প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

ষষ্ঠ ভাগ।

১৩১৩

এলাহাবাদ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ছয় আনা।

প্রবাসী, ১৩১৩।

বিষয় বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

সূচী।

স্বতন্ত্র মুদ্রিত চিত্রের সূচী।



মেঘ দূতের বিরহী যক্ষ

প্রবাসী

"Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters.'
"to look on noble forms
Makes noble thro' the sensuous organism
That which is higher."—*Tennyson.*

৬ষ্ঠ ভাগ। } বৈশাখ, ১৩১৩। { ১ম সংখ্যা।

জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি।

সুবিখ্যাত দার্শনিক মার্জ্ (Merz) তৎপ্রণীত "ইয়ুরোপীয় ভাবের ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে একস্থলে বলিয়াছেন, "বিশ্ববিদ্যালয় ভাবজননের যন্ত্রবিশেষ।" ঐ গ্রন্থ পাঠে ইহা স্বতঃ প্রতিপন্ন হইবে যে ভাবের যেমন ব্যক্তিত্ব আছে, তেমনই জাতীয়ত্বও আছে। সেই হিসাবে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়কে কোন একটা ভাববিশেষের জন্ম ও বিকাশের ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ভারতবর্ষে 'বিশ্ববিদ্যালয়' বলিলে যাহা বুঝায়, ইয়ুরোপের বিশ্ববিদ্যালয় সকল তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ। ব্যক্তিত্ব এবং জাতীয় আদর্শের স্ফুরণ ইয়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রধান বিশেষত্ব। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝা প্রয়োজন।

ইয়ুরোপীয় প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কার্য্যকরী কিম্বা অর্থকরী বিদ্যা স্থান পায় না। যেমন একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক,—আইন শিক্ষা।* বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের উপাধি গ্রহণ করিয়া কেহ আইন ব্যবসা করিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় আদি ও বর্ত্তমান সমাজচিত্র এবং সামাজিক রীতি নীতি পর্য্যালোচনা করিয়া একটী আদর্শ সমাজচিত্র শিক্ষার্থীর সমক্ষে খাড়া করিয়া দেয়। শিক্ষার্থী তাহাতে সমাজের একটী আদর্শচিত্র দেখিতে পায়। কিন্তু প্রচলিত সমাজের বিধান প্রণালী শিক্ষা করিয়া আইন ব্যবসায় করিতে হইলে ব্যবসায়ীকে কেবল আদর্শ আইন শিক্ষাতে ব্যাপৃত থাকিলে চলে না। তাহাকে ব্যবসায়িক বিদ্যালয়ে প্রচলিত গতীয়ন্ত প্রণালী শিক্ষা করিতে হয়। (ইহাকে ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টার পরীক্ষা কহে)। এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিশ্ববিদ্যালয় এই শিক্ষার কিম্বা পরীক্ষার সহিত কোন সংস্রব রাখে না। এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কোন্ কাজে লাগে? তাহার উত্তর আমি এই প্রবন্ধের আরম্ভেই দিয়াছি,— বিশ্ববিদ্যালয় কেবল ভাব জন্মাইবার যন্ত্রবিশেষ। হয় ত একদিন এমন ছিল যখন বিশ্ববিদ্যালয় যাবতীয় বিশ্ববিদ্যা শিক্ষা দিতে সমর্থ হইত। কিন্তু বিদ্যার ক্রমোন্নতি এক্ষণে এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যেখানে ভাব ও কার্য্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা না করিলে মানবসমাজের উন্নতি করা যায় না। প্রত্যেক শিক্ষারই আদর্শ থাকা প্রয়োজন, কেবল কার্য্যকরী শিক্ষা দ্বারা আদর্শের গ্রহণ কিম্বা রক্ষণ, কোন কার্য্যই সফলতার সহিত সম্পাদন করা যায় না। একজন

* এস্থলে যে কথাগুলি বলা হইয়াছে, তাহা ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল।

বিখ্যাত ইংরাজ পণ্ডিত (জন্‌সন্) আদর্শবিহীন কার্য্যক্ষেত্রকে 'পশুশালা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (অবশ্য তিনি কার্য্যবিহীন ভাববিকাশকেও 'স্বপ্নদেশ' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন)। আজকাল হুজুগের দিন পড়িয়াছে,—কার্য্যক্ষেত্রের পরিসর ও কার্য্য এত বাড়িয়া গিয়াছে যে কাজ করিতে করিতে কাজের উৎকর্ষের সহিত আদর্শেরও উৎকর্ষসাধন করা অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ ভাবের উৎকর্ষ দ্বারা আদর্শের উৎকর্ষ সাধন সহজে ঘটিতে পারে। এই জন্য, কার্য্য ও ভাব যাহাতে উভয়তঃ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে অথচ একের হুজুগে অপরের খর্ব্বতা না ঘটে তাহার সুব্যবস্থা করিতে গিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কেবল ভাব ও আদর্শের জনন এবং সংরক্ষণ করিবার ভার নিজের আয়ত্তাধীনে রাখিয়া কার্য্যকরী শিক্ষাকে পৃথক করিয়া দিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এক সময়ে এমন অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল যখন দেখা গেল যে ভাব ও আদর্শ ঠিক রাখিতে পারিলে কার্য্যকরী শিক্ষা ঐ আদর্শকে অবলম্বন করিয়া স্বায়ত্ত রক্ষণ ও পরিচালনে সক্ষম হইবে। সেই ময়ে বিশ্ববিদ্যালয় কার্য্যকরী শিক্ষাকে স্বায়ত্তশাসনের দিয়া নিজে কেবল ভাববিকাশের ব্যবস্থাতে মনঃকরিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার সুফল ; যতদিন ভাবরাজ্য অটুট ও ক্রমবিকশিত হইতে বে, ততদিন কার্য্যক্ষেত্র আদর্শভ্রষ্ট হইয়া স্খলিতপদ হতে পারিবে না। ইহা হইতে আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে বিশ্ববিদ্যালয় কার্য্যকরী বিদ্যা দান অপেক্ষা কার্য্যের উৎকর্ষবিধানার্থ আদর্শ নিয়োগ করিয়া স্বীয় সাফল্য প্রকটিত করিয়া থাকে। শিক্ষার এই স্বাতন্ত্র্যবিধান দ্বারা ইয়ুরোপে কি ফল দাঁড়াইয়াছে তাহা বিচার করা আবশ্যক। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাবস্ফুরণ শিক্ষা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতেছে—তাহারা উন্নততর ভাবের সমাবেশ দ্বারা কার্য্যক্ষেত্রের আদর্শ উন্নত করিয়া কার্য্যের উন্নতিবিধান করিতে সক্ষম হইতেছে; আর যাহারা কোন বিশেষ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট না হইয়া সমাজে বিচরণ করিতেছে, তাহারাও উন্নত ভাবের প্রচার দ্বারা সমাজের ভাবসমষ্টির উন্নতিবিধান করিতে সক্ষম হইতেছে। ইহা দ্বারা জাতীয় ভাব ও জাতীয় কর্ম্মক্ষমতা উভয়ই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই দ্বিবিধ উৎকর্ষ কি উপায়ে সাধিত হইতেছে তাহা বুঝিতে হইলে শিক্ষার জাতীয়ত্ব কোথায় তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন জনের ব্যক্তিত্ব একত্র সমাবিষ্ট হইয়া একভাবাপন্ন হইলেই ঐ সকল জনসমষ্টিকে জাতি বলা যায়। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে ভাবের একত্বই জাতীয়তার মূল, এবং বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের একত্বে সমাবেশই জাতীয়তার লক্ষণ। দশজনের ভিন্ন ভিন্ন ভাবস্রোতকে এক সমষ্টিতে মিলিত করিয়া প্রবাহিত করিতে পারিলেই জাতীয় জীবন গঠনের সূত্রপাত হয়; এবং ঐ সমাবিষ্ট ভাবস্রোত জাতীয় ভাবরূপে পরিগণিত হয়। যেখানে দশের ভাব মিলিয়া যাইবে সেখানেই ঐ ভাবসমষ্টি জাতি উৎপাদন করিবে। একবার জাতি উৎপাদিত হইলে তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব নিমজ্জিত হইয়া তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না; পরন্তু তাহাতে লুপ্ত হইয়া তাহার আয়তন বৃদ্ধি করিবে। ইহাকেই জাতীয়তার লক্ষণ বলা হইল। ইহা হইতে আরও দেখা যাইতেছে যে যেখানে ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবে সেখানে জাতীয় ভাব তিষ্টিতে পারিবে না। এই জাতীয় ভাবেতে ব্যক্তিত্বের নিমজ্জন কিরূপে সাধিতে হয়? ইহার একমাত্র উত্তর—**শিক্ষা দ্বারা।**

প্রথমেই দেখান হইয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয় ভাবের জনয়িতা। ইহাও বলা হইয়াছে যে ইয়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক পার্থক্য, কারণ উভয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী অতি স্বতন্ত্র। ইংলণ্ডে ভাবশিক্ষার জন্য কেহ লণ্ডন কিম্বা এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় না; যাহারা ঐরূপ শিক্ষা করিতে চায় তাহারা অক্সফোর্ড কিম্বা কেমব্রিজে যায়। কারণ ভাব জন্মাইবার প্রধান সরঞ্জাম ঐ দুই স্থানেই রহিয়াছে। ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইহাদের কোনটার আদর্শে গঠিত নহে। আরও একটী কথা আছে,—জাতীয় ভাবজনক বিশ্ববিদ্যালয় একের আদর্শে অন্যত্র গঠিত হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির জাতীয় ভাব স্বতন্ত্র; এমন কি এক জাতির মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে পরস্পর হইতে বিভিন্ন ভাব স্ফুরিত হইতে দেখা যায়। সকল ভাব একত্রে এক স্থানে এক ব্যক্তিতে ফুটিতে পারে না। তাই নানা স্থানে নানা

ভাবের স্ফুরণ জন্য নানা ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয় হয়, ও তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের গণ্ডী স্থাপিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি হয়। এক জাতিতেই যখন এত কাণ্ড ঘটে তখন জাতির পার্থক্যে যে ভাবের পার্থক্য ঘটিবে, ও তাহা হইতে পৃথক আদর্শে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষার জন্য যেমন বিলাতী আদর্শে বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইতে পারে না, তেমনই আবার বিদেশী রাজশক্তিও দেশীয় আদর্শ খাড়া করিয়া ভারতীয় জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে না। যাঁহারা মনে করেন ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষা দিয়া আমাদের জাতিবন্ধন হইবে,—আমাদের জাতীয় ভাবের স্ফুরণ হইবে,—তাঁহারা অবোধ; কারণ সাহিত্য ও দর্শন জাতীয় ভাবেরই পরিচায়ক, তাহাদের সার্ব্বজনিকত্ব সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা ইংরাজ রাজশক্তিকে আমাদের জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা না করা অপরাধে দোষী মনে করেন তাঁহারা হস্তীমূর্খ! যাঁহারা কখনও জাতীয় শিক্ষা দেখিয়াছেন কিম্বা বুঝিয়াছেন তাঁহারা জানিবেন যে একজাতি অপর জাতিকে জাতীয় শিক্ষা দিতে পারে না। আমাদের ভিতরে ভাবের অঙ্কুর থাকিলে তবে নিজের আদর্শকে অপরের আদর্শে সংস্কৃত করা যাইতে পারে; কিন্তু বিজাতীয় ভাব ও শক্তিদ্বারা জাতীয় ভাবের অঙ্কুর জন্মাইতে চেষ্টা করা ও দেশীয় গেন্দাফুলকে বিলাতী ডালিয়াতে পরিণত করিতে চেষ্টা করা একই রূপ অসম্ভব মনে হয়। জাপান আমাদিগকে ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে,—তথায় বিজাতীয় শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার আনুকূল্য করিতেছে, কিন্তু তাহা জাতীয় শিক্ষার উপায় নহে। ইংরাজ রাজশক্তি কিম্বা ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় যদি ভারতে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি-স্থাপন করিতে পারিত, তাহা হইলে ইংরাজকে সৃষ্টিকর্ত্তার পদবীতে স্থাপিত করিতে হইত, অথবা একান্ত পক্ষে তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করা আমাদের কর্ত্তব্য হইত।

ইয়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমাদের দেশের কলেজের স্থানীয়। তাহাতে কেবল পাঠ্যনির্ব্বাচন ও পরীক্ষাগ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন হয় না,—শিক্ষাদান তাহার প্রধান কর্ত্তব্য। ইয়ুরোপীয় কলেজগুলি আমাদের দেশের ছাত্রাবাসের অনুরূপ হইত, যদি ছাত্রাবাসগুলিতে শিক্ষকের বসবাস থাকিত। 'কলেজ' অর্থ পাঠমন্দির নহে;—যাহাতে কতকগুলি শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী লোক পরস্পরের সাহচর্য্যে বাস করিয়া পরস্পরের জ্ঞানার্জ্জনের ও ভাবসংগ্রহের সহায়তা করে, তাহাকে 'কলেজ' কহে। ইয়ুরোপীয় এই জাতীয় একটী কলেজে গেলে দেখা যাইবে যে তাহার অধিবাসিগণের মধ্যে একটী ভাব অতিশয় প্রবল। তাহা এই যে প্রত্যেকে আত্মোন্নতি দ্বারা দেশের ও জাতির উন্নতিবিধান করিবার সঙ্কল্প লইয়া কলেজে আসিয়াছে। দশজনের একজন হইতে হইবে; জগতের কার্য্যক্ষেত্রে আমার জন্য কিছু একটা করিবার কাজ আছে, তাহা আমি না করিলে চলিবে না, এই বোধ প্রত্যেক ছাত্রের হৃদয়ে প্রবল। ইহাই ব্যক্তিত্ববোধ। দশজনের একত্র বাস ও সাহচর্য্য দ্বারা এই ব্যক্তিত্ববোধ ক্রমে একটা আদর্শগ্রহণ করিতে ও ভবিষ্যজীবনের কার্য্যক্ষেত্র বাছিয়া লইতে সক্ষম করে। ইহার আরও একটা সুফল এই হয় যে দশজনের ব্যক্তিত্ব, পরস্পরের সাহচর্য্যে ঘসিয়া মাজিয়া, তাহার কণ্টকগুলি ছাঁটিয়া ফেলিয়া, একটা দলবদ্ধ 'ভাবে' পরিণত করা যায়। অধিকাংশ স্থলে তাহা পূর্ব্বলব্ধ কোন আদর্শের সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; ইহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শের উন্নতি সূচিত হয়। কিন্তু সর্ব্বত্রই দশের মিলনে একটা জাতীয়ত্ব পরিস্ফুট হয়। নিজের ব্যক্তিগত ভাবকে দশজনের ভাবের সহিত মিলিত করিতে এবং বিরোধ স্থলে দশের মতে নিজের ভাবকে সংযত করিতে ও দশের হিতার্থ নিজের ব্যক্তিগত হিতকামনাকে সংযত করিয়া লাভালাভ পরস্পর সমভাগে শান্তচিত্তে গ্রহণ করিতে পারা ইয়ুরোপীয় বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ শিক্ষা। ইহারই নাম জাতীয় শিক্ষা। প্রত্যেক মানবের একটী কর্ত্তব্যস্থান রহিয়াছে, তথায় কি একটী অপরিজ্ঞাত কর্ত্তব্য তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে; সেই কর্ত্তব্যের অনুসন্ধান করিয়া তাহা পালন করিতে শিক্ষা করা মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা। ইহারই নাম 'ব্যক্তিত্ব' রাখা হইয়াছে। জগতে আমি যে একজন ব্যক্তি তাহার পরিচয় জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে; কোন ক্ষেত্র বিশেষে কোন বিশেষ কর্ম্মসাধন দ্বারাই আমার ব্যক্তিত্বের পরিচয়। যেখানে দশজন ব্যক্তি পরস্পরের হিতকামনায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত

হয় সেখানে তাহাদের একটা দলবন্ধন হইয়া থাকে। ইহারই নাম হইল জাতি। কেবল একদেশে জন্মিলে কিম্বা একরূপ পোষাক পরিলে একজাতীয় হওয়া যায় না। আবার দশটী ভাবকে একত্বে পরিণত করিতে হইলে একটা আদর্শের প্রয়োজন হয়। দুই জন লোকই একটা 'প্রোগ্রাম' (কার্য্যপদ্ধতি বা অনুষ্ঠানপদ্ধতি) না হইলে পরস্পর মিলিয়া কাজ করিতে পারে না; প্রোগ্রামের অভাবে হয় ত একই কাজ উভয়ে করিতেছে, অথচ উভয়ের কার্য্যে একটা ঐক্য-বন্ধন থাকিতেছে না। যেখানে সহস্র সহস্র লোক দ্বারা জাতিগঠন করিতে হইবে, সেখানে একটী আদর্শ-প্রোগ্রাম থাকা বিশেষ দরকার। এই আদর্শই জাতীয়তার ভিত্তি, এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বের সংমিশ্রণে এই আদর্শের উৎপত্তি হয়। ব্যক্তিগত কার্য্যের সম্মুখে এই জাতীয় আদর্শ খাড়া না থাকিলে জাতীয়তা রক্ষা হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ও আদর্শনির্ব্বাচন ইয়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষা। এ স্থলে ইহা বলা হইতেছে না যে ইয়ুরোপে প্রত্যেক শিক্ষার্থী ঐ দুই শিক্ষাতে সফলতালাভ করিতে সক্ষম হয়। তাহা যদি হইত তবে ইয়ুরোপ এতদিনে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইত। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে ইয়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ঐ দুইটী শিক্ষাই শিক্ষার্থীদিগের কামনীয়। ইহার মধ্যে একজন শিক্ষার্থীও যদি ঐ দুই শিক্ষাতে সফলতালাভ করে তাহা হইলেই জাতীয় মঙ্গল সূচিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় নিজের অস্তিত্ব সার্থক জ্ঞান করে। শিক্ষার সম্পাদন অপেক্ষা শিক্ষার উদ্দেশ্যেতেই একটী জাতীয় সার্থকতা রহিয়াছে; উহাই শিক্ষার আদর্শ।

আরও একটী কথা আছে—কোন জাতির কালানুক্রমিক ঘটনাপরম্পরা লিপিবদ্ধ হইলে তাহা ঐ জাতির ইতিহাস হয়। কিন্তু ইতিহাসোক্ত ঘটনাসমূহের অভিজ্ঞতা হইতে ভাব সঙ্কলিত হইলে তাহা ঐ জাতির দর্শনে পরিণত হয়। একারণ দর্শনে জাতীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য জাতিবিশেষের বর্ত্তমান বা চলিত ভাব, এবং দর্শন ঐ জাতির অভিজ্ঞতার সঙ্কলিত ভাব প্রকটন করে। একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়াছেন যে যেখানে ইতিহাসের সমাধান হয়, সেখান হইতে দর্শন উৎপন্ন হয়। আবার ইতিহাস যেমন বাড়িতে থাকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনেরও উৎকর্ষ ঘটে। এইরূপে সাহিত্য ও দর্শন জাতীয়তার পরিচয় প্রদান করে। যেমন বালকদিগকে আগে মাতৃভাষা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়া পরে অন্য বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা দিতে হয়, সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধেও সেই প্রথা নির্দ্দেশ করা যায়,—আগে জাতীয় সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষা দ্বারা নিজের জাতীয় বীজ বপন করিয়া জাতীয় ভাবের অঙ্কুর জন্মাইতে হয়; তৎপর তাহার মূলে পরকীয় সাহিত্য ও দর্শনের সার দিলে তাহাতে জাতীয় ভাব সতেজ ও বর্দ্ধিত হয়। ইয়ুরোপে সর্ব্বত্রই এই প্রথা প্রচলিত, একারণ তথায় বালকদিগের শিক্ষার মূলে জাতীয় ভাব বিদ্যমান থাকে। দর্শন বলিতে কেবল প্রাচীন দর্শন বুঝিতে হইবে না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইতিহাস যত পুরাতন হইতে থাকে তাহা হইতে ততই নূতন দর্শন উৎপন্ন হয়। দর্শন নিত্য ঘটিতেছে; কিন্তু অতীতের ঠুলি চক্ষে দিয়া কেবল অতি পুরাতন দর্শনের অনুসরণ করিলে জাতীয় উন্নতি ঘটে না। কারণ অপরাপর জাতির সংঘর্ষে আমাদের জীবন নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে;—আমাদের ভাবে ও অভিজ্ঞতাতে নিত্য পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আমাদের দর্শনকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সহিত মিলাইতে না পারিলে সেই দর্শনের জাতি থাকে না। জাতীয় দর্শন সভ্যতার পরিচায়ক; সাহিত্য দর্শনের বর্ত্তমান ভাগ আলোচনা করে ও তাহাকে বর্ত্তমান জীবনের সহিত মিলাইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর করে।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে শিক্ষা জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়াতে শিক্ষার জাতীয়তা রক্ষা হইতেছে না। তাহার ফলে আমাদের ব্যক্তিত্ব স্ফুরিত হইতে না পারাতে জাতীয় আদর্শও তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। ইহার ফলে আমাদের জাতীয় ভাব ক্রমে খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। আমরা পরকীয় ভাব পরের কথায় ব্যক্ত করিতে যথেষ্ট শিক্ষা করিয়াছি, কিন্তু ঐ সকল ভাব আমাদের জীবনে মিশিয়া যাইতেছে না। তাই, ঐরূপ পরকীয় শিক্ষার ফলে, আমাদের জাতীয় ভাব কিছুতেই জন্মাইতেছে না। ইহার একটী দৃষ্টান্ত অতি সহজ;—আমার স্বজাতীয় দশজনের মতের সহিত আমার মত না

মিলিলে আমি একক কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করি, কিন্তু তথাপি আমার মতকে সংযত করিয়া জাতীয় দশের মতের সহিত মিলাইয়া কার্য্য করিতে অগ্রসর হই না। ইহাতেই জাতীয় শিক্ষার অভাব সূচনা করিতেছে। আমার মতের সহিত যাঁহাদের মতের অনৈক্য হইল তাঁহাদের সহযোগে কার্য্য করিব না, কিম্বা দশজনে বিচার করিয়া অধিকাংশের মতে যাহা কর্ত্তব্য ধার্য্য হইল, তাহাতে আমি অমত প্রকাশ করিয়াছি বলিয়া সেই কার্য্য নির্ব্বাহে সহায়তা করিব না, ইহা জাতীয় ভাবের লক্ষণ নহে। ভাব সংযমন ভিন্ন জাতীয়তা আসিতে পারে না। আমাদের দেশে জাতীয় শিক্ষার অভাবেই জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণও জাতীয় ভাব গ্রহণ ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। দেশে জাতীয় ভাব উৎপাদন করিতে হইলে জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে আমাদের রাজা আমাদের স্বজাতি নহে। একারণ আমাদের জাতীয় শিক্ষা রাজশক্তির অনুমোদিত কিম্বা রাজশক্তিদ্বারা পরিচালিত হইবে ইহা আশা করা বাতুলতা মাত্র। প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইংরাজি শিক্ষা দ্বারা আমাদের জাতীয়তা উৎপাদন করিতে কখনই সক্ষম হইতে পারে না, কারণ আমাদের দেশে এখনও জাতীয় 'বিশ্ব-বিদ্যা' ও তাহা শিক্ষা দিবার অনুকুল সরঞ্জাম বা শিক্ষক কিছুই নাই। যদিও সাধারণ হিসাবে বুঝা যাইবে যে বিজ্ঞান সার্ব্বজনিক বিদ্যা, অতএব তাহাতে জাতি থাকিতে পারে না; কিন্তু ইয়ুরোপের ইতিহাসে দেখা যায় যে বিজ্ঞানও জাতীয়তা অবলম্বন করিয়া থাকে,—ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্ব স্ব ভাবে বিজ্ঞানকে ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় পরিচালিত করে। তাহাদের সাহিত্য তাহাদের দর্শন বিজ্ঞানকে তাহাদের জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে। কিছুদিন হইল, ভারতের ইয়ুরোপীয় শিক্ষকগণ একবাক্যে কলরব তুলিয়াছিলেন যে এতদিন ধরিয়া ভারতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইল তথাপি ভারতবাসীর জীবনে বৈজ্ঞানিক ভাব প্রবিষ্ট করিতে পারা গেল না। অনেক অল্পজ্ঞ সমালোচক ঐ সকল উক্তিকে জাতিবিদ্বেষদুষ্ট বলিয়া উপহাস করিতে ক্ষান্ত হন নাই; কিন্তু তাহাদের মূলে গভীর সত্য রহিয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও ভারতে 'পাশ্চাত্য' রহিয়া গিয়াছে, এখনও তাহার প্রাচ্য জাতিত্ব প্রতিষ্ঠা হয় নাই। এখনও ঐ বিজ্ঞান কেবল বিদ্যালয়েই আলোচিত হইতেছে, তাহা আমাদের জীবনে মিশিয়া, তাহার ভাব দ্বারা আমাদের জীবনকে চালিত করিতে সক্ষম হয় নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানপাশকরা লোকের নিকট ম্লেচ্ছত্ব ঘুচাইতে পারিতেছে না; এমন কি এখনও তাঁহারা বিজ্ঞানকে আপনার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দিতে কুণ্ঠিত,---পাছে জাতি যায়! ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে সাহিত্য ও দর্শন ছাড়া, জগতের একমাত্র সার্ব্বজনিক বিদ্যা বিজ্ঞানেরও জাতি আছে। এই সকল শিক্ষণীয় বিষয়ের জাতি প্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয়কে ধরিয়া নাড়া দিবার ক্ষমতা মুখের কথায় হয় না; তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যার প্রয়োজন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কথা কহিবার আগে আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা,—এমন সকল বিদ্যালয় স্থাপন করা, যাহাতে ব্যক্তিত্ববোধ ও জাতীয় আদর্শগ্রহণ যুগপৎ ঘটিতে পারে। ইংরাজ রাজশক্তির কুৎসা ও অবমাননা জাতীয়তা নহে। (কোন কোন শিক্ষার্থী সাহেব দেখিলে ঢিল মারা, কিম্বা দশজনে মিলিয়া কোন সাহেববিশেষকে অথবা তদভাবে সমস্ত ইংরাজ জাতিকে গালি দেওয়া জাতীয়তা মনে করে)। পরন্তু নিজের স্বার্থ ও ইচ্ছা সংযত করিয়া জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় আদর্শের উদ্দেশ্যে জীবনকে বৃত ও পরিচালিত করিতে শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা। ইংরাজের সাহিত্য ও দর্শন হইতে ভাষা ও ভাব গ্রহণ করিয়া সেই ভাষা ও ভাবের অপব্যবহার করিলে (অর্থাৎ তাহা ব্যবহার করিয়া ইংরাজকে গালি দিতে শিখিলে) আমরা জাতি পাইব না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমাদের জাতি গিয়াছে। কিন্তু পরকীয় জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি কোথায় তাহা দেখিয়া জাতি শব্দের একটা অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়াই এত কথা বলিতে সাহস করিয়াছি। জাতি দিয়া অন্ততঃ এই অভিজ্ঞতাটুকু লাভ করিয়াছি বলিয়া আজ কথা কহিতে লজ্জা করিতেছে না।

একজন ইংরাজ ঔপন্যাসিক ইংলণ্ডের বোর্ডিংস্কুলগুলিকে

জাতীয় 'বাতিঘর' (Light-house) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই একটী কথাতে কতখানি জাতীয় শিক্ষার উপাদান রহিয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে অনেক উপকার হইবে। আমাদের এখন 'গুরুকুল বিদ্যালয়ের' দিন চলিয়া গিয়াছে কিন্তু জাতীয় বোর্ডিং স্কুল ভিন্ন আমাদের জাতীয় ভাব ভজনের অন্য উপায় দেখা যায় না। ঐরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দশজনকে পরস্পরের ইচ্ছা ও রুচির সমাদর করিতে, ও পরস্পরের সহিত মিলিয়া বাস করিতে, চলিতে ফিরিতে, ও কার্য্য করিতে দিতে পারিলেই জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিস্থাপিত হইবে। ঐরূপ বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে একত্রে থাকিতে হইবে। আহারে, বিহারে, শিক্ষায়, কার্য্যে, সর্ব্বত্র শিক্ষকের আদর্শগ্রহণ শিক্ষার মূল অঙ্গ। কেবল কথা শুনিয়া ও বই পড়িয়া কার্য্যশিক্ষা হয় না, তাহাতে কেবল কথা শিক্ষা হয় মাত্র। কেবল কথা দ্বারা যেমন জাতীয়তা জন্মায় না, তেমনই কোন বিদ্যাই জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। ভাবের স্ফুরণ ভিন্ন শিক্ষার অন্য যে কোন উদ্দেশ্যই অকিঞ্চিৎকর, এবং জাতীয় শিক্ষাদান করিতে হইলে শিক্ষার জাতীয়তা সম্পাদনই প্রাথমিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। এই উদ্দেশ্যের সফলতা গ্রন্থ কিম্বা ভাষাপেক্ষা শিক্ষকেতে অধিক বর্ত্তে। তাই শিক্ষকের আদর্শই এই শিক্ষার প্রথম সোপান। ইহাও দেখা যায় যে বালকদিগের প্রথম জীবনের স্ফুরণ খেলাতে; একারণ জাতীয় শিক্ষার মূলে জাতীয় খেলার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। দশের স্বার্থের সহিত নিজের স্বার্থের সংমিশ্রণ ও নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সংযত করিতে শিক্ষা, প্রথমেই খেলাস্থলে ঘটে। দশে মিলিয়া বিনা দ্বন্দ্বে খেলিতে শিক্ষা করা জাতীয় শিক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। একত্রে অশন, একত্রে বাসন অভ্যস্ত না হইলে পরস্পরের জীবনের গতি সমাবিষ্ট হইতে পারে না, এবং তদভাবে জাতীয় ভাব বিকশিত হয় না। আমাদের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি কোথায় তাহা দেখাইয়া দেওয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। কিন্তু যাঁহারা জাতীয় শিক্ষাদানে উৎসুক তাঁহাদিগকে ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করা হইল যে জাতীয় শিক্ষার এমন একটা ভিত্তি আছে, যাহাকে অবলম্বন না করিলে জাতীয় শিক্ষা জন্মাইতে পারে না।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

কৃষিকর্ম্ম।

(শিল্পকলা-আলোচনা-সমিতির জন্য লিখিত প্রবন্ধের মর্ম্ম।)

মাননীয় ডি, এম্, হ্যামিল্টন্ সাহেবের উক্তিঃ—

স্বদেশী দ্রব্যজাত প্রস্তুত করিবার দিকে লোকের এখন যেরূপ ঝোঁক দেখা যাইতেছে, তাহাতে তাহাদের একটা কথা ভুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। কথাটা এই যে, কৃষির উন্নতি না হইলে অন্যান্য শিল্পকলার উন্নতিও অসম্ভব। বয়নশিল্পের উন্নতি শুধু উত্তম তুলা উৎপাদনের উপর নির্ভর করে তাহা নহে, উৎপন্ন কাপড়চোপড়ের কাট্‌তিও কৃষকদের মধ্যেই বেশী হইবে। অতএব কৃষকদের অবস্থা যাহাতে স্বচ্ছল হইতে পারে সেই চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। মাঞ্চেষ্টর ও ডণ্ডীর সমস্ত কার্পাস ও পাটশিল্প হাত করিতে পারিলেও ভারতের ত্রিশ কোটি লোকের মাত্র এক কোটি ঐরূপ শিল্পকলার চর্চ্চা করিবে, শতকরা ৯০ জন তখনও কৃষকই থাকিয়া যাইবে। তাহাদের একটা গতি করিতে হইলে তাহাদের কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহা করিবার একমাত্র উপায়, তাহাদিগকে অল্প সুদে মূলধন যোগান ও তাহাদের কর্ষণ-প্রণালীর উৎকর্ষসাধন। ভারতবাসীর অভাব, গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসগৃহ। এই ত্রিবিধ অভাব পূরণেরই একমাত্র উপায় কৃষি; কারণ, যে চালার তলে সে মাথা রাখিবে তাহারও উপকরণ কৃষিজাত। ভারতীয় কৃষক যে শুধু তাহার নিজের ভরণপোষণের জন্যই দায়ী তাহা নহে, প্রকৃত পক্ষে তাহাকে সমগ্র সাম্রাজ্যের ভার বহন করিতে হয়। বণিকদের পণ্যদ্রব্য সেই যোগায়; কল চালাইবার তুলা ও পাট সেই উৎপাদন করে; লৌহবর্ত্মবাহিত মালের অধিকাংশ তাহারই শ্রমে উৎপন্ন হয়; পাট, তিসি, চাউল, নীল, চর্ম্ম ও চা দ্বারা সেই জাহাজ বোঝাই করে; য়ুরোপোৎপন্ন কাপড়চোপড় সেই আমদানী করে; রাজস্ব ও সৈনিক বিভাগের ব্যয়ভার সেই বহন করে; জমীদারের ধনাগার সেই পূর্ণ করে; খনিশিল্পও তাহারই উপর নির্ভর করে, কারণ মালবোঝাই শকট ও অর্ণবপোতচালনার জন্য অলাতশিলার প্রয়োজন। অতএব যাহাতে ভারতীয় কৃষকের উন্নতি হয়, তাহাতে ভারত সাম্রাজ্যেরও উন্নতি।

ভারতে বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালী প্রচারের জন্য গবর্ণমেন্টকে উদ্যোগী দেখিলে কাহার না আনন্দ হয়? এই জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, প্রয়োজন হইলে আরও দিবেন। এখন দেশীয় লোকদের যাঁহারা নেতৃস্থানীয়, তাঁহাদের উচিত কৃষকেরা যাহাতে এই বৈজ্ঞানিক-কৃষিশিল্পশিক্ষার ফল 'হাতে-কলমে' পাইতে পারে তাহার উপায় করিয়া দেওয়া। এজন্য সর্ব্বপ্রথমেই চাই অর্থ। মহাজনদের পেট ভরাইতেই যদি কৃষকের উপার্জ্জিত অর্থের শেষ কপর্দক পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইয়া যায়, তবে তাহার এই "ভূতের বেগার" খাটিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষাকার্য্য চালাইয়া নির্ণয় করিতে হইবে, কিরূপে কৃষকের আর্থিক অবস্থা উন্নত করা যায়। এজন্য অনেকে অনেক সময়ে অনেক প্রস্তাব করিয়াছেন। মাননীয় গোখলে মহোদয় একবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, কৃষকদের সমস্ত ঋণ মোচনের ভার সরকার নিজ স্কন্ধে লইয়া তাহাদিগকে ঋণের দায় হইতে একবার মুক্তি দিয়া দেওয়া উচিত। উদ্বৃত্ত অর্থ হাতে থাকিতে দুই এক জেলায় এই প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিয়া দেখা অবশ্যই উচিত। সরকার শতকরা বার্ষিক ৬।০ টাকা সুদে কৃষকদিগকে টাকা ধার দিতে প্রস্তুত আছেন। চাষের জন্য ঋণদান আইন (Agricultural Loans Act) ও জমীর উন্নতিবিধান আইন (Land Improvement Act) অনুসারে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ যদি একটু অধিকতর মুক্তহস্তে কাজ করেন, তবে উক্তরূপ ঋণদানে কৃষকেরা অধিকতর ফল পাইবে, ভারতগবর্ণমেণ্ট এরূপ আশা করেন। সম্প্রতি তাঁহারা যে রেজলিউশন পাশ করিয়াছেন তাহাতে এই অভিমতই ব্যক্ত হইয়াছে। এই পরীক্ষাকার্য্যও চালাইয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু আমার ভয় হয় পাছে সরকার-নিয়োজিত কর্ম্মচারীরা মাঝে পড়িয়া নিজেদের উদরপূর্ত্তির জন্য ৬।০ টাকার উপর আরও শতকরা ১০৲ টাকা গরীব কৃষকদের নিকট আদায় করিয়া সরকারের সদুদ্দেশ্যটি ব্যর্থ করিয়া দেয়। কৃষকেরা নিজেদের ভিতর মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিলে আর এরূপ অনিষ্টপাতের আশঙ্কা থাকে না। এরূপ কয়েকজন জমীদার অগ্রসর হউন, যাঁহাদের দুই এক হাজার টাকা খরচ করিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। ঋণদানের যৌথসমিতি (Co-operative Credit Society) গঠন করিয়া তাহা হইতে শস্যদাদন দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যাউক, সমিতিগুলি সরকারী রেজিষ্টরের রেজিষ্ট্রীভুক্ত হউক্। পূর্ব্বে আমি এরূপ যৌথসমিতির আবশ্যকতা ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহারই সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১) যে দেশের সর্ব্বপ্রধান শিল্পকলার আর্থিক বুনিয়াদ কাঁচা তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না।

(২) ভারতীয় কৃষককে শতকরা ২৫৲ হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত সুদ মহাজনকে দিতে হয়; অন্যান্য দেশের কৃষককে শতকরা ৫৲ হইতে ১০৲ টাকার বেশী দিতে হয় না। এরূপ অবস্থায় প্রথমোক্তের শেষোক্তের সহিত প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব।

(৩) পাশ্চাত্য দেশসমূহে ব্যাঙ্কের সহিত কৃষকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিদ্যমান। এদেশে প্রত্যেক কৃষকের ঋণের পরিমাণ অত্যল্প, কিন্তু কৃষকের সংখ্যা অত্যধিক। কাজেই পাশ্চাত্য দেশের প্রথায় এখানে কাজ চলিতে পারে না। প্রতি গ্রামে একটি ঋণদানের যৌথসমিতি গঠিত হইবে এবং সেই সমিতি গ্রামস্থ কৃষকদের জন্য ব্যাঙ্ক বা মহাজনের নিকট টাকা ধার করিবে।

(৪) এই ঋণগ্রহণের জন্য গ্রাম্য সমিতি কিরূপ জামিন দিবে?

(৫) রায় পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-গোলা-প্রথা হইতে উক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। এই প্রথানুসারে গোলায় সঞ্চিত শস্যের পরিমাণ সুদে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া যায়। এই শস্য-ভাণ্ডার গচ্ছিত রাখিয়াই মহাজনের নিকট টাকা ধার করা যায়।

(৬) যৌথ ঋণদানসমিতি বিষয়ক আইন (Co-operative Credit Societies Act) অনুসারে ধর্ম্ম-গোলা রেজিষ্ট্রী করিলে সমিতিভুক্ত প্রত্যেকে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে সমিতি কর্তৃক গৃহীত ঋণের জন্য দায়ী হয়। যদি আবশ্যক হয়, তবে ধর্ম্ম-গোলা এইরূপে রেজিষ্ট্রী করা যাইতে পারে।

(৭) যদি সম্ভবপর হয়, তবে গ্রামবাসীদের নিকট হইতেই শস্য সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্ম-গোলা পূর্ণ করিতে হইবে; এরূপ করিলে গ্রামবাসীরা গোলাটিকে নিজেদের জিনিষ বলিয়া

মনে করিবে ও সর্ব্বদা তাহার উন্নতিকামনা করিবে। অগত্যা জমীদারেরাই অগ্রসর হইয়া ১০০ গ্রামের জন্য ১০০ মণ (বেশীও আবশ্যক হইতে পারে) শস্যদান করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।

(৮) শস্য-বীজ ধার দেওয়ার সাধারণ নিয়ম এই যে, শস্য সংগৃহীত হইলেই মণকরা দশ সের হইতে বিশ সের পর্য্যন্ত সুদের হিসাবে সুদ ও আসল আদায় করা হয়। ধর্ম্ম-গোলা হইতেও এই হারেই ধার দেওয়া হইবে। সুদে আসলে কৃষকদের নিকট যে শস্য আদায় হইবে তাহা গ্রামের হিতার্থে ধর্ম্ম-গোলায়ই রাখিয়া দেওয়া হইবে। মহাজনদিগকে আসল টাকা ও শতকরা ছয় টাকা সুদ সুবিধামত ধর্ম্ম-গোলা হইতে দেওয়া হইবে, কিন্তু কৃষকদিগকে যে দাদন দেওয়া হইবে, তাহার আদায়-অনাদায় ও লাভ-লোকসানের জন্য ধর্ম্ম-গোলাই দায়ী থাকিবে।

(৯) গ্রামবাসীরা যখন বুঝিতে পারিবে যে, লাভ তাহাদেরই হইতেছে, তখন এরূপে "দশে মিলে কাজ করিবার" সুবিধা বুঝিয়া তাহারা আপনা-আপনিই সকল অর্থঘটিত ব্যবসায়ে এই প্রথা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

(১০) ধর্ম্ম-গোলা কালক্রমে গ্রাম্য শস্য-ভাণ্ডারে পরিণত হইবে। গ্রামবাসীরা তাহাদের শস্যের পুঁজি এই ভাণ্ডারেই জমা করিবে ও প্রয়োজনানুসারে যথোচিত সুদে দাদন পাইবে। এরূপ বন্দোবস্ত না থাকায় তাহারা সমুদয় শস্য এককালে বাজারে কিংবা বানিয়ার নিকট বিক্রয় করিতে যাইয়া অল্পমূল্যে বেচিতে বাধ্য হয়। গ্রাম্য-সমাজ এই ভাণ্ডারের জন্য সংগৃহীত শস্যের জন্য শতকরা ছয় টাকা সুদ দিবে, কিন্তু এই ভাণ্ডার হইতে যে দাদন দেওয়া হইবে, তাহার জন্য শতকরা দশ টাকা সুদ আদায় করিবে। ইহাতে সমাজের যে লাভ থাকিবে তাহা হইতে একটি রক্ষিত-নিধি (Reserve Fund) গঠিত হইবে। সমাজ এই রক্ষিত-নিধির জিম্মায় অধিকতর মূলধন অল্প সুদে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে। এই রক্ষিত-নিধির টাকা ধর্ম্ম-গোলাভুক্ত কৃষকদের পুরাতন ঋণ-পরিশোধ ও প্রয়োজনানুসারে অন্যান্য বিষয়েও ব্যয়িত হইবে।

(১১) উক্ত আইনের ১৫ ধারা অনুসারে যে গোলা রেজিষ্ট্রী করা হয়, তাহাতে গচ্ছিত শস্য-মূলধন (Grain Capital) মহাজনেরা দেনার দায়ে ক্রোক করিতে পারে না। এজন্য যৌথসমাজ গঠন করিতে ও ধর্ম্ম-গোলা-প্রথা অবলম্বন করিতে গ্রামবাসীদের সহজেই প্রবৃত্তি জন্মিবে। ধর্ম্ম-গোলা উক্তরূপ শস্য-ভাণ্ডারে পরিণত না হইলেও, ইহাতে কৃষকদের প্রভূত কল্যাণ হইবে।

কিন্তু শুধু জমীদারগণের দানের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না—দানের অর্থে কোনও কারবার চলিতে পারে না। তবে প্রস্তাবিত কার্য্যের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তাহা কোথা হইতে আসিবে? লোকে নূতন কোনও কারবারে টাকা খাটাইতে সহজেই ভয় পায়। আমার মতে একাজে জমীদারদিগের প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইলে তাঁহারা যাহাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত না হন, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে আংশিকরূপে প্রতিভূ হইতে হইবে। এজন্য আমি নিম্নোক্ত প্রস্তাব করিতে চাই:—

(১) জমীদার কিংবা অন্যান্য প্রতিপত্তিশালী লোকেরা মিলিয়া প্রতি জেলায় নগদ টাকা কিংবা শস্যের ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবেন এবং তাঁহাদের জমীদারীর এলাকাভুক্ত গ্রামে উক্তরূপ যৌথসমাজ গঠন করিবেন।

(২) গ্রাম্যসমিতি হইতে প্রথমতঃ শুধু শস্যই দাদন দেওয়া হইবে। এই শস্য জেলা-ব্যাঙ্ক হইতে শতকরা ছয় কিংবা সাত টাকা সুদে গ্রাম্যসমাজকে ধার দেওয়া হইবে। ক্রমে ক্রমে ইহার সহিত নগদ টাকার কারবারও সংযোজিত হইতে পারিবে।

(৩) জেলা-ব্যাঙ্ক হইতে গ্রাম্য-সমাজকে যে ছয় কিংবা সাত টাকা সুদে ধার দেওয়া হইবে তাহার তিন টাকার জন্য সরকার দায়ী থাকিবেন, বাকী তিন কিংবা চারি টাকা গ্রাম্য-সমাজ হইতেই পাওয়ার আশায় জমীদারদিগকে এই কারবার চালাইতে হইবে।

সরকার দুই এক লক্ষ টাকা লইয়া এই পরীক্ষাকার্য্য চালাইতে অগ্রসর হউন। কাজ ভাল চলিতে থাকিলে সরকারের প্রতিশ্রুত তিন টাকা সুদ দিতেই হইবে না। সরকারকে এখন কৃষিসম্বন্ধীয় ঋণ (Agricultural loans) ও খাজানা রেহাই দিতে কোটি কোটি টাকা খরচ করিতে হয়, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফল হয় না। উক্ত পরীক্ষা-কার্য্য যদি সুফল প্রসব করে, তবে ভারতবাসীদের মনে

পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের ভাব জাগিয়া উঠিবে। এরূপ বিশ্বাসের অভাবেই তাহাদের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির পথ রুদ্ধ রহিয়াছে। এইরূপে গ্রাম্য কৃষকদের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ-সমস্যারও সুমীমাংসা হইয়া যাইবে।

সকল সভ্য দেশেই আজকাল কৃষিবিষয়ক ব্যবস্থা প্রণালীর দিকে লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সেখানেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল ফলিয়াছে বলিয়া মনে হয় যেখানে উক্তরূপ যৌথকারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের কৃষি-ব্যবসায়ও এই পথে চালাইতে দেশের নেতৃবৃন্দ অগ্রসর হউন। মোটের উপর এদেশীয় জমীর উর্ব্বরতা অধিকাংশ দেশের তুলনায়ই হীন নহে। ভারতীয় কৃষকের চালচলনও খুব সাদাসিধা। অতএব তাহার কর্ষিত জমীর পরিমাণানুসারে পৃথিবীর মধ্যে তাহারই সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী হওয়া উচিত। ভারতের যে সকল প্রদেশে বৃষ্টিপাত কম হয়, সেই সকল স্থানেও এমন ফল-শস্য জন্মে যে, দুর্ভিক্ষের সময় তাহা জীবিকানির্ব্বাহের উপায়-স্বরূপ হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মধ্য-ভারতের খেজুর গাছের কথা উল্লেখযোগ্য। এখানে স্বদেশী চিনি উৎপাদনের প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে, কিন্তু গরীব স্বদেশবাসীদিগকে কিরূপে খেজুর-গাছ কাটিতে হয় তাহা শিখাইবার আগ্রহ কাহারও দেখা যায় না। প্রকৃতির বক্ষোনিহিত ধনরত্ন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে ভারতবর্ষের ন্যায় অন্য কোনও দেশে দেখা যায় না। যাঁহারা অন্ন-সমস্যার (the bread problem) সমাধানার্থ কত কথাই বলিয়া থাকেন, বুভুক্ষাক্লিষ্ট লোকদের কাতর ক্রন্দনে যদি সত্য সত্যই তাঁহাদের হৃদয় দ্রব হইত, তবে গলাবাজি ছাড়া আসল কাজও তাঁহারা কিছু করিতেন; ভারতের বর্ত্তমান অবস্থাও অনেক পরিমাণে উন্নত দেখা যাইত। যাহা হউক, এখন সরকার যে সকল কৃষি-বিদ্যালয়, পরীক্ষাক্ষেত্র ও বীজের গোলাঘর প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, যদি ভারতের সর্ব্বত্র সেই সকলের সুযোগ বুঝিয়া কৃষিব্যবসায়ের আর্থিক বুনিয়াদ পাকা করিয়া কাজ চালান যায়, তবে শুধু গরীবদের অন্নসংস্থান হইবে তাহা নহে, ধনীদেরও ধনাগমের সুবিধা হইবে।

উপরে যাহা বলা হইল, ভারতীয় কৃষিকার্য্যের সম্বন্ধেই তাহা প্রধানতঃ খাটে। বিহার অঞ্চলে য়ুরোপীয় ধরণে কৃষিকার্য্যের যে ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার সফলতার পক্ষে দুইটি প্রধান কারণ বিদ্যমান, উত্তম জমী ও সস্তা মজুর; কিন্তু টাকারই প্রধানতঃ অভাব। বাছিয়া বাছিয়া বিশ্বস্ত লোক লইয়া ক্ষেত্রপতিরা (planters) একটি যৌথব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন না কি? কিঞ্চিৎ পরিমাণ সরকারী সাহায্য লইলে এরূপ একটি ব্যাঙ্কের জন্য সহজেই মূলধন সংগৃহীত হইতে পারে। সরকার যখন সৈনিক বিভাগের জন্য এত টাকা খরচ করিতে পারেন, তখন যে কৃষকেরা সেই খরচের অধিকাংশ বহন করে ও শিল্পকলার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে সহায়তা করে, তাহাদের জন্য সরকারকে কিছু সাহায্য করিতে অবশ্যই অনুরোধ করা যায়। অন্যান্য দেশের ও বৃটিশ উপনিবেশসমূহের গবর্ণমেণ্ট কৃষিকার্য্যের জন্য অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। যে জেলায় পুষা অবস্থিত, তাহার অধিবাসীরা যদি অর্থাভাবে সরকার যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বন্দোবস্ত করিতেছেন তাহার ফলভোগ করিতে না পায়, তবে বড়ই পরিতাপের বিষয় হইবে। বিজ্ঞান-প্রদর্শিত পথে কার্য্য করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন; নচেৎ শুধু বিজ্ঞানচর্চ্চায় কোনও ফল হইবে না।

যুক্ত-প্রদেশের কৃষির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ডব্লিউ, এইচ্, মোরল্যাণ্ড সাহেব বলেন:—

কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও এ প্রদেশে প্রতি জেলায়, এমন কি প্রায় প্রতি গ্রামে, স্থানীয় অভাব বুঝিয়াই শস্য জন্মান হইত, কোন্ জমীর পক্ষে কিরূপ শস্য সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিত না। অযোধ্যা প্রদেশে কাপড় বুনিবার জন্য তুলার প্রয়োজন হইত, সেখানে শুধু তুলার চাষই হইত; হামিরপুর জেলার প্রয়োজন ছিল চিনি, সেখানে উৎপন্নও হইত শুধু ইক্ষু। কিন্তু জল ও স্থলপথে যাতায়াত ও মাল চালানের সুবিধা হওয়ায় এই চিরাগত প্রথার এখন ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। এ প্রদেশের কৃষিসম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে এই পরিবর্ত্তনের কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে। কারণ, এখন সকল দেশে, এমন কি সকল স্থানে, সেই শস্য উৎপাদনের চেষ্টাই চলিতেছে যাহা সেই দেশের বা স্থানের উৎপাদিকাশক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

লোকে এরূপ শস্য উৎপাদন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেছে না, যে স্থানে তাহার খুব কাট্‌তি হয় তাহাও খুঁজিয়া বাহির করিতেছে। এইরূপে যব ও মরিস্‌স্ দ্বীপ, অষ্ট্রীয়া ও অন্যান্য দেশ হইতে ভারতে চিনি আসিতেছে; আমেরিকা হইতে এখানে তামাকের চালান হইতেছে। অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। অন্যান্য দেশ হইতে এদেশে যে শস্যের আমদানী হইতেছে এদেশের ক্রেতারা যদি তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে পায়, তবে এদেশে উৎপন্ন শস্য বিক্রীত না হইয়া পড়িয়া থাকিবে; বিদেশের বস্তু সস্তায় পাইতে লোকে স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় করিবে এরূপ মনে করা বাতুলতা মাত্র। ইহাতে ক্রেতাদের লাভ হইবে বটে, কিন্তু কৃষকদের ক্ষতি হইবে। এমন অবস্থায় কৃষকেরা নিম্নোক্ত তিনটি পন্থার কোনও একটি অবলম্বন করিতে পারে। (১) তাহারা যে শস্যের চাষ করিতেছিল তাহা ছাড়িয়া দিয়া এমন কোনও শস্য উৎপাদন করিবে যাহাতে লাভ হয় বটে, কিন্তু পূর্ব্বের মত নহে। (২) তাহারা এরূপ কর্ষণপ্রণালী অবলম্বন করিবে যাহাতে পূর্ব্বের শস্য উৎপাদন করিয়াই বিদেশীয় কৃষকের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। (৩) এমন কোনও নূতন শস্যের চাষ করিবে যাহাতে লাভ পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী থাকে। এই ত্রিবিধ পন্থার প্রথমটিতে কৃষিব্যবসায়ের অবনতি, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিতেই তাহার উন্নতি। যে দেশের সহিত তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের কৃষিজাত দ্রব্যের আদান প্রদান চলিতে পারে তাহার কৃষির অবস্থা কখনও স্থিতিশীল থাকে না; আজ যে প্রণালীতে লাভ হইতেছে, কালই আবার তাহা লাভজনক নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। তবে কৃষিকর্ম্মের উন্নতি বলিতে কি বুঝায়? আজ একখণ্ড জমীর উৎপন্ন শস্য হইতে যে পরিমাণ লাভ হইতেছে, কাল যদি তাহা হইতে বেশী লাভ হয়, তবে সেই জমীর চাষে উন্নতি হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

জমীর আয় তবে কিরূপে বাড়ান যায় তাহাই ভাবিবার বিষয়। এদেশে প্রত্যেক কৃষকের কর্ষিত জমীর পরিমাণ অত্যল্প, কৃষকের স্বকীয় মূলধন নাই, সুদের হারও অত্যন্ত বেশী। জমীর পরিমাণ-বর্দ্ধনের চেষ্টা বৃথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীতেই যাহা পারা যায় করিতে হইবে। আমেরিকা ও বৃটিশ উপনিবেশসমূহে কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে; কাজেই এদেশের সহিত সেই সকল দেশের তুলনা করিয়াও বিশেষ লাভ নাই। তবে ইহা সত্য যে, ভারতীয় কৃষকের নিপুণতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু অর্থ নাই; ঐ সকল দেশের কৃষকের অর্থ আছে, কিন্তু ভারতীয় কৃষকের ন্যায় নিপুণতা নাই। ইহা সাহস করিয়া বলা যায় না যে, ঐ সকল দেশে কৃষিবিজ্ঞানের এতাদৃশী উন্নতিসত্ত্বেও, কৃষকের কৃষি-বিষয়ক জ্ঞান একজন এদেশবাসী জাট বা কুর্ম্মীর সমান। প্রথমোক্তকে যাহাই শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা সে অর্থের বলে শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, শেষোক্ত অর্থাভাবে স্বকীয় বুদ্ধিবিবেচনাটুকুও খরচ করিবার অবসর পায় না। এই পার্থক্যই কৃষিক্ষেত্রে প্রথমোক্তের প্রাধান্যের কারণ। বহুব্যয়সাপেক্ষ কৃষিপ্রণালী যখন ভারতীয় কৃষকেরা অর্থাভাবে অবলম্বন করিতে পারিবে না, তখন তাহাদের মধ্যে দামী কর্ষণ-যন্ত্র, কৃত্রিম সার প্রভৃতির প্রচলনের কথাও সম্প্রতি উত্থাপন করিবারই প্রয়োজন নাই। কিন্তু সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলই যে অর্থ। কৃষকেরা যাহাতে অল্প সুদে মূলধন পাইতে পারে তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। কৃষকদের জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারা যায়;—কাহারও একটি কূপের প্রয়োজন, কিন্তু খনন করিবার অর্থ নাই; কাহারও অপেক্ষাকৃত সবল বলদের দরকার, কিন্তু কিনিবার অর্থ নাই; কাহারও ইচ্ছা যে, একটু রহিয়া সহিয়া বাজার চড়িলে শস্য বিক্রয় করে, কিন্তু যে কয় দিন বিক্রয় না হইবে, সে কয় দিন উদরান্নের কিরূপে সংস্থান হয়? কাহারও ইচ্ছা যে ছোলার বদলে গম জন্মায়, কিন্তু বীজ কিনিবার অর্থ কৈ? কাহারও ইচ্ছা ইক্ষুর চাষ করে, কিন্তু তাহাতে যে মজুর নিযুক্ত করা আবশ্যক তাহার মজুরি কোথা হইতে আসিবে? কাহারও ইচ্ছা গোল-আলুর চাষ করে, কিন্তু সার কিনিবার সামর্থ্য নাই। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, অর্থাভাবেই তাহারা তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতেরও আয় বাড়াইতে পারিতেছে না। তাহার নিকট তবে বিজ্ঞানানুমোদিত উচ্চ আদর্শ খাড়া করিয়া ফল কি? সত্য বটে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগের ব্যয় বাড়াইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, কিন্তু যদি সেই সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের মূলধন সংগ্রহের বন্দোবস্ত না হয়, তবে বিশেষ সাফল্যলাভের আশা নাই।

বিশেষতঃ, সরকারের লক্ষ্য হইতেছে প্রধানতঃ পরীক্ষা-কার্য্যের দিকে—শিক্ষালাভের দিকে, শিক্ষা দিবার দিকে নহে। তাহাতে হঠাৎ কৃষিকার্য্যে নবযুগের আবির্ভাব হইবে এরূপ আশা করা বৃথা।

কৃষকদের মূলধন সংগ্রহ সম্বন্ধে দুই একটি কথা সংক্ষেপে বলিব। প্রত্যেক কৃষকের মূলধনের পরিমাণ অত্যল্প, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা-বাহুল্য-হেতু মোটের উপর ঢের টাকার প্রয়োজন; টাকা যোগাইতেও হইবে খুব শীঘ্র শীঘ্র ও এরূপ সর্ত্তে যাহাতে কৃষকেরা তাহা গ্রহণ করিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, য়ুরোপীয় ব্যাঙ্কের ধরণে এদেশে কাজ চলিতে পারে না, সরকারী সাহায্যেও এ কাজ হওয়া তুল্যরূপে অসম্ভব। কৃষকদের ভিতরেই তাহাদিগকে ঋণ দেওয়ার জন্য যৌথ-সমাজ-গঠন করিতে হইবে। এরূপ সমাজ-গঠনের চেষ্টা এখন এদেশে চলিতেছে। এরূপ সমাজ-গঠন বা তুল্যরূপে ফলপ্রদ অপর কোনও উপায় অবলম্বন ব্যতীত ভারতীয় কৃষির উন্নতির আশা নাই। অন্ততঃ এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিল্পকলার ক্রমিক অধোগতি নিবারণের জন্যও এরূপ অনুষ্ঠানাদি অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র সোম।

একটি উচ্চ অঙ্গের ভারতীয় শিল্প-বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা।

(শিল্পকলা-আলোচনা-সমিতির জন্য লিখিত প্রবন্ধের মর্ম্ম।)

দেওয়ান বাহাদুর কে, কৃষ্ণস্বামী রাও, সি,আই,ই, মহোদয় বলেন:—

ভারতীয় শিল্পকলার লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে হইলে এখনকার চেয়ে অধিকতর বিস্তৃতভাবে বাষ্প ও তাড়িতশক্তির ব্যবহার করিতে হইবে। হস্তচালিত যন্ত্রাদি যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন তদ্দ্বারা প্রস্তুত জিনিষে দেশের বর্ত্তমান অভাবের মোচন হইতে পারে না, বিদেশ হইতে জিনিষ আমদানী না করিলে আমাদের চলে না। বাষ্প ও তাড়িতশক্তির ব্যবহারপ্রণালী অবগত হইতে হইলে যন্ত্রবিদ্যার (mechanics) অধ্যয়ন, তাহার ব্যবহারিক জ্ঞান (practical knowledge) ও আমেরিকা, য়ুরোপ ও জাপানের কলকারখানায় যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কাজ হয় তাহা জানা আবশ্যক। সত্য বটে ভারতের স্থানে স্থানে কয়েকটি সরকারী ও বে-সরকারী শিল্পবিদ্যালয় আছে, কিন্তু তাহাতে এরূপ সহজ সহজ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় যে, তদ্দ্বারা আমাদের শিল্পকলার উৎপাদিকাশক্তি বর্দ্ধনের কাজ একরূপ হইতেই পারে না বলা যায়। কোনও লাভজনক বড় কাজ করিতে হইলে মূলধন, সুদক্ষ লোক ও শ্রমিকগণের (labour) সমবায় আবশ্যক; সর্ব্বোপচিকীর্ষা (public spirit), সাহসিকতা ও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে উক্ত তিন শক্তির সমবায় হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, এই গুণত্রয়ের অভাবেই আমাদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, একটি উচ্চ অঙ্গের শিল্পবিদ্যালয়ের অভাব তদ্রূপ অবস্থার বিশেষ কারণ নহে। তাঁহারা আরও বলেন যে, এরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ঢের টাকার প্রয়োজন; এখন সুদক্ষ কারিগরের ততদূর আবশ্যকতা নাই যাহাতে এত টাকা খরচ করা যাইতে পারে। ভারতের যন্ত্রচালিত কলকারখানার সংখ্যা বার শতের উপর। তজ্জন্য যত কারিগরের প্রয়োজন তাহা একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পবিদ্যালয় যোগাইয়া উঠিতে পারে না। তাহার উপর আবার এখন স্বদেশী জিনিষের যেরূপ কাটতি আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে আরও কলকারখানা স্থাপিত হইবে। এখন বিদেশ হইতে শুধু যন্ত্রাদি আসিতেছে তাহা নহে, তাহা স্থাপন করিবার জন্য মেক্যানিকাল্ ইঞ্জিনিয়ারও বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। ইহাতে কলকারখানাগুলিকে কত ক্ষতি ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। এদেশে এরূপ একটি কারখানাও নাই যেখানে একটি সামান্য বাষ্পীয়যন্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। দম-কলে জল উত্তোলন ও ক্ষেত্রাদিতে জল সেচনের পক্ষে অয়েল-এঞ্জিন্ (oil engine) কতদূর উপযোগী চ্যাটার্টন সাহেব তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন; অনেক কৃষিজীবী তাহার পরীক্ষাকার্য্যও আরম্ভ করিয়াছেন। এই পরীক্ষায় যেরূপ সাফল্যলাভের সম্ভাবনা তাহাতে অনেকেই এঞ্জিন ব্যবহার করিতে আগ্রহান্বিত হইবে বটে, কিন্তু এঞ্জিন্ বিকৃত হইলে যখন তাহা এদেশে মেরামত হইতে পারে না, তখন এই

ভয়েও অনেকে এঞ্জিন্ ব্যবহার করিতে বিরত থাকিবে। এই সকল কারণে অন্ততঃ একটি শিল্পশিক্ষার কলেজ স্থাপন করিবার বিশেষ আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিদেশে যাইয়া শিল্পশিক্ষার জন্য এখন বৃত্তিদানের যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বিদেশের জল বায়ু সহিবে কি না, বিদেশের আচার ব্যবহার, আহার পানীয় এদেশের মত নহে বলিয়া সেখানে অবস্থান অসুবিধাজনক, বিদেশে গেলে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে, ইত্যাদি নানাদিক্ ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেক প্রতিভাশালী যুবক এখনও বৃত্তি লইয়া বিদেশে যাইতে দ্বিধাবোধ করে। তাহার উপর বৃত্তিদাতার এরূপ সর্ত্ত প্রায়ই থাকে যাহাতে বৃত্তিগ্রহণেচ্ছু যুবক আবদ্ধ হইতে চাহে না। বদান্য লোকেরা যতই দান করুন আর চেষ্টা করুন না কেন, এদেশস্থ একটি সুপরিচালিত বিদ্যালয়ে যত অধিকসংখ্যক কারিগর তৈয়ার হইবে, বৃত্তিদানের ব্যবস্থায় তাহা কখনও হইতে পারে না। বৃত্তিতে তাহাদেরই উপকার হয় যাহারা চরম শিক্ষা লাভ করিতে চায়, কিন্তু যাহারা কতক পরিমাণ জ্ঞানলাভ করিয়াই শিক্ষা সমাপ্ত করিতে চায় তাহাদের বৃত্তি লইয়া বিদেশে যাওয়ার ফল কি? শিল্পকলার নিম্নবিভাগে কাজ করিবার জন্য শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরই বেশী দরকার। স্থানীয় বিদ্যালয় না হইলে এরূপ লোক তৈয়ার হইতে পারে না। এখন আবার সকল সভ্য দেশেই স্বদেশী-দ্রব্য-রক্ষণ ও বিদেশী দ্রব্য-বর্জ্জনের প্রয়াস চলিতেছে। ইহাতে কালে ভারতীয় শিক্ষার্থীর বিদেশী শিক্ষালয়ে প্রবেশাধিকার না থাকিতেও পারে।

প্রস্তাবিত তাতার গবেষণা-মন্দির স্থাপিত হইলে আমাদের অভাব কিয়দংশে পূরণ হইতে পারে। কিন্তু যত দিন না তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় ও তাহাতে কি প্রণালীতে শিক্ষা ও উপদেশ দিতে হইবে, তাহা স্থিরীকৃত হয়, ততদিন এ সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছুই বলা যায় না। কিন্তু গবেষণাই যখন ইহার উদ্দেশ্য, তখন ইহা হইতে যন্ত্রনির্ম্মাণ ও বিকৃত-যন্ত্রের মেরামত সম্বন্ধে কিংবা দ্রব্যজাত প্রস্তুত করিতে যে সকল রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার আবশ্যক তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনও বিশেষ ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের আশা আছে বলিয়া মনে হয় না। বয়ন-শিল্পেই আমাদের সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। সৌভাগ্যক্রমে গবর্ণমেন্ট কৃষি-কর্ম্মের উন্নতিতে মন দিয়াছেন। বয়ন-শিল্পের উৎকর্ষসাধনেও গবর্ণমেন্টের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। শিল্পশিক্ষার কলেজ স্থাপিত না হইলে এই অত্যাবশ্যক শিল্পকলার উন্নতি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। পুস্তকালয়, পরীক্ষাগার (laboratory) কৌতুকাগার (museum) ও কারখানা (workshop) সমন্বিত অন্ততঃ একটি উচ্চ অঙ্গের শিল্পবিদ্যালয় ভারতের কোনও কেন্দ্রীভূত স্থানে স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ইহার প্রাথমিক আনুষ্ঠানিক খরচ এক কোটি টাকা ও বার্ষিক খরচ এক লক্ষ টাকা হইতে পারে। করদ ও মিত্ররাজ্যের অধিবাসীরাও ইহাতে শিক্ষা পাইতে পারিবে এরূপ বন্দোবস্ত থাকা উচিত। ভারত গবর্ণমেন্ট, দেশীয় রাজন্যবর্গ ও যে সকল বড় লোক প্রস্তাবিত তাতার গবেষণা-মন্দিরের সংশ্রবে আছেন, তাঁহারা, অর্থসাহায্য করিবেন।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র সোম।

পরলোকগত ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন।*

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী দিল্লী-প্রবাসী বাঙ্গালীর ইতিহাসে একটা শোকের সহিত স্মরণীয় দিন তাহাতে সন্দেহ নাই। সেদিন যে দৃশ্য সকলের নেত্রগোচর হইয়াছিল, দিল্লী সহরে বোধ হয় সেরূপ দৃশ্য পূর্ব্বে কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। ঐ দিনে বেলা প্রায় ১ ঘটিকার সময় দিল্লীর সর্ব্বজনপ্রিয়, স্বদেশবৎসল, উদারচরিত, করুণহৃদয় ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন দিল্লীবাসীর হৃদয়ে শোকের হিল্লোল প্রবাহিত করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যুসংবাদ সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়ে এবং দেখিতে দেখিতে অসংখ্য নরনারী—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বাঙ্গালী ও হিন্দুস্তানী—তাঁহার বাসভবনের সম্মুখে সমবেত হন এবং অতীব দুঃখের সহিত তাঁহার মৃতদেহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ

* বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারি দিল্লী বঙ্গ-সাহিত্য সভা কর্ত্তৃক আহূত হেমবাবুর স্মরণার্থ সভায় পঠিত।

শ্মশান পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাঁহার প্রতি তাঁহাদের শেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটীর সম্পাদক হার্লি সাহেব ও অপর ২।১ জন ইংরাজ শ্মশানক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মৃতের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করেন। দিল্লী সহরে এমন লোক ছিল না যে ডাক্তার হেমচন্দ্রের মৃত্যুর কথা আলোচনা করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করে নাই। বস্তুতঃ দিল্লিবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে তিনি যে প্রভাববিস্তার করিয়াছিলেন তাহাই যেন মূর্ত্তিমান হইয়া—সেদিন তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে, রাজপথে ও শ্মশানক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী নাটাগড় নিবাসী সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-বংশীয় ৺নীলাম্বর সেন মহাশয় আগ্রার সুপ্রীম কোর্টের হেড-ক্লার্ক ছিলেন। বর্ত্তমান এলাহাবাদের ন্যায় আগ্রা তখন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের প্রধান নগর বলিয়া গণ্য হওয়ায় সরকারী আফিস আদালতগুলি সকলই তখন আগ্রায় অবস্থিত ছিল। সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যাও তখন আগ্রায় নিতান্ত অল্প ছিল না, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে নীলাম্বর বাবুই স্বীয় চরিত্রবলে এবং ক্ষমতা ও সম্মানে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সেকালে প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে তাঁহার সহৃদয়তা ও আতিথেয়তা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এই নীলাম্বর বাবুর তৃতীয় পুত্র। তিনি পিতার পূর্ব্বোক্ত দুই মহদ্‌গুণের উত্তরাধিকারী হইয়া সমগ্র উত্তর-ভারতে যে কীর্ত্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন, অল্পদিনের মধ্যে সেরূপ প্রতিষ্ঠালাভে অতি অল্প লোকেই সমর্থ হইয়া থাকেন। নীলাম্বর বাবুর পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রায় বাহাদুর সংসারচন্দ্র সেন জয়পুরের মহারাজার মন্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেশীয় রাজ্যে বাঙ্গালীর গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার ২য় পুত্র শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন। ইনি অনেকদিন টেলিগ্রাফ বিভাগে কর্ম্মকরার পর হেমবাবুর সাহায্যার্থে দিল্লী আসিয়া তাঁহার ডাক্তারখানা পরিচালনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। নীলাম্বর বাবুর ৩য় পুত্র আমাদের পরম প্রীতিভাজন অশেষগুণসম্পন্ন স্বনামধন্য ডাক্তার হেমচন্দ্র। তাঁহার ৪র্থ পুত্র শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন জয়পুর মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন সুপ্রসিদ্ধ S. C. Sen Photographers এই নামে পরিচিত হইয়াছেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ আগ্রার সেণ্ট জন্স কলেজে পাঠ করিয়াছিলেন, পরে ১৫।১৬ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংসার বাবুর নিকট থাকিয়া জয়পুর মহারাজার কলেজে বিদ্যালাভ করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হ'ন। মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নকালে সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ-বিক্রেতা ডিঃ গুপ্তের আত্মীয় ৺বলাইচাঁদ গুপ্ত মহাশয়ের প্রথমা কন্যার সহিত তাঁহার শুভ-পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। মেডিকেল কলেজে যাঁহারা হেমবাবুর সহাধ্যায়ী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দিল্লীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদের ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কানপুরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কুচবিহার ষ্টেটের ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্ত ও কলিকাতার ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ কর এবং প্রাণধন বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নকালে হেমবাবু একটি ঘটনায় যে স্বার্থ-ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত বিরল এবং উহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের মহত্ত্ব সূচিত হইয়াছিল। হেমবাবুর কোন বন্ধু তাঁহার একবৎসর পূর্ব্বে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিলেও একবার পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ায় অবশেষে হেমবাবুর সহাধ্যায়ী হইয়াছিলেন। মেডিকেল কলেজের ৩য় বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় ইঁহারা একই স্থান অধিকারপূর্ব্বক বৃত্তির অধিকারী হইলে উক্ত বন্ধু হেমবাবুকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বৃত্তির উপর দাওয়া পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। মেডি-কেল কলেজের নিয়মানুসারে কোন ছাত্র একবার পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলে ভবিষ্যতের কোন পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াও বৃত্তির অধিকারী হন না। যাঁহারা প্রতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহারাই বৃত্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। তবে এই শেষোক্ত ছাত্র বৃত্তিতে দাবী পরিত্যাগ করিলে পূর্ব্বোক্ত পুরাতন ছাত্র বৃত্তিলাভ করিতে

পারেন। তদনুসারে হেমবাবু অম্লানবদনে বৃত্তির দাওয়া পরিত্যাগ করিলে তাঁহার বন্ধু বৃত্তিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি এল, এম্, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দিল্লী, আগ্রা অথবা এতদঞ্চলের অন্য কোন স্থানে চিকিৎসা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সে সময়ে তাঁহার এক ভগ্নীপতি ৺ কালীনারায়ণ রায় মহাশয় দিল্লীর অদূরবর্ত্তী সুলতানপুর নামক স্থানে কাষ্টমস (Customs) বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহারই পরামর্শে উক্ত বৎসর জুলাই মাসে হেমবাবু দিল্লী আগমন পূর্ব্বক চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী হইলেন।

তৎকালে হাকিমী চিকিৎসায় এদেশবাসীর যেরূপ আস্থা ছিল, এবং বাদসাহদিগের আমল হইতে হাকিমদিগের যেরূপ প্রতিপত্তিলাভ হইয়াছিল, তাহাতে হেমবাবুর ন্যায় একজন নূতন ইংরাজীনবিশ ডাক্তারের সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল; কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক যত্নে এবং অসামান্য চিকিৎসা-নৈপুণ্যে তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যে এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় উৎকর্ষ সংস্থাপন পূর্ব্বক চিকিৎসকদিগের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রতিপত্তির আরও দুই একটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। তৎকালে হাকীম ও দেশীয় বৈদ্যের চিকিৎসায় বিফলমনোরথ না হইলে এবং রোগীর অবস্থা নিতান্ত সঙ্কটজনক না দেখিলে এদেশবাসী কেহ ডাক্তার ডাকিতেন না। সুতরাং এই প্রকার সঙ্কটজনক রোগ আরোগ্য করাতেই যে তাঁহার যশঃসৌরভ চারিদিক বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আর একটী বিশেষ ঘটনায় তিনি দিল্লীর তাবৎ প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন; ইহাও তাঁহার কৃতকার্য্যতার বিষয়ে সাতিশয় অনুকূল হইয়াছিল। দিল্লীর ইগার্টন ষ্ট্রীটনিবাসী পাটিয়ালা কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক পরলোকগত "প্রোফেসার রামচন্দ্র" সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হইলে হেমবাবুর উপর তাঁহার চিকিৎসার ভার অর্পিত হয়। হেমবাবু বিশেষ দক্ষতার সহিত চিকিৎসা করিয়াও বিশেষ কোন সুফললাভ না করায় দিল্লীর তদানীন্তন সিভিল সার্জ্জন ডাঃ রস্‌কে পরামর্শের জন্য আহ্বান করা হয়। নূতন ডাক্তার বলিয়া ডাঃ রস্ প্রথমতঃ হেমবাবুর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করেন নাই, কিন্তু হেমবাবুর লিখিত উক্ত রোগীর পীড়ার বিবরণ ও ব্যবস্থাদি দেখিয়া তিনি এতই প্রীত হন যে তিনি রোগীর আত্মীয়বর্গ ও প্রোফেসার রামচন্দ্রের গৃহাগত কমিশনার, ডেপুটী কমিশনার প্রভৃতি দিল্লীর তাবৎ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে হেমবাবুর চিকিৎসা-নৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করেন এবং হেমবাবু যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তদ্ভিন্ন তাঁহার নিজের অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন নাই জানাইয়া ও রোগী উপযুক্ত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আছেন এরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়া বিদায়গ্রহণ করেন। হেমবাবু যদিও এক্ষেত্রে রোগীর আরোগ্যবিধানে কৃতকার্য্যতালাভ করিতে পারেন নাই; তথাপি এই ঘটনার পর হইতে তিনি দিল্লীর চিকিৎসক সমাজের শীর্ষস্থানীয়রূপে গৃহীত হইয়াছিলেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে হেমবাবুর পত্নীবিয়োগ হয়। এই পুণ্যশীলা সাধ্বী মহিলা তাঁহার স্বামীর হৃদয়ে কি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহা হেমবাবুর দ্বাদশ বর্ষব্যাপী বিপত্নীক জীবনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে" এই মহাবাক্য সেই পতিব্রতা নারীর সম্বন্ধে যথার্থই সার্থকতালাভ করিয়াছিল। যে মহান আতিথেয়তা গুণে হেমবাবু তাঁহার শত শত স্বদেশবাসী পরিব্রাজকগণের (Tourists) কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া উত্তর-ভারতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন শুনা যায় তাহা তাঁহার গুণবতী পত্নীর উৎসাহ ও অনুরাগে সমধিক স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল।

হেমবাবুর দেবোপম চরিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি গৃহী হইয়াও একপ্রকার সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার অসামান্য চরিত্র বলে তিনি দিল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের হৃদয়ে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অসূর্য্যম্পশ্যা পর্দ্দানসীন মুসলমান অন্তঃপুরিকাগণ পর্য্যন্ত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ব্যবস্থাগ্রহণ করিতে কিছুমাত্র সংকোচবোধ করিতেন না। হেমবাবু যখন প্রথম দিল্লী আগমন করেন, তখন এখানে যে স্বল্পসংখ্যক বাঙ্গালী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ নিজ স্বভাব চরিত্রের দ্বারা বাঙ্গালী নামে বড়ই কলঙ্কলেপন করিয়াছিলেন। হেমবাবু সেই কলঙ্ক ক্ষালন করিয়া

বাঙ্গালীর গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। এদেশবাসীরা হেমবাবুর উন্নত স্বভাব চরিত্র দর্শনে বিস্মিত ও মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। হেমবাবুর সংস্রবে আসিয়া কোন কোন বদ্ধ মাতাল সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত জীবন যাপন করিয়াছে, ইহাও আমরা অবগত হইয়াছি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি হেমবাবু এখানকার চিকিৎসকদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন, এদেশবাসীরা তাঁহাকে সমধিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিত; নানা ঘটনা উপলক্ষে তাঁহাকে সর্ব্বদাই ভালমন্দ নানা লোকের সংস্রবে আসিতে হইত। বাদসাহী নগর বলিয়া দিল্লীর নৈতিক আদর্শ কোন কালেই সমুন্নত ছিল না। আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, বাইনাচ না হইলে এখানকার বিবাহ কিম্বা অন্য কোন উৎসব পূর্ণভাবে সুসম্পন্ন হয় না। আবগারী বিভাগের সহিত এখানকার কায়স্থ ও বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়দিগের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা একপ্রকার সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং এদেশের সর্ব্বশ্রেণীর শ্রদ্ধেয় ও প্রীতিভাজন হেমবাবু প্রায় সকল উৎসবাদিতে নিমন্ত্রিত হইয়া যেরূপ নির্লিপ্তভাবে নিমন্ত্রণরক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নহে। তাঁহার পত্নীবিয়োগের পর পুনরায় দারপরিগ্রহের জন্য অনেকেই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই।

চিকিৎসকরূপে হেমবাবু দিল্লীতে অসামান্য প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। প্রায় ২৫ বৎসর কাল এখানকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ডাক্তাররূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি যে সকল গুণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতি অল্পলোকের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। রোগী দেখিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়া কেহ বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে এরূপ কখনও শুনা যায় নাই। বরং সকাল হইতে রোগীর বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ১টা ১॥০টার সময় স্নান করিয়া আহার করিতে বসিয়াছেন এমন সময় কোন রোগীর সঙ্কট অবস্থার কথা অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ আহার পরিত্যাগ করিয়া রোগী দেখিতে গিয়াছেন, এরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে বিরল নহে। রাত্রিতেও যতবার তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছে তত বারই তিনি রোগী দেখিতে গিয়াছেন—নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া কোন প্রকার আপত্তি করেন নাই। হেমবাবুর এইরূপ আহার ও নিদ্রার ব্যাঘাত দেখিয়া তাঁহার জননীর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিত। তাই তাঁহার নিদ্রা ও বিশ্রামের সময় কেহ ডাকিতে আসিলে তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী বড়ই বিরক্ত হইতেন ও হেমবাবুকে তখন রোগী দেখিতে যাইতে নিষেধ করিতেন; কিন্তু হেমবাবু এবিষয়ে তাঁহার আদেশ পালন করিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, "আমি উপস্থিত হইলে যদি কাহারো প্রাণে শান্তি হয় তাহা হইলে আমাকে অবশ্যই যাইতে হইবে; তোমরা এবিষয়ে আমাকে বাধা দিও না।" তাঁহার নিজের বাড়ীতে একবার ছেলেদের পীড়ার সময় তিনি স্বীয় জননীকে দৃষ্টান্তের দ্বারা নিজের প্রাণের কথা হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছিলেন! ছেলেদের চিকিৎসার জন্য তাঁহার কোন ডাক্তার-বন্ধুর আসিতে বিলম্ব হওয়ায় তাঁহার মা ডাক্তার এখনও আসিলেন না বলিয়া বড়ই অধীরতা ও বিরক্তি প্রকাশ করিতেছিলেন; তখন হেমবাবু তাঁহাকে বলেন, "দেখ দেখি মা, ডাক্তারের আসিতে সামান্য বিলম্ব হওয়াতে তুমি কত অধীর হইতেছ। আর আমাকে যে সময় সময় রোগী দেখিতে যাইতে নিষেধ কর, ভাবিয়া দেখ দেখি আমি না গেলে তাহাদের মনে কত ক্লেশ হয় ও তাহারা কত অধীর হইয়া পড়ে।" বস্তুতঃ তিনি রোগীর ক্লেশ নিজের ক্লেশের ন্যায় অনুভব করিতেন। তাই তিনি রোগীর বিপদের কথা শুনিলে স্থির থাকিতে পারিতেন না। রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়া এবং রোগী দরিদ্র হইলে অর্থাদি না লইয়াও তিনি যেমন রোগীর গৃহে পদার্পণ করিতেন, এরূপ উদারতা, স্বার্থত্যাগ ও পরার্থপরতা অতি অল্প চিকিৎসকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালীদের নিকট হইতে তিনি কখনও অর্থগ্রহণ করিতেন না, এদেশবাসীদের মধ্যেও অসমর্থ দেখিলে তিনি কপর্দ্দক মাত্র না লইয়া চিকিৎসা করিতেন। আবার অর্দ্ধমূল্যে এবং কখন কখন বিনামূল্যেও তাঁহার ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ প্রদান করিতেন। কখন কখনও রোগীর আহার ও পথ্যাদির জন্য অর্থাদিও প্রদান করিয়াছেন। রোগীর মৃত্যু হইবে বুঝিতে পারিলেও তিনি কাহারো নিকট পারিশ্রমিক লইতেন না। ব্রাহ্মণপণ্ডিত, মোল্লা ও পাদরীদের নিকট হইতেও তিনি চিকিৎসার জন্য অর্থগ্রহণ করিতেন না। এমনও অনেক সময়ে ঘটিয়াছে যে তাঁহার যশঃসৌরভে

আকৃষ্ট হইয়া বহুদূর হইতে রোগী তাঁহার নিকট রোগ-শান্তির নিমিত্ত উপস্থিত হইলে তিনি কয়েকদিন তাঁহার নিকটে থাকিয়া ব্যবস্থাগ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তাহারা সেরূপ ভাবে থাকিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া না আসায় বিদেশে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলে হেমবাবু নিজব্যয়ে তাঁহাদের থাকিবার স্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কোন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি তাঁহার ডাক্তারখানায় আগমন পূর্ব্বক তাঁহার পরামর্শ ও ব্যবস্থাগ্রহণ করিয়া দর্শনী দিতে চাহিলে তিনি কখনই গ্রহণ করিতেন না। সুপ্রসিদ্ধ মোগল বাদসাহ-বংশীয়দিগের পরিবারে তিনি পারিশ্রমিক না লইয়া চিকিৎসা করিতেন এবং তাঁহাদের জন্য ঔষধ অর্দ্ধমূল্যে প্রদত্ত হইত। বাঙ্গালী-দের নিকট হইতে তিনি কখনও অর্থগ্রহণ করেন নাই। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতার কণ্ট্রোলার পোষ্ট আফিসের অংশবিশেষ দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইলে প্রায় দুই শত বাঙ্গালী দিল্লীপ্রবাসী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এতগুলি বঙ্গসন্তানের আগমন সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই তিনি তাঁহার বন্ধু ডাঃ শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সান্যাল মহাশয়দ্বয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, তাঁহারা বাঙ্গালীদের নিকট চিকিৎসার জন্য অর্থগ্রহণ করিবেন না। ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে সমগ্র বাঙ্গালী সমাজের প্রতি তাঁহার সমান ভাব ছিল। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ধনী ৺ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় দেশপর্য্যটন উপলক্ষে একবার দিল্লী আসিয়া সপরিবারে কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার পরিবারস্থ কাহারো পীড়া হওয়ায় তাঁহার চিকিৎসার জন্য হেমবাবুকে আহ্বান করা হয়। হেমবাবুর চিকিৎসায় রোগী যথাসময়ে আরোগ্যলাভ করিলে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার দিল্লী পরিত্যাগের কথা উত্থাপন পূর্ব্বক হেমবাবুকে তাঁহার বিল পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে হেমবাবুর সরকার বিল লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি দেখিলেন যে কেবল ঔষধের জন্য বিল করা হইয়াছে, দর্শনীর জন্য কোন বিল করা হয় নাই। ইহা দেখিয়া ভিজিটের বিল আনিবার জন্য বিল-সরকারকে পাঠাইয়া দেন। বিলস-রকার শূন্য হস্তে প্রত্যাগমন করিয়া নিবেদন করিল যে ভিজিটের জন্য বিল হয় নাই, এবং হইবেও না। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে তিনি হেমবাবুর সহিত কথা বলিয়া মীমাংসা করিবেন স্থির করিলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন হেমবাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়কে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিতে উপস্থিত হইলে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর তাঁহাকে বলেন যে "আমি যখন অর্থপ্রদানে অসমর্থ নহি, তখন আপনি কেন আমার নিকট ভিজিটের টাকা লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন?" তদুত্তরে হেমবাবু বিনীতভাবে নিবেদন করেন যে তাঁহার নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিলে কেবল তাঁহার জীবনের একটী মহাব্রত ভঙ্গ করা হইবে তাহা নহে অপিচ অবস্থাপন্ন স্বদেশীয়দিগের নিকট হইতে অর্থগ্রহণের লালসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সমূহ অকল্যাণসাধন করিবে। তৎপরে তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণের প্রস্তাব উপস্থিত করিলে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ভাবিলেন এত বড় অদ্ভুত লোক দেখিতেছি; ইনি চিকিৎসা করিয়া অর্থগ্রহণ করেন না, আবার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করেন। তখন তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়া সপরিবারে হেমবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে কৈবর্ত্ত জাতীয় কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোক এখানে আসিয়া সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হন। হেমবাবু সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন এবং বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন। দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই এবং উক্ত ভদ্রলোক মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যু হইলে হেমবাবু তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার সৎকারক্রিয়া সম্পন্ন করেন। হেমবাবুর ঈদৃশ উদারতা ও সহৃদয়তা অতীব প্রশংসার্হ।

হেমবাবুর আতিথেয়তা এ অঞ্চলে এক প্রকার প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। তীর্থযাত্রা ও দেশভ্রমণ উপলক্ষে যে সকল বাঙ্গালী এতদঞ্চলে পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই যে হেমবাবুর আতিথ্যগ্রহণ করিয়া আপ্যায়িত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। হেমবাবুর গৃহে অতিথিদের জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট গৃহ আছে; তাহাকে সচরাচর বৈঠকখানা গৃহ বলে। হেমবাবু নিজের কাজে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন বলিয়া তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর উক্ত অতিথিভবনের সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থার ও অতিথিগণের পরিচর্য্যার ভার বিশেষভাবে অর্পিত ছিল।



দিল্লীর পরলোকগত

ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন

Kuntaline Press, Calcutta.

অতিথিদের সুখসচ্ছন্দতাবিধানের নিমিত্ত যখন যে অর্থের প্রয়োজন হইত মুখুজ্যে মহাশয় চাহিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উহা প্রদানের নিমিত্ত ডাক্তারখানার উপর আদেশ প্রচারিত ছিল। হেমবাবুর এই অতিথিভবন বৈঠকখানা নামে অভিহিত হইলেও তাঁহার রোগী দেখিবার ঘরই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার বৈঠকখানা ছিল। রোগী দেখার সময় ভিন্ন অনেক সময় তিনি এই গৃহে প্রাতে ৫টা হইতে ১টা ও অপরাহ্ণ ৩টা হইতে রাত্রি ৯।১০টা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতেন। এই গৃহে তিনি তাঁহার গৃহাগত রোগীদিগকে ব্যবস্থাদান এবং বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজন ও অতিথি অভ্যাগত সকলের সহিত আলাপাদি করিতেন। অতিথিদের অনেকেই এই কক্ষে তাঁহার অবসর সময়ে তাঁহার সহিত আলাপাদি করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। দিবসে বেলা ১ঘটিকার পূর্ব্বে হেমবাবুর আহার হইত না; কিন্তু আহার করিবার পূর্ব্বে অতিথি ও অন্যান্য সকলের আহার হইয়াছে কি না তাহার সংবাদ লইয়া তবে আহার করিতেন। অতিথিদিগের আহারের বিলম্ব হইলে তিনি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। রোগী-গৃহ হইতে প্রত্যাগমনের সময় নির্দ্ধারিত না থাকায় দিবসে তিনি সকলের সঙ্গে একত্র আহার করিতে পারিতেন না; কিন্তু রাত্রিতে সকলকে লইয়া একত্র আহার করা তাঁহার রীতি ছিল। অনেক বড় লোকের গৃহে দাসদাসী কর্ম্মচারী ও বাবুদের জন্য আহারের পৃথক পৃথক বন্দোবস্ত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু হেমবাবুর গৃহে সেরূপ কোন ব্যবস্থার পার্থক্য ঘটিবার উপায় ছিল না। তিনি উহা একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না। একদা তাঁহার গৃহে কোন নূতন পাচক নিযুক্ত হওয়ার পর একদিন রাত্রে সকলে আহারে বসিলে উক্ত পাচক ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ অধিক ঘৃত ও মসলাযুক্ত মাংসের পাত্র হেমবাবুকে প্রদান করে। হেমবাবু পার্শ্ববর্ত্তী সকলের পাত্রগুলি নিরীক্ষণ করিয়া "এ বিষ্ঠা আমাকে কেন দেওয়া হইয়াছে" বলিয়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত উক্ত পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ৮।১০ টাকা মণ চাউলের অন্ন তাঁহার গৃহে সকলের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রত্যহ তাঁহার গৃহে প্রায় ৫০।৬০ জন লোক আহার করেন, ইহা অবগত হইলে ঐরূপ ব্যবস্থার মূল্য কত অধিক তাহা সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে। সম্প্রতি কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিক পত্রে* হেমবাবুর আতিথেয়তার প্রতি কটাক্ষ করিয়া তাঁহার কোন সাহিত্যসেবক অতিথি তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনচ্ছলে হেমবাবুর কিঞ্চিৎ নিন্দা করিয়াছেন। উক্ত কাহিনী প্রকাশিত হইলে আমরা উহার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু হেমবাবুর বিশেষ অনুরোধে উহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। তিনি এই ঘটনা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে "যখন আগ্রার অত বড় বিখ্যাত সহৃদয় ডাক্তার নবীনবাবুরও কেহ কেহ নিন্দা করিয়া থাকেন, তখন আমি ত অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি; আমার ত্রুটি থাকা অসম্ভব নহে।" এ স্থলে ইহা বলা নিতান্তই আবশ্যক যে উক্ত লেখক মহাশয় হেমবাবুর সম্বন্ধে অতি ভ্রমাত্মক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তিনি হেমবাবুর অতিথি-ভবনের ভারপ্রাপ্ত তাঁহার বন্ধু মুখুজ্যে মহাশয়ের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু যিনি নিজের সময়াভাব নিবন্ধন মুখুজ্যে মহাশয়ের উপর ঐ কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই। প্রাতঃকালীন রোগীদেখার ব্যস্ততার মধ্যে হেমবাবুর সহিত উক্ত লেখক মহাশয়ের যে দু'চারিটী কথা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন যে হেমবাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "এখানে এখন বড় প্লেগ হইতেছে, এ সময়ে সঞ্জীববাবু আপনাকে এখানে পাঠাইয়া ভাল করেন নাই।" এ কথায় উক্ত লেখক মহাশয় মনে করিয়াছিলেন যে হেমবাবু বোধ হয় তাঁহাকে তাঁহার গৃহে স্থান দিতে তত ইচ্ছুক ছিলেন না। বলা বাহুল্য তাঁহার এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক হইয়াছিল। তাঁহার গৃহের সন্নিকটে ৩।৪ জন রোগীর প্লেগে মৃত্যু হওয়ায় উহার আক্রমণ হইতে তাঁহার রোগীদিগের রক্ষার জন্য তিনি তখন যেরূপ চিন্তাকুল ছিলেন তাহাতে তিনি ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়া সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার কোন আত্মীয়ের এখানে আসিবার কথা হইলেও তিনি ঐরূপ মত প্রকাশ করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি লোকদেখান শিষ্টাচারের বড় বেশী পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং শিষ্টাচার অপেক্ষা কর্ত্তব্যের গুরুত্ব অধিক মনে করিতেন।

হেমবাবুর দয়া ও দানশীলতার কথা এ অঞ্চলের প্রায়

---

* প্রবাসীতে। —সম্পাদক।

কাহারো অবিদিত ছিল না। দশ বিশ টাকা হইতে একশত টাকা পর্য্যন্ত তিনি অকাতরে অনেককে দান করিয়াছেন। তাঁহার করুণ হৃদয় অপরের দুঃখে বড়ই কাতর হইত। তাই কেহ বিপদাপন্ন হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার দুঃখ দূর না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। ডেপুটী কণ্ট্রোলার পোষ্টাফিসের জনৈক কর্ম্মচারী বাবু শ্রীধরচন্দ্র চন্দ বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার সৎকার ও তাঁহার নিরাশ্রয় পরিবারবর্গের স্বদেশ গমনের সকল ব্যয় ভার তিনি বহন করিয়াছিলেন। এইরূপ কত বিপন্ন মৃতের সৎকারে তিনি সাহায্য করিয়াছেন ও কত নিরাশ্রয় পরিবারের দুঃখ বিমোচন করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। "দিও কিঞ্চিৎ, না করিও বঞ্চিত" ইহাই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার গৃহ হইতে কোন প্রার্থী কখনও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে বা রিক্ত হস্তে প্রতিগমন করিয়াছে শ্রুত হওয়া যায় নাই। দুই একজন সাধু সন্ন্যাসী প্রায় প্রত্যহই তাঁহার গৃহে আহার পাইত এবং কেহ কখনও ফিরিয়া না যায় এবিষয়ে কাজের ভিড়ের মধ্যেও তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য থাকিত। একবার একজন সন্ন্যাসী তাঁহার বসিবার ঘরের দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইয়া ২।৩ বার গৃহ মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন কিন্তু কেহই তাঁহাকে লক্ষ্য না করায় কাহাকেও কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া যান। রোগী দেখিতে দেখিতে হেমবাবুর সেদিকে একবার দৃষ্টি পড়ে কিন্তু রোগী দেখার পর আর তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ একজন লোক পাঠাইয়া তাঁহার সন্ধান লন এবং তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহার অভিলষিতরূপ আহার করাইয়া তাঁহাকে বিদায় দেন। তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান যে কত ছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। হিন্দুস্তানী, বাঙ্গালী, খৃষ্টান অথবা ইংরাজ যে কেহ তাঁহার নিকট চাঁদার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাকেই তিনি অর্থ দান করিয়াছেন। তিনি রোগী দেখিয়া গৃহপ্রত্যাগত হইলে তাঁহার কন্যাদের কেহ না কেহ আসিয়া তাঁহার মুদ্রাধার হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেন। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে উক্ত অর্থের অল্পতা দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইতেন কিন্তু উহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেও হেমবাবুর নিকট কোন সন্তোষজনক উত্তর প্রাপ্ত হইতেন না। বলা বাহুল্য হেমবাবুর ন্যায় একজন প্রথমশ্রেণীর চিকিৎসকের পক্ষে পারিশ্রমিকের এরূপ অল্পতার অর্থ কি তাহা বুঝিতে কাহারো বিলম্ব হইত না। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় পরোপকারী ব্যক্তি আজ কাল অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

দিল্লীর কালীবাড়ীর সহিত হেমবাবুর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। উহার উন্নতি কল্পে তাঁহার ভগ্নীপতি কালীনারায়ণ রায় মহাশয় ও তিনি যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন এবং তিনি আরও কিছু দিন জীবিত থাকিলে বোধ হয় কালীবাড়ীর জন্য একটী স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া যাইতে পারিতেন। কালীবাড়ীর গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত তিনি নিজে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁহার ও এখানকার:কার তারক কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র মহাশয়ের চেষ্টায় প্রায় ১৭০০৲ টাকা উক্ত গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত সংগৃহীত হইয়াছিল।

বাবু গগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন বাঙ্গালী ডাক্তার লাল কাটরার নিকট চাঁদনী-চকের উপর একটী দ্বিতল গৃহে ডাক্তারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। একজন এদেশবাসী দালাল গগনবাবুর ডাক্তার খানায় কয়েকদিন অবস্থান পূর্ব্বক কিছু মালপত্র তাঁহার নিকট রাখিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ ব্যক্তি নানা জুয়াচুরী কার্য্যে লিপ্ত থাকায় ডিটেক্‌টিভ পুলিস কর্ত্তৃক অনুসৃত ও ধৃত হয়। গগনবাবুর ডাক্তারখানায় চোরাই মাল বাহির হওয়ায় তাঁহাকেও হাতকড়া দিয়া পুলিসে ধরিয়া লইয়া যায়। গগনবাবুর ডাক্তারখানার সম্মুখবর্ত্তী এজেন্সি আফিসের কোন লোক হেমবাবুকে এই সংবাদ প্রেরণ করে। হেমবাবু প্রথমতঃ গগনবাবুর এক বন্ধুর নিকট একজন লোক পাঠাইয়া উহার বিপদের কথা জ্ঞাপন করেন ও তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে বলেন কিন্তু তিনি কোনরূপ উপায় অবলম্বন না করায় হেমবাবু স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইয়া ৪০০০৲ টাকা জামিনে গগনবাবুকে মুক্ত করিয়া আনেন এবং তাঁহার মোকদ্দমার অনেক তদ্বির ও অর্থ ব্যয় করিয়া গগনবাবুকে অব্যাহতি প্রদান করেন। ইহার পর গগনবাবু ডাক্তার খানা বিক্রয় করিয়া দেশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে হেমবাবু কেনা দামে তাঁহার সকল ঔষধ পত্র ক্রয় করিয়া নিজ ব্যয়ে তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দেন। দিল্লী

ষ্টেসনের বুকিং ক্লার্ক বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ তহবিল তশ্রুপের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে হেমবাবু অনেক অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন।

হেমবাবু অতি অমায়িক ও শান্ত স্বভাবের লোক ছিলেন। ক্রোধ কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। কেহ তাঁহার নিন্দা বা গ্লানি করিলে তিনি তাহার উপর বিরূপ হইতেন না। আমাদের কোন বন্ধু তাঁহার সহিত কোন বিষয়ে তর্ক করিতে করিতে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে অন্যায়রূপে তিরস্কার করেন কিন্তু হেমবাবু তাঁহার ব্যবহারে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া অতি সহজভাবে তাঁহার যুক্তির দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিতে থাকেন এবং তাঁহার উত্তেজিত কণ্ঠের দুর্ব্বাক্য শ্রবণে যারপরনাই আমোদ বোধ করেন। একদা হেমবাবু তাঁহার কোন বন্ধুর মন্দ-অভ্যাসের কথা উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাকে মিষ্ট মিষ্ট ভৎসনা করায় উক্ত বন্ধু তাঁহার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অনেক গালাগাল করেন। তথাপি তাহার পরদিন হেমবাবু উক্ত বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইয়া অযাচিত ভাবে তাঁহার সহিত একত্র আহার করিতে কিছু মাত্র সংকোচবোধ করেন নাই। সুখ্যাতি কিম্বা অখ্যাতি তিনি সমভাবেই গ্রহণ করিতেন। তিনি কখনও উহাতে বিচলিত হইতেন না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হেমবাবু সকল শ্রেণীর লোকের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। এদেশবাসীদের তিনি কত প্রিয় ছিলেন দুই একটা ঘটনায় তাহার সম্যক পরিচয়প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাঙ্গালীরা মৎস্যভোজী বলিয়া এদেশবাসী উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা বাঙ্গালীদের প্রতি সামাজিক হিসাবে কিঞ্চিৎ ঘৃণার ভাবপোষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু হেমবাবু বাঙ্গালী হইলেও তাঁহার প্রতি ইহাঁদের সেরূপ ভাব কিছুমাত্র ছিল না। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে দশহরা ও মহরম উপলক্ষে এদেশবাসী হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে দিল্লীর ডেপুটী কমিশনার হেমবাবুকে আত্মরক্ষার্থ পিস্তল সঙ্গে রাখিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে উহা প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু হেমবাবু তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন; হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে তাঁহার কোন শত্রু নাই সুতরাং তাঁহার ঐরূপ কোন সতর্কতার প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে দুইদিন দলবদ্ধ দাঙ্গাকারীদের মধ্য দিয়া যাইতে হইলেও তিনি নিরাপদে ও সসম্মানে গন্তব্যস্থানে উপনীত হইয়াছিলেন।

যাবতীয় সদনুষ্ঠানে হেমবাবুর সহানুভূতি ছিল। সকল শ্রেণীর লোকের সহিত তিনি প্রীতি ও সদ্ভাবসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি ফ্রী মেশন সোসাইটীর সভ্য ও থিওসফিক্যাল সোসাইটীর দিল্লী শাখার বহুকাল সম্পাদক ছিলেন। বাঙ্গালী বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত বর্ত্তমান কণ্ট্রোলার অব্ পোষ্টাফিসের সাহায্যকৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র মহাশয় প্রভৃতি যে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ হেমবাবু নিয়মিতরূপে মাসিক সাহায্য প্রদান করিতেন। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব্ব হইতে তিনি স্বদেশী-প্রচেষ্টার পক্ষপাতী ছিলেন। এখানকার অনেক "মিলের" তিনি অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন এবং কোন কোন মিলের ডিরেক্টারও নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে করোনেশান দরবার উপলক্ষে তিনি জয়পুর মহারাজার চিকিৎসকরূপে বিলাতযাত্রা করেন।

বহুদিন হইতে হেমবাবুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল এবং বহুমূত্র রোগেও তিনি অনেকদিন ভুগিতে ছিলেন। তাঁহার এই ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তিনি কিছুকাল কাশ্মীর ও কলিকাতায় অবস্থান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যে এত শীঘ্র আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, ইহা আমরা কেহই কল্পনা করিতে পারি নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সহসা পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন এবং ২।৩ দিনের মধ্যেই চিকিৎসকদিগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ও আত্মীয় স্বজনের মনে দারুণ শেলাঘাত করিয়া বিগত ২৫শে জানুয়ারি ৫১ বৎসর মাত্র বয়সে অমরধামে প্রস্থান করেন।

বিধাতার বিধানে তাঁহার প্রিয় পুত্র আজ তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার বিয়োগে দিল্লী-প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজের যে ক্ষতি হইল তাহার কখনও পূরণ হইবার নহে।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক।

—

তপস্যার ফল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পণ্ডিত মহাশয়।

রায় মহাশয়েরা কলিকাতায় ফিরিবার পর, তাঁহাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে দেখিতে আসিয়াছিলেন সোমেশ্বর ন্যায়রত্ন। একে পঁয়তাল্লিশ পার হইলেই লোকে বুড়া বলে, তাহার উপর আবার ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মাথার সব ক'গাছি চুল পাকিয়া গিয়াছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয়কে যে বুড়া পণ্ডিত বলিলে তিনি খুসি হইতেন, একথা অনেকেই জানিত। বাড়ির ফটকের কাছে আসিতে আসিতেই তাঁহার গাল দু'খানি হাসিতে ভরিয়া গেল, এবং বারান্দায় উঠিতে উঠিতেই দু'বার চাদর দিয়া চোক মুছিতে হইল। সেই সময়ে যদি নরেন্ তাহার নূতন ফুলগাছগুলির তত্ত্বাবধানে আসিয়া হাজির না হইত, তাহা হইলে পণ্ডিত মহাশয়ের একটা বিষম বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল।

নরেন ত তাঁহাকে দেখিয়াই 'পণ্ডিত মশাই, পণ্ডিত মশাই' বলিয়া নাচিয়া উঠিল; এবং ন্যায়রত্ন মহাশয়ও তাহাকে কোলে ধরিয়া নানা স্বরে হাসিয়া তাঁহার আগমন ঘোষণা করিলেন। কূল উপ্‌ছিয়া অনেক জল নরেনকে প্লাবিত করিবার অবসর পাইয়াছিল বলিয়া, মিষ্টার রায় আসিয়া দেখিলেন, যে পণ্ডিত মহাশয়ের আনন্দ অনেকটা সংযত ধারায় বহিতেছে। রায় মহাশয় বলিলেন, "নরেনের কেমন চেহারা বদ্‌লেছে দেখেছেন? আগেকার চাইতে ঢের ফরসা হয়েছে।" পণ্ডিত মহাশয়ের শাস্ত্রে স্বাস্থ্যে নজর দিয়া অত কথা বলিতে নাই। তিনি বলিলেন, "না, না; ওত চিরদিনই আমাদের কুমার কার্ত্তিক।"

সুশীলা কোন প্রকারে তাঁহার চুলগুলি তাড়াতাড়ি জড়াইয়া বাঁধিয়া আঁচলখানি গুছাইয়া লইয়া দৌড়িয়া আসিলেন। "নরেন্ ঢের ফরসা হয়েছে" এই মন্তব্যটি শুনিতে শুনিতে কক্ষ হইতে বাহির হইতেছিলেন। আসিয়াই পণ্ডিত মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি যে এত কালো, আমিও দেখুন একটু ফরসা হয়েছি।" পণ্ডিত মহাশয় সে কথা শুনিয়া আবার নানা স্বরে হাসিতে আরম্ভ করিলেন। রায় মহাশয় তখন বলিলেন, "দেখুন ন্যায়রত্ন মশাই, দার্জিলিং যাবার আগে সুশীলা কি কাহিল হয়ে গিয়েছিল; মনে নাই?" ন্যায়রত্ন অতি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "চার মাস অনাহারে, অনিদ্রায় মাতৃসেবা ক'রে, তপঃকৃশা উমার মত শোভা হয়েছিল।" সুশীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মনে আছে ত?—তপঃশরীরৈঃ কঠিনৈরুপার্জিতং, তপস্বিনাং দূরমধশ্চকারসা—"

সুশীলা দিক্ হইয়া বলিল, "ছাই মনে আছে! দুটো ভাল কথা বল্‌বেন; না ঐ ছাই ভস্ম! আপনি নিশ্চয় ভাটবামুনের ছেলে!" পণ্ডিত মহাশয়কে কথায় আঁটিয়া উঠা মুস্কিল; তিনি বলিলেন, "আমি ভাটবামুনের ছেলে? মা আমার উমা; বাবাও আমার মহেশ্বর আস্‌বেন।" সুশীলা তখন বলিল, "আচ্ছা পণ্ডিত মশাই, রমা কেমন আছে, তা বল্লেন না; শচীদার ছেলেটি কেমন আছে, তা বল্লেন না; আর কেবল উপমা কালিদাসস্তই কচ্চেন?" এমন সময় রায়-গৃহিণী আসিলেন; পণ্ডিত মহাশয় দাঁড়াইয়া তাঁহার নমস্কারের প্রতিনমস্কার করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিত মশাই তখন বাড়ীর খবর দিয়া বলিলেন, "রমার ছেলেপিলে হবে, সে শ্বশুর বাড়ী গেছে; শচীর ছেলে ভারি দুষ্টু হচ্চে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।" রায়-গৃহিণী রমার মার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন; এবং পণ্ডিত মহাশয় তাহাতে যেন একটু লজ্জা পাইয়া মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "তা-ভাল আছেন বই কি।"

দার্জিলিংএর গল্পে এবং নানা অবান্তর কথায় অনেক সময় কাটিয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় তখন সেদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি যাইবার সময় সুশীলা তাঁহাকে শুনাইয়া দিলেন যে আস্‌ছে কাল তিনি শচীদার দুষ্টু ছেলেটাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আস্‌তে যাবেন। পণ্ডিত মহাশয় বুঝিলেন যে দেবীগণ কাল তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিবেন। দেবীপূজার জন্য কি কি আয়োজন করিবেন, ভাবিতে ভাবিতে হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বন্ধুসম্মিলন।

আকাশে যখন রামধনু প্রতিবিম্বিত হয়, তখন প্রথম রামধনুটির ছায়ায়, আর একটি রামধনু, প্রথমটির ঊর্দ্ধদেশে ফুটিয়া উঠে। দ্বিতীয় রামধনুটি ছায়ার ছায়া;

বর্ণের উজ্জ্বলতায় প্রথমটির মত নহে; তবুও কিন্তু সে প্রথমটির ঊর্দ্ধে আসন পাতে। বিলাতী পুরুষদিগের অনেক ছায়া মহাশয়েরাও, বর্ণে কিঞ্চিৎ মলিন হইলেও আসলের উপর এককাটি উঠিয়া থাকেন। মৌলিক বন্যবরাহ অপেক্ষা কুলীন গ্রাম্যশূকরেরা খাদ্যনির্ব্বাচনে অধিক পরিমাণে অদ্বৈতবাদী; নকল সাহেবদিগের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের সুমার্জ্জিত ভাষায় অনবরত ভদ্রেতর শব্দ সমাবেশ করিয়া থাকেন। সকলেই যে লোক মন্দ তাহা নয়; তবে কেহ কেহ, তাঁহাদের বিদেশীয় ভাষা-শিক্ষা যে কেবল মাত্র গ্রন্থপাঠেই হয় নাই, এইটি বুঝাইবার চেষ্টায় কিছু গোল করিয়া থাকেন। ইহাঁরা দেখিতে যে ঠিক ইংরাজের মত তাহাতে ভুল নাই। তবে কি না, পরিচ্ছদের উজ্জ্বলতা এবং বৈচিত্রে ইহাদের সমাচ্ছাদিত শরীরের উপর, বিধাতার তুলিকাচিত্রিত বর্ণটা, মুখদেশে একটু গাঢ়তর হইয়া উঠে। কিন্তু সাগর পার হইয়া আসিলে উত্তমাঙ্গের ঐ মলিনতাটুকু হইয়াই থাকে। উহা সনাতন প্রথা; স্বয়ং বাল্মীকি বলিয়াছেন।

আমাদের পরিচিত বোনার্জি সাহেব গৃহে ফিরিবার পর তাঁহার অনেক বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট বন্ধুবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বোনার্জি একা থাকিতেন বলিয়া তাঁহার ঘরখানি বন্ধুবর্গের আড্ডা ছিল। অবসর পাইলেই তাঁহারা আসিয়া চুরুটের ধুঁয়ায় পরকুৎসা উদ্গার করিতেন, এবং চার উষ্ণতায় তাহার উপভোগ্যতা অনুভব করিতেন। কিন্তু সে ধুঁয়ায় মেঘের সৃষ্টি হইত না; সে উদ্গারে বিষ ছিল না; এবং সে উষ্ণতায় দাহ ছিল না। সবটুকু পাতলা রকমের ইয়ারকি। কৃত্রিম নকলটুকু বাদ দিয়া দেখিবেন, যে ইহারা লোক মন্দ নহেন। এদেশে বিলাতি ছাঁচের সমাজ পাইয়া উঠেন না বলিয়া, দশজনে মিলিয়া ঐ সমাজের একটু নিরীহ রকমের অভিনয় করেন। ইহারা যেদিন কৃত্রিম খোলসটি ফেলিয়া দিবেন, সেই দিনই দেখিবেন, যে ইহাদের অনেকের সংস্পর্শে সামাজিকতার সুখ অনেক বাড়িয়া উঠিবে।

বন্ধুবর্গের মধ্যে রটিয়া গিয়াছিল, যে বোনার্জি হিমালয়ে প্রেমালয়ের সৃষ্টি করিতেছিলেন। 'আমরা আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি' বলিয়া, একদল লোক আসিয়া যখন বোনার্জিকে ঘিরিয়া ফেলিল, তখন তিনি বিষম গোলে পড়িলেন। হাওয়ার উপর অনেক ইয়ারকি করা চলে, কিন্তু যেখানে কথাটার মূলে সত্যের আভাস আছে, অথচ সকলই অনিশ্চিত, সেখানে তামাসা করা চলে না। বোনার্জি একটু থতমত খাইয়া গেলেন। বন্ধুরাও পাইয়া বসিলেন। কেহ বলিলেন "হবে না কেন? একে কবিলোক, তাহে হিমালয়ের শোভা; তাহে আবার হিমগিরির উপর তাংবীক্ষ্য সর্ব্বাবয়বানবদ্যাং" আর একজন বলিয়া উঠিলেন, "রাখ তোমার অং বং, ভায়া! ওহে বনার্জি, খুব একটা জাঁকাল রকম পার্টি দেবে কবে বল!" বোনার্জি, বন্ধুবর্গকে চুরুট উপহার দিয়া বলিলেন, "কেন? আমি কি পয়সা খরচ করবার অন্য উপায় খুঁজে পাচ্চিনে না কি?" একজন উত্তর দিয়া বলিলেন, "তা পাবে না কেন? এখন নানারকম গহনা, জ্যাকেট, শাড়ী ইত্যাদিতে ঢের খরচ কত্তে পারবে। দিন থাকতে আমাদের নামে কিছু উৎসর্গ কর।" বোনার্জি দুই তিনটি দেশলাই পোড়াইয়া বলিলেন, "তোমাদের বাপ মা ত তোমাদিগকে বৃষোৎসর্গ করে ছেড়ে দিয়েছেন; আবার উৎসর্গ?" একজন রায়-পরিবারের সহিত পরিচিত ছিলেন; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আর ওকে কথায় পার্ব্বার জো নাই; দেখছ না কেমন পৌরাণিক দৃষ্টান্ত?" খুব হাসির ঘটা পড়িয়া গেল।

একজন তখন চেয়ারে চিৎ হইয়া পড়িয়া বলিলেন, "ওহে বোনার্জি, এবার তোমাকে ধুতি চাদর ধরতে হবে।" কথাটা শুনিয়াই আর একজন বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা ভাই, লেংটি প'রে দেশউদ্ধার কত্তে হবে, এ কি রকমের ধুয়া উঠেছে?" বোনার্জি রক্ষা পাইলেন; কথার স্রোত দেশ-কল্যাণকর গভীর খাতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। যাহা হউক, শেষে অনেক উপহাস পরিহাস ঠেলিয়া বোনার্জি মহাশয় বন্ধুবর্গকে বুঝাইয়া দিলেন, যে কথাটা ঐ ভাবে প্রচারিত হইলে রায়পরিবার বিশেষরূপে ক্ষুণ্ণ হইবেন; এবং তাঁহার সে পরিবারের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের কোন সম্ভাবনাও নাই।

কথাটা ত বন্ধুবর্গ একরকম বুঝিলেন; কিন্তু বোনার্জি নিজে কিছুই বুঝিলেন না। হিমালয়ে যাইবার পূর্ব্বেই সুশীলার সৌন্দর্য্য এবং সুশিক্ষার প্রতি আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। সমাজের যে রকম অবস্থা, তাহাতে তিনি সুশীলার পিতাকে

তাঁহার মনোগত ভাব ইঙ্গিতে জানাইলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন ভাবিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার প্রেমানুরাগের মধ্যে মোহ বা মমতা ছিল না; কিন্তু সুশীলার সরলতা, নির্ভীকতা ও স্বাধীনতা দেখিয়া আকর্ষণটা বেগলাভ করিয়াছিল। সুশীলা যদি যথার্থই তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী হইবেন আশা থাকিত, তাহা হইলে সাহেবির খোসাটা ফেলিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু এখন তাহা করিতে গেলে হয়ত বৃথাই উপহাসাস্পদ হইতে হইবে; সং সাজাই সার হইবে। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একটা অর্দ্ধদগ্ধ চুরুট ফেলিয়া দিয়া আর একটি ধরিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

আগন্তুক।

মিষ্টার রায়, অপরাহ্ন সময়ে বাহিরে দাঁড়াইয়া সুশীলার সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন, যে গৃহের সম্মুখের স্থান টুকুতে কোথায় কি রকম করিয়া ফুলের কেয়ারি করিবেন। এমন সময়ে একজন যুবক, ফটক পার হইয়া আসিয়া, তাঁহাদিগকে দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুকের প্রয়োজন জিজ্ঞাসার জন্য, মিষ্টার রায় তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন; এবং সুশীলা যথাস্থানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, যে একটা পাতাবাহারের গাছ তুলিয়া ফেলিয়া, সেখানে একটা শাদা ফুলের গাছ না পুঁতিলে যেন মিশ খাইতেছে না।

মিষ্টার রায় আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথেকে আস্‌ছেন?" আগন্তুক অতি ধীর স্বরে বলিলেন, যে তিনি বাবু ভোলানাথ সিংহ মহাশয়ের অনুসন্ধানে আসিয়াছিলেন। ভোলানাথ বাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, যে তিনি অপরাহ্নে সেখানে যাইবেন; একটা বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবার ছিল বলিয়া আসিয়াছিলেন। "ভোলানাথ বাবু? তিনি যে কলিকাতায় এসেছেন, তা ত জানিনে! আপনাকে যখন বলেছেন, তখন হয় ত আস্‌বেন। আচ্ছা, খানিকটে বসুন। আপনার বাড়ী কি রায়গ্রামে?" যুবক কহিলেন, "না; রায়গ্রামে আমার মাতুলালয় ছিল। ভোলানাথ বাবু আমাদের খুব পরিচিত।" রায় মহাশয় দেখিলেন আগন্তুকের মুখখানি বেশ; কথা অতি মধুর এবং বিনয়পূর্ণ। একটু কথা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায়গ্রামে মামাবাড়ী? বটে? কাদের বাড়ী?" কি জানি ব্যারিষ্টার মহাশয় ভাবিবেন, যে তিনি আত্মীয়তা করিতে আসিয়াছেন; এই ভাবিয়া আগন্তুক একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, যে তাঁহার মাতুল-কুলে এখন আর কেহ নাই। ব্যবহারজীবী ব্যারিষ্টার বেশ বুঝিতে পারিলেন যে আগন্তুক আত্মীয়তা ফাঁদিবার দোষ হইতে মুক্তি চাহিতেছে। তখন তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতামহ-কুলে কেহ নাই? কাদের বাড়ী বাপু?" রায় মহাশয় অল্পবয়স্ক সুন্দর যুবক দেখিয়া বাপু বাছা ধরিলেন। যদিও তিনি সবে চল্লিশ পার হইয়াছেন, তবুও বৃদ্ধবয়সসুলভ রোগটি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। যুবক বলিলেন যে তাঁহার মাতামহ ঈশ্বর শম্ভুচন্দ্র বাগ্‌চি। এবারে মিষ্টার রায় যুবকের হাত ধরিয়া বলিলেন, "বটে? তোমার মামা হারাণ যে আমার সমপাঠী এবং পরম বন্ধু ছিলেন। এস বাপু, ঘরে এসে বোসো। সুশীলা, এসো; ইনি হারাণের ভাগ্নে; কাজেই আমারও ভাগ্নে। চল, সকলেই ঘরে গিয়ে বসি। আহা, বাগ্‌চি কুলের এখন তুমিই এক প্রতিনিধি আছ বাপু।" সকলে গৃহে প্রবেশ করিবার পর, মিষ্টার রায় যুবককে একসঙ্গে চা খাইতে অনুরোধ করিলেন। যুবক সবিনয়ে স্বীকৃত হইলেন।

তাহার পর চা খাইতে যাইবার সময় বলিলেন, "ভাল কথা; তোমার নামটি জিজ্ঞাসা করি নাই।" যুবক কহিলেন, যে তাঁহার নাম সুশীলচন্দ্র মৈত্র। রায় হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে; আমার মেয়ের নাম হচ্চে সুশীলা। ও সুশীলা, এ ছেলেটি তোমার ভাই হয় জান ত?" সুশীলা তাঁহার অধরে শারদকৌমুদী ফুটাইয়া, নরেন্‌কে চুপি চুপি বলিয়া দিলেন, যে এই বাবুটিকে যেন সে দাদা বলে। রায়-জায়া আসিয়া যখন সুশীলের পরিচয় পাইলেন, তখন তিনি বলিলেন, "ওমা! একে যে দেখেছি। মোহিনী বিধবা হয়ে একবার বাপের ভিটে দেখ্‌তে এসেছিল; তখন একে রায়গ্রামে দেখেছি।" সুশীলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার মা ভাল আছেন?" সুশীল ঘাড় নাড়িলেন। রায়-জায়া পুনরপি কহিলেন, "তোমাকে যখন দেখেছিলুম, সুশীলা আমার দু'বছরের; তোমার তখন দশ বছর পেরিয়েছে; নয়? তোমার তা মনে আছে কি?" মেয়েদের কাছে বয়সগণনায়, ঠিকুজি কুষ্ঠি হারি মানে। এবার

সুশীল স্বীকার করিলেন, যে তাঁহার সব মনে আছে। বিলাত-ফেরৎ সমাজকে সুশীল একটা বিভীষিকা বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু যাঁহারা এক মিনিটে আপনার করিয়া ফেলিতে পারেন, তাঁহাদের মাহাত্ম্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন।

রায়-জায়ার টেবিলে খাদ্যসামগ্রী অতি প্রচুর ছিল; তবুও তাঁহার মন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "বড় মানুষের ছেলেকে দেবার মত আমার কিছু নেই। তোমার মাকে একটু বাড়িয়ে টাড়িয়ে বলে আমার মান রক্ষা করো। তোমার মাকে ত আর দেখ্‌তে পাব না।" সুশীল বুঝিলেন, যে রায়-পরিবার তাঁহার মাকে সেই সাবেকি রকমেই ভাবিতেছিলেন। এত আত্মীয়তা এবং অনুগ্রহের পর, অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন, "আমার পিতাঠাকুর ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন জানেন? মা, আগে বাড়ীতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বই রাখ্‌তে দিতেন না; কিন্তু বিধবা হ'বার পর থেকে, তিনি আমাকে ব্রাহ্মসমাজে এনে মানুষ করেছেন। তিনি আপনাকে দেখ্‌লে খুব খুসি হবেন। আপনাদের কথা কত বলেন।" রায়-জায়া বলিলেন, "তা, কই? তুমি ত কখনো আমাদের খবর নেও নি?" সুশীল চক্ষু অবনত করিয়া চাম্‌চে দিয়া চা নাড়িতে লাগিলেন।

আত্মীয়তা ঘনাইয়া আসিল দেখিয়া, রায়-জায়ার মনে নানা কথা উঠিতে লাগিল। তিনি সকলকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "সুশীলা একদিন আমাদের খিড়্‌কির পুকুরে গিয়ে নেমেছিল; সুশীল দেখ্‌তে পেয়ে, ওকে এম্‌নি ধম্‌কে তাড়িয়ে এনেছিল, যে কি বল্‌ব! মেয়ে ত আমার কান্না জুড়ে দিলেন; সুশীল গিয়ে আবার ওকে কতকগুলো ফুল এনে দিল। সুশীর তা মনে নাই।" সুশীল হাসিতে লাগিলেন; এবং সুশীলা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "মার সব যত কথা!" জীবনের প্রভাতকালের কথা চিরদিনই স্নিগ্ধতা বিতরণ করে। সেই ধমকানি টুকু উবিয়া গিয়া, তাহার ইতিহাসটা পরমাত্মীয়তার সঙ্গে জড়াইয়া প্রাণ স্পর্শ করিল। এই এক কথায় নবাগতের প্রতি সুশীলার স্নেহ বাড়িয়া উঠিল।

রায় মহাশয় এতক্ষণ কথা কহিতে পান নাই। তিনি একঢোক চা খাইয়া বলিলেন, "আজ ইনি ভোলানাথ বাবুর সন্ধানে এসে ধরা পড়েছেন।" ভোলানাথ বাবুর ভাবনায় যেন সুশীলার এতদিন ঘুম হয় নাই। সুশীলা আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভোলানাথ বাবু এসেছেন না কি?" রায় মহাশয় তখন যথাশ্রুত কথা শুনাইয়া চার পেয়ালা মুখে তুলিলেন। ভোলানাথ বাবু হয় ত পথে অন্য কোন গৃহে ব্রহ্মসংগীত শুনাইবার সুবিধালাভ করিয়া এখনো রায়-গৃহ পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারেন নাই।

দশম পরিচ্ছেদ।

আত্মীয়তা।

বসিবার ঘরে গিয়া সুশীলা বলিলেন, "ভোলানাথ বাবু এলেন না দেখ্‌ছি।" মিষ্টার রায় বলিলেন, "ভোলানাথ বাবুর সঙ্গে খুব জরুরি কাজ ছিল বুঝি?" সুশীল কহিলেন, যে ভোলানাথ বাবু তাঁহার সঙ্গে একত্রে মাদ্রাজ যাইবেন বলিয়াছিলেন; নূতন রেলওয়েতে না যাইয়া তিনি ষ্টীমারে যাইবেন স্থির করিয়াছেন; ভোলানাথ বাবু তাহাতে সম্মত কি না জানিবার প্রয়োজন; কেন না প্রাতেই যাহা হউক বন্দোবস্ত স্থির করিয়া লইতে হইবে। মিষ্টার রায় বুঝিতে পারিলেন, যে ভোলানাথ বাবু সুশীলের গলগ্রহ হইয়াছেন; সুশীল এখন তাঁহাকে লইতে স্বীকৃত হইয়া দায়ে পড়িয়া তাঁহাকে খুঁজিতেছেন।

মিষ্টার রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কংগ্রেস্ উপলক্ষ্যে মাদ্রাজ যাবে?" সুশীল স্বীকার করিয়া কহিলেন, যে ঐ উপলক্ষ্যে মাদ্রাজ দেখিবারও সুবিধা হইবে। মিষ্টার রায় বলিলেন, "ভালই। ষ্টীমারে যাওয়াই বেশী সুবিধার কথা; কারণ সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি এবং তোমাদের প্রেসিডেন্ট-ইলেক্‌ট্ বসু মহাশয়েরাও ষ্টীমারে যাবেন। মিষ্টার বসু ত তোমাদের সমাজের সভাপতি?" সুশীল বলিলেন, "হাঁ।" সুশীল ভাবিলেন, ঢের হইয়াছে; এইবার উঠি। কিন্তু রায় মহাশয় আর একটু পরিচয় পাইবার আশায়, লেখাপড়া প্রভৃতির কথা পাড়িলেন। সুশীলের মুখ হইতে তাহার নিজের কথা অনেক কষ্টে বাহির করিতে হইয়াছিল। এবিষয়ে পরস্পরের কথোপকথন এইরূপ হইয়াছিল:—

রায়—তুমি কি এখনো কলেজে পড়?

সুশীল—না।

রায়—কলেজ ছেড়েছ কত দিন ?

সুশীল—এই প্রায় তিন বৎসর হ'ল।

রায়—কতদূর পড়েছিলে ? বি,এ, পাশ করেছ ?

সুশীল—হাঁ।

রায়—তার পর আর পড়নি ?

সুশীল—অল্প কিছু পড়েছিলুম।

রায়—এম, এ, দিয়েছিলে ?

সুশীল—হাঁ।

রায়—পাশ করেছিলে ?

সুশীল—হাঁ।

রায়—আইন পড়নি ?

সুশীল—না।

রায়-গৃহিণী বলিলেন, "ওদের ত রোজগার কত্তে হবে না ; ওরা আর আইন পড়তে যাবে কেন ?"

মিষ্টার রায় বলিলেন, "বেশ কথা। তোমাদের জীবিকার ভাবনা নেই ; ভাল কাজে সময় দিতে পার্ব্বে। তুমি অবশ্যই বিবাহ করেছ ?" সুশীল তখন পার্শ্বস্থ টিপয়খানির উপর হইতে অন্যমনস্কভাবে এল্‌বাম খানি লইয়া তাহার পাতা উল্টাইয়া বলিল, "না।" রায়-জায়া সস্মিত মুখে বলিলেন, "ভারি লাজুক ছেলে ; ওকে আর ঘাঁটিও না।" সুশীল কিন্তু পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে শ্রীমতী সুশীলার ফটো বাহির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রায়-গৃহিণী তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবার প্রসঙ্গে বলিলেন, "এইটি সুশীলার ফটো।" সুশীলা চমকিয়া উঠিয়া ভাবিল, "এ কি বিপদ" সুশীল একটু যেন অপ্রতিভ হইলেন। রায়-জায়া কহিলেন, "এটা ওর দু'বছর আগেকার ফটো।" সুশীল বুঝিতে পারিলেন না, যে কখন এলবাম খানি তাঁহার হাতে উঠিয়াছিল। ফেলিয়া দিতেও পারেন না ; করেন কি ? তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারিতেন, যে ইচ্ছাপূর্ব্বক এলবাম লইয়া সুশীলার ছবি খুলিয়া দেখিতে বসেন নাই। তখন অন্য পাতা উল্টাইয়া নিজেই বলিলেন, "এটা নরেনের ছবি; বেশ উঠেছে।" নরেন তখন সদর্পে দিদির মুখের দিকে তাকাইল।

এমন সময় সত্য সত্যই ভোলানাথ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই আজি তাঁহাকে আশাতিরিক্ত আদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ভোলানাথ বাবু সুশীলকে দেখিয়াই বলিলেন, "এঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল না কি ?" রায় মহাশয় সুশীলকে কথা কহিতে না দিয়া বলিলেন, "ও যে আমাদের আত্মীয়। আপনি না কি মাদ্রাজ যাচ্চেন ?" ভোলানাথবাবু ঘরের হার্ম্মোনিয়ামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "হাঁ ; এবার [illegible]

সেই জন্য যাওয়া য [illegible]

সুশীল তখন তাঁহা [illegible]

যাইতে রাজি আছে [illegible]

যে, ষ্টীমারে ডুবিয়া মরিবার ভয় আছে কি [illegible] কোন ক্লেশ হ'বে কি না। উভয় বিষয়েরই সন্তোষজনক উত্তরলাভ করিয়া ভোলানাথবাবু সতৃষ্ণে হার্ম্মোনিয়ামের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "দার্জ্জিলিংএ যেটা দেখেছিলুম তার চাইতে যে এ হার্ম্মোনিয়াম খুব বড় দেখ্‌ছি!" রায় মহাশয়ের মনে সঙ্গীতের পূর্ব্বস্মৃতি জাগরুক ছিল বটে, তবুও তিনি বলিলেন, "এ অর্গানটার আওয়াজ বড় মিঠে। আপনি যদি বাজাতে চান, দেখুন।" "আচ্ছা আমি বাজাচ্ছি। সুশীল, তুমি একটা ভাল দেখে ব্রহ্মসঙ্গীত গাও ত !" বলিয়া ভোলানাথ বাবু গায়ের র‍্যাপারখানা চেয়ারে রাখিয়া অর্গান খুলিলেন। সুশীল বেচারা এই আকস্মিক বিপদে বিব্রত হইয়া বলিল, যে তার গলা ভারি খারাপ ; আর ভাল গান তার মনেই পড়্‌ছে না।

রায় মহাশয় তখন সস্নেহে সুশীলের পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "থাক্, ওর লজ্জা হচ্ছে। আপনিই গান, ভোলানাথ বাবু।" ভোলানাথ বাবু অমনি স্বকীয় সিংহনাদে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। ভোলানাথ যখন একমনে গান গাহিতেছিলেন, তখন মিষ্টার রায় সুন্দর ছেলেটির পার্শ্বে চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলেন, "তুমি যদি গাইতে পার, ত একটা গাও না !" রায়-জায়া এবং সুশীলা এ প্রস্তাব শুনিয়া সুখী হইলেন। সুশীল মুখ নত করিয়া স্বীকৃত হইলেন। তাহার পর ভোলানাথ বাবুর গান সমাপ্ত হইবা মাত্র, মিষ্টার রায় নিজে অর্গানের পাশে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আপনি একটু এদিকে আসুন ; সুশীলকে দিয়া গান গাওয়াইতেছি।" বাবু ভোলানাথ সিংহ, মেষশাবকের মত নরম হইয়া আন্তরিক কষ্টে আসনত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় কিন্তু সুশীলকে

ফর্মায়েস্ করিয়া বলিলেন, "'ওহে সুন্দর, চির সুন্দর'— সেইটি গাও।" সুশীল সেইটিই গাহিলেন:—

ওহে সুন্দর! চির সুন্দর, তুমি এসহে তোমারে হেরিব।
বসন্তে ফুল্লকুসুমমাল্যে তোমার চরণ ঘেরিব।
স্নেহ দিঠি তব, অরুণ-আভাতে—
চেয়েছিল আজি তরুণ প্রভাতে,
(আমি) তখন হেরিনি; এখন সন্ধ্যা-তপনে বদন হেরিব।
নেহারি তোমায় বিহগেরা গায়,
আলো মাখা জল, কল্লোলে ধায়;
(মোরা) আলো পাখী নর, সাগর ভূধর সবাই তোমায় বেড়িব।

মিষ্টার রায়ের মনে নবসৌন্দর্য্য জাগিল; রায়-জায়া জলভরা চক্ষে মনে মনে আবৃত্তি করিলেন "তখন হেরিনি: এখন সন্ধ্যা-তপনে বদন হেরিব:" সুশীলার মনে হইতেছিল —সে কথা অন্য অধ্যায়ে বলিব। নরেন বুঝিল, যে ভোলানাথ বাবুর চাইতে ঢের ভাল গান; কিন্তু দিদির গানের মত নয়।

এবারে সুশীল এবং ভোলানাথ বাবু বিদায় হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে সুশীল কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের মত বলিলেন, "মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে একদিন আসব; মাকে নিয়েই হয় ত আসব।" মিষ্টার রায় এবং রায়-জায়া, ইহাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া পুনঃ পুনঃ সে বিষয়ে অনুরোধ করিলেন। ভোলানাথ বাবু অনুরুদ্ধ না হইয়াই বলিলেন, "আমি সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌ব এখন।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নূতন ভাব।

লোকে মেরী বাউরীকে যে অত্যন্ত কালো বলে, কিন্তু সে কথার একটু প্রতিবাদ করা চলে। কারণ, সে যখন অপরাহ্ণ-সূর্য্যকর সেবন করিতেছিল, তখন তাহার উল্কীর দাগগুলি, মুখের উপর স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল; একেবারে জলে জল মিশাইয়া যায় নাই। মেরী দেখিল, যে ফটকপথে সাহেবের গাড়ী গৃহে ফিরিল; তাহার রৌদ্রতাপভোগের এই বিপত্তি দেখিয়া সে গৃহে প্রবেশ করিল। তখন গাড়ী হইতে মিষ্টার বোনার্জি এবং নরেনকে সঙ্গে লইয়া মিষ্টার রায় অবতরণ করিলেন।

সুশীলা দেবী বসিবার ঘরের আসনগুলি একটু নূতন রকম করিয়া সাজাইয়া, গৃহের পুরাতনত্ব দূর করিয়া, কৃত কার্য্যের ফল অবলোকন করিতেছিলেন। এমন সময়ে গাড়ীর যাত্রীগণ প্রবেশ করিলেন। সুশীলা অমনি সহাস্য মুখে বোনার্জিকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মিষ্টার বোনার্জি তখন প্রীতিপূর্ণ মুখে তাহার সহিত কথোপকথনের সূত্রপাত করিলেন; এবং মিষ্টার রায় নরেনকে লইয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

বোনার্জি। আপনি আজকাল অনেক সংস্কৃত বই পড়্‌চেন?

সুশীলা। কে বল্লে? সংস্কৃত ভাল বুঝ্‌তেই পারিনে; তা ছাড়া দার্জিলিং থেকে ফিরে আসা অবধি, কোন বই ছুঁয়েছি কি না মনে হচ্ছে না। না; আপনার Morning Breeze আগা গোড়া প'ড়েছি। বেশ্ লাগ্‌ল।

বোনার্জি। ভদ্রতার খাতিরে আমার কবিতার একটু প্রশংসা করাই উচিত। তা যাক্ সে কথা। আপনি কি মনে করেন যে একালের পাশ্চাত্য সভ্যতাটা আমরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা কর্‌তে পারি।

সুশীলা। অত বড় একটা কথা ত আমি ভেবেই উঠ্‌তে পারিনে। সভ্যতাটা যে কি, তাও ত আমি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারিনি। ভাষা এবং পরিচ্ছদ ছাড়া যে কতটুকু আমাদের স্বদেশী আর কতটুকু বিদেশী— তাও হয় ত আমার জানা নাই।

বোনার্জি। আমরা ইংরাজি পোষাক পরি; না পরিলে নিশ্চয়ই ভাল হ'ত। কিন্তু হাকিম এবং ব্যারিষ্টার মহলে ঐ পোষাক ব্যবহারটা অনেক দিন থেকে প্রচলিত হয়ে গেছে; এখন তাঁদের সকলকেই বাধ্য হয়ে পর্ত্তে হয়। এখন পরিবর্ত্তন কর্ত্তে হলে, একদিনে চট্‌করে হয়ে উঠ্‌বে না। হওয়া কিন্তু উচিত, স্বীকার করি। আমাদের পক্ষে এ পোষাক যখন তখন ফেলে দেওয়া চলে। আমাদের কলেজ স্কুলে বিলাতী পোষাকের প্রথা দাঁড়ায় নাই।

বোনার্জি যখন সুশীলার কাছে একথা বলিলেন, তখন তাঁহার বড়ই লজ্জা হইল। তিনি কখন কি একটু তামাসা করিয়া বলিয়াছিলেন বলিয়া, বোনার্জি যে বকমে ত্রুটি স্বীকার করিলেন, তাহাতে তিনি অত্যন্ত লজ্জা পাইলেন।

বুঝিতে পারিলেন, যে বোনার্জি উচ্চমনা ব্যক্তি। না জানি এমন লোকের প্রতি অসাবধানে কত দুর্ব্যবহার করা হইয়াছে ভাবিয়া, তাঁহার মনে কষ্ট উপস্থিত হইল। সুশীলা অতি কাতর স্বরে বলিলেন, "আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা কর্ব্বেন; আমি অনেক সময়ে এমন অনেক কথা বলেছি, যা' আমার কদাচ বলা উচিত ছিল না।"

বোনার্জি একথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু কোন কথা কহিবার পূর্ব্বে, বুড়া পণ্ডিত বা ন্যায়রত্ন মহাশয় উত্তর-চরিত হস্তে সহাস্য মুখে প্রবেশ করিলেন। সুশীলা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া মিষ্টার বোনার্জিকে দেখাইয়া বলিলেন, "এঁর নাম মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি সরকারী কলেজের প্রোফেসর। ইনি খুব সুপণ্ডিত এবং কবি।" পণ্ডিত মহাশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। বোনার্জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিত মশাই, আপনার হাতে ওখানি কি বই?" পণ্ডিত মহাশয় হাসিয়া বইখানি দিয়া বলিলেন, "উত্তর-চরিত। অতি চমৎকার নাটক।" বোনার্জি পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন, "সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস আর ভবভূতি ছাড়া অন্য কোন কবির খুব সুপাঠ্য নাটক আছে?" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "অত ভাল নাই; তবে ভাল নাটক আছে। মৃচ্ছকটিকখানি ভাল বই। না, সুশীলা?" সুশীলা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি তা আমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চেন কেন? আমি কি সব নাটক পড়েছি নাকি?" বোনার্জি হাসিয়া বলিলেন, "আপনার ছাত্রীকে আপনি অনেক শিখিয়েছেন।" পণ্ডিত মহাশয়ের কথার ফোয়ারা খুলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "সংস্কৃত পড়্বার ভারি অনুরাগ। ওঁর বাবা ত বল্ছিলেন, যে কেবলই সংস্কৃত পড়ে, ও পরীক্ষা পাশ কত্তে পার্ব্বে না। কিন্তু ওঁর মা বল্তেন, যে মেয়ের যা ভাল লাগে তাই পড়ুক; পরীক্ষা পাশ করে কি হবে? তা, এমন বুদ্ধি যে পরীক্ষাও পাশ করেছেন।" সুশীলা বেগতিক দেখিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত মশাই, ওঁরা ঢের পরীক্ষা পাশ করেছেন; আর আমার বিদ্যা বুদ্ধিও উনি খুব জানেন।" সুশীলা বড়ই সঙ্কুচিতা হইতেছিলেন দেখিয়া, বোনার্জি তখন পণ্ডিত মশায়কে বলিলেন, "ন্যায়রত্ন মহাশয়, শাস্ত্রে কি বিলাত-যাত্রার নিষেধবিধি আছে?" পণ্ডিত মহাশয় গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "যবনান্ন আহার, শাস্ত্রে নিষেধ; সেটা খুব পুরাতন ব্যবস্থা। সমুদ্রযাত্রার কথাটা হয় ত কিছু আধুনিক।" বোনার্জি বলিলেন, "একালে কি ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তন করা উচিত নয়?" পণ্ডিত মহাশয় সংস্কারক নহেন; তিনি পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হচ্চে ত। আপনা আপনি পরিবর্ত্তন হচ্চে। ধর্ম্ম ব্যবহার কালানুসারে বদলায়ই।" পণ্ডিত মহাশয় হয় ত নিরূপিত সময়ে ছাত্রীকে পড়াইতে আসিয়াছেন, মনে করিয়া, বোনার্জি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া আসনত্যাগ করিলেন; এবং আপনার টুপিটি লইয়া সুশীলাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি এখন আস্চি।" বোনার্জি সাহেবের বিদায়ের পর পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "ইনি বড় সুবোধ; অতি সজ্জন ব্যক্তি।" সুশীলা সেকথার অনুমোদন করিলেন। কিন্তু সহসা সুশীলার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হইল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

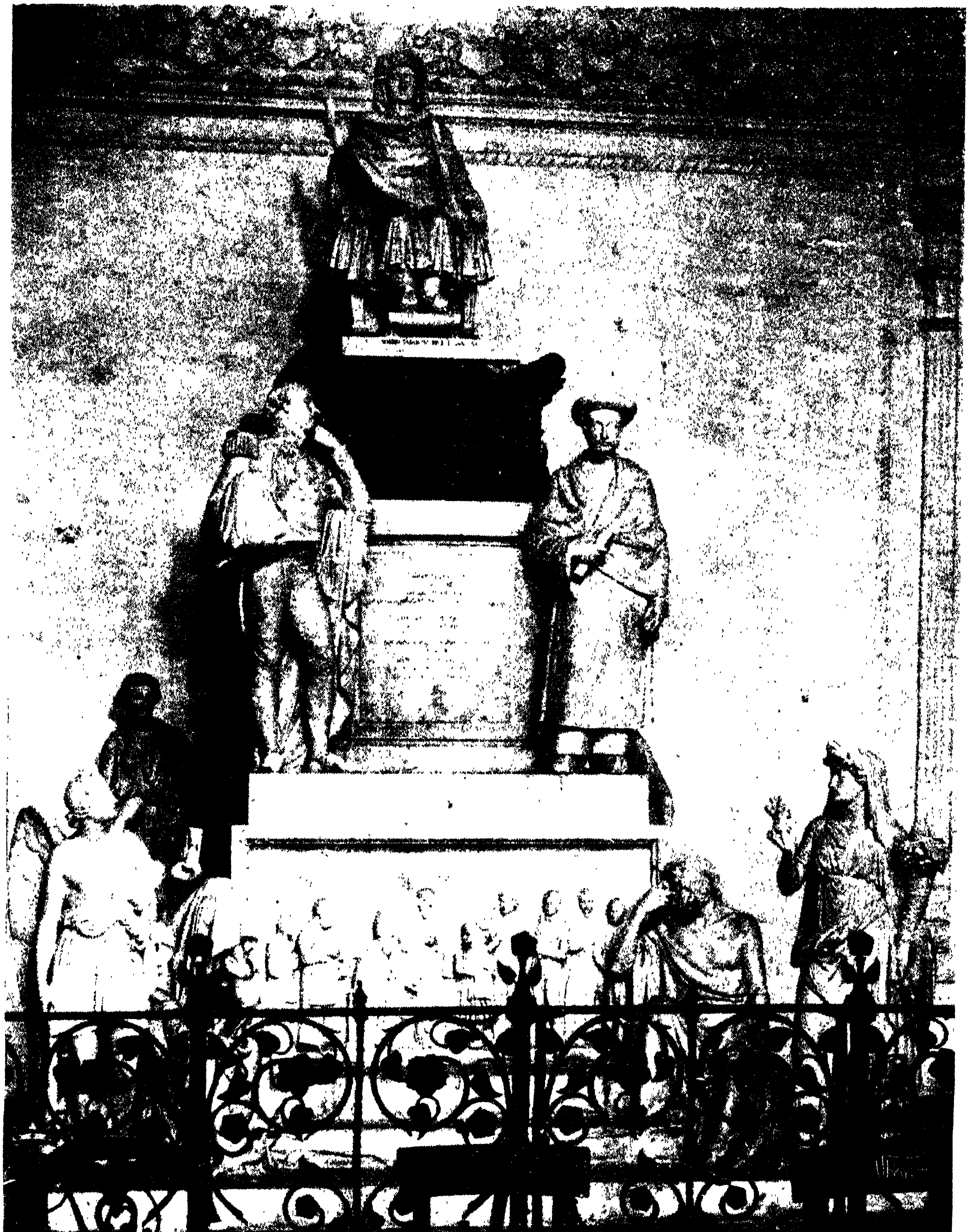
ভারতেতিহাসের একখানি বিস্মৃত পৃষ্ঠা।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ভারতের ভয়ানক দুর্দ্দিন গিয়াছে। সেই দুর্দ্দিনে ভারত-রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়া যাহারা তৎসাময়িক দৃশ্যপটখানি সুরঞ্জিত করিয়াছিল, ঐতিহাসিক হিসাবে তাহাদের জীবন-কাহিনী যদ্রূপ মূল্যবান্ তদনুরূপ কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু তাহাদের অনেকে য়ুরোপ হইতে আসিয়া স্বীয় কু-কীর্ত্তি দ্বারা জাতীয় চরিত্রে এমনি কলঙ্কের কালি ঢালিয়া দিয়া গিয়াছে যে, অধিকাংশ স্বজাতিবৎসল লেখক ভারত-ইতিহাস হইতে সে কলঙ্কের দাগ যত্নপূর্ব্বক মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। প্রচলিত ক্ষুদ্র ইতিহাসগুলিতে তাহাদের নাম-গন্ধও পাওয়া যায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে

"সাহিত্য" ও "প্রদীপে" সমরু-কাহিনী* প্রকাশিত হইয়াছিল ; এবং ১৮৯৪ অব্দে সার্দ্ধানার "রোমান ক্যাথলিক প্রেস" হইতে "সার্দ্ধানা" নামে একখানি পুস্তক বাহির হইয়াছিল। তাহার পরও কয়েকখানা ইতিহাস মুদ্রা-যন্ত্রের কৃপায় প্রকাশ পাইল, কিন্তু সমরু-কীর্ত্তি তথাপি স্থান পাইল না। অল্পদিন হইল ঐতিহাসিক কীন "উষার পূর্ব্বে আঁধার" (Darkness before Dawn) নামক গ্রন্থে তাহাদের পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে প্রধান চরিত্র-যুগলের নাম "ওয়াল্‌টার রেণহার্ড" এবং "জেবউন্নিসা," ওরফে সমরুদম্পতি। যথায় সমরুবেগমের জীবননাটকের অঙ্কগুলি অভিনীত হয়, ঘটনাচক্রে সেই ঐতিহাসিক সাদ্ধানার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আমাদের তাঁবু পড়িয়াছিল। তথায় যাহা দেখা ও শুনা গিয়াছিল এবং পরে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে ইহাই বলিতে হয় যে, শতাব্দী মাত্র পূর্ব্বের এই সমরুকীর্ত্তি বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের গণনার মধ্যে না আসিলেও ভারত-ইতিহাস হইতে সেই বিস্মৃত পৃষ্ঠাখানি এত সহজে বাদ দেওয়া যাইতে পারিবে না। মীরাট, আগ্রা, দিল্লী এবং সার্দ্ধানায় সুরক্ষিত স্মৃতিস্তম্ভ খোদিতলিপি ও স্থায়ী কীর্ত্তিগুলি ভারতের হাড়ে হাড়ে এমনই বসিয়া গিয়াছে যে, যুগযুগান্ত পরেও জন্মভূমির ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকগণ সেই সমুদয় এবং অক্ষয় জনশ্রুতি হইতে বিস্তর উপকরণ প্রাপ্ত হইবেন।

মীরাটের ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কোটানা গ্রামে দেড়শত বৎসরের কিছু উপর হইল লুৎফ আলী খাঁ ওরফে আসদ খাঁ নামে জনৈক আরববংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার দুই স্ত্রীর মধ্যে প্রথমা উচ্চবংশীয়া এবং দ্বিতীয়া পূর্ব্বে নর্ত্তকী ছিল। সম্ভবতঃ ১৭৫০ অব্দে লুৎফআলীর ছোট স্ত্রীর গর্ভে একটী সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাহার ছয় বৎসর পরে লুৎফআলীর মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রথম পক্ষের এক পুত্র ছিল। সে দুর্ব্বৃত্ত বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভগ্নীর নিগ্রহ করিবার বেশ সুযোগ প্রাপ্ত হইল। কন্যা ও জননী নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও দুই তিন বৎসর গৃহে ছিল কিন্তু ক্রমে সপত্নীপুত্রের কঠোর আচরণ অসহ্য হইয়া উঠিল। তখন একদিন সেই সহায়হীনা বিধবা তাহার একমাত্র ভরসা কুমারী কন্যার হাত ধরিয়া স্বামী-গৃহ ত্যাগ করিল। ১৭৬০ অব্দের প্রারম্ভে উভয়ে দিল্লীতে আসিয়া বাস করে। কন্যার বয়স তখন প্রায় দশ বৎসর। সেই স্ফুট গৌরাঙ্গী ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলে তাহার সুগঠিত দেহ সুপরিণত হইল ; তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ আয়ত লোচনদ্বয় প্রতিভাসমুজ্জ্বল হইল এবং বালিকার সুকুমার অঙ্গে সকল সুষমা ক্রমে ক্রমে একত্রিত হইয়া তাহাকে প্রকৃতই রূপসী করিয়া তুলিল। কথিত আছে, অনন্যোপায়া কুমারী দিল্লীতে গান্ধর্ব্বব্যবসায় অবলম্বন করিল। ভারতে সে সময় ফরাসী ও ইংরাজে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। একদিকে লা বুর্দ্দন্যা এবং ডুপ্লে ফরাসীর আধিপত্য বিস্তারে বদ্ধপরিকর, অপরদিকে সেনাপতি ক্লাইভ ইংরাজ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপনে স্থিরসঙ্কল্প। মোগলসাম্রাজ্যের কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে ; হতগৌরব মোগল-সম্রাট মহারাষ্ট্র, শিখ, রাজপুত, জাঠ, পিণ্ডারী, পাঠান ও য়ুরোপীয় শক্তিব্যূহের মধ্যে পড়িয়া অশান্তিতে কালহরণ করিতেছেন ; ক্ষুদ্র বৃহৎ

* শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী ১৩০৯ সালের বামাবোধিনী পত্রিকার ১৭০ পৃষ্ঠায় "স্ত্রীলোকের অধ্যবসায়" শীর্ষক প্রবন্ধে সমরুবেগমের কীর্ত্তি-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "সম্প্রতি (১৩০৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের) প্রবাসী নামক মাসিকপত্রে আর একজন ভদ্রলোক কতিপয় পংক্তি মাত্র লিখিয়া সমরুবিবির কীর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অধ্যবসায়ের কথা উল্লেখ করেন নাই।" প্রবাসী পত্রিকায় "পঞ্জাবে বাঙ্গালী" প্রবন্ধে আমরা যে সমরুবেগমের নামোল্লেখ করিয়াছিলাম, তিনি সাদ্ধানার জায়গীরদার সমরুপত্নী। মহাভারতী লিখিয়াছেন, "* * * রাজা মানসিংহ পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক বন্দী করিয়া পশ্চিমে লইয়া গিয়াছিলেন, ঐ স্ত্রীলোক তাহাদের অন্যতম। মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই স্ত্রীলোকের সমরুবিবি নাম হইয়াছিল। কি কারণে বলিতে পারি না, কিছু কাল পরে সমরুবিবি মুসলমান-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রোমান কাথলিক খ্রীষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছিল। * * * * * কিছু দিন পরে আকবরের সহিত সমরুর বিবাহ হইল। * * * * সমরুবিবি তখন সমরুবেগম বলিয়া প্রখ্যাতা হইল। * * * * সমরুবেগমও পরধাম হইতে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সম্রাট আকবরের নাম ও কীর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে আগ্রায় সমরুবেগমের নাম ও কীর্ত্তি লক্ষ-কণ্ঠে গীত হইতেছে। * * * *" সম্রাট আকবর ১৬০৫ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন এবং ঐতিহাসিক সমরুবেগম প্রায় ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং মহাভারতী মহাশয়োক্ত বেগম সমরু কোন্ সমরু তাহা বহু অনুসন্ধানেও নির্ণয় করিতে পারিলাম না। এ সম্বন্ধে মহাভারতী মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলাম কিন্তু পত্রোত্তরে যাহা জানিয়াছি, তাহাতে উভয় সমরুই এক বলিয়া ভ্রম হয়। আমি আগ্রা ও সার্দ্ধানায় যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা সার্দ্ধানার জায়গীরদার সমরু ও তাঁহার স্ত্রী সমরুবেগমেরই কীর্ত্তি। মহাভারতী মহাশয়, তথাকথিত আকবর-পত্নী বাঙ্গালী সমরুবিবির ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব।—লে।



সার্দ্ধানায় বেগমসমরুর প্রস্তরমূর্ত্তি।

রাজা ও জমীদারবর্গ সুযোগ বুঝিয়া একে একে সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করিয়া প্রবল হীনশক্তিকে কবলিত করিতেছে এবং ডি বয়নী, টমাস, ডুদ্রোনী, পেরন্, মিডক এবং শেপার্ড প্রভৃতি কতিপয় প্রতিভাশালী, উচ্চ ও নীচ-বংশীয় য়ুরোপীয় সমরনিপুণ ব্যক্তি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি দ্বারা নিযুক্ত হইয়া দেশীয় সমরবিভাগে য়ুরোপীয় প্রথা প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত করিতেছে। যুগ পরিবর্ত্তনের সূচনাস্বরূপ সর্ব্বত্রই বিশ্বাসঘাতকতা, গৃহশত্রুতা, বিদ্রোহ এবং অরাজকতা প্রকাশ পাইয়া ভারতভূমিকে যেন নর-পিশাচের তাণ্ডবক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। এমন সময় ওয়াল্টার রেণাড নামে জনৈক ভবঘুরে ফরাসী ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়া ভারতে আগমন করে। প্রকৃতই সেই সময় মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংস ও ইংরাজের অভ্যুদয়কালের সন্ধিস্থল। ডি বয়না, টমাস প্রভৃতি কর্ত্তৃক সংগঠিত শোণিতপিপাসু পেসাদারী সেনাদল সেই বিপ্লব সংঘটনের নিমিত্ত মাত্র। উক্ত সৈন্য-দলগুলি য়ুরোপ হইতে আগত কয়েক শত চরিত্রহীন ভবঘুরের দ্বারা গঠিত হয়। রেণাড ঐরূপ দলের একজন বিখ্যাত অধিনায়ক। রেণাড কখন ফরাসী পক্ষে কখন ইংরাজ পক্ষে চাকরি করিয়া পরে নানা স্থান ঘুরিয়া বেড়ায়। কোথাও সুবিধা করিতে না পারিয়া নবাব মীরকাসীমের সেনাপতি, তখন বিহারের শাসনকর্ত্তা, গুর্গনখাঁর অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করে। ইতিপূর্ব্বে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহস, অধ্যবসায় এবং উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি কয়েকটী অনন্যসাধারণ গুণ দরিদ্র রেণার্ডকে স্বীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট রাখিতে পারিত না। রেণার্ড তাই অষ্টপ্রহর স্বীয় ভবিষ্যৎ চিন্তায় মগ্ন হইয়া মুখখানা আঁধার করিয়া বসিয়া থাকিত। তাহার বর্ণও কিছু মলিন ছিল। মূর্খ সৈনিকগণ তাহার সেই বিষাদগম্ভীর মলিন মুখ দেখিয়া তাহাকে সম্বার (Sombre) অর্থাৎ আঁধারমুখ বলিয়া ডাকিত। এইরূপে ক্রমে রেণার্ড ম্বার নামেই প্রসিদ্ধ হইল, এবং নবাব সৈন্যদলভুক্ত হইয়া মরুসাহেব বলিয়া পরিচিত হইল। এখানে গিরিয়ার ভীষণ যুদ্ধ পর্য্যন্ত নবাবের সহিত ইংরাজের যে কয়টী যুদ্ধ য় সমরু তাহাতে বিশেষ রণচাতুর্য্য দেখাইয়া খ্যাতিলাভ করে। ওয়াল্টার রেণার্ড ওরফে সমরু সাহেব শেষে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পাটনার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে প্রকৃত-অন্ধকূপ-হত্যাকারীর দুর্নাম লইয়া রোহিলখণ্ডে পলায়ন করত স্বীয় কলঙ্কিত জীবন রক্ষা করে।

সমরু রোহিলখণ্ডে পলাইয়া গিয়া কখন অযোধ্যায়, কখন বুন্দেলখণ্ডে, কখনও রোহিলা সর্দ্দার দলে, কখন মহারাষ্ট্র পক্ষে, কোন সময়ে সম্রাট পক্ষে এবং কখনও বা জাঠ সর্দ্দার সুর্য্যমল্লের সেনাদলে কর্ম্ম করিয়া ১৭৬৭ অব্দে ভরতপুরের রাজার সৈন্যদল সহ দিল্লী অবরোধ করিতে আগমন করে।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে রেণাড স্বীয় মাতৃভাষা ফরাসীসে কথোপকথন করিত, সাহেবী পোষাক পরিত, এবং মিষ্টার সম্বার নামে অভিহিত হইত। অভ্যাস বশে ফরাসী রেণার্ড ছয় বৎসরের মধ্যে মুসলমান সমরুরূপে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিল, এবং মোগল পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া উর্দ্দু ও পারস্য ভাষায় কথোপকথন করিয়া, মুসলমান সমাজের রীতি নীতি আদব কায়দা আয়ত্ত করিয়া আপনাকে সমরু নামের উপযুক্ত করিয়া লইল। শেষে পরিবর্ত্তনের চূড়ান্ত করিবার জন্য বড়বেগম নাম্নী জনৈক নর্ত্তকীকে বিবাহ করিয়া সমরু একটী প্রকৃত মুসলমান সংসার পাতিল! বড়বেগম বহুদিন স্বামীর ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পায় নাই। জাফর ইয়ার খাঁ নামে এক পুত্র রাখিয়া বড়বেগম অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

এদিকে দিল্লী অবস্থানকালে সমরুর সহিত পূর্ব্বোক্ত পিতৃহীনা আরব কুমারীর পরিচয় হয়, এবং সেনাপতি সমরু তাহার রূপলাবণ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া মুসল-মান প্রথানুসারে তাহাকে যথারীতি বিবাহ করে। তদবধি তাহার নবপরিণীতা বধূ বেগমসমরু নাম প্রাপ্ত হয়। বিবাহের পর আট বৎসরকাল সমরু স্বীয় দুর্দ্ধর্ষ পেশাদারী সেনাদল সহ ভারতের বিভিন্ন রাজশক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে ঘোর সংগ্রাম করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। অতঃপর ১৭৭৫ অব্দে বর্ষাণার ভীষণ যুদ্ধের পর সমরু স্বীয় বিক্রমে বিদ্রোহী ভরতপুর-রাজকে সম্রাটের বশে আনয়ন করিয়া দিল্লীশ্বরের অনুগ্রহভাজন হয়। এপর্য্যন্ত সকল সমরক্ষেত্রে সমরু সস্ত্রীক গমন করিত। কিন্তু এই যুদ্ধের পর সমরু সম্রাটের গোলন্দাজ এবং মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্যদলের

অধিনায়কত্ব লাভ করিয়া একস্থানে স্থায়ী হয়। সম্রাট এই বিপুল বাহিনী পোষণের জন্য তাহাকে মীরাটের অন্তর্গত সার্দ্ধানা পরগণা ও তৎসংলগ্ন জমীজরাৎ অর্থাৎ বার্ষিক ৬ লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর দান করেন। জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া সমরু জীবনের অবশিষ্টকাল সুখশান্তি ও আরামে অতিবাহিত করে। বেগম স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে এবং রূপলাবণ্যে সমরুকে এরূপ করায়ত্ত করিয়া লয় যে একে একে সকল ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে থাকে। মুগ্ধ সমরু তাহাতে দ্বিরুক্তি করিতে পারে নাই। পরে সমরুর মৃত্যু হইলে তাহার প্রথম পক্ষের পুত্র বর্ত্তমান থাকিতেও নিঃসন্তান বেগম আইনানুসারে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া সৈন্য পরিচালনার ভার পর্য্যন্ত স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৭৭৮ অব্দের মে মাসে সার্দ্ধানার জায়গীরদার এবং আগ্রার শাসনকর্ত্তা সমরুর মৃত্যু হয় এবং আগ্রার ক্যাথলিক সমাধিক্ষেত্রে একটী সুদৃশ্য অষ্টকোণ গৃহে তাহার দেহ মহাসমারোহে সমাধিস্থ হয়। ইহার পর সমরুর য়ুরোপীয় ও দেশীয় কর্ম্মচারী এবং সৈন্যগণের প্রার্থনায় সম্রাট আগ্রায় বেগমের অভিষেককার্য্য সমাধা করিতে আদেশ দেন। ইহার তিন বৎসর পরে বেগম রেভারেণ্ড গ্রেগোরিও কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া "জোআন্না নোবিলিস" নাম প্রাপ্ত হন এবং আগ্রা হইতে সার্দ্ধানায় আসিয়া প্রজাশাসনে মনোনিবেশ করেন। বেগমের সপত্নীপুত্র নবাব জাফর ইয়ার খাঁও খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ওয়ালটার ব্যালথাজার রেণার্ড নাম গ্রহণ করে।

এই সময় জর্জ্জ টমাস নামে জনৈক সমরকুশল আইরিষ নানা স্থান ঘুরিয়া সার্দ্ধানায় আসিয়া উপস্থিত হইলে বেগম তাহাকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। টমাসের অধীনে সমরুর সুশিক্ষিত সেনাদল অধিকতর দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। বেগম এখন হইতে বর্দ্ধিত হারে স্বীয় সেনাদল ভাড়া দিয়া প্রকৃতই সামরিক ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। তাঁহার রণপ্রিয় সৈন্যগণ দাক্ষিণাত্যে, পঞ্চনদ প্রদেশে, রোহিলখণ্ডে, অযোধ্যায় এবং রাজপুতানা প্রভৃতি যে যে স্থানে যায় তথায় অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়া একদিকে যেমন বেগমসমরুর নামে সর্ব্বত্র ভীতি সঞ্চার করে, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় শক্তিসমূহকে য়ুরোপীয় সমরপ্রণালীর পক্ষপাতী করিয়া তুলে।

১৭৮৭ অব্দে সাহারাণপুরের নবাব গোলাম কাদির বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী আক্রমণ করে এবং দুর্গরক্ষক মহারাষ্ট্র সৈন্যগণকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া সম্রাটকে বন্দী করে। বেগমসমরু তখন শিখ আক্রমণ হইতে সম্রাটকে রক্ষা করিবার জন্য পানিপথে সৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন; কিন্তু দিল্লীশ্বরের আসন্ন বিপদের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ প্রাসাদের লাহোর দ্বারে শিবির সন্নিবেশ করিয়া থাকেন। বিদ্রোহী গোলাম কাদির প্রথমে বেগমকে বহু অনুনয় বিনয় করিয়া পরে উভয়ের মধ্যে সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া লইবার প্রলোভন দেখাইয়া অকৃতকার্য্য হইলে উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু নির্ভীক নারীর অটল প্রতিজ্ঞা, অসীম সাহস দেখিয়া এবং তাঁহার সৈন্যগণের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া গোলাম কাদির রণে ভঙ্গ দিয়া যমুনার পরপারে পলায়ন করে। বৃদ্ধ সম্রাট সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া বেগমকে "সাম্রাজ্যের প্রিয়পুত্রী" উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করেন। পর বৎসর সম্রাট গোকুলগড়ের দুর্গাধিপ নজফ কুলিখাঁর বিদ্রোহ দমন করিতে বেগমসমরু ও তাঁহার সেনাদলসহ গমন করেন। এখানে একদা প্রত্যূষে সম্রাটকে অসতর্ক অবস্থায় পাইয়া বিদ্রোহিগণ হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করে। প্রত্যুৎপন্নমতি বেগম নিমেষের মধ্যে সপরিবারে সম্রাটকে স্বীয় শিবিরে আনয়ন না করিলে তাঁহারা শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া প্রাণ হারাইতেন। অতঃপর সম্রাটকে নিরাপদ করিয়া বেগম অবিলম্বে রণক্ষেত্রে গিয়া বর্দ্ধিত উৎসাহে সৈন্য পরিচালনা করেন এবং যতক্ষণ না বিদ্রোহীদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও দুর্গ অধিকৃত হয় ততক্ষণ তথায় উপস্থিত থাকেন। যুদ্ধাবসানে সম্রাট প্রকাশ্য দরবার করিয়া প্রাণ এবং মান রক্ষার জন্য বেগমসমরুকে ধন্যবাদ দেন এবং "জেব উন্নিসা" অর্থাৎ "রমণী জাতির গৌরব" এই উপাধিসহ সম্মানসূচক রাজপরিচ্ছদ ও দিল্লীর দক্ষিণে যমুনাতীরস্থ বাদশাপুর নামক সুবিস্তৃত পরগণা পুরস্কার দান করেন। এই সময়ে (১৭৯০ অব্দে) বেগম যখন মথুরায় সম্রাটসৈন্যশিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন তখন একদিন সংবাদ আসিল যে তাঁহার দুই ক্রীতদাসী আগ্রার প্রাসাদে অগ্নি সংযোগ করিয়াছে। প্রাসাদে তাঁহার বিস্তর ধনরত্ন রক্ষিত ছিল এবং তাঁহার

প্রধান কর্মচারীদিগের স্ত্রী পুত্র পরিবার বাস করিতেছিল। যাহা হউক, সময়ে প্রতিকার হওয়ায় ধন ও জীবন রক্ষা পায়। দাসীদ্বয় ধৃত হইয়া মথুরায় বেগম সমীপে নীত হয়। বিচারে তাহাদের দোষ প্রমাণিত হইলে বেগম তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করিয়া জীবিতাবস্থায় প্রোথিত করিতে আজ্ঞা দেন। কাহারও মতে, শুদ্ধ ইহাতেই তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই, বেগম স্বীয় শয়নকক্ষে দাসীদ্বয়ের জীবন্ত কবর দিয়া তদুপরি সমস্ত রাত্রি শয়ন করিয়া থাকেন। রমণীর এই প্রতিহিংসা-পরায়ণতা এবং নিষ্ঠুরাচার অমার্জ্জনীয়। পাটনায় যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড সমরু সাহেবের চরিত্র চিরকলঙ্কিত করিয়াছিল, মথুরায় এই ঘটনা বেগমসমরুর জীবনেও চির অপযশের কলঙ্করেখা অঙ্কিত করিয়া দিল। কিন্তু তাঁহার জীবনীলেখক অনেক যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া এই কলঙ্কমোচনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ—

"* * * It is to be borne in mind, that among natives, there is no particular mode of execution prescribed for those who are condemned to die; and in the present instance, the criminals being women, burying alive was deemed a decent mode of carrying the sentence into execution. Their punishment was not greater than the crime deserved, and the occasion demanded." (Sirdhana—Pages 10-11).

বলা বাহুল্য জীবনীকার জনৈক য়ুরোপীয় খৃষ্টান। সে যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উক্ত ঘটনার পাঁচ বৎসর পরেই বেগমকে বিধাতার অদ্ভুত বিধানে এই পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। যতই দিন যাইতে লাগিল বেগমের সৈন্যগণ ততই ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার পরিচয় দিতে লাগিল। সুতরাং বেগমের পুনরায় বিবাহ করাই যুক্তিসঙ্গত স্থির হইল। জেবউন্নিসা তখনও তরুণী। তাঁহার সেনাপতি জর্জ্জ টমাস তাঁহার পাণিপ্রার্থী, কিন্তু লি ভেসো নামক জনৈক সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশীয় সুপুরুষ ফরাসী কর্ম্মচারী বেগমের হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইল। উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে কিছু দিন বহু বিবাদ বিসম্বাদের পর জর্জ্জ টমাস কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গেল। লি ভেসো সেনাপতির পদ অধিকার করিলেন। ১৭৯৩ অব্দে মুস্যো স্যালুর এবং বার্ণিয়ারের সমক্ষে যাজক গ্রেগোরিও কর্ত্তৃক লি ভেসোর সহিত বেগমের বিবাহ রেজিষ্ট্রী হইয়া গেল। সাধারণে তখন তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না কিন্তু ক্রমে এই ব্যাপার প্রকাশ পাইলে নবদম্পতি সৈন্যগণের চক্ষুঃশূল হইলেন। তাহারা ভাবিল এই বিবাহের পরিণামে সমরুর গৌরব লোপ পাইবে এবং তাহাদের ভরণপোষণের জন্য নির্দ্ধারিত জায়গীর বিদেশীয়ের হস্তগত হইবে। এদিকে লি ভেসোর দাম্ভিকতা এবং বংশমর্য্যাদার গর্ব্ব অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের আক্রোশ বৃদ্ধি করিল। তাহারা সমরুর পুত্র জাফর ইয়ার খাঁ ওরফে ব্যালথাজার রেণার্ডের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। এই সময় লি ভেসো ব্রিটিস রাজ্য দিয়া চন্দননগরে গমন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া গবর্ণর জেনারেল সার জন শোরকে পত্র লেখেন; এদিকে বেগম স্বীয় অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটময় এবং কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সিন্ধিয়ার হস্তে শাসন-ভার দিয়া লি ভেসোর সহিত গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ কিন্তু কোন সূত্রে এই গুপ্তসংবাদ পাইয়া প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং দিল্লী হইতে আসিয়া পৈতৃক জমীদারী অধিকার করিবার জন্য সমরুর পুত্রকে আহ্বান করিল।

বেগম সেইদিন প্রাসাদের এক গুপ্তদ্বার দিয়া রজনীর ঘোর অন্ধকার পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি পাল্কীতে, লি ভেসো অশ্বারোহণে। স্বামীর হস্তে পিস্তল, পত্নীর করে শাণিত ছোরা। উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে একজনের মৃত্যু হইলে অন্য জন আত্মঘাতী হইবে। আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী, রত্নসম্ভার ও দাসদাসী সঙ্গে করিয়া তাঁহারা ৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন এমন সময় ফরাক্কাবাদের পথে কার্চ্চা নামক স্থানে পৌছিতে না পৌছিতে বিদ্রোহীদিগের অশ্ব-খুরধ্বনি শ্রুত হইল। বেগমের বুঝিতে আর বাকি রহিল না। তিনি প্রস্তুত হইলেন। নরপিশাচগণ ভীষণ ঝড়ের ন্যায় আসিয়া পড়িল। তাহাদের গুলির আঘাতে কয়েকজন অনুচর মৃত হইল। কিন্তু সেই শব্দে স্বামী আত্মঘাতী হইয়াছেন ভাবিয়া বেগম স্বীয় বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিলেন। তাঁহাকে রক্তাক্তকলেবর এবং সংজ্ঞাহীন দেখিয়া পরিচারিকাগণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। শত্রুদল-বেষ্টিত লিভেসো উন্মত্তের ন্যায় ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচারিকাগণ বলিল বেগম আত্মঘাতিনী হইয়াছেন। লি ভেসো পুনরায় ঐ প্রশ্ন করিলেন, তাহারা পুনরায় ঐ

উত্তর দিল এবং বেগমের রক্তাক্ত রুমাল দেখাইয়া দিল। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া মুখের মধ্যে পিস্তল ছুঁড়িলেন। গুলি তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া গেল। লি ভেসোর বিশাল দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইল। নরপিশাচগণ সেই মৃতদেহের যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিয়া বেগমকে লইয়া সার্দ্ধানায় ফিরিল। দম্পতির পূর্ব্বচুক্তি অনুসারে লি ভেসোর জীবন নাটকের শেষ অঙ্ক এইরূপে অভিনীত হইল বটে কিন্তু জেবউন্নিসার পরমায়ু তখনও শেষ হয় নাই। অস্ত্রাঘাত মাত্রেই তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু ছোরা তাঁহার বক্ষের অস্থিভেদ করিতে পারে নাই, দুর্বৃত্তগণ এক্ষণে তাঁহার বিনাশের নূতন উপায় উদ্ভাবন করিল। তাহারা তাঁহাকে প্রাসাদপ্রাঙ্গণে এক প্রকাণ্ড কামানে বাঁধিয়া রাখিল। এদিকে জাফর ইয়াব খাঁ, নবাব মজফ্‌ফর-উদ্দৌলা নামে জায়গীরে অভিষিক্ত হইল।

বেগম রৌদ্রের তাপে, হেমন্তের শিশিরে, অনাহারে এবং পিপাসায় জর্জ্জরিত হইয়া দিবারাত্রি সেই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পড়িয়া রহিলেন। পরে দুর্বৃত্তগণ তাঁহাকে অতি জঘন্য এবং অত্যল্প উচ্ছিষ্ট আহার দিতে লাগিল। কয়েকদিন পরে মন্সো স্যালুর এই পৈশাচিক অত্যাচার দেখিতে না পারিয়া জর্জ্জ টমাসকে সমস্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। বেগমও কোন প্রকারে সিন্ধিয়া এবং দিল্লীর মহারাষ্ট্র শাসনকর্ত্তাকে স্বীয় উদ্ধারের জন্য সংবাদ দিলেন। টমাস ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাকিলেও বেগমের দুর্দ্দশার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। সুতরাং এই অমানুষিক অত্যাচারকাহিনী অবগত হইয়া এবং তজ্জন্য পরোক্ষভাবে নিজেই অনেকটা দায়ী মনে করিয়া মর্ম্মাহত এবং স্তম্ভিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহীদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "শারীরিক বা মানসিক কষ্টে বেগমের মৃত্যু হইলে সম্রাট সৈন্যগণকে বরখাস্ত করিয়া জায়গীর ফিরাইয়া লইবেন।" এদিকে দিল্লীর মহারাষ্ট্র শাসনকর্ত্তার আদেশে টমাস সসৈন্যে সার্দ্ধানা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সিন্ধিয়াও বিদ্রোহীদিগকে ভয় প্রদর্শন ও তিরস্কার করিয়া পত্র লিখিলেন। ইতিপূর্ব্বেই চরিত্রহীন মূর্খ ও বিলাসী নবাব মুজফ্‌ফরউদ্দৌলার অল্পদিনের শিথিল ও ব্যর্থ শাসনে সকলে বিরক্ত হইয়াছিল; এক্ষণে টমাসের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই অনেকে বেগমের পক্ষ অবলম্বন করিল। টমাস আসিয়াই জাফর ইয়াবকে বন্দী করিলেন এবং অবিলম্বে একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিত হইল, এবং ত্রিশজন প্রধান প্রধান য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী সর্ব্বতোভাবে বেগমের বাধ্য হইবে এবং অপর কাহারও অধিনায়কত্ব স্বীকার করিবে না বলিয়া ঈশ্বর ও যীশুখৃষ্টের নামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিল। সিন্ধিয়ার পক্ষ হইতে জনৈক প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিয়া বেগমের অভিষেককার্য্য সম্পন্ন করিল। সিন্ধিয়া এ জন্য দেড় লক্ষ টাকা বেগমের নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন এবং জর্জ্জ টমাস বেগমের প্রধানা সখী মেরিয়া নাম্নী জনৈক সুন্দরী ফরাসী যুবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। বেগম তাঁহাকে বহুমূল্য যৌতুক দান করিলেন। বেগম স্বীয় উদ্ধারের অন্যতম কারণ মন্সো স্যালুরকে সেনাপতি পদে বরণ করিলেন। বন্দী নবাব দিল্লীতে বেগমের এক কুঠীতে বন্দী হইয়া রহিল, এবং তথায় আট বৎসর পরে হঠাৎ বিসূচিকা রোগে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

জায়গীর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বেগম আর কখনও কোন প্রকার দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেন নাই। অতঃপর যাহাতে স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শৃঙ্খলার সহিত প্রজাপালন, সৈন্যপোষণ ও রাজকার্য্য পরিচালন করিতে পারেন তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিলেন। ১৮০০ অব্দে বেগম হিন্দুস্থানের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা সিন্ধিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও সম্মান প্রদর্শন করিতে আগ্রা গমন করেন। সিন্ধিয়া বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার অধিকার সুদৃঢ় করিয়া দেন এবং শিখদিগের আক্রমণ হইতে পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ভার অর্পণ করেন। দুই বৎসর পরে আসাইএর যুদ্ধ হইলে বেগম সসৈন্যে সিন্ধিয়ার সাহায্যার্থ সমরক্ষেত্রে গমন করেন। যদিও ঐ যুদ্ধে ইংরাজের জয় হয় তথাপি একমাত্র তাঁহারই সেনাদল অমিত সাহস এবং বিক্রম প্রকাশ করিয়া অক্ষত ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই যুদ্ধের পর বেগমের সহিত ইংরাজের সন্ধি স্থাপিত হয়। তদনুসারে বেগম আজীবন ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিতে এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রতিশ্রুত হন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বেগম যে সময় খণ্ড রাজ্যগুলি লোপ প্রাপ্ত হইতে ছিল সেই সময় স্বীয় অধিকার ও ক্ষমতা এইরূপে সুদৃঢ় করিয়া লইলেন। সন্ধির পর বেগমকে একবার মাত্র ইংরাজকে

সাহায্য করিতে হইয়াছিল। ১৮২৫ অব্দে ভরতপুরের যুদ্ধ হয়। বেগম লর্ড লেকের সাহায্যার্থ সসৈন্যে রণক্ষেত্রে গমন করেন। উহাই তাঁহার শেষ যুদ্ধযাত্রা। ঐ যুদ্ধে জয়লাভের পর গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য দরবারে বেগমকে তাঁহার সাহস ও অস্ত্রসাহায্যের জন্য ধন্যবাদ ও সম্মান দান করেন।

প্রবলশক্তি ইংরাজের বন্ধুত্ব লাভ এবং স্বরাজ্যে শান্তি স্থাপন করিবার পর বয়োবৃদ্ধি সহকারে বেগম ধর্ম্মানুশীলন এবং পরহিত সাধনে অগ্রসর হইলেন। তখন ক্যাথলিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিস্তার, পরিপুষ্টি এবং সাহায্যদান প্রধান লক্ষ্য হইল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দুধর্ম্মের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম যে সে সময় প্রবেশলাভ করিতে পারিয়াছিল তাহা কেবল প্রবলপ্রতাপান্বিত বেগম সমরুর যত্নে ও অর্থে। মার্শম্যান, কেরী ও ওয়াডের জীবন চরিতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সে সময় রোমের পোপ সাদ্ধানার মিশনকে হিন্দুস্থানে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। সাদ্ধানার যাজকগণের মধ্যে ডিউস্‌ডেভিট্‌, পেট্রোনী এবং জুলিয়স সীজর, সর্ব্বপ্রধান এবং বিখ্যাত ছিলেন। বাইবেল গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ, হিন্দীভাষায় খৃষ্টধর্ম্মপ্রতিপাদক গ্রন্থরচনা এবং উক্ত সাম্প্রদায়িক বিবিধ গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ দ্বারা হিন্দুস্থানে যে খৃষ্টধর্ম্ম ও সাহিত্যের বহু প্রচার হয়, হিন্দী ভাষায় সুপণ্ডিত মন্সো পেট্রোনীই তাহার মূল। বেগম এতদর্থে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি তিব্বতীয় ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকগণকে স্বীয় প্রাসাদে স্থানদান করিয়াছিলেন এবং সাদ্ধানার সুবিস্তীর্ণ খৃষ্টানপল্লীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্থানীয় খৃষ্টানগণের উপাসনার জন্য যে প্রকাণ্ড এবং অতি সুন্দর ভজনালয় সাদ্ধানার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে তাহার নির্ম্মাণকার্য্যের ভার মেজর রেঘসিনী নামক জনৈক ইতালীয় কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পিত হয়। বেগম তদর্থে চারি লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। নানা প্রকার বহু মূল্য এবং বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত প্রস্তরে এই বিরাট মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহার অভ্যন্তরে জয়পুরের শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত সুউচ্চ বেদী এবং যাঁহার পবিত্র নামে ভজনালয় উৎসর্গিত, ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সেই পরমারাধ্যা দেবী ম্যাডোনার অপরূপ মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। মন্দিরের তত্ত্বাবধান ও জীর্ণ সংস্কারের জন্য বেগম স্বতন্ত্র এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তিনি দেশীয় যাজকদিগের ধর্ম্মশিক্ষার্থ সাদ্ধানার কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য এক লক্ষ টাকা এবং স্থানীয় দরিদ্র নরনারীর জন্য সাহায্যভাণ্ডার সংস্থাপনার্থে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন। কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, আগ্রা এবং মীরাটের খৃষ্টধর্ম্মালয়ের সাহায্যার্থে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা; রোমের পোপকে উপযুক্ত পাত্রে বিতরণ করিবার জন্য দেড় লক্ষ টাকা এবং ক্যাণ্টারবারির আর্ক-বিশপকে তদর্থে অর্দ্ধ লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দেন। কলিকাতায় যাহারা ঋণের দায়ে কারাবাস করিতেছিল তাহাদের মধ্যে প্রকৃত কৃপাপাত্রগণের উদ্ধারার্থ এবং গরীবসেবার জন্য অর্দ্ধ লক্ষ টাকা দান করেন। এইরূপে তিনি দেবসেবা ও মানবসেবায় এক কালীন প্রায় সার্দ্ধ ছয় লক্ষ টাকা দান করেন। ভজনালয় প্রতিষ্ঠার পর বেগম সাদ্ধানার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ঐ প্রাসাদ কুঠী দিলকুষা নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রাসাদে এখনও বহুমূল্যবান দ্রব্য রক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বেগমের অমাত্য ও পারিষদগণের অনেক সুন্দর তৈলচিত্র আছে। বেগম দিল্লী এবং মীরাটেও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার দিল্লীস্থ প্রাসাদে এক্ষণে দিল্লী ও লণ্ডন ব্যাঙ্ক অবস্থিত। মীরাটে ক্যাথলিক সৈন্যদিগের যে সুন্দর ভজনালয় আছে তাহাও বেগম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে সেতু, গমনাগমনের পথ প্রভৃতি নানা জনহিতকর কার্য্যে বেগম সমরুর নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। তাঁহার শাসনাধীন প্রজাবর্গের সাহায্যার্থে তাঁহার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। তাঁহার অধিকার মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। কোন দুর্দ্দান্ত জমীদার তাঁহার বিরুদ্ধে কখন অস্ত্রধারণ করিতে বা তাঁহার প্রজাপীড়ন করিতে সাহসী হয় নাই। বর্ত্তমান বৃটিশশাসনে প্রজাপুঞ্জ যেমন নির্ভয়ে নিদ্রা যায় বেগমের শাসনাধীন প্রজাগণ সেই শান্তি ভোগ করিত। অধিকন্তু অতিরিক্ত করভারে তাহারা প্রপীড়িত হইত না এবং অনাবৃষ্টির বৎসর কৃষকগণ প্রচুর শস্য ও অর্থদাদন পাইত। তাঁহার রাজ্যে অন্তর্বাণিজ্য বিস্তারলাভ করিয়াছিল এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইয়াছিল। বেগম শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও বেগম জাতীয় সংস্কার, জাতীয় বেশভূষা এবং দেশীয় আচার

ব্যবহারের অনুরাগিণী ছিলেন। তিনি সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিতেন বটে কিন্তু পাল্কীর ভিতর থাকিয়া তাহাদের আদেশ ও উৎসাহ দান করিতেন। স্বীয় প্রাসাদে তিনি পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকের মত থাকিতেন এবং অবগুণ্ঠিতা হইয়া দরবারে আসিয়া পর্দ্দার অন্তরাল হইতে সর্ব্ববিধ রাজকার্য্য সমাধা করিতেন। বার্দ্ধক্যে ইহার অন্যথাচরণ করিলেও এবং বড় লাট প্রধান সেনাপতিপ্রমুখ প্রধান প্রধান ইংরাজ রাজপুরুষকে নিমন্ত্রণ ও তাহাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেও তিনি আহার, বেশভূষা ও রীতিনীতির কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই।

১৮৩৬ অব্দের ২৭ জানুয়ারী (প্রায় ৮৬ বৎসর বয়সে) বেগমের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে রোমের পোপ (Pope Gregory the XVI) বেগমের প্রতি স্নেহ ও বাৎসল্যের নিদর্শন স্বরূপ পত্র সহ বহু খৃষ্টীয় সাধু সন্ন্যাসীর স্মৃতি-নিদর্শনসম্বলিত দুইটী reliquaries (সাধু সাধ্বীদিগের দেহাবশেষ রক্ষার্থ পাত্র) ও বিবিধ মূল্যবান দ্রব্য পাঠাইয়া দেন। দীনবৎসলা বেগমের মৃত্যুতে তাঁহার রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল এবং তাঁহার সমাধিক্ষেত্র সহস্র সহস্র নরনারীর অশ্রু জলে সিক্ত হইয়াছিল। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে বড় লাট লর্ড উলিয়ম বেনটিঙ্ক বিলাত প্রত্যাগমন কালে বেগমকে যে পত্র লিখিয়া যান তাহা তাঁহার প্রজারঞ্জকতা, বদান্যতা এবং দীনবৎসলতার অন্যতম প্রমাণ। বড় লাট বাহাদুর লিখিয়াছিলেন:

"MY ESTEEMED FRIEND,

I cannot leave India without expressing the sincere esteem I entertain for your Highness's character. The benevolence of disposition and extensive charity which have endeared you to thousands have excited in my mind sentiments of the warmest admiration, and I trust that you may yet be preserved for many years, the solace of the orphan and widow, and the sure resource of your numerous dependants. To-morrow morning I embark for England, and my prayers and best wishes attend you, and all others who like you, exert themselves for the benefit of the people of India.

I remain,
With much consideration,
Your Sincere Friend,
M. W. BENTINCK.

CALCUTTA,
March 17th, 1835

এই অসাধারণ রমণীর জন্ম ও জীবন যেরূপ অপূর্ব্ব রহস্যময়, এক অলৌকিক ঘটনা তদ্রূপ তাঁহার মৃত্যুকেও চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ১৮৩১ অব্দে বেগম কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। এমন সময় মীরাটের প্রসিদ্ধ ফকীর সাফির শা সার্দ্ধানায় আগমন করেন। তিনি দেখেন রাজময় একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে, বেগম শয্যাগতা হইয়া আছেন; সকলেই তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছে। সাফির শা স্বয়ং অতি বৃদ্ধ এবং পীড়িত ছিলেন। এক্ষণে মীরাট হইতে সার্দ্ধানা পর্য্যন্ত পদব্রজে আগমন করায় তাঁহার শরীর এমনই ভগ্ন হইয়া পড়িল যে তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে স্বীয় অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিতে লাগিলেন। অতঃপর সাফির শা লোকমুখে বেগমকে বলিয়া পাঠাইলেন "আয়ে তেরে, চলে হাম" অর্থাৎ মৃত্যু তোর জন্যই আসিয়াছিল কিন্তু আমিই চলিলাম। এদিকে সাফির শার নিকট যাহারা উপস্থিত ছিল তাহাদিগকে তিনি বলিলেন যে "ঠিক আর পাঁচ বৎসর পরে বেগমের মৃত্যু হইবে।" এই বলিয়া ফকীর গত হইলেন। কিন্তু এই কথা মুহূর্ত্ত মধ্যে চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বেগম সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। তিনি ফকীরের জন্য সার্দ্ধানায় এক সুন্দর সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তদবধি সাফির শা সিদ্ধ পীরের শ্রেণীভুক্ত হইলেন এবং তাঁহার কবর মুসলমান সম্প্রদায়ের একটী পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়। আজিও অনেক মুসলমান নরনারী উক্ত ফকীরের নাম ভক্তিভরে গ্রহণ করে এবং পীড়িত জনের আরোগ্য কামনায় সার্দ্ধানায় এই কবরস্থানে আসিয়া মানত করে ও পূজা দিয়া থাকে। কথিত আছে ঠিক পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার দিবস প্রাতে বেগমের মৃত্যু হয়।*

বেগমের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৩৯ অব্দের ২৭এ জানুয়ারী রোম নগরের প্রসিদ্ধ সান কার্লোর (San Carlo) জমকাল ধর্ম্মমন্দিরে রাজ্ঞীর পদোচিত সমারোহ সহকারে এক বিরাট শোক সভা হয়। সভাগৃহ সময়োচিত উপকরণ ও সাজসজ্জায় সুশোভিত হয় এবং তাহার মধ্যস্থলে মৃত বেগমের একটি স্মৃতিস্তম্ভ সংস্থাপিত হয়। রোম নগরস্থ ইংরাজী কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ডাক্তার

* Punjab Notes & Queries, Vol. III. Page 107.

ওয়াইজম্যান উক্ত সভায় যে সুদীর্ঘ শোকসূচক বক্তৃতা করিয়াছিলেন তৎপ্রসঙ্গে তিনি উপস্থিত শত শত রোমীয় নরনারীর সমক্ষে ভারতের এই অসাধারণ শক্তিশালিনী রমণীর গুণগ্রামের পরিচয় দিয়া রোম নগরে এরূপ বিরাট সভার প্রয়োজন ও ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় তাঁহার নিকট কতদূর ঋণী তাহা বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন :—

"The Princess, whom we commemorate at God's altar, was powerful in her day; she ruled her dominions with more than woman's arm; she feared not the turmoils and dangers of war, she guided with skill the arduous counsels of peace; by many she was beloved, by others feared."

বেগম সমরুর স্মৃতিস্তম্ভ ভারতের একটী দর্শনীয় বস্তু। উহা ইতালীর উৎকৃষ্ট শিল্পিগণের দ্বারা করারা মর্ম্মর প্রস্তরে রোম নগরে নির্ম্মিত হয় এবং ১৮৪২ অব্দে অর্থাৎ বেগমের মৃত্যুর ছয় বৎসর পরে সাদ্ধানার প্রাসাদে সংরক্ষিত হয়। স্তম্ভশীর্ষে বৃদ্ধা বেগম সমরু দেশীয় পরিচ্ছদে সিংহাসনে বসিয়া স্বীয় অসীম সাহস, ধৈর্য্য, বীর্য্য ও রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ সম্রাট সাহ আলম প্রদত্ত সাদ্ধানার সনন্দপত্র দক্ষিণ করে ধারণ করিয়া আছেন। দক্ষিণে তাঁহার প্রপৌত্র এবং উত্তরাধিকারী মিষ্টার ডাইস সম্বার বিষণ্ণ বদনে দণ্ডায়মান; বামে মন্ত্রী দিবান রায় সিংহ। পশ্চাদ্‌ভাগে একদিকে বিশপ জুলিয়াস সীজর ও অপরদিকে বেগমের এডিকং এবং অশ্বারোহী সেনাপতি ইনায়ৎউল্লা। নিম্নে স্তম্ভগাত্রে উদ্গত খোদকারা কার্য্যের তিনখানি শিলা ফলক আছে। তাহাতে বেগমের জীবনের প্রধান প্রধান তিনটি ঘটনার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সম্মুখের ফলকে সাদ্ধানার ভজনালয় প্রতিষ্ঠাকালীন দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রধান যাজক স্বীয় পদোচিত পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া ডীকন, সবডীকন প্রমুখ পুরোহিতমণ্ডলী মধ্যে বসিয়া আছেন এবং বেগম স্বীয় প্রধান য়ুরোপীয় কর্ম্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ভজনালয়ের ব্যবহারোপযোগী বহুমূল্য বস্ত্র সহ সুবর্ণময় পানপাত্র তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। দক্ষিণের ফলকে বেগম কিরূপ দরবার করিতেন তাহার দৃশ্য এবং বামদিকের শিলাফলকে বিজয়োৎসবের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শেষ চিত্রে বেগম হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মহাসমারোহে সসৈন্যে নগর পরিভ্রমণ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত উহাতে মর্ম্মর প্রস্তরের ছয়টী রূপকমূর্ত্তি সংলগ্ন আছে। ডাইস সম্বারের মূর্ত্তির ঠিক নিম্নে মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা ও সাহস; নিঃশঙ্ক হৃদয়ে এবং দৃঢ়ভাবে সিংহের পৃষ্ঠে এক পদ রাখিয়া দণ্ডায়মান। তন্নিম্নে এক অবগুণ্ঠনবতী দক্ষিণ করে সর্প ধারণ করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন; ইনি প্রজ্ঞার প্রতিমূর্ত্তি। তৎপার্শ্বে কালের প্রতি-মূর্ত্তি এক স্বর্গীয় দূত বাম হস্তে নিঃশেষিতবালুকা একটী ঘটিকা যন্ত্র (hourglass) উত্তোলন করিয়া বেগমকে দেখাইতেছে এবং দক্ষিণ করে একটি মশাল নিবাইবার ছলে জীবনদীপ নির্ব্বাণের ইঙ্গিত করিতেছে। স্তম্ভের বাম পার্শ্বে প্রথমে মাতৃমূর্ত্তি অসীম স্নেহে শিশুকে অতি যত্নে বুকের মধ্যে ধরিয়া আছে এবং একটী বালক প্রতিদানে মাতৃভক্তির চিহ্নস্বরূপ একটী আপেল ফল জননীকে অর্পণ করিতেছে। দ্বিতীয় প্রাচুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি; বিবিধ ফলপুষ্প গোধূম ধান্যাদির শীষপূর্ণ লক্ষ্মীর আড়ী (cornucopia) ধারণ করিয়া ফুল্লারবিন্দমুখী লক্ষ্মীস্বরূপিণী, বেগমকে একটী ফুলের তোড়া উপহার দিতেছে এবং তৎ-পার্শ্বে স্তম্ভপাদমূলে বিষাদ যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া বসিয়া আছে। সকল মূর্ত্তিগুলিই প্রমাণ ও পূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট। সুতরাং স্তম্ভটি প্রায় দ্বাদশ হস্ত পরিমিত।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

বঙ্গদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা।

বঙ্গদেশে বর্ত্তমান কালে এক নূতন ভাবস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাচীন কালের শান্তি সন্তোষ ও জড়তাময় জীবনযাত্রার প্রণালী এখন অতীতের রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। তাহার স্থানে বর্ত্তমান কালের অশান্ত, অসন্তোষপূর্ণ, উৎসাহ ও উদ্বেগযুক্ত জীবন আসিয়াছে। বাঙ্গালী এখন আর তাহার পূর্ব্বের মোটা ভাত কাপড়ে সন্তুষ্ট নহে। ইংরাজি শিক্ষা যে বিলাসস্রোত আনিয়াছে, তাহার ফলে সাংসারিক অভাব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। প্রাচীন ও নবীনের এই সংঘর্ষণে জাতীয় লাভ ও ক্ষতি দুইই হইয়াছে।

ক্ষতি হইয়াছে এই যে জীবন আর পূর্ব্বের মত শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ নহে। সে কবিত্ব সে জড়তাপূর্ণ জীবনযাত্রা আর নাই। কিন্তু লাভও হইয়াছে অনেক। জাতীয় উন্নতির উপাদান যে অসন্তোষ ও সংশয়বাদ তাহা আসিয়াছে। মানুষ যখন নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া পড়ে, তখনই তাহার উন্নতি করিবার চেষ্টা হয়। তখন তাহার সংশয়ও প্রবল হইয়া উঠে, কেহ তাহাকে 'তোমার অবস্থাই ভাল; সংসার অসার; সুখদুঃখ মানসিক বিকারমাত্র' ইত্যাদি দার্শনিক কথা বলিয়া সহজে প্রবোধ দিতে পারে না। এই সংশয়বাদই (scepticism) জ্ঞানোন্নতির প্রথম কারণ। মেঘ হইতে বৃষ্টি কি করিয়া হয় এই কথা অনেকেরই মনে উঠে; কিন্তু যে সহজে বিশ্বাস করে তাহাকে যদি বলা যায় 'ঐরাবত সাগর হইতে জল তুলিয়া আকাশ হইতে ছিটাইয়া দেয়', তাহা হইলে সে তাহাই বিশ্বাস করিবে। তাহার আর সত্যানুসন্ধান করিবার ইচ্ছাই জন্মিবে না। কিন্তু অবিশ্বাসী বা জিজ্ঞাসু ব্যক্তি এত সহজে বিশ্বাস করিতে পারিবে না, সে ভাবিবে আকাশে যে হস্তী জল তুলে তাহার প্রমাণ কি? আর যদি সাগরের জলই তুলে তবে বৃষ্টির জল লোনা হয় না কেন? এই অবিশ্বাসের ভাব হইতেই জ্ঞানান্বেষণের স্পৃহা জন্মে এবং তাহা হইতেই জ্ঞান বৃদ্ধি-লাভ করে।

যে সকল বাঙ্গালী মস্তিষ্কচালনা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, তাঁহারা প্রথমতঃ ইংরাজি শিক্ষা করিয়া চাকরী ও ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। তখনকার কালে যে একটু ইংরাজি শিখিত সেই একটা চাকরী পাইয়া বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিত। ইংরাজ ভারতবর্ষের যেখানেই অধিকার বিস্তার করিয়াছে, সেই স্থানেই বাঙ্গালী ইংরাজের সহকারিতা করিয়া ইংরাজের ও নিজের স্বার্থসাধন করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সময়ের পরিবর্ত্তনে ঘটনাচক্রও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে চাকরীর উপযুক্ত লোক যত জুটিতেছে, চাকরী তত জুটিতেছে না। এইরূপে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের অন্নসংস্থান হইতেছে না। তাহাদিগের জন্য একটা উপায় আবশ্যক। দেশের অশিক্ষিত লোকেরও অন্নকষ্ট উপস্থিত। যদিও ইংরাজ রাজত্বের প্রথমকালে নানা কারণে এদেশের শিল্প লোপ পাইয়াছিল, তাহা হইলেও তখন তাহার কুফল তত প্রখররূপে অনুভূত হয় নাই। তখন দেশে প্রচুর জমী ছিল, যাহাদের শিল্প নষ্ট হইতেছিল তাহারা কৃষিকার্য্যের দ্বারা কোনও রূপে আপনাদের ভরণ-পোষণ করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু এক্ষণে কৃষিকার্য্যের উপযোগী জমী যত আছে, কৃষকের সংখ্যা তাহার তুলনায় অনেক বেশী হইয়াছে। কাজেই জমীর খাজনা হু হু করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। এমন কি গোচারণের জমী পর্য্যন্ত কর্ষিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে সাধারণ প্রজাবৃন্দের অবস্থা বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।

দেশের এইরূপ অবস্থার দিনে জনসাধারণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবিকাবিহীন লোকদিগের যাহাতে অন্ন-সংস্থান হয়, তাহার উপায় বিধানার্থ দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে দেশের লোকের যে বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইবে, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। এই দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারই যে বর্ত্তমান দুরবস্থা হইতে দেশকে মুক্ত করিবার একমাত্র পন্থা তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই দেশীয় শিল্পের কি উপায়ে ও কতদূর উন্নতি হইতে পারে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

এমাসন্ বলিয়াছেন, 'why so hot, my young friend'? দেশী শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াই যাঁহারা ইহাকে সমুন্নত দেখিতে চান, আমরাও তাঁহাদিগকে এমাসনের ভাষায় বলি, 'এত তাড়াতাড়ি কেন?' এই যে ইংরেজের বর্ত্তমান বিরাট শিল্প ও বাণিজ্য তাহাও একদিনে গঠিত হয় নাই। ইহারও প্রথমাবস্থায় কত শোচনীয় দুর্দ্দশা হইয়াছিল, ইতিবৃত্তে তাহার উল্লেখ আছে। আমাদেরও উন্নতিলাভ করিতে যে অনেক সময় লাগিবে এবং অনেকবার বিফলপ্রযত্ন হইবার পর যে আমরা সিদ্ধিলাভ করিব, এই কথাটী মনে রাখিয়াই আমা-দিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতির পথে যে সকল অন্তরায় বিদ্য-মান আছে, তাহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের সম্যক্ সহানুভূতির অভাব একটী প্রধান। দেশের শিশু শিল্পের উন্নতির পক্ষে রক্ষণনীতি (policy of protection) যে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে, ইতিবৃত্তে তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। প্রথম নেপোলিয়নের সময়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ উপলক্ষে

ইংলণ্ড ইউরোপের সহিত বাণিজ্য বন্ধ করে। ইহার ফলে চিনি, সোরা, সোডা প্রভৃতি যে সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সমুদ্রবাণিজ্যদ্বারা ইউরোপে আনীত হইত, তাহা একবারে বন্ধ হইয়া গেল। সোডার অভাবে সাবান ও কাচ হইতে পারিল না; চিনির ও সাবানের অভাবে লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। সোরার অভাবে বারুদ প্রস্তুত হয় না। তখন ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্রের কর্তৃপক্ষীয়গণ রাসায়নিকদিগকে আহ্বান করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে অনুরোধ করিলেন। এই নীতির পরিণাম ফল রসায়ন বিদ্যার ইতিহাসে সম্যক বর্ণিত হইয়াছে। বীট মূল হইতে চিনি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল। এই চিনি এক্ষণে ইক্ষুচিনিকে পরাস্ত করিয়াছে। সোরা প্রস্তুত করিবার জন্য, ফরাসী রাসায়নিকগণ গো ও অশ্বমল গোময় প্রভৃতি পরিত্যক্ত জৈবপদার্থ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সোরা প্রস্তুত করিবার জন্য সোরার চাষেরও (saltpetre plantation) বন্দোবস্ত করিলেন; এবং সোডার অভাব দূরীকরণার্থ সিটিজেন লেব্ল্যাঙ্ক (Citizen Le Blanc) লবণ হইতে সোডা প্রস্তুত করিবার অবিনশ্বর প্রণালী আবিষ্কার করিয়া সোডা ও সাবানের বাণিজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিলেন।

এই রাজকীয় সহায়তা ও রক্ষণনীতির প্রভাবেই জর্ম্মনী শিল্পবিষয়ে এত উন্নতিলাভ করিয়াছে। জাপানী শিল্পও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া শুধু আপনার বলেই উন্নীত হয় নাই। যে সকল জাপানী ছাত্র প্রথমত ইউরোপ হইতে শিল্পশিক্ষা করিয়া আসিয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সাহায্যে নিজের ব্যয়ে ও দায়িত্বে এক কারখানা খুলেন। এই কারখানার দ্রব্যসমূহ, ভাল হউক আর মন্দ হউক গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্রীত হইত। এইরূপে সেই কারখানার উন্নতি হইয়া যখন উহা আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল, তখন তাহার পরিচালনের ভার সাধারণের উপর অর্পিত হইল। ইহার কার্য্যতা দেখিয়া ক্রমশঃ সাধারণ লোকেও নিজেদের ব্যয়ে ঐরূপ কারবার খুলিতে সাহসী হইল।

পরিশেষে বক্তব্য যে এবিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের উদাসীনতা বড়ই দুঃখের বিষয়। ভরসা করি ক্রমশঃ এভাব দূর হইয়া দেশের মহদুপকার সাধিত হইবে।

দেশীয় শিল্পের উন্নতির পথে দ্বিতীয় অন্তরায় ধনিবর্গের নূতন ব্যবসায়ে মূলধন খাটাইতে অনুৎসাহ। ইহাঁদের স্বপক্ষে একটা কথা বলা যাইতে পারে। কোন দেশের লোকেই অনিশ্চিত পথে সহজে যাইতে সম্মত হয় না। কাজেই এদেশের ধনিগণ জমীদারিতে অর্থনিয়োগ না করিয়া অনিশ্চিত ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিবেন কেন? বঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় জমিদারীর সুখ আছে, বোম্বায়ে কিন্তু সে সুখ নাই। এই জন্য বোম্বায়ের ধনিবর্গ জমীদারি না কিনিয়া ব্যবসায় টাকা ফেলেন। আর একটা কথা। বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে অনেকগুলি যৌথকারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; তাহাদের প্রায় সকলগুলিই ফেল হইয়াছে। তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে এই কথাই বুঝা যায় যে দেশীয় শিল্পোন্নতির অন্তরায় ধনিবর্গের অনুৎসাহ ততটা নহে, শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যে সুদক্ষ লোকের অভাব যতটা।

কাজেই দেখা যাইতেছে, এদেশে বহুসংখ্যক শিল্প বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির আবশ্যক। সুখের বিষয় এ বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে নামিবার পূর্ব্বে খুব ভালরূপ মনে রাখিতে হইবে যে এখনকার দিনে জ্ঞানবলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বল। যে দেশের লোকে এই জ্ঞানবল লাভ করিবার জন্য সাধনা করিবে, বিজয়লক্ষ্মী তাহাদিগেরই অঙ্কগত হইবে।

এক্ষণে এদেশে যেরূপ প্রণালীতে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা ঈপ্সিত ফললাভ করিবার পক্ষে বিশিষ্টরূপ অনুকূল নয়। যে সকল ছাত্র এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া বঙ্গসমাজে বড় অপমানিত বোধ করেন এবং জ্ঞানচর্চ্চা অপেক্ষা বিদেশগমনদ্বারা একটা হৈ চৈ করিয়া আপনাদিগকে লোকসমাজে প্রচারিত করাই যাহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই সকল হুজুকপ্রিয় ছাত্রই এক্ষণে বিদেশে শিল্পশিক্ষার্থীগণের প্রধান পাণ্ডা। অবশ্য এই দলের মধ্যে যে দু'একজন প্রকৃত জ্ঞানার্থী ছাত্র নাই এমন নহে। যাহা হউক, এই সকল ছাত্র বিদেশ হইতে একটা কিছু করিবার প্রণালী শিখিয়াই দেশে আসিয়া কারবার খুলিবার চেষ্টা করেন। তাহাদের জ্ঞান 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং'-গোছের হয়। যাহা তাহারা দেখিয়া আসে নাই তাহা আর বুদ্ধি দ্বারা ঠিক করিয়া লইতে পারে না। ঘটনাক্রমে যদি এদেশের

দ্রব্যসমূহের সহিত তাহাদের ব্যবহৃত দ্রব্যসমূহের কোনও পার্থক্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই তাহাদের চক্ষুস্থির হইয়া যায়! এই সকল কারণে দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে বিদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিখিতে পাঠান কর্ত্তব্য।

এখন যাঁহারা বিদেশে ছাত্র পাঠান তাঁহারা বলিতে পারেন যে, "ভাল ছেলে পাই না বলিয়াই আমাদিগকে মাঝারি ছেলে পাঠাইতে হয়। ভাল ছেলেদের এখানেই একটা কাজ জুটিয়া যায়, কাজেই তাহারা বিদেশে যাইতে চাহে না। বাস্তবিক ইহাও একটী উৎকট সামাজিক ব্যাধির লক্ষণ যে, যাহারা চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ভাল হইয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হয় তাহারা দেশে থাকিয়া কোন রকমে ৫০৲ টাকাই হউক বা ১০০৲ টাকাই হউক, চাকুরিতে আয় করিতে পারে; তাহারা এই নির্দ্ধারিত আয় ছাড়িয়া ভাবী উন্নতিকল্পে অগ্রসর হয় না। আবার আমাদের সমাজের ভয়ে ও বাল্যবিবাহগ্রস্ত হইয়া অনেকে যাইতে পারে না।" কথাগুলি সত্য, কিন্তু নিম্নলিখিত দুইটী ব্যবস্থায় অনেকটা সুবিধা হইবে এইরূপ অনুমান হয়। প্রথমতঃ, প্রত্যেক বৃত্তির অর্থ আরও কিছু অধিক হওয়া আবশ্যক। নহিলে যাহাদের ঘরের টাকা খরচ করিবার সামর্থ্য নাই, সেরূপ অনেক কৃতবিদ্য ছাত্র বিদেশগমনে সক্ষম হইবে না। অল্প টাকার অনেকগুলি বৃত্তি অপেক্ষা বেশী টাকার অল্পসংখ্যক বৃত্তি বাঞ্ছনীয়; দুই জন অৰ্দ্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তিকে পাঠান অপেক্ষা একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে পাঠাইলে ভাল হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিলাতের কারখানাওয়ালাদের সঙ্গে এরূপ বন্দোবস্ত করা চাই, যাহাতে তাহারা এই সকল ছাত্রকে কারখানায় কিছুকাল শিক্ষানবীশ রাখিতে সম্মত হয়। বিলাতের শিল্প ও কলা-বিদ্যালয়সমূহে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহা একবারেই কার্য্যকরী নহে---হাতে-কলমে কারখানা হইতে কেহ শিখিয়া আসিলে তবে তাহার দ্বারা কোনও নূতন কারখানা স্থাপিত হইতে পাইল; এখন, সকলেই জানেন কারখানা-ওয়ালারা কিরূপে শিক্ষার্থীদিগকে কারখানায় ঢুকিতে দেয় না। এ বিষয়ে জাপান কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিল দেখা যাউক। জাপান গবর্ণমেণ্ট বড় বড় বিলাতী কারখানা হইতে কোটী কোটী মুদ্রার রণপোত, এঞ্জিন প্রভৃতি লইতে স্বীকার পাইল; সঙ্গে সঙ্গে বন্দোবস্তও হইল সেই সেই কারখানাওয়ালারা গুটীকত নির্ব্বাচিত জাপানী ছাত্রকে কিছুকাল এপ্রেণ্টিস রাখিবে। আমরা এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিলে কোন কোনও ভাল ছেলে বিলাত যাইতে সম্মত হইতে পারে। এ বিষয়ে আমরা ইণ্ডিয়া আফিসের কৃপাকটাক্ষ প্রার্থনা করি। বৎসর বৎসর কত কোটী কোটী টাকার নানাবিধ দ্রব্যজাত ইণ্ডিয়া আফিসের কর্তৃপক্ষীয়-গণ বিলাত হইতে এদেশে আমদানী করেন। তাঁহারা যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অনায়াসেই কারখানাওয়ালা-দের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারেন। প্রবল রাজকীয় সহায়তা ব্যতিরেকে প্রজাবর্গের দুর্ব্বল শক্তি দ্বারা এরূপ মহৎ ব্যাপার সিদ্ধ হওয়া সুদূরপরাহত।

আরও একটী কথা। যে সকল সাধারণ ছাত্র আপাততঃ বিদেশে যাইতেছে, তাহাদের প্রকৃতই শিল্পশিক্ষার প্রতি অনুরাগ আছে কি না, তাহা কতকটা পরীক্ষা করিয়া এবং এদেশেই কতকটা তাহাদিগকে শিখাইয়া পড়াইয়া পাঠান উচিত। বিদেশগমনোন্মুখ ছাত্রদিগকে যদি প্রশ্ন করা যায়, "কি শিখিতে যাইতেছ" তাহার সদুত্তর পাওয়া যায় না। তাহাদের মনের মধ্যে একটা সুনির্দ্দিষ্ট সংকল্প জন্মে নাই। এতদর্থে এদেশে যদি একটা শিল্পকলেজ খোলা হয় তবে বড়ই ভাল হয়। সেই কলেজ হইতে বা অন্য কোনও উপায়ে তাহাদিগকে রসায়ন-বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা, অঙ্কন, উদ্ভিদ-বিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা তাহাদের ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে, তাহার একটা মোটামুটি ধারণা জন্মাইবার জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করা উচিত। এই শিক্ষার পরে তাহারা তাহাদের ঈপ্সিত শিল্পশিক্ষা বিষয়ে আরও কিছু অধ্যয়ন ও পরীক্ষা করুক। অর্থাৎ, যদি সাবান প্রস্তুত তাহাদের শিক্ষণীয় বিষয় হয়, তবে তাহারা এদেশেই সাবান সম্বন্ধে কতকগুলা পরীক্ষা করুক। তাহারা দেখুক যে বিনা সাহায্যে তাহারা কতদূর অগ্রসর হইতে পারে এবং বিদেশ হইতেই বা তাহাদিগকে কি শিখিতে হইবে অথবা যদি তাহারা অন্য কোন বিদ্যা শিখিতে চায় ত তাহা খুব সেকেলে রকমেও এদেশে চলিত থাকিলে, তাহারও প্রক্রিয়া সকল নিজহস্তে করিয়া তাহার দোষ অসম্পূর্ণতা শিখুক।* এই শিক্ষাপ্রণালীর ফল

* গত বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র

খুব ভাল। কারণ নিজেদের চেষ্টায় যে জ্ঞানটুকু লাভ হইবে তাহার মাত্রা যতই কেন কম হউক না, ঐ জ্ঞানলাভার্থ তাহাদের গবেষণাবৃত্তির যে চর্চ্চা হইবে তাহার মূল্য অনেক। এইরূপ শিক্ষার ফলেই তাহারা ভবিষ্যতে নূতন জ্ঞান আহরণে সমর্থ হইবে।

এদেশের যে সকল উৎকৃষ্ট ছাত্র বিদেশে যাইতে পারিবে না তাহাদিগকে একেবারে বাদ দিলে চলিবে না। তাহাদের জন্য কোনও প্রকার শৈল্পগবেষণাবৃত্তির (Technical Research Scholarship) ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৃত্তিধারিগণ এদেশের কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। বৈদ্যাতিক এঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি কয়েকটা কঠিন বিষয় ভিন্ন, বস্ত্ররঞ্জন, চীনাবাসন, সাবান, রং, চর্ম্ম-সংস্কার, সংরক্ষিত খাদ্যদ্রব্য (preserved foods), কাগজ আদি সম্বন্ধে এদেশেও প্রস্তাবিত শিল্পকলেজে অনেক দূর পরীক্ষা করিবার সুবিধা করা যাইতে পারে। ঐ সকল বৃত্তিধারিগণের ইহাই বোধ্য হউক যে, তাঁহারা এতদ্দেশীয় দ্রব্যাদি হইতে এবং যতদূর সম্ভব সহজপ্রণালী দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিতে থাকুন। এইরূপে এদেশে একদল গবেষণাকারী প্রস্তুত হইবে। তাহারা তৎপরে স্বয়ং বিদেশে যাইয়া অথবা বিদেশ হইতে প্রত্যাগত ছাত্রবর্গের নিকট হইতে বিদেশের নবার্জ্জিত বিদ্যার সহিত আপনাদের অর্জ্জিত বিদ্যা মিলাইয়া এদেশের উপযোগী প্রণালীমতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

পরিশেষে দেশীয় শিল্পোন্নতির আর একটী গুরুতর অন্তরায়ের কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সেটী হইতেছে—*আমাদের দেশে সাধারণ বিজ্ঞানচর্চ্চার অভাব* (want of general scientific research)। শিল্প বিজ্ঞানের রাজ্যে আজকাল দৈনন্দিন পরিবর্ত্তন হইতেছে, সামান্য একটী নূতন আবিষ্ক্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পূর্ব্ববর্ত্তী প্রক্রিয়া একেবারে নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে। সুতরাং এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে আমাদের ছাত্রগণ যদি উদ্ভাবিনী শক্তির পরিচয় দিয়া আপনাদের প্রণালীসমূহকে ক্রমাগত উন্নতির দ্বারা নূতনের সমকক্ষ করিয়া রাখিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহারা আজ এত ব্যয় করিয়া যাহা শিখিয়া আসিতেছেন, দুই বৎসর পরে জর্ম্মনী বা আমেরিকায় একটা নূতন আবিষ্কারের ফলে তাহা সমুদয়ই বিফল হইয়া যাইবে।

আধুনিককালের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাগুলি আরও বিশদ ভাবে বুঝা যাইবে।

(১) সকলেই জানেন সোরা হইতে নাইট্রিক এসিড প্রস্তুত হয়। কিন্তু আজকাল তড়িৎ সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন হইতে নাইট্রিক এসিড প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিছু কালের মধ্যে হয় ত এই প্রণালী পুরাতন প্রণালীকে উঠাইয়া দিবে।

'One of the sensations at the International Congress of applied chemistry held in Berlin in 1903 was the announcement made then that the formation of nitrates from the air had been successfully accomplished. . Profs. Birkeland and S. Eyds of Christiania, have devised a process which has proved so efficient in practice that a syndicate has been formed to work it.. . The syndicate has works at Notodden and the daily production amounts to the equivalent of 30 cwt. of pure nitric acid. Extensions of the works are being rapidly carried out. The synthetically produced calcium nitrate is now used in the chemical industry, besides taking the place of chili nitre as a fertiliser.'

The Chemist and Druggist, Dec. 16, 1905.

(২) Brummer Mond & Co. চীনের আলকালির ব্যবসা (alkali trade) কয় বৎসরের জন্য একচেটিয়া

মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "এদেশে শিক্ষা সমাপ্ত না করিয়া বিদেশে হাতখড়ি আরম্ভ করিলে অর্থ ও সময়ের অপব্যয় ত হয়ই, এদেশের অবলম্বিত ক্রমের দোষ ত্রুটি লক্ষ্য করিবারও সুযোগ ঘটে না। ফলে বিদেশে কলা শিক্ষা করিয়া এদেশে আসিয়া সেই কলা নূতন ভাবে শিখিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, এদেশের কোন্ দ্রব্য কোথায় কত পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে জানিয়া গেলে তদনুরূপ শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি থাকে।" (৪৫২ পৃষ্ঠা)। *এই জন্য* এ বৎসর চুয়াল্লিশ জন ছাত্রের শিল্পার্থ বিদেশগমনসংবাদ পড়িয়া তিনি আমাকে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, "কই, এবারেও ত দেশে শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত হইল না।" তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের "নেতা"রা "স্বদেশী" হইলেও বাঙ্গালায় লিখিত কোন কথা মূল্যবান্ মনে করেন না। কোনও ইংরাজী ব্যাকরণ বাঁচাইয়া দু'টা কথা ইংরাজীতে লিখিলে তাহার দাম আছে, কিন্তু অতি বিচক্ষণ লোকেরও বাঙ্গলা কথার দাম নাই। ছেঁড়া কোটের যে সম্মান, মূল্যবান্ ধুতি চাদরের সে সম্মান কেমন করিয়া হইবে বলুন। মোতোদা ও হারোদা নামক যে দু'জন জাপানী ভদ্রলোক সম্প্রতি ভারত ভ্রমণ করিতেছেন, এলাহাবাদে কোন ভদ্রলোক তাঁহাদের নিকট দুঃখ করিয়া বলেন যে, একজন ভারতবাসী জাপান হইতে শিল্প শিখিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাহা কাজে লাগাইতে পারিতেছেন না। তদুত্তরে জাপানী ভদ্রলোকেরা বলেন যে, জাপানে কোন শিল্প শিখিতে যাইবার পূর্ব্বে এদেশে সেই শিল্প যতটা সম্ভব শিখিয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু কে কার কথা শুনে?—প্রবাসী-সম্পাদক।

করিয়া লইয়াছে। সেই কয়বৎসরের পরেও যে কেহ তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিবে এমত তাহারা মনে করে না।

Mr. Burril (United States Consul) then mentions what would need to be done by any manufacturer who desires to compete with Messrs Brunner Mond & Co., and naively remarks that they "would resent any invasion of their monopoly and would employ every means to discourage competition." Examination of the prices he quotes does not reveal an *Eldorado* for competitors.

The Chemist & Druggist, Oct. 14, 1905.

(৩) ইউরোপে কোন দেশে কোটী মুদ্রা ব্যয়ে একখানি রণপোত প্রস্তুত হইল। তারপর যখন সেখানি ভাসান হইল তখন হয় ত শুনা গেল আর একদেশে একটু উন্নত প্রণালীমতে রণপোত প্রস্তুত হইতেছে। অমনি সেই কোটী টাকার রণপোতখানি একেবারে 'পচিয়া গেল'—তাহা ভাঙ্গিয়া নূতন উপায়ে আর একখানি রণপোত প্রস্তুত হইতে লাগিল। সম্প্রতি ইংলণ্ডের "H. M. Battleship" "Dreadnaught" এরূপ উন্নত প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছে যে অনেকে বলিতেছেন পুরাতন রণপোতগুলির আমূল সংস্করণ আবশ্যক। আবার হয় ত দুদিন পরে 'Dreadnaught' খানিই পুরাতন বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে।

(৪) ইংলণ্ডের J. W. Swan, F.R.S., President of the Society of Chemical Industries, কয়েক বৎসর হইল একটী বক্তৃতায় ইংলণ্ডে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অভাব জনিত ব্যবসায়ের ক্ষতি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—

One of the most pressing requirements of the moment demanded not only in the interest of the chemical industry but in that of our manufacturing industries generally, is *adequate endowment and encouragement of research*. Original scientific research is the fountain-head of new knowledge, the vital stimulus of industrial growth, the originator of new industries and sustainer of old. Yet, nationally, in the organisation of our educational and industrial system, we give to scientific research no hospitality we barely pay it the respect of recognition.

Nature, Aug. 1, 1901.

ইংলণ্ডের সম্বন্ধে যদি এই কথা বলা হইল, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কি বলিতে হইবে?

দেশে তখনই শিল্পাদি সুপ্রতিষ্ঠ হইবে যখন দেশময় বিজ্ঞানচর্চ্চা হইতে থাকিবে। জর্ম্মানী প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞানের অত বহুলপ্রচার বলিয়াই না আজ তাহারা শিল্প বিষয়ে অত উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছে? বাস্তবিক, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বোলার, লীবিগ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ জর্ম্মানীতে যে বিজ্ঞানচর্চ্চার সূত্রপাত করেন, প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়া সেই বিজ্ঞানসাধনা চলিতেছে।* জর্ম্মানীর শিল্পোন্নতি, এই বিজ্ঞানসাধনার অন্যতম ফল। বৈজ্ঞানিকগণ জ্ঞানের জন্য বিজ্ঞানচর্চ্চা করেন, আনুষঙ্গিকরূপে কোন কোন দ্রব্যের প্রস্তুতপ্রণালী আবিষ্কৃত হয়, ব্যবসায়িগণ তাহার সাহায্যে বড় বড় নূতন কারখানা খোলেন। হিমালয়দুহিতা ভাগীরথী অনন্যমনে সাগরোদ্দেশে গমন করিতেছেন; তোমার ক্ষেত্রে জলসেচন আবশ্যক, তুমি একটী খাল কাটিয়া তাহার কিছু জল লইয়া যাও। মনস্বিগণের মস্তিষ্কপ্রসূত বিজ্ঞান সর্ব্বদা সত্যের অনুসন্ধানে ধাবিত হইতেছে, তুমি ব্যবসাদার তাহার কিঞ্চিৎ সাহায্য লইয়া একটা কারখানা খোল। যাঁহারা আমাদের দেশে শিল্পের সম্যক উন্নতি দেখিতে বাসনা করেন তাঁহাদিগের এই কথাটী ভাবিয়া দেখা উচিত।

যে ভারতবর্ষ একদিন নিষ্কাম জ্ঞানচর্চ্চার জন্য জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, যেখানকার জ্ঞানিবৃন্দ তরুতলে, পর্ণকুটীরে, লোকালয়ের আড়ম্বর হইতে, বিলাসবিভ্রম হইতে বহুদূরে, নীরবে নির্জ্জন জ্ঞানচর্চ্চার ফলে সাংখ্য বেদান্তের ন্যায় দর্শনশাস্ত্র, মহাভারত রামায়ণের ন্যায় মহাকাব্য, চরক সুশ্রুতের ন্যায় চিকিৎসাগ্রন্থ, বরাহ মিহির গোলাধ্যায়ের ন্যায় জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়া জগতে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন; যেখানকার ব্রাহ্মণগণ শোকে দুঃখে বিবিধ নির্য্যাতনের মধ্যে পড়িয়াও নিষ্কামভাবে কার্য্য করিয়া শুধু জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া ঋষিদের অর্জ্জিত জ্ঞান আমাদের নিকট আনয়ন করিয়াছেন; অথবা সেদিনও যে দেশের পণ্ডিতগণ তিন্তিড়ীপত্র, কাঁচকলা ও আতপ তণ্ডুল মাত্রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অসামান্য জ্ঞানস্পৃহার পরিচয় দিয়াছেন—সে দেশের দারুণ দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া কাহার

* গত বৎসর আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত "প্রবাসী বাঙ্গালীর দ্বিতীয় পত্র" দেখুন।

না চিত্ত শোকার্ত্ত হইয়া পড়ে? সেই দেশে কি না আজ অর্থই বিদ্যাশিক্ষা করিবার পক্ষে একমাত্র প্রলোভন? যে দেশের বিদ্যার্থিগণ বিলাসশূন্যতা, কষ্ট ও শ্রমসহিষ্ণুতাদি গুণের দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন, সেই দেশের বিলাসী, শ্রমবিমুখ, অর্থোপার্জ্জনমাত্রলক্ষ্য শিক্ষার্থীদিগকে দেখিয়া কাহার না অন্তরে দারুণ ক্ষোভ উদিত হয়? আজকাল কেবল "অর্থকরী বিদ্যা চাই"—এই ধুয়া উঠিয়াছে—ইহা কেবল জাতীয় হীনতার পরিচায়ক মাত্র। বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্যই বিদ্যা ও জ্ঞানচর্চ্চা কর—একথা বড় একটা শুনা যায় না। আমাদের জানা উচিত যে যে দেশে নিউটন, স্পেনসার, ডারবিন্ জন্মিতে পারে, সেই দেশেই ওয়াট্, ষ্টিফেন্‌সন্ জন্মিতে পারে; যে দেশে হেলমহোলটজ্, বেয়ার, বোলার আদি মহাজ্ঞানী জন্মিতে পারে, সেই দেশের শিল্পিগণই অসাধারণত্ব লাভ করিতে পারে। যে ভারতে কপিল, ব্যাস, আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত জন্মিয়াছিলেন, সেই ভারতেই শিল্পকলা, আয়ুর্ব্বেদ ও রসায়ন শিল্পাদির উন্নতি হওয়া সম্ভব ছিল। আবার ভারতে নিষ্কাম জ্ঞানচর্চ্চা আরম্ভ হউক, আবার ভারতে জাতীয় জীবন সর্ব্বতোমুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। জ্ঞান জাতীয় জীবনের উৎস; ইহা হইতে শত শত নদী বাহির হইয়া গিয়াছে—তাহার সলিল শত লোকের কার্য্যসাধন করিয়া যাইতেছে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়,
শ্রীনিবারণচন্দ্র ভটাচার্য্য, এম্,এ,
শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি,এস্‌সি।

বলবান জামাতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নলিনীবাবু আলিপুরের পোষ্ট মাষ্টার। বেলা অবসান-প্রায়, আপিসে বসিয়া নলিনীবাবু ছটফট করিতেছিলেন। আশ্বিন মাস,—সম্মুখে পূজা,—নলিনীবাবু ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও হেড্ আপিস হইতে কোনও হুকুম আসিল না। যদি আজ পাঁচটার মধ্যেও হুকুম আসে, তবে আজই মেলে এলাহাবাদ রওনা হইবেন। এলাহাবাদে তাঁহার শ্বশুরালয়। নলিনীবাবু এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইবেন। জিনিষপত্র কিনিয়া, বাক্স তোরঙ্গ সাজাইয়া, প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু এখনও ছুটির হুকুম আসিল না। বেলা চারিটা বাজিল। হঠাৎ টং টং করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বড় আশা করিয়া নলিনী বাবু টেলিফোনের নল মুখে দিয়া বলিলেন—"Yes"।

কিন্তু হায়, ছুটির হুকুম আসিল না। একটা মনি অর্ডার সম্বন্ধে কি গোলমাল ঘটিয়াছিল, তাহারই সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন।

নলিনী হতাশ হইয়া আবার চেয়ারে আসিয়া উপবেশন করিলেন। দুই একটা টুকী টাকী কার্য্যের পর পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানি তাঁহার স্ত্রীর লেখা। ইতিপূর্ব্বেই সেখানি বহুবার পাঠ করা হইয়াছিল; আবার পড়িলেন—

(একটি পাখীর ছবি)
নিয়ে সোণার জলে মুদ্রিত—
"যাও পাখী যেথা মম আছে প্রাণপতি"

প্রিয়তম,

তোমার সুধামাখা পত্রখানি পাইয়া মনপ্রাণ শীতল হইল। নাথ, এতদিনের পর কি দীর্ঘ বিরহের অবসান হইবে? তোমার চাঁদমুখ খানি দেখিবার জন্য আমার চিত্তচকোর উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। আজ দুই বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে, এখনও একদিনের তরে পতিসেবা করিতে পাইলাম না। ছুটী হইলেই শীঘ্র চলিয়া আসিও। দুঃখিনী আশাপথ চাহিয়া রহিল। দিনাজপুর হইতে মেজদি আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কতদিনে তোমার ছুটি হইবে? পঞ্চমীর দিন যাত্রা করিতে পারিবে কি? আজ তবে আসি। মনে রেখ, ভুল না।

তোমারই
সরোজিনী।

নলিনীবাবু পত্রখান উলটিয়া পালটিয়া পাঠ করিলেন। শেষে পুনর্ব্বার তাহা পকেটে রাখিয়া দিলেন।

পাঁচটা বাজিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। আজও ছুটির কোনও সম্ভাবনা আর দেখা যাইতেছে না। নলিনী বাবু একটি মৃদু রকমের দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আবার কার্য্যে মন দিতে চেষ্টা করিলেন। যাহা হউক, আজ চতুর্থী মাত্র। যদি আগামী কল্যও ছুটি আসে, তবুও পঞ্চমীর দিন যাত্রা করিতে সক্ষম হইবেন।

পাঁচটা বাজিতে যখন আর দুই এক মিনিট বাকী আছে, তখন আবার টেলিফোনের কল ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। আবার নলিনীবাবু নলে মুখ দিয়া বলিলেন "yes."

ছুটি!—ছুটি!—ছুটি! নলিনী বাবু দুই সপ্তাহের বিদায় পাইয়াছেন। ডেপুটি পোষ্টমাষ্টারকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া আজই রাত্রে নলিনী বাবু রওনা হইতে পারিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সরোজিনীর পত্রে প্রকাশ, 'দিনাজপুরের মেজদি' আসিয়াছেন। ইহাঁর আসিবার কথা পূর্ব্বেই নলিনীবাবু অবগত ছিলেন, এবং সেই জন্যই বিশেষতঃ এবার এলাহাবাদ যাইবার জন্য তাঁহার এত অধিক আগ্রহ। 'দিনাজপুরের মেজদি'র উপর তাঁহার বিলক্ষণ রাগ আছে,—তাই তাঁহার সহিত এখন একবার সাক্ষাতের জন্য তিনি বড় ব্যস্ত। কিন্তু সে ব্যাপারটি কি বুঝাইতে হইলে মেজদির একটু পরিচয় এবং নলিনীর বিবাহবাসরের একটু ইতিহাস বিবৃত করা আবশ্যক।

মেজদির স্বামী মহা সাহেব লোক,—তিনি দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। মেজদির নামটি উল্লেখ করিলেই সকলেই তাঁহাকে অনায়াসে চিনিতে পারিবেন। শ্রীমতী কুঞ্জবালা দেবীর স্বাক্ষরিত ওজস্বিনী স্বদেশী কবিতাগুলি বর্ত্তমান সময়ের মাসিক পত্রাদিতে কে না পাঠ করিয়াছেন? সৌভাগ্যবশতঃ ফুলার সাহেব বাঙ্গলা জানেন না, জানিলে এত দিন কুঞ্জবালার স্বামীর চাকুরিটি লইয়া টানাটানি হইত।

কুঞ্জবালা বিদুষী, সুতরাং * বলাই বাহুল্য তাঁহার রসনাটি ক্ষুরধার। তিনি ইংরাজিতে শিক্ষিত, সুতরাং তাঁহার আইডিয়াল সর্ব্ববিষয়ে সাধারণ বঙ্গললনা হইতে বিভিন্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, একবার তাঁহার এক দেবর এক শিশি সুগন্ধি কিনিয়া আনিয়াছিল। দেখিয়া কুঞ্জবালা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ও কার জন্যে এনেছিস্?"

"নিজে মাখ্‌ব।"

"দূর—ও জিনিষ ত কেবল স্ত্রীলোক আর বাবুরে মাখে;—পুরুষ মানুষ কখনও সুগন্ধি ব্যবহার করে?"

বালক দেবরটি, বউদিদির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বুঝিতে না পারিয় ভাল মানুষের মত বলিয়াছিল,—"কেন? বাবুরা কি পুরুষ নয়?"

নলিনী বাবুর যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার মূর্ত্তিটি দিব্য গোলগাল নন্দদুলালি ধরণের ছিল। গাল দুইটি টেবো টেবো, হাত দুখানি নবনীতোপম, প্রকোষ্ঠদেশের কোমল অস্থিগুলি কোমলতর মাংসে সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন। শীলতার অনুমোদিত না হইলেও, বিবাহ-বাসরে কুঞ্জবালা নলিনীর দেহখানির প্রতি বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্র বাবুর কাব্য কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেনঃ—

নলিনীর মত চেহারা তাহার
নলিনী যাহার নাম,
কোমল কোমল কোমল অতি
যেমন কোমল নাম।
যেমন কোমল, তেমনি বিকল,
তেমনি আলস্য ধাম,
নলিনীর মত চেহারা তাহার
নলিনী যাহার নাম।

একটি শ্লেষবাক্য মনুষ্যকে যেমন সচেতন করে, দশটি উপদেশবচনেও সেরূপ হয় না। সেই শ্লেষবাক্য যদি সুন্দরী-মুখনিঃসৃত হয়, এবং সেই সুন্দরী যদি সম্পর্কে শ্যালিকা হন, তাহা হইলে একটি শ্লেষবাক্যের ফল শতগুণ সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

বিবাহের পর নলিনী বাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ও সপরিবার কর্ম্মস্থান এলাহাবাদে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বিদুষী শ্যালিকার ব্যঙ্গ নলিনী কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিলেন না।

একদা সন্ধ্যায় পোষ্ট আফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া, ঈজি চেয়ারে পড়িয়া, নলিনী বাবু ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা তাঁহার মনে একটা মৎলবের উদয় হইল। কেন, তিনি ত চেষ্টা করিলেই এ কলঙ্ক মোচন করিতে পারেন,—শরীর পুরুষোচিত দৃঢ় করিতে পারেন। পরদিন বাজার হইতে তিনি স্যাণ্ডোর ডাম্বেলাদি ক্রয়

* প্রবাসীর অনেক বিদুষী গ্রাহিকা আছেন; "সুতরাং" আমি লেখক মহাশয়ের সহিত একমত হইতে পারিলাম না।—সম্পাদক।

করিয়া আনিয়া, বাড়ীতে রীতিমত ব্যায়াম অভ্যাস করিতে যত্নবান হইলেন। নিজ দৈনিক খাদ্যতালিকা হইতে মিষ্ট, দুগ্ধ, ঘৃত ও তণ্ডুল যথাসম্ভব কাটিয়া দিয়া, তত্তৎস্থানে রুটি, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি যোজনা করিলেন। প্রথম প্রথম পাঁচ সাত মিনিটের অধিক ব্যায়াম করিতে পারিতেন না,—ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। অভ্যাসের গুণে ক্রমে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করিতে লাগিলেন।

এক বৎসর এইরূপ করিয়া তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিলক্ষণ দৃঢ় হইল। তখন স্বীয় মূর্ত্তি আরও অধিক মাত্রায় পরুষ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি দাড়িকামানো বন্ধ করিয়া দিলেন। দুই একটি শিকারী বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রামে গিয়া, হংস, বন্যশূকরাদি শিকার করিতেও অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপ করিয়া দুই বৎসর কাটিয়াছে। এখন আর সে নলিনী নাই। এখন তাঁহার কপোলদেশ বসাশূন্য, চিবুকাগ্রভাগ সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত, হস্তপদাদি অস্থিবহুল হইয়াছে; ফলতঃ, তিনি নামের এখন সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছেন। এমন সময় একবার কুঞ্জবালার সহিত সাক্ষাৎ আকাঙ্ক্ষিত। হায়, নামটাও যদি পরিবর্ত্তন করিবার উপায় থাকিত! নলিনী বাবু মনে করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র জন্মিলে তাহার নাম রাখিবেন—খুব একটা ভীষণ রকমের—কি নাম রাখিবেন এখনও স্থির করিতে পারেন নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন বেলা দুইটার সময়, নলিনী বাবু এলাহাবাদ ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। তাঁহার পরিধানে পায়জামা ও লম্বা পঞ্জাবী কোট, মস্তকে পাগড়ী। হস্তে একটি বৃহদাকার যষ্টি দেখা যাইতেছিল। জিনিষপত্রের সঙ্গে একটি বন্দুকের বাক্স। ইচ্ছা ছিল ছুটিতে কিঞ্চিৎ শিকারও করিয়া যাইবেন।

ষ্টেশনে নামিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—কৈ, কেহত তাঁহাকে লইতে আসে নাই। গত কল্য যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি যে শ্বশুর মহাশয়ের নামে চারি আনার টেলিগ্রাম একটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পৌঁছে নাই না কি?

কুলী ডাকিয়া, জিনিষপত্র লইয়া, নলিনী বাবু ষ্টেশনের বাহিরে গেলেন। একজন গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহেন্দ্র বাবু উকীলকা বাসা জান্‌তা?"

গাড়োয়ান উত্তর করিল,—"হাঁ বাবু—আইয়ে।"

"চলো"—বলিয়া নলিনী গাড়ীতে আরোহণ করিলেন।

এলাহাবাদে নলিনীবাবু পূর্ব্বে কখনও আসেন নাই; এমন কি এই তিনি প্রথম বঙ্গদেশের বাহিরে পদার্পণ করিয়াছেন। পশ্চিমের সহরের নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি চলিলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে গাড়ী একটি বৃহৎ কম্পাউণ্ডযুক্ত বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই বহির্ব্বাটী, বারান্দায় একটি নয় দশ বৎসরের বালিকা খেলা করিতেছিল। বারান্দার নিম্নে, বামে, একটা কূপ; সেখানে বসিয়া একজন পশ্চিমী ভৃত্য সজোরে একটা কটাহ মাজিতেছিল।

গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া, সেই ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া নলিনী বাবু বলিলেন:—

"এই মহেন্দ্র বাবু উকীলের বাড়ী?"

"হাঁ বাবু।"

"বাবু আছেন?"

"না। তিনি কিদার বাবু উকীলের বাড়ী পাশা খেল্‌তে গিয়েছেন।"

"আচ্ছা,—ভিতরে খবর দাও,—বল জামাই বাবু এসেছেন।" এই কথা শুনিবামাত্র, যে মেয়েটি বারান্দায় খেলা করিতেছিল, সে ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া বলিল,—"ওগো, তোমাদের জামাই বাবু এসেছেন।"

ভৃত্যটির নাম রামশরণ। সে এই কথা শুনিয়া, এক-মুখ হাসিয়া বলিল,—"আরে! জামাই বাবু?" বলিয়া সে চটপট হাত ধুইয়া ফেলিয়া, নলিনীকে একটি দীর্ঘ সেলাম করিল।

তাহার পর রামশরণ জিনিষপত্র গাড়ী হইতে নামাইয়া ফেলিল। এদিকে বাড়ীর ভিতর হইতে নানা আকারের বালকবালিকাগণ আসিয়া উঁকি মারিয়া জামাই দেখিতে লাগিল।

রামশরণ নলিনী বাবুকে বৈঠকখানার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। বলিল,—"বাবু, চান করা হোবে কি?"

নলিনী বলিল,—"হাঁ—স্নান ক'রব। তুমি গোসল-খানায় জল দাও।"

এই সময় একজন বাঙ্গালী ঝি আসিয়া নলিনীকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"ভাল ছিলেন ত ?"

"হাঁ, ভাল ছিলাম। তোমরা কেমন ছিলে ?"

হাসিয়া ঝি বলিল,—"যেমন রেখেছেন। আজ ছ'মাস আমি এ বাড়ীতে চাকরি করছি, দিদিমণিকে রোজ জিজ্ঞাসা করি, 'জামাই বাবু কবে আসবেন গো ?'—'জামাই বাবু কবে আসবেন গো ?'—দিদিমণি বলেন, এই ছুটি হ'লেই আসবেন। তা' এতদিনে যে মনে পড়ল সেও ভাল। আপনি চান করে ফেলুন। মা ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি জলটল খাবেন, না ভাত চড়িয়ে দেওয়া হ'বে ?"

নলিনী মোগলসরাই ষ্টেশনে, কেলনারের কল্যাণে, প্রাতরাশ সমাধা করিয়া আসিয়াছিলেন ; বলিলেন—"এখন ভাত চড়াতে হ'বে না,—জলটল কিছু খাব এখন।"

ঝি বলিল,—"আচ্ছা, তবে চান করে ফেলুন। পরে, আপনাকে একটি নতুন জিনিষ দেখাব। আমার বখ্‌শিসের জন্য কি গহনা-টহনা এনেছেন বের করে রাখুন।"—বলিয়া ঝি নলিনীর প্রতি রমণী জন সুলভ কটাক্ষপাত করিয়া, মৃদু হাস্য করিল।

রামশরণ বলিল,—"তুই বখ্‌শিস্ লিবি, আমি বুঝি বখ্‌শিস্ লেব না ?"

নলিনী ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল গম্ভীরভাবে ঘাড়টি নাড়িতে লাগিল।

স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া নলিনী দেখিল, কতকগুলি বালকবালিকা তাহার বন্দুকের বাক্স খুলিয়া বন্দুকটি বাহির করিয়াছে। সকলে মিলিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি যোড়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

তাহাদের হাত হইতে বন্দুকটি লইয়া নলিনী সাবধানে স্থানান্তরে রাখিয়া দিল। এমন সময় পূর্ব্বকথিত ঝি আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কোলে একটি অল্প কয়েক মাস বয়স্ক শিশু। তাহার মুখ খানি সদ্য পরিষ্কৃত, চক্ষুযুগল এই মাত্র কজ্জলিত, মাথার চুলগুলি সাবধানে কে বুরুষ করিয়া দিয়াছে।

ঝি শিশুটিকে হাতে করিয়া, তুলিয়া, নাচাইয়া, বলিল—"দেখ জামাই বাবু দেখ, কেমন সোণার চাঁদ হয়েছে। যেন রাজপুত্তুরটি। নাও—একবার কোলে কর।"

নলিনী কখনই ছোট শিশু পছন্দ করিত না। তথাপি ভদ্রতার খাতিরে বলিল—"বাঃ—বেশ ছেলেটি ত!"—বলিয়া কোলে লইল।

ঝি বলিল—"বেশ ছেলেটি বল্লেই হয় না, এখন কি দিয়ে মুখ দেখ্‌বে দেখ।"

নলিনী পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া শিশুর বদ্ধমুষ্টির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল।

কলিকাতার ঝি তদ্দর্শনে গালে হাত দিয়া বলিল—"ওমা, ওমা ওকি! লোকে বলবে কি গো! রূপো দিয়ে সোণার চাঁদের মুখ দেখা ?"

সমবেত বালকবালিকাগণ খিল খিল করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া, আর কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া, নলিনী বলিল—"সোণা ত আনি নি।" মনে মনে স্বীয় পত্নীর উপরও রাগ হইল। তাহার কি উচিত ছিল না পত্রে নলিনীকে লেখা যে অমুকের সন্তান হইয়াছে, তাহার মুখ দেখিবার জন্য একটা গিনি আনিও ?

ঝি বলিল—"সে কথা শোনে কে ? তা হ'লে আজই সেকরা ডেকে সোণার গহনার ফরমাস দাও। ছেলের বাপ হ'লেই হয় না!"

নলিনীর বুদ্ধিসুদ্ধি ইতিপূর্ব্বেই যথেষ্ট গোলমাল হইয়া গিয়াছিল ; শেষের এই কথা শুনিয়া সে একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িল। "ছেলের বাপ হ'লেই হয় না" ইহার অর্থ কি? তবে নলিনীই কি ছেলের বাপ না কি ?

শিশুকে ঝির কোলে ফিরিয়া দিয়া, সভয়ে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"ছেলেটি কবে হ'ল ?"

ঝি পুনর্ব্বার গালে হাত দিয়া বলিল—"অবাক্ কল্লে যে! তোমার ছেলে কবে হল তুমি জান না, পাড়ার লোককে জিজ্ঞাসা করছ ?"

যে দুইটি বালকবালিকা উহারই মধ্যে একটু বয়ঃপ্রাপ্ত ছিল, তাহারা ঝির এই ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্ষুদ্রতর বালকবালিকাগণ তাহাদের দেখা দেখি, উচ্চতর স্বরে হাস্য করিয়া মেঝেতে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

সদ্যঃস্নাত নলিনীর ললাট তখন ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

।, মনের বিস্ময় মনে চাপিয়া রাখিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। এ গূঢ় রহস্য ভেদ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

এই সময় একটি বালিকা আসিয়া, নলিনীর হাতে একটি গেলাস দিয়া বলিল—"জামাই বাবু! একটু সরবৎ খাও।"

নলিনী গেলাসে মুখ দিয়া দেখিল, জলটা লবণাক্ত। গেলাস নামাইয়া রাখিল। তখন হঠাৎ তাহার মনে হইল, তাহার প্রতি এই পিতৃত্ব আরোপটাও, জামাই ঠাটারই একটা অংশ হইবে। এই মীমাংসায় উপনীত হইয়া, নলিনীর মন একটু শান্ত হইল। তাহার কুঞ্চিত ভ্রূযুগল আবার সমতা প্রাপ্ত হইল।

সেই বৈঠকখানার একটি কোণে, একটা কবাট খুলিবার শব্দ হইল। কবাটের সম্মুখস্থিত, পর্দ্দা অপসৃত করিয়া রামশরণ ভৃত্য বলিল—"বাবু আসুন—জল খাওয়া দেওয়া হয়েছে।"

নলিনী চাহিয়া দেখিল, অন্দর মহলের একটি কক্ষ দৃশ্যমান। উঠিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষের মধ্যস্থলে সুন্দর কার্পেটের আসন পাতা রহিয়াছে। তাহার সম্মুখে রূপার রেকাবী বাটী গেলাসে ভরা নানাবিধ খাদ্য ও পানীয়। নলিনী ধীরে ধীরে আসন খানির উপর উপবেশন করিয়া জলযোগে মন দিল।

এমন সময় কক্ষান্তর হইতে মলের ঝুম ঝুম শব্দ উত্থিত হইল। একটি ক্ষুদ্র বালিকা দ্বারপথে মুখ দিয়া বলিল—"মেজদি আসচেন।"

নলিনী বুঝিল, কুঞ্জবালা আসিতেছেন। নিজ দক্ষিণ হস্তের আস্তিন সে ভাল করিয়া গুটাইয়া লইল। কুঞ্জবালা আসিয়া দেখুন, তাহার হাতের কব্জী এখন আর সুগোল নহে, মাংসল নহে পরন্তু তাহা সুপুষ্ট অস্থি ও শিরায় সমাকীর্ণ।

মলের শব্দ নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। "কি ভাই, এতদিন পরে মনে পড়ল?" বলিতে বলিতে যুবতী আসিয়া কক্ষমধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন।

কিন্তু তাহা একমুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। চারিচক্ষে মিলিত হইলেই, সেই মহিলা একহাত ঘোমটা টানিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

নলিনী দেখিল, তিনি কুঞ্জবালা নহেন।

পার্শ্বের কক্ষ হইতে দুই তিনটি রমণীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর নলিনীর কর্ণে আসিল—

"কি লো, পালিয়ে এলি যে?"

"ওমা, ওযে অন্য লোক।"

"অন্য লোক কি লো! আমাদের শরৎ নয়?"

"না, শরৎ হ'বে কেন?"

"কে তবে?"

"আমি জানি?"

"একি কাণ্ড? জুয়োচোর না কি?"

"যে রকম চোয়াড়ে চেহারা, আশ্চর্য্য নয়।"

"ওমা একি কাণ্ড! কে এল?"

একজন বালকের কণ্ঠস্বরে শুনা গেল—"একটা বন্দুক নিয়ে এসেছে।"

"অ্যাঁ!—ওমা কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো। ওরে রামশরণা—রামশরণা—কোথা গেল। যা, শীগ্গির বাবুকে খবর দে।"—রমণীগণের দ্রুত পদধ্বনি শ্রুত হইল। তাহার পর আর কিছু নলিনী শুনিতে পাইল না।

এই সময়ের মধ্যে, অদূরস্থিত একটি পুস্তকের আলমারির প্রতি নলিনীর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। সারি সারি বাঁধান পুস্তক রহিয়াছে; প্রত্যেক খানির নিম্নে সোণার জলে নাম লেখা—এম, এন্, ঘোষ।

তখন সমস্ত ব্যাপার নলিনী দিনের আলোকের মত স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। তাহার শ্বশুরের নাম মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার মহেন্দ্রনাথ ঘোষ। তবে ভ্রমক্রমে সে অন্য লোকের শ্বশুর বাড়ীতে চড়াও করিয়াছে।

নলিনী তখন মনে মনে হাস্য করিতে করিতে, নিশ্চিন্ত মনে, একে একে জলখাবারের বাটীগুলি খালি করিয়া ফেলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এদিকে রামশরণ ভৃত্য ঊর্দ্ধশ্বাসে বাবুকে খবর দিতে ছুটিল। কেদার বাবু উকীলের বাসায়, ছুটির সময়, প্রায়ই পাশাখেলার আড্ডা জমিয়া থাকে। অদ্য এখানে বড় মহেন্দ্রবাবু, ছোট মহেন্দ্রবাবু (নলিনীর আসল শ্বশুর) এবং অন্যান্য অনেকগুলি উকীল সমবেত হইয়াছেন।

পাশাখেলা চলিতেছিল, এমন সময় ঝড়ের মত আসিয়া রামশরণ সেখানে প্রবেশ করিল। নিজ প্রভুকে দেখিয়া বলিল—"বাবু—বাবু—জলদি বাড়ী আস্থন।"

তাহার মুখ চক্ষু দেখিয়া, ভীত হইয়া, মহেন্দ্র ঘোষ বলিলেন—"কেন রে - কারু অসুখ বিসুখ।"

"বাড়ীমে একঠো ডাকু এসেছে।"

সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিলেন। মহেন্দ্র ঘোষ বলিলেন—"ডাকু? দিনের বেলায় ডাকু?"

রামশরণ বলিল—"ডাকু হোবে কি জুয়াচোর হোবে কি পাগল আদমি হোবে কিছু ঠিকানা নাই। সে বলে কি হামি বাবুর দামাদ আছি।"

ইহা শুনিয়া অন্য সকলে হাস্য করিলেন। কিন্তু মহেন্দ্র ঘোষ উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কখন এল? কি করছে?"

"এই তিন বাজে এসেছে। একঠো লাঠি এনেছে, একঠো বন্দুক এনেছে—অন্দরমে গিয়ে জল উল খেয়েছে। মাইজি লোককো বড়া ডর হয়েছে।"

"বন্দুক এনেছে? লাঠি এনেছে?—হতভাগা পাজি শূয়ার—তুই বাড়ী ছেড়ে এলি কার জিম্মায়?" বলিয়া ক্ষিপ্তের মত মহেন্দ্র বাবু বাহির হইলেন। গাড়ী প্রস্তুত ছিল। লম্ফ দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া হাঁকিলেন—"জোর সে হাঁকাও।"

কয়েকজন উকীল সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়াছিলেন। কেহ বলিলেন—"বোধ হয় পাগল হ'বে।" কেহ বলিলেন, "না—পাগল হলে বন্দুক আনবে কেন? কোন বদমায়েস গুণ্ডা হবে।" ছোট মহেন্দ্র বাবু (নলিনীর শ্বশুর) বলিয়া দিলেন—"পাগলই হোক গুণ্ডাই হোক, ধরে পুলিসে হাণ্ডোভার করে দিও।"

গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিল। বাড়ীতে পৌঁছিলে, গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মহেন্দ্র বাবু বলিলেন—"কই, কোথায়?"

এমন সময় নলিনী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহস্বামীকে অভিবাদন করিয়া বলিল, —"আপনিই মহেন্দ্র বাবু? আপনার কাছে আমার একটা ক্ষমাপ্রার্থনা করবার আছে।"

নলিনীর ভাব ভঙ্গী ও কথাবার্ত্তায় মহেন্দ্র বাবু একটু থতমত খাইয়া গেলেন। বাড়ী পৌঁছিয়াই যেরূপ প্রহারের বন্দোবস্ত করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহাতে বাধা পড়িয়া গেল।

মহেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে আপনি?"

"আমার নাম নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়। আমি মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা। মহেন্দ্র বাবু উকীলের বাড়ী গাড়োয়ানকে বলেছিলাম, সে আমাকে এখানে এনে ফেলেছে। আমি আমার ভুল এই অল্পক্ষণ মাত্র জানতে পেরেছি। এতক্ষণ চলে যেতাম। আপনাকে আনতে লোক গিয়েছে, আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে তবে যাব এই জন্যে অপেক্ষা করেছি।"

এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র ঘোষের রাগ জল হইয়া গেল। তিনি নলিনীর হাতখানি নিজ হস্তে ধারণ করিয়া হো হো শব্দে অনেকক্ষণ হাস্য করিলেন।

শেষে বলিলেন—"মহিনের জামাই তুমি! বেশ বেশ। দেখ, এখানে দুজন মহেন্দ্র বাবু উকীল থাকাতে, মক্কেল নিয়ে মাঝে মাঝে গোলমাল হয় বটে। হয় ত মফঃস্বল থেকে কোনও উকীল আমার কাছে এক মোকদ্দমা পাঠিয়ে দিলে, মক্কেল কাগজ নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হল তোমার শ্বশুর বাড়ীতে। কিন্তু জামাই নিয়ে গোলমাল এই প্রথম।" বলিয়া মহেন্দ্র ঘোষ অপরিমিতরূপ হাস্য করিতে লাগিলেন।

তাহার পর নলিনাকে লইয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। কিঞ্চিৎ গল্প গুজবের পর, নলিনীর জন্য একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। নলিনী তখন বিদায়গ্রহণ করিয়া নিজ শ্বশুরালয় অভিমুখে যাত্রা করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এদিকে কেদারবাবু উকীলের বাড়ীতে, সে অপরাহ্নে পাশাখেলা আর ভাল জমিল না। মহেন্দ্র ঘোষ প্রস্থান করিলে, সেই সভায় অনেকে অনেক আশ্চর্য্য জুয়াচুরির গল্প করিলেন। অনেক পাগলের গল্পও হইল। ক্রমে সভাভঙ্গ হইল। উকীলগণ একে একে নিজ আলয়ে ফিরিয়া গেলেন।

মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী শাগঞ্জ মহল্লায়। তিনি বাড়ী ফিরিয়া চা ও তাওয়াদার তামাক হুকুম করিলেন।

আফিসকক্ষে ঈজি চেয়ারে বসিয়া, চা-পান করিতে লাগিলেন। ভৃত্য একটি বৃহদাকার ছিলিম আলবোলায় চড়াইয়া, গুলের আগুনে মৃদু মৃদু পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

চা-পান শেষ হইলে, মহেন্দ্রবাবু আলবোলার নলটি মুখে করিয়া, আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ কাটিলে পর, একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল। উকীলের বাড়ী, কত লোক আসে যায়, মহেন্দ্রবাবু কিছুই ব্যস্ত হইলেন না, কিন্তু চক্ষু উন্মীলন করিয়া রহিলেন।

বাহির হইতে শব্দ শুনিলেন, একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর বলিতেছে—"এই মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী?"

"হাঁ বাবু।"

"খবর দাও, বল বাবুর দামাদ এসেছেন।"

এই "দামাদ" শুনিয়াই মহেন্দ্রবাবু কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। জানালার পর্দ্দা তুলিয়া দেখিলেন—বৃহৎ যষ্টি হস্তে ষণ্ডামার্ক আকারের একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে, গাড়োয়ান গাড়ীর ভিতর হইতে একটা বন্দুকের বাক্স বাহির করিতেছে।

দেখিয়াই মহেন্দ্রবাবু হাঁকিলেন—"কোই হ্যায় রে?" বলিতে বলিতে বাহিরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন।

তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া বেচারা নলিনী একটু থতমত খাইয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু দাঁত মুখ খিঁচাইয়া সপ্তমে বলিলেন—"পাজি বেটা জুয়াচোর—ভাগো হিঁয়াসে। অভি ভাগো। ঘুরেফিরে শেষ আমার বাড়ীতে এসেছ? শ্বশুর পাতাবার আর লোক পেলে না! বেটা বদমায়েস গুণ্ডা!"

ইতিমধ্যে অনেকগুলি ভৃত্য দরোয়ান আসিয়া পড়িয়াছিল। মহেন্দ্রবাবু হুকুম দিলেন—"মারকে নিকাল দেও। গর্দ্দান পাকড়কে নিকাল দেও।"

ভৃত্যগণ নলিনীকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল। তাহা দেখিয়া নলিনী তাহার বৃহৎ যষ্টি মস্তকোপরি উত্থিত করিয়া বলিল—"খবরদার। হাম চলা যাতা হ্যায়। লেকেন যো হামকো ছুয়েগা, উসকা হাড্ডি হাম চুর চুর কর ডালেঙ্গে।"

নলিনীর মূর্ত্তি ও লাঠি দেখিয়া ভৃত্যগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নলিনী মহেন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আপনি ভুল করছেন। আমি আপনার জামাই নলিনী।"

একথা শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন—"বেটা জুয়াচোর! তুমি শ্বশুর চেন আর আমি জামাই চিনিনে? আমার জামাইয়ের এরকম গুণ্ডার মত চেহারা?—ভাগো হিঁয়াসে—নিকলো হিঁয়াসে—নয় ত অভি পুলিসমে ভেজেঙ্গে"—

নলিনী আর দ্বিরুক্তি করিল না। গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া গাড়োয়ানকে বলিল—"চলো ষ্টেশন।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গোলমাল থামিলে, তাওয়াদার তামাকটা শেষ করিয়া মহেন্দ্রবাবু বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিলেন—"মদ খেয়েছ না কি? জামাইকে তাড়ালে?"

মহেন্দ্রবাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"জামাই কাকে বল? সে একটা জুয়াচোর।"

"জুয়াচোর কিসে জানলে?"

তখন মহেন্দ্রবাবু, পাশা খেলিবার কালে কেদারবাবুর বাসায় যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন সবই বলিলেন।

শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন—"বেশ ত, কিন্তু তাইতেই কি প্রমাণ হয়ে গেল যে সে জুয়াচোর? দুজনেরই এক নাম,—বাড়ী ভুল করে সেখানে গিয়ে ওঠাই কি আশ্চর্য্য?"

স্ত্রীর মুখে এ যুক্তি শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু একটু দমিয়া গেলেন। লাঠি ও বন্দুক দেখিয়াই হঠাৎ তিনি বুদ্ধিহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন,—এসকল কথা ভালরূপ বিচার করিয়া দেখিবার অবসরই পান নাই।

একটু ভাবিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—"সে যদি হ'ত—তা' হলে খবর দিয়ে আসত,—আমরা ষ্টেশনে তাকে আনতে যেতাম। কথা নেই বার্ত্তা নেই হঠাৎ কখনও জামাই প্রথমবার শ্বশুরবাড়ী এসে উপস্থিত হয়? সেটা জুয়াচোর—জুয়াচোর।"

"কেন আসবার কথা থাকবে না—আসবার কথা ত রয়েছে। পূজোর আগেই আসবে আমরা ত জানি,—তবে ঠিক কবে আসবে তা খবর ছিল না বটে।"

পিতার এই বিপদ দেখিয়া, কুঞ্জবালা বলিলেন—"ওগো সে নলিনী নয়—আমি তাকে দেখেছি।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—"তুই দেখেছিস না কি? বলত বল ত! কোথা থেকে দেখলি?"

"যখন ঐ গোলমালটা হ'ল, আমি দোতালায় উঠে জানালা দিয়ে দেখলাম। নলিনী আমাদের ননীর পুঁতুল। এ ত দেখলাম একটা কাটখোটা জোয়ান।"

মহেন্দ্রবাবু অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—"ঠিক বলেছিস্। আমি ত সেকথা তার মুখের উপরেই বলে দিয়েছি। আমি আমার জামাই চিনিনে? তার কি অমন কাশীর গুণ্ডার মত চেহারা? তার দিব্যি নধর বাবু-বাবু চেহারাটি। বিয়ের সময় একদিনমাত্র দেখেছি বটে,—তা' বলে এমনিই কি ভুল হয়?"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল—"বাবু, টেলিগেরাপ এসেছে।"

টেলিগ্রাম পড়িয়া মহেন্দ্রবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। ইহা সেই নলিনীর প্রেরিত গতকল্যকার চারি আনা মূল্যের টেলিগ্রাম।

গৃহিণী বলিলেন—"খবর কি?"

নিতান্ত অপরাধীর মত, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—"এই ত টেলিগ্রাম এসেছে। সে তবে দেখছি জামাই—ই বটে।"

গৃহিণী বলিলেন—"তবে এখন ফেরাবার কি উপায় হয়?"

"যাই, নিজে গিয়ে দেখি। যাবার সময় গাড়োয়ানকে বলেছিল ষ্টেশনে চল। এখন ত কলকাতা যাবার কোনও গাড়ী নেই। বোধ হয় ষ্টেশনে গিয়ে বসে আছে। যাই গিয়ে বাপু বাছা বলে ফিরিয়ে আনি।"

* * * *

বাড়ীর লোকে মনে করিয়াছিল, নলিনী এই ব্যাপার লইয়া শালী-শালাজকে ঠাটা করিয়া গায়ের ঝাল মিটাইবে। কিন্তু নলিনী ফিরিয়া আসিয়া একদিনের জন্যও সেকথা উত্থাপন করে নাই। যে ভুল হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর সকলেই লজ্জিত, অনুতপ্ত—তাহাই নলিনীর পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হইয়াছিল। একদিন কেবল অন্য প্রসঙ্গে মহেন্দ্র ঘোষ উকীলের কথা উঠিলে সে বলিয়াছিল—"যা হোক্ পরের শ্বশুরবাড়ীতে উঠে যে আদর যত্ন পেয়েছিলাম,—অনেকে সেরকম নিজের শ্বশুরবাড়ীতে উঠেও পায় না।"

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কোকিল।

হে বিহগ, বসন্তের বীণাটির তুই
প্রথম বাসনা,
ধরণীর পরিপূর্ণ যৌবন রেখার
সম্পূর্ণ চেতনা।
সারা বরষের তুই সঞ্চিত আনন্দ
মুক্ত একেবারে,
বাসন্তী সৌন্দর্য্যে তুই মত্ততা মধুর
ব্যক্ত স্ফুটতরে।
ও হরিত নাট-ক্ষেত্রে তুই অবারিত
উৎসব আবেশ,
অক্লান্ত ও সমারোহ-সমষ্টির সব
প্রবাহ নিঃশেষ।
সম্পূর্ণ আবেগ তুই বসন্তের মত
মধুর ধ্বনির,
(কিম্বা) বিস্মৃতিটি ধরণীর গত জীর্ণতার
জাগিস্ গভীর।
নীরস জগৎ-তীরে তুই বাৎসরিক
যৌবন সন্তাষ,
কিম্বা নব বরষের সরস মর্ম্মের
পূর্ণ ইতিহাস।

লজ্জাবতী বসু।

তুমি আছ।

গভীর জীমূতমন্দ্রে বেদান্তের বাণী
ঘোষে, "বিশ্ব মায়াময়", একথা না মানি।
তুমি আছ, তুমি থাক মোর প্রাণ ভ'রে;
বিশ্ব যদি মায়া হয়, হোক্ তার পরে।

শ্রীরঙ্গলাল রায়।

হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় উদ্ভিদাবলী।

১। চম্পক।

এই বৃক্ষ ভারতের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সুগন্ধ পুষ্প হিন্দুরা দেবদেবীর পূজায় ব্যবহার করেন।

এই বৃক্ষের ত্বক্ ও পুষ্প ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে:—

"চম্পকঃ কটুকস্তিক্তঃ কষায়ো মধুরো হিমঃ।
বিষক্রিমিহরঃ কৃচ্ছ্র-কফবাতাস্রপিত্তজিৎ॥"

অর্থাৎ চাঁপা ফুলের গুণ কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর ও হিম। ইহা বিষ, ক্রিমি, মূত্রকৃচ্ছ্র, এবং কফ, বাত, রক্ত ও পিত্ত-জনিত রোগ সকল নাশ করে।

মাদ্রাজের সুবিখ্যাত ৺ ডাক্তার মোহীদীন শেরিফ ইহা ব্যবহার করিয়া বলিয়াছেন:—"The flowers are a very efficient stimulant, antispasmodic, tonic, stomachic and carminative; and the



চম্পক।

bark an antiperiodic." অর্থাৎ ইহার ফুল ফলদায়ক উত্তেজক, আক্ষেপনিবারক, বলকারক, অগ্নিদীপক ও বায়ুনাশক; ইহার ত্বক্ জ্বরঘ্ন।

নানাবিধ জ্বরে ইহা অত্যন্ত উপকারী।

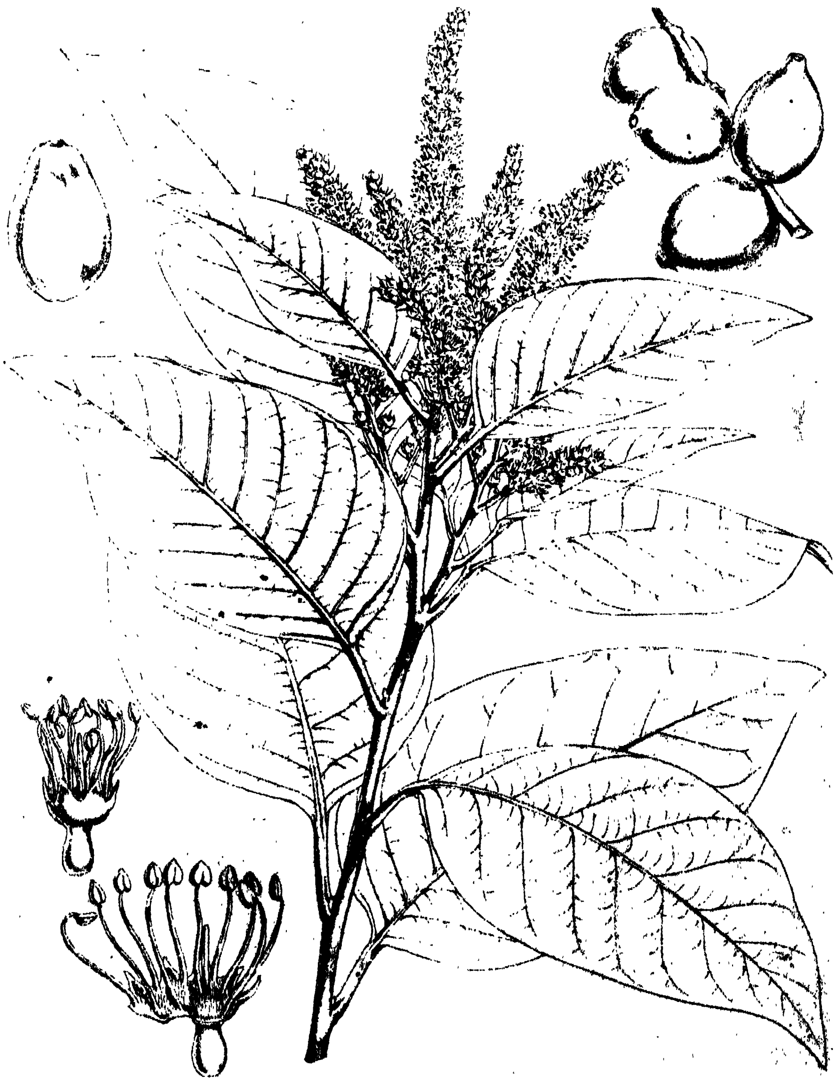
পুষ্প হইতে (১) Infusion ইন্ফ্যুজন অর্থাৎ ফাণ্ট বা নির্য্যাস, ও (২) টিংচর অর্থাৎ ঔষধাধিবাসিত মদ্যার্ক এবং ত্বক্ হইতে Decoction ডিককশন বা কাথ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা হয়।

(১) ইন্ফ্যুজন প্রস্তুত করিবার বিধিঃ—শুষ্ক পুষ্প চূর্ণ আড়াই আউন্স, গরম জল ২০ আউন্স। একঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক।

(২) টিংচর ইন্ফ্যুজনের মত প্রস্তুত করিতে হয়। গরম জলের পরিবর্ত্তে Rectified Spirit অর্থাৎ শোধিত সুরাসার ব্যবহার করিতে হয়।

(৩) ডিককশন প্রস্তুত করিবার প্রণালীঃ—ত্বক্ আড়াই আউন্স, ৪০ আউন্স জলে সিদ্ধ করিবেক। ২০ আউন্স জল থাকিতে নামাইয়া লইবেক।

চাঁপার বীজও সম্ভবতঃ মানুষের কোন না কোন কাজে



হরীতকী।

লাগিতে পারে। এ বিষয়ে কোন পরীক্ষা করা হইয়াছে কি না জানি না; করা উচিত।

২। হরীতকী।

বৈদ্যকগ্রন্থে হরীতকী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত গ্রন্থকারদিগের মতে প্রায় সকল রোগেই ইহা ব্যবহার করিতে পারা যায়। ইহা এত উপকারী যে প্রাণদা, সুধা, ভিষক্‌প্রিয়, এই সকল আখ্যা ইহাকে দেওয়া হইয়াছে। বিজয়া, রোহিণী, পূতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী বলিয়া সাত জাতীয় হরীতকীর বর্ণনা বৈদ্যকগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাজারে বিক্রয়ার্থ ঐরূপ সাত জাতীয় হরীতকী পাওয়া যায় না।

"হরীতকী চর্ব্বণ করিয়া সেবন করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হয়; পেষণ করিয়া সেবন করিলে মল শোধিত হয়; সিদ্ধ করিয়া খাইলে মল সংগ্রহ করে ও ভর্জন করিয়া (ভাজিয়া) সেবন করিলে ত্রিদোষ নষ্ট হয়।"

"রসায়নেচ্ছু ব্যক্তি বর্ষা ঋতুতে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে চিনিসহ, হেমন্তকালে শুঁঠ-চূর্ণসহ, শীতকালে পিপুল-চূর্ণসহ, বসন্তকালে মধু এবং গ্রীষ্মকালে গুড়সহ হরীতকী সেবন করিবেন।"

(আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ ১২৩ পৃষ্ঠা)।

হরীতকী চামড়া কষ করিবার জন্য, রং করিবার জন্য এবং কালী প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার সহিত



আমলকী

ফিট্‌কিরি মিশাইলে পাকা হরিদ্রা রং পাওয়া যায়। কালী প্রস্তুত করিবার জন্য ইহার সহিত হীরাকস ব্যবহার করিতে হয়।

হরীতকী মোরব্বা প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গলা দেশে বীরভূম হরীতকীর মোরব্বার জন্য বিখ্যাত। কাঁচা অবস্থায় শুকান হরীতকীকে জাঙ্গী হরীতকী বলে। ইহা জোলাপরূপে এবং রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩। আমলকী।

হরীতকীর মত আমলকীও বৈদ্যগণের একটী প্রিয় ঔষধ। আমাশয় প্রভৃতি উদরের রোগে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বণ্টিয়স্ (Buntius) বলেন যে যবদ্বীপে ওলন্দাজেরা তাহাদের হাঁসপাতালসমূহে আমাশয়ে ও পিত্ত-জনিত পীড়ায় আমলকী ও বিভীতকী (বয়েড়া) নিত্য ব্যবহার করিত। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাব-দেশে লোকেরা ইহার আচার ব্যবহার করিয়া থাকে। সুস্বাদ ও সুখাদ্য বলিয়া ইহা বহু পরিমাণে ভোজন করা হয়। ইহা হইতে বেশ মোরব্বাও প্রস্তুত হয়। শৈত্যোৎপাদক ও সারক এক প্রকার পানীয় ইহা হইতে প্রস্তুত হয়।

লৌহ কসের সহিত ইহা মসী প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

চর্ম্মকারেরা চর্ম্ম পরিষ্কার করিবার জন্য ইহা ব্যবহার করে।



জাম।

৪। জাম।

কাল-জামের ফল, পাতা, ত্বক্ ও বীজ ঔষধে ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যকগ্রন্থের মতে ইহা ধারক, রুক্ষ, এবং কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি ও দাহ নাশক।

আমাশয় প্রভৃতি উদর-রোগে ইহার ত্বক্ ব্যবহৃত হয়। অপক্ক ফল হইতে শিরকা প্রস্তুত করা হয়। এই শিরকা অগ্নিদীপক ও অরুচিনাশক বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

সম্প্রতি ডাক্তারগণ ইহার বীজ বহুমূত্র ও মধুমেহ রোগে ব্যবহার করিয়া অনেক ফললাভ করিয়াছেন।

ইহার ত্বক্ হইতে এক প্রকার সংকোচক গঁদ পাওয়া যায়। জাম হইতে এক প্রকার সুন্দর বেগুনিয়া রং পাওয়া যায়।

ছোট-জামের গাছ গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

[ক্রমশঃ]

শ্রীবামনদাস বসু।

মেঘদূত।

(ভূমিকা—১ হইতে ৫)

প্রভুর শাপে বর্ষব্যাপী-নির্ব্বাসনে তাড়িত
মহিমাহীন যক্ষ,—গুরু প্রিয়াবিরহে তাপিত—
—জানকী-স্নানে রামগিরিতে সলিল যথা পুণ্য,
স্নিগ্ধ তরু-ছায়ার তলে রহিত তথা ক্ষুণ্ণ। ১

সেহি গিরিতে প্রিয়াবিরহী রহিল মাস কতিপয়;
শিথিল হাতে স্বর্ণ-বালা, শীর্ণ দেহে যেমন হয়।
আষাঢ় মাসে প্রথম দিনে হেরিল মেঘ উদিত,—
করীর মত ক্রীড়নশীল, শৈলদেহে লম্বিত। ২

হেরিয়া মেঘ ধেয়ান করে কুবেরচর নিশ্চল;
অন্তরেতে বাষ্প ভরা বুকে বাসনা চঞ্চল।
জলদ হেরি সেহ শিহরে প্রিয়া যাহার অন্তিকে;
কি দশা তার, এল যে ফেলে কণ্ঠে বাঁধা পত্নীকে? ৩

শ্রাবণ যবে আসিবে, তবে, বাঁচিবে প্রিয়া কেমনে?
ভাবি, জানাতে চাহে কুশল-বারতা মেঘ-বাহনে।
নব কুটজ কুসুমে তাই অর্ঘ্য রচি সঁপিল।
"ভাল ত? এস!" বলিয়া, মধু-বচনে তারে তুষিল। ৪

অনিলে, জলে, আলোকে, ধূমে, গঠিত জড়মূরতি;
প্রাণীর মত দূতের কাজ সাধনে কোথা শকতি?
বিভল চিতে যক্ষ করে তবুও বৃথা আয়োজন;
বোঝে না প্রেমে আতুর নর, কেবা চেতন অচেতন। ৫

(মেঘসম্ভাষণ দ্বারা আরম্ভ ৬—১২)

পুষ্কর-আবর্ত্ত-কুলে জনম তব জলধর,
ইচ্ছাধীন শরীর ধর, দেবরাজের প্রধান চর।
দৈববশে প্রবাসী আমি, বন্ধু নাহি নিকটে;
মহান্ তুমি, তোমার কৃপা যাচি গো আজি সঙ্কটে।
অধমজন-সেবনে নাহি পূরাতে চাহি কামনা;
লজ্জা নাহি মহৎ-পদে ব্যর্থ হলে যাচনা। ৬

সন্তাপেতে দগ্ধ যারা, তুমি তা'দের শরণ হও;
কুবের-ক্রোধে দগ্ধ আমি,—প্রিয়ার তরে বারতা লও।
যক্ষপতিগণ-বসতি, যাইবে সেহি অলকায়;—
নগর-তট-কানন মাঝে আছেন দেব-দেব যথায়;
ধৌত পুরী-সৌধ তাঁরি ললাটোদিত চন্দ্রিকায়। ৭

চলিবে নভে,—পথিকবধূ পরাণে পূরি আশ্বাস,
হেরিবে তোরে ঊর্দ্ধমুখে সরায়ে হাতে কেশ-পাশ।
বন্দী আমি, পারি না যেতে! নহিলে হেরি তোমারে
বিরহাতুরা জায়ারে তেজি রহিতে দূরে কে পারে? ৮

চলিবে মন্দগতিতে পন্থা, অনুকূল বায়ু বহিবে;
অতীব মধুর নিনাদে চাতক সঙ্গে উড়িয়া রহিবে।
দোহদোৎসব সময় জানিয়া,—মালারূপে যেন সাজিয়া,
হে সুন্দর! তোরে সেবিবে বলাকা, গগনের পথে রাজিয়া। ৯

দিন গণি দিন কাটিছে প্রেয়সী, তাহারে জলদ, হেরিও;
কাছে যেতে কিছু সঙ্কোচ নাহি, ভ্রাতৃজায়া সম মানিও।
আশার বোঁটায় ফুলের মতন, কামিনীর প্রাণ থাকে রে।
নহিলে ঝরিত সে কোমল ফুল, গুরু বিরহের চাপে রে। ১০

গর্জ্জনে তব সফলা ধরণী, ফোটে শিলীন্ধ্র মহীতে,
যাইতে মানস-সরসে হংস, উন্মনা সেহি ধ্বনিতে,

লইয়া পাথেয়—মৃণালখণ্ড, উড়িবে হাঁসের পাঁতি;
কৈলাস তক্ হইবে তাহারা তোমার সাথের সাথী। ১১

আলিঙ্গিয়া তুমি কর সম্ভাষণ, তুঙ্গ শৈল সখারে,
অঙ্কিত যার কটিতে রামের পূজ্যচরণ-রেখা রে।
বরষ অন্তে যাহার মিলনে, বিরহ-দুঃখ স্মরিয়া,
স্নেহের প্রকাশে উষ্ণ অশ্রু, পড়ে দর দর ঝরিয়া। ১২

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

চিত্র।

বর্ত্তমান মাসের প্রবাসীতে আমরা শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত মেঘদূতের বিরহী যক্ষের ছবি প্রকাশ করিলাম। মূল ছবিখানি নানা স্বাভাবিক বর্ণে রঞ্জিত; আমরা উহা এক রঙ্গে ছাপিয়াছি। তাহা হইলেও আমাদের ছবিখানি হইতে মূল ছবির সৌন্দর্য্য অনেকটা বুঝা যাইবে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের অন্যান্য খ্যাতনামা চিত্রকর ইউরোপীয় রীতি অনুসারে ছবি আঁকেন। অবনীন্দ্রবাবু ভারতীয় রীতিতে ছবি আঁকেন; ইহা তাঁহার একটি বিশেষত্ব। তাঁহার বিরহী যক্ষের ছবি সম্বন্ধে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ চিত্রবিষয়ক মাসিক পত্র "দি ষ্টুডিও" বলেন :—

"The readers of *The Studio* will perhaps remember the work of the talented Bengali artist, Mr. Abanindra Nath Tagore, which was reproduced in the number for October, 1902. The two illustrations of Kalidasa's poem which are given in this number show a considerable advance in technical power, with no loss of the fine poetic expression which was apparent in his earlier work."

"In the first illustration the Yaksha is addressing the cloud, and Mr. Tagore has conveyed with much poetic insight the idea of the mysterious being, half-human, half-divine, seated on his lonely mountain top, over which the monsoon cloud is sweeping. Though he has brought considerable realistic truth into his rendering of the mountain mist sweeping through the trees, he has been faithful to the traditions of fine decorative feeling which the old School of Indian painting upholds. If other Bengali Art students follow in his footsteps, instead of slavishly imitating modern European Artistic methods, there is some hope of the rescue of Indian fine art from the depths of inanity to which it has fallen."

The Studio, June 1905.

মহাপ্রলয় ও প্রাচীন ভবিষ্যৎবাণী।

আমাদের অতি প্রাচীন ইতিহাস মহাভারতগ্রন্থে লিখিত আছে :—

ততো দিনকরৈর্দীপ্তৈঃ সপ্তভির্ম্মনুজাধিপ।
পীয়তে সলিলং সর্ব্বং সমুদ্রেষু সরিৎসু চ ॥
যচ্চ কাষ্ঠং তৃণঞ্চাপি শুষ্কং চান্দ্রঞ্চ ভারত।
সর্ব্বং তদ্ভস্মসাদ্ভূতং দৃশ্যতে ভরতর্ষভ ॥
ততঃ সম্বর্ত্তকো বহ্নির্বায়ুনা সহ ভারত।
লোকমাবিশতে পূর্ব্বমাদিত্যৈরুপশোষিতম্ ॥
ততঃ স পৃথিবীং ভিত্বা প্রবিশ্য চ রসাতলম্।
দেবদানব যক্ষাণাম্ ভয়ং জনয়তে মহৎ ॥
নিদহন্নাগলোকঞ্চ যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্ষিতাবিহ।
অধস্তাৎ পৃথিবীপাল সর্ব্বংনাশয়তে ক্ষণাৎ ॥

মহাভারত। বনপর্ব্ব। ১৮৮ অধ্যায়। ৬৫—৭১ শ্লোক।

অর্থাৎ, তারপর (প্রলয়কালে) দীপ্ত সাতটি সূর্য্য নদী ও সমুদ্রসমূহের সমস্ত জল শোষণ করিয়া লইবে। আর্দ্র ও শুষ্ক সমস্ত তৃণই ভস্মীভূত হইয়া পড়িবে এবং তৎসহ সপ্তসূর্য্য দ্বারা শুষ্ক পৃথিবীতে সংবর্ত্তক নামক অগ্নি বায়ুর সহিত উপস্থিত হইয়া পাতালে প্রবেশ করিবে। ইহা দেব-দানব-যক্ষগণের মহৎ ভয়ের কারণ হইবে। এই অগ্নিই নাগলোক ও পৃথিবীর অধঃস্থিত দ্রব্যসমুদায় ও অপর পদার্থ মাত্রকেই ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে লিখিত আছে : —

"Moreover, the light of the Moon shall be as the light of the Sun, and the light of the Sun shall be sevenfold as the light of seven days in the day the Lord bindeth the breach of his people, and healeth the stroke of their wound."

Isaiah (Chap. 30., V. 26)

অর্থাৎ,—সেই প্রলয়দিনে চন্দ্রালোক সূর্য্যালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে এবং সূর্য্যালোক সাত দিনের একত্রীভূত আলোকের ন্যায় সাতগুণ উজ্জ্বল হইবে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশীয় দুইখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থে পৃথিবীর পরিণাম সম্বন্ধীয় উক্তির এই প্রকার ঐক্য বড় বিস্ময়কর।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, মহাপ্রলয় সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিগণ যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি বিজ্ঞানসম্মত? একদল লোক বলেন, দৈববলে বলীয়ান্ ঋষিরা অভ্রান্ত। সুতরাং পৃথিবীর ধ্বংস যে শাস্ত্রোক্ত প্রকারেই হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। আমরা এই শ্রেণীর লোকের যুক্তি তর্কের উপর কোনও কথা বলিব না। যে একদল লোক, বিজ্ঞানসাহায্যে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাচীন উক্তিগুলির সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহাদের কথাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়

শেষোক্ত সম্প্রদায়ে এ সম্বন্ধে দুইটি মতবাদের প্রচলন দেখা যায়। কতকের মতে, ভূ-গর্ভ-নিহিত তাপই পৃথিবীর ধ্বংসের কারণ হইবে, অর্থাৎ পৃথিবী নিজের তাপেই ভস্মীভূত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন বাক্যের সাফল্য দেখাইবে। বলা বাহুল্য এই সিদ্ধান্তটিকে কোন ক্রমে বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় না। ভূ-গর্ভের তাপ যে, ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। কাজেই সেই ক্ষীয়মান তাপ দ্বারা অতি দূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর আকস্মিক ধ্বংসসম্ভাবনা, কোন বৈজ্ঞানিকেরই কল্পনায় স্থান পাওয়া উচিত নয়। ঐ দলের অপর বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে, সেই সূর্য্যই অকস্মাৎ প্রজ্বলিত হইয়া পৃথিবীর লয়-সাধন করিবে। কথাটা আলোচ্য বটে।

সূর্য্য অকস্মাৎ উজ্জ্বলতর হইয়া পৃথিবীকে ধ্বংস করিবে শুনিলেই, সৌরাকাশে প্রায় প্রতি বৎসরেই যে প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত উঠিয়া সৌর-কলঙ্কাদির উৎপত্তি করে, তাহারি কথা আমাদের মনে আসিয়া পড়ে। এই সকল ঝটিকাবর্ত্ত যে খুব বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়াও আমরা ইহাদের প্রভাব বুঝিতে পারি। কিন্তু যাহাতে পৃথিবী হঠাৎ ধ্বংস হইতে পারে, এ প্রকার সৌরোৎপাতের একটু লক্ষণও আমরা দেখিতে পাই নাই। সুতরাং সূর্য্য কর্ত্তৃক পৃথিবীর ধ্বংসসম্ভাবনা থাকিলে, তাহার আভ্যন্তরীণ অগ্নির দ্বারা যে সে কার্য্য কোন ক্রমে সম্পন্ন হইবে না, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। সূর্য্যের আকস্মিক প্রজ্বলনের জন্য বহিঃস্থ কোন জ্যোতিষ্কের সহিত ইহার সংঘর্ষ একান্ত আবশ্যক। ইহা ছাড়া অপর কোন উপায়ে পৃথিবীকে ধ্বংস করিবার উপযোগী তাপ সূর্য্যমণ্ডলে জন্মাইতে পারে না।

নূতন নক্ষত্রের আকস্মিক আবির্ভাব জ্যোতিঃশাস্ত্রের ইতিহাসের অভিনব ব্যাপার নয়। আজ চারি বৎসর অতীত হইল, বৃষরাশির নিকটবর্ত্তী পারসিয়স্ (Perseus) রাশিতে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ঐ প্রকার একটি নূতন নক্ষত্রের প্রজ্বলন দেখিয়াছিলেন, এবং কোনও দুইটি অনুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সংঘর্ষে এই অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া ইঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের সূর্য্য ঐ প্রকার কোনও জ্যোতিষ্কের ধাক্কা পাইয়া জ্বলিয়া উঠিতে পারে না কি?

এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সহজ নয়। আমাদের পরিচিত নক্ষত্রগুলি সৌরজগৎ হইতে এত অধিক দূরে অবস্থিত যে, অতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেও হাজার হাজার বৎসর অতিবাহিত না হইলে সূর্য্য নিকটতম তারকাটির কাছে উপস্থিত হইতে পারে না। দক্ষিণাকাশের সেণ্টৌরস্ (Centaurus) রাশির একটি নক্ষত্রকে জ্যোতিষিগণ আমাদের নিকটতম তারকা বলিয়া থাকেন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সূর্য্য যদি প্রতি সেকেণ্ডে দশ মাইল বেগে ছুটিয়া আমাদের সেই নিকটতম প্রতিবেশীর দিকে অগ্রসর হয়, তবে পথিমধ্যে প্রায় আশী হাজার বৎসর কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং আশী হাজার বৎসর পরে সূর্য্যের সহিত কোন নক্ষত্রের সংঘর্ষ হইবে কি না, তাহা এখন আলোচনা না করিলেও চলিতে পারে। দুই চারি হাজার বৎসরের মধ্যে সৌরজগতের কোনও বিপদ আছে কি না, তাহাই প্রথমে আমাদের আলোচ্য।

জ্যোতিষিগণ বলেন, আমরা রাত্রিকালে নগ্ন চক্ষুদ্বারা বা দূরবীণ সাহায্যে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহা ছাড়া আর এক জাতীয় তারকা সর্ব্বদাই আকাশের নানা স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। আকার প্রকারে আমাদের পরিচিত নক্ষত্রগুলির সহিত ইহাদের বিশেষ কোন অনৈক্য নাই। বহুকাল তাপালোক বিকীরণ করিয়া অনুজ্জ্বল হইয়া পড়ায় ইহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই না মাত্র। সুতরাং এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ঐ প্রকার কোনও নিকটবর্ত্তী অনুজ্জ্বল নক্ষত্রের সংঘর্ষে সূর্য্য কি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে না? ইহার উত্তরে আধুনিক জ্যোতিষিগণ বলিতেছেন,—যদি কোনও সময়ে সূর্য্যের তাপাধিক্যে পৃথিবীর ধ্বংস সম্ভবপর হয়, তবে আমাদের দৃষ্টিবহির্ভূত কোন অনুজ্জ্বল তারকার সংঘর্ষেই তাহা সংঘটিত হইবে। বৃহস্পতি শনি ইত্যাদি গ্রহ যেমন তাহাদের ক্ষুদ্র উপগ্রহ গুলিকে সঙ্গে লইয়া আকাশের একদিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, সূর্য্যও সেই প্রকার সমস্ত সৌরপরিবারকে সঙ্গে লইয়া, আকাশের একদিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সূর্য্যের এই স্বকীয় গতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর, গতির দিক্ লইয়া পণ্ডিত সমাজে কিছুদিন তর্ক বিতর্ক চলিয়াছিল। সম্প্রতি এই তর্কদ্বন্দ্বের অবসান হইয়াছে এবং সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন, সৌরজগৎ প্রতি সেকেণ্ডে দশ মাইল বেগে লাইরা (Lyra) রাশিস্থ অভিজিৎ (vega) নক্ষত্রকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সুতরাং সূর্য্য ও অভিজিৎ নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কোনও অনুজ্জ্বল মৃত নক্ষত্র সৌরজগতের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলে, উভয়ের সংঘর্ষে যে একটা বিকট অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

অধ্যাপক গোর (I. E. Gore) একজন খ্যাতনামা ইংরাজ জ্যোতিষী। ভবিষ্যতে সূর্য্যের সহিত কোনও অনুজ্জ্বল নক্ষত্রের সংঘর্ষ নিতান্ত অসম্ভব নয় ভাবিয়া, তিনি এসম্বন্ধে গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং সম্প্রতি তাহার ফল প্রকাশ করিয়াছেন। সূর্য্য ও অভিজিৎ নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী কোনও স্থানে সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ ও গতিশীল একটি

অনুজ্জ্বল নক্ষত্রের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। হিসাবে দেখা গেল, ঐ কাল্পনিক নক্ষত্র ও সূর্য্যের পরস্পর ব্যবধান একশত পঞ্চাশ কোটি মাইল না হইলে, আমরা পৃথিবী হইতে নক্ষত্রটির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিতে পারিব না। এই ব্যবধানে এটি সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হইয়া, একটি নবম শ্রেণীর তারকার ন্যায় আমাদিগকে দেখা দিবে।

দুইটি গতিশীল পদার্থ পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিলে, মহাকর্ষণের নিয়মানুসারে তাহাদের বেগ দ্রুততর হইয়া আসে। গতিবিজ্ঞানের এই নিয়ম অবলম্বনে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সূর্য্য ও সেই কল্পিত নক্ষত্রের ব্যবধান দেড়শত কোটি মাইল হইতে ছয় কোটি মাইলে পরিণত হইতে প্রায় বারো বৎসর অতিবাহিত হইবে, এবং সেই সময়ে নক্ষত্রটিকে আমরা পঞ্চম শ্রেণীর তারকার ন্যায় উজ্জ্বল দেখিতে থাকিব। পঞ্চম শ্রেণীর নক্ষত্র খুব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নয়। সুতরাং সূর্য্যের এত নিকটে আসিয়াও সেটি অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে না। কিন্তু ইহার পর ব্যবধান এত দ্রুত কমিতে আরম্ভ করিবে যে, পরবর্ত্তী চারি বৎসরের মধ্যে নক্ষত্রটি বৃহস্পতির কক্ষার নিকটবর্ত্তী হইয়া উজ্জ্বলতায় দুইটি শুক্র ও চারিটি বৃহস্পতির সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে। দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় ইহাকে আকাশে উদিত দেখিয়া, এই সময়ে ধরাবাসী মাত্রেরই বিস্মিত হইবার সম্ভাবনা।

ইহার পর সৌরজগৎ কি প্রকার বেগে সংহারক নক্ষত্রটির নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিবে, গোর সাহেব তাহারো হিসাব করিয়াছেন। এই গণনায় দেখা যায়, ৫১ দিনে পৃথিবীর কক্ষা অতিক্রম করিয়া পরবর্ত্তী অষ্টাহের মধ্যে সেটি এত প্রবল বেগে সূর্য্যে আসিয়া ধাক্কা দিবে যে, সেই সংঘর্ষণজাত তাপ দ্বারা সৌরজগৎ মুহূর্ত্তে এক জ্বলন্ত নীহারিকায় পর্য্যবসিত হইয়া পড়িবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সূর্য্যের উপর পড়িবার পূর্ব্বে সংহারক নক্ষত্রটি যখন ভূ-কক্ষার নিকটবর্ত্তী হইবে, তখন ইহার টানে পৃথিবীর কোনও অনিষ্ট হইতে পারে কি না। গোর সাহেব এ সম্বন্ধেও পৃথক গণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যায়, নক্ষত্রটি যদি সূর্য্যের গন্তব্য পথ ধরিয়া কোন বৎসরের ২১ জুন তারিখে ভূ-কক্ষার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে সূর্য্যের উপর পড়িবার পূর্ব্বেই নক্ষত্রটি দ্বারা পৃথিবীর ধ্বংস নিশ্চিত। এই অবস্থায় তারকাটি এত জোরে পৃথিবীকে টানাটানি করিতে থাকিবে যে, সূর্য্য কোন ক্রমেই সেই টান্ সাম্‌লাইতে পারিবে না। নক্ষত্র বক্রগতিতে সৌরজগতে প্রবেশ করিলে, আমাদের পৃথিবীর অবস্থা কি প্রকার হওয়া সম্ভাবনা, গোর সাহেবের গণনা দৃষ্টে তাহাও জানা যায়। এই গণনায় নাক্ষত্রিক সংঘর্ষ হইতে সূর্য্যের মুক্তির সম্ভাবনা দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীটি যে নিরাপদে থাকিতে পারিবে তাহা কোনক্রমেই মনে হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মহাভারতকার ও বাইবেলের লেখক বহুশতাব্দী পূর্ব্বে, পৃথিবীর পরিণাম সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত খাড় করাইয়াছিলেন, তাহা একবারে অসম্ভব নয়।

জ্যোতিষশাস্ত্রের উন্নতির সহিত আজকাল নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণের উপযোগী অনেক যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়ায়, আকাশের কোন্ অংশে কতগুলি নক্ষত্র দেখা যায়, তাহা স্থির হইয়া গেছে। এজন্য এখন অতি সহজেই নূতন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব তিরোভাব ধরা পড়িয়া যায়। সৌরজগতের গন্তব্যস্থান লাইরা রাশিতে বহু অনুসন্ধান করিয়াও অদ্যাপি কোন নূতন নক্ষত্রের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং গোর সাহেবের কথায় বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, আগামী চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে পুরাণোক্ত প্রকারে পৃথিবীর ধ্বংস হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

সখীর প্রতি বঙ্গবিধবার উক্তি।

আমারই মত তুমি পতিহীনা!—এস সহচরি,
মহামন্ত্র দিব তব কাণে কাণে—মধুর বচন!
তুমি চাও মরিবারে,—সে কি ভাল? বড় ভয়ঙ্করী
আত্মহত্যা,—তার বাড়া পাপ নাই!—মানবজীবন
বড়ই দুর্লভ সখি!—তাই চুপে, তিল তিল করি,
মরি আমি!—হৃদয়শ্মশান মাঝে, অগুরু চন্দন
আনি চুপে, বসাই লো প্রাণনাথে!—করি প্রজ্বলন
আপনারে, তাঁর সঙ্গে!—মহারঙ্গে চিতা উঠে ধরি!
অপূর্ব্ব এ সতীদাহ হয় নিত্য দিবস রজনী;
রূপকান্তি, সুখশান্তি সব যায়, সব যায় পুড়ে!
চিতার কালিমা-ছায়া পড়িয়াছে সারা মুখ যুড়ে!
কাঁদ কেন? শুনিছ না হুলুধ্বনি? ওই শঙ্খধ্বনি
হইতেছে! সুরনারী লাজমুষ্টি গগনের শিরে
ছড়াইছে!—হেসে হেসে, পুণ্যলোকে যাব লো অচিরে!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



শকুন্তলার পুত্র ভরত সিংহশাবকের দাঁত গণিতেছে।

মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর কর্ত্তৃক প্রবাসীর জন্য অঙ্কিত চিত্র হইতে।

প্রবাসী

"Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters.
"to look on noble forms
Makes noble thro' the sensuous organism
That which is higher."—*Tennyson.*

৬ষ্ঠ ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩। | ২য় সংখ্যা।

স্বদেশ-প্রেমের ব্যাধি।

ভারত-ক্ষেত্রে এক নব শক্তি দেখা দিয়াছে। ইহার অভ্যুদয় মাত্র আমরা দেখিতেছি; ইহার বিকাশ ভবিষ্যতের গর্ভে রহিয়াছে। ইহাকে নূতন শক্তি বলিতেছি কারণ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। যেরূপে ইহা জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং বিকশিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত আসিয়াছে, তাহা আমাদের চক্ষের উপরে রহিয়াছে বলিলে হয়। সে শক্তি স্বদেশ-প্রেম।

স্বদেশ-প্রেম বলিয়া যে শক্তি মানব-হৃদয়ে কার্য্য করে, তাহার প্রকৃতি যখন পর্য্যালোচনা করি, তখন বিস্ময়ে নিমগ্ন হইয়া যাই। স্বদেশ পদার্থটা কি? ইহা কোথায় থাকে? স্বাধীনতা বস্তুটা কি? তাহার আকৃতি প্রকৃতি কি প্রকার? দেখিতে পাই স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য লোকে প্রাণ দিতে পারে; যাহার জন্য প্রাণ দিতে পারে সে কি সামান্য জিনিস! এমন জিনিস এতদিন কোথায় ছিল? আজ কোথা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল? এ সমুদয়ই বিচিত্র কথা। স্বদেশ ছিল কিন্তু স্বদেশ-প্রেম ছিল না, কোথা হইতে স্বদেশ-প্রেম জাগিয়া উঠিতেছে!

ইহা কি সকল হৃদয়েই জাগে? ইহা নিঃস্বার্থ হৃদয়কে ধরে, এবং ধরিলে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা জগতের ইতিবৃত্তে দেখিয়াছি। আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের জন্মদাতা জর্জ্জ ওয়াশিংটন এবং নব্য ইটালীর জন্মদাতা ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির বিষয়ে চিন্তা করিলেই, স্বদেশ-প্রেম কিরূপ শক্তি ও ইহাতে কি করিতে পারে তাহা অনুভব করা যায়।

বিদেশীয় রাজাদিগকে প্রজাদিগের স্বদেশ-প্রেমকে ডরাইতে হয়; এইজন্য এই নব শক্তির আবির্ভাব মাত্র বিদেশীয় রাজাদিগকে শঙ্কিত ও তন্মনস্ক দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের রাজনীতিতে ইহাকে বাধা দিবার যত প্রকার উপায় হইতে পারে, সমুদয় তাঁহারা প্রয়োগ করিতেছেন। উচ্চশিক্ষার গতিকে মন্দীভূত করা, বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে একতা বর্দ্ধিত হওয়ার পথে বিঘ্নস্থাপন করা, স্বদেশ-প্রেমের উদ্দীপক চিন্তাসকলকে শিক্ষার্থীদিগের চিত্ত হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করা, প্রকাশ্য সভাদির ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করিবার চেষ্টা করা, স্বদেশ-প্রেমভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে প্রকারান্তরে দণ্ডিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করা, এ সমুদয়ই এক আশঙ্কা ও একই রাজনীতির পরিচায়ক।

কথা এই, বিদেশীয় রাজারা স্বদেশ-প্রেমের আগুন নিবাইতে পারিবেন কি না? পাঝার আগুন যখন একবার

ভাল করিয়া লাগে তখন তদুপরি বর্ষার ধারা পড়িলেও তাহাকে নিবাইতে পারে না। প্রশ্ন এই, এ স্বদেশ-প্রেম পাঁঝার আগুনের মত লাগিয়াছে কি না? চিন্তা করিয়া দেখিতেছি, লাগে নাই। দেশের অগণিত প্রজাসংখ্যার সহিত তুলনাতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মুষ্টিমেয় মাত্র। এই মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে সকলকে আবার ইহা ধরে নাই। অগণিত প্রজা ত নিম্নেই পড়িয়া রহিয়াছে। স্বদেশ বা স্বদেশ-প্রেম কাহাকে বলে, তাহারা জানে না। আর স্বদেশের কথা ভাবিবেই বা কখন? দুর্ভিক্ষে অনাহারে, মহাজন ও রাজার পীড়নে তাহাদিগকে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন, সন্ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত রাখিয়াছে। ভারতীয় প্রজামণ্ডলী যেন সেই পাঁঝা যাহার উপরদিকের খানকতক ইটে আগুন লাগিয়া ঝামা হইতেছে, অবশিষ্ট সমুদয় পাঝা কাঁচা ইটে পূর্ণ রহিয়াছে। বিদেশীয় রাজারা এ পাঝা যেন নিবাইতে সমর্থ না হন, সে বিষয়ে এদেশীয়দিগকে মনোযোগী ও সতর্ক থাকিতে হইবে।

এ ত গেল রাজাদিগের সহিত যেখানে সম্বন্ধ সেখানকার কথা। আমাদেরও ভাবিবার বিষয় অনেক আছে। অপরাপর প্রেমের ন্যায় স্বদেশ-প্রেমেরও কতকগুলি ব্যাধি আছে, তাহা আমাদিগকে সামলাইতে হইবে। দাম্পত্য প্রেমের ব্যাধি ঈর্ষা; বাৎসল্যের ব্যাধি সন্তানের দোষের প্রতি অন্ধতা; স্বধর্ম্মানুরাগের ব্যাধি সাম্প্রদায়িকতা; ইহা সকলেরই বিদিত। তেমনি স্বদেশ-প্রেমের কি কোনও ব্যাধি আছে? এইরূপ কতকগুলি ব্যাধির নির্দ্দেশ করিতেছি:—

প্রথম ব্যাধি, আমরা বিগত চল্লিশ বৎসর দেখিয়া আসিতেছি, যখনি এদেশীয়দিগের মনে স্বদেশ-প্রেম ও জাতীয়তার ভাব জাগিতেছে, তখনি তাহা বিদেশীয় বিদ্বেষের আকার ধারণ করিতেছে; আমাদের যাহা আছে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অপর দেশে যাহা আছে তাহা নিকৃষ্ট এবং আমাদের কাহারও নিকট কিছু লইবার নাই, এই ভাবটা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এটা স্বদেশ-প্রেমের একটা ঘোর ব্যাধি। জাপানবাসিগণের স্বদেশ-প্রেমের অর্থ যদি এই হইত তাহা হইলে জাপানকে আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইত না। বর্ত্তমান জাপানের উন্নতির ইতিবৃত্ত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে ঠিক ইহার বিপরীত ভাব থাকাতেই জাপান উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। ১৮৬৮ সালের পূর্ব্বে জাপানীর রাজনীতি চীনের রাজনীতির ন্যায় ঘোর বিদেশীবিদ্বেষী ছিল। জাপানবাসিগণ বিদেশীয়দিগকে আপনাদের দেশে বাণিজ্যাগার স্থাপন করিতে বা ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিতে দিত না। এমন কি তৎপূর্ব্বে মার্কুইস ইতোর ন্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকেও লুকাইয়া বিদেশে যাইতে হইত। বিদেশীয়দিগকে অতি কষ্টে জাপানে প্রবেশের অধিকারলাভ করিতে হইয়াছে। তৎপরে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে যখন এই রাজনীতি পরিবর্ত্তিত হইল, এবং জাপানবাসিগণ বিদেশীয় যাহা কিছু ভাল আছে, তাহার অনুশীলনে ও গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন হইতে জাপানের নব অভ্যুদয় আরম্ভ হইল। জাপানীয় গবর্ণমেণ্ট কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, সামরিক প্রণালী প্রভৃতি অনুশীলন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন; তাঁহারা দুই বৎসর কাল আমেরিকা ও ইউরোপের সমুদয় দেশে ভ্রমণ করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আসিলেন। তৎপরে তাহাদের সঞ্চিত জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল।

জাপান বিদেশীয় যাহা কিছু ভাল আছে তাহা দেখিলেন কিন্তু তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন না। সে সমুদয়কে আপনাদের অবস্থার অনুকূল করিয়া লইতে লাগিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে জাপানের সামরিক প্রণালী জার্ম্মান প্রণালীর অনুরূপ। রাজনীতি ও শাসন প্রণালী ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট প্রথার অনুরূপ। কিন্তু তাহা বলিয়া জাপান জার্ম্মান সামরিক প্রণালীর হুবহু অনুকরণ করেন নাই, তাহাকে নিজের অবস্থার অনুরূপ করিয়া লইয়াছেন এবং তাহাতে আপনার অনেক যোগ করিয়াছেন। যথা, জাপানী রাইফল জার্ম্মান রাইফলের আদর্শে নির্ম্মিত কিন্তু তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সৌভাগ্যক্রমে জাপানের সামাজিক অবস্থা ইংলণ্ডীয় পার্লেমেণ্ট প্রথার অনুকূল ছিল, এই জন্য জাপানে ইংলণ্ডীয় পার্লেমেণ্ট প্রথা প্রচলিত হইতে পারিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও জাপানের পার্লেমেণ্ট প্রণালীতে এমন অনেক নূতন বিষয় দেখা যায় যাহা ইংলণ্ডীয় শাসন-প্রণালীতে নাই।

ফলতঃ বিদেশে যাহা ভাল আছে তাহা দেখ, একথা যখন বলা যাইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে অনুকরণ আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু অনুসরণই উদ্দেশ্য। অনুকরণ ও অনুসরণে অনেক প্রভেদ। অনুকরণের অর্থ মূল ভাব ও আদর্শটার সহিত তাহার প্রকার ও প্রণালীটাও লওয়া,—অনুসরণের অর্থ মূল ভাব ও আদর্শটা লইয়া তাহাকে আমাদের অবস্থার অনুরূপ প্রকার ও প্রণালী দেওয়া। ইংরাজীতে একটাকে বলে imitation অপরটাকে বলে assimilation.

মোটের উপর এই কথা বলা যায়, অনুকরণের দ্বারা কোনও ব্যক্তি বা কোন জাতি অদ্যাপি মহত্বলাভ করে নাই; কিন্তু অনুসরণ ভিন্ন কেহ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। অনুকরণ সর্ব্বথা পরিহরণীয় কিন্তু অনুসরণ সর্ব্বথা অবলম্বনীয়। সুতরাং স্বদেশ-প্রেম যখন এই বিকৃত ভাব ধারণ করে, যে আমরা মনে করিতে থাকি যে আমাদের যাহা কিছু আছে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং অপরের নিকট আমাদের কিছু শিখিবার নাই, তখন আমরা তাহাকে ব্যাধিবিশেষ বলিয়া মনে করি এবং মনে মনে শোক করিতে থাকি।

এই অনুকরণ ও অনুসরণের প্রভেদ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আর একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। ইংরাজদিগের ন্যায় আত্মম্ভরী, দর্পিত ও বিজাতি-বিমুখ জাতি অল্পই আছে। ইঁহারা মনে করেন, ইঁহাদের সমতুল্য জাতি আর নাই। সকলে ইঁহাদের অনুসরণ করিবে, ইঁহারা কাহারও অনুসরণ করিবেন না। এই জাতীয় গর্ব্ব ইঁহাদিগকে ইউরোপের সকল জাতির অপ্রিয় করিয়াছে, কাহারও নিকট যে কিছু শিখিতে হইবে ইহা ইংরাজেরা মনে করিতেন না। কিন্তু তাঁহাদিগকেও ফ্রান্স এবং জার্ম্মানির নিকট অনেক বিষয় শিখিতে ও লইতে হইয়াছে। ইংলণ্ড অপেক্ষা জার্ম্মানি ও ফ্রান্সের লোকের মৌলিকতা অধিক। ইংরাজদিগের একপ্রকার স্থিতিশীলতা আছে যাহাকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়া মৌলিকতার ভূমিতে আরোহণ করা অল্প লোকেরই সাধ্যায়ত্ত। তদ্ভিন্ন ইঁহাদের উদ্ভাবনী বৃত্তি অপেক্ষা কার্য্যকারিণী বুদ্ধি অধিক প্রবল; সেজন্য মৌলিকতার পথে ইঁহারা তত শীঘ্র যান না। কারণ যাহাই হউক ফলে দেখা যাইতেছে যে প্রবল জাতীয় গর্ব্ব সত্বেও ইংরাজদিগকে শিক্ষাদি সম্বন্ধে অনেক বিষয় জার্ম্মানি ও ফ্রান্সের নিকট হইতে লইতে হইয়াছে। আমরা ইংরাজ রাজ্যে বাস করি, ইংরাজী ইতিবৃত্তে অভিজ্ঞ, ইংরাজী ভাষাতে কথা কহি এবং চিন্তা করি, সুতরাং ইংরাজের যাহা আছে, তাহাই উন্নতির আদর্শ ইহা ভাবা আমাদের পক্ষে বিস্ময়কর নহে। এখনও অনেক বিষয়ে ইংলণ্ড ফ্রান্স, জার্ম্মান প্রভৃতির পশ্চাতে রহিয়াছে; এবং তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। যেমন ইংলণ্ডের বর্ত্তমান দর্শন বহুল পরিমাণে, ক্যাণ্ট হিগেল প্রভৃতির চিন্তার অনুসরণে পরিপুষ্ট; তেমনি বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষাপ্রণালী ইউরোপীয় জাতিদিগের আদর্শে গঠিত। ইংরাজদিগের ন্যায় জাতীয়তা গর্ব্বে স্ফীত জাতিকেও পরের অনুসরণ করিতে হইতেছে। সুতরাং আবার বলি, এদেশীয়-দিগের স্বদেশ-প্রেমের অর্থ যদি এই হয়, যে অপরের যাহা ভাল আছে তাহা দেখিতে হইবে না কি লইতে হইবে না, তবে বলি ইহা স্বদেশ-প্রেমের একটী ব্যাধি মাত্র।

স্বদেশ-প্রেমের দ্বিতীয় ব্যাধি, স্বদেশের অতীতের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি। অতিরিক্ত শব্দ এই জন্য ব্যবহার করিতেছি, যে স্বীয় দেশের অতীতে যাহা কিছু ভাল ছিল তাহার প্রতি যাহাদের ভক্তি নাই, তাহারা জাতীয় উন্নতিলাভে কখনই সমর্থ হইতে পারে না। অতীতে যাহা কিছু ভাল ছিল তাহার সংরক্ষণের জন্যই ঈশ্বর মানব-হৃদয়ে অতীতের প্রতি আস্থা দিয়াছেন। ইহা না থাকা মানব-হৃদয়ের বিকারের মধ্যে গণ্য। বেদমন্ত্রগুলি একবার পাঠ কর, তাহাদের সংখ্যা একবার গণনা কর, তৎপরে চিন্তা কর সেগুলি কিরূপে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া নামিয়া আসিয়াছে। তাহার অনেকগুলি যখন রচিত হইয়াছে তখন লিখিবার প্রণালী লোকের জানা ছিল না। অধিকাংশ স্থলে এগুলিকে মুখস্থ করিয়া কণ্ঠে কণ্ঠে দেওয়া হইয়াছে। অতীতের প্রতি কিরূপ আদর থাকিলে এগুলি কণ্ঠে কণ্ঠে নামিয়া আসিতে পারে তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখ। অতীতের প্রতি এই স্বাভাবিক আস্থা না থাকিলে আমরা কি ওগুলি প্রাপ্ত হইতাম? এইরূপ সর্ব্বদেশেই মানব-হৃদয়ের অতীত-ভক্তি অনেক উৎকৃষ্ট বিষয়কে জাতীয় সম্পদরূপে রক্ষা করিয়াছে।

তৎপরে যদি চিন্তা করিয়া দেখা যায়, দেখা যাইবে, যে

অতীতকে বিস্মৃত হইয়া অতীতকে অগ্রাহ্য করিয়া বর্ত্তমানের উন্নতি হইতে পারে না। উন্নতির অর্থ, দেশ যতদূর আসিয়াছে, তৎপরে তাহাকে লইয়া যাওয়া। সুতরাং যাঁহারা অগ্রসর হইবার জন্য পা বাড়াইতেছেন তাঁহাদিগকে দেখিতে হইবে কোথা হইতে পাখানা তুলিতেছেন। এইরূপেও অতীতকে ছাড়িয়া বর্ত্তমানের উন্নতিসাধন সম্ভব নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে বৃত্তি অতীতকে সংরক্ষণ করে তাহা মানবের উন্নতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

অতীতের প্রতি যে ভক্তি তাহার সপক্ষে এত কথা বলিয়াও ইহা বলিতে হইতেছে যে অতীতের প্রতি সেই ভক্তি অতিরিক্ত যাহা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রোধ করে। আমাদের যাহা ছিল তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল এবং আমাদের আর উন্নতি করিবার নাই; যে স্বদেশ-প্রেম এই কথা বলে তাহা ব্যাধিবিশেষ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মনে কর মহারাজা রণজিৎ সিংহের সময় কোনও শিখ সর্দ্দার বিশজন অশ্বারোহী অনুযাত্রিক, কেহবা ত্রিশজন অনুযাত্রিক সহ বাহির হইতেন। এখন যদি দেখ তাঁহাদের বংশধরগণ, সেই অতীত গৌরবের স্মৃতি ভুলিতে না পারিয়া কর্ম্মকাজে প্রবৃত্ত হইতেছেন না, আলস্যে কাল কাটাইতেছেন, এবং যাত্রা মহোৎসবাদিতে পূর্ব্ব গৌরবের অভিনয় করিয়া কেহ বিশ কেহ বা ত্রিশটা বেটো ঘোড়ার উপর পথ হইতে সংগৃহীত কতকগুলি রুগ্ন দুর্ব্বল লোক বসাইয়া অনুযাত্রিক সাজাইয়া বাহির হইতেছেন, তাহা হইলে কে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে পারে? সেইরূপ যে জাতি নিজ পূর্ব্ব গৌরবের অভিমানে স্ফীত হইয়া বর্ত্তমানের উন্নতিসাধনে বিমুখ তাহারাও অশ্রদ্ধেয় এবং তাহাদের অতীতানুরাগ ব্যাধিবিশেষ।

স্বদেশ-প্রেমের তৃতীয় ব্যাধি, আমরা কি আছি তাহার প্রতি অধিক মনোযোগ না দিয়া আমাদিগকে অন্যেরা কি বলিতেছে ও কি দেখিতেছে সেই দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া ও সেই বিবাদে কাল হরণ করা। যথার্থ স্বদেশ-প্রেমিক তাঁহারা যাঁহারা আত্ম-চেষ্টা দ্বারা আত্মোন্নতিসাধনে তৎপর হইয়াছেন। যেমন গৃহস্থে গৃহস্থে সর্ব্বদা কলহ করিয়া থাকে "কেন আমাদের ছেলে মন্দ কাজটা কি করিয়াছে? যেটা ওর দোষ বলিতেছ সেটা দোষ নয়, সেটা ওর গুণ" তেমনি একশ্রেণীর স্বদেশ-প্রেমিক দেখি যাঁহার নানা যুক্তি উদ্ভাবন করিয়া আপনাদের দেশে যাহা কিছু আছে তাহার সমর্থন করিবার জন্য ব্যগ্র। যে শক্তি তাঁহারা এই কার্য্যে ব্যয় করেন তাহার অর্দ্ধেক যদি দেশের কুরীতি, কুনীতির উন্মূলনে নিয়োগ করিতেন তাহা হইলে দেশের অনেক কল্যাণ হইত। একথা নিশ্চিত আমাদিগকে আপনাদের চেষ্টাতে মহত্ত্ব লাভ করিতে হইবে। আমাদিগকে কেহ জাতীয় মহত্ত্ব আনিয়া দিবে না বা কিনিয়া দিবে না। আপনাদের দোষ আপনারা সংশোধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া দুর্ব্বলতার পরিচায়ক নহে সবলতারই পরিচায়ক। যে জাতি আত্ম-সংশোধন ও আত্মোন্নতি সাধনে দৃঢ়ব্রত তাহাকে অপর জাতিরা শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। বিদেশীয় রাজারা আমাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন জানিয়া আমরা সকলেই দুঃখিত। ইহাতে কে না দুঃখিত হইবে? যাঁহাদিগের হস্তে শাসন-কার্য্যের ভার তাঁহারা যদি প্রজাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন তাহা হইলে কি প্রকারে সুশাসন হইতে পারে? কিন্তু আমরা শ্রদ্ধার কি কারণ দিয়াছি, তাহাও ত একবার দেখিতে হইবে? আমরা স্বীয় চেষ্টায় দেশের কোন্ দোষটা সংশোধন করিয়াছি? রাজারা যদি আমাদিগকে বলেন, "দেখ আমরা তোমাদের সতীদাহ প্রথা নিবারণ করিয়া দিয়াছি, রাজপুতদিগের মধ্যে শিশুহত্যা নিবারণ করিয়াছি, ধর্ম্মের নামে নরবলি প্রভৃতি হইত তাহা বিলুপ্ত করিয়াছি, সিন্ধু প্রভৃতি দেশে যে নারীহত্যা বহু প্রচলিত ছিল তাহা বারণ করিয়াছি। বল তোমরা স্বীয় চেষ্টায় কি কতদূর করিয়াছ? তোমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা কত বৎসর ধরিয়া বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, নারীর চির বৈধব্য, জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতির প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন; কৈ তাঁহারা কে কি করিয়াছেন? তোমাদের যত বিক্রম আমাদের পশ্চাতে লাগিবার সময়, আর দয়া ও সুকোমল ভাব নিজেদের দোষগুলিকে ধরিবার সময়; ইহা দেখিলে তোমাদের প্রতি কিরূপে শ্রদ্ধা থাকিতে পারে?" একথা যদি রাজারা আমাদিগকে বলেন, তবে তাহার উত্তর কি?

বর্ত্তমান স্বদেশ-প্রেমের উদ্দীপনার সময় একটা ভাব দেখিয়া মনে বিষাদ উপস্থিত হইতেছে। সে ভাবটা এই, জাতীয় সামাজিক জীবনকে হীন অবস্থাতে থাকিতে দিয়াও

যেন রাজনীতি সম্বন্ধে অতি উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারা যায়। ইহা অপেক্ষা ঘোরতর ভ্রান্তি আর হইতে পারে না। বুয়ার যুদ্ধের সময় লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল, যে এক এক জন বুয়ারের জন্য পাঁচ পাঁচ জন ইংরাজ প্রয়োজন হইল, তবে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারা গেল। ইহার ভিতরকার কারণ কি? ভিতরের কারণ এই, ইংরাজগণ সুখপ্রিয়, বিলাসী হইতেছেন এবং তাঁহাদের সামাজিক জীবনে এরূপ অনেক দোষ প্রবেশ করিতেছে, যাহাতে তাঁহাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে। প্রাচীন রোমকদিগেরও এইরূপ দশা ঘটিয়াছিল; সামাজিক জীবনের অধোগতি নিবন্ধনই রাজনৈতিক জীবনের অধোগতি ঘটিয়াছিল।

আমরা যে জাতীয়ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইব, আমাদের সে শক্তি কৈ? শক্তি যদি থাকিত তাহা হইলে যে ক্ষেত্রে আমাদিগকে বাধা দিবার কেহ নাই সে ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইত। একবার বিগত সেনসস্ রিপোর্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ আমরা কি সামাজিক অবস্থাতে বাস করিতেছি! জিজ্ঞাসা করি আমাদের সামাজিকভাবে কি কিছু করিবার নাই? এবিভাগ কি স্বদেশ প্রেমের এলাকার অন্তর্গত নহে? এদিকে স্বদেশ-প্রেমিকদের দৃষ্টি সেরূপ পড়ে না কেন? ইহাতে কি এই প্রমাণ হয় না, যে, যেদিকে সামাজিক নিগ্রহের ভয় স্বার্থনাশের ভয় সে দিকে তাঁহাদের বিক্রমের অভাব, আর যেদিকে বিনা খরচে কেবল চীৎকার মাত্র দ্বারা স্বদেশ-হিতৈষী নাম কেনা যায় সেইদিকে তাঁহাদের প্রচুর বিক্রম? এটাও স্বদেশ-প্রেমের ব্যাধি। স্বদেশ-প্রেমিকদিগকে স্বদেশ-প্রেমের এই ব্যাধিগুলিকে পরিহার করিতে হইবে।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

স্বদেশী-প্রচেষ্টায় শিক্ষিত লোকের কর্ত্তব্য।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের "সায়েন্টিফিক্ আমেরিকানে" "দি কামিং বী" বা ভবিষ্যতের মৌমাছি শীর্ষক একটি প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল। আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনার সৌকার্য্যার্থে তাহার সার মর্ম্ম নিয়ে দিতেছিঃ—

"সাধারণ মধুমক্ষিকার শুঁড় (proboscis) তত লম্বা নহে বলিয়া উহা লাল ক্লভার ও অন্যান্য অনেক রকম ফুলের মধু চুষিয়া লইতে পারে না। ভারতবর্ষে "জায়েন্ট বী" নামক যে একপ্রকার অতি বড় মধুমক্ষিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার সাঙ্কর্য্যবিধান করিলে এই অভাব দূর হইতে পারে। যুক্ত-রাজ্যে যে মৎস্য-বৈঠক (Fish Commission) বসিয়াছিল তাহার পরীক্ষাকার্য্য দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, জাপানে যে একপ্রকার আহার্য্য জেলি মাছ (Jelly fish) পাওয়া যায়, তাহার সহিত আমেরিকার শ্যাড্ ও ফ্লাউণ্ডার মাছের সাঙ্কর্য্য-বিধান করিলে শ্যাড্ মাছের কাঁটার অংশ এতটা কমান যাইতে পারে যে তাহাকে কাঁটাশূন্য বলিলেই চলে। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গুডেল সাহেব বলিয়াছেন যে, এমন সময় আসিবে যখন সর্ব্ববিধ ফল বীজশূন্য হইবে। তাঁহার এই উক্তির সত্যতার আভাস এখনই পাওয়া যাইতেছে। এখন এরূপ কলা উৎপন্ন হইতেছে যাহাতে আদৌ বীজ নাই, কিংবা বীজগুলি এত অপরিণত ও সূক্ষ্ম যে কাল কাল দাগের মত মাত্র দেখায়। এই বীজ বপন করিলে তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। মাঝে মাঝে বীজশূন্য কমলালেবুও দেখিতে পাওয়া যায়। কাঁটাশূন্য শ্যাড্ মাছ ও বীজশূন্য ফল উৎপাদন করা যদি সাধ্যায়ত্ত হইয়াছে তবে হুলশূন্য মধুমক্ষিকার আবির্ভাবও অসম্ভাবিত নহে। দক্ষিণ আমেরিকায় দ্বিবিধ হুলশূন্য মৌমাছি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহারা মধুসংগ্রহে তত পটু নহে। তাহাদের সহিত সাধারণ মধুমক্ষিকার সাঙ্কর্য্যবিধানে হুলশূন্য মৌমাছি উৎপন্ন হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। উক্ত প্রণালীতে মৌমাছির শুঁড় লম্বা হইবে ও এই উপায়ে উহা হুলশূন্য হইবে। এই দুই গুণের সহিত ইটালীর মৌমাছির সদ্‌গুণগুলি যুক্ত হইলেই মধুমক্ষিকার চরমোৎকর্ষ হইল বলিতে পারা যায়।

"এই পরীক্ষাকার্য্যের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। ব্যক্তিবিশেষের ইহার উপযোগী গুণ থাকিলেও অর্থাভাবে তাহা দ্বারা এ কাজ হইতে পারে না। যেরূপ লাভের

আশা আছে তাহাতে যুক্ত-রাজ্যের কৃষিবিভাগের এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে যুক্ত-রাজ্যে আড়াই কোটি পৌণ্ড (এক পৌণ্ড=প্রায় আধসের) অর্থাৎ সেই বৎসরের লোকসংখ্যার জন প্রতি আধ পৌণ্ড মধু উৎপন্ন হইয়াছিল। মৌমাছি হুলশূন্য করিতে পারিলে অনেকেরই মধুর চাষে প্রবৃত্তি হইবে; স্থানে স্থানে বিশেষ বিশেষ শস্য উৎপাদন করিয়াও মৌমাছি জড় করিবার সুবিধা করা যাইবে। বেশী মধু উৎপন্ন হইলে তাহার দাম কমিয়া যাইবে বা খরিদ্দার যুটিবে না এরূপ আশঙ্কা অমূলক। ইহাই সাধারণ নিয়ম যে, কোনও জিনিস যে পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহার কাট্‌তিও সেই পরিমাণে বাড়িয়া যায়। পূর্ব্বে বিলাতী বেগুনের বিক্রয়ই ছিল না, এখন তাহার কত কাট্‌তি। মধুর কাট্‌তি না হওয়ার কারণ এই যে, লোকে তাহার ব্যবহার জানে না। জন প্রতি বৎসরে আধ পৌণ্ড মধু খরচ হইয়া থাকিলে বড়ই কম খরচ হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহারও আবার অধিকাংশই ঔষধ প্রস্তুত করিতে লাগিয়াছে।"

মধুর চাষের উৎকর্ষসাধন উক্ত প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও প্রসঙ্গক্রমে মৎস্য ও ফলের চাষের উন্নতিবিধানের আভাসও আমরা ইহাতে পাইতেছি। এই প্রস্তাবের পর প্রায় চৌদ্দ বৎসর কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে এই সকল বিষয়ে উন্নতি যুক্ত-রাজ্যে হইয়া গিয়াছে। এই সে দিন "অমৃত বাজারে" দেখা গেল যে, সেখানে মাছের হাসপাতাল পর্য্যন্ত হইয়াছে। এই স্বদেশী-প্রচেষ্টার দিনে, এই "সরকারী চাকরী করিব না" বলিয়া কোমর বাঁধিবার দিনে, সর্ব্বোপরি এই জীবন-সংগ্রামের দিনে, আমাদেরও এই তিনটি খাদ্যের উৎকর্ষসাধনে মনোযোগ দেওয়া অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমরা উক্তরূপ কোনও দুঃসাধ্য প্রস্তাব উত্থাপন করিব কেহ যেন সে ভয় না করেন। আমরা গরীব, যে যৌথকারবার লক্ষ্মীর কৃপালাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া সকল দেশে অবলম্বিত হইতেছে তাহা চালাইতেও আমরা অভ্যস্ত হই নাই। সরকারী সাহায্যলাভের আশাও আমাদের পক্ষে দুরাশা মাত্র। সুতরাং আমরা ব্যক্তিগত চেষ্টায় এ বিষয়ে কতটা কাজ করিতে পারি তাহাই একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

অপেক্ষাকৃত আয়াসসাধ্য কৃষিকর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে এবং এই সকল কাজ হীনকর্ম্ম বলিয়া আমাদের যে বদ্ধমূল কুসংস্কার আছে তাহা দূর করিতে হইলে ফলের চাষই প্রথম সোপান বলিয়া মনে হয়। সম্মার্জ্জনী হাতে লইয়া রাস্তা পরিষ্কার করিতে আমাদের অনেকেই হয় ত পারি না, কিন্তু চাকরচাকরাণীর অভাবে বাড়ীর ও ঘরের ভিতরে ঝাড়ু দিতে তত সঙ্কোচ বোধ হয় না, অনেক সময়ে দিয়াও থাকি। তদ্রূপ বাড়ীতে ও বাড়ীর আশে পাশে দুই চারিটা ফলের গাছ জন্মাইতে আমাদের "হাত আসলে" ও মন চাললে "ক্ষেতে নামিতে" কতক্ষণ? এ ক্ষেত্রে আমাদের যে অভাব আছে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমি যখন আমাদের মত একখানি বাড়ীর কথা ভাবি তখন মনে হয়, এমন বাড়ী থাকিতেও লোকের "অন্নচিন্তা চমৎকারা" উপস্থিত হয়! এমন সময় ছিল যখন আমাদের বাড়ীর আম কাঁঠাল শেয়াল কুকুরে খাইয়া শেষ করিতে পারিত না, এখন আমাদেরও খাইতে হইলেই কিনিতে হয়। আমাদের বাড়ী একটি আমগাছ ছিল, তার নাম ছিল "সেরকিয়া," তাহার এক সের ওজনের একটি আম খাইলে দিব্য জলযোগ হইত। এখনও "পাথরিয়া" ও "আষাঢ়িয়া" নামক দুইটি গাছ আছে; এক একটি আমের ওজন প্রায় দুই সের হইবে; আঁটি ছোট ও পাতলা, পোকাও হয় না। "আষাঢ়িয়া" গাছটির ফল আষাঢ় মাসে পাকে বলিয়াই তাহার এই নাম হইয়াছিল, কিন্তু গাছটি কিছু উচ্চ ও ফলের বোঁটা অত্যন্ত নরম বলিয়া বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আমাদের অঞ্চলে যে প্রবল ঝড় হয় তাহাতে কাঁচা থাকিতেই আমগুলি ঝরিয়া যায়। আমি এ পর্য্যন্ত তাহার ফল পাকিতে দেখি নাই। বাড়ীর অন্যান্য গাছেরও যেমন এই দুইটি গাছেরও তেমনই কোনও যত্ন নাই; কাজেই ফলন অত্যন্ত কম। আমাদের বাপ-দাদারা হয় ত কত যত্ন করিয়া এই সকল গাছ জন্মাইয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের এমনই সুসন্তান যে, তোতা পাখীর মত শ্রাদ্ধের মন্ত্র আওড়াইয়াই তাঁহাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যের সমাধা করি, তাঁহাদের এই সুন্দর স্মৃতিচিহ্নগুলি রক্ষা করিয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। এক একটি গাছ কত

কালের সাক্ষী, কত সুখ-দুঃখ স্নেহ-বাৎসল্যের স্মৃতি তাহাদের সহিত জড়িত, তাহারা কেমন মানুষের অমরত্বের ছাপমারা। অকৃতজ্ঞ আমরা, আমাদের হাতে তাহাদের এরূপ লাঞ্ছনা হয়! এরূপ আরও কত উৎকৃষ্ট জাতীয় ফলের গাছ আমাদের বাড়ীতে ও পাড়ায় যত্নাভাবে নষ্ট হইতেছে। আমাদের পাড়ায় একটি মিষ্ট তেঁতুলের গাছ ছিল তাহার তুলনা আমি এ পর্য্যন্ত কোথাও পাই নাই, অথচ মিষ্ট তেঁতুল ঢের দেখিয়াছি। স্বর্গীয় সুনামখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের বিক্রমপুরস্থ কবিকল্পনাযোগ্য ভদ্রাসনটি কয়েক বৎসর হইল পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে। তাহাতে কত উৎকৃষ্ট ফল ও ফুলের গাছ ছিল। তন্মধ্যে দুইটি বিভিন্ন জাতীয় "কাঁচামিঠা" আমের গাছ ও একটি উৎকৃষ্ট কুলের গাছের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। দুঃখের বিষয় ইহাদের চিহ্নমাত্র চতুঃপার্শ্বস্থ কোনও গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল দৃষ্টান্তে ফলের চাষে শিক্ষিত লোকের চেষ্টার অভাবই কি সূচিত হইতেছে না? শুধু প্রকৃতির উপর ও যাহারা পেটের জ্বালায়ই অস্থির সেই সাধারণ লোকের উপর নির্ভর করিয়া আর কতকাল চলিবে? মুর্শিদাবাদের শ্রীযুক্ত মহেশনারায়ণ রায় ও পাইকপাড়া নর্শারি বিবিধ ফলের কলমের তালিকা প্রকাশ করিয়া ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত "কৃষকে" ফল-চাষ সম্বন্ধে বিবিধ সুপরামর্শ দিয়া দেশের মঙ্গলসাধনে যদিও যত্নবান্ আছেন বটে, তথাপি মনে হয়, বড় লোকদের বাগানের তাহাতে যে উপকার হইতেছে, সাধারণ লোকের বিশেষতঃ সাধারণ শিক্ষিত লোকের, সেই সুবিধার দিকে তত লক্ষ্য নাই। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যেরূপ বিস্তৃতভাবে ল্যাংড়া আম, পেয়ারা, কুল ও খরমুজের (আগ্রা ও লক্ষ্ণৌর খরমুজের চাষই বিশেষরূপে বাঞ্ছনীয়) চাষ হইয়া থাকে বঙ্গদেশের অন্ততঃ স্থানে স্থানে তদ্রূপ হইতে পারে না কি? উক্ত তালিকাদ্বয় পড়িলে ত মনে হয় অল্প বিস্তর চাষ হইয়াই থাকে। ফাল্গুনের "কৃষকেও" পড়িলাম "তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতির চাষ ফাল্গুন মাসে শেষ করিলেই ভাল হয়"। সাইবিরিয়ার গাছ যখন আমেরিকায় জন্মান যাইতে পারে তখন চেষ্টা করিলে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ফল বঙ্গদেশের স্থানবিশেষে উৎপাদন করা যায় না, একথা সহজে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। কাবুলী ফলের দৌড় পঞ্জাব পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। আরও পূর্ব্বাভিমুখে কবে তাহার শুভ অভিযান হইবে ভগবানই জানেন। কাবুলী ফল বিক্রেতারা আমাদের চোখের উপর হইতে বৎসর বৎসর কত টাকা লইয়া যায় তাহা আমরা একবার ভাবিয়া দেখি কি? তাহারা রাস্তায় ফেরি করিতে করিতেও মুষ্টি মুষ্টি ফল খাইয়া থাকে। এই ফলাহারের প্রভাব তাহাদের বিপুল শরীরের উপর নাই কে বলিতে পারে? আমি কোনও দুঃসাধ্য প্রস্তাব উত্থাপন করিব না বলিয়া যদিও প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তথাপি পাঠকদের অবগতির জন্য বলিতেছি যে, বিকানীরের বিলাতফেরত মহারাজা মরুভূমির বালুকা অপসারিত করিয়া প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহা মৃত্তিকা দ্বারা ভরাট করিয়া তাহার উপর বাগানবাড়ী প্রস্তুত করাইয়াছেন। তিনি যাহা বহুব্যয়ে বিস্তৃতভাবে করিয়াছেন তাহা আমরা আংশিক রূপেও করিতে পারি। গত ফেব্রুয়ারি মাসের "এগ্রিকালচারিষ্ট" পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যুক্ত-প্রদেশে কি প্রণালীতে 'উষর' জমী উর্ব্বর করিবার সরকারী চেষ্টা চলিতেছে। অবশ্য ইহাতে এখনও আশানুরূপ ফল হয় নাই।

ফলের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। ফলাহার, ফলাহারী প্রভৃতি কথাগুলি যদিও আমাদের দেশেই প্রচলিত, স্বচ্ছন্দবনজাত কন্দমূলফলাদি আহার করিয়া আমাদের দেশের মুনি ঋষিরাই জীবনধারণ করিতেন ইহা যদিও সত্য, এবং যদিও মরসুমী ফল (Season fruits) ধনী, নির্ধন সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে খাইয়া থাকে, তথাপি নির্ব্বিবাদে বলা যায়, ফল খাওয়ার একটা রীতি আমাদের দেশে নাই, ইহা আমাদের নিত্য আহার্য্যের অংশ বিশেষ নহে। বড় লোকেরাও ইহা সখ করিয়া মাত্র খান বলিয়া মনে হয়। তবে কি আমরা ফলের ব্যবহার জানি না? আজকাল 'ভেজাল' যেরূপ 'ভজাইতে' আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে চাউল, ডাইল, তরকারী, ফল, মাছ প্রভৃতি অতি অল্পসংখ্যক কয়েকটি জিনিস খাইলেই মনকে প্রবোধ দেওয়া যায় যে খাঁটি জিনিসটি খাইলাম। যে দুধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া স্বীকৃত (খাদ্যবিচার সম্বন্ধে যাঁহারা এখনও ইতিকর্ত্তব্যতা

স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই তাঁহাদিগকে গিলেস্পি সাহেবকৃত "The Natural History of Digestion" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি) তাহারই নকল নাম দাঁড়াইয়াছে "সাদা পানি" (পানিটুকু খাঁটি হইলেও যে রক্ষা ছিল। তখন দুগ্ধজাত অন্যান্য জিনিসের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এরূপ অবস্থায় বাজারের লুচি কচুরী মিঠাই মিঠাইগুলিকে তাড়াইয়া আমাদের জলযোগের স্থান অধিকার করিবার শক্তিও কি ফলের নাই? আমরা খাইতে বসিলেই বালিশের খোলটির মত উদরটির সকল কোণ ভরিয়া ফেলিতে চাই, কোন্ খাদ্যে কি পরিমাণ পুষ্টিকর উপাদান আছে তাহার বিচার করিয়া কোনওটি বা বেশী কোনটি বা কম খাইতে হয় এ চিন্তা আমাদের মনে আদৌ স্থান পায় না। মাছ ভাতও যে পরিমাণ পেটে যায়, মাংস-পলান্ন পাবি ত তার চেয়েও ঠুসিয়া ভরি। এরূপ বিচারের অভাবই বোধ হয় আমাদের ফলাহার প্রবৃত্তির প্রধান অন্তরায়। দ্বিতীয় বাধা ফলের অভাব বা মহার্ঘতা। কখন কোনও মরসুমী ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ও সস্তা হয়, তখন আমরা আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া খাইতে ছাড়ি না। বস্তুতঃ ফল একটি প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য, ইহাকে ইহার যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে আমাদের রীতিমত চেষ্টা করা উচিত। অতঃপর ভাবিয়া দেখা উচিত যে, ফলদান আমাদের লৌকিকতার অঙ্গ, ফল আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক পূজাপার্ব্বণের খরচের এক বিশেষ অংশ। বিধবা ও অন্যান্য নিরামিষাশীদের জন্যও ফল চাই। বাজারে মহার্ঘ ফল কিনিয়া আর দান করা চলে না, তাই "লৌকতা" দিন দিন লোপ পাইতেছে, ঠাকুর দেবতারাও আস্ত কলাটির স্থলে বহুধা খণ্ডিত কদলীতেই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইতেছেন। ফল খাওয়ার প্রতি আমাদের যেরূপ উপেক্ষা তাহাতে ব্রত পূজাদি উপলক্ষেও যাহাতে কিছু ফল খাওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু এরূপ হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় আর কি সন্তোষলাভ করা যায়! বাড়ীতে প্রচুর ফল জন্মাইতে পারিলে সব দিক রক্ষা হইবে। খরচ বাঁচিবে, খাইয়া প্রাণটা বাঁচিবে।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, শুধু সখের জন্য ফলের চাষ করিলে চলিবে না, তাকে একটি ব্যবসায়ে পরিণত করিতে হইবে। সখের কাজের স্থায়িত্ব আশা করা যায় না। নেহাৎ যাঁহারা বাড়ীর ফল বেচিতে এখনও মর্য্যাদা হানির আশঙ্কা করেন, তাঁহারা যদিও ফলক্রয়ের খরচ বাঁচাইবার জন্যই প্রধানতঃ একাজে প্রবৃত্ত হইবেন বটে, তথাপি তাঁহাদের গরীব প্রতিবাসীদের প্রতি যেন একটু দৃষ্টি থাকে। এখন দেখিতে পাই, গাছ হইতে হাওয়ায় একটি আম পড়িলেও যদি কেহ তাহা কুড়াইয়া লয় তবে তাহাকে "দূর দূর" করা হয়। এই স্বদেশপ্রীতির অনুশীলনের দিনে এরূপ সঙ্কীর্ণভাব পোষণ করা শোভা পায় না। যাহাদের জমাজারাত নাই, ফলের গাছ জন্মাইবার সুবিধা নাই, কিনিয়া খাইবারও সামর্থ নাই, তাহাদের দুই চারিটা ফল দান করিলেই শাস্ত্রব্যাখ্যাত ফলদানের পুণ্যলাভ হয়, শুধু "তেলা মাথায় তেল দিয়া" সেই লাভের প্রত্যাশা করা বৃথা। পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রীতি-বন্ধনের যে সকল উপায় ছিল এখন সেগুলি ত দৃঢ় করিতে হইবেই, অধিকন্তু তজ্জন্য নূতন নূতন কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। শুধু মৌখিক "লৌকতায়" ও মুখে "ভাই ভাই এক ঠাঁই" বলিলে চলিবে না।

যে কারণেই হউক আমাদের অন্নাক্ষম পোষ্যের সংখ্যা কম নহে। এই "unemplyed"-দিগের সমস্যা আমাদিগকে যতদূর উদ্বিগ্ন করা উচিত ছিল এখনও ততদূর করে নাই, করিলে তাহার সমাধান করিতে অবশ্যই কিছু চেষ্টা করিতাম। দোষ যে শুধু সেই অজ্ঞ বেচারাদের তাহাও স্বীকার করা যায় না। তাহারা ত তাহাদের দাওয়া কতকটা এইরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেঃ—"তোমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াই অর্থ উপার্জ্জন কর, আর যাহাই কর, তোমরা যখন আফিসে চাকরী ভিন্ন কিছু করিবে না, তখন তোমরা 'বাবু'। আর আমরা যখন তোমাদের সংস্পৃষ্ট বা সম্পর্কিত তখন আমাদেরও 'বাবু' সাজিতে স্বভাবতঃই প্রবৃত্তি হয়। তোমরা প্রায়ই সহরে থাক, তোমাদের কর্ম্মস্থলে সমাজ-বন্ধনের ত আঁটাআঁটি নাই, থাকিলেও 'চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না।' আমরা তোমাদের বাড়ী ঘর আগ্‌লাই, সমাজের কঠোর সংস্পর্শে আমাদিগকেই আসিতে হয়, তাই ভিতরকার অন্ধকার বাহিরের সাজসজ্জায় একটু চাপা দিতে চেষ্টা করি। ইহাতে যদি কখন কখন একটু

'বেজায় বাবুও' হই, তোমরা তোমাদের উদারহৃদয়ে *আমাদের এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাটুকু মার্জ্জনা করিতে পার না? খাটিয়া খাইতে বলিলে রাস্তার ভিখারীর পর্য্যন্ত যে* দেশে মেজাজ গরম হয়, সে দেশে তোমরা যদি আমাদিগকে গতর খাটাইয়া খাইতে বল তবে সে তোমাদের (ছোট মুখে বড় কথা সাজে না) বিদেশীর নিকট শেখা একটা বেয়াদবি বৈ আর কি? আমরা কিন্তু ততটা বেয়াদব্ এখনও হই নাই। বাড়ীর কর্ত্তা যদি সত্য সত্যই ঝাড়ু হাতে লইয়া ঘরের ভিতরটা সাফ্ করিতে আরম্ভ করেন তবে আমরা শশব্যস্তে অগ্রসর হইয়া বলি, 'আজ্ঞে, আপনি কেন?' মোট কথা, হয় তোমরা অল্পস্বল্প বেতনে তোমাদের মত আমাদের একটা চাকরী করিয়া দেও, নয় আমাদিগকে যাহা করিতে বল তোমরাও তাহা কর। আমাদের ব্যবসায় বাণিজ্যের বুদ্ধিটুকু বিকাশ করিবার পথও তোমাদিগকেই করিয়া দিতে হইবে। যতদিন তাহা না করিবে ততদিন 'পেটে খাইলে পিঠে সয়' ভিন্ন অন্য পন্থা আমাদের নাই।" বস্তুতঃ স্বদেশী-প্রচেষ্টায় শিক্ষিত লোকেরা হাত দিলে এই বেচারাদেরও একটা গতি হইবে। আমাদের দেশের ছাত্রগণ এই উপলক্ষে যে মহৎকার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, অবকাশকালে বাড়ী গিয়া যদি তাঁহারা দুই চারিটা কার্পাস গাছের সহিত দুই চারিটা ফলের গাছও রোপণ করিতে চেষ্টা করেন, তবে উক্ত শ্রেণীর লোকেরা তাঁহাদের সাহায্য করিবে এবং তাঁহাদের অনুপস্থিতিকালে গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। পুনরায় ছুটীর সময় গৃহে প্রত্যাগমন কালে ছাত্রগণ অনুভব করিতে পারিবেন যে, আত্মীয় স্বজনের স্নেহের মত এই সযত্ন পোষিত বৃক্ষগুলিরও কেমন এক আকর্ষণ-শক্তি আছে। ছাত্রজীবনের পর যখন তাঁহারা কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিবেন ও অধিক সময়ই বাড়ী ছাড়িয়া থাকিতে বাধ্য হইবেন, তখন এই অভিনব স্নেহের সজোর টানে তাঁহাদের মন ঘন ঘন গৃহাভিমুখে আকৃষ্ট হইবে, শত ম্যালেরিয়ার ভয়ও সেই স্রোতের মুখে ভাসিয়া যাইবে। পৈতৃক বাসস্থানের সহিত আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে বলিয়া সহর ও বিদেশবাসের যে অপবাদ আছে এইরূপে তাহা অপনোদিত হইবে।

গত চৈত্রের "প্রবাসী"তে শ্রদ্ধাভাজন ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনাদিগকে "চৈত্রিক ফটোগ্রাফি"র চর্চ্চা করিতে আহ্বান করিয়াছেন। তা' বেশ। আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে সে আমোদ উপভোগের বিশেষ ব্যাঘাত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু গত বৎসরের বৈশাখের "প্রবাসীর" "বৈজ্ঞানিক যাদুকর" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আমরা বলিতে যাই যে, ফল ও ফুলের চাষও কম আমোদের বিষয় নহে তাহাতে শরীর ও মন উভয়ই প্রফুল্ল থাকে, বরং আর্থিক হিসাবে একটু লাভের কথা আছে। আর এই লাভটুকু আছে বলিয়াই ফুলের চাষে যদিও সৌন্দর্য্যবোধশক্তির একটু বেশী উন্মেষের সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয়, তথাপি সম্প্রতি ফলের চাষই আমরা বেশী প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। যাঁহারা ইংরাজের অনুকরণ করিতে যাইয়া বাগান ও বাড়ী ফুলগাছে সাজাইবার পক্ষপতী হন তাঁহাদিগকেও ফলগাছের প্রতি একটু মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি।

দ্বিতীয়তঃ মধুর চাষের কথা। শ্রীহট্টে কমলামধু ও স্বর্গীয় সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের মহামণ্ডল ষ্টেটে পদ্মমধু উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের প্রকৃত পক্ষে চাষ হয় কি না জানি না। অন্ততঃ শিক্ষিত লোকের তাহাতে হাত আছে বলিয়া ত মনে হয় না। নাইনিতালের মধুর কথা অনেকেই অবগত আছেন। আলমোড়া জেলায়ই প্রধানতঃ তাহার চাষ হয়; তত্রত্য আরণ্যফুলের প্রাচুর্য্যই এই ব্যবসায়ের উৎপত্তির কারণ। সেখানকার গোয়ালারা (এ অঞ্চলে ইহাদের নাম আহীর অর্থাৎ আভীর) এই কাজ করে। আলমোড়ার সহিত নাইনিতাল রেলওয়ে দ্বারা যুক্ত নহে; তথাপি মধু আলমোড়া হইতে নাইনিতাল পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে এবং শেষোক্ত স্থানে ভেজালের কাজও কিছু না চলে তাহা নহে। যাহা হউক, দুঃখের বিষয় এই যে, নাইনিতালের আলু যদিও কলিকাতা পর্য্যন্ত যায়, ওখানকার মধু এলাহাবাদের বাজারে দুর্লভ।

এক সময়ে আমাদের দেশে মধুর যে বিশেষ অভাব ছিল "মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" কথাই তাহার প্রমাণ। এখনও দেখিতে পাই পাড়াগাঁয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার মুখে মধু দেওয়ার যে রীতি আছে কোনও প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে

ছিটাফোঁটা চাহিয়া আনিয়াই সে কাজ সারা হয়। পূর্ব্ব বঙ্গের অধিকাংশ স্থলে শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে যে দই চিঁড়ের 'ফলার' হয় তাহাতে কখনও কখনও দধি ও মধুর "মণিকাঞ্চন যোগ" হইয়া থাকে। আমারই দুর্ভাগ্য কি না জানি না, একাধিক বার আমার এরূপ "ফলার" যুটে নাই। এরূপ "ফলারে" যেরূপ গুড়চিনি খরচ হয় তাহার স্থলে এই স্বদেশী চিনির অভাবের দিনে মধুর প্রচলন বিশেষ বাঞ্ছনীয়। মধু দুষ্পাপ্য না হইলে অনেক চিনির কাজ মধুতে চলিতে পারে। যাঁহারা চিনির মিছরির সরবৎ খান, তাঁহারা মধুর পানা কখনও খাইয়াছেন কি? প্রাতে মধুর পানা খাইলে শরীর বলিষ্ঠ হয় ও স্নিগ্ধ থাকে বলিয়া অনেকে তাহা খাইয়া থাকেন। দুধে যাঁহাদের চিনি না হইলে চলে না, তাঁহারা তৎপরিবর্ত্তে মধু ব্যবহার করিলে অধিকতর ফল পাইবেন এরূপ আশা করা যায়। মধু খাঁটি হইলে দুধ বেশ সুস্বাদ ও সুগন্ধ হয়। টাট্‌কা মধু দিয়া গরম মুড়ি খাইতেও বড় উপাদেয়। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে মধুর যে গুণব্যাখ্যা আছে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

মধু শীতং লঘু স্বাদু রুক্ষং গ্রাহি বিলেখনম।
চক্ষুষ্যন্দীপনং স্বর্য্যং ব্রণ শোধন রোপণম্।
সৌকুমার্য্যকরং সূক্ষ্মং পরং স্রোতো বিশোধনম।
কষায়ানুরসং হ্লাদি প্রসাদজনকং পরম
বর্ণং মেধাকরং বৃষ্যং বিশদং রোচনং হরেৎ।
কুষ্ঠার্শকাস পিত্তাস্র কফমেহঃ ক্লমক্রমীন্।
মেদস্তৃষ্ণা বমিশ্বাস হিক্কাতিসার বিড়্‌গহান্।
দাহক্ষতক্ষয়াংস্তত্তু যোগবাহ্যল্পবাতলম॥

ভাবপ্রকাশঃ।

অর্থাৎ মধু শীতবীর্য্য, লঘু, ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুর রস, রুক্ষ, ধারক, কৃশতাকারক, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নিদীপ্তিকারক, স্বরবর্দ্ধক, ব্রণশোধক, ব্রণরোপক, শরীরের কোমলতা সম্পাদক, সূক্ষ্মমার্গানুসারী, স্রোতঃ সমূহের বিশোধক, আহ্লাদজনক, অত্যন্ত প্রসন্নতাকারক, বর্ণপ্রসাদক, মেধাজনক, বৃষ্য, বিষদ গুণযুক্ত, রুচিকারক, যোগবাহী, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক, এবং কুষ্ঠ, অর্শ, কাস, রক্তপিত্ত, কফ, প্রমেহ, ক্লান্তি, ক্রমি, মেদ, পিপাসা, বমি, শ্বাস, হিক্কা, অতিসার, মলবদ্ধতা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয় রোগনাশক।

নানা দ্রব্যাত্মক ত্বাচ্চ যোগবাহি হিমং মধু।

চরক সংহিতা।

নানাগুণ দ্রব্য হইতে সংগৃহীত বলিয়া মধু শীতল ও যোগবাহী অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের সহিত সংযোগ করা যায়।

গুরু রূক্ষ কষায়ত্বাচ্ছৈত্যাচ্চাল্পং হিতং মধু।

* * * *

মধ্বামং দারুণং তস্মাৎ সদ্যো হন্যাদ্ যথা বিষম্।

চরক সংহিতা।

মধু, গুরু, রূক্ষ, কষায় ও শীতল বলিয়া অল্প পরিমাণে সেবন করিলেই হিতকর হয়। মধু অধিক সেবন করিলে যদি উদরে আম হয় তবে তাহাকে মধ্বাম কহে। এই রোগ বিষের ন্যায় সদ্য প্রাণঘাতী।

মধু "ভাবপ্রকাশে" লঘু ও "চরক সংহিতায়" গুরু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কবিরাজেরা বলেন, এই দুই বর্ণনায় বাস্তবিক পক্ষে বিরোধ নাই; কারণ, মধু "যোগবাহী" বলিয়া কোনও দ্রব্যের সংযোগে লঘু, আবার কোনও দ্রব্যের সংযোগে গুরু হইয়া থাকে। ইহা যে শুধু ঔষধ প্রস্তুত করিতে ও অনুপানে লাগে তাহাও নহে; ইহার বাহ্য প্রয়োগও (External application) আছে। চক্ষে প্রয়োগের পক্ষে পদ্মমধুই প্রশস্ত। মধুদ্বারা ক্ষত পরিষ্কার করা হয় (ইহা ব্রণশোধক) ইহাতে ঘা ভরিয়া আসে (ইহা ব্রণরোপক) নিয়মিতরূপে মধু সেবন করিলেই যে শুধু শরীরের রং পরিষ্কৃত ও উজ্জ্বল হয় তাহা নহে, মধুমিশ্রিত জলে সাবানের কাজ করে। মধুর এই গুণ কতকটা গ্লিসরীনের তুল্য। প্রলেপেও মধু ব্যবহৃত হয়। এখন কথা হইতেছে এই যে, যে পদার্থের এত গুণ তাহার ব্যবহার লোকের মধ্যে তত নাই কেন? শ্রাদ্ধ, পূজা ও পঞ্চামৃতে "নিদানের বিধান" স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ মধু ব্যবহৃত হয়, পায়স রান্না করিয়া তাহাতে মধুর ছিটা দেওয়ার রীতি এখনও মাঝে মাঝে দেখা যায়। মোট কথা আমাদের দেশে লোকে ইহার ব্যবহার কতকটা জানে; ইহা যদি সুলভ হয় তবে আগ্রহের সহিত তাহারা ইহা ব্যবহার করিবে। মহা[illegible] হউক আর বিকৃত হউক, বাজারে যে এখনও মধু পাওয়া যায় তাহা কতকটা কবিরাজ মহাশয়দের কৃপায়। কি[illegible]

তাঁহাদের বিরুদ্ধেও একথা বলা চলে যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের উপযুক্ত অর্থ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এই মহোপকারী বস্তুটি তাঁহারা যে পরিমাণে শোষণ করিতেছেন সে পরিমাণে উৎপাদন করিতে চেষ্টা করেন না। তাঁহারা যাহা অসম্পন্ন রাখিয়াছেন, শিক্ষিত লোকেরা তাহা সুসম্পন্ন করিতে অগ্রসর হউন। শিক্ষিত লোকের চেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে অভিনব দ্রব্য বাজারে চলিয়া যায়, মধু ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ জিনিস।*

অতঃপর মৎস্য সম্বন্ধে কিছু বলিলেই আমাদের বক্তব্য শেষ হইল। বঙ্গদেশেও মাছের অভাব যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে খাল বিল পুষ্করিণীসঙ্কুল নদীপরিবেষ্টিত বিক্রমপুররূপী দ্বীপটির দৃষ্টান্তেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। সেখানেও এখন মাছের জন্য হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। এখন জাহাজ ও রেলের গাড়ী বোঝাই হইয়া স্থানান্তরে প্রচুর মাছ চালান হয়; শুঁট্‌কি ও লোনা মাছ ত দেশান্তরেও যায়। অশিক্ষিত লোককে রূপার চাক্‌তির লোভ দেখাইলে অন্যান্য জিনিসের বেলা যেরূপ হয় মাছের বেলাও তাহাই হইতেছে; ধীবরেরা দেশের লোকের 'ভোগ মারিয়া' কেবলই মাছ চালান দিতেছে। কালের চক্রে নদী খাল বিল পুকুর ভরাট হইয়া যাওয়ায় এখন মাছ জন্মায়ও কম। পদ্মার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের খাল ও পুষ্করিণীগুলি ত বালির ঢিপ্‌ হইয়াছে। পূর্ব্বে যেমন লোকে (ভদ্রলোকেরাও অনেক সময় এ আমোদ উপভোগের লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না) পলো ও জাল লইয়া খালে ও পুকুরে মাছ ধরিত এখন তাহা বড় একটা দেখা যায় না। শত শত লোক 'পলো, পলো চীৎকারে গগন ভেদ করিয়া যখন একটা স্বল্পজল দীঘিতে নামিয়া পড়িত তখন জলের উপর মাথা ভিন্ন আর কিছু দেখা যাইত না; অনাবিল জলরাশি আলোড়িত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে পঙ্কিল হইয়া উঠিত; কত শোল, বোয়াল, রুই লাফাইয়া আক্রমণকারীদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইত, হয় ত এক জাল হইতে লাফ দিয়া পলাইতে গিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অপর জালে আট্‌কা পড়িত। তখনকার সেই উদ্দাম উচ্ছ্বাসপূর্ণ দৃশ্য দেখিবার জন্য দীঘির পাড়ে দর্শকের সংখ্যাই বা কত হইত; সেই মধুর* দৃশ্যকে মধুরতর করিবার জন্যই যেন গাছের মাথায় মাথায় কাক, চীল ও বকের আনন্দবাজার বসিত। দুঃখের কথা বলিতে কি, আমি গত পূর্ব্ব বৎসর দেশে গিয়া খুঁজিয়াও এদৃশ্যের সন্ধান পাই নাই। তবেই ভাবিয়া দেখুন যাহাদের 'ভাত যুটিলে নুন্ যুটে না,' যাহাদের মাছই একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য, তাহাদের দুই চারিটা মাছ ধরিয়া খাইবার সুবিধা না থাকায় কি কষ্টই না উপস্থিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে ভদ্রলোকেরই কি মাছ না হইলে চলে? খাইতে বসিয়া মাছের ঝোলের বাটীটি কতক্ষণে আসিবে তজ্জন্য কেনা সোৎকণ্ঠে অপেক্ষা করেন। মাছের দৈনিক খরচটা কি কম? নিমন্ত্রণের খরচে মাছের দফাটা কি নগণ্য? তবে শিক্ষিত ভদ্র লোকেরা এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে চলিবে কেন? আরও ভাবিয়া দেখুন, জলের অভাব প্রায় সর্ব্বত্রই আছে। আমরা 'এক গুলিতে দুই বক মারিবার' কথাই জানি, কিন্তু পুষ্করিণী খনন করিলে দেখিতেছি 'এক গুলিতে চারি বক মারিতে পারা যায়—জলের অভাব মোচন, মৎস্য পোষণ, খননলব্ধ মৃত্তিকায় উক্ত ফল চাষের জন্য জমী প্রস্তুত করণ ও গরীবদের উপকার সাধন। পুকুর কাটার খরচ মায় সুদ অতি শীঘ্র শীঘ্র ফল ও মৎস্য বিক্রয়ের লাভ হইতে উঠিয়া যায়। অতএব আশা করা যায়, এরূপ বিনা ব্যয়ে হাতে হাতে উক্ত চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিতে আমরা অবহেলা করিব না।

বিক্রমপুরে (বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানেও এরূপ পুকুর আছে) অনেক পুকুর মাছ-পোষণের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে দেখা যায়। এগুলিকে ড্যাঙ্গা বলে। অনেক ভদ্রলোকই চামড়ার ব্যবসায় করিলে আমাদের দেশে যেরূপ চামার অখ্যাতি হয়, তদ্রূপ ড্যাঙ্গার মাছ বেচিলে জেলে-অখ্যাতি হওয়ার আশঙ্কা এখনও করেন। তাই ড্যাঙ্গার লাভজনক ব্যবসায় অনেক স্থলেই নিম্নশ্রেণীর লোকদের হাতে রহিয়া গিয়াছে। কাজেই এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বিক্রমপুরের ভদ্রজনবহুল সুপ্রসিদ্ধ ষোলঘর গ্রামের (এই গ্রামের সুযোগ্য সন্তান বিক্রমপুরের শিরোভূষণ মাননীয় জষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ) ভদ্রলোকেরা এ ব্যবসায়ে সঙ্কোচ বোধ করেন না। তাঁহাদের সদ্‌দৃষ্টান্ত, শুধু বিক্রমপুরে কেন

* মৌমাছি পুষিয়া মধুর চাষ, সরকারী কোন কোন জেলে হয়। সম্পাদক।

* মাছদের পক্ষে নয়। সম্পাদক।

বাংলার প্রতি গ্রামে অনুসৃত হউক্। মর্য্যাদাহানিরূপ অমূলক জুজুর ভয় এই স্বদেশী প্রচেষ্টার দিনে আমাদিগকে ছাড়িতেই হইবে। ভদ্রসন্তানেরা ফেরি করিয়া স্বদেশী জিনিস বিক্রয় করিতে পেছপাও হয় না আর আমরা বাড়ীর ফল ও পুকুরের মাছ বেচিতে অপমান বোধ করিব? কখনই না; বরং কার বাড়ীতে কত বড় আম হয় ও কার ড্যাঙ্গায় তিন সনী (ড্যাঙ্গার মাছ সাধারণতঃ তিন বৎসর অন্তর ছাড়ান হয়) 'কৈ' কত কত বড় হয় তাহার জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিব এবং পারিত সেই আম ও কৈ-মাছ প্রদর্শনীতে পাঠাইয়া পারিতোষিক আদায় করিব।

এখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, ড্যাঙ্গার মাছ যখন ছাড়ান হয়, তখন তাহার মালীক নিজ ব্যবহারের জন্য ভাল ভাল মাছ রাখিয়া তবে জেলেদের সহিত বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করেন। শিক্ষিত লোকেরা একাজে হাত দিলে শুধু নিজেদের জন্য কেন, নিকটবর্ত্তী বাজারের জন্য কি পরিমাণ মাছ সচরাচর আবশ্যক হয় তাহার হিসাব করিয়া দেশের লোকের অভাব মোচনের সুবন্দোবস্ত করিয়া, যাহারা মাছ চালান দেয় তাহাদের বিক্রয় করিবেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। মাছ একটি উত্তম সার। আঁষ্টে জল লাউকুমড়া প্রভৃতি গাছের গোড়ায় দিতে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। দুই তিন বৎসর হইল এলাহাবাদে একবার ইলিশ মাছের খুব প্রাচুর্য্য হইয়াছিল। এখানকার যমুনার ইলিশ গঙ্গা ও পদ্মার ইলিশের মত সুস্বাদ নহে বলিয়া এবং অল্পসংখ্যক বাঙ্গালীর পক্ষে (মছলীখোর বাঙ্গালীর সংসর্গগুণে এ অঞ্চল-বাসী কায়স্থ ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের একটু মাছের নেশা ধরিয়াছে বৈ কি? 'হিলশা' যখন বেজায় সস্তা হয় তখনই ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়) অত মাছ হজম করা অসম্ভব বলিয়া বাগানের মালিরা উহা কিনিয়া লইয়া বাগানে পুতিয়া ফেলিয়াছিল। শুনিয়াছি মাঝে মাঝে আমাদের দেশের মালিরা এরূপ করিয়াই থাকে। ক্ষেত্রাদিতে সার ব্যবহার করা আবশ্যক, কিন্তু আমাদের দেশের গরীব কৃষকদের কৃত্রিম সার কিনিবার সামর্থ্য নাই, একথা সকলেই জানেন। মাছ এই অভাব অনেকাংশে পূরণ করিতে পারে। অতএব প্রচুর পরিমাণে মাছ উৎপাদন করার একটি বিশেষ আবশ্যকতা ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে। গত ফাল্গুনের "কৃষক" পাঠে অবগত হইলাম যে, তুলার চাষে যত প্রকার সারের প্রয়োজন তন্মধ্যে নাইট্রোজেন একটি এবং এই নাইট্রোজেন্ শুক্না মাছ হইতে পাওয়া যাইতে পারে। স্বদেশী কাপড়-চোপড়ের জন্য তুলার চাষের দেশময় যে 'হৈ চৈ' পড়িয়া গিয়াছে তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এখনও প্রকৃত পক্ষে এই সকল বিষয়ের সাহিত্য আমাদের দেশে রচিত ও গঠিত হয় নাই। শিক্ষিত লোকেরা এই সকল বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে শীঘ্রই এ অভাব দূর হইবে। শিক্ষিত লোকের চেষ্টা না হইলে কোনও বিষয় সংক্রান্ত চিন্তার আদান প্রদান এবং সেই বিষয়ের তত্ত্ব সংগ্রহ হয় না। শিক্ষিত লোকেরা তাঁহাদের অর্জ্জিত জ্ঞান যক্ষের ধনের মত গোপন করিয়া রাখেন না, লোকের হিতার্থ তাহা দান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করে।*

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র সোম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের খস্ড়া নিয়মাবলী।

মুখবন্ধ।

প্রায় দুই বৎসর হইল বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত নূতন আইন পাশ হইয়াছে। এই নূতন আইন অনুসারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠিত সেনেট সভা নূতন নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কোনও কোনও প্রদেশে এই কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে এবং কর্ত্তৃপক্ষ নূতন বিধিব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কার্য্যের জন্য ১৫ই এপ্রেল শেষ তারিখ ধার্য্য ছিল। সম্প্রতি সেনেটসভা খস্ড়া নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিয়াছেন। শীঘ্রই এই নিয়মাবলীর আলোচনা করিবার জন্য সিমলাশৈলে একটি সরকারী বৈঠক বসিবে। বৈঠকে কয়েকজন বাছা বাছা সেনেটের সভ্য থাকিবেন,

* ইংরাজ বণিক্গণের অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই আমাদের দেশে সামুদ্রিক ও অন্যবিধ মাছের প্রাচুর্য্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন। ফলে, জেলেদের অন্ন মারা যাইবে। আমরা তখন নিজ আলস্য ও উদ্যোগহীনতার নিন্দা না করিয়া গবর্ণমেণ্টকে গালি দিব। সম্পাদক।

ইঁহারা সহর ও মফঃস্বলের সরকারী বেসরকারী ও মিশনরী-কলেজগুলির দিক্ দেখিবেন এই বিবেচনায় ইঁহাদিগকে লওয়া হইয়াছে। বৈঠক মে মাসের প্রথমে বসিয়া দুই মাসের মধ্যে কার্য্য শেষ করিবেন। সিমলাশৈলেই বৈঠক বসাইয়া শিক্ষাসংস্কারের প্রথম সূচনা হয়। আবার সিমলাশৈলে বৈঠক বসাইয়া এই ব্যাপারের উপসংহার হইবে। যদিও ভারত গবর্ণমেণ্ট এই নিয়মাবলী অবিকল গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন, ইচ্ছামত সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার রাখেন, তথাপি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, যে বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞগণ কয়েক মাস ধরিয়া অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা বিচার আলোচনার পর যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট দ্বিধা না করিয়া সেগুলি গ্রাহ্য করিবেন। এই খস্‌ড়া নিয়মাবলীতে শিক্ষা ও পরীক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইল, শিক্ষিত সাধারণ তাহা জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত রহিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে অগ্রসর হইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিলাম।

(১) শিক্ষার ব্যবস্থা।

নূতন আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার অধিকার হইয়াছে। পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অধিকার ছিল না। খস্‌ড়া নিয়মাবলীতে এতদনুযায়ী কতকগুলি শিক্ষকের পদের সৃষ্টির ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত না হইলে এই ব্যবস্থানুসারে কার্য্য আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বেও যেমন পরীক্ষাগ্রহণ করাই মুখ্য কার্য্য ছিল, এখনও তাহাই থাকিবে। তবে যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসৃষ্ট বিদ্যালয়গুলিতে সুচারুরূপে শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়, তদ্বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বাপেক্ষা খরদৃষ্টি থাকিবে। যাহাতে বিদ্যালয়ে কোনও রূপ দোকানদারী না থাকে, ও উপযুক্ত এবং উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষক থাকে, বিদ্যালয়গৃহ প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যকর হয়, পুস্তকাগার ও (বিজ্ঞান শিখাইতে হইলে) যন্ত্রাগার কার্য্যোপযোগী হয়, বিজ্ঞানশিক্ষার স্থলে প্রত্যেক ছাত্রের 'হাতে কলমে' শিখিবার ব্যবস্থা থাকে, শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই সার না হয়, ইত্যাদি নিয়ম পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কঠোর করা হইয়াছে। যাহাতে ছাত্রগণ পাঠে অধিকতর মনোযোগী হয় তজ্জন্য তাহাদিগকে ক্ল্যাসে শতকরা ৭৫ দিন উপস্থিত থাকিতে হইবে (পূর্ব্বে শতকরা ৬৬ দিন ছিল) এবং তাহারা ইচ্ছামত যখন তখন একলেজ হইতে ওকলেজে যাইতে পারিবে না, অনুত্তীর্ণ ছাত্রগণকেও আবার এক বৎসর (এখনকার মত ছয় মাস নহে) পড়িতে হইবে, এইরূপ নিয়ম হইয়াছে। ইহা ছাড়া ছাত্রগণের পড়াশুনা কিরূপ হইতেছে তাহা মাঝে মাঝে পরখ করিবার জন্য শিক্ষকগণ Exercise দিবেন এবং তাহার রীতিমত হিসাব থাকিবে, এরূপ ব্যবস্থাও হইয়াছে। এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালিত হইতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইবেন তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে।

(২) Discipline (সংযম)।

কিন্তু ছাত্রদিগের পুস্তকপাঠের ও বিষয়শিক্ষার প্রকৃষ্ট সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বিদ্যালয়ের দায়িত্ব ফুরাইল না। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন। অতএব ছাত্রদিগের নীতি ও চরিত্রের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; এই বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম করিয়াছেন যে, যে সকল ছাত্র অভিভাবকের নিকট থাকিবে না তাহাদিগকে কলেজসম্পৃক্ত বাসাবাড়ীতে থাকিতে হইবে এবং কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদের অভিভাবকস্থানীয় হইবেন। খস্‌ড়া নিয়মাবলী মঞ্জুর হইবার পূর্ব্বেই এই নিয়মটি চলিয়াছে। নিয়মটি সম্বন্ধে আমাদের দেশের অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তজ্জন্য একটু বিশদরূপে ব্যবস্থাটার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

অক্‌সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। তথায় যে প্রণালী প্রচলিত আছে, আমাদের দেশে তাহার প্রচলন করিলে শিক্ষার উৎকর্ষ ঘটিবে, কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ ধারণা। তথায় ছাত্রেরা এখানকার মত বই বগলে করিয়া ৪।৫ ঘণ্টার জন্য বিদ্যালয়ে আসে না, সর্ব্বক্ষণ কলেজের বোর্ডিংগৃহে বা অদূরস্থিত লাইসেন্সপ্রাপ্ত মেস্‌বাটীতে থাকে। ইহাতে তাহাদের চারি-দিকে যেন একটা জ্ঞানের আকাশ (Atmosphere of

Culture) রচিত হয়, বিদ্যালোচনার সুবিধা ঘটে এবং সর্ব্বক্ষণ কর্ত্তৃপক্ষের নজরে থাকাতে চরিত্রগঠনেরও সুবিধা ঘটে। আমাদের দেশের সামাজিক ব্যবস্থা অবশ্য ইংলণ্ড হইতে কতকটা বিভিন্ন। কিন্তু আমাদের দেশেও ছাত্রদিগের গুরুগৃহে বাস করার নিয়ম ছিল এবং টোলে সেই নিয়ম এখনও বিদ্যমান। তবে যাহারা নিজের গৃহ হইতে আসিয়া নিকটবাসী গুরুর নিকট পাঠ লইয়া যায়, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের দেশোপযোগী বিধিই হইয়াছে। যে সকল ছাত্র (day-scholars) সহরে বা সহরের উপকণ্ঠে নিজ নিজ অভিভাবকের নিকট বাস করে, তাহারা স্বচ্ছন্দে বাটী হইতে যাতায়াত করিতে পারিবে। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে এটুকু সুবিধাও নাই। যেসকল অপরিণতবয়স্ক ছাত্র সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া প্রলোভনবহুল সহরে বিনা অভিভাবকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে থাকে, তাহাদের চরিত্রস্খলনের ষোল আনা সম্ভাবনা, তাহারই নিবারণকল্পে এই ব্যবস্থা। অথচ যাহাতে ছাত্রদিগের মধ্যে স্বাবলম্বনের ভাব জন্মে, তাহাতে বাধা দেওয়া হইবে না। ছাত্রগণ পূর্ব্বের ন্যায় এখনও আপন সুবিধামত আহারাদির বন্দোবস্ত করিবে ও পাচককিঙ্কর নিযুক্ত করিবে; তবে দাসী রাখিতে পারিবে না এই যা একটু কড়াকড়ি। এক কলেজের ছাত্র এক বা ততোঽধিক মেসে থাকিবে, 'পাঁচমিশালি' থাকিবে না, এ ব্যবস্থা আমরা ত খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক মনে করি। তবে ইহাতে নাকি অনেক সদস্যের বিশেষ আপত্তি। এই ব্যবস্থার ফলে, কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ ছাত্রদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য রীতিচরিত্রের উপর দৃষ্টি রাখিবেন, শুধু কিঞ্চিৎ পরিমাণ বিদ্যা বিক্রয় করিয়া কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পাইবেন না। কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগের রীতিমত তত্ত্বাবধান করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার ফলে ছাত্র ও শিক্ষকের পরস্পর মেলামেশার সুবিধা হইবে। এই দুইটিই শুভফল বলিতে হইবে। প্রত্যেক মেসে একজন করিয়া শিক্ষক সর্ব্বক্ষণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক থাকিলে অবশ্য 'সোণায় সোহাগা' হইত; কিন্তু আমাদের সামাজিক রীতির কথা মনে রাখিলে ইহা সম্ভবপর নহে সহজেই বুঝা যায়। কেননা এদেশীয় সকল শিক্ষকই বিবাহিত ও চাকরীস্থলে পরিবার লইয়া বাস করেন। মেস্‌গুলির পরিদর্শনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে, এ ব্যবস্থাও হইয়াছে।

(৩) পরীক্ষার সংখ্যা।

পরীক্ষা জ্ঞানের পরিমাপক বলিয়া পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু অনেক সময় পরীক্ষা জ্ঞানের পরিপন্থী হইয়া উঠে; ছাত্রেরা জ্ঞানলাভ অপেক্ষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াকেই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে ইহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। এই হিসাবে দেখিতে গেলে পরীক্ষার সংখ্যা অযথা বৃদ্ধি করা মঙ্গলদায়ক নহে। পরীক্ষার পর পরীক্ষা পাশ করিতে গিয়া ছাত্রগণ ধীরেসুস্থে জ্ঞানসঞ্চয় করিতে ব্যাপৃত না থাকিয়া, না বুঝিয়া মুখস্থ করিতে বাধ্য হয় এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটে ও মস্তিষ্ক চিরদিনের জন্য দুর্ব্বল ও বিকল হইয়া যায়। ভারত গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা একথা বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

কিন্তু খসড়া নিয়মাবলীতে দেখিতেছি পরীক্ষার সংখ্যা এখন অপেক্ষাও বৃদ্ধি হইয়াছে; প্রবেশিকার দুই বৎসর পরে Intermediate বা মধ্যপরীক্ষা, তাহার দুই বৎসর পরে বি, এ বা বি, এস, সি পাশ ও অনার পরীক্ষা এবং তাহার আবার দুই বৎসর পরে (এখনকার নিয়মে দেড় বৎসর ছিল) এম, এ, বা এম, এস, সি পরীক্ষা এবং তাহার পরে আবার পি, এইচ, ডি, বা ডি, এস, সি পরীক্ষা। তবে শেষ পরীক্ষায় কোনও মৌলিক গবেষণা করিলে পরীক্ষাগ্রহণের বিশেষ আবশ্যকতা থাকিবে না এরূপ আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। সপ্তদশ বর্ষ বয়সে ছাত্রগণ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিবে এবং অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়সে সমস্ত পরীক্ষা শেষ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিবে। মধ্যের কয়েকটা বৎসর পরীক্ষা দিতে দিতে তাহাদের প্রাণান্ত হইবে। ব্যবস্থাটা বড় বিষম হইল।

আমাদের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং তাহার চারি বৎসর পরে ডিগ্রী পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত করিলেই সঙ্গত হইত। মধ্যে কোনও পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। তবে ছাত্রগণ রীতিমত মনোযোগ দিতেছে কি না দেখিবার জন্য কলেজে সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক,

ষাণ্মাসিক, বাৎসরিক প্রভৃতি Exerciseএর ব্যবস্থা থাকিলেই যথেষ্ট হইত। ডিগ্রী পরীক্ষার পরে যে কোনও সময়ে কোনও ছাত্র কোনও রূপ মৌলিক গবেষণা করিতে সমর্থ হইবে, তখন তাহাকে গুণের তারতম্যানুসারে এম, এ বা এম,এস্,সি অথবা ডক্টর-অফ্-আর্টস্ বা সায়ান্স প্রভৃতি উপাধি দিলেই সুব্যবস্থা হইত। ক্রমাগত পুস্তকের পরিমাণ বাড়াইয়া পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া জ্ঞানের পরিধি মাপিয়া শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। যেমন অতিভোজনে অরুচি জন্মে, ছাত্রদিগেরও সেইরূপ জ্ঞানালোচনায় বিরক্তি জন্মে। এই জন্যই অনেকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া আর কখনও পুস্তক হাতে করেন না। এম, এ প্রভৃতি উচ্চ পরীক্ষায়, শিক্ষা করার শক্তির বিকাশ হইয়াছে কি না, ছাত্রগণ নিজের ইচ্ছার ও শক্তির উপর ভর করিয়া জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে কি না এবং কোনও ফল দেখাইতে পারিতেছে কি না, ইহাই দেখিবার জিনিস। অবশ্য আমাদের এসব কথা 'অরণ্যে রোদন'।

(৪) পরীক্ষা।

(ক) প্রবেশিকা পরীক্ষা।

ছাত্রদিগকে প্রবেশিকা ও এফ্, এ পরীক্ষায় এত বিষয় আয়ত্ত করিতে হয় এবং অনেকেই এত অল্প বয়সে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয় যে, না বুঝিয়া মুখস্থ করা এক প্রকার অনিবার্য্য; এই দূষিত প্রণালী অবলম্বনে নিম্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে তাহারা উচ্চ (বি, এ,) পরীক্ষায় অনেকেই ফেল হয়। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে নূতন ব্যবস্থায় প্রবেশিকা ও এফ্, এ, পরীক্ষায় বিষয়সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে এবং যাহাতে ছাত্রগণ কাঁচা বয়সে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং মস্তিষ্ক চিরদিনের জন্য দুর্ব্বল না করিয়া ফেলে, তদুদ্দেশ্যে ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিবে না, এই মঙ্গলজনক নিয়ম করা হইয়াছে।

এই পরীক্ষায় (ইহার নূতন নামকরণ হইয়াছে ম্যাট্রিকুলেশন) সাড়ে তিনটি বিষয় লইতেই হইবে, যথা---ইংরাজী, অপর একটি ভাষা, গণিত এবং ইতিহাস (শেষটি আধখানা বিষয়); পূর্ব্বে যেমন ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল ও বিজ্ঞানসূত্র ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন আর সেরূপ থাকিল না। এই কয়টি বিষয় লইলেই ছাত্রেরা পাশ হইতে পারিবে তবে যাহারা পরীক্ষায় কেবলমাত্র পাশ করিতে চাহে না, উচ্চ স্থান অধিকার করিতে চাহে, তাহারা ইচ্ছা করিলে আর একটি বিষয় লইতে পারে, যথা—প্রাকৃতিক ভূগোল, গতিবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, ড্রয়িং (রেখাঙ্কণ বা প্রাণিদেহ ও উদ্ভিদ্‌দেহ চিত্রণ)। আমাদের বিবেচনায় ইহা সঙ্গত ব্যবস্থা। তবে ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস বুঝিতে হইলে যতটুকু ভূগোলজ্ঞান আবশ্যক তাহাও ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল এবং ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের কেবলমাত্র আধুনিক ইতিহাস শিখিলেই প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের পক্ষে যথেষ্ট হইত। এই দুই দেশের প্রাচীন ইতিহাস গ্রীস, রোমের সঙ্গে এফ্, এ পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট করিলেই চলিত। আর প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৈকল্পিক ভাবেও বিজ্ঞানের স্থান না করিলেই ভাল হইত। বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু আমাদের দেশে স্কুলে বিজ্ঞানশিক্ষার সরঞ্জামের ও উপযুক্ত বিজ্ঞানশিক্ষকের অভাব; কাজেই 'যবেতবে' কাজ চালাইলে মুখস্থ বিদ্যারই প্রসার বাড়িবে। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনও এই কথাই বলিয়াছেন। তবে অবশ্য সেনেটসভা নিয়ম করিয়াছেন, যে সকল স্কুলে বিজ্ঞানশিক্ষার ভালরূপ বন্দোবস্ত নাই, সে সকল স্কুল হইতে কোনও ছাত্র বিজ্ঞানের পরীক্ষা দিতে পাইবে না। তাহা হইলে ফলে দাঁড়াইতেছে যে অতি অল্প দল এবং ছাত্রই এ পথে যাইবে। কেবল তাহাদিগের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাদিগকে উচ্চ ডিবিশনে পাশ হইবারও বেশ একটু সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) এফ্, এ পরীক্ষা।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ছাত্রগণ আর্টস্ এবং বিজ্ঞান এই দুই বিভাগের এক বিভাগে যাইবে; তবে যাহারা আর্টস্ বিভাগে ভর্ত্তি হইবে তাহারাও ইচ্ছা করিলে কতকগুলি বিজ্ঞান বিষয় লইতে পারিবে। এবং আর্টস্ বা বিজ্ঞান পরীক্ষায় পাশ হইয়া আবার এক বৎসর পড়িয়া অপর বিভাগেও পরীক্ষা দিতে পারিবে। আর্টস্ পরীক্ষায়

(ইহার নূতন নাম হইল Intermediate Examination in Arts) ইংরাজী ও একটি প্রাচীন ভাষা এই দুইটি বিষয় লইতেই হইবে; এবং তাহারও উপর আর দুইটি বিষয় লইতে হইবে; তবে সেখানে বাছিয়া লওয়া চলিবে, যথা—গ্রীস্ ও রোমের ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, গণিত, কোনও না কোনও বিজ্ঞান। অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ চারিটি বিষয় লইতে হইবে। তবে গণিত বিষয়টি ইতিহাস বা তর্কশাস্ত্র অপেক্ষা অধিক কঠিন করা হইয়াছে, ইহাতে একশ্রেণীর ছাত্রদিগের প্রতি অবিচার হইয়াছে। এখানেও বিষয়সংখ্যার হ্রাস হওয়াতে আমরা সন্তুষ্ট; পূর্ব্বে এফ্, এ পরীক্ষায় অন্ততঃ ছয়টা বিষয় লইতে হইত, কেহ কেহ সাতটাও লইত। বিজ্ঞান বিভাগে (Intermediate Examination in Science) চারিটা বিষয় লইতেই হইবে, যথা—ইংরাজী, গণিত, জড়বিজ্ঞান, রসায়ন। এই চারিটি বিষয় লইলেই ছাত্রগণ পাশ করিতে পারিবে। আবার ইহার উপর ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে, পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে প্রয়াসী হইলে, অপর একটা বিষয় (কোনও একটা বিজ্ঞান) লইতে পারে। বলা বাহুল্য, আর্টস্ ও বিজ্ঞান উভয় বিভাগেই বিজ্ঞান শিখিতে হইলে প্রত্যেক ছাত্রকে 'হাতে কলমে' শিখিতে হইবে। তবে তাহার স্বতন্ত্র পরীক্ষা দিতে হইবে না। এক্ষেত্রেও বিষয়সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে বলিয়া আমরা সন্তুষ্ট, কিন্তু আর্টস্ পরীক্ষার্থীদিগের তুলনায় বিজ্ঞানপাঠীদিগের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে, কারণ, (১) বিজ্ঞানপাঠীদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে একপ্রকার বাধ্য হইয়া পাঁচটা বিষয় আয়ত্ত করিতে হইবে এবং (২) বিজ্ঞানপাঠী প্রত্যেক ছাত্রকে যে চারিটা বিষয় লইতেই হইবে সেখানে বাছাবাছি চলিবে না। যখন প্রত্যেককেই তাহার যেদিকে ঝোঁক ও রুচি সেই সেই বিষয় লইতে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবার জন্য আর্টস্ বিভাগেও বিজ্ঞানের স্থান করা হইল, তখন বিজ্ঞান বিভাগের বেলায় সেই স্বাধীনতার লোপ করা অবিচার নহে কি? বিশেষতঃ, আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চ্চার যেরূপ দুর্দ্দশা, তাহাতে বিজ্ঞানপাঠী ছাত্রদিগকে উৎসাহ দেওয়াই সঙ্গত ও সমীচীন।

এফ্, এ পরীক্ষা সম্বন্ধে আমাদের আর একটা কথা বলিবার আছে। নূতন নিয়মে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিবার পরেই ছাত্রদিগকে হয় আর্ট্স্ না হয় বিজ্ঞান ইহার এক পথ ধরিতে হইবে; পূর্ব্বে এফ্, এ পরীক্ষার পর এই ব্যবস্থা ছিল। আমাদের মনে হয়, পূর্ব্বের ব্যবস্থাই সঙ্গত ছিল। নূতন নিয়মে, অনেক ছাত্র কিছু মাত্র বিজ্ঞান না শিখিয়া কৃতবিদ্য গ্র্যাজুয়েট হইয়া সংসারে প্রবেশ করিবে, এই বিংশ শতাব্দীতে ইহা অত্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই রেলওয়ে টেলিগ্রাফ বৈদ্যুতিক ট্রাম ও বৈদ্যুতিক টানাপাখার দিনে জড়বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি সম্বন্ধে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে আপনাকে 'শিক্ষিত' বলিয়া সমাজে পরিচয় দিবে, ইহা নিতান্তই লজ্জাকর। দ্বিতীয়তঃ, ধরিতে গেলে মধ্যশিক্ষা (Secondary Education) বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার বাহিরে,সেই পর্য্যায়ে ছাত্রগণকে বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে বাধ্য করা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধ্যায়ত্ত নহে, আমাদের দেশের স্কুলগুলির যেরূপ অবস্থা তাহাতে ওরূপ ব্যবস্থা সঙ্গতও নহে। এ অবস্থায় এফ্, এ পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা হিসাবে জড়বিজ্ঞান না শিখাইলে উপায়ান্তর নাই। তৃতীয়তঃ, প্রবেশিকা পরীক্ষার পরেই দুইটা পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া সুবিবেচনা নহে, তবে কতক পরিমাণে বিষয় নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা দিলেই যথেষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনও এই কথা বলিয়াছেন।

অতএব আমরা বিবেচনা করি, এফ্, এ পরীক্ষায় (ইহাকে Intermediate Examination বলিতে পারেন) ইংরাজী, প্রাচীন ভাষা, জড়বিজ্ঞান এবং গ্রীস্ ও রোমের ইতিহাস এই চারিটি বিষয় লইতেই হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইলে সঙ্গত হইত; (এই দুই প্রাচীন দেশের ইতিহাস না জানিলে প্রকৃত শিক্ষাই হয় না)। এই চারিটি বিষয় লইলেই ছাত্রগণ পাশ হইবে। তবে পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিতে প্রয়াসী হইলে, ইহার উপর আর একটা বিষয় লইতে পারে এবং যে যাহা খুসি তাহাই লইতে পারে, এইরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত। যাহা হউক, খসড়া নিয়মাবলীতে বিষয়সংখ্যা যে কমিয়াছে ইহা খুব সন্তোষপ্রদ। যদিও প্রবেশিকা ও এফ্, এ পরীক্ষায় কোনও কোনও বিষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে, (যথা, গণিত) এবং প্রকৃত শিক্ষার পরিচয় না দিলে ছাত্রগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে না তাহার সম্যক্ ব্যবস্থা হইয়াছে, ও পাশের নম্বর উচ্চ করা হইয়াছে, তথাপি বলিতে হইবে

মোটের উপর ছাত্রগণের বোঝা হাল্‌কা হইয়াছে, কেননা কতকগুলা বিষয় লইয়া 'খিচুড়ি পাকান' অপেক্ষা অল্প-সংখ্যক বিষয় ভাল করিয়া শেখা সুখকর।

(গ) বি, এ ও বি, এস, সি পরীক্ষা।

বি, এ পরীক্ষায় বিষয়সংখ্যা কমে নাই, বরং সামান্য একটু বাড়িয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রকে ইংরাজী এবং মাতৃভাষা লইতে হইবে, মাতৃভাষা আধ খানা বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। যাহাদের মাতৃভাষা ইংরাজী, তাহাদিগের জন্য ইংরাজী সাহিত্যের উপর আর একখানা প্রশ্ন-পত্র হইবে। এ ব্যবস্থাটা আমাদের যেন কেমন কেমন ঠেকে। (এখন যেমন ছিল, সেইরূপ) ছাত্রেরা ইচ্ছাসুখে মাতৃভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবে, এই ব্যবস্থা থাকিলেই চলিত। এফ্‌, এ পরীক্ষায় এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল এবং নূতন নিয়মেও বাহাল রহিয়াছে। ছাত্রদিগকে এই দুইটা বিষয় লইতেই হইবে, তাহার উপর আরও দুইটা বিষয় লইতে হইবে, যথা - প্রাচীনভাষা, ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতি, দর্শন ও তর্কশাস্ত্র, গণিত, কোনও একটা বিজ্ঞান। পূর্ব্বে যেমন আর্ট্‌স্‌ বিভাগে প্রত্যেক ছাত্রকে জোর করিয়া দার্শনিক করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা ছিল, এখন আর তাহা থাকিবে না। যাহার যাহা খুসি সে তাহাই লইতে পারিবে। বলা বাহুল্য যে, ইহাতে ছাত্রদিগের বোঝা বিলক্ষণ হালকা হইবে; পূর্ব্বে বহুতর ছাত্র এই নীরস, জটিল ও abstract বিষয় আয়ত্ত করিতে না পারিয়া পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইত। এই নূতন ব্যবস্থায় হয় ত অধিকাংশ ছাত্র সংস্কৃত লইবে, ইহাও একটা সুফল। বিষয়সংখ্যা সামান্য একটু বৃদ্ধি হওয়াতে বিশেষ কোনও অসুবিধা হয় নাই। বরং সকলেই উৎসাহ ও প্রীতির সহিত এই নূতন বিষয়টি (মাতৃভাষা) অধ্যয়ন করিবে। পূর্ব্বে অর্থনীতি ইতিহাসের অন্তর্গত ছিল, এখন দুইটি স্বতন্ত্র বিষয় হইবে। সকল প্রকারের ছাত্রেরা যাহাতে নিজের ঝোঁক ও রুচি অনুসারে বিষয় নির্ব্বাচন করিতে পায়, তজ্জন্য বিজ্ঞানকেও আর্ট্‌স্‌ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অবশ্য বিজ্ঞানে সুধু পুঁথিগত বিদ্যা হইলে চলিবে না, 'হাতে কলমে' শিখিতে হইবে এবং 'হাতে কলমে' শিক্ষার পরীক্ষা দিতে হইবে। পূর্ব্বে এ ব্যবস্থা কেবল মাত্র অনারে ছিল।

বি, এস, সি পরীক্ষায় ছাত্রগণকে কোনও তিনটি বিজ্ঞান (গণিতও বিজ্ঞানের সামিল ধরিতে হইবে) লইতে হইবে। ইহাদিগকে আর ইংরাজী সাহিত্য লইতে হইবে না। এ ব্যবস্থাটি আমাদের কাছে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে বোধ হয় বটে, যাহারা বিজ্ঞানানুশীলনে ব্যাপৃত থাকিবে তাহাদিগের আর সাহিত্য পাঠের প্রয়োজন কি? কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইংরাজী বিদেশীয় ভাষা, একদম ইংরাজী সাহিত্যচর্চ্চা ছাড়িয়া দিলে অচিরেই ছাত্রগণের ইংরাজীজ্ঞান কাঁচা হইয়া পড়িবে; এফ্‌, এ পর্য্যন্ত যতটা সাহিত্য আলোচনা করিয়াছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। তবে এই সকল ছাত্রদিগের জন্য কবির কাব্যপাঠের ব্যবস্থা না করিয়া Tyndall, Huxley, Darwin, Spencer, Ball, Proctor প্রভৃতি লেখকগণের বৈজ্ঞানিক সাহিত্যপাঠের ব্যবস্থা করিলে সঙ্গত হইত। ইঁহারা বৈজ্ঞানিক হইলেও ইঁহাদের রচনারীতি (style) অতি পরিপাটী; এই আদর্শে বিজ্ঞানপাঠী ছাত্রগণ রচনা করিতে যত্নশীল হইবে, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

যে সকল ছাত্র আর্ট্‌স্‌ বা বিজ্ঞান বিভাগে পাশ হইয়াছে, তাহারা আবার এক বৎসর পড়িয়া অপরবিভাগে পরীক্ষা দিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহারা আর্ট্‌স্‌ বিভাগে পূর্ব্ব পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে তাহারাই আর্ট্‌স্‌ বিভাগে বি, এ পরীক্ষা দিতে পারিবে। যাহারা বিজ্ঞান বিভাগে পূর্ব্ব পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে তাহারাই বিজ্ঞান বিভাগে বি, এস্‌, সি পরীক্ষা দিতে পারিবে।

(ঘ) ও (ঙ) অনার, এম্‌, এ ও এম্‌, এস্‌, সি; পি, এইচ্‌, ডি ও ডি, এস্‌, সি।

যদিও স্বতন্ত্র বৎসরে অনার পরীক্ষা দিতে হইবে না, তথাপি এই পরীক্ষায় যখন স্বতন্ত্র পাঠ্যের ব্যবস্থা আছে, তখন ধরিতে গেলে ইহাও একটা স্বতন্ত্র পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় পাশ পরীক্ষা অপেক্ষা জ্ঞানের অধিকতর গভীরতা ও পরিমাণ প্রয়োজন হইবে। এখনকার অনার পরীক্ষা অপেক্ষা কঠিনতর হইবে অনুমান হয়। ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে কোনও একটি বিষয়ে অনার লইতে পারে, একের অধিক বিষয়ে লইতে পারিবে না। কেননা যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে

তাহাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একের অধিক বিষয়ে অনার্সের পাঠ্য আয়ত্ত করা সম্ভবপর নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে; সেরূপ করিলে পল্লবগ্রাহিতা বা মুখস্থবিদ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। এ ব্যবস্থা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। কিন্তু আমরা পাশ ও অনার্সের এইরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরীক্ষার পক্ষপাতী নহি। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনও এইরূপ স্বতন্ত্র পরীক্ষার উপর বিশেষ রাজী নহেন। ইহাতে দুই জাতীয় বি, এ বা বি, এস, সি হওয়াতে পাশ বি, এ বা বি, এস, সি দিগের উপর অল্পবিদ্য বলিয়া সাধারণের অন্যায় অশ্রদ্ধা হয়। যাহারা পাশকোর্সে প্রথম বিভাগে প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইবে, তাহাদিগকে অনার্স আখ্যা দিলেই যথেষ্ট হইত।

এম্, এ ও এম্, এস্, সি পরীক্ষায় একটি বিষয় লইতে হইবে এবং জ্ঞানের গভীরতা ও পরিমাণ এখনকার অপেক্ষা বেশী হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। কতকগুলি নূতন বিষয়ও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহার উপর আবার ডকটরস ডিগ্রী বলিয়া একটা নূতন ডিগ্রীর সৃষ্টি হইল।

সাধারণভাবে প্রত্যেক পরীক্ষার আলোচনা করিলাম। এক্ষণে ইংরাজী, সংস্কৃত এবং বাঙ্গলা এই তিনটি ভাষা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইল তাহার বিচার করিব।

(চ) ইংরাজী।

আমাদের ছাত্রগণের ইংরাজীজ্ঞান সাধারণতঃ অত্যন্ত কাঁচা হয় এবং তজ্জন্য তাহারা নিম্নপরীক্ষায় যোগে-যাগে উত্তীর্ণ হইলেও বি, এ পরীক্ষায় বারম্বার অকৃতকার্য্য হয়, ইহা পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। ১৩১১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে "পরীক্ষা-বিভ্রাট্" নামক প্রবন্ধে এই প্রশ্নের বিচার করিয়াছি। ইহার একটা কারণ, স্কুলের সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা সে পরিমাণে বাড়ে নাই; সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার ভার অল্পবেতন-ভোগী অল্পবিদ্য শিক্ষকদিগের হাতে দেওয়া হয়। ইহাতে বনিয়াদ কাঁচা হইয়া যায়; এবং সেই "বিস্‌মোল্লায় গলদ" কিছুতেই উচ্চ স্তরে শোধরাইতে পারা যায় না। এই দোষ দূর করা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় সাক্ষাৎ ভাবে কিছু করিতে পারেন না, তবে ভরসা করি স্কুল recognition বিষয়ে যে নূতন নিয়ম হইয়াছে তাহার দরুণ শিক্ষকনিয়োগ সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী কড়াক্কড় হইবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত এনট্রান্স পরীক্ষার প্রধান দোষ এই যে, ছাত্রগণ যে পরিমাণ ভাষাজ্ঞান লইয়া উচ্চশিক্ষালাভের জন্য কলেজে প্রবেশ করে, তাহা বড় অসম্পূর্ণ। এবিষয়ে কিভাবে সংস্কার হওয়া উচিত, পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে তাহা বলিয়াছি। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, নূতন ব্যবস্থায় ঠিক সেই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

(১) যাহাতে ছাত্রগণ অর্থপুস্তক মুখস্থ করিয়া অবলীলাক্রমে পাশ হইতে না পারে, তজ্জন্য পাঠ্যপুস্তক উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাঠ্যপুস্তক থাকাতে পাঠের পরিসর নিম্নশ্রেণী হইতেই এত সঙ্কীর্ণ হইত যে ভাষাজ্ঞান পাকা হইতে পারিত না। এক্ষণে ছাত্রগণ স্বাধীনভাবে নানারূপ সাহিত্যপুস্তক পড়িতে উৎসাহিত ও বাধ্য হইবে। (২) ইংরাজী হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদ ও মাতৃভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ এই উভয় প্রকার অনুবাদ ইংরাজীর পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভাষাশিক্ষায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। পূর্ব্বে ইংরাজি হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদ দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষার অন্তর্গত ছিল, কিন্তু আমরা উল্লিখিত প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে ইহাও প্রকৃত পক্ষে ইংরাজীজ্ঞানের পরিচায়ক, অতএব, ইহা ইংরাজীভাষার পরীক্ষার অঙ্গীভূত হওয়া উচিত। নূতন ব্যবস্থায় তাহাই হইয়াছে। সাধারণতঃ যে বিদ্‌ঘুটে বাঙ্গলা অনুবাদের জন্য দেওয়া হয়, তাহারও দোষ দেখাইয়াছিলাম। এক্ষণে নিয়ম হইয়াছে যে বাঙ্গালাভাষার প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার-দিগের রচনা হইতে অনুবাদের জন্য প্রশ্ন সঙ্কলিত হইবে। (৩) ইংরাজীভাষার ব্যাকরণ প্রাচীনভাষার ব্যাকরণের ন্যায় বিরাট ব্যাপার নহে; অতএব ব্যাকরণের কতকগুলা 'কূট-কচালে' প্রশ্ন না দিয়া অনুবাদ ও রচনার উপর জোর দেওয়া উচিত, আর তাহাতেই প্রকৃত ব্যাকরণজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। একথাও আমরা আমাদের প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম। সেই ব্যবস্থাই হইয়াছে। (৪) পূর্ব্বে শতকরা ৩৩ এ পাশ ছিল, এক্ষণে ৩৬ হইল; ইহাতে জ্ঞানের মাত্রা বাড়িবে। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ও বি, এ পরীক্ষা কমিশন পাশের নম্বর উচ্চ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

উচ্চপরীক্ষায় সাহিত্য হিসাবে ইংরাজী পড়িতে হইবে। কাজেই সে সব স্থলে পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে সেই সঙ্গে পুস্তকের বাহির হইতেও প্রশ্ন দেওয়া হইবে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে পাঠের পরিসরবৃদ্ধি ঘটিবে। সকল ভাষাতে এবং সকল পরীক্ষাতে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভাষাজ্ঞানের প্রকৃত পরিচয় এই উপায়ে গ্রহণ করাই আধুনিকশিক্ষাপ্রণালীসম্মত এ কথাও আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম। এফ্‌, এ ও বি, এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে এক্ষণে তিনখানি করিয়া প্রশ্ন-পত্র (পূর্ব্বে দুইখানি ছিল) থাকিবে:—(১) পদ্য (২) গদ্য (৩) অপঠিতপূর্ব্ব অংশের ব্যাখ্যা ও প্রবন্ধরচনা। পাশের নম্বরও পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ করা হইয়াছে। এফ্, এ পরীক্ষায় ভাষাতত্ত্ব (philology) প্রবেশ করান হইয়াছে। এই ব্যবস্থাটা আমাদিগের নিকট সঙ্গত বোধ হয় না।

(চ) সংস্কৃত।

১৩১১ সালের চৈত্র সংখ্যা এবং ১৩১২ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে দুইটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে সংস্কৃত (বা অপর কোনও প্রাচীন ভাষা) সকল আর্টস পরীক্ষায় অবশ্যশিক্ষণীয় হওয়া উচিত, এবং তদনুকূলে যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলাম। তৎসমুদায়ের পুনরাবৃত্তি করিয়া পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না। এই প্রস্তাব ও যুক্তিগুলি সেনেট সভার গোচর করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। পূর্ব্বেও যেমন প্রাচীন ভাষা কেবলমাত্র এফ্‌, এ পরীক্ষায় অবশ্যশিক্ষণীয় ছিল, এখনও তাহাই রহিল, উপরন্তু এফ্‌, এ পরীক্ষায়ও যাহারা বিজ্ঞানের পথ অবলম্বন করিবে তাহাদিগকে প্রাচীনভাষা আদপে শিখিতেই হইবে না এই ব্যবস্থা দাঁড়াইল। যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের পরামর্শানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত আইন পাশ হইয়াছে, আমাদের জ্ঞানিজনেরা যদি একবার সেই কমিশনের কথাগুলা ভাল করিয়া পড়িতেন, তাহা হইলে প্রাচীন ভাষার প্রতি এরূপ অবহেলা করিতেন না। যাহা হউক, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সেনেটসভার কার্য্যে দোষারোপ করা নিতান্তই অশোভন। তাঁহারা অবশ্য 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে' এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

১৩১১ সালের অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘ সংখ্যা এবং ১৩১২ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে আমরা সংস্কৃতশিক্ষা সম্বন্ধে যে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহাতে কতকগুলি সংস্কার প্রার্থনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে তাহার অধিকাংশই নূতন ব্যবস্থায় গৃহীত হইয়াছে। প্রথমতঃ, প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতের দ্বিতীয় প্রশ্ন-পত্রে ইংরাজী হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদ এবং মাতৃভাষায় প্রবন্ধরচনার ব্যবস্থা ছিল, তৎপরিবর্ত্তে অপঠিতপূর্ব্ব সংস্কৃত গদ্যপদ্যের ইংরাজীতে অনুবাদ ও ইংরাজী হইতে সংস্কৃতে অনুবাদের ব্যবস্থা হইল। উচ্চ পরীক্ষায় যদিও ইহার জন্য স্বতন্ত্র প্রশ্ন-পত্রের ব্যবস্থা হইল না, তথাপি প্রত্যেক প্রশ্ন-পত্রেই ঐ ধরণের কতক কতক প্রশ্ন থাকিবে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। এফ্‌, এ ও বি, এ পাশ পরীক্ষায় পূর্ব্বে স্বতন্ত্র ব্যাকরণপাঠের ব্যবস্থা ছিল না, এখন হইয়াছে। এই সকল প্রকৃষ্ট ব্যবস্থার ফলে ছাত্রেরা সংস্কৃত রীতিমত না শিখিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না।

আমরা ঐ সকল প্রবন্ধে সংস্কৃতের সংস্কৃতে ব্যাখ্যা ও পদ-পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলাম। এই নিয়ম থাকাতে ছাত্রগণ সকল পরীক্ষায় (বিশেষতঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায়) না বুঝিয়া সংস্কৃত প্রতিবাক্য ও ব্যাখ্যা মুখস্থ করে, প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃতে রচনাশক্তির বিকাশ হয় না। নূতন ব্যবস্থায় ইহার কতকটা প্রতিকার হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এরূপ নিয়ম অন্য কোনও প্রাচীন (বা বৈদেশিক) ভাষার বেলায় নাই।

১৩১১ সালের চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে বলিয়াছিলাম, এম, এ পরীক্ষায় ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে প্রতীচ্যজ্ঞানের সঙ্গে প্রাচ্যজ্ঞানের সংমিশ্রণ বাঞ্ছনীয়। ইহার কতকটা ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা আরও বলিয়াছিলাম যে এম, এ পরীক্ষায় ইংরাজী ভাষার সঙ্গে কোনও একটি প্রাচ্যভাষা লইতে হইবে, শুধু একটা ভাষায় এম, এ উপাধি পাইবে না। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ ব্যবস্থা আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনও এইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এ ব্যবস্থা হয় নাই।

(জ) বাঙ্গলা।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে সংস্কৃত না

লইয়া বাঙ্গলা লইতে পারে। এস্থলেও দ্বিতীয় বেলার প্রশ্ন-পত্রে অপঠিতপূর্ব্ব অংশের ব্যাখ্যা এবং প্রবন্ধরচনা করিতে হইবে এই ব্যবস্থা হইয়াছে। মাতৃভাষা হইতে ইংরাজীতে এবং ইংরাজী হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদ যদিও ইংরাজী পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত, তথাপি ইহার দরুণ ছাত্রগণ মাতৃভাষার চর্চ্চা রাখিবে এই হিসাবে ইহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবে পূর্ব্বে সকল ছাত্রদিগের জন্যই মাতৃভাষায় প্রবন্ধরচনার যে ব্যবস্থা ছিল তাহা উঠিয়া গেল। এফ্, এ পরীক্ষার ন্যায় এ স্থলেও এই ধরণের একটি (optional) ইচ্ছাসুখে লইবার প্রশ্ন-পত্র থাকিলে ভাল হইত। বি, এ পরীক্ষায় মাতৃভাষায় রীতিমত পরীক্ষা দিতে হইবে সে কথা বি,এ পরীক্ষার আলোচনাকালে বলিয়াছি। যাহারা বিজ্ঞানচর্চ্চা করিবে, ডিগ্রী পরীক্ষায় তাহাদিগের জন্য মাতৃভাষায় প্রবন্ধরচনার যে (optional) ইচ্ছাসুখে লইবার প্রশ্ন-পত্র ছিল, নূতন ব্যবস্থায় তাহা উঠিয়া গেল। আমাদের বিবেচনায় কোনও পরীক্ষায়ই মাতৃভাষা অবশ্যশিক্ষণীয় না করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রবন্ধরচনার জন্য optional প্রশ্ন-পত্র রাখিলেই সঙ্গত হইত। আমাদের বরাবর ধারণা, সংস্কৃত অবশ্যশিক্ষণীয় হইলে পরোক্ষভাবে বাঙ্গলা ভাষার অধিক উপকার হইবে। এ কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনেরও এই মত। বাঙ্গলা ভাষার উন্নতিবিধায়ক একটি বড় সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া আমাদের মন্তব্য শেষ করিব; বিশ্ববিদ্যালয় অর্থসাহায্য করিয়া বা পদক পারিতোষিক প্রভৃতি দিয়া উৎকৃষ্ট বিদেশীয় গ্রন্থের অথবা সংস্কৃত গ্রন্থের বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থের প্রকাশ ও সম্পাদন বিষয়ে উৎসাহ দিবেন। এই শেষোক্ত ব্যবস্থার জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট সাতিশয় কৃতজ্ঞ থাকিলাম। ইহাতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ব্যবসায় পরীক্ষাগ্রহণ, এই অপবাদের ক্ষালন হইল।

উপসংহার।

শিক্ষা ও পরীক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ কঠোর ব্যবস্থা হইল ইহার ফলে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে, ছাত্রাভাবে এবং খরচার দায়ে অনেক স্কুলকলেজ উঠিয়া যাইবে, এবং উচ্চশিক্ষার দ্বার অবরুদ্ধ হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়সংস্কারের প্রস্তাব হওয়া অবধি দেশের আপামরসাধারণ এই তিনটি কথা বলিয়া আসিতেছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, শিক্ষার আদর্শ যত উন্নত হইবে, ছাত্রগণ তত ভাল করিয়া শিখিতে প্রয়াসী হইবে এবং শিক্ষকগণও তদ্বিষয়ে উৎসাহী হইবেন, ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য। অতএব পরীক্ষা কঠিন হইলেই যে পরীক্ষার ফল এখন অপেক্ষা খারাপ হইবে এরূপ আশঙ্কা অমূলক। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রসংখ্যা 'দলে পুরু' হইলেই প্রকৃত শিক্ষক সুখী হন না, সংখ্যায় অল্প হইলেও তাহারা উচ্চশিক্ষালাভের অধিকারী হওয়া চাই, প্রকৃত শিক্ষকের ইহাই আকাঙ্ক্ষা। বর্ত্তমান প্রণালীর দোষে অধিকারী অনধিকারী সকল ছাত্রই তথাকথিত উচ্চশিক্ষার দিকে ঝোঁকে, ইহাতে তাহাদেরও অর্থনাশ এবং মনস্তাপ ঘটে, এবং উচ্চশিক্ষার আদর্শেরও অবনতি ঘটে। উচ্চ শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে উচ্চ শিক্ষা হওয়া চাই। ব্যবস্থার কঠোরতায় বাধ্য হইয়া যদি কতক পরিমাণ ছাত্র শিল্পশিক্ষা বা ব্যবসায়বাণিজ্যের দিকে যায় তাহাতে দেশের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল। এ সকল কথা আমরা 'পরীক্ষা-বিভ্রাট' শীর্ষক প্রবন্ধে এবং ১৩১১ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে বলিয়াছি। ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্যেও এ কথার আভাস দিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, যে সকল স্কুলকলেজ বা শিক্ষক শিক্ষাদানের কার্য্যে নিতান্ত অশক্ত, সেগুলি থাকিয়া কোনও সুফল নাই, অনর্থক শিক্ষার অবনতি ঘটে। তাহাদিগের সংখ্যাহ্রাস অপ্রার্থনীয় নহে। তবে তাহারা যদি শিক্ষার সুচারু বন্দোবস্ত করিতে অগ্রসর হয়, সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার বাহাদুর তাহাদিগকে অর্থসাহায্য করিতে কার্পণ্য করিবেন না। দেশের ধনকুবেরগণও ইচ্ছা করিলে এই সকল স্কুলকলেজগুলিকে প্রকৃত শিক্ষার কেন্দ্র করিয়া তুলিতে পারেন। আর যাঁহারা দেশহিতকল্পে এই সকল স্কুলকলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাঁহারা এগুলির উন্নতির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিলে অবশ্যই এগুলির উন্নতি করিতে পারিবেন। 'যেন তেন প্রকারেণ' ছাত্রদিগকে পরীক্ষায় পাশ করাইয়া দিতে পারিলেই প্রকৃত শিক্ষাদান হইল, এই ভ্রান্তবিশ্বাস আমাদিগের স্বদেশীয়গণের মন হইতে

যত শীঘ্র অপসারিত হয়, ততই দেশের, সমাজের ও শিক্ষা-বিভাগের মঙ্গল।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

নেপাল যাত্রা।

আমরা সত্য সত্যই নেপাল রাজ্যের রাজধানী কাটমণ্ডুতে অবস্থান করিতেছি। সম্মুখে ভুবনবিখ্যাত এভারেষ্টের শুভ্র হিমানীমণ্ডিত শিখর রৌদ্রে চক্‌চক্ করিতেছে। তাহার উভয় পার্শ্বেই সীমান্ত ব্যাপিয়া চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতমালা। এই আমাদের ভারতের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত। কে ইহার নাম হিমালয় রাখিয়াছিল? ইহা যে প্রকৃতই হিমালয়। আহা! ঐ শুভ্র নির্ম্মল হিমালয়ে প্রাণ ছুটিয়া যায়। কিন্তু উহা মানবের অলঙ্ঘনীয়।

এই সেই কাটমণ্ডু—বাল্যকালে ভূগোলে পড়িয়াছিলাম নেপাল হিমালয়ের ক্রোড়স্থিত স্বাধীন রাজ্য, কাটমণ্ডু তাহার রাজধানী। তখন কাটামুণ্ড পড়িতেই শিহরিয়া উঠিতাম। কাটামুণ্ডতে গেলে বুঝি কেহ আর মুণ্ড ফিরিয়া পায় না। না জানি সে কি ভীষণ রাজ্য! সে দেশের মানব বুঝি সাক্ষাৎ দানব। ক্রমে শুনিলাম কেহ নাকি নেপালে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। কেবল শ্রুতিকথা নয় নেপাল প্রত্যাবৃত্ত সাক্ষাৎ মানব দেখিলাম, কৈ মুণ্ড ত যায় নাই, বরং কিছু লাভ হইয়াছে। তখন কাটমণ্ডুভীতি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। কিন্তু তখন ভাবি নাই যে সেই কাটমণ্ডুতে একদিন আসিতে হইবে।

জুলাই মাসের একদিন রাত্রি প্রায় ১০টার সময় হাবড়া হইতে রেলগাড়ী চড়িয়া নেপাল যাত্রা করিলাম। রাত্রি প্রভাত হইতে-না-হইতে মোকামা ঘাটে পৌছিলাম। ষ্টীমারে করিয়া গঙ্গা পার হইবার সময় গঙ্গার বক্ষে অরুণোদয় দেখিলাম। সে বড় সুন্দর দৃশ্য। গঙ্গা পার হইয়াই পুনরায় রেলগাড়ীতে আরোহণ করিলাম। উভয় পার্শ্বের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মজফঃরপুর মতিহারী ইত্যাদি ছাড়িয়া বৈকালে শিগাউলি পৌছিলাম। এই সেই শিগাউলি যেখানে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রাজের সহিত নেপালরাজের সন্ধি হইয়াছিল। সেদিন হইতে নৈনিতাল, মস্যুরি প্রভৃতি রমণীয় প্রদেশসকল নেপালরাজের হস্তচ্যুত হইয়াছে। শিগাউলি হইতে অন্য রেলগাড়ীতে উঠিয়া দেখিতে দেখিতে সূর্য্যাস্তের সময় বক্‌সনে পৌছিলাম। ষ্টেশনটী অতি ক্ষুদ্র, একখানি গৃহমাত্র বলিলেও হয়। এখানে ইংরাজ রাজ্যের সীমান্ত। ষ্টেশনেই দেখিলাম মাটীতে ছোট ছোট পানসীর মত কি পড়িয়া রহিয়াছে। এমন যান ত জীবনে কখন দেখি নাই। জলপথ নয়। স্থলপথে এই নৌকায় চড়িয়া কিরূপে যাইব বুঝিতে পারিলাম না। শুনিলাম ইহার নাম কাঠেট।—ইহার তলদেশ কাষ্ঠে আবৃত বটে।—কাঠেটে শয্যা বিস্তৃত হইল—আমরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কাঠেটে বসিলাম। অমনি চারিজন তাহা স্কন্ধে করিয়া লইল। তখন বুঝিলাম এ ত নৌকা নয়,—এ দোলা। উপকথায় যে দোলার কথা পড়িয়াছিলাম এই বুঝি সেই দোলা। কাঠেটের মাথার উপর একটা কাঠের ঢাকনা, তাহার চারিদিকে ঝালরের মত পর্দ্দা। কাঠের দোলায় দুলিতে দুলিতে নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী বীরগঞ্জের হাঁসপাতালে আসিয়া পৌছিলাম। সেই খানেই রাত্রিবাস করা গেল। পরদিন প্রাতে আহারাদি করিয়া পুনরায় কাঠেটে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলাম। বীরগঞ্জে আসিতে আসিতে পথে মহারাজার শীতকালের আবাসগৃহ সুন্দর প্রাসাদ দেখিলাম। বীরগঞ্জ একটা ক্ষুদ্র সহর। বীরগঞ্জ ছাড়িয়া বিশাল প্রান্তরে আসিয়া পড়িলাম। আজ আমাদিগকে প্রায় দশক্রোশ যাইতে হইবে। প্রান্তর ছাড়িয়া দিবাশেষে এক জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলাম। শুনিলাম চারি ক্রোশ ক্রমাগত এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌছিতে হইবে। জঙ্গলের ভিতর এক এক ক্রোশ অন্তর একটা জলের কল আছে। জন-মানবহীন শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলের ভিতর রজনী সমাগত হইল। সঙ্গে মশাল, লণ্ঠন কিম্বা কোনরূপ আলো নাই। ঝিল্লী-নিনাদিত গভীর অরণ্যে নিঃশব্দে ব্যাকুলচিত্তে কয়টী প্রাণী যাইতেছি। আমাদের মন ত্রাসে উৎকণ্ঠিত। শিশুসন্তানগণ ক্ষুধা এবং নিদ্রায় আকুল। আবার কোথা হইতে মাছির ন্যায় কি গায়ে পড়িতেছে। তাহার দংশনে সকলে আরও অস্থির হইয়া পড়িল। শ্রাবণ মাসে এতদঞ্চল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়। আমরা ব্যাকুলচিত্তে ক্রমে রাত্রি ৯টার

সময় বিহাকবির পান্থনিবাসে পৌঁছিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। দোতলায় প্রশস্ত গৃহে বেঞ্চ, টেবিল এবং শয়নের জন্য খাট রহিয়াছে দেখিলাম। তখনি শয্যা প্রস্তুত হইল। শিশুগণ শয়ন করিল, এবং সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত করিল। আমরা দুটী অন্নের প্রত্যাশায় রাত্রি ১০৷৷০।১১টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অর্দ্ধসিদ্ধ দুটী ভাত খাইয়া শয়ন করিলাম। পরদিন প্রাতে আহার করিয়াই পুনরায় যাত্রা করিলাম। বিহাকবি হইতে বরাবর একটা পার্ব্বত্য নদীর বারিশূন্য তল ধরিয়া চলিলাম। কেবল বালুকা এবং নুড়ি, মধ্যে মধ্যে ঝিরঝির করিয়া জল আসিতেছে। কাটমণ্ডু যাইবার পথ বরাবর প্রায় এই প্রকার। হয় নদীর মধ্য দিয়া না হয় নদীর ধার দিয়া যাইতে হয়। বিহাকবির হইতে তিন ক্রোশ মাত্র দূরে চুরিয়ার পান্থনিবাসে আমরা আশ্রয় লইলাম। চুরিয়ার পান্থশালাটী যদিও বিহাকবির ন্যায় প্রশস্ত নয় কিন্তু স্থানটী বেশ নির্জ্জন এবং সুন্দর স্থানে অবস্থিত। পরদিন প্রাতে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া আবার কাণ্ঠেটারোহণ। আজিকার পথে দৃশ্য বড় সুন্দর। ক্রমে যত যাইতেছি দুইধারে গভীর জঙ্গলাবৃত পর্ব্বত সকল অটল অচল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। দিবাভাগেই ঝিল্লিকাগণ ঝিঁ ঝিঁ শব্দ করিতেছে। মাঝে মাঝে পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরণার জল পড়িতেছে। প্রকৃতির কি স্তব্ধ সুগম্ভীর ভাব! চারিদিকের সুন্দর শান্ত সৌন্দর্য্যে আমাদের প্রাণ বিস্ময়ে ও পুলকে স্তব্ধ হইয়া গেল। কোথায় দোধ পার্ব্বত্য নদী কল্ কল্ ছল্ ছল্ করিয়া যেন লাফাইতে লাফাইতে নামিয়া আসিতেছে। কি বিক্রম! কি গর্জ্জন! জল অতি স্বাদু, অতি নির্ম্মল, অত্যন্ত শীতল। পথে কেবল পর্ব্বত এবং জঙ্গল, মধ্যে মধ্যে কেবল দুই এক ঘর বসতি দেখিলাম। বাহকগণ সেখানে আহার ও বিশ্রাম করে। পথে হেটুরা মেরুঘাটার প্রভৃতি স্থানে পান্থনিবাস আছে বটে কিন্তু বর্ষাকালে সেখানে "আউল" নামে ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব। একবার তাহার কবলে পড়িলে আর রক্ষা নাই। আমরা এ সকল পান্থনিবাসে পদার্পণ করিলাম না, তৃতীয় দিন প্রায় ৯ ক্রোশ পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া ভীমকেশীর পান্থনিবাসে প্রায় সন্ধ্যার সময় উপনীত হইলাম। এখানে বিস্তর যাত্রীর সমাগম দেখিলাম। দ্বিতল গৃহে আশ্রয় লইলাম বটে কিন্তু স্বচ্ছন্দে বাস করিবার কোন বন্দোবস্ত নাই। আহারের ক্লেশ পথে যথেষ্ট—মোটা চিড়া মোটা চাউল ভিন্ন কিছুই মিলে না।

সঙ্গে প্রচুর আহারের সংস্থান করিয়া না আসিলে বিলক্ষণ আহারের ক্লেশ পাইতে হয়। আমাদের সঙ্গে ভৃত্য ও পাচক ছিল বটে, কিন্তু পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা না থাকায় সঙ্গে যথেষ্ট আহার্য্য আনা হয় নাই। সুতরাং সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভীমকেশী উপত্যকার ন্যায় চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা বেষ্টিত। পর দিন প্রত্যূষে আহারাদির কোন চেষ্টাই না করিয়া শিশু সন্তান-দিগের জন্য কিঞ্চিৎ মহিষের দুগ্ধের সংস্থান করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম। পথের কষ্টে নাকাল হইয়া আজ আমাদের প্রতিজ্ঞা কাটমণ্ডু পৌঁছিতেই হইবে। ভীমকেশী হইতে বাহির হইয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। ওঃ সে কি ভয়ানক পথ! যেন সোজাভাবে উঁচু হইয়া উঠিতেছে। পথে না আছে গাছপালা না আছে আশ্রয়। পথও কি তেমনি? পা দিবা মাত্র যেন নোড়া নুড়ি গড়াইয়া পড়িতেছে। কেবল ক্ষণে ক্ষণে ভয় হইতেছে বাহকগণ এইবার বুঝি আমাদের স্কন্ধে লইয়া গড়াইয়া তলায় পড়িয়া যায়। পথ এমন সোজা যে আমাদের কাণ্ঠেট হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। ক্রোড়ের শিশুকে এক হস্তে চাপিয়া ধরিয়া আর এক হস্তে কাণ্ঠেট শক্ত করিয়া ধরিয়াছি, আর বারম্বার সকলকে সাবধান করিয়া দিতে হইতেছে। এই ভয়ানক খাড়াই যেন আর শেষ হয় না। প্রায় ২৩০০ফুট এই ভাবে উঠিলাম। ভয়ে যেন হৃৎপিণ্ডের শোণিত খরবেগে চলিতে চলিতে সহসা বন্ধ হইয়া আসিল। এইভাবে অতি কষ্টে শিখরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাহকগণ কাণ্ঠেট নামাইয়া হাঁপাইতে লাগিল। আমরা বাঁচিলাম। এই স্থানের নাম চিসাপানি-গাড়ি। এখানে গড় এবং সৈন্য এই পথে শত্রুর আগমন প্রতিরোধ করিবার জন্য সমুদায় ব্যবস্থা আছে। স্থানটী খুব উচ্চ এবং শীতল। চিসাপানিগাড়ি হইতে নীচের পথ ভীমকেশী পরিখা দেখা যায়। গাড়িতে পৌঁছিয়া দেখিলাম আমাদের জন্য কাটমণ্ডু হইতে লোক আসিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে নানাবিধ ফল খাদ্যদ্রব্য। আনিয়া শিশুগণ বাহকগণ সকলে আনন্দে ভোজন করিল। আজ আমাদের পথের

শেষ দিন—আজ পথ যেরূপ কঠিন, দূরত্বও তদ্রূপ। গড়ি হইতে ক্রমে নামিয়া কুনিসানি নামক সুন্দর স্থানে আসিলাম। সেখানে খরস্রোতে গর্জ্জন করিতে করিতে এক পার্ব্বত্য নদী নামিয়া যাইতেছে। তাহার উপর সুন্দর পুল। পুলের উপর দিয়া সকলে পদব্রজে পর পারে উপস্থিত হইলাম। সেখানে অতি সুরম্য পান্থনিবাস রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের সেদিন বিশ্রামের সময় নাই। আজ ক্রমাগত পাহাড় ভাঙ্গা। একটা হইতে অন্যটা—সেটা হইতে আর একটা। এই প্রকারে ক্রমে তিনটা উচ্চ উচ্চ পাহাড় অতিক্রম করিলাম। ক্রমে সূর্য্যাস্ত হইল। কিন্তু আমাদের গন্তব্য স্থান এখনও বহু দূরে। আমরা চন্দ্রগিরি নামক শেষ পাহাড়ে নামিতে লাগিলাম। সে কেবলই নামা—ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় অবরোহণ করিতেছি। চন্দ্রগিরি হইতে নিম্নে কাটমণ্ডুর উপত্যকা—সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আমাদের দর্শনলালসা চরিতার্থ হইতে দিল না। চন্দ্রগিরি হইতে অবতরণ করিয়া আমরা সমতলে পদার্পণ করিলাম। সে স্থানের নাম থানকোট। সেখানে জনসমাজ এবং কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ দেখিয়া মনে হইল এইবার বুঝি কাটমণ্ডুতে পৌঁছিলাম। কিন্তু থানকোট হইতে অন্ধকারে তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় রাত্রি ৯টার সময় আমরা কাটমণ্ডু সহরে প্রবেশ করিলাম। কেবল দুপারে গীত বাদ্যের শব্দ কর্ণে আসিতে লাগিল। তখন আমরা এত পরিশ্রান্ত যে পর্দ্দা সরাইয়া দুইধারের দৃশ্য দেখিতে ইচ্ছা হইল না। ইহা ভিন্ন এসহরে কলিকাতার ন্যায় পথপার্শ্বে আলোক নাই, সব অন্ধকার—কেবল গীতবাদ্য কর্ণে আসিতে লাগিল। বাসায় পৌঁছিতে প্রায় ১০টা বাজিয়া গেল। আমরা সুসজ্জিত আলোকিত গৃহ এবং বন্ধুর পরিচিত মুখ দেখিয়া যেন অবসন্ন দেহে প্রাণ পাইলাম।

শ্রীহেমলতা দেবী।

চেরুমা।

দক্ষিণ ভারতের মালাবার প্রদেশে বহুসংখ্যক অসভ্য ও নীচ জাতীয় লোকের বাস। এই সকল বর্ব্বর, অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাও যেমন বিপুল, তাহাদের সামাজিক শ্রেণী-বিভাগও তদ্রূপ বহুতর। এক চেরুমা জাতির মধ্যেই ঊনচল্লিশটি সম্প্রদায় বা শ্রেণী-বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত পারিয়া, মালায়ার, কাদের, নাইদি প্রভৃতি নানা জাতির নানা শ্রেণী বিদ্যমান আছে। তৎসমুদয়ের আলোচনা প্রবন্ধান্তরে করিবার বাসনা রহিল। বর্ত্তমান প্রস্তাবে কেবল চেরুমাগণের বিষয়ই কিছু বিবৃত করিব। এস্থলে বলিয়া রাখি, ১৩১০ সালের শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসীতে' 'মালাবারের চেরুমা' শীর্ষক প্রবন্ধে আমি চেরুমা জাতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। পাঠকগণ উক্ত প্রবন্ধটিও এই সঙ্গে একবার পাঠ করিতে পারেন।

গত আদম সুমারির রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, চেরুমাদিগের সংখ্যা ২৫৮, ৪০২ জন। ইহাদের ঊনচল্লিশটি সম্প্রদায় মধ্যে পাঁচটি প্রধান। নিম্নে তাহার নাম ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা লিপিবদ্ধ হইল :—

কানাক্কান	...	...	৭৩০০০ জন।
পোলা চেরুমান	..	..	৩৮০০০ জন।
এরালান	...	...	২৩০০০ জন।
কুদান	..	...	১৪০০০ জন।
রোলান	..	...	১২০০০ জন।

প্রথম দুই সম্প্রদায়ের চেরুমারা মালাবারের দক্ষিণ তালুকে বসবাস করে, এরালান শ্রেণীর চেরুমা পালঘাট ও ওয়ালুভানদ তালুকে, কুদান শ্রেণীর চেরুমা কেবল ওয়ালুভানদ তালুকে এবং রোলান শ্রেণীর চেরুমারা ওয়ালুভানদ এবং এরনদ তালুকে বাস করিয়া থাকে।

চেরুমা শব্দের অর্থ ক্ষেত্রের (বা ময়দানের) পুত্র, কারণ তাহাদের অধিকাংশ কৃষিক্ষেত্রেই ভূমিষ্ঠ হয় এবং সেই খানেই বাস করে। মালাবার প্রদেশে তাহারা অতি নীচ জাতীয় বলিয়া এবং ভূস্বামী বা জমীদারের কৃষিকার্য্যের যন্ত্রস্বরূপ বিবেচিত হয়। ইহাদের অধিকাংশেরই নিজের কোন বাড়ী ঘর নাই, নিজ নিজ প্রভুপ্রদত্ত গৃহেই তাহাদের ঘরকন্না ও বসবাস এবং তাহাদের 'মুষ্টিভিক্ষা'তেই জীবন ধারণ হইয়া থাকে। প্রত্যহ প্রত্যূষে চেরুমাগণ স্ব স্ব প্রভুর আলয়ে গমন করে এবং তাঁহার আদেশ মত সমস্ত দিন ক্ষেত্রে জলসেক কি কর্ষণ কিম্বা কৃষিসম্বন্ধীয় যে-কোনো

প্রকারের কার্য্য প্রয়োজনীয়, তাহা সম্পন্ন করে। সন্ধ্যার সময় পারিশ্রমিক বাবদ কিছু ধান্য তাহাদের মধ্যে বিতরিত হয় কাজ থাক্ বা না থাক্ তাহারা প্রত্যহই প্রভুর নিকট কিছু কিছু ধান্য বা তণ্ডুল পাইয়া থাকে; কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় সম্বৎসরে তাহাদের অদৃষ্টে কচিৎ অবসর দিন ঘটে। চেরুমাগণের সন্তানবর্গও বাল্যকাল হইতে জ্যেষ্ঠগণের আদশে কাজ-কর্ম্মে অভ্যস্ত হইতে থাকে।

পূর্ব্বে চেরুমারা ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহৃত হইত, বর্ত্তমান কালে আইনতঃ কোনো ক্রীতদাস না থাকিলেও, উহারা স্ব স্ব প্রভু কর্ত্তৃক যে ভাবে শাসিত ও ব্যবহৃত হয়, তাহা ক্রীতদাসের অবস্থা হইতে কোনো অংশে ভাল নহে। মালাবার প্রদেশের এই দাস-ব্যবসায়ের প্রতি সর্ব্ব প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৃষ্টি পতিত হয়। সেরিংগাপত্তমের সন্ধি স্থলে ইংরেজ রাজা মহীশুরের টিপুসুলতানের নিকট হইতে মালাবার প্রাপ্ত হন। সেই বৎসরেই অর্থাৎ ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাহাদুর দাস-ব্যবসায় রহিত করিয়া এক ঘোষণা প্রচার করেন। তাহাতে দাস-ব্যবসায়ীকে চোরের সঙ্গে এককরা হয় এবং তাহাতে বিধান থাকে যে, যদি কেহ দাস-ব্যবসায় করে তবে কোম্পানী বাহাদুর তাহার সমস্ত দাস কাড়িয়া লইয়া দাসের মূল্যের পাঁচগুণ জরিমানা করিবেন। যে ব্যক্তি ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিবে, সেও ঐ ভাবে দণ্ডিত হইবে। এই সময় সমুদ্রপথে ফরাসীদিগের মাহি (Mahe) এবং ডচ্‌দিগের, কোচিনের সহিত এই ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। সময় সময় দস্যুতস্করের দল ব্যবসায়ীগণের হস্ত হইতে বহুসংখ্যক দাস অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়া উক্ত দুই স্থানের বৈদেশিক এজেন্টের নিকট বিক্রয় করিত।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাহাদুর কর্ত্তৃক দাস-ব্যবসায় দূষণীয় ও দণ্ডনীয় বলিয়া প্রচারিত হইলেও ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই ব্যবসায় গোপনে একরকম পূর্ব্বভাবেই প্রচলিত ছিল। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে মিঃ ওয়ারডেন মালাবারের প্রধান কালেক্টরের পদে নিয়োজিত হইয়া উক্ত ঘৃণিত ব্যবসায়ের অস্তিত্বের প্রমাণ পান এবং নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তদ্বিষয়ে সরকার বাহাদুরে রিপোর্ট করেন। রিপোর্টের ফলে সরকার হইতে আদেশ হয় যে, রাজস্বদায়ে এখন হইতে আর কোনো দাস বিক্রীত হইতে পারিবে না। চেরুমারা সরকারের খাস-জমি চাষ আবাদ করিত, অজন্মা হইলে তাহারা রাজস্ব প্রদান করিতে পারিত না। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের নিকট হইতে সংগৃহীত রাজস্ব মধ্যে ৯২৭৮/০ আনা মাপ দেন এবং কোনো ব্যক্তি যাহাতে গোপনে দাস ক্রয় বিক্রয় করিতে না পারে তৎপক্ষে তীব্র দৃষ্টি রাখার জন্য স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীবৃন্দকে অনুরোধ করেন।* অতঃপর ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৮৪৩ অব্দে পাঁচ আইন দ্বারা (Act V of 1843) মালাবারের দাস ব্যবসায় রহিত করিয়া দেন। এই আইনের বিধানের বিষয় কালেক্টর মিষ্টার কনোলি (Conolly) সমগ্র জেলায় প্রচার করেন এবং প্রত্যেক চেরুমাকে বুঝাইয়া দেন যে, যদি তাহাদের প্রভু তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন তবে তাহারা যেন তাহাদের নিকটেই অবস্থান করে। কালেক্টর বাহাদুর সেই প্রসঙ্গে আরো প্রকাশ করেন যে, সরকার বাহাদুরের ইচ্ছা নয় যে, ক্রীতদাসেরা তাহাদের বর্ত্তমান প্রভুকে ত্যাগ করিয়া অন্যের অধীনে নিযুক্ত হয়। তাহারা যথাইচ্ছা তথা কার্য্য করিতে পারে,—কেহ যেন তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ না করে। সদাশয় ইংরেজ রাজ বিপন্ন দাসদিগকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন। কালেক্টর জেলার মধ্যে প্রচার করেন, কেহ যেন চেরুমাগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করেন। এই সময় ও বর্ত্তমান সময়ে কত প্রভেদ! অসভ্য অশিক্ষিত চেরুমাগণের দুরবস্থা দর্শনে যে ইংরেজ রাজ বিগলিত হইয়া তাহাদের প্রতি বরাভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন,—তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, আজ সেই ইংরাজ রাজ বঙ্গচ্ছেদে মুহ্যমান শিক্ষিত, রাজভক্ত বাঙালীর সর্ব্ববিধ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিনা দোষে হরণ করিতে উদ্যত! আজ সারকিউলারের উপর সারকিউলার দ্বারা বাঙালীর স্বাধীনতা লোপ করা হইতেছে। আজ বাঙালীর ছেলে যাহারা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তাহারা সভা-সমিতিতে যোগদান

* ইহার পর বিলাতের ডাইরেক্টর সভার অভিপ্রায় মত আর একটী আদেশ প্রচারিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য—"to watch the subject of the improvement of the Cherumar with that interest which it evidently merits, and leave no available means untried for effecting that object."

করিতে পারিবে না, 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া জননী জন্মভূমিকে ডাকিতে পারিবে না! আজ নূতন বঙ্গদেশের কোনো কোনো জেলার অধিবাসীবৃন্দ উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইতে সামান্য কনষ্টেবল কর্ত্তৃক যে ভাবে লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত এবং পিষ্ট হইতেছে, তাহাতে মনে হয় না যে আমরা সুসভ্য ইংরেজ রাজের শাসনে বাস করিতেছি। নূতন বঙ্গের অধিবাসীগণের এরূপ অবস্থা কি এই দাসগণের অবস্থা অপেক্ষাও শোচনীয় নহে?

থাক্ সে কথা। চেরুমাগণের মুক্তির জন্য সরকার বাহাদুর ঐরূপ উদার বিধি ব্যবস্থা করিলেও প্রকৃতপক্ষে অদ্যাপিও তাহারা মুক্তি পায় নাই। মালাবারের সম্ভ্রান্ত অনেক মহোদয় বলেন যে, প্রকৃত স্বাধীনতা কাহাকে বলে দাসেরা তাহা জানে না। সুতরাং তাহাদের সম্মতিক্রমেই এখন দাসব্যবসায় চলিতেছে। দাসের ইচ্ছাক্রমে লোকে তাহাকে বিক্রয় বা ক্রয় করে। অবশ্য এ ঘটনা গোপনে অনুষ্ঠিত হয়; কারণ ব্যবসায়ীগণ দণ্ডবিধির ৩৭০ ও ৩৭১ ধারা রীতিমত জ্ঞাত আছে।

মালাবারের অপরাপর নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তিগণের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে চেরুমাগণের সামাজিক অবস্থা অতি শোচনীয় বলিয়া বোধ হয়। কোনো উচ্চজাতীয় ব্যক্তিকে পথ দিয়া আসিতে দেখিলে চেরুমারা ত্রিশ ফুট দূরে সরিয়া দাঁড়াইবে। যদি এই নিষিদ্ধ সীমার মধ্যে কেহ আগমন করে, তবে উচ্চজাতীয় ব্যক্তি নিজকে অপবিত্র জ্ঞান করে এবং তৎক্ষণাৎ অবগাহন দ্বারা পাতকরাশি বিদূরিত করে। কোনো ব্রাহ্মণ-পল্লীতে বা দেবালয় ও পুষ্করিণীর নিকট চেরুমার যাওয়ার অধিকার নাই। যদি তদ্রূপ করে তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে। প্রকাশ্য রাজপথে চেরুমা যদি তাহার প্রভুকে আসিতে দেখে, তবে তাঁহার বিরক্তি নিবারণের নিমিত্ত সে পথ ছাড়িয়া দূরে—বিপথে গিয়া দণ্ডায়মান হয়। যদি পথিপার্শ্বে দাঁড়াইবার ভাল স্থান না থাকে, তবে তাহারা প্রভুর সন্তোষ উৎপাদনের নিমিত্ত কর্দ্দম বা কণ্টকের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। চেরুমারা পথে ভিন্ন জাতীয় যে ব্যক্তিকেই আসিতে দেখুক না কেন, তাহাকে সাবধান করিবার নিমিত্ত 'ও হো হো' বলিয়া চীৎকার করে। কোচিন এবং ত্রিবাঙ্কুড় দেশীয় রাজ্যে তাহাদের দুরবস্থার পরিসীমা নাই; কারণ এখানে ব্রাহ্মণ-প্রভুত্ব অপ্রতিহত। ব্রাহ্মণ-শাসিত পালঘাট তালুকে অদ্যাপিও চেরুমাগণ দিবাভাগে বাজারে প্রবেশ করিতে পারে না।

তাহাদের সামাজিক অবস্থা যেমন শোচনীয়, বাসের স্থানও তেমনি কদর্য্য। সামান্য চালা ঘর তাহাদের বাসস্থান এবং অল্প খান কতক মাটীর বাসনেই তাহাদের সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। কেহ কেহ ক্ষেত্র হইতে দূরে বাস করে, অপর কেহ কেহ ক্ষেত্রেই বিশেষতঃ বর্ষাকালে চালা ঘরে মাঠে বাস করে। মালাবার কৃষি-প্রধান স্থান এবং চেরুমারাই তথাকার প্রধান কৃষক। এপ্রেল মে মাস হইতে চাষের কার্য্য আরম্ভ হয়। চেরুমারাই ভূমি-কর্ষণ, বীজ বপন, জলসেচন, ভূমি হইতে আগাছা, ঘাস প্রভৃতি উৎপাটন এবং শস্য রক্ষা প্রভৃতি কৃষি বিষয়ক যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকে। শস্য পক্ক হইলে তাহারা রজনীতে ক্ষেত্রে প্রহরায় নিযুক্ত থাকে। ক্ষেত্রে যে ঘরে থাকিয়া তাহারা চৌকি দেয়, তাহা নারিকেল পত্র বা গিরিপ্রান্তস্থিত কোন প্রকারের তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া বংশদণ্ডোপরি সংরক্ষিত থাকে। তাহাদের রমণীগণও রাত্রে ক্ষেত্রে বাস করে। শস্য পাকিলে চেরুমারা তাহা কর্ত্তন করতঃ 'কালামে' (গোলাবাড়ীতে বা শস্য মাড়াই স্থানে) লইয়া যাইয়া শস্য মাড়াই করিয়া তাহা গৃহজাত করে। তৎপর পুনরায় চাষের সময় উপস্থিত হইলে তাহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কাজে ব্যাপৃত হয়। গ্রীষ্মকালে তাহাদের পরিশ্রম কিছু লাঘব হয়, এই সময় তাহারা উদ্যানে শাক্ সব্জীর চাষ করে। বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শিশু চেরুমা প্রভুর গো-চারণ করিয়া থাকে। তাহারা এইরূপ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, তাহার বিনিময়ে কি পায়? বড়জোর ছয় 'নালি' বা দেড় 'এদানগাল' (ধান্য মাপিবার কাঠা) ধান্য পাইয়া থাকে, তাহার মূল্য দুই কি তিন পয়সা মাত্র। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর এই সামান্য ধান্য লইয়া তাহারা শান্তিময় কুটীরে প্রবেশ করে এবং উহারই কিয়দংশ লবণ, তৈল, তাড়ি, তামাক, মৎস্য প্রভৃতি প্রধান খাদ্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য মৌজুত রাখিয়া দেয়। চেরুমারা নিজেই ধান ভানে, রন্ধনের ভারটা অবশ্য চেরুমীদিগের উপর। রন্ধন হইলে শিশুসন্তানদিগকে প্রথমে খাইতে দেওয়া হয়, তৎপর

বর্ষীয়ানগণের আহারান্তে যাহা অবশিষ্ট থাকে চেরুমীরা তদ্দ্বারা কোনো প্রকারে উদরের জ্বালা নিবৃত্তি করিয়া থাকে। বলিতে ভুল হইয়াছে, পুরুষগণের আহারের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতে কিয়দংশ তাহাদের প্রাতঃকালের আহারের নিমিত্ত রাখিয়া চেরুমীরা ভোজন করে। চেরুমারা বড় কাঁকড়া ও মৎস্যপ্রিয়, তাহারা আবাদের সময় ক্ষেতের পার্শ্বের ডোবা খাল হইতে প্রচুর পরিমাণে উহা ধরিয়া থাকে।

চেরুমারা ছুটি পায় না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল ভগবতী ও কালীপূজার সময় একদিন করিয়া অবকাশ পায়। এই দিন তাহারা আমোদ আহ্লাদ পানভোজন করিয়া থাকে। এই দিনের পারিশ্রমিক তাহাদিগকে অগ্রিম প্রদত্ত হয়। ইহার দ্বারা তাহারা তাড়ি খাইয়া মত্ত অবস্থায় পূজার স্থানের নিকট গমন করে এবং চারিজনে একত্রে হাত ও গলা ধরাধরি করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণের অদূরেঃ

লালি লালি লালি হো
লালি লালি লালি হো

বলিয়া নৃত্য গীত করিতে থাকে। যুগ যুগান্ত হইতে চেরুমারা ঐ ছয় লালি করিয়া দৈনিক পারিশ্রমিক পাইয়া আসিতেছে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ক্রমে বৃদ্ধি হইলেও তাহাদের পারিশ্রমিকের কোনো হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই। তাহারা উপার্জ্জনের অধিকাংশ মদে উড়াইয়া দেয় সত্য; স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে চেরুমাগণ মদের দোকানের সম্মুখে নারিকেলের খুলিতে করিয়া মদ্যপান করিতে বসে। চেরুমা প্রথমে পান করে, তৎপর তাহার স্ত্রী তৎপর সন্তানবর্গ তাড়ি পান করে। এ দৃশ্য মালাবারের দৈনন্দিন ঘটনা, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও মত্ততাবস্থায় তাহারা কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। তাড়ি তাহাদের প্রধান পানীয়।

চেরুমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। কিন্তু পারিশ্রমিক স্বরূপ দৈনিক যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাতে পরিবারবর্গের সকলের উদর পূর্ণ না হইলে বন্য কন্দ, ফল, মূল, মৎস্য প্রভৃতি দ্বারা সে অভাব মোচন করিয়া থাকে। মৎস্য তাহাদের প্রিয় খাদ্য হইলেও পচা মৎস্য ভক্ষণ করে না। তাহাদের সামাজিক আচার ব্যবহারে কোনো বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় না। তাহাদের সমস্ত জীবন কৃষিকার্য্যে কাটিয়া যায়, শীকার কি অন্য কোনো আমোদ আহ্লাদে তাহাদের প্রবৃত্তি দেখা যায় না। মনুষ্যসমাগম অনুভব করিয়া শশক যেমন ঝটিতে লোকলোচনের বহির্ভূত হইতে প্রয়াস পায়, চেরুমারাও তেমনি স্বজাতি ভিন্ন অপর জাতীয় ব্যক্তির সমাবেশস্থান হইতে দূরে অবস্থান করিতে ভালবাসে। প্রধান প্রধান পর্ব্বদিনে তাহারা তাহাদের প্রভুর আলয়ে মিলিত হয়, তথায় কিছু ধান্য বা তণ্ডুল ও পাকের অপর সামান্য কিছু উপকরণ সহ একখানি করিয়া ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিধানের নিমিত্ত পাইয়া থাকে। এই বস্ত্রখণ্ডের নাম 'মুণ্ড'। ইহা সাধারণতঃ সাড়ে তিন ফুট লম্বা এবং আড়াই ফুট প্রশস্ত হইয়া থাকে। এই বস্ত্রখণ্ড কোমরে জড়াইয়া আর একখানি সামান্য গামছা দ্বারা তাহারা মস্তক আবৃত করে। চেরুমীরা মোটা ও লম্বা একখানি করিয়া বস্ত্র পায়, তদ্দ্বারা তাহারা কটিদেশ আবৃত করে কিন্তু হাঁটুর নিম্নভাগ, উপরিভাগের সৌভাগ্যে নিরন্তর ঈর্ষ্যা প্রকাশ করে। চেরুমাদের বক্ষঃস্থল অনাবৃত থাকে। কেবল নানা বর্ণের স্ফটিক ও প্রস্তরের মালা গলদেশ হইতে লম্বিত হইয়া বক্ষঃস্থলের উপর শোভা পায়। চেরুমাদের ব্যবহার্য্য বস্ত্রখণ্ড সারা বৎসরেও ধৌত হইবার অবসর পায় না। শীতকালে অষ্টপ্রহর তাহারা কুটীরে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত রাখে, তীব্র শীতকণা হইতে দেহরক্ষার ইহাই তাহাদের একমাত্র উপাদান।

চেরুমীদের দস্তার বালা হস্তের প্রধান অলঙ্কার এবং কাঁসার রিং কর্ণে ও অঙ্গুলীতে শোভা পায়। কোনো কোনো সৌভাগ্যবতী চেরুমী নাসিকা ও পদাঙ্গুলীতেও ঐপ্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করে। কোনো কোনো শ্রেণীর চেরুমারা মস্তকে কেশ রাখে না, আবার কতক শ্রেণীর লোকে কেবল মস্তকের সম্মুখভাগ মুণ্ডন করে। তাহারা যেপ্রকার খুর দ্বারা কেশ মুণ্ডন করে তাহাকে একখানি ভোঁতা ছুরিকা বলাই সঙ্গত। এই ভোঁতা ছুরি দ্বারা মুণ্ডিত হইবার সময় চেরুমাদের মুখে এক প্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণার ভাব প্রকাশ পায়, কাহারো, কাহারো, মস্তকের চর্ম্ম ছিঁড়িয়া রক্তপাত হইতে থাকে; তত্রাচ তাহারা সেই পুরাতন ভোঁতা ছুরির মমতা ত্যাগ করিতে পারে না! বর্ষাকালে ক্ষেত্রে কাজ করিবার সময় চেরুমারা কটিদেশ কদলীপত্রে

আবৃত করে এবং ঐ পত্রের বা অপর কোন সবুজ বর্ণের দীর্ঘ পত্রের চূড়াকৃতি টুপি প্রস্তুত করতঃ মস্তকে দেয়। চেরুমীদিগের পধান কার্য্য—রন্ধন ও সন্তান পালন। এই দুই কার্য্য করিয়া অবসর পাইলে তাহারা ক্ষেত্রে যাইয়া সাধ্যানুসারে স্বামী পুত্রের সাহায্য করিয়া থাকে। বর্ষাকালে তাহারাও ঐরূপ টুপি মাথায় দিত কিন্তু এক্ষণে ক্রমে ক্রমে চেরুমীদিগের টুপি ব্যবহার পদ্ধতি হ্রাস হইতেছে। চেরুমারা বেশ লম্বা হয় না, তাহাদের অধিকাংশই হ্রস্ব কিন্তু খুব সবল ও শক্তিশালী। তাহাদের মুখ দেখিলেই মনে হয় যে, তাহারা নিতান্ত সরল ও বর্ব্বর। মালাবারে একটী প্রবাদ আছে যে,—চেরুমারা বৃদ্ধ হয় না। প্রকৃতই পাকা-চুলো চেরুমা খুব অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়।

বিবাহব্যাপারে বরের ভগিনীই প্রধান কর্ম্মকর্ত্রী। বরের ভগিনীই ভাবী ভ্রাতৃবধূর মূল্যের টাকা প্রদান এবং বিবাহ অন্তে বধূকে গৃহে আনয়ন করে। বিবাহের পূর্ব্বে উভয় পক্ষের কর্তৃপক্ষেরই সম্মতি আবশ্যক, এবং এই সম্মতি উভয়ে উভয়ের বাড়ী যাইয়া প্রকাশ করে। এই মিলনের সময় তাহারা কাঞ্জি পান করে; বিবাহে কর্ত্তাব্যক্তির সম্মতি থাকিলে এই কাঞ্জি গ্রহণ করিবার সময় সে প্রথম একটী 'কানাম' (স্থানীয় মুদ্রা) কাঞ্জিস্থিত পাত্রে নিক্ষেপ করে। ইহাতেই তাহাদের সম্মতি প্রকাশ পায়। বর কন্যার গৃহাভিমুখে বিবাহার্থে যাত্রা করিলে পল্লীর সমস্ত চেরুমা সেই সঙ্গে গমন করে এবং পথিমধ্যে স্থানে স্থানে তাহারা লাঠি খেলে। চেরুমীগণ তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে সমস্বরে জাতীয় সঙ্গীত গান করে এবং বলে,—"ও চেরুমা! তোমাদের 'ভাদিতাল্লু' (লাঠি খেলা) একবার দেখাও।" বিবাহউৎসবে স্ত্রী পুরুষ একত্রে নৃত্যও করে। শ্বশুরগৃহে আসিবার সময়ে কন্যা অবশ্য ক্রন্দন করিয়া থাকে। কন্যা শ্বশুর গৃহে প্রথম প্রবেশের সময় চৌকাঠের উপরিস্থিত একখানি শিলনোড়া পদদলিত করে। ইহার তাৎপর্য্য কি বুঝা যায় না। বিধবা-বিবাহ, বহু-বিবাহ প্রভৃতি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। তালাক্ দেওয়াও সচরাচর দেখা যায় না।

প্রসবের পর ২৮ দিন চেরুমীরা অপবিত্র থাকে; মালাবারের সুদূর উত্তর প্রান্তে প্রসবের পর চেরুমীরা ৪২ দিন অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সময় চেরুমীরা যে গৃহে থাকে, সে গৃহে চেরুমীরা ভোজন করে না। প্রসবের পূর্ব্বে প্রায়ই একখানি পৃথক চালা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। অশৌচ অন্তে নবজাত সন্তানটি তাহাদের প্রভুর নিকট আনীত হয়। তিনিই শিশুর নামকরণ করেন।

আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে মালাবারের উত্তর প্রদেশস্থ চেরুমারা আট দিন এবং দক্ষিণ প্রদেশস্থ চেরুমারা ১৪ দিন অশৌচ পালন করে। কিন্তু এই কয় দিন অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিলে তাহাদিগকে অনশনব্রত পালন করিতে হইবে বলিয়া, তাহারা অশৌচনাশের এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে। গোময়ের সহিত ধান্য মিশ্রিত করতঃ কতিপয় গোলাকার পিণ্ড করে, পরে তাহা একটি মৃৎপাত্রে করিয়া পাত্রের মুখবন্ধ করতঃ গৃহের এককোণে রাখিয়া দেয়। যত দিন এই পাত্রটির মুখ বন্ধ থাকে তত দিন তাহারা অপবিত্রতার হস্ত হইতে রক্ষা পায় এবং স্বজাতীয়ের সহিত অবাধে মিলামেশা করিতে পারে। সুবিধা মত একদিন ঐ পাত্রের মুখ উদ্ঘাটন করে। এই সময় হইতে ৪০ দিন তাহাদের অশৌচ থাকে। অশৌচের পঞ্চদশ ও একচত্বারিংশ দিবসে তাহারা মৃতের ও তৎপূর্ব্বপুরুষের উদ্দেশ্যে তণ্ডুল ছিটাইয়া দিয়া জ্ঞাতিবর্গকে ভোজন করায়।

প্রত্যেক চেরুমা নিজ নিজ পরিবার লইয়া পৃথক থাকে, তাহাদের কোন নেতা নাই। কিন্তু বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসার নিমিত্ত প্রবীণদিগের একটি সমিতি আছে। এই সমিতির সভাপতির হস্তে তাহারা কতকগুলি ক্ষমতা দিয়াছে। বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করিয়া সভাপতি যে আদেশ প্রচার করে, উভয় পক্ষই অবনত মস্তকে তাহা স্বীকার করিয়া লয়।

উইনাডে (Wynad) বৈদেশিক কৃষি ব্যবসায়ীগণের কার্য্যের সহায়তার নিমিত্ত এখন চেরুমাদিগকে রেলপথে যাতায়াত করিতে দেখা যায়। অনেকে মহীশূরের স্বর্ণখনিতেও কাজ করিতে যায়। লোক দেখিলে ভীতিবিহ্বল হওয়া, ধীরে ধীরে সে স্বভাব তাহাদের পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যাহারা ভূস্বামীর নিকট হইতে খাজানা করিয়া জমী লইয়া আবাদ করে, তাহাদের তাহাতে কোনরূপ প্রজাস্বত্ব জন্মে না। জমীদার যে দিন ইচ্ছা তাহা কাড়িয়া লইতে পারেন

শস্য মাড়াই করিয়া চেকমারা কাঠের জালায় ভরিয়া ভূ-গর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখে, আবশ্যক মত বাহির করিয়া লয়। তাহাদের আবাস কুটীরকে 'চালা' বলে।

এখন চেকমাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। চেকমাদের দেবতার নাম কি তাহা জানি না। তবে তাহারা একখানি কৃষ্ণশিলা অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তাহাদের স্বজাতি হইতেই পুরোহিত নির্ব্বাচিত হয়। তাহারা পুরোহিতকে খুব সম্মান ও ভক্তি করিয়া থাকে। তাহার উক্ত প্রস্তরদেবতার প্রীত্যর্থে তাহার সম্মুখে মরগী বধ করিয়া তাহার রক্তে দেবতাকে স্নান করায়। চেকমারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরজন্ম স্বীকার করে। অবশ্য কোন কোন সম্প্রদায়ের চেকমা পরজন্মটা মানে না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে।

বারান্তরে চেকমাজাতির অপরাপর সম্প্রদায়ের ও মালাবারের অন্যান্য নীচ অসভ্য জাতির বিবরণ লিখিবার বাসনা রহিল।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় উদ্ভিদাবলী।

৫। শাল।

এই বৃক্ষ ভারতের নানাস্থানে জন্মায়। সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, বাঁকুড়া, মানভূম প্রভৃতি সাঁওতালদিগের বাসস্থানে ইহা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

শালগাছের গঁদ অত্যন্ত উপকারী। এই গঁদকে সচরাচর লোকে ধূনা বলিয়া থাকে। ইহা পুড়াইলে সুগন্ধ বাষ্প প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য ধূনা ভারতের সর্ব্বত্র পূজার সময় ব্যবহৃত হয়।

ধূনা আমাশয় রোগে উপকারী। উক্ত রোগে চিনির সহিত ইহা দেওয়া হয়। আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে ধূনা শীতবীর্য্য, গুরু, তিক্ত-কষায়-রস, ধারক এবং ইহা বাতাদি দোষত্রয়, রক্তদুষ্টি, স্বেদ, বিসর্প, জ্বর, ব্রণ, বিপাদিকা, গ্রহদোষ, ভগ্ন রোগ, অগ্নিদগ্ধ ক্ষত, অলক্ষ্মী, নেত্রশূল ও অতিসার নাশক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ধূনা অনেক প্রকার মলম্ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সাঁওতালেরা শালগাছের পাতাও ঔষধে ব্যবহার করিয়া থাকে। তা' ছাড়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি অনেক জেলায় লোকে শালপাতায় ভাত খায়, এবং ইহা মুদি ময়রার দোকানে ক্রেতাদিগকে জিনিস দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এই গাছের ছাল হইতে লাল ও কাল রং সাঁওতালেরা প্রস্তুত করে। আবার এই ছাল চামড়া পরিষ্কার ও কস (tan) করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

দুর্ভিক্ষের সময় সাঁওতালেরা এই গাছের বীজ ভক্ষণ করিয়া থাকে।

শালগাছের কাঠ খুব মজবুত বলিয়া অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়। বাড়ীর কড়ি, দ্বার, গবাক্ষ, নদীর সেতু, নৌকা ও গাড়ির জন্য এই কাঠ প্রায় ব্যবহৃত হয়।

এই গাছের কাঠের কয়লা লৌহবিশুদ্ধকারীরা ব্যবহার করিয়া থাকে।

"The charcoal from the timber is said by the Kol iron-smelters to be the best for their purpose and to produce superior iron." (*Revd. A. Campbell.*)

"কোল লৌহকারেরা শালের কয়লা তাহাদের কাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বলে। তাহারা বলে ইহা দ্বারা সরেস লোহা প্রস্তুত হয়।"

এই শালবৃক্ষ এত উপকারী বলিয়া ভারতের নানাস্থানে লোকেরা ইহার পূজা করিয়া থাকে। বুদ্ধদেব এই বৃক্ষের ছায়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে বুদ্ধদেবের জন্মের সময় তাঁহার মাতা মায়াদেবী এই বৃক্ষের একটা শাখা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

আবার বুদ্ধদেব এই বৃক্ষের ছায়ায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

ডিমক (Dymock) সাহেব তাঁহার প্রণীত Pharmacographia Indica নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন:—

"The small branches of the *Sala* are used by Indian villagers to detect witches: they write upon branches the name of every woman over 12 years of age in the village; the branches are then placed in water,



শাল। পাতা, ফুল, ফল।

and left for 4½ hours; if any woman's branch withers she is the witch."

"শালের ছোট ছোট শাখা ভারতীয় গ্রামবাসীদের দ্বারা ডাইনী ধরিবার জন্য ব্যবহৃত হয়; তাহারা ডালগুলিতে গ্রামের বার বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক প্রত্যেক স্ত্রীলোকের নাম লেখে। তাহার পর ডালগুলি সাড়ে চারি ঘণ্টা জলে ডুবাইয়া রাখা হয়; কোন স্ত্রীলোকের নামযুক্ত শাখা শুকাইলে সেই ডাইনী বলিয়া স্থির হয়।"

৬। টুন।

এই ৫০।৬০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ ভারতের নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই গাছের ছাল ও ফুল ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ছাল কষায়, ধারক ও জ্বরনাশক। এই জন্য ইহা বালকদিগের অতিসার ও আমাশয় রোগে উপকারী। ছালের ইন্‌ফ্যুজান্ বা ক্বাথ জ্বরে ব্যবহৃত হয়।

বম্বাই অঞ্চলে এই গাছের ফুল স্ত্রীলোকদিগের নানা রোগে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের বীজ ও পাতা গরু ও বলদদিগকে খাইতে দেওয়া হয়।

ইহার ফুল হইতে লাল হরিদ্রা রং প্রস্তুত হয়। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ইহার ফুল হইতে বসন্তী বলিয়া এক প্রকার রং প্রস্তুত করা হয়। আবার বীজ হইতেও লাল রং প্রস্তুত হয়।



টুন। পাতা, ফুল।

এই গাছ হইতে এক প্রকার গদ পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয় না।

এই গাছের কাঠ উইপোকায় আক্রমণ করে না বলিয়া ইহা অনেক প্রকার আসবাব বা গৃহসজ্জা প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা হইতে নৌকাও প্রস্তুত হয়।

৭। কুল।

কুলগাছ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফল সর্ব্বজনবিদিত। পুরাণে কথিত আছে যে পূর্ব্বকালে বদরিকাশ্রমে (যাহা আজকাল বদরিনাথ বলিয়া বিখ্যাত) এত কুলগাছ ছিল যে তজ্জন্য ইহার নাম বদরিকাশ্রম হইয়াছিল। সেখানকার মুনিরা ইহার ফল খাইয়া জীবনধারণ করিতেন।

কুল লোকেরা খায়। দুর্ভিক্ষের সময় গরীব লোকেরা ইহা খাইয়াই জীবনধারণ করে। অনেক রকম কুল দেখিতে পাওয়া যায়। অপক্ক কুলের আচার প্রস্তুত হয়।

পঞ্জাব ও হিন্দুস্থান প্রদেশে কুলের বেশ সুস্বাদ চাটনী তৈয়ার হয়। কুল শুকাইয়া, তাহাতে তেঁতুল ও লবণ মিশাইয়া রাখিলে তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাল অবস্থায় থাকে ও খাইতে পারা যায়।



কুল। পাতা, ফুল, ফল।

কুল ঔষধে ব্যবহার হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে নানা-প্রকার কুল ও তাহাদিগের গুণাগুণ বর্ণিত হইয়াছে।

"যে কুল পচ্যমান অবস্থাতেই মধুর রস হয় ও আয়তনে বৃহৎ, তাহাকে সৌবীর বদর বলে। উহাকে চলিত ভাষায় নারিকুলে কুল বলা যায়। নারিকুলে কুল শীতবীর্য্য, ভেদক, গুরু, পুষ্টিকারক এবং ইহা পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয় ও পিপাসানাশক।

"যে বদরী, সৌবীর বদর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট অর্থাৎ মধ্য প্রমাণ এবং যাহা সম্যক্ পাকিলে মধুর-রস হয়, তাহাকে কোল বলে। কোলাখ্য বদর- ধারক, রুচিকারক, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুবর্দ্ধক, কফজনক, পিত্তকারক, গুরু ও সারক।

"ক্ষুদ্র বদরকে কর্কন্ধু বলা যায়। কর্কন্ধু ঈষৎ মধুর-কষায়-তিক্ত-রসান্বিত, অম্লরস, স্নিগ্ধ, গুরু এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

"শুষ্ক বদরী ভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু এবং ইহা পিপাসা, ক্লান্তি ও রক্তদোষ নাশক।" (আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ ২০১ পৃষ্ঠা)।

মাদ্রাজ প্রদেশের বৈদ্যরা এই গাছের মূলের ক্কাথ নানা প্রকার জ্বরে দিয়া থাকেন।

কষায় ও ধারক বলিয়া এই গাছের ছাল ও বীজ অতি-সারে দেওয়া হয়।

বম্বাই অঞ্চলে এই গাছের পাতা, যজ্ঞডুম্বরের পাতার সহিত বাঁটিয়া বৃশ্চিকদংশিত স্থানের উপর প্রলেপরূপে দেওয়া হয়। ইহার পাতা ফোড়ার উপর বাঁটিয়া লাগাইলে ফোড়া শীঘ্র গলিয়া যায়।



বিভীতকী বা বহেড়া। পাতা, ফল, ফুল।

৮। বহেড়া।

বহেড়ার গাছ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ত্রিফলার ইহা একটী প্রধান অঙ্গ। বৈদ্যগ্রন্থে "বহেড়া মধুর-বিপাক, কষায় রস, কফ-পিত্ত নাশক, উষ্ণবীর্য্য, শীতস্পর্শ, ভেদক, কাসনিবারক, রুক্ষ, নেত্র ও কেশের হিতকর এবং ক্রিমি ও স্বরদোষ প্রশমক। বহেড়ার মজ্জা পিপাসা, বমি, কফ ও বাতহারক, লঘুপাক, কষায় রস ও মদকারক" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বহেড়া হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। এই তৈল কেশে লাগাইলে কেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

বহেড়া গাছের ছাল হইতে এক প্রকার গঁদ পাওয়া যায়। এই গঁদ কোল ও চুয়াড় প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা ভক্ষণ করে। ঔষধেও এই গঁদ ব্যবহৃত হয়।

বহেড়া দ্বারা কাপড় প্রভৃতি রঞ্জিত হইয়া থাকে। বহেড়া ফল ও পাতা চামড়া কস করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বহেড়া ফল হইতে উত্তম লিখিবার কালী প্রস্তুত হয়।

বহেড়া গাছের কাঠ অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়। বহেড়ার বীজের ভিতরের শস্য অনেকে খাইয়া থাকে।

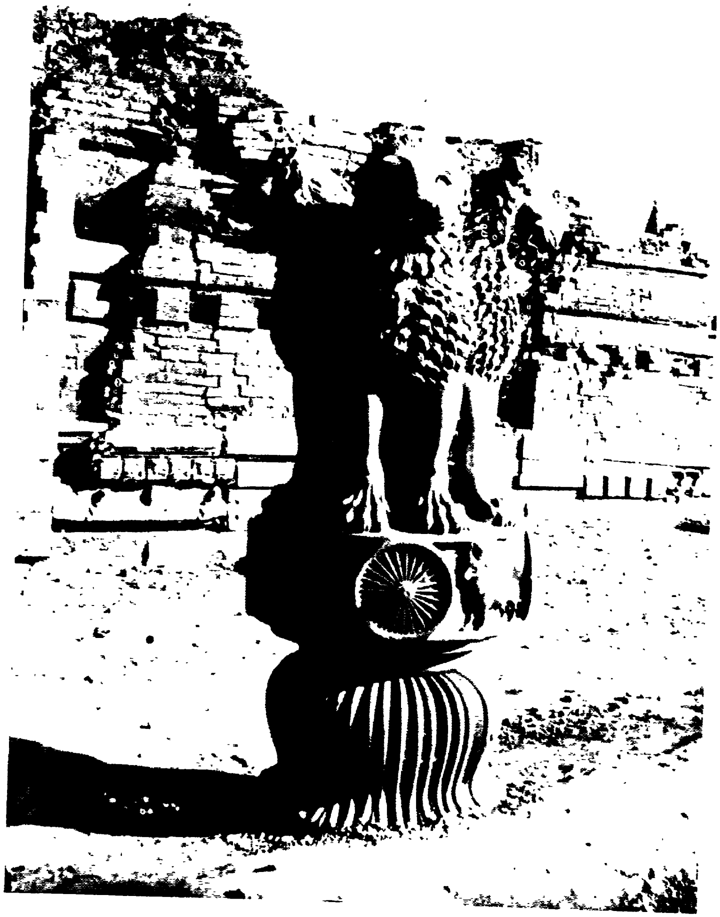
[ক্রমশঃ]

শ্রীবামনদাস বসু।

পথে।

আপনারে বড় করি' প্রাসাদের শিরে
বসে' যবে ছিনু আমি গরবের ভরে,
তুচ্ছ ভাবি সারা বিশ্ব, তোমারে তখন
নয়নেও দেখি নাই, ভাবিয়াও মন
পারে নাই তব মূর্ত্তি করিতে ধারণা;
মনে হ'ত তুমি চির অজানা অচেনা
র'বে মোর কাছে! তোমার সন্ধান
পায় না পায় না বুঝি এই মর প্রাণ।
আজি যবে নিম্নে নামি দাঁড়ায়েছি পথে,
সারা বিশ্ব-পদ-ধূলি তুলে' লয়ে মাথে,
আপনারে হীন করি', দেখিনু তখন
তুমিই আপনি আসি করেছ ধারণ
অসহায় কর খানি; সাথে সাথে ফিরে'
ভিক্ষা অন্ন মাগি' দাও দীন ভিখারীরে।

তারাপ্রসন্ন ঘোষ



সারনাথে আবিষ্কৃত ভগ্ন স্তম্ভের শীর্ষভাগ



সারনাথ স্তূপের গায়ে কারুকার্য।

সারনাথ।

কাশীর পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের উপর ইংরাজ কর্তৃক ক্রূশ চিহ্ন স্থাপিত হইলে ভারতের রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব এবং যুগান্তরের বেশ একটা ধারাবাহিক ইতিহাস থাকিয়া যাইত; সারনাথের বৌদ্ধস্তূপাদি দেখিলে এইরূপই মনে হয়। এখানের প্রাচীন কীর্ত্তির যতই আভাস পাওয়া যাইতেছে ভারতেতিহাসের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদগুলি ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ভারতে যতগুলি রাষ্ট্রবিপ্লব এবং বিশেষতঃ ধর্ম্মবিপ্লব হইয়া গিয়াছে, তাহার সাক্ষ্যদান করিবার জন্য যত তীর্থ যত নিদর্শন আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে কাশী নগরীই সর্ব্ব প্রাচীন ও সর্ব্বপ্রধান বলিয়া মনে হয়। হিন্দুর যাহা প্রাচীনতম ইতিহাস সেই বেদ হইতে লইয়া পুরাণ কাব্যাদিতে কাশীর উল্লেখ আছে এবং সেই পুরাকালেও উহা সমৃদ্ধিশালী নগরী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই প্রাচীনতম হিন্দুধর্ম্মব্যূহ ভেদ করিয়া শাক্যসিংহ যখন বারাণসীর বক্ষে স্বীয় ধর্ম্মচক্র প্রথম ঘূর্ণিত করিয়াছিলেন, তদবধি হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় কাল পর্য্যন্ত কাশীর নানা স্থান এবং বিশেষতঃ সহরের তিন মাইল উত্তরে স্থিত সারনাথ নামক স্থান বৌদ্ধ স্তূপ, বিহার, স্তম্ভ, মূর্ত্তি ও বিবিধ নিদর্শনে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এক্ষণে যে স্থানকে সারনাথ বলে পূর্ব্বে তাহার নাম ছিল 'মৃগদাব'। মেজর গ্রাণ্ট, কানিংহাম, প্রভৃতির প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় রিপোর্টাদিতে তাহাই "Deer Park" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আওরঙ্গজেব যেমন হিন্দু দেব মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষের উপর মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, হিন্দু ও মুসলমান তদ্রূপ বৌদ্ধকীর্ত্তি লোপ করিবার জন্য বিহার ও চৈত্যের উপর মন্দির ও মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমান কাশীর অনেক মন্দির ও মস্‌জিদ্ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারাদির হিন্দু ও মুসলমান সংস্করণ মাত্র। সেই জন্য যত এখন অনুসন্ধান-আবিষ্ক্রিয়া চলিতেছে, ততই বৌদ্ধযুগের প্রকৃত তথ্য বাহির হইয়া পড়িতেছে। বুদ্ধের জীবন-নাটকের প্রধান চারিটী অঙ্ক যথায় অভিনীত হয়, বৌদ্ধগণের নিকট সেই স্থানচতুষ্টয় মহা তীর্থ বলিয়া গণ্য। তাঁহার জন্মের জন্য কপিলাবস্তু, তাঁহার বুদ্ধত্বলাভের নিমিত্ত বুদ্ধগয়া; বুদ্ধ কর্তৃক ধর্ম্মচক্র প্রথম ঘূর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া সারনাথ এবং তাঁহার নির্ব্বাণপ্রাপ্তির জন্য কুশীনর ভারতের বৌদ্ধ মহাতীর্থ। তৎকালীন কাশীনরেশ প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের যজ্ঞভূমি মৃগদাব বা ঋষিপত্তন নামক উপবন মহাত্মা বুদ্ধকে দান করেন। সঙ্ঘেশ্বর শাক্যসিংহের সংস্পর্শে মৃগদাব পরে সঙ্ঘারাম নামে পরিচিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউন্‌থ্‌সাঙ্ এই মহাতীর্থ দর্শন করিয়া যান। রাজকুলতিলক অশোক প্রমুখ গুপ্তবংশীয় এবং পালবংশীয়রাজগণের রাজত্বকালে এই সঙ্ঘারাম বৌদ্ধকীর্ত্তির কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিলে কিছুকালের জন্য এখানে হিন্দুপ্রভাব নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। কিন্তু বৌদ্ধ সাম্রাজ্য বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান কালে বৌদ্ধচিহ্ন বিলোপের যে বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বুদ্ধদেবকে হিন্দুর অবতারের তালিকাভুক্ত করা অন্যতম। তদনুসারে হিন্দুগণ এই সঙ্ঘারামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া সঙ্ঘেশ্বরের পূজা প্রবর্ত্তিত করেন। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সঙ্ঘেশ্বরই সারনাথ এবং তিনিই হিন্দু বৌদ্ধ সকলেরই সারনাথ বা পরম দেবতা বা মহাদেব। কাশীতে শিব ব্যতীত আর কাহারও তিষ্ঠিবার যো নাই। সুতরাং, এখানে মৃত্যু হইলেও যখন শিব হইতে হইবে, তখন বৌদ্ধ সারনাথ শিবত্বে পরিণত হইয়া হিন্দুর পূজ্য হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি? সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত কাশীপরিক্রমা নামক গ্রন্থে পঞ্চক্রোশী যাত্রাবিধি প্রসঙ্গে আছে :—

"বরুণার পার, হৈয়া শুদ্ধাকার, অসংখ্য লিঙ্গেরে।
যত্নে তাহে পূজি, পরে গিয়া ভজি, দেব সঙ্ঘেশ্বরে।
কিঞ্চিদ্ধ্যান তথা, করিয়া সর্ব্বথা, কিঞ্চিৎ তিষ্ঠিবে,
পরে পাশপাণি, ক্ষেত্রমধ্যে জ্ঞানী, প্রবেশি পূজিবে।"

বৌদ্ধপ্রভাব বিলোপের পর হইতে কালের গতিতে সারনাথের বৌদ্ধ নিদর্শনগুলি ক্রমেই যত মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত হইতে থাকে, ততই তাহা লোকলোচনের অগোচরে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিতে থাকে। এইরূপে শত শত বৎসর কাটিলে হঠাৎ একদা কাশীনরেশ চেৎসিংহের প্রধান মন্ত্রী জগৎসিংহের স্মরণার্থ জগৎগঞ্জ পল্লীর প্রতিষ্ঠাসূত্রে স্থপতিগণ এখানে গৃহাদি নির্ম্মাণের উপকরণ সংগ্রহ করিতে যাইয়া ১৮ হাত মৃত্তিকার নিম্নে অশোকস্তূপ-মধ্যস্থ ধনাগারের সন্ধান প্রাপ্ত হয়। সেই প্রোথিত ধনাগারের প্রায় সমস্ত ধনরত্নই তাহারা বাহির করিয়া লয়; কিন্তু কতকগুলি মানব-

হস্তের দগ্ধ অস্থি, পদ্মরাগ মণি, মুক্তা ও সুবর্ণের পত্রাবলী সহ একটী হরিদ্বর্ণ মর্ম্মর সম্পুটক কোন প্রকারে কাশীর তৎকালীন রেসিডেণ্ট জোনাথান ডানকান্ সাহেবের হস্তগত হয়। ১৭৯৪ অব্দের জানুয়ারী মাসে এই ঘটনা হয়। তাহার পর হইতে মেজর জেনারল কানিংহাম ১৮৩৫ অব্দে মেজর কিটো ১৮৫১ অব্দে এবং মিঃ টমাস ও ডাঃ হল প্রমুখ অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত মধ্যে মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া বহু মূর্ত্তি, স্তম্ভ, অট্টালিকাদির ভগ্নাংশ প্রভৃতি বাহির করিয়াছেন। তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ কানিংহাম, ফগুসন, প্রিন্সেপ্, শেরিং প্রভৃতির গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। সারনাথ হইতে প্রাপ্ত বিবিধ বৌদ্ধকীর্ত্তির নিদর্শন কলিকাতা ও লক্ষ্ণৌএর পুরাদ্রব্যাগারে রক্ষিত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত এখানে যতকিছু আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ধমেক নামক প্রকাণ্ড প্রস্তরময় বৌদ্ধস্তূপই সর্ব্বপ্রধান। তৎপরে 'চৌখাণ্ডি' নামক ইষ্টকময় অট্টালিকা, তিন সহস্র ফুট লম্বা ও সহস্র ফুট চওড়া সারঙ্গতাল ও চন্দ্রতাল প্রভৃতি বাহির হইয়াছে; কিন্তু কেহই কোন শিলালিপি বা কোন প্রকার ফলকলিপি ও লিখিত নিদর্শন আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। এদিকে কাহারও পূর্ব্ববৎ দৃষ্টি না থাকায় ক্রমে ক্রমে যাহা ছিল তাহাও লোপ পাইতে বসিয়াছিল এবং অবশেষে এমন হইল যে সারনাথের কোন্ স্থান খনিত ও কোন্ স্থান অখাত আছে তাহা আর জানিবার উপায় রহিল না। গত পূর্ব্ববৎসর যখন পুরাতত্ত্ব-বিভাগের দৃষ্টি ইহার প্রতি পতিত হয়, তখন মিঃ এফ, ও, অর্টেলের তত্ত্বাবধানে ইহার আবিষ্কার-কার্য্য বিস্তারিতভাবে চলিতে লাগিল। তাহার ফলে ভারতেতিহাসের কয়েকটি বিলুপ্ত অধ্যায় উদ্ধারলাভ করিয়াছে। ভারতের বৌদ্ধযুগের ধর্ম্মেতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে এই অতি পুরাতন দেশের প্রাচীন শিল্পকলা ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান, ইহার শিক্ষা ও সভ্যতার চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সারনাথে বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক নবধর্ম্মের বার্ত্তা প্রথম ঘোষিত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত স্থান চিরস্মরণীয় করিবার জন্য বৌদ্ধ সম্রাট অশোক যে স্তম্ভ স্থাপিত করেন তাহা এক্ষণে বাহির হইয়াছে। তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত ধমেক স্তূপের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুন্দর মসৃণ গ্রানাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত এই স্তম্ভের গাত্রে ৯ ছত্র অশোক-লিপি উৎকীর্ণ আছে। স্তম্ভটী কিন্তু ভগ্নাবস্থায় বাহির হইয়াছে এবং লিপিরও কতকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই লিপিতে সম্রাট অশোক দেবানাম্প্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এই লিপি হইতে জানা গিয়াছে সম্রাট অশোক খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারকল্পে বহু প্রয়াস ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করেন। স্তম্ভে পরবর্ত্তী সময়েরও কোন কোন বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে যে লিপি এপর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, অশ্বঘোষের রাজত্বকালীন এরূপ এক লিপি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভগ্নস্তম্ভের সম্মুখেই উহার শিরোভাগ পাওয়া গিয়াছে। ইহা সুপ্রসিদ্ধ (Persepolitan bell) পারসি পলিসের ঘণ্টাকারে নির্ম্মিত। তাহার শীর্ষদেশে চতুর্দ্দিঙ্মুখী চারিটী প্রকাণ্ড সিংহমূর্ত্তি। সিংহচতুষ্টয় সারনাথে প্রথম ঘূর্ণিত ধর্ম্মচক্রের সাঙ্কেতিক চিহ্নস্বরূপ একটী প্রস্তরময় চক্র মধ্যস্থলে ধারণ করিয়া আছে। সেই তরঙ্গায়িত কেশরাবৃত সিংহমূর্ত্তিচতুষ্টয়, স্তম্ভগাত্রের খোদাগিরি, প্রস্তরোৎকীর্ণ ঋজু, চক্র ও তরঙ্গায়িত রেখাদি সুদক্ষ শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে বাইশ শত বৎসরের পুরাতন স্তূপগাত্রোৎকীর্ণ তরঙ্গায়িত রেখাঙ্কণ বা স্ক্রোল বর্ত্তমান চিত্রবিজ্ঞানানুমোদিত নিয়মের সম্পূর্ণ অনুযায়ী। ইহাও বড় কম বিস্ময়ের কথা নহে যে বাইশ শত বর্ষ পূর্ব্বের সেই ঘণ্টা ও সিংহমূর্ত্তিগুলি কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া আজিও বেশ সুন্দর ও সুরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। য়ুরোপীয় আধুনিক শিল্পবিজ্ঞানবিদ্গণ কর্ত্তৃক উহা খোদাগিরির চূড়ান্ত ও স্থাপত্যশিল্পের উৎকৃষ্ট আদর্শ বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে। ভারতবাসীর ইহা অল্প গৌরবের কথা নহে যে আধুনিক শিল্পের আদর্শস্থানীয় হইলেও উহা অর্ব্বাচীন নহে। চীন পরিব্রাজক হিউনথ-সাঙ্ ৭ম শতাব্দীতে এই স্তম্ভ দেখিয়া লিখিয়াছিলেন, "অশোক স্তূপের সম্মুখবর্ত্তী মর্ম্মর স্তম্ভ প্রায় ৭০ফুট উচ্চ এবং জেড্ নামক বহুমূল্য প্রস্তরের আভাযুক্ত ও ঝকঝকে। ইহার গাত্র হইতে এক প্রকার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয়। যাহারা এই স্তম্ভের সম্মুখে অন্তরের সহিত প্রার্থনা করে তাহারা সময়ে সময়ে প্রার্থনানুযায়ী সমূর্ত্তি শুভাশুভ চিহ্নসকল দর্শন করিয়া থাকে। এই স্থানেই

বুদ্ধ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মচক্র প্রথম ঘূর্ণিত করেন।" এই স্তম্ভের সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি ও ছত্রদণ্ড পাওয়া গিয়াছে। উভয়ের গাত্রে খোদিত লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে প্রতাপশালী রাজা কনিষ্কের সিংহাসনাধিরোহণ করিবার দুই বৎসর পরে এগুলি সংস্থাপিত হয়। রাজা কনিষ্ক খৃষ্টজন্মের একশত বৎসর পরে ভারতরাজ্য শাসন করেন। ইহাও স্থির হইয়াছে যে যাঁহাদিগের দ্বারা ঐ বৌদ্ধমূর্ত্তি ও ছত্রের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন হয় তাঁহারা দুইজন বৈদেশিক রাজন্য বা মণ্ডলাধিপ—নাম খরিপল্লন ও বানস্পর। মূর্ত্তি ও ছত্রদণ্ডের সম্মুখস্থ ভূমি খনন করায় একটী বেশ জমকাল পাথরের ছত্র বাহির হইয়াছে। ছত্রের অভ্যন্তর ভাগ বিবিধ কারুকার্য্যখচিত সমকেন্দ্রিক মণ্ডলরেখান্বিত ও ধর্ম্মের সাঙ্কেতিক চিহ্নাঙ্কিত। ইহা সম্পূর্ণ অটুট না থাকিলেও ইহাই বৌদ্ধপুরাদ্রব্য ও বৌদ্ধশিল্পের বৃহত্তম নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অন্যান্য মূর্ত্তির মধ্যে ছোট বড় কতকগুলি সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি উঠিয়াছে। তন্মধ্যে এই সারনাথে পাঁচজন ভিক্ষুকে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মোপদেশ দানকালে বুদ্ধদেব যেরূপ পদ্মাসনে বসিয়াছিলেন সেইরূপ একটী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। অনেকানেক মূর্ত্তিগাত্রে প্রাচীন ও মধ্যযুগের গুপ্ত অক্ষরে উৎসর্গলিপি খোদিত দেখা যায়। এক্ষণে যতই অনুসন্ধান চলিতেছে, ততই কিছু-না-কিছু পাওয়া যাইতেছে। বোধ হয় সমস্ত উৎখাত হইলে বৌদ্ধ-ইতিহাসের মালমসলার সঙ্গে সঙ্গে অতীত যুগের নব নব কাহিনী বাহির হইয়া পড়িবে। ভারতের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের নিকট ইহা যেমন আনন্দের সংবাদ আনিয়াছে, সেইরূপ স্পষ্টাক্ষরে যেন বলিয়া দিতেছে যে সাহেবসুবাদের মরক্কো চামড়ায় বাঁধা সোণার জল করা অনেক তথাকথিত ভারতেতিহাসগুলিকে অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও চাপা দিয়া ভারতের মাটিমাখা খাঁটী ইতিহাস খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের স্বদেশবাসীগণ এই কার্য্যে যথোচিত উৎসাহ সহকারে প্রবৃত্ত হইতেছেন না। আমরা আমাদের দেশের প্রাচীন গৌরবের বড়াই করিব, কিন্তু আবিষ্ক্রিয়ার কার্য্য ইয়ুরোপীয়েরা করিবে; ইহা সাতিশয় লজ্জার বিষয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

"ভারত-ধর্ম্ম কি" সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

গত চৈত্রমাসের প্রবাসীতে "ভারত-ধর্ম্ম কি" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া, অনেকের মনে নানা চিন্তার উদয় হইয়াছে। প্রথমে লেখককে তাঁর পবিত্র ব্রতের জন্য এবং এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া, আমার কথা কয়টি নিবেদন করিতেছি।

সমর্থ রামদাস স্বামী একজন প্রকৃত মহাত্মা ছিলেন। মহারাষ্ট্র জাতির যে শক্তি একদিন মোগল রাজশক্তিকে কম্পিত করিয়াছিল, সেই শক্তির মূলে রামদাস স্বামী মালিরূপে জলসেচকরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। সকল প্রকার অভ্যুত্থানের মূলেই, এই প্রকার দু'একজন লোককে বিদ্যমান দেখা যায়। তাঁরা জীবনের সমস্ত শক্তি ও প্রেম ঢালিয়া দিয়া বন্ধ্যাভূমির সুপ্ত বীজকণাকে জীবন্ত করিয়া তোলেন, অনুর্ব্বর ভূমিকে উর্ব্বর করেন, একটা মৃতপ্রায় জাতিকে সতেজ জাগ্রত করিয়া তোলেন। এইরূপ লোকের জীবনপাতের দ্বারা যখন জাতীয় জীবনের অন্ধকাররাশি ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া নবজীবনসূর্য্যের রশ্মি প্রতিভাত হয়, তখন ক্রমশঃ অনেকেই জাতীয় জীবনের অভ্যুত্থানের জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ যখন কেবল অন্ধকার দেখে, তখন এইরূপ ঋষিপ্রকৃতি অসাধারণ লোকই, সেই অন্ধকারের মধ্যে, কিছু সত্য ও সার বস্তু দেখিতে পান, যাহা আশ্রয় করিয়া তাঁহারা জীবনযজ্ঞের আয়োজন করেন। এই আয়োজন বৃথা যায় না। ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে।

রামদাস স্বামীর ন্যায় উপদেষ্টার কাছে যাওয়ার আমাদের প্রয়োজন হইয়াছে। তাই লেখক রামদাস স্বামীর উপদেশটিকে প্রসারিত এবং বর্ত্তমান যুগের উপযুক্ত করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বামীজীর মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের লক্ষ্য ছিল, মহারাষ্ট্রদেশবাসীদিগকে একজাতিতে পরিণত করা। ভারতধর্ম্মের উদ্দেশ্য সমস্ত ভারতবাসীকে এক মহাজাতিতে (nation-এ) পরিণত করা। "এখন ভারতে নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্ম্ম।" এই সকল পার্থক্য ও বাধা অতিক্রম করিয়া জাতীয় ভ্রাতৃত্ব (national brotherhood) সূত্রে সমগ্র ভারতবাসীকে গ্রথিত করা—"ভাই ভাই" করা ভারত-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

ভারত-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া, লেখক বলিতেছেন—"ভারতে একতা নাই বলিয়াই ভারতবাসীর ভিতর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা নাই, সৌহার্দ্দ নাই।" এই উক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই—একতা নাই বলিয়া ভালবাসা নাই, না, ভালবাসা নাই বলিয়াই একতা নাই? একতা থাকিলে ভালবাসা জন্মায়, এবং ভালবাসা থাকিলে একতা সম্ভব হয়—এতদুভয়ই কিয়ৎপরিমাণে সত্য। কিন্তু তলাইয়া দেখিলে, একতার মূলে প্রেম। আগে প্রেম, তারপর একতা। ভারতভূমির পানে তাকাইয়া ভারতবাসীর পানে তাকাইয়া যাহার হৃদয়ের প্রেম যতটা উদ্বেলিত হইবে, সেই ততটা একতাসাধনে ব্রতী হইতে পারিবে, এবং জাতি-ধর্ম্ম-ভাষার ব্যবধান অতিক্রম করিতে পারিবে। প্রেমের ধর্ম্ম এক করা। একতার মূলে যদি প্রেম ব্যতীত অপর কিছু থাকে, তবে সেই একতা যে কোন্ সামান্য ঝড়ে উৎপাটিতমূল হইয়া ধরাশায়ী হইবে, তাহার কোনও স্থিরতা নাই। অতএব ভারত-ধর্ম্ম যদি ভারতে একতা আনয়ন করিতে চান তবে প্রেমের পথ অবলম্বন করুন। গভীর জ্ঞানচর্চ্চা চাই, জ্বলন্ত কর্ম্মোদ্যম চাই, কিন্তু মূলে থাকা চাই প্রেম। অনুগ্রহ নয়, যশোলিপ্সা নয়, বিদ্বেষ নয়, কোনও প্রকার প্রকাণ্ড স্বার্থপরতা নয়—

বিশুদ্ধ প্রেম। হৃদয়ে জাগুক এই প্রেম, সব বিচ্ছিন্নতা একতায় পরিণত হইতে দেরী হইবে না।

ইটালী ও জর্ম্মানীর উল্লেখ করিয়া, লেখক দেখাইয়াছেন, বিচ্ছিন্নদেশ কেমন করিয়া এক হয়। তাহার মধ্যেও দেখা যায় যে কবিগণ নানা প্রকারে মানবহৃদয়ে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রেম জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং যখনই সেই প্রেম জাগিয়াছে, তখনই একতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও জাতীয় শক্তির অভ্যুত্থান হইয়াছে। স্বদেশের অতীত গৌরব, বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ও ভবিষ্যৎ আশা—এই তিনটি বিষয় অবলম্বন করিয়া, কবিগণ, বাগ্মিগণ ও ঋষিগণ জাতীয় জীবনের চূড়ান্ত দুর্দ্দশার সময় ম্রিয়মাণ মানবের হৃদয় ও মনের সুপ্ত তিরস্কৃত ও অবনত অথচ স্বাভাবিক এবং সুমহৎ ভাব ও আকাঙ্ক্ষাগুলিকে জাগ্রত ও উন্নতশিরস্ক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক যে কয়টি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি এই উদ্দেশ্যেই রচিত। এইরূপে, ভারতধর্ম্ম ব্যাপারটা কি এবং কি প্রকারে তাহার বিস্তার হইতে পারে তাহা ইটালী ও জর্ম্মানীর দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া, লেখক প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে, ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

অন্যান্য অনেক দেশ বিচ্ছিন্ন ছিল,—নানা ভাষা ছিল, নানা ভাগে বিভক্ত ছিল, অপর জাতির অধীন ছিল, তবুও এক হইতে পারিয়াছে, জাগ্রত ও স্বাধীন হইতে পারিয়াছে; অতএব আমরাও পারিব, এ আশা যে পোষণ করিতে পারে না সে তো নাস্তিক। কিন্তু, আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে যে বাধা বিদ্যমান, জগতের অন্য কোনও দেশে সেরূপ বাধা কোনও দিন ছিল না। তাই আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার প্রণালী কিঞ্চিৎ অন্য প্রকারের হওয়া আবশ্যক।

লেখক ভারত-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পালনীয় পাঁচটি প্রতিজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহার প্রথমটি ব্যতীত, অপর চারিটি সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিবার আছে। একে একে প্রতিজ্ঞাকয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

২য় প্রতিজ্ঞা। "ভারতবর্ষ আমার দেশ, এই দেশে যাহা নির্ম্মিত হয় তাহাই আমার ব্যবহার্য্য"। "তাহাই"টা হইতেছে চিন্তার বিষয়। ঘড়ী, পেন্সিল, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, বস্ত্রাদি বয়নের কল, পুস্তকাদি ছাপিবার সরঞ্জাম প্রভৃতি এদেশে এখনও নির্ম্মিত হয় নাই। এপ্রকার বস্তু অন্যদেশে নির্ম্মিত হইলেও ভারত-ধর্ম্মীর ব্যবহার্য্য কি না। শিক্ষার্থীগণ বিদেশী পুস্তক এবং বিদেশী বস্তুর সাহায্যে যাহা এদেশে নাই এমন বস্তু প্রস্তুত এবং নূতন জ্ঞান আহরণ করিবে কি না? কোনও বিদেশী বন্ধু তাহার দেশের কোনও বস্তু উপহার দিলে, তাহা গ্রহণীয় কি না? এইরূপ প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত মীমাংসায় উপস্থিত না হইয়া, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা যায় না। এবিষয়ে লেখকের মনের ভাব কি, তাহা জানিবার জন্য প্রশ্নগুলি উপস্থিত করিলাম।

৩য় প্রতিজ্ঞা। "আমি ভারতী ভাষা ব্যবহার করিব।" ভারতীভাষা মানে কি? ইংরাজী ভাষা কি পরিত্যাগ করিতে বলেন? একজন কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোক যদি বাঁকিপুরে আসিয়া জনসাধারণের মধ্যে কিছু কাজ করিতে চান, তবে ইংরাজী ছাড়া তার গতি নাই। প্রশ্ন হইতে পারে:—কেন, তিনি যদি হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষা জানেন? যদি জানেন তবে তো কথাই নাই। কিন্তু তবুও একথা বলা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের লোকের মধ্যে কাজ করিতে হইলে, ইংরাজী ব্যতীত কোনও একটা ভাষার দ্বারা তাহা হয় না। সুরেন্দ্রবাবুকে যদি পুনায় গিয়া মারাঠি ভাষায় বক্তৃতা দিতে হয়, এবং অধ্যাপক গোখ্‌লেকে যদি কলিকাতায় গিয়া বাঙ্গলায় বক্তৃতা দিতে হয়—তবে ব্যাপারটা কেমন হয়? ভাষা বিষয়ে যখন প্রতিজ্ঞা করার কথা তুলিয়াছেন, তখন "ভারতী ভাষা" ব্যাপারটা যে কি তাহা লেখকের পরিষ্কার করিয়া ভাঙ্গিয়া বলা উচিত।

৪র্থ প্রতিজ্ঞা। "আমি নিজেকে ভারতী জাতি বলিয়া পরিচয় দিব। আমি নিজেকে কখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র বলিয়া সেন্সস্ রিপোর্টে লিখাইব না।" একি একটা মতের (opinion) প্রতিজ্ঞা, না, বিশ্বাসের প্রতিজ্ঞা? ব্রাহ্মণ, শূদ্র ভেদ তো স্বীকার করিব না; হিন্দু মুসলমান ভেদ স্বীকার করিব কি না? এই যে একতা ও সাম্য স্বীকার—ইহা কি মুখের কথায় এবং সেন্সাসের খাতায়ই থাকিবে, না, জীবনেও কাজ করিবে? ভারতবর্ষে একতা সংঘটনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বাধা জাতিভেদ—হিন্দু জাতিভেদ, জন্মগত জাতিভেদ, অপরিবর্ত্তনীয় অনুল্লঙ্ঘনীয় জাতিভেদ। ধর্ম্মবিশ্বাস ও দার্শনিক মত এবং বিভিন্ন সাধনপ্রণালীসম্ভূত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়—এ সবের বিভিন্নতা এবং বহুলতা সব দেশেই আছে। কিন্তু ভারতের মত জাতিভেদ কোথাও নাই। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশবাসী মুসলমানগণ কি প্রকারে একতাপাশে বদ্ধ, লেখক তাহা দেখাইয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মগণও, সমবিশ্বাসী বলিয়া ততটা নয়, যতটা জাতি ভেদ নাই বলিয়া একত্র হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ এবং পঞ্জাবের ব্রাহ্মণ হিন্দু মুসলমানের মত দূরে দূরে অথচ এক জাতি, এক ধর্ম্ম। অপর পক্ষে একজাতীয় শাক্ত ও বৈষ্ণবের ধর্ম্মবিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও কোনও দূরত্ব নাই, বিবাহাদিও হইয়া থাকে—যদি তাহারা একপ্রদেশবাসী হয়। হিন্দু মুসলমানের মিলনের কথা ছাড়িয়া দিয়া—যদি হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, এবং তাহার মূলে জাতিভেদ কর্ত্তারূপে বর্ত্তমান দেখা যায়, তাহা হইলেই বুঝা যায় ভারতী জাতি (Indian nation) গঠনের পথে—একতার পথে জাতিভেদ কি ভয়ানক শত্রু। "ভারত-ধর্ম্মী" কি জাতিভেদ ভাঙ্গিবেন? ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মণ শূদ্র এবং মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম প্রভৃতি নানা প্রকারের দশজন যুবক যদি ভারত-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া একত্র দেশের কাজে ব্রতী হ'ন, তবে তাহারা কি আহারাদি বিষয়ে জাতিভেদ মানিয়া চলিবেন, একে অপরের স্পর্শ কুকুর বেড়ালের স্পর্শ অপেক্ষাও অপবিত্র বোধ করিবেন, এবং মুখে বলিবেন 'আমরা ভাই ভাই'?—না, জাতিভেদ মানিবেন না? এ বিষয়ে লেখকের অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করি।

৫ম প্রতিজ্ঞা। "আমি ভারত-ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিব না।" মানবজীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা ও তৎসাধন বিষয়ে দৃষ্টিশূন্য হইয়া এই প্রতিজ্ঞাটি লেখা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তিনি কি মনে করেন যে মতের উদারতা এবং মানবীয় কর্ম্মশক্তিই ভারতের কল্যাণসাধনের পক্ষে যথেষ্ট? তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় থাকিবে এবং থাকাই প্রয়োজনীয়; কিন্তু প্রতিজ্ঞায় বলিতেছেন তাহা স্বীকার করা হইবে না। ইহার মানে কি? ধর্ম্মের শক্তি, আধ্যাত্মিকতার শক্তি, ভগবৎপ্রেমপ্রসূত শক্তি যদি মানুষ চায়, তাহা হইলে, তাহাকে তাহার জ্ঞান বুদ্ধি ধারণা অনুসারে কোনও না কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায় বা সাধকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত থাকিতেই হইবে। একা একা, বাহিরে বাহিরে, আর যাই হোক্, ধর্ম্মসাধন হয় না।

ধর্ম্মমত, ধর্ম্মবিশ্বাস, ধর্ম্মসাধন, ও সম্প্রদায় প্রভৃতির বিভিন্নতা স্বাভাবিক। মানুষের পক্ষে বৈষ্ণব, শাক্ত, মুসলমান, ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান প্রভৃতি হওয়া স্বাভাবিক—ধর্ম্মধারণার দিক দিয়া। তেমনি কর্ম্মগত শ্রেণীবিভাগ হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু ধর্ম্ম অথবা সমাজ যে কোনও দিক দিয়া কোনও শ্রেণীবিভাগ যদি অপরিবর্ত্তনীয় অনুল্লঙ্ঘনীয় একটা কিছু হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলেই অস্বাভাবিক এবং অমঙ্গলকর হইয়া উঠে। বৈষ্ণবের ছেলে বড় হইয়া খ্রীষ্টান হইতে পারে এবং প্রচারকের ছেলে বিচারক হইতে পারে। নীতি এবং চরিত্রে যদি আঘাত না লাগে, তবে এই পরিবর্ত্তনের পথ বন্ধ করিবার কি প্রয়োজন? এই পরিবর্ত্তন এবং বিভিন্নতা স্বাভাবিক এবং মানুষের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়। যাহা স্বাভা-

রিক এবং প্রয়োজনীয় তাহা স্বীকার করিতে দোষ কি ? ধর্ম্মবিষয়ে অসীম উদারতা, এবং সামাজিক বিষয়ে যথা সম্ভব ঘনিষ্ঠতা—আর, ঈশ্বর পিতা ও মানব মাত্রেই "ভাই ভাই"—এ একই কথা। এই সত্য জীবনে প্রকাশিত করিতে প্রয়াসী না হইলে কিছুতেই কিছু হইবে না। এবিষয়ে লেখকের অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করি।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই, দেশের সেবকগণ যদি "ভারত-ধর্ম্ম" বিষয়ে আলোচনা করেন, তবে ভাল হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

উত্তর

লেখক মহাশয়ের সহিত আমার কোন গুরুতর বিষয়ে মতভেদ নাই। এই দেশে যাহা জন্মে, তাহাই আমার ব্যবহার্য্য, ইহা আমি এই অর্থে বলিয়াছি, যে, যে সকল জিনিস ভারতবর্ষে এবং অন্যদেশে উভয়ত্রই উৎপন্ন বা প্রস্তুত হয়, তৎসমুদয়ের মধ্যে ভারতবর্ষীয় জিনিসই আমার ব্যবহার্য্য। ভারতে যাহা জন্মে না বা প্রস্তুত হয় না, এরূপ বিদেশী জিনিস ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভারতী ভাষা ব্যবহারও যথাসম্ভব করিতে হইবে। যেখানে উপায় নাই, সেখানে বিদেশী ভাষার সাহায্য লইতে হইবে। বিদেশী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা আমরা অবশ্য করিব। জাতিভেদ প্রথাকে আমি অনিষ্টকর ও বর্জ্জনীয় মনে করি। ইহার বিনাশসাধন করিতে পারিলে সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের খুব মঙ্গল হয় বলিয়া মনে করি। ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার মত এই যে বর্ত্তমান কালে লোকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত আছে এবং তদ্রূপ পরিচয়ও দেয়; কিন্তু তাহা না করিলে যে আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতা জন্মে না, তাহা বলা যায় না। উপনিষদের ঋষিরা আপনাদিগকে কোন বিশেষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন কি না, জানি না। বাস্তবিক প্রত্যেক মানুষের ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্। ভারত-ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিব না, বলিয়া যে প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে আমার আদর্শ জাপানীদের মত ছিল। তাহারা বলে, We are Japanese *first*, and then Budhists, or Shintoists, or Christians, &c. আমি ও বলি, আমরা প্রথমে ভারতী; তারপর হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, ইত্যাদি। আধ্যাত্মিকতার লাঘব করা বা উহার প্রয়োজন অস্বীকার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার সমুদয় প্রতিজ্ঞা আজ বা কাল কার্য্যে পরিণত করা সুসাধ্য না হইতে পারে; কিন্তু আমি একটা ভবিষ্যৎ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া লিখিয়াছি। এই আদর্শ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করি।

কোনও ভারত-ধর্ম্মী।

পূজা।

(১)

দিগ্‌ভ্রান্ত,

আজ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ। সম্মুখে কণ্টকাকীর্ণ, অনন্তপ্রসারিত, ঊর্দ্ধগামী, তমসাবৃত, প্রচ্ছন্ন মুক্তি-মার্গ; পশ্চাতে নর্ত্তনশীল, ফেনিল জলধির অস্ত-গমনোন্মুখসূর্য্যরাগদীপ্ত, লোহিত, উদ্দাম ঊর্ম্মিমালা! পদ-দলিত, লাঞ্ছিত পথিক, কোন্ দিকে যাইবে? ঐ দেখ রঞ্জিত সাগরের বিচিত্র মোহময় তরঙ্গ-সংঘাত;—ঐখানে যাইতে চাহ? না, ঐ অসীম বিস্তৃত পন্থাবলম্বন করিয়া, রুধিরাপ্লুত বিক্ষত চরণে, তমিস্রের মধ্য দিয়া,—বহু ঊর্দ্ধে সেই ধবলালোক-বিধৌত স্বপ্নলোকে প্রয়াণ করিতে বাসনা কর? তোমার এখন বিচারের সময় উপস্থিত। পথিক, সময় বড় সঙ্কীর্ণ। বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত কর। অবিলম্বেই যে তোমাকে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিতে হইবে! ঐ দেখ অট্টহাস্যে বারিরাশি তোমার দিকে ধাইয়া আসিতেছে। পথিক, কাল-বিলম্বে তোমার অস্তিত্ব কোথায় রহিবে? অতীতের কথা একেবারে ভুলিও না। একবার মনে ভাব—সেই কানন-কুটীরোত্থিত বিশ্ব-জাগরণ-মন্ত্র। সেই দিন—আর এই দিন! এমন কেন হইল? কেন হইল! হতভাগ্য, বিস্মৃত হইতেছ কেন? স্বহস্তে সহোদরকে গৃহ-তাড়িত করিয়া অজ্ঞাত কুলের চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলে! পরের উপর অনন্ত নির্ভরের ফলে আজ নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহও সমূলে বিনষ্ট করিয়াছ। দুগ্ধ-কদলী দিয়া যে সর্প-শিশুকে সযত্নে পরিপুষ্ট করিয়াছ আজ সে তাহার দৃপ্ত ফণা বিস্তার করিয়া তোমার মোহ ঘুচাইতে উদ্যত হইয়াছে। এ যে বিধাতারই অবশ্যম্ভাবী, অপূর্ব্ব কল্যাণ-বিধান! ভ্রান্ত, কৃত কর্ম্মের ফলভোগ না করিয়া এখন কোথায় যাইবে?

* * * * *

ঐ দেখ মুগ্ধ, লবণাম্বুরাশি তোমার চরণ চুম্বন করিতেছে। এখনো নিদ্রালস চিত্ত সুস্থ হইল না?—হায় জাগিলে না!

* * * * *

অন্ধকার! চারিদিকে সূচীভেদ্য, নেত্রপীড়াকর তীব্র তিমির! সংক্ষুব্ধ অম্বুনিধি-বক্ষে সংখ্যাতীত দীপ্যমান তারকা-দ্যুতি। তারালোক মধ্যে, এই অতলস্পর্শ, ঘনঘোর কৃষ্ণবর্ণ পাথারগর্ভ হইতে অবিশ্রাম গভীর-গম্ভীর তরঙ্গ-গর্জ্জন শ্রুত হইতেছে। পীড়িত, বিহ্বল পান্থ, এখনো নীরবে কি ভাবিতেছ?

(২)

সহসা চকিতে আকাশতল বিভক্ত হইল। সেই বিদীর্ণ গগনে একি!—এ কাহার চরণরশ্মি নিখিল ভুবন জ্যোতির্ম্ময়

করিয়া ফেলিল ? পথিক, স্থির নয়নে, সংযত মনে বারেক চাহিয়া দেখ। কি দেখিতেছ ? ঐ মহোজ্জল প্রভার কেন্দ্র-স্থলে, মহীয়সী মূর্ত্তিতে, ভূমানন্দে কে ঐ বরাভয়দাত্রী-স্বতঃ-প্রকাশিত রহিয়াছেন ? কি ?—চিনিলে ?

* * * * *

দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া আদেশ-বাণী প্রচারিত হইল—"অগ্রসর হও!" পথিক সে আহ্বানে পদতলে কণ্টকস্তূপ বিদলিত করিয়া, সেই অম্বর-বিলম্বী মার্গ দিয়া বিহ্বল-বিবশচিত্তে অগ্রসর হইল। অগ্রসর হইয়া কি দেখিল ? দেখিল,—কুলকুণ্ডলিনী শক্তি স্ফূরিত, ফুল্ল পদ্মকোরকে উপবিষ্টা। পদতলে রক্তগঙ্গা প্রবাহিতা; দক্ষিণ কর-স্থিত দানব-নিধনচক্র হইতে "সর-সর" শব্দে আগ্নেয়াস্ত্র বর্ষিত হইতেছে; বামহস্ত-সিঞ্চিত শান্তিবারি নিখিলবিশ্ব পূত, স্নিগ্ধ করিয়া তুলিতেছে। পথিক আর থাকিতে পারিল না। স্বহস্তে বক্ষ হইতে হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করিয়া পদ্মাসনাসীনা মনোময়ী মহাদেবীর পাদাম্বুজে নিক্ষেপ করিল। অম্লান, দিব্য স্বর্ণ জ্যোতিতে তাহার সেই বিসর্জ্জিত হৃৎপিণ্ডটি চিরতরে অম্বরপটে সংলগ্ন রহিল। তাহাতে লিখিত রহিল—

"বন্দে মাতরম্" !

পথিক মরিল। কিন্তু শুনিলাম,—তাহার কণ্ঠোচ্চারিত শেষ বাণী তখনো গগনতল মথিত করিয়া কম্পিত হইতেছে—"মা! মা! মা!"

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

ঘ্রাণতত্ত্ব।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কি প্রকারে গন্ধ অনুভব করি, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। গন্ধপ্রদ পদার্থ কি প্রকার অবস্থায় নাসিকায় পৌঁছিলে গন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

অভিধানকারকে ঘ্রাণের সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন,—কোন বস্তু হইতে নির্গত হইয়া যাহা আমাদের ঘ্রাণোত্তেজক স্নায়ুকে (Olfactory nerve) আঘাত দেয়, তাহাই ঘ্রাণ। বলা বাহুল্য, এটা ঘ্রাণের নির্দোষ সংজ্ঞা হইল না। গন্ধপ্রদ পদার্থ হইতে যে সকল অংশ নির্গত হইয়া নাসা-বিবরে প্রবেশ করে, তাহার অবস্থাটা যে কি, সংজ্ঞা হইতে তাহা জানা যায় না। নাকের নিকট চন্দন রাখ, তাহার মৃদুগন্ধ অনুভব করিতে থাকিবে। এখানে চন্দন বায়বীয় বা তরল অবস্থায় নাসিকায় প্রবেশ করে, কি কঠিনাবস্থায় থাকিয়াই ধূলিকণার ন্যায় নাসারন্ধ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, অভিধানে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

পদার্থের নানা অবস্থার নানা গুণের আলোচনা করা জড়বিজ্ঞানের কার্য্য। এই জন্য ঘ্রাণতত্ত্বের আলোচনা কালে, ঘ্রাণ জিনিসটাকে বৈজ্ঞানিকেরা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চাপা দিয়া রাখিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে ইঁহাদিগকে একটা স্পষ্টা-পষ্টি জবাব দিতে হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—গন্ধোৎ-পাদক পদার্থের অতি ক্ষুদ্র কণা কঠিনাকারে থাকিয়া আমা-দের নাসিকায় প্রবেশ করে, এবং নাসিকাস্থ ইন্দ্রিয়বিশেষ তাহাদেরই সংস্পর্শে আসিয়া গন্ধজ্ঞান উৎপন্ন করে। উদাহরণ স্বরূপ ইঁহারা বলিয়া থাকেন,—বৃহৎ ঘরের কোন স্থানে রতিপ্রমাণ মৃগনাভি লুকায়িত রাখ, ইহারি গন্ধে ঘরটি বহু বৎসর পরিপূর্ণ থাকিবে। অথচ এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মৃগনাভিটুকু স্বদেহের অণুগুলিকে গন্ধাকারে ছাড়িয়া, ওজনে অধিক কমিবে না। গন্ধপ্রদ জিনিসের কণাগুলি এত সূক্ষ্মাকারে বিভক্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে!

অধিকাংশ পদার্থে প্রচুর উত্তাপ দিলে, তাহারা খুব সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। এই প্রকারে বিভক্ত জিনিসকে আমরা বাষ্প বলি। ইহা পদার্থের একটা বিশেষ রূপ। তরল বা কঠিনাকার ত্যাগ করিয়া পদার্থ ঐ রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু নিজের রূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মৃগনাভি ইত্যাদি গন্ধপ্রদ দ্রব্য যে পূর্ব্বোক্তপ্রকার অতি সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইতে পারে, তাহা জানা ছিল না। বৈজ্ঞানিকগণ অণু পরমাণু প্রভৃতি আরো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিস লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা যখন ঘ্রাণোৎপত্তির মূলে ঘ্রাণপ্রদ জিনিসের অতিক্ষুদ্র কঠিন কণার কার্য্য দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়া প্রচার করিলেন, তখন এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ করিবার কারণ রহিল না। বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক সকলেই স্বীকার করিলেন, দ্রব্যের অতি সূক্ষ্ম অংশ কঠিনাকারে থাকিয়া নাসিকায় প্রবেশ করিলে, গন্ধ-জ্ঞান জন্মায়।

এই সিদ্ধান্তের পোষক নানা উদাহরণ সংগ্রহ হইতে লাগিল। স্থির হইল, শিকারের দেহনিঃসৃত মলাদি অতি সূক্ষ্ম কণার আকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। শিকারী কুকুর নাসিকা সাহায্যে সেই কণাপ্রবাহের দিক্ নির্ণয় করিয়া, শিকারকে আক্রমণ করে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, একজাতীয় প্রজাপতিকে ধরিয়া কোন দূরস্থানে লুকায়িত রাখিলে, সহচর প্রজাপতিগুলি অতি অল্পকাল মধ্যে ধৃত সঙ্গীকে খুঁজিয়া বাহির করে। ইহার ব্যাখ্যানে সকলে বলিতে লাগিলেন,—প্রজাপতির দেহনিঃসৃত কোন দ্রব্যের ক্ষুদ্রকণা ছড়াইয়া পড়িয়া পরস্পরের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উপর কার্য্য করে। এইজন্য কোন্ পথ ধরিয়া কণাপ্রবাহ চলিতেছে তাহা ঠিক্ করিয়া, ধৃত সঙ্গীর সন্ধান করা উহাদের পক্ষে কঠিন হয় না।

ঘ্রাণতত্ত্বের ঐ পুরাতন সিদ্ধান্তটিকে বিজ্ঞানের নূতন আলোকে পরীক্ষা করিয়া লওয়ার কথা, এ পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিকেরই মনে স্থান পায় নাই। ডাক্তার এট্‌কিন্ (Dr. John Aitkin) এখনকার একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক। ইনি ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রয়াল সোসাইটির জনৈক পুরাতন সভ্য। তা'ছাড়া কয়েকটি সুসজ্জিত পরীক্ষাগারের পরিচালন ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত আছে। ঘ্রাণতত্ত্ব লইয়া অধ্যাপক মহাশয় সম্প্রতি অনেক গবেষণা করিয়াছেন। এই গবেষণার ফলে যাহা জানা যাইতেছে, তাহাতে সকলে বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, কোন দ্রব্য যখন বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করে, আমরা তখনি তাহার গন্ধ অনুভব করি। পদার্থের অতি সূক্ষ্ম অংশ কঠিনাকারে থাকিয়া নাসিকায় পৌঁছিলে গন্ধজ্ঞান হয় না, বাষ্পাকারে পরিণত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

ডাক্তার এট্‌কিনের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটি কেবলমাত্র অনুমানমূলক নয়। প্রত্যক্ষ ও সহজ পরীক্ষা দ্বারা ইনি নিজের প্রত্যেক কথার সমর্থন করিয়াছেন।

পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন, কোন বায়বীয় জিনিসকে জমাট বাঁধাইতে ধূলিকণাদির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন জড়কণা অনেক সাহায্য করে। দুইটি একই আকারের পরিষ্কার কাচপাত্রে কেবল মাত্র জলীয় বাষ্প আবদ্ধ রাখিলে, জল যতক্ষণ তাহাদের মধ্যে বাষ্পাকারে থাকে, ততক্ষণ তাহাকে জল বলিয়া চেনা যায় না। কিন্তু একটি পাত্রে কিছু ধূলিকণা ফেলিয়া, পরে উভয় পাত্রস্থ বাষ্পকে জমাইবার চেষ্টা করিলে, ধূলিযুক্ত পাত্রটির বাষ্পকে সর্ব্বাগ্রে জমাট বাঁধিতে দেখা যায়। পূর্ব্বের স্বচ্ছ বাষ্পপূর্ণ পাত্রে, কুয়াশার ন্যায় অস্বচ্ছ জলকণার সঞ্চার হইতে থাকিবে। বড় বড় সহরে প্রাতে ও সন্ধ্যায় যে এক প্রকার কুয়াশা দেখা যায়, তাহা বাতাসে উড্ডীয়মান সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণা ও ধোঁয়ার কণারই কাজ বলিয়া স্থির হইয়াছে। সহরের বায়ুতে ধূলিকণা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মিশানো থাকে। কাজেই ঐ সকল স্থানের জলীয় বাষ্প ঐ কণাগুলির চারিপাশে জমাট বাঁধিয়া কুয়াশার উৎপত্তি করে।

বায়বীয় পদার্থ মধ্যস্থিত কঠিন জড়কণার এই কার্য্যটির সাহায্যে এট্‌কিন্ সাহেব তাঁহার নূতন সিদ্ধান্তটির সার্থকতা দেখাইয়াছেন। ইনি দুইটি পরিচ্ছন্ন কাচপাত্র লইয়া, উভয়েই প্রথমে ধূলি বা অপর কোনও জড়কণা বর্জ্জিত জলীয় বাষ্প রাখিয়াছিলেন, এবং পরে একটি পাত্রে কিছু মৃগনাভি ফেলিয়া দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, গন্ধটা যদি সত্যই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার আকারে মৃগনাভি হইতে বাহির হইত, তবে ঐ সকল কণাকে অবলম্বন করিয়া পাত্রটির জলীয় বাষ্প নিশ্চয়ই জমাট হইয়া পড়িত। কিন্তু পরীক্ষায় তাহা দেখা যায় নাই। মৃগনাভির গন্ধপূর্ণ পাত্রটি, অপর পাত্রের ন্যায় স্বচ্ছই রহিয়া গিয়াছিল। কাজেই মৃগনাভির অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ কঠিনাকারে থাকিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে গন্ধের উৎপত্তি হয় বলিয়া যে বিশ্বাস ছিল, তাহার অমূলকতা এই সহজ পরীক্ষায় বেশ বুঝা যায়।

কাচের নলের মধ্যে পরিষ্কার তুলা রাখিয়া, সাধারণ অপরিষ্কৃত বায়ুকে সেই নলের ভিতর দিয়া চালাইতে থাকিলে, বায়ু পরিষ্কৃত হইয়া নল হইতে বাহির হয়। কারণ এখানে বায়ুমিশ্রিত ধূলিকণাদি তুলায় বাধা পাইয়া আটকাইয়া যায়। এই প্রক্রিয়াটি বায়ুশোধন করিবার একটি সুন্দর উপায়। এটকিন্ সাহেব মৃগনাভি ইত্যাদি দ্বারা গন্ধযুক্ত বায়ুকে কাচনলের ভিতর দিয়া চালাইয়া শোধন করিয়া লইয়াছিলেন। পদার্থের সূক্ষ্ম কণাদ্বারা গন্ধের উৎপত্তি হইলে, শোধিত বায়ুতে গন্ধের লেশমাত্র থাকিত না। কিন্তু

প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাহা দেখা যায় নাই। সুতরাং গন্ধটা যে পদার্থের সূক্ষ্ম কণাদ্বারা উৎপন্ন নয়, এই পরীক্ষাটির দ্বারাও তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

ডাক্তার এট্‌কিন্ কর্পূর, স্থাপ্‌থালিন্ ও আতর ইত্যাদি নানা ভালমন্দ গন্ধদ্রব্যের উপর পূর্ব্ববর্ণিত পরীক্ষা করিয়া, উভয় পরীক্ষাতে একই ফল পাইয়াছেন। কাজেই ঘ্রাণ-তত্ত্বের মূল ব্যাপারে যে পুরাতন বিশ্বাস ছিল, তাহা আজকাল ক্রমেই শিথিল হইয়া দাঁড়াইতেছে। গন্ধপ্রদ দ্রব্য হইতে গন্ধটা তরল বা কঠিন আকারে আসিয়া নাসিকায় প্রবিষ্ট হইলে, পরীক্ষায় তাহা ধরা পড়িত। সুতরাং দ্রব্যের বাষ্পীয় অবস্থাতেই যে গন্ধ উৎপন্ন হয়, একথা অস্বীকার করিবার আর উপায় নাই।

নানা আবর্জ্জনাপূর্ণ ড্রেন্ বড় বড় সহর মাত্রেরই নানা অংশে বিস্তৃত থাকে। এই সকল পয়ঃপ্রণালী দ্বারা কি প্রকারে সহরের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েক-জন ইংরাজ স্বাস্থ্য-রক্ষক আলোচনা করিয়াছিলেন। স্থির হইয়াছিল, পয়ঃপ্রণালী হইতে উদ্গত দুষ্ট বাষ্প স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর এবং বিশেষ ক্ষতিকর ড্রেনের গন্ধ। গলিত আবর্জ্জনার কণাসকল গন্ধের আকারে আমাদের দেহে প্রবেশলাভ করে, এবং নানা ব্যাধির জীবাণু সঙ্গে সঙ্গে বহিয়া আনিয়া অধিবাসিগণকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া ফেলে। বলা বাহুল্য গন্ধোৎপত্তির পুরাতন সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিয়া, স্বাস্থ্যরক্ষকগণ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু গন্ধ যে, কেবল বায়বীয় পদার্থময়, ডাক্তার এট্‌কিনের পরীক্ষায় তাহা অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হইয়া গেছে। সুতরাং নানা ভয়াবহ পীড়ার বাহক বলিয়া স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ ড্রেনের গন্ধের উপর যে অযথা দোষারোপ করিয়াছিলেন, এই নবাবিষ্কারে নিশ্চয়ই তাহার ক্ষালন হইবে বলিয়া আশা হয়। এখন ব্যাধি-জীবাণুর সংক্রমণের কারণান্তর অনুসন্ধানের সময় আসিয়াছে।

ঘ্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এই নূতন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অদ্যাপি কোনও কথা শুনা যায় নাই। এট্‌কিন্ সাহেব অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন কথাই বলেন নাই। অতি সহজ ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার প্রত্যেক উক্তিই সমর্থিত হইয়াছে। সুতরাং এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হঠাৎ দাঁড়াইয়াই যে কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, তাহা আমাদের মনে হয় না।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

শায়েস্তা খাঁর চাটগাঁ অধিকার।

(অক্সফোর্ড বড্‌লিয়ান্ লাইব্রেরীর এক ফার্সি হস্তলিপি অবলম্বনে।)

বাঙ্গলার নৌ-বল।

চাটগাঁর মগ ও তাদের আশ্রিত ফিরিঙ্গি জলদস্যুরা বাঙ্গলায় যে সব উপদ্রব করিত তাহা পূর্ব্বের এক প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছি। বাঙ্গলার নবাবেরা কৃপণতা বা আলস্য বশতঃ এ অত্যাচার দমনের চেষ্টা করিতেন না। সত্য বটে বাঙ্গলার জলপথ রক্ষার জন্য ঢাকায় বাদশাহী সরকারের কতকগুলি যুদ্ধের নৌকা ("নওয়ারা") রাখা নিয়ম ছিল, এবং তাহার খরচ এবং মাল্লা ও কর্ম্মচারীদের বেতনের জন্য জাগীর এবং ১৪ লক্ষ টাকা তন্‌খা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু ১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি, শুজার শাসনকালে, সরকারী আমলাদের অত্যাচার ও লুঠে এই সব নওয়ারার মহালগুলিতে প্রজারা উচ্ছন্ন গিয়াছিল এবং নৌ-সেনা ও কর্ম্মচারীরা বেতন না পাইয়া অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়াছিল। পরে মির্ জুম্‌লা বাঙ্গলার নবাব হইয়া আসিলেন এবং নওয়ারার নূতন বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া পুরাতন নিয়ম সব উল্টাইয়া দিলেন। কিন্তু তার জায়গায় নূতন বিধি করার আগেই আসাম অধিকার করিতে গিয়া তিনি প্রাণ হারাইলেন। অনেক নৌ-সেনাও আসামে মারা গেল এবং নওয়ারার অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। তার পর, ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমে জল-দস্যুরা আসিয়া ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত বগাদিয়া পর্গনা লুঠ করিল, এবং সায়ের-আব্-এর সর্দ্দার (cruising admiral) মুনবব্বর খাঁ জমিদারকে হারাইয়া দিল। ঢাকা হইতে ফৌজদার আকিদৎ খাঁ তাহার সাহায্য করিতে ইস্‌লাম খাঁ তরীন (আফঘান) এবং অন্যান্য নবাবী কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা নিজের ভীরু মাল্লাদিগকে জোর করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নৌকা ফিরাইতে

বাধা দিল; তখন মাল্লারা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতরাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। ইসমাইল খাঁ ও তার সঙ্গীরা স্থিরভাবে তীর চালাইয়া শত্রুর অগ্রসরণ থামাইয়া রাখিল। স্রোতে ঐ মাল্লাহীন নৌকাগুলি পাড়ে আসিয়া ঠেকিল; তখন সাহসী যোদ্ধারা রক্ষা পাইল। আর সব নৌকা মগেরা দখল করিল অথবা ডুবাইয়া দিল। এইরূপে বঙ্গে নওয়ারার নাম মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

উদ্যোগ-পর্ব্ব।*

৮ই মার্চ্চ, ১৬৬৪ খৃঃ, নূতন সুবাদার শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গলার পশ্চিম রাজধানী রাজমহলে পৌঁছিলেন। প্রথম হইতেই তাঁর দৃঢ় সংকল্প হইল যে জলদস্যুদের উচ্ছেদ করিয়া বাঙ্গলার প্রজাগণকে শান্তি দিবেন। তিনি মাহমুদ বেগ্ নামক নওয়ারার দারোগাকে নৌকা সাজান ও বন্দোবস্ত করিতে বিশেষ তাগিদ করিয়া এবং পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া, কাজী সামূ (নওয়ারার মুশরফ্) এর সহিত ঢাকা পাঠাইলেন।

নূতন নৌকার জন্য কাঠ ও কারিগর আবশ্যক। নবাবের পর্‌ওয়ানা লইয়া গ্রামে গ্রামে পেয়াদারা গিয়া কাঠ ও মিস্ত্রী সংগ্রহ করিয়া ঢাকায় পাঠাইতে লাগিল। তা' ছাড়া নবাব হুকুম দিলেন যে হুগলী, বালেশ্বর, মুরঙ্গ, চিলমারী, যশোহর, কড়িবাড়ী প্রভৃতি বন্দরে যত গুলি সম্ভব নূতন নৌকা তৈয়ার করিতে হইবে। ওলন্দাজদের কাপ্তেন রাজমহলে উপস্থিত ছিল। তাহাকে নবাব বলিলেন, "তোমরা প্রতি বৎসর বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিয়া অগাধ টাকা উপার্জ্জন কর, কিন্তু কোন কর দিতে হয় না। হিন্দু মুসলমান বেপারী হইলে লাভের উপর যে কর দিতে হইত, তোমরা বলিয়া বাদশাহ সরকার তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই মহা অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তোমাদের উচিত যে নিজের দেশ হইতে যুদ্ধ-জাহাজ আনাইয়া আরাকানের মগদিগকে বিনাশ করিতে আমাদের সাহায্য কর। আর, আরাকান দেশে তোমাদের যে সব কুঠি আছে তাহা উঠাইয়া দেও। নচেৎ বাদশাহের সাম্রাজ্যে কোথায়ও তোমাদিগকে বাণিজ্য করিতে দেওয়া যাইবে না, এবং তোমাদের লাভ একেবারে বন্ধ হইবে।" ডচ্ কাপ্তেন উত্তর করিল, "আপনার প্রস্তাব বড় গুরুতর। আমাদের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তা জেঁদ্রালকে (Governor-General of the Dutch Indies) লিখিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া তবে ইহাতে সম্মত হইতে পারি।" নবাব বলিলেন, "আচ্ছা, তাঁহাকে লেখ।" এবং জেঁদ্রালের জন্য এক প্রস্ত খেলাৎ, এক মণিখচিত জীন-পোশ (saddle-cover), এবং এই বিষয়ে এক পর্‌ওয়ানা ঐ কাপ্তেনের হাতে দিলেন।

চাটগাঁর ফিরিঙ্গিরা নৌকাযোগে আসিয়া বাঙ্গলায় ডাকাতি করিত এবং লোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইত। মগরাজকে লুঠের অর্দ্ধেক দিয়া তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিত। ঢাকার কাছে লখিকোল বন্দরে লবণ-ব্যবসায়ী কয়েক জন ফিরিঙ্গি বণিক থাকিত। শায়েস্তা খাঁ তাঁহার কর্ম্মচারী শেখ জিয়াউদ্দীন ইউসুফ্‌কে এই বন্দরের দারোগা করিয়া পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন যে এই ফিরিঙ্গিদের দ্বারা চাটগাঁর ফিরিঙ্গিদিগকে চিঠি লিখাইয়া, নবাবের অনুগ্রহ ও পুরস্কারের আশা দেখাইয়া, তাহাদিগকে মগদের পক্ষ হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিয়া বাদশাহের চাকরি-ভুক্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে।

বর্ষা শেষ হইলে রাস্তা ঘাট আবার দেখা দিল। ১৬ই অক্টোবর ১৬৬৪ খৃঃ, শায়েস্তা খাঁ রাজমহল হইতে ঢাকার দিকে রওনা হইলেন। হাজরাহাটী পৌঁছিলে কয়েক জন বাঙ্গালী তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিল, "জল দস্যুরা প্রায়ই ফরিদ-পুরের পথে যাতায়াত করে। আপনার সে দিক দিয়া যাওয়া বিপদজনক। ঝাঁক নালা দিয়া যাবেন।" নবাব এই ভয়ের পরামর্শ হাসিয়া ত্যাগ করিলেন, এবং ফরিদ-পুরের পথ দিয়াই চলিলেন। নাজিরপুর ও যাত্রাপুর হইয়া ঢাকার বাহিরে পৌঁছিয়া কয়েক দিন অপেক্ষা করিলেন। ১৩ই ডিসেম্বর গণকেরা গণিয়া শুভদিন বলিল, ও নবাব ঢাকায় প্রথম প্রবেশ করিলেন।

নৌকা তৈয়ারি।

নৌকা তৈয়ার, মাল্লা সংগ্রহ, ও রসদ জোটানর জন্য কঠিন পরিশ্রম হইতে লাগিল। নৌকা তৈয়ারের কার-খানার অধ্যক্ষ হইল হকিম মহম্মদ হোসেন (নবাবী কর্ম্ম-চারী)। মহম্মদ মকীম্ হইল নওয়ারার মুশরফ্। কিশোর

দাস (বাদশাহী সরকারের কর্ম্মচারী) নওয়ারা পোষণের পর্গণাগুলির তত্ত্বাবধান এবং নৌ-সেনার তনখা ও জাগীরের বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হইল। নবাবের চেষ্টায় অল্পদিনেই ৩০০ যুদ্ধপোত তৈয়ার ও সাজান হইল।

সংগ্রামগড়ে থানা ও দুর্গ নির্ম্মাণ।

যে ব-দ্বীপে ঢাকা, তার শেষে সংগাম গড়। ইহার সম্মুখে গঙ্গা ও ব্রহ্মপত্র মিলিত হয়। সেকালে সংগ্রাম নামে একজন রাজা মগদের বাধা দিবার জন্য এখানে গড় বানাইয়াছিল। সেইজন্য এই নাম হইয়াছে। কিন্তু সে পুরাতন গড়ের চিহ্নও নাই। নবাব দেখিলেন যে এখানে একটা দুর্গ বানাইয়া রণ-সাজ,সৈন্য ও যুদ্ধ-পোত রাখিলে মগ ও ফিরিঙ্গিদের বাঙ্গলায় আসার পথ রোধ করা যাইতে পারে। অতএব তিনি হুগলীর পুরাতন ফৌজদার মহম্মদ শরীফ্‌কে সংগাম গড়ের থানাদার করিয়া পাঠাইলেন; সঙ্গে অনেক সৈন্য, চাকর ও তোপ দিয়া তথায় একটা দুর্গ বানাইতে হুকম দিলেন। আবুল হাসান ২০০ নৌকা সহ এখানে অড্ডা করিল। মহম্মদ বেগ আবকশ ১০০ নৌকা সহ ধাপায় রহিল শত্রু আসিতেছে শুনিলে আবুল হাসানের সাহায্যে যাইবে। ধাপা হইতে সংগাম গড় পর্য্যন্ত একটা উঁচু আল (embankment) বাধা হইল, যে বর্ষাকালেও সৈন্য ও অশ্বগণ হাঁটিয়া এই পথ দিয়া ঢাকা হইতে সংগাম গড় (১৮ ক্রোশ) যাইতে পারিবে।

সোনদ্বীপ জয় ও থানা স্থাপন।

এই সময় বিখ্যাত যোদ্ধা ফর্হাদ খাঁ ভালুয়ার ফৌজদার ও বিচক্ষণ নেতা ইব্‌ন্ হোসেন নওয়ারার দারোঘা নিযুক্ত হইল। সংগ্রাম গড় হইতে চাটগাঁ যাইতে হইলে সোনদ্বীপ মাঝ পথে পড়ে এবং ঐ দ্বীপে আড্ডা করিতে পারিলে বড় সুবিধা হয়, কারণ সোনদ্বীপ হইতে চাটগাঁ পৌঁছিতে দুই প্রহর সময় লাগে, বেশীক্ষণ সমুদ্রে থাকিতে হয় না। এজন্য আগে সোনদ্বীপ জয় করা বড়ই দরকার। সোনদ্বীপের বর্ণনা ও দিলাব্বরের নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লওয়ার বিবরণ ১৩১২ মাঘের "নবনূরে" "একজন বাঙ্গালী মুসলমান বীর" প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি। ১৯এ নবেম্বর, ১৬৬৫ খৃঃ, সোনদ্বীপ অধিকার ও তথায় মোঘল থানা স্থাপন করা হইল। ভালুয়ায় খাদ্য, তোপ ও জঙ্গল কাটার হাতিয়ার জমা হইতে লাগিল।

ফিরিঙ্গিদের ভাঙ্গাইয়া আনা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নবাবের হুকুমে শেখ জিয়াউদ্দীন ইউসুফ্ খিধিকোলের ফিরিঙ্গিদিগকে দিয়া চাটগাঁর ফিরিঙ্গি-দিগকে বাদশাহের পক্ষে আসিতে অনুরোধ করিয়া পাঠায়। নবাব হুগলী বন্দরের (পর্টুগীজ্) কাপ্তেনকে দিয়াও তাহা-দিগকে এই মর্ম্মে চিঠি পাঠান। ঢাকা পৌঁছিয়া তামলুক বন্দরের কাপ্তেনকে দিয়াও তাহাদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন। লোকে আরাকানের রাজাকে বলিয়া দিল যে ফিরিঙ্গিরা নবাবের পক্ষ হইতে ক্রমাগত চিঠি পাইতেছে। তারপর যখন সোনদ্বীপ জয়ের সংবাদ পৌঁছিল, মগরাজ মহাচিন্তায় তাঁহার খুড়তুত ভাই চাটগাঁর শাসনকর্ত্তাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "খুব সাবধানে থাকিও, দুর্গটি মজবুৎ রাখিও, ফিরিঙ্গিদের মন তুষ্টি করিও। কিন্তু তাহাদের স্ত্রীপুত্রদিগকে অভয় দিয়া এখানে পাঠাইয়া দিও। এখান হইতে আমি শীঘ্রই নৌকা ও সৈন্য তোমার সাহায্যে পাঠাইতেছি।" মগরাজের ইচ্ছা ছিল যে কৌশলে ফিরিঙ্গিদের পরিবারগুলি হস্তগত করিয়া পরে চাটগাঁয় তাদের পুরুষগুলিকে হত্যা করিয়া, মোঘলদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পথ বন্ধ করিবেন। ফিরিঙ্গিরা এই অভিসন্ধি টের পাইয়া নিজ স্ত্রীপুত্র সহ ৪২ খান জলবা নৌকা লইয়া পলাইয়া নোয়াখালিতে ফর্হাদ খাঁর নিকট আসিয়া আশ্রয় লইল। খাঁ তাহাদের পরিবারগণকে ভালু-য়ায় এবং তাহাদের অধ্যক্ষ কাপ্তেন মুর ও অন্যান্য প্রধানকে ঢাকায় নবাবের নিকট পাঠাইল। কিন্তু ফিরিঙ্গি নাবিকগণকে তাদের নৌকা সহিত নোয়াখালিতেই রাখিল। ফিরিঙ্গিরা বাদশাহের পক্ষে যোগ দেওয়ায় বাঙ্গলার প্রজারা নিরাপদ হইল। নবাব নিজ তহবীল হইতে কাপ্তেন মুর প্রভৃতিকে ২০০০৲ টাকা দিলেন। বাদশাহী সরকার হইতে কাপ্তেনের ৫০০৲ টাকা মাসিক বেতন এবং অপর প্রধানদের জন্য স্বচ্ছন্দে থাকার মত আয় নির্দ্দিষ্ট হইল।

কাপ্তেন মুর জানাইল, "আরাকানের রাজা নিজ বলের অহঙ্কারে চাটগাঁ দুর্গ রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা করেন। এত দিন আমাদের উপরই সে ভার ছিল। এখন সোনদ্বীপ জয়ের সংবাদ পাইয়া অনেক সৈন্য ও নৌকা চাটগাঁ

রক্ষার জন্য পাঠাইতেছেন। যদি মোঘল সৈন্য ইহাদের পৌঁচার আগে চাটগাঁ আক্রমণ করে, ঐ দুর্গ সহজেই জয় হইবে।" নবাব এ সুবিধা না ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ অভিযানের বন্দোবস্ত করিলেন।

চাটগাঁ অভিযান।

বাঙ্গলায় মোঘলরাজ্যের দক্ষিণপূর্ব্ব সীমা জগদিয়া হইতে চাটগাঁ ৩০ ক্রোশ দূর। এই স্থান জঙ্গলময়, জনহীন, পথহীন, পার হওয়া কঠিন। পথে আবাদ বা হাট নাই। চাটগাঁ অবরোধ করিয়া জয় শেষ করা পর্য্যন্ত মোঘল-সেনাকে বাঙ্গলা হইতে রসদ লইয়া যাইতে হইবে। নওয়ারার মাল্লারা মগদিগকে এত ভয় করিত যে, তাহাদের দ্বারা জলপথে রসদ পৌঁচানর আশা করা যাইতে পারে না।

স্থির হইল যে, নবাবের পুত্র বুজুর্গ উম্মেদ খাঁ, ৪০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া চাটগাঁ অভিযানের প্রধান সেনাপতি হইবেন। নবাব শায়েস্তা খাঁ ঢাকায় থাকিয়া রসদ পাঠানর তত্ত্বাবধান করিবেন।

২৪শে ডিসেম্বর, ১৬৬৫ খৃঃ, শুভক্ষণ দেখিয়া বুজুর্গ উম্মেদ খাঁ ঢাকা হইতে রওনা হইলেন। সঙ্গে চলিল ইখ্‌তিসাস্ খাঁ (আড়াই হাজারী), সরান্দাজ খাঁ (দেড় হাজারী), ফর্হাদ খাঁ (হাজারী), করাব্বল খাঁ (ঐ) রাজা সুবলসিংহ শিশোদীয় রাজপুত (দেড় হাজারী) ইব্‌ন্ হোসেন (নওয়ারার দারোঘা), মির মর্তাজা (তোপখানার দারোঘা) এবং অন্যান্য বাদশাহী কর্ম্মচারী, অনেক নকদী ও আহদী সৈন্য, এবং ২৫০০ নবাব সরকারের অশ্বারোহী।

মির মর্তাজা, ইব্‌ন্ হোসেন, মুনব্বর খাঁ জমিদার প্রভৃতি নেতারা প্রথমে নোয়াখালিতে গেল, এবং তথা হইতে ফর্হাদ খাঁ ও কাপ্তেন মুর ও অন্যান্য ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে মিলিত হইয়া বুজুর্গ উম্মেদ খাঁর সৈন্যের অগ্রণী হইয়া জল ও স্থল পথে চাটগাঁর দিকে ধাবিত হইল। আস্কর খাঁ ঢাকায় রহিল। ইব্‌ন্ হোসেনের অধীনে ২৮৮ খান যুদ্ধের নৌকা ছিল। ইতিপূর্ব্বে ঢাকায় অনেকগুলি কুড়াল সংগ্রহ করা হইয়াছিল; সৈন্যেরা তাহা লইয়া জঙ্গল কাটিয়া পথ করিতে লাগিল।

অভিযান রওনা হইবার দিন নবাব প্রাতঃকাল হইতে দুপুর এবং বৈকাল হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বাহিরের বৈঠকখানায় বসিয়া সব তদারক করিতে লাগিলেন। তারপর অন্তঃপুরে গিয়াও যদি কোন কথা মনে পড়িত অমনি তাহার বিষয় কেরাণীদিগকে বলিয়া পাঠাইতেন। প্রতিদিন অভিযানের প্রধান কর্ম্মচারী ও মনসবদারদিগকে উপদেশ লিখিয়া পাঠাইতেন, এবং তাদের নিকট হইতে সংবাদপূর্ণ চিঠি পাইতেন।

রসদের বন্দোবস্ত।

গোলার আমলাদের প্রতি হুকুম রহিল যে, বেপারীরা ঢাকায় যত শস্য আনিবে তাহার অর্দ্ধেক সৈন্যদের নিকট পাঠাইতে হইবে। বাঙ্গলার সর্ব্বত্র ফৌজদারগণ কড়া হুকুম পাইল যে, যতদূর সাধ্য খাদ্যদ্রব্য পাঠাইবে; এবং এজন্য নবাবের নিকট হইতে ইসাওলগণ নিযুক্ত হইয়া গেল। একটা বচন আছে, "যে শত্রু প্রথমে সৈন্যদিগকে দুর্ব্বল ও যুদ্ধ অবরোধে অক্ষম করে সেটা হচ্ছে অন্নাভাব।" কিন্তু নবাব এত বেশী ও এত দিকে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে, এ যুদ্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সৈন্যনিবাসে ও ঢাকা সহরে শস্যের দাম ১০ ও ৯ এই অনুপাতে ছিল।

জলে ও স্থলে সৈন্যগণের অগ্রসর হওয়া।

বজুর্গ উম্মেদ খাঁ দ্রুত কুচ করিয়া কয়েক দিনের মধ্যে সৈন্যসহ ফেনীর নদী পার হইয়া মগরাজ্যে ঢুকিলেন এবং জঙ্গল কাটিয়া পথ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সুলতান বেগ মনসব্‌দার কিছু সৈন্যসহ ফেনীর থানাদার হইয়া রহিল। পদে পদে সমুদ্রতীর দিয়া জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা তৈয়ারী হইতে লাগিল। জল ও স্থলপথের সৈন্যগণ কুচ ও বিশ্রাম কোন সময়েই পরস্পর হইতে পৃথক হইত না। ইব্‌ন্ হোসেনের অধীনে নওয়ারা সমুদ্র দিয়া ও সৈন্যের পুরোভাগ (van) স্থলপথে ফর্হাদ খাঁ, মির মর্তাজা ও হায়াৎ খাঁ জমাএৎদারের অধীনে অগ্রে চলিল।

ইব্‌ন্ হোসেন নৌকাসহ খুব দ্রুত কুমারিয়া নালায়—চাটগাঁ সহর হইতে দুই কুচের পথ—পৌঁছিয়া, সেখান হইতে সামনে চাটগাঁর দিকে এবং পশ্চাতে মোঘল-সৈন্যের

দিকে বন কাটিয়া রাস্তা তৈয়ার করিতে লাগিল। স্থল-পথের সৈন্যগণের পুরোভাগও জঙ্গল কাটিয়া আগাইয়া ২১এ জানুয়ারি ১৬৬৬ খৃঃ ইব্‌ন্ হোসেনের সঙ্গে মিলিত হইল। সেনাপতি বুজুর্গ উম্মেদ খাঁ কুমারিয়া হইতে তিন ক্রোশ পশ্চাতে রহিলেন।

অভিযানের ফল বিচার।

বাঙ্গলার নবাবগণ মগদের অত্যাচার এত দিন সভয়ে নীরবে সহিয়া আসিতেছিলেন এবং এক মাত্র যিনি চাটগাঁ অবরোধ করিয়াছিলেন সেই ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গও দুই-বৎসর পরে তথা হইতে বিফল হইয়া ফিরিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। এজন্য অবশেষে বাঙ্গলার লোকদের ধারণা হইয়াছিল যে চাটগাঁ জয় করা অসাধ্য ব্যাপার। শায়েস্তা খাঁর চেষ্টার সফলতা সম্বন্ধে সকলেরই মনে মহা দুশ্চিন্তা ও ভয় হইতে লাগিল।

রায় নন্দলাল নামক নবাবের প্রিয় কর্ম্মচারী এবং তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তির বিশ্বস্ত দেওয়ান, অসামান্য ক্ষমতা, বিদ্যা, কার্য্যকুশলতা, ফার্সি ও হিন্দী সাহিত্য জ্ঞান প্রভৃতি গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি কিন্তু সর্ব্বদা বলিতেন যে এ যুদ্ধে নবাবের জয় হইবেই। যে দিন রজব্ মাসের নূতন চাঁদ উঠিল, নবাব ভাগ্যপরীক্ষার জন্য হঠাৎ কোরাণ খুলিলেন এবং এই বচনটির উপর তাঁহার দৃষ্টি প্রথমে পড়িল, "সে সময় কাছে আসিয়াছে যখন তোমাদের প্রভু তোমাদের শত্রুকুল ধ্বংশ করিবেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী করিবেন।"

প্রথম জলযুদ্ধ।

২২শে জানুয়ারি সন্ধ্যার সময় ইব্‌ন্ হোসেনের দূতগণ সংবাদ আনিল যে শত্রু-পোত চাটগাঁ হইতে আসিয়া এখান হইতে দুই প্রহরের পথ কাঁঠালিয়া নালায় রহিয়াছে। ইব্‌ন্ হোসেন নিজের নৌ-সেনাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া কয়েক খান নৌকা রাতারাতি ঐ নালার মুখে পাঠাইয়া দিয়া তাহাদিগকে খুব সতর্ক থাকিতে হুকুম দিল। পর দিন (২৩শে জানুয়ারি) দু প্রহরে চৌকিদারগণ খবর দিল যে মগ নৌ-সেনা কাঁঠালিয়া হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিতেছে।

তখন জোরে বাতাস ও প্রকাণ্ড ঢেউ উঠিয়াছিল; জোয়ার আসায় জল উছলিয়া বাদশাহী নৌকাগুলি আগাগোড়া ভিজাইয়া দিতে লাগিল। তবুও ইব্‌ন্ হোসেন যুদ্ধের জন্য নৌকা খুলিয়া দিলেন। তীর হইতে একজন তুর্কী সেনা চেঁচাইয়া মহম্মদ বেগ আবাকশ্‌কে বলিল, "তুমি পাগল নাকি যে এমন তুফানে এই গভীর সমুদ্রে নৌকা রওনা করিতেছ"? সে উত্তর করিল, "ওরে ভাই, যদি পাগলই না হইতাম, তবে যুদ্ধের ব্যবসা করিতে আসিতাম না।"

শীঘ্র জলযুদ্ধ হইবে সংবাদ পাইয়া ফর্হাদ খাঁ, মির মর্ত্তাজা ও হায়াৎ খাঁ তাড়াতাড়ি স্থলপথে নওয়ারার সাহায্যে আগাইলেন।

মগদের ১০ খান ঘরাব্ ও ৪৫ খান জল্‌বা নৌকা দেখা দিয়া তোপ চালাইতে লাগিল। কাপ্তেন মুর ও অন্যান্য ফিরিঙ্গিদের নৌকা সর্ব্বাগ্রে ছিল; তাহারা নির্ভয়ে শত্রুর নৌকার উপর ঝাঁপিয়া পড়িল। ইব্‌ন্ হোসেনও তাহাদের পশ্চাতে ধাইয়া আসিল। মগেরা এ আক্রমণ সহিতে পারিল না; ঘরাবের লোকগুলি জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল; জলবাগুলি দ্রুতবেগে পলাইয়া গেল। ইব্‌ন্ হোসেন শত্রুর ঘরাব্‌গুলি অধিকার করিয়া পশ্চাদ্ধাবন করিতে চাহিল, কিন্তু বাঙ্গলার নৌ-সেনা—যাহা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই—আজ মগদিগকে হারাইয়াছে। ইহাই যথেষ্ট মনে করিয়া আর আগাইতে অস্বীকার করিল। কাজেই ইব্‌ন্ হোসেন কুমারিয়ার নালায় সে রাত্রি কাটাইলেন।

দ্বিতীয় যুদ্ধের আয়োজন।

পরদিন মগদের ২।৩ খান নিশানযুক্ত নৌকা দূরে দেখা গেল। গত কল্য প্রাতে মগেরা যুদ্ধে যাইবার সময় ১০খান ঘরাব্ ও ৪৫খান জল্‌বাই বাদশাহী নওয়ারা পরাস্ত করা ও কাড়িয়া লওয়ার জন্য যথেষ্ট ভাবিয়া নিজদের বড় পোত (খালু ও ধুম্ নামের) এবং অন্যান্য অনেক নৌকা পথের মধ্যে হর্লার নালায় রাখিয়া গিয়াছিল। সেই খালু নৌকাগুলির উপরের নিশান এখন দেখা গেল। ইব্‌ন্ হোসেনের উৎসাহ-বাণীতে মাতিয়া বঙ্গীয় নৌ-সেনা হর্লার দিকে রওনা হইল। মগেরা সংবাদ পাইয়া নালা হইতে বাহিরে আসিয়া সমুদ্রে নৌশ্রেণী রচনা করিয়া দাঁড়াইল। প্রথমে ইব্‌ন্ হোসেন

নিজের ছোট দ্রুত নৌকা সহ তথায় পৌঁছিয়া বড় ভারি নৌকাগুলির অপেক্ষায় দূরে থাকিয়া তোপ ছাড়িতে লাগিল, নিকট যুদ্ধ হইল না। সন্ধ্যার সময় সে গুলি আসিয়া জুটিল। রাত্রি দূর কামান আওয়াজে কাটিয়া গেল।

পরদিন ২৫শে জানুয়ারি প্রাতে মোঘল নৌ-বাহিনী মহা উৎসাহে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে ও গোলা চালাইতে চালাইতে শত্রুর দিকে অগ্রসর হইল। প্রথমে চলিল সবচেয়ে বড় জাহাজ (সলু) এর শ্রেণী, তাদের উপর ভারি কামান ছিল। দ্বিতীয় সারে ছিল মাঝারি আকারের জাহাজ ঘরাব্‌গুলি। সকলের পিছু ছোট ও দ্রুত জলবা ও কুচা নৌকার শ্রেণী।

মগ রণনীতি সমালোচন।

মগেরা মহা ভুল করিয়াছিল। একে মোঘল নওয়ারা ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল; তার উপর মগ নৌ-সেনা দুই ভাগ হইয়া দুই দিন দুই ভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করিতে যাইল। এইরূপে বলভাগে ক্ষীণ মগদের পরাজয় সহজ। বিশেষতঃ অনেক বৎসর ধরিয়া মগেরা নিজে নৌ-যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়া ফিরিঙ্গিদিগকে দিয়া বাঙ্গলা লুঠ করাইয়া তাহার ভাগ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিত। এরূপ লোকেরা ত রণে অপটু হইবেই। একদিকে ২৩শে জানুয়ারির যুদ্ধে জিতিয়া মোঘলেরা উল্লাসিত, অপর দিকে মগেরা পরাজয়ে ভীত হইয়াছিল। মগ নৌ-বল যদি একত্র হইয়া ইব্‌ন্ হোসেনকে কুমারিয়ার নালায় প্রথম আসিবার দিন আক্রমণ করিত, তবে তাহাদের জেতার খুব সম্ভাবনা হইত। কারণ তখন ইব্‌ন্ হোসেন একা, রাস্তা তৈয়ার হয় নাই, এবং স্থলপথের সৈন্যগণের পুরোভাগ তখনও কুমারিয়া পৌছে নাই। এ যুদ্ধে মগদের কোনই রণকৌশল বা দূরদর্শিতার চিহ্ন পাওয়া যায় না।

মগ-পোতের পলায়ন।

আজ মগেরা পালান ভিন্ন উপায় দেখিল না। দ্রুতগামী জলবা নৌকাগুলি ভারি বড় জাহাজগুলিকে কাছি দিয়া টানিয়া রণক্ষেত্র হইতে পিছু হটাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ইব্‌ন্ হোসেন নিজের শ্রেণী না ভাঙ্গিয়া সাবধানে পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল।

বৈকাল ৩টার সময় মগেরা কর্ণফুলী নদীর মুখে পৌছিয়া তাহার মধ্যের চর—চাটগাঁ দুর্গের ঠিক সামনে—অবধি গিয়া চাটগাঁর তীরের কাছে নঙ্গর করিল। মোঘল নওয়ারা অমনি আসিয়া নদীর মুখ অধিকার করিয়া বসিল।

এইটি মগদের দ্বিতীয় সাংঘাতিক ভ্রম। নদীর মধ্যে নৌকা লইয়া পলাইয়া, তাহারা পশ্চাদ্ধাবনকারী মোঘলদের দ্বারা যেন খাঁচার মধ্যে বদ্ধ হইল। তার চেয়ে খোলা সমুদ্রে থাকিলে পরাজিত হইলেও দ্রুত নৌকাগুলি আরাকানে নিরাপদে পলাইয়া যাইতে পারিত। নদীর মধ্যে আসায় পলায়নের পথ ত বদ্ধ হইলই, তার উপর নৌ-সেনা ও দুর্গ এদের একের বিপদ অপরকে অভিভূত করিল; দুর্গ বিজিত হইলে মগ নৌ-বল আর তীর হইতে সাহায্য পাওয়ায় নিরাশ হইবে, নৌ-বল পরাস্ত হইলে দুর্গস্থিত মগদের বাহিরে যাইবার অথবা আরাকান হইতে সাহায্য পাইবার কোন সম্ভাবনা রহিবে না। কাজেও তাহাই দেখা গেল।

কর্ণফুলী তীরের দুর্গ জয়।

কর্ণফুলী নদীর মোহানার পশ্চিম পাড়ে, ফিরিঙ্গি বন্দর নামে ফিরিঙ্গি পল্লীর কাছে, মগেরা ৩টা বাঁশের গড় করিয়াছিল; এবং তার মধ্যে অনেক তোপ ও তেলিঙ্গা সৈন্য এবং ২টা হাতি রাখিয়া দিয়াছিল। ইহারা এখন নওয়ারার উপর গুলি করিতে লাগিল। ইব্‌ন্ হোসেন আর ইতস্ততঃ না করিয়া কতকগুলি সৈন্য তীরে নামাইয়া তাহাদিগকে স্থলপথে ও নৌকাগুলিকে নদী উজাইয়া পাঠাইয়া দিল। উভয় দল গিয়া গড় আক্রমণ করিল। মগেরা কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া পলাইল, এবং মোগলেরা বাঁশের কেল্লাগুলি পোড়াইয়া দিয়া মোহানায় ফিরিয়া আসিল।

দ্বিতীয় জলযুদ্ধ।

পথের কণ্টক এইরূপে ভাঙ্গিয়া দিয়া, ইব্‌ন্ হোসেন শত্রু রণপোত আক্রমণ করিল। ফিরিঙ্গি ও মোগল নৌ-সেনা বেগে শত্রুর চারিদিকে গিয়া পড়িল। মহা জলযুদ্ধ বাধিয়া গেল। চাটগাঁ দুর্গ হইতেও গোলা বর্ষণ হইতে লাগিল। অবশেষে "বিজয়ের বাতাস মুসলমান পতাকার উপর বহিতে লাগিল।" নদীর মুখ মোঘলদের হাতে; মগ নৌকার

পলাইবার পথ বন্দ। তখন অনেক মগ দাঁড়ি ও সৈন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল; অপরেরা নৌকার উপর ধরা দিল। কতকগুলি নৌকা মোঘল তোপে ও টক্করে (ramming) ডুবিয়া গেল। অবশিষ্ট ১৩৫ খান ইবন্ হোসেনের হাতে পড়িল।

ইতিমধ্যে বুজুর্গ উম্মেদ খাঁ জলযুদ্ধের খবর পাইয়া সৈন্যসহ দ্রুত চাটগাঁর নিকট পৌঁছিলেন। দুর্গরক্ষী সৈন্যগণ স্বচক্ষে জলযুদ্ধের ফল দেখিয়া এবং নিজ পক্ষের চৌকিদারগণের নিকট মোঘল সৈন্যের আগমনের কথা শুনিয়া মহাভয়ে রাতারাতি দুর্গ হইতে পলাইয়া গেল।

চাটগাঁ দুর্গ সমর্পণ।

সেই রাত্রেই ইব্‌ন্ হোসেন মগ বন্দীদের মধ্য হইতে দুই জন বিশ্বস্ত লোককে পাঠাইয়া চাটগাঁর দুর্গাধ্যক্ষকে জানাইল "বৃথা নিজ পরিজন সহ বিনষ্ট হইও না। আগেভাগে দুর্গ সমর্পণ করিয়া সকলের প্রাণ বাঁচাও। নচেৎ আমরা তোমাদিগকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিব।" দুর্গাধ্যক্ষ সে রাত্রির জন্য শান্তি ভিক্ষা করিয়া, পরদিন প্রাতে মোঘলদিগকে দুর্গদ্বার খুলিয়া দিবে প্রতিজ্ঞা করিল।

২৬শে জানুয়ারি প্রাতে ইব্‌ন্ হোসেন দুর্গের দিকে রওনা হইল। কিন্তু তার আগেই মুনব্বর খাঁ দ্বার খোলা পাইয়া দুর্গে ঢুকিয়াছিল, এবং তাহার অনুচরগণ কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া বাড়ীঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল। ইব্‌ন্ হোসেনের আগুন নিবাইবার সব চেষ্টা বিফল হইল। অবশেষে দুর্গস্বামীকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিল। আগুন পুড়িয়া শেষ হইলে পুনরায় দুর্গে গিয়া সমস্ত সম্পত্তি নবাবের নামে দখল করিল। দুর্গের ২টা হাতি পুড়িয়া মরিয়াছিল, অপর দুটি হস্তগত হইল।

চাটগাঁর সম্মুখে নদীর দক্ষিণ পাড়ের ছোট দুর্গে যে সব মগ ছিল, তাহারাও পলাইয়া গেল, এবং সে দুর্গও দখল হইল। সে পারের কৃষিগণ—অধিকাংশই বাঙ্গলা হইতে ধরিয়া আনা বন্দী মুসলমান—পলায়নকারী মগদের উপর পড়িয়া তাহাদের এক সেনাপতিকে মারিল এবং ২টা হাতি কাড়িয়া লইয়া ইব্‌ন্ হোসেনের কাছে আনিল।

২৭শে জানুয়ারি সেনাপতি বুজুর্গ উম্মেদ খাঁ চাটগাঁ দুর্গে প্রবেশ করিলেন। ওদেশের লোকদিগকে আশ্বস্ত করিয়া, নিজ সৈন্যগণকে কড়া হুকুম দিলেন যে প্রজাদের কাহারও প্রতি যেন লুঠ বা অত্যাচার করা না হয়।

পুরস্কার।

মগ দুর্গস্বামীকে জয়ের সংবাদ সহ নবাবের কাছে পাঠান হইল। সে ২৯শে জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছিল। চারিদিকে প্রজারা আনন্দ বাদ্য বাজাইতে লাগিল। নবাব ফিরিঙ্গি ও মোঘলদিগকে অসংখ্য পুরস্কার দিলেন। নবাবী সৈন্যগণ ও নওয়ারার মাল্লারা এক মাসের বেতন বকশিস (bounty) পাইল।

যখন বাদশাহ আওরাংজীব জয়-বিবরণ (despatch of victory) পাইলেন, তিনি নবাব শায়েস্তা খাঁকে এক মণিখচিত তরবার, দুটা হাতি, দুইটা ঘোড়া (সোনার সাজ-যুক্ত), এবং এক প্রস্ত খেলাৎ পাঠাইলেন। সেনানায়কেরা সকলেই উচ্চতর মনসবে উন্নীত হইল। ইব্‌ন্ হোসেন "মনসুর খাঁ" এবং মির মর্তাজা "মুজাহিদ খাঁ" খেতাব পাইল।

চাটগাঁ জয়ের লাভ।

কিছু দিন পরে প্রধান মন্ত্রী জাফর খাঁ বাদশাহের হুকুম অনুসারে দিল্লী হইতে নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "নববিজিত দেশের জমা (রাজস্ব) কত?" নবাব উত্তর দিলেন "আসল কথায় ইহার 'জমা' হচ্ছে বাঙ্গলার মুসলমানদের মনের 'জমায়াৎ' (শান্তি); ইহার কর হচ্ছে ইস্‌লামের প্রভাব বৃদ্ধি; ইহার নগদ (আয়) হচ্ছে বাদশাহীর স্থায়িত্বের জন্য প্রজাদের আশীর্ব্বাদ। মগ-উপদ্রব থামিল, এখন বাঙ্গলার আবাদ শীঘ্র বৃদ্ধি হইবে; তাহা হইতেই চাটগাঁ জয়ের কি লাভ বুঝিতে পারিবেন।"

যদুনাথ সরকার এম্, এ,
পাটনা কলেজের অধ্যাপক।

প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা।

১২৭২ বঙ্গাব্দ হইতে ৺কাশীধামে বঙ্গসাহিত্য সমাজ নামে একটী বাঙ্গলা পুস্তকালয় প্রচলিত আছে। এক সময়ে ইহার অবস্থা খুব ভাল ছিল। মধ্যে সাধারণের উৎসাহাভাবে ও তদানীন্তন কার্য্যকারকের অনবধানতা বশতঃ পুস্তকাদি অনেক নষ্ট হওয়ায়, সমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। অধুনা স্থানীয় বিদ্যোৎসাহীগণের চেষ্টায়,

বিশেষতঃ লব্ধপ্রতিষ্ঠ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু মোক্ষদাদাস মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু হৃষিকেশব সান্নাল বি. এ. ও শ্রীযুক্ত বাবু চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় বি. এ. মহাশয়দিগের উত্তেজনায়, উহার উন্নতি উদ্দেশে ও সংস্কার কামনায় মিত্রগোষ্ঠী, বান্ধব সমিতি, সঙ্গীত সমিতি প্রমুখ প্রধান প্রধান স্থানীয় সম্মিলনীর প্রতিনিধি স্বরূপ কয়েকটি সভ্য ও অপরাপর কয়েকজন ভদ্রমহোদয় দ্বারা একটি কার্য্যনির্ব্বাহিকা সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। এবং বিগত চারি বৎসর হইতে সুহৃৎসমিতি নামে যে একটি আলোচনা-সমিতি (Debating Society) প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাও উক্ত সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হওয়ায়, সমাজের বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন আলোচনা-বিভাগেরও সংযোগ হইল। এখন আশা করা যায়, উভয়ের সমবেত চেষ্টায়, স্থানীয় জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে বঙ্গভাষার প্রচাররূপ মহৎ কার্য্যে সমাজ দিন দিন অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইবে। সমাজের উন্নতিকল্পে ভিন্নস্থানীয় বদান্য গ্রন্থকার, প্রকাশক, পত্রিকা-সম্পাদক ও মহানুভবগণের অতি সামান্য দানও কৃতজ্ঞতার সহিত পরিগৃহীত হয়।

ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, বঙ্গসাহিত্য সমাজ।

রায় বাহাদুর ডাক্তার রামলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম। তাঁহার জীবনচরিত ও ছবি পূর্ব্বেই প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। নূতন আরও কিছু বৃত্তান্ত ছাপিবার ইচ্ছা আছে।

জন্ মর্লী ও বঙ্গভঙ্গ।

জন্ মর্লী সাহেব বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম আমরা এইরূপ বুঝিয়াছি:—

"হে বাঙ্গালীগণ, তোমাদের সহিত ভাল ব্যবহার করা হয় নাই। তবে কি না, আমার জাত-ভাইয়েরা যাহা করিয়া ফেলিয়াছে, আমি তাহা অংরাজ হইয়া উল্টাইয়া দিব, এরূপ আশা করা উচিত নয়। তা' ছাড়া, তোমাদের উপর অবিচার হইয়াছে বলিয়া তোমরা যে বাস্তবিকই মনে কর, তাহার কোন সাকার, অর্থাৎ পকেট্ বা উদরেন্দ্রিয় কিম্বা ত্বগিন্দ্রিয়-গোচর বিশেষ প্রমাণ পাই নাই। তোমরা বড় শান্ত শিষ্ট। আমরা উদারনৈতিক বা রক্ষণশীল যাহাই হই না কেন, সকলেই ইংরাজ, সকলেই শক্তের ভক্ত, নরমের যম। অতএব, তোমাদের আপীল্ ডিস্‌মিস্ হইল।"

গ্রন্থসমালোচনা।

জল সরবরাহের কারখানা। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জিনীয়ার শ্রীহরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বি.এ. এল্.সি.ই.) কর্ত্তৃক বিরচিত। দুই খণ্ড। এলাহাবাদ, বাহাদুরগঞ্জ, পাণিনি কার্য্যালয় হইতে শ্রীরামেশ্বরপ্রসাদ ভার্গব কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ টাকা। এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় নূতন। জলসরবরাহের কারখানা বা ওয়াটার ওয়ার্কস্ সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় কোন এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কিছুই শিক্ষা দেওয়া হইত না শুনিয়াছি। সুতরাং এই পুস্তক সর্ব্বশ্রেণীর এঞ্জিনীয়ারিং ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা আদৃত হওয়া উচিত। ঠিকাদারগণেরও ইহা কাজে লাগিবে। সাধারণ পাঠকবর্গও ইহা হইতে বিস্তর জ্ঞানলাভ করিবেন। বলা বাহুল্য, এরূপ বিষয়ে কেহই সুললিত পদবিন্যাসের আশা করেন না। তাহাতে আবার ইহা প্রথম উদ্যম। লেখা বিশদ হইলেই হইল। আজকাল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। এমন সময়ে এরূপ কঠিন বিষয়ে এমন একখানি সুন্দর পুস্তকের আবির্ভাব আশাজনক। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে চেষ্টা থাকিলে ক্রমশঃ সব বিষয়েই বাঙ্গালা ভাষায় কেতাব লেখা যাইতে পারে ও সব বিষয়ই বাঙ্গালায় শিখান যায়। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এই পুস্তক লিখিয়া ও এলাহাবাদের পাণিনি কার্য্যালয় ইহা প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গৃহস্থাশ্রমীদিগের উপকার করাই সন্ন্যাসীদের প্রকৃত কর্ত্তব্য। বিজ্ঞানানন্দ স্বামী এই কর্ত্তব্যপালন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। আজকাল নির্ম্মল জলের অভাব সহরে ও গ্রামে দেশময় যেরূপ বাড়িয়া চলিতেছে, এবং তাহাতে রোগ ও মৃত্যুসংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে এরূপ একখানি পুস্তক আমাদের খুব কাজে লাগিবার কথা। পুস্তকখানিতে প্রায় আড়াই শত পরিষ্কার চিত্র আছে। রুড়কী কলেজের ওয়াটার ওয়ার্কস্ বিষয়ক পুস্তকে মোটে ইহার এক তৃতীয়াংশ চিত্র আছে। বিশেষজ্ঞেরা জানেন যে এরূপ পুস্তকের ছবি শোভা বর্দ্ধনের জন্য দেওয়া হয় না; ইহা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। সুতরাং চিত্রবাহুল্য হইতেই পুস্তক খানির মূল্যবত্তা বুঝা যাইবে। ইহার একুশটি অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবৃত হইয়াছে;—প্রস্তাবনা, জলের ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলী, কি পরিমাণে জল সরবরাহ করিতে হইবে, জল পর্য্যাপ্ত হইবে কি না তাহার নির্দ্ধারণ, যতখানি জল হ্রদে জমা করিতে হইবে তাহার নির্দ্ধারণ, ওয়াটার ওয়ার্কসের শ্রেণী বিভাগ, জল সঞ্চয় করিবার হ্রদ, মাটীর বাঁধ বালীর আড়ী ও ওয়াটার ওয়ার্কসে ভূকম্পের ফলাফল, পাকা বাঁধ, জল শোধন প্রণালী, থিতাইবার চৌবাচ্চা, বালীর দ্বারা ছাঁকনীর কারখানা, চৌবাচ্চা, জলের টাওয়ার, ষ্টাণ্ড পাইপ এবং আদর্শ ওয়াটার ওয়ার্কস, পম্পিং যন্ত্র, নল এবং খোলা পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে জলের প্রবাহের বিষয়, জল বিতরণ করিবার প্রণালী, অগ্নি নির্ব্বাপণ করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত, ওয়াটার ওয়ার্কসের নল, জলের অপচয় কিসে নিবারণ হয়, মীটার, ওয়াটার ওয়ার্কস সম্বন্ধে সচরাচর ব্যবহৃত যন্ত্রাদি, কতিপয় সহরে জলসরবরাহের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।*

গীতগোবিন্দ শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যকৃত পদ্যানুবাদ। যখন কোন চিত্রকর একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের সন্ধ্যাকালের সৌন্দর্য্য আঁকেন, তখন তাঁহাকে অনেক রং ফলাইয়াই সেই রংগুলির বৈচিত্র এবং বিশেষত্বের দ্বারা কালোচিত সৌন্দর্য্যটুকু ফুটাইয়া তুলিতে হয়। চিত্রের নকল করিতে গিয়া কেহ যদি রংটুক উপেক্ষা করিয়া গাছ পাহাড় নদী প্রভৃতির নকল করেন, তবে কি সেই চিত্রে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিন্দুমাত্র আভাসও পাওয়া যাইতে পারে? জয়দেব কবি মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর রং ফলাইয়া যে চিত্র আঁকিয়াছেন, কেবল কথার ভাবে বা যথার্থ অর্থে তাহার তিলমাত্র আভাস দেওয়াও অসম্ভব। বিশ্বেশ্বর বাবুর অনুবাদ খুব যথাযথ হইয়াছে; কিন্তু নূতন শব্দ এবং ছন্দে জয়দেবের সৌন্দর্য্য কিছুমাত্রও লক্ষিত হইল না। উহাতে "বিগলিত বসনের" অসৌন্দর্য্যটুকুই ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখক বেশ উপযুক্ত ব্যক্তি; পরিশ্রমও করিয়াছেন যথেষ্ট; অথচ অনুবাদে সুফল ফলে নাই।

প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত হরিমোহন বিদ্যাভূষণ, গীতগোবিন্দের একটি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহাতে যে অনুবাদ আছে,

* প্রকাশকগণ এই পুস্তক প্রবাসীর গ্রাহকগণকে ন্যূন মূল্যে দিবেন। অন্যত্র বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

তাহার বিশেষত্ব এই যে, যে সকল স্থলে সংস্কৃত সমাস বা শব্দের অর্থের জন্য সাধারণ পাঠকের কবিতা বুঝিবার কষ্ট হয়, সেটুকু পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আছে। কাজেই মূলটি, ঠিক বাঙ্গালা রচনার মতই ঐ অনুবাদের সাহায্যে পড়িতে পারা যায়। ছন্দ এবং শব্দ সুরক্ষিত রাখিয়া যদি পদ্যানুবাদ করা না চলে, তবে এ প্রকার অনুবাদই প্রশস্ত।

একালের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দিনে, বিশেশ্বর বাবুর ভূমিকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি কথা বলিব। প্রায় ২৭ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে একজন ভক্ত বৃদ্ধ বৈষ্ণবকে কৃষ্ণলীলার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, স্বয়ং ভগবান, নরদেহ ধারণ করিয়া ঠিক সেই সেই কার্য্যে প্রীতিলাভ করিতেন, যাহা সাধারণ লোকের কাছে প্রিয়। একজন বড়লোক আসিয়া যদি গরিবের ঘরের খুদ খাইয়া তৃপ্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে গরিবের কত আনন্দ হয়। ভগবান যে নরগৃহের লীলায় তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন, এই কথা ভাবিয়াই সেই বৃদ্ধ ভক্তের চক্ষুতে জলধারা বহিত। তিন বৎসর পরে বৃন্দাবনেও এক বৈষ্ণবভক্তের মুখে ঠিক ঐ কথা শুনিয়াছিলাম। ইহাতে কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চলে না। জয়দেবের রচনা-ভঙ্গী দেখিয়া তাহাকেও এ শ্রেণীর ভক্ত কবি বলিয়া মনে হয়। বিধাতার কাছে যখন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করা চলে, তখন যৌবন সমর্পণে দোষ হয় না, অনেক বৈষ্ণবই এইরূপ বুঝিয়া থাকেন। যে ভাবে যাহা রচিত, তাহা সেই ভাবেই বুঝিয়া লওয়া ভাল; পরিবর্ত্তিত রুচির ফলে অন্য অর্থ করা সুবিধাজনক নয়।

Hinduism Ancient and Modern—রায় বাহাদুর লালা বৈজনাথ, বি-এ, প্রণীত। যাহাতে দেশের মঙ্গল হয়, দেশের লোকে সুসংস্কৃত মত অবলম্বন করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, এই শুভ সংকল্পে গ্রন্থকার সরল এবং শুদ্ধ ইংরাজি ভাষায় গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রদান, বিধবার বিবাহ, জাতিভেদ বর্জ্জন, সমুদ্র যাত্রার প্রয়োজন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সামাজিক সংস্কারের পক্ষে তিনি অনেক কথা লিখিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তার মূল মতগুলির সহিত সমালোচকের সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকিলেও, সমালোচনার সময়ে গ্রন্থের দোষ গুণের বিচার না করিলে চলে না। এই শ্রেণীর যত গ্রন্থ দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে লালা বৈজনাথ বাহাদুরের গ্রন্থ অতিশয় যোগ্যতার সহিত লিখিত।

কিন্তু এই শ্রেণীর সকল গ্রন্থ পড়িয়াই কয়েকটি ত্রুটির কথা মনে পড়ে; সেগুলির কিঞ্চিৎ আভাস দিব। রোগ সম্বন্ধে সাধারণ ঔষধের ব্যবস্থা থাকিলেও, রোগীর ব্যক্তিনিষ্ঠ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যেমন চিকিৎসা প্রণালীতে একটু প্রভেদ রাখিতে হয়, তেমনি জাতি-নিষ্ঠ বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমাজ সংস্কার ধর্ম্মসংস্কার প্রভৃতি করা উচিত। এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এবং সমাজ সম্বন্ধে সকল প্রকার আদর্শই যে প্রাচীনকাল হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া না দিলে চলিবে না, এ কথা স্বীকার করা সহজ হয় না। ঐ প্রকার চেষ্টার ফলে, অনেক সময়ে এমনও ঘটে যে, আমরা একালে যাহা হিতকর বলিয়া মনে করি, যদি ঠিক তাহা প্রাচীনকালের অনুষ্ঠানে খুঁজিয়া না পাই, তাহা হইলে কোন প্রকারে প্রাচীন ইংরাজি আইনের Legal fictionএর মত, জোড়াতালি দিয়া একটি কল্পিত ব্যাখ্যার বলে, কোন একটা কথাকে নূতন আদর্শের অনুরূপ জিনিষ বলিয়া খাড়া করিতে হয়। ইহাতে একদিকেও ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়, অন্য দিকেও আবার সুফল ফলে কি না সন্দেহ।

গ্রন্থকার, বেদান্তবাদটি যেরূপ বুঝিয়াছেন, তাহাই আদর্শ হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখানে প্রথমতঃ আদর্শ কথার অর্থ কি? গ্রন্থকার যাহা আদর্শ বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহাই? গ্রন্থকার একস্থলে বলিয়াছেন যে, এ দেশের অধিকাংশ লোক ঐ ধর্ম্মকে আদর্শ ভাবিয়া থাকেন। তাহা ঠিক কি? খুব প্রাচীনকালের ইতিহাসে দেখিতে পাই, যে, শঙ্করব্যাখ্যাত অদ্বৈতবাদ এ দেশে ছিল না; অথবা অতি অল্প লোকের বিশ্বাসে ছিল। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাই যে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার ধর্ম্মমত এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। ভারতসমাজে ব্রাহ্মণেরা মুষ্টিমেয় ছিলেন; এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ বা শাস্ত্রের আদর্শও অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে বদ্ধ ছিল। কালক্রমে দেশব্যাপী ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণেরা নূতনবিধ পৌরাণিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন। এখনও এ দেশে আর্য্য অনার্য্য এবং মিশ্র জাতির মধ্যে বিবিধ রকমের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। গ্রন্থকার যদি বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বৈদান্তিক ধর্ম্মই সত্য, তবে তিনি তাহা অবশ্যই প্রচার করিবেন। কিন্তু অধিকাংশের মত বলিয়া, যদি উহার প্রচার প্রার্থনা করেন, তবে প্রাচীন এবং আধুনিক সমাজের ভোটে উহা দাঁড়াইতে পারে না। ব্রাহ্মণদিগের যে কয়েক খানি শাস্ত্রগ্রন্থ রহিয়া গিয়াছে, উহা হইতেই যে এ দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম এবং সমাজের অবস্থা জানা যায়, ইহা ঠিক নহে। লোকসাধারণের মধ্যে (কেবল অনার্য্য নহে, অধিকাংশ আর্য্য জাতীয়ের মধ্যেও), কি প্রকার ধর্ম্মমত এবং অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, তাহা প্রাচীন প্রাকৃত ও পালি সাহিত্যে অনেক পরিমাণে জানা যায়। সমাজের যথার্থ চিত্র এবং অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের কথা অপেক্ষা, ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের আদর্শ এবং অনুষ্ঠিতব্য ব্যবস্থার কথা বেশী।

তাহার পর জাতীয় ধর্ম্ম কথাটার সব সময়ে অর্থবোধ হয় না। দেশের সকল লোককে কি এমনি করিয়া এক ছাঁচে ঢালিয়া লওয়া সম্ভব যে, ঈশ্বর এবং পরলোক সম্বন্ধে সকলের একরকম বিশ্বাস থাকিবে? এবং সেই বিশ্বাস দেশের কোন প্রাচীন মতের অনুরূপ হইবে? বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে বৈদিকধর্ম্ম ছাড়াও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে বেদবহির্ভূত ৬২।৬৩টি স্বাধীন ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল; এবং স্বাধীনভাবে সকলে তাহা লইয়া নিঃসঙ্কোচে বিচার করিতেন। রীস ডেবিড্‌স্ প্রাচীন ভারতের এই মতবিষয়ক স্বাধীনতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এখন সকলের সুপরিচিত। এই বৈচিত্র্য এবং স্বাধীনতা হইতেই সমাজের স্বাস্থ্য এবং উন্নত জীবন সূচিত হয়।

মনে করুন যে কোন লোক মুক্তির জন্য বিশ্বাস করিল, যে যথার্থই যীশুখৃষ্ট ঈশ্বরের অবতার। কাহারো বিশ্বাসের উপর আমার হাত নাই। এখন খৃষ্টবিশ্বাসীকে আমরা সমাজ হইতে তাড়াইয়া দিব, না সমাজে রাখিব? আমার স্বযত্নরচিত ধর্ম্মের পেটেন্ট ঔষধি যদি সে ব্যক্তি কিনিতে না চায়, এবং বাইবলের বটিকা যদি সে উপযোগী মনে করে, তবে আমি তাহাকে বাধা দিবার কে? যে সমাজে নির্ব্বিবাদে সকল প্রকারের মত বর্দ্ধিত হইতে পারে না, সে সমাজ কি আদর্শ সমাজ? জাতীয়ত্বের জন্য একটা প্রাচীন ধর্ম্মমত গ্রহণ না করিলে চলে না, বলা উচিত; না, মতের স্বাধীনতার যে যাহা ভাল মনে করে, তাহাই তাহার আদর্শ হইতে দিয়া সমাজ-শরীরকে জীবন্ত এবং সুস্থ করা উচিত? ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিব। বিশ্বাস কথার অর্থ এই যে, যে যাহা সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছে; তখন, একথা বলা চলে না, যে তোমার মত যাহাই হউক, তুমি দশজনের জন্য, জাতীয়তার জন্য, এক রকমের পূজা অনুষ্ঠান কর। গ্রন্থকার ভগবানের উক্তি দ্বারা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছিলেন যে, "যে যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই আমাকে পূজা করুক, সে আমাকে পাইবে। কারণ সকল নদীই সমুদ্রে পড়ে।" অনেকে ঐ সত্যটায় বিশ্বাস না করিতে পারেন। তাঁহাদের জন্যও ত সমাজে একটা ব্যবস্থা চাই? তাহার পর ভগবান্‌প্রদর্শিত "কারণটা" কোন লোকই ঠিক বলিয়া ভাবিতে পারে না। ভগবানের ভূগোলটি

তত সুবিধার নহে। সকল নদীই সমুদ্রে পড়ে না। অনেক নদী একেবারে মরুক্ষেত্রে শুকাইয়া যায় এবং অনেক নদী সাগরসম্পর্কশূন্য হ্রদে পড়িয়া থাকে। কথাটা সত্য মিথ্যা যাহাই হউক, ঐ প্রাচীন ভুল দৃষ্টান্তটা কারণরূপে প্রযুক্ত না হইলেই ভাল হয়।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা, সামাজিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও তাহাই। যাহা ভাল মনে করিব, তাহা যদি স্বাধীন ভাবে বিচার করিতে না পারি, যাহা হিতকর বলিয়া ভাবি, যদি জাতীয়তার মোহে তাহার অনুষ্ঠান করিতে না পারি, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। এ সত্য, অমুক দেশে জন্মিয়াছে, অতএব উহা গ্রহণ করিব না; একথা বড় সংকীর্ণ। প্রাচীন শাস্ত্রে থাকুক বা নাই থাকুক আমরা যেন হিতকর কার্য্য হইতে দূরে না থাকি। ভাল কথায় স্বদেশ বিদেশ কি, তাহা বুঝিতে পারি না। পরলোক সম্বন্ধে খৃষ্টানের মত, যদি কেহ সত্য বলিয়া বুঝিল, এবং উপনিষদেয় ঋষিবচন গ্রহণ না করিল, তাহা হইলে তাহার জাতীয়ত্ব নষ্ট হইবে কেন? আমার মনে হয় যে জাতীয়ত্ব লাভ এবং মুক্তির নামে, আমরা অনেক সময়ে সংকীর্ণ কারাগারের মধ্যে আমাদের বন্ধনের ব্যবস্থাই করিয়া থাকি।

জাতীয়ত্বের মূল স্বদেশ-প্রেমে; পর বিদ্বেষে নহে। যাহা সত্য এবং যাহা সুন্দর, তাহা যে দেশেই বিকশিত হইয়া থাকুক, স্বদেশ-প্রেমের উত্তেজনায় তাহা স্বদেশীয়দিগকে আনিয়া দিতে হইবে। এ বিষয়ে সুবিচার চাই, ধীরতা চাই, তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাই বলিয়া যেন স্বদেশকে ভালবাসার নামে সংকীর্ণ কারাগারে পিশিয়া না মারি।

ছেলেদের গল্প। শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত। এই সচিত্র সুন্দর গল্পের বহিখানি সর্ব্বাংশেই বালকবালিকাদের পাঠের উপযোগী হইয়াছে। ছয় আনা মূল্যও বেশী নহে।

তপস্যার ফল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ছবি দেখা।

মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর, সুশীলচন্দ্র তাঁহার মাতাকে লইয়া রায়-গৃহে আসিয়াছেন; এবং রায় মহাশয়েরাও একবার সপরিবারে তাঁহার গৃহে গিয়াছিলেন। এইরূপে আত্মীয়তা বাড়িবার পর সুশীলচন্দ্র একদিন রায় মহাশয়ের নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বোনার্জিও নিমন্ত্রিত ছিলেন। বোনার্জির সহিত পূর্ব্ব হইতেই সুশীলের পরিচয় ছিল। সে পরিচয়, সুশীলের কলেজ পরিত্যাগের সময়ে ঘটে। কাছে কোন বই পড়িয়া থাকিলে অন্যমনস্ক ভাবে সেখানি লইয়া পাতা উল্টাইবার রোগটা সুশীলের একটু বেশি ছিল। একবার এই অভ্যাসের দোষে, এল্‌বাম্ খুলিয়া গোলে পড়িয়াছিলেন। আজি যে খানির পাতা উল্টাইতেছিলেন সেখানি একটি বিলাতি মাসিকের খৃষ্টমাস সংখ্যা।

বোনার্জি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সুশীলচন্দ্র কাহারো কোন কথা কানে না তুলিয়া, নিবিষ্টচিত্তে কোন একখানি ছবি দেখিতেছেন, তখন তাঁহাকে একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ছবি মশাই?" সুশীলচন্দ্র চিত্রটি দেখিয়া যথার্থই বড় মুগ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি তাঁহার সৌন্দর্য্যমুগ্ধ চক্ষু দুইটি তুলিয়া গভীর অনুরাগব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "ভারি চমৎকার।" কাজেই ছবিখানি দেখিতে সকলেরই কৌতূহল জন্মিল। রায়-জায়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ছবি, সুশীল?" তখন তিনি চট্ করিয়া উঠিয়া রায়-জায়ার সম্মুখে ছবিখানি রাখিয়া তাহার বর্ণনা করিতে বসিলেন। এতটা প্রগলভতা তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ নহে; কিন্তু "মুগ্ধা" রমণীরাও ভাবমুগ্ধা হইলে কখনো কখনো "প্রগলভা" হইয়া থাকেন। সকলেই ছবিটি ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; কিন্তু সুশীলচন্দ্র তাহা আদৌ লক্ষ্য না করিয়া ছবিটির ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

চিত্রের বিষয়টি এই:— একটি পঙ্করিণীতে অতি অল্পই জল ছিল, কিন্তু কাদা ছিল খুব বেশি। একটা শূকর সেই কাদায় গড়াগড়ি দিতেছে, এবং তাহার পার্শ্বেই একজন লোক একহাঁটু কাদায় দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া আছে। আকাশের খুব ঊর্দ্ধে দু'একটি চিল উড়িতেছিল। চিত্রটি ইতিপূর্ব্বে রায় পরিবারের সকলেই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই উহার বিশেষত্ব বা সৌন্দর্য্য অনুভব করেন নাই। চিত্রের লোকটির দৃষ্টিতে যে এ কথা সূচিত হইতেছিল যে, শূকরের মত পঙ্কনিমগ্ন হইলেও সে ঊর্দ্ধগগনচারী পাখীরও অনেক ঊর্দ্ধে ভাবের পাখা বিস্তার করিয়া উড়িতেছিল, তাহা কেহ পূর্ব্বে অনুভব করেন নাই। ছবিটি যখন নূতন সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইল, শ্রীমতী সুশীলা দেবী তখন বিস্ফারিত নেত্রে চিত্র দর্শন করিতে লাগিলেন; এবং মিষ্টার বোনার্জি সুশীলা দেবীর চিত্রমুগ্ধ সৌন্দর্য্যচিত্রে মনোনিবেশ করিলেন।

মিষ্টার রায় যখন, "বেড়ে ছবি" বলিয়া আসনগ্রহণ করিলেন, তখন সুশীলা এবং বোনার্জি ছবি দেখা হইতে নিরস্ত হইলেন; এবং সকলেই আপন আপন আসনে গিয়া বসিলেন। নরেন তখন তাহার সেই পরিচিত ছবির বই খানিতে, যেখানে একটা বিড়াল, অন্য বিড়ালকে;

তাড়াইয়া আহারসংগ্রহের জন্য লেজ ফুলাইয়া এবং দাঁত খিঁচাইয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছিল, সেই ছবিটি খুলিয়া আনিয়া সগর্ব্বে সকলকে দেখাইল। তাহার ধারণা যে, সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছবি। সকলেই যখন স্বীকার করিলেন যে, বিড়ালের ছবিই ভাল, নরেন তখন দিদির কোল আশ্রয় করিয়া ছবির বইখানি দিদির হাতে দিল। বোনার্জি সুশীলচন্দ্রকে বলিলেন, "আপনি বোধ হয়, ভাল ছবি আঁকতে পারেন।" সুশীলের মনে হইল যে, ছবিটি লইয়া তিনি যেন একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন; হয় ত বা শিষ্টাচারের সীমালঙ্ঘন করা হইয়াছে। লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "না মশাই, আমি কদাপি ছবি আঁকি নাই।" মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কখনো কাহারো ঘরে গিয়া এমন করিয়া বই ঘাঁটিবেন না।

রায়-জায়া যখন অতিথিদ্বয়ের সেবার উদ্যোগের জন্য উঠিলেন, মিষ্টার রায় তখন বোনার্জির সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে তাঁহাকে লইয়া অফিস-ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। সুশীলচন্দ্র তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সুশীলা দেবীর সঙ্গে কথা কহিবার উদ্যোগ করিয়া বলিলেন, "আপনারা কিছু মনে কর্ব্বেন না; ছবির কথাটা নিয়ে বড়ই বাড়াবাড়ি করে তুলেছিলাম।" সুশীলচন্দ্র যদি কথা কয়েকটি সুশীলা দেবীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সস্নেহ দৃষ্টিতেই আশ্বস্ত এবং প্রীত হইতে পারিতেন। দেবী হাসিয়া বলিলেন, "আপনি বুঝিয়ে না দিলে, আমরা কেউ ছবিটার ভাব বুঝতেই পাত্তাম না।" সুশীলচন্দ্র একটু মাথা চুলকাইয়া লইলেন। সুশীলা দেবী আবার কহিলেন, "আপনি সে দিন যে গানটা গেয়েছিলেন, সেটি আমাকে একদিন লিখে দেবেন; মা বলেছিলেন যে, আর একদিন আপনার গান শুনবেন।" নরেন বলিয়া উঠিল, "আজকেই গাইতে হবে।" সুশীলচন্দ্র তখন নরেনের দিকে, এবং হয় ত সে যাঁহার কোলে বসিয়াছিল তাঁহার দিকেও সানুরাগ এবং সস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

মিষ্টার বোনার্জি এমন সময়ে ফিরিয়া আসিয়া সুশীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি নাকি শীঘ্রই বিলাত যাবেন?" এই সংবাদটি ভোলানাথ বাবু কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। সুশীলচন্দ্র বলি ন, "আমার যাবার ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু মার নিতান্ত অনিচ্ছা; তাই যাওয়া হবে না।" বোনার্জি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা ব্রাহ্ম; না?" সুশীল এই এক প্রশ্নের পর অন্য প্রশ্নের সঙ্গতি বুঝিতে পারিলেন না। "হাঁ" বলিয়া জবাব দিয়া, অন্য কথা তুলিবার জন্য বলিলেন, "আপনার যখন অবকাশ থাকে, তখন একদিন আপনার বাড়ীতে যাব।" বোনার্জি এবং সুশীল যখন কথা কহিতেছিলেন, সুশীলা দেবী তখন নরেনের পিঠে হাত বুলাইতেছিলেন, এবং ছবির বইখানি খুলিয়া, সম্ভবতঃ সেই পূর্ব্বকথিত ছবিখানি দেখিতেছিলেন। বোনার্জি যেন তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া এ কথা সে কথা উত্থাপন করিতেছিলেন। তাহার পর সুশীলা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওতে আরো অনেক ছবি আছে, হয় ত।" সুশীলা তখন ছবির বইখানি আনিয়া বোনার্জিকে দিলেন। বোনার্জি সধন্যবাদ গ্রন্থখানি লইয়া অন্যমনস্ক হইয়া ছবি দেখিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের সংবাদ।

মথুরা হইতে বৃন্দাবন, ৬ মাইল পথ। বৃন্দাবনের গোপিনীরা মথুরার হাটে দুধ দই বেচিতেও আসিতেন। তবুও মা যশোদা, শ্রীকৃষ্ণের সেই মথুরা নামক বিদেশবাসে অধীরা হইয়া, "আমার নীলমণি কোথা গেলিরে", বলিয়া কত মড়াকান্নাই কাঁদিতেন। সুশীলচন্দ্রের জননী, সেই মা যশোদার দেশের লোক; তিনি যে ছেলের বিলাতযাত্রায় বাধা দিবেন, ইহাতে কিছুমাত্র বিস্ময়ের কথা নাই। ছেলে যখন মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই অদ্ভুত প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন পুত্রের মাদ্রাজযাত্রার সময় যে ক্ষুদ্র ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল শুনিয়াছিলেন, তাহা সুশীলচন্দ্রের জননীর কল্পনায় মহাপ্রলয় সাজিয়া দাঁড়াইল। ছেলেকে একেবারে জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তা হবে না বাবা!" বাবাটিও নিরুপায় হইয়া সে সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন।

মার মন হইতে আতঙ্ক দূর হইল না। ছেলেগুলি টিয়ে পাখীর জাতি; পায়ে শিকল না দিলে চলে না। সুশীলের পায়ে একগাছি সোণার শিকল দিবেন ভাবিয়া অনেক পাত্রী অনুসন্ধানের পর অভয়বাবুর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন। মেয়েটি দেখিতে শুনিতেও ভাল,

লেখাপড়াও শিখিয়াছে। অভয়বাবু পাটনায় চাকুরি করেন, মেয়েটি সেখানে থাকে। সুশীলার মা, কলিকাতায় তাহাকে দু'তিনবার দেখিয়াছিলেন। একালের কোর্টশিপ্ যে রকমে হইয়া থাকে, তাহার ব্যবস্থা হইল। অর্থাৎ বিবাহ হইবে কথা দিয়া, সুশীলের মাতা, মেয়ে দেখিতে সুশীলকে একবার পাটনা পাঠাইবেন, স্থির করিলেন। এমনও হইবার সম্ভাবনা ছিল, যে অভয়বাবু মেয়ে লইয়া নিজেই একবার কলিকাতা আসিবেন।

ভোলানাথ বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের যে কয়েকটি মূল সত্যে বিশ্বাস করিতেন, তাহার মধ্যে একটি এই যে অমুকের সঙ্গে অমুকের বিবাহ-সম্বন্ধ হইয়াছে, এসংবাদ যিনি সর্ব্বাগ্রে সংগ্রহ করিয়া অন্য লোককে শুনাইতে পারেন, তিনি ভারি বাহাদুর। ভোলানাথ বাবু রায় পরিবারে এই সংবাদ প্রচার করিয়া বাহাদুরি লাভ করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। রায়-জায়ার ইতিপূর্ব্বে দু'একবার মনে হইয়াছিল, যে বোনাজ্জির সঙ্গে যদি সুশীলার বিবাহ না হয়, তবে সুশীলের সঙ্গে হইলে বেশ হইত। কাজেই তিনি সংবাদটা শুনিয়া বিশেষ কিছু বলিলেন না। সুশীলা দেবী কিন্তু সংবাদ পাইবা মাত্র মার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বেশ্ হবে; না, মা?" মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "বেশ হবে কি না, কি করে বলব? আমি ত মেয়ে দেখি নাই!" সুশীলাও দেখেন নাই; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস, যে ভাল মেয়ে না হইলে কি আর বিবাহ স্থির হইয়াছে? মেয়ের নাম কি, দেখিতে কেমন, কতদূর পড়িয়াছে, এসকল কথা জানিবার জন্য সুশীলার ভারি কৌতূহল জন্মিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যে পাটনা, এবং অভয়বাবু ছাড়া, ভোলানাথ বাবুর আর কিছুই জানা ছিল না! তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে অচিরাৎ সকল সংবাদ সংগ্রহ করিবেন।

রায় মহাশয় সংবাদটি শুনিবার পর, ভোলানাথ বাবু কর্ত্তৃক টেবিলে রক্ষিত একখানি সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ভোলানাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের সমাজের উৎসব যে পরশু থেকেই আরম্ভ হবে দেখ্ছি। ১৫ দিন ধরে কি হবে মশাই?" ধর্ম্মকথা শুনাইবার সবিশেষ সুযোগলাভ করিয়া ভোলানাথ বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "পরশুদিন সকল ব্রাহ্মের ঘরেই সমাজের কল্যাণের জন্য উপাসনা হবে। আপনি যদি বলেন, ত আমি সেদিন এখানে এসে উপাসনা করি।" রায় মহাশয় একটু গোলে পড়িয়া বলিলেন, "আপনি এক দিন এসে উপাসনা কর্ত্তে পারেন—তা—ক্ষতি কি? কিন্তু; আমরা ত ব্রাহ্ম নই!" ভোলানাথ বাবু এবার সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "আপনি পরমেশ্বরে বিশ্বাস করেন, জাতিভেদ মানেন না, আপনার পক্ষে—" রায় মহাশয় একটু হাসিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "অত কথায় কাজ কি? আপনি এসে উপাসনা কর্ব্বেন; আর এখানেই আহার কর্ব্বেন।" এমন মিষ্ট কথায় বন্যাসিংহও গ্রাম্যসিংহ হইয়া যায়।

ভোলানাথ বাবুর সকল প্রস্তাবেই বেশ একটু মৌলিকতা থাকিত। তিনি রায় মহাশয়ের সম্মতিতে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "সে দিন সুশীলকেও নিয়ে আস্ব; সে গান গাবে, আর আমি উপাসনা কর্ব্ব।" রায় মহাশয় একটু অসাবধানে বলিয়া ফেলিলেন, "তা, সে ভদ্রলোকের ছেলেকে টানাটানি করে কি হবে?" কি সর্ব্বনাশ! উপাসনা করিতে আসে কি তবে চাষার ছেলেরা? ভোলানাথ বাবু কথাটা ধরিলেন না; কিন্তু রায়, রায়-জায়া এবং সুশীলা একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। সুশীলা তখন তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আমি দু'চারিটি গান শিখেছি, আমিই না হয় গাবন" ভোলানাথ সেদিন অত্যন্ত সন্তোষ সহকারে বিদায়গ্রহণ করিলেন।

ভোলানাথ বাবু বিদায় হইবার পর মিষ্টার রায় নরেনকে লইয়া সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়া গেলেন। সুশীলা দেবী তখন মেরীকে ডাকিয়া একটু গল্প করিবেন মনে করিয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন, সে কোচোয়ানের ঘরে বসিয়া অনুপস্থিত কোচোয়ানের হুঁকায় নির্ব্বিবাদে তামাকু সেবন করিতেছে। আর তাহার দিকে তাকাইতে প্রবৃত্তি হইল না; একাকিনী নিজ কক্ষে একটি আলো জ্বালিয়া সেদিনকার সেই ছবির বইখানি দেখিতে লাগিলেন। ছবি দেখিতে দেখিতে সহসা নিদ্রাভিভূতের মত ঢলিয়া পড়িয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

তাঁহার মনে হইল, যেন তিনি পৃথিবীর ধূলিপঙ্কের বহু উর্দ্ধে উড়িতেছেন। রথাবতরণের সময় দুষ্মন্তের চক্ষে ধরিত্রী

যেমন হরিৎ-গোলকের মত দেখাইতেছিল, পৃথিবীটি তেমনি দেখিতেছিলেন। পৃথিবী ধূলিশূন্য, পবনপ্রবাহে ঝটিকা নাই, এবং সূর্য্যকিরণ, আকাশের স্নিগ্ধ নীলিমার স্পর্শে শীতল হইয়া রজতধারার মত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ঝরিয়া পড়িতেছিল। সুশীলা যেন পরীর মত পাখা নাড়িয়া, পৃথিবীর উদ্ধে এবং মেঘের উর্দ্ধে মেঘের মত ভাসিয়া যাইতেছিলেন, এবং যাইতে যাইতে পাখীর মত গাহিতেছিলেন,—"ওহে সুন্দর, চির সুন্দর!" অনেক দূর ভাসিয়া যাইবার পর মনে হইল, যেন তিনি আবার নীচে নামিতেছেন, এবং পৃথিবীর শ্যাম-সৌন্দর্য্যের মধ্যে ধূলি ও কর্দ্দম দেখা যাইতেছে। দেখিলেন, একস্থানে কর্দ্দমরাশির মধ্যে মেরী বাউরী শূকর সাজিয়া গড়াগড়ি দিতেছে। মেরীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেরী, এ কোন্ স্থান?" মেরী যখন কাদা ছড়াইতে ছড়াইতে বলিল, "এটা পাটনা সহর," তখন সুশীলার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

যে মুহূর্ত্তে সুশীলা দেবী এই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পূর্ব্বকৃত অনুরোধে, সুশীলচন্দ্র, "ওহে সুন্দর, চির সুন্দর," গানটি একখানি কাগজে যত্নপূর্ব্বক লিখিতেছিলেন, এবং মিষ্টার বোনার্জি, সিগারেটের ধূঁয়ায় গৃহ সুবাসিত করিয়া সুশীলার উদ্দেশে সনেট্ লিখিবেন ভাবিতেছিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ষ্টীমার পথ।

মিষ্টার বোনার্জির সহিত পরিচিত হইবার পর, ভোলানাথ বাবু দুই একবার তাঁহার গৃহে যাইতে ভুলেন নাই; এবং কখনো কখনো ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া তর্কও করিয়াছেন। সুশীলের বিবাহের কথা রায় পরিবারে প্রচার করিবার পর, বোনার্জিকেও একদিন সে কথা শুনাইয়াছিলেন। ভোলানাথ বাবুর অন্য কোন সংবাদে বা সাধুপ্রসঙ্গে বোনার্জি যে কখনো তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস নাই; কিন্তু এ সংবাদ পাইবার পর, বিশেষ জিদ্ করিয়া ভোলানাথ বাবুকে দু'কাপ্ চা এবং বিবিধ খাদ্য আহার করাইয়াছিলেন। ভোলানাথ বাবুকে বিদায় দিয়া চট্ করিয়া এক খানি গাড়ি ভাড়া করিয়া, বোনার্জি রায় গৃহের দিকে ছুটিলেন।

চুরুটের ধূঁয়ায় গাড়ী পূর্ণ করিয়া; এবং প্রফুল্লতায় চিত্ত পূর্ণ করিয়া যখন গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন দরোয়ানের মুখে সংবাদ পাইলেন, যে মিষ্টার রায় সপরিবারে কলিকাতা হইতে মফঃস্বলে চলিয়া গিয়াছেন। বোনার্জি তখন ক্ষুণ্ণ মনে দরোয়ানের সেলাম মাত্র লাভ করিয়া গাড়ীখানি বিদায় দিয়া পদব্রজে অনির্দ্দিষ্ট পথে সান্ধ্যভ্রমণে চলিলেন।

মিষ্টার রায় মেদিনীপুরে একটা বড় মোকদ্দমা পাইয়াছিলেন। সংবাদটা পাইবা মাত্র সুশীলা দেবী জিদ্ করিলেন, যে তাঁহারা সকলেই মেদিনীপুরে যাইবেন। সুশীলা কোন কথা বলিলে রায় মহাশয় কদাপি তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না; বিশেষতঃ এই সময়ে রায়-জায়ার পক্ষে কলিকাতা বাস তত উপযোগী নহে বলিয়াও তাঁহার ধারণা ছিল। যখন স্থির হইয়া গেল, যে সকলে মিলিয়া মেদিনীপুরে যাইবেন, তখন সুশীলা বলিলেন, "বাবা, তুমি আমাদের কলিকাতা পরিত্যাগের সংবাদটা চারিদিকে প্রচার কোরো না; মেদিনীপুরে গিয়ে যাকে হয় চিঠি লিখো।" বাবা স্বীকৃত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেন। রায় সাহেব বুঝিতে পারিলেন, যে কলিকাতার সামাজিকতায় সুশীলার অনুরাগ নাই।

ষ্টীমারে গঙ্গা এবং কেনাল পথে যাইবার সময় মাষ্টার নরেন, প্রতি দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া সহানুভূতিলাভের জন্য দিদিকে কত কথা বলিত; কত কিছু দেখাইত; কিন্তু এবারে দিদি একটু গম্ভীর। "ঐ দেখ, কেমন ছোট নৌকা খানি; কি চমৎকার শাদা পাখীটি; ছেলেরা কেমন সাঁতার কাট্ছে, দেখ:" প্রভৃতি কথায় সুশীলা কেবল একটু ঠোট হেলাইয়া হাসিতেন, এবং হাঁ হাঁ করিতেন; কিন্তু সুশীলা দেবীর প্রকৃতিনিষ্ঠ প্রফুল্লতা, নরেনের কৌতুকপ্রদ দৃশ্যগুলিকে মনোহর করিয়া তুলিত না। নরেন তাহা অনুভব করিয়া অপরাহ্ণ সময়ে দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবৃছ দিদি?" দিদি সতর্ক হইলেন। তাঁহার মাথায় ভাবনা ঢুকিয়াছে, এ কথা যখন নরেন্ বুঝিয়াছে, তখন পিতা মাতাও হয় ত তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। হাসিয়া নরেনকে বলিলেন, "একটা গান্ শুন্‌বি?" নরেন আগ্রহে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। সুশীলা তখন নরেনের মুখের কাছে মুখ লইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিলেন, "একটা ফড়িং

ধরেছি।" মাষ্টার নরেনের আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না।

সুশীলা যখন ভাইটীকে ভুলাইবার জন্য বারোঁয়া ভাঁজিতেছিলেন, মিষ্টার রায় তখন কেবিনের মধ্যে বসিয়া পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন "বোনার্জির প্রতি কি সুশীলার অনুরাগ হচ্চে বলে মনে হয়?" রায়-জায়া ভাবিলেন, যে সুশীলা ত সকলের সঙ্গেই সদ্ব্যবহার করে, কাহারো প্রতি উহার বিরাগ আছে দেখিতে পাওয়া যায় না; অনুরাগের কোন বিশেষ লক্ষণও দেখা যায় নাই। কাজেই কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "কিছুতো বুঝ্‌তে পাচ্চিনে; দেখা যাক্, যা হবার তাই হবে।" রায় মহাশয় আবার বলিলেন, "কদিন থেকে সুশীলা যেন কি ভাবছে বলে মনে হয়; নয়?" পত্নী মাথা নাড়িলেন; কিন্তু কিছু বলিলেন না। রায়-জায়ার আবার একটু স্বাস্থ্যভঙ্গের শঙ্কা হইয়াছিল: হয় ত সেই জন্যই সুশীলার এই চিন্তা। হয় ত, সেই জন্যই সুশীলা কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার জন্য জিদ্ করিয়াছিল। পতি পত্নী সেই কথাই মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন।

এই সময়ে ডেকের এক প্রান্তে একজন যাত্রী গায়ের র‍্যাপারখানির উপর একখানা কম্বল জড়াইয়া তামাকু সেবনের উদ্যোগে টিকে ধরাইতে ধরাইতে আশু চিত্তবিনোদনের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া মন এবং গলা খুলিয়া গান ধরিল। তাহার সহযাত্রীটি সঙ্গীত বিদ্যায় কতদূর পারদর্শী ছিল, জানি না। কিন্তু লোকসমক্ষে হয় ত দেখাইবার প্রয়োজন, যে তিনিও ঐ বিদ্যায় বড় ফেলা যান্ না; কাজেই সে তাহার বোঁচ্‌কাটিকে তবলার প্রতিনিধি করিয়া তাহাতে চপেটাঘাত করিতে লাগিল; এবং মাথা দোলাইতে লাগিল। লোকটি গাহিতেছিল বেশ। সুশীলা দেবী, তখন নরেন্‌কে বলিলেন, "ঐ শোন্, গান শোন্।" নরেন্ গায়কের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, কিন্তু তাহার দিদি, সেই গানের সঙ্গে আপনার কত কথা জুড়িয়া কূলের দিকে চাহিয়া কত কিছু ভাবিতে লাগিলেন। গায়ক একটি অতি পুরাতন গান গাহিতেছিল; "মনে রৈল সৈ, মনের বেদনা।" গায়কের মনের বেদনা কি, তাহা সেই জানিত; এবং সে বেদনাটুকুও তামাকের শেষটানে একেবারে মিটিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সুশীলা তাঁহার বেদনার আশু নিবৃত্তির কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না।

গানটি যে কখন থামিয়া গেল, এবং বোঁচ্‌কার ডুড়্ ডুড়্ শব্দের পরিবর্ত্তে হুঁকার গুড়্ গুড়্ ধ্বনি উঠিল, সুশীলা দেবী তাহা লক্ষ্য করেন নাই। মাষ্টার নরেন যখন বলিল, "চল দিদি মার কাছে যাই," সুশীলা তখন নরেনের ডাইন হাতের আঙ্গুল গুলি টিপিতে টিপিতে কেবিনে প্রবেশ করিলেন। ষ্টীমারখানি সকলের সুখ দুঃখ উপেক্ষা করিয়া গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল। [ক্রমশঃ]

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

স্বদেশী চিত্র।

গত মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বিরহী যক্ষ" নামক একখানি চিত্রের প্রতিলিপি সন্নিবেশিত হইয়াছে। চিত্রখানি ইতিপূর্ব্বে "ষ্টুডিও" পত্রিকায় বিশেষরূপে প্রশংসিত হয়।

অবনীন্দ্র বাবুর চিত্রের গুণপনা ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে নানা মতভেদ ও বাদানুবাদ আছে। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার রচনায় যে একটু বিশেষ রকমের দেশীয় আস্বাদ ও জাতীয় ভাব আছে তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। ঐ জাতীয় ভাব ও স্বদেশী আদর্শটা কি তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে দেশীয় চিত্রপদ্ধতির রীতি প্রকৃতি ও তাহার সহিত বিলাতী ছবির পার্থক্য কি তাহা বুঝা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান ও সূক্ষ্মসমালোচনা শক্তির কোনও দাবী রাখি না— বিষয়টীর মোটামুটি কথাগুলি উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের দেশে যে একটী বিশেষরূপে ভারতের নিজস্ব শিল্পপদ্ধতি প্রচলিত ছিল এ সংবাদ অনেক শিক্ষিতের পক্ষেও নূতন। ভারতীয় চিত্রচর্চ্চা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সঙ্কীর্ণ রকমের। এ বিষয়ে উপযুক্ত পরিমাণ উপাদানেরও যথেষ্ট অভাব নাই এমন নহে। দুই একজন চিত্রামোদী বিশেষজ্ঞের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজকাল প্রাচীন চিত্রের কতিপয় ছিন্ন, কীটদষ্ট নিদর্শন অতি কষ্টে সংগৃহীত হইতেছে। এই নমুনাবলীর সকলগুলিই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নহে, এবং অনেকগুলিই খাপছাড়া রকমের—

তাহার মধ্য দিয়া কোনও ধারাবাহিক সূত্র খুঁজিয়া লওয়া বড়ই দুরূহ—উচ্চশ্রেণীর কলাকুশলী বিশেষজ্ঞের চক্ষু আবশ্যক। সুতরাং এই সকল নমুনা বিচার করিয়া ভারতীয় চিত্রচর্চা সম্বন্ধে ঠিক ধারণা করা, তাহার উৎকর্ষের মূল্য নির্দ্ধারণ করা, আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের অবস্থায় অনেকটা অসম্ভব। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের চিত্রসাধনার আদর্শ-নিহিত গভীর তত্ত্বগুলি এখনও অনুসন্ধান, অনুমান ও কল্পনার বিষয়। কদাচিৎ দুই একখানি অতি জীর্ণ পুরাতন চিত্রে ভারতীয় প্রতিভার অলৌকিক নিপুণতা ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান কালমেঘে বিজলী খেলার মত চিক্ চিক্ করিয়া উঠে—ঐরূপ সুন্দর নৈপুণ্য ও চিত্রসাধনার অন্যান্য উৎকৃষ্ট নিদর্শনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে আশ্বাসিত করে বটে, কিন্তু অনুসন্ধানলব্ধ আরও অন্যান্য নিকৃষ্ট-শ্রেণীর চিত্র আমাদের উপবাসী চক্ষুকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। এইরূপে ভারতের প্রাচীন চিত্রের অধিষ্ঠাত্রী শিল্পদেবতা শত শত জীর্ণ পুরাতন চিত্রপটাদির অন্তরাল হইতে আমাদের সহিত লুকোচুরি খেলিতেছেন। জানি না কবে তিনি তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য্যসম্ভারে সজ্জিত হইয়া, তাঁহার সম্পূর্ণ মূর্ত্তিতে ধরা দিবেন, তত্ত্বান্বেষীর পিপাসু চক্ষুকে চরিতার্থ করিবেন।

এদেশে সংস্কৃত, পালি, পার্শী ও অন্যান্য প্রাচীন হস্তলিপি ও পুঁথি সংগ্রহ করিতে যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করা হয়, প্রাচীন চিত্রাদির নমুনা সংগ্রহ করা তদপেক্ষা ন্যূন পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সাপেক্ষ নহে। এক্ষণে এই চিত্রাদি সংগ্রহ করিবার সখ বিশেষরূপে ইংরাজ মনিষী-গণের মধ্যেই আবদ্ধ। তাহার ফলে পারস্য চিত্ররীতির অনেক শ্রেষ্ঠ বহুমূল্য নমুনা বৃটিশ মিউজিয়াম* ইত্যাদি আমাদের অনধিগম্য নানাস্থানে গিয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি এখনও সমাধিমগ্ন।

যাহা হউক প্রাচীন চিত্রাবলীর যথেষ্ট পরিমাণ সংখ্যা যত দিন সংগৃহীত না হইতেছে, এবং যত দিন না সেগুলি কালানুক্রমে যথার্থ ঐতিহাসিকসূত্রে গ্রথিত হইতেছে, ততদিন ভারতীয় চিত্রাদর্শ সম্বন্ধে চূড়ান্ত (final) অভিমত প্রকাশ করা ধৃষ্টতা মাত্র। আদিম কাল হইতে ভারতীয় শিল্পসাধনা নানা চিন্তা ও ভাবস্তরের মধ্য দিয়া কিরূপে রূপান্তরিত হইয়া আপনার আদর্শ প্রকাশ করিয়াছে—তাহার নানা প্রকৃতির ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিলে একটা বিশিষ্টকালের চিত্রের মূল্য ও বিশেষত্ব আংশিকভাবে, ও ভারতীয় শিল্পসাধনার মূল আদর্শটীকে স্বভাবতঃই সংক্ষুব্ধ করিয়া দেখাইবে। যাহা হউক পুরাতাত্ত্বিকগণের খননপটু খনিত্রের মুখে দিন দিন নূতন নূতন ফলক, ভাস্কর্য্য ও চিত্রাদি সাধারণের গোচরে আসিতেছে এবং তাহার ফলে ভারতীয় শিল্পতত্ত্বের অনেক সমস্যা ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। এ পর্য্যন্ত এদেশে যতগুলি চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশগুলিই মূল আদর্শের অনুকরণ বা প্রতিলিপি মাত্র এবং অনেকগুলিই ভারতীয় শিল্প প্রতিভার প্রতিনিধি স্থানীয় নমুনা (representative specimen) বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তাহা হইলেও এই চিত্রগুলিতে প্রাচীন শিল্পের সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত ও সঙ্কেত আছে তাহা কেবল ঐতিহাসিক হিসাবেও বহুমূল্য। ভারতীয় চিত্রপ্রতিভা এই প্রাচীন চিত্রপরম্পরায় খণ্ড ভাবে প্রতিফলিত হইলেও ইহার মৌলিক প্রকৃতির একটা মোটামুটি ধারণা করা অসম্ভব নহে।

এমার্সন বলিয়াছেন,—"art is nature passed through the alembic of man." প্রকৃতির ছবি মানবের মস্তিষ্ক কটাহের মধ্য দিয়া শিল্পের আকারে ঢালা হইয়া পড়ে। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির মৌলিক প্রতিভার ভেদানুসারে তাহাদের শিল্পপ্রকৃতি ভিন্ন হয়। প্রকৃতির ছবি যে যে রীতিতে যেরূপ চক্ষে দেখে সেই অনুসারে তাহাদের শিল্পের আকৃতি ও প্রকৃতির পার্থক্য জন্মে। দেশীয় ও বৈদেশিক চিত্রশিল্প তুলনা করিয়া দেখিলে উক্ত জাতিগত বৈষম্য লক্ষ্য হয়। প্রাচ্য যে দৃষ্টিস্থান (point of view) হইতে বা যে চক্ষে প্রকৃতির পুঁথি পাঠ করিয়াছে, প্রতীচ্য ঠিক সে চক্ষে দেখে নাই, তাহার দৃষ্টিস্থান স্বতন্ত্র। য়ুরোপীয় চিত্রশিল্পে প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণের প্রবৃত্তিই অধিক, প্রাচ্যশিল্পে ইহার একান্ত অভাব। প্রাচ্যশিল্প স্বভাবের

* সুপ্রসিদ্ধ Clarke Manuscript নামক আকবরের সংগৃহীত রজমনামার মূল চিত্রগুলির বিবরণ কৌতূহলী পাঠক Royal Asiatic Societyর পত্রিকার ১৯০৫ সালের এপ্রিল সংখ্যায় পাঠ করিবেন।

যথাযথ মূর্ত্তি প্রতিফলিত করিতে যায় নাই উহাকে আদর্শীভূত (idealised) আকারেই প্রকাশ করিতে সচেষ্ট। এইজন্য য়ুরোপীয় চিত্রের বক্তব্য বাস্তবিক রীতিতে প্রকাশিত হয়, ভারতীয় চিত্রের ভাষা আলঙ্কারিক রীতির অবলম্বন করিয়াছে। এমন কি মুসলমান যুগের মূর্ত্তিচিত্রণরীতির (portrait-painting) নমুনাতেও শিল্পীগণের স্তাবকসুলভ অতিরঞ্জনবৃত্তি এই আলঙ্কারিক প্রবৃত্তিমূলক। য়ুরোপীয় মূর্ত্তিচিত্রকরগণের ন্যায় মোগলশিল্পী মানবের যথাযথ বাহ্য বিশেষত্ব প্রকাশ করিতে ব্যগ্র নহে। মধ্যে মধ্যে অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে এই অতিরঞ্জনবৃত্তি অনেক ব্যঙ্গমূর্ত্তির (Carricature) সৃষ্টি করিয়াছে।

স্থূলতঃ য়ুরোপীয় চিত্রপ্রণালী বাস্তব প্রধান, ভারতীয় চিত্রশিল্প অলঙ্কার প্রধান। আমার একটি বন্ধু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিল্পের বৈপরীত্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন— "The occidentals have attempted to make *art natural,* the orientals have made *nature artistic.*" প্রতীচ্যগণ শিল্পকে স্বভাবানুগত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, প্রাচ্যগণ স্বভাবকে শিল্পদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এই আলঙ্কারিক আদর্শ প্রাচ্য প্রকৃতির অনুরূপ ;—ভারতের স্থাপত্যরীতির ভৌষণিক আড়ম্বর এই একই আদর্শ প্রকটিত করিতেছে। ভারতীয় সাহিত্য রীতিতেও আমরা উপরোক্ত আদর্শের অনুসন্ধান পাই। আমাদের উপাখ্যান, আখ্যায়িকা, কাব্যপুরাণাদি য়ুরোপীয়গণের তথাকথিত ইতিহাস উপন্যাসের সমরূপী নহে। ভারতের কাব্য পুরাণাদি বর্ণিত অসংখ্য নায়কগণ য়ুরোপীয় হিসাবে বাস্তবিক ঐতিহাসিক পুরুষ নহে —প্রাচ্য প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন আধ্যাত্মিক ভাবের শরীরী কল্পনা মাত্র। প্রাচ্য আদর্শ ও কবিকল্পনার মধ্য দিয়া,—আমাদের মহাকাব্যের নায়ক নায়িকাগণ এমন একটা মহিমার আলোকে, ভারতীয় দৃষ্টিক্ষেত্রের দিগন্তদেশে পরিপ্রেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাদিগকে বাস্তবিকতার চক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কেবল যে অসম্ভব তাহা নহে,—তাহা হইলে তাহাদের গৌরব ও অধ্যাত্মশক্তির প্রাণহানি হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে চিত্রিত মূর্ত্তিগুলি এমন একটি তীব্র স্বর্গীয় ছটায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে যে তাহাদিগকে বাস্তবিক 'মডেলের' গণ্ডীর মধ্যে ধরিতে বা প্রত্যক্ষ করিতে (realise) গেলে, শাপগ্রস্ত দেবতার ন্যায় তাহারা মহিমাচ্যুত হইয়া পড়ে। রামচরিত্রের এরূপ চাক্ষুষ প্রতিকৃতি চিত্রে অঙ্কিত হইতে পারে না,—মূলের বিরাট মহত্ব রেখা ও বর্ণের ভাষায় এরূপ ভাবে অনূদিত হইতে পারে না—যাহা প্রত্যেক রামায়ণপাঠীর 'মনগড়া' ছবিটীর সহিত মিলিয়া গিয়া প্রত্যেককেই সন্তুষ্ট করিতে পারে। চিত্রশাস্ত্রের (বিশেষতঃ বাস্তবশ্রেণীর চিত্রের) সঙ্কীর্ণ শক্তির (limitations) পক্ষে তাহা অসম্ভব। রামায়ণের বর্ণিত স্ত্রী পুরুষ চিত্র লক্ষ্য করিয়া একজন বাঙ্গালী স্ত্রীকবি* তাহাদের যথার্থ প্রকৃতি বুঝিয়াই বলিয়াছেন—"Rubies girt in epic gold"। ভারতের ইতিহাসে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ বাস্তবিকই মহাকাব্যের স্বর্ণরশ্মিতে মণ্ডিত ও দীপ্যমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মহাপুরুষদিগকে মৃত্যুর পরেই সিদ্ধশ্রেণীভুক্ত (canonize) করিবার একটা প্রথা ছিল। ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যের বর্ণনীয় মহাপুরুষগণ ইহারই অনুরূপ দিব্যমহিমায় আচ্ছাদিত হইয়া এক উচ্চস্তরের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। চিত্রপটে ইহাদের চাক্ষুষ অবয়ব কল্পনা (plastic actualisation) করিতে বাস্তবিক রীতি একেবারেই অকর্ম্মণ্য এবং অনেকস্থলে অনিষ্টকারী। এ বিষয়ে আলঙ্কারিক রীতিই প্রশস্ত। আলঙ্কারিক প্রণালীতে চিত্রিত বিষয়ের যে ব্যঞ্জনাশক্তি (suggestiveness) ও কল্পনার অবসর থাকে বাস্তবিক চিত্রের আলোক ও ছায়ার উৎকট বৈপরীত্যে তাহা দুষ্প্রাপ্য। পৌরাণিক বস্তুচিত্রে বাস্তবিক রীতির ব্যর্থতা সম্প্রতি ফরাসী চিত্রকরগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে Arthurian legends, নামক আখ্যায়িকাগুলি চিত্রে ব্যাখ্যাত করিয়া সার এডোয়ার্ড বর্ণ-জোন্‌স্ এই ক্ষেত্রে আলঙ্কারিক রীতির উপযোগিতা সিদ্ধ করিয়াছেন। য়ুরোপীয় চিত্রশিল্পে আলঙ্কারিক বৃত্তির আজন্ম অভাব ছিল। সম্প্রতি য়ুরোপীয়গণ চিত্রশিল্পে আলঙ্কারিক আদর্শের মূল্য বুঝিয়াছেন। জাপানী চিত্রের অলঙ্কারপ্রধান ভাব ও কল্পনা অনেক আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পী স্ব স্ব চিত্রে সন্নিবেশিত করিতেছেন। ইংরাজী চিত্রশিল্পে Decorative art বা ভৌষণিক শিল্প নামক নূতন শাখার উদ্ভব হইয়াছে।

* শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

য়ুরোপীয় চিত্রবিচাররীতির হিসাবে ভারতীয় শিল্পের "ছবিত্ব" (pictorialism) প্রশংসার বিষয়। ভারতের বিশিষ্ট আদর্শ ছাড়িয়া দিলেও, কেবল ছবিত্বের হিসাবে বিদেশী চিত্রে বস্তুসংস্থানকৌশল, রেখাঙ্কনপটুতা, বর্ণসন্নিবেশ-রুচি ইত্যাদি যে সকল বিশিষ্ট গুণ প্রশংসিত হয়, দেশী চিত্রপরম্পরায় তাহার অভাব নাই। তবে ঐগুলি সকল চিত্রেই লক্ষ্য হয় না। দিল্লী, কাশী, জয়পুর ইত্যাদি স্থানে এখনও যে প্রাচীন চিত্রাদির উদাহরণ পাওয়া যায়, উহা স্বভাবানুগত না হইলেও সুমধুর বর্ণবিন্যাসে চক্ষুতৃপ্তিকর "দৃশ্যসঙ্গীত" আখ্যা পাইবার যোগ্য।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে চিত্রপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা যে কেবল জাতীয়ভাবে পূর্ণ ও দেশী-প্রবাদমূলক এমন নহে, অধিকন্তু ভারতীয়ভাব ও বিশেষত্ব ধারণ ও প্রকাশ করিবার পক্ষে বিশেষরূপে উপযোগী। এ কথাটী আমরা উপরে স্পষ্টীকৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অবনীন্দ্র বাবু দেশী শিল্পাদর্শের গোমুখীতে আকণ্ঠ রসাকর্ষণ করিয়াছেন, এমন একটু নূতন শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, যাহা তাঁহার চিত্রগুলিতে পরিস্ফুট হইয়া উহাদিগকে জীবন্তভাবে উজ্জ্বল করিয়াছে। ভারতীয় চিত্রশিল্পের এখন ঘোর দুর্দ্দিন। উহার উৎকৃষ্ট নমুনাগুলিতেও স্থানে স্থানে যে দীনতা, প্রাণহীনতা ও দুর্ব্বলভাব দেখা যায় তাহা অত্যন্ত শোচনীয়। পুষ্টির অভাবে ভারতের প্রাচীন চিত্র এক্ষণে কঙ্কালসার ও মৃতপ্রায়। অবনীন্দ্র বাবু প্রাচীন চিত্রের জড়কঙ্কালে রক্তমাংস ও স্থানে স্থানে জীবনীশক্তির সঞ্চার করিতে প্রয়াস পাইতেছেন।

গত মাসে সন্নিবেশিত চিত্রটীর সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। "বিরহী যক্ষের" আখ্যানবস্তুটী অবনীন্দ্র বাবুর নিজের নহে। কালিদাসের কল্পনা তিনি চিত্রে অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র। এস্থলে মূলের ভাব ও মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখাতেই শিল্পীর কৃতীত্ব। অবনীন্দ্র বাবু 'যক্ষ' চিত্রণে কি পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছেন গুণজ্ঞগণ তাহার বিচার করিবেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে* যক্ষের যে স্বরূপ বর্ণনা আছে, অথবা আমরা চলিত কথায় "যক্" বলিতে যাহা বুঝি, মেঘদূতের নায়ক সে ধাতুর নহে। কুমারসম্ভবে হিমালয়ের বর্ণনাস্থলে বিদ্যাধর, অপ্সর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধাদি যে সকল দেবযোনির উল্লেখ আছে, যক্ষগণ তাহারই মধ্যে এক শ্রেণীর জীব। ইহারা মনুষ্য হইতে উচ্চস্তরের প্রাণী অথচ সম্পূর্ণরূপে দেবত্বের অধিকারী নহে। দেবাদি অতিপ্রাকৃত ও অমানুষিক জীবগণের স্বরূপ চিত্রণ শিল্পী-গণের একটী কঠিন সমস্যা। দেবতা ও পৌরাণিক পুরুষগণ সাধারণ মনুষ্যোচিত মূর্ত্তিতেই চিত্রিত হইয়া থাকেন। কেবল তাঁহাদের উৎকর্ষ ও বিশেষত্ব সূচিত করিতে, এমন একটী বিশেষ ছাঁচের (type) মুখভাব গড়িয়া লইতে হয় যাহাতে তত্তৎ জীবগণের আকৃতি সম্বন্ধে আমাদের 'মনগড়া' ছবিটী অক্ষুণ্ণ থাকে।

ভারতীয় চিত্রশিল্পের সেবায় অবনীন্দ্র বাবু যেটুকু করিয়াছেন তাহা ভাবীকালের দেশী শিল্পের চরম উন্নতির আদর্শ নহে—এ ক্ষেত্রে পরিণতির যথেষ্ট অবকাশ আছে। কে বলিতে পারে ভবিষ্যতে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত, তাঁহার অপেক্ষা অধিক প্রতিভাশালী কোনও শিল্পী এই ক্ষেত্রে তাঁহার অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট রচনা দ্বারা ভারতীয় চিত্র-শিল্পের মর্য্যাদা বৃদ্ধি না করিবেন? অবনীন্দ্র বাবুর বিশেষত্ব এই যে তিনি ভারতীয় চিত্রশিল্পসম্বন্ধে ঠিক পথটী অনুসন্ধান করিয়া লইয়াছেন—ঠিক সুরেই আঘাত করিয়াছেন। ভারতীয় কলালক্ষ্মী যদি অকৃতি সন্তানগণের পাপে বাস্তবিকই অন্তর্হিত হইয়া থাকেন, তাঁহার ভক্তগণের আবাহন গানে পুনরাবির্ভূত হইবেন—তাঁহার পূজার মন্দিরে আবার তিনি অচলা হইয়া বসিবেন—ভারতের চিত্রকলায় তাঁহার চরণারুণ অঙ্কিত হইয়া উঠিবে।

১০ই বৈশাখ, ১৩১৩ সাল। শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

---

* "আজগ্মুঃ যক্ষনিকরাঃ কুবেরবরকিঙ্করাঃ
শৈলজপ্রস্তরকরাঃ অঞ্জনাকার মূর্ত্তয়ঃ॥
বিকৃতাকার বদনাঃ পিঙ্গলাক্ষা মহোদরাঃ।
স্ফটিকা রক্তবেশাশ্চ দীর্ঘস্কন্ধাশ্চ কেচন॥"

শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে—১৭ অধ্যায়।

ইংরাজ-শাসন কি বিধাতার বিধান?

সেদিন বিলাতে একটি বক্তৃতায় লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছেন যে বিধাতার বিধানে ভারতবর্ষ ইংরাজের অধীনে আসিয়াছে। ইংরাজদের এরূপ মনে করিবার ও বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ, ভারতবর্ষ ইংরাজদের হাতে না আসিলে ইংলণ্ডের এত ধন এবং শক্তি বৃদ্ধি হইত না। সুতরাং লর্ড কার্জ্জনের উক্তিতে আমার মনে এই প্রশ্নের উদয় হয় নাই যে ভারতে ইংরাজ-শাসন বিধাতার বিধান কি না। আমি কিছুদিন হইতেই একথা ভাবিতেছিলাম। কারণ, রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের দেশের প্রধান প্রধান রাজনীতিজ্ঞেরা এই কথা বলিয়া আসিতেছেন। কেবল শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ গত মান্দ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তাঁহার বক্তৃতায় একথা অস্বীকার করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার Final appeal to the Christian Public নামক পুস্তকের শেষে বলিয়াছেন:—

I now conclude my Essay by offering up thanks to the Supreme Disposer of the events of this universe, for having unexpectedly delivered this country from the long-continued tyranny of its former Rulers, and placed it under the government of the English,—a nation who not only are blessed with the enjoyment of civil and political liberty, but also interest themselves in promoting liberty, and social happiness, as well as free inquiry into literary and religious subjects among those nations to which their influence extends.

এইরূপ কথা আরও অনেকে বলিয়াছেন। এখানে বলিয়া রাখি, রাজা রামমোহন রায় মুসলমান শাসনের ভাল দিক্‌টার প্রতি অন্ধ ছিলেন না; তাহা পরে দেখাইব।

এখন, প্রথম বিচার্য্য বিষয় এই যে, মানবীয় ব্যাপারে বিধাতার বিধানের অর্থ কি? মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এবং সামাজিক বা জাতীয় জীবনে যাহা কিছু ঘটে, আমরা তাহাকেই মানবীয় ব্যাপার বলিতেছি। যে সকল প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়ায় দিবারাত্রি, ঋতু পরিবর্ত্তন, ঝড়, বৃষ্টি, বৃক্ষ লতা ও ফল ফুল শস্যের জন্ম, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি ঘটে, সে সকলের বিষয় আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আপাতদৃষ্টিতে সাক্ষাৎভাবে মানুষের কর্তৃত্বে মানব জীবনে যে সকল ঘটনা বা পরিবর্ত্তন ঘটে, তন্মধ্যে বিধাতার বিধান কাহাকে বলিব, ইহাই বিবেচ্য। যাহা কিছু ঘটে, তাহাই কি বিধাতার বিধান? তাহা হইলে সম্প্রদায় বিশেষ, ব্যক্তি বিশেষ, বা জাতি বিশেষ, পাপ বা পুণ্য যাহাই করুক না কেন, তাহাকেই বিধাতার বিধান বলিতে হয়। কিন্তু তাহা বলিলে মানুষের নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করিতে হয়; মানুষকে আর পাপী বা পুণ্যাত্মা বলা চলে না। এ দার্শনিক প্রশ্নের মীমাংসায় আমরা প্রবৃত্ত হইব না। পক্ষান্তরে, যাহা হইতে শুভ ফল ফলে এরূপ ঘটনা মাত্রকেও আমরা বিধাতার বিধান বলিতে পারি না। কারণ, ঈশ্বরবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করেন, যে অমঙ্গল হইতেও ঈশ্বর মঙ্গল ঘটান; কিন্তু তিনি অমঙ্গলের, পাপের বা অপবিত্রতার জনয়িতা নহেন, এবং অমঙ্গলকেও মঙ্গল বলা যায় না। অবশ্য এ প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে, তবে পাপ বা অমঙ্গল কোথা হইতে আসে? এই দার্শনিক প্রশ্নেরও মীমাংসা করিতে আমরা অসমর্থ। যাহা হউক, আমরা দেখিলাম, মানবের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় বা সামাজিক জীবনের ঘটনামাত্রকে বা পরিণামে শুভফলপ্রদ ঘটনামাত্রকে বিধাতার বিধান বলিবার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিতে পারে।

এখন, দেখা যাক্, ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায় কোন্ কোন্ ঘটনাকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিধাতার বিধান মনে করিয়াছেন। খৃষ্টানেরা যীশুখৃষ্টের জন্ম ও কার্য্যকে বিধাতার বিধান মনে করেন। মুসলমানেরা মহম্মদের জন্ম ও কার্য্যকে বিধাতার বিধান মনে করেন। এইরূপ বৈষ্ণবেরা চৈতন্যের, ব্রাহ্মেরা রামমোহন রায়ের ক্রিয়াকলাপকে বিধাতার বিধান মনে করেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে ইতালীয়েরা ম্যাট্‌সিনিকে বিধাতার বিধানে ইতালীর উদ্ধারার্থ আবির্ভূত বলিয়া মনে করেন। মার্কিনদের ওয়াশিংটনের প্রতি মনের ভাব এইরূপ। এইসকল স্থলে এইসকল মনুষ্যকে বিধাতার বিধানের সহিত ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায় কেন যুক্ত করেন? কারণ, তাঁহাদের মতে ইঁহাদের উদ্দেশ্য শুভ ও উন্নত, জীবন সাধু, এবং কার্য্য মানবের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়াছে। সুতরাং আমরা এখন সমুদয় সংশয়স্থলগুলি বাদ দিয়া, এ কথা বলিতে পারি, যে আমরা কোন ঘটনার মধ্যে পাত্রগণের বা নায়কগণের উদ্দেশ্য, জীবন ও কার্য্যের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া ঐ ঘটনা বিধাতার বিধান কি না, তৎসম্বন্ধে অনুমান করিতে পারি।

ইংরাজশাসনের ফল ভাল কি মন্দ বা উভয়ই, তাহার বিচার এখন না করিয়া, আমরা উক্ত নিয়ম অনুসারে একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতে পারি। ইংরাজেরা ব্যবসা করিবার জন্য এদেশে আসিয়াছিল; মানবের, আমাদের, মঙ্গলের বা উন্নতির জন্য এখানে আসে নাই। পরিশেষে এই বাণিজ্য রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার জন্য, ইংরাজের রাজত্ব স্থাপনও, ইংরাজ ঐতিহাসিকগণেরই লেখা অনুসারে, জাল, চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা ও রক্তপাত দ্বারা হইয়াছে। যাহারা ইংরাজরাজত্বের স্থাপনকর্ত্তা, তাহাদের চরিত্র, জীবন, সাধু বা উন্নত ছিল না। এবিষয়ে আমরা কিছু না বলিয়া কয়েকজন বিখ্যাত ইংরাজের মত তুলিয়া দিতেছি। এই প্রবন্ধে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া কিছু বেশী পরিমাণে ইংরাজী উদ্ধৃত করিতে হইবে।

কেরী সাহেব বলেনঃ—

"Drunkenness, gambling and profane swearing were almost universally practised. The public journals testify to the absence of 'decency and propriety of behavior' in social life. In December 1780, one of them complains that 'Europeans of all ranks' ordinarily made Christmas festivities a 'plea for absolute drunkenness and obscenity of conversation, &c., that is while they were able to articulate at all' and urged that respectable men ought not to subject their wives to such impure and injurious associations. Another paper, in 1788, complained of 'a very general depravity of conversation and manners both in mixed and male societies' such as he 'hoped for the honor of human nature, was not the case in other countries.".

* * * * "Nearly all the unmarried Europeans—and few were married in those days—lived in acknowledged concubinage with native women. In 1840 a work called "*The East Indian Vade Mecum*" was published by Captain Thomas Williamson. It was intended to contain a compendium of information valuable to persons about to settle in India and was dedicated to the Honorable Court of Directors of the East India Company, as designed particularly to be a guide to young gentlemen in their service. In this work concubinage is regarded as a matter of ordinary necessity, and advice is given as to the female establishment a young man should set up, its proper cost, &c. The impossibility of marriage with English women is shown by the declaration that an English lady could not be landed in India 'under respectable circumstances throughout, for less than £500'; and the connections recommended are justified by the statement that 'the number of European women to be found in Bengal and its dependencies cannot amount to two hundred and fifty; while the European male inhabitants of respectability including military officers may be taken at about four thousand.' (Carey's Good Old Days of Honorable John Company, Vol. II, pp. 63-64.)

ক্লাইবের জালকরার কাহিনী ছোট ছোট ছেলেরাও জানে। তিনি ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা। তিনি অম্লানবদনে বলিয়াছেনঃ-

'I never sought to conceal it, but declared publicly in my letters to the secret committee of the Indian Directors that the Nabob's generosity had made my fortune easy, and that the Company's welfare was now my only motive for staying in India. What pretence could the Company have to expect, that I, after having risked my life so often in their service, should deny myself the only opportunity ever offered of acquiring a fortune without prejudice to them, who, it is evident, would not have had more for my having had less.'

হার্বার্ট স্পেন্সার বলেনঃ—

"The Anglo-Indians of the last century—'birds of prey and of passage,' as they were styled by Burke—showed themselves only a shade less cruel than their prototypes of Peru and Mexico. Imagine how black must have been their deeds, when even the Directors of the Company admitted that 'the vast fortunes acquired in the inland trade have been obtained by a scene of the most tyrannical and oppressive conduct that was ever known in any age or country.' Conceive the atrocious state of society described by Vansittart, who tells us that the English compelled the natives to buy or sell at just what rates they pleased on pain of flogging or confinement. Judge to what a pass things must have come when, in describing a journey, Warren Hastings, says: 'Most of the petty towns and *serais* were deserted at our approach.' A cold-blooded treachery was the established policy of the authorities. Princes were betrayed into war with each other; and one of them having been helped to overcome his antagonist, was then himself dethroned for some alleged misdemeanour. Always some muddied stream was at hand as a pretext for official wolves. Dependent Chiefs possessing coveted lands were impoverished by exorbitant demands for tribute and their ultimate inablity to meet these demands was construed into a treasonable offence, punished by deposition. Even

down to our own day kindred iniquities are continued. Down to our own day, too, are continued the grievous salt monopoly, and the pitiless taxation, that wring from the poor ryots nearly half the produce of the soil. Down to our own day continues the cunning despotism which uses native soldiers to maintain and extend native subjection--a despotism under which, not many years since, a regiment of sepoys was deliberately massacred, for refusing to march without proper clothing. Down to our own day the police authorities league with wealthy scamps, and allow the machinery of the law to be used for purposes of extortion. Down to our own day, so-called gentlemen will ride their elephants through the crops of impoverished peasants; and will supply themselves with provisions from the native villages without paying for them. And down to our own day, it is common with the people in the interior to run into the woods at sight of a European." (Social Statics, pp. 367-8.)

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর ফক্সের ইণ্ডিয়া বিল সমর্থনকালে বিখ্যাত বাগ্মী বার্ক যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Young Magistrates who undertake the Government and Spoliation of India, animated with all the avarice of age, and all the impetuosity of youth, they roll in one after another, wave after wave; and there is nothing before the eyes of the natives but an endless hopeless prospect of new flights of birds of prey and passage, with appetite continually renewing for a food that is continually wasting. * * * Their prey is lodged in England, and the cries of India are given to seas and winds, to be blown about, in every breaking up of the monsoon, over a remote and unhearing ocean." * * *

"Here (in England) the manufacturer and husbandman will bless the just and punctual hand that in India has torn the cloth from the loom, or wrested the scanty portion of rice and salt from the peasant of Bengal, or wrung from him the very opium in which he forgot his oppression and his oppressors."

সার চার্লস্ ডিল্ক বলেন :—

"There is too much fear that the English, unless held in check, exhibit a singularly strong disposition towards cruelty, wherever they have a weak enemy to meet. * * * It is not only in war-time that our cruelty comes out; it is often seen in trifles during peace. Even a traveller, indeed, becomes so soon used to see the natives wronged in every way by people of quiet manner and apparent kindness of disposition, that he ceases to record the cases. In Madras roads, for instance, I saw a fruit-seller hand up some limes to a lower-deck port, just as we were weighing anchor. Three Anglo-Indians (men who had been out before) asked in chorus 'How much?' 'One quarter rupee.' 'Too much.' And, without more ado, paying nothing, they pelted the man with his own limes, of which he lost more than half. In Ceylon, near Bentotte rest-house, a native child offered a handsome cowrie (of a kind worth in Australia about five shillings, and certainly worth something in Ceylon) to the child of a Mauritius coffee-planter who was travelling with us to Columbo, himself an old Indian officer. The white child took it, and would not give it up. The native child cried for money, or to have his shell back, but the mother of the white child exclaimed, 'you be hanged; it's worth nothing;' and off came the shell with us in the dawk. Such are the small but galling wrongs inflicted daily upon the Indian natives. * * * I have heard Anglo-Indians exclaim that the new Penal Code has revolutionised the country. 'Formerly,' they say, 'you used to send a man to a police-officer or a Magistrate with a note: 'My dear—Please give the bearer twenty lashes,' but now Magistrates are afraid to act, and your servant can have you fined for beating him.' In spite of the lamentations of Anglo-Indians over the good old days, I noticed in all the hotels in India the significant notice, 'Gentlemen are earnestly requested not to strike the servants.' * * * It is in India, when listening to a mess-table conversation on the subject of looting that we begin to remember our descent from Scandinavian Sea-king robbers. Centuries of education have not purified the blood, our men in India can hardly set eyes upon a native prince or a Hindoo palace before they cry, 'What a place to *break up*?' 'What a fellow to *loot*.' When I said to an officer who had been stationed at Secrole in the early days of the Mutiny, 'I suppose you were afraid that the Benares people would have attacked you,' his answer was, 'Well, for my part, I rather hoped they would, because then we should have thrashed them and looted the city. It hadn't been looted for two hundred years.'

"Those who doubt that Indian Military Service makes soldiers careless of men's lives, reckless as to the rights of property, and disgraceful of human dignity, can hardly remember the letters which reached home in 1857, in which an officer in high command during the march upon Cawnpore reported, 'Good bag to-day;

polished off rebels,' it being borne in mind that the 'rebels' thus hanged or blown from guns were not taken in arms, but villagers apprehended 'on suspicion.' During this march atrocities were committed in the burning of villages, and massacre of innocent inhabitants at which Mohamed Toglak himself would have stood ashamed, and it would be to contradict all history to assert that a succession of such deeds would not prove fatal to our liberties at home. * * There is little of the feeling which a common citizenship should bestow, little of that equality of man which Christianity would seem to teach." (Dilke's "Greater Britain", 5th edition of 1870 pp. 145—7.)

আমরা এস্থলে নিজের কথা কিছুই বলিলাম না। নানা-শ্রেণীর ইংরাজ লেখকগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, যে, ইংরাজশাসন যদি বিধাতার বিধান হয়, তাহা হইলে বিধাতা এরূপ লোকদিগকে নিজ বিধান প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কেন মনোনীত করিলেন? তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি খৃষ্টের, মহম্মদের, বা ওয়াশিংটনের, ম্যাট্‌সিনির মত লোক নিযুক্ত কেন করিলেন না? আমরা এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে অসমর্থ। যাঁহারা ইংরাজ-শাসনকে নিঃসন্দেহে বিধির বিধান মনে করেন, তাঁহারা এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিলে প্রবাসীতে ছাপিব। হয় ত কেহ বলিবেন, আমরা ইংরাজদের চেয়েও খারাপ। কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে ইংরাজদের মহত্ত্ব প্রমাণিত হয় না।

আমরা বলিতেছি না যে কোম্পানীর আমলে বা তাহার পরে ইংরাজ ভারত-শাসকদের মধ্যে কোন ভাল লোক ছিল না বা নাই। ইংরাজীতে লিখিত পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশগুলি হইতে, ইংরাজরাজত্বের প্রতিষ্ঠাতাদিগের ও পরিচালকদিগের সম্বন্ধে মোটের উপর তাঁহাদেরই সমদর্শী স্বদেশবাসীদের মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে, তাহাই আমরা দেখাইতে চাই।

একবার ১৮৫৭ সালে সিপাহীযুদ্ধে ইংরাজরাজত্ব যায়-যায় হইয়াছিল। তাহার একটা কারণ, সিপাহীদিগকে গো ও শূকরের চর্ব্বিমিশ্রিত টোটা ব্যবহার করিতে বাধ্য করা. এতদিন অমূলক জনরব বলিয়া ইংরাজ লেখকেরা বলিতেন। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল লর্ড রবার্টস্ 'Forty-one years in India' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"The recent researches of Mr. Forrest in the records of the Government of India prove that the lubricating mixture used in preparing the cartridges was actually composed of the objectionable ingredients cows' fat and lard, and that incredible disregard of the soldiers' religious prejudices was displayed in the manufacture of these cartridges."

ভারতবর্ষীয় রাজন্যবর্গের সহিত অন্যায় আচরণও সিপাহী-যুদ্ধের আর একটি কারণ। যাহা হউক, ভারতবর্ষের প্রজা-সাধারণ ইংরাজশাসনের পক্ষে ছিল বলিয়া তখন উহা উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু যুদ্ধের অবসানে ইংরাজেরা কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল,তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিক কে (Kaye) বলেন :—

"Martial Law had been proclaimed; those terrible Acts passed by the Legislative Council in May and June were in full operation; and Soldiers and Civilians alike were holding Bloody Assizes or slaying Natives without any assize at all *regardless of sex or age.* Afterwards the thirst for blood grew stronger still. It is on the records of our British Parliament, in papers sent home by the Governor General of India in Council that aged women, and children, were sacrificed, as well as those guilty of rebellion. They were not deliberately hanged but burnt to death in their villages —perhaps now and then accidentally shot. Englishmen did not hesitate to boast, or to record their boasting in writing, that they had 'spared no one', and that 'peppering away at niggers' was very pleasant pastime, 'enjoyed amazingly'. And it has been stated, in a book patronised by high official authorities that 'for three months eight dead-carts daily went their rounds from sun-rise to sun-set to take down the corpses which hung at cross roads and market-places and that 'six thousand beings' had been thus 'summarily disposed of and launched into eternity.' * * An Englishman is almost suffocated with indignation when he reads that Mr. Chambers or Miss Jennings was hacked to death by a dusky ruffian; but in Native histories, or, history being wanting, in Native legends and traditions, it may be recorded against our people, that mothers and wives and children, with less familiar names, fell miserable victims to the first swoop of English vengeance; and these stories may have as deep a pathos as any that rend our own hearts. It may be, too, that the plea of provocation, which invests the most sanguinary acts of the white man in this deadly struggle with the attributes of righteous retribution, is not wholly to be rejected when urged in extenuation of the worst deeds of those who have never known Christian teaching."

এই সকল কারণে সিপাহীযুদ্ধ হওয়ায় ইংরাজরাজত্ব যাইতে বসে; এইরূপে উহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধের কারণের মধ্যে বা যুদ্ধাবসানের পরের দৃশ্যগুলির মধ্যে বিধাতার হস্ত আমরা খুঁজিয়া পাই না। যাঁহারা পান, তাঁহারা দেখাইয়া দিলে দেখিতে প্রস্তুত আছি। বলা বাহুল্য, এই যুদ্ধে যে সকল দেশী লোক পিশাচের মত ব্যবহার করিয়াছিল, আমরা তাহাদিগকেও নরাধম বলিয়া মনে করি।

এক্ষণে অনেকে বলিবেন, যুদ্ধাবসানে লর্ড ক্যানিং যেরূপ দয়া ও সুবিবেচনার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা ত উত্তম। আমরা ইহা স্বীকার করি, কিন্তু এখানে কথা হইতেছে এই যে মহারাণী ঘোষণাপত্র প্রচার করিলে কি হয়, তদনুসারে ত কাজ হয় না। এ কথা না হয় নাই বলিলাম যে এই ঘোষণাপত্রও স্বার্থপ্রণোদিত। লর্ড লিটন ত একটি গুপ্ত (এক্ষণে প্রকাশিত) মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন যে আমরা (ইংরাজ শাসনকর্তারা) ঘোষণাপত্রের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছি। লর্ড কার্জন ত পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে ভারতবাসী রাজকার্য্যে কখন ইংরাজের মত সর্ব্বোচ্চ পদগুলি পাইবে না। ইংরাজ ফিরিঙ্গী ও দেশী লোকদের মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমা হইলে ক্বচিৎ কদাচ সুবিচার হয়। আমরা রাজভক্ত বলিয়া যতই চীৎকার করি না কেন, এবং বুয়ার যুদ্ধ প্রভৃতি সঙ্কটকালে ইংরাজেরা আমাদিগকে রাজভক্ত বলিয়া যতই মানুক না কেন, তাহারা আমাদিগকে রাজভক্ত মনে করে না। প্রমাণ, অস্ত্র আইন; প্রমাণ, অস্ত্র আইন অনুসারে অস্ত্র ব্যবহার করিবার অনুমতির সংখ্যার ক্রমিক হ্রাস; প্রমাণ, খৃষ্টানেরা ভোলাণ্টিয়ার হইতে পায়, অন্য ধর্ম্মের লোকেরা পায় না; প্রমাণ, দেশীয় সৈন্যদল হইতে ক্রমে ক্রমে মারাঠা প্রভৃতিদের বিতাড়ন ও সীমান্ত প্রদেশের সৈন্যগ্রহণ; প্রমাণ, দেশীয় সৈন্যদলে দেশীয় কর্ম্মচারীর ক্ষমতা হ্রাস ও ইংরাজ কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি।

যাঁহারা ইংরাজশাসনকে বিধাতার বিধান মনে করেন, তাঁহারা বলেন যে ইংরাজরাজত্বে আমাদের যে সকল উপকার হইয়াছে, তৎসমূহ এরূপ মনে করিবার একটি কারণ। উপকার যে হইয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করি। যথা:—

(১) শিক্ষার দ্বারা আমাদের চোখ্ ফুটিয়াছে; (২) দেশে শান্তি ও সুশাসন স্থাপিত হইয়াছে; (৩) ইংরাজশাসন সমস্ত ভারতকে আমাদের দেশ এবং সমুদয় ভারতবাসীকে আমাদের স্বদেশীয় মনে করিতে বাধ্য করিতেছে; (৪) হিন্দু মুসলমান সকলে ইংরাজরূপী সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বী পাইয়া এক হইবার একটা কারণ পাইয়াছে; (৫) ইংরাজীরূপ সাধারণ ভাষা আমরা ব্যবহার করিতেছি; (৬) রেল প্রভৃতি দ্বারা বাণিজ্য ও যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। (৭) স্ত্রীজাতির ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের দুর্দ্দশার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল উপকার সম্বন্ধেও আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। খুলিয়া বলিবার স্থান নাই। সংকেতে বলিতেছি। ইংরাজ আমাদের রাজা না হইলে এসকল উপকার হইত না, ইহা কে বলিতে পারে? বিধাতার হাতে উপায়ের অভাব নাই। জাপান কি উন্নত হয় নাই? চীনের কি উন্নতি হইতেছে না? আমাদের মঙ্গলের জন্য ইংরাজ নিজের আধটি পয়সাও ব্যয় করে নাই। সবই আমাদের টাকায় হইয়াছে। যাঁহারা আমাদের উপকার করিয়াছেন মনে করেন, তাঁহারা পুরা পারিশ্রমিক অপেক্ষাও বেশী টাকা পাইয়াছেন; যীশুখৃষ্ট আদি পূর্ব্বোল্লিখিত নরহিতৈষী মহাত্মাদের মত ইংরাজেরা নিঃস্বার্থভাবে খাটেন নাই। আমাদের ধারণা, ইংরাজেরা অন্যান্য জাতিরই মত সকল স্থলেই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করে; আমাদের মঙ্গল, তাহাদের উদ্দেশ্য নয়; উহা একটা আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। বার্ক বলেন:—

Never wholly separate in your mind the merits of any political question from the men who are concerned in it. You will be told that if a measure is good, what have you to do with the character and views of those who bring it forward? But designing men never separate their plans from their interests, and if you assist them in their schemes, you will find the pretended good in the end thrown aside, or perverted, and the interested object alone compassed; and this, perhaps, through your means.

নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলিও বিবেচ্য:—

কাজের ফল ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে—

We ask what a man has done, but from what degree of virtuous principle he acts is not so carefully weighed.—*Thomas a' Kempis.*

স্থশাসন সম্বন্ধে—

To secure good administration was one thing, but good government could never be a substitute for government by the people themselves.—*Sir Henry Campbell-Bannerman.*

It would be better for the Indian people to be governed by their own "corrupt" countrymen than by the angelic European leeches.—*Dadabhai Naoroji.*

শান্তি সম্বন্ধে—

Peace indeed is both sweet in name and wholesome in reality: but there is all the difference in the world between peace and slavery. Peace is the calmness of freedom, slavery the worst of all evils, to be kept off at the cost not only of war, but even of life itself.—*Cicero.*

রেলবিস্তার সম্বন্ধে—

"Were India only covered with a net-work of railways corresponding to its powers of production, and to the requirements of its population, the present volume both of our import and of our export-trade, considerable as it is, would undoubtedly be greatly augmented." Lord Dufferin's speech at a dinner given by the London Chamber of Commerce, October 30, 1889.

রেলবিস্তারের প্রধান উদ্দেশ্য দুটি, ইংরাজের বাণিজ্য বিস্তার, এবং অন্তর্যুদ্ধ ও বহির্যুদ্ধের সুবিধা।

মোট কথা এই, ইংরাজের যে যে কাজে ও ব্যবস্থায় আমাদের লাভ বা সুবিধা হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, তাহার প্রত্যেকটিতেই আমাদের চেয়ে ইংরাজের অধিক লাভ ও সুবিধা হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে আমরা ইহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইতে পারি।

তাহার পর ইংরাজরাজত্বের কুফলগুলিও একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য বিবেচ্য। কারণ, ইহাও সম্ভব যে সুফল অপেক্ষা কুফলই বেশী হইয়াছে। যথাঃ—(১) আমরা দিন দিন অধিকতররূপে পৌরুষহীন ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি। সৈনিক বিভাগের উচ্চপদ কোন ভারতবাসী পায় না, যুদ্ধকৌশল শিখিতে পায় না। শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ জাতিসকলের ভারতবাসী সৈনিকবিভাগে ঢুকিতে পাইতেছে না। অস্ত্র আইনের ও পুলিসআদির অত্যাচারের ফলে সকলে ভীরু ও নির্বীর্য্য হইয়া যাইতেছে। (২) ইংরাজ বলিতেছেন, তোমাদের নিকৃষ্টতা জাতিগত; তোমরা উৎকৃষ্টতর জাতির অধীনে থাকিবেই থাকিবে; তোমরা অন্যনিরপেক্ষ হইয়া নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া কিছু হইতে, কিছু করিতে পার না, কখন পারিবে না। আমরাও ইংরাজের এই স্বার্থপ্রসূত মিথ্যা কথা মানিয়া লইয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত জড়তাগ্রস্ত হইতেছি। ফলে, আমাদের আত্মনির্ভরের হ্রাস ও শক্তিহানি হইয়াছে ও হইতেছে। ইংরাজ রাজত্বে আমাদের পুরুষকার-লোপই ঘোরতম ক্ষতি। (৩) রাজনৈতিক অধিকার লোপ ও সর্ব্বপ্রকার উচ্চতম রাজপদ হইতে চ্যুত হওয়া। এ বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন:—

"Your Majesty is aware, that under their former Muhammadan Rulers, the natives of this country enjoyed every political privilege in common with Mussulmans, being eligible to the highest offices in the State, entrusted with the command of armies and the government of provinces and often chosen as advisers to their Prince, without disqualification or degrading distinction on account of their religion or the place of their birth. They used to receive free grants of land exempted from any payments of revenue, and besides the highest salaries allowed under the Government, they enjoyed free of charge, large tracts of country attached to certain offices of trust and dignity, while natives of learning and talent were rewarded with numerous situations of honour and emolument. Although under the British Rule, the natives of India, have entirely lost this political consequence, ."

ফলে, এখন সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, কার্য্যক্ষম, বিদ্বান্ এবং চরিত্রবান ভারতবাসীকেও যে কোনও অপদার্থ ইংরাজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বিবেচিত হইতে হইতেছে। (৪) দেশের শিল্পকলার বিলোপ ও তজ্জনিত ধনক্ষয়। এ বিষয়ে কেবল ঐতিহাসিক হোরেস হেম্যান উইলসনের মতই যথেষ্ট।

"The history of the trade of cotton cloth with India affords a singular exemplification of the inapplicability to all times and circumstances of that principle of free trade which advocates the unrestricted admission of a cheap article, in place of protecting by heavy duties a dearer one of home manufacture. It is also a melancholy instance of the wrong done to India by the country on which she had become dependent. It was stated in evidence, that the cotton and silk goods of India up to this period [1813] could be sold for a profit in the British market, at a price from fifty to sixty

per cent. lower than those fabricated in England. It consequently became necessary to protect the latter by duties of seventy and eighty per cent. on their value or by positive prohibition. Had this not been the case, had not such prohibitory duties and decrees existed, the mills of Paisley and of Manchester would have been stopped in their outset, and could scarcely have been again set in motion, even by the powers of steam. They were created by the sacrifice of the Indian manufacture. Had India been independent, she would have retaliated; would have imposed preventive duties upon British goods and would thus have preserved her own productive industry from annihilation. This act of self-defence was not permitted her; she was at the mercy of the stranger. British goods were forced upon her without paying any duty: and the foreign manufacturer employed the arm of political injustice to keep down and ultimately strangle a competitor with whom he could not have contended in equal terms."

The History of British India, by Horace Hayman Wilson, Vol I, p. 385.

(৫) ইংরাজ রাজপুরুষ ও ইংরাজ বণিক্‌দিগের দ্বারা ভারতবর্ষের প্রায় ৪৫ কোটি টাকা প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে নীত হয়। ভারতগবর্ণমেণ্ট নিজের ছোট বড় সমুদয় কর্ম্মচারীকে যত বেতন দেন, তাহার শতকরা আশি টাকা ইংরাজ কর্ম্মচারীরা পায়। (৬) এইরূপ ধনক্ষয় হওয়ায় ভারতে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইতেছে। ইংরাজরাজত্বের পূর্ব্বেও দেশে দুর্ভিক্ষ হইত; কিন্তু এরূপ বহু বিস্তৃত ও এরূপ ঘন ঘন হইত না। এ বিষয়ে সেদিন বিলাতে একটি বক্তৃতায় বিখ্যাত পাদরী একেড্ সাহেব (Rev. Dr. Aked) বলেন:—

Famine in India was chronic, and things were going from bad to worse. In the first quarter of the nineteenth century there were five famines with a million deaths; in the second quarter, two famines, with half a million deaths; and in the third quarter, six famines, with five million deaths; and in the last quarter, sixteen famines, with twenty-six million deaths. The average income told the same tale. India had retrograded materially, and the simple fact was that the longer our rule continued, the worse the condition of things became. They passed no judgement on British rule in India; but whether the state of things was in consequence of or in spite of British rule, their plea was the same, and that was that the system should be changed, and they should apply to the intelligence, the self-protecting instincts, and the patriotism of the Indian people themselves, and entrust them with a large share in the government of their country. (Applause.)

(৭) ইংরাজরাজত্বে রেলওয়ে বিস্তার জন্য ম্যালেরিয়ায় এবং দারিদ্র্যবৃদ্ধি জন্য প্লেগে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে। ১৯০৪ সালের শেষ পর্য্যন্ত তেত্রিশ লক্ষ লোক প্লেগে মরিয়াছে। পূর্ব্বেও প্লেগ হইত। কিন্তু এরূপ দেশব্যাপী প্লেগ ইংরাজ-রাজত্বের পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। (৮) গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন লোপ।

এ বিষয়ে আর অধিক লিখিবার ইচ্ছা নাই। হইতে পারে যে মুসলমান আমাদের পিঠে চাবুক মারিত; কিন্তু ইংরাজ পেটে মারিতেছে।

যদি কোন কোন বিষয়ে অপকার ও কোন কোন বিষয়ে উপকার হইলে কোন রাজত্বকে বিধাতার বিধান বলা চলে, তাহা হইলে মুসলমান রাজত্বকে বিধাতার বিধান বলিব না কেন? মুসলমান রাজত্বের অপকৃষ্টতম অংশের সহিত ইংরাজরাজত্বের উৎকৃষ্টতম দিকের তুলনা করা ন্যায়সঙ্গত নহে। মুসলমান রাজত্বে ভারতবর্ষের কি কি উপকার হইয়াছে, তাহা মহামতি মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে মহাশয় ১৮৯৯ সালে লক্ষ্ণৌ সহরে একটি বক্তৃতায় পরিষ্কার ভাবে প্রদর্শন করেন। আমরা তন্মধ্যে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। মুসলমান রাজত্বে রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানের যতটা সমতা ছিল, এখন ইংরাজ ভারতবাসীর মধ্যে যে তাহা নাই, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বে 'মোটের উপর দেশের ধন যে দেশেই থাকিত' তাহা সর্ব্বজনবিদিত। এখন রাণাডের কথা বলি। মুসলমান ধর্ম্মের সার্ব্বজনিক সাম্যবাদের ফলে উত্তর-ভারতে হিন্দুদের মধ্যে জাতিবৈষম্যের প্রকোপ অনেক হ্রাস পায়। দক্ষিণ-ভারতে মুসলমান প্রভাব তেমন বিস্তৃত হয় নাই। এই জন্য এখনও তথায় উত্তর-ভারত অপেক্ষা শূদ্রাদির অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। মুসলমান প্রভাবে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার কমে। পাঁচশত বর্ষব্যাপী মুসলমান রাজত্বের ফলে হিন্দুরা নবতেজে আবার আপনাদের প্রভাব স্থাপন করে।

"Of one thing we are certain, that after lasting over five hundred years, the Mahomedan empire gave way, and made room for the re-establishment of the the old native races in the Punjab, and throughout central Hindustan and Southern India, on foundations of a much more solid character than those which yielded so easily before the assault of the early Mahomedan conquerors. The domination, therefore, had not the effect of so depressing the people that they were unable to raise their heads again in greater solidarity."

ইংরাজ শাসনে আমাদের উপর ঠিক্ ইহার উল্টা ফল ফলিয়াছে। আমরা কোথায় শক্তিশালী হইব, নব বলে বলীয়ান, নব তেজে তেজীয়ান হইব, রাণাডের কথায় কোথায় আমরা "revived native powers" পাইব, না, একেবারে দমিয়া যাইতেছি ও ভীরু কাপুরুষ হইয়া যাইতেছি। রাজা রামমোহন রায় ৫০ বৎসর ব্যাপী ইংরাজ শাসন লক্ষ্য করিয়া ইংরাজজাতিকে অন্য জাতির স্বাধীনতার পোষক বলিয়াছিলেন। এখন বাঁচিয়া থাকিলে হয় ত তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইত। ইংরাজ নিজের অধিকৃত পরদেশ ব্যতীত অন্য সকল দেশে প্রজামর্দ্দনের শত্রু। এবিষয়ে সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস লেখক কে (Kaye) সাহেব রাজা রামমোহন রায়ের অনেক পরে লিখিয়াছেন :—

To suggest that in an Asiatic race there might be a spirit of independence and a love of country, the manifestations of which were honourable in themselves, however inconvenient to us, was commonly to evoke as the very mildest result the imputation of being 'Anti British, whilst sometimes the 'true British feeling' asserted itself in a less refined choice of epithets, and those who ventured to sympathise in any way with the people of the East were at once denounced as 'white niggers.' Yet among these very men, so intolerant of anything approaching the assertion of liberty by an Asiatic people, there were some who could well appreciate and sympathise with the aspirations of European bondsmen, and could regard with admiration the struggles of the Italian, the Switzer or the Pole to liberate himself, by a sanguinary contest from the yoke of the usurper. But the sight of the dark skin sealed up their sympathies. They contended not merely that the love of country, that the spirit of liberty, as cherished by European races, is in India wholly unknown, but the Asiatic nations, and especially the nations of India, have no right to judge what is best for themselves; no right to revolt against the beneficence of a more civilised race of white men, who would think for them, and deprive them, for their own good, of all their most cherished rights and their most valued possessions."

হার্বার্ট স্পেন্সার সত্যই বলিয়াছেন :—

"Feelings and deeds we laud as virtuous when they are not in antagonism with our own interests and power, we think vicious feelings and deeds when our own interests and power are endangered by them. Equally in the mythical story of Tell and in any account not mythical, we read with glowing admiration of the successful rising of an oppressed race; but admiration is changed into indignation if the race is one held down by ourselves. We can see nothing save crime in the endeavour of the Hindus to throw off our yoke; and we recognise no excuse for the efforts of the Irish to establish their independent nationality. We entirely ignore the fact that the motives are in all such cases the same, and are to be judged apart from results."

আকবরের রাজত্বের আরম্ভ হইতে ১০০ বৎসরে সর্ব্ববিষয়ে ভারতবর্ষের কি কি উন্নতি হইয়াছিল, তাহা রাণাডে দেখাইয়াছেন। আকবর হিন্দুনারীর দুর্দ্দশা মোচনের জন্য অনেক উপায় অবলম্বন করেন। মুসলমানের নিকট হিন্দু শাসননীতি ও যুদ্ধকৌশল বিষয়ে অনেক শিক্ষা লাভ করে। মুসলমানের সংস্পর্শে তাহাদের রুচি ও আদবকায়দা মার্জ্জিত ও উন্নত হয়। মুসলমানেরা বারুদ ও কামানের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করে। অনেক রকম শিল্পকলার প্রবর্ত্তক মুসলমানেরা। তাহাদের বিদেশী নামই তাহার প্রমাণ। তাহারা মোমবাতী, কাগজ, কাচ, ঘরের আসবাব, ঘোড়ার জীন প্রভৃতির প্রবর্ত্তন করে। সঙ্গীত, চিকিৎসা ও জ্যোতিষের উন্নতি করে। তাহাদের দৃষ্টান্তে ভূগোল, ইতিহাস ও সাহিত্যের উন্নতি হয়। তাহারা রাস্তাঘাট, খাল, সরাই, ডাকঘর নির্ম্মাণ ও স্থাপন করে। উন্নত স্থাপত্যরীতির প্রচলন ও উদ্যানপ্রতিষ্ঠা রীতির প্রবর্ত্তন করে। অনেক নূতন ফল ফুল ভারতে উৎপাদন করে। উৎকৃষ্ট রাজস্বনীতি প্রবর্ত্তিত করে। তাহা এখনও চলিতেছে। সমুদ্রপারস্থ দেশের সহিত বাণিজ্য চালাইয়া ভারতবর্ষকে বিদেশের সহিত সংযুক্ত রাখিয়া উহার কূপমণ্ডুকতা দূর করে।

ধর্ম্ম ও চিন্তা-জগতে পরস্পরের সংস্রবে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই উপকার হইয়াছে। মুসলমানের ধর্ম্মান্ধতা কমিয়াছে। হিন্দুর জাতিবৈষম্য কমিয়াছে। হিন্দু এক দেবতা বা একেশ্বরনিষ্ঠ হইয়াছে। প্রমাণ উত্তর-ভারতে বৈষ্ণব, রামানন্দী, শিখ, কবীরপন্থা, মালিকদাসী, দাদুপন্থী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব; এবং দক্ষিণে তুকারাম, একনাথ, নামদেব প্রভৃতি সাধু মহাত্মাদিগের ধর্ম্মপ্রচার। রাণাডের মতে The Brahma and the Arya Samaja movements of this century are the continuations of this ethical and spiritual growth. তদ্ভিন্ন হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিতেছিল এবং উভয়ের সংযোগে একটি জাতি গঠিত হইতেছিল। আওরঙ্গজেব ধর্ম্মান্ধ রাজনীতি প্রবর্ত্তিত না করিলে বোধ হয় আজ ভারতের ভাগ্য অন্যরূপ হইত।

"Owing to this circumstance, the work of fusion was left incomplete; and in the course of years, both the communities have developed weaknesses of a character, which still needs the disciplining process to be continued for a longer time under other masters. Both Hindus and Mahomedans lack many of those virtues represented by the love of order and regulated authority. Both are wanting in the love of municipal freedom, in the exercise of virtues necessary for civic life, and in the aptitude for mechanical skill, in the love of science and research, in the love of daring and adventurous discovery, the resolution to master difficulties, and in chivalrous respect for womankind."

এখন এই other masters, এই আমাদের বর্ত্তমান প্রভুরা আমাদিগকে উন্নতির কিরূপ সুযোগ দিতেছেন, তাহা সকলেই জানেন। ইহার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে উন্নতি সম্পূর্ণ আমাদের হাতে; কিন্তু লজ্জার সহিত বলিতে হইতেছে যে এ সকল বিষয়ে হিন্দু বা মুসলমান কাহারও বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে না।

আমাদের বক্তব্য এইখানেই শেষ করিলাম। ইংরাজ-শাসন বিধাতার বিধান কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণগুলি বলিলাম। এখন কোন উপযুক্ত ব্যক্তি সন্দেহ ভঞ্জন করিলে উপকৃত হইব।

পরীক্ষার বয়স নির্দ্দেশ।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ব্বেই প্রবেশিকা পরীক্ষার ন্যূনতম বয়স ১৬ বৎসর নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখন কলিকাতাতেও তাহাই হইল। ইহার সপক্ষে সাহেবেরা প্রধানতঃ কি কি যুক্তি দেখান, দেখা যাক্।

তাঁহারা বলেন, ভারতীয় অভিভাবকেরা বেশী চাপ দিয়া, বেশী মানসিক পরিশ্রম করাইয়া ছেলেদিগকে কাঁচা বয়সে পরীক্ষা পাশ করাইয়া থাকেন। তাহাতে ছাত্রদের অনিষ্ট হয়। অতএব ১৬ বৎসরের কমে কাহাকেও প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে দেওয়া উচিত নয়। ধরিয়া লইলাম যে কোন কোন স্থলে অধিক চাপ দেওয়া হয়। কিন্তু ইহা ত সকলেই জানেন যে, বিস্তর ছাত্র বিনা চাপে অনায়াসে ১৪।১৫ বৎসর বয়সে প্রথম বিভাগেও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ও হইতে পারে। ইহাদিগকে কেন অকারণ ১ বা ২ বৎসর বসাইয়া রাখা হইবে? আইনের একটা মূল নীতি আছে যে ১০ জন অপরাধীর সাজা না হয়, তাহা বরং ভাল; কিন্তু একজনও নিরপরাধীর সাজা হওয়া উচিত নয়। তেমনি আমরা বলি যে, যে সকল ছাত্র দেহ মন সুস্থ রাখিয়া, স্বাস্থ্যের নিয়মভঙ্গরূপ অপরাধে অপরাধী না হইয়া, ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে পরীক্ষা পাশ করিতে পারে, তাহাদিগকে অকারণ বসাইয়া রাখিয়া দণ্ডিত করা উচিত নয়। ইহাতে যত অসুবিধা বুদ্ধিমান ছাত্রদেরই হইবে।

যাহার মানসিক শক্তি কম, তাহাকেই পাশ করাইবার জন্য চাপ দিতে হয়। কিন্তু মানসিক শক্তির সমান বিকাশ সকল ছাত্রের একই বয়সে হয় না। সুতরাং কোন ছাত্র ১৫ বা ১৪ বৎসর বয়সে যাহা অনায়াসে করিতে পারে, আর একজন তাহা ১৮ বৎসরেও না করিতে পারে। অতএব সকলকেই মানসিক বিকাশ হিসাবে একশ্রেণীতে ফেলা অতিশয় অযৌক্তিক। আইনের দ্বারা অনেক অঘটন ঘটে; কিন্তু আইনের দ্বারা সকল ছাত্রেরই মানসিক শক্তির বিকাশ ঠিক ১৬ বৎসরে একবিধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কথিত আছে গ্রীস্ দেশে পুরাকালে প্রোক্রাষ্টিস্ নামে এক ডাকাত ছিল। তাহার হাতে যাহারা পড়িত,

সে তাহাদিগকে একটা খাটে শুয়াইত। এই খাটটা হয় তাহাদের শরীরের চেয়ে লম্বা নয় খাট হইত। সুতরাং সে হয় তাহাদের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া নয় তাহাদিগকে (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের ব্যবস্থা অনুসারে) পিটাইয়া পিটাইয়া লম্বা করিয়া বিছানার সমান করিবার চেষ্টা করিত। এইরূপে হতভাগ্য লোকগুলির প্রাণ যাইত। আমাদের সরকার বাহাদুর আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য কি এইরূপ একটা প্রোক্রাষ্টিসের বিছানা প্রস্তুত করিতেছেন? আয়র্লণ্ডে এবংবিধ একটি নিয়ম সম্বন্ধে অধ্যাপক মাহাফী বলেন ঃ

"For, (1) No boy professing to be under thirteen is allowed to compete a rule evidently intended to obviate the undue pressing of clever and diligent children. But we can point to cases of brilliant children, afterwards becoming brilliant men, who at the age of eleven could without difficulty answer the papers of the preparatory year, as now understood. Are these children of genius to be held back in order that they may win scholarships for themselves and result fees for their masters?"

"The tendency, therefore, of the present system is to make every school-master sort his boys, not according to brains or development, but according to age."

Professor Mahaffy, "How to circumvent 'cramming' in Irish Secondary Education," in the *Nineteenth Century* for Nov. 1898.

আর একটা যুক্তি এই যে, স্কুল অপেক্ষা কলেজে স্বাধীনতা বেশী। ছোট ছেলেদিগকে এই স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয়। এটা বিলাতী যুক্তি, বিলাতে খাটে; আমাদের দেশে খাটে না। বিলাতে স্কুলে কলেজে শাসনের, নিয়মানুগত্যের মাত্রায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমাদের স্কুলে যেমন কলেজেও প্রায় তেমনি শাসন। বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। মেসে ছেলেরা বাড়ীর চেয়ে বেশী স্বাধীন ভাবে থাকে সত্য; কিন্তু তাহার বন্দোবস্ত মেসের তত্ত্বাবধানের বিধান করিলেই হইবে। তাহা হইয়াছেও। তা ছাড়া, ঠিক্ ১৬ বৎসর বয়সেই ছেলেরা স্বাধীনতার উপযুক্ত হইবে, ২।১ মাস বা বৎসর আগে হইবে না, ইহাই বা কোন্‌দেশী যুক্তি? সকল মানুষ একই বয়ঃক্রম অনুসারে স্বাধীনতার উপযুক্ত হয় না। কাহারও আত্মসংযমক্ষমতা ও দায়িত্ববোধ অল্প বয়সে হয়, কাহারও বা বেশী বয়সে হয়, কাহারও বৃদ্ধবয়সেও হয় না। যাহাদের চরিত্রের গঠন ক্রিয়া ধীরেসুস্থে হয়, তাহাদের জন্য সকলকে দণ্ড দেওয়া বিধেয় নহে।

ইহারই সংস্পৃষ্ট আর একটা যুক্তি এই যে, বেশী বয়সের ও কম বয়সের ছেলেদের একসঙ্গে মিশিতে দেওয়া নৈতিক অনিষ্টের কারণ। ইহা সত্য কথা। কিন্তু এ যুক্তিটাও বিলাতে যেমন খাটে, এদেশে তেমন খাটে না। এদেশে কলেজ মানে একটা অধ্যাপনার যায়গা; বিলাতে কলেজ মানে আরও কিছু,—শিক্ষাদাতাদের তত্ত্বাবধানে একটা একত্র বাসের যায়গা। ছোট বড় ছেলের একত্র বাসে যে কু-ফল হয়, একত্র পাঠে তাহা হয় না। তদ্ভিন্ন আমাদের স্কুল ও কলেজ সকল অধিকাংশস্থলেই এক বাড়ীতে না এক হাতায় স্থাপিত; স্কুল কলেজের ছেলেরা অবাধে মিশিতে পারে। স্কুলেও একই শ্রেণীতে ৪।৫ বৎসরের বয়সের প্রভেদ এরূপ ছেলে পড়ে। এমত স্থলে পরীক্ষার একটা বয়স নির্দ্দেশ করিয়া কি লাভ হইবে? ছেলেদের নৈতিক উন্নতির বন্দোবস্ত অন্যবিধ হওয়া দরকার। তাহা অনেক সামাজিক এবং গার্হস্থ্য রীতিনীতির উপরও নির্ভর করে। সে সকল কথা এখানে বিচার্য্য নহে।

আর একটা যুক্তি এই যে, কম বয়সের ছেলেরা অধ্যাপকদের অধ্যাপনা বুঝিতে পারে না। ইহার কোন মূল্য নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মানসিক শক্তির বিকাশ সকলের এক বয়সে একরূপ হয় না। সুতরাং ১৬ বৎসর বয়স হইলেই ছেলেরা কঠিন বিষয় বুঝিতে পারিবে, তাহার আগে পারিবে না, ইহা সত্য নহে। বাস্তবিক অভাব, ভাল শিক্ষাপ্রণালীর, ভাল শিক্ষকের, ভাল শিক্ষা দিবার সরঞ্জামের (apparatus)। এ সকল অভাব দূর না করিয়া পরীক্ষার বয়সনির্দ্দেশরূপ সস্তা অনিষ্টকর ব্যবস্থা করা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপযুক্তই হইয়াছে। কারণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আমাদের সুশিক্ষা দিবার চিন্তায় ঘুম হইতেছে না!

এখন আরও কতকগুলি কথার বিচার করা দরকার। ১৬বৎসরটারই উপর এত ঝোঁক পড়িল কেন? ৩ বার, ৭ বার, ৯ বার, কোন কোন মন্ত্র আওড়াইলে বা অঙ্গবিশেষ চালনা করিলে শুনা যায় অদ্ভুত ফল ফলে; ১৬ সংখ্যাটিতেও

কি তদ্রূপ কোন জাত আছে? আমাদের দেশী শিক্ষানীতি অনুসারে ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া ১৬য় পড়িলে (প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে) ছেলেদিগকে কতকটা স্বাধীনতা দিবার কথা আছে। কিন্তু সাহেবেরা বলেন, না, ১৬ অতিক্রম করা চাই। এখন, কাহার কথা মানিব? আমাদের দেশের জলবায়ু আদি প্রাকৃতিক কারণ সমষ্টির ফল আমাদের দেশী প্রবাদবাক্যেই অভ্রান্তভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকবার অধিক সম্ভাবনা। শীতপ্রধান দেশে দৈহিক ও মানসিক বিকাশ কিছু বিলম্বে হয়। তথায় যৌবনারম্ভ ১ বৎসর পরে হইতে পারে। কিন্তু সে সব দেশের কথাও একখানা শিক্ষা-বিষয়ক প্রামাণিক গ্রন্থে কিরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে দেখুন:-

"It has been generally agreed that there are three distinct stages in the development of the mind corresponding to three clearly marked periods in the development of the body. The three epochs extend each over seven years, and are strikingly distinguished by physiological differences in the constitution, some of which are external and obvious. These periods are infancy, childhood and youth."

"Childhood extends from the seventh to the fourteenth year, or the attainment of puberty, and coincides nearly with the second dentition"

"In the United States the legal school age is from five to fifteen; in France from seven to twelve; in Germany from six to fourteen." "AGE IN EDUCATION" in the *Cyclopaedia of Education.*

সুতরাং পূর্ণ ১৬ বৎসরেই যে একটা সুনির্দ্দিষ্ট, সুপরিলক্ষণীয় শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহার পূর্ব্বে ঘটিবে না, এমন কোন কথা নাই।

সত্য বটে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকার বয়স ১৬, জাপানে ১৭। কিন্তু দুই-ই শীতপ্রধান স্থান, সুতরাং তথায় দেহ মনের বিকাশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা কিছু বিলম্বে হইতে পারে; এবং উভয় স্থানেই পরীক্ষার মান (standard) আমাদের প্রবেশিকার চেয়ে অনেক উচ্চ। সুতরাং বেশী শিখিতে বেশী বয়স লাগিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ১৫ বৎসর বয়স নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এখন আরও ১ বৎসর বাড়াইবার কি কারণ ঘটিল? গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাবে ১৫ বৎসর বয়স মঞ্জুর করিয়াছেন। বাঙ্গালীর ছেলেদের চেয়ে পঞ্জাবী ছেলেরা কি লেখা-পড়ায় অল্প বয়সে বেশী পারদর্শী হয়? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময় ১৬ বৎসর বয়স নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু তাহা অনিষ্টকর প্রতীত হওয়ায় উঠাইয়া দেওয়া হয়।

ল্যাথাম সাহেব বিলাতের একজন বিখ্যাত শিক্ষানীতিজ্ঞ। তিনি বলেন:--

"The three years from 18 to 21, the proper season for University residence."—p. 444, The Action of Examinations, by H. Latham.

"We should not continue Examinations beyond the age of 22, excepting when a guarantee is wanted of Special or Professional knowledge which is to be turned to actual use, and such Examinations need not be and should not be of a closely competitive character."

Ditto. p. 405.

অক্সফর্ড কেম্ব্রিজের বি. এ-রা আমাদের দেশে আসিয়া এম. এ পরীক্ষার বিষয়ও পড়াইয়া থাকেন। সুতরাং তাহারা অন্ততঃ আমাদের এম্. এদের সমান, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ল্যাথাম সাহেবের মতে ২১ বৎসর বি. এ. হইবার উপযুক্ত বয়স। আমাদের এখানে কিন্তু তাহার সমতুল্য (তাহাও সন্দেহ স্থল) বিদ্যালাভ করিতে অর্থাৎ এম্. এ হইতে ২২ বৎসর লাগিবে। চমৎকার বন্দোবস্ত! ২২ বৎসরের পরে ল্যাথাম সাহেবের মতে আর পরীক্ষা দিবার বয়স থাকে না। পরীক্ষা দিলেও উহা প্রতিযোগিতামূলক হওয়া উচিত নয়। যদি কেহ সিবিলিয়ান হইবার জন্য বিলাত যাইতে চায়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে এখানে বি. এ. পাশ করিয়া গিয়া বিলাতে তিন বৎসর পড়িলে ভাল হয়। কিন্তু তাহাতে বয়স ২৩ বৎসর হইয়া যায়; বাইশের মধ্যে হয় না। এবং ২৩ বৎসরে একবার ফেল হইলে পরীক্ষার্থীর আর পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার সুযোগ থাকে না। কেহ এখানকার বি. এ. পাশ করিয়া বিলাতের বি. এ. হইতে চাহিলে তাহাও বাইশ বৎসরের মধ্যে হয় না।

অতঃপর আইন ও চিকিৎসা ব্যবসার কথা ধরা যাক্। আমাদের এখানে আর ২২ বৎসরের আগে বি. এল্. পাশ করিয়া উকীল হইবার উপায় থাকিবে না। কিন্তু বিলাতে ২১ বৎসরে ব্যারিষ্টার হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। অথচ আমাদের বি. এল্ অপেক্ষা ব্যারিষ্টারের সম্মান, অধিকার ও কাজের সুবিধা অধিক! বিলাতে ২১ বৎসরে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই; কিন্তু এখানে

১৮ বৎসরে এফ্. এ. পাশ করিয়া বরাবর ঠিক্ সময়ে মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ২৩ বৎসর বয়সে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করা যায়। ইংলণ্ডে চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিবার বয়স ১৬ হইতে কমাইয়া ১৫ করা হইয়াছে। এখানে কিন্তু ১৮ বৎসরের কমে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাহারও চিকিৎসা বিদ্যারম্ভের যো থাকিবে না! বিলাতে এঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি কোন বৃত্তিই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ সাপেক্ষ নহে। এখানে এইরূপ সকল বৃত্তির দ্বারের চাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে। অতএব দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আমাদের ছাত্রদিগকে সকল বিষয়েই বিলাতী ছাত্রদের চেয়ে অসুবিধায় ফেলা হইতেছে।

ঠিক্ ষোল বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার সময় উপস্থিত হইবে এবং ঐ বয়সেই তাহারা উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত হইবে, এমন করিয়া কখনও সমুদয় ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না। এখনও অনেক ছাত্রকে ২।১ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইতেছে, ভবিষ্যতেও হইবে। এই সময়টা তাহারা কি করিবে? একই শ্রেণীতে পুনঃ পুনঃ ২।৩ বৎসর ধরিয়া পড়িয়া কি লাভ? তাহা কাহারই বা ভাল লাগে? এই ভাবে পড়িতে বাধ্য করিলে পড়াশুনায় বিতৃষ্ণা এবং আলস্যের অভ্যাস জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কারণ, ছাত্রদের পক্ষে এরূপ মনে করা খুব স্বাভাবিক যে, ও ত আমার পড়াই আছে; আবার কি পড়িব? এই সকল ছাত্রকে বিদ্যালয় হইতে নাম কাটাইয়া লইয়া ঘরে পড়াইবার মত অবসর ও যোগ্যতা উভয়ই অভিভাবকদের থাকিবার কথা নয়। উপযুক্ত গৃহ-শিক্ষক রাখিবার মত সঙ্গতিও অতি অল্প অভিভাবকের আছে। তদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ে পড়িলে সময়নিষ্ঠা, সত্বর কাজ করিবার অভ্যাস, প্রতিযোগিতার ভাব হইতে শিক্ষায় উৎসাহ, দল বাঁধিবার ক্ষমতা, দলের জন্য নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুবিধা ভুলিয়া কাজ করিবার ইচ্ছা ও অভ্যাস, প্রভৃতি জন্মে, ঘরে বসিয়া থাকিলে তাহা হয় না। পক্ষান্তরে, যদি এই সকল ছাত্র স্কুলেই থাকে, তাহা হইলে, তাহাদের শিক্ষার এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা অপেক্ষার ২ বা ১ বৎসর সময় নূতন নূতন কিছু শিখিতে পারে, অথচ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া না যায়। এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইলে সকল স্কুলেই সুযোগ্য কয়েকজন অতিরিক্ত শিক্ষক রাখিতে হইবে, এবং কোন সমীচীন শিক্ষা প্রণালীরও উদ্ভাবন করিতে হইবে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর হইতে পরীক্ষার ন্যূনতম বয়স ১৬ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অথচ কোনও স্কুলে এরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুলগুলিও এখন যেমন আছে, তাহাই থাকিবে। নূতন কিছু ব্যবস্থা হইবে না। সুতরাং সাহেবদের খেয়াল বা স্বার্থপ্রণোদিত কূটনীতির যূপকাষ্ঠে প্রতি বৎসর কতকগুলি নিরপরাধ বুদ্ধিমান্ ছাত্রের স্বার্থ বলি দেওয়া হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

গত বৎসর ১৬ই অক্টোবর জাতীয় ফণ্ডের জন্য চাঁদাতুলিতে আরম্ভ করা হয়। বর্ত্তমান বৎসরের ২৮শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৭০৬৮৪৸৴১ উঠে। ধনীলোকেরা ৪২০০০৲ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন; তন্মধ্যে ৩৬৭৫০৲ টাকা আদায় হইতে বাকী! তাঁহাদের সম্বন্ধে জাতীয় ফণ্ডের আবেদন-পত্রে লেখা হইয়াছে, whose names are sufficient security for their realisation। এলাহাবাদের বাঙ্গালীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু টাকা তুলিয়াছিলেন ও তুলিতেছিলেন। কিন্তু ঐ ইংরাজী কথাগুলি পড়িবার পর আর কাহারও দ্বারে নগদ ভিক্ষা মাগিতে যাইতে আমাদের প্রবৃত্তি ও সাহস হয় নাই। এই ফণ্ডের মুরুব্বি ধনীরা বলিতেছেন, "আমরা বাক্য দিলাম, আমাদের বাক্যই নগদ টাকার সমতুল্য। তোমরা গরীব লোক; অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলেও করিতে পার; অতএব নগদ টাকা দাও।" যেন ধনীলোকেরা কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। ইহাঁরা বুঝেন না যে যাঁহারা মুরুব্বিয়ানা করিবেন, তাঁহাদেরই আগে নগদ টাকা দিয়া তবে কথা কহা উচিত। টাকা থাকিলেই যে লোকে টাকা দেয়, তাহা সর্ব্বত্র সত্য নহে। আর, পরে টাকা আদায় হইলেও এখন কাজ চলিবে কিসে? আমরা এখনও বুঝিলাম না যে কেবল বাক্য দ্বারা কোন জাতির উদ্ধার হয় না।

অনেক বাক্‌বিতণ্ডা ও লেখালেখির পর আমাদের জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ গঠিত হইল ও উহার নিয়মাবলী প্রচারিত হইল।

আমরা মনে করিতেছিলাম, এই পরিষৎ নিজের নাম সার্থক করিবার জন্য প্রথমেই শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত করিবেন; সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত কেবল পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন না। অন্ততঃ "জাতীয়" এক আধটা পাঠশালা খুলিয়া তাহাতে দু'একজন "জাতীয়" গুরুমহাশয়কেও বসাইবেন। কিন্তু কাজে কি হইল? জাতীয় "শিক্ষা" পরিষৎ শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া প্রথমেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। অর্থাৎ যাহাতে বিনামূল্যে সস্তা "জাতীয়তা" করা চলে, সেই আয়োজন। পর্ব্বত কতবার মূষিক প্রসব করিবে? আমরা যদি কাজে কিছু করিতে না পারি, ত বৃথা আস্ফালন করিয়া লোক হাসাইবার কি প্রয়োজন? রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে ২।১টি জাতীয় বিদ্যালয় বাধ্য হইয়া তথাকার লোকদিগকে খুলিতে হইয়াছে। এই সকল স্কুলের জন্য জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ কিরূপ সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়াছেন জানি না। এবং ইহাদের শিক্ষাপ্রণালী কি ভাবে "জাতীয়" তাহাও জানা নাই। আলীগড় কলেজে বার্ষিক লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কেবল অবৈতনিক পরীক্ষকদিগের দ্বারাই কি কার্য্য উদ্ধার করিবেন, ভাবিয়াছেন? ভারতবর্ষের লোক স্বপ্ন দেখার জন্য বিখ্যাত। এত ধাক্কা খাইয়াও ঘুম ভাঙ্গিল না। কিন্তু এখনও আশা আছে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশীঘটিত আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর হইতে অনেক লোকের উপর অত্যাচার অবিচার হইয়াছে। কয়েক জনের অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড হইয়াছে। কেহ কেহ আহত হওয়ায় কিছু রক্তপাতও হইয়াছে। তবে, এ পর্য্যন্ত কেহ অনেক বৎসরের জন্য জেলে যান নাই, কেহ নির্ব্বাসিত বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন নাই, বা হত হন নাই। হয় ত কালে এ সকলও হইবে। ভগবান তজ্জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করুন। কিন্তু আপাততঃ যাহা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের উপর যে উৎপীড়ন হইতেছে, তাহাকে আইরিশ বা রুষীয়দিগের উপর অত্যাচারের সহিত তুলনা করা অত্যুক্তি মাত্র। আমরা আইরিশ বা রুষীয় স্বদেশপ্রেমিকদের পায়ের ধূলা লইবারও যোগ্য এখনও হই নাই। কিন্তু স্থলবিশেষে এরূপ কথা বলা হইতেছে ও বড়াই করা হইতেছে, বুঝি আমরা তাঁহাদিগকেও বা অতিক্রম করিয়া বসি। ষ্টীম এঞ্জিনের বয়েলার হইতে বাষ্প ছাড়িয়া দিলে এঞ্জিনের শক্তি থাকে না। আস্ফালন করিলে উহাতেই সমুদয় কার্য্যশক্তি ব্যয় হইয়া যায়। ভগবান্ আমাদিগকে গম্ভীরভাবে স্বদেশসেবার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করুন। আমরা মাতৃভূমির অতি অযোগ্য সন্তান। মরিলেও মায়ের ঋণ শোধ যায় না। কিন্তু আমরা গায়ে আঁচড় লাগিবা মাত্র, খুব করিয়াছি, ভাবিয়া পরস্পরকে মেডেল দিতে আরম্ভ করিলাম, ইহা ভাল লক্ষণ নয়। কোনও উৎপীড়িত জাতির আত্মোৎসৃষ্ট লোকেরা এরূপ স্বদেশপ্রেমের নাটকীয় অভিনয় করিয়াছেন বলিয়া আমরা ইতিহাসে পড়ি নাই। প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিকের চরিত্রে ও আচরণে অন্যবিধ গাম্ভীর্য্য, বিনয় ও দীনতা পরিলক্ষিত হয়। আমরা অতিশয় কষ্টের সহিত এ সকল কথা লিখিতেছি।

যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, সে কামড়ায় না।

স্বদেশী আন্দোলনে এ পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ যুবক ও বালকেরাই রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছেন। রাজপুরুষেরা কি বাতুল, যে প্রবীণ লোক ছাড়িয়া উহাঁদের উপরই অত্যাচার করিতেছেন? বোধ করি, তা' নয়। সম্ভবতঃ ইহার কারণ, আমাদের দেশের প্রবীণ লোক অপেক্ষা উহাঁদের মধ্যেই রাজপুরুষেরা মনুষ্যত্বের অধিক চিহ্ন দেখিতেছেন। সুতরাং অঙ্কুরেই উহার বিনাশসাধন প্রয়োজন মনে করিতেছেন।

সম্প্রতি ঢাকায় যে প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষাসমিতি বসিয়াছিল, তাহাতে মুসলমানদের জন্য বিশেষ করিয়া এক প্রকার বাঙ্গলা সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে। ঢাকার নবাব, বাঙ্গালীর ঐক্যের শত্রু রাজপুরুষদের হাতে ক্রীড়ার পুতুল। তিনি এই শিক্ষা-

সমিতির মুরুব্বি। এই প্রস্তাবের মধ্যে, সেই কিছু দিন আগেকার বঙ্গভাষা-বিভাগের সরকারী প্রস্তাব নূতন মূর্ত্তিতে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছে। আমরা এরূপ ভাগাভাগি দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের শক্তিক্ষয়ের বিরোধী। ইহা সত্য যে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্য অতিমাত্রায় হিন্দুসাম্প্রদায়িকতায় পূর্ণ রহিয়াছে। যে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্রাট্ বলা হয়, তিনিও এই সংকীর্ণতা অতিক্রম করিতে পারেন নাই, হিন্দুত্ব ছাড়াইয়া উদার মানবত্বে পৌছিতে পারেন নাই। বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকেও এই দোষ দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে হিন্দুদের দোষ নাই; মুসলমানেরা বাঙ্গলার চর্চ্চা করিলে এই দোষ সারিয়া যাইবে। ইংলণ্ড খৃষ্টান দেশ। কিন্তু শেক্‌সপীয়র বা ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ বা কার্লাইল প্রভৃতির পুস্তকাবলীতে খৃষ্টীয় সাম্প্রদায়িকতা বা সংকীর্ণতার ছাপ নাই। উহাতে উদার মানবীয় ভাবই দেখা যায়। সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালী বঙ্গ-সাহিত্যের চর্চ্চা করিলে ক্রমে বঙ্গসাহিত্যেও কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্ত্তে উদার মানবীয় ভাব বা আদর্শ (broad humanity) আসিবে। দুই চারিটা বেশী আরবী ফারসী কথা মুসলমানেরা কথাবার্ত্তায় ব্যবহার করেন। তাহার জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমানে শ্রেষ্ঠ মুসলমান লেখকলেখিকাদের বাঙ্গলা সাধারণ বাঙ্গলারই মত। ইহা বদ্‌লাইবার দরকার নাই। তবে, অল্পশিক্ষিত লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য ভাষা সোজা করা উচিত। কিন্তু অল্পশিক্ষিত হিন্দুদের জন্যও এরূপ সোজা ভাষার দরকার।

আজকাল এই জাতীয়তার আন্দোলনের দিনেও দেখিতেছি, অনেকে জাতীয়ত্ব মানে হিন্দুত্ব মনে করেন। কিন্তু কেবল হিন্দু লইয়া ভারতীয় জাতি (Indian nation) বা বাঙ্গালী জাতি গঠিত নহে। অনেকে ভুলিয়া যান যে সাড়ে চারি কোটি (সপ্তকোটি নহে) বাঙ্গালীর মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী মুসলমান। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-সাহিত্যেও মুসলমান প্রভাব বাড়িবে, এবং মুসলমানের উপরও বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রভাব বাড়িবে। খৃষ্টানেরা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম হইলেও ইহাদের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। কিন্তু আসল কথা এই যে, স্থায়ী বিশুদ্ধ সাহিত্য কাহাকে বলে তাহা আমাদের বুঝা দরকার। মুসলমান যদি "কাফের ধ্বংস" নামক পুস্তক লেখেন, তাহা স্থায়ী বাঙ্গলা সাহিত্য হইবে না। খৃষ্টান যদি গীতা ও শ্রীকৃষ্ণকে গালি দিয়া একটি বহি লেখেন, তাহা বিশুদ্ধ সাহিত্য হইবে না। হিন্দু যদি ব্রাহ্মসমাজ বা খৃষ্টান সমাজ বা বিলাত-ফেরত সমাজের বিদ্রূপপূর্ণ ছবি আঁকেন, তাহাও বিশুদ্ধ সাহিত্য হইবে না। এ সকলের প্রয়োজন থাকিতে পারে: এখন সে তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের বক্তব্য, এই, যে, শেক্‌সপীয়র খৃষ্টান হইয়াও যেমন ম্যাক্‌বেথ লিখিয়াছেন, হ্যামলেট লিখিয়াছেন, খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার বা অখৃষ্টানদের কুৎসা করিবার বা ভ্রম দেখাইবার জন্য নহে, বিশ্বজনীন মানব চরিত্র অঙ্কন জন্য, আমাদিগকেও সেইরূপ সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে হইবে। যে বাঙ্গালী পরাধীন, যাহার নারীরূপ অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত, যে সাম্প্রদায়িকতারূপ কূপের মণ্ডুক, যাহার পথে আরও কত বাধা বিঘ্ন, সে এরূপ সাহিত্য কখনও সৃষ্টি করিতে পারিবে কি না জানি না। তবে বাঙ্গালী প্রেমের কবিতায় এবং ভাগবতী গীতিতে সার্ব্বজনীনতায় পৌছিয়াছেন বলিয়া অন্যদিকেও আশা আছে।

সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার একটা কুলক্ষণ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। মুসলমান বা খৃষ্টান লেখকেরা হিন্দু বা ব্রাহ্ম সম্পাদকের নিকট সমালোচনার্থ প্রায়ই বহি পাঠান না। তদ্রূপ মুসলমান বা খৃষ্টান সম্পাদকের কাছেও অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লেখকদের বহি সমালোচনার্থ প্রায় যায় না। কিন্তু সাহিত্যের দ্বার সকলের জন্য মুক্ত; এখানে, যার আছে ভক্তি সে পাবে শক্তি, নাহি জা'ত বিচার।

চিত্র।

কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে যেখানে শকুন্তলার পুত্র সর্ব্বদমন সিংহশাবককে বলিতেছে, "জিম্ভালে সিংহ-সাবআ জিম্ভ দন্তাইং দে গণইস্‌সং", "হাঁ কররে সিংহের বাচ্চা, হাঁ কর, আমি তোর দাঁতগুলা গণিব", শ্রীযুক্ত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর এবার প্রবাসীর জন্য সেই দৃশ্যের ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

তদ্ভিন্ন এবার সারনাথের দুখানি ছবিও দেওয়া গেল। আর একখানি আষাঢ় মাসে ছাপিবার ইচ্ছা রহিল।

গত বৎসর চৈত্রের প্রবাসীতে ৭২৬ পৃষ্ঠার নীচে যে পাদটীকা আছে, তাহা ভ্রমক্রমে ছাপা হইয়াছে।

ঐ মাসের প্রবাসীতে ৭৮৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লিখিত সোঽহম্ স্বামীর আশ্রমের ছবি ভ্রমক্রমে ছাপা হয় নাই। উহা পরে ছাপিবার ইচ্ছা রহিল।

মায়ের প্রতি।

তোমার বন্দিনী মূর্ত্তি ফুটিল যখন,
　　দীপ্ত দিবালোকে,
সহস্র ভা'য়ের প্রাণ উঠিল শিহরি,
　　ঘৃণা, লজ্জা, শোকে।
পবিত্র বন্দনমন্ত্রে কম্পিত বাঙ্গালা
　　দূর আর্য্য-ভূমি!
মুক্তকণ্ঠে যুক্তকরে ডাকিছে তোমায়,
　　হে লজ্জাবারিণী।
সাধনার ধন তুমি ভারতবাসীর,
　　সহস্র পীড়নে,
উপবাসে, অনশনে ভোলে নাই তোমা।
　　দুর্ব্বল সন্তানে
দিব্য মন্ত্রে দিব্য স্নেহে দাও স্থান আজি
　　মন্দিরে তোমার;
যায় যাক্ থাক্ প্রাণ, সে মন্ত্র শুনিয়া
　　জাগিব আবার—।
হিমাচল হ'তে দূর কুমারিকা পার
　　কাননে, প্রান্তরে,
নগরে নগরে ক্ষুদ্র পল্লীতে পল্লীতে,
　　প্রাসাদে কুটীরে,
কোটি কোটি মৃত প্রাণ, হোমাগ্নির প্রায়
　　উঠুক্ জলিয়া,
মা তোর তাপসী-মূর্ত্তি পূজিবে সন্তান
　　হিয়া রক্ত দিয়া।

শ্রীকুসুমকুমারী দাস।

বরিশাল; ১লা বৈশাখ, ১৩১৩।

আয়, আজি আয়, মরিবি কে !

(১)

পিশিতে অস্থি শোষিতে রুধির,
নিশীথে শ্মশানে পিশাচ অধীর।
থাকিতে তন্ত্র　　সাধন মন্ত্র
　　প্রেত ভয়ে, ছি ছি, ডরিবি কে?
মড়ার মতন　　না লভি মরণ
　　সাধকের মত মরিবি কে?
　　আয়, আজি আয়, মরিবি কে!

(২)

অসুর নিধনে কিসের তরাস?
পশুর নিনাদে তোরা কি ডরাস্?
না গণি বিজন　　কানন ভীষণ
　　বিষম বিপদ বরিবি কে?
নিষ্ঠুর অরি　　সংহার করি
　　বীরের মতন মরিবি কে?
　　আয় আজি আয় মরিবি কে!

(৩)

উঠিছে সিন্ধু মথিয়া তুফান,
ছুটিছে ঊর্ম্মি পরশি বিমান;
সাহসেতে ভর　　করি সে সাগর
　　হাসি মুখে তোরা তরিবি কে?
হউক ভগ্ন,　　জলধি-মগ্ন,
　　তবু তরী বাহি মরিবি কে?
　　আয় আজি আয়, মরিবি কে!

(৪)

চরণের তলে দলি রিপুগণ
লভিত নির্ব্বাণে অমর জীবন,—
তাদেরি অংশে তাদেরই বংশে
জনম ; সে কথা স্মরিবি কে ?
লভিতে তূর্ণ ত্রিদিব পুণ্য
আর্য্যের মত মরিবি কে ?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে।

(৫)

চন্দন মাখা হাতে দেববালা
নন্দন ফুলে গাঁথি জয়মালা
তোমারে নিরখি রয়েছে অপেখি ;
সে বিজয়মালা পরিবি কে ?
মাতি সৌরভে যশে গৌরবে
অমর হইয়া মরিবি কে ?
আয়, আজি আয় মরিবি কে !

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত।



বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

প্রবাসী

"Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters.
"to look on noble forms
Makes noble thro' the sensuous organism
That which is higher."—*Tennyson.*

৬ষ্ঠ ভাগ। | আষাঢ়, ১৩১৩ | ৩য় সংখ্যা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ংরাজী ১৮৬৪ সালে মেদিনীপুরে আমি পরম পূজনীয় মহর্ষি-দেবকে প্রথম দর্শন করি। তখন আমার বয়ঃক্রম সাত ৎসর মাত্র। আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে তনি তথায় গমন করিয়াছিলেন। আকৃতিতে প্রকৃতির ারিচয় পাওয়া যায়, মহাত্মাদিগের মূর্ত্তিতে মহত্ত্ব প্রকাশিত য়। সেই বাল্যকালে মহত্ত্বের নাচত্বের কোন জ্ঞান ছিল া, তথাপি মহর্ষিদেবের মহত্ত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি দর্শনে স্বতঃই আমার দয়ে ভক্তির সঞ্চার হইল। পরবর্ত্তীকালে যতই তাঁহাকে ানিতে লাগিলাম ততই সেই ভক্তি পরিবর্দ্ধিত হইতে াগিল।

ঈশ্বর-তন্ময়ত্ব।

মহর্ষির নিকট উপস্থিত হইলেই তাঁহার ঈশ্বর-তন্ময়ত্ব হৃদয় নকে যেরূপ মুগ্ধ করিত এমন আর কিছুই নহে। ঈশ্বর ধ্যান থবা ঈশ্বর-প্রসঙ্গেই তাঁহার জাগ্রত অবস্থার অধিকাংশ সময় াপিত হইত। ঈশ্বর-তন্ময়ত্ব তাঁহার অসাধারণত্বের একটী প্রধান উপাদান। যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি, তখনই াহাকে ঈশ্বর-প্রসঙ্গে উৎসাহান্বিত, উৎফুল্ল ও সঞ্জীবিত হইতে দখিয়াছি। সাক্ষাৎকারী যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউন, যে কোন ব্যক্তি হউন, তাঁহার সহিত ঈশ্বর-প্রসঙ্গ না করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতেন না। ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনে ও ব্যাখ্যায় কখনও তাঁহাকে ক্লান্ত হইতে দেখি নাই। যখন শারীরিক দুর্ব্বলতায় ম্রিয়মাণ, তখনও ঈশ্বর-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু উপস্থিত হইলে কোথা হইতে নূতন বল, নূতন তেজ লাভ করিয়া তিনি ঈশ্বর-প্রসঙ্গে নিমগ্ন হইতেন। ঈশ্বর বিষয়টী তাঁহার মনে যে উৎসাহ ও আনন্দ সঞ্চার করিত, তাহার গভীরতা যেন অপরিমেয় বলিয়া বোধ হইত। এমন অপূর্ব্ব ঈশ্বর-তন্ময়ত্ব যাহা কখন ম্লান হইত না, যাহা কখন ক্ষীণাকার ধারণ করিত না, যাহা আমৃত্যু তাঁহার আত্মাকে পূর্ণ করিয়াছিল তাহার ভিত্তি কোথায়? এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়। সেই যৌবনকালে যখন দেবেন্দ্রনাথ সতেজে সংসারকে পশ্চাতে ফেলিয়া সানন্দে ঈশ্বরের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহার সত্য শিবসুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন, সেই সময়ে তাঁহার আত্মায় যে গভীর ঈশ্বর প্রেমের উদয় হইল, অবিচলিত ভাবে আমৃত্যু সেই প্রেমের কর্ষণই তাঁহার ঈশ্বর-তন্ময়ত্বের ভিত্তি। তিনি যেরূপ উজ্জ্বল ভাবে ঈশ্বরকে দেখিয়াছিলেন, সেরূপে সেই সত্যশিব সুন্দর পুরুষকে দেখিতে পাইলে মানবমাত্রেরই হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রেমের উদয় হয় এবং মহর্ষির ন্যায় সেই প্রেম

সযত্নে রক্ষা করিতে পারিলে মানবমাত্রেই তাঁহার ন্যায় ঈশ্বর-তন্ময়ত্ব লাভ করিতে পারে। কিন্তু কোন্ আধ্যাত্মিক নিয়মে ঐরূপ উজ্জ্বল দর্শন ঘটে তাহার সম্যক মীমাংসা বোধ হয় এখনও বহুকাল মানুষের শক্তির অতীত বিষয় হইয়া থাকিবে। উজ্জ্বল ঈশ্বর দর্শন হইতে ঈশ্বর-প্রেম, ঈশ্বর-প্রেম হইতে ঈশ্বর-তন্ময়ত্ব। ঈশ্বর অবিনাশী সুতরাং তাঁহার প্রতি যাঁহার যথার্থ প্রেম হইয়াছে, তাঁহার সে প্রেম যে কখন হ্রাস পাইবে না, ম্লান হইবে না, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? মহর্ষির ন্যায়ই পুরাকালের ঈশ্বর-প্রেমিক কোন মহর্ষি বলিয়াছিলেন, "স য আত্মানমেব প্রিয়মপাস্তে ন তস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি"। মহর্ষির ন্যায়ই পুরাকালের কোন ঈশ্বর-প্রেমিক মহর্ষি প্রাণে প্রাণে ঈশ্বর-প্রেম অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন,—"তদেতৎ প্রেয়ো পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ো অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।" এই সকল অত্যুচ্চ ঔপনিষদ পরম সত্যের সম্যক সত্যতা কেবল মহর্ষির দৃষ্টান্ত দর্শনেই আমাদিগের মধ্যে অনেকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন।

প্রকৃতিতে ঈশ্বর দর্শন।

মহর্ষিদেব চিরকালই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত যোগসাধনে ভাল বাসিতেন। যখন পীড়ার জন্য চিকিৎসক তাঁহাকে প্রকৃতির লীলাভূমি পরম সুন্দর হিমালয় প্রদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন, তখন তিনি গঙ্গার তীরে, গঙ্গার সুন্দর দৃশ্য সম্মুখে রক্ষিত হয় এরূপ অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিলেন। চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরস্থ বাটীতে অবস্থিতি কালে তিনি প্রকৃতির দুইটী মাত্র সামগ্রী যোগের সাহায্য স্বরূপ পাইয়াছিলেন; একটী গঙ্গার দৃশ্য, অপরটী সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের মহিমা। আমি ঐ বাটীতে একবার দুই দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলাম। দেখিতাম প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া বারান্দায় উপবিষ্ট হইয়া মহর্ষি উপাসনা ও ধ্যানে মগ্ন হইতেন। গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ উদ্যানাবলীর পশ্চাৎ দিক হইতে মোহন রক্তিম ছটায় সুশোভিত হইয়া সূর্য্যদেব উদিত হইলে তিনি গাত্রোত্থান করিতেন। আবার অপরাহ্নে সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে গঙ্গার বক্ষে ভাসমান বোটের ছাদের উপর উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান ও চিন্তায় মগ্ন হইতেন এবং সূর্য্যাস্তের পরে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। সূর্য্যের সহিত যেরূপ পৃথিবীর সম্বন্ধ, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার তদনুরূপ সম্বন্ধ, এই ভাব মহর্ষির উপদেশে পাওয়া যায়। বোধ হয়, এই ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন বলিয়াই উদীয়মান ও অস্তগামী সূর্য্যের অনুপম মহিমা দর্শন করিতে করিতে ঈশ্বর চিন্তায় তিনি সমধিক বিমল আনন্দ প্রাপ্ত হইতেন।

সৌরভে ঈশ্বরানুভব।

কখন কখন দেখিতাম মহর্ষির পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র টেবিলে সুগন্ধময় পুষ্পরাশি অথবা একটী ফুলের তোড়া রক্ষিত হইত। সৌখিন বাবুও ফুল ভালবাসেন, মহর্ষির নিকটও ফুল অতি প্রিয়। কিন্তু উভয়ের নিকট পুষ্প কি বিভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হয়! দর্শনেন্দ্রিয় যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তির আত্মার সম্মুখে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত করে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও তেমনি সূক্ষ্ম, অদৃশ্য সৌরভের মধ্য দিয়া তাহার আত্মায় ঈশ্বরের পবিত্রতা ও অপার্থিবতার ভাব মুদ্রিত করিয়া দেয়। যিনি আধ্যাত্মিক ভাবে পুষ্প উপভোগ করিতে সক্ষম, পুষ্পের মধুর মনোহর সৌরভ তাঁহার আত্মার সহিত ঈশ্বরের ও পরলোকের যোগ ঘনিষ্ঠ করিয়া দেয়, স্বর্গের সুরভি তাঁহার আত্মার উপর প্রবাহিত করে, ঈশ্বরের সত্তাকে মধুরতর করিয়া তোলে। পার্থিব সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া অপার্থিব বস্তুকে ধারণ করা, আয়ত্ত করা, উপভোগ করা, মহর্ষির সাধনার একটী অঙ্গ ছিল। এইজন্য যেমন তিনি পর্ব্বত, সমুদ্র, বন, উপবন, নদ, নদী প্রভৃতির মধ্যে বাস করিতেন, তেমনি পার্শ্বে সুন্দর, সুগন্ধময় পুষ্পরাশি রক্ষা করিতেও ভাল বাসিতেন।

উপনিষদের প্রতি অনুরাগ।

মহর্ষিদেবের আত্মা উপনিষদ-রসপানে সর্ব্বদাই প্রমত্ত থাকিত। উপনিষদরূপ পুষ্পোদ্যানে তিনি অহরহঃ বিচরণ করিতেন; উহার বিবিধ মনোহর পুষ্পের সৌরভে বিভোর হইয়া যাইতেন। প্রস্রবণ হইতে জলের ন্যায় তাঁহার মুখ হইতে সর্ব্বদাই উপনিষদের মহান্ শ্লোকাবলী বিনির্গত হইত। তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া উপনিষদ আবৃত্তি শুনিলাম না, এমন বোধ হয় একবারও ঘটে নাই। মহর্ষিদেব এরূপ উৎসাহ, তেজ ও আন্তরিকতা সহকারে উপনিষদের

শ্লোক আবৃত্তি করিতেন, যে তাহা শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইত, প্রাণ পুলকিত হইত, শ্লোকস্থ সত্য অন্তরের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে যেন এক নূতন উচ্চ জগতে উত্থিত করিত। উপনিষদের শ্লোকাবলী যেরূপ মহান্, তাহাদের আবৃত্তিও এইরূপ সুন্দর ও নির্দোষ না হইলে তাহাদের অবমাননা করা হয়, মহর্ষির আবৃত্তি শুনিয়া মনে এই ভাবের উদয় হইত। উপনিষদের যে শ্লোক নিজে বহুবার পাঠ করিয়াও ফললাভ হইত না, মহর্ষির মুখে একবার সেই শ্লোকের আবৃত্তি শুনিলে মন তাহার গূঢ় ভাবে অনুপ্রাণিত হইত। মহর্ষিদেবের তেজোময়, প্রাণময় উপনিষদ আবৃত্তি শ্রবণ করিয়া অনেক লোকের হৃদয়ে যে বিবিধ ধর্ম্মসত্য গূঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সমস্বরে উপনিষদ পাঠ।

মহর্ষি আযৌবন উপনিষদগত প্রাণ ছিলেন, তাঁহার রচিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমস্তই উপনিষদের শ্লোক সংগ্রহ। উক্ত গ্রন্থের এই উপনিষদাংশ বহুজনের সহিত মিলিত হইয়া সমস্বরে পাঠ করিতে মহর্ষি বড় ভাল বাসিতেন। প্রাচীন ভারতের "সামগান" রীতি স্মরণ করিয়া তাঁহার ব্রহ্মর্ষিভক্ত প্রাণে যে পবিত্র মধুর ভাবের উদ্রেক হইত, ব্রাহ্মগণের সহিত সমস্বরে উপনিষদ পাঠ করিয়া সে ভাব বোধ হয় কিয়ৎপরিমাণে চরিতার্থ হইত। উপনিষদের উৎকৃষ্ট শ্লোকাবলীর পরম পবিত্র রসে যাঁহার হৃদয় নিমজ্জিত হইয়াছিল, পরম প্রিয়পাত্র ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিত হইয়া সেগুলি গান করা তাঁহা কর্ত্তৃক যে ব্রহ্মপূজার একটি অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত হইবে তাহা স্বাভাবিক। ১৮৭৪ সালের কোন সময়ে মহর্ষি টিটাগড়ে গঙ্গার উপর নিভৃত স্থানে একটি বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সমস্বরে উপনিষদপাঠ জন্য একদিন তথা হইতে নিমন্ত্রণ আসিল। পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত আমি তথায় গমন করিলাম। কলকলনাদিনী গঙ্গাতীরস্থ, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মধ্যস্থ, শোভন শান্তিময় স্থানে রমণীয় প্রাতঃকালে গঙ্গার দৃশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া মহর্ষি ত্রিশ পঁয়ত্রিশজন ব্রাহ্মের সহিত মিলিত হইয়া ভক্তিভরে উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে সমোৎসাহে উপনিষদগানে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডস্থ সমস্ত শ্লোকগুলি সমস্বরে বেদপাঠের নিয়মানুসারে পাঠ করিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগিল। সেই সুন্দর, পবিত্র স্থানে, সুন্দর, পবিত্র, মঙ্গলময় পরমব্রহ্মের মহিমা, উপনিষদের সুন্দর, পবিত্র ভাষায়, পবিত্র হৃদয়ে গান করিয়া সকলে যে এক অপূর্ব্ব বিমলানন্দ উপভোগ করিলেন, তাহা তাঁহাদিগের মুখশ্রীতে প্রতিফলিত হইতেছিল। মহর্ষিদেবের প্রাণে ঋষিভাব কিরূপ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, ঋষিদিগের ন্যায় প্রকৃতির শোভার মধ্যে প্রকৃতিনাথের ঋষিরচিত যশোগানের প্রতি তাঁহার এই প্রকার ঐকান্তিক অনুরাগ তাহার অন্যতম প্রমাণ।

অবিরামে ব্রহ্মগুণ গান।

১৮৭৪ সালের কোন এক দিবসে কোন নিকট আত্মীয় ব্রাহ্মের বাটীতে কোন গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে বহু ব্রাহ্মের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে অনেক আহূত ব্রাহ্ম আগমন করিতে লাগিলেন; পরিশেষে দেখিলাম মহর্ষিদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনার পর সকলে উপাসনাস্থল হইতে স্থানান্তরে উপবিষ্ট হইলেন। মহর্ষি চতুঃপার্শ্বস্থ ব্রাহ্মগণের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। এমৎ কালে সহসা একজন ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ব্রাহ্মণ যুবক মহর্ষির নিকটে আসিয়া কোন কথা না বলিয়া গান আরম্ভ করিলেন, "তুমি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, তুমি দেখা না দিলে কে দেখ্‌তে পায়।" মহর্ষি তৎক্ষণাৎ অন্য প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সহাস্যে, অতি প্রফুল্ল চিত্তে যুবকের সহিত ঐ ব্রহ্ম সঙ্গীতে যোগ দিলেন। আহারের উদ্যোগ করিতে একঘণ্টারও অধিক কাল বিলম্ব হইল। দেখিলাম মহর্ষি ঐ দুই ছত্র মাত্র গীত সোৎসাহে যুবকের সহিত মিলিত হইয়া অনবরত গান করিতে লাগিলেন। বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই, বিরাগ নাই, কেবলই "তুমি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়; তুমি দেখা না দিলে কে দেখ্‌তে পায়," এই বাণীতে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন; বোধ হইল যেন ব্রহ্ম ক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপের অধিকারভূত হইয়া সকলকে দেখা দিতে উন্মুখ হইয়া উঠিলেন। অবিরামে ব্রহ্মগুণ গানের যে মহিমা তাহা যেন মহর্ষি বুঝাইয়া দিলেন।

জ্ঞানানুরাগ।

মহর্ষিদেব কেবল ধ্যাননিরত ও যোগপরায়ণ ছিলেন না; জ্ঞানলাভের জন্য তিনি সর্ব্বদাই সমুৎসুক থাকিতেন। যত দিন তাঁহার দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতা জন্মে নাই ততদিন তিনি প্রত্যহ কিছু কাল অধ্যয়নে ক্ষেপণ করিতেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা ছিল না। ইয়োরোপীয় দর্শন শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার অনুরাগই ছিল। আমি যখন "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় প্রবন্ধ লিখিতাম তখন তিনি আমাকে ধর্ম্ম ব্যতীত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ সালে যখন তিনি চুচুঁড়ায় গঙ্গাতীরের বাটীতে অবস্থিতি করিতেন তখন তাঁহাকে Herbert Spencer's First Principles গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতে দেখিয়াছি। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছিলাম যে ফরাসীস দর্শনকার Cousin ও জার্ম্মেন দার্শনিক Fichte এর কোন কোন গ্রন্থ এক সময়ে তাঁহার অতি প্রিয় গ্রন্থ ছিল। শেষোক্ত গ্রন্থকার প্রণীত "The way Towards the Blessed life" গ্রন্থ পাঠে তিনি বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। দর্শন ও বিজ্ঞান ব্যতীত ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ইয়োরোপীয় প্রাচ্য পুরাতত্ত্ববিদগণ প্রণীত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতে তিনি ভাল বাসিতেন। মিউর, ম্যাক্সমূলার, মনিয়ার উলিয়মস, ওয়েবার প্রভৃতির রচিত অনেক গ্রন্থই তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। দেশের রাজনীতির অবস্থা অবগত হইবার জন্য তিনি প্রত্যহ সংবাদপত্র পাঠ করিতেন। দৃষ্টি শক্তি লোপ পাইবার পর হইতে অপর কর্ত্তৃক গ্রন্থ ও সংবাদপত্রাদি পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিতেন।

ধর্ম্মবাক্য।

আমার পিতৃদেব ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন কালে যেখানে উচ্চ ধর্ম্মভাবের কথা পাইতেন তাহা উদ্ধার করিয়া রাখিতেন। মধ্যে মধ্যে ঐ সকল ধর্ম্মবাক্যের মধ্যে কতকগুলি নির্ব্বাচন করিয়া তিনি স্বীয় মন্তব্য সহ মহর্ষিদেবকে পাঠাইয়া দিতেন। এই সকল বাক্যের মধ্যে যে গুলি তাঁহার খুব ভাল লাগিত, মহর্ষি সেইগুলি বারম্বার আবৃত্তি করিতেন। একবার সাক্ষাতের পর বিদায়গ্রহণ করিতেছি, তখন মহর্ষি বলিলেন; "রাজনারায়ণ বাবুকে বলিও আমি তাঁহার প্রেরিত ধর্ম্মবাক্য-গুলি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দানুভব করি। কতকগুলি আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে।" এই বলিয়া কবি শেলির এই চরণটী ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত উচ্চৈঃস্বরে সমুৎসাহে দুই তিনবার আবৃত্তি করিলেন:—

"The meanest worm beneath the sod
With love and worship blends itself with God."

মহর্ষিদেবের আত্মা উপনিষদের ধর্ম্মভাবে লালিত ও অনুপ্রাণিত। শেলির এই বাক্যে উপনিষদের আলোক প্রতিফলিত দেখিয়াই বোধ হয় উহা তাঁহার এমন প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

গাম্ভীর্য্য ও প্রফুল্লতার সম্মিলন।

মহর্ষির স্বভাবের একটী প্রধান বিশেষত্ব ছিল গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রফুল্লতা ও সুরসিকতার সম্মিলন। তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি উপবিষ্ট আছেন, কিন্তু কয়েক মিনিট কাল অতীত না হইতে হইতেই কথোপকথনের মধ্যে সুরসিকতার পরিচায়ক কত কথা বলিতে বলিতে তিনি হাস্যপূর্ণ ও প্রফুল্লতাময় হইয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখিলাম বদনমণ্ডলে আবার গভীর গাম্ভীর্য্য প্রকাশিত হইল, চক্ষু মুদ্রিত হইল, মস্তক অবনত হইল, সমস্ত দেহে পূর্ণ স্থৈর্য্যের ভাব দেখা গেল; অনুমান করিলাম তিনি ধ্যানে মগ্ন হইয়াছেন। যত বার মহর্ষির নিকট গিয়াছি এইরূপ ভাবই দেখিয়াছি। ঠিক্ এইরূপ ভাব- গাম্ভীর্য্যের পশ্চাতেই প্রফুল্লতা—আর কোন ব্যক্তিতেই দেখি নাই। মনে হয় ধর্ম্ম-চিন্তা ও ব্রহ্ম ধ্যানের গুরুত্ব তাঁহার মুখশ্রীকে গম্ভীর করিয়া তুলিত, আবার যখনই পার্থিব ও সাংসারিক বিষয় আলোচনায় নিমগ্ন হইতেন, তখন সাধু আত্মার স্বাভাবিক আনন্দের অভিব্যক্তি যে প্রফুল্লতা তাহা প্রকাশিত হইত। এই বাহ্যিক লক্ষণ তাঁহার স্বর্গ-মর্ত্ত্য-সাম্মিলিত চরিত্রেরই পরিচায়ক ছিল।

সাধুতার সমাদর।

আমার পিতৃদেবের প্রতি মহর্ষিদেবের যে অনুরাগ ও প্রীতি ছিল কখন তাহা বিচলিত হয় নাই। তাঁহার সাধুতার প্রতি মহর্ষিদেবের যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল অনেকবার তাহারও পরিচয় পাইয়াছি। আমাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সময় উপদেশ প্রদানান্তে মহর্ষিদেব বলিয়াছিলেন, "উপদেশ শ্রবণ করিলে, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় তোমার পিতার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিলেই হইবে।"

স্নেহশীলতা।

১৮৭৮ সালে মহর্ষি চন্দননগরে গঙ্গার উপরে একটী বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তখন একদিন পিতৃদেবের সহিত আমি তথায় গমন করিয়াছিলাম। আমরা যখন উপস্থিত হইলাম তখন বেলা আটটা। তখন পূজাপাদ মহাশয় বাটীতে ছিলেন না; ভৃত্য বলিল তিনি রাজপথে প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আমাদিগকে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তৎপরে অল্পকাল কথোপকথনের পর আমাদের আহারের বন্দোবস্তের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শীঘ্র আহারের আয়োজন করিবার জন্য পাচক ও ভৃত্যকে মুহুর্মুহু উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন, পরে আমাদিগকে যথাসময়ে ভোজন করাইয়া তবে তৃপ্ত হইলেন। যাহাতে আমাদের আহার করিতে বেলা না হয় এবং যাহাতে আমাদের জন্য বিবিধ উপাদেয় আহার্য্য দ্রব্যের আয়োজন হয় তজ্জন্য মহর্ষি যে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে আমাদিগের প্রতি তাঁহার স্নেহের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম।

১৮৭০ সাল হইতে ১৮৭৯ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতায় বাস কালে আমি যখনই মহর্ষিদেবের সাক্ষাৎ লাভ জন্য তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে উপস্থিত হইতাম, তখনই তিনি স্নেহ সহকারে নানা সদুপদেশ দানে এবং অপরাহ্ণ হইলে জলযোগ করাইয়া পরিতৃপ্ত করিতেন।

গভীর স্নেহের একটী লক্ষণ এই যে স্নেহাস্পদের অভাব বা প্রয়োজন অনুমান করিয়া লইয়া সেই অভাব দূর করা এবং সেই প্রয়োজন সাধন করা। মহর্ষিদেব কতবার এইরূপে আমাদের অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াছেন। অকৃত্রিম স্নেহশীলতার অপর একটী লক্ষণ এই যে যদি স্নেহাস্পদ কখন কোনরূপ সাহায্য আংশিকভাবে প্রার্থনা করে তাহা হইলে স্নেহশীল ব্যক্তি সক্ষম হইলে পূর্ণভাবে তাহা চরিতার্থ করেন। মহর্ষিদেবের এইরূপ স্নেহেরও আমরা পরিচয় পাইয়াছি।

গুরুশিষ্য সম্বন্ধ।

মহর্ষি অনেকের পরমপূজ্য ধর্ম্মগুরু ছিলেন, কিন্তু কখন তাঁহাকে গুরু-গিরি ফলাইতে দেখি নাই। তিনি কখন কাহারও গুরু হইতে প্রয়াস পাইতেন না; ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসুকে তাঁহার ধর্ম্ম-জ্ঞান, ধর্ম্ম বিশ্বাস দান করিয়াই তিনি তৃপ্ত হইতেন, সে দানের প্রতিদান স্বরূপ গুরুর পদপ্রাপ্তির জন্য প্রয়াসী হইতেন না। এইরূপ প্রয়াসে যে নীচতা প্রকাশ পায় তাহা তাঁহার প্রকৃতির মহত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্রাহ্মসমাজেও গুরুবাদ প্রবেশ করিয়াছিল; গুরুগিরির কলঙ্কে ব্রাহ্মসমাজও কলঙ্কিত হইয়াছিল। মহর্ষির অধিনায়কত্ব ব্রাহ্মসমাজে অবিচলিত থাকিলে সে কলঙ্ক যে ব্রাহ্মসমাজকে কখন স্পর্শ করিতে পারিত না তাহা আজ নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। যাঁহারা মহর্ষিকে গুরু বলিয়া ভক্তি করিতেন তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তাহাদের চিন্তার স্বাধীনতার উপর তিনি কখন হস্তক্ষেপ করিতেন না। সম্পূর্ণ বশ্যতা যে শিষ্যত্বের লক্ষণ সে শিষ্যত্ব কখনই আত্মার সম্যক মঙ্গলের অনুকূল হইতে পারে না। চিন্তার স্বাধীনতা রক্ষা আজ না হউক কাল, বর্ত্তমানে না হউক ভবিষ্যতে, ইহকালে না হউক পরকালে, অনন্ত মঙ্গলেরই কারণ হইবে। গুরু পদে উন্নত যে ব্যক্তির এই পরম সত্য গ্রাহ্য হইয়াছে, তিনি শিষ্যে সম্পূর্ণ বশ্যতা কখনই আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন না। মহর্ষি তাহা করিতেন না। ইহা তাঁহার প্রতি তাঁহার শিষ্যগণের শ্রদ্ধা ভক্তি গভীরতর করিত বলিয়া আমার বিশ্বাস।

মৃত্যুভয় হইতে বিমুক্তি।

সাধারণতঃ মানুষ মৃত্যুকে এত ভয় করে যে মৃত্যুর চিন্তা উদয় হইলে তাহা সযত্নে মন হইতে অপসারিত করে এবং মৃত্যু বহুদূরে অবস্থিত করিতেছে মনকে এই প্রবোধ দেয়। জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি মৃত্যু সম্বন্ধে এরূপ মোহাচ্ছন্ন হয়েন না। আমার পিতৃদেবকে লিখিত মহর্ষির পত্রসমূহ হইতে অবগত হইয়াছি যে তাহার মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মহর্ষি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। মৃত্যু দূরে নহে, মৃত্যু সম্মুখে এই ভাবকে তিনি মনে জাগরিত রাখিতেন তাঁহার কথোপকথন হইতেও আমার ইহা ধারণা হইয়াছিল। মৃত্যু সম্মুখে, এই ভাব রক্ষা করিয়া তিনি স্বীয় শক্তি অনুসারে কর্ম্মান্বিত এবং হৃষ্টচিত্ত থাকিতেন। মৃত্যু-বিস্মৃতি অথবা মৃত্যু স্মরণে বিষণ্ণতা ও নিশ্চেষ্টতা, সাধারণ মানব চরিত্রের এই উভয় প্রকার ক্ষীণতার একটীও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। মৃত্যু ইচ্ছা করিবে না এবং মৃত্যুকে

ভয়ও করিবে না, কিন্তু সর্ব্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিবে, শাস্ত্রের এই উপদেশ মহর্ষির জীবনে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল দেখিতে পাই। নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে যেরূপে আলোচনা করিতে শুনিতাম তাহাতে আমার মনে এই সংস্কার জন্মিয়াছিল, যে তিনি স্বীয় জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিয়া তাঁহার চিরারাধ্য পরম প্রিয় ব্রহ্মের সম্মুখীন হইবার উপযুক্ত হইয়াছেন, এই বিশ্বাস তাঁহার মনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার।

মহর্ষিদেবের নিকট উপস্থিত হইলে প্রায়ই ব্রাহ্মধর্ম্মের বা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচারের সহায়তা করে এরূপ একটা না একটী নূতন প্রস্তাবের কথা তাঁহার মুখে শুনিতাম। ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মযোগের পরই ব্রহ্মজ্ঞানের বিস্তারের চিন্তাই তাঁহার আত্মাকে অধিকার করিয়া থাকিত, ইহাই আমার প্রতীতি জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচারের জন্য তিনি আমৃত্যু অর্থ দ্বারা, উপদেশ দ্বারা, সুপরামর্শ দ্বারা চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মনিষ্ঠতার অধিকতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে? পরব্রহ্মের পবিত্র ধ্যানে আত্মা নিমগ্ন হইতেছে, ধ্যানযোগে লালিত হইয়া আত্মা উন্নত ও বলীয়ান হইতেছে; আবার যখন যোগ হইতে বিরত হইয়া সংসারে ফিরিয়া আসিতেছে তখন আত্মা সেই ব্রহ্মের জ্ঞান জনসমাজে প্রচার জন্য ব্যাকুল হইয়া উপায় অন্বেষণ করিতেছে, এবং সাধ্যানুসারে সংকল্পিত উপায় কার্য্যে পরিণত করিতেছে। ইহাই ত ব্রহ্ম-পরায়ণতার, ব্রহ্মনিষ্ঠতার সরল, স্বাভাবিক লক্ষণ, ইহাই ত ব্রহ্ম-তন্ময়ত্বের উচ্চ নিদর্শন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

মহর্ষিদেব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ঐ পত্রিকার প্রতি অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তাঁহার যত্ন ও স্নেহ অবিচলিত ছিল। তিনি নিয়ত উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। উহার সুসম্পাদন জন্য সর্ব্বদাই সমুৎসুক থাকিতেন। পত্রিকার যে কোন লেখকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তাঁহার নিকট তল্লিখিত প্রবন্ধের গুণের কথার উল্লেখ করিয়া সাধুবাদ পূর্ব্বক তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন, কোন দোষ, ত্রুটী থাকিলে সস্নেহে, কোমল ভাবে তাহার পুনর্ঘটন সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিতেন। প্রতি মাসের প্রথমেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশিত না হইলে ক্ষুব্ধ হইতেন। পত্রিকা দ্বারা দেশে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের যে সাহায্য হইতেছে তাহা সামান্য হইলেও তাহাতে তৃপ্তি ভাব প্রকাশ করিতেন।

বক্তৃতা শক্তি।

আদি ব্রাহ্মসমাজে আমি কয়েকবার মহর্ষির বক্তৃতা শুনিয়াছি। সে কয়েকবার উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াই তিনি ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। যে গভীর প্রাণপূর্ণ আবেগ, যে ভক্তিভাব তাঁহার বক্তৃতার প্রত্যেক বাক্যের সহিত জড়িত থাকিত, তাহা তাঁহার সুমধুর স্বরের সহিত মিলিত হইয়া শ্রোতার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিত। যতক্ষণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিতাম ততক্ষণ কর্ণকুহর যেমন পরিতৃপ্ত হইত, হৃদয় মন তেমনি এক উচ্চ আনন্দময় পবিত্র লোকে বাস করিত। অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার বক্তৃতার অনেক কথা কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিত। "ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্যুষ্মাকমন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাচাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি।" ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া তিনি যে দিন উপদেশ দেন সে দিন আমি সমাজে উপস্থিত ছিলাম। "তোমরা তাঁহাকে জানিলে না যিনি এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমাদের অন্তরে রহিয়াছেন," অসাধারণ বাগ্মীতার সহিত তিনি যখন বৈদিক ঋষির এই খেদোক্তির ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তখন শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এমন একজনও ছিলেন না যিনি ঈশ্বর-বিস্মৃতির জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে শোক না করিয়াছেন এবং ঈশ্বরপরায়ণ হইবার জন্য মনে মনে সংকল্প না করিয়াছেন। তিনি যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক একটী যুক্তি বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে তারস্বরে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা তাঁহাকে জানিলেনা যিনি এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমাদের অন্তরে রহিয়াছেন," তখন ক্রমে ক্রমে শ্রোতার হৃদয় ঈশ্বরের সত্তায় নিমগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল। ঐ ব্যাখ্যানটী শ্রোতাকে ঈশ্বরের সত্তার মধ্যে সবলে আনয়ন করিয়া, ধীরে ধীরে তাহার নিকট ঈশ্বরের সত্তা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছিল। সে উজ্জ্বল সত্তা অস্বীকার করিবার তাঁহার আর উপায় ছিল না। শ্রোতাদিগের মধ্যে যিনি সে দিন সমাজগৃহে শূন্য হৃদয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনিই পূর্ণ হৃদয় হইয়া

ফিরিয়াছিলেন। হৃদয়কে স্পর্শ করিতে, মনকে এক উচ্চ পবিত্র লোকে উত্থিত করিতে, এবং আত্মাকে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল করিতে মহর্ষির ধর্ম্মোপদেশের যেরূপ ক্ষমতা দেখিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজের অন্য কোন ধর্ম্মোপদেষ্টার বক্তৃতায় সেরূপ ক্ষমতা অনুভব করি নাই। আমি কেশবচন্দ্র সেনের বাঙ্গালা ও ইংরাজী বহু ধর্ম্মোপদেশ ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু তৎসমস্ত মহর্ষির দেবলোক প্রেরিত মহাবাণীবৎ উপদেশের সহিত তুলনাই হয় না। আমার মনে হয় যে যদি মহর্ষিদেব বঙ্গদেশের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে চিরজীবন ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেষ্টা রূপে পরিব্রজন করিতে পারিতেন তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ আজ বঙ্গদেশে নিশ্চয়ই সম্যক রূপে সমাদৃত ও গৌরবান্বিত হইত।

তর্কে ধীরতা।

একদিন দেখিলাম এক ব্রাহ্মণ-যুবক মহাশয়ের সহিত বিষম কূট তর্ক আরম্ভ করিল। কূটতার প্রতিশোধে কূটতা অবলম্বন না করিয়া মহাশয় তাহার প্রশ্নের মীমাংসা করিতে লাগিলেন। যুবকটী মধ্যে মধ্যে স্পষ্টই রুক্ষ ভাবান্বিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মহাশয় ধীর ভাবে শান্ত ভাবে অতি সুমিষ্ট ভাবে স্বীয় বক্তব্য বলিয়া যাইতেছিলেন। তর্ক বিতর্কে শান্তভাব রক্ষা করা একটী অসাধারণ গুণ। মহাশয়কে এই শান্তভাব হইতে বিচ্যুত হইতে দেখি নাই। ধীর ভাবে তর্ক আরম্ভ হইল, কিন্তু যখনি বিরুদ্ধ মত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল অমনি চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল, স্বর কর্ণভেদী, আকাশভেদী উচ্চতায় লাফাইয়া উঠিল, বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর জীবনগত ঘটনা বা চরিত্রগত দোষের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তাঁহার মতের অসারতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। দেখিতে পাই ইহাই সাধারণ নীতি। ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজ সকল বিষয়ের আলোচনা বা তর্কে এইরূপ অস্থিরতা, চাঞ্চল্য ও হীনতা আবার অনেকে তেজস্বিতা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহা যে নীতি-বিরুদ্ধ তাহা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হয় না। ইহা যে অকারণে প্রীতি বিনাশক, পরস্পরের হৃদয়ে অশান্তির সঞ্চারক, ও সত্যে উপনীত হইবার প্রতিবন্ধক তাহা অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও সম্যক বোধগম্য হয় না। তর্কে মহর্ষির ধীর ভাব, শান্ত ভাব ও মিষ্ট ভাব অতি মনোহর, উহা সকলের অনুকরণ যোগ্য।

রক্ষণশীলতা।

যে হিন্দু পাশ্চাত্য জাতিগণের বর্ত্তমান প্রাধান্যে মোহাবিষ্ট না হইয়া স্থির ভাবে, ধীর ভাবে, নিরপেক্ষ ভাবে হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু আচার ব্যবহারের প্রকৃতি, গতি ও মর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন তিনি অন্ততঃ আংশিক ভাবেও রক্ষণশীল না হইয়া থাকিতে পারেন না। এইরূপ চিন্তার ফলে মহর্ষি রক্ষণশীল ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রক্ষণশীলতার প্রাণ উন্নতিই ছিল। যেখানে বুঝিতেন উন্নতির দ্বার রুদ্ধ হইবে, সেখানে তিনি রক্ষণশীল ভাব পরিত্যাগ করিতেন। কিন্তু তিনি যাহাকে উন্নতি বলিতেন, আধ্যাত্মিকতার পরিপোষণ তাহার ভিত্তি। যেখানে আধ্যাত্মিক মঙ্গল রক্ষা করিতে গিয়া পার্থিব উন্নতির লাঘব হইত সেখানে তিনি পার্থিব উন্নতিকে উন্নতি বলিয়াই স্বীকার করিতেন না। যে কার্য্য বা অনুষ্ঠান তিনি মানবাত্মার কুশলের অন্তরায় বলিয়া বুঝিতেন, উন্নতি-বিরোধী, সঙ্কীর্ণমনা, রক্ষণশীল, এই অপবাদে ভূষিত হইবার শঙ্কায় তিনি সে অনুষ্ঠান বা কার্য্যের অনুমোদন করিতেন না।

অবতারবাদ।

কেশবচন্দ্র সেন আদি সমাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর যখন তিনি মহর্ষির উপদেশ ও দৃষ্টান্তের প্রভাব হইতে দূরে গিয়া পড়িলেন, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ হইতে তিনি শনৈঃ স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহারই দুইজন পরম ভক্তশিষ্য, যাঁহারা অহরহঃ তাঁহার পার্শ্বে থাকিতেন, তাঁহারাই সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলেন যে কেশবচন্দ্র সেন আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া শিষ্যগণের নিকট প্রচার করিতেছেন। এ বিষয়ের সত্যতা লইয়া নানা বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। অনেকেই এই অভিযোগ যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-বিরোধী অবতার-বাদ মহর্ষি অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এরূপ ভ্রমাত্মক মতের কেশবচন্দ্র সেন পোষকতা করেন শুনিয়া তিনি তৎকালে প্রায়ই বিস্ময় প্রকাশ করিতেন। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি একবার এই সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করিতে করিতে মহর্ষি বলিলেন; "আচ্ছা,

কেশব বাবুর অবতার হইবার প্রতি লোভ জন্মিল কেন? আমাদের দেশে ত বরাহ অবতার, কূর্ম্মও অবতার, মৎস্যও অবতার। অতএব এ দেশে অবতার হওয়া কি এমন গৌরবের কথা?" এদেশে অবতার পদাকাঙ্ক্ষী লোক বিরল নহে। তাহাদের আকাঙ্ক্ষার উপর মহর্ষির এই শ্লেষ বাক্য শাণিত খড়্গের ন্যায় পতিত হইবে আশা করি।

ইংরাজ ও খ্রীস্টধর্ম্ম।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ইংরাজদিগের প্রতি ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি মহর্ষির প্রীতির অভাব ছিল। এই কথার উত্তরে ইহাই বলা উচিত যে যাহা প্রীতির উপযুক্ত নহে সে বস্তুর প্রতি প্রীতির অভাব হওয়াই সত্যনিষ্ঠ আত্মার পক্ষে স্বাভাবিক। ইংরাজ এদেশ অধিকার করাতে মঙ্গল অপেক্ষা এ দেশের অধিকতর পরিমাণে অমঙ্গলই হইতেছে মহর্ষির এই ধারণা ছিল। ভারতে ইংরাজ আগমন ঈশ্বরের বিশেষ ইচ্ছানুসারে ঘটিয়াছে, এই যে একটা ঘোর ঈশ্বর অবমাননা-কর মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেক লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে, সে মত মহর্ষি অনুমোদন করিতেন না। কোন প্রকৃতিস্থ-মস্তিষ্কধারী ব্যক্তি ঐ মত অনুমোদন করিতে পারে না। ঐ মতের স্বপক্ষে যে সকল যুক্তি প্রযোজিত হইয়া থাকে তাহার অসারতা প্রমাণ করিয়া ঐ ঘোর অমঙ্গলকর মতকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা যায়। মহর্ষি ভদ্রতার অনুরোধ ব্যতীত স্বেচ্ছায় কখন কোন ইংরাজের সমাপন্ন হয়েন নাই। কোন ইংরাজ ভদ্রভাবে তাঁহার পরিচয় প্রার্থী হইলে তাহাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেন না। একবার শিমলা শৈলে অবস্থান কালে ভারত গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কোন ইংরাজ রাজপথে ঝাঁপানে উপবিষ্ট মহর্ষির সম্মুখে টুপি খুলিয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হয়েন। মহর্ষি ঝাঁপান বাহক-দিগকে দাঁড়াইতে বলিয়া সাহেবের সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করেন। সাহেব নিজের পরিচয় দিয়া তাঁহার আলয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। মহর্ষির অনুমতি পাইয়া সাহেব একদিন তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন। সাহেব হিন্দু ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকগণের যে ভ্রান্তমত তাহাই নিজের মতরূপে গ্রহণ করিয়া মহর্ষির নিকট তাহা প্রকাশ করেন। মহর্ষি বলেন, "প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কি তাহা না জানিলে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম কি তাহা আপনি বুঝিতে পারিবেন না। হিন্দু ধর্ম্মজ্ঞ আপনার স্বদেশবাসীগণের প্রণীত গ্রন্থ পাঠ করিয়া আপনি বুঝুন হিন্দুধর্ম্ম কি, তৎপরে আপনার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা করিব।" কিছু দিন পরে সাহেব বলিয়া পাঠান যে শিমলা শৈলের কোন পুস্তকাগারে বা কাহারও গৃহে ঐরূপ গ্রন্থ নাই। এই বার্ত্তা পাইয়া মহর্ষি আমার পিতৃদেবকে সাহেবের সমস্ত বিবরণ লিখিয়া তাঁহার জন্য "Muir's Sanskrit Texts" নামক পঞ্চভাগে বিভক্ত প্রকাণ্ড গ্রন্থ পাঠাইয়া দিতে বলেন। সাহেব ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন কিনা এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য পুনরায় মহর্ষির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন কিনা তাহা জানিতে পারি নাই। এই ঘটনা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে ঋষিগণ প্রচারিত বিশুদ্ধ, আদিম হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ ইংরাজের সহিত একমন হইয়া বন্ধুভাবে আলাপ পরিচয় করা, এবং ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করা তাঁহার উপনিষদ-সুধা-মগ্ন আত্মার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি মহর্ষির যে প্রীতির অভাব হইবে তাহাতে বিস্ময়কর কিছুই নাই। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম কুসংস্কারময় ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিলেও অত্যুক্তি হয়না; পরন্তু খ্রীষ্টের চরিত্র পূর্ণ আদর্শ মানব চরিত্রের নিম্নে অবস্থিত, এবং খ্রীষ্টের উপদেশের মধ্যে এমন একটীও বচন নাই যাহার সার বা মর্ম্ম হিন্দু শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। হিন্দুশাস্ত্রে অবাত, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মজ্ঞ কোন হিন্দুই খ্রীষ্ট বা খ্রীষ্টবাদে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারে না। যিনি উপনিষদরূপ আধ্যাত্মিক হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বর্গেরদিকে, ব্রহ্মেরদিকে স্থির দৃষ্টি রক্ষা পূর্ব্বক অবস্থান করেন, তিনি সেই অত্যুচ্চ শৈলমালার পাদদেশ ধৌতকারী পঙ্কিল নদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন কেন?

সুখ ও আত্মপ্রসাদ।

মহর্ষির নিকট একদিন উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া বলিল অমুক বাবু আসিয়াছেন। মহর্ষির আদেশানুসারে ভৃত্য তাঁহাকে তাঁহার নিকট লইয়া আসিল। বাবুটি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন উপনগর নিবাসী জমিদার। ইনি অতুল ধনের অধিপতি, বয়ঃক্রম চল্লিশের কিছু

অধিক। সঙ্গে একজন পারিষদ। ইনি মহর্ষির নিকটে পূর্ব্বে দুই একবার আসিয়াছিলেন। উপস্থিত হইয়াই ধর্ম্ম প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। জমীদার মহাশয় অল্পকালমাত্র ধর্ম্মালোচনায় মনঃসমর্পণ করিয়াছেন, কথা বার্ত্তায় এরূপ প্রমাণ পাইলাম। ধর্ম্মের জন্য বা শান্তির জন্য তাহার বড়ই ব্যাকুলতা দেখিলাম। ধার্ম্মিক হইলেই ঈশ্বর সুখ, ঐশ্বর্য্য শান্তি সকলই দেন, ইনি এই মত প্রকাশ করিলেন। মহর্ষি তাহা শুনিয়া বলিলেন "না, তাহা নহে। ধর্ম্ম সুখৈশ্বর্য্যের দ্বার নহে। দৃঢ়ভাবে সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মপালন করিতে গেলে এ পৃথিবীতে অনেকের ভাগ্যে দুঃখ দারিদ্র্যই ঘটে। কিন্তু ধর্ম্মপালন করিয়া ধার্ম্মিক ঈশ্বরের নিকট হইতে যে পুরস্কার পান তাহা পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য অপেক্ষা অনেক মূল্যবান। ধর্ম্মের পুরস্কার আত্মপ্রসাদ, সুখ নহে।" জমীদার মহাশয় এই উত্তর পাইয়া কিঞ্চিৎ ক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যেন অন্যমনস্ক ভাবে বলিতে লাগিলেন, "এঁ এঁ ধর্ম্মের পুরস্কার সুখ নহে? ধর্ম্মের পুরস্কার সুখ নহে।" মহর্ষি তাঁহার কথার মর্ম্ম আরও বিশদরূপে তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু জমীদার মহাশয়ের হাব ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইল যেন তিনি কি একটা আশা লইয়া আসিয়াছিলেন, মহর্ষির ঐ কথায় সে আশা ভাঙ্গিয়া গেল। বিদায়ের পূর্ব্বে তাঁহার মুখের ভাব যেন বলিতেছিল, "ব্রাহ্মের ঈশ্বর যখন ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে সুখ দেন না, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মে আমার আশা মিটিবেনা।" লোকটির আধ্যাত্মিক বোধশক্তি এতই হীন যে আত্মপ্রসাদের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব মহর্ষির বিশদ ব্যাখ্যা স্বত্ত্বেও উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। সম্প্রতি শুনিয়াছি নানা সাংসারিক কারণে উক্ত জমীদার মহাশয় অত্যন্ত অসুখে ও অশান্তিতে কালযাপন করিতেছেন।

নব-দীক্ষিত অনুতপ্ত যুবক ও মহর্ষি।

১৮৭০ কিম্বা ১৮৭১ সালে আদি ব্রাহ্মসমাজে এক বুধবার দিনের উপাসনার পর একজন যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। প্রতিজ্ঞাগ্রহণের পর মহর্ষি তাহাকে উপদেশ দেন। উপদেশের মর্ম্মস্পর্শী বাক্যগুলি যুবকটাকে এরূপ ব্যাকুল করিয়া তুলিল যে সে অস্থির হইয়া আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। উপদেশ শেষ হইল, তখন সে অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। মহর্ষি তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। অনুতাপ-দগ্ধ যুবক "আমার পরিত্রাণ নাই" "আমার উদ্ধার নাই" অনবরত এই প্রকার হতাশোক্তি করিতে লাগিল এবং বস্ত্র দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া অবিরামে ক্রন্দন করিতে লাগিল। উপাসকদিগের মধ্যে অনেকে মুগ্ধ হইয়া এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু নব-দীক্ষিত যুবকের অনুতপ্ত হৃদয়ের উদ্বেলতা প্রশমনের কোন চিহ্ন না দেখিয়া একে একে তাঁহারা গৃহে গমন করিতে লাগিলেন। একঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইয়া গেল, যুবকের ক্রন্দনেরও শেষ নাই, সান্ত্বনা প্রদানেও মহর্ষিরও ক্লান্তি নাই। ক্রমে সমাজগৃহ প্রায় লোকশূন্য হইল; রাত্রি অধিক হইতে লাগিল দেখিয়া আমিও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজে।

১৮৬৮ সালে আমরা এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলাম। পরলোকগত নীলকমল মিত্র মহাশয়ের "লাল কুঠি"র অনতিদূরে আমাদিগের বাসা ছিল। ঐ বৎসরের শীতকালে মহর্ষিদেব এলাহাবাদে উপস্থিত হয়েন। তিনি মিত্র মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া "লাল কুঠিতে"ই অবস্থিতি করেন। রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট একটী দ্বিতল বাটীতে তখন এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইত। ৺ মিত্র মহাশয় এবং তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যোগদান করিতেন। মহর্ষির আগমনে এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ উৎসব হয়। স্মরণ হইতেছে লাল কুঠি হইতে মহর্ষির সহিত আমরা কয়েকজনে উপাসনা গৃহে যাত্রা করিলাম। দ্বিতলের দীর্ঘ হলটি লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মহর্ষি বেদীতে আসন গ্রহণ করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

দীর্ঘ-জীবন।

পরলোকের জন্য সম্যকরূপে উপযোগী হইবার পক্ষে মানুষের দীর্ঘ জীবনের প্রয়োজনীয়তা আছে, বোধ হয় মহর্ষির ইহা ধারণা ছিল। "শতায়ুর্ব্বৈঃ পুরুষঃ" এই শ্রুতি-বাক্য তাঁহার মুখে একাধিকবার শুনিয়াছি। পুরুষ কে না যিনি আত্মাবান। সবিশেষ বিশ্লেষণে এই বাক্যের অর্থ ইহাই দাঁড়ায় যে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত সকল নিয়ম পালন করিয়া মানুষ ইহলোকে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিলে তাহার

আত্মার কল্যাণই সাধিত হয়। ইহলোকে আত্মা যতদূর পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইতে পারে তাহা লাভ করিবার জন্য ক্ষুর ধারের ন্যায় শাণিত ধর্ম্মপথে শতবৎসর বা তদ্রূপ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চলিতে হয়। যিনি আত্মবান, ভোগসুখ যাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে অক্ষম, একমাত্র আত্মার উন্নতির আকাঙ্ক্ষাই তাঁহাকে শরীর পালন করিতে প্রোৎসাহিত করিতে থাকে। এই পবিত্র আকাঙ্ক্ষাই মহর্ষিকে শরীরপালনে অতীব যত্নশীল করিয়াছিল। স্বাস্থ্য ও বল রক্ষার জন্য তিনি আপনাকে কঠোর নিয়মের অধীনে রাখিয়াছিলেন। আহার সম্বন্ধে মিতাচার ও বিহিতাচারই তাঁহার দীর্ঘ জীবনের একটী প্রধান কারণ ছিল। একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শরীর কিরূপ?" আমি বলিলাম, "আমার অপরিপাক জনিত অসুখ পূর্ব্ববৎই আছে।" পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন ঔষধ ব্যবহার করিতেছ কি?" আমি বলিলাম, "প্রত্যহ অনেকটা লেবুর রস পান করি।" ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তুমি খানিকটা লেবুর রস খাইয়াই পরিপাক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হও, কিন্তু দেখ আমাকে এখন প্রত্যহ কোন্ জিনিষটা খাব, কোন্টা না খাব আর কতটাই বা খাব, সে সম্বন্ধে অনেক বিবেচনা ও বিচার করিয়া আহার করিতে হয়।" মহর্ষির এই কথাগুলির সহিত আমি আমেরিকার একজন প্রধান চিকিৎসকের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখিতে পাইলাম। সে চিকিৎসক বলিয়াছেন, "If we can adjust our daily food to the daily requirement of the system, we shall never be ill!" দেখিলাম স্বীয় অভিজ্ঞতা ও বিচার বলে মহর্ষি স্বীয় স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে যে নিয়ম স্থির করিয়া লইয়াছেন, সুদূর আমেরিকার একজন শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বিজ্ঞানের নিয়ম প্রয়োগে সেই সত্যেই উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু কেবল শারীরিক নিয়ম পালন করিয়াই মহর্ষি দীর্ঘজীবন লাভ করেন নাই। শান্ত দান্ত সমাহিত না হইলে পরমায়ু বর্দ্ধিত হয় না।

ঋষিত্ব।

শুনিয়াছিলাম স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনই সর্ব্ব প্রথমে পূজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথকে "মহর্ষি" আখ্যা প্রদান করেন। মত বিভেদ থাকিলেও কেশবচন্দ্র তাঁহার ধ্যানপরায়ণতা ও যোগনিরত ভাবে ঋষিত্ব দর্শনে অপারগ হয়েন নাই। ঈশ্বর দর্শন শক্তি যদি ঋষিত্বের প্রধান লক্ষণ হয়, চক্ষুষ্মান আত্মা যাহার তিনিই যদি ঋষি নামের বাচ্য হয়েন, তাহা হইলে এই নাম পূজ্যপাদ মহাশয়ের যে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল তাহা যাঁহারা কেশবচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার সহবাস লাভ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মপ্রকৃতির বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন। যিনি যৌবনকালে বলিয়াছিলেন, সম্মুখের দেয়াল যেমন দেখিতেছি তেমনি ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখিতেছি, এবং যৌবন কাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বথা এই বাক্যানুযায়ী ঈশ্বরদর্শন শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে ঋষি বলিলে ঋষি নামের গৌরব কিছুমাত্র হানি করা হয় না। ঋষি শব্দের যে কয়েকটী সাধারণ অর্থ আছে সে কয়েকটী অর্থানুসারেও ঐ নাম পূজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল। প্রথম অর্থ, যিনি সাংসারিক সুখ ত্যাগ করিয়া জ্ঞানপথে গমন করিয়াছেন তিনি ঋষি; দ্বিতীয় অর্থ; যাঁহা হইতে বিদ্যা, সত্য, তপ, ও শ্রুতি এই সকল সম্যক রূপ নিরূপিত হয় তিনি ঋষি; তৃতীয় অর্থ, যিনি পরমার্থে সম্যক দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে পরোপকার করেন তিনি ঋষি; চতুর্থ অর্থ, যিনি সাংসারিক বিষয় হইতে বিরত হইয়া ধর্ম্মচিন্তায় মনোনিবেশ করেন তিনি ঋষি; পঞ্চম অর্থ, যিনি ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকেন তিনি ঋষি। দীর্ঘায়ু ঋষির একটী লক্ষণ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই শারীরিক লক্ষণটীও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে বর্ত্তমান ছিল।

প্রাচীন ভারতের তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষিগণের প্রতি পূজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথের গভীর, অচলা ভক্তি ছিল। সুতরাং সেই উচ্চ নামে তিনি অভিহিত হইতেন বলিয়া তিনি মনে মনে লজ্জিত হইতেন। আমার পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি একদিন যোড়াসাঁকোর বাটীর বারান্দার চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি ফুল গাছের টবের মধ্যভাগে চৌকির উপর উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথনকালে মহর্ষি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ এই গাছগুলি হচ্ছে আমার তপোবন; আর আমি ঋষি।" জ্ঞান, ধর্ম্ম, পবিত্রতায় যিনি যত উচ্চ হউন না কেন, অহঙ্কারশূন্য হইলে তাঁহার মনশ্চক্ষু সমক্ষে জ্ঞানের, ধর্ম্মের ও পবিত্রতার উচ্চতর আদর্শ উদ্ঘাটিত হইয়া

যায়, সুতরাং লোকে তাঁহাকে যত উচ্চ ভাবে তিনি আপনাকে তত উচ্চ কখন ভাবিতে পারেন না। এই সুন্দর আধ্যাত্মিক নিয়মই মানবাত্মার অনন্ত উন্নতির ভিত্তি। পূজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথে আমরা যে ঋষিভাব দেখিয়া তাঁহাকে মহর্ষি না বলিয়া বিরত থাকিতে পারিতেছি না, তাঁহার নিজের উন্নত হৃদয়ে ঋষি ভাবের যে আদর্শ ছিল তাহা তদপেক্ষা যে অনেক উচ্চ তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না, সুতরাং লোকে তাঁহাকে মহর্ষি বলিয়া থাকে বলিয়া যে তিনি তাহা লইয়া পরিহাস করিবেন তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

পূজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথে ঋষিভাবের যেরূপ সমাবেশ হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান যুগের সাধারণ-লোক-পরিচিত অন্য কোন হিন্দু সন্তানে দেখা যায় না। তাঁহার এই ঋষিত্ব লাভের দৃষ্টান্ত হিন্দুজাতির পক্ষে অতি কল্যাণকর হইবে সন্দেহ নাই। এ কালে ঋষি ভাব যে কেহ প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহা বোধ হয় কেহ বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে কাহারও মনে সে অবিশ্বাস তিষ্ঠিতে পারিবে না। সাধনা সকলেই করিতে পারে না, সিদ্ধি সকলের আয়ত্তাধীন নহে। বর্ত্তমান কালে ঋষিত্ব সাধনার অতীত বলিয়াই অনেকের ধারণা হইয়াছিল, কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাহা একালের অধঃপতিত হিন্দুগণেরও সাধনার অন্তর্গত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহাই তাঁহার পার্থিব জীবনের পরম গৌরব ও সার্থকতা।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

কাটমণ্ডু

নেপাল হিমালয়ের ক্রোড়স্থিত এক বিস্তীর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশ। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫০০ ক্রোশ এবং প্রস্থে ৯০ হইতে ১৫০ ক্রোশ পর্য্যন্ত হইবে। ইহার উত্তর সীমা তীব্বত, পূর্ব্বে সিকিম, পশ্চিমে রোহিলখণ্ড এবং কুমায়ন, দক্ষিণে হিন্দুস্থান। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে সিগাউলির সন্ধির পূর্ব্বে নৈনিতাল, মসুরি প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত ছিল। এই যে বিস্তীর্ণ প্রদেশ ইহা স্বাধীন হিন্দুরাজার অধীন। একশত বিংশতিবৎসর পূর্ব্বে এদেশ হিন্দুরাজার অধীন ছিল না। নেয়ার নামধেয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এক মিশ্রজাতি এদেশে রাজত্ব করিত। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে গুর্খাবংশীয় পৃথ্বীনারায়ণ নামে জনৈক হিন্দু নরপতি নেওয়ার রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সমুদয় নেপালে রাজ্য বিস্তার করেন। নেপালের বর্ত্তমান নরপতি রাজাধিরাজ পৃথ্বীবীরবিক্রম ইহারই বংশধর। একদা মারাঠাদিগের ন্যায় বর্ত্তমান নেপালেও মন্ত্রীরাজত্ব প্রচলিত ছিল।

কাটমণ্ডু নেপালের রাজধানী। ইহা সমুদ্রতল হইতে ৪,৫০০ ফুট উচ্চ। এক বিস্তীর্ণ উপত্যকার একাংশে কাটমণ্ডু সহর অবস্থিত। পূর্ব্ব পশ্চিমে এই উপত্যকার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ মাইল হইবে—প্রস্থে উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১৫ মাইল। কাটমণ্ডু আগমন কালে চন্দ্রাগারির শিখরদেশ হইতে এই বিস্তীর্ণ উপত্যকাটী চিত্রপটের ন্যায় চক্ষের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়। ইহা চতুর্দ্দিকে উন্নত পর্ব্বতমালায় অবরুদ্ধ *, কেবল দক্ষিণে বাঘমতী নদীর নির্গমন স্থলে এক বিচ্ছেদ আছে। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে, অতি পুরাকালে নাগবাস নামে এক প্রকাণ্ড পার্ব্বত্য হ্রদ ছিল। মানজুশ্রী বোধিসত্ত্ব নামে চীন দেশ হইতে সমাগত এক মহাত্মা স্বীয় তরবারির আঘাতে পর্ব্বত ভেদ করিয়া ইহার বারিরাশি নির্গমনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। তখন হইতে ইহা মনুষ্যের আবাসের উপযোগী হইয়াছে। এই কিম্বদন্তী অনেক কারণে নিতান্ত অমূলক বলিয়া মনে হয় না। কারণ এই উপত্যকা একেবারে সমতল এবং কঙ্করশূন্য নদীতলের ন্যায় পঙ্কিলময়। যদি এখনও কোন উপায়ে বাঘমতী নদীর বারি নির্গমনের পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলে এই রমণীয় উপত্যকা ভবিষ্যতে পুনরায় পার্ব্বত্য হ্রদে পরিণত হইতে পারে।

কাটমণ্ডু সহর পূর্ব্বে কান্তিপুর নামে অভিহিত হইত। ৭২৩ খৃষ্টাব্দে রাজা গুণরাম দেব এই সহর প্রতিষ্ঠা করেন। একদা তিনি মহালক্ষ্মীর পূজা করিতেছিলেন। এমন সময় স্বপ্নে দেবী তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "বাঘমতী এবং বিষ্ণুমতী নদীর সঙ্গম স্থলে এক সহর নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

* পূর্ব্বদিকে মহাদেবপোখরি, উত্তরে মুনিচর, শিবপুরি, কুকনি, কাঁটছিলা, পশ্চিমে নগরজন, দক্ষিণে চন্দ্রাগিরি, চম্পাদেবী, ফুরকিং, ফুলচক (সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৯৭২০ ফুট উচ্চ)।

পুরাকালে তথায় নীমুনি তপস্যা করিয়াছিলেন। এই নূতন সহরের আকৃতি দেবীর খড়্গের ন্যায় হইবে। এ সহরে প্রতিদিন লক্ষ টাকার কারবার হইবে।" শুভলগ্নে রাজা পাটন হইতে কান্তিপুরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিলেন। সহরে ১৮,০০০ গৃহ নির্ম্মিত হইল। লক্ষ্মী প্রতিজ্ঞা করিলেন যতদিন না সহরে লক্ষ টাকার কারবার হয়, ততদিন তিনি এই সহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া অবস্থিতি করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে কান্তিপুর নামের পরিবর্ত্তে ইহা কাটমণ্ডু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সহরের মধ্যভাগে পুরাতন রাজ-প্রাসাদের সন্নিকটেই কাটমণ্ডু নামে এক কাষ্ঠের গৃহ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজা লক্ষ্মিণা সিংহ মল্ল ইহা ফকীরদিগের আবাসের জন্য নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। এই কাটমণ্ড অর্থাৎ কাষ্ঠময় নিকেতন হইতে কাটমণ্ডু নামের উৎপত্তি। যদিও এই কাষ্ঠময় নিকেতন অত্যন্ত পুরাতন হইয়াছে তথাপি ইহা এখনও ফকীরদিগের আশ্রয়রূপে দণ্ডায়মান আছে। কাটমণ্ডু বর্ত্তমান গুর্খা রাজবংশের রাজধানী বটে কিন্তু নেওয়ার রাজাদিগের রাজত্ব কালে পাটন, ভাতগাঁও, কীর্ত্তিপুর প্রভৃতি প্রধান সহর ছিল। এই সকল সহর পূর্ব্বে প্রাচীরবেষ্টিত ছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া সহরে প্রবেশের পথ ছিল। সচরাচর এই সকল দ্বার উন্মুক্ত থাকিত, কেবল যুদ্ধ বিগ্রহ বা অন্য কোনরূপ বিশেষ কারণে রুদ্ধ হইত। বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীর বা প্রবেশদ্বার সকলের কোন চিহ্ন নাই। গুর্খা রাজত্বকালে তাহা ক্রমে লোপ পাইয়াছে। এইরূপে কাটমণ্ডু সহরে প্রায় ৩২টী প্রবেশদ্বার ছিল। যদিও প্রাচীর নাই কিন্তু সহরের সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সীমার মধ্যে কোন নীচজাতীয় ব্যক্তির বাস করিবার অধিকার নাই। এবং আরও অনেক নিয়ম অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। বাগমতী এবং তাহার শাখা বিষ্ণুমতী এই কাটমণ্ডু সহর বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সহরের ঠিক মধ্যভাগে নেওয়ার রাজাদিগের পুরাতন প্রাসাদ অদ্যাবধি দণ্ডায়মান আছে। বর্ত্তমান সময়ে এই বিচিত্র প্রাসাদমালা হনুমানঢোকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সিংহদ্বারের সম্মুখে হনুমানের এক প্রকাণ্ড বিগ্রহ দণ্ডায়মান আছে। ঢোকা অর্থাৎ দ্বার। এই বিচিত্র প্রাসাদের দ্বার স্বর্ণনির্ম্মিত। বাহির হইতে দেখিলে ইহাকে সৈন্যাবাস বা কারাগৃহ বলিয়া মনে হয়। ইহার গঠনপ্রণালী বর্ত্তমান রুচিসঙ্গত নয়। বর্ত্তমান নরপতি এই প্রাসাদে অবস্থিতি করেন না। হনুমানঢোকার সম্মুখে এবং চতুর্দ্দিকে নানা সুদৃশ্য দেবমন্দির স্তম্ভ প্রভৃতি পুরাকীর্ত্তি সকল বিদ্যমান আছে। বস্তুতঃ এ স্থানের দৃশ্যটী মনোরম। হনুমানঢোকার অদূরে ভৈরবের এক প্রস্তরনির্ম্মিত বীভৎস প্রতিমূর্ত্তি আছে; তাহার চক্ষু গোলাকার, দন্তপংক্তি ভীষণ ভাবে প্রকটিত। হনুমানঢোকার প্রায় ৪০০ হাত দূরে কোট নামে এক নব্য ধরণের গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্যাকৃতিতে ইহার কোন বিশেষত্ব নাই বটে কিন্তু বর্ত্তমান ইতিহাসে ইহা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর এখানে এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। সেইদিন নেপালের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত পরিবার নায়কহীন হইয়া পড়ে। এবং সেই দিনই সুপ্রসিদ্ধ জঙ্গ বাহাদুরের অভূতপূর্ব্ব গৌরবের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। তাই আজও কোটের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে রক্তাক্ত স্মৃতি হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তোলে। সহরের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাজার ইন্দ্রচক। ইন্দ্রচক কলিকাতার বড়বাজার বলিয়া ভ্রম হয়। বিলাতী পণ্যদ্রব্যে ইহা সুশোভিত।* সহরের রাস্তা সকল অপ্রশস্ত এবং প্রস্তরনির্ম্মিত এবং অধিকাংশ স্থান অত্যন্ত অপরিষ্কার; দুই পার্শ্বে উন্নত দ্বিতল গৃহ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল গৃহ আমাদের দেশের গৃহের ন্যায় নহে। কারুকার্য্য-খচিত কাষ্ঠের বারান্দা প্রত্যেক গৃহের প্রধান সৌন্দর্য্য। গৃহ সকল ক্ষুদ্র আলোকশূন্য—গবাক্ষ সকল ক্ষুদ্র ও বিচিত্র কারুকার্য্যে শোভাযুক্ত। বর্ত্তমান সময়ে জনসাধারণের রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে; এখন কাটমণ্ডু সহরে কলিকাতার ন্যায় প্রকাণ্ড সুশোভিত অট্টালিকা সকল নির্ম্মিত হইতেছে।

সহরের বাহিরে উত্তরপূর্ব্বদিকে এক প্রকাণ্ড ময়দান আছে। উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল হইবে এবং প্রস্থে প্রায় তাহার এক তৃতীয়াংশ। এই স্থানে সর্ব্বদাই কাবাজ খেলা হয়। ইহাকে টুনি খিল বলে। ইহা অনেকটা কলিকাতার গড়েরমাঠের ন্যায়। টুনি খিলের মধ্যে তিনটী

* স্বাধীন রাজা নেপালে বিলাতী পণ্যদ্রব্যের প্রাধান্য বড়ই কুলক্ষণ। তথায় স্বদেশীর তরঙ্গ কি পৌঁছে নাই? সেখানে রাজশক্তি স্বদেশীর বিরোধী না হইবারই কথা। সম্পাদক।

মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় ;—(১) জঙ্গ বাহাদুর, (২) বীর শামসের, (৩) ভীমসেন থাপা। টুনি খিলের দক্ষিণে প্রকৃত কাটমণ্ডু সহর। বর্ত্তমান সময়ে টুনি খিলের চতুর্দ্দিকে অনেক সুদৃশ্য প্রাসাদ এবং অট্টালিকা সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল অট্টালিকা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। এই প্রশস্ত ময়দানের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মহারাজ চন্দ্র শামসের বাহাদুরের শ্বেত সৌধমালা দণ্ডায়মান থাকিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে। মহারাজ চন্দ্রশামসের সাহেবের প্রাসাদের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ জঙ্গ বাহাদুর মহাশয়ের থাপাথলীর দরবার দেখিতে পাওয়া যায়। বাঘমতীর অপর তীর হইতে এই সকল প্রাসাদমালা কাটমণ্ডু প্রবেশ কালে দর্শকের নয়নগোচর হয়। এই স্থানে সম্প্রতি একটী নূতন পুল নির্ম্মিত হইয়াছে। বীর শামসের মহারাজার সময়ে কাটমণ্ডু সহরের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

টুনি খিলের পশ্চিম দিকে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বীর হাঁসপাতাল ও দরবার স্কুল শোভা পাইতেছে। উত্তরে রাণী-পকুর, এবং মহারাজ বীর শামসের সাহেবের অতি সুশোভন লাল দরবার নামক প্রাসাদ। রাণীপকুরের মধ্যে একটী দেবমন্দির আছে। এই সুন্দর সরোবরটী প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা প্রতাপমল্ল পুত্রশোককাতরা পত্নীর সান্ত্বনার জন্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ; এবং ভারতবর্ষের সমুদায় তীর্থ হইতে পবিত্রবারি আনিয়া ইহাতে রক্ষিত হইয়াছিল। অদ্যাবধি এই সরোবরের দক্ষিণে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত হস্তীর উপর প্রতাপ মল্ল এবং তাঁহার রাণীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পারে বীর লাইব্রেরী এবং ঘটিকাগৃহ আছে। ইহাও বীর শামসের মহারাজার কীর্ত্তি। তিনি কাটমণ্ডু সহরে ড্রেন এবং জলের কল নির্ম্মাণ করিয়া সহরবাসীর প্রভূত উপকার করিয়াছেন। তিনি নানা উপায়ে কাটমণ্ডু সহরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

অদ্যাবধি কাটমণ্ডু সহরের পথপার্শ্বে আলোকের কোন ব্যবস্থা নাই। এই একটী বিশেষ অভাব এখনও অপূর্ণ আছে। বীর শামসের মহারাজার লাল দরবারের উত্তরে রাণা পরিবারস্থ অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সুদৃশ্য প্রাসাদ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। আরও উত্তরে বর্ত্তমান নরপতি মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীবীর বিক্রমের শাহের রাজভবন। তিনি এখন হনুমানঢোকায় অবস্থিতি করেন না। সহরের একবারে উত্তরে পর্ব্বতের পাদদেশে ব্রিটিশ রেসিডেন্সি। টুনি খিলের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে কলিকাতার অকটারলনি মনুমেণ্টের অনুরূপ একটী মনুমেণ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সুবিখ্যাত রাজমন্ত্রী ভীমসেন থাপা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মনুমেণ্টের নিকটেই তাঁহার বাঘ দরবার নামে প্রাসাদ অদ্যাবধি আছে। টুনি খিলের পশ্চিম দিকে বীর হাসপাতালের সন্নিকটে আর একটী দ্রষ্টব্য স্থান আছে। ইহা মহাকালের মন্দির। স্বয়ং রাণা মহারাজ ইহার সম্মুখ দিয়া কখন ইহাকে দর্শন না করিয়া গমন করেন না। মন্দিরটী অত্যন্ত পুরাতন। সম্ভবতঃ বৌদ্ধগণ ইহা স্থাপন করেন কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বৌদ্ধ হিন্দু সকলেই ইহাকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। ইহার প্রভূত সম্পত্তি এবং বিস্তর উপাসক। বিগত পাঁচিশ বৎসরের মধ্যে টুনি খিলের চতুর্দ্দিকের হর্ম্ম্যাবলীর দ্বারা সহরের সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। আবহমান কাল হইতে টুনি খিল সৈন্য-দিগের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে এই স্থানে রণবাদ্য এবং কাবাজ খেলার সময় সৈন্যদিগের অস্ত্রের ঝঞ্চনা শ্রুত হইয়া থাকে। কারণ সৈনিক বিভাগই নেপাল রাজ্যের সমুদায় অর্থ সামর্থ্য গ্রাস করিয়া আছে। নেপাল রাজ্যের নাম শুনিবার পূর্ব্বে গুর্খা সৈনিকের খ্যাতি শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু ইহাদিগের বাহ্যাকৃতি চালচলন কোনরূপ বীরত্ব কিম্বা গৌরব ব্যঞ্জক নহে। কাটমণ্ডু সহরের প্রাসাদ সকলের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অধিকতর মনোহারী। দুর্ভেদ্য প্রাকারের ন্যায় চতুর্দ্দিকের সুনীল উন্নত পর্ব্বতমালা, উত্তর সীমায় দিগন্তপ্রসারী হিমানী-মণ্ডিত শিখরশ্রেণী, উজ্জ্বল আলোকমণ্ডিত সুনীল নভোমণ্ডল, শ্যামল পুষ্পিত বৃক্ষলতা, হৃদয় মন বিমুগ্ধ করিয়া রাখে। বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া এই সকল অপূর্ব্ব শোভা দেখিলে হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠে। তখন মনে হয় পুরাণে যে কৈলাসপুরীর বর্ণনা আছে তাহা বুঝি এই। হিমাচলের অঙ্গে অঙ্গে এত সৌন্দর্য্যও বিধাতা ঢালিয়া দিয়াছেন।

দেখিয়া দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত হয় না। দেখি আর ভাবি কবি যথার্থই গাহিয়াছেন ঃ---

"তুমি ধন্য ধন্য হে;
ধন্য তব প্রেম;
ধন্য তোমার জগৎ রচনা।"

শ্রীহেমলতা দেবী।

দ্রৌপদী

মানব কল্পনার অপূর্ব্ব সৃষ্টি যে নারীকে মহাভারতকার তদীয় মহা কাব্যের মেরুদণ্ডরূপিনী করিয়াছেন, যাঁহার প্রতি অবমাননা কুরুকুল নিধনের প্রথম বজ্র নিনাদ, তাঁহার অনুরূপ চরিত পৃথিবীর সাহিত্যে অতি বিরল। সংস্কৃত সাহিত্য যে সকল নারী চিত্রে অলঙ্কৃত, তন্মধ্যে এই চিত্র সম্পূর্ণ নূতন। যাজ্ঞসেনী কেবল দ্রোণ বধের জন্য পবিত্র যজ্ঞবেদী হইতে উদ্ভূতা নহেন, কিন্তু উন্নত নারীত্ব প্রদর্শন করিতে সংস্কৃত সাহিত্যের হোমভূমি হইতে উত্থিতা। জীবন-ব্যাপী তপস্যালব্ধ যে সকল গুণ চরিত্রকে মানবত্বের উন্নততম শিখরে উত্থিত করে, তাহা যেমন ইহাতে সুব্যক্ত, তদ্রূপ অন্যত্র দৃষ্ট হয়না। দিগন্তলীন প্রান্তরবক্ষে দণ্ডায়মান, সুনীল গগনপটে বিলীন, নিঃসঙ্গ শৈলের ন্যায় এই রমণী স্বকীয় অলোকসামান্য চরিত্র গাম্ভীর্য্যে সংস্কৃত সাহিত্য আকাশের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। দ্রোণকৃত যে অপমান বহ্নি যজ্ঞসেনের অস্থিতে অস্থিতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, দ্রৌপদী যেন তাহারই বহিঃপ্রকাশ। পিতার যে ক্ষাত্র তেজ ও বীরদর্পের উত্তাপ তিনি জন্মাবধি হৃদয় ভরিয়া গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাহা তাঁহাকে বাল্যাবধি তেজে উন্নত, দর্পে অটল ও আত্মসম্ভ্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। পরস্পর বিরোধী ঘটনাবলীর মধ্যে জীবনে বহুবার নিক্ষিপ্ত হইলেও এই প্রখর আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্য ত্যাগ করে নাই। নৃপতিকুলে উৎপন্না বলিয়া এই আভিজাত্য বোধ নহে। ইহা উন্নত চরিত্র সম্ভূত। যাঁহারা আধ্যাত্মিক শক্তিতে মানবকুলের রাজবংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাঁহাদের আত্মাতেই কেবল এই প্রদীপ্ত রাজশ্রী লক্ষিত হইয়া থাকে।

স্বয়ংবর সভাতলে বিপুল জনতরঙ্গের মধ্যে ও সহস্র উৎসুক নেত্রের সমক্ষে পিতৃতেজ সমন্বিতা ষোড়শবর্ষীয়া ক্ষত্রকুমারী অকুণ্ঠিতহৃদয়ে সর্ব্ব ক্ষত্রগুণসম্পন্ন কুমার কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করিলেন; কহিলেন, "আমি সূত পুত্রকে বরণ করিবনা।" রূপ, গুণ ও শৌর্য্যে অনন্য যুবক সর্ব্বাংশে তাহার অনুরূপ প্রার্থী হইয়াও প্রত্যাখ্যাত হইলেন, কারণ তিনি ক্ষত্রপুত্র বলিয়া পরিচিত নহেন। যে তেজোমহিমা ও যে গুণরাশি উন্নত বংশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে, ক্ষত্র কুমারী তাহার বিশ্বস্ততায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেননা।

কিন্তু এই সময়েই এই তরুণী রাজদুহিতার চরিত্রে উদ্দমনীয় গর্ব্বের সহিত প্রবল ধর্ম্মানুরাগ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার রমণীয় সম্মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। যে অজ্ঞাত কুলশীল পুরুষ দ্রুপদের পণে জয়ী হইয়া কৃষ্ণাকে স্বীয় ভ্রাতাদের নিকটে লইয়া গেলেন, তিনি ও তাঁহার ভ্রাতারা ক্ষত্রিয় ও রাজকুমার হইয়াও রাজ্যহীন; কেবল তাহাই নহে, শত্রুর উৎপীড়নে তাহারা ছদ্মবেশী ও ভিক্ষোপজীবী।

স্বয়ংবর শেষে দ্রুপদরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র, দ্রৌপদী কাহার সহিত কোথায় গমন করিলেন? সুললিত কুসুমমালা কি শ্মশানে পতিত হইল?" ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, "পিতঃ, যিনি অনায়াসে লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণা সানন্দ অন্তরে নাগবধূর ন্যায় সেই নাগেন্দ্রতুল্য বীর পুরুষের অজিন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছেন।" কি সুন্দর চিত্র! কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যে দর্পিতা পঞ্চাল রাজ-কুমারী বিপুল সভা মধ্যে কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তিনি পরক্ষণেই সম্পদ-সুখময় রাজকন্যার জীবন পশ্চাতে ফেলিয়া পতির ভাগ্য সানন্দে নিজ মস্তকে ধরিয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করিলেননা।

লক্ষ্যবেদ্ধা বীর তাঁহাকে এক কুম্ভকারের গৃহে লইয়া গেলেন, ইহাই, দ্রুপদ কন্যার স্বামীর আলয়। এই ভিখারী পতির গৃহে আসিয়া বিক্রান্ত ভূপতির আদরে বর্দ্ধিতা দৃপ্তা পুত্রী কি করিলেন?

সায়ংকাল উপস্থিত হইলে অনুজেরা ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আনিয়া অগ্রজের নিকটে অর্পণ করিলেন। দ্রৌপদী শ্বশ্রূর আদেশে ভিক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার অগ্রভাগ লইয়া দেবতাদিগকে বলি, ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা এবং উপস্থিত

অন্নার্থীদিগকে অন্নদান করিয়া পরে মাতা ও পুত্রদিগকে ভোজন করাইয়া সর্ব্বশেষে স্বয়ং ভোজন করিলেন। সকলে কুশ-শয্যায় অজিন বিস্তীর্ণ করিয়া শয়ন করিলে কুন্তী তাঁহাদের শিরোভাগে এবং দ্রৌপদী তাঁহাদের পাদদেশে শয়ান হইলেন। রাজকুমারী ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিতা হইলেননা বা তাঁহাদের প্রতি কোন অসম্মান প্রদর্শন করিলেন না। এইরূপে পাঞ্চালীর বধূজীবন আরম্ভ হইল।

কপট দ্যূতে পাণ্ডুপুত্রদিগকে পরাস্ত করিয়া দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে সভাতলে আনয়ন করিতে পাঠাইলে কৃষ্ণা শ্বশুরকুল সমীপে যে প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলেন, তাহার উত্তর দিতে সেই সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী নয়শালী বয়োবৃদ্ধগণও অসমর্থ হইলেন। সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি দিকপালগণ স্ব স্ব ধর্ম্মত্যাগ করিলেও যাঁহার সত্যব্রত কেশপ্রমাণ স্খলিত হইবার নহে এবং নারীর প্রতি অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষালনহেতু উগ্রতম প্রায়শ্চিত্ত বিধি যিনি একদিন শিরঃ পাতিয়া লইয়াছিলেন, কুলের স্তম্ভস্বরূপ সেই কুরু পিতামহকে বলিয়া পাঠাইলেন, সত্যবদ্ধ পতির সত্যরক্ষা হেতু চন্দ্রবংশের বধূ সভাতলে অপমানের হস্তে আপনাকে নিক্ষেপ করিবেন কি না? ধর্ম্মপুত্র স্বীয় পতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যূতমুখে বিসর্জ্জন করিয়াছেন? তৎপরে যখন সূত প্রতিকামী দ্রৌপদীকে পুনরায় লইতে আসিয়া সখেদে কহিল, “হায়, এইবার বুঝি কুরুকুল নির্ম্মূল হইল” তখন তিনি প্রাকৃত নারীর ন্যায় সন্ত্রস্ত হইলেননা, কিন্তু ধীর ও অবিকম্পিত কণ্ঠে এবং দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “হে সূতপুত্র, বিধাতাই এরূপ বিধান করিয়াছেন। পৃথ্বীতলে ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমরা সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিব। রক্ষ্যমান ধর্ম্ম অবশ্যই আমাদের শান্তিবিধান করিবেন। আমি প্রার্থনা করি, ধর্ম্ম যেন কৌরবগণের প্রতি বিমুখ না হন। হে সূতনন্দন, তুমি সভ্যগণ সমীপে যাইয়া ধর্ম্মতঃ আমার কি করা কর্ত্তব্য, জিজ্ঞাসা কর। সেই নয়শালী বরিষ্ঠ ধর্ম্মাত্মাগণ যাহা কহিবেন, আমি নিশ্চয় তাহাই করিব।”

সেই অচিন্ত্য বিপদের সময়ে কোন্ হৃদয় হইতে এরূপ বাক্য নির্গত হইতে পারে? তাদৃশ ঘোর অবস্থায়ও ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার চিন্তা সর্ব্বাগ্রে যাঁহার চিত্তে উদিত হয়, তাঁহার অন্তঃকরণ কি এই পৃথিবীর বহু উর্দ্ধে স্থাপিত নহে? যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য ভীষণ অপমানের উন্মুক্ত রঙ্গভূমিতে আপনাকে এরূপ অক্ষুব্ধচিত্তে সমর্পণ করিতে পারেন, স্বয়ং ধর্ম্ম আসিয়া যে সে নারীর লজ্জা ও সম্ভ্রম আপনার নিভৃত নিরাপদ বক্ষে শত আবরণে বেষ্টন করিয়া ধারিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? “প্রার্থনা করি, ধর্ম্ম যেন কৌরবগণের প্রতি বিমুখ না হন।” ঘোর অভিষঙ্গমুখে নিক্ষিপ্ত হইবার প্রাক্কালে পরম শত্রুগণের জন্য এই কল্যাণচিন্তা কি উন্নত মনের পরিচায়ক!

সভাতলে চারিদিকে শত্রুগণের উপহাস, বিদ্রূপ, পৈশাচ অট্টহাস্য ও মৃত্যু যাতনারও অধিক তীব্র অপমানের মধ্যে লজ্জামাত্র আবরণে আবৃতা, ধর্ম্মের উন্নত শিখরে অধিষ্ঠিতা, তেজোমানদ্বিতীয়া যাজ্ঞসেনী যেরূপে আপনাকে অক্ষুণ্ণ রাখিলেন, তাহার বিবরণ অতি অদ্ভুত। এরূপ অভাবনীয় বিপদে কোন রমণীকে কোন দিন পতিত হইতে হয় নাই এবং সে করাল রৌরবমুখ হইতে অক্ষতবপুঃ ও দিব্যদ্যুতি-মণ্ডিতা এমন কমনীয় মূর্ত্তিও কোন দিন উত্থিত হয় নাই। অগ্নিদগ্ধ না হইলে স্বর্ণের পরীক্ষা হয় না, প্রলয়ের অগ্নিতে দগ্ধ না হইলে সাধু সাধ্বীরও প্রকৃত সৌন্দর্য্য জগতের সমক্ষে প্রকটিত হয় না। প্রলয়ের মুখে পৃথিবীর সকল বন্ধন ও আবরণ লূতাতন্তুর ন্যায় নিমেষে দিক্‌দিগন্তে উড়িয়া যায়, তখন বীরপুরুষ ও বীরনারী পৃথিবীর সকল অবগুণ্ঠন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইয়া ক্ষণকালের জন্য জগতের সমক্ষে তাঁহার অতি ভাস্বর দ্যুতি প্রকাশ করেন।

সে দিন সে কৌরব সভাগৃহে কি অনুপম হৃদয়মুগ্ধকর শোভা অপার্থিব জগত হইতে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল! সোদরতুল্য স্নেহভাজনগণ যেখানে ভীষণ শত্রু, হৃতবীর্য্য ক্ষীণপুণ্য শ্বশুরকুল যে সভায় মূকবৎ আসীন, সত্যবদ্ধ পতি যথায় রাহুগ্রস্ত রবির ন্যায় হীনতেজাঃ, তথায় এই সহায়হীনা নারী কোন্ সাহসে ও কি অকুণ্ঠিত মহিমাভরে অটল গিরির মত দণ্ডায়মান হইতে পারিয়াছিলেন?

পৃথিবীর রমণীকুল বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, দ্রুপদদুহিতার এই অকুতোভয়তার অবলম্বন কোথায়? পৃথিবীতে যাহারা আপনার ছিল, তাহারা যখন মোহাচ্ছন্ন হইয়া অসাড়প্রায় মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত রহিল, তখন

লজ্জা যাঁহার একমাত্র অবগুণ্ঠন, অনবদ্য সাধুতা যাঁহার হৃদয়ের মহামূল্য কৌস্তুভ, তাঁহাকে রক্ষা করিতে কে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং কোন্ দিব্য আভাময় মণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া এই মহিমাময়ী অতি উজ্জ্বল অথচ নয়নাস্নিগ্ধকর সহস্ররশ্মি বিকীর্ণ করিতে করিতে অনন্ত সাগরপারবর্ত্তী, কোটিতারকাপ্রদীপ্ত, উজ্জ্বল প্রজ্জ্বলিত, বেলাবিহীন অপরিজ্ঞাত লোকে উত্থিত হইলেন?

যে, পাশব আচরণ ভীরু প্রকৃতি নারীর হৃদয়েও দারুণ অমর্ষাগ্নি উদ্দীপ্ত করে, তাহা পঞ্চালরাজদুহিতার নিগূঢ় মর্ম্মে ভূগর্ভস্থ দ্রব ধাতু সিন্ধুর যে ভৈরবকল্লোল উত্থিত করিয়াছিল, বাহ্যলক্ষণে তাহা প্রকাশিত হইল না, অমানুষ শক্তিবলে তাহা সংযত রহিল। যে পতির অবিমৃষ্যকারিতায় নারীর চরম অভিষঙ্গমুখে তিনি নিক্ষিপ্তা, অমর্ষপ্রদীপ্তা পাণ্ডবরাজ্ঞী তখন সেই সত্যবদ্ধ, অধোবদন ও বিবশ পতির প্রতি প্রলয়ের মেঘের ন্যায় বজ্রতড়িন্ময় অগ্নিরাশি উদ্গীরণ করিলেননা; প্রত্যুত কহিলেন, "ধর্ম্মনন্দন সজ্জন নিষেবিত ধর্ম্মপথই অবলম্বন করিয়া আছেন। আমি পতির বাক্যে গুণ পরিত্যাগ করিয়া দোষারোপ করিতে ইচ্ছা করি না।" দ্বৈতবনে যে নারী দিক্‌পালসদৃশ পঞ্চপাণ্ডবের হৃদয়বহ্নির উদ্দীপনা, যাঁহার মুক্তবেণী কুরুকুলধ্বংসের উদিত ধূমকেতু, ভীষণ অপমানের রঙ্গভূমিতে অপরাধী পতির প্রতি আত্ম-বিস্মৃত প্রেমের এই কমনীয় স্পর্শ তাঁহার ন্যায় পৌরুষে উদ্দীপ্তা ও অনাবিল প্রেমে আত্মবিস্মৃতা মহা নারীর উচ্চ হৃদয় হইতেই কেবল উদ্ভূত হয়।

তৎপরেই স্ফুলিঙ্গবর্ষী অশ্রুহীন নয়ন শ্বশুরগণের দিকে ফিরাইয়া কহিলেন, "হায়, ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্। ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যেহেতু সভাস্থ সমস্ত কুরুগণ স্বচক্ষে কুরুধর্ম্মের ব্যতিক্রম নিরীক্ষণ করিতেছেন। বুঝিলাম, ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের কিছুমাত্র সত্ত্ব নাই। প্রধান প্রধান কুরুবংশীয় বৃদ্ধগণও দুর্য্যোধনের এই অধর্ম্মানুষ্ঠান অনায়াসে উপেক্ষা করিতেছেন।"

যে অসামান্য ধর্ম্মানুরাগ দ্রৌপদীর চরিত্রের ভিত্তি, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাঁহার বরগ্রহণকালে তাহা অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। আমরা অন্য কোন নারীচরিত্রে ধর্ম্মানুরাগ ও তেজস্বিতার এমন হৃদয়গ্রাহী সম্মিলন দেখি নাই। গঙ্গা ও যমুনা-সঙ্গমের ন্যায় বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত এই দুই ভাবের মনোমুগ্ধকর সংমিশ্রণে তাঁহার চরিত্রের ন্যায় যে পবিত্র তীর্থ সংস্কৃত সাহিত্যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে অবগাহন করিলে শরীর মন স্নিগ্ধ ও পবিত্র হয়।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন, "হে দ্রুপদতনয়ে, তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তুমি আমার সমুদয় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে ভরতকুলপ্রদীপ, যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যে, সর্ব্বধর্ম্মযুক্ত শ্রীমান যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্রগণ যেন ঐ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুত্র না হয়। কেননা প্রতিবিন্ধ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণ কর্তৃক লালিত, উহার দাস-পুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়।"

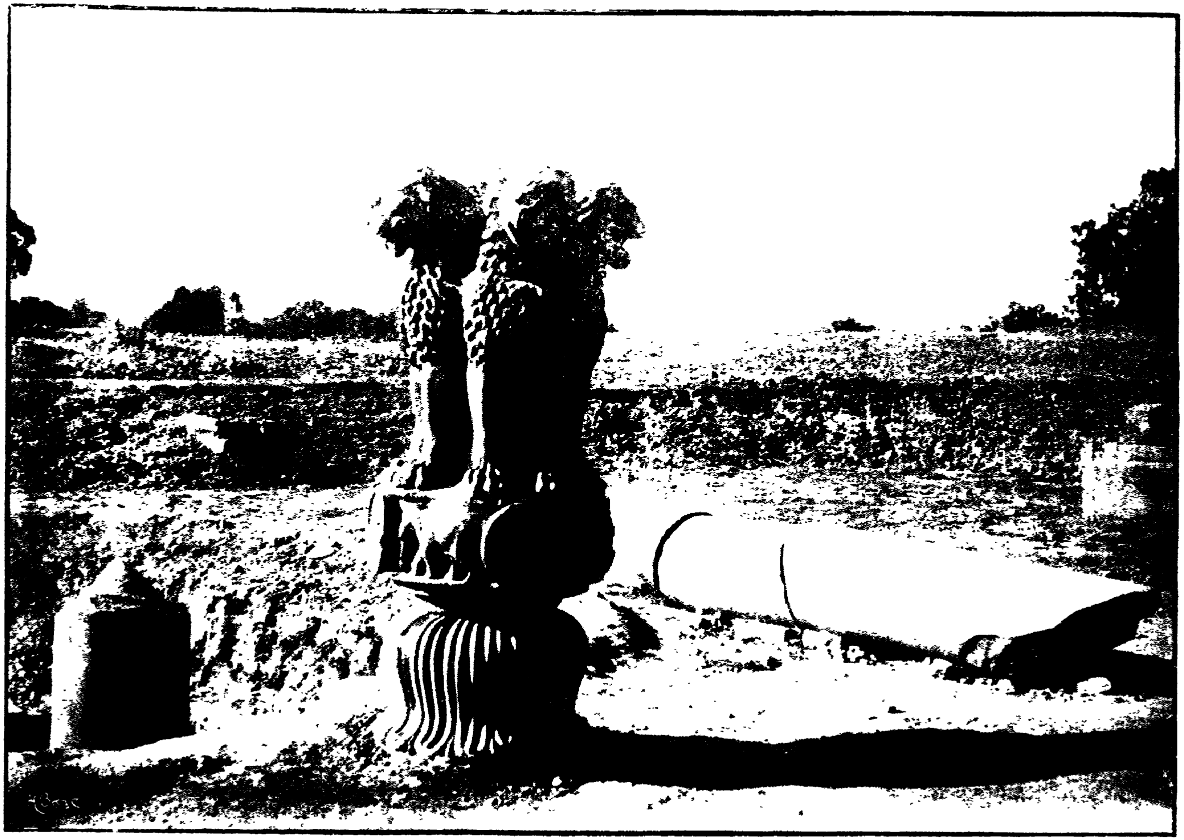
ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে কল্যাণি, আমি তোমার অভিলাষানুরূপ এই বর প্রদান করিলাম। এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নও।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে মহারাজ, সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন হউক।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,"হে নন্দিনি,আমি তোমার প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলাম, এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর দান দ্বারা তোমার যথেষ্ট সৎকার করা হয় নাই। তুমি ধর্ম্মচারিণী, আমার সমুদয় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে ভগবন, লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু; অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করিনা। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি। যেহেতু বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন, উহাঁরা পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।"

ধর্ম্ম ও আত্মসম্মানবোধের এইরূপ সুন্দর মিলনে



সারনাথে ভগ্ন অশোকস্তম্ভ ও তাহার শিরোভাগ।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA

পাণ্ডবরাজ্ঞীর চরিত্র এমন নয়নলোভনীয় হইয়াছে। সাগরের ন্যায় অসীম রহস্যময় তাঁহার চরিত্রের সৌন্দর্য্য সর্ব্বত্র সমভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই জন্য, যে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেও কোন সময়েই তাহা ধর্ম্মের অনুল্লঙ্ঘনীয় বেলাভূমি অতিক্রম করে নাই।

যখন জয়দ্রথ নিশাকালে পবনকম্পিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-শিখা সদৃশী এই নারীকে কাম্যকবনের আশ্রমপদে একাকী প্রাপ্ত হয়, তখন পাঞ্চালী তাহার ও তাহার রাজ্যের সকল কুশল প্রশ্ন করিয়া অতিথি সৌজন্যে তাহার সৎকার করেন; পরে তাহার দুরাভিসন্ধি অবগত হইয়া সিংহীর ন্যায় স্বীয় তেজোরাশি প্রকাশ করেন। জয়দ্রথ তাহাতে বিরত না হইয়া তাঁহার প্রতি বলপ্রকাশ করিতে গিয়া তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হয়। মহাবিক্রান্ত পঞ্চালরাজদুহিতার বাহুবলে সিন্ধুসৌবীরপতি ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূপাতিত হয়।

পরিশেষে জয়দ্রথ পুনরায় বলপূর্ব্বক তাঁহাকে রথে তুলিল। দ্রৌপদী তখন প্রাকৃত নারীর ন্যায় বৃথা বিলাপ চীৎকার বা উদ্দেশে পতিভৎসনা ইত্যাদি নারীজনোচিত কোন দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিলেন না। তিনি ধীরভাবে কুলপুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণাম পূর্ব্বক জয়দ্রথের রথে আরোহণ করিলেন।

পরে যখন জয়দ্রথ দৃশ্যমান পাণ্ডবদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল তখন তিনি তাহার রথস্থা হইয়াও নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহাদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই তেজোগর্ভ বচন পাঠ করিলে মন আনন্দে পূর্ণ হয়। দ্রৌপদী কহিলেন, "রে মূঢ়, তুমি অতি নিদারুণ আয়ুক্ষয়কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে ঐ সকল মহাবীরের পরিচয় লইয়া কি করিবে? উঁহারা সমবেত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, আজি তোমাদের মধ্যে কেহই জীবিতাবশিষ্ট থাকিবেনা। এক্ষণে অনুজগণের সহিত ধর্ম্মরাজকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার সকল ক্লেশই অপনীত হইল। আমি তোমা হইতে আর কোন অনিষ্ট শঙ্কা করি না। যেমন অর্ণব মধ্যে রত্নপরিপূর্ণ নৌকা মকরপৃষ্ঠে আহত হইলে চূর্ণ ও বিকীর্ণ হইয়া যায়, এক্ষণে আমি সৈন্যগণ মধ্যে তদ্রূপ বিক্ষোভিত ও অসহায় হইয়াছি। তুমি মোহাবেশপরবশ হইয়া যাঁহাদিগকে এইরূপে অবমাননা করিতেছ, সেই পাণ্ডবেরা তোমাকে অবিলম্বে ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবেন। অদ্য যদি তুমি ইহাদের নিকটে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হও, তবে তোমার পুনর্জন্ম হইবে সন্দেহ নাই।"

কিন্তু এই শৈলতুল্য চরিত্র নির্ম্মলসলিলা স্বাদু নিঝরিণী-গণে এবং স্নিগ্ধ ও সুচ্ছায় তরুলতায় কিরূপ শীতল ও নয়নাভিরাম, একাধারে লক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণা সদৃশী ইহার গার্হস্থ্য জীবনের কল্যাণী মূর্ত্তি দেখিলে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন।

যুধিষ্ঠির পত্নী পণ রাখিবার সময় কহিয়াছিলেন, "হে সুবলনন্দন, যাঁহার রূপ লক্ষ্মীর ন্যায়, যাঁহার গাত্রে পদ্মগন্ধ, যাঁহার হস্তে সর্ব্বদা শারদপদ্ম শোভা পায়, যিনি, অনৃশংসতা, সুরূপতা, সুশীলতা, অনুকূলতা, প্রিয়বাদিতা ও ধর্ম্মার্থকাম-সিদ্ধির হেতুভূততা প্রভৃতি ভর্ত্তার অভিলষিত গুণ সমুদয়ে বিভূষিতা, যিনি গোপাল ও মেষপালকগণের নিয়মানুসারে শেষে নিদ্রিত ও অগ্রে জাগরিত হয়েন, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদীকে পণ রাখিলাম।"

কাম্যকবনে একদা সত্যভামা দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। সত্যভামা দ্রৌপদীকে কথোপকথন প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে দ্রৌপদী, তুমি লোকপাল সদৃশ মহাবীর পাণ্ডবগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? তাঁহারা তোমার উপর কখনই ক্রুদ্ধ হন না, প্রত্যুত তোমার প্রতি এরূপ অনুরক্ত, যে তোমা ব্যতীত আর কাহাকেও মনে স্থান দেন না, ইহার কারণ কি? তুমি কি ব্রতচর্য্যা, উপবাস, সঙ্গমাদিতে স্নান, হোম, মন্ত্র, ঔষধ ইহার কোন উপায়ের প্রভাবে পাণ্ডবদিগকে এরূপ বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছ? তুমি কি উপায়ে তাঁহাদিগকে এমন অনুরক্ত করিলে, আমাকে তাহা বল।" দ্রৌপদী কহিলেন, "সখি, শ্রবণ কর। পাপপরায়ণা রমণীরাই পতি বশ করিবার জন্য মন্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি অনিষ্টজনক বাহ্য উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, ও ধর্ম্মপরায়ণা সাধ্বী নারী কখনই ঐরূপ গর্হিত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না। সত্যভামে, আমি মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহার করিয়া সতত পাণ্ডবগণের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। অভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক সানুরাগে ও অনন্যমনে পতিগণের চিত্তানুবর্ত্তন করি। ভর্তৃগণ স্নান,

ভোজন বা উপবেশন না করিলে কদাচ আহার বা উপবেশন করি না। ভর্ত্তা গৃহে প্রত্যাগত হইলে তৎক্ষণাৎ উত্থান পূর্ব্বক আসন, ব্যজন ও জলপ্রদান করিয়া তাঁহার অভিনন্দন করিয়া থাকি। আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ পরিষ্কার,গৃহোপ-করণ মার্জ্জন, রন্ধন, যথাসময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্যরক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্টপ্রকৃতি স্ত্রীলোকের সহিত কখনও অবস্থান করি না, তিরস্কার বাক্য মুখে আনিনা, সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্যশূন্য হইয়া কাল যাপন করি। অতিহাস ও অতিরোষ ত্যাগ করিয়া সত্যে নিরত হইয়া নিরন্তর ভর্ত্তৃগণের সেবা করিয়া থাকি। হে সত্যভামে, আমি প্রত্যহ বীরপ্রসবিনী আর্য্যা কুন্তীকে স্বয়ং অন্নপান ও আচ্ছাদন প্রদান দ্বারা সেবা করি; কদাচ উঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোজন, বা বসন ভূষণ পরিধান করিনা। পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকেতনে প্রত্যহ অষ্ট সহস্র ব্রাহ্মণ রুক্ম পাত্রে ভোজন করিতেন এবং যাঁহাদিগের প্রত্যেকের সমভিব্যাহারে ত্রিংশৎ কর্ম্মকরী পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, এমন অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী স্নাতক প্রতিদিন প্রতিপালিত হইতেন। অপর দশ সহস্র স্নাতকের নিমিত্ত প্রত্যহ স্বর্ণপাত্র সমুদয় সুসংস্কৃত অন্নে পরিপূর্ণ থাকিত। আমি ঐ সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে অন্নপান ও আচ্ছাদন প্রদান পূর্ব্বক সমুচিত সৎকার করিতাম। মহারাজ ধর্ম্মরাজের রাজ্যশাসন সময়ে এই সমস্ত বিষয় ছিল, আমি তৎসমুদয়, অন্তঃপুরস্থ ভৃত্যগণ, গোপাল ও মেষপালগণের তত্ত্বাবধান করিতাম। হে ভদ্রে, আমি একাকিনী মহারাজের সমুদয় আয় ব্যয়ের বিষয় অবগত ছিলাম। পাণ্ডবগণ আমার উপর সমুদয় পোষ্যবর্গের ভার অর্পণ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইতেন। আমি সমুদয় সুখ পরিহার করিয়া দিবারাত্র সেই দুর্ব্বহ ভার বহন করিতাম। আমি একাকিনী জলনিধির ন্যায় নিধিপূর্ণ কোষাগারের তত্ত্বাবধান করিতাম; দিবারাত্রি সমান জ্ঞান এবং ক্ষুধা তৃষ্ণাকে সহচরী করিয়া সতত কৌরবগণের আরাধনা করিতাম। আমি সর্ব্বাগ্রে প্রতিবোধিত ও সর্ব্বশেষে শয়ান হইতাম এবং সতত সত্য ব্যবহারে রত থাকিতাম। হে সত্যভামে, আমি পতি বশীভূত করিবার এই মহৎ উপায় জানি, কিন্তু অসদাচার কামিনীগণের ন্যায় কদাচ কুব্যবহার করিনা, তাহা করিতে অভিলাষও করিনা।”

মহাভারতকার নারীজীবনের এই যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র ভারতনারীগণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী চিত্র আমরা অন্য কোন সাহিত্যে প্রত্যক্ষ করি নাই। লোকপালসদৃশ দুর্দ্ধর্ষ পাণ্ডবগণ যে এই মহীয়সী নারীর নিকটে সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও প্রীতির সূত্রে দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রখর কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও কঠোর আত্মত্যাগে দীক্ষিত এবং মধুর প্রেমে আত্মহারা নারীগণ যখন অকুণ্ঠিত মহিমাভরে সমাজ মধ্যে আপনাদের শক্তি বিস্তার করিতে পারিবেন, তখন মনস্বিনী ও পবিত্রহৃদয়া নারীর শাসনে পুরুষের দুর্ব্বলতা কত দূর শাসিত ও তাঁহার হৃদয় পৃথিবীর মলিনতার কত উর্দ্ধে উত্থিত হইবে, মহাভারতকার এই চিত্র প্রকটিত করিয়া তাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু।

“ইংরাজ শাসন কি বিধাতার বিধান?”

সম্পাদক মহাশয়,

“ভারতে ইংরাজ রাজত্ব বিধাতার বিধান কি না” এই প্রশ্নটি আপনি যে প্রণালীতে বিচার করিয়াছেন, তাহাতে যে কোনও মীমাংসা পাওয়া যাইতে পারে আমার সে বিশ্বাস নাই। কেন না, ফলাফল দেখিয়া কোনও কার্য্য বা ঘটনার মঙ্গলামঙ্গল বিচার করিতে হইলে অনন্তকাল অপেক্ষা করিতে হয়। আশু ফলই যে কোন কার্য্য বা ঘটনার শেষ ফল, তাহা সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন আর কাহারও নির্ণয় করিবার সামর্থ্য নাই। ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের মতে যাহা অমঙ্গলজনক তাহাই যে প্রকৃতপক্ষে অমঙ্গলজনক তাহাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। বিশেষতঃ, মানব-সমাজে যাহা ঘটে তাহা সু হউক বা কু হউক, মানবের স্বাধীন ইচ্ছার পরিচালনের দ্বারাই ঘটে, সুতরাং সু-য়ের জন্য যে দায়ী, কু-য়ের জন্যও সেই দায়ী। কাজেই, সু-য়ের বাহাদুরী যদি বিধাতার হয়, তবে কু-য়ের জন্য মানব দায়ী হইবে কেন? আর, মানব স্বাধীন ইচ্ছাপরিচালন করিয়া কার্য্য করে বলিয়া যদি সেখানে ভগবানের হাত না থাকে তবে ভগবানকে মানব-সমাজ হইতে অন্ততঃ চিরবিদায় গ্রহণ করিতেই হয়। যদি বুদ্ধদেবের কার্য্য বিধাতার বিধান হয় (অবশ্য খ্রীষ্টান পাদ্রি বলিবেন উহা সয়তানের বিধান!) তবে জেঙ্গিস খাঁর কার্য্য নয় কেন তাহা আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ। তবে আপনি বলি-বেন যে উহাতে পাপপুণ্য দায়িত্ববোধ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। যদি তাই হয় তবে ও সব ক্ষণভঙ্গুর বস্তুগুলি না থাকিলেও মানব-সমাজ চলিবে।

অন্ততঃ স্বাধীন ইচ্ছার দোহাই দিয়া ভগবান্‌কে মানব-সমাজ হইতে বিদায় দেওয়ার অপেক্ষা ভাল চলিবে। তারপর, মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করিয়া আশু ফলের দোহাই দিয়া বিধাতৃত্ব নির্ণয় করিতে গেলে কেবল যে মানব-সমাজ হইতে ভগবান্‌কে নির্ব্বাসিত করিতে হয় তাহা নহে, জড় রাজ্য হইতেও ভগবানকে অনেক পরিমাণে হস্ত গুটাইতে হইবে। এই তো সে দিন স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে ভীষণ ঘটনা ঘটিয়া গেল। একজন হিরণ্যগর্ভের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে স্বয়ং ভগবানই সে জন্য দায়ী। কিন্তু আশু ফলের দ্বারা বিচার করিলে, হয় বলিতে হয় ভগবান মঙ্গলময় নন, না হয় বলিতে হয়, উহাতে ভগবানের কোন হাত নাই; অন্ধ জড় প্রকৃতির খেলা, সর্ব্বশক্তিমানের লীলা নহে। আমি এ দু'য়ের কিছুই বলিতে প্রস্তুত নহি। আমি জানি, উহা ভগবানের লীলা, যদিও উদ্দেশ্য কি ভাল বুঝি না। মানব সমাজ সম্বন্ধেও তাই বিশ্বাস করি, আপাতমধুরই হউক আর আশু বিষফলপ্রদই হউক ঘটনা মাত্রই ভগবানের প্রত্যক্ষ লীলা, তাঁহারই মঙ্গলহস্তনিয়ন্ত্রিত। মানবের স্বাধীন ইচ্ছা আছে বলিয়া তাহাতে ভগবানের হাত নাই এ মত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। একজন ভয়ানক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইল, অত্যন্ত কষ্ট পাইল। আমরা ইহাকে অমঙ্গল বলি। কিছু দিন পরে দেখা গেল, বসন্তে তাহার শরীরস্থ বহু পুরাতন দুশ্চিকিৎস্য ম্যালেরিয়া বিষ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। আরও কি হইয়াছে কে জানে। আশু ফল দেখিয়া বিচার করিয়া আমরা ভ্রমে পতিত হই। আপনি হয় তো বলিবেন তিনি সর্ব্বশক্তিমান, অন্য উপায়ে কষ্ট না দিয়াও তো ম্যালেরিয়া বিষ বিনষ্ট হইতে পারিত? এরূপ জেরার হাতে বিধাতার নিস্তার নাই, এ জেরার শেষ পরিণতি এই যে বিধাতা কেন মানুষকে অভাব ও অপূর্ণতার অতীত করিয়া সৃষ্টি করিলেন না। ইহার উত্তর, ঈশ্বর আর একটা ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে পারেন না। ক্রমবিকশিত জগতে সকলই অপূর্ণ। খ্রীষ্ট মহম্মদকে পাঠাইয়া ভগবান যে বিধান প্রচার করিয়াছেন তাহাও পূর্ণ নহে। ভারতে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠাতাগণের দুর্নীতির ওজুহাতে যদি ভারত শাসন ক্ষেত্র হইতে ভগবানকে নির্ব্বাসিত হইতে হয়, তবে ধর্ম্ম-প্রচারকগণের দুর্নীতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ধর্ম্মক্ষেত্র হইতেও ভগবানকে নির্ব্বাসন করা চলে। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে উক্ত ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যীশুখৃষ্টের জীবদ্দশা হইতে আরম্ভ করিয়া এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যে পরিমাণ জাল জুয়াচুরি, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, অন্যায় অত্যাচার, নির্দ্দোষীর রক্তপাত অনুষ্ঠিত হইয়াছে এমন আর কোনও একটা বিশেষ ব্যাপারে হইয়াছে কি না সন্দেহ। তাই বলিয়া কি বলিব যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিকাশে ভগবানের হাত নাই? অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে শস্য নষ্ট হইল, লোক দুর্ভিক্ষে মরিল। পর বৎসর সুবৃষ্টিতে ফসল হইল, লোকসকল অতিরিক্ত আহার করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সুবৃষ্টি বা কুবৃষ্টির ফল একই হইল। ফল দেখিয়া বিচার করিলে সু কু নির্দ্দিষ্ট হইবে না, কেন না সমগ্র ফল দেখিবার শক্তি আমাদের নাই। ডাক্তার শরীরে ছুরিকা বসাইয়াছে বলিয়া তাহাকে সয়তানের অনুচর বলিতে পারি না; অপেক্ষা করিয়া উদ্দেশ্য ও পরিণাম ফল জানিলে আসল তথ্য নির্নীত হইবে। তখন বুঝিব মাতৃস্তন ও ডাক্তারের ছুরিকায় কোনও বিভিন্নতা নাই। জগতে যীশুর আবির্ভাব আর সেকেন্দরের আবির্ভাব, একই হস্তের দান—উদ্দেশ্য জগতের কল্যাণ। তবে বিভিন্ন প্রণালীতে। বায়ুর সুমন্দ হিল্লোল, নির্ঝরিণীর নির্ম্মল সলিল, পূর্ণিমার চন্দ্রমা, সুশ্যামল শস্যক্ষেত্র, ফলপুষ্পপরিপূর্ণ অরণ্যানীও যাঁহার মঙ্গল হস্তের রচনা, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভীষণ ভূকম্পন, ধ্বংসকারী জলপ্লাবনও সেই "মহদ্ ভয়ং বজ্রমুদ্যতে"রই লীলা। উদ্দেশ্য মঙ্গল। আজ যে মানব জড় প্রকৃতির উপর এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহার শক্তি যে এত বাড়িয়াছে এই দৈব উৎপাতগুলিও তাহার কারণ। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে যাইয়াই মানুষ আজ মানুষ হইয়াছে। প্রকৃতির লীলার মধ্যে এই ভীষণতা, এই আপাতঅমঙ্গলকর ধ্বংসের ভাব না থাকিলে মানব আর এক স্বতন্ত্র জীবে পরিণত হইত। ভগবানের দুই রকমের বিধান, এক রকম বিধান মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতে হয় আর এক রকমের বিধানের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া শক্তিসঞ্চয় করিতে হয়। আমার মনে হয়, ভূকম্পন, জলপ্লাবন, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত যে শ্রেণীর বিধান ভারতে ইংরাজশাসন ভগবানের সেই শ্রেণীর বিধান। আমাদিগকে এ বিধানের কাছে সর্ব্বদা সন্তর্পণে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হইবে এবং এই আত্মরক্ষার চেষ্টাতেই আমরা আত্মত্ব লাভ করিব। আমরা নিদ্রিত থাকিলে সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত হইব। মিকাডোর রাজত্ব জাপানের পক্ষে পূর্ণিমার চাঁদ; যে ভাবে থাক, চাঁদের আলো পাইবেই। ভারতবাসীর পক্ষে ইংরাজরাজত্ব স্যানফ্রান্‌সিস্কোর ভূকম্পন: জাগিয়া সচেষ্ট না থাকিলে সমূলে বিনাশ। যদি সচেষ্ট থাক পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরীর পত্তন করিতে পারিবে। ইংরাজরাজত্ব বিধাতার বিধান, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন শ্রেণীর বিধান, আমরা তাহা বুঝিতে ভুল করিয়াছিলাম। আমরা ভাবিয়াছিলাম চাঁদের আলো, এ যে ঘরে আগুন লাগিয়াছে তাহা বুঝিতে পারি নাই। আগুন নিভাইতে যে শক্তি লাভ হইবে, সেই শক্তিতে যে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা হইবে তাহা ভাবি নাই। এতদিন যেন ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের পাখার বাতাসে নিদ্রিত ছিলাম। কিন্তু নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, এখন বেশ বুঝিয়াছি ভগবান আমাদের জন্য কোন্ শ্রেণীর বিধান প্রেরণ করিয়াছেন। ঘর অনেকটা পুড়িয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু আগুন নিভাইয়া গৃহের পুনর্নির্ম্মাণে যে শক্তির উপচয় হইবে তাহাতেই ইংরাজরাজত্বের বিধানত্ব নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইবে। কিন্তু তাহার জন্য কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, বাদুড়ের দংশনযাতনা অনুভব করিতে হইবে, তবেই বিধানের পূর্ণতা, নতুবা নহে। ইহা পারিলে, ভারতমাতা এমন শোভা ধারণ করিবেন, যে শোভা তাঁহার অতীতের গৌরবের দিনেও ছিল না। ইহাই বিধাতার ইঙ্গিত।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

মন্তব্য। আমি বিধান শব্দটি কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছি, তাহা বোধ হয় স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে পারি নাই। লেখক মহাশয় যাহাকে প্রথম রকমের বিধান বলিয়াছেন, যাহা সাক্ষাৎ ভাবে হিতকর, তাহাই আমার অভিপ্রেত। মানবের কার্য্যে মানবের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব আছে কি না, এবং থাকিলে তাহা কতটুকু তাহা আমি নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ। তবে কেহ ব্যভিচার নরহত্যা আদি করিলেও তাহাও বিধাতার বিধান ইহা বলিতে আমার সাহস হয় না। সম্পাদক।

পরীক্ষার বয়স নির্দ্দেশ।

প্রতিবাদ।

সম্পাদক মহাশয়,

জজের রায় বাহির হইলে আর উকীলের বক্তৃতা চলে না। সেইরূপ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইলে আর অন্য লেখকের কথা কাটাকাটি চলে না। এই হিসাবে দেখিতে গেলে 'পরীক্ষার বয়স নির্দ্দেশ' সম্বন্ধে আপনি যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহার উপর আর কথা চলে না। কিন্তু মোকদ্দমাস্থলে 'ছানির' প্রার্থনা করিতে গেলে আবার উকীল কৌনসলির দু'কথা বলা চলে। সেইরূপ এ ক্ষেত্রেও প্রশ্নটির পুনর্ব্বিচার করিবেন এই আশায় দু'চারি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা

করি. প্রবন্ধটি আপনার মন্তব্য সহ আগামী বারের প্রবাসীতে প্রকাশিত করিবেন।

১। আপনি বয়সের বাঁধাবাঁধির নিয়মের সঙ্গে গ্রীকপুরাণোক্ত প্রোক্রাষ্টিসের শয্যার তুলনা করিয়াছেন। এবং সেই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'আইনের দ্বারা সকল ছাত্রেরই মানসিক শক্তির বিকাশ ঠিক ১৬ বৎসরে একবিধ হইবার সম্ভাবনা নাই'। কিন্তু তুলনাটার ও মন্তব্যে একটু দোষ ঘটিয়াছে। আইনকর্ত্তাদের অভিপ্রায় ত ইহা নহে যে, প্রত্যেক ছাত্রই ঠিক ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে পরীক্ষা দিতে পাইবে, তাহার পূর্ব্বেও নহে, তাহার পরেও নহে। ন্যূনকল্পে ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে পরীক্ষা দিতে পাইবে, তাহার অধিক যত বয়সে ইচ্ছা দিক তাহাতে আপত্তি নাই। যাহার মানসিক শক্তির যত বেশী বয়সে বিকাশ হইবে, সে তত বেশী বয়সে পরীক্ষা দিবে, ইহাতে ত কোনও অসঙ্গতি হইল না। 'বয়সের বাঁধাবাঁধি করা চলে না কেননা কেহ শীঘ্র শীঘ্র 'ডাঁটো' হয়, কাহারও দেরী লাগে।' আপনি এইরূপ একটা ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু তাহা হইলে কোনও স্থলেই ত বয়সের নির্দ্দেশ চলে না। যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার অসুবিধা হইবে বলিয়া আপনি এই নিয়মের বিরুদ্ধবাদী, সেই পরীক্ষায়ই বা বয়সের বাঁধাবাঁধি রহিয়াছে কেন? সে দিন দেখিলাম, শিবপুর এন্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশের জন্যও বয়সের বাঁধাবাঁধি রহিয়াছে। উকীলেরা কোন্ বয়সে মুনসেফ হইতে পাইবেন তাহারও একটা বাঁধা নিয়ম আছে, শুনিয়াছি। সরকারী চাকরীতে প্রবেশ করারও বয়সের নির্দ্দেশ আছে। তবে শেষোক্ত দুইটি স্থলে 'এতর কম নহে' না বলিয়া 'এতর বেশী নহে' বলা আছে। তাহাতে আমার তর্কের কোনও ক্ষতি হয় না, কেননা দুই দিকেই principle একটাই। এসব স্থলেও 'বয়সেতে বিজ্ঞ নহে বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে' এই মহাজনবচন উদ্ধার করিয়া বয়সের বাঁধাবাঁধি উঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে কি? শিক্ষাতত্ত্ব ছাড়িয়া যদি সমাজতত্ত্ব হইতে দুই একটা উদাহরণ লওয়া যায় তাহা হইলে বোধ হয় 'ধানভান্তে শিবের গীত' হইবে না, কেননা সে সকল স্থলেও এই একই principle। 'প্রাপ্তেতু ষোড়শেবর্ষে' শ্লোকেও ত এই বয়সের নির্দ্দেশ। সাবালক হওয়া সম্বন্ধেও বয়সের নির্দ্দেশ আছে। হিন্দুশাস্ত্রে কন্যার একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স উত্তীর্ণ হইলে 'অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা' বলা হইয়াছে। কিন্তু সকলেরই যে এক বয়সে শারীরিক পরিপুষ্টি সমভাবে ঘটে, ইহা শারীরতত্ত্বসম্মত নহে। শুনিয়াছি কোনও কোনও সমাজে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে একটা বয়স নির্দ্ধারিত আছে যে, এতর কমে আইন অনুসারে বিবাহ হইতে পারে না। এ সকল স্থলেও ত বলা যাইতে পারে, যখন সকল কন্যার শারীরিক পরিপুষ্টি (development) সমানভাবে ঘটে না, তখন এরূপ আইন থাকা অন্যায়। স্মরণ হয় যে যখন সম্মতি আইন লইয়া একটা হুলস্থূল পড়িয়াছিল, তখন কোনও কোনও ধুরন্ধর বয়সের বাঁধাবাঁধির বিরুদ্ধে ঠিক এই কূতর্কটা তুলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, শরীরের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি না হইতেই গর্ভধারণের উদ্যোগ ইতর প্রাণীর মধ্যে নাই, এবং মনুষ্য সমাজেও বোধ হয় কেবল অধঃপতিত হিন্দুসমাজ ভিন্ন অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক, অবান্তর কথা ছাড়িয়া দিয়া আসল কথাটা দাঁড়াইতেছে এই যে, এ সকল স্থলে একটা (average) গড়পড়্তা ধরিয়া লইয়া নিয়ম বাঁধা হয়। ইহাই এ সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত principle।

২। আপনি স্বীকার করিয়াছেন, জাপান ও য়ুরোপে কলেজে প্রবেশ করার এরূপ বয়সের বাঁধাবাঁধি আছে। কিন্তু আপনি বলিয়াছেন যে, 'উভয় স্থানেই পরীক্ষার মান (Standard) আমাদের প্রবেশিকার চেয়ে অনেক উচ্চ।' প্রচলিত প্রবেশিকা পরীক্ষাসম্বন্ধে এ কথা খাটিতে পারে, কিন্তু যে নূতন নিয়ম হইতেছে তাহাতে আমি যতদূর জানি, আমাদের ম্যাট্রিকুলেশান লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রায় তুল্যমূল্য হইবে। আর যেটুকু ন্যূনতা থাকিবে তাহার সম্বন্ধে এ কথাটি মনে রাখিবেন যে, আমাদের দেশের বালকদিগকে পরকীয় ভাষায় সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে ও বিদ্যার পরিচয় দিতে হইবে। এই 'সর্ব্বনেশে' ব্যবস্থার দরুণ বিলাতের পরীক্ষা ও এখানকার পরীক্ষা তুল্যমূল্য হইলেও তাহাদের মধ্যে 'আকাশ পাতাল' তফাৎ হইয়া পড়ে, ইহা একবার বিবেচনা করিয়াছেন কি? যদিও নূতন ব্যবস্থায় পরীক্ষার বিষয় দুই একটা কমিয়াছে বটে, কিন্তু বিষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় (সংখ্যা নহে) এবং পাশ নম্বরের হার উচ্চ হওয়ায় এবং প্রকৃত শিক্ষার পরিচয় দিতে হইবে ইহার সম্যক্ ব্যবস্থা হওয়ায় মোটের উপর পরীক্ষা পূর্ব্বাপেক্ষা কঠিন হইবে। সেই জন্যই বেশী বয়সে পরীক্ষা দেওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

৩। আজকাল বয়সের বাঁধাবাঁধি না থাকাতে যে অনেক ছাত্রকে 'ইঁচড়ে পাকাইতে' চেষ্টা হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অভিভাবকগণ অনেক সময়ে ইহাদিগের বাঙ্গলা অক্ষর পরিচয় হইবামাত্র ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন, ইহাদিগকে কখনও মাতৃভাষা ভাল করিয়া শিখিবার অবকাশ দেওয়া হয় না। যত শীঘ্র পুত্রটি পরীক্ষা পাশ করিতে পারে ততই ভাল, শুভস্য শীঘ্রম্, চাকরী করিয়া দু'পয়সা আনিতে পারিবে, পুত্রের রোজগার খাইতে পারিবেন এই বিবেচনায় ইঁহারা বালকের চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্যভঙ্গ ও মস্তিষ্ক দুর্ব্বল করিয়া দেন। বাঙ্গালী যে পূর্ব্বের ন্যায় দীর্ঘজীবী হইতেছে না ইহা যে তাহার একটা কারণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে বংশে দুই পুরুষ ধরিয়া ইংরাজী লেখাপড়ার চর্চ্চা হইয়াছে, সে বংশে আয়ুঃক্ষয় ও জীবনী শক্তির হ্রাস (Loss of vitality) অবধারিত। পরীক্ষায় বয়সের বাঁধাবাঁধি না থাকা এই অনিষ্টের জন্য প্রধানতঃ দায়ী। যে সময়ে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল তখনকার ছাত্রগণ এখনকার ছাত্রগণ অপেক্ষা সবল ও সুস্থকায় ছিল। এই নিয়ম রদ হইলে প্রথম প্রথম কেবল তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্রগণই অল্প বয়সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত। আমার বেশ মনে আছে আমি যেবার পরীক্ষা দিই, সেবার আমরা যে মফঃস্বল কলেজগৃহে পরীক্ষা দিয়াছিলাম তথায় প্রায় দুই শত পরীক্ষার্থীর মধ্যে আমরা দুই জন মাত্র চতুর্দ্দশবৎসরবয়স্ক ছিলাম; এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্য সহরশুদ্ধ লোক ভাঙ্গিয়াছিল। বলা বাহুল্য আমরা দুই জনই প্রশংসার সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম; আর আজকাল দেখিতে পাই শত শত ছাত্র দ্বাদশ ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে পরীক্ষা দেয়; তাহারা তেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধিও নহে, অনেকেই তৃতীয় বিভাগে পাশ হয়। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় অত্যন্ত সাধারণ ধরণের ছাত্রগণকেও 'কিলাইয়া কাঁঠাল পাকান'র চেষ্টা সজোরে চলিতেছে। অভিভাবকগণ এই সকল infant phenomenon দেখাইয়া বিলক্ষণ বাহাদুরি লইবার চেষ্টা করেন। যে সমাজে কন্যা অল্প বয়সে সন্তান প্রসব করিলে 'নাতি'র ঠাকুরদাদা হইলাম বলিয়া লোকে সৌভাগ্য-বোধ করে, সে সমাজে পুত্র অল্প বয়সে পাশ হইলে গর্ব্ব অনুভব করা অবশ্য খুব স্বাভাবিক। তবে ইহাতে পুত্র কন্যার স্বাস্থ্যের অবস্থা কি দাঁড়ায়, তাহাই বিবেচক ব্যক্তি দেখিবেন। আমার মাতুল মহাশয় অল্প বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন বয়সের বাঁধাবাঁধি থাকাতে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া দুই বৎসর পরে পরীক্ষা দিতে হয়। 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ'। আমিও অল্প বয়সে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম এবং পরীক্ষা দিয়াছিলাম। গত বৎসর আবার তাঁহার দৌহিত্র দ্বাদশ বর্ষ বয়সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমার পুত্রও চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু এই সকল স্থলে যে স্বাস্থ্যহানি, জীবনীশক্তির হ্রাস ও মস্তিষ্কের অযথা চালনা হইয়াছে, তাহা ধ্রুবসত্য। যখন সকল দেশেই দেখা যাইতেছে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে

কলেজের পাঠ আরম্ভ হয় তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে অল্প বয়সে পাশ করিতে গেলে বুদ্ধিমান ছাত্রদিগেরও উপর বেশী চাপ পড়ে।

৪। আপনি বলিয়াছেন, নূতন নিয়ম জারী হইলে যে সকল ছাত্রকে ২১ বৎসর বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহাদের দশা কি হইবে? ইহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয় বটে; কেননা এ সকল ছাত্রের ত যাহা অনিষ্ট হইবার তাহা হইয়াছে; এখন বসাইয়া রাখিলে কিছু আর স্বাস্থ্যের উন্নতি বা মস্তিষ্কের পরিপূরণ হইবে না। তবে একথাও বলিয়া রাখি, এখন যে সকল ছাত্র উচ্চশ্রেণীতে পড়িতেছে, পরীক্ষার মান উচ্চ হওয়ায় তাহারাও যথাসময়ে পরীক্ষা দিতে পারিবে না, অন্য কারণে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকেও দুই এক বৎসর থাকিতে হইবে। যাহা হউক, ইহার প্রকৃত মীমাংসা, হঠাৎ এই নিয়ম না চালাইয়া ৩।৪ বৎসর পরে চলিবে এইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা হইলে নিম্নশ্রেণী হইতে সেরূপ তাড়াতাড়ি বিদ্যা 'গিলান' হয় তাহার প্রতিবিধান হইবে। ইহার ফলে মাতৃভাষায় দখল জন্মিবে এবং বনিয়াদ পাকা হইবে। শিশুগণ স্বাস্থ্যহানি না করিয়া ধীরেসুস্থে শিখিতে পারিবে, শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারিবে, অভিভাবকগণের অযথা তাড়না হইতে অব্যাহতি পাইবে, আর 'পিতামাতার খেয়াল বা স্বার্থপ্রণোদিত কূট নীতির যূপকাষ্ঠে প্রতি বৎসর কতকগুলি নিরপরাধ ছাত্রের স্বার্থ বলি দেওয়া হইবে' না।

৫। বয়সের বাঁধাবাঁধি না থাকাতে অনেক রকম জুয়াচুরি হয়, নূতন নিয়মে তাহারও প্রতিবিধান হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনেকে বাহাদুরী লইবার ইচ্ছায় অল্পবয়সে পুত্রটিকে পাশ করাইতে চাহে; এ সকল অভিভাবক যে বাহাদুরির লোভে বয়স কমাইয়া লেখান ইহাও বিচিত্র নহে। তাহা ছাড়া যাহাতে সকল পরীক্ষায় দুই চারিবার করিয়া, ফেল হইলেও ভবিষ্যতে সরকারী চাকুরী পাইবার ভরসা থাকে, সেই জন্যও অনেকে যথেষ্ট margin রাখিয়া যথাসম্ভব কমাইয়া লেখান। তবে বলিতে পারেন, নূতন নিয়মেও ত বয়স বাড়াইবার দিকে জুয়াচুরি হইবে। হইবে বই কি, কিন্তু বয়স বেশী লিখাইবার বেলায় কেবল একটা স্বার্থ, পরীক্ষা দিবার অনুমতিলাভ, আর বয়স কম লেখানয় বহুবিধ স্বার্থ ছিল। কাজেই, মোটের উপর এখন জুয়াচুরিটা কম হইবে।

৬। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ১৫ বৎসরেই রাজী ছিলেন, অথচ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ১৫ বৎসর করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তখন ভারত গবর্ণমেণ্ট বিশেষ আপত্তি করিয়া পুনর্ব্বিচারের জন্য সেনেট সভাকে অনুরোধ করেন। তাহার ফলে তথায়ও ১৬ হইয়াছে; পঞ্জাবে ১৫ বৎসর করা হইয়াছে, অন্যত্র সেরূপ করিলে কি ক্ষতি ছিল? আপনি এইরূপ বলিয়াছেন। আমি বিশেষ ক্ষতি দেখি না, আমাদের শাস্ত্রের দোহাই দিয়া 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে', বেশ রাখা যায়। তবে পঞ্জাবে ইংরাজী শিক্ষা বেশী দিন চলে নাই, তথাকার লোক এখনও সবল ও সুস্থকায় এবং বংশপরম্পরাক্রমেও তাহারা বাঙ্গালী, উড়িয়া প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ। এ হিসাবে দেখিতে গেলে পঞ্জাবে ১৫ হইলে বাঙ্গালাদেশে ১৬ হওয়া অন্যায় নহে।

৭। তাহার পর সিভিল সার্ভিসের কথা। এ সম্বন্ধে ভারতগবর্ণমেণ্ট বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়কে এই যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে জনকতক ছাত্রের স্বার্থের জন্য সমস্ত জাতিটার বালক সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যভঙ্গকরা সুবিবেচনার কার্য্য নহে। বাস্তবিক, হাজারকরা কয়জন ছাত্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে যায়, তাহা কি কেহ খতাইয়া দেখিয়াছেন? যে সামান্যসংখ্যক ছাত্র এই পথে যায় তাহাদিগকে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চনীচ সকল পরীক্ষা দিয়া যাইতে হইবে, এমন ত কোনও 'মাথার দিবি' দেওয়া নাই। এখানকার উচ্চপরীক্ষা পাশ করিয়া গেলে যে বিশেষ কোনও সুবিধা ঘটে, তাহাও আমার বোধ হয় না। তদপেক্ষা, শীঘ্র শীঘ্র বিলাতে গিয়া তথায় তথাকার প্রথামত পড়াশুনা করিলে বেশী ফল হইবার সম্ভব। আমার যতদূর স্মরণ হয়, পূর্ব্ব আমলে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দে (Mr. B. De) এম্, এ, পাশ করিয়া গিয়াছিলেন এবং এখনকার আমলে মিঃ Albion রাজকুমার বন্দ্যো এম্, এ, পাশ করিয়া এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মিঃ প্রাটেল ও শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে বি, এ, পাশ করিয়া গিয়াছিলেন; (ইহার মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি পাশ হইতে পারেন নাই)। এই কয়েকজন ছাড়া আর সকলেই হয় এফ, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া বা পাশ করিয়া অথবা এখানে কোনও পরীক্ষা পাশ না করিয়া গিয়াছিলেন এবং সিভিলিয়ান হইয়া ফিরিয়াছেন। অতএব এম্, এ, বা বি, এ, পাশ করিয়া না গেলে অনুষ্ঠানের একটু ত্রুটি হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করার কোনও প্রতিবন্ধক হইবে না।

৮। আপনার অবশিষ্ট যুক্তিগুলি আমি অনুমোদন করি। স্কুল ও কলেজের ছাত্র পৃথক করা সম্বন্ধে সাহেবদিগের একটা আত্যন্তিক আগ্রহ দেখা যায়। তাঁহারা নাকি একটা অকথ্য পাপাচরণের আশঙ্কায় এ বিষয়ে এতটা উৎকণ্ঠিত। এই জন্য বোর্ডিং সম্বন্ধে নিয়ম করিবার সময় একজন সাহেব, শুনিয়াছি, প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে এক ঘরে একজন ছাত্র থাকিতে পারিবে বা দুইএর অধিক ছাত্র থাকিতে পারিবে, কিন্তু দুইজন থাকিতে পারিবে না। ইহাতে অনুমান হয়, তাহাদের দেশে এইরূপ পাপাচরণ অত্যন্ত সাধারণ। আমাদের দেশের ছাত্রগণ সকলেই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির না হইলেও সম্ভবতঃ এসকল বিষয়ে অতদূর দুশ্চরিত্র নহে। যাহা হউক, এই কুৎসিত কথা লইয়া আর বেশী আলোচনা করিব না।

৯। পরিশেষে একটু কৈফিয়ত দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। নানারূপ রাজনৈতিক ব্যাপারে সাহেবদিগের সহিত আমাদের মনোমালিন্য ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। ইহার ফলে সাহেবদের যেটা মত সেটার উপর আমাদের সন্দেহ জন্মে, সেই কূটরাজনীতিপ্রসূত বলিয়া আমাদের ধারণা হয়। যে সকল ভারতবাসী সাহেবী রায়ে রায় দেন, তাহাদিগকে স্বার্থান্বেষী, স্বদেশদ্রোহী, ধামাধরা, কালাপাহাড় প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটসভায় নূতন বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নপ্রসঙ্গে কোনও কোনও বাঙ্গালী শিক্ষাব্যবসায়ীর প্রতি এইরূপ অবিচার করা হইয়াছে, ইহা আমাদের অগোচর নাই। শিক্ষার উন্নতিকল্পে সদ্বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া সাহেবদিগের সঙ্গে একমতাবলম্বী হওয়া এখনকার দিনে গর্হিতকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়। অথচ শিক্ষাতত্ত্বে বিচক্ষণ ইংরেজশিক্ষকদিগের য়ুরোপীয় প্রণালী অর্থাৎ আধুনিক প্রণালী সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা আছে, আমাদের দেশে কাহারও তাহা নাই এবং থাকিতেও পারে না। এ বিষয়ে স্বদেশী গোঁড়ামি করিতে গেলে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইবে; আমরা নিজের বুদ্ধিতে শিক্ষার কিরূপ উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিতে পারি, তাহার প্রমাণ 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদে'র পাণ্ডুলিপিতেই হাতে হাতে পাওয়া যাইতেছে। পেড্‌লার সাহেবের যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমাদের দেশের সংবাদপত্রসম্পাদকগণ গালি পাড়িয়াছেন, শিক্ষাপরিষদ প্রায় অবিকল সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। যে একটু আধটু নূতনত্ব আনিয়াছেন, তাহাও অদ্ভুত, যথা, নিম্নশ্রেণীতে সাহিত্য হিসাবে ইংলণ্ডের ইতিহাস মাতৃভাষায় লিখিত অধ্যয়ন। অপরস্য কিং ভবিষ্যতি? তাই বলিতেছি, এক্ষেত্রে সাহেবদের নিকট শিখিবার আমাদের যথেষ্ট আছে। শিক্ষাব্যবসায়ে লিপ্ত সরকারী, বেসরকারী সকল সাহেবই যে আমাদের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা বিবেচনা করা কি ন্যায়ানুমোদিত? ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রচলনকালে মিশনরী সাহেবেরা আমাদের দেশের কি উপকার করিয়াছেন তাহা ভুলিয়া যাওয়া ঘোর অধর্ম্ম। এখনকারদিনে ডক্টর ম্যাকিচান, ডক্টর মরিশন, রেভঃ ওয়ান প্রভৃতি সাহেবগণ একবাক্যে বলিয়াছেন প্রবেশিকার বয়স নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। প্রবন্ধের বিস্তৃতিভয়ে ইঁহাদিগের

মত উদ্ধৃত করিলাম না। ইঁহাদিগের কথায় কূট অভিসন্ধি আরোপ করা নিতান্ত অসঙ্গত। প্রবন্ধের এই অংশটি আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোককে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইল। কথাগুলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনার প্রবন্ধের উত্তর নহে।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তর।

প্রবেশিকা পরীক্ষার বয়স নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে আমার যুক্তিগুলি দুই শ্রেণীর, ১ম, বয়স নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত নয়, ২য় একান্তই যদি নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে ১৬র কম হওয়া উচিত।

ললিত বাবু দেখাইয়াছেন যে, আরও অনেক বিষয়ে বয়স নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু তজ্জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষারও বয়স নির্দ্দেশ করিতে হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নয়। অনেক আইনে মানুষের স্বাধীনতা কিছু কমাইয়া দেয়। স্বাধীনতার হ্রাস ক্ষতিকর। তথাপি যে যে স্থলে ক্ষতি অপেক্ষা লাভ বেশী, সে সকল স্থলে স্বাধীনতাহ্রাসরূপ ক্ষতি মানুষ সহ্য করে। যে যে বিষয়ে বয়সনির্দ্দেশরূপ স্বাধীনতাবিলোপে অনিষ্ট অপেক্ষা ইষ্ট অধিক, তথায় বয়স নির্দ্দিষ্ট হউক, কিন্তু সর্ব্বত্র উহা আবশ্যকও নয়, মঙ্গলকরও নয়। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বয়স নির্দ্দেশ আবশ্যক ও মঙ্গলজনক কি না, স্বতন্ত্রভাবে এই বিষয়ের আলোচনা হওয়াই ভাল।

প্রথমে একটা অবান্তর কথা বলিয়া ললিত বাবুর কোন কোন যুক্তি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। প্রোক্রাষ্টিসের খাটের উপমাটা লম্বাকে খাট করা ও বেঁটেকে লম্বা করা, এই উভয় দিক দিয়া পরীক্ষার বয়স নির্দ্দেশ সম্বন্ধে খাটে না, তাহা আমি গত মাসের প্রবন্ধ লিখিবার সময় ভুলিয়া যাই নাই। কিন্তু প্রথমোক্ত দিকে খাটে বলিয়া আমি উহার উল্লেখ করিয়াছিলাম।

ললিত বাবু চাকরীর বয়স, সাবালক হওয়ার বয়স, তিন আইনের বিবাহে কন্যার বয়স প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক বিষয়ে বয়স নির্দ্দেশের আবশ্যকতা ও ইষ্টানিষ্ট স্বতন্ত্র ভাবে আলোচ্য। গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট বয়স পার হইয়া গেলে সাধারণতঃ চাকরী দেন না। তাহার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, গবর্ণমেণ্ট পেনসন দিবার আগে কর্ম্মচারীদের অভিজ্ঞতার ফল যতটা ভোগ করিতে চান, বেশী বয়সে চাকরী দিলে তাহা পাইবেন না; কিম্বা বেশী বয়সে চাকরী দিলে কাজ শিখিবার ও প্রচুর পরিমাণে অভিজ্ঞতালাভের যথেষ্ট শক্তি ও সময় থাকিবে না। তথাপি দেখিতে পাই অনেক স্থলে নির্দ্দিষ্ট বয়স পার হইয়া গেলেও লোকে গবর্ণমেণ্টের চাকরী পায়। কিন্তু একটি স্থলেও ১৬ বছরের কম বয়সের কোন ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে দিবার ক্ষমতা কি কাহাকেও দেওয়া হইয়াছে? দেশশুদ্ধ সমস্ত লোকের সাংসারিক জ্ঞান, কার্য্যক্ষমতা, মানসিকশক্তি ও বিবেচনার পরীক্ষা লইয়া সাবালকত্বের সার্টিফিকেট দেওয়া অসাধ্য, অন্ততঃ সাতিশয় দুঃসাধ্য। সুতরাং সাবালক হওয়ার একটা বয়স নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছে। ইহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যেরূপ, তাহাতে প্রয়োজন হইলে প্রত্যেকের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ অনুসারে পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু এরূপ নিয়ম করিবারও কোন প্রয়োজন ঘটে নাই। তিন আইনের বিবাহে কন্যার বয়স নির্দ্দেশ হয় ত এই জন্য করিতে হইয়াছে যে, প্রত্যেক বালিকা সম্বন্ধে ডাক্তার বা অন্য কাহারও দ্বারা শারীরিক বিকাশ সম্বন্ধে তথ্যনির্দ্ধারণ সুসাধ্য ও বাঞ্ছনীয় নহে। তা' ছাড়া ১৪ বৎসর বয়স এত কম যে, ইহাতে কোন সমাজসংস্কারকের আপত্তি ঘটিতে পারে না। তদ্ভিন্ন, ১৪ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কোন বালিকার বিবাহ না দিলে তাহাকে কোন সুবিধা বা অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল, কোন সংস্কারক ইহা মনে করিতে পারেন না। প্রবেশিকা পরীক্ষার ১৬ বৎসর বয়স নির্দ্দেশ সম্বন্ধে কি এই সকল কথা খাটে? এইরূপ অন্যান্য বিষয়েও পরীক্ষার বয়স নির্দ্দেশের কারণাদি সম্বন্ধে পার্থক্য দেখান যাইতে পারে।

ললিত বাবুর মতে কলিকাতার প্রবেশিকার কাঠিন্য সব দিক্ বিবেচনা করিলে য়ুরোপীয় প্রবেশিকার সমান হইবে। তাঁহার অনুমানের মূল্য আছে; কিন্তু এখনও ইহা অনুমান মাত্র। বর্ত্তমান প্রবেশিকা বিলাতের প্রবেশিকার সমতুল্য নহে। পরে কিরূপ দাঁড়াইবে বলা যায় না। আর যদি বাস্তবিকই পরীক্ষার কাঠিন্য বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে স্বভাবতই ছেলেরা অধিকাংশস্থলে অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে পরীক্ষা দিবে। তজ্জন্য আইন করিবার প্রয়োজন নাই।

তাহার পর শতকরা কয়জনকে ইঁচড়ে পাকান হয়, তাহা বিচার্য্য। ললিত বাবু বলেন, শত শত ছাত্র ১২।১৩ বৎসরে এণ্ট্রেন্স দেয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার আমার কাছে নাই। সুতরাং আমি তাহার আন্দাজ ঠিক কি না বলিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমি ১০ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংপর্কছাড়া। তবে আমাকে একজন কটকের ও একজন বাঁকুড়ার অভিজ্ঞ শিক্ষক যাহা বলিলেন, তাহাতে মনে হইল যে ললিত বাবুর আন্দাজ অনেকটা বেশীর দিকে গিয়াছে। আমারও ধারণা তাই। আমার ধারণা, বেশী ছাত্রকে ইঁচড়ে পাকান হয় না।* আমার ধারণা, ছেলেরা বাস্তবিক এখন যে বয়সে পরীক্ষা দেয়, পরেও অধিকাংশ স্থলে তাহাতেই দিবে; কেবল কাগজে পত্রে ১৩।১৪।১৫র পরিবর্ত্তে ১৬ লেখা থাকিবে। লাভের মধ্যে কেবল সত্যনিষ্ঠ লোকদের ছেলেরা অকারণ জীবনের দুই এক বৎসর সময় হারাইবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার বয়স নির্দ্দিষ্ট না থাকায় সম্ভবতঃ কেহ কেহ অল্পায়ু হইয়া থাকিবে, কিন্তু বাঙ্গালীর অল্পায়ু হইবার ইহা একমাত্র কারণ নহে; ললিত বাবুও তাহা বলেন নাই। আমার ধারণা, ইহা প্রধান কারণ এমন কি একটি প্রধান কারণও নহে। যখন ১৬ বৎসর বয়স নির্দ্দিষ্ট ছিল, তখনকার ছাত্রেরা অধিকতর সুস্থ ও বলবান্ ছিল, ইহা ললিত বাবুর উক্তি মাত্র। ইহার কোন প্রমাণ নাই। বোধ করি কোন প্রমাণ দেওয়াও যায় না।

১৬ বৎসর বয়স নির্দ্দিষ্ট হওয়াতেও জুয়াচুরী চলিবে, তাহা ললিত বাবুও স্বীকার করেন। তবে, তিনি বলেন যে কম হইবে। ইহাও তাহার অনুমান, কার্য্যতঃ বোধ হয় হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না। বয়স ভাঁড়ান

* সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে দেখিলাম, এ বৎসর তের এবং তের বৎসরের ন্যূনবয়স্ক কেবল দশজন ছাত্র এণ্ট্রান্স পাস হইয়াছে। এই বয়সের কত ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। পঞ্চাশ জনের বেশী দিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

এবার মোট পাসের সংখ্যা ১৮৮৩। তাহার মধ্যে ১৫ জন বালিকা। তাহাদের বয়স লেখা নাই। বাকী ১৮৬৮ জনের মধ্যে ৯৬৯ জন অর্থাৎ অর্দ্ধেকের উপর ১৭ বৎসরের অধিক বয়স্ক; ৩৮৫ জনের বয়স ১৬ বা তদধিক এবং ১৭র কম; ৩১৩ জনের ১৫ বা তদধিক এবং ১৬র কম; ১৫১ জনের ১৪ বা তদধিক এবং ১৫র কম; ৪৪ জনের ১৩ বা তদধিক এবং ১৪র কম; ৬ জনের ১২ বা তদধিক এবং ১৩র কম। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে যে সকল ছেলে পাস হইয়াছে তন্মধ্যে ১৩৫৪ জনকে অর্থাৎ শতকরা ৭২ জনকে কেহই ইঁচড়ে পাকা বলিতে পারিবেন না। বাকী সংখ্যাগুলি বিবেচনা করিলেও ইঁচড়ে পাকান ভয়ঙ্কররূপে চলিতেছে বলিয়া মনে হয় না।

অন্য উপায়েও অনেকটা কমান যায়। এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

পঞ্জাবে ১৫ বয়স ললিত বাবুর মতে ঠিক, কারণ পঞ্জাবীরা আমাদের চেয়ে বলিষ্ঠ। তাহা মানিয়া লইলাম। কিন্তু আমরা যে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে পরীক্ষা পাশ করিতে পারি, তাহা বিবেচনা করা উচিত নয় কি? তাহা বিবেচনা করিলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও ১৫ বয়স হওয়া উচিত। তা ছাড়া, বাঙ্গালীর চেয়ে সুস্থ ও বলবান জাতিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার অধীন, তাহা ভুলা উচিত নয়।

কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের সিবিল সার্বিসে ঢুকিবার অসুবিধা হইবে বলিয়া একটা জনহিতকর ব্যবস্থা হইতে নিবৃত্ত থাকা উচিত নয়। কিন্তু ইহাই একমাত্র অসুবিধা নয়। আমাদের দেশে বিদ্যাসাপেক্ষ অধিকাংশবৃত্তি (Professions) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসাপেক্ষ; যেমন, ওকালতী, চিকিৎসা, নানাবিধ চাকরী; বিলাতে তদ্রূপ নয়। আমি গতমাসের প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে বিলাতের ছাত্রেরা আমাদের ছাত্রদের চেয়ে অল্প বয়সে এই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে। অথচ আমাদের যেমন এই সকলের উপর নির্ভর, বিলাতে তেমন নয়, সেখানে নানাবিধ স্বাধীনবৃত্তি ও জীবিকার দ্বার মুক্ত। সুতরাং পরীক্ষার বয়স নির্দ্দেশ আমাদের পক্ষে যতটা অসুবিধাজনক বিলাতে তেমন নয়। এরূপ নিয়ম বিলাতের লোকে যে point of view হইতে দেখিবে, আমরা ঠিক সে ভাবে দেখিতে পারি না।

এখান হইতে গ্রাজুয়েট হইয়া গেলে তাহা সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় কোন কাজে লাগে কি না জানি না। তবে গরীব ছাত্রেরা সরকারী বৃত্তি লইয়া যাইতে পারে, এ সুবিধাটা অকিঞ্চিৎকর নহে।

সরকারী ও বে-সরকারী সাহেবেরা সকলেই সব বিষয়েই কু মতলবে কাজ করেন, ইহা আমি মনে করি না। কিন্তু আমার ধারণা এই যে, কেবল আমাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য ইংরাজসম্প্রদায় কোন কাজ করিতেছেন, ইহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। ষ্টীম্যান তাঁহার একটা প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, সরকারী কাগজপত্রে কোন ব্যবস্থার বা সন্ধি আদির যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহাই সত্য বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা অতিশয় সরলচিত্ত। ভারতবর্ষে ইংরাজদের নিঃস্বার্থ সাধু ইচ্ছায় আমার বিশ্বাস নাই। আমার সামান্য অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়ন হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ভারতবর্ষে ইংরাজসম্প্রদায়ের কোন কাজ বা ব্যবস্থা যতক্ষণ না নিঃসন্দেহে কেবল আমাদের ইষ্টের জন্য অভিপ্রেত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, ততক্ষণ উহা তাহাদের স্বার্থপ্রণোদিত এবং হয় ত আমাদের অনিষ্টকর বলিয়া সন্দেহ করিতে হইবে। তবে ব্যক্তিবিশেষ ভাল হইতে পারেন। ভারতবর্ষে ইংরাজ ফিরিঙ্গীদের জন্য যে সকল স্কুল আছে, তাহাদের শেষ পরীক্ষা আমাদের প্রবেশিকার সমতুল্য বলিয়া পরিগণিত। আমার কাছে ঐ সকল স্কুলের কোড্ বা নিয়মাবলী নাই। কিন্তু ললিত বাবু কলিকাতায় অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে ঐ সকল স্কুলের শেষ পরীক্ষার কোন বয়স নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কিনা।

আমার ধারণা, ইঁচড়ে পাকান অপেক্ষা ধূমপানে ছাত্রদের অধিক অনিষ্ট হইতেছে। কিন্তু আমরা চাওয়া সত্ত্বেও সরকার বাহাদুর এ বিষয়ে কোন আইন করিলেন না। সুতরাং পরীক্ষার বয়স নির্দ্দেশ কেবল ছাত্রহিতৈষণাপ্রণোদিত বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না।

মোট কথা এই ১। এরূপ কোন অমঙ্গল ঘটিতেছে কি না, আইন দ্বারা যাহার প্রতীকার করা দরকার হইয়াছিল? (কারণ সব অমঙ্গলের প্রতীকার আইন দ্বারা করিবার চেষ্টা করা অসঙ্গত)। আমার মতে, ঘটিতেছে না। ২। এই ব্যবস্থায় বিশেষ কিছু ইষ্ট হইবে কি না? আমার বিবেচনায় হইবে না। ৩। ইহাতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট বেশী হইবে কি না? বলা কঠিন। বোধ হয় হইবে।

যে সকল ছাত্রকে ২।১ বৎসর বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহাদের জন্য ললিত বাবু যে ব্যবস্থা করিতে বলেন, তাহা যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না; ভবিষ্যতের ছাত্রদের অসুবিধা ইহাতে দূর হইবে না। আর গবর্ণমেণ্ট এরূপ ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াও বোধ হয় না।

প্রবাসী-সম্পাদক।

হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় উদ্ভিদাবলী।

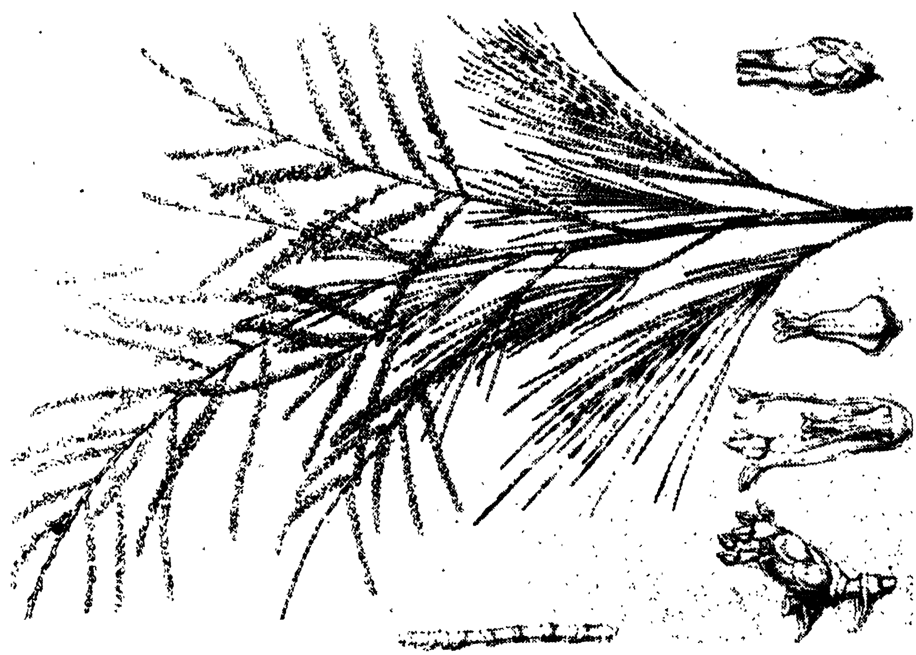
[ভারতবর্ষে কতপ্রকার গাছগাছড়া হইতে আমরা উপকার পাইতে পারি ও অর্থোপার্জ্জন করিতে পারি, তাহা কেবল দেখানই এই প্রবন্ধগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। ভারতবাসীরা কার্য্যতঃ এই সকল গাছগাছড়া ব্যবহার করিয়া উপকৃত হন ও অর্থোপার্জ্জন করেন, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে ভারতের দারিদ্র্য অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে। প্রবাসী-সম্পাদক।]

৯। রক্ত ঝাউ।

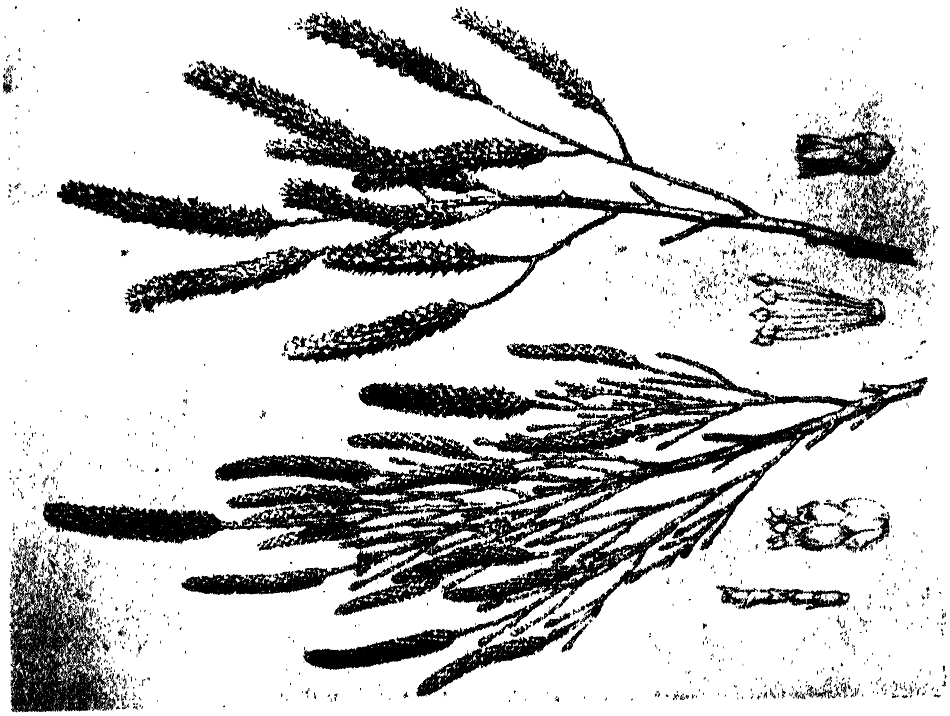
তিন চারি জাতির ঝাউ গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। সব জাতির গাছকেই আমরা ঝাউ বলিয়া থাকি। পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্‌বিৎ পণ্ডিতগণ উহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিক আখ্যা (Scientific names) প্রদান করিয়াছেন। রক্ত ঝাউর বৈজ্ঞানিক নাম "Tamarix articulata." এই গাছ সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন ভারতের অন্যত্রও ইহা জন্মায়।

এই গাছ হইতে এক প্রকার গঁদ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা প্রায় কোন কাজে ব্যবহৃত হয় না।

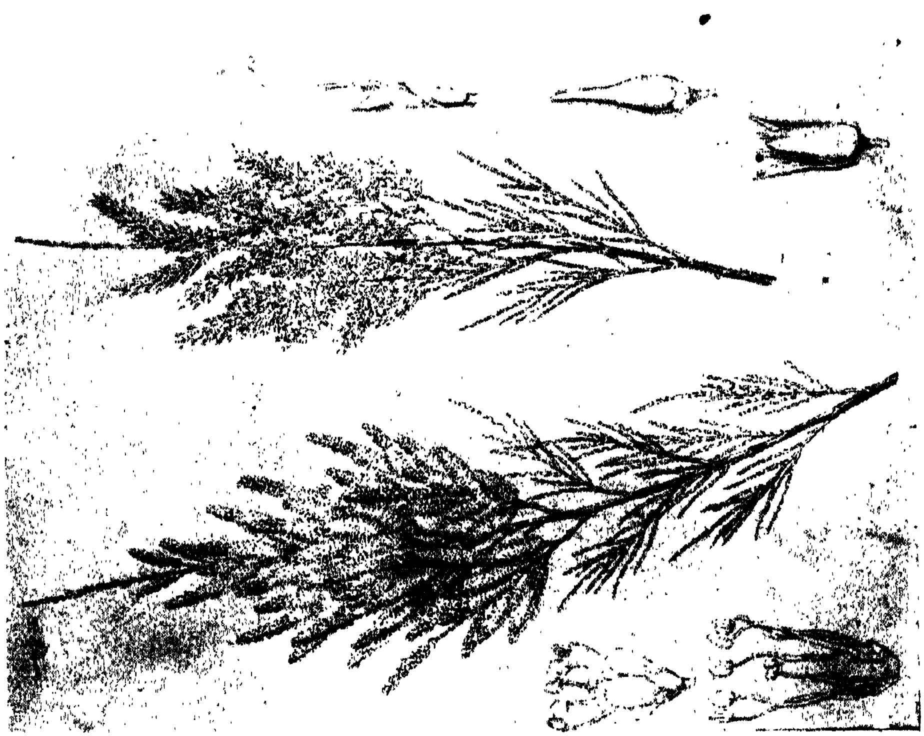
ইহার ছাল ও ফুল চর্ম্মকবের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই বৃক্ষের শাখায় এক কীট দ্বারা এক প্রকার গোল পদার্থ উৎপাদিত হয়। এই পদার্থকে ইংরাজীতে galls ও হিন্দিভাষায় মাই বলে। ইহা চর্ম্মকষ ও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। উহা কষায় বলিয়া অনেক চর্ম্মরোগে ও গলার ভিতরে ঘা প্রভৃতিতে কুল্লা করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই বৃক্ষের শাখায় বংশলোচনের মত এক পদার্থ (যাহাকে



৯। রক্ত ঝাউ।



১০। Tamarix dioica.



১১। Tamarix gallica.



১২। করীর (Capparis aphylla).



১৪। কর্কটশৃঙ্গী। Pistacia integerrima.



৭। Garuga pinnata, জুম্।



১২। শিশু।

ইংরাজীতে Manna বলে) পাওয়া যায়। উহাও ঔষধ-রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা ভিন্ন এই জিনিসটি নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ঝাউ গাছের কাঠ গৃহ নির্ম্মাণে ও আর আর অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়।

(১০)। Tamarix dioica এবং (১১) Tamarix gallica এই দুই জাতির গাছকে বাঙ্গালা ও হিন্দি-ভাষাতে কেবল ঝাউ বলে। এই দুই জাতির গাছ ভারতের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। রক্ত ঝাউর মত এই দুই প্রকার গাছ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়।

১২। করীর (Capparis aphylla).

সংস্কৃতভাষায় যে বৃক্ষকে করার বলে তাহা বঙ্গদেশে জন্মায় না; কিন্তু পাঞ্জাব, দক্ষিণ, রাজপুতানা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা কটু তিক্ত রস, ঘর্ম্মকারক, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা অর্শ, কফ, বায়, আমদোষ, গরদোষ ও ব্রণ নাশক।

ইহার পাতা ও শাখা চূর্ণ করিয়া ব্লিষ্টার (Blister) রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা দন্তশূল আরোগ্য করে এইরূপ পাঞ্জাব প্রদেশে প্রবাদ।

ইহার ছাল কটু এবং ভেদক; ব্রণ ও ক্ষতে ব্যবহৃত হয়। এই গাছ যখন ছোট থাকে, তখন খাইতে খুব সুস্বাদ। ইহার পাতা, শাখা, ফুল ও ফল রাঁধিয়া খাইতে ভাল লাগে। ইহার ফল আচাররূপে ব্যবহৃত হয়। যখন আমি পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে ছিলাম, তখন ইহার ফলের আচার প্রায় প্রত্যহ ব্যবহার করিতাম।

ইহার কাঠে উই ধরে না বলিয়া, তাহা নানাবিধ গৃহসজ্জা প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

১৩। জুম (Garuga pinnata)।

এই বৃক্ষ পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, রাজপুতানা ও গুজরাত ভিন্ন প্রায় ভারতের অন্য সব প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই বৃক্ষের ছাল চর্ম্মকষের জন্য ব্যবহার করা হয়। বম্বাই প্রদেশে এই বৃক্ষ অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতার রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া হাঁপানি (asthma) রোগে দেওয়া হয়।

চক্ষুরোগে ইহার শাখার রস ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলের আচার প্রস্তুত হয়। এই আচার মুখপ্রিয় ও অগ্নিদীপ্তিকারক।

এই বৃক্ষের পাতা ও শাখা প্রভৃতি হস্তীদিগের ভক্ষ্য।

এই বৃক্ষের কাঠ গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

১৪। কর্কটশৃঙ্গী। Pistacia integerrima

এই গাছ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ও হিমালয় পর্ব্বতে জন্মায়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে কর্কটশৃঙ্গী কষায়, তিক্ত ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা কফ, বায়ু, ক্ষয়, জ্বর, শ্বাস. ঊর্দ্ধবাত, তৃষ্ণা, কাস, হিক্কা, অরুচি ও বমি নাশ করে।

ইহার মাত্রা ২০ গ্রেণ।

হাকিমেরাও ইহা উক্ত রোগে ব্যবহার করে। তাহাদিগের মতে ইহার প্রলেপ কোন কোন চর্ম্মরোগেও উপকারী।

কোন কোন ইংরাজ ডাক্তারের মতে ইহা আমাশয় রোগে উপকারী।

কর্কটশৃঙ্গী চর্ম্মকষের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই বৃক্ষের পাতা মহিষ ও উষ্ট্রদিগের ভক্ষ্য। ইহার কাঠ হইতে অনেক প্রকার ঘরের আসবাব প্রস্তুত হয়।

১৫। শিশু।

এই বৃক্ষ উত্তর ভারতে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, গর্ভস্রাবক, এবং ইহা শোষ, মেদ, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, বমি, ক্রিমি, বস্তিবেদনা, ব্রণ, দাহ, রক্তদোষ ও কফ নাশক।

এই গাছের বীজ হইতে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল নানাবিধ চর্ম্মরোগে উপকারী।

ইহার ছাল, আদার সহিত বিসূচিকা রোগে প্রয়োগ করা হয়।

ইহার পাতার কাথও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। শিশু কাঠ গৃহকার্য্যে ও নানাবিধ আসবাব প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

[ক্রমশঃ।

শ্রীবামনদাস বসু।

গোয়ালিয়রে চাষ।

আপনি আমাদের দেশের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং আপনার চেষ্টার ও পরিশ্রমের মজুরিস্বরূপ আপনার পরিশ্রমের সার্থকতা সম্বন্ধেও কিছু লিখিতে বাধ্য হইতেছি। গত বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইবার পরে আমাদের এখানে চারি ঘর বিশিষ্ট বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জিনিয়ার এবং একজন এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল। এঞ্জিনিয়ার বাবু ১৫০০০ বিঘা জমি ও একটী গ্রাম লইয়াছেন এবং উকীল বাবু ৪৬০০ বিঘা জমি লইয়াছেন ও একটী প্রায় ২৫০ টাকা মুনাফার গ্রামের জন্য আবেদন করিয়াছেন। তৃতীয় ভদ্রলোকটীও একটী বৃহৎ গ্রাম লইয়াছেন। আমিও আমার রাজত্ব বাড়াইয়া প্রায় মোট ১৫০০০ বিঘার জমি করিয়াছি। আমি এবং ভগবতী বাবু (আপনার প্রথম মক্কেল) প্রত্যেকে ১৬ হাত ব্যাসের দুটী কূপ খনন করাইতেছি এবং তজ্জন্য ৩১০০ টাকা আমাদের উভয়কে রাজকোষ হইতে দেওয়ার আদেশ হইয়াছে ও আমরা আংশিক টাকাও পাইয়াছি। (ইহার কারণ "মাহেন্দ্রযোগ" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)।

আমরা কয়েক ঘর বাঙ্গালিতে এখন মোটে প্রায় ৬০,০০০ বিঘা জমি লইয়াছি। আমরা আশা করি যে, ন্যূনকল্পে এক লক্ষ বিঘা হইলে আমরা মহারাজার নিকট একটী Deputation পাঠাইয়া আমাদের সকলের সুবিধাজনক কিছু স্থায়ী সর্ত্ত যথা ৩০ সালা বন্দোবস্ত ইত্যাদি করাইতে পারা যায় বলিয়া বিশেষ উচ্চতম রাজকর্ম্মচারিরা আশ্বাস দিয়াছেন। তবে সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে স্বকার্য্য দ্বারা তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া উত্তমরূপে প্রমাণ করিতে হইবে। এই সমস্ত বিশেষ সর্ত্ত দ্বারা আমাদের ভবিষ্যৎজীবন শাসিত হইবে।

এখন আমরা এখানে প্রায় ১০ ঘর বাঙ্গালী হইয়াছি। এবং ভরসা করি ইহা অতি শীঘ্রই বৃদ্ধি পাইবে এবং এখানে আমাদের একটী সুন্দর উপনিবেশ স্থাপন হইবে। আমার এবং আমাদের জাতির প্রত্যেক হিতৈষী ব্যক্তিরই ইহা চিন্তা করিবার বিষয় যাহাতে এই নূতন উপনিবেশে শস্যের পরিবর্ত্তে কেবল আগাছা না হয়। যাহাতে শিক্ষিত

এবং সদ্বংশজাত ভদ্রসন্তান এখানে আসিয়া আমাদের জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করেন, তাহা যেন সমস্ত ভদ্রলোকের স্মরণ থাকে। ইতিহাস চর্চ্চা দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে, যে কোন নূতন স্থানে জাতীয় ভিত্তি দৃঢ়রূপে সংস্থাপন করিতে হইলে বিশেষ সদ্গুণান্বিত বিদ্বান ব্যক্তির প্রয়োজন। আমরাও প্রথমতঃ পঞ্জাব ইত্যাদি অন্যান্য স্থানে বিশেষ গুণান্বিত পুরুষ দ্বারাই আমাদের খ্যাতিবিস্তার করিয়াছিলাম। আমি ভরসা করি এ স্থানেও সেইরূপ সদ্গুণ-বিভূষিত ভদ্রসন্তানগণ আপনাদের বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া দিন দিন আমাদের জাতীয় গৌরবের বৃদ্ধি করিবেন ও বহুকালাবধি দাস্যবৃত্তিধারী বাঙ্গালী জাতির মধ্যে স্বাধীন বৃত্তির উজ্জ্বলতম আলোক দ্বারা অন্য বন্ধুবান্ধবকেও আপনার নির্ব্বাচিত পন্থায় অগ্রসর হইতে সর্ব্বোতোভাবে দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিয়া জনসমাজে পূজিত হইবেন।

আমরা এখানে কিরূপে সম্মানিত হই তাহার একটা উদাহরণ আবশ্যক। নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে পাঠক সকল বিষয় সহজেই অনুমান করিতে পারেন। একদা আমি সুবা (অর্থাৎ District Collector)এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার কাছারি গিয়াছিলাম। আমার বাটী হইতে ঐ কাছারি প্রায় ২১ মাইল। আমার সহিত একটী বালক-চাকর ছিল। আমি সেখানে যাইয়া নিলামে কতকগুলি মহিষ ক্রয় করি ও তাহাদিগকে আমার বাটীতে আনিবার জন্য সুবার কাছে একটা লোক চাই। তিনি একটী লোক দেওয়ার পরে—তাঁহার সহিত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমি রেলে বাটীতে ফিরি ও আমার চাকরটীকে ঐ লোকটার সহিত মহিষগুলি আমার বাসায় আনিতে বলি। পরে আমি যখন রেলষ্টেশনে আসি তখন আমি দেখি যে কিছু পরে আমার চাকরটীও আমার নিকটে আসিল ও তাহারও টিকিট ক্রয় করিতে চাহিল। আমি তাহাকে হঠাৎ রাস্তায় অপরিচিত স্থানে নূতন মহিষগুলি কাহার ভরসায় ছাড়িয়া আসিয়াছিল জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে সুবা সাহেব আমি চলিয়া আসার পর মহিষগুলিকে দেখিতে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে কেন আমায় ছাড়িয়া মহিষের সঙ্গে ছিল। সে উত্তর করিল যে আমিই তাহাকে তদ্রূপ আদেশ করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি দেখিলেন যে বালকের সহিত রাস্তার উপযোগী শীতবস্ত্র ছিল না ও আমার সহিতও অন্য চাকর ছিল না এবং আমার হয় ত পথে চাকর অভাবে কষ্ট হইতে পারে মনে করিয়া তিনি আমার চাকরকে বলিলেন, "যাও তুমি শীঘ্র বাবুর সঙ্গে যাও, দেখ যেন তাঁহার কষ্ট না হয় এবং তিনি যদি কিছু বলেন তবে তাঁহাকে বল যে মহিষ যদি রাস্তায় হারায় তাহা হইলে সুবা সাহেব বলিয়াছেন তিনি তাহার দাম দিবেন।" এই বলিয়া তিনি দু'জন পুলিশ কনষ্টেবল ও দু'জন চাকর দ্বারা আমার বাটীতে আমার মহিষ পাঠাইয়া দেন এবং আমি সে সব পুলিশের লোককে কিছু দিতে যাওয়ায় তাহাদিগকে এতদ্বিষয় সুবাসাহেব স্পষ্ট নিষেধ করিয়া দিয়াছেন এই বলিয়া লইতে অস্বীকার করে।

ইহা অবশ্য একটী সামান্য উদাহরণ। সমস্ত বিষয়েই তিনি আমাদিগের উপর সমান শ্রদ্ধান্বিত। সম্প্রতি আমি তাঁহাকে Artisian well প্রস্তুত করিবার জন্য America হইতে কল আনাইয়া দিতে বলায় তিনি আমার নির্ব্বাচিত দুটী কলের নিমিত্ত ১৩০০০ টাকার জন্য Boardএ অনুমোদনার্থ পাঠাইয়াছেন। এইরূপ প্রত্যেক কথায় তাঁহার এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীর আমাদের উপর আস্থা প্রকাশ পায়। আমরা আশা করি যেন এখানে এরূপ ভদ্র সন্তানেরা আসেন যাঁহারা আপনাদের উদার স্বভাব ও চরিত্রের বলে এদেশে আমাদের প্রতিষ্ঠা অধিকতর দৃঢ় করিয়া তুলিবেন।

আমাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া সুবাসাহেব আমার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ এখানকার লোক রাজ্যের পক্ষে অধিকতর লাভজনক সর্ত্তে লইতে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেগুলি স্থানীয় লোককে দেওয়া স্থগিত রাখিয়াছেন। তাঁহারও বিশ্বাস যে তিনিও আমাদের একটী শিক্ষিত ভদ্রপল্লী স্থাপন করিতে পারিলে তাঁহার শ্রম সফল জ্ঞান করিবেন।

আষাঢ় আগতপ্রায়। যাঁহারা যথার্থ কৃষি প্রয়াসী তাঁহাদের আর কাল বিলম্ব করিবার অবসর নাই। চাকর সংগ্রহ, বলদ ক্রয়, জমি প্রস্তুত করান ও বীজ সংগ্রহ প্রভৃতি নানারূপ কঠিন কার্য্য তাঁহাদের ইতিপূর্ব্বেই করিতে হইবে। বিশেষতঃ এই রেলের ও নদীর নিকটবর্ত্তী সুন্দর স্থানগুলি অন্যে লইলে তখন আর "নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈল দানং

চৌরে গতে কিং খলু সাবধান” সূত্র অনুযায়ী সাবধান ও যত্নপর হইয়া কি হইবে? কিছুদিন পরে এখানকার ভাল জমিগুলি বিলি হইয়া গেলে আমাদের চাকরিতে অভিলাষী শিক্ষিত বঙ্গযুবক মাত্রেরই একটা বিশেষ ক্ষতি হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি মনে করি যে অন্ততঃ অনেকের পক্ষে এখানেই হউক বা অপর স্থানেই হউক কৃষিপ্রয়াসী জগতের একটা বৎসর তুলাদণ্ডে ঝুলিতেছে এবং অনেকের পক্ষে বোধ হয়:

> There is a tide in the affairs of men
> Taken at the flood leads,on to fortune
> Neglected, leaves a dreary waste behind.

এই বাক্যটী মহাবাক্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। যদি চাষ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় তাহা হইলে বাটীর কাছে হয় বলিয়া যে দেওঘরের লাল কঙ্কর বিশিষ্ট জমিতেই না চাষ করিতে পারিলে আর চাষ করিব না ভাবিয়া এতবড় একটা স্বাধীন বৃত্তি একবারে ছাড়িয়া গলায় গামছা বাঁধিয়া চাকরির জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হইবে ইহার কোনও কারণ দেখি না। মহাত্মা কৰ্জ্জন গৰ্জ্জন করিয়া আমাদের নিদ্রাভঙ্গ করিবার পরও কি আমরা সেই পোচান হিতোপদেশের শ্লোকটা “তাতস্য কূপোয়ম্ ইতি ব্রুবানঃ, ক্ষারং জলং কাপুরুষা পিবান্তি॥” মুখস্থ করিয়াও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অক্ষম? ঘুম ভাঙ্গিলে নূতন নূতন টাটকা পড়া মুখস্থ হয় ও কার্য্যে ইচ্ছা হয়— কেবল কি কপালগুণে আমাদেরই ইহার বিপর্য্যয় হইবে? আমি কিন্তু এরূপ ভাবি না। অতএব আমাদের বন্ধু বান্ধবগণ সমস্ত বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাঁহাদের কৃষিকার্য্য করিতে প্রকৃত ইচ্ছা আছে, তাঁহারা এখানকার এই সুন্দর সুযোগ কিছুতেই ত্যাগ করিবেন না ইহা আমার একান্ত মনোগত ভাব। আমাকে কষ্ট দিতে কেহ ইতস্তত করিবেন না, আমি চিঠির উত্তর দিব না বলিলে কি হয় প্রকৃত কৃষিপ্রয়াসী ভদ্রলোক আমাকে ছাড়িবেন না। তাঁহাদের পত্র পাইলেই আমার নাড়ীজ্ঞান দ্বারা বুঝিয়া লইব এবং যিনি এখানে আসিবেন বুঝিব তাঁহাকে যথাসম্ভব সাহায্য করিব এবং একখানার যায়গায় দশ খানার উত্তর দিব। তবে এখন আমার ৭০০ রও উপর পত্রের উত্তর দেওয়ায় এবং মোটে পূর্ব্বোক্ত কয়ঘর বাঙ্গালী এখানে আসায় আমায় ফাঁকি দিয়া আর কেহ খাটাইতে পারিবেন না ইহা নিশ্চিত।

হিন্দুদিগের পক্ষে এখানে একটা আশ্চর্য্যজনক দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে গোহত্যাকারীর ১৪ বৎসর কয়েদ ও গোহত্যা করিয়া কিম্বা অন্য রাজ্যে হত্যাকরা গোমাংস যদি কেহ ভোজন করে তাহার ৭ বৎসর কয়েদ হয়। এইরূপ হিন্দুরাজার দৃঢ় আইন থাকায় এখানে হিন্দু মুসলমানে মোটেই বিবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি স্বচক্ষে মুসলমানদের তাজিয়াতে হিন্দুদিগকে ও হিন্দুদের ফাগুয়া অর্থাৎ দোলেতে মুসলমানদের এরূপ ঘনিষ্টভাবে পরস্পরে পরস্পরের উৎসবে আমোদিত হইতে দেখিয়াছি যে আমি প্রথমে ঠিক করিতে পারি নাই যে কে হিন্দু ও কে মুসলমান। এইরূপ ভ্রাতৃভাব বাঙ্গলায় অতি বিরল। ইহা রাজার সুশাসনের গুণ বলিতে হইবে। এখানে সরকার হইতেই হিন্দুর দেবালয়ে ও মুসলমানের মসজিদে বিস্তর দেবোত্তর দান করা হইয়াছে যাহাতে কেহ কাহার প্রতি দ্বেষ প্রকাশ না করে।

একটী কথা আমি প্রত্যেকবার লিখিতে ভুলিয়া যাই। অনেক লোকে লিখিয়াছেন যে ঊর্দ্ধ সংখ্যা তিনশত টাকার বেশী এবং অপরে কিছুই খরচ করিতে পারিবেন না। ব্যক্তিগত উত্তর দিলে হয় ত অনেকে রাগ করিবেন, কিন্তু এটা কি চিন্তা করিবার বিষয় নহে যে বিবাহতে যে টাকাটা পান তাহা যায় কোথায়? অর্থাৎ কন্যার বাপের গৃহ লুণ্ঠন দ্বারা পাত্র পক্ষ যে বড় মানুষ হন তাহা কি আবার নাচ গান করিয়াই পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হন না অন্য খরচও আছে। কই বিবাহ করিবার সময় ত বিবাহের বাজারে নিরাশ্রয় ও এখনকার প্রথম শ্রেণীর পড়া অশু ভক্ষধনুর্গুণ বরের কর্ত্তাও ত কুলীন ভাণ করিয়া দু’হাজার টাকার কম হাঁকেন না? বোধ হয় আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার পত্রপ্রেরকের মধ্যে অধিকাংশই ঐ রূপ নাচ গানে সব টাকা হারাইয়াছেন অথবা অধিকাংশই অবিবাহিত সুতরাং তাঁহাদের বড়মানুষ হইবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহাদের অদৃষ্ট খুলিলে আমাকে দয়া করিবেন। আমার প্রায় ৬৮০ জায়গায় বিবাহের নিমন্ত্রণের আশা আছে; “নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ”।

আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যে এখন পর্য্যন্ত আমি যতদূর জানি আশানুরূপ বিশেষ শিক্ষিত লোক হাত দেন নাই।

অনেকেই সম্ভবতঃ মনে করেন ইহা চাষার কার্য্য এবং ইহাতে বিশেষ বিদ্যা বুদ্ধির দরকার হয় না এবং পুঁথিগত বিদ্যার যতই জানা যায় না কেন ইহা প্রকৃতই চাষার কার্য্য অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষাভিমানী ব্যক্তির পক্ষে ইহা অতিশয় নীচ কার্য্য। আক্ষেপের বিষয় যে যাঁহারা কৃষিবিদ্যানিপুণ ও কৃষিকলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত তাঁহারাও চাকরিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাঁহাদের বিদ্যাও সেরূপ ফলপ্রদ হয় নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহা যে অত অশিক্ষিত লোকের কার্য্য নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত বিষয়টী লিখিতে বাধ্য হইলাম। আমি Royal Agricultural College Cirencester এর Principal এর সহিত আলাপ করি। তিনি "I will reply with pleasure, as well as I can, to your enterprising friend's enquiries", এই কথা আমার বন্ধুকে (Rev. Holland of Allahabad যিনি তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দেন) লেখায় আমি তাঁহার সৎপরামর্শের জন্য তাঁহার নিকট আমার কার্য্যের বিষয় লিখি। তাহাতে লেখা ছিল যে আমি কৃষিকার্য্য, একটা বাগান ও একটা গাভীশালার (দুধের ও ঘির জন্য) জন্য চেষ্টা করিব। তাহার উত্তরে তিনি আমার বন্ধুকে লিখিলেন "I would doubt from his letter whether he is sufficiently competent for the multifarious work he has in view: but I should be sorry to discourage him, he may have a *genius*."।

ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, যে কার্য্য আমাদের দেশের নেহাৎ অশিক্ষিত লোক হইতে সুশিক্ষিত লোকেরাও অধিকাংশ ঘৃণার চক্ষে দেখেন ও চাষার কার্য্য বলিয়া মনে করেন, তদ্বিষয়ে Royal College of Agriculture এর Principal এর মত ঐ রূপ। আমাদেরও বেদাদি শাস্ত্রে যাহার ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হয়, যে কার্য্যে প্রবৃত্ত লোকের তালিকার মধ্যে রাজর্ষি জনকের নাম দেখিতে পাওয়া যায় তাহার উপর আমাদের দেশীয় শিক্ষিত লোকে বিশেষ কৃপাকটাক্ষ বিতরণ করিলে দেশের যে বিশেষ উন্নতি হইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। এ বৎসরে এই শেষ সুবিধা বলিয়া উহা জন সাধারণকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি যে একবার সকলে চিঠিলেখা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। এখানে আসিলে "হোটেল ইত্যাদি" নাই বটে, তবে আমার বাটীতে দু'দিন শাকান্ন খাইয়া আপনাদের কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লউন ইহাই আমার সানুনয় নিবেদন।

শ্রীভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
ঠিকানা--Sadora Gaon,
Bina Baran Railway, Gwalior.

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের নূতন আবিষ্কার।

যে দিন এদেশে ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সেই দিন হইতে ইংরাজ ভারতের পাঠশালামাত্রেই গুরুর আসন অধিকার করিয়া, আমরা যে জ্ঞানে বিদ্যায় ও মৌলিকতায় তাহাদের অপেক্ষা অনেক হীন, তাহা উপদেশ দিয়া আসিতেছে। এই উপদেশের ফল এককালে ফলিয়াছিল। সেই সময়ে দলে দলে ইংরাজি শিক্ষিত ছাত্র জাতীয় বিদ্যাবুদ্ধি সাহসসামর্থ্যের উপর একটা গভীর অশ্রদ্ধা লইয়া কলেজ হইতে বাহির হইতেন। ইংরাজি চালচলনের মোহে ইহাঁরা ঘোর অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইংরাজ যে সময় ভারতবাসীর যে ছবি আঁকিতেছিল, মূলের সহিত তাহার ঐক্য আছে কি না তখন মিলাইয়া দেখিবার সামর্থ্য তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। জ্ঞান, বুদ্ধি, ধর্ম্মকর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত আদর্শে আমরা যে অনেকের চেয়ে উঁচুতে আছি, তাহা এখন আমরা বুঝিতেছি, এবং আমরা যেখানে দুর্ব্বল সেখানে বলসঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতেছি। বড় বলিয়া প্রকৃত গৌরব অনুভব করা সকল জাতির ভাগ্যে ঘটে না। যে জাতির এই অনুভূতি আছে, তাহাকে সহজে কেহ বিচলিত করিতে পারে না। আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন আমরা নিজেকে বড় বলিয়া চিনিতে আরম্ভ করিতেছিলাম, তখন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার এক মহাবিষ্কার দ্বারা বৈদেশিক পণ্ডিতগণকে চমকিত করিয়া আমাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ভারত যে কেবল "অতীত গৌরববাহিনী" নয়, আচার্য্যবর তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধীয়

গ্রন্থখান স্বদেশবাসীর নামে উৎসর্গ করিয়া,—সেদিন সকলকে বুঝাইয়াছিলেন। সেদিন শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই বুঝিয়াছিলেন বিজ্ঞানাভিমানী আধুনিক জাতির মধ্যে দাঁড়াইয়া গৌরব করিবার দিন তাঁহাদের প্রকৃতই আসিয়াছে। আজকাল আমাদের মধ্যে যে একটা জাগরণের ভাব দেখা দিয়াছে, ঐ আত্মগৌরব-বোধ হইতেই তাহার উৎপত্তি এবং আচার্য্য বসু তাহার অন্যতম উদ্বোধক।

গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমরা আচার্য্য বসু মহাশয়ের কোন নূতন গবেষণার বিশেষ সংবাদ পাই নাই। আমাদের প্রাচীন পিতামহদিগের ন্যায় যিনি ধনৈশ্বর্য্যের প্রলোভন হইতে মুক্ত হইয়া, কেবল সত্যানুসন্ধানকে জীবনব্রত করিয়াছেন, তিনি এই দীর্ঘকাল কখনই বৃথা ক্ষেপণ করিতেছেন না, তাহা আমরা বেশ বুঝিয়াছিলাম। স্তব্ধ ধ্যানের আসনত্যাগ করিয়া তিনি আবার যে শুভলগ্নে আমাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া, তাঁহার কঠোর সমাধিলব্ধ মহামন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিবেন, আমরা কেবল তাহারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম মাত্র। প্রতীক্ষাকাল শেষ হইয়াছে,—আজ আচার্য্যবর এক মহত্তর আবিষ্কার সমাধা করিয়া, আবার আমাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এবং সেই আবিষ্কারগ্রন্থ জননী মাতৃভূমির চরণকমলে উৎসর্গ করিবার জন্য স্বদেশবাসীকে আহ্বান করিতেছেন। সহস্র উপদেশ ও বক্তৃতায় যে মাতৃভক্তির সঞ্চার হয় নাই, আচার্য্য বসুর নূতন গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে

"মাত্রে"

এই একমাত্র নিঃসঙ্গ শব্দটির মোহিনী শক্তিতে তাহা শত শত হৃদয়ে উদ্বোধিত হইয়া উঠিবে।

আচার্য্য বসু মহাশয়ের নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধীয় সদ্যঃপ্রকাশিত গ্রন্থখানি (Plant Response) প্রায় আটশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তিনি এত নূতন তত্ত্বের অবতরণা করিয়াছেন, যে, পড়িলে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার সুযোগ আমাদের দেশে নাই বলিলেও চলে। সুসজ্জিত পরীক্ষাগার, সূক্ষ্ম যন্ত্রনির্ম্মাণোপযোগী সাজসরঞ্জাম, আমরা বহু কষ্টেও এখানে হাতের গোড়ায় পাই না। কোন নূতন যন্ত্রের নির্ম্মাণ আবশ্যক হইলে সেটিকে ঠিক্ মত গড়িয়া দিতে পারে, এ প্রকার যন্ত্রশিল্পীও এদেশে দুর্লভ। একক জগদীশচন্দ্র "শোষণগ্রাফ্" ও "কুঞ্চনগ্রাফ" প্রভৃতি নানা যন্ত্রের উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণ করিয়া, অতি অল্পকাল মধ্যে যে সকল আশ্চর্য্যকর আবিষ্কার সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

আচার্য্য বসু মহাশয় ইতিপূর্ব্বে তাঁহার "সজীব ও নির্জীবের সাড়া" (Response in the living and the non-living) নামক গ্রন্থে জড় ও জীবের মূলগত একত্ব প্রতিপাদন করিয়া, সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে যে এক আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, পাঠক তাহার কথা অবশ্যই শুনিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন,—আঘাত উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া একা জীবেরই বিশেষত্ব নয়। যে যে উত্তেজনায় জীব সাড়া দেয়, সেই সকল তাড়নায় পড়িলে নির্জীব পদার্থও অবিকল একই প্রকারে সাড়া দিয়া থাকে। বিষ ও মাদকদ্রব্য প্রয়োগ, ও পুনঃ পুনঃ আঘাত তাড়নাদি দ্বারা প্রাণী মাত্রেই কি প্রকারে মৃত্যু, মত্ততা ও অবসাদাদির লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি। নির্জীব ধাতু ইত্যাদিতে বিষাদি প্রয়োগ করিয়া অধ্যাপক বসু মহাশয় মৃত্যু ইত্যাদির অনুরূপ সকল চিহ্নই দেখাইয়াছিলেন। এই সকল পরীক্ষাদি দ্বারা ধাতু অধাতু, উদ্ভিদ্ প্রাণী সকলেই যে একই গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ, তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থে বসু মহাশয় নির্জীব পদার্থ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলেন নাই, কেবল উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর ভিতরকার খুঁটিনাটী সকল ব্যাপারেই যে একটা পূর্ণ ঐক্য আছে তাহা দেখাইয়া, উভয়ের অভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং কেবল বাহ্য উত্তেজনায় সাড়া দেওয়াতেই যে প্রাণীর প্রাণিত্ব ও উদ্ভিদের উদ্ভিদত্ব তাহা অকাট্য যুক্তি ও পরীক্ষাসিদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

জীব মাত্রেরই নাড়াচড়া চলাফেরার মধ্যে একটা বড় বৈচিত্র্য বর্ত্তমান আছে। সূর্য্যালোকপাতে কয়েক জাতীয় লতার ডগা মাটি হইতে উপরের দিকে বাঁকিয়া উঠিয়া, শূন্যে মাথা তুলিবার চেষ্টা করে। আবার সেই আলোকের উত্তেজনাতেই কতকগুলি উদ্ভিদ্ কুব্জপৃষ্ঠ হইয়া মাটিতে মাথা গুঁজিবার আয়োজন করিতে থাকে। ভূমধ্যাকর্ষণ (Gravity)

দ্বারা গাছের মূল মাটিতে প্রবেশ করে, আবার সেই আকর্ষণই অঙ্কুরকে উপরের দিকে উঠাইয়া দেয়। লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ কর, তাহার পত্রবৃন্তটি নামিয়া পড়িবে, এবং পাতাগুলিও শেষে যোড় বাঁধিয়া নীচে নামিতে থাকিবে। কিন্তু অপর একটি গাছের পত্র স্পর্শ কর, তাহাতে কোন প্রকার সাড়ার চিহ্ন দেখিতে পাইবে না। প্রাণীর চলাফেরাতেও অবিকল ঐ প্রকার নানা কার্য্য দেখা যায়।

একই জাতীয় নানা জিনিসের ঐ সকল বিচিত্র কার্য্যের দুই প্রকার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। প্রথম,—এক-জাতিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও উহাদের প্রত্যেকেই এক একটি রহস্যময়ী শক্তি লইয়া জন্মিয়াছে বলিয়া স্বীকার করা। দ্বিতীয়তঃ—স্প্রিং ঘুরাইলে ঘড়ি যেমন নানা প্রকারে সেই বাহ্য উত্তেজনায় সাড়া দেয় ও কখন কখন সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্য করে, জীবদেহকে সেই প্রকার একটি জড়যন্ত্র বলিয়া প্রমাণ করা, এবং তাহাদের বিচিত্র কার্য্যগুলির মূলে বাহ্য উত্তেজনার অস্তিত্ব দেখানো।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্য্যন্ত বিপথ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিলেন। ইঁহারা উদ্ভিদদিগের পূর্ব্বোক্ত বৈচিত্র্যে কোন ঐক্য আবিষ্কার করিতে না পারিয়া, উল্লিখিত ব্যাখ্যানদ্বয়ের মধ্যে, প্রথমটিকেই আশ্রয় করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। জীবের ক্ষয়, বৃদ্ধি ও নানা প্রকার চলাফেরার কারণ জিজ্ঞাসা কর, জীবতত্ত্ববিৎ বলিবেন,—জীবনীশক্তি জীবদেহগুলির উপর বিশেষ বিশেষ ভাবে কার্য্য করিয়া তাহাদিগকে নানা প্রকারে চালাইয়া লইয়া বেড়ায়। কিন্তু এই জীবনীশক্তির মূল কোথায় এবং সেটি কি প্রকারেই বা কার্য্য করে তাহা কোন জীবতত্ত্ববিৎই বলিতে পারিবেন না। আচার্য্য বসু মহাশয় এই জীবনীশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। অজ্ঞতাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ ঐ নিরর্থক শব্দটির গঠন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল।

সজীব ও নির্জীব পদার্থের উপরে আঘাত উত্তেজনার প্রভাব সম্বন্ধে, আচার্য্য বসু মহাশয় যে মহাসত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, জীবনীশক্তি সম্বন্ধীয় গবেষণাকালে তাহা তাঁর মনে জাগিতেছিল এবং জীবের বিচিত্র কার্য্যগুলি বাহ্য উত্তেজনারই নানা বিকাশ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল। এই বিশ্বাসই যে সম্পূর্ণ সত্য, অধ্যাপক বসু মহাশয় নানা পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ উল্লেখ করিয়া তাহা তাঁহার নবপ্রকাশিত পুস্তকে প্রচার করিয়াছেন। ইঁহার মতে জীবদেহমাত্রই পূর্ব্বউদাহৃত ঘড়ির ন্যায় এক একটি যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রযুক্ত শক্তিকে নানা আকারে বিকাশ করা ছাড়া যন্ত্রের যেমন নিজস্ব কোন শক্তি নাই, জীবদেহেও সেই প্রকার জন্মগত কোন শক্তি থাকে না। বাহিরের যে শক্তি তাহাদিগকে আঘাত দেয়, তাহাতে যন্ত্রের ন্যায় সাড়া দেওয়াই ইহাদের একমাত্র কাজ। জীবতত্ত্বের যে মহা নিয়ম পেফার (Pfeffer) সাক্স (Sachs) প্রভৃতি প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই, প্রাচ্য পণ্ডিত আচার্য্য বসুর দিব্যদৃষ্টিতে তাহা ধরা দিয়াছে।

নানা জীবের বিচিত্র কার্য্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণ জীবতত্ত্বে অনেক বিকট কল্পনার জঞ্জাল প্রবেশ করাইয়াছেন। অধ্যাপক বসু মহাশয় তাহার প্রত্যেকটিই পরীক্ষাসিদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়া নিজের সিদ্ধান্তটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পাঠক বোধ হয় জানেন, আমাদের দেহের কোন স্থানে আঘাত দিলে, তজ্জাত বেদনার জ্ঞানটা আমরা সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করি না। আঘাত প্রাপ্তি ও বেদনা অনুভূতির মধ্যে একটা সময়ের ব্যবধান স্পষ্ট দেখা যায়। আঘাত উত্তেজনায় উদ্ভিদ আমাদেরি মত সাড়া দেয়, এবং আঘাত ও সাড়া দেওয়ার মধ্যে ইহারাও সময় লইয়া থাকে। লজ্জাবতী লতার একটি ডালের গোড়ায় দেশলাইয়ের আগুন অল্পক্ষণের জন্য স্পর্শ করাও, এই আঘাতে পাতাগুলি নীচের দিক হইতে ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া আসিয়া, সাড়া দিতে থাকিবে। কেবল লজ্জাবতীলতা নহে, উদ্ভিদমাত্রেই যে লজ্জাবতীর ন্যায় আঘাতে সাড়া দেয়, এবং আঘাত ও সাড়া দেওয়ার মধ্যে একটা সময়ের ব্যবধান দেখায়, আচার্য্য বসু মহাশয় নানা পরীক্ষায় তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। শরীরতত্ত্বের মতে প্রাণীদেহে প্রযুক্ত আঘাত, সর্ব্বশরীর-ব্যাপ্ত স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা বাহিত হইয়া মস্তিষ্কে নীত হইলে, বেদনার অনুভব হয়। কিন্তু উদ্ভিদের আঘাত কি প্রকারে তাহার সর্ব্বাঙ্গে চালিত হয় ও তদ্দ্বারা সাড়ার উৎপত্তি

হয়, তাহা এ পর্য্যন্ত ভাল জানা ছিল না। জীবতত্ত্ববিদগণ এই বিষয়টি লইয়া গত শতাব্দীতে বহু গবেষণা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে স্থির হইয়াছিল যে, উদ্ভিদের আহত স্থানের জলীয় অংশ আঘাত দ্বারা ধাক্কা পাইয়া, দেহের চারিদিকে ছুটিতে আরম্ভ করে, এবং ছুটাছুটিতে যে প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহাই আঘাতের বেদনাকে সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত করিয়া সাড়া উৎপাদন করায়। আচার্য্য বসু মহাশয় এই সিদ্ধান্তের পোষক সকল যুক্তিগুলিকেই খণ্ডন করিয়া, প্রাণী ও উদ্ভিদের বেদনানুভূতি ও সাড়া দেওয়ার মূল কারণ যে একই, তাহা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন, এবং তা' ছাড়া প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদেরও যে একপ্রকার স্নায়ুমণ্ডলী আছে, তাহাও প্রমাণ করিয়াছেন।

স্বতঃ-সঞ্চলন (Autonomous Movements) জীবিত উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই একটি প্রধান ধর্ম্ম। প্রাণীহৃৎপিণ্ড আপনা হইতেই তালে তালে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে। বনচাঁড়াল প্রভৃতি কয়েক জাতীয় উদ্ভিদের পাতাকেও আপনা হইতে অল্পাধিক পরিমাণে তালে তালে উঠিতে নামিতে দেখা গিয়াছে। জীবতত্ত্ববিদগণ এ পর্য্যন্ত এই স্থূল ব্যাপারের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। ইহারা আবার বাক্যাড়ম্বরে নিজেদের অজ্ঞতা ঢাকিবার জন্য, এই প্রসঙ্গে Tonic Condition নামক এক নূতন কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই Tonic অবস্থাটা যে কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, ইঁহাদের মধ্যে কেহই সদুত্তর দিতে পারেন না। অধ্যাপক বসু মহাশয় নানা পরীক্ষা দ্বারা এই স্বতঃ সঞ্চলনের মূল কারণ দেখাইয়াছেন, এবং উদ্ভিদেও হৃৎপিণ্ডের অনুরূপ যন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছেন। তা' ছাড়া প্রাণীর শরীরে মদ্য প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ প্রবেশ করাইলে, প্রয়োগমাত্রাভেদে যেমন হৃৎকম্পনের দ্রুততা ও মন্থরতা দেখা যায়, উদ্ভিদদেহে সেই প্রকার মদ্যাদি প্রয়োগ করিয়া, একই ফল দেখিতে পাইয়াছেন।

উদ্ভিদ্তত্ত্বের যে সকল ব্যাপার লইয়া গত শতাব্দীতে আলোচনা হইয়া গেছে, তন্মধ্যে উদ্ভিদের রস শোষণ বিষয়টির উপর যত তর্ক কোলাহল সৃষ্টি হইয়াছিল, এমন বোধ হয় আর কোন ব্যাপারেই হয় নাই। কিন্তু এই বাগ্বিতণ্ডায় বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় নাই। মূলদেশ হইতে বৃক্ষ চূড়ায় কি প্রকারে রস সঞ্চালিত হয়, তাহা কেহই নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন নাই। বায়ুর চাপ, কৈশিকাকর্ষণ (capillarity), বহিঃপ্রবাহ (Osmotic action) ও মূলের চাপ ইত্যাদি নানা শক্তির সাহায্য লইয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু এগুলি দ্বারা যে, রসসঞ্চলনের প্রকৃত রহস্যের উদ্ধার হইয়াছে তাহা কোনক্রমে বলা যায় না। বড় বড় জীবতত্ত্ববিদগণ আজও এটিকে অব্যাখ্যাত ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। আচার্য্য বসু মহাশয় রস শোষণ সম্বন্ধীয় অনেক পরীক্ষার বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং তাঁহার "শোষণগ্রাফ" যন্ত্রটি দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন।

আচার্য্য বসু মহাশয়ের নবাবিষ্কার সম্বন্ধে আমরা এপর্য্যন্ত যেসকল কথা বলিলাম, তাহা গুটিকতক স্থূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের আভাস মাত্র। এগুলি ছাড়া বসু মহাশয় জীবের জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু ও পুরুষানুক্রমিতা (Heredity) প্রভৃতি কত যে ছোট বড় ব্যাপারকে নূতন ভাবে দেখিয়া, সারসত্যের উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাঁহার প্রতিপাদ্য স্থূল বিষয়গুলিরই তালিকা প্রস্তুত করিলে এক বৃহৎ প্রবন্ধ হইয়া দাঁড়ায়। এক কথায় বলিতে গেলে, তিনি উদ্ভিদ ও প্রাণিতত্ত্বের কোন ব্যাপারকেই ছাড়েন নাই, এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন এবং এই আলোকে উহাদের স্বরূপ আজ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ জড়রাজ্যের মাঝে দুইটি বৃহৎ গণ্ডী কাটিয়া, জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। আচার্য্য বসু মহাশয়ের আবিষ্কারগুলি দ্বারা, ঐ খণ্ডরাজ্যগুলি ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার ধারণ করিবে। বৈজ্ঞানিকগণ শারীরবিদ্যা (Physiology) ও জড়বিদ্যার (Physics) মধ্যে এখন আর কোন পার্থক্যই দেখিতে পাইবেন না; এবং একই শক্তির উত্তেজনাজাত আণবিক বিন্যাসের ভেদেই যে জড়ের জড়তা ও জীবের সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাও সকলে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন।

বিজ্ঞানের আধুনিক ইতিহাস আলোচনা করিলে একটা বড় ব্যাপার আমাদের চোখে পড়ে। আমরা দেখিতে পাই, তাপালোকতত্ত্ব বিদ্যুৎ চৌম্বকতত্ত্ব ও রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি

বিজ্ঞানের সকল শাখাগুলিই যেন এক ঐক্যের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই ঐক্যের পথই যথার্থ পথ ও সত্যের পথ। যিনি বিশ্বের রাজা, তিনি আমাদের তুচ্ছ পার্থিব রাজার ন্যায় জটিল আইন কানুন বিধিবদ্ধ করিয়া যে বিশ্বকে শাসন করিবেন, তাহা আমাদের মনেই হয় না। তাঁহার আইন অদ্বিতীয় অখণ্ড ও মহান হইবারই কথা। বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের অধীত বিদ্যাগুলিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে না দেখিয়া, যখন তাহাদিগকে সমগ্র জগতেরই অঙ্গীভূত করিয়া দেখিবার সামর্থ্য লাভ করিবেন, তখনই তাঁহাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা সার্থকতা লাভ করিবে এবং ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহানিয়ম আপনা হইতেই তাঁহাদিগের নিকট ধরা দিবে। আচার্য্য বসু মহাশয় তাঁহার আবিষ্কারগুলি দ্বারা, সজীব নির্জ্জীবের অভিন্ন ভাব এবং শরীরতত্ত্ব ও জড়তত্ত্ব প্রভৃতির মূলগত ঐক্য দেখাইয়া, সেই চরমতত্ত্ব আবিষ্কার করিবার পথ সুগম করিয়া তুলিয়াছেন।

অধ্যাপক বসু মহাশয়ের প্রত্যেক আবিষ্কারই নানা প্রচলিত সিদ্ধান্তের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং কতদিনে যে সেগুলি পণ্ডিতসমাজের গ্রাহ্য হইবে, তাহা এখন ঠিক্ করিয়া বলা চলে না। রক্ষণশীলতার প্রভাব কেবল রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়, বৈজ্ঞানিক ব্যাপারেও ইহার প্রভাব যথেষ্ট। বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায়, কোন বৈজ্ঞানিকই এপর্য্যন্ত পুরাতনের স্থানে নব সিদ্ধান্তকে সহজে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। নানা প্রকার বিরোধ ও বিসম্বাদের ভিতর দিয়া আবিষ্কারক মাত্রকেই অগ্রসর হইতে হইয়াছে। সুতরাং আচার্য্য বসু মহাশয় যে অবাধে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলিকে জগতে প্রচারিত করিতে পারিবেন, তাহা আমাদের মনে হয় না। তাঁহাকে ইহা লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সহিত অনেক সংগ্রাম করিতে হইবে, এবং শেষে তিনিই জয়ী হইবেন। আচার্য্যবর যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা লুকাইয়া থাকিবার নয়।*

শ্রীজগদানন্দ রায়।

* আমরা পর মাস হইতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারগুলির বিস্তৃত বিবরণ একাধিক প্রবন্ধে "প্রবাসী"তে প্রকাশ করিব।
লেখক।

"আশকে কবর"।

স্বচ্ছস্রোতা সরবৎ নদী তুর্কিস্থানের মরুপ্রান্তরে সরবৎ সদৃশ স্বাদু নীরধারা ঢালিয়া দিয়া সাগরে গিয়া আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছে। সরবৎ নদীর সিকতাময় পুলিন বেষ্টন করিয়া উত্তরে আখলাৎ গিরিমালা। গিরিসানুতে দ্রাক্ষাকুঞ্জ, খর্জ্জুর-বাগ। দক্ষিণকূলে শুধু সিকতার সীমাহীন বিস্তার, মাঝে মাঝে পেস্তা, চালগুজা প্রভৃতির ক্ষেত্রের হরিৎ শোভা। আখলাতের কোলে আদানা গ্রাম; আখলাতের শীর্ষ-বিস্রুত 'সরা' নির্ঝরিণী আদানার বুক চিরিয়া নহর বহিয়া সরবৎ নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। আদানা যেন বাঘাম্বর গঙ্গামৌলী মহেশের মত গম্ভীর সৌন্দর্য্যে মনোরম।

আমির আম্মন এই প্রদেশের অধিপতি। আদানায় তাঁহার পল্লীভবন। তাঁহার বয়স বত্রিশ বৎসর; ক্রুর আরব মরুর মধ্যে মধুচরিত্র শ্যামদ্বীপ। দিব্য গৌর, উন্নত, পেশীপুষ্ট দেহ; পদ্মপ্রফুল্ল কোমল মুখশ্রী; অংসবিলম্বী দীর্ঘ কুঞ্চিত বাবরি চুল; পরিচ্ছদ সহজ সুন্দর; দৃঢ় চরিত্র, নিষ্ঠাবান।

গুলসুরৎ তাঁহার একমাত্র বেগম। গুলসুরৎ বাস্তবিকই "গুল্-সুরৎ"। তাহার স্বামীর আদরের ডাক "গুল্-গুলাব"। বাস্তবিক সে গোলাপ ফুলের মতই সুন্দর;—গোলাপের লালিমা তাহার ওষ্ঠে ও গণ্ডে; গোলাপের কোমলতা তাহার দেহে ও মনে; গোলাপের গন্ধ তাহার চরিত্র ও ব্যবহারে; গোলাপের কণ্টক কুর্দ্দিস্থানের ঈর্ষাকাতর সুন্দরীদের চিত্তে।

গুলসুরৎ স্বামীতে নির্ভরশীলা, তাহারই উদ্যানের স্বহস্ত-বর্দ্ধিত শ্যামা-লতাটির মত; সকলের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণা কপোতীর মত; অজ্ঞাত প্রচ্ছন্নগুণা কস্তুরী মৃগের মত; প্রকট চিত্তসৌন্দর্য্যে গুপ্ত দেহশ্রী কাঁঠালী চাঁপার মত। সে প্রজ্ঞাবান চরিত্রবলী স্বামী পাইয়া গর্ব্বিতা নহে, ধন্যা; স্বামী তাহার মত ফুলটি পাইয়া মুগ্ধ।

আদানা হইতে প্রায় এক ক্রোশ তফাতে গুলসুরতের এক ভগ্নির বাড়ী ছিল। তাহার নাম নুর নেহার। নুর নেহার গুলসুরতের ভগ্নি অপেক্ষা সখির স্থান অধিকার করিয়াছিল। সূর্য্যের স্বর্ণ আভা সরার উচ্ছল জলে যখন সান্ধ্য-লালিমা দান করিত, যখন আখরোট, বাদামের ফুলের গন্ধে আদানা মত্ত হইয়া উঠিত, যখন বুলবুল 'দেওয়ানা' হইয়া

পড়িত, তখন গুলস্থরৎ ঔৎসুক্য-ক্ষুব্ধ চিত্তে ভবন-জালায়ন মুক্ত করিয়া অপেক্ষা করিত, কখন তাহার বহিন নুর নেহার কুব্জপৃষ্ঠ উষ্ট্রের উপর দূর প্রান্তরে দেখা দিবে। ফিরোজা রঙের রেশমী বোরকা ভেদ করিয়া উৎসুক সখির চঞ্চল দৃষ্টি গুলস্থরৎ মনশ্চক্ষে অনুভব করিত; আপনার স্বাগতদৃষ্টি বহিনের প্রতি প্রেরণ করিত; উষ্ট্র হেলিয়া দুলিয়া দ্রুত চলিত।

একদিন বৈকালে আমির আম্মন ভোজন-ভবনে বৈকালিক আহারের জন্য আসিয়াছেন। ঘরটি 'কমখাব' আচ্ছাদিত; তাহার উপর গজ-দন্ত-নির্ম্মিত মেজের উপর মখমলের আস্তরণ; তাহার পার্শ্বে স্বর্ণরঞ্জিত বিচিত্র কারুচিত্রিত কেদারা, তদুপরি আমির আম্মন উপবিষ্ট। ঘরের চারিদিকে বড় বড় জানালা, জানালার উপর সূক্ষ্ম মসলিনের 'পরদা', জানালাগুলিকে অর্দ্ধাবৃত করিয়া রাখিয়াছে; প্রতি বাতায়নাবকাশে এক একজন বাঁদি দণ্ডায়মানা; নীল পেশোয়াজ, সবুজ ওড়না, লম্বিত বেণী, মেহ্‌দি-রঞ্জিত হস্ত, কজ্জললিপ্ত চক্ষু; সুন্দরীদের বিচিত্র বসনে বৈকালিক রৌদ্র ঝিকিমিকি খেলিতেছে; দক্ষিণ বায়ু ব্যস্তসমস্ত ভাবে বাতায়নের আচ্ছাদনী ঠেলিয়া, ঘরে ঢুকিয়া যুবতীর ওড়না উড়াইতেছে, আতরের গন্ধে আকুল হইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে। বাঁদির হাতে থাঞ্চাভরা মিষ্টান্ন, কাহারো হাতে রৌপ্যপাত্রে নানাবিধ মেওয়া, কাহারো হাতে সরবৎ, কাহারো হাতে গোলাপপাশ, কাহারো হাতে আতরদান, কাহারো হাতে ময়ূর পচ্ছের ব্যজন। গুলস্থরৎ স্বামীকে আহার্য্য বিতরণ করিতেছে। তাহার 'আসমানি' রঙের পেশোয়াজ, ফিরোজা রঙের ওড়না, স্বর্ণখচিত পায়ে জরির জুতা, মস্তকের লম্বিত বেণী বেষ্টন করিয়া মুক্তামালা, চোখের কোনে 'সুরমা' টানা, হাতের তলে জাফরাণের রং, গণ্ডে ওষ্ঠে অনিন্দ্য স্বাস্থ্যের লালিমা; বৈকালের রৌদ্র যখন তাহার দেহচুম্বনের অবকাশ পাইতেছিল তখনই হাসিয়া উঠিয়া চক্ষে ঝিলিক হানিতেছিল, গুলস্থরতের গণ্ডের লালিমা গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। গুলস্থরতের সে দিকে লক্ষ্য ছিল না, সে স্বামীকে আহার করাইতে ব্যস্ত, কিন্তু আমির আম্মনের কৌতূহলী চক্ষু সে শোভায় মগ্ন হইয়া গিয়াছিল। গুলস্থরৎ গোলাপের সরবৎ, মেওয়া ও মিষ্টান্ন একে একে স্বামীর সম্মুখে স্থাপন করিতেছিল, স্বামীর ভোজনশেষ পাত্র আবার উঠাইয়া বাঁদিদের হাতে দিতেছিল।

যখন আহার আরম্ভ হইল, তখন গুলস্থরৎ ওড়নাখানি গুটাইয়া লইয়া স্বামীর পার্শ্বে গিয়া বসিল এবং গজদন্তমণ্ডিত ময়ূরপুচ্ছের 'সন্দলী' পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। আম্মন প্রেয়সীর সরবৎ-মধুর, স্নিগ্ধ রূপধারার অভ্যুখে, গোলাপী সরবৎ তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। তিনি প্রিয়ার কিশলয়কোমল মসৃণ সুন্দর ছোট্ট হাত খানি ধরিয়া বলিলেন, "তোমার বহিনের আসার সময় হইয়াছে?" গুলস্থরৎ বলিল, "না, এখনো আসার সময় হয় নি। ঐ দেয়ালের রৌদ্রটুকু যখন ঐখানে উঠিবে, তখন হেনা ফুটিবে, বুলবুল ডাকিবে, আর আমার বহিনের উট পেস্তার ক্ষেতে দেখা দিবে।" আম্মন প্রেয়সীর বর্ণনাবহুল কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বহিনের এখানে আর না আসাই ভাল; হয় তাহার আগমন বন্ধ করিতে হইবে, নয় ত আমাদের আদানা ছাড়িতে হইবে।" গুলস্থরৎ বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমার প্রিয়সখি ও বহিন মধুর প্রকৃতি; সে তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিল?" আম্মন কতকগুলি পেস্তা ও কিসমিস একত্র করিয়া মুখে দিয়া বলিলেন, "তোমার বহিন আমার সঙ্গে 'আশক' করিতে উৎসুক।" এই কথাতে গুলস্থরৎ বসোরার গোলাপ ক্ষেতকে লজ্জা দিয়া হাস্য করিয়া কহিল, "বহিনের স্বামীর প্রতি 'আসনাই' হওয়া ত স্বাভাবিক। যে আমাকে ভালবাসে, তাহাকে তোমাকে ভালবাসিতে 'মানা' কর না কি?" আম্মন আবজোসের বিচি ফেলিয়া বলিল, "না, তা বারণ করি না, কিন্তু বেশী ভালবাসিয়া ফেলিলেই বিলক্ষণ ভয় হয়, কারণ তোমার স্বামী একটি বই ত নয়।" এই কথাতে গুলস্থরৎ "যাও" বলিয়া স্বামীর গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া একটি ছোটরকম ধাক্কা দিল; আম্মনের অঙ্গুলিধৃত আঙুরটি মাটিতে পড়িয়া অভিমানে ফাটিয়া গেল। দু'জনের হাসিকে বাধা দিয়া নুরনেহার বলিয়া উঠিল, "তোমাদের আনন্দের 'শরিক' আসিয়াছে।" গুলস্থরৎ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া ভগ্নীর হাত ধরিল।

* * * * *

পরদিন প্রাতে আম্মন একখানি পত্র স্ত্রীর হাতে দিয়া

বলিলেন, "দেখ, আমার কথা সত্য কি না।" গুলসুরৎ পড়িতে লাগিল:—

"হে আমার জান-বেহেস্তের ইঞ্জিল, গুলসুরতের কাছে শুনিলাম যে আমার গোপনপূজা হৃদয় দেবতার গোচর হইয়াছে। ভালই। জানাইবার জন্য আমার প্রাণ মধ্যে মধ্যে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। সরলা গুলসুরৎ মনে করে আমি তাহারই প্রেমের আকর্ষণে উটে চড়িয়া, তপ্ত বালুকার প্রান্তর ভাঙিয়া নিত্য আদানায় যাই! কিন্তু খামিন্, তুমি জানিয়াছ, নুরনেহারের চক্ষুর 'নুর' তুমি। এবং আমার নাম অন্বর্থ হইয়াছে শুধু তোমাকে দেখিয়াই। কে আমার এই গুপ্তপ্রেম ব্যক্ত করিয়া দিল? বুঝি মনোভব। আজ আমার প্রেম বসন্তের প্রজাপতির মত বিচিত্রবর্ণের রঙিন্ পাখা মেলিয়া উড়িয়াছে, 'আয়্ ইয়ার,' তাকে তোমার চিত্তপুষ্পের প্রেমমধু পান করিতে দেও। আমি বিধবা, কিন্তু তুমি আমার ভগ্নীপতি হইলে কেন? জানি আমি, বহিন গুলসুরৎ তোমার স্ত্রী থাকিতে তুমি আমায় 'নেকাহ' করিতে পার না। কিন্তু, তবু—তোমার প্রেম না পাইলে আমার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইবে। তুমি গুলসুরতের প্রেমে 'মশগুল্,' কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে এমন প্রাণপাবী প্রেম কোথায়? আমার মত রূপ সে কোথায় পাইবে? সে কি আমার বাঁদি হইবার যোগ্য? যদি দয়া হয়, তোমার বাগানে বৈকালে আমায় দেখা দিও আমার অনেক কথা বলিবার আছে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমায় যদি সেখানে না পাই তবে বুঝিব আদানায় আমার কবরেরও স্থান হইবে না। একটি স্বদর্পিত প্রাণা রমণীর শুভাশুভ তোমার উপর নির্ভর করিতেছে জানিও। 'ফকত'।

অভাগিনী নুরনেহার।"

পত্র পড়িতে পড়িতে গুলসুরতের গণ্ড বাহিয়া ধারা বহিল, যেন বসোরার গোলাপ ক্ষেতে বারিবর্ষণ হইতেছে। জলভরা চোখ দুটি স্বামীর মুখের উপর তুলিয়া গুলসুরৎ বলিল, "খামিন্, কি হবে? নুর নেহার আমার বহিন না হইলে তোমায় সাদি করিতে বলিতাম। আমায় 'তালাক' দিলে বিবাহ হয়, কিন্তু আমি তোমায় ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব! তুমি ও নুর নেহার আমার যে তুল্য প্রিয়।" আম্মন বলিলেন, "প্রেয়সি, একনিষ্ঠতাই হজরৎ মহম্মদের অনুমোদিত, তাহা কি ভুলিয়া গেলে? যে আপন দোষে দুঃখকে ডাকিয়া আনিয়া আপনার চিত্তদুর্গ অধিকার করিতে দেয়, তাহার দুর্গতি দেখিয়া কষ্ট বা শোক করা বৃথা। খোদা বহিনকে শুভমতি দান করুন।"

* * * *

আম্মনের ভবন-সন্নিহিত উদ্যানের বাদামতলায় অন্ধকার জমাট বাঁধিতেছে। আখরোটের গাছে আঙুরের লতা বেড়িয়া উঠিয়াছে, একটা বুলবুল লতার শাখায় ঝুলিয়া একটা আঙুরে এক একবার চঞ্চু বিদ্ধ করিতেছে আর এক একবার মুখ উঁচু করিয়া সুধাসিক্ত কণ্ঠে মধুর শিশ দিয়া উঠিতেছে। পুষ্পবহুল বসন্তে হেনা, বকুল, চামেলি ও গোলাপের গন্ধে সান্ধ্যসমীরণ ভারাক্রান্ত হইয়া মৃদু বহিতেছে। উদ্যানের মধ্যে পাষাণ বেদিকা বিদীর্ণ করিয়া সরার জল ফোয়ারা হইয়া রূপার তারগুলির মত জলধারা তমসাচ্ছন্ন শূন্যে প্রেরণ করিতেছে, সে জল নীচে পড়িয়া, নহর বহিয়া, সরবৎ নদীতে গিয়া মিশিতেছে। সরার বুকে সান্ধ্যসূর্য্যের শেষ স্বর্ণাভা নিভিয়া গেল। আম্মন ও গুলসুরৎ ভবন-জালায়ন হইতে অস্পষ্ট দেখিলেন, পুষ্পবিতানের মধ্য হইতে বাহির হইল নুর নেহার; আজ তাহার বোরকা নাই, গুণ্ঠন নাই; ফিরোজা রঙের পোশোয়াজ, গোলাপী ওড়না, পৃষ্ঠে দোদুল্য বেণী, দীপ্ত সৌন্দর্য্য উদ্যানে যেন দাবাগ্নি জ্বালিয়াছে।

নুর নেহার একবার চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া চাহিয়া লইল। প্রাসাদের দিকে চাহিয়া একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল, তার পর কাঁচি দিয়া বেণী কাটিয়া ফেলিল; চোখের সুরমা মুছিয়া ফেলিল, হাতের কুঙ্কুমরাগ নহরের জলে ধুইয়া ফেলিল, ওড়না, পেশোয়াজ ফেলিয়া মোটা বোরকায় গুণ্ঠন টানিল। পরিত্যক্ত প্রসাধন একত্র করিয়া রাখিল। তার পর—দক্ষিণমুখে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। তার পর—ধীরে ধীরে খর্জ্জুর-বীথির অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

আম্মন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নুর নেহার গৃহে ফিরিল না, বোধ হয় মক্কায় কাবাতে আপনাকে উৎসর্গ করিতে গেল।" এতক্ষণ গুলসুরৎ নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল, এখন ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিষাদিত

দম্পতি একটি "শামাদান" হাতে লইয়া বাগানের উদ্দেশে বাহির হইলেন।

আম্মন পরিত্যক্ত পোসাকের উপর একখানি কাগজ দেখিয়া উঠাইয়া লইয়া "শামা"র আলোতে পড়িলেন, নুর নেহারের প্রার্থনা :—

"এই আদানায় আমার সকল গর্ব্ব, সকল মোহ, সকল পাপের কবর হউক। রে সয়তান, আমাকে আর প্রলুব্ধ করিও না। হে পরমেশ্বর, মানুষের প্রেম আকর্ষণে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তোমার প্রেম লাভেও যেন বঞ্চিত না হই। আমার চিত্ত, হে "সোভান্ আল্লা", তোমার প্রেমে পবিত্র হউক।"

আম্মন সে লিপিখানি মস্তকে রাখিয়া বলিলেন, "আমেন"। বিষাদিত দম্পতি মক্কার দিকে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিলেন। গুলসুরৎ বহিনের কর্ত্তিত বেণী ও পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ একটি অশ্রুসিক্ত স্বর্ণপেটিকায় সযত্নে রাখিয়া দিল। তাহার উপরে মিনার কাজে লিখিত হইল "আশকে কবর।"

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তপস্যার ফল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নূতন বন্ধু।

মিষ্টার বোনার্জি, জানালায় দাঁড়াইয়া দুইজন উড়ে বেহারার ঝগড়া শুনিতেছিলেন। একজন বেহারা যখন অপরের উক্তি বিশেষ উপেক্ষা করিয়া সদন্তে বলিল, "মোর কঁ-অ-ড় গলা," তখন বোনার্জি ভাবিলেন, যে লোকটি বোধ হয় তাহার কোমর এবং গলায় আঘাত পাইয়া থাকিবে, এবং সেই আঘাতের কারণের সঙ্গে অন্য ব্যক্তির সদোষ সম্পর্কহেতু ঝগড়া বাধিয়াছে। বোনার্জি যখন উড়িয়া ভাষার এই অপূর্ব্ব মর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিলেন, এবং প্রত্নতত্ত্ববিদের মত ভাষার ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া অজ্ঞাত বিষয়ের মীমাংসা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার গৃহে চারিজন বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। মেসাস্ ন্যান্ডি এবং পাল্ দাবা খেলিতেছিলেন এবং মিষ্টার ডস্ তাঁহাদের পার্শ্বে গালে হাত দিয়া বসিয়া তাঁহাদের খেলা দেখিতেছিলেন। অন্যদিকে একখানি আরাম-চেয়ারে শুইয়া ডাক্তার ভট্টাচার্য্য একখানি ইংরাজি দৈনিকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বোনার্জি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, একাকী প্রসন্ন চিত্তে উড়িয়া বেহারা মথিত ঝগড়া সাগরের মধ্য হইতে অমৃত লাভ করিতেছিলেন।

ন্যান্ডি বা নন্দী মহাশয় যখন দেখিলেন, যে পাল মহাশয় যদি তাঁহার দাবা ধরিতে আসেন, তাহা হইলেই তিনি ঘোড়ার কিস্তিতে তাঁহার নৌকা ধরিয়া, মৃত দাবাটি দিয়া নৌকা সংহার করিয়া কিস্তি মাৎ করিতে পারেন। পালের মনে দাবা ধরার প্রবৃত্তি জাগাইবার জন্য, নন্দী মহাশয় বারম্বার তাঁহার দাবার বিপদের কথা কৃত্রিম কাতরতাসহ প্রকাশ করিতেছিলেন। কিন্তু পাল যখন, সে কথা লক্ষ্য না করিয়া একটি বড়ে টিপিয়া ঘোড়ার পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন, নন্দী তখন নিরুপায় হইয়া অন্য খেলা দেখিতে দেখিতে গুন্ গুন্ করিয়া পৈতৃক ভাষায় গাহিতে লাগিলেন, "আর যেন শ্যামের বাঁশী বাজে না, বাজে না।" ডাক্তার ভট্টাচার্য্য জানিতেন, যে একটু বিপদ্গ্রস্ত না হইলে, নন্দীর মুখে গান স্ফুটিত না; তখন তিনি কৌতূহল প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, খেলার কদ্দূর ?" নন্দী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "বিশেষ কিছু নয়।" ভট্টাচার্য্য তখন আবার সংবাদপত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে বোনার্জি দেখিলেন, যে গাড়ী হইতে নামিয়া সুশীলচন্দ্র তাঁহার গৃহের দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি দ্রুতপদে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গিয়া সুশীলচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন। সংবাদপত্রের আড়াল হইতে নবাগতকে একবার দেখিয়া লইয়া, ভট্টাচার্য্য তাঁহার সংবাদ-পত্রে অধিকতর মনোনিবেশের ভাণ করিলেন। নন্দী মহাশয় কিন্তু সুশীলচন্দ্রকে চিনিতেন; সুশীল তাহা জানিতেন না। সকলেই তাঁহাকে এক একবার দেখিয়া লইলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার দিকে মনোযোগ করিলেন না। দাবার বাজিটি উঠিয়া যাইবার পর বন্ধুদিগের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবেন মনে করিয়া বোনার্জি মহাশয় সুশীলচন্দ্রকে আপনার নিকটে বসাইয়া কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ডস্ বা দাস মহাশয় তখন সহসা বলিয়া উঠিলেন, "এবার ? ওমশাই, নন্দী এবার মাৎ হলেন দেখুন।" ভট্টা-

চার্য্য তখন সহাস্যমুখে কাগজ ফেলিয়া, "তাই নাকি" বলিয়া মাথা তুলিলেন। নন্দী বলিলেন, "চাল্ আছে, চাল্ আছে।" দাস খুব হাসিয়া বলিলেন, "আছে, ত দিন্ না!" পাল মহাশয় চারিদিক তাকাইয়া বলিলেন, "না, এবার তোমার খেলা গেছে; ঢেলে সাজ।" ভট্টাচার্য্য তামাসা করিয়া বলিলেন, "নন্দীর এখনও চাল আছে; ওহে একটা সিগারেট খেয়ে মাথা পরিষ্কার করে নেও।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে নন্দী মহাশয় সুশীলচন্দ্রকে জানিতেন। ইহাও জানিতেন যে তিনি ব্রাহ্ম। মাথা পরিষ্কারের কথা পড়িতেই নন্দী মহাশয় ব্রাহ্মকে উত্যক্ত করিবার সুবিধা পাইয়া বলিলেন, "সিগারেটে কি মাথা পরিষ্কার হয়? ও তৎসৎ বলে একবার এক ডোজ্ হুইস্কি খেয়ে নিতে পাল্লে হ'ত।" সর্ব্বাপেক্ষা ভট্টাচার্য্য মহাশয় নন্দীকে বিশেষ করিয়া চিনিতেন। তিনি জানিতেন, যে নন্দী মদ্য খান না; নিশ্চয়ই নন্দী এই নবাগতকে ব্রাহ্ম বলিয়া জানেন বলিয়া, বিষ উদ্গার আরম্ভ করিয়াছেন।

নন্দীটির মুখ ভাল নয়; আবার কি বলিতে কি বলিবে ভাবিয়া, বোনাজি মহাশয় তাড়াতাড়ি সুশীলচন্দ্রকে সকলের সহিত পরিচয় করাইতে লাগিলেন। নন্দী কিন্তু নাছোড়-বান্দা; তিনি সুশীলচন্দ্রের হস্ত মর্দ্দন করিয়াই একটি সিগারেট খাইতে অনুরোধ করিলেন। সুশীলচন্দ্র যখন বলিলেন যে তামাকে তিনি অভ্যস্ত নহেন, তখন নন্দী বলিলেন, "সে কি মশাই? এ জিনিষ ত ব্রহ্মের মত নির্গুণ এবং ধোঁয়াটে; এতে আপত্তি কেন?" সুশীলচন্দ্র তখন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ডাক্তার ভট্টাচার্য্য, সুশীলচন্দ্রের সেই সরলতা এবং প্রফুল্লতাব্যঞ্জক হাসিতে অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়া নন্দীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাঃ, কি চমৎকার রসিক পুরুষ।" সহসা তখন দাস মহাশয় বলিয়া ফেলিলেন, "বোধ হচ্চে যে নন্দী আজ পরমেশ্বর পরমেশ্বর করে ডেকে দাবা খেলতে বসেছিল; হেরে গিয়ে ভগবানের উপর ঝাল্ ঝাড়ছে।" একথায় সুশীল ব্যতীত অন্য সকলেই খুব হাসলেন। দাবা খেলায় হারিবার পর, আবার নবাগতকে আক্রমণ করিবার সময়, ঠিক তাহারই সমক্ষে সেই কথার উল্লেখ, নন্দীর পক্ষে অসহ্য হইল। তিনি তখন গম্ভীরতার ভাণ করিয়া বলিলেন, "বাস্তবিকই আমি বুঝতে পারিনে, যে লোকে এত গাধা কেন হয়, যে একটা পরমেশ্বর এনে খাড়া করে।" ডাক্তার ভট্টাচার্য্য যে খুব ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নয়; কিন্তু গাম্ভীর্য্যের নামে সেই চপলতা এবং সঙ্কীর্ণতা, তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি বলিলেন, "ঠিক! এই দুনিয়ায় একটি বুদ্ধিমানের সৃষ্টি হয়েছিল, সেটি তুমি। চপল লোকের পক্ষে চিন্তাশীলতা দেখাবার ঐটিই প্রশস্ত পথ; কিন্তু কিছু মানিনে বল্লেই, যে তুমি সকল তত্ত্ব ভেবে চিন্তে ভস্ম করে বসে আছ, একথা লোকে নাও মনে কত্তে পারে।" অহংকারী ব্যক্তির জন্য যে ঔষধের প্রয়োজন, ডাক্তার তাহার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সময়ে যদি চা এবং অন্যান্য খাদ্যের ট্রে আসিয়া না পঁহুছিত, তবে মিষ্টার নন্দী গোলে পড়িতে পারিতেন।

জয়লাভের পর বেশি কথা বলা তত স্বাভাবিক নয় বলিয়াই হয় ত, মিষ্টার পাল, এতক্ষণ কিছু বলেন নাই। একটু চা-পান করিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "বাস্তবিকই পরমেশ্বরের কথা বোঝা বড় কঠিন।" সুশীলচন্দ্র তাঁহার কাছে বসিয়াছিলেন; তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "ঠিক্ বলেছেন।" নন্দী তখন একটুক্রা কেক্ মুখে গুঁজিয়া বক্রদৃষ্টিতে সুশীলচন্দ্রের দিকে চাহিলেন। মিষ্টার পাল পুনরপি কহিলেন, "সেই জন্যই লোকে বলে, যে বিশ্বাসেই ভগবানকে লাভ করা যায়।" কথাটা শুনিয়া মিষ্টার নন্দীর মুখে বিদ্রূপসূচক হাসির প্রকাশ পাইল। সুশীলচন্দ্র জানিতে পারিয়াছিলেন যে, নন্দী মহাশয় ধর্ম্মকথা অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন; তথাপি তিনি মিষ্টার পালের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বিশ্বাস কথাটা হয় ত অন্য অর্থে ব্যবহার হয়।" নন্দী মহাশয় তখন চস্মার অন্তরাল হইতে তাঁহার দন্তব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সুশীলচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "যেমন আমরা কোন লোককে বিশ্বাস কল্লে তার হাতে ধন সমর্পণ কত্তে কুণ্ঠিত হইনে; তেম্নি যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁরা জীবন সম্বন্ধে শঙ্কিত না হতে পারেন। ঈশ্বরকে যাঁরা জেনেছেন, বিশ্বাস কথাটা তাঁদের জন্যেই ব্যবহার হয়। বিশ্বাস করে সে না-জানা জিনিষ জান্তে হবে, সে অর্থ নাও হতে পারে।" সুশীলচন্দ্র দেখিলেন, যে ডাক্তার ভট্টাচার্য্যের দৃষ্টি তাঁহার দিকে; এবং সে দৃষ্টিতে তৃপ্তি এবং প্রীতি ফুটিয়া রহিয়াছে।

সুশীলচন্দ্র বিদায় হইবার সময় ডাক্তার ভটাচার্য্যও বিদায় হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইলেন; এবং পরে উভয়ে আপন আপন গাড়ীতে উঠিবার সময়ে সময়ান্তরে পরস্পরে দেখাসাক্ষাৎ করিবেন কথা হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

তত্ত্ব-কথা।

কলিকাতার অট্টালিকার অরণ্যের মধ্যেও কোকিলের ডাক শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সে খাঁচার কোকিল। সুশীলচন্দ্র যে সময়ে উদান নামক ক্ষুদ্র পালি গ্রন্থ খানি পড়িতেছিলেন, তখন এক প্রতিবেশীর বারান্দায় কোকিল ডাকিতেছিল। ভগবান বুদ্ধদেব বিশেষ মুহূর্ত্তে ভাব প্ররোচনায় যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, উদানে তাহাই আছে। কোকিলের মধুরধ্বনির মধ্যে যে অতৃপ্তি, অসহিষ্ণুতা এবং অদম্য কামনা সূচিত হয়, বুদ্ধদেবের হিতৈষণার ব্যগ্রতা এবং সংসারাতীত ভাবের উদ্দীপনার সহিত তাহার তুলনা করা চলে না। কিন্তু উভয় ধ্বনিতেই যে মধুরতা এবং অতৃপ্তির উত্তেজনা আছে, সুশীলচন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিতে ছিলেন। এমন সময়ে ডাক্তার ভটাচার্য্যকে সঙ্গে করিয়া ভৃত্যবালক আসিয়া সংবাদ দিল, "দাদাবাবু, দেখুন কে এসেছেন।"

সুশীলচন্দ্র ডাক্তার ভটাচার্য্যকে একদিন বই দেখেন নাই; কিন্তু তাঁহাকে যেন চিরপরিচিত পরমাত্মীয় বলিয়া মনে হইল। ডাক্তার ভটাচার্য্যকে বিনা অভিবাদনে সহাস্য মুখে একখানি সোফার উপরে বসাইয়া তাঁহার টুপিটি এবং উদান গ্রন্থখানি টেবিলের উপর রাখিলেন। এমন সময়ে আবার কোকিল ডাকিয়া উঠিল। ডাক্তার ভটাচার্য্য তখন কবিতাগ্রন্থের আলমারিটির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আপনার দেখ্‌ছি ঘরে কবিতা, আর ঘরের পাশেই কোকিলের ডাক; আছেন ভাল।" সুশীলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ সত্যসত্যই কোকিলের ডাক শুন্‌ছিলাম, বেশ্ লাগ্‌ছিল।" ভটাচার্য্য তখন ক্রীড়াব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "আপনিও কবি? তাই বুঝি বোনাজির সঙ্গে এত ভাব?" সুশীলচন্দ্র ভটাচার্য্যের কাছে চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলেন, "না মশাই, আমি কখনো একছত্র কবিতা লিখেছি মনে পড়ে না।" ভৃত্যবালক আবার আসিয়া সংবাদ দিল "কে এসেছেন।" সুশীলচন্দ্র চেয়ার হইতে উঠিতে না উঠিতেই মিষ্টার বোনার্জি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলে ডাক্তার ভট্টাচার্য্যের পার্শ্বে আসনগ্রহণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে আদর করিয়া বলিলেন, "এসেছ রাস্কেল্? ঐ শোন কোকিল ডাক্‌ছে; একটা কবিতা লিখে ফেল।"

বোনার্জি খুব চুরুট্ খাইয়া থাকেন; সুশীল তাহা জানিতেন। কিন্তু তাঁহার গৃহে সিগার বা সিগারেট কিছুই ছিল না। বোনার্জিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য, সুশীলচন্দ্র সে কথা তাঁহাকে জানাইয়া বলিলেন, "আপনি যদি তামাক খান্ তবে জোগাড় করে দিতে পারি।" সুশীল নিজে তামাক খাইতেন না, কিন্তু তাঁহার পিতার হুঁকাটি সর্ব্বদা পরিষ্কার করিয়া রাখাইতেন, কারণ অনেক ভদ্রলোককে তামাক দিতে হইত। তামাকের দরকার নাই বলিয়া, বোনার্জি সাহেব স্বীয় পকেটে সিগারেট কেস্‌টি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভট্টাচার্য্য বলিলেন তিনি তামাক খাইবেন। কাজেই বোনার্জির আর সিগারেট বাহির করা হইল না; চাকর যখন তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল, তখন দেশী প্রথাতেই ধূম উদ্গার করিতে লাগিলেন।

আবার কোকিল ডাকিল। ভট্টাচার্য্য তখন বোনার্জির হাত হইতে হুঁকার নল কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "শুন্‌ছো কবি?" বোনার্জি একটু হাসিয়া বলিলেন, "এঁর বাড়িতে কোকিলের ডাক শোনা যাচ্চে; আর সে দিন আমার বাড়িতে ওঁকে নাস্তিকতার কচ্‌কচি শুনে আস্‌তে হয়েছে।" সুশীল বলিলেন, "নাস্তিকতার কথা শোনা ভাল; বড় বড় বিলাতি নাস্তিকদের বই পড়্‌লে অনেক উপকার হয়। প্রায়শঃই তাঁদের লেখায় কিছুমাত্র জটিলতা নাই; খুব পরিষ্কার এবং বিশদ রকমে অনেক সংস্কারের সমালোচনা আছে।" ভট্টাচার্য্য, হুঁকার নলটি টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "তা হ'তে পারে; যা সকলে স্পষ্ট চোখে দেখ্‌ছি সে কথা পরিষ্কার ক'রে বলা সহজ। পুকুরে নৌকা চালানোতে বড় বাহাদুরি নাই; কিন্তু পাহাড়ে নদীতে কিম্বা গঙ্গার ঝড় তুফানে নৌকা চালানো কষ্ট। যে রকমে নৌকা চালানো যায়, তা বুঝিয়ে বর্ণনা করাও শক্ত।" বোনার্জি মহাশয় হুঁকার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া, অন্য মনে সিগারেটের কেস্‌টি বাহির

করিয়া সিগারেট ধরাইয়া বলিলেন, "মিষ্টার মৈত্র যা বলছেন, তা কিন্তু ঠিক। যত্ন করে সংস্কারের সমালোচনা কত্তে পাল্লে, যোগ, থিয়সফি ভূত প্রেত প্রভৃতি গুলো আর গায় লাগ্‌তে পারে না।" সুশীলচন্দ্র ডাক্তার ভট্টাচার্য্যের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "ঠিক্ তাই; যার প্রকৃতিতে বাচালতা বেশি, সে সমুদ্র দেখে তার গম্ভীরতা অনুভব কত্তে পার্ব্বে না; কিন্তু মনে যদি জড়তা না থাকে, তা হলে সমুদ্রটাকে কাল্পনিক ভয় বিস্ময় দিয়েও জড়িয়ে রাখ্‌বে না। সংসারের প্রহেলিকা গুলো নিয়ে বাচালতা করা এককথা, আর ওর সঙ্গে ভূত প্রেত জড়িয়ে রাখা অন্য কথা।" ভট্টাচার্য্য তখন সজোরে ধমোদ্গার করিয়া বলিলেন, "বাচলতা কথাটা বেশ্ লাগল; আমি নাস্তিকদের বইয়ে Levity of the vulgar, বড় বেশি দেখ্‌তে পাই। প্রায়ই দেখ্‌তে পাই, যে একটা কৃত্রিম বিনয়ের স্বর ভেঁজে বলে বসেন, যে ধর্ম্ম-ওয়ালারা অতীন্দ্র কথা জান্‌বার স্পর্দ্ধা এবং অহঙ্কার করে; কিন্তু নিজেদের সম্পত্তি অহঙ্কার আর দম্ভ ছাড়া অন্য কিছু নয়। আম্‌রা দুনিয়ার সব বুঝে ফেলিছি, সকল তত্ত্ব আমাদের নখদর্পণ; আর ধর্ম্মওয়ালারা মূর্খাদপি মূর্খ।" বোনার্জি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ঐ রকম অহঙ্কারে বেশ একটু সুখ আছে।" ডাক্তার ভট্টাচার্য্য পুনরপি সুশীলচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কুসংস্কারের কথা বল্‌ছিলেন্ না? আপনি দেখবেন, যে আমাদের দেশে যিনি যত বেশি পরিমাণে ভয়ে ভয়ে সমাজে যা কিছু করে, তারি মধ্যে মাথা গুজে বসে আছেন, তিনিই তত নাস্তিকতার বড়াই করেন। অর্থটা কি জানেন্? কেউ যদি বলে, যে ইনি লেখাপড়া শিখেও দেখ কি কচ্চেন; তখন একেবারে হিমালয়ের মাথার উপরে গিয়ে দাঁড়ান। বলে বসেন্, যে এ সংসারে যে যা কচ্চে সবই কুসংস্কার; এবং তিনি তা সব জেনে শুনে, সব কুসংস্কার এক বর্গের মধ্যে ফেলে দিয়ে, অত্যন্ত অনুগ্রহ করে, যাহোক্ একটা সমাজে মাথা গুঁজে আছেন।"

সমালোচনাটা দীর্ঘ হইতে পারিত; কিন্তু থালায় এপেল্ লেবু প্রভৃতি বিবিধ ফল আসিয়া সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

রায় পরিবার কত দিনে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবেন, এই সংবাদ পাইবার জন্য মিষ্টার বোনার্জি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, নিজেও কিছু লিখিয়া জানিতে পারেন না; অথচ না জানিলেই নয়। এমন সময় ভোলানাথ বাবু কলিকাতায় থাকিলে বড় কাজে লাগিত। গাধাকে লোকে গাধা বলে, কিন্তু মোট বহিবার পক্ষে ওয়েলার অপেক্ষা গাধার পৃষ্ঠ প্রশস্ততর। ভোলানাথ বাবুর ছুটি ফুরাইয়াছিল; তিনি এখন কুচ্‌বিহারে। বোনার্জি তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, একখানি গীতা পকেটে করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মর্ম্মগ্রহণের ছলে সুশীলার সংবাদলাভার্থে সোমেশ্বর পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে গেলেন।

বেলা প্রায় ৯ টার সময়ে পণ্ডিত মহাশয় তৈলনিষিক্ত কলেবরে তামাকুর ধূমে পিত্তনাশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার দরজার সম্মুখে বোনার্জির গাড়ি থামিল। পণ্ডিত মহাশয় হুঁকাটি রাখিয়া দিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু বোনার্জি দেখিলেন যে, গীতাতে কুলাইল না,—বড় অসময়ে আসিয়াছেন। অসময়ে পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন জানাইলে পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে না পারিয়া কষ্ট পাইবেন ভাবিয়া, গাড়ী হইতে না নামিয়াই বলিলেন, "এইটি আপনার বাড়ী? আমি কাজে যাচ্ছিলাম; আপনাকে দেখে গাড়ী থামালুম। আর একদিন আপনার এখানে আসব।" পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "আপনারা বড় অনুগ্রহ করেন। কাল আমি ষ্টীমার ঘাটে যাব; যদি রায়-মহাশয়দের সঙ্গে তাঁদের বাড়ীতে না যাই, তা'হলে আপনার বাড়ী হয়ে ঘরে ফির্ব্ব। সকালে ৯ টার সময়ে নাকি মেদিনীপুরের ষ্টীমার আস্‌বে।"

বিনা কথায় এবং বিনা গীতায় সিদ্ধিলাভ করিয়া বোনার্জি সাহেব পণ্ডিত মহাশয়কে নমস্কার করিয়া, গাড়োয়ানকে শিয়ালদহ অভিমুখে গাড়ী চালাইতে বলিলেন। শিয়ালদহের পথে আসিয়াছিলেন বলিয়া, পণ্ডিত মহাশয়কে ভুলাইয়া বিদায় হইলেন। কিন্তু তখন আবার অন্য ভাবনার উদয় হইল। মিষ্টার রায় যখন এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে কোন সংবাদ দেন নাই, তখন তাঁহারা আসিবামাত্র, অথবা কয়েক দিন পরে, বিনা আহ্বানে যাওয়াটা ভাল দেখাইবে

কি? আহ্বান যে করিবেন তাহারই বা বিশ্বাস কি? ষ্টীমার আসিবার সময়, একবার দূরে একখানি গাড়ীতে থাকিয়া দেখিয়া লইলে কেমন হয়?

শিয়ালদহের ষ্টেশনের কাছে গিয়া গাড়োয়ান গন্তব্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিল। বোনার্জি তখন গাড়ী হইতে নামিয়া বিনা কার্য্যে ষ্টেশন-গৃহে গিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া ফিরিলেন; নহিলে গাড়োয়ান তাঁহাকে পাগল ভাবিতে পারে। বাড়ীতে ফিরিয়া স্নান আহার করিতে বিলম্ব হইতে লাগিল; শেষে অসুখ করিয়াছে বলিয়া দু'দিনের ছুটির জন্য কলেজে চিঠি পাঠাইয়া দিয়া, জানালার ধারে চুরুট মুখে দিয়া বসিলেন। মনের ভাব এবং ধুঁয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানা আকার ধারণ করিয়া উড়িয়া উড়িয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল। বাবুর্চি আসিয়া অনেক বার খাহারের সময় হইয়াছে বলিয়া এত্তেলা করিয়াছিল; কিন্তু একটি ক্ষুদ্র "হুঁ" ভিন্ন অন্য উত্তর না পাইয়া তাহাকে নিরস্ত হইতে হইয়াছিল।

বিনা আহারে আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিতেন বলা যায় না, কিন্তু ডাক্তার ভট্টাচার্য্য প্রাতের কার্য্য শেষ করিয়া যখন গৃহে ফিরিয়াছিলেন, তখন দেখিলেন যে বোনার্জি কলেজে না গিয়া জানালার ধারে বসিয়া আছেন। তখন কৌতূহলী হইয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার যখন ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি, আজ কলেজে যাবে না?" বোনার্জির তখন হুঁস্ হইল এবং বলিলেন, "হাঁ, এখন খেতে যাচ্ছি।" ডাক্তার মহাশয়ের নাড়ীটেপা বিদ্যাও ছিল; তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে বোনার্জির মাথায় কোন একটা ভাবনা ঢুকিয়াছে, এবং ভাবনাটাও সম্ভবতঃ প্রেম বিষয়ক, কারণ চক্ষুর দৃষ্টি একটু ধ্যানপরায়ণ, কিন্তু দুঃখাভিভূত নহে; কথার স্বরে আত্মগোপনের চেষ্টা আছে, কিন্তু কাতরতা নাই। ভাবিলেন, যে সময়ান্তরে রোগ নির্ণয় করা যাবে। ধীরে ধীরে একটী চুরুট তুলিয়া মুখে দিলেন, এবং চুরুটের মুখটি সম্পূর্ণরূপে অগ্নিস্পৃষ্ট করাইয়া বলিলেন, "কাল বিকালে দৈবাৎ সিঁড়িথেকে পা পিছলে পড়ে সুশীল মৈত্রের ডান্ পায়ে স্পেন্ হয়েছে, বেচারাকে সাত আটদিন বিছানায় থাক্‌তে হবে।" কথাটা শুনিয়া মিষ্টার বোনার্জি স্থির ভাবে বলিলেন, "কালকে বিকাল বেলা—না, আজ্‌কেই বিকালে একবার দেখ্‌তে যাব এখন। তুমি যদি যাও আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেও।" ডাক্তার ভট্টাচার্য্য তাঁহার প্রেমগ্রস্ত বন্ধুর মুখের দিকে একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া, "আচ্ছা ৫টার সময় বাড়ী থেকো" বলিয়া বিদায় হইলেন। বোনার্জির চিন্তাস্রোত আবার একটু নূতন দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সুশীলের বিবাহ কি সত্য সত্যই স্থির হইয়াছে?

[ক্রমশঃ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পুরাতন বঙ্গের অধিকাংশ জেলায় স্বদেশী ভাব অত্যন্ত নিস্তেজ হইলেও মোটের উপর সর্ব্বত্র স্বদেশীর প্রসার ধীরে ধীরে বাড়িতেছে বোধ হয়। এ সময়ে আমাদিগকে সর্ব্বদা আন্দোলন দ্বারা এই ভাবকে সতেজ রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। দেশী বস্ত্র সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য। আমরা যদি ৪০নং অপেক্ষা ঊর্দ্ধ সংখ্যার সূতার মিহি কাপড় পরি, তাহা হইলে সূতা বিলাতী হইবে। সুতরাং কাপড় পূরা দেশী হইবে না। এই জন্য স্বদেশী বস্ত্রের ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগের মোটা কাপড়ের অধিক আদর করা কর্ত্তব্য। দেশী চিনি সম্বন্ধেও একটি কথা মনে রাখা দরকার। ইহার মূল্য বিদেশী চিনি অপেক্ষা বেশী। সুতরাং যাঁহারা দেশী চিনি হইতে প্রস্তুত সন্দেশ মিষ্টান্ন খাইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে কিছু বেশী দাম দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে; নতুবা কেবল গুড়েই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

স্বর্গীয় রমাকান্ত রায়ের মৃত্যুতে দেশের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। একটি বীজের মৃত্যুতে অসংখ্য ফলের উৎপত্তি হয়। স্বর্গীয় রমাকান্তের মৃত্যুতে যদি বহুসংখ্যক, অন্ততঃ ২১৫ জন, বাঙ্গালী যুবক, তাঁহার আত্মোৎসর্গ, উৎসাহ, স্বাধীনচিত্ততা, কার্য্যশক্তি, শ্রমগৌরবানুভূতি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবন ও মরণ সার্থক হইবে। যাঁহারা বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদেশ যান, তাঁহারা রমাকান্তের বিদ্যা ও চরিত্র উভয়ই লইয়া গৃহে ফিরিলে সোনায় সোহাগা হয়; অভাব পক্ষে তাঁহার চরিত্রের অনুসরণ করিলে দেশের আশা সফল হয়।

গতমাসে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উৎসবটি দূরদর্শিতার সহিত অসাম্প্রদায়িক ভাবে করিতে না পারিলে ইহা হইতে ইষ্ট অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। ভাসাভাসা ভাবে দেখিলে মনে হইতে পারে যে শিবাজী মুসলমানের শত্রু; সুতরাং শিবাজী উৎসবের অর্থ হিন্দু মুসলমানের বিবাদ জাগাইয়া তুলা। এবং সাম্প্রদায়িক ভাবে উৎসব করিলে এইরূপ ফলই ফলিতে পারে। কিন্তু শিবাজী উৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্যরূপ হওয়া উচিত। শিবাজীর সময়ে তাঁহার দেশের প্রধান শত্রু ছিলেন কতকগুলি মুসলমান। তখন তাঁহাদিগকে বিদেশী অত্যাচারী বা দেশদ্রোহী মনে করিবার কারণ ছিল। এই জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়া তাহাদের শত্রুতা করিয়াছিলেন। শিবাজী স্বদেশদ্রোহী হিন্দুকেও ছাড়িয়া কথা কহেন নাই। আমরা তজ্জন্য শিবাজী-চরিত্র হইতে এই উপদেশ লাভ করি, যে যে কেহ দেশদ্রোহী, দেশের শত্রু, সে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, বা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক, আমাদিগকে প্রাণপণ করিয়া তাহার শত্রু তাহার কার্য্যের বিরোধী হইতে হইবে। অপরদিকে, শিবাজী যেমন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইয়াও তাঁহার রাজ্যে অনেক উচ্চ পদে মুসলমানকে নিযুক্ত করিয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সহযোগিতা স্বীকার করিয়াছিলেন, আমাদিগকেও তদ্রূপ ভারতহিতৈষী সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসীকে নিজের দলস্থ জ্ঞান করিয়া তাহাদের সহযোগিতা স্বীকার করিতে হইবে। শিবাজীউৎসব রাজনৈতিক উৎসব। কলিকাতায় উৎসবের বন্দোবস্তকারীরা মুখে ইহা স্বীকার করিলেও ইহাকে অনেকটা হিন্দু সাম্প্রদায়িক উৎসবে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন বটে, যে যাহাঁরা মূর্ত্তিপূজক নহেন, তাঁহারা সিংহবাহিনীর পূজা বাদ দিয়া উৎসবের অন্যান্য অংশে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের কাজ এরূপ চুল-চিরিয়া করা যায় না। ইহা কতকটা নিরামিষভোজীকে মাছের ঝোলের মাছ বাদ দিয়া আলু খাইতে বলার মত। মনে করুন, কতকগুলি মুসলমান যদি আকবরকে বা অন্য কোন মুসলমান রাজাকে ভারতের একজন সর্ব্বজনবন্দনীয় বীর মনে করিয়া তাঁহার রাজ্যাভিষেক উৎসব করেন, ও বক্‌রঈদের মত গোহত্যাকে ঐ উৎসবের অঙ্গ করেন, ও বলেন যে হিন্দুরা গোহত্যা ব্যতীত উৎসবের অন্যান্য অংশে যোগ দিতে পারেন, তাহা হইলে হিন্দুরা উহাতে যোগ দিতে পারেন কি? নিশ্চয় পারেন না। এইজন্য শিবাজী উৎসবকে সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক করা উচিত। মাছিমারা কেরাণীর ন্যায় শিবাজী যাহা করিতেন, তাহারই নকল করিলে কোন ফল হইবে না; তাঁহার জীবনের মূল নীতিগুলির অনুসরণ করিতে হইবে। এই নীতিগুলির সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলিতে হয়, ভগবদ্‌ভক্তি, দেশভক্তি, ও জনসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীনহিতেচ্ছা। দেশকালপাত্রভেদে নিজ নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে সকলেরই প্রাণপণ করিয়া এই নীতিত্রয়ের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। নতুবা শিবাজীর হিন্দু বা অহিন্দু অনুরাগী ভক্ত মাত্রকেই ভবানীর পূজা করিতে হইবে, (উৎকৃষ্ট রাইফল পরিহার করিয়া) তরবারি ধরিতে হইবে, "বাঘনখ" দ্বারা বিশ্বাসঘাতক শত্রুর পেট চিরিয়া দিতে হইবে, সন্দেশের ঝুড়ির ভিতর বসিয়া দিল্লী হইতে পলাইতে হইবে, বা চারিটি বিবাহ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। বলা বাহুল্য হিন্দুগণ স্বতন্ত্রভাবে স্বতন্ত্রস্থানে ভবানীর মূর্ত্তির পূজা করিলে কাহারও আপত্তি করিবার অধিকার থাকিবে না।

সম্প্রতি মার্কিন ঋষি ইমার্সনের শতবার্ষিক জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে অনেক চিন্তাশীল তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি ইমার্সনের রচনাবলীতে প্রাচীন উপনিষদাদির উপদেশের সাদৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হন। বাস্তবিক আত্মার বর্ণভেদ বা জাতিভেদ নাই, সত্যদর্শী ব্যক্তিরা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে একই সত্য অনুভব করিয়া গিয়াছেন। তবে, সত্য অনন্ত ও অপরিমেয় বলিয়া, নানা ঋষি নানা অংশ ও দিক্ দেখিয়াছেন। ইমার্সনের রচনা এরূপ প্রগাঢ় ভাব ও চিন্তাপূর্ণ যে তাঁহার এক একটি বাক্যের ব্যাখ্যান স্বরূপ এক একটি প্রবন্ধ রচিত হইতে পারে। সুতরাং দু এক কথায় তাঁহার প্রকৃতি ও প্রতিভার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। তবে, তাঁহার সম্বন্ধে মোটামুটি দু একটি কথা বলা যাইতে পারে। প্রথম, তাঁহার আত্মনির্ভর। পরের চাকরী করিও না, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও, ইত্যাদি রূপ শিক্ষাপ্রধান যে স্বাবলম্বন আমরা সে অর্থে এখানে আত্মনির্ভর কথাটি ব্যবহার

করিতেছি না। নিজ নিজ আত্মার ভাব, চিন্তা, অভিজ্ঞতা, ও সত্যানুভূতির উপর সম্পূর্ণ সাহসে নির্ভর করাই প্রকৃত আত্মনির্ভর। তুমি পৃথিবীর মৃত ও জীবিত সমুদয় লোকের দোহাই দিলেও যতক্ষণ না কোন সত্যে আমার আত্মা সায় না দিবে, ততক্ষণ উহা "আমার সত্য" নহে, উহা আমি মানিব না, ইহাই ইমাসনের ভাব। তাঁহার সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই, যে, তিনি জগতের, মানবজাতির, ভবিষ্যৎ আশা পূর্ণ দেখিতেন; অর্থাৎ ইংরাজীতে বলিতে গেলে তিনি optimist ছিলেন। তৃতীয় কথা এই যে অন্য শিক্ষকেরা কতকগুলি চিন্তা ও সত্য আমাদিগকে উপহার দেন, ইমার্সন আত্মাসাগরে ডুবিয়া এই সকল রত্ন সংগ্রহ করিতে আমাদিগকে উৎসাহিত, উদ্বুদ্ধ, উত্তেজিত করেন। অন্যে চিন্তা দেন, তিনি চিন্তায় প্রবৃত্ত করেন। চতুর্থ কথা, তিনি সঙ্গতিরক্ষা (consistency) অপেক্ষা সত্যান্বেষণ ও সত্যকথনে যত্নশীল ও অনুরাগী। আপাতবিরোধী দুটি সত্যে সামঞ্জস্য থাকিতে পারে, ইমাসন ইহা জানিতেন। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন, consistency in the bugbear of fools পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যরক্ষা আহাম্মকদের জুজু। অন্যত্র বলিয়াছেন, আমার বাড়ীর চৌকাঠের মাথায় লিখিয়া রাখিব, whim, বা খেয়াল। পঞ্চম কথা এই যে তাঁহাকে কোন বিশেষ দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ফেলা যায় না। কারণ, তিনি সত্যের নানাদিগ্‌দর্শী ছিলেন।

গত মাসে দু'জন বিভিন্ন ছাঁচের পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। একজন বিখ্যাত আইরিশ নেতা মাইকেল ডেভিট, আর একজন নরওয়ের বিখ্যাত লেখক হেন্‌রিক্ ইব্‌সেন্। মাইকেল ডেভিট্ অনেকবার দীর্ঘকালব্যাপী কারাবাস করিয়াছেন, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করিয়াছেন, কিন্তু ইংরাজেরাও তাঁহার সাহস, স্বদেশভক্তি ও চরিত্রের নিষ্কলঙ্কতায় মুগ্ধ। তিনি আইরিশ ল্যাণ্ড লীগের স্থাপনকর্ত্তা। তিনি ফেনিয়ান ছিলেন। যেরূপ কাল পড়িয়াছে, ভারতেও এইরূপ ছাঁচের লোক হয়ত জন্মগ্রহণ করিবেন। "সম্ভবামি যুগে যুগে" অনেক অর্থে গ্রহণ করিতে পারা যায়।

ইউরোপের নানা ভাষায় ইব্‌সেনের গ্রন্থাবলীর অনুবাদ হইয়াছে। ভারতের কোন ভাষায় বোধ হয় তাঁহার কোন বহির অনুবাদ হয় নাই। আমাদের মানসিক কূপমণ্ডুকতা একেবারে ঘুচে নাই, এমন নয়; কিন্তু বড় কম ঘুচিয়াছে। জগতের চিন্তামন্দাকিনী নানা দেশোদ্ভবা স্রোতস্বতী দ্বারা পুষ্টা। আমাদের এই মন্দাকিনীতে অবগাহন প্রয়োজন। ইবসেনের প্রতিভার স্থান নির্ণয়ের হয়ত এখনও সময় হয় নাই, হয়ত ইহা টলষ্টয়ের সমজাতীয় নহে। কিন্তু বাঙ্গলায় ইহাঁর কিছু পরিচয় কেহ কি দিবেন না? ইহাঁর নাটকগুলিতে সাহসের সহিত নরনারীর সম্বন্ধের নানা অভিনব সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছে। অনেকে বলেন, ইহাই ইহাঁর গ্রন্থাবলীর বিশেষত্ব।

যাহারা "স্বদেশী" নহে, তাহাদিগকে সামাজিক শাসনের দ্বারা "স্বদেশী" করা উচিত কি না? আমাদের বোধ হয়, মানুষকে বুঝাইয়া, ভালবাসার দ্বারা বশ করিয়া যে কাজ করান যায়, তাহাই সে স্থায়ী ভাবে করে। পক্ষান্তরে, শাসন দ্বারা কিছু করাইতে গেলে, না করিবার জিদ বাড়িয়া যায়। সামাজিক শাসনের একটি মহৎ দোষ এই যে ইহাতে কপটতা বাড়ে, ভীরুতা বাড়ে, স্বাধীনচিত্ততা কমে, যাহারা দলে পুরু, তাহাদের স্বেচ্ছাপ্রভুত্ব (Tyranny) বৃদ্ধি পায়। যাহারা দলে পুরু, সত্য ও ন্যায় তাহাদের দিকে হইলেও সত্য ও ন্যায়কেই অন্য সাহায্য ব্যতিরেকে জিতিতে দেওয়া ভাল; কোন ভয় দেখাইলে ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন হার্বার্ট স্পেন্সর বলেন:—

"Every man is free to do that which he wills, provider he infringes not the equal freedom of any other man." (*Principles of Ethics*, Section 272).

"প্রত্যেকের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবার স্বাধীনতা আছে যদি সে অন্য কোন মানুষের তাহারই সমান তদ্রূপস্বাধীনতায় বাধা না দেয়।" কোন আপত্তিকারী বলিতে পারেন, তবে চুরি বা নরহত্যায় বাধা দাও কেন? উত্তর, কারণ উহা সমাজের অহিতকর; এবং চোর নিজের উপর বাটপাড়ি পছন্দ করে না; নরহত্যাকারী নিজে হত হইতে চায় না। এখন কথা হইতেছে, যে তুমি যদি বিলাতী কাপড়ের,

চিনির ও নুনের ক্রেতাকে সমাজচ্যুত কর তাহা হইলে, তুমি দলে পাতলা হইলে, তোমাকে বিলাতী জিনিসের ক্রেতারা একঘরে করিলে, তুমি তাহাতে রাজী আছ কি না? দুরাচার লোকেরা রাজভয়ে ও সমাজভয়ে অনেক সময় সৎপথে থাকে। ইহা তাহাদের স্থায়ী উন্নতির চিহ্ন না হইলেও ইহাতেও সমাজ আপাততঃ নিরাপদ থাকে। কিন্তু "বিদেশী"র ক্রেতাদিগকে কি দুরাচার বলা যায়? অনেকে বলিবেন, তাহারা স্বদেশদ্রোহী, অতএব দুরাচার। এ বিষয়ে নানা তর্ক বিতর্ক হইতে পারে। আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত না হইয়া একটি কথা বলিতেছি; আশা করি ইহাতে সকল দলের লোকেই সায় দিবেন। আমি যদি প্রাণের সহিত "স্বদেশী" হই, তাহা হইলে আমার "বিদেশী"-ক্রেতার সঙ্গে মিলামিশা, আমোদ আহ্লাদ, আদান প্রদান স্বভাবতই বন্ধ হইয়া আসিবে। আমি কাহাকেও উৎপীড়ন করিতে চাই না; কিন্তু যাহার সঙ্গে আমার প্রাণের মিল নাই, তুমি তাহার সঙ্গে আমাকে সম্পর্ক রাখিতে বাধ্য করিতে পার না। এইরূপে, যদি দেশের অধিকাংশ লোক "স্বদেশী" হন, তাহা হইলে কার্য্যতঃ "বিদেশী"রা সমাজচ্যুত হইবেন। তাঁহারা তখন লজ্জা ও আত্মঘৃণায় "স্বদেশী" হইতে পারেন। আমাদের বোধ হয় এবম্বিধ সামাজিক শাসনকে কেহ উৎপীড়ন বলিবেন না।

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের পুত্র ভারতভ্রমণ করিয়া দেশে গিয়া এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে ভারতশাসনে সহানুভূতির পরিমাণ বাড়িলে ভারতের আরও মঙ্গল হয়। কথাটা সত্য, কিন্তু ভারতশাসনের ইহা চরম নীতি বা মূলনীতি (ultimate or fundamental principle) নয়; যদিও মর্লী তাহাই বলেন। ইংরাজদের মুখের এই সহানুভূতি কথাটার মধ্যে একটু মুরুব্বিয়ানা, একটু অনুগ্রহের আমেজ আছে। আমরা দুর্ব্বল ও হীন হইলেও এই আমেজটুকুতে আমাদের আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগে। আমরা চাই, ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার; সহানুভূতি সুদশাবস্থিত মানুষকে কল্পনায় দুঃস্থের দশায় উপনীত হইতে সাহায্য করে, এবং তদ্দ্বারা তাহাকে ন্যায়কারী হইতে সমর্থ করে। সুতরাং সহানুভূতি উপায় মাত্র, ন্যায়াচরণই লক্ষ্য। সহানুভূতি ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের মানসিক প্রকৃতির উপর নির্ভর করে; তুমি আইন দ্বারা সহানুভূতি জন্মাইতে পার না। (আর, অনেক সময় সহানুভূতি কথার কথা মাত্র; কিন্তু কথায় চিঁড়ে ভিজে না।) পক্ষান্তরে যদি ভারতশাসন নীতি ও প্রণালী এরূপভাবে পরিবর্ত্তন করা যায় যে ভারতবাসীর রাজস্ব আদায়ে ও খরচে, এবং আইন প্রণয়নে প্রকৃত ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে আমরা ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার বরাবর পাইতে পারি। কেবল সহানুভূতির উপর নির্ভর করিলে স্থায়ী মঙ্গল কোথায়? মনে করুন, আজ সহানুভূতির বশে মর্লী বঙ্গচ্ছেদ রহিত করিলেন। আপাতত আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে আবার যে কেহ আমাদের সর্ব্বনাশ করিবেনা, তাহার কি বন্দোবস্ত হইল? আসল কথা, ভারতবাসীর মতামত অনুসারে ভারতশাসন হইবে, এই ব্যবস্থাই চূড়ান্ত স্থায়ী শুভ ব্যবস্থা; ইহার কমে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না।

কিন্তু কোন জাতিই স্বেচ্ছায় প্রভুত্ব ছাড়িয়া দেয় না; ইংরাজেরাও দিবে না। কেবল তাহাদের ন্যায়বুদ্ধির উপর নির্ভর করা বৃথা। বরং, আমাদের ন্যায্য অধিকার দিলে তাহাদের বাণিজ্য বাড়িবে, ইহা বুঝাইয়া দিতে পারিলে কতক ফল হইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফল হয়, যদি আমরা তাহাদিগকে বুঝাইতে পারি যে আমাদিগকে ন্যায্য অধিকার না দিলে তাহাদের অমঙ্গল হইবে। কিন্তু ফাঁকা আওয়াজে ইংরাজ ভয় পায় না। ইংরাজ যদি বুঝে যে ইহাদের কিছু গূঢ় সম্বল আছে, তাহা হইলে ভয় পাইবে, নতুবা নয়।

আমাদের ন্যায্য অধিকার লাভের উপায় কি? শেষ এবং অব্যর্থ উপায় বর্জ্জন, পরিহার বা boycott। মেরিডিথ টাউনসেণ্ড্ তাঁহার এসিয়া ও ইউরোপ নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"There are no white servants, not even grooms, no white policemen, no white postmen, no white anything. If the brown men struck for a week, the 'Empire' would collapse like a house of cards, and every ruling man would be a starving prisoner in his own house. He could not move or feed himself, or get water.

তাই বলি, ইংরাজের প্রভুত্বরক্ষাবিষয়ে কোনরূপ সাহায্য না করাই আমাদের একমাত্র চরম পন্থা। কারণ, আমরা ইংরাজকে আমাদের দেশের লোককে দাসভাবাপন্ন রাখিতে সাহায্য না করিলে ইংরাজের স্বেচ্ছাশাসন টিকিতে পারে না। হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন :

Inequitable government can support itself only by the aid of a nation correspondingly inequitable, in its sentiments and acts. Injustice cannot reign if the community does not furnish a new supply of unjust agents.—Herbert Spencer, "The Study of Sociology," chap. 16.

আমরা হয় ত বলিব, এই দুই ইংরাজ যে সঙ্কেত করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করা অসাধ্য। কোন্ বড় কাজটা সুসাধ্য? বিশেষতঃ আমাদের পক্ষে। কিন্তু যখনই আমরা আত্মনির্ভর করিয়া ভাবিব ও বলিব, "সাধ্যায়ত্ত," তখনই কেল্লা ফতে হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে। এই জন্য আমাদের মতে, ভারতবাসীর, কেবল সম্মানভৃতিক (honorary) কার্য্য নহে, গবর্ণমেণ্টের চাকরী মাত্রই ত্যাগ করা উচিত। ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে মোট দশ লক্ষ লোক কেবল গবর্ণমেণ্টের চাকরী দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। ভারতমাতা এই কয়জন লোককে কি খাইতে দিতে পারেন না? আমরা যাহা লিখিলাম, তাহা অনেকের নিকটে পাগলামি বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ইহা পাগলামি কিনা, তাহা বলিবার এখনও সময় আসে নাই।

১৯০৪ সালে বাঙ্গলা দেশের জেল সমূহে মৃত্যুসংখ্যা হাজার করা ১৯·৫ ছিল; ১৯০৫এ হয় ২৫·৩। কোন কোন জেলে ৪৩·৩ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এদিকে কয়েদীদের মজুরী হইতে ৫,৩০,১৬৩৶০ লাভ হইয়াছে। সুতরাং টাকার অভাবে কয়েদীদের স্বাস্থ্যের ভাল বন্দোবস্ত হয় নাই, বলিবার যো নাই। অভাব অন্যত্র।

বাঙ্গলাদেশের কলকারখানাগুলিতে মজুরের অভাব কেন হয়, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সিবিলিয়ান ফোলী সাহেবকে নিযুক্ত করেন। তাঁহার রিপোর্ট অনেক জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ। তন্মধ্যে এখানে দুই একটা কথার উল্লেখ করিব। খিদিরপুর ডক্ প্রভৃতিতে মার্চ্চ, এপ্রিল, মে ও জুন মাসে মজুরীর দর খুব বাড়ে; দৈনিক ১৲ হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। আমরা অনেকে মাষ্টারী ও কেরাণীগিরি করিয়া কত পাই? জ্ঞানের প্রকৃত আদর আমরাও যেমন করি, মুটেরাও তেমনি করে। তবে কিনা, আমরা ভদ্র লোক! কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের কলকারখানায় সমুদয় মজুর বাঙ্গালী ছিল। এখন হিন্দুস্থানী, বেহারী ও ওড়িয়া বাঙ্গালীকে তাড়াইয়া দিয়াছে। ইহার কারণ কি? খাস বাঙ্গালা দেশে কি সব প্রাপ্তবয়স্ক সমর্থ পুরুষ ঐ মজুরদের চেয়ে বেশী রোজগার করে? সকলেরই কি পেটে ভাত, কোমরে কাপড় ও চালে খড় আছে? তা কখন নয়। সুতরাং বাঙ্গালী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, শ্রমবিমুখ, রুগ্ন বা ঘরকুনো (গৃহকোণাসক্ত), ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এ রোগের কি কোন প্রতীকার নাই? রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের যোগ্যতা অধিকার সম্বন্ধে কিছু কিছু ভাবিলে মন্দ হয় না।

আমেরিকা হইতে বেণ্টন নামক একজন সাহেব ভারতবর্ষের মৌমাছি স্বদেশে পাঠাইয়া মধুর চাষের উন্নতি করা যায় কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এ দেশে আসিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার বেশী আশা নাই। তবে, এ দেশের চাষাদিগকে সোজা বৈজ্ঞানিক উপায়ে মধুর চাষ শিক্ষা দিলে অনেক সুফল হয় বলিয়া তিনি মনে করেন। বেণ্টন সাহেব নিজ উদ্দেশ্য সাধনার্থ রুশিয়া, এসিয়া মাইনর ও পারস্য দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। ভারত পর্য্যটন শেষ করিয়া তিনি ফিলিপাইন দ্বীপ হইয়া স্বদেশে ফিরিবেন। ইহাকেই বলে উদ্যোগিতা।

এ জগতে যদি বাঁচিবি।

(১)

ওরে অক্ষম, ওরে দুর্ব্বল,
বীর-বিক্রম কর সম্বল
যদি জীবন ধারণে বাসনা।

ওরে অধম, চপল, ঘৃণ্য,
নিজ সংযম-বল ভিন্ন
কহ, আছে কি অন্য সাধনা ?
বিপদে অভয়, জীবনে বিজয়
কোথা কেবা আর যাচিবি ?
সাধনার পর নির্ভর কর,
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

(২)

ছিছি, মিথ্যা গরিমা গাহিয়া,
নিজে আত্মমহিমা কহিয়া,
হইবি শ্রেষ্ঠ ভবে কি ?
ওড়ে ফুৎকারে কিরে হীনতা ?
তেজ ধিক্কারে নিজ নীচতা ;
শুক বচন-দম্ভে হবে কি ?
হইতে উচ্চ শুধু কি তুচ্ছ
বচনগুচ্ছ রচিবি ?
কর্ম্মের পর নির্ভর কর,
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

(৩)

সহি চরণ-দলন, ধীরতা ?
করি বেদনে রোদন, বীরতা ?
কাজ কিরে ভীরু, বড়াইয়ে ?
সহে ভীষণ তাড়ন, মানুষে ?
হ'লে পাষাণ পীড়ন, সানু সে
দেয় অগ্নির কণা ছড়ায়ে।
মায়ের আশাস্ লভিতে পারিস্
শূর সম যদি রাজিবি।
মায়ের উপর নির্ভর কর,
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

(৪)

কেন বনে বনে বৃথা ক্রন্দন ?
বাঁধ, প্রাণে প্রাণে প্রীতি-বন্ধন
যদি জীবন লভিতে বাসনা।
সবে লভি বল, বাধা ঠেলিয়া,—
চল কাজে চল কথা ফেলিয়া
করি বিধির করুণা যাচনা।
লভিবে অমর অক্ষয় বর,
ভাই ভাই যদি সাজিবি।
বিধির উপর নির্ভর কর,
এ জগতে যদি বাঁচিবি।
এস অক্ষম, এস ঘৃণ্য,
এস অধম, অবশ, খিন্ন,
এস শূরবীর সহ সকলে।
এস মাতার চরণে নমিয়া,
এস ধাতার করুণা ধ্বনিয়া,
এস সাধনার বলে সদলে।
পূত সংযমে বীর বিক্রমে
অতুল কীর্ত্তি রচিবি।
ধর্ম্মের পর নির্ভর কর,
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মহানিদ্রা।

সংখ্যাতীত তনয়ের জননী আমার,
বুক ফেটে' যায় মাগো, হেরিয়া তোমার
হেন দশা ! ছিলে রাজ-রজেন্দ্রাণী দেবী,
কৃতার্থ মানিত বিশ্ব শ্রীচরণ-সেবি'।
আজি সেই তুমি মাগো, ভিখারিণী প্রায়
রুক্ষ কেশে, শুষ্ক মুখে লুটি'ছ ধূলায় ;—
কেহ নাহি লহে খোঁজ। অযুত সন্তান
পুষ্ট হইতেছে নিত্য স্তন্য করি' পান
ওই বক্ষ-তলে ;—তবু, হা দুঃখিনী মোর,
কেহ নাহি চেনে তোরে ! সকলে বিভোর
হ'য়েছে বিলাস-মোহে। পরের চরণে
দলিতা হ'তেছ তুমি নির্ম্মম পীড়নে ;—
তথাপি এখনো মাগো, তব পুত্র সবে
নিশ্চিন্তে নিদ্রিত রহে একান্ত নীরবে !

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী

বোধন।

যুগ-যুগান্তের পরে শ্যামলা, কোমল পদে তব
মিলিল মা, অপূর্ব্ব অর্চ্চনা—রক্ত-জবা অভিনব!
উত্তপ্ত শোণিত-বিন্দু—পূত-গন্ধি, উজ্জ্বল, নির্ম্মল,
তব পাদপদ্মরাগে প্রেমানন্দে করে ঝল-মল!
ক্লিন্ন-ভগ্ন প্রাণ আজি নবোৎসাহে হ'য়ে উদ্বেলিত,
দাবি করেছিল দেবি, দর্পভরে মরণ-অতীত
মরতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জীবন্ত সম্পদ্। ধন্য লীলা,—
মুহূর্ত্তে এ বিশ্বঘৃণ্য পশুগণে ভক্ত করে' দিলা!
অনির্ব্বাণ মাতৃজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হে বঙ্গ-জননী,
সুপ্তদেশে। উঠিছে রমণীকণ্ঠে শুভ হুলুধ্বনি,
রক্তাক্ত অপত্য-অঙ্গে বহে তাহে শক্তি সুধারাশি।
পদলিপ্সু ভক্তবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ, দৃপ্ত, অভিলাষী
আত্ম-বিসর্জ্জন তরে। ভুলাইয়া আক্ষেপ-বেদন
এ বঙ্গে জাগিল মাগো, তব তরে ব্যাকুল বোধন!

'ভারত-সুহৃদ' কার্য্যালয়,
বরিশাল। শ্রীঅনাথবন্ধু সেন।

বিদায়।

(১)

চাইনি তব মুখের পানে
যখন গেলে চ'লে
শুনিনি আমি বিদায় বাণী
কিযে গেলে ব'লে।
গিয়াছ তুমি যামিনী ভোরে,
ছিলাম যবে ঘুমের ঘোরে,
আলসে আঁখি মুদিত ছিল
যখন গেলে চ'লে
শুনিনি আমি বিদায় বাণী
কি যে গেলে ব'লে।

(২)

অজানা দেশে অচেনা পথে
কিসের মোহ ঘোরে,
একাকী তুমি কেন যে গেলে
বলিলে না তো মোরে।
যা কিছু মোর ছিল বা আছে,
দিয়াছি তোর পায়ের কাছে,
তবুও তোর বিশাল তৃষা
মিটিল নাকি ওরে?
একাকী তুই কোথায় গেলি
কিসের মোহ ঘোরে।

(৩)

রাজার ধনে দুহাত তোর
দিয়াছি আমি ভ'রে
আঁচল ঘিরে যতন ক'রে
রেখেছি আমি তোরে;
তবুও তুই বাড়াস হাত
কিসের আশে দিবস রাত
কাঙ্গাল তুই রহিয়া গেলি
কাঙ্গাল ক'রে মোরে
দিয়ে যে ছিনু রাজার ধনে
দুহাত তোর ভ'রে।

(৪)

হেথায় ছিল বিহগ গীত
নদীর কল গান
পূর্ণিমাতে সাগর হ'তে
আসিত হেথা বান
হেথায় বনে ফুটিত ফুল
পবন হেথা হ'তো আকুল
হেথায় ছিল তোমারি তরে
বেদনা-ভরা প্রাণ।
রাখিয়া গেলে কেবলি শুধু
সজল দুনয়ান।

শ্রীরঙ্গলাল রায়।

৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



স্বর্গীয় রমাকান্ত রায়।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

প্রবাসী

"Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters."
"to look on noble forms
Makes noble thro' the sensuous organism
That which is higher."—*Tennyson.*

৬ষ্ঠ ভাগ। | শ্রাবণ, ১৩১৩। | ৪র্থ সংখ্যা।

জনসাধারণের শিক্ষা এবং জাতীয় সম্পদ ও উন্নতি।

প্রত্যেক মানুষেরই চোখে দেখিবার অধিকার আছে। চোখের আলো লাভ করিবার যেমন সকলেরই অধিকার আছে, জ্ঞানের আলোক লাভ করিবার অধিকারও তেমনই সকলেরই আছে; বরং বলিতে গেলে বেশী আছে। কারণ, অনেকে জন্মান্ধ হইয়া সংসারে আসে; কিন্তু তাহারাও জ্ঞানালোকে বঞ্চিত থাকিতে চায় না, তাহাদিগকেও শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানী করা উচিত ও করা যায়। সভ্যদেশমাত্রেই জন্মান্ধদিগেরও শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। অতএব কাহাকেও শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখা, তাহাকে তাহার জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখার নামান্তর মাত্র। সুতরাং ধনী দরিদ্র সকলেরই সন্তানবর্গ, প্রয়োজন হইলে বিনা ব্যয়ে, যাহাতে শিক্ষালাভ করিতে পারে, সর্ব্বত্র তাহার সরকারী বন্দোবস্ত থাকা উচিত। অনেকে ইহা সহজে স্বীকার করিবেন না। এই জন্য, শিক্ষার সহিত জাতি-বিশেষের সম্পদ উন্নতি, এমন কি বাঁচিয়া থাকার কি সম্পর্ক, তাহা দেখান প্রয়োজন।

সকলেই জানেন ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ, এবং প্লেগ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে লক্ষ লক্ষ লোক মারা পড়ে। তজ্জন্য ১৯০১ সালের লোকসংখ্যাগণনায় দেখা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের প্রধান অধিবাসী হিন্দুদের সংখ্যা দশ বৎসরে কোথায় বাড়িবে, না হাজারে ৩ জন কমিয়া গিয়াছে! এইরূপ ক্রমাগত লোকসংখ্যা কমিতে থাকিলে, আমরা কত দিন টিকিব?

দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ইত্যাদি। এ সকল স্বাভাবিক ব্যাপার এখনও মানুষের আয়ত্তের বাহিরে রহিয়াছে। কিন্তু আজকাল ঘোরতর দুর্ভিক্ষের সময়েও দেখা যায় যে, বাজারে ধান চালের বা গম যবাদির অভাব থাকে না। শস্য সকল দুর্মূল্য হয় মাত্র। সুতরাং গরিব লোকেরা অর্থাভাবে শস্য কিনিতে না পারিয়া মারা যায়। এই অর্থাভাবের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা যায় যে, পূর্ব্বে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোক শিল্পজীবী ছিল। দেশীয় অধিকাংশ শিল্প লোপ পাওয়ায় এখন ভারতের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী হইয়াছে*। কিন্তু চাষের উপযোগী জমীও আর বাড়িয়া চলিতেছে না। তা' ছাড়া সারের

* দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, সমগ্র বঙ্গে কর্ম্মক্ষম তাঁতি আছে ১০ লক্ষের উপর। কিন্তু তন্মধ্যে ২ লক্ষ ৭২ হাজার তাঁত চালাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

অভাবে উর্ব্বরা জমীও ক্রমশঃ অনুর্ব্বর হইতেছে। দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতা বশতঃ চাষীরা নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষও করিতে পারিতেছে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আগে যত লোক জমীর উপর নির্ভর করিত, এখন তার চেয়ে অনেক বেশী লোক জমীর উপর নির্ভর করিতেছে। তাহারাও আবার ভাল করিয়া চাষ করিতে পারিতেছে না। এমত স্থলে ঘোর দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী। এই দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। (১) কৃষির উন্নতি; (২) পুরাতন লুপ্ত শিল্পের যথাসম্ভব পুনরুদ্ধার ও নূতন নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন। প্রথমে চাষের কথা ধরা যাক্।

চাষীরা এখন এরূপ অজ্ঞ, জড়তাপন্ন ও অসাড় যে, চাষের যে উন্নতি হইতে পারে, তাহাদের চিরাগত প্রথা অপেক্ষা উন্নততর প্রণালী যে থাকিতে পারে, নূতন নূতন শস্য ফলমূলাদির চাষ যে হইতে পারে, তাহা তাহাদের কল্পনাতেও আসে না। সুতরাং প্রথমে তাহাদিগকে জড়তা ও অসাড় অবস্থা হইতে জাগাইতে হইবে; অন্যান্য জাতি চাষবাসের কিরূপ উন্নতি করিতেছে, তাহা তাহাদিগকে দেখাইতে ও দেখিতে সমর্থ করিতে হইবে; চাষে তাহারা অন্যান্য জাতিদের কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা তাহাদিগকে অনুভব করাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ে উন্নতির আশা জাগাইয়া দিতে হইবে। কেবল শিক্ষা দ্বারাই এইরূপ ফললাভের আশা করা যাইতে পারে। যদি তাহাদের মনের জড়তা দূর করা যায়, যদি তাহাদিগকে অসাড় অবস্থা হইতে জাগান যায়, যদি তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলেই তাহারা অভিনব উন্নত কৃষিপদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে। ৩৬ বৎসর হইতে গেল ১৮৭০ সালে গবর্ণমেণ্ট একটি কৃষিবিভাগ স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য—কৃষিবিষয়ে নূতন নূতন পরীক্ষা করা, ও কৃষিবিষয়ক জ্ঞানবিস্তার করা। কিন্তু অন্যান্য কারণের মধ্যে, চাষাদের অজ্ঞানতাবশতঃ এই বিভাগ হইতে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

ভারতবর্ষে কৃষির গুরুত্ব যে কত বেশী তাহা বলা যায় না; কারণ বার আনারও অধিক লোক কৃষিজীবী। সত্য বটে, পুরাতন শিল্পের পুনরুদ্ধার ও নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন দ্বারা কৃষিমাত্রোপজীবীর সংখ্যা না কমাইলে আমাদের জাতীয় দারিদ্র্য দূর হইবে না। কিন্তু আমাদের দুটি প্রধান শিল্প, কাপড় ও গুড় চিনি, কাঁচা মালের জন্য কৃষির উপরই নির্ভর করে। বাস্তবিক বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্যের মধ্যে কার্পাসসূত্র ও বস্ত্র এবং চিনিই প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানীয়।

উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মূল্য যে কিরূপ তাহা চিনির কারবারের ইতিহাস হইতে দেখান যাইতে পারে। আকের চিনির উৎপাদন ভারতবর্ষে স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বীট চিনির কারবার এই সে দিনের বলিলেও হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মার্‌গ্রাফ্ নামক বর্লিনের একজন ঔষধ-বিক্রেতা এক প্রকার শাদা বীটমূল হইতে ওজনের শতকরা ৬.২ অংশ এবং এক প্রকার লাল বীটমূল হইতে শতকরা ৪.৫ অংশ চিনি উৎপাদন করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক চেষ্টার কেমন শক্তি দেখুন; এখন জার্ম্মেনীতে শতকরা ১২.৭৮, ফ্রান্সে ১১.৬ এবং ইংলণ্ডে ১৫.৫ অংশ বীটচিনি পাওয়া যায়। ক্রমাগত ভাল ভাল বীট বাছিয়া উন্নত প্রণালীতে চাষ করিয়া ও উন্নত প্রণালীতে চিনি উৎপাদন করিয়া এইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। আক হইতে ওজনের শতকরা ১৮ অংশ চিনি পাওয়া যায়। তা' ছাড়া ১ পৌণ্ড (প্রায় আধসের) বীট চিনি প্রস্তুত করিতে এক পেনি (এক আনা) খরচ পড়ে; ১ পৌণ্ড আকের চিনি প্রস্তুত করিতে কিছু কম পড়ে। কিন্তু তথাপি বীটচিনির এসকল অসুবিধা সত্ত্বেও উভয় প্রকার চিনির কিরূপ দশা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে দেখুন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ বাদ দিয়া পৃথিবীর অন্যত্র যত চিনি ব্যবসায়ে হাত ফিরিয়াছে, তাহার কেবল শতকরা ৪.৩৫ অংশ ছিল বীট চিনি; ১৯০১ সালে কিন্তু বীটচিনি ৬৭.৬১ অংশ হইয়াছিল। বীট চিনির এরূপ উন্নতির কারণ এই যে উহার উৎপাদন ও ব্যবসায় উন্নতিশীল, বিজ্ঞানী ও উদ্যোগী জাতিদের হাতে আছে। জ্ঞানের ও উদ্যোগিতার এমনি শক্তি! কার্পাসসূত্র ও বস্ত্রের কথাও ধরুন। আমাদের দেশে পূর্ব্বে যে অতি সূক্ষ্ম ঢাকাই কাপড় প্রস্তুত হইত, তাহার জন্য কার্পাস এবং তাহা হইতে সূক্ষ্ম সূত্র এই দেশেই হইত। কিন্তু এখন ৪০ নম্বরের অপেক্ষা সূক্ষ্ম সুতা এদেশে হয় না, তাহার মত ভাল কাপাসও এদেশে জন্মায় না। আবার কার্পাস চাষের উন্নতি করিলে যে এদেশেই

সরু সুতার উপযোগী কার্পাস জন্মিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, আমরা চাষের যতই উন্নতি করি না কেন, বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা অনেক অধিকসংখ্যক লোকের শিল্প-জীবী হওয়া যে একান্ত আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা ভারতবর্ষ কখন ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারিবে না। কিন্তু প্রাচীন শিল্প সকলের উন্নতি এবং নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন করিতে হইলেও জনসাধারণকে তাহাদের জড়তা ও অসাড়তা হইতে জাগান প্রথমেই প্রয়োজন; তাহার পর নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার নূতন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে। অন্য দেশের প্রণালী ঠিক হুবহু আমাদের দেশে আমদানী করিলে সকল সময় আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে না। তা' ছাড়া নিত্য নিত্য নূতন প্রণালী সভ্যদেশসমূহে আবিষ্কৃত হইতেছে। এই জন্য আমরা যাহাতে পশ্চাতে পড়িয়া না যাই তজ্জন্য এক দল বৈজ্ঞানিক গবেষক ও আবিষ্কর্ত্তাও চাই। সুতরাং কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য যেমন একদিকে জনসাধারণের প্রাথমিক সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন, তদ্রূপ অন্য দিকে কতকগুলি লোকের সর্ব্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও আবশ্যক। বর্লিনের বিখ্যাত অধ্যাপক টিউজ তাঁহার একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে কৃষি, ছোট ছোট শিল্পের কারখানা, বড় কারখানা, বাণিজ্য, সকল বিষয়েই জনসাধারণের শিক্ষাই ভিত্তিস্বরূপ।*

কিন্তু এখানে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, পূর্ব্বে উল্লিখিত কারণ সকল ভিন্ন ভারতের দারিদ্র্যের আরও অনেক কারণ আছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। বাল্য বিবাহ ও স্ত্রীপুরুষ অর্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ, বিবাহ ও শ্রাদ্ধের সময় অপরিমিত ব্যয়, অদৃষ্টে বিশ্বাস বশতঃ ভারতবাসীদের উদ্যমহীনতা, পরস্পরে বিশ্বাসের অভাব, তজ্জন্য দল বাঁধিবার ও পরস্পরের সহযোগিতা করিবার শক্তির অভাব, এইহেতু যৌথকারবার প্রতিষ্ঠার দুঃসাধ্যতা, কারিগর ও মজুরদের মধ্যে সময়নিষ্ঠা, সততা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের অভাব, এবং তজ্জন্য তত্ত্বাবধানের (supervision) ব্যয়াধিক্য। এই সকল কারণেও যে ভারতবাসীরা আংশিক ভাবে দরিদ্র হইয়াছে ও রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সামাজিক রীতিনীতির সংস্কার, ধর্ম্মবিশ্বাস সংস্কার এবং জাতীয় চরিত্রের উন্নতি করিতে হইলেও জনসাধারণের শিক্ষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর কি আছে? সংস্কারের কথা শুনিয়া রক্ষণশীল লোকদেরও ভীত হওয়া উচিত নয়। কারণ, তাঁহাদের মতে শাস্ত্রানুগত্যই ত প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু শাস্ত্র না জানিলে সে ধর্ম্ম রক্ষা পায় কেমন করিয়া? আবার, শিক্ষা ব্যতিরেকে শাস্ত্রজ্ঞও হওয়া যায় না। অতএব সংস্কারক ও রক্ষণশীল, উভয়দলের লোকেরই জনসাধারণের শিক্ষা বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

অনেকে বলিবেন, সকলকে শিক্ষা দিলে মুটে মজুরের কাজ কে করিবে? উত্তর, লিখিতে পড়িতে জানে এমন লোকেরাই করিবে; যেমন আমেরিকায় ও জাপানে করে। যে শিক্ষায় মানুষ সকলপ্রকার শ্রমকে গৌরবজনক মনে করে, তদ্রূপ শিক্ষাই বাঞ্ছনীয়। একটু লেখা পড়া শিখিলেই যাহারা শারীরিক শ্রমকে অপমানকর মনে করে, তাহাদের উন্নতি কি প্রকারে সম্ভবে? আবার একদল বলিবেন, সকলে লেখাপড়া শিখিলে, ছোট লোকের বড় বা'ড় হইবে; তাহারা আমাদিগকে মানিবে না। ইহা অতি হেয় কথা। "ছোট" লোকেরা চিরকাল তোমাদের পা চাটিবে, এমন গর্হিত ইচ্ছা কেন কর? আর, বাস্তবিক যদি তোমরা সম্মানের যোগ্য হও, তাহা হইলে লেখা পড়া শিখিবার পরও সাধারণ লোকে তোমাদিগকে মানিবে। কিন্তু যদি তোমরা সম্মানের যোগ্য না হও, তাহা হইলে তোমাদের সম্মান না পাওয়াই ত ন্যায়সঙ্গত।

কিরূপ বিষে প্লেগ উৎপাদন করে, তৎসম্বন্ধে এখনও ডাক্তারদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু স্বার্থপর ইংরাজ রাজপুরুষগণ ছাড়া ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে ঘোর দারিদ্র্য ব্যতীত প্লেগ কোথাও হয় না, তিষ্ঠিতেও পারে না। এক সময়ে ইউরোপেও প্লেগের মড়ক হইত, কিন্তু এখন তথায় ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্লেগও তিরোহিত হইয়াছে। দশবৎসর পূর্ব্বে ভারতে প্লেগের আবির্ভাব হইয়াছে; ১৯০৫ সালের শেষ পর্য্যন্ত ইহাতে সরকারী গণনা অনুসারেই ৩৭

* "General education is the foundation and necessary antecedent of increased economic activity in all branches of national production, in agriculture, small industries, manufacture and commerce."

লক্ষ লোক মরিয়াছে। বাস্তবিক হয় ত আরও অনেক অধিক লোক মরিয়াছে। দারিদ্র্য ব্যতীত আরও একটা প্লেগের কারণ, জনসাধারণের স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জনসাধারণের শিক্ষা দ্বারা প্লেগের মড়কও অনেক কমিতে পারে।

আমরা উপরে সংক্ষেপে দেখাইয়াছি যে ভারতবাসীর আর্থিক, শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি শিক্ষাসাপেক্ষ। আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভও শিক্ষাসাপেক্ষ। আমরা যদি রাজনৈতিক উচ্চ অধিকারলাভ করিতে চাই, তাহা হইলে জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম ও বয়স নির্ব্বিশেষে স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেক ভারতবাসীকে হৃদয়ে গভীর স্বদেশ-প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কোন গবর্ণমেণ্ট যতই স্বেচ্ছাচারী হউক না কেন, তাহাকে একতায় বলীয়ান প্রকৃতিপুঞ্জের শক্তির নিকট শেষে পরাজয় স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু আমরা সার্ব্বজনিক শিক্ষা ব্যতীত দেশকে দেশ বলিয়া চিনিব কেমন করিয়া? দেশের স্বার্থের কাছে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থকে বলি দিব কেমন করিয়া? এক হইব কেমন করিয়া? বর্ত্তমান কালে সাধারণ লোকেরা এমন দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, এমন অজ্ঞ, যে তাহারা নিজ নিজ রাজনৈতিক অধিকারের বা দেশের মঙ্গলের কথা ভাবিতেও পারে না। এত দারিদ্র্যসত্ত্বেও, এত অজ্ঞতাসত্ত্বেও তাহারা পূর্ব্ববঙ্গে দেশের কল্যাণার্থ যে স্বার্থত্যাগ করিতেছে ও উৎপীড়ন সহ্য করিতেছে, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে তাহারা শিক্ষিত ও সচ্ছল অবস্থাপন্ন হইলে দেশের মঙ্গলের জন্য কিরূপে অবলীলাক্রমে প্রাণপাত করিতে পারে।

গবর্ণমেণ্টেরও সার্ব্বজনিক শিক্ষাকে ভয়ের চক্ষে দেখা উচিত নয়। কারণ আমরা দেখাইয়াছি, শিক্ষার পরোক্ষ ফল ধনবৃদ্ধি। দরিদ্র ও অশিক্ষিত প্রজাদের নিকট অপেক্ষা ধনী শিক্ষিত প্রজাপুঞ্জের নিকট গবর্ণমেণ্ট অধিক রাজস্ব পাইতে পারেন। শিক্ষায় শাসনকার্য্য অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ও অল্পব্যয়সাপেক্ষ করে। অশিক্ষিত প্রজাদের জন্য যত পুলিশ রাখিতে হয়, শিক্ষিত প্রজাদের জন্য তত রাখিতে হয় না। পুলিশাদির অনেক অত্যাচার জনসাধারণের অজ্ঞতার জন্যই হয়। তাহারা আইন বুঝিলে, নিজেদের অধিকার জানিলে, অধস্তন কর্ম্মচারীরা নিশ্চয়ই এত অত্যাচার করিতে পারিত না। সার্ব্বজনিক শিক্ষাতে বাস্তবিক অধস্তন রাজকর্ম্মচারীদের যোগ্যতা ও চরিত্রের উন্নতি হইবে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিলে, অনেক মহামারীকে আরম্ভেই সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ও নির্মূল করা যাইবে, অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটিতে পাইবে না। শিক্ষা বিস্তারে যে অপরাধের সংখ্যা কমে, তাহারও প্রমাণ দিতেছি। ১৮৯২ সালে গ্রেট-ব্রিটেনে ১২৫৮১ জন আসামী রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়। ১৯০১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও আসামীর সংখ্যা কমিয়া ১১৯২৪ হয়। ১৮৯২ সালে লণ্ডনে হাজার করা ৩·৩০৮ জন অভিযুক্ত হয়; কিন্তু জনসংখ্যার বহুল বৃদ্ধি সত্ত্বেও ১৯০১ সালে অভিযুক্তের সংখ্যা কমিয়া হাজার করা ২·৬১০ হয়।

যদি ভারতবর্ষের লোকে সকলেই প্রকৃত শিক্ষা পায়, তাহা হইলে তাহারা অধিকতর ধনী, বলবান ও স্বাধীন হয়; সুতরাং অধিকতর সন্তুষ্টও থাকে। প্রজাবর্গের সন্তোষ অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ উভয় হইতেই রাজ্যকে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ। এই জন্য দেখা যাইতেছে যে সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা দিলে গবর্ণমেণ্ট সেনার সংখ্যা অনেক কমাইয়া সৈনিক বিভাগের ব্যয় খুব কমাইয়া দিতে পারেন।

অদূরদর্শী ইংরাজেরা মনে করে যে, শিক্ষিত ভারত অপেক্ষা অজ্ঞ ভারতকে শান্তিতে ও নির্ব্বিবাদে দখলে রাখা অধিকতর সহজ। কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য নয়। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহী সিপাহীরা শিক্ষিত লোক ছিল না; এবং দাঙ্গা হাঙ্গামা শিক্ষিত লোকেরা করে না। কিন্তু অদূরদর্শী ইংরাজদের মত যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও তাহাদের ভুলা উচিত নয় যে, দাসের প্রভুও একপ্রকার দাস, স্বেচ্ছাচার উৎপীড়িতের যেরূপ ক্ষতি করে, স্বেচ্ছাচারীরও তদ্রূপ ক্ষতি করে। রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতন যুগের ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারা জানেন যে, অনুন্নত বা অবনত জাতিদের প্রভাবে তাহাদের শাসনকর্ত্তাদের কিরূপ অধোগতি হয়। অথবা অত দূরে যাইবারই বা প্রয়োজন কি? আসামের চা-বাগানের কুলিরা এক প্রকার ক্রীতদাস। তাহাদের প্রভু চা-করগণের নীতি চরিত্র অনেকস্থলে কিরূপ, তাহা কাহারও জানিতে বাকী নাই।

আর, ইংরাজ-রাজত্বও ত চিরস্থায়ী হইবে না। পার্থিব

কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং ভারতের উপর ইংলণ্ডের রাজনৈতিক প্রভুত্ব, আমাদের ক্রমশঃ স্বায়ত্ত শাসনের ইচ্ছা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শান্তিতে বিলুপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়; দমননীতির আতিশয্যে বিদ্রোহ ও রক্তপাতের দ্বারা ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধচ্ছেদ বাঞ্ছনীয় নহে। ইংলণ্ডের রাজত্ব একদিন যাইবেই যাইবে;—আমাদিগকে শিক্ষা দিলে ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিলে শান্তিতে সদ্ভাবে যাইবে; আমাদিগকে অজ্ঞ রাখিলে ও দমন করিলে বিদ্রোহে ও রক্তপাতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান হইবে।

এক্ষণে দেখা যাক্ গবর্ণমেণ্ট আমাদের প্রতি কর্ত্তব্য করিতেছেন কি না। ভারতে শতকরা ৯৫ জন নিরক্ষর। ভারতে সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রাম আছে। তাহার মধ্যে ৪ লক্ষেরও অধিক গ্রামে ইস্কুল পাঠশালা কিছুই নাই। অথচ এই সকল গ্রামের লোকেরাও অন্য লোকদের মত ট্যাক্স দেয়। নীচে একটি শিক্ষাবিষয়ক তালিকা দিতেছি। ইহা প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক এবং সংখ্যাগুলি আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের শিক্ষা কমিশনের ১৮৯৭, ১৮৯৮, ১৮৯৯ বা ১৯০০ সালের রিপোর্ট হইতে সঙ্কলিত। প্রথম স্তম্ভে দেশের নাম, দ্বিতীয়ে অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা কত জন পাঠশালে যায়, তাহার সংখ্যা, তৃতীয়ে শিলিং * ও পেনীতে * জনকরা প্রাথমিক শিক্ষার খরচ দেওয়া গেল।

সুইজারলণ্ড	২০·৭	৮শি ৫পে
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্	১৭·৭	৫শি
মার্কিন যুক্ত-রাজ্য	২০·৯	৯১শি
রুশিয়া	৩	৮পে
জাপান	৭·৮	১১পে
মিসর	২·১৭	জানা নাই
ভারত	১·৪	০·৮৩পে

ইহা অবশ্য সত্য যে ভারতবর্ষ ইউরোপ আমেরিকা অপেক্ষা গরীব; সুতরাং এখানে শিক্ষার ব্যয় পাশ্চাত্য দেশসমূহের মত অত বেশী করা যাইতে পারে না। কিন্তু, ভারতের উর্ব্বরা ভূমি, অপর্য্যাপ্ত খনিজ ঐশ্বর্য্য, এবং মিতব্যয়ী ও শ্রমপটু প্রজাপুঞ্জসত্বেও ভারত কাহার দোষে দরিদ্র, এ প্রশ্নের উত্তর না চাহিয়াও, আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি না যে, ভারতবর্ষে, অনুন্নত অসভ্য মিসর দেশের শত করা অর্দ্ধেক অপেক্ষাও কম ছাত্র ছাত্রী কেন পাঠশালায় যায় ভারতের দারিদ্র্য সম্বন্ধে আরও একটি কথা বক্তব্য আছে। এখানে আমরা যেমন গরীব, তেমনি অল্প পয়সায় শিক্ষকও ত পাওয়া যায়।

ইংরাজ রাজপুরুষেরা মাঝে মাঝে আমাদিগকে বলেন, তোমাদের আত্মমর্য্যাদা শিক্ষা করা উচিত; তোমরা কেন ভিখারীর মত বিনাপয়সায় বা প্রায় বিনা পয়সায় শিক্ষার জন্য চীৎকার কর? তদুত্তরে আমরা বলি, "মহাশয়েরা ত বিনামূল্যে শিক্ষা দেন না; শিক্ষাবিভাগের ও সমুদয় সরকারী বে-সরকারী শিক্ষালয়ের ব্যয়ের অর্দ্ধেকের উপর আমরা দিই। আর যদিই আমরা বিনাবেতনে শিক্ষা পাইতাম, তাহা হইলেও ত উহার ব্যয় মহাশয়দের ইংলণ্ডস্থ পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে নির্ব্বাহিত হইত না; আমাদেরই যে অর্থ ট্যাক্স স্বরূপ আদায় করা হয় তাহা হইতেই নির্ব্বাহিত হইত!" বাস্তবিক কিন্তু অবৈতনিক শিক্ষালাভে কোন অমর্য্যাদার কথা নাই। পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যতম ও ধনবত্তম দেশে আজ কাল সর্ব্বসাধারণকে বিনাবেতনে আইন দ্বারা বাধ্য করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার নীতি সমর্থিত ও কার্য্যে পরিণত হইতেছে। ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা সকলেই বিনাব্যয়ে পাইতে পারে। আমাদেরই দেশে অনেক দিন হইতে বড়োদা রাজ্যের কোন কোন গ্রামে প্রজারা এইরূপ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। এখন হইতে বড়োদা-রাজের সকল প্রজাই এই সুবিধা ভোগ করিবে। আমেরিকার যুক্ত-রাজ্য ধনে, আত্মনির্ভরে ও স্বাধীনতাপ্রিয়তায় কোন দেশ অপেক্ষা কম নয়। পাদটীকায় * আমরা

* শিলিং=বার আনা; পেনী=এক আনা।

* "The people of the United States spare no expense in providing the necessary free schools, where children can obtain elementary and secondary education of the best type." (p. 1) "The high schools being free, a large number of children pass into them from the grammar schools." (p. 3) "The free schools are largely used by all classes. The son of the wealthy man sits in the same class with the son of the labourer. In Washington, we saw the son of the President of the United States, two grandsons of the late President Garfield, and many children of Members of Congress sitting and working in the same classes as the children

মোজ্‌লী শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট হইতে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাহা হইতে পাঠকগণ দেখিবেন যে তথায় প্রাথমিক শিক্ষা ত বিনাব্যয়ে সকলকে দেওয়া হয়ই; অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধোবর্ত্তী উচ্চশ্রেণীর স্কুলের শিক্ষাও বিনাব্যয়ে সকলকে দেওয়া হয়। অবৈতনিক স্কুলসমূহে সামান্য মুটে মজুরের ছেলেদের সঙ্গে দেশপতির ছেলেও পড়ে। তাহাতে তাহার কোন অপমান হয় না। স্বাধীনচিত্ত মার্কিনদের যাহাতে আত্মমর্য্যাদার হানি হয় না, তাহাই ইংরাজ বাহাদুরেরা আমাদের আত্মমর্য্যাদানাশক বলিয়া প্রমাণ করিতে চান! এ চেষ্টা বৃথা। সোজা করিয়া বলিলেই হয়, যে, তোমাদিগকে শিক্ষা দিব না, কিম্বা আমাদের যে যেখানে আছে সকলকে মোটা বেতন দিয়া ও সৈন্যপোষণ করিয়া তোমাদিগকে শিক্ষাদিবার মত যথেষ্ট টাকা থাকে না।

যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট কিছু করুন আর নাই করুন আমরা যদি বাঁচিতে চাই ও উন্নতি করিতে চাই তাহা হইলে সকল স্ত্রী ও পুরুষকে শিক্ষা দিতে হইবে। জাপানে অধিকাংশ স্ত্রীপুরুষেরা লেখা পড়া জানে; তাই তাহাদের এত উন্নতি। শিক্ষা কিরূপ হইবে, স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষা একরকমের হইবে কি না, সে বিষয়ে একমত না হইলেও তত ক্ষতি নাই। প্রত্যেকেই নিজের নিজের মত অনুসারে জনসাধারণের শিক্ষার বন্দোবস্ত করুন। নানা প্রকারে শিক্ষা চলুক। একদল দারিদ্র্যব্রতধারী লোক জনসাধারণকে শিক্ষাদানই জীবনের কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করুন। প্রাতে মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় যখন সুবিধা হয় শিশুর, যুবার, প্রৌঢ়ের শিক্ষা চলুক। পুস্তক দ্বারা বক্তৃতা দ্বারা, যাত্রা কথকতা দ্বারা, ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা সর্ব্ববিধ উপায়ে শিক্ষা চলুক। তাহা হইলেই আমরা ভারতে নবযুগের সূত্রপাত দেখিতে পাইব।

---

of coachmen, gardeners, labourers, &c. Not the slightest difference is observed in regard to these children, they mix in the classes and playgrounds on terms of perfect equality." (p. 4).

বৈদিক সভ্যতা—কৃষিবিদ্যা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

সভ্যতা ক্রমবিকাশশীল। মানুষ সভ্যতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। আমাদিগের আদিম পূর্ব্বপুরুষগণ ফল মূল খাইয়া জীবনধারণ করিতেন। ইহার পরই মৃগয়ার যুগ; মৃগয়ালব্ধ মাংসই এ সময়ের প্রধান খাদ্য। সভ্যতার তৃতীয় স্তরে পশুপালনের যুগ। গো-মহিষ্যাদির দুগ্ধ ও মাংসই এ যুগের প্রধান আহার্য্য। কিন্তু যখন জনসংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং পূর্ব্বোক্ত উপায়ে জীবনধারণ করা আর সম্ভব হইল না, তখন মানবকে বাধ্য হইয়া কৃষিবিদ্যা উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল।

কৃষিবিদ্যার গৌরব।

কেহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "এ পর্য্যন্ত জগতে যাহা কিছু আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কি?"—আমি বলিব "কৃষিবিদ্যা"। সভ্যতার অপর সমুদয় চিহ্ন বিলুপ্ত হইলেও মানব ধরাপৃষ্ঠে বাস করিতে পারে, কিন্তু কৃষিবিদ্যা যদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, এই পৃথিবী অচিরাৎ শ্মশানে পরিণত হইবে। তুমি রাজচক্রবর্ত্তী, অতুল তোমার ঐশ্বর্য্য, সুসজ্জিত প্রাসাদে নিত্য অবস্থিতি, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় তোমার বিশ্রাম—আর আমি তোমার ক্রীতদাস। কিন্তু শস্যের অভাব হইলে তোমার আমার একই দশা। তুমি যাহাকে সভ্যতা বল, সে সভ্যতা কি তখন তোমার ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করিতে পারিবে? শুনিতে পাই ইংলণ্ড নাকি সভ্যতাতে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু ইংলণ্ডের মত পরমুখাপেক্ষী আর কে আছে? দেশে অন্ন নাই, কিন্তু অন্ন চাই। উপায় কি? ধন লইয়া আমেরিকাতে যাও—আমেরিকার বাজারে গমের ছড়াছড়ি। অষ্ট্রেলিয়াতে যাও—জাহাজ বোঝাই করিয়া মাংস ক্রয় করিয়া আনিবে। টাকা থাকিলে ডিমের জন্যও ভাবিতে হইবে না; অতি নিকটেই ফ্রান্স রহিয়াছে—স্পেনও দূরে নয়। কিন্তু দেশে অর্থ নাই, অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহারই বা ভাবনা কি? আসিয়াতে যাও—আফ্রিকাতে উপনিবেশ স্থাপন কর, জলে স্থলে, পথে ঘাটে

মাঠে এবং গৃহে গৃহে অর্থ পড়িয়া রহিয়াছে ; ইহার মালিক কেহ নাই—কুড়াইয়া লইয়া আইস। কিন্তু সবই ইংলণ্ডের নৌ-শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে দিন দিনই দেশের নৌ-শক্তি বৃদ্ধি করিতেছেন, ইহার একমাত্র কারণ অন্নাভাব ও অর্থাভাব। অন্ন বহন করিয়া আনিতে হইতেছে নৌ-শক্তির সাহায্যে, অন্নের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে হইতেছে নৌ-শক্তির প্রভাবে। আজ যদি ইংলণ্ড নৌ-যুদ্ধে পরাস্ত হয়, ইহার যুদ্ধ-জাহাজ যদি জলগর্ভে বিলীন হইয়া যায়, দেখিবে জগতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস হইতেও ইহার নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। বিদেশীয় অধিকার ইহার হস্তচ্যুত হইবে, বিদেশীয় বাণিজ্য অপরে কাড়িয়া লইবে, দেশে অন্নের অভাব হইবে এবং অধিকাংশ লোক অনাহারে মরিয়া যাইবে।

বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, নীতি বল—সমুদয়ই অন্নের উপর নির্ভর করিতেছে। অন্নের অভাবে ধার্ম্মিক লোকও পশু হইয়া যায়, জননীও সন্তান হত্যা করিতে পারে। মানুষের সুখসম্পদ সমুদয় কাড়িয়া লও, মানুষ বরং তাহা সহ্য করিতে পারে, কিন্তু মুখের গ্রাস যদি কাড়িয়া লও, সে তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। পর্ণকুটীরে বাস করিয়াও মানুষ মহাজ্ঞানী হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে অন্ন হইতে বঞ্চিত কর—দেখিবে, তাহার মনুষ্যত্ব চলিয়া গিয়াছে। এই জন্যই বলি কৃষিবিদ্যা অপেক্ষা কল্যাণকর—কল্যাণতর আর কিছুই নাই। কৃষিবিদ্যাকে অপসারিত কর, তোমার সভ্যতা চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে, সামাজিক বন্ধন পারিবারিক বন্ধন—সমুদয়ই ছিন্ন হইয়া যাইবে, তোমাদিগকে আবার সেই মৃগয়াকার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে, পশুযূথ লইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে হইবে। এখন ভাবিয়া দেখ, যাঁহারা স্বীয় প্রতিভাবলে ভূমিকর্ষণ বিদ্যা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন—জগৎ তাঁহাদিগের নিকট কত ঋণী। তাঁহারাই সমাজের পিতা, সমাজের ভিত্তি তাঁহারাই স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারাই আর্য্যগণকে বর্ব্বরতা হইতে প্রথমে সভ্যতার পথে আনয়ন করেন।

আর্য্য শব্দের অর্থ।

আজকাল 'আর্য্য' নামের মহিমা সকলেই ঘোষণা করিতেছেন ; "আমি আর্য্য নই"—একথা অনেকেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু 'আর্য্য' শব্দের মৌলিক অর্থ "কৃষক" বা "কৃষকসন্তান"। সংস্কৃত ব্যাকরণে এই শব্দকে "ঋ" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। 'ঋ' ধাতুর অর্থ গতিসূচক। কিন্তু অপরাপর আর্য্যজাতির ভাষায় ইহার অনুরূপ একটী ধাতু আছে তাহার অর্থ 'চাষ করা'। গ্রীক ভাষার 'অর্-ব' ধাতু, লাটিন 'অর্-ও' ধাতু, গথিক 'অর-গন্', ইংরাজী 'আর্', লিথুনিয়ান 'অর্-তি' আবেস্তার 'ইর্'—ইত্যাদি সমুদয় ধাতুর অর্থই "লাঙ্গল দ্বারা চাষ করা"। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণে "অর্" বলিয়া কোন ধাতু পাওয়া যাইতেছে না। সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে 'অর্' ধাতু প্রচলিত ছিল, কাল ক্রমে ধাতুটী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিম্বা ইহাও হইতে পারে যে 'অর্' ধাতু 'ঋ' ধাতুরই রূপান্তর মাত্র ; 'ঋ' ধাতুরই মৌলিক অর্থ "হলচালনা করা" এবং হলের গতি হইতেই "ঋ" ধাতুর গতিসূচক অর্থ প্রচলিত হইয়াছে। 'ঋ' ধাতুর উত্তর 'যৎ' প্রত্যয় করিলে 'অর্য্য' এবং ণ্যৎ প্রত্যয় করিলে 'আর্য্য' শব্দ সিদ্ধ হয়। বিভিন্ন ভাষার কৃষিবাচক ধাতুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় 'অর্য্য' এবং 'আর্য্য' উভয়েরই মৌলিক অর্থ কৃষক। সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণে ইহার পরোক্ষ প্রমাণও রহিয়াছে। 'অর্য্য' শব্দের একটী অর্থ বৈশ্য (পাণিনি ৩।১।১০৩) ; অর্য্যা ও অর্য্যাণী শব্দের অর্থ বৈশ্য জাতীয় স্ত্রীলোক এবং অর্য্যী শব্দের অর্থ বৈশ্য পত্নী (পাঃ ৪।১।৪৯ সিঃ কৌমুদী)। বাজসনেয় সংহিতা ও (১৪।২৮) তৈত্তিরীয় সংহিতাতে (৪।৩।১০।১) চারি জাতির এই নাম দেওয়া হইয়াছেঃ—ব্রহ্মণ, ক্ষত্র, অর্য্য ও শূদ্র।

এখানেও বুঝা যাইতেছে 'অর্য' অর্থ বৈশ্য। সকলেই জানেন কৃষিই প্রাচীন বৈশ্যদিগের একটী প্রধান কার্য্য ছিল। সুতরাং 'অর্য্য' অর্থ কৃষক—ইহা বলা অযৌক্তিক নহে। কেহ কেহ বলেন 'অর্য' অর্থ কৃষক এবং 'আর্য্য' শব্দের অর্থ কৃষক-সন্তান। ঋগ্বেদে ব্রহ্মন্ শব্দের একটা অর্থ মন্ত্রকৃৎ; এই ব্রহ্মন্ হইতেই ব্রাহ্মন্ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। যিনি ব্রহ্মন্ অর্থাৎ মন্ত্রকর্ত্তার পুত্র তিনিই ব্রাহ্মণ। বিশ্ শব্দের একটী অর্থ মানব; এই বিশ শব্দ হইতেই 'বৈশ্য' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে এবং বৈশ্য শব্দের অর্থ মানব সন্তান। এই নিয়মানুসারে বলা যাইতে পারে "আর্য্য" অর্থ 'আর্য্যপুত্র' অর্থাৎ কৃষক সন্তান। আর্য্য শব্দের অর্থ কৃষকই হউক বা

কৃষকসন্তানই হউক, ফলে দাঁড়াইল একই। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত এই 'আর্য্য' শব্দ কৃষকবাচক।

কিন্তু ইহাতে লজ্জিত হইবার কিছুই নাই। প্রত্যেক সমাজেই এমন এক সময় উপস্থিত হয় যখন মৃগয়াদি ত্যাগ করিয়া অনেককেই জীবন ধারণের জন্য কৃষিকার্য্যে ব্রতী হইতে হয় এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় মহাত্মাগণও কৃষিকার্য্যকে গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করেন। নূতন প্রবর্ত্তন করিতে হইলেই নেতৃগণকেই পথ প্রদর্শন করিতে হইবে—নতুবা লোকে সে পথে চলিবে কেন? যাঁহারা কৃষিবিদ্যা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই স্বহস্তে হল চালনা করিতে হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই তাঁহারা অর্য্য বা আর্য্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৈদিক কৃষক।

বৈদিক ঋষিগণ ইঁহাদিগেরই বংশধর। প্রাচীন আর্য্যগণের ন্যায় যে মন্ত্রকৃৎ ঋষিগণও স্বহস্তে হল চালনা করিতেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ঋগ্বেদে "কৃষ্টী" ও "চর্ষণী" এই দুইটী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কৃষ্টী শব্দ ৫২ বার এবং চর্ষণী শব্দ ৫৯ বার ব্যবহৃত হইয়াছে। কৃষ্টী অর্থ কৃষক এবং চর্ষণী অর্থ চাষা; কিন্তু বেদে ইহাদিগের অর্থ মানুষ। যাস্ক, সায়ণ এবং অন্যান্য সমুদয় বেদাচার্য্যগণই এই মত পোষণ করেন। নিম্নোদ্ধৃত ঋঙ্মন্ত্র পাঠ করিলেও ইহার সত্যতা প্রতীয়মান হইবে।

১। বজ্রবাহু ইন্দ্র স্থাবর, জঙ্গম, শান্ত পশু ও শৃঙ্গী পশুদিগের রাজা। তিনি মনুষ্যগণের (চর্ষনীনাম্) রাজা হইয়া বাস করিতেছেন। ১।৩২।১৫।

২। যিনি মনুষ্যগণের (চর্ষনীনাম্) একমাত্র প্রভু তাঁহাতে আমাদের স্তুতি প্রবিষ্ট হউক। ১।১৭৬।২।

৩। হে ইন্দ্র! মনুষ্যগণ (চর্ষণয়ঃ) বিবিধ বাক্য দ্বারা তোমাকে আহ্বান করে। ৬।৩৩।২।

৪। ইন্দ্র জঙ্গম ও মনুষ্যগণের (চর্ষনীনাম্) রাজা, পৃথিবীতে নানা প্রকারের যে ধন আছে, তিনি তাহারও রাজা। ৭।২৭।৩।

৫। আমাদিগের সোম তোমার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে এবং লোক সমূহ (কৃষ্টয়) তোমাকে নমস্কার করিতেছে। ৭।৩১।৯।

৬। আবর্ত্তমান চক্র যেমন অশ্বের পশ্চাৎ গমন করে তেমনি মনুষ্যগণের (চর্ষনীনাম্) স্তুতিতে প্রীত হইয়া আমাদিগের নিকটে আইস। ৪।৩১।৪।

৭। মনুষ্যগণ (চর্ষণয়ঃ) যজ্ঞ দ্বারা তোমার পূজা করে। ৬।২।২।

৮। হে আহ্বানযোগ্য ইন্দ্র! তুমি মনুষ্যগণের (কৃষ্টীনাম্) হব্যের নিকট আগমন কর এবং অভিষুত সোম পান কর। ৮।৩২।১৭।

৯। মনুষ্য প্রজাগণ (চর্ষণয়ঃ) সেই ইন্দ্রকে অর্চ্চমন্ত্র দ্বারা, সাম মন্ত্র দ্বারা এবং গায়ত্র মন্ত্র দ্বারা বর্দ্ধিত করে। ৮।১৬।৯।

১০। হে সোম! মানবসমূহ (কৃষ্টয়ঃ) যেন তোমার ব্রতে স্থিত থাকে। ৯।৮৬।৩৭।

১১। হে ইন্দ্র তুমি মহান্! যজ্ঞকর্ত্তাকে শীঘ্র রক্ষা কর। মনুষ্যগণ (কৃষ্টয়ঃ) তোমার মহদাশ্রয়ের বিষয় অবগত আছে। ১০।৫০।৫।

১২। যখন তোমার উপাসকগণ (চর্ষনয়ঃ মনুষ্যগণ) ভয়ে কম্পিত হয়, তখন তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিও। ৬।২৫।৭।

১৩। তুমি মনুষ্যদিগের ধারক ও তাহাদিগের মধ্যে সমিদ্ধ (কৃষ্টীনাম্ ধর্ত্তা উত মধ্যে সমিদ্ধ)। ৫।১।৬।

১৪। মানবগণের অধিপতি ইন্দ্রকে (রাজানম্চর্ষনীনাম্ ইন্দ্রং) স্তোতৃগণ প্রাচীন মন্ত্র দ্বারা স্তুতি করিয়াছিলেন। ৫।৩৯।৪।

১৫। মনুষ্যগণ (চর্ষনয়ঃ) তাহাকে বলকর স্তোত্র এবং (যজ্ঞাদি) কর্ম্ম দ্বারা পূজা করে। এই ইন্দ্রই ধনের কর্ত্তা। ৮।১৬।৬।

১৬। যিনি মানবগণের একমাত্র আহ্বান যোগ্য (য একঃ ইৎ হব্যঃ চর্ষনীনাম্) আমি সেই ইন্দ্রকে এই সমস্ত স্তোত্র দ্বারা স্তব করি। ৬।২২।১।

বাহুল্য ভয়ে আর অধিক স্থল উদ্ধৃত করা গেল না। যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেই নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইবে যে "কৃষ্টী" এবং "চর্ষণী" শব্দের অর্থ মানুষ। যে সমাজে কৃষক এবং চাষা বলিলে মানুষ বুঝায়, বুঝিতে হইবে সে সমাজের কৃষিই প্রধান কার্য্য। যদি বল উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ মানব নহে কৃষক অর্থেই এই দুটী কথা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে "বেদ চাষার গান"। কারণ উদ্ধৃত মন্ত্রসমূহে প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃষ্টী ও চর্ষণীগণ ঋঙমন্ত্র উচ্চারণ করে, যাগযজ্ঞ করিয়া থাকে, দেবোদ্দেশে আহুতি প্রদান করে এবং ইহারা দেবগণের বিষয় অবগত আছে। প্রকৃত কথা এই উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ মানব ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এ সমুদয় কথা হীনতাসূচক হইলে ইন্দ্রকে কখনই চর্ষণীদিগের রাজা বলিয়া সম্বোধন করা হইত না। কোন ব্রাহ্মণ কি কখন ইষ্টদেবতাকে দস্যু বা ম্লেচ্ছদিগের রাজা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে?

ঋগ্বেদে বিশ্বাঃ-কৃষ্টয়ঃ শব্দের অর্থ:—

১। সোম পান করিয়া সর্ব্ব মনুষ্য (বিশ্বাঃ কৃষ্টয়ঃ) যাঁহার নিকট কামনার বস্তু লাভ করে সেই মহান্ ইন্দ্রের স্তুতি কর। ৩।৪৯।১।

২। হে ইন্দ্র! তুমি লোক সমূহকে (বিশ্বাঃ কৃষ্টীঃ) ধন দান কর। ৪।১৭।৬।

ঋগ্বেদে দশবার "চর্ষণীধৃৎ" শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। ইহার অর্থ মনুষ্যগণের ধারণকর্ত্তা। বহু স্থলে দেবতাদিগকে "চর্ষণীনাম্ রাজা" ও "চর্ষণীনাম্ সম্রাট্" বলা হইয়াছে। অগ্নি মনুষ্যগণের যজ্ঞে হোতার কার্য্য করেন এই অর্থে যেমন

বলা হইয়াছে যে তিনি "জনানামহোতা" (৫।১৬।২ ; ৮।২০৩।৬ ইত্যাদি) তেমনি ইহাও বলা হইয়াছে যে তিনি "চর্ষণীনাম্ হোতা" (৮।২৩।৭ ; ৮।৬০।১৭ ইত্যাদি)। এখানেও দেখা যাইতেছে যে চর্ষণী শব্দাদির অর্থ—"জনসমূহ।"

ঋগ্বেদে পঞ্চকৃষ্টীঃ (৪।৩৭।১০ ; ১০।১১৯।৬), পঞ্চচর্ষণীঃ (৫।৮৬।২ ; ৭।১৫।২ ইত্যাদি), পঞ্চজনাঃ (২।৫৯।৮) পঞ্চ মানুষঃ (৮।৯।২) ইত্যাদি শব্দের বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যাস্কের মতে এ সমদয়ের অর্থই মানুষ। আর্য্যজাতি পঞ্চনদে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এই জন্যই ইহাদিগকে "পঞ্চ স্থানের লোক" বলা হইয়াছে। বেদে যেমন সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ আছে (১।৩৫।১২ ইত্যাদি), তেমনি "সপ্তমানুষ" শব্দও পাওয়া যায় (৮।৩৯।৮)। সপ্ত নদী বিশিষ্ট দেশের নাম সপ্তসিন্ধু; এই দেশবাসী লোকের নাম "সপ্ত মানুষ।" তেমনি পঞ্চকৃষ্টি কিম্বা পঞ্চচর্ষণীর অর্থও পঞ্চনদবাসী লোক। সুতরাং নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে কৃষ্ট্যাদি শব্দের অর্থ মানুষ। কৃষক এবং চাষার অর্থ যখন মানুষ তখন বুঝিতেই হইবে যে ঋগ্বেদের সময়ে কৃষিকার্য্যই সকলের উপজীবিকা ছিল।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

কৃষিকার্য্য করিবার জন্য ঋগ্বেদে স্পষ্ট উপদেশই দেওয়া হইয়াছে।

"অক্ষৈঃ মা দিব্যঃ। কৃষিং ইৎ কৃষস্ব" পাশা খেলিও না কৃষিকার্য্য কর। ১০।৩৪।১৩।

ঋষিগণ যে স্বহস্তে শস্যকর্ত্তনাদি করিতেন তাহারও প্রমাণ আছে :—

হে ইন্দ্র! আমি তোমার আশাতেই হস্তে দাত্র (—কাস্তে) ধরিলাম। পূর্ব্বে যে যব ছিন্ন হইয়াছে বা সংগৃহীত হইয়াছে তাহা দ্বারা মুষ্টি পূর্ণ কর। ৮।৭৮।

নিম্নলিখিত সূক্তে কৃষিকার্য্য সূচক অনেক কথা পাওয়া যাইবে।

হে সখাগণ! উদ্বুদ্ধ হও। তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর।......আনন্দদায়ক স্তোত্র রচনা করিয়া উচ্চারিত কর। অরিত্র সহযোগে পার হওয়া যায় এরূপ নৌকা প্রস্তুত কর। আয়ুধ সমুদয় (সীরযুগ ইত্যাদি—সায়ণ) প্রস্তুত ও অলঙ্কৃত কর। হে সখাগণ! পূর্ব্বে যজ্ঞ সম্পাদন কর। হল যোজনা কর; যুগগুলি বিস্তারিত কর। এই স্থলে লাঙ্গল পদ্ধতি প্রস্তুত হইলে বীজ বপন কর। স্তব দ্বারা আমাদিগের অন্ন পরিপূর্ণ হউক। সৃণিগুলি (—কাস্তে) নিকটবর্ত্তী পক্ক শস্যে পতিত হউক। বুদ্ধিমানগণ লাঙ্গল যোজনা করিতেছেন। দেবগণের নিকট সুখপ্রার্থী হইয়া ধীরগণ যুগসমূহ পৃথকরূপে উভয় দিকে বিস্তারিত করিতেছেন। পাত্র সুসজ্জিত কর, বরত্রা (—চর্ম্মরজ্জু) দ্বারা বন্ধন কর। আমরা পরিপূর্ণ, অক্ষয়, সুসেচনযোগ্য গর্ত্ত হইতে জল সেচন করি। অশ্বগণকে প্রীত কর। সংগৃহীত ধান্য গ্রহণ কর। সুখে বহন করিতে পারে এমন রথ প্রস্তুত কর। এই কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য দ্রোণপাত্র এবং প্রস্তরময় চক্র রহিয়াছে।......ইহার জল মানবের পানের উপযুক্ত। এই জল সেচন কর। গোষ্ঠ প্রস্তুত কর; এই স্থানই মনুষ্যদিগের জলপানের উপযুক্ত। বহুল স্থূল বর্ম্ম সীবন কর। ১০।১০১।

ঋষিগণ কৃষিকার্য্যকে কি চক্ষে দেখিতেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত স্তোত্র হইতে প্রতীয়মান হইবে :—

আমরা বন্ধুসদৃশ ক্ষেত্রপতির সহিত ক্ষেত্র জয় করিব। তিনি আমাদিগের গো ও অশ্বকে পোষণ করুন। তিনি এই কার্য্যে আমাদিগকে সুখী করুন। হে ক্ষেত্রপতি, ধেনু যেমন দুগ্ধ প্রদান করে, তেমনি আমাদিগকে মধুযুক্ত জল প্রদান কর। সংশোধিত ঘৃতের ন্যায় মধুস্রাবী জল প্রদান কর। ঋতের স্বামীগণ আমাদিগকে সুখী করুন। ওষধী আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, দ্যৌ আপ ও অন্তরীক্ষ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, ক্ষেত্রপতি আমাদিগের জন্য মধুমান হউন। আমরা যেন অহিংসিত হইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পারি। বলীবর্দ্দ সুখে বহন করুক মনুষ্যগণ সুখে কার্য্য করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক, প্রগ্রহ সুখে বদ্ধ হউক এবং প্রতোদ সুখে প্রেরণ কর। হে শুন ও সীর, তোমরা এই স্তুতি সেবা কর। আকাশে যে জল সৃষ্টি করিয়াছ তাহা দ্বারা এই ভূমি সিক্ত কর। হে সীতা! তুমি অভিমুখে আগমন কর। তুমি আমাদিগকে সৌভাগ্যবান করিবে আমাদিগকে সুফল প্রদান করিবে, এই জন্য তোমাকে বন্দনা করিতেছি। ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন (কিম্বা গভীর করুন)। পূষা তাহার অনুগমন করুন (ইহাকে নিয়মিত করুন)। পয়স্বতী (শস্যদায়িনী) সীতা (লাঙ্গল পদ্ধতি) বৎসরের পর বৎসর শস্য দোহন (—উৎপন্ন) করুন। ফাল সকল সুখে কৃষিকর্ম্ম করুক। রক্ষকগণ বলীবর্দ্দের সহিত সুখে গমন করুক। পর্জ্জন্য মধুময় পয়ঃ (জল) দ্বারা সুখে ভূমি সিক্ত করুন। হে শুন ও সীর, আমাদিগকে সুখী কর। ৪।৫৭।

পূর্ব্বোক্ত সূক্তে শুন, সীর সীতা ইত্যাদিকে পূজা করা হইয়াছে। সুতরাং কৃষিকার্য্যকে ঋষিগণ কতদূর শ্রদ্ধা করিতেন তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

বৈদিক ঋষিগণ যে কৃষিকার্য্য করিতেন ইহাতে বোধ হয় আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সন্দেহ নির্ম্মূল করিবার জন্য বলা যাইতে পারে যে, উত্তর কালেও ঋষিগণ কৃষিকার্য্য করিতেন। মহাভারতে নিম্নলিখিত ঘটনাটি পাওয়া যায়।

"এ সময়ে আয়োদধৌম্য নামক এক ঋষি ছিলেন। উপমন্যু, আরুণি ও বেদ নামে তাঁহার তিন জন শিষ্য ছিল। একদিন ঋষি আরুণিকে আজ্ঞা করিলেন, "বৎস! কেদারখণ্ড বন্ধন কর"—"কেদার খণ্ডং বধান" অর্থাৎ ক্ষেত্রে গিয়া এইরূপে আলবাল খনন কর যাহাতে ক্ষেত্রের জল নির্গত না হইতে পারে। উপাধ্যায় কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আরুণি সেই স্থলে গমন করিলেন কিন্তু কেদারখণ্ড বন্ধন করিতে

পারিলেন না। এইরূপে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইল। তৎপর একটী উপায় নির্ণয় করিয়া ভাবিলেন ইহাই করিব। তিনি অবশেষে কেদারখণ্ডে শয়ন করিলেন এবং তাহাতে ক্ষেত্রের জল আর বহির্গত হইল না। মহাঃ আদি পর্ব্ব ৩।২১।২৪।

ইনিই আরুণি উদ্দালক ঋষি। ইনি শ্বেতকেতুর পিতা, যাজ্ঞবল্কের গুরু এবং উপনিষদের একজন বিখ্যাত ঋষি

উত্তর কালে জনকের ন্যায় খ্যাতনামা নরপতিও হল-চালনা করিতেন। রামায়ণে আছে ঃ—

অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।

আমি ক্ষেত্রকর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে লাঙ্গল পদ্ধতি হইতে (এক কন্যা) উত্থিতা হইয়াছিল। ক্ষেত্র শোধন করিতে করিতে সীতা অর্থাৎ লাঙ্গল পদ্ধতি হইতে, এই কন্যা লাভ হইয়াছিল এই জন্য ইহার নাম সীতা হইয়াছে। বালকাণ্ড ৬৬

জনকের সময়েও যখন নৃপতিগণ স্বহস্তে হলচালনা করিতেন, তখন বৈদিকযুগে রাজা প্রজা, পণ্ডিত মূর্খ সকলেই যে হলচালনা করিবেন তাহাতে বিচিত্র কি?

কৃষি শিক্ষা।

ঋষিগণের বিশ্বাস ছিল দেবগণই প্রথমে মানবকে এই বিদ্যা অর্পণ করিয়াছিলেন। কণ্বের পুত্র সোভরি ঋষি ঋগ্বেদের একস্থলে বলিতেছেন ঃ—

হে অশ্বিদ্বয়! মনুকে সাহায্য করিবার জন্য তোমরা দ্যুলোকে লাঙ্গল দ্বারা প্রথমে যব কর্ষণ করিয়াছিলে। যবম্ দিবি যবম্ বৃকেণ কর্ষথঃ।
৮।২২।৬।

অপর একস্থলে আছে ঃ—

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা মনুষ্যের জন্য লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ এবং তদনন্তর যব বপন করিয়া, অন্নদোহন করিয়া, কৃষিদ্বারা অন্ন উৎপন্ন করিয়া) এবং বজ্রদ্বারা দস্যুগণকে বিদরিত করিয়া আর্য্যজাতির জন্য বিস্তীর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছ।১।১১৭।২১।

হালের গরু

বৈদিক যুগে গরুর সাহায্যেই চাষ করা হইত। এ বিষয়ে একটী মন্ত্র পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে (৪।৫৭) অপরাপর স্থলেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৃষ যেমন ভূমি কর্ষণ করিলে যব বপন করা হয়।১।১৭৬।২।

ভূমিকর্ষক যেমন গোসমূহের স্তুতি করে তেমনি হে সোভরি! তুমি নূতন স্তোত্র দ্বারা মহাবলশালী মরুৎগণের স্তুতি কর ৮।২০।২৯।

যেমন গো দ্বারা বার বার ভূমি কর্ষণ করিয়া যব উৎপন্ন করা হয়, তেমনি তিনি পুনঃপুনঃ আমার জন্য সোম সহ সড়ঋতু আনয়ন করেন।
১।২৩।১৫

জলসেচন ও অনাবৃষ্টি।

জলশূন্য স্থানে বাসকরা অসম্ভব। পানীয় জলের সদা সর্ব্বদাই আবশ্যক। বিনা জলে শস্যাদি উৎপন্ন হয় না ঋষিগণ ইহাও অবগত ছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা সপ্তসিন্ধু প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই জন্যই সরস্বতীর এত প্রশংসা। সম্ভবতঃ জলের সুবিধার জন্য প্রথমে নদীর উপকূলেই ভূমি কর্ষণ করা হইত। বৈদিক আর্য্যগণ যে জলসেচন করিয়া ভূমি সিক্ত করিতেন তাহার প্রমাণ পূর্ব্বেই পাইয়াছি।

"আমরা পরিপূর্ণ অক্ষয় সুসেচনযোগ্য গর্ত্ত (অবত) হইতে জল সেচন করি। ১০।১০১।

অবত কিম্বা অবট শব্দের অর্থ কূপ কিম্বা ভূগর্ভস্থ কোন গহ্বর। জলের জন্য যে আর্য্যগণ কূপাদি খনন করিতেন ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ আছে।

গভীর গর্ত্ত খনন করা হইলে (খাতাঃ অবতাঃ) তাহাতে যেমন জল নিঃসৃত হয় তেমনি প্রস্তর দ্বারা অভিষুত মধু তোমার দিকে ক্ষরিত হইতেছে। ৫।৫০।৩

খাতাঃ অবতাঃ-- ইহার অর্থ "নিখাত কূপ কিম্বা জলাশয়।"

১।১০৫।১৭ ঋকে কূপশব্দেরও ব্যবহার দেখা যায় এবং দুইটী স্থলে (৫।৭৮।৭ ও ১০।১০৭।১০) পুষ্করিণীর উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান সময়ে আমরা কৃত্রিম জলাশয়কেই পুষ্করিণী বলিয়া থাকি। সংস্কৃত সাহিত্যে "কুল্যা" নামক একটা শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ খাল, নালা, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি। ঋগ্বেদেও (৩।৪৫।৩ ও ১০।৪৩।৭) এই কথাটী পাওয়া যায়। সায়ণের মতে ঐ সমুদয় স্থলে "কুল্যা" শব্দের অর্থ "কৃত্রিম সরিৎ"; বেদার্থ-যত্নকারও ঐ কথা বলেন। এই সমুদয় দেখিয়া মনে হয় ঋষিগণ জলের জন্য খাল ও তড়াগাদি খনন করিতেন। একটী স্থলে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে ঃ—

যে জল আকাশ হইতে পতিত হয়, যাহা খনিত্রে খাদিত প্রণালীতে প্রবাহিত হয় (খনি ত্রিমাঃ) যাহা স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া (নদীরূপে) সমুদ্রের অভিমুখে গমন করে, সেই শুচি ও পাবক অপ্ দেবী আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৭।৭০।২।

এখানে বৃষ্টির জল, কৃত্রিম প্রণালীর (খালের) জল এবং নদীর জলের কথাই বলা হইতেছে। "খনি ত্রিমাঃ" শব্দ হইতে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে অতি প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষে নালা কাটিয়া জল আনা হইত।

কিন্তু ঋষিগণকে প্রধানতঃ বৃষ্টির জলের উপরই নির্ভর করিতে হইত। বৃষ্টির জন্য বেদে বহুবার প্রার্থনা করা হইয়াছে। সময়ে সময়ে বৃষ্টির অভাবও হইত। নিরুক্ত ও বিষ্ণু পুরাণাদিতে লিখিত আছে যে, শান্তনু রাজার রাজ্যে এক সময়ে দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি হয় (শন্তনো রাজ্যে দ্বাদশ বর্ষাণি দেবো ন ববর্ষ—নিরুক্ত ২।১০।)। বৃষ্টির অভাবে দেশে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বৃষ্টির জন্য শান্তনু এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপি এই যজ্ঞের পুরোহিত নিযুক্ত হইলেন। এই উপলক্ষে দেবাপি যে সূক্ত রচনা করিয়া যজ্ঞে উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল :—

হে বৃহস্পতি। তুমি মিত্রই হও, বরুণ কিম্বা পূষাই হও, তুমি আমার জন্য দেবতাদিগের নিকট গমন কর। আদিত্যের সমভিব্যাহারেই হউক বা বসুগণ কিম্বা মরুৎগণের সঙ্গেই হউক, তুমি পর্জ্জন্যকে শান্তনুর জন্য বৃষ্টিবর্ষণ করাও। (বৃহস্পতি বলিলেন) হে দেবাপি! তোমার প্রেরিত দ্রুতগামী বিদ্বান্ দেবতা দূতরূপে আমার অভিমুখে আগমন করিয়াছে। (দেবাপি বলিতেছেন) হে বৃহস্পতি। আমার অভিমুখে আগমন কর। তোমার জন্য উজ্জ্বল স্তব উচ্চারণ করিব। হে বৃহস্পতি! তুমি আমাদিগের জন্য মুখে উজ্জ্বল বাক্য স্থাপন কর। ইহা যেন সুস্পষ্ট উচ্চারিত ও ক্ষমতাশালী হয়। ইহা দ্বারা শান্তনুর জন্য বৃষ্টি উৎপন্নকারী মধুময় রস আকাশ হইতে আগমন করুক। মধুময় রস আমাদিগের জন্য আগমন করুক। হে ইন্দ্র। সহস্র রথে বহন করা যাইতে পারে এমন বৃষ্টির জল প্রদান কর। (হে দেবাপি)। হোম কার্য্যে উপবেশন কর, যথাবিধি যজ্ঞ কর, হবির্দ্বারা দেবগণের পরিচর্য্যা কর। ঋষ্টিসেন পুত্র দেবাপি দেবতাদিগের জন্য স্তোত্র রচনা করিয়া হোমকার্য্যে উপবেশন করিলেন। তিনি ঊর্দ্ধস্থ সমুদ্র হইতে স্বর্গীয় বারি নিম্ন সমুদ্রাভিমুখে আনয়ন করিলেন। এই ঊর্দ্ধস্থিত সমুদ্রে দেবগণ কর্ত্তৃক জল নিরুদ্ধ হইয়াছিল। ঋষ্টিসেন সুত দেবাপি কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট ও সঞ্চালিত হইয়া বৃষ্টির জল শুষ্ক ভূমির অভিমুখে ধাবিত হইল। যখন দেবাপি শান্তনুর পুরোহিত রূপে হোমকার্য্যে বৃত হইয়া দীন ভাবে ধ্যান করিলেন, তখন বৃহস্পতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্তুতি অর্পণ করিলেন। দেবগণ ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং ইহাতে বৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছিল। হে অগ্নি। মানব সন্তান ঋষ্টিসেন দেবাপি পবিত্রভাবে তোমাকে সমিদ্ধ করিয়াছে। তুমি সমুদয় দেবগণের সহিত হর্ষযুক্ত হইয়া বৃষ্টি বর্ষণকারী পর্জ্জন্যকে প্রেরণ কর। প্রাচীন ঋষিগণ স্তুতি সহ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। হে সর্ব্বস্তুত অগ্নি। সমুদয় লোক তোমাকে যজ্ঞে আহ্বান করে। সহস্র সহস্র রথ পূর্ণ করিয়া আমরা তোমার জন্য (ঘৃত কাষ্ঠাদি) আনয়ন করিয়াছি। হে রোহিতাশ্ব অগ্নি। আমাদিগের যজ্ঞাভিমুখে আগমন কর। হে অগ্নি। এই নবনবতী সহস্র রথ বাহিত আহুতি। হে শূর। ইহা দ্বারা তোমার প্রাচীন শরীর বর্দ্ধিত কর। হে অগ্নি। বৃষভতুল্য ইন্দ্রের ভাগে নবতি সহস্র আহুতি অর্পণ কর। দেবযান পথ তুমি অবগত আছ। তুমি উল বংশোদ্ভব শান্তনুকে স্বর্গে দেবগণের মধ্যে স্থাপন কর। হে অগ্নি! শত্রুদিগের দুর্গম পুরী ধ্বংস কর। রোগ দূর কর; রাক্ষসগণকে অপসারিত কর। সুবিস্তীর্ণ আকাশস্থ এই সাগর হইতে আমাদিগের জন্য প্রভূত জল এই পৃথিবী পৃষ্ঠে বর্ষণ কর। ১০।৯৮।

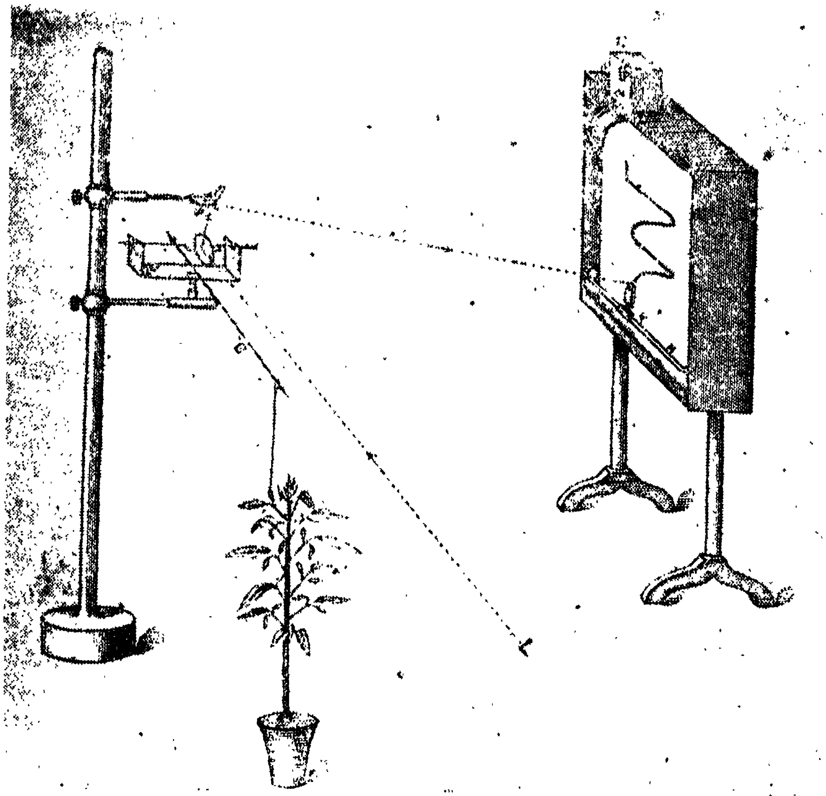
মহেশচন্দ্র ঘোষ।

উদ্ভিদের আঘাত অনুভূতি।

বনচাঁড়াল ও লজ্জাবতী প্রভৃতি কতকগুলি গাছে হাত দিলে বা তাহাদের উপর তাপ প্রয়োগ করিলে, ঐসকল গাছের ছোট ছোট পাতা গুটাইয়া আসে, এবং পাতার ডাঁটাও নামিয়া পড়ে। আম, জাম, নারিকেল প্রভৃতি গাছের এপ্রকার স্পর্শানুভূতি নাই। ইহা দেখিয়া জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এপর্য্যন্ত সমগ্র উদ্ভিদ জাতিকে সসাড় ও অসাড়, এই দুই শাখাজাতিতে ভাগ করিয়া আসিতেছিলেন। এই শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে লজ্জাবতী প্রভৃতি কয়েকটিমাত্র গাছ সসাড় শ্রেণীভুক্ত হয়। অবশিষ্ট সকলই অসাড়ের দলে গিয়া পড়ে।

আচার্য্যবর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়, তাঁহার সদ্যঃ প্রকাশিত "উদ্ভিদের সাড়া" (Plant-Response) নামক গ্রন্থে, পূর্ব্ববর্ণিত শ্রেণীবিভাগের ভুল দেখাইয়াছেন। ইনি প্রমাণ করিয়াছেন, যে হিসাবে লজ্জাবতী লতা সসাড়, আম, জাম ইত্যাদি যে কোন গাছও, ঠিক সেই হিসাবে সসাড়। কেবল ইহাই নয়, নানা আঘাত উত্তেজনায় প্রাণিগণ যে প্রকারে সাড়া দেয়, উদ্ভিদের সাড়া যে অবিকল তদ্রূপ, আচার্য্য বসু মহাশয় নানা পরীক্ষায় তাহাও প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন।

লজ্জাবতী লতা যেমন সসাড়, আমগাছও সেই রকমে সসাড়, একথাটা শুনিলে প্রথমে মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। সন্দেহ হইবারই ত কথা; তাপ বা আলোক প্রয়োগ করা দূরের কথা, লজ্জাবতীর ডালে একটু হাত লাগিলেই, তাহার পাতাগুলি বুজিয়া আসে। কিন্তু আমগাছে সহস্রবার ঝাঁকি দিলেও তাহার পাতা একটুও নামিয়া পড়ে না। অধ্যাপক বসু মহাশয় তাঁহার বর্ত্তমান আবিষ্কারে দেখাইয়াছেন, আঘাত উত্তেজনায় উদ্ভিদ ও প্রাণী মাত্রেরই দেহের ভিতর একই প্রকার ক্রিয়া হইয়া থাকে। লজ্জাবতী প্রভৃতি উদ্ভিদ অবস্থাবিশেষে পড়িয়া, ঐ সকল ক্রিয়ার যে ফল বাহিরে প্রকাশ করিতে পারে, আম, জাম গাছ ঠিক সেইরূপে তাহা পারে না বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে সেই ক্রিয়ার ফল ধরা পড়িয়া যায়। কোন প্রাণীকে নির্দ্দয়ভাবে আঘাত করিতে থাকিলে, সে হাত, পা ছুড়িয়া ও চীৎকার করিয়া বেদনা জ্ঞাপন করে। এখন উহার হাত, পা খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া, আঘাত করিতে থাকিলে তাহার আর হাত, পা ছুড়িয়া বেদনা



১ম চিত্র।

জানাইবার উপায় থাকে না। একমাত্র চীৎকারই তাহার বেদনা জ্ঞাপনের একমাত্র উপায় হইয়া দাঁড়ায়। আম, জাম ইত্যাদি গাছের হাত, পা যেন বাঁধা; তাই ইহারা আহত হইয়া বহু চেষ্টাতেও লজ্জাবতী লতার ন্যায় হাত, পা নাড়িয়া বেদনা জানাইতে পারে না। হাত, পা বাঁধা প্রাণীর বেদনার সাড়া যেমন তাহার চীৎকারে জানা যায়, স্বভাবতঃই হাত, পা বাঁধা গাছগুলির সাড়া সেই প্রকার অন্য উপায়ে জানা গিয়া থাকে।

পূর্ব্বে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায়, প্রাণীরা যেমন চীৎকার ও অঙ্গসঙ্কোচাদি দ্বারা আঘাতে সাড়া দেয়, উদ্ভিদও সেই প্রকার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ এই দুই প্রকারে সাড়া দিয়া থাকে। অপ্রত্যক্ষ সাড়া কোন যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া প্রথমে বুঝা অসম্ভব, কারণ চক্ষুকর্ণাদি স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা ধরা পড়ে না। প্রত্যক্ষ সাড়া সহজেই বুঝা গিয়া থাকে; কারণ পাতা ও ডগার উঠানামা চোখেই ধরা পড়িয়া যায়। কিন্তু সকল সময়েই কেবল চোখের দেখার উপর নির্ভর করিলে কাজ চলে না। কোন্ আঘাতে কতক্ষণে পাতা কতটা উঠিল নামিল, এবং কতক্ষণে ও কিপ্রকারে সেটি সেই আঘাতের ধাক্কা সাম্‌লাইয়া প্রকৃতিস্থ হইল, এ সকলের লেখাপড়া ও হিসাবপত্র করা খালি চোখের কাজ নয়। কাজেই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ উভয় সাড়াই ঠিক জানিবার জন্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের আবশ্যক। আচার্য্য বসু মহাশয় ইহার জন্য অনেকগুলি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। আমরা এখানে কেবলমাত্র দুই প্রকার সাড়া-অঙ্কন পদ্ধতির উল্লেখ করিব। আচার্য্য বসু মহাশয়ের আবিষ্কারগুলি বুঝিতে হইলে, কি প্রকারে সাড়া-লিপি অঙ্কিত হয় এবং লিপি দেখিবামাত্র কি প্রকারে সাড়ার প্রকৃতি বুঝা যায়, তাহা প্রথমে জানা আবশ্যক।

১ম চিত্র।

প্রথম চিত্রটি আচার্য্য বসু মহাশয়ের উদ্ভাবিত সাড়া অঙ্কনের একটি যন্ত্র। গাছের পাতা ও ডগা উঠানামা করিয়া

যে সাড়া দেয় ইহাদ্বারা সেগুলি সহজে লিপিবদ্ধ রাখা যাইতে পারে।

যন্ত্রের "B" চিহ্নিত অংশটি আলুমিনিয়ম্ বা অপর কোনও ধাতুর তার। এই তারের এক প্রান্ত গাছের পাতায় অতি সূক্ষ্ম রেশমী সূতা দিয়া সংযুক্ত আছে এবং অপর প্রান্তটি আর একটি তারে লম্বভাবে দৃঢ় সংযুক্ত করা হইয়াছে। এই শেষোক্ত তারে একটি গোলাকার ক্ষুদ্র দর্পণও সংলগ্ন রাখা হইয়াছে এবং যাহাতে ঐ দর্পণসহ দুইটি তার অনায়াসে খেলিয়া বেড়াইতে পারে, তাহারো ব্যবস্থা যন্ত্রে আছে।

"L" চিহ্নিত রেখাটি, একটি স্থির আলোক-রশ্মির পথ। এই আলোক প্রথমে সেই তারসংলগ্ন দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া, এবং পরে তাহার উপরকার আর একখানি স্থির গোলাকার দর্পণে পুনঃ প্রতিফলিত হইয়া, সম্মুখের সাড়া-অঙ্কন-যন্ত্রের কাগজে আসিয়া পড়ে। এই যন্ত্রাঙ্কিত সুদীর্ঘ কাগজখানিকে ফিতার মত গুটাইয়া রাখা হয়, এবং "C" চিহ্নিত ঘড়িকলের দ্বারা তাহাকে ইচ্ছানুরূপ দ্রুত বা ধীর-ভাবে খোলা হইয়া থাকে।

এখন মনে করা যাউক চিত্রের সূত্রসংলগ্ন গাছের পাতাটি যেন লজ্জাবতী লতার ন্যায় আপনা হইতেই নীচের দিকে নামিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, ইহাতে পাতা সংযুক্ত সূতার টানে সেই পূর্ব্ববর্ণিত দুইটি তার ও তৎসংলগ্ন দর্পণখানিকে আমরা নিশ্চয়ই চঞ্চল হইয়া পড়িতে দেখিব। কাজেই সেই দর্পণপ্রতিফলিত আলোকরশ্মিও দ্বিতীয় দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ার পর, সাড়া অঙ্কনের কাগজে চঞ্চল হইয়াই দেখা দিবে। পাতার উঠানামা না থাকিলে, "L" আলোকরশ্মিকে উক্ত দুই প্রতিফলনের পর কাগজে এক স্থির আলোক বিন্দুর আকারে দেখা যাইত; কিন্তু পাতা নামিয়া যাওয়ায় আমরা আলোকবিন্দুটিকে এক সরল পথে বাম হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে দেখিব।

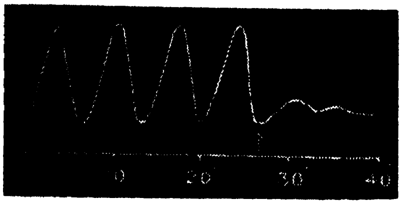
এখন মনে কর, আমাদের সেই পাতাটি উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ অবস্থায় সেই তার সংলগ্ন দর্পণখানি ঘুরিয়া আবার পূর্ব্বের স্থানে আসিতে আরম্ভ করিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফলিত আলোকবিন্দুও ইহার পূর্ব্বের পথে বাম হইতে দক্ষিণদিকে চলিতে আরম্ভ করিবে। কাজেই পাতার এই প্রকার উত্থান পতনে সাড়া অঙ্কনের কাগজের উপর আলোকবিন্দুটিকে আমরা এক সরল পথক্রমে ক্রমাগত বামে দক্ষিণে যাওয়া আসা করিতে দেখিব।

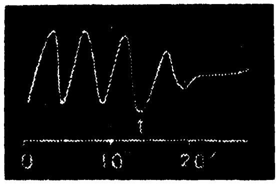
খাতার উপর পেন্‌সিলের মুখ রাখিয়া যদি সেটিকে ক্রমাগত বামে ও দক্ষিণে চালনা করা যায়, তাহা হইলে খাতায় একটা লম্বা দাগ পড়িয়া যায়। এখন মনে করা যাউক পেন্‌সিলের মুখ যখন বাম হইতে দক্ষিণে চলিতেছে, তখন খাতাখানিকে কেহ ধীরে ধীরে টানিয়া লইতেছে। বলা বাহুল্য, এপ্রকার অবস্থায় খাতায় কখনই পূর্ব্বের ন্যায় এক সরল দাগ পড়িবে না। এক নির্দ্দিষ্ট সরল রেখার স্থানে, খাতার উপরে স্রোতের ন্যায় এক আঁকা বাঁকা চিত্র অঙ্কিত হইয়া যাইবে। পূর্ব্ববর্ণিত যন্ত্রে সাড়া অঙ্কনের কাগজখানি যখন ঘড়িকলের দ্বারা খুলিতে আরম্ভ করিবে, বাম দক্ষিণ-গামী আলোকবিন্দুটি তখন আর কাগজের উপর সরল রেখা অঙ্কন করিতে পারিবে না; তাহার স্থানে উদাহৃত খাতার চিত্রের ন্যায় এক উঁচু নিচু বক্র রেখা অঙ্কিত হইয়া পড়িবে।

পেন্‌সিল যেমন খাতায় দাগ রাখিয়া যায়, আলোক-বিন্দু সাড়া লিপির কাগজে বক্র পথে চলিতে থাকিলেও তাহাতে কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় না। কাজেই আলোক-বিন্দুর পথ যাহাতে কাগজে স্থায়ী ভাবে অঙ্কিত হয়, তাহার উপায় আবশ্যক। আচার্য্য বসু মহাশয় সাধারণ কাগজের পরিবর্ত্তে যন্ত্রে ফোটোগ্রাফের কাগজ জড়াইয়া, আলোকের পথ স্থায়ী করিবার এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। আলোকবিন্দু যে পথে চলা ফেরা করে, ফোটোগ্রাফের কাগজে তাহার ছবি অঙ্কিত হইয়া যায়। পরে ফোটোগ্রাফির সাধারণ প্রক্রিয়ায় সেই ছবি ফুটাইয়া তুলিলে, কাগজে আলোকের পথ স্থায়ী রূপে অঙ্কিত হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় চিত্র।

চিত্রদ্বয় পূর্ব্ববর্ণিত যন্ত্রসাহায্যে প্রাপ্ত দুইটি সাড়ালিপি। বনচাঁড়াল গাছের পত্রবৃন্তকে আহত করায়, তৎসংলগ্ন পত্রটি নামিয়া পড়িয়া দ্বিতীয় চিত্রের বাম পার্শ্বের ঊর্দ্ধ রেখাটিকে সাড়া অঙ্কনের কাগজের উপর টানিয়াছিল। তার পর পাতাটি যখন যথাকালে প্রকৃতিস্থ হইয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল, পরবর্ত্তী নিম্ন রেখাটি আপনা হইতেই





২য় ও ৩য় চিত্র।

অঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে চিত্রের এক একটি চূড়াকার বক্ররেখা পত্রের উত্থান পতনের জ্ঞাপক; এবং কোন্ চূড়া অপরের তুলনায় ভূমি হইতে কত উপরে উঠিয়াছে জানিতে পারিলে, উভয় পাতার মধ্যে কোন্‌টি অধিক নীচে নামিয়াছিল, তাহা কেবল চিত্র দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা যায়।

চূড়াগুলির ভূমিকে সময় জ্ঞাপক রেখা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। একবার নামিয়া গিয়া পাতাটি যদি উঠিতে বিলম্ব করে, তবে সেই সময়ে লিপি অঙ্কন-যন্ত্রের সেই জড়ানো কাগজটার অনেকখানি খুলিয়া যাইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পাতার উত্থান পতন সূচক চূড়াটির ভূমিকেও খুব দীর্ঘ হইতে দেখা যাইবে।

দ্বিতীয় চিত্রে একটি পাতার চারি বার উত্থান পতনের ছবি অঙ্কিত আছে। প্রথম একবার নামিয়া যাওয়ার পর সম্পূর্ণ উঠিতে পাতাটি প্রায় আট মিনিট সময় ব্যয় করিয়াছিল। ছবির ভূমি রেখার সহিত প্রথম চূড়ার ভূমি তুলনা করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। চারিবারের নিয়মিত আঘাতে পত্রটি চারিবার নিয়মিত ভাবে সাড়া দিলে পর, তাহার বৃন্তের মূলে বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছিল। বিষযুক্ত হইয়া পাতাটি আর নিয়মিত সাড়া দিতে পারে নাই। দ্বিতীয় চিত্রের দক্ষিণ প্রান্তস্থ অংশটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, পাঠক পাতার বিষমৃত অবস্থার পরিচয় পাইবেন। সাড়া-লিপি-যন্ত্রের আলোক বিন্দু স্থির থাকিলে, যেমন সাড়ার কাগজে এক সরল দাগ পড়িয়া যায়, এখানেও প্রায় তদ্রূপ সরল দাগ সাড়া লিপিতে অঙ্কিত হইয়া গেছে।

তৃতীয় চিত্রটি বনচাড়াল গাছের সাড়া লিপি। তিন বারের নিয়মিত আঘাতে, পাতাটি তিনবার নিয়মমত উঠা নামা করিয়াছিল। তৃতীয় বার উঠার শেষে আচার্য্য বসু মহাশয় তাহার ভিতর দিয়া প্রবল বিদ্যুৎ প্রবাহ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাজেই তখন পাতা মৃতপ্রায় হইয়া গিয়া, আর সাড়া দিতে পারে নাই। তৃতীয় চিত্রের দক্ষিণ প্রান্তস্থ অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, উহার মৃত্যুরেখা স্পষ্ট দেখা যাইবে।

বাহিরের আঘাত উত্তেজনায় প্রাণিগণ যে সকল প্রত্যক্ষ সাড়া দেয়, তাহা জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ পূর্ব্বের অনুরূপ পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ রাখিয়াছেন। কিন্তু উদ্ভিদ অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারেও যে প্রাণীরই মত সাড়া দিতে পারে, তাহা এপর্য্যন্ত কোন জীবতত্ত্ববিদের মনে হয় নাই। ৪র্থ চিত্রটি ভেকের পেশী বিশেষের সাড়া লিপি। নিয়মিত আঘাতে পেশীটি আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া কি প্রকার নিয়মিত সাড়া দিয়াছিল, পাঠক চিত্রদৃষ্টে সহজে বুঝিতে পারিবেন। চিত্রের শরচিহ্নিত (Arrow marked) অবস্থায় সাড়া দেওয়ার পর, পেশীতে বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছিল। ইহাতে তাহার সসাড়তা ক্রমে কি প্রকারে কমিয়া আসিয়াছিল, চিত্রের দক্ষিণ প্রান্তস্থ ক্রমনিম্ন চূড়াগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

চতুর্থ চিত্র।

এই ত গেল প্রত্যক্ষ সাড়া অঙ্কনের কথা। আচার্য্য বসু মহাশয় অপ্রত্যক্ষ সাড়া অঙ্কনের কি উপায় করিয়াছেন



৪র্থ চিত্র।

এবং তাহার অস্তিত্বই বা কি প্রকারে বুঝিয়াছেন, এখন দেখা যাউক। দেহের আকুঞ্চন প্রসারণ ও পাতার উঠানামা

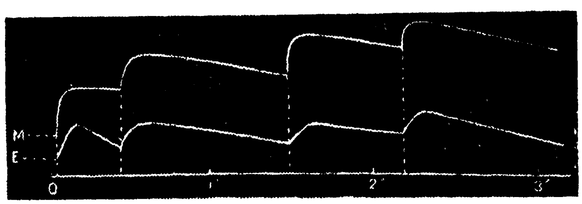
দ্বারা প্রাণী ও উদ্ভিদে যে প্রত্যক্ষ সাড়া দেয়, পূর্ব্ববর্ণিত যন্ত্রে পাতিত আলোকের বিচলন দ্বারা তাহা বেশ লিপিবদ্ধ করা চলে। কিন্তু যখন আঘাত পাইয়া উদ্ভিদ নড়িয়া চড়িয়া অনুভূতি প্রকাশ করিতে পারে না, তখন তাহা জানিবার উপায় কি?

আচার্য্য বসু মহাশয় এই অপ্রত্যক্ষ উত্তেজনা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বিদ্যুতের সাহায্যগ্রহণ করিয়াছেন। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, জীবদেহের কোন অংশে আঘাত দিলে, আহত স্থান হইতে সুস্থ স্থানের দিকে আপনা হইতেই একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটিতে থাকে। আঘাত যতই গুরু হয় প্রবাহও তত প্রবল হইয়া দাঁড়ায় এবং আহত স্থান ক্রমে সুস্থ হইতে আরম্ভ করিলে, প্রবাহের মাত্রাও ক্রমে কমিয়া আসিয়া একেবারে লোপ পাইয়া যায়। যে সকল বৃক্ষ প্রত্যক্ষ সাড়া দিতে পারে না, তাহাতেই যে কেবল এই বৈদ্যুতিক সাড়া দেখা যায়, একথা পাঠক মনে করিবেন না। আহত জীব মাত্রেরই অঙ্গে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিদ্যুৎ পরিচালিত হইয়া থাকে। কাজেই যে সকল উদ্ভিদ প্রত্যক্ষ সাড়া দেয়, তাহাতে এই সাড়া ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত অপ্রত্যক্ষ বৈদ্যুতিক সাড়াও দেখা গিয়া থাকে।

ভূমি-আম্‌লা (Biophytum)* লজ্জাবতীজাতীয় এক প্রকার ছোট গাছ। লজ্জাবতীরই মত এই গাছগুলি বাহিরের আঘাত উত্তেজনায় প্রত্যক্ষ সাড়া দেয়। পঞ্চম চিত্রটি ঐ গাছের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সাড়ার ছবি। বাহিরের আঘাতে ডালপালা নামাইয়া উঠাইয়া গাছটি যে প্রত্যক্ষ সাড়া দিয়াছিল, চিত্রের "M" চিহ্নিত বক্র রেখাটি দ্বারা তাহা সূচিত হইতেছে, এবং সেই একই আঘাতে কেবল বৈদ্যুতিক প্রবাহের হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া, সেটি যে অপ্রত্যক্ষ সাড়া দিয়াছিল তাহা "E" চিহ্নিত অংশে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পাঠক এবার চিত্রখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উভয় সাড়ার একতা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। খুঁটিনাটি সকল বিষয়েই উভয়ের অবিকল মিল রহিয়াছে। সুতরাং এস্থলে ঐ দুইটি সাড়াকে একই আঘাতজাত উত্তেজনার দুইটি স্বতন্ত্র বিকাশ না বলিয়া থাকা যায় না। লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করিলে তাহার পাতা গুটাইয়া আসে, কিন্তু আমের গাছে হাত দিলে তাহার পাতা বুঁজিয়া আসে না,—অতএব কেবল লজ্জাবতী লতারই আঘাত অনুভূতি আছে, এখন আর এ প্রকার যুক্তি প্রয়োগ করা চলে না। লজ্জাবতী লতা কোন আঘাত পাইলে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ এই উভয়বিধ সাড়াতেই তাহার উত্তেজনা ব্যক্ত করে, এবং আমবৃক্ষ কেবল অপ্রত্যক্ষ বৈদ্যুতিক সাড়াতে অনুভূতি জানায়; উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই টুকু মাত্র আঘাতানুভূতি কেবল লজ্জাবতীর নিজস্ব নয়, আম কাঁটাল প্রভৃতি বৃক্ষমাত্রেই এই ধর্ম্মটি পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান আছে।

৫ম চিত্র।

আঘাত উত্তেজনায় উদ্ভিদ সকল যে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সাড়া দিয়া থাকে, আচার্য্য বসু মহাশয় তাহার মূল কারণ আবিষ্কার করিবার জন্য অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন। এই গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে— জীবদেহ আঘাত পাইলেই তাহার আহত অংশের সুবিন্যস্ত অণুসকল বিকৃত হইয়া পড়ে, এবং সেই বিকারের গ্রাস হইতে মুক্তি পাইবার জন্য প্রত্যেক অণুরই একটা চেষ্টা দেখা যায়। প্রাণী ও উদ্ভিদের সকল প্রকার সাড়াই এই আণবিক বিকারের ফল এবং এই বিকার হইতে মুক্তিলাভ করিলেই, তাহারা সাড়া রোধ করিয়া আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া দাঁড়ায়।



৫ম চিত্র।

উদ্ভিদ দেহের ভিতরকার আণবিক বিন্যাস বিকৃত হইলে বিকারের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই গুলির মধ্যে উদ্ভিদদেহস্থ কোষের ভিতরকার জলীয় অংশ বহির্গত হওয়া এবং আহত স্থান হইতে সুস্থ অংশের দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিচালন করাকে, আচার্য্য বসু আণবিক বিকারের প্রধান লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সুস্থ অব-

* Biophytum গাছ বীরভূম অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বন্য অবস্থায় দেখা যায়। এই গাছের যে বাঙ্গালা নামটি ব্যবহৃত হইল, তাহাই উহার প্রকৃত নাম কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

ন্যায় উদ্ভিদদেহের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোষগুলি জলপূর্ণ হইয়া স্ফীত থাকে। এ অবস্থায় তাহাতে আঘাত করিলেই আণবিক আকার পরিবর্ত্তন দ্বারা সেই জল সজোরে বাহির হইয়া দেহের অভ্যন্তরে ছুটিতে থাকে। কাজেই আহত অংশের কোষ-সকল সঙ্কুচিত হইয়া তৎসংলগ্ন ডালপাতাকে নামাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করে।

চেষ্টা ব্যতীত ফললাভ হয় না সত্য, কিন্তু চেষ্টামাত্রকেই সকল সময় সফল হইতে দেখা যায় না। উদ্ভিদদেহের কোষসকল জলহীন হইয়া যখন সঙ্কুচিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ডালপালাকেও নামাইবার চেষ্টা করে সত্য, কিন্তু এই চেষ্টার সফলতা লজ্জাবতী ইত্যাদি কয়েকটি উদ্ভিদ ব্যতীত অপর কোন গাছে স্পষ্ট দেখা যায় না। লজ্জাবতীর দেহের গঠন ও বিশেষ বিশেষ দুই একটি অঙ্গ ঐ চেষ্টার সহায়তা করে। কিন্তু আম ইত্যাদি গাছে ঐ প্রকার স্বাভাবিক সুব্যবস্থা না থাকায়, আণবিক চেষ্টা সেখানে ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রত্যেক আঘাতে সকল গাছই যে লজ্জাবতী লতার ন্যায় আণবিক বিকারগ্রস্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা সকলেরই যে আণবিক অবস্থা একই প্রকার হইয়া দাঁড়ায়, তাহা আমরা বিকারের দ্বিতীয় লক্ষণ অর্থাৎ বিদ্যুতের উৎপত্তি দেখিয়া জানিতে পারি।

আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সজীব ও নির্জীবের সাড়ার একতা প্রদর্শন করিয়া, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক জগতে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, পাঠক পাঠিকাগণ অবশ্যই তাহার কথা শুনিয়াছেন। সেই সময়ে তিনি বৈদ্যুতিক সাড়া অবলম্বন করিয়াই তাঁহার আবিষ্কার-গুলিকে দাঁড় করাইয়াছিলেন। উদ্ভিদের বৈদ্যুতিক সাড়া লইয়া, এপর্য্যন্ত কোন পণ্ডিতই বিশেষ গবেষণা করেন নাই, কাজেই কয়েকজন ইংরাজ জীবতত্ত্ববিদ্ কেবল বৈদ্যুতিক প্রমাণে বসু মহাশয়ের আবিষ্কারে বিশ্বাসস্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ বলিয়াছিলেন,—আবিষ্কারক মহাশয় যতদিন চিরাগত প্রত্যক্ষ সাড়া দ্বারা তাঁহার সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিতেছেন, তত দিন তাহাতে কেহই বিশ্বাসস্থাপন করিবে না। এই অন্ধ পণ্ডিতগণের ভ্রম দূর করিবার জন্য অধ্যাপক বসু মহাশয় তাঁহার বর্ত্তমান গবেষণাগুলিতে কেবল মাত্র প্রত্যক্ষ সাড়া দিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যে সকল ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করিয়া জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এপর্য্যন্ত বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া আসিতেছিলেন, আচার্য্য বসু মহাশয়ের এই নূতন আবিষ্কার-বিবরণ প্রচারিত হইলে, সেগুলিকে নিশ্চয়ই ত্যাগ করিতে হইবে।

লজ্জাবতীজাতীয় উদ্ভিদ ও সাধারণ উদ্ভিদের সাড়া-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অধ্যাপক বসু মহাশয় যে সকল নব তথ্যের সন্ধান পাইয়াছেন, পর প্রবন্ধে আমরা তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিব। উদ্ভিদদেহের গঠন কি প্রকার হইলে, তাহা প্রত্যক্ষ সাড়া দিবার অনুকূল হয়, এবং তাহাদের কোন্ অবস্থাই বা প্রত্যক্ষ সাড়া রোধ করে, তাহাও ঐ প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

চীনদেশে স্বদেশী

আজ কাল বঙ্গদেশে 'স্বদেশী' আন্দোলনের সময়ে চীনদেশে 'স্বদেশী' দ্রব্য সকল কি প্রকারে উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার কতকটা আলোচনা করিলে বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া বোধ করি। এদেশের সর্ব্বসাধারণ লোকে স্বদেশী দ্রব্যেরই ভক্ত এবং সেই জন্য কোটি কোটি লোকে স্বদেশী দ্রব্য উৎপন্ন এবং বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

চীনদেশে 'স্বদেশী' রক্ষার তিনটী প্রধান কারণ দেখা যায়। প্রথম কারণ এই যে চীন স্বাধীন জাতি, গবর্ণমেণ্ট জাতি রক্ষণশীল এবং বিদেশী দ্রব্যের প্রতি কুসংস্কারাপন্ন। দ্বিতীয় কারণ চীনা জাতির জাত্যভিমান ও বিদেশী লোকের প্রতি ঘৃণা। তাহারা মনে করে চীনাদের মত সুসভ্য, উন্নত জাতি আর নাই। তৃতীয় কারণ চীনদিগের স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশভক্তি। প্রায় বিগত একশতাব্দী যাবৎ বিদেশী বণিকগণ আপন আপন রাজশক্তির সাহায্যে নানা কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া ছলে বলে, কয়েকটী বন্দরে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইয়াছেন এবং তদ্দ্বারা চীন রাজ্যে বিদেশী দ্রব্য প্রচারের জন্য প্রভূত চেষ্টা হইতেছে। এই কারণে ক্যাণ্টন, সংঘাই, টিন্‌সিন, ফুচেও, চিফু, চুংকিং,

হাংকাও, টেঙ্গিয়ে প্রভৃতি স্থানে বিদেশী মালের আমদানি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। আমার বোধ হয় একশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের অবস্থা এবিষয়ে যেমন ছিল, বিদেশীয় মাল সম্বন্ধে এ দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সেই দশায় উপস্থিত হইয়াছে। খাস চীন রাজ্যের ১৮টী প্রদেশের মধ্যে এমন বহু সংখ্যক সহর আছে যথায় বিদেশী মালের আমদানি আদবেই নাই। ১০ বৎসর পূর্ব্বে টেঙ্গিয়ে বন্দরে বিদেশী মাল দৃষ্ট হইত না, কিন্তু আপার বর্ম্মার দমনের পর এবং এই স্থানে বিদেশী দ্বারা কাষ্টাম্ আফিস স্থাপনের পর বিদেশী মালের আমদানি বৃদ্ধি হইতেছে।

এ দেশে বিলাতী মালের মধ্যে থানের কাপড়, নানা প্রকার ছিট, সাবান, জাপানী দিয়াশালাই ও ছাতা, আমেরিকান সিগারেট, কেরাসিন তৈল ও ল্যাম্প ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমার বিশ্বাস কাগজ, কলম, কালি, দোয়াত প্রভৃতি লিখিবার সরঞ্জাম চীনদেশে চিরকালই স্বদেশী থাকিবে। তাহার কারণ যে ধরণে চীনা অক্ষর সকল লিখিত হয়, তাহা বিদেশী কাগজ, কলম ও কালিতে লিখিতে সুবিধা হয় না এবং লিখিলেও সুন্দর দেখায় না। চীনাদের লিখিবার কাগজ এত পাতলা ফিন্ ফিনে যে তাহার উপর আমাদিগের কলম চালাইবার সাধ্য নাই। ঐ কাগজ বিলাতী টিস্যু পেপার অপেক্ষাও পাতলা। উহার উপর সূক্ষ্মাগ্রবিশিষ্ট তুলি দ্বারা লিখিতে সুবিধা। আমাদের কালি ঐ কাগজের পক্ষে অতি পাতলা, লিখিলেই চুপসিয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরের পাটার উপর মসী-যষ্টি বা মসী-দণ্ড চন্দনের মত ঘর্ষণ করিয়া তবে তুলি (Brush) দ্বারা লিখিতে হয়। বিদেশী চিঠির খামও যে ইহারা কখনো ব্যবহার করিবে এমন বোধ হয় না।

একজন চীনাম্যানের মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত স্বদেশী পোষাকে ঢাকা এবং সেই মত একজন চীনা রমণীর অঙ্গে এক তিলও বিদেশী দ্রব্য প্রায় দৃষ্ট হয় না। তবে সৌখীন চীনা পুরুষ রমণীগণকে সময় সময় বিদেশী ছাতা ব্যবহার করিতে দেখা যায় এবং পকেট-ঘড়িও অবস্থাপন্ন লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে।

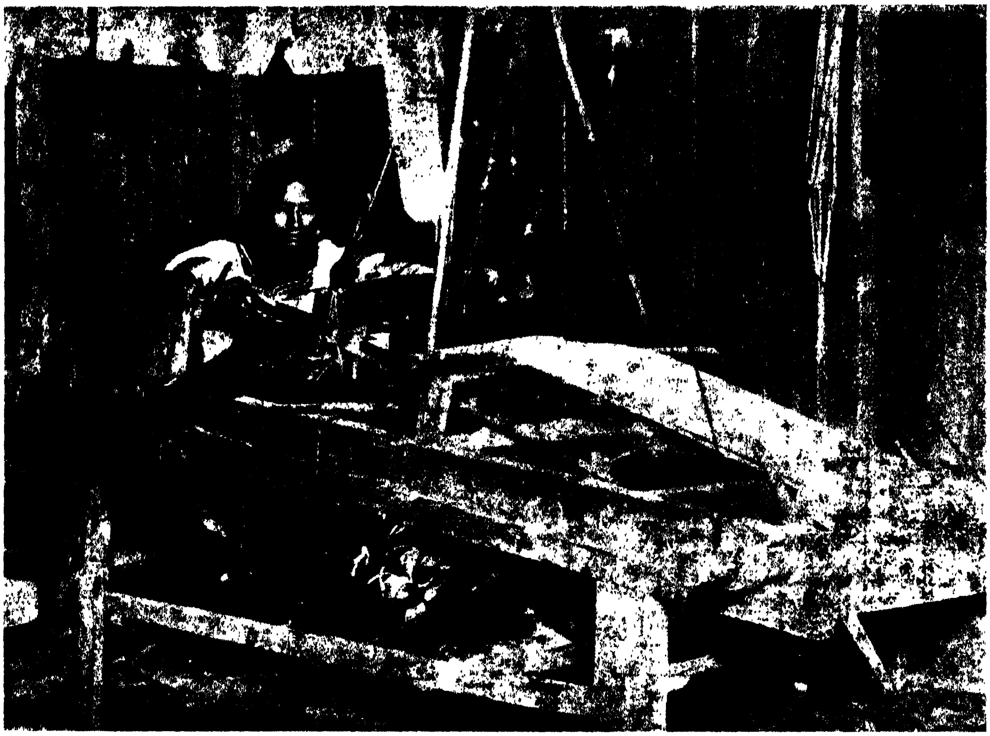
সর্ব্বপ্রথম এদেশে আসিবার পর চীনাদিগের মোটা কাপড়ের পরিচ্ছদ, কাপড়ের জুতা, মোটা কাপড়ের দ্বারা প্রস্তুত মোজা প্রভৃতি দেখিয়া আমার বিলাতী বুট ও বিলাতী পশমি কাপড়ের কোট পেণ্টালুন প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহাদিগকে হেয় জ্ঞান করিতাম; কিন্তু ক্রমে দেখিয়া শুনিয়া এবং বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়া অজ্ঞান অন্ধকার দূর হইয়াছে! এখন বুঝিতে পারিতেছি যে "জন্ চায়নাম্যান" আমাদিগ অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ ও কত সুখী! আমি এখানে আপাদমস্তক ইংরেজী পোষাকে ঢাকিয়া বসিয়া থাকি। চীনারা যাহারা বিদেশে কখনও যায় নাই, মনে করে আমাদিগের দেশের সকলেই বোধ করি এই প্রকার পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা আমাদিগের ঘরের খবর জানিতে পারিলে না জানি আমাকে কত ঘৃণার চক্ষে দেখিত। সিঙ্গাপুর, পেনাং, ব্রহ্মদেশ ও কলিকাতায় যে সকল চীনারা থাকে তাহাদের পোষাক খাস চীনদেশী পোষাক নহে। চায়নাম্যান বিদেশে যে পোষাক পরিধান করে, স্বদেশে ফিরিলে সেই পোষাক পরিধান করিয়া সমাজে মিশিলে সম্মান পায় না। খাস স্বদেশী পোষাক না ব্যবহার করিলে দেশে তাহারা উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে।

এদেশে নিত্য ব্যবহার্য্য কতকগুলি দ্রব্য কি প্রকারে উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিতে ইচ্ছা করি।

বস্ত্রবয়ন।

যত স্বদেশী শিল্প আছে তাহার মধ্যে বস্ত্রবয়নকার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কেন না অন্নের পরই লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই নিত্য অত্যাবশ্যক বস্ত্রবয়নকার্য্য বঙ্গদেশ হইতে একেবারে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল।

এদেশে (ইউনান প্রদেশে) বস্ত্রবয়নকার্য্য বড় সহজ ব্যাপার নহে। কারণ এখানে তুলা জন্মে না। ব্রহ্মদেশান্তর্গত মিন্‌জান্ প্রভৃতি স্থান হইতে চীন দেশে তুলার আমদানি হইয়া থাকে। এই তুলা এদেশে আমদানি করাও দুরূহ ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। মিলজান্ হইতে তুলা ষ্টিমারযোগে ভামো আনীত হয়, তথা হইতে অশ্বতর বা বলদ বাহনে ৮।১০ দিনের পথ নদী, নালা, পাহাড় অতিক্রম করিয়া টেঙ্গিয়ে আনীত হয়। এখান হইতে ঐ তুলা পুনরায় ৫ দিনের পর্ব্বতময় পথ ইউন্-চান্-ফু এবং ১২ দিনের পথ টালিপু



নামক স্থানে নীত হয়। বৃষ্টির দিনে তুলা আমদানি হইতে পারে না। এখন সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে মিন্‌জান্ হইতে ৯,০০০ ফুট উচ্চ পাহাড়ে টালিফু বলদ দ্বারা তুলা পৌঁছান কত কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য।

চীনদেশী ওজনের এক চিন (1 Catty)=৬৭॥ তোলা। তাহার মূল্য ॥৵০। ঐ তুলা ধুনিয়া সূতা কাটিতে মজুরি ৵০ এবং ঐ সূতা দ্বারা কাপড় বুনিতে ব্যয় ।০ পড়ে এবং ঐ কাপড়ের বাজার দর ১।০। উহার দৈর্ঘ্য ১৩ ফুট এবং প্রস্থ ২ ফুট। টেঙ্গিয়ে সহরে ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থান সকলে এই ব্যয় পড়ে কিন্তু ইউনচান ফু ও টালিফুতে ব্যয় কত বেশী হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্মদেশে তুলার মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায়, রেঙ্গুন হইতে বিদেশী সূতার আমদানি বৃদ্ধি পাইতেছে। বিদেশী সূতার এক চিনের (1 Catty) মূল্য ৮৵০। চীনারা বলে বিদেশী সূতার কাপড় টেকসই নহে। বিদেশী সূতার কাপড় বা বিদেশী কাপড় যদি এক বৎসর পরিধান করা যায়, তাহা হইলে দেশী সূতার কাপড় তিন বৎসর ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সচরাচর এদেশে তিন প্রকার কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১। তা-পু—মোটা কাপড়।

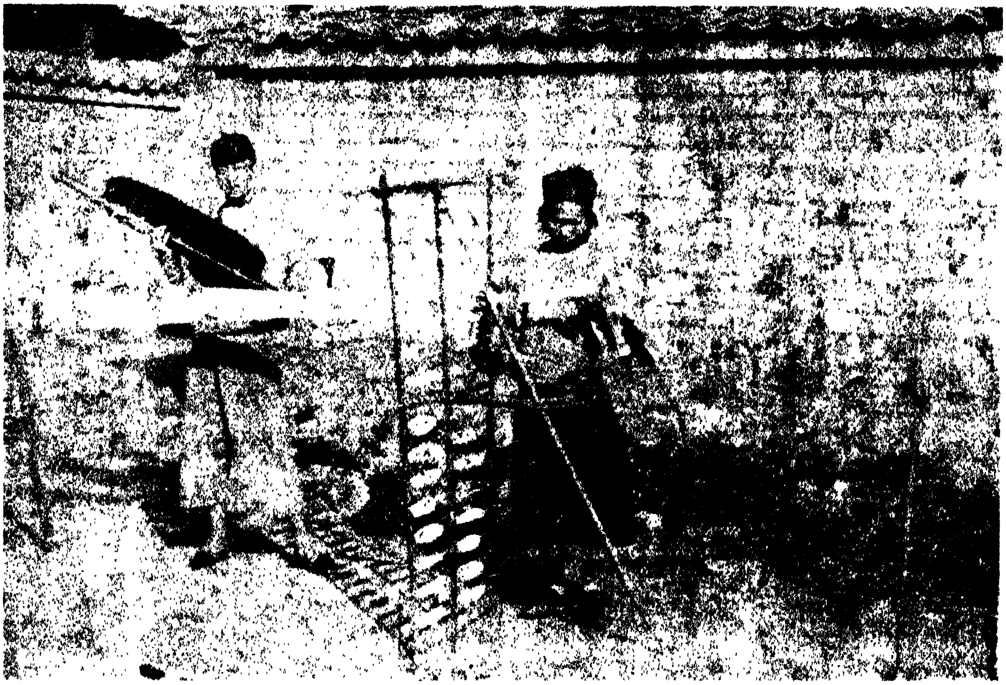
২। আড়-পু—মধ্যম প্রকার কাপড়।

৩। ছিয়াও-পু—পাতলা কাপড়।

প্রথম নম্বরের কাপড় আমাদের দেশের বোম্বাইয়ের চাদর অপেক্ষাও খুব মোটা ও খস্‌খসে। নিম্নশ্রেণীর লোকে, যেমন পাহাড়িরা এবং কৃষকগণ, এই কাপড়ই ব্যবহার করে। দ্বিতীয় প্রকার কাপড় মোটা মারকিন কাপড়ের মত। এবং তৃতীয় নম্বরের কাপড় মোটা নয়নসুক কাপড়ের সদৃশ। উচ্চ শ্রেণীর এবং মধ্যম শ্রেণীর লোকে এই দুই প্রকার কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকে।

তাঁত (Hand-loom)।

মধ্যম শ্রেণীর এবং নিম্নশ্রেণীর প্রায় সকল লোকের ঘরেই বস্ত্রবয়নের তাঁত আছে। বস্ত্রবয়ন এবং সূতাকাটা স্ত্রীলোক ও বালিকাগণের কর্ত্তব্য। পুরুষে এই কার্য্য কখনও করে না। অধিকাংশ লোকেই আপন আপন





ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র নিজেরা বয়ন করিয়া লয় এবং অনেক গরিব লোকে এই প্রকার কাটনা কাটিয়া এবং বস্ত্রবয়ন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। চীনদেশের মত ব্রহ্মদেশেও প্রায় ঘরে ঘরেই বস্ত্রবয়নের তাঁত আছে।

এদেশের সুতাকাটার চরকা বঙ্গদেশী চরকা অপেক্ষা হীনাবস্থাপন্ন, কিন্তু কার্য্য বোধ করি একই প্রকার হইয়া থাকে। ঘরে ঘরে বালিকারা এই প্রকার চরকায় দিবা রাত্রি সূতা কাটিয়া থাকে।

ইউনান প্রদেশে রেশম বিশেষ উৎপন্ন হয় না। সেই জন্য এদেশে রেশমের কাপড় প্রস্তুত হইতে দেখা যায় না। চি জোয়ান নামক প্রদেশে অতি উৎকৃষ্ট রেশমি বস্ত্র সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে। রেশমি বস্ত্র ভিন্ন নানা প্রকার রেশমি ফিতা বা ফুল-দার লেস সকলও এই প্রদেশে প্রস্তুত হয়। চীনা রমণীগণের গাউনে ও পাজামায় এই সকল লেস্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এদেশে ছোট ছোট বালিকাগণের নিত্য প্রয়োজনীয় কার্য্য এই যে, তাহারা দিবারাত্রি অবসর মত রেশমি এবং জরির কার বুনিয়া দেশের অভাব পূরণ করিয়া নিজেদের জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

চীনা রাজ্যের অন্তর্গত হুনান নামক প্রদেশে প্রচুর তুলা জন্মে। তথায় অতি উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।





পুরুষের পোষাক।

সচরাচর এদেশে পাঁচ প্রকার টুপি ব্যবহার করিতে দেখা যায়। সর্ব্বসাধারণে দিবারাত্রি কাল বর্ণের এক প্রকার গোল টুপ (Skull Cap) ব্যবহার করিয়া থাকে। সাহেবদিগের সান্ধ্য-টুপি (Evening Cap) যে ধরণে কাপড় কাটিয়া প্রস্তুত হয় ইহাও সে ধরণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার শীর্ষভাগে একটী লাল গুটি থাকে কিন্তু দেখিতে ঐ সান্ধ্যটুপির সঙ্গে কোন সাদৃশ নাই। কাল কাপড় ও কাল রেশমি বস্ত্র দ্বারা এই টুপি প্রস্তুত হইয়া থাকে। আর দুই প্রকার টুপি আছে, তাহার এক প্রকার গ্রীষ্মকালে এবং এক প্রকার শীতকালে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই টুপিদ্বয় কালানুযায়ী কোন পর্ব্ব উপলক্ষে রাজ-দরবারে যাইতে হইলে এবং বিবাহাদি উপলক্ষে লোকে পরিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালীয় টুপি দেখিতে ইংরেজ পল্টনের জেনারালের টুপির মত। ইহা তৃণ (Straw)-নির্ম্মিত। পদমর্য্যাদানুসারে এই টুপির শীর্ষদেশে, পিতল, স্বর্ণ, জেড বা মূল্যবান সবুজ রংয়ের পাথরের চূড়া সংলগ্ন থাকে। ঐ চূড়ার মূলদেশ হইতে লালবর্ণের পশমি ঝলম সকল টুপির চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া তাহার শোভা বর্দ্ধন করে। যাহাদের সরকারি উপাধি নাই এমন লোক সকল এবং নিম্নশ্রেণীর সরকারি কর্ম্মচারিগণ ঐ টুপি ব্যবহার করিতে হইলে তাহারা

উক্ত প্রকার গুটিকা বা চূড়া ব্যবহার করিতে পারে না। ইহাকে ইংরেজিতে ইউনিফরম বলা যাইতে পারে।

শীতকালীয় টুপি কাল মকমল দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা দেখিতে বাঙ্গালীর কাল মকমলের গোল পিরি টুপির মত। কিন্তু প্রভেদ এই যে, বাঙ্গালী টুপির মস্তক-আবরণী অংশ শিরোবেষ্টনীর উপর প্রান্তে সমতল ভাবে থাকে। চীনাদের টুপির মস্তকাবরণী অংশ শিরোবেষ্টনীর নিম্নপ্রান্ত হইতে গঠিত হইয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে বেষ্টনীর ঊর্দ্ধ প্রান্ত অতিক্রম করিয়া উঠে। এবং বেষ্টনীর ঊর্দ্ধ প্রান্ত উক্ত মস্তকাবরণী হইতে মুক্ত থাকে। এই টুপির মধ্যস্থানে শীর্ষদেশে, পিতল, স্বর্ণ, জেড প্রভৃতি মূল্যবান গুটিকা বা চূড়া সংলগ্ন থাকিয়া ব্যবহারকারীর পদমর্য্যাদার পরিচয় দিয়া থাকে। ইহারও গুটিকা বা চূড়ার মূলদেশ হইতে লালবর্ণের রেশমি বা কার্পাসসূত্র সকল ঝলমের মত ঝুলিয়া টুপির শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকে।

চতুর্থ প্রকার টুপি নামদা (Felt) দ্বারা প্রস্তুত হয়। উহা দেখিতে জাহাজের গোরাগণের টুপির মত (Sailors' hat)। ইহা ভদ্রলোকে বড় ব্যবহার করে না। নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

পঞ্চম প্রকারের টুপি বড় বড় মাথাইল বা মাথলা। ইহা উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বাঁশের চেয়াড়ি দ্বারা প্রস্তুত হয় এবং ইহার উপর মোম জামা, কাগজ বা কাপড় আচ্ছাদন করিয়া রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষার উপায় করে। এই টুপি চীনদেশীয় লোকে ছাতার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। কেন না ইহাদের জাতীয় কোন প্রকার ছাতা দৃষ্ট হয় না। এই মাথাইলকে টুপি শ্রেণীতে উল্লেখ করিলাম, কেননা চীন ভাষায় ইহাকে "তা-মৌজে" বা বড় টুপি বলিয়া থাকে। প্রত্যেক চীনার বিশেষতঃ উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণীর লোকের ঘরে প্রথম তিন প্রকার এবং শেষোক্ত প্রকার টুপি থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

শ্রমজীবী কৃষক এবং নিম্নশ্রেণীর লোকে যে জামা ব্যবহার করে, তাহা সচরাচর উরুর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে। সদাসর্ব্বদা লোকে ৫।৬টী জামা উপর্য্যপরি পরিয়া থাকে। উচ্চশ্রেণীর এবং মধ্যম শ্রেণীর লোকে ঐ প্রকার জামার উপর লম্বা চোগা বা জোব্বা পরিধান করে। বাঙ্গালীর যেমন লম্বা কোঁচা ভদ্রলোকের চিহ্ন, চীনাদের লম্বা চোগাও সেই প্রকার ভদ্রলোকের চিহ্ন। অর্থাৎ যাহারা মজুরি বা কৃষিকার্য্য করিয়া খায় তাহারা ঐ লম্বা চোগা পরিয়া কাজ করিতে পারে না। এই চোগার আস্তীন হাতের আঙ্গুল অপেক্ষাও প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা। শীতকালে ইহার মধ্যে আঙ্গুল ঢাকিয়া রাখিয়া শীত হইতে অঙ্গুলিকে রক্ষা করে। এই চোগার উপর সাধারণ ভদ্রলোকে আস্তীনশূন্য এক প্রকার কোট ব্যবহার করে। ঐ কোট রেশমি বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত। উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্ম্মচারিগণ ও উপাধিধারী ভদ্রলোকগণ ঐ চোগার উপর আস্তীনশূন্য কোটের পরিবর্ত্তে খুব ঢোলা মূল্যবান আর এক প্রকার কোট পরিয়া থাকে। তাহার আস্তীন অতি ঢোলা। উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারিগণের এই কোটের সম্মুখে ও পশ্চাতে বর্গক্ষেত্রাদি জরির কার্য্য-বিশিষ্ট এক এক খণ্ড কাপড় সূচী দ্বারা গ্রথিত থাকিয়া ব্যবহারকারী সিবিল্ বা মিলিটারি বিভাগের কর্ম্মচারী তাহার পরিচয় দিয়া থাকে। সিবিল ও মিলিটারির চিহ্ন স্বতন্ত্র।

পরিধানে পাজামা বা ইজার, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে। কিন্তু ভদ্রলোকগণ ঐ পাজামার উপর হাপ বা অর্দ্ধ-পাজামা পরিধান করে। এই অর্দ্ধ পাজামা দুই পায়ের দুইটী স্বতন্ত্র। উহা উরুর সম্মুখে ফিতা দ্বারা কোমরের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে। কিন্তু ইহা উরুর পশ্চাৎভাগ আবৃত করিতে পারে না। নিম্নদিকে মোজার সঙ্গে রেশমি ফিতা দ্বারা জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

মোজা মোটা কাপড় কাটিয়া, সেলাই করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই মোজা দীর্ঘকাল ব্যবহার করা যায়। চীনারা বিলাতী মোজা ভাল বাসে না, কারণ উহা অল্প দিনেই ছিঁড়িয়া যায়।

এদেশের প্রায় সকল লোকেই স্বদেশী জুতা ও বুট ব্যবহার করিয়া থাকে। এই জুতা সকলের বাহিরে মখমল এবং ভিতরে মোটা কাপড় দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেবল তলাতে চামড়া থাকে। ভদ্রলোকেরা যে জুতা ব্যবহার করে তাহাতে নানা রেশমি ফুলদার কার্য্য থাকে। স্ত্রীলোক-গণ এই জুতা সেলাই করিয়া দেয় এবং চামড়ার কার্য্য মুচিদ্বারা সম্পন্ন হয়। ভাল জুতার উপরিভাগে কাল রেশমি কাপড় থাকে। চটি জুতার চাল এদেশে বিশেষ নাই।

স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ।

বালিকা ও বয়স্কা কুমারীগণ মাথায় মুকুট সদৃশ কপালি ব্যবহার করে। কিন্তু কুমারী ক্রীতদাসীগণ এবং নিম্নশ্রেণীর কুমারীগণের মধ্যে অনেকে পুরুষের মত প্রথম নম্বরের কাল টুপি পরিয়া থাকে। বিবাহিতা রমণীগণ প্রায় তিন হাত লম্বা এবং এক ফুট প্রশস্ত একখণ্ড কাল কাপড় দ্বারা মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিয়া রাখে। কাপড়খানি আন্দাজ চারি ভাঁজ করিয়া সম্মুখ হইতে পশ্চাতে লইয়া খোপার সঙ্গে বাঁধিয়া খোপার শোভা বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

রমণীগণও পুরুষের মত ৫।৬টা জামা উপর্য্যুপরি পরিধান করে। সর্ব্বোপরি বড় জামা বা গাউন। এই গাউনগুলি ঢোলা হাঁটুর নিম্নে পতিত হয় এবং ইহার আস্তীন এত ঢোলা, যে তাহার মধ্যে ছোট এক শিশুকে শোয়াইয়া রাখিতে পারা যায়। উক্ত আস্তীনের ভাঁজের মধ্যে টাকা পয়সা রাখিয়া পকেটের কার্য্য সম্পন্ন করে। রেশমি লেস দ্বারা আস্তীন ও গাউনের কিনারা শোভিত করা হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্মান ও মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের পাজামাও পুরুষের মত দুই প্রকার। কেহ কেহ শুধু ঢোলা পাজামা পরিয়া থাকে এবং অনেকে ঢোলা সাধারণ পাজামার উপর পূর্ব্বোল্লিখিত অর্দ্ধ পাজামা পরিয়া, তাঁহা পায়ের নলার সঙ্গে জুতার সহিত মিল করিয়া বাঁধিয়া, পায়ের শোভাবৃদ্ধি করিয়া থাকে। আয়ত ক্ষেত্রাকৃতি আর একখানি বস্ত্র কোমরের সঙ্গে বাঁধিয়া পা পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দেয়। উহা ইংরেজী এপ্রনের (apron) সদৃশ।

স্ত্রীলোকের ক্ষুদ্র জুতাগুলি সমস্তই কাপড়ের দ্বারা প্রস্তুত। এই জুতায় অবস্থানুসারে নানা সূচীর কার্য্য দ্বারা তাহাতে ফুল তুলিয়া তাহার সম্মান বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। তিন ইঞ্চি হইতে ৪।৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত সচরাচর এই জুতার আয়তন হইয়া থাকে। তবে ছোট লোকের মধ্যে এবং ক্রীতদাসীগণের পা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জুতার আকৃতিও বড় হইয়া থাকে।

পুরুষ ও স্ত্রীগণের পোষাক লোকের অবস্থানুসারে নানা প্রকার রেশমি বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং স্ত্রীলোকগণের ও বালকবালিকাগণের পোষাক নানা প্রকার সূচী-শিল্পনৈপুণ্যে শোভিত হইয়া থাকে।

বালকবালিকাগণের পোষাক তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত একই প্রকার। জিজ্ঞাসা না করিয়া পোষাক ও চেহারা দেখিয়া বালক কি বালিকা বুঝিবার সাধ্য নাই। ছোট ছোট বালকবালিকাগণ মাথায় মুকুটসদৃশ শিল্পকার্য্যযুক্ত রেশমি টুপি পরিয়া থাকে। গাত্রে জামা ও পাজামা পুরুষের মত। কেবল প্রভেদ এই যে ছোট বালকবালিকা-গণের পাজামায় মল মূত্র ত্যাগ করিবার জন্য বড় বড় খোলা ছিদ্র থাকে। অজ্ঞাতসারে মল মূত্র ত্যাগ করিলেও কাপড় নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। জুতাও একই প্রকার। ৪।৫ বৎসর বয়স হইলে বালিকাগণের পা বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মাথার ও গাত্র পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

এখন পাঠকগণ অনুমান করুন চীন দেশের ৪০ কোটি লোকের প্রত্যেকেই কাটা পোষাক পরিধান করে এবং এক একজন নর নারীর গাত্রে গড়ে ৪।৫টা জামা, একটা পেন্টালুন, টুপি ও জুতা থাকে। এই সকল পরিচ্ছদই স্বদেশী। কোথা হইতে কি প্রকারে এত রাশি রাশি পরিচ্ছদের সরবরাহ হইয়া থাকে? আমি প্রথমতঃ এদেশে আসিয়া এই বিষয় চিন্তা করিতাম, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিতাম না। তাহার কারণ এখানে কোন ফ্যাক্টরি নাই, কোন টেলার কোম্পানি নাই, বা সেলাইয়ের কল নাই! কে এই সকল সেলাই করিয়া যোগায়? শেষে জানিতে পারিলাম যে এদেশের লোকের ঘরে ঘরে টেলার কোম্পানি! প্রত্যেক কুমারী, যুবতী, প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধা অহরহ ঘরে ঘরে এই প্রকার পোষাক প্রস্তুত করিতেছে। এই সেলাইয়ের কার্য্য করা ইহাদের একটী গুণের মধ্যে। যে বালিকা সূচীর কার্য্য না জানে সে সমাজে নিন্দনীয়। সূচীর কার্য্যে ইহারা এমন দক্ষ যে, মুখে অন্যের সঙ্গে আলাপ করিতেছে এবং হাতে তাড়াতাড়ি সেলাই করিতেছে। দেশময় যত পোষাক তাহা ইহারাই সরবরাহ করিয়া থাকে। কোন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নশ্রেণীর লোকে আপন আপন পরিচ্ছদ সেলাইর জন্য অন্য কাহাকেও পয়সা দেয় না। আপন আপন ঘরেই ঐ সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাপড়ের উপর পরিষ্কার রেশমি নানা বর্ণের লতা, পাতা, ফুল তোলা ইহাদের নিত্য কার্য্য। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ চল্লিশ পার হইলেই সূঁচের ছিদ্র চক্ষে দেখেন না, কিন্তু এ

দেশে, ৬০।৭০ বৎসরের বৃদ্ধাগণ অহরহ স্ূঁচের কার্য্য করিতেছে। একজন স্ত্রীলোককে একদিন সেলাইয়ের কার্য্য করাইয়া লইতে হইলে তাহার একদিনের বেতন ॥০ আট আনা। আমাদের দেশে এমন সকল স্ত্রীরত্ন আছেন যে তাঁহারা স্ূঁচের ফোঁড় কি করিয়া তুলিতে হয় তাহা জানেন না।

যখন এই দেশের পরিচ্ছদের বিষয় চিন্তা করিয়া নিজ দেশের পোষাকের প্রতি দৃষ্টি করি, তখন লজ্জায় অধোমুখ করিতে হয়। আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণ পুরুষের এক ধুতি ও এক চাদর। অনেকের এক গামছা বা কৌপীন সম্বল। স্ত্রীলোকগণের একখানি শাড়ি দ্বারা মাথায় টুপি, গায়ের জামা, পাজামা প্রভৃতির কার্য্য হইয়া থাকে। জুতা ত স্বপ্নেও কেহ ভাবে না। এই যে জাঁকাল পরিচ্ছদ তাহাও আমাদের দেশে প্রস্তুত হয় না, বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। কতই পরিতাপের বিষয়!

অন্যান্য স্বদেশী শিল্প।

আমাদের দেশের সকলেই জানেন যে চীন দেশী মাটির বাসন চিরকাল প্রসিদ্ধ। সুতরাং তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। এদেশে বিলাতী মাটির বাসন কেহ বিশেষ ব্যবহার করে না। জাপানি মাটির বাসনের কোন কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্য এখানে আমদানি হইয়া থাকে।

চামড়া।

এখানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ চামড়ার কারখানা আছে। চামড়ার দ্বারা জুতার তলা, ব্যাগ, মণি-ব্যাগ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বহু লোকে এই ব্যবসায় করিয়া জীবনধারণ করে।

কম্বল।

এদেশে তিন প্রকার কম্বল প্রস্তুত হয়। সাদা, নীল ও লাল বর্ণের কম্বল। ঐ কম্বল আমাদের দেশী বা বিলাতী কম্বলের মত নহে। উহা নামদার সদৃশ। লাল রঙ্গিল কম্বলগুলি গালিচার মত নক্সা করা। সাদা ও নীল বর্ণের কম্বলসকল বর্ষাকালে লোকে রাস্তায় চলিতে হইলে বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করে। এক একটা কম্বল ১০।১২ বৎসর বেশ ব্যবহার করা যায়। ইহা ওজনে তোলা হিসাবে বিক্রীত হয়।

রং।

এদেশের সমস্ত লোকেই নীল বর্ণের পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। ৪০ কোটি লোকের পোষাক নীলবর্ণে রঞ্জিত করিবার জন্য কত নীলের প্রয়োজন। এখানে গৃহস্থ লোকের নিজেদের নীলের চাষ আছে এবং নীল প্রস্তুত করিবার জন্য কারখানা আছে। হরিতালের খনি এদেশে থাকায় প্রচুর হরিতাল রেঙ্গুনে রপ্তানি হইয়া থাকে। নীলের পরেই লাল রং। কাগজ ও অন্যান্য জিনিষ লাল রঙ্গের ইহারা বড় ভাল বাসে।

লবণ।

ব্রহ্মদেশে যেমন আফিং কেহ গোপনে আমদানি করিলে শাস্তি পায়, এদেশের রাজাদেশ অনুসারে বিদেশী লবণ আমদানি করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয়। এদেশে পাহাড়ে এক প্রকার লবণ জন্মে সেই লবণ ভিন্ন অন্য লবণ বাজারে চক্ষে দেখিবার সাধ্য নাই। এই লবণের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা এদেশে বাঁচিয়া যায়। ব্রহ্মদেশের সীমানার সংলগ্ন যত শান বসতি আছে তাহারা নাকি গোপনে ব্রহ্মদেশী লবণ আমদানি করিয়া থাকে। ভবিষ্যতে এই গুপ্ত লবণের ব্যবসা লইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যে কোন রাজনৈতিক বিবাদ হইবে এমন অনেকে অনুমান করিয়া থাকে।

আফিং।

চীনারা আর এখন বিদেশী আফিংএর উপর নির্ভর করে না। এদেশে এখন প্রচুর আফিং চাষ হইয়া থাকে। আফিং এত সস্তা যে ৮০ তোলা বিক্রয় হয়। লেখক কিন্তু এই জাতীয় 'স্বদেশীর' পক্ষপাতী নহে। এরূপ স্বদেশীকে দূর হইতে নমস্কার করা প্রয়োজন। যদিও ইহাদ্বারা লক্ষ লক্ষ টাকা দেশে থাকিয়া যাইতেছে, কিন্তু লোকগুলি স্বদেশী সস্তা আফিং খাইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে।

সংরক্ষিত ফল (preserved fruit)।

লিচু, আনারস প্রভৃতি ফলসকল আজকাল চীনদেশে সংরক্ষিতভাবে প্রস্তুত হইয়া বিক্রয় হইতেছে। ঐ সকল টিনে সংরক্ষিত ফল ক্যাণ্টন, সাংঘাই অঞ্চলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের আম, উৎকৃষ্ট

কলা, জাম, আনারস, কমলা, কুল ইত্যাদি ফলের এই প্রকার ব্যবসা করিতে পারিলে দেশের এক মহা উপকার হয়। শীতপ্রধান দেশে আম, কাঁঠাল ও কলা ইত্যাদি সংরক্ষিত ভাবে বৈজ্ঞানিক মতে রাসায়নিক উপাদানে প্রস্তুত করিয়া চালান দিতে পারিলে, দেশের ধনবৃদ্ধির এক পন্থা উদ্‌ঘাটিত হয়। কলা ও নারিকেল যে দেশে বারমাস জন্মে সে দেশের লোকে যে এবিষয় চিন্তা করে না এই আশ্চর্য্য! এবিষয়ে আর একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। এস্থানে তেঁতুল, কুল প্রভৃতি কোন টক দ্রব্য পাওয়া যায় না। সেই জন্য বিলাতি জ্যাম ব্যবহার করিতাম। দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের প্রতি স্পৃহা হওয়ায় কলিকাতার 'Sweet Mango Chutney' আনাইয়াছিলাম, কিন্তু ঐ সুইট্ ম্যাঙ্গো চাটনি এত টক্ যে মুখে দিতে পারা যায় না। কাজে কাজেই বাধ্য হইয়া আবার বিলাতী জ্যামের শরণ লইতে হইয়াছে। ঐ চাটনি প্রস্তুতকারক শ্রীকৃষ্ণ দত্ত এণ্ড কোং, মাছুয়া বাজার, কলিকাতা। আমি দত্ত কোম্পানিকে অনুরোধ করি যে তাঁহাদের সুইট ম্যাঙ্গো চাটনি এত টক্ না করিয়া আরো কিছু বেশী গুড় উহাতে দিবেন। আমসত্ত্ব, কুল এবং তেঁতুলের আচার প্রস্তুত করিয়া বিদেশে চালান দিতে পারিলে বেশ কারবার চলে। দেশে, পল্লীগ্রামে অসংখ্য লেবু জন্মে। ইহা দ্বারা লাইম জুস্ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে লাভ হয়। মাদ্রাজী 'কারি পাউডার' ব্রহ্মদেশে বিখ্যাত, সাহেবগণ পর্য্যন্ত উহা ব্যবহার করেন। বঙ্গদেশে কি এমন কেহ নাই যে এই প্রকার "কারি পাউডার" প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন। বঙ্গদেশী জিনিষ অন্ততঃ যত বাঙ্গালী বিদেশে আছেন ব্যবহার করিয়া ব্যবসার উন্নতি দেখাইবেন। চীনদেশের কথা প্রসঙ্গে নিজদেশের কথা আনিয়া ফেলিলাম ; পাঠক মাপ করিবেন।

কাগজ।

সচরাচর তিন প্রকার কাগজ এ স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। মোটা কাগজ, মধ্যম প্রকার কাগজ এবং পাতলা সাদা কাগজ। খুব মোটা কাগজ কচি বাঁশ জলে পচাইয়া, পরে কুটিয়া প্রস্তুত হয়। ইহাতে লেখা যায় না। দোকানের মাল পত্র বাঁধিতে, বেনে দোকানের পুঁটলি বাঁধিতে, মল ত্যাগের পর ব্যবহার করিতে ও অন্যান্য সাধারণ কার্য্যে ইহা ব্যবহার করা হয়।

মধ্যম প্রকার কাগজ এবং সাদা পাতলা কাগজ এক প্রকার গাছের বাকল জলে পচাইয়া পরে কুটিয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহার কারখানা এখানে আছে।

পাঁচ খানি ফটো পাঠাইলাম। এদেশে ফটো তোলা বড় কঠিন। চীনারা কিছুতেই ফটো তুলিতে দিতে চাহে না। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকগণের ফটো। চীনদেশী তাঁতের যে ফটো তোলা হইয়াছে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। কারণ ঘরের মধ্যে তাঁত, তথায় যথেষ্ট আলো থাকে না, তাহার উপর অবার সঙ্কীর্ণ স্থানে ফটো তুলা অতি কষ্টকর, অগ্র পশ্চাৎ ক্যামেরা সরাইয়া আপন ইচ্ছানুযায়ী আকৃতি অনুসারে ফটো তোলা যায় না। নানা কৌশলে এই রমণীকে স্বীকৃত করাইয়া ঘরের বেড়া কাটিয়া দূরে সরাইয়া তবে ফটো তুলিয়াছি, কিন্তু তবু ঠিক হয় নাই। চীনদেশে টানা কাড়ান ও সুতা পাট কি করিয়া করিতে হয় তাহার একখানা ফটো দিলাম। একটী বালিকা কার বুনিতেছে এবং একটী বালিকা চরকায় সুতা কাটিতেছে তাহা ফটো দেখিলেই অনুমিত হইবে। আর একজন লোক রেশমের সুতা পাকাইতেছে।

টেঙ্গিয়ে ; শ্রীরামলাল সরকার।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩ সাল।

রজনীতে।

আমি রাত্রি বড় ভালবাসি। প্রণয়িনী বা স্বদেশকে পুরুষ যেমন ভালবাসে তেমনি প্রগাঢ় ভালবাসি। সে ভালবাসা গভীর, অপরাজিত, অপ্রাকৃত। যখন রাত্রি আসে তখন আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় সজাগ হইয়া উঠে ;—চক্ষু মুগ্ধ হইয়া সেই শ্যামার অনিন্দ্যরূপ দেখে, কর্ণ তাহার নিস্তব্ধ সঙ্গীত শ্রবণ করে, নাসিকা তাহার পুষ্পপ্রাণের ঘ্রাণ পায় এবং ত্বক তাহার স্নিগ্ধতা অনুভব করে। তামসী নিশার কৃষ্ণশোভা যখন আমাকে সবিশেষে আবৃত করিয়া ফেলে, তখন আমার অন্তরে অনন্তের অভাস পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সেই অসীমতা উপলব্ধি করিয়াই বুঝি পেচকও আমারই মত উচ্চকণ্ঠে শব্দ করিয়া অনাদ্যনন্তের মহিমার স্তব করে।

দিবালোক আমার পীড়াদায়ক। তখন শুধু ঝঞ্ঝনা, শুধু কোলাহল, শুধু ব্যস্ততা, শুধু কর্ম্ম। তখন শান্তি নাই, শ্রান্তি যথেষ্ট; প্রীতি নাই, ভীতি ঢের; নিরোধ নাই বিরোধ অনেক। দিবালোক ঐশ্বর্য্যশালী; তাহার মহিমায় অপর সকলের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইয়া যায়, নিজস্ব গুপ্ত হইয়া পড়ে। দিবালোকে যে সমস্ত দ্রব্য ব্যক্ত হয়, তাহারা নিজস্ব ধর্ম্মে নহে, পরকীয় প্রসাদে। তাই দিবালোকব্যক্ত নিসর্গ-শোভা আমার প্রিয় নহে। ধনীর দেওয়া সাচ্চা জরির সাজ-পরা রামদীন জমাদার আমার ভীতির সামগ্রী; পল্লীবাসে সে যখন রামদীনুয়া ছাড়া আর কিছু নহে, তখন সে আমার প্রীতির আস্পদ।

তাই যখন সূর্য্যকে অস্তোন্মুখ দেখি,—যখন পশ্চিম দিগন্তে দিবসের চিতা দীপ্ত লোহিত রাগে জ্বলিয়া উঠে, তখন কি এক অব্যক্ত আনন্দ আমাকে আক্রমণ করে; আমার সর্ব্বাঙ্গে আনন্দপ্রবাহ অনুভব করি। এখন এমন সময় আসিতেছে যখন যে জিনিষটি যেমন তেমনি দেখিতে পাইব, তাহাতে ঋণলব্ধ পরকীয় উগ্রতা আর দেখিব না। স্বদেশ পরাধীনতা মুক্ত হইলে যে আনন্দ এ সে আনন্দ।

পর্ব্বতে, প্রান্তরে, সমুদ্রোপকূলে বা কাননাভ্যন্তরে বসিয়া যখন দেখি পূর্ব্বাকাশ হইতে শ্যামার কৃষ্ণচেলাঞ্চল খানি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লুপ্ত করিবার জন্য লুটাইয়া পড়িতেছে, তখন আনন্দের আন্দোলন শিরায় শিরায় অনুভব করি। অন্ধকারের অস্পর্শ আলিঙ্গনে বিশ্বচরাচর যখন আপনাকে হারাইয়া ফেলে, বর্ণ ও আকার যখন অস্পষ্ট হইয়া আসে, আমি তখন বিশ্বের নিজস্ব মহিমা দেখিয়া মুগ্ধ হই; পরকীয়ঋণমুক্ত দেখিয়া সুখী হই; অধীনতামুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিয়া অবাক হই।

দিবালোকে প্রত্যেক বস্তু পরের মাহাত্ম্যে অপগতনিজস্ব হইলেও প্রত্যেকে নিজেকে চোখের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পায়। ঋণীর স্বভাবই এই;— বাঙ্গালী সভার মধ্যে ইঙ্গবঙ্গই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবার, রাত্রিতে, অন্ধকারে সকলে নিজস্ব লাভ করিলেও কেমন আপনাদের দূরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সমষ্টিভাবে অনন্তের আভাস প্রদান করে। তখন আমার, নীলাকাশ তলে দিকহারা পেচকের মত, আনন্দে চীৎকার করিতে সাধ যায়; মত্ত শৃগালের মত দিক্‌দিগন্তে ছুটিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করে।

অদম্য দুর্জ্জেয় প্রেমের নিত্যসখা মৃত্যু। আমার তন্নিষ্ঠ, একাগ্র প্রেম রজনীর অন্ধকার কোলে মৃত্যু-মহারাজের বিরাট আসন পাতা দেখিতে পায়। প্রেমিকার কোলের মত রজনীর অন্ধকারে মৃত্যুর বিরাট ছবি বড় সুন্দর, চিত্তহর, মুগ্ধকর। রজনীতে অজ্ঞাতকারণ ভীতি এই মৃত্যুরই ক্ষীণ পরিরম্ভ।

আমি তখন বোম্বাই সহরে থাকিতাম। কৃষ্ণাষ্টমীর অন্ধকার রাত্রি। আমি অভ্যাস মত নৈশভ্রমণে বাহির হইয়াছি। মাথার উপরে দীপ্ত ছায়াপথ; চতুষ্পার্শ্বে উজ্জ্বল তারকার ছড়াছড়ি- যেন মৃত্যুলোকের প্রশস্ত রাজবর্ত্ম উজ্জ্বল দীপমালায় প্রদীপ্ত। উচ্চে নীলাকাশ কৃষ্ণতর; নিম্নে নীল সমুদ্র কৃষ্ণতর; মালাবার পর্ব্বতশীর্ষে খর্জ্জুর তাল নারিকেলের শ্যামলতা গাঢ়তর। সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজবর্ত্ম শ্যামপত্র নারিকেলশ্রেণী শোভিত; বৃক্ষাবকাশে আলোকবিন্দুগুলি প্রকাশমান; সমুদ্রের বক্রতায় আলোকমাল্যবৎ প্রতীয়মান। রাজপথ নিস্তব্ধ। সাগরজলের খল্‌খল্, বৃক্ষপত্রের ঝর্ ঝর্, বায়ুর সন্ সন্ শব্দ সেই গম্ভীর নিস্তব্ধতার দিকে যেন ভয়চকিতভাবে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতেছিল। কি চমৎকার! কি সুন্দর!

কতক্ষণ এরূপ বেড়াইয়াছিলাম মনে নাই। যখন আত্মরত মন একটু শিথিলচিন্ত হইয়াছিল তখন দেখিলাম ম্লানচন্দ্রালোকে সমুদ্র, পর্ব্বত, কানন অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের রূপ আমার বড় সুন্দর বোধ হয়। শুক্লশশী যেন প্রগলভা যুবতী, ভরা সুখের উগ্র হাসি আপনাকে অতিক্রম করিয়া সকলকে নিমজ্জিত করিতে ছুটিতেছে। কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না ম্লান মৃদু, যেন প্রথমসুখশেষা যুবতী বিধবার করুণ হাসি, সে যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকেই আর্দ্র করে, করুণ করে, স্পষ্ট ম্লানিমা প্রদান করে।

যখন কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রালোকে ভাবভোলা হইয়াছিলাম, তখন মধুস্রাবী সঙ্গীতধারায় আমার তন্ময়তা ঘুচিল। শুনিলাম রমণীকণ্ঠের মিষ্ট সঙ্গীত দূরে নারিকেলকুঞ্জে ধ্বনিত হইতেছে:—

'জাঁ যেতন্ বোর্‌দি ও দার্ জানি হান্নুয্,
দর্দ্‌হা দাদি ও দরমান্ নি হান্নুয্'।

রজনীর দীপ্ত অন্ধকারে সুকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত শ্রবণে আমার স্থূল দেহ গলিয়া সঙ্গীতপ্রাণ অন্ধকারের সহিত অশরীর একাকার হইতে চাহে। সেই পরকীয় ভাষায় কি এক কাঁদনির সুরে ধ্বনিত সঙ্গীত শুনিলাম। পরকীয় ভাষার সঙ্গীত তাহার ব্যক্ত-অব্যক্ত, বোধ্য-অবোধ্য ভাব-পরম্পরায় কি এক মোহময়, স্বপ্নময়, অতীন্দ্রিয় কাব্যজগতের রচনা করে। আমি সর্ব্বেন্দ্রিয় কর্ণে কেন্দ্রীভূত করিয়া শুনিলাম গায়িকার সুকণ্ঠ ক্রমশ আমার দিকেই অগ্রসর হইতেছে। রমণী গাহিতেছেঃ—

'জাঁ যেতন্ বোরদি ও দার্ জানি হান্নুস্,
দর্দ্ তা দাদি ও দরমানি হান্নুস্। ১
মোল্‌কে দেল কারদি খারাব্ আজ্ তেগে নাজ্,
আন্ দরি ভিরানা সোলতানি হান্নুস্। ২
হর্ দো আলম কিমতে খোদ্ গোফতাই,
নেরখে বালা কোন্ কে আরজানি হান্নুস্।' ৩।*

গাহিতে গাহিতে কণ্ঠ শরীরী হইয়া নারিকেলকুঞ্জ হইতে নির্গত হইয়া আসিল। রমণী মুসলমানী। সে যে মুসলমানী তাহা আন্দাজ করিলাম তাহার পরিচ্ছদ ও মুখশ্রী দেখিয়া এবং ভাষা ও কণ্ঠ শুনিয়া। রমণীর বয়ক্রম অনুমান করিলাম পঁচিশ হইতে ত্রিশের মধ্যে। বর্ণ দিব্য গৌর, এক্ষণে যেন অযত্নে কিছু মলিন হইয়াছে; দেহখানি যেন ভাস্করের নিপুণহস্তকুন্দিত, কেমন আনন্দা, মেদবর্জ্জিত, অস্থূল; বেশভূষা অযত্নসম্বৃত শ্রীমণ্ডিতা; আলুলায়িত কেশপাশ পশ্চাতে বেণীসন্নদ্ধ; রুক্ষ চূর্ণ কুন্তল কপালকপোলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে— যেন পদ্মোদর বেষ্টন করিয়া কেশরদাম। আমি মুগ্ধ হইয়া রমণীর অযত্নগ্রস্ত রূপ দেখিতেছিলাম। রমণী আমাকে লক্ষ্য না করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহার সম্মুখে গিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিলাম 'বাবা সাহেবা আদব'। সে সেলাম প্রত্যর্পণ না করিয়া কেমন এক দুঃখাবেশপূর্ণ শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি হিন্দু? শাস্ত্র জানেন যদি ত' বলুন দেখি হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ"?

আমি এই আকস্মিক গুরু প্রশ্ন শুনিয়া থতমত খাইয়া বলিলাম,— "ধার্ম্মিকের কাছে আপনার ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।"

"হায়, কে ইহার মীমাংসা করিবে?" বলিয়া রমণী প্রস্থানোদ্যতা হইল!

রমণীর মুখে খাটি উর্দ্দু,— সে কথা না সঙ্গীত? সুন্দরি, যে সুধার ক্ষণিক আস্বাদনে আমার অতৃপ্তি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা আরো আমি চাই,—ওগো, দাঁড়াও দাঁড়াও। রজনীর দীপ্ত অন্ধকারে যে স্বপ্নরাজ্য রচনা করিয়াছ, তাহা এত শীঘ্র ভাঙিলে চলিবে না, দাঁড়াও ওগো, তুমি দাঁড়াও। যে কৌতূহল আমার প্রাণে জাগ্রত করিয়াছ তাহা পশ্চাতে ফেলিয়া তোমার যাওয়া হইবে না, দাঁড়াও সুন্দরি, তুমি দাঁড়াও!

আমি তাহার পথরোধ করিয়া বলিলাম, "গোস্তাকি মাফ করিবেন; আপনার প্রশ্ন আমার কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়াছে।"

রমণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য জানিতে চাহেন? তবে কোথাও বসিবেন চলুন।"

সমুদ্রের প্রায় জলের ধারে দুখানা পাথরের উপর দুজনে পাশাপাশি বসিলাম। চরণনিম্নে শান্ত সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউগুলি উদ্বেল হইয়া আসিয়া গড়াইতেছে; মাথার উপর নক্ষত্ররাজি সাগরজলে আপনাদের ছায়া দেখিতেছে; নিমেষপাতনশীল চক্ষুর মত দূরে বাতিঘরের আলোটা থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশ পাইতেছে; নিশাশশাঙ্কক্ষতনীলরাজি; সবৃক্ষশিখরোদগ্র মালাবার শৈলে চলৎপলাশপত্রান্তগোচর চন্দ্রিকাদ্যুতি চক্ষে ঝিলিক হানিতেছে, পার্শ্বে লুলিতশিথিল-বেশা, ব্যালোলকুন্তলকলাপবতীর আপাণ্ডু-গণ্ডপতিতালক-কুন্তলালীর অপূর্ব্ব-শ্রী; এক মনে সমস্ত দেখিতেছিলাম।

আমি এই কাব্যরাজ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম; হঠাৎ "বাবুজি, আমার নাম লায়লি" এই মধুর সঙ্গীতে আমার সঙ্গিনীর প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। আমি একটু নড়িয়া সরিয়া বসিলাম। লায়লি বলিতে লাগিলঃ—

* দেহ হ'তে প্রাণ বঁধু, নিয়েছ কাড়িয়া,
তুমি আছ পরিবর্ত্তে তার।
তুমি মোর পীড়া ব্যাধি দেহে
তুমি পুন ঔষধ তাহার। ১
চিত্তরাজ্য ধ্বংসিয়াছ প্রেম-অসি দিয়া,
ধ্বংস-অবশেষ মাঝে তুমি রাজা পুন। ২
ইহ পরকাল তব মূল্য করিয়াছ,
মূল্য বৃদ্ধি কর তুমি সুলভ এখনো। ৩

"বাবুজি আমার নাম লায়লি; আমাদের গরিবখানা ছিল লক্ষ্ণৌ সহরে; আমার পিতা একজন প্রসিদ্ধ মৌলবী ও গায়ক ছিলেন। তাঁহার মোকামে কত এলমনবিশ আসিত যাইত। সঙ্গীত ও বিদ্যাচর্চ্চার মধ্যে আমি যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। একদা এক সুন্দর যুবক বিদ্যার্থী হইয়া আমার পিতার নিকট আসিল, তাহার নাম স্বরূপলাল।" লায়লি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া থামিল।

আমি দেখিলাম আবহমানকালের হতাশপ্রেমের করুণ-কাহিনী, ইহাতে বিচিত্রতা আছে কি? সুন্দরী কাব্যটা জমাইয়া তুলিতে পারিবে কি?

লায়লি বলিতে লাগিল, "সুন্দর এলমনবিশের নাম স্বরূপলাল। আহা সে কিরূপ! মরি মরি তার কণ্ঠ কি মধুর? হেনার বনে বুলবুলের গান শুনিয়াছি, চামেলির কুঞ্জে শ্যামার ঝঙ্কার শুনিয়াছি, জ্যোৎস্না রাত্রে পাপিয়ার কণ্ঠ শুনিয়াছি, বসন্ত প্রাতে দৈহালের স্বর শুনিয়াছি, কিন্তু সেই যুবকের স্বর কেমন সুন্দর বুঝাইবার মত কিছু কখন শুনি নাই। স্বরূপলাল অনুপম মেধা ও সুকণ্ঠের গুণে শীঘ্রই পিতার অতি প্রিয় সাকরেদ হইল। মুসলমানের কঠোর অবরোধও তাহার নিকট শিথিল হইয়া গেল।

"স্বরূপলাল সংস্কৃতজ্ঞ ছিল। আমি পিতার অনুমতি লইয়া তাহার নিকট সংস্কৃত পড়িতে লাগিলাম; আমিও তাহাকে পারসী, আরবী ও সঙ্গীত শিক্ষা দিতাম। পিতার প্রসাদে আমি কিছু বিদ্যা অধিগত করিয়াছিলাম।

"প্রথম দর্শনে যাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সঙ্গলাভে সে আমার চিত্তরাজ্য জয় করিল। সে আমার আদরের নাম রাখিয়াছিল লীলা; আমি তাহাকে বলিতাম সুরূপলাল।

"একদিন সে তাহার পুস্তকের মধ্যে একখানা কাগজে দেখিল লিখিত রহিয়াছে—

"আয় চেহ্‌রেয়ে জিবায়েতু রিশ্‌কে বুতানে আরবী।
হরচন্দ্, আস্‌ফৎ মিকুনম্, দরহুস্‌নে জাঁ বানো তারী।
তু আজ পরী, চাবুক তরী, ওজ্ বরগে গুল্ নাজুক তরী।
ওজ্ হরচে গুয়ম বর তরী; হক্কা আজাইব্ দিলবরী।
আলম্ হামা এগ্‌মাএ তু, খলকে খোদা শয়দাএ তু।
ই নরগিসে রোনায়ে তু; আওরদা রস্ মে দিলবরী।"*

"সুরূপলাল—আমি তাহাকে ঐ নামেই ডাকি—সুরূপলাল সেই কবিতা পড়িল, একবার আমার মুখের দিকে অপাঙ্গে চাহিল, কিন্তু আমাকে কিছু বলিল না, বা মুখের ভাব ব্যতিক্রম ঘটিল না; কিন্তু আমার সহিত তাহার ব্যবহার আর পূর্ব্বের মত সরল সহজ রহিল না; সে দূরে দূরে থাকিত, আমায় দেখিলে একটু বুঝি সংযত ও গম্ভীর হইত। একদিন শুনিলাম সে বাবার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়াছে।

"ফিরিঙ্গিরা বলে প্রেম অন্ধ। কথাটা বড় ঠিক। আমি মনে করিলাম সুরূপলাল বুঝি প্রেমার্ত্তার ক্ষীণ ইঙ্গিত বুঝিতে পারে নাই। প্রেমে সংশয় সন্দেহ সর্ব্বদা। আমি তখন ইচ্ছা করিলাম স্পষ্ট করিয়া আমার মনোভাব তাহার নিকট ব্যক্ত করিব।

"হায় খোদা, তুমি রমণীর প্রাণে প্রেম দিলে যদি, তবে এমন দুর্ব্বার লজ্জা দিলে কেন? কতদিন চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু বলি বলি করিয়া বলা হয় নাই। কিন্তু সুরূপলালকে সত্য সত্যই গমনকাম দেখিয়া আর লজ্জা রহিল না। তাহার বিরহ আমার মৃত্যুসদৃশ। তাই জীবন মরণের সন্ধিক্ষেত্রে আসিয়া আর লজ্জা রহিল না। লজ্জার মাথা খাইয়া প্রগল্‌ভা রমণীর মত তাহাকে বলিলাম, 'বন্ধু, তুমি মন হরণ করিয়াছ; আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তোমার বাঁদি হইবার অধিকার দিয়া কৃতার্থ কর'।

"ব্রাহ্মণ সুরূপলাল স্থিরকণ্ঠে বলিল, 'অসম্ভব, তুমি যবনী, তুমি ম্লেচ্ছ'।

"হায় নিষ্ঠুর পুরুষ, এমন রূঢ় কথাটা ব্যক্তপ্রণয়ার মুখের উপর উচ্চারণ করিতে একটু দ্বিধা বোধ হইল না, একটু গলার স্বর কম্পিত হইল না। প্রেমিকা সব সহ্য করে, প্রেমের

---

* তোমার সুন্দর মুখ, বাড়ায় হিংসার দুখ, আরবী-ভাস্কর-প্রতিমার।
যতই বলি না আমি, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তুমি, অনুপম সৌন্দর্য্য তোমার।
পরী অপেক্ষাও জ্ঞানী, পুষ্পপেলব প্রাণী, উপমার তুমি অগোচর।
সমস্ত জগৎ হায়, তোমারিত' গুণ গায়, অধীন উন্মত্ত চরাচর।
নরগিস পুষ্প + তব সৃজিয়াছে অভিনব, চিত্তচুরি-রীতি চমৎকার।
আমি কি কহিব আর, তুলনা তুমি তোমার ওহে প্রিয় বান্ধব আমার।

+ নরগিস পুষ্প পারস্য কবিতায় চক্ষের সহিত উপমিত হয়।

অপমান সহ্য করিতে পারে না। প্রেমে আবার ম্লেচ্ছ যবন কি? মূর্খ ব্রাহ্মণ, তুমি কেবল কতকগুলা পুঁথির ভার বহন করিয়াছ, বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পার নাই। হায়, ক্রোধে তখন ধর্ম্মনিষ্ঠ স্বার্থত্যাগী সংযমী ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারি নাই। আমি 'শিরসি আহত ভোগীইব' নিষ্ফল ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, 'কাফের, বুৎপরস্ত্, মাটির ঢেলা পূজা কর, প্রেমের পবিত্র সাধনায় সেই অকিঞ্চিৎকর ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কি আমায় গ্রহণ করিতে পার না?'

"স্বরূপলাল হাসিয়া বলিল, 'থাম গাজি সাহেব; অন্য লোকে আমার ধর্ম্মের নিন্দা করিলে প্রতিবাদ করিতাম না; কিন্তু আমার শিষ্যার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই দেখিয়াই তোমায় ঔপনিষদ ব্রহ্মের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। তুমি যে হিসাবে আমার কাছে ম্লেচ্ছ, সেই হিসাবে আমি তোমার নিকট কাফের আখ্যা পাইতে পারি কিন্তু তার বেশি আর কিছু নহে'। স্বরূপলাল আবার ক্ষমার সুন্দর প্রশান্ত হাসিদ্বারা আমার ক্রোধকে ধিক্কার দিয়া বলিল, 'আচ্ছা, তুমি ভালবাস যদি, তোমার ধর্ম্মত্যাগ করিয়া আমার ধর্ম্ম গ্রহণ কর; আমিও তোমাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া সুখী হইব'। স্বরূপলাল আবার হাসিল।

"আমি তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে বুঝিতে পারি নাই। অনেক প্রলোভন দেখাইলাম, তর্ক করিলাম। শেষ পরাস্ত মানিলাম। পরাস্ত মানিলাম বটে, কিন্তু আমাদের জটিল মিলন সমস্যা অপ্রতিপন্নই থাকিয়া গেল।

"আমরা কেহই ধর্ম্মত্যাগ করিতে রাজি হইলাম না। হায় ভগবান, ধর্ম্মের পথে এত সঙ্কীর্ণতা কেন? সংস্কার ও অভ্যাসের এত সঙ্কোচ কেন? এই 'কেন' সমস্যা কখন যদি প্রতিজ্ঞাত হয়, সেই ভরসায় মরণের প্রতীক্ষা করিয়া আছি।"

রমণী এই বলিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, আর একটু সবুর করুন। আমার ত একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে। স্বরূপলাল এক্ষণে কোথায়? আপনি তাহার সাক্ষাৎ পান কি?

লায়লি উত্তর করিল, "স্বরূপলালের সহিত মধ্যে মধ্যে দেখা হয় মাত্র। সে কাশ্মীরে পাঠশালা খুলিয়া বিদ্যার্থীদিগকে সংস্কৃত পারসী ও সঙ্গীত শিক্ষা দিতেছে। সে কর্ম্মী সন্ন্যাসী। সে ত' একটা অবলম্বন পাইয়াছে, কিন্তু হায় আমার কি উপায়? আমি ঘূর্ণাবর্ত্তের শুষ্কপত্রের মত কোন্ পথে যাইব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। বাবুজি সেলাম—"

আমি—বাক্যসুধাপানমগ্ন আমি বলিলাম, "আর্য্যে নমস্কার। কিন্তু আর একটা কথা। ধর্ম্মত্যাগ না করিয়াও উভয়ে উভয়কে গ্রহণ করিলেই ত' সব গণ্ডগোল চুকিয়া যায়।"

লায়লি হাসিয়া বলিল, "বাবুজি, ব্রাহ্মণ স্বরূপলাল যবনীকে গ্রহণ করিবে না—ত্যাগে সুমহান্ ব্রাহ্মণ স্বার্থ অপেক্ষা সমাজহিত শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। আর আমার দিকেও তাহাকে গ্রহণ করা অসম্ভব—কারণ, মোসলেম শাস্ত্রে কাফেরের সহিত বিবাহ 'বাতিল'—নিষিদ্ধ।"

লায়লি হঠাৎ গান গাহিয়া উঠিল। আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সম্মুখ হইতে বিশ্বচরাচর উহ্য হইয়া গেল—আমার মন গানে তন্ময় হইয়া গিয়াছে—কখন আমার অজ্ঞাতসারে লায়লি অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

লায়লি অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। আমি শুধু তার করুণ কণ্ঠের মধুর সঙ্গীত শুনিতে লাগিলাম—দূরে—দূরে—ক্রমশ দূরে—ক্ষীণ—ক্ষীণতর হইয়া সে ক্রন্দন ধ্বনিত হইতেছে—

"বাএসে ওহ্‌শৎ হুয়ি হায়্ আশ্‌নাই আপ্‌কী,—
তিন্‌কে চুন্‌ওয়ানে লাগ হাম্‌সে তাম্‌সে, জুদাই আপ্‌কী।*

লায়লি ত চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার স্বর সমুদ্রের কল কলে বৃক্ষ পত্রের সনসনিতে, আমার হৃদয়ের ধকধকিতে প্রতিধ্বনিত শুনিতে লাগিলাম। নক্ষত্রালোক হইতে সেই সঙ্গীত ক্ষরিত দেখিতে লাগিলাম।

মনে হইতে লাগিল, হায়, স্বরূপলাল কি মূর্খ, একটা কিছু রফা করিতে পারিল না!

ভোরের বাতাস বহিল। পেচক গৃহে ফিরিল। আমিও নানা চিন্তায় হৃদয় ভরিয়া গৃহে ফিরিলাম। দিনের আলোকে এক এক বার মনে হইতেছিল, একি স্বপ্ন?

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* আপনার সাথে প্রেম আতঙ্কের কথা,—
দিয়েছে তোমার প্রিয় কি বিষম ব্যথা।

মধুমক্ষিকার জীবন-রহস্য।*

করুণাময় জগদীশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে যত প্রকার প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সকলেরই জীবনের একটা-না-একটা উদ্দেশ্য আছে। সকল প্রাণীর জীবনের উদ্দেশ্য আমাদের জানা নাই। কারণ আমরা সকলের কার্য্যকলাপ অদ্যাপি পর্য্যালোচনা করি নাই। পণ্ডিতগণ যে সকল জীবের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির জীবনকাহিনী অতীব রহস্যপূর্ণ। মধুমক্ষিকা এই শ্রেণীভুক্ত। প্রতীচ্যজগতের অনুসন্ধিৎসার ফল জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল যে, মধুমক্ষিকার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের জন্য মধু সঞ্চয় করা। কত শত পুষ্প হইতে কত অধ্যবসায় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যে ইহারা একবিন্দু মধু আহরণ করে আমরা সে কথা ভাবিবার সময় পাইতাম না; ইহাদের মধ্যে কিরূপ সুন্দর সমাজনীতি বিদ্যমান, তাহা একবার ইহাদের গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবগত হইবার ইচ্ছা আমাদের মনে কখনও স্থান পাইত না; ইহাদের বহুবায়াস অর্জ্জিত মধু অপহরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতাম; সম্বৎসরের প্রযত্ন-কল্পিত মধুচক্রকে এক নিমেষে ধ্বংস করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতাম। পাশ্চাত্যজগৎ আজ আমাদের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অধ্যবসায় আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছে। মধুমক্ষিকার শ্রমশীলতা, শিল্পনৈপুণ্য, সমাজনীতি প্রভৃতি দেখিয়া পাশ্চাত্যজগৎ ইহার বাসগৃহকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছেন; একপ্রকার যন্ত্র দ্বারা চক্রের কোন ক্ষতি না করিয়া মধু নিষ্কর্ষণ করিতেছেন। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ মধুমক্ষিকা সম্বন্ধে যে সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এই অনুমান হয় যে, আমাদের জন্য মধু সঞ্চয় করা অপেক্ষা ইহার জীবনের উদ্দেশ্য অধিক মহত্তর। মনুষ্যকে উদ্যমশীলতা, পরিশ্রমসহিষ্ণুতা, স্বজাতি-বাৎসল্য, সামাজিক উৎকর্ষসাধনের জন্য আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি সদ্গুণনিচয় শিক্ষা দিবার জন্যই বিধাতা এ ক্ষুদ্র জীবকে সৃজন করিয়াছেন। ইহার জীবনের যে সকল ঘটনা হইতে এরূপ শিক্ষালাভ হইতে পারে তৎসমুদয়ের একটা আভাস এ প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল।

এক একটা মধুচক্রকে এক একটী নগর বা রাজ্য বলিতে পারা যায়। এক একটী নগর এক একটী রাণীর অধীন। এই রাণীই নগরবাসিগণের জন্মদাত্রী। এক রাণীর সন্তান দ্বারাই এক একটী নগর গঠিত হয়। সন্তান প্রসব করা ছাড়া রাণীর অন্য কোন কাজই নাই। তাঁহার প্রজারা তাঁহার জন্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, তাঁহার জন্য আহার সংগ্রহ করে, এবং তাঁহাকে আদর যত্ন করে। রাণীর প্রজাদিগের অধিকাংশ স্ত্রী, কেবল কয়েক শত মাত্র পুরুষ। পুরুষেরা কোন কাজ করে না; ইহারা অধিক দিন বাঁচেও না। যখন নগরটী নূতন রাণীর অধীনে আসে তখন তিনি এই পুরুষদিগের মধ্য হইতে একজনকে পতিপদে বরণ করেন; অবশিষ্ট পুরুষগণ রাণীকে লাভ করিবার প্রযত্নেই প্রাণদান করে। যে সৌভাগ্যবান পুরুষ রাণীকে লাভ করিতে সক্ষম হয় মিলনের অব্যবহিত পরেই তাহারও প্রাণবিয়োগ হয়। স্ত্রীগণ প্রায় সকলেই বন্ধ্যা; তাহারা বিবাহ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে না। রাজ্যের সকল কার্য্য ইহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ইহাদের মধ্যে শ্রমবিভাগ ও কার্য্যশৃঙ্খলা আছে; কোন কার্য্যই বিশৃঙ্খল বা যথেচ্ছভাবে নিষ্পন্ন হয় না। কতকগুলি মক্ষিকা রাণীর সহচরীর কার্য্য করে; কতকগুলি ডিম সকলের তত্ত্বাবধান করে; কতকগুলি চক্র নির্ম্মাণ করে—ইহাদের মধ্যে আবার কেহ মোম উৎপাদন করে এবং কেহ স্থপতির কার্য্য করে; কতকগুলি মধু ও পুষ্প-পরাগ সংগ্রহ করে; কতকগুলি রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখে; কতকগুলি শবাদি স্থানান্তরিত করে; কতকগুলি নগর-তোরণাদি রক্ষা করে। এই যে কর্ম্মানুক্রমিক জাতিবিভাগ, ইহা বংশপরম্পরাগত নহে। আমাদের সমাজে যেমন ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ পদবাচ্য, চাই তিনি এ পদের যোগ্য হউন বা না হউন, মধুমক্ষিকা-সমাজে সেরূপ নহে। রাণী ছাড়া ইহাদের সকলেই বন্ধ্যা,—কাজেই বংশপরম্পরাগত জাতিবিভাগের সম্ভাবনাই নাই। সকল শ্রেণীর মধুমক্ষিকা একই মাতার সন্তান, একই মাতার সন্তানগণ পৃথক পৃথক কার্য্যে দীক্ষিত হয়। বৃদ্ধ মক্ষিকাগণ শিশু মক্ষিকাদিগকে বিভিন্ন ব্যবসায়ে শিক্ষিত করে।

* সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিদ্ Maurice Maeterlinck কৃত "The Life of the Bee" অবলম্বনে লিখিত।

মধুমক্ষিকার জাতিবিভাগ বংশানুক্রমিক নয় বলিয়াই ইহাদের মধ্যে জাত্যভিমান নাই, হিংসা বিদ্বেষ নাই, দলাদলি নাই; পরস্পরের সহিত সহানুভূতি আছে; সকলেই এক প্রাণ হইয়া সকল কার্য্য করে; কাজেই ইহাদের সমাজের অধঃপতন হয় না। রাজনীতিকুশল পণ্ডিতগণের নিকট ইহারা সমাজ-শাসন-প্রণালী শিক্ষা করে না। সকল জীবের স্রষ্টা সেই অনাদি অনন্ত পুরুষই ইহাদের একমাত্র শিক্ষক। তিনি যে শিক্ষা দেন, তদপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষা আর হইতে পারে না। তাঁহার শিক্ষায় বংশানুক্রমিক উচ্চ নীচ জাতি বিভাগের স্থান নাই। যে সমাজে এই ঐশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘিত হয়, সে সমাজের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

রাণীর কর্ত্তব্য সন্তান প্রসব করা। এক একটী রাণী দশ বার সহস্র ডিম প্রসব করে। এই ডিম হইতে রাণী বা প্রজা উভয় জাতীয় মধুমক্ষিকা উৎপন্ন হইতে পারে। যখন নূতন রাণীর প্রয়োজন হয়, তখন যে সকল ডিম তিন দিনের কম পূর্ব্বে জন্মিয়াছে প্রজাগণ তাহাদের মধ্য হইতে তিন চারিটী হইতে দশ বারটী পর্য্যন্ত ডিম পৃথক করিয়া রাখে এবং ভিন্ন প্রকার খাদ্যের সাহায্যে ইহাদিগকে ক্রমশঃ রাণী-জাতীয় মক্ষিকায় পরিণত করে। রাণীজাতীয় মক্ষিকার সহিত প্রজাজাতীয় মক্ষিকার আকৃতিগত পার্থক্য আছে। রাণীর নিম্নোদরটী প্রজার নিম্নোদর অপেক্ষা দ্বিগুণ বড়, রাণীর বর্ণ প্রজার বর্ণ অপেক্ষা অধিক স্বর্ণাভ ও পরিষ্কার, রাণীর হুল বক্র, এবং মস্তিষ্ক ক্ষুদ্রতর। রাণীকে কোন কাজ করিতে হয় না, কাজেই উহার শরীরে মোম রাখিবার বা মধু সঞ্চয় করিবার থলি নাই। নিম্নোদরটী বড় কারণ উহাতে অসংখ্য ডিমধারণোপযোগী থলি থাকে।

নূতন রাণীর প্রয়োজন দুই কারণে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ যখন রাণী বৃদ্ধ হওয়ায় সন্তান প্রসবে অক্ষম হন, তখন সমাজরক্ষার্থ নূতন রাণীর আবির্ভাব প্রার্থনীয় হইয়া পড়ে। পৃথক রক্ষিত ডিম হইতে যে কয়টী রাণীজাতীয় মক্ষিকার জন্ম হয়, তাহাদের একটীকে রাণী পদে বরণ করা হয়। নবীনা রাণী অবশিষ্ট পরিত্যক্ত রাণীগুলিকে শমন-সদনে প্রেরণ করেন। অবসরপ্রাপ্ত রাণীর জন্য পৃথক বাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট হয়; ইহার পর তাঁহার কি হয় সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট তথ্য এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই; তবে কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, নূতন এবং পুরাতন রাণীর মধ্যে বিবাদের আশঙ্কায় প্রজাগণ এক অপূর্ব্ব উপায়ে বৃদ্ধা রাণীকে জগৎ হইতে অপসৃত করে। যাহাকে তাহারা এতকাল আদর যত্ন করিয়া আসিয়াছে তাহাকে সামান্য লোকের ন্যায় বধ করে না। কতকগুলি মক্ষিকা তাহাকে দৃঢ়ভাবে বেষ্টন করে; ইহাতে তাহার নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা থাকে না; এইরূপে আহার ও বায়ু অভাবে সে প্রাণত্যাগ করে। দ্বিতীয়তঃ যখন রাজ্যটী উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হয়, যখন চক্রটী মধুপূর্ণ হইয়া উঠে, এবং কক্ষগুলি সহস্র সহস্র ডিমে ভরিয়া যায়, তখন ভবিষ্যবংশীয়গণের হিতার্থে পুরাতন রাণী অধিকাংশ প্রজাগণকে সঙ্গে লইয়া নূতন রাজ্যস্থাপনের উদ্দেশে বহির্গত হন এবং অবশিষ্ট মক্ষিকাগণ নূতন রাণী নিযুক্ত করে। যে চক্রে ৮০ বা ৯০ সহস্র মক্ষিকা আছে তাহার ৬০ বা ৭০ সহস্র এইরূপে চলিয়া যায়। কোন দৈব দুর্ঘটনায় হঠাৎ প্রসূত মানসিক উত্তেজনা, অবশ্যম্ভাবী বিধিনির্ব্বন্ধ, বা নির্ব্বুদ্ধিতা এই নগরত্যাগের কারণ নহে। ইহার জন্য উহারা যে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যে সময় ইহারা নগরত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয় সেই সময় যদি রাণীজাতীয় মক্ষিকার ডিমগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ইহাদের যাওয়া বন্ধ হয়; ইহারা তখন পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব কার্য্যে মনোনিবেশ করে, এবং আপাততঃ কিছু দিনের জন্য নগরত্যাগের সংকল্প পরিহার করে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে একমাত্র ভবিষ্যবংশধরগণের মঙ্গলের জন্যই ইহারা নিজের সুখসচ্ছন্দে জলাঞ্জলি দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। ইহারা জানে যে জাতীয় উন্নতির জন্য নূতন বংশের উদ্ভব অতীব বাঞ্ছনীয়; নূতন বংশের উপর ইহাদের জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। অতএব ডিমগুলি হইতে নূতন মক্ষিকার জন্ম হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যখন এই অসংখ্য ডিম হইতে মক্ষিকা বাহির হইবে তখন চক্রে পুরাতন ও নূতন উভয় বংশের স্থান হওয়া দুষ্কর হইবে এবং যে আহার্য্য সংগৃহীত হইয়াছে তদ্দ্বারা উভয় বংশের জীবন ধারণ সম্ভব নহে। সুতরাং সমাজের উন্নতির জন্য কতকগুলিকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। এই

মহামন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া ইহারা বিঘ্ন বিপত্তিকে গ্রাহ্য করে না। নগরত্যাগ করিয়া বাহির হইলে কত বিঘ্ন বিপত্তির মুখে পড়িতে হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই; ঝড়, বৃষ্টি, শীত, রৌদ্রে, কীট-পতঙ্গের আক্রমণে, কত মক্ষিকার যে প্রাণ যাইবে তাহার স্থিরতা নাই, তথাপি ইহারা বিচলিত নয়। এরূপ উচ্চদরের আত্মোৎসর্গ, এরূপ একমত, একপ্রাণ হইয়া সমাজের কল্যাণের জন্য স্বার্থত্যাগ মনুষ্যসমাজেও বিরল। স্বজাতির হিতকামনায় একপ্রাণ স্বার্থত্যাগ এক জাপান ছাড়া প্রাচ্য জগতের অন্যত্র অধুনা দৃষ্টিগোচর হয় না। জাপান আজ স্বার্থত্যাগের যে জলন্ত দৃষ্টান্ত লোক-সমক্ষে স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে শুধু প্রাচ্য কেন প্রতীচ্য জগতও স্তম্ভিত হইয়াছেন। যে দেশের জননী স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সহাস্য মুখে পুত্রকে রণে প্রেরণ করিতেছেন, যে দেশের বালক বালিকা পর্য্যন্ত দেশহিত-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত, সে দেশ যে আদর্শদেশ তাহাতে সন্দেহ নাই। মধুমক্ষিকার জীবনে স্বার্থত্যাগের যে মূলমন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় জাপান তাহা আয়ত্ত করিয়াছে। তাই আজ জাপানী বীর বিপদ কাহাকে বলে জানে না; এমন কোন বিপদ নাই স্বদেশের হিতের জন্য যাহার সম্মুখীন হইতে জাপানী যুবক ভয় পায়। এই জন্যই আজ জাপান এত উন্নত। আর যে দেশে "আপনি বাঁচলে বাপের নাম" প্রবচন মধ্যে গণ্য, যে দেশে চাণক্যের ন্যায় কূটনীতিজ্ঞ সমাজ-শিক্ষকের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে দেশের অবস্থা যে শোচনীয় হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যে দেশের লোক আপনার পুত্র কন্যা সুখে থাকিলেই সকল কর্ত্তব্যের অবসান হইল মনে করে, যে দেশের লোক মনে করে "ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া কি হইবে, যে কয়টা দিন আছি এক রকম কাটাইয়া দিই, তাহার পর কে দেখিতে আসিতেছে দেশের কি হইল না হইল." সে দেশ কেন না অধোগতির চরম সীমায় উপনীত হইবে? মধুচক্রের কথা বলিতে বলিতে একটা মধুহীন কথার অবতারণা করিয়া ফেলিয়াছি, সহৃদয় পাঠক ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে চলুন আবার মধুচক্রের নিকট ফিরিয়া যাই।

যে বিশ বা ত্রিশ সহস্র মক্ষিকা চক্রে থাকিয়া গেল তাহারা যে স্বার্থপরবশ হইয়া এরূপ করিল তাহা নহে। তাহারাও ভবিষ্যবংশীয়গণের হিতাকাঙ্ক্ষাপ্রণোদিত হইয়া নগরে অবস্থান করিতে বাধ্য হইল। তাহাদিগকে ডিম-গুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে এবং যখন নূতন মক্ষিকা-গণের জন্ম হইবে তখন তাহাদিগকে পৃথক পৃথক কার্য্যে দীক্ষিত করিতে হইবে। ক্ষুদ্রপ্রাণী মধুমক্ষিকাগণের এইরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। ইহা-দের সকল কার্য্যেই শৃঙ্খলা বিদ্যমান—ইহারা যাহা কিছু করে সকলই সমাজের মঙ্গলের জন্য। ইহাদের কার্য্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর হয় না।

কর্ত্তব্যজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, কোন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া আনন্দে অধীর হয়, সেইরূপ ৬০ বা ৭০ সহস্র মক্ষিকা মহোল্লাসে আনন্দকোলাহল করিতে করিতে নগরত্যাগ করিল। তাহাদের জীবনের এই দিনটী যেন অতি পবিত্র, অতি মহান। তাহারা এতই আনন্দে অধীর যে আজ তাহাদের শত্রু মিত্র জ্ঞান নাই, কেহ তাহাদের অপকার করিলে সে অপকারের প্রতিদান মানসে অপকারকারীকে দংশন করে না। যাহারা মধুমক্ষিকাকে পালন করিয়া মধু সঞ্চয় করে, এই সময় তাহাদের মাহেন্দ্র যোগ। পল্লীগ্রামে কখন কখন এইরূপ মধুমক্ষিকাপালকে উড়িয়া যাইতে দেখা যায়। এই সময় যখন তাহারা বৃক্ষশাখা প্রভৃতিতে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন যদি কোন আধারে তাহাদিগকে ধরা যায় ত তাহারা অনায়াসে ধরা দেয় এবং সেই আধার মধ্যে আপনাদের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া লয়। যদি এরূপ না ধরা যায়—তাহা হইলে ইহারা কোন উপযুক্ত স্থানে আপনাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করে; কখন বৃক্ষের শাখায় বা কোটরে, কখন গৃহপ্রাচীরের গাত্রে বা ছিদ্রমধ্যে চক্র নির্ম্মাণ করে। বস্তুতঃ ইহারা এমন স্থানে বাসা নির্ম্মাণ করে—যে স্থান হইতে পুষ্প মধু আহরণের সুবিধা হইতে পারে।

আধারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কি প্রণালীতে ইহারা চক্র নির্ম্মাণ করে এখানে তাহার আভাস দিতে চেষ্টা করিব। অধিকাংশ মক্ষিকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আধারের গাত্র বহিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করে। যখন সর্ব্বোচ্চস্থানে উপনীত হয় তখন অগ্রবর্ত্তী মক্ষিকাটী স্বীয় সম্মুখস্থ পদের নখ দ্বারা তথায় আপনাকে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করে, এবং যে সকল

মক্ষিকা ইহার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিতি করে তাহারা ইহাকে অবলম্বন করিয়া ঝুলিয়া থাকে; এইরূপ অনেকগুলি শ্রেণী গঠিত হয় এবং শ্রেণীনিচয় পরস্পর মিলিত হইয়া দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে। অবশিষ্ট মক্ষিকাগুলি—যাহারা নিম্নে অবস্থান করে—তৃণ লতাদি সরাইয়া বাসস্থানটীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতে থাকে; ইহাদের কতকগুলি আবার পুষ্প পরাগ আহরণের জন্য বাহিরে বহির্গত হয়, এবং কতকগুলি রাস্তা-ঘাট রক্ষা করিতে থাকে।—আধারগাত্রে নিশ্চেষ্টভাবে বর্ত্তমান শ্রেণীবদ্ধ মক্ষিকাগুলি ১৮ হইতে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে অবস্থান করে, এই সময়ের মধ্যে ইহাদের নিম্নোদর প্রান্তে যে ছোট ছোট চারিটী থলি আছে তাহাদের মুখ হইতে স্বচ্ছ শ্বেতবর্ণ ঘর্ম্মবিন্দুর ন্যায় একপ্রকার পদার্থ বহির্গত হয়। ইহাই পরে মোমরূপে পরিণত হয়। পরস্পরে সংবদ্ধভাবে অবস্থানহেতু উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় এবং উষ্ণতার বৃদ্ধি প্রযুক্ত থলিমধ্যস্থিত মধুই মোমের উপাদানে পরিণত হয়। যখন প্রায় সকল মক্ষিকার গাত্রে এই পদার্থের উদ্ভব হয় তখন হঠাৎ একটী মক্ষিকা আপনাকে শ্রেণীবন্ধন হইতে বিচ্যুত করিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিয়া পড়ে এবং স্বীয় গাত্রোদ্ভূত মোমকে কখনও বিস্তৃত, কখনও কর্ত্তন, কখনও সমতল করে; এইরূপে নিপুণ সূত্রধারের ন্যায় মোমটুকুকে প্রয়োজনানুরূপ আকার প্রদান করিয়া আধারগাত্রে সংলগ্ন করিয়া দেয়, ও তাহার পর নামিয়া আসে। তৎক্ষণাৎ আর একটী মক্ষিকা উপরে উঠে। এবং স্বীয় গাত্রের মোমটুকুকে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রথম মক্ষিকা স্থাপিত মোমের সহিত সংবদ্ধ করিয়া দেয়। এক এক করিয়া ক্রমশঃ সকল মক্ষিকাই এইরূপ করিতে থাকে। কিয়ৎকালের মধ্যে আধারাভ্যন্তরের উপরিভাগে মোমের একটী আবরণ নির্ম্মিত হইয়া যায়। ইহার পর কক্ষনির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। যাহারা মোম উৎপাদন করে তাহারা এ কাজ করে না। স্থপতিবিদ্যানিপুণ মক্ষিকাগণ এক এক করিয়া উপরে উঠিতে থাকে এবং মোমের আবরণটী হইতে কক্ষ নির্ম্মাণআরম্ভ করিয়া দেয়। সকল কক্ষগুলি বেশ সামঞ্জস্যের সহিত নির্ম্মিত হয়। স্থপতিগণ এক্ষণে নামিয়া আসে এবং মোম উৎপাদনকারী মক্ষিকাগণ পুনরায় উপরে উঠিয়া পূর্ব্বআবরণের পার্শ্বে আর একটী মোমের আবরণ গঠিত করে; আবার স্থপতিগণ উঠিয়া দ্বিতীয় আবরণের উপর কক্ষ উঠাইয়া দেয়। এইরূপে তিন চারিটী আবরণের উপর কক্ষ গঠিত হয়। এই সকল কক্ষশ্রেণীর মধ্যে যাতায়াতের পথ থাকে। কক্ষগুলি এমন ভাবে দক্ষতার সহিত নির্ম্মিত হয় যে এক একটী দেখিতে ষড়্‌ভুজবিশিষ্ট নলের ন্যায় হয়। গণিতজ্ঞগণ জানেন যে একটী সমতল ক্ষেত্রকে কাটিয়া কক্ষশ্রেণীতে পরিণত করিতে হইলে তিনটী উপায়ে ইহা সিদ্ধ হইতে পারে। হয় কক্ষগুলিকে ত্রিভুজ, না হয় চতুর্ভুজ, না হয় ষড়্‌ভুজ করা। এরূপ করিলে কক্ষগুলির অন্তরালে অনাবশ্যক ব্যবধান থাকিয়া যায় না। এই তিন প্রকার কক্ষের মধ্যে ষড়্‌ভুজ কক্ষই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ও দীর্ঘ-কালস্থায়ী। আশ্চর্য্যের বিষয় ক্ষুদ্রপ্রাণী মধুমক্ষিকা এরূপ দক্ষতার সহিত নিজ কক্ষগুলিকে ষড়্‌ভুজবিশিষ্ট করে যেন উহা গভীর গণিতশাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত আছে।

যে সকল কক্ষ নির্ম্মিত হইল তাহাদের কয়েকটী অন্য গুলি হইতে ভিন্ন প্রকারের; এগুলি রাণীর বাসগৃহ। কতকগুলি বড় রকমের; এগুলিতে পুরুষজাতীয় মক্ষিকারা থাকিবে। অবশিষ্ট কক্ষগুলিতে অন্যান্য মক্ষিকাগণ থাকিবে এবং আহার্য্য দ্রব্যাদিও রাখা হইবে। চক্রনির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হইলে রাণী ডিম পাড়িতে আরম্ভ করেন। তিনি কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে থাকেন, আর এক একটী কক্ষে একএকটী ডিম পাড়িতে থাকেন। কক্ষে ডিম রাখিবার পূর্ব্বে তাহার মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইয়া দেখিয়া লন তাহাতে অন্য ডিম নাই; এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে এক কক্ষে একাধিক ডিম থাকিয়া না যায়। এইরূপে তিনি প্রত্যহই ডিম পাড়িতে থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে রাণী জানেন কোন ডিম হইতে পুরুষ এবং কোনটী হইতে স্ত্রী জন্মিবে। এই ক্ষমতা থাকায় যে ডিমটীর যে স্থান সেই স্থানেই তিনি তাহাকে রাখিয়া দেন। বস্তুতঃ রাণী ইচ্ছামত পুরুষ বা স্ত্রী জাতীয় ডিম পাড়েন। কিন্তু পরিণীতা হইবার পূর্ব্বে অনূঢ়া রাণী কেবল পুরুষ ডিমই প্রসব করে। বিবাহের পরে যে সকল ডিম প্রসব করে তাহাদের অধিকাংশ স্ত্রী-জাতীয়।

এইরূপে নবচক্রটী ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রজাগণের অবিরাম পরিশ্রমে, অত্যাশ্চর্য্য অধ্যবসায়

বলে, মধুর ভাণ্ডার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে; রাণীর প্রাত্যহিক ডিম প্রসব হেতু সহস্র সহস্র ডিম জন্মিতে থাকে, এবং ডিম হইতে ক্রমশঃ নূতন মক্ষিকা উদ্ভূত হইতে থাকে। কিছু দিন পরে যখন নগরটী সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে তখন আবার সমাজস্থিতের জন্য অধিকাংশ মক্ষিকা অবশিষ্ট মক্ষিকার উপর ভবিষ্যতের আশাস্থল ডিমগুলির রক্ষাভার অর্পণ করিয়া স্বার্থত্যাগের অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে রাখিয়া অন্যত্র বাসস্থান নির্ম্মাণের জন্য অত্যুৎসাহের সহিত বিপদ সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়।

জাতীয় উন্নতিকল্পে স্বদেশত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিবার প্রথা সকল নগরে এক নহে। কোন কোন নগর হইতে মক্ষিকাগণ একবারের অধিক চলিয়া যায় না; কোথাও আবার শীঘ্র শীঘ্র পর্য্যায়ক্রমে দুই তিন বা চারি দল বাহির হইয়া যায়। প্রথম দল চলিয়া যাইবার পর নগরে রাণীর অভাব হয়, কারণ রাণী উপনিবেশ স্থাপনোদ্দেশে বহির্গত মক্ষিকাগণের সহিত চলিয়া যান। রাণীজাতীয় মক্ষিকার যে সকল ডিম থাকে তাহা হইতে কখন কখন চারি পাঁচ বা ততোধিক রাণীর জন্ম হয়। কোন কোন নগরে প্রথম যেটীর জন্ম হয় সেইটীই রাণীপদে বরিতা হয় এবং এই রাণী অন্যগুলিকে বধ করেন। এরূপ স্থলে আর শীঘ্র উপনিবেশিকের দল গঠিত হয় না। কোন কোন নগরে আবার এক একটী নূতন রাণীর সহিত এক এক দল মক্ষিকা বাহির হইয়া যায় এবং কোন দৈবদুর্ব্বিপাক না ঘটিলে অন্যত্র যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে।

স্ত্রীজাতীয় বন্ধ্যা মক্ষিকাগণই নগরের সকল কার্য্য সম্পন্ন করে। ইহারা সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যাপৃত। নিজে অলস নয় বলিয়া ইহারা আলস্য সহ্য করিতে পারে না। পুরুষ জাতীয় মক্ষিকাগণ বড়ই অলস; তাহারা কোন কাজই করে না; কেবল খায় আর ঘুমায়। এইজন্য স্ত্রীগণ ইহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। ইহাদের একটীর সহিত রাণীর মিলন হইবে এবং সেই মিলনের উপর ভবিষ্যৎ জাতীয় উন্নতি নির্ভর করিতেছে, এই জন্যই পুরুষদিগকে একবারে জন্মমাত্রই জীবনচ্যুত করে না। এই মিলনের সময় পুরুষগণ আপনা আপনিই কালকবলে পতিত হয়। মিলন নগরের বাহিরে সমাধা হয়। ইহার সময় উপস্থিত হইলে রাণী নগর হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধাকাশে প্রবলবেগে উঠিতে আরম্ভ করেন এবং পুরুষগণ তাঁহার অনুসরণ করে। ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত অলস-স্বভাব পুরুষগণ অত্যধিক পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুইটী পুরুষও জীবিত থাকে ততক্ষণ রাণী উঠিতে থাকেন। ইহাদের একটী যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন অন্যটীর সহিত তাঁহার মিলন হয়। এতদ্দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ পুরুষের সহিত এ মিলন সমাধা হয়। আবার ঈশ্বরের এমনই অদ্ভুত নিয়ম যে মিলনের অনতিবিলম্বেই পুরুষটী প্রাণ হারায়। অতঃপর রাণী নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রজাগণ মহোল্লাসে তাঁহার অভ্যর্থনা করে।

মধুমক্ষিকা বিষয়ে জ্ঞাতব্য আরও অনেক তত্ত্ব আছে। সে সকলের উল্লেখ দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি সম্পাদন করিতে চাহি না। যে দু' একটা বিষয় এ প্রবন্ধে আলোচিত হইল, তাহা হইতে আমরা মধুমক্ষিকা জীবনের মূলতত্ত্বের একটা স্থূল ধারণা করিতে পারি। আমরা দেখিতে পাই মধুমক্ষিকার জীবন কর্ম্মময়, আলস্য কাহাকে বলে ইহারা জানে না; পুরুষ মক্ষিকাগণ অলস বলিয়া তাহাদের জীবনের পরিণাম অতি ভয়াবহ; মধুমক্ষিকার মধ্যে কেমন সুন্দর কর্ম্মবিভাগ-প্রণালী বর্ত্তমান; সর্ব্বোপরি ইহাদের কি মহান্ আত্মত্যাগ—সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থের বিসর্জ্জন। আর কিছুর সম্মুখে না হউক ইহাদের একপ্রাণ আত্মোৎসর্গের সম্মুখে মনুষ্যকেও নতশির হইতে হয়।

শ্রীঅধরচন্দ্র মিত্র।

খেওড়ার লবণের খনি।

সুদূর পঞ্জাবের পশ্চিম প্রান্তে খেওড়ার লবণের খনি প্রসিদ্ধ। অম্বালা হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত যে রেলপথ গিয়াছে, এই পথে লালামুসা জংশন নামে একটি ষ্টেশন আছে; উক্ত ষ্টেশন লাহোর হইতে ৬২ মাইল উত্তরে। তথা হইতে ৬০ মাইল পশ্চিমে খেওড়া ষ্টেশন। পৃথিবীর মধ্যে

অন্য কোনও স্থানে এরূপ বৃহৎ লবণের খনি নাই; ভারতবর্ষেই সমুদ্র ব্যতীত রাজপুতানার অন্তর্গত সম্বর নামক হ্রদ এবং খেওড়ার খনিই লবণের প্রধান উৎপত্তিস্থল। তন্মধ্যে শেষোক্তটিকেই প্রধানতম বলিতে হইবে। লবণ গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া ব্যবসা। মনুষ্যের এরূপ নিত্য-ব্যবহার্য্য এবং প্রধান দ্রব্য একচেটিয়া করা এবং উহার কর অসম্ভবরূপ অধিক রাখা গবর্ণমেণ্টের কখনই শ্লাঘার বিষয় নহে। বাস্তবিক আমরা যাহা দেখিলাম, তাহাতে প্রকৃতিদেবীর ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে মণ প্রতি এক পয়সাও খরচ হয় কি না সন্দেহ; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ঐ খনিতেই উহা ২৲ মণ হিসাবে বিক্রয় করিতেছেন। পূর্ব্বে উহা ২৷৷০ টাকা মণ হিসাবে বিক্রয় হইত, এক্ষণে লর্ড কর্জ্জন ৷৷০ আনা কমাইয়া অশেষ বদান্যতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। উক্ত খনির নাম "মেয়ো সল্ট মাইন"; লর্ড মেয়োর সময় হইতেই ইহা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

সম্প্রতি আমরা খেওড়ার খনি দেখিতে গিয়াছিলাম। দুই তিন স্থানে গাড়ী বদল করিয়া রাত্রি দুইটার সময়ে খেওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। খেওড়া স্থানটি তিন দিকে পাহাড় বেষ্টিত কঙ্করময় অসমতল ভূমি। এবং একদিকে যতদূর দৃষ্টিগোচর হয় "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" সমতল ভূমির মধ্য দিয়া প্রবলবাহিনী "ঝিলম" নদী রজতখণ্ডের ন্যায় তরতর করিয়া চলিয়াছে। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে দেখিলাম প্রবল বাতাসের সহিত প্রচুর পরিমাণে কঙ্কর-কণা উড়িতেছে। আমরা মনে করিলাম বুঝি আজি ঝড় হইতেছে কিন্তু তাহা নহে, এখানে প্রত্যহই এই প্রকার ঝড় বহিতে থাকে। ষ্টেশনের নিকটেই একটি ডাক-বাংলায় আমরা আশ্রয় লইলাম। প্রাতে উঠিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল বুঝি আমরা আরব দেশে আসিলাম; বাস্তবিক তথায় অসংখ্য উষ্ট্র, যে দিকে দৃষ্টি যায়, সেই দিকেই উষ্ট্র। কেহ বা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে চড়িয়াছে, কেহ বা মাল বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতেছে। লবণ-ব্যবসায়িগণ দলে দলে উষ্ট্র বোঝাই করিয়া লবণ লইয়া যাইতেছে। উষ্ট্র এবং অশ্বতরী ব্যতীত সে প্রদেশে অন্য কোন প্রকার যান নাই। চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে বাবলা গাছ আছে; তদ্ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার গাছ নাই। শ্রান্ত হইলে পথিকগণ ইহার তলে আশ্রয়লাভ করে এবং ইহার পাতাই উষ্ট্রের প্রধান আহার। উষ্ট্রের দুগ্ধ এখানকার লোকে পান করে, এবং উহার দধি প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। উষ্ট্রের বিষ্ঠা তথায় জ্বালানী কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় দেখিলাম। বস্তুতঃ উষ্ট্রই তথাকার লোকেদের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায়। লোকসংখ্যা নিতান্ত অল্প। তিন চারি জন বাঙ্গালী সেখানে লবণ-বিভাগে কার্য্য করেন। বস্তুতঃ এমন সুদূর প্রদেশেও বাঙ্গালী আছেন দেখিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। স্বদেশী আন্দোলনের কল্যাণে এ দৃশ্য বোধ হয় আর বেশী দিন দেখিতে পাইব না।

ষ্টেশন হইতে খনি প্রায় দুই মাইল পথ। পাশ ব্যতীত তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার নিয়ম নাই। পাশ সংগ্রহ হইলে বেলা তিনটার সময় আমরা খনির মুখে উপস্থিত হইলাম। ভিতরে ভয়ানক অন্ধকার বলিয়া দর্শকগণকে এইখান হইতে ইচ্ছামত আলোক ও বাতী ইত্যাদি লইয়া যাইতে হয়। একজন পথপ্রদর্শক, এবং কয়েকটা আলোক ও বাতী-মশালধারী লোকের সহিত আমরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ভিতরের বায়ু রুদ্ধ থাকায় এবং বারুদ ও গন্ধকের গন্ধে আমাদের শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। যাহা হউক, আলোকের সাহায্যে লবণনির্ম্মিত সুড়ঙ্গ দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। খানিক দূর গিয়া দেখিলাম, পথ অত্যন্ত দুর্গম; কোনও স্থানে বা দুই তলা সমান নামিতে হয়, কোথাও বা খুব উচ্চে উঠিতে হয়। কোন কোন স্থানে এদিক হইতে ওদিকে যাইবার জন্য লবণনির্ম্মিত বড় বড় সেতু আছে। লবণনির্ম্মিত সুড়ঙ্গ দিয়া আমরা বরাবর চলিতে লাগিলাম; লবণের পথ, তাহার উপর দিয়া লবণ বোঝাই ট্রাম অবিরত যাতায়াত করিতেছে; লবণের দেওয়াল আলোকের সাহায্যে ঝকমক করিয়া জ্বলিতেছে; যেন মনে হইল অসংখ্য হীরক জ্বলিতেছে। বটের ঝুরির ন্যায় লম্বা লম্বা শুভ্রবর্ণ অসংখ্য লবণের ঝুরি ঝুলিতেছে, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। মনে হইল জগদীশ্বর প্রকৃতিরাজ্যে কত স্থানে কত প্রকার আশ্চর্য্য দৃশ্য পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা আমরা

কল্পনায়ও আনিতে পারি না ; বাস্তবিক ক্ষুদ্র জীবের জন্য দয়াময় নিজের দয়ার উৎস উন্মুক্ত করিয়া আমাদের যে কত প্রকার কল্যাণ সাধন করিতেছেন, অকৃতজ্ঞ মানব আমরা সে বিষয়ে একবার চিন্তাও করি না।

কিয়ৎদূর অগ্রসর হইলে আমরা এক স্থানে উপস্থিত হইলাম ; তথায় পথপ্রদর্শক বলিল, ইহা লবণের বাগান ; দেখিলাম তথায় লবণনির্ম্মিত ফল ও ফলের ন্যায় অনেকগুলি হইয়া আছে। তথা হইতে আরও খানিক দূর গিয়া প্রায় একতলা সমান নীচে নামিয়া আমরা এক ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে উপস্থিত হইলাম ; এই স্থানে যাইবার পথটি অত্যন্ত অপ্রশস্ত, এবং অসমতল। যাহা হউক, তথায় উপস্থিত হইলে পথদর্শক আমাদের তথায় খুব সাবধানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিল। সে স্থানে এরূপ ভয়ানক অন্ধকার যে দশ বারোটা আলোকের সাহায্যেও আমরা অতি নিকটের বস্তু ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সেখানে কয়েকটা বংশশাল এবং অন্যান্য কয়েকটা আলোকের সাহায্যে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম ; দেখিলাম আমরা একটি প্রকাণ্ড হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া আছি ; সম্মুখে প্রায় এক হাত প্রশস্ত একখানি কাষ্ঠের তক্তা দেওয়া আছে, তাহার পরই অগাধ জল। হ্রদের মধ্যে একখানি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে ; দর্শকগণ ইচ্ছা করিলে তাহাতে চড়িয়া ভ্রমণ করিতে পারেন। কিন্তু উহা অতীব দুঃসাহসিক ব্যাপার। জল অতি স্বচ্ছ, জলের নীচে স্থানে স্থানে চিনার বস্তার ন্যায় রাশি রাশি লবণ জমাট বাঁধিয়া আছে ; নির্ম্মল জলে তাহা সমস্তই দেখা যাইতেছে। হ্রদটি কত গভীর জানিতে ইচ্ছুক হইলে পথপ্রদর্শক বলিল, ইহা কত গভীর তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারা যায় নাই। দুই চারি জন দর্শক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ইহার গভীরতা নির্ণয় করিতে গিয়া ইহার মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার নির্ম্মল নীল লবণাক্ত জল দেখিয়া মনে হইল ইহা সমুদ্রের এক অংশ। বাস্তবিক আমাদের এ ধারণা নিতান্ত অমূলক হয় নাই। কারণ এক স্থানের লবণের প্রাচীরের মধ্যে দেখিলাম, একটি অতি পুরাতন গাছের গুঁড়ির কিয়দংশ লবণের সহিত জমাট বাঁধিয়া আছে। ঐ বৃক্ষটি যে কত দিনের পুরাতন তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। দুই একজন প্রত্নতত্ত্ববিৎ ঐ কাষ্ঠের কিয়দংশ কর্ত্তন করিয়া পরীক্ষার জন্য বিলাতে লইয়া গিয়াছেন ; এবং উহা এক্ষণে বিলাতের ব্রিটিস্ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। উহা কি বৃক্ষ এবং কত দিনের পুরাতন তাহা স্থির হইলে খনিটি যে কত দিনের পুরাতন তাহা স্থির হইতে পারে। সম্ভবতঃ বহু পূর্ব্বে এই স্থানে সমুদ্র ছিল, কালক্রমে সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায়, উহার লবণরাশি একত্রিত হইয়া এক্ষণে খনির আকার ধারণ করিয়াছে। আমার এ অনুমান সত্য কি না প্রত্নতত্ত্ববিদেরা তাহা স্থির করিবেন। আমরা শুধু দর্শকরূপে গিয়াছিলাম, সুতরাং যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। তথা হইতে কিছু দূর গিয়া আমরা আর এক স্থানে উপস্থিত হইলাম ; পথদর্শক আমাদের উপরিভাগে দৃষ্টিপাত করিতে বলাতে, দেখিলাম উপরিভাগে অতি উচ্চে একটি ক্ষুদ্র পথে তারকার ন্যায় একটি আলোক দেখা যাইতেছে। ভিতরের রুদ্ধ বায়ুনির্গমের জন্য খনির উপরিভাগে ঐরূপ একটি ছিদ্র রাখা হইয়াছে। তথায় একটা ফানস ছাড়া হইল ; মুহূর্ত্তের মধ্যে ফানসটি ছিদ্রের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তথা হইতে তাহা একটি তারকার ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল।

তথা হইতে কিছু দূর গিয়া প্রায় তিন চারি তলা সমান লবণের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া যে স্থানে লবণ কাটা হইতেছে আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে বালক বালিকা স্ত্রীলোক এবং পুরুষ সর্ব্বসমেত প্রায় পাঁচ শত লোক কাজ করিতেছে। এইরূপ কাজ এই খনির মধ্যে বহু স্থানে হইতেছে, শুনিলাম প্রায় ৪০০০ লোক এই খনির মধ্যে কাজ করিতেছে। প্রত্যেকের হাতে এক একটি খনির উপযোগী লৌহনির্ম্মিত প্রদীপ, প্রত্যেক প্রদীপে একটি করিয়া শিকলি সংযুক্ত আছে ; খনকগণ আবশ্যক মত তাহা লবণের দেওয়ালে বা অন্য কোনও স্থানে সংযুক্ত করিয়া কাজ করে। শুনিলাম গবর্ণমেণ্টের সহিত ইহাদের চুক্তি হিসাবে কার্য্য হয়, তাহাতে ইহাদের লাভ অতি অল্পই থাকে ; গ্রাসাচ্ছাদনও স্বচ্ছন্দরূপে হয় কি না সন্দেহ। বালকবালিকাগণের বিষণ্ণ মুখ এবং কঙ্কালসার আকৃতি দেখিলে পাষণ্ডেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। অনবরত রুদ্ধ বায়ুতে থাকায় ইহাদের

শরীরের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হইয়াছে। সকলেরই পরিধান প্রায় একরূপ। লবণবিভাগে গবর্ণমেণ্টের যেরূপ লাভ, তাহাতে এই সকল মজুরদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পুরুষগণ সকলেই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থান কর্ত্তন করিতে ব্যস্ত। বড় বড় শাবলের দ্বারা লবণরাশির মধ্যে গর্ত্ত করিয়া ডাইনামাইট দ্বারা ফাটান হইতেছে; সে শব্দ বজ্রনিনাদের ন্যায় সমস্ত খনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ডাইনামাইট পুরিবার উপযোগী প্রায় ১ হাত ছিদ্র করিতে দুই ঘণ্টারও অধিক সময়ের আবশ্যক হয়। ইহা অতীব শ্রমসাধ্য কার্য্য। তথায় বারুদের গন্ধে এবং রুদ্ধ বাষ্পে আমাদের নিশ্বাস গ্রহণ করা অতি কষ্টকর হইয়া উঠিল ঐরূপ স্থানে সমস্তদিন থাকিয়া এরূপ কঠিন পরিশ্রম করা যে কতদূর কষ্টকর, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন কিন্তু হতভাগ্যগণের উদরের জ্বালায় এ সমস্তই করিতে হয়। স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাগণ, কর্ত্তিত লবণ বহন করিয়া সমতল স্থানে আনিয়া একত্র করিতেছে; তথা হইতে টুলি বোঝাই করিয়া খনি হইতে বাহিরে আনা হইতেছে। তথা হইতে এইরূপ আরও কয়েকটি স্থান দেখিয়া ক্রমে বাহির হইয়া আসিলাম; সন্ধ্যার সময় খনির কার্য্য বন্ধ হইয়া যায় সুতরাং আমরা সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিলাম। পরিষ্কার বায়ুর অভাবে যে কিরূপ ভয়ানক কষ্ট হয় তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিলাম। বাহিরে আসিবার সুড়ঙ্গ পথ নিকটবর্ত্তী হইলে পথদর্শক আমাদের অতি আস্তে আস্তে যাইতে বলিল। কারণ রুদ্ধবায়ু হইতে সহসা বিশুদ্ধ বায়ুতে আসিলে মূর্চ্ছিত হইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাহিরে আসিলাম। সেদিন আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সুতরাং সেদিন আর কিছু দেখিতে পারিলাম না।

পরদিন প্রাতে আমরা খেওড়ার বাজার এবং লবণের মণ্ডি (Market) দেখিতে গেলাম; খেওড়ার বাজার অতি সামান্য। দুই একখানি দুগ্ধ দধির, দুই একখানি রুটির এবং অন্যান্য সামগ্রীর দুই একখানি, সর্ব্বসমেত সাত আট খানি দোকান লইয়া বাজার। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাজার বন্ধ হইয়া যায়। বাজার দেখা হইলে আমরা মণ্ডি দেখিতে গেলাম। উহা একটি দেখিবার যোগ্য স্থান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে খনি হইতে কর্ত্তিত লবণ টুলি করিয়া খনি হইতে কিছু দূরে একস্থানে আনিয়া জমা করা হয়। প্রায় ১ মাইল বিস্তৃত এবং প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ লবণের চাপ স্তূপাকারে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে; ব্যবসায়িগণ দলে দলে আসিয়া উহা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছে।

খেওড়া হইতে ১৮ মাইল দূরে ৺কটাস্ নামক তীর্থ আছে। ইহা একটি পীঠস্থান। এই স্থানে ভগবতীর বামচক্ষু পতিত হইয়াছে। উহা হিন্দুগণের একটি প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। বারান্তরে উহার বিষয় লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমতী প্রিয়বালা দেবী।

হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় উদ্ভিদাবলী।

১৬। চেউলী (Bassia butyracea)।

এই বৃক্ষ হিমালয় পাহাড়ে কুমায়ুন হইতে ভূটান পর্য্যন্ত জন্মায়। ঐ অঞ্চলে ইহাকে চিউরা, চেউলী, ফলবরা ও চ্যুরি বলে।

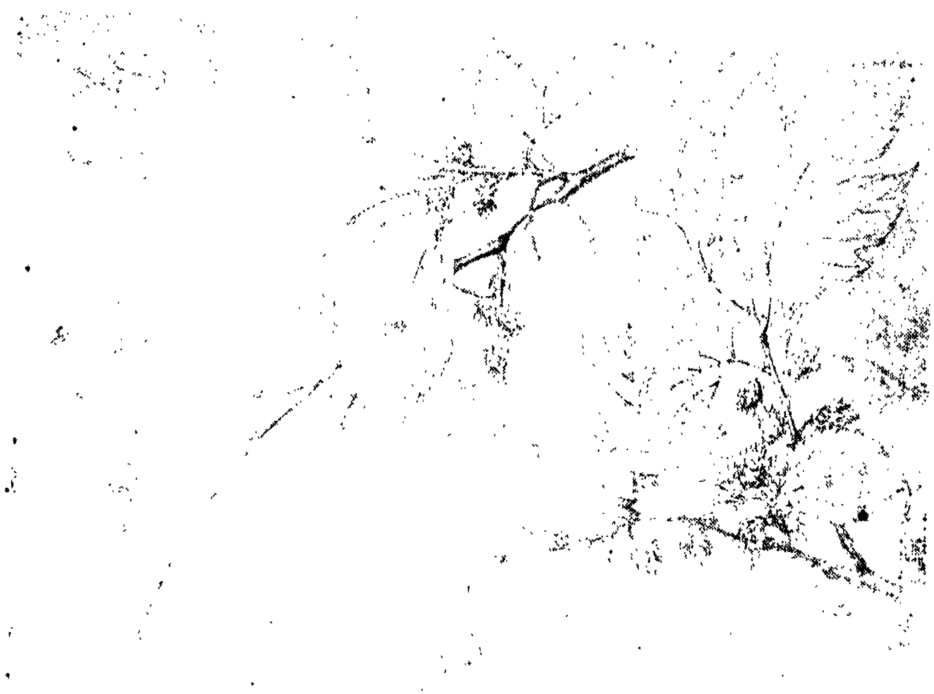
ইহার বীজ হইতে প্রচুর পরিমাণে তৈল পাওয়া যায়। ঐ তৈল দেখিতে প্রায় মাখনের মত। এই জন্য ইহা ঘী ভেজাল করিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রদীপে পোড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই তৈল হইতে সাবান এবং বাতি প্রস্তুত করিতে পারা যায়। বাত রোগে এই তৈল অতি উপকারী। গোলাবের আতরের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ইহা মাথায় লাগাইলে কেশ বর্দ্ধন করে।

ইহার ফল পুষ্টিকর বলিয়া পর্ব্বতবাসীরা খায়।

১৭। তূত (Morus alba)।

তূতের গাছ পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

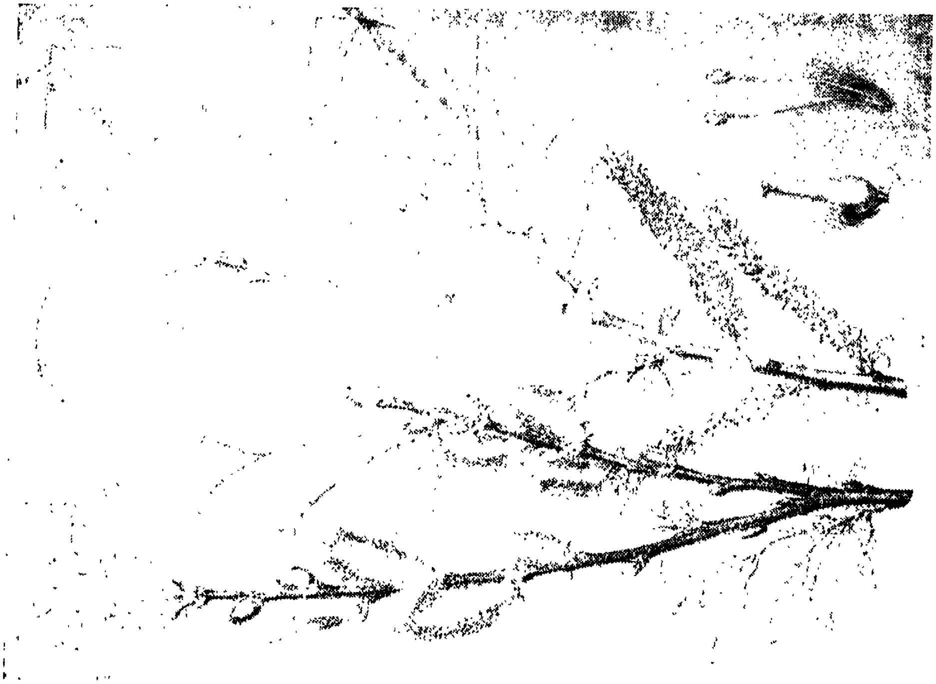
ইহার ফল অতি সুস্বাদ বলিয়া লোকেরা ভক্ষণ করে। আফগানিস্থানে পাঠানেরা ইহার ফল শুকাইয়া ও চূর্ণ করিয়া, তাহার রুটি প্রস্তুত করে। এই রুটি খুব সুস্বাদ ও পুষ্টিকর।



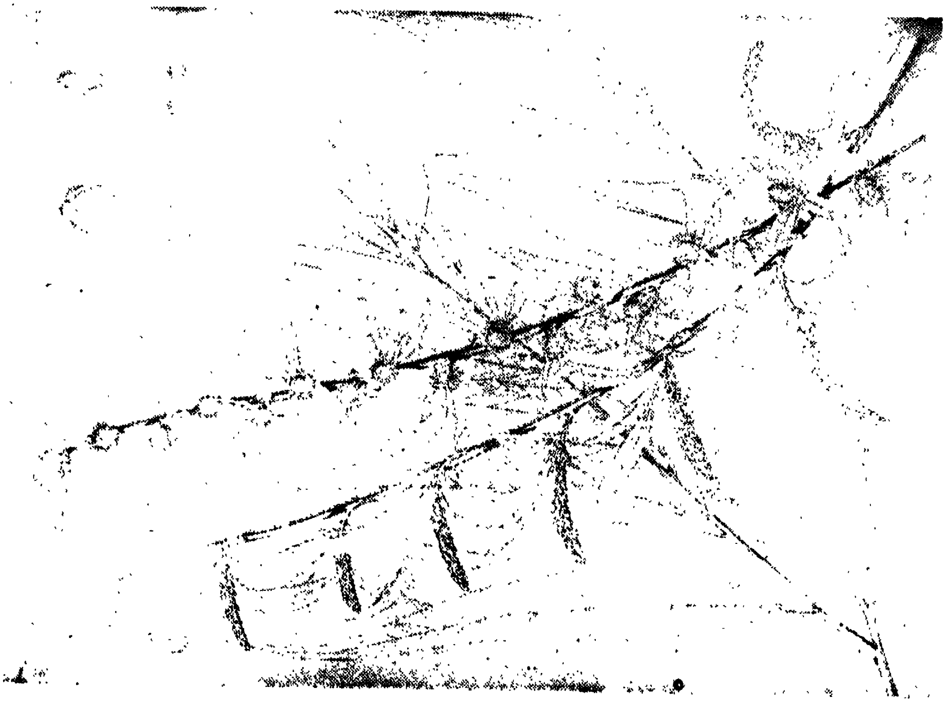
১৭। তুঁত (Morus alba)।



১৬। চেউরী (Bassia butyracea)।



১৭। বেদমুস্ক (Salix Caprea.)



১৮। স্যালিক্স বাবিলোনিকা (Salix babylonica.)



২০। বহন (Populus euphratica)।



২১। চিলগোজার গাছ (Pinus Gerardiana)।

এই ফলের রস জ্বররোগীকে দেওয়া হয়। তাহাতে পিপাসা নিবৃত্ত হয়। হাকিমেরা ইহার ফল অজীর্ণতা ও গলার ব্যথার জন্য দিয়া থাকেন।

এই গাছের ছাল কৃমিনাশক ও রেচক বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

কাশ্মীর প্রদেশে ও অন্যত্র এই গাছের পাতা রেশমের গুটিপোকার খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা গরুকে খাইতে দিলে, তাহাদের দুধ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

এই গাছের কাঠ গৃহ নির্ম্মাণ, নৌকা ও আসবাব প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে ব্যবহৃত হয়।

১৮। স্যালিক্স বাবিলোনিকা (Salix babylonica)।

এই বৃক্ষ উত্তর ভারতে জন্মায়। ইহার পাতা হইতে স্যালিসিন (Salicin) বলিয়া একরূপ পদার্থ পাওয়া যায়। উহা জ্বরেতে ব্যবহৃত হয়।

এই বৃক্ষের ছাল কৃমিনাশক।

ইহার কাঠ হইতে ক্রিকেট খেলিবার ব্যাট্ প্রস্তুত হয়। তদ্ভিন্ন ইহার শাখা হইতে ঝুড়ি প্রভৃতি নানাবিধ নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিস প্রস্তুত হয়।

১৯। বেদমুষ্ক (Salix Caprea)।

উত্তর-পশ্চিম ভারত ও রোহিলখণ্ড প্রদেশে এই বৃক্ষ বেদমুষ্‌ক্ নামে প্রসিদ্ধ।

এই বৃক্ষের ফুল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া আরক প্রস্তুত করা হয়। ঐ আরক নানা রোগে হাকিমেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাথা ব্যথা ও চোখ উঠায় ঐ আরক বিশেষ উপকারী।

ইহার পাতার ক্বাথ জ্বরে উপকারী। কাশ্মীর প্রদেশে এই বৃক্ষের ফুল হইতে আতর প্রস্তুত করা হয়। এই আতর সুগন্ধিরূপে ব্যবহৃত হয়।

২০। বহন (Populus euphratica)।

এইবৃক্ষ সিন্ধুনদ তটে ও সিন্ধুদেশে জন্মায়। পাঞ্জাবী ও সিন্ধী ভাষায় ইহাকে বহন ও সফেদা বলে।

ইহার ছাল কৃমিনাশক বলিয়া ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

ইহার পাতা উট ও ছাগল প্রভৃতির খাদ্য।

ইহার কাঠ নৌকা ও গৃহ নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়।

পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে ইহার শাখা দাঁতনরূপে ব্যবহৃত হয়।

২১। চিলগোজার গাছ (Pinus Gerardiana)।

এই গাছ উত্তর-পশ্চিম হিমালয় প্রদেশে জন্মায়।

ইহার ফল চিলগোজা ও নেওজা নামে উত্তর ভারতে প্রসিদ্ধ।

এই গাছের কাঠে প্রচুর পরিমাণে তারপিন তৈল পাওয়া যায়।

ইহার ফল হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা নানারোগে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

ইহার বীজ বাদামের মত ব্যবহৃত হয়। কুনাবর প্রদেশের অধিবাসীরা ইহার বীজ চূর্ণ করিয়া, আটার সহিত মিশ্রিত করিয়া, রুটি প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করে।

এই বৃক্ষের কাঠে অনেক তৈল থাকে বলিয়া উহা মশাল রূপে ব্যবহৃত হয়।

দেশীয় চরকা ও তাহার উন্নতি।

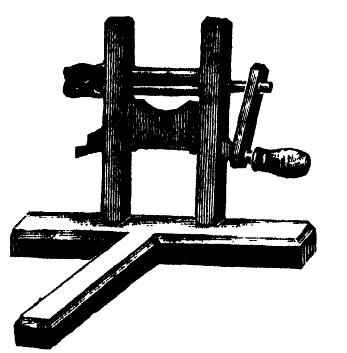
ইদানীং বঙ্গদেশে চরকা এত দুর্লভ হইয়াছে যে, তাহা অনেকেরই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কদাচিৎ কোন গ্রামে ব্রাহ্মণ-বিধবা চরকায় পৈতার সূতা কাটিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। যাঁহারা চরকা দিয়া সূতা কাটা দেখেন নাই, উহার দোষগুণ তাঁহাদের সম্যক্ বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। চরকায় সূতা কাটা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মনে হয়, এমন অনায়াসনির্ম্মাণযোগ্য যৎসামান্য যন্ত্র দ্বারা কার্পাস তুলের ন্যায় সূক্ষ্ম ও হ্রস্ব রোম-* যোগে সূত্র-কর্ত্তনে কলা-কৌশলের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। যিনি চরকা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তিনি ধন্য! যে দেশে উহার উদ্ভাবন হইয়াছিল, সে দেশ ধন্য! বলা বাহুল্য, সে দেশ এই-ই দেশ। কারণ সেই প্রাচীন কালে—যে কালে আর্য্য পিতামহগণ কার্পাসবস্ত্র পরিধান আরম্ভ করিয়াছিলেন—সেই প্রাচীন কালে পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি কার্পাসবস্ত্রের প্রয়োজন

* চলিত শব্দ রোয়া বা রোঁয়া। ইহা রোম বা লোম শব্দের অপভ্রংশ। কার্পাস তুল কার্পাস বীজের ত্বকের রোমই বটে, পাট বা শণের ন্যায় আঁশ অর্থাৎ অংশু নহে।

অনুভূত হয় নাই। অথচ এদেশের একটা মিথ্যা দুর্নাম রটিয়াছে যে, প্রাচীনেরা শিল্পী ছিলেন না!

বস্তুতঃ আর কোন্ দেশ আছে যে দেশের যন্ত্র এমন সুসাধ্য অথচ সূক্ষ্মকর্ম্মযোগ্য কিংবা কার্য্যের বিশেষ উপযোগী। স্থূল যন্ত্রের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ঢেঁকি দেখুন। উহার উপযোগিতার তুলনা নাই। সূক্ষ্ম যন্ত্রের মধ্যে সূত্রধরের ভ্রমর-যন্ত্র (তুরপন) ধরুন। কাঠের, কপাটের, দরজার যেখানে ইচ্ছা, সেই খানেই ছিদ্র করুন; ভ্রমর এবং একগাছা দড়ী (জিনবাড়ী) পাইলেই হইল। ইহাদের নিমিত্ত কোন কারখানায় যাইতে হয় না, বিশ্বকর্ম্মার শিষ্য সূত্রধর নিজেই ভ্রমর নির্ম্মাণ করে। ভ্রমর-যন্ত্র ও ভ্রমি-যন্ত্র (কুন্দন-যন্ত্র) এক বলিলেই হয়। ভ্রমি-যন্ত্র বিশ্বকর্ম্মার যোগ্য যন্ত্র বটে। ভ্রমি-যন্ত্রের সহিত কুলাল-যন্ত্রের তুলনা করুন। উভয়ের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ বিদ্যমান। উভয়েই অপরূপ রূপ-নির্ম্মাণে সমর্থ।

এসকল যন্ত্রের উল্লেখে প্রয়োজন কি? কার্পাস-সূত্রকর্ত্তন সম্বন্ধীয় যন্ত্রগুলি অনুধাবন করুন। কার্পাসের বীজ হইতে তূল পৃথক্ করিবার "খাওয়াই" (খাদক—কার্পাসখাদক)



কাপাস-খাওয়াই।

দেখুন। ধন্য ইহার উদ্ভাবয়িতা, ধন্য তাহার যন্ত্রজ্ঞান! ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়া বলুন, ইহার অপেক্ষা স্বল্পমূল্য (স্থল-বিশেষে ।/০ আনা মাত্র) এবং উৎকৃষ্ট কার্পাস-খাদক হইতে পারে কি না। ইহার দুইটি বেলন ("পোয়া," roller), বাম প্রান্তের দন্ত (মুগুরি বা কামরাঙ্গা Spiral toothed wheel), বেলনদ্বয় গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া আঁটিয়া রাখিবার নিমিত্ত কপাল বা 'তুল্সিয়া' (তুলিয়া রাখে যে— tightening wedge), এমন কি খুঁটা দুইটির হেলান (forward inclination) দেখুন, এবং বলুন দেশীয় কার্পাস-খাদকে যন্ত্রবিজ্ঞানের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত আছে কি না। কাঠের দেশীয় আখ-মাড়া কল খাওয়াইর জ্ঞাতি। লোহার আধুনিক আখ-মাড়া কল দেশীয় কলের অনুকরণ মাত্র।

চরকা দেখুন, বেগ বৰ্দ্ধিত করিবার সুন্দর দৃষ্টান্ত। চরকা আর কিছু নহে, বেগ-বৰ্দ্ধক চক্রমাত্র (multiplying wheel)। যদি চক্রের ব্যাস ২০ ইঞ্চ এবং টেকোর ব্যাস ইঞ্চের অষ্টমাংশ হয়, চক্র একবার ঘুরিলে টেকো ১৬০ বার ঘুরে। এই বেগবৰ্দ্ধক চক্র-যন্ত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। চরকা ব্যতীত অন্য কোন একটি যন্ত্রের সাধ্য নাই যে, কার্পাস তূলর ন্যায় ক্ষুদ্র কোমল রোমকে জড়াইয়া পাকাইয়া দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম ও দৃঢ় সূত্রে পরিণত করিতে পারে। ইহা অত্যুক্তি নহে। প্রমাণ, কলের বা মিলের যে সকল আধুনিক যন্ত্র আছে, তন্মধ্যে সেই যন্ত্রই (mule) শ্রেষ্ঠ, যাহা চরকার অনুকরণ মাত্র। যে সূক্ষ্ম-সূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্রের নিমিত্ত প্রাচীন ভারত বিখ্যাত ছিল, সে সূত্র চরকাতেই প্রসব করিতে পারে, অন্য কিছুতে নহে।

সূত্র করিবার পূর্ব্বে তূল প্রস্তুত করিতে হইবে। (১) প্রথমে কার্পাস রৌদ্রে দিয়া তাহার অপক্ব বা 'মরা' কার্পাস ও অপর আবর্জ্জনা বাছিয়া ফেলিতে হইবে। (২) 'খাওয়াই' দ্বারা বীজ হইতে তূল পৃথক করিতে হইবে। (৩) তূলর রোয়াগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিতে হইবে। ধুনিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ধুনিবার নিমিত্ত পূর্ব্বকালে গৃহে গৃহে ধনুঃ থাকিত। কখন কখন ধনুঃ দ্বারা তূল ফুটাইবার পূর্ব্বে হাতে করিয়া তূল পেঁজা হয়। দুই হাতের আঙ্গুল দিয়া তূল অল্পে অল্পে টানিয়া তূল-পিঞ্জন সম্পন্ন হয়। একবারে হয় না, দুইবার তিনবার ভাঁজিয়া ভাঁজিয়া তূল টানিতে হয়। অবশ্য এই কার্য্যে বহু সময় লাগে, কিন্তু পরে সূতা কাটা সহজ ও ভাল হয়। (৪) পেঁজা তূলর পাঁইজ (পাঞ্জ) করিতে হয়। রোয়াগুলির শিথিল, গোল ও শূন্যগর্ভ সলিতার নাম পাঞ্জি অর্থাৎ তূল-নালিকা। ইহার নিমিত্ত পেঁজা তূল কোন মসৃণ স্থানে (যেমন কাঠের পীঁড়ি) সমান স্থূল ও বিস্তৃত করিয়া সাজাইয়া তদুপরি মসৃণ গোল ও দীর্ঘ শলাকা (যেমন শর কাঠি) রাখিয়া তাহাতে তূল জড়াইতে হয়।

ইহার পর তিনটি কাজ আছে। (১) পাঞ্জি হইতে রোয়া টানিয়া ও অল্প পাক দিয়া তাহাকে দীর্ঘ করিতে হয়। (২)

ঐ দীর্ঘ সূত্রে পাক দিতে হয়। (৩) পাক-দেওয়া সূতা কোন আধারে (টেকোতে) জড়াইতে হয়। এই তিনটি কাজ চরকা দ্বারা হয়। অতএব চরকা হেয় যন্ত্র নহে। উহা দ্বারা সূতা টানা, পাকান ও জড়ান হয়।

অবশ্য চক্র দ্বারা টেকোর (তকু) ঘূর্ণন-বেগ বর্দ্ধিত হয়। টেকো কিসে কিরূপে বসান বা আটকান থাকে? কি আশ্রয় করিয়া ঘুরে? লৌহ পিত্তলাদি ধাতুর নলী বা শামীর (Bearing) ভিতরে নহে, শরমঞ্জরীর কিংবা নারিকেল কাতার দড়ীর ভিতরে ঘুরে। বৃথা ঘর্ষণ হইবে না, অথচ তর্কুকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে, পরন্তু ঘর্ষণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে না, এমন দড়ী আর কি আছে? সকল প্রকার সূত্রের বা দড়ীর সমান গুণ নাই। কোন কোন দড়ী ঘষাঘষিতে সহজে ছিঁড়ে না, কোন কোন দড়ী টানে বা ভারে সহজে ছিঁড়ে না। যে সূত্র দ্বারা চক্রের গতি তর্কুতে আসে, তাহার নাম মাল-সূতা (মালা-সূত্র)। উহা প্রায়ই তাঁতের (অন্ত্র-তন্ত) হয়। কারণ তাঁত মসৃণ ও স্থায়ী হয়, এবং সহজে বাড়িয়া লম্বা হয় না। তাঁতের অভাবে কার্পাস-সূত্র। কিন্তু সে সূত্রে তৈলে-দ্রবীভূত ধনা মাখান হয়। ইহাতে কার্পাস-সূত্র তন্তবৎ মসৃণ এবং দৃঢ় হয়। মাল-সূতার গ্রন্থি দেখিবেন। সেখানেও কৌশল আছে।

চক্রখানি দেখুন। উহা কাঠের পাটার কিংবা লোহার চাকা নহে। বলিতে গেলে উহা দড়ীর চাকা। কারণ চক্রের দড়ীর উপর দিয়া মাল-সূতা ঘুরিতে থাকে। কি সুন্দর কৌশল! কাঠের পাটার কিংবা লোহার চাকায় মাল-সূতা সমান টান থাকিত না, কিংবা মাল-সূতার ন্যায় সরু সূতা দ্বারা সরু টেকো অবলীলাক্রমে ঘুরাইতে পারা যাইত না, সূক্ষ্ম সূত্রকর্ত্তনও হইতে পারিত না। কি কৌশলে চরকার দড়ীকে চক্রাকার করা হয়? দুই পাশে পাখী (পক্ষ) দিয়া। ফলে প্রথমতঃ দড়ীর স্থিতিস্থাপকতা, তার পর পাখীর স্থিতিস্থাপকতায় মাল-সূতা নিয়ত সমান টানে থাকে।

চক্র-যন্ত্র এত গুণসম্পন্ন হইলেও বর্ত্তমান কালে উহা রেলের গাড়ীর পাশে গো-শকটের তুল্য মন্থরগতি। অবশ্য রেলের গাড়ীর সবেগে গুড় গুড়ানির কাছে গরুর গাড়ির শান্তি-পূর্ণ ধীরগতি তিষ্ঠিতে পারে না। এখন শান্তির পরিবর্ত্তে উৎকণ্ঠা। ইহাই জড়ত্ব-সার সভ্যতা। দিবসের কাজ কর্ম্মের পর এবং রাত্রে বিশ্রামের পূর্ব্বে গৃহস্থ-গৃহিণী চরকায় সূতা কাটিয়া পরিজনের বস্ত্রের উপায় করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর নীতির সমালোচনা কিংবা গৃহস্থালীর উন্নতি ও আকাঙ্ক্ষার বিচার কিংবা কত রাজ্যের কত রাজা উজীর বধ, কত পূর্ব্বস্মৃতির করুণ আলাপ করিতেন, তাহা কবি ব্যতীত অন্যে ব্যক্ত করিতে পারেন না। অভ্যাসের এমনই গুণ যে, দরিদ্র কুটীরবাসিনী রাত্রের অন্ধকারেও সূতা কাটিতে পারিতেন, টেকোতে "সূতা ফেলা" (টেকোতে পাক-দেওয়া সূতা জড়ান) স্বচ্ছন্দে চলিত। এখন আর সে দিন নাই, দশ হাত 'এয়ো-সূতা' কাটিতে হইলেই ঘরণীদিগের চক্ষুঃ স্থির হয়।

বাষ্পীয়-যন্ত্রের প্রভৃত বলের নিকট চরকার মৃদুগতি অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে। কলে বেশী কাজ করে বটে, কিন্তু কলা-কৌশল লুপ্ত করে। এখন জীবনসংগ্রামে সূক্ষ্ম কলার আদর নাই, স্থূল কাজের মোহ সস্তা মানবমনকে অধিকার করিয়াছে। এখন চরকা ঘুরাইয়া দিনে ⁄০ আনা পয়সা উপার্জ্জন করা দুরূহ। বিশেষ অভ্যাস থাকিলেও মিনিটে দশ বারের অধিক বার চরকায় সূতা কাটা ও জড়ান হইতে পারে না। বামহাত বিস্তৃত করিয়া প্রতি বারে দেড়হাত, বড় জোর একগজ সূতা কাটা যায়। সুতরাং মিনিটে ১০ গজ, ঘণ্টায় ৬০০ গজ, এবং ৬ ঘণ্টায় ৩,৬০০ গজ সূতা কাটা যাইতে পারে। যদি ৪০ নম্বরের* সূতা কাটা হয়,

* যাঁহারা কলের সূতার নম্বরের হিসাব জানেন না, তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত বলা আবশ্যক যে, ৮৪০ গজ সূতায় এক মোড়া হয়। কোন সূতার যত মোড়া ওজনে এক পৌণ্ড (একটি ডবল পয়সার ওজন কম আধসের) হয়, সেই সূতার নম্বর তত। চল্লিশ মোড়ায় এক পৌণ্ড ওজন হইলে সূতার নম্বর চল্লিশ, দশ মোড়ায় হইলে নম্বর দশ ইত্যাদি। অতএব ৪০ নম্বরের এক পৌণ্ড সূতা ৮৪০ × ৪০ = ৩৩,৬০০ গজ লম্বা, ১০ নম্বরের এক পৌণ্ড সূতা ৮৪০ × ১০ = ৮,৪০০ গজ লম্বা। দেখা যাইতেছে, ১০ নম্বরের এক খেই সূতা, ৪০ নম্বরের দুই খেই সূতার সমান মোটা। সূতার নম্বর অক্লেশে নিরূপণ নিমিত্ত এখানে একটা সঙ্কেত দেওয়া যাইতেছে। একটি নূতন দুয়ানির ওজনের সূতা লম্বায় ২৭ গজ হইলে তাহার নম্বর ১০, ৫৪ গজ হইলে নম্বর ২০, ৬১ গজ হইলে নম্বর ৩০, ১০৮ গজ হইলে নম্বর ৪০ ইত্যাদি। চরকায় যে সূতা কাটা হয়, তাহা প্রায়ই ১০ হইতে ৩০ নম্বরের মধ্যে। মোটামুটি ২০ নম্বরের বলা যাইতে পারে। সময়ে সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়, অমুক প্রত্যহ এক পোয়া সূতা কাটিতে পারে। এ কথার অর্থ নাই। নম্বর বা সূতার স্থূলতা বা সূক্ষ্মতা না বলিলে দক্ষতা বুঝা যায় না। দিনে ১০

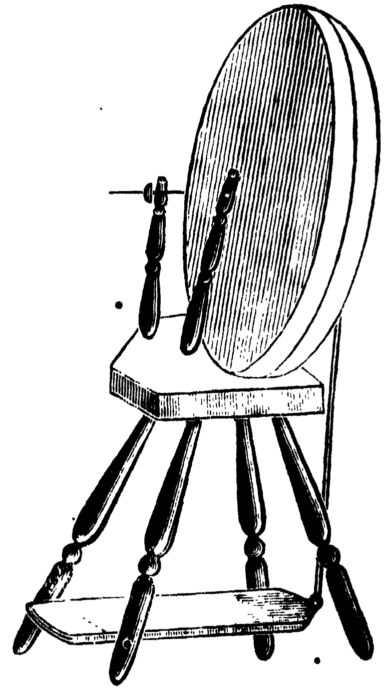
তাহা হইলে ৩,৬০০ গজ সূতা, ওজনে এক পৌণ্ডের প্রায় দশ ভাগ মাত্র। ইহার মূল্য প্রায় ৴০ আনা। তূলর মূল্য এবং তূল প্রস্তুত করিবার ব্যয় বাদ দিলে কত থাকে?

চরকায় সূতা কাটিয়া পরিবারের লোকদিগের কাপড়, বিশেষতঃ সরু কাপড় যোগান দুরূহ ব্যাপার। একখানি দশহাতি ধুতি বা শাড়ী বুনিতে অল্প সূতা লাগে না। সূতা ৪০ নম্বরের হইলে ১৩।১৪ মাইল লম্বা সূতা লাগে! এই কারণে পূর্ব্বকালে মোটা সূতার কাপড় দেশে বহু প্রচলিত ছিল। এখনও গ্রামের 'অসভ্য' লোকেরা ২০ নম্বরের সূতার কাপড় পরিয়া পূর্ব্বরীতি রক্ষা করিতেছে। যেখানে বাহ্য চাক্‌চিক্যময় 'সভ্যতা' প্রবেশ করে নাই, সেখানে প্রাচীন চরকা এখনও টিকিয়া আছে। ওড়িশা, মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি প্রদেশে এখনও সূতা কাটা হইয়া থাকে। বহু লোকের পক্ষে অবসরকালে দুইটি পয়সা উপার্জ্জনও উপেক্ষার বিষয় নহে†।

চরকায় সূতা কাটায় উপার্জ্জন অল্প বলিয়া এবং মিহি কাপড়ের 'রেওয়াজ' হওয়ায় বঙ্গদেশে সূতা কাটা হেয় কার্য্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অমুক চরকায় সূতা কাটিয়া খায়—অত্যন্ত অপমানের কথা! এই অপমান-বোধ বঙ্গদেশ ছাড়িয়া অল্পে অল্পে অন্য প্রদেশে ব্যাপ্ত হইতেছে।

শুনিতে পাই, বঙ্গদেশে কেহ কেহ পুরাতন চরকা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, কেহ কেহ চরকাকে আরও কার্য্যকর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যাঁহারা চরকার উন্নতির চেষ্টায় আছেন, তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন, তাঁহারা যেন স্বয়ং প্রথমে চরকায় সূতা কাটিয়া দেখেন। বুঝিবেন, চরকা দ্বারা তিনটি কাজ হয়। এই তিনটি কাজের উল্লেখ পূর্ব্বে করা গিয়াছে। সে তিনটি কাজ এই।—(১) চরকা সোজা ঘুরাইয়া পাঁজ হইতে সূতা টানা হয় (drawing)। এই সময় সূতায় বেশী বা যথোচিত পাক দেওয়া হয় না, সূতায় আলগা পাক থাকে। বাম হাত দূরে সরাইয়া এই সূতা টানা হয়। তার পর (২) বামহাতের কাছের সূতা আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া ধরিয়া সেই আলগা-পাক সূতায় পুরা পাক দেওয়া হয় (twisting)। তার পর (৩) চরকার ক্ষণিক বিরাম এবং পরে তাহাকে উল্টা দিকে ঘুরাইয়া টেকোর মুখের সূতা খুলিয়া লওয়া হয় (unwinding)। তারপর চরকা সোজা ঘুরাইয়া এবং বামহাত অল্পে অল্পে টেকোর কাছে আনিয়া টেকোতে সূতা ফেলা অর্থাৎ জড়াইয়া রাখা হয় (winding)।

অতএব চরকার গতি অবিরাম নহে; কেবল সবিরামও নহে, বিরামের পর বিলোম হয়। চরকা গড়া ভাল হইলে এই অনুলোম গতি, পরে ক্ষণমাত্র বিরাম, পরে অল্প বিলোমগতি, পরে পুনর্ব্বার অনুলোম গতি পা দিয়া উৎপাদন করা যাইতে পারে। আমরা ভূমিকে আসন করিয়া থাকি বলিয়া বোধ হয় এদেশে পা দিয়া চরকা ঘুরান প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ১ম চিত্রে পা দিয়া চরকা ঘুরাইবার উপায় প্রদর্শিত হইল। একখানি টুলের বা চৌকির উপরে দক্ষিণ পার্শ্বে চক্র, এবং বাম পার্শ্বে টেকো বসান



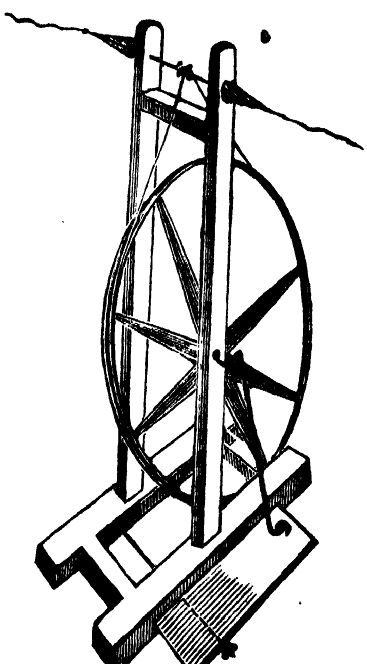
পায়ে চালা চরকা।
১ম চিত্র।

নম্বরের এক পোয়া সূতা কাটা যাইতে পারে। কিন্তু আজ কাল সে সূতার কাপড় কেহ পরিতে পারিবে কি?

† ওড়িশা ও মাদ্রাজের গ্রামে বহু লোক নিজের নিজের কাপড় ঘরে চরকা-কাটা সূতায় বোনাইয়া পরে। ওড়িশার গ্রামে এখনও একছটাক সূতা কাটিয়া দিবার বেতন একপয়সা মাত্র। অবশ্য সে সূতা মোটা।

গিয়াছে। চৌকির নীচে টিপন পাটা আছে, এবং টিপন-পাটার অগ্রভাগের সহিত চক্রের অক্ষ সন্ধিদ্বারা যুক্ত আছে। ফলে সেলাই করিবার বিলাতি কলে চক্রের ও টিপন-পাটার যেমন ব্যবস্থা, পায়ের চরকারও তেমন।

অবশ্য সকল কাজেই অভ্যাস চাই। প্রচলিত চরকা পাইলেই যে-সে তাহাতে সূতা, বিশেষতঃ সমসূক্ষ্ম সূতা কাটিতে পারিবে না। পায়ের চরকায় ডান হাত খালি থাকে। চক্রকে চৌকির মাঝামাঝি বসাইয়া তাহার দুই পাশে দুইটা টেকো এককালে চালান যাইতে পারে। কিংবা ২য় চিত্রের ন্যায় দুই-টেকো পায়ের চরকা করা যাইতে পারে। এক সময়ে দুই হাতে দুই খেই সূতা কাটায় অভ্যাস চাই। ঠাকুরের আরতি করিবার সময় পূজক-



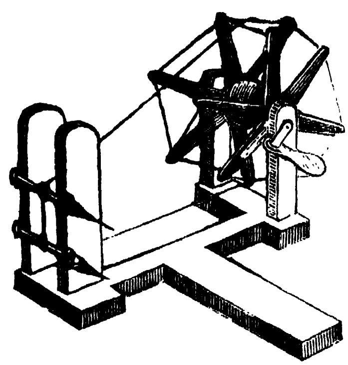
পায়েচালা দুখেই চরকা।

২য় চিত্র।

ব্রাহ্মণ এক হাতে ঘণ্টা বাজাইতে; এবং অন্য হাতে পঞ্চ-প্রদীপ ঘুরাইতে থাকেন। দুই হাতে দুই খেই সূতা কাটিবার অভ্যাস হইলে অবশ্য মোট সূতা বেশী পাওয়া যাইবে। তুল এবং পাঁজ ভাল করিয়া প্রস্তুত করিলে সূতা কাটা সহজ হয়। সূতা সমান সরু হয় এবং অল্পেই ছিঁড়ে না।

২য় চিত্রের চরকার চক্রের উপরে দুইটি খুঁটাতে একটি টেকো আছে। সেই টেকোর দুই প্রান্ত কাজে দুইটা টেকোর তুল্য। টিপন-পাটা চক্রের দক্ষিণ পার্শ্বে সংলগ্ন করা গিয়াছে। টেকোকে অবলীলাক্রমে ঘুরাইবার ও বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে উহার মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র কপি (pulley) লাগান গিয়াছে। মাল-সূতা অবশ্য কপির উপর দিয়া গিয়াছে।

অনেকের ধারণা আছে যে, বাম হাতে পাজ ধরার গুণে চরকায় সূতা কাটা হয়। এই ধারণা ভুল। চলিত চরকায় ডান হাতের কাজ সহজেই বুঝা যায়। বাম হাতের কাজগুলি এই। (১) পাজ ধরা, (২) সূতা টানা, (৩) টানা শেষ হইলে সূতা আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া রাখা, (৪) সূতা টেকোর কাছে আনা। এই সকল কাজের মধ্যে পাঁজ ধরিবার কৌশল নাই।

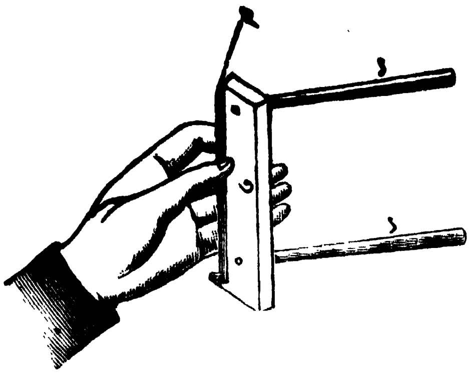


দুটেকো চরকা।

৩য় চিত্র।

অতএব দেশীয় চলিত চরকাতেই একটি টেকোর স্থানে দুইটি টেকো বসান যাইতে পারে। ৩য় চিত্রে ইহা দেখান গিয়াছে। সহজে টেকো দুইটি ঘুরিবে বলিয়া প্রত্যেক টেকোর মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র কপি লাগান গিয়াছে। বাম হাতে দুইটা পাজ ধরিবার সুবিধা হয় না। এজন্য একটি পৃথক্ পাজ-ধরা আবশ্যক। ৪র্থ চিত্রে পাজ-ধরা দেখান গিয়াছে। তিন চারি আঙ্গুল চৌড়া এবং সাত আট আঙ্গুল লম্বা এক টুকরা পাতলা কাঠের পাটার (৩) উপর ও নীচের নিকটে দুইটি ছিদ্র করা গিয়াছে। পাটার পশ্চাৎভাগে ছিদ্র দুইটিতে দুইটা নল (১, ১) আঁটা গিয়াছে। বাঁশের ফাঁপা কঞ্চি কিংবা

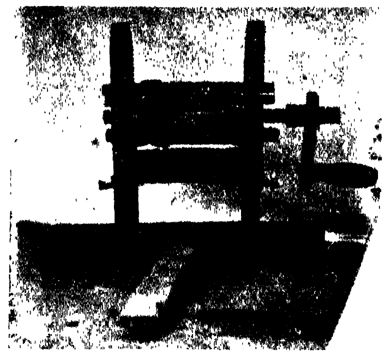
টিনের নল করা যাইতে পারে। ঐ নলের উপরিভাগ খোলা থাকিলে পাঁজ অক্লেশে নলে রাখিতে পারা যায়। অতএব নলের পরিবর্ত্তে নলের দীর্ঘচ্ছেদ বা নালী আঁটিলে সুবিধা হয়। এই দুই নালী দ্বারা বামহাতের পাঁজধরার কাজ হয়। টানা সূতায় পূরা পাক দিবার পূর্ব্বে সূতা বাম হাতের দুই তিনটি আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া ধরিতে হয়।



৪র্থ চিত্র। পাঁজধরা।

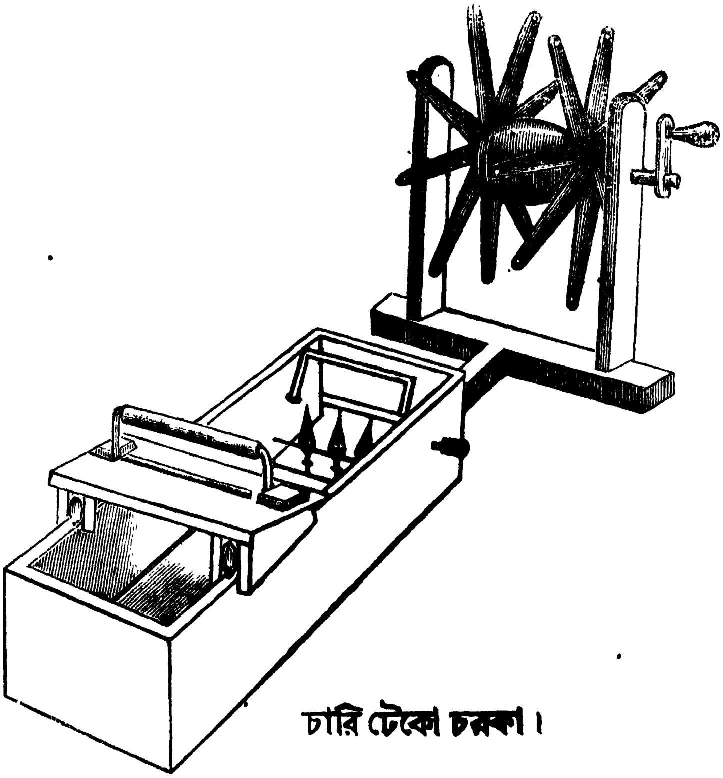
এই কাজ পাঁজ-ধরা কাঠের উপর একটা গোল কাঠি (যেমন মোটা শরকাঠি কিংবা সমান মোটা একটুকরা কঞ্চি, ২) চালাইয়া করা যায়। ঐ চিত্রে পাঁজ-ধরা ধরিবার কৌশল দেখান গিয়াছে। বামহাতের বুড়া আঙ্গুলের টিপে শরকাঠি ধরা আছে। ঐ অবস্থায় পাঁজ-ধরা বাম হাত দিয়া সরাইয়া সূতা টানা শেষ করা হয়। তারপর বুড়া আঙ্গুল দিয়াই শরকাঠি গড়াইয়া পাঁজ-ধরার ছিদ্রের উপরে আনিয়া টানা সূতা টিপিয়া ধরিতে হয়। এখন টানা সূতায় পূরা পাক দেওয়ার অসুবিধা হয় না। অর্থাৎ বামহাতে উক্ত পাঁজ-ধরা ধরিয়া বামহাতের সমুদয় কাজগুলি যথাক্রমে করিতে পারা যায়। বলা বাহুল্য, এই রূপে চলিত চরকার দ্বারা তিন চারিটি টেকো ঘুরাইয়া সূতা কাটা যাইতে পারে।

প্রচলিত চরকার নিমিত্ত যে প্রকার পাঁজ সর্ব্বদা করা হইয়া থাকে, সে পাঁজের একটি দোষ দেখা যায়। সে দোষ এই যে, পাঁজে তূলর রোয়াগুলি ঋজুভাবে না থাকিয়া অধিকাংশই পরস্পর জড়াইয়া থাকে। প্রচলিত চরকায় এই প্রকার পাঁজে সূতা কাটার বিঘ্ন হয় না, তবে খুব সরু সূতা কিংবা সমান সরু সূতা কাটা কঠিন হয়। রোয়াগুলি যত লম্বা হয় এবং পরস্পর যত ঋজুভাবে থাকে, সূতা কাটা তত সহজ ও ভাল হয়। সূতা-কাটা বিলাতি কলে (Spinning Mill) প্রথমে তূল ঝাড়িয়া, পরিষ্কৃত করিয়া লম্বা পটী করা হয়। তখন তূলর রোয়াগুলি প্রায়ই উল্টা পাল্টা সোজা বাঁকা থাকে। পরে তূলর পটীকে টানিয়া টানিয়া সরু ও লম্বা করা হয়। এই সঙ্গে তূলর রোয়াসকল ঋজু হইয়া পড়ে। তূলকে হাতে পাঁজিয়া প্রায় এইরূপ

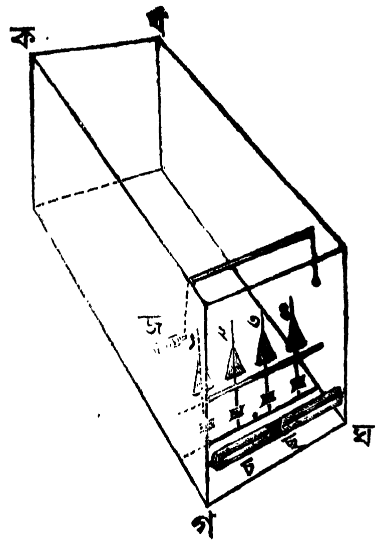


৫ম চিত্র। পাঁজ খাই।

করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাতে বহু সময় আবশ্যক হয়। প্রচলিত কাপাস-খাওয়াইর অনুকরণে তূল-পেঁজা খাওয়াই করা যাইতে পারে। ৫ম চিত্রে এই প্রকার খাওয়াই দেখান গেল। কাপাস-খাওয়াইতে এক জোড়া পোয়া থাকে, এই খাওয়াইতে দুই জোড়া পোয়া আছে। এই দুই জোড়া পোয়ার মধ্যে এক জোড়া সরু, অন্য জোড়া মোটা। চিত্রে প্রদর্শিত খাওয়াইর উপরের জোড়ার পোয়া প্রায় ৸৹ ইঞ্চ, এবং নীচের জোড়ার প্রায় ১৷৹ ইঞ্চ মোটা। ফলে তূলর আধ-হাত লম্বা পাঁজ উপরের জোড়ার ভিতর দিয়া আনিয়া নীচের জোড়ার ভিতর দিয়া চালাইলে পাঁজটি এক হাত লম্বা হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঁজের রোয়া অনেকটা সোজা হইয়া পড়ে। দুই তিনবার এই খাওয়াইর ভিতর দিয়া চালাইলে পাঁজের অধিকাংশ রোয়া ঋজুভাবে আসিয়া পড়ে। এইরূপ পাঁজ সূতাকাটার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। চিত্রের পোয়াগুলির পেঁচ বা কামরাঙ্গা দুই খুঁটীর মাঝে দেখা যাইতেছে। কাপাস-খাওয়াইর মত পোয়ার বামপ্রান্তে পেঁচ কাটিলে কোন ক্ষতি নাই। সরু ও মোটা দুই রকমের দুই জোড়া পোয়া লাগাইতে বিশেষ গুণপনা আবশ্যক হয় না। পাঁজ খাওয়াইতেও বেশী বল লাগে না।


চারি টেকো চরকা।

৬ষ্ঠ চিত্র।



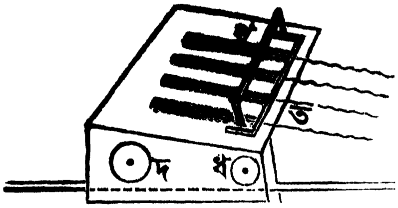
চারি-টেকো।

৭ম চিত্র।

পাঁজের রোয়া ঋজুভাবে সাজান হইলে একটি চক্রদ্বারা আট দশটি টেকো ঘুরাইয়া আট দশ খেই সূতা এক সময়ে কাটিতে পারা যায়। খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে হার্গ্রীভস (Hargreaves) নামক জনৈক ইংরাজ প্রথমে এই প্রকার চরকা নির্ম্মাণ করেন। তিনি তাঁহার কন্যার নামানুসারে তাঁহার চরকার নাম জেনি (Jenny) রাখিয়াছিলেন। তিনি জেনি দ্বারা এক সময়ে আট খেই সূতা কাটিবার উপায় করিয়াছিলেন। পরে সে যন্ত্রের কিঞ্চিৎ উন্নতি করিয়া এক সময়ে ৮০ খেই সূতা কাটিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের প্রাচীন চরকার স্থানে আধুনিক কলের চরকা হঠাৎ আসিয়া বসে নাই। জীবের ও জীবজাতির অভিব্যক্তির মত প্রত্যেক কলেরও ক্রমবিকাশ আছে। প্রাচীন চরকার ক্রমবিকাশে জেনির, এবং জেনির ক্রমবিকাশে আধুনিক কলের চরকা দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং যে দেশে এখনও কলের চরকা চালাইবার সুযোগ হয় নাই, সে দেশের পক্ষে আট-টেকো কি দশ-টেকো চরকা কাজের হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

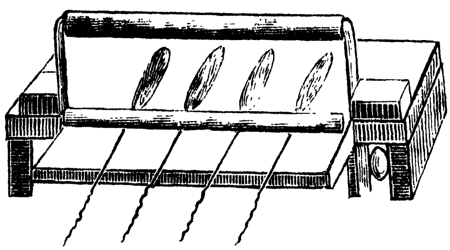
জেনির কিঞ্চিৎ রূপান্তর করিয়া ৬ষ্ঠ ও ৭ম চিত্রে একটি চারি টেকো চরকা প্রদর্শিত হইল। পরীক্ষার নিমিত্ত চারিটি টেকো বসান গিয়াছিল, এবং সেই চরকারই রেখা-চিত্র প্রদর্শিত হইল। বলা বাহুল্য, এই চরকার সদৃশ চরকা গড়িয়া তাহাতে চারিটি টেকো না দিয়া ৮।১০টি টেকো বসান যাইতে পারে। তবে টেকোর সংখ্যা যত বাড়ান যায়, খেই ছিঁড়িবার সম্ভাবনা তত অধিক হয়। চরকার সমস্ত অঙ্গ উত্তমরূপে সাবধানে গড়িতে পারিলে, বিশেষতঃ পাঁজ ভাল হইলে খেই ছিঁড়িবার আশঙ্কা কম হয়। অবশ্য এরূপ চরকা চালাইতেও কিঞ্চিৎ অভ্যাস চাই।

৬ষ্ঠ চিত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে চলিত চক্র দেখা যাইতেছে। চক্রের উপর দিয়া মাল-সূতা গিয়া একটি ক্ষুদ্রব্যাস বেলনকে (৭ চিত্র, চছ)ঘুরাইতেছে। এই বেলন হইতে চারি গাছি মাল-সূতা চারিটি টেকোকে ঘুরাইতেছে। টেকোগুলিকে অবলীলাক্রমে ঘুরাইবার অভিপ্রায়ে প্রত্যেক টেকোতে একটি ছোট কপি লাগান আছে। টেকোর মাল-সূতা নিম্নত



৮ম চিত্র। পাঁজধরা।

টান রাখিবার অভিপ্রায়ে বেলনকেও চরকার চক্রের অনুরূপ কিন্তু সরু ও লম্বা করা গিয়াছে। ইহাকে দড়ীর বেলন বলা যাইতে পারে। টেকোগুলি বামে অল্প হেলান আছে। কাঠের একটা লম্বা ফর্ম্মা (৭ চিত্র, কখগঘ) করিয়া তাহার এক পাশে দড়ীর বেলন এবং কিছু ভিতরে টেকো বসান গিয়াছে। দেবদারুকাঠের লম্বা একটা বাক্স পাইলে ফর্ম্মা আবশ্যক হয় না। এইরূপ বাক্স ৬ষ্ঠ চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাক্সের উপর নীচে ও সম্মুখ পার্শ্ব খোলা। চারি টেকোর নিমিত্ত চারিটি পৃথক্ পাঁজ একখানি পাঁজ-



৯ম চিত্র। পাঁজধরা।

ধরার (৮,৯চিত্র) উপরে রাখা হয়। কাঠের একখানি পীঁড়ির দুই পাশে কাঠের ছোট ছোট চাকা (দধ) আঁটিয়া দেওয়া গিয়াছে। ফর্ম্মার দুই লম্বা পাশের কাঠের উপর দিয়া ঐ পাঁজ-ধরা বামে ও দক্ষিণে গড়াইয়া লইতে পারা যায়। পাঁজ-ধরা পীঁড়ির উপর পিঠে-ঘেঁষিয়া কাঠের একটি সরু বেলন (যেমন কাগজে রেখা টানিবার রুল, ৮ চিত্র, ত) আছে। উহা এবং পীঁড়ির ভিতর দিয়া পাঁজ হইতে সুতা বাহির হয়। বেলনের পশ্চাতে টিনের কিংবা বাঁশের কঞ্চির চারিটি নালী আঁটিলে তাহাদের ভিতরে পাঁজ রাখা যায়। চিত্রে ঐ নালীগুলি দেখান হয় নাই। বাম হাতে ঠেলিয়া পাঁজ-ধরা টেকোর কাছে আনিয়া ডান হাতে চক্র ঘুরাইতে আরম্ভ করা যায়। তারপর পাঁজ-ধরা বামে ঠেলিয়া লইয়া গেলে সুতা টানা

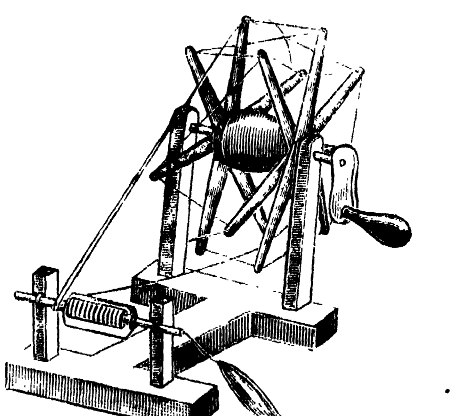


১০ম চিত্র।

হয়। এখন পাঁজ-ধরার টিপ-বেলন (৮ চিত্র থ; ১০ চিত্র) সুতার উপর ফেলিতে হইবে। এই টিপ-বেলনও কাঠের কিন্তু কিছু মোটা বা ভারী। এইরূপে সুতা টিপিয়া ধরিয়া চক্র ঘুরাইয়া টানা সুতায় পুরা পাক দেওয়া হয়। ইহার পর সেই পাক-দেওয়া সুতা টেকোতে জড়াইতে হইবে। চক্র উল্টা দিকে ঘুরাইয়া টেকোর মুখের সুতা খুলিয়া দিতে হইবে। তারপর টেকোর মুখের কাছে যে আর একটি বেলন (ফেলা-বেলন, ৭ চিত্র জ) দেখা যাইতেছে, তাহাকে ঘুরাইয়া টেকোর মুখের কাছের সুতা নামাইয়া বা দাবাইয়া দিতে হইবে। এখন বামহাত দিয়া পাঁজ-ধরা অল্পে অল্পে যেমন টেকোর কাছে আনা যাইবে, তেমন চক্র ঘুরাইলে টেকোতে সুতা জড়াইয়া যাইবে। ইহার পর ফেলা-বেলন পূর্ব্বস্থানে উঠাইয়া রাখিয়া পূর্ব্বের মত সুতা কাটা আরম্ভ করা যাইবে। এইরূপে সুতা কাটা বলিতে গিয়া যত সময় লাগিল, কাজে তত সময় লাগে না। বস্তুতঃ একবার অভ্যাস হইলে এবং চরকাটি ভাল গড়িতে পারিলে দ্রুত সুতা-কাটা চলে। খুব সরু সুতা কাটিতে গেলে অবশ্য কিছু সময় লাগে, এবং সেই ছিঁড়িবার আশঙ্কা থাকে। বলা বাহুল্য, সরু সুতা কাটিতে বেশী পাক লাগে। আরও একটি কথা স্মরণ রাখা ভাল যে, সুতা কাটিতে কাটিতে যদি কোন স্থান পাঁজের দোষে সরু হইয়া পড়ে, সেই স্থানেই বেশী পাক লাগে। ইহাতে ফল এই হয় যে, যে স্থান মোটা থাকে, সে স্থানে পাক কম লাগাতে রোয়া টানা পড়িয়া লম্বা হয়। এই সময় সুতা ছিঁড়িবার আশঙ্কা। অতএব উত্তমরূপে পাঁজ করা আবশ্যক।

কাপাসের সুতা কাটার সহিত শণ পাট প্রভৃতির দড়ী কাটার সাদৃশ্য আছে। দুই খেই সুতা পাক দিয়া মোটা করাও প্রায় সেইরূপ। গ্রামে শণ পাট প্রভৃতি লম্বা আঁশের (অংশুর) দড়ী কাটা 'ঢ্যারা' নামক যন্ত্র দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্থানভেদে ঢ্যারার নামভেদ থাকিতে পারে।

বলা বাহুল্য, উহা বজ্রাকারে আবদ্ধ দুই খণ্ড কাষ্ঠে নির্ম্মিত চক্র-বিশেষ। দড়ী কাটিতে হইলে আঁশ টানিতে ও পরে পাক দিতে, ঢ্যারার মুখের দড়ী খুলিতে ও ঢ্যারাতে পাক-দেওয়া দড়ী জড়াইতে হয়। সরু দড়ী (যেমন জেলের জালের দড়ী) কখন কখন তাকুড় (তকু টী) দিয়া কাটা হয়। ঢ্যারা ও তাকুড়ে প্রভেদ এই যে, ঢ্যারা ভারী কাজেই অপেক্ষাকৃত মোটা দড়ী কাটিবার উপযুক্ত, তাকুড় টেকো-মাত্র কাজেই হালকা এবং সরু দড়ী কাটিবার উপযুক্ত। তাকুড়ে দড়ী কাটিতেও চরকায় সূতা কাটার মত অনুলোম-গতি, বিরাম, বিলোমগতি, এবং শেষে দড়ী জড়াইবার সময় অনুলোমগতি আবশ্যক। ফলে দড়ী কাটিতে সময় লাগে এবং অল্পকাল মধ্যে দুই হাত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কোন কোন স্থানে কেহ কেহ পাটের দড়ী কাটিবার বাঁশের কঞ্চির 'কল' ব্যবহার করিয়া থাকে। এনিমিত্ত দুইজন লোক আবশ্যক হয়। একজন কঞ্চির 'কল' দুই হাতে পরে পরে টানিতে থাকে, অন্য জন পাট 'খাওয়াইতে খাওয়াইতে' (অর্থাৎ আঁশে আঁশে জুড়িতে জুড়িতে) পেছু হাঁটিয়া যায়। কোন কোন স্থানে ভারী চরকা দ্বারা পাটের দড়ী কাটা হইতে দেখা যায়। ইহাতে একজন লোক লাগে। এই উভয়বিধ উপায়ে যে দড়ী কাটা হয়, তাহা ঢ্যারা-কাটা দড়ীর মত চিক্কণ এবং টেকসই হয় না। তথাপি সে দড়ী অনেক কাজে লাগে।

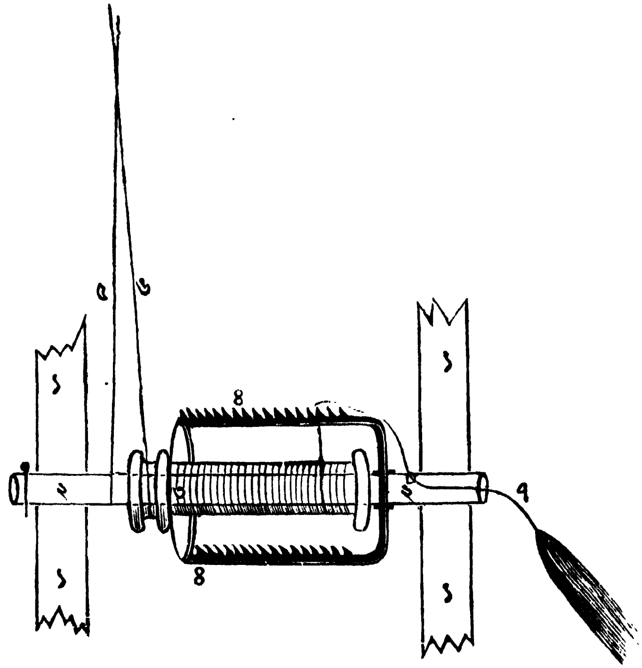


লাটাই টেকো চরকা।

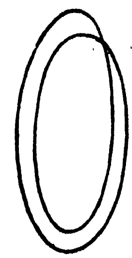
১১শ চিত্র।

তাকুড় দিয়া পাটের কিংবা শণের যেরূপ সরু দড়ী কাটা হয়, সেইরূপ দড়ী কাটিতে এবং দুই তিন খেই সূতা পাক দিয়া মোটা করিতে নিম্নলিখিত চরকা বিশেষ উপযোগী। ইহার গুণ এই যে, দড়ী বা সূতা পাক দেওয়া ও জড়ান এক সময়ে হইতে থাকে চরকার কেবল অনুলোমগতি আবশ্যক হয়; সুতরাং চরকার চক্রখানি স্বচ্ছন্দে পায়ে ঘুরান চলে। এই চরকা অদ্যাপি স্কটল্যাণ্ডে চলিত আছে। সেখানে এতদ্দ্বারা লম্বা ঊর্ণার (মেষলোমের) সূতা (worsted) কাটা হইয়া থাকে। এই চরকাকে (Saxon wheel) বাঙ্গলায় নলী-চরকা কিংবা নাটাই-চরকা বলা যাউক।

১১শ চিত্রে সূতা পাক দিবার হাতের নলীচরকা দেখান গিয়াছে। ইহার টেকো ও পাক-দেওয়া সূতা জড়াইবার নলী দ্রষ্টব্য। এই অঙ্গের দৈর্ঘ্যচ্ছেদ ১২শ চিত্রে প্রদর্শিত হইল। ১,১ দুইটি খুঁটী, ২ টেকো, কিন্তু এই টেকো নীরেট না হইয়া ফাঁপা, অন্ততঃ টেকোর মুখের কাছে কিছু দূর পর্য্যন্ত ফাঁপা। টেকোর মুখের কাছে এবং খুঁটার ভিতর দিকে টেকোর গা হইতে ভিতরের ছিদ্র পর্য্যন্ত একটি ছিদ্র আছে। টেকোর মুখের ভিতর দিয়া ঐ ছিদ্র-পথে সূতা উঠে। ৪ একটি নাটাই টেকোতে দৃঢ়রূপে বদ্ধ আছে। নাটাইর এক হাতে করাতের দাঁতের মত দাঁত কাটা। (চিত্রের নাটাইর দুই হাতেই দাঁত কাটা আছে)। কাঠের একটা নলী (৩) টেকোতে পরান আছে এবং টেকোকে আশ্রয় করিয়া ঘুরিতে পারে। নলী ঘুরাইবার নিমিত্ত উহার প্রান্তে একটি কপি। টেকোর ব্যাস অপেক্ষা এই কপির ব্যাস বড়। এখন যদি একই চক্র হইতে দুই গাছি মাল-সূতা (৫,৬) দিয়া টেকো এবং নলীর কপি ঘুরান যায়, তাহা হইলে টেকো এবং নলী অসমান বেগে ঘুরিতে থাকিবে। টেকোর মুখ (৭) দিয়া সূতা চালাইয়া ছিদ্র-পথে উঠাইয়া নাটাইর একটি দাঁতের গা দিয়া লইয়া নলীতে বাঁধা আছে। ফলে চক্র ঘুরাইলে টেকো ঘুরিয়া সূতায় পাক দিতে থাকিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নলী ঘুরিয়া সেই পাক-দেওয়া সূতা টানিয়া লইয়া নিজের গায়ে জড়াইতে থাকিবে। টেকো এবং নলীর কপির ব্যাসের প্রভেদ এবং নলীর ব্যাস অনুসারে সূতায় টান পড়ে এবং সূতা নলীতে জড়ান হয়। ১২শ চিত্রে যে টেকো দেখান গিয়াছে, তাহা পুরাতন ছাতার লোহার



১২শ চিত্র। নলী-টেকো।

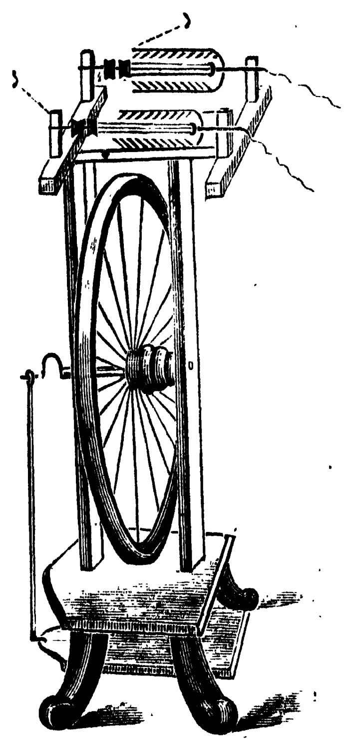


১৩শ চিত্র। মাল-সূতা।

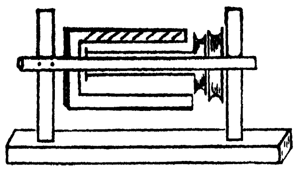
বাঁটে করা গিয়াছিল। নাটাইখানি কাপড়ের গাঁটবাঁধা লোহার 'হাল' বা সরু পাত দিয়া করিয়া টেকোতে ঝালিয়া দেওয়া গিয়াছিল। কাঠ কুঁদিয়া এক পাশে কপি রাখিয়া অন্য ভাগ নলী করা গিয়াছিল। উপরে দুই গাছি মাল-সূতার উল্লেখ করা গিয়াছে। বস্তুতঃ একগাছি ১৩শ চিত্রের আকারে টেকো ও নলীর কপির উপর দিয়া গিয়াছে। টেকোতেও একটি কপি আঁটিয়া মাল-সূতা দ্বারা তাহাকে ঘুরাইলে সূতা পাক দেওয়া আরও সহজ হয়।

এই নলী-টেকো ১ম চিত্রের চৌকীর উপর বসাইয়া পা দিয়া ঘুরান যাইতে পারে। তখন ডানহাত খালি থাকে। কাজেই তখন দুই হাত দিয়া পাট খাওয়াইয়া দড়ী কাটা যায়। পাটের দড়ী কাটিবার পূর্ব্বে পাটকে আঁচড়াইয়া তাহার গুছি করিয়া লওয়া আবশ্যক। নতুবা দড়ী কাটায় বিলম্ব ঘটে।

পাট উত্তমরূপে আঁচড়াইয়া গুছি করিতে পারিলে দুই হাতে দুই খেই দড়ী কাটা যাইতে পারে। ১৪শ চিত্রে এইরূপ দুই-নলী-টেকো চরকা প্রদর্শিত হইল। অবশ্য অভ্যাস চাই।



১৪শ চিত্র। দু নলী টেকো চরকা।



১৫শ চিত্র। নলী টেকোর ছেদ।

১৫শ চিত্রে কাঠের নলী-টেকো দেখান গেল। নাটাইর কাঠে কতকগুলি লোহার কাঁটা মারিয়া দাঁত করা গিয়াছে। নলীর কোন স্থানে দড়ী জড়াইবার পর হাত দিয়া একটি দাঁত দূরে দড়ী লাগাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে নলার এদিক্ হইতে ওদিক্ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে সমান মোটা করিয়া সূতা বা দড়ী জড়ান যায়। কঞ্চির টেকো, সরু ফাঁপা বাঁশের নলী, এবং বাখারির নাটাই করা যাইতে পারিবে। বস্তুতঃ একবার ব্যাপারটা বুঝিলে নলী-চরকার নানাবিধ রূপ দেওয়া যাইতে পারিবে।

পরিশেষে একটি কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করা যাইতেছে। সেটি এই যে, কোন লিখিত বর্ণনাই পরীক্ষা করিয়া দেখার তুল্য হইতে পারে না। আশা করি যাঁহারা সূতা কিংবা দড়ী কাটার উপায় চিন্তা করিতেছেন, তাঁহারা এই প্রবন্ধ হইতে দুই একটা ইঙ্গিত পাইবেন।*

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

চাষের জন্য সহযোগিতামূলক ঋণদান ব্যবস্থা।

(জে, হোপ-সিম্‌সন সাহেবের প্রবন্ধের মর্ম্ম)।

ধার পাওয়া অধমর্ণের সততা ও ঋণ পরিশোধের ক্ষমতায় উত্তমর্ণের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। ধার লইতে গেলে কেবল সততায় চলে না; কারণ, অনেক সময় সৎলোকেও অকর্ম্মণ্য বা নিঃস্ব হয়। আবার, কেবল ঋণপরিশোধের ক্ষমতা দেখাইলেই চলে না; কারণ, অনেক সময় অর্থ থাকিলেও লোকের ঋণপরিশোধের অভিলাষ থাকে না।

কৃষকের মধ্যে অনেককেই সৎ ও কার্য্যদক্ষ দেখা যায়। তথাপি তাহারা যে কম সুদে ধার পায় না, দারিদ্র্য, এককালে স্বল্প অর্থের আবশ্যকতা, ধার দিবার জন্য ভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব, এ দেশের লোকের স্থিতিশীল রীতিনীতি ও কৃষকের অজ্ঞতা তাহার কারণ। বর্ষার অভাব বা ভাবী ফসলের দুরবস্থা দেখিয়াও উত্তমর্ণ অনেক সময় ধার দেন না; কারণ, এক বৎসর অনাবৃষ্টি হইলেই কৃষক ঋণ-পরিশোধে অক্ষম হয়। রাজ্যে অশান্তি থাকিলে কম হারে টাকা পাইবার অসুবিধা হয়। শান্তি বিরাজমান থাকিতেও যে কম হারে টাকা পাওয়া যায় না, ইহা কেবল অন্যায়-পূর্ব্বক অধিক হার রাখার জন্য বলিতে হইবে। অনেকে মিলিয়া একত্রে ধার লইলে কৃষকেরা অতি অল্প হারে টাকা পাইতে পারে।

কৃষকেরা সাধারণতঃ অতি অল্পমাত্রই সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের মূলধন অল্প। নিঃস্ব কৃষকের বীজ, গো-মহিষাদি, সার, অধীনস্থ শ্রমিকের বেতন, কর, নিজ পরিবারের ভরণপোষণ প্রভৃতির জন্য অর্থ আবশ্যক। যে কোন কারণে, অর্থ ব্যয়িত হউক না কেন, সমস্তই ঋণ পূর্ব্বক করা হয়। এ ক্ষেত্রে অল্প সুদে টাকা পাওয়া কৃষকের পক্ষে কম মঙ্গলকর নহে। অল্প সুদে টাকা পাইলে চাষীর অর্থ বাঁচিয়া যাইবে; ঋণগ্রহণ পূর্ব্বক নূতন নূতন কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিবে এবং দেশ সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইবে। কৃষক অধিক অর্থ কোন কাজে লাগাইতে পারিবে, শস্য পাকিলেই বিক্রয় করিতে হইবে না, মূল্য বৃদ্ধি হওয়া পর্য্যন্ত শস্য রাখিতে পারিবে এবং অনেকে যন্ত্রাদি ও সার ক্রয়ে সক্ষম হইবে।

অনেকে একত্রে ধার লইলে যে ধার অধিক পাওয়া যায় তাহা বলাই বাহুল্য। একজনকে টাকা দিলে সে হঠাৎ মরিয়া যাইতে পারে, হঠাৎ কোন বিপদ ঘটিতে পারে, গো-মহিষাদি রোগে আক্রান্ত হইতে পারে, অথবা উর্ব্বর ভূমি মরুতে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু যেখানে দুই দশ জন একত্রে ধার লয়, সেখানে প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে ও একত্রে টাকার জন্য দায়ী হওয়ায় উহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা অল্প। এজন্য ইউরোপে একত্রে ধার লইলে অপেক্ষাকৃত কম হারে ধার পাওয়া যায়। আয়র্লণ্ডে এরূপ সমিতির সদস্যগণ নির্ধন

---

* যাঁহারা ইংরাজি জানেন, তাঁহারা Chamber's Encyclopædia নামক কোষে Spinning নামক শব্দের নীচে দুই-নলী-টেকো চরকা (Saxon wheel) এবং আট-টেকো চরকার (Spinning Jenny) চিত্রসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখিতে পাইবেন।

ও নিরক্ষর হইলেও একত্রে ধার লইলে শত করা ৪॥৵ হারে টাকা পাইয়া থাকেন। এদেশে কম হারে কৃষকেরা টাকা পায় না। কারণ, ধনী লোকে একত্রে কার্য্যকরণের মূলতত্ত্ব ও একত্রে কার্য্যকারী সমিতির স্থায়িত্বের বিষয় অবগত নহে। একত্রে কার্য্যকারী সমিতির স্থাপনে যে সকল সভাসদ একাকী ধার পান না, বা যাঁহাদের অধিক হারে ধার লইতে হয়, তাঁহাদের উভয়েরই সুবিধা হয়। যাঁহারা নির্ভয়ে বা নির্ব্বিবাদে টাকা খাটাইতে ইচ্ছা করেন এবং যাঁহারা কম হারে টাকা লইতে ইচ্ছা করেন—অথচ তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকের এরূপ অল্প অর্থের আবশ্যক যে ধনবান লোকে এরূপ অর্থ ধার দিতে প্রস্তুত নহেন,—এই উভয় শ্রেণীর লোকের পক্ষে এরূপ সমিতি সুবিধাজনক। এতদ্ভিন্ন কার্য্যে শিক্ষালাভের ইহা প্রধান উপায়। ইহাতে সততার পুরস্কার আছে। অপব্যয়ের আশঙ্কাও কম। ইহাতে মানুষের মনকে সৎপথে ধাবিত করে; কারণ কেহ অসৎ হইলে অবশিষ্ট সদস্য কর্তৃক বিতাড়িত হয়। বীজ, যন্ত্রাদি, গো-মহিষাদি, জীবনবীমা, অসময়ের জন্য সঞ্চয় ও বিবাহ বা মৃত্যুর জন্য বন্দোবস্ত প্রভৃতি কল্পে এরূপ সমিতি খুব কাজ দেয়।

অন্য দেশের এরূপ সমিতির কার্য্যাবলীর আলোচনা করিলে অনেক শিখিতে পারা যায়, এবং মনে আশার সঞ্চার হয়। এরূপ সমিতি ডেনমার্কের কৃষির উন্নতির অন্যতম সোপান। শতবৎসর পূর্ব্বে ডেনমার্ক নিতান্ত হীনাবস্থ ছিল। জর্ম্মানীর উন্নতিকল্পে Schultz Delitsch, Raiffeisen, Haas প্রভৃতি সমিতি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। ইতালীতে Cavaliere Luzzatti, Dr. Wollemberg, এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে নবযুগের অবতারণা করিয়াছেন। ফ্রান্সে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপে তত উন্নতি হয় নাই বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে উন্নতির অনেক আশা আছে এবং উহার দক্ষিণাঞ্চলে কৃতকার্য্যতা লাভ অনেক পরিমাণে হইয়াছে। আয়র্লণ্ডে গরীবদিগের মধ্যে সম্প্রতি একত্রে কার্য্যকরণের যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। তথায় এরূপ কারখানায় প্রস্তুত নবনীত সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এবং শস্যের দর এরূপ সুলভ হইয়াছে যে, ইউরোপ মহাদেশোৎপন্ন শস্যের সহিত দরে সমকক্ষতা করিবার অনেক আশা হইয়াছে। লক্ষণ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এরূপ সমিতির উন্নতির দিন আসিয়াছে এবং Rochdale Pioneer সমিতির কৃতকার্য্যতার মূলমন্ত্রগুলি শীঘ্রই কৃষকদিগের মধ্যেও আদৃত হইবে। যাঁহারা এ বিষয়ে অধিক জ্ঞানলাভের বাসনা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ করিবেন। Pratt's Organisation of Agriculture (Thacker Spink & Co.র নিকট পাওয়া যায় মূল্য ৫৲) Wolff's People's Banks, এবং Wolff সাহেবের অন্যান্য পুস্তকাবলী, Dupernex's People's Banks for Northern India, এবং Sir Frederick Nicholson সাহেবের ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত অমূল্য বিবরণী।

একত্রে কার্য্যকরণ এদেশে বহুদিবস হইতে প্রচলিত। জাতিভেদপ্রথা, গ্রাম্যশাসনপ্রণালী তাহার দৃষ্টান্তস্থল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একত্রে ধার লওয়ার প্রথা একেবারে প্রচলিত নাই। মান্দ্রাজে নিধি নামক সমিতি এরূপ নিয়মে ধার দেয় যে, তাহাতে ধন অপব্যয় করিতেই যেন প্রবৃত্তি হয়। পঞ্জাবের Co-operative Credit Societyর রেজিষ্ট্রার ১৯০৪ খৃঃ অব্দের ১০ আইনের কার্য্যবিবরণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেন যে, তথায় অতি পূর্ব্বকালে বন্যা হইতে গ্রাম রক্ষা করিবার জন্য একটী দেশীয় Co-operative Society বিদ্যমান ছিল। সার ফ্রেড্রিক নিকলসন সাহেবের পর হইতেই গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তৎপরে Dupernex সাহেবের পুস্তকও অনেক সহায়তা করিয়াছে। Sir Antony MacDonnell সাহেব তাঁহার স্বাভাবিক উদ্যমের সহিত এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; এবং এ প্রদেশে ১৯০৩ খৃঃ অব্দে প্রায় ২০০ Raiffeisenএর মত সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ১৯০৪ খৃঃ অব্দের ১০ আইন Co-operative Credit Societys Act, এবং রেজিষ্ট্রারের পদ স্থাপন কার্য্য গত বৎসরে হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে লোকের উপর অবশিষ্ট নির্ভর করিতেছে। অবশ্য ধনী বা জমিদারেরা একত্রে কার্য্যকরণের সুবিধা দেখিয়া অধীনস্থ লোকের মধ্যে উহার প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়াই বিশ্বাস হয়। অনুরোধে বা উপরোধে এ সকল কার্য্য সুসম্পন্ন

হয় না। যত দিন না সাধারণ লোকে ইহার সুবিধা বিশেষ-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, এবং যত দিন না তাঁহাদের এই সুবিধার উপর বিশ্বাস জন্মিবে, ততদিন ইহার কোন ফল ফলিবে না। আবার বিশ্বাস ও জ্ঞান, শিক্ষাসাপেক্ষ। অতএব প্রথমে লোকের শিক্ষা আবশ্যক।

যে গ্রামে লোকের মধ্যে বিশেষ বিবাদ নাই বা যেখানে গ্রামের লোকেরা একত্রে মিলিতে পারিবে এরূপ কোন গ্রামে গিয়া একতা ও যৌথকারবারের কথা প্রচার কর। যে সকল প্রশ্ন বা আশঙ্কার কথা তাহারা উত্থিত করে, তৎসমুদয়ের ধৈর্য্যসহকারে উত্তর দাও। আবার প্রশ্ন করিলে আবার বুঝাইয়া দাও। এইরূপে যখন তাহারা বুঝিবে ও কার্য্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তখন তাহাদের মধ্যে সৎ ও বিশ্বাসী তিন চারিজন নেতাকে মনোনীত করিতে বল। তাহারা ঐ বিষয় সবিস্তার আলোচনা করিবে। তৎপরে ঐ তিন চারিজনকে পনর কুড়িজন সচ্চরিত্র কৃষক মনোনীত করিতে বল। যাহাদের চরিত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎমাত্র সন্দেহ আছে, তাহাদিগকে বর্জ্জন কর। এরূপ করিলে Co-operative Soceityর বীজ বপন করা হইবে। কার্য্যে শক্তিলাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ উহার পরিচালনভার মেম্বরদিগের মনোনীত ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় তাঁহা-দের অভিজ্ঞতা নিতান্তই অল্প। দ্বিতীয়তঃ হিসাব রাখিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে অচল বিশ্বাসের সহিত মূর্খতার সম্বন্ধ থাকে। তদ্বিষয়েও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তৃতীয়তঃ মেম্বরদিগের প্রথম কয়েক বৎসরের আবশ্যক মত অর্থের সংগ্রহ আবশ্যক। এরূপ সমিতির স্থায়িত্ব বিষয়ে অবিশ্বাস হেতু এবং অধিক হারে ধার দেওয়ার অভ্যাস হেতু স্থানীয় মহাজন অর্থসাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে না। যেস্থানে প্রথম সমিতি স্থাপিত হইবে, সেই স্থান নির্দ্ধারণ বিশেষ-রূপে আবশ্যক। তাহা হইলে প্রথম দুইটী আপত্তির খণ্ডন হইতে পারে। এ সম্বন্ধে স্মরণ রাখা উচিত যে, গবর্ণমেণ্ট প্রথম তিন বৎসরের জন্য বিনা সুদে ও পরে শতকরা ৪৲ হারে যত টাকা সংগৃহীত হইবে, তত টাকাই দিবেন, অর্থাৎ সমিতির ৫০০৲ টাকার আবশ্যক হইলে ও কেবলমাত্র ১০০৲ টাকা মেম্বরগণের নিকট হইতে আদায় হইলে গবর্ণমেণ্ট আর একশত টাকাই দিবেন। বাকী ৩০০৲ টাকা মহা-জনের নিকট হইতে ধার করিতে হইবে।

সমিতির পরিচালন বা সংরক্ষণের ব্যয় ও মেম্বরগণের নিকট হইতে দেওয়া অর্থের জন্য যাহা পাওয়া যায়, এ উভয়ের পার্থক্যই লাভালাভ। যাহাতে জমার জন্য টাকা অধিক পাওয়া যায় তাহার জন্য অধিক হারে সুদ দেওয়া উচিত, টাকা ধার লইতে হইলেও প্রায় ৬৲ হারে সুদ দিতে হইবে। অনেক স্থলে মূলধন পূর্ণ করিবার জন্য আরও অধিক হারে দিতে হইবে। Reserve fund শীঘ্র বাড়াইবার জন্য মেম্বারদিগের ধার দিবার সময়ে প্রথমে ১২॥০ টাকা হারে ধার দেওয়া উচিত। একবার ভালরূপে আরম্ভ হইলে চালাইবার জন্য অধিক ক্লেশ পাইতে হয় না।

একটী এরূপ সমিতি স্থাপিত দেখিলে লোকের যে শিক্ষা হইবে, সহস্র উপদেশ দিলেও তাহা হইবে না। একটী স্থাপিত দেখিলে নানা সমিতি স্থাপিত হইবে। তখন হিসাব ও টাকাকড়ি সম্বন্ধে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। কয়েক জেলায় একটী করিয়া Central Bank স্থাপিত হওয়া উচিত। গ্রাম্যসমিতির সহিত মেম্বারগণের যে সম্বন্ধ; Central Bankএর সহিত গ্রাম্যসমিতিরও সেই সম্বন্ধ। Central Bank গ্রাম্যসমিতির জন্য অর্থসংগ্রহ করিবে, গ্রাম্যসমিতিকে ঋণ দিবে, গ্রাম্যসমিতির টাকা জমা রাখিবে এবং সকলের হিসাব রাখিবে। তাহা হইলে স্থানে স্থানে হিসাব রাখার জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না; এবং এককালে অনেক অর্থের আবশ্যক হেতু উত্তমর্ণের নিকট কম হারে ধার পাইতে পারিবে।

গ্রাম্যসমিতির মেম্বার লইয়া Central Bankএর গঠন হওয়া উচিত। যেখানে এরূপ গ্রাম্যসমিতি অধিক নহে, সেখানে উহাদের মধ্য হইতে পঞ্চায়েৎ লইয়া Central Bank এর গঠন হইবে। যেখানে অধিক, সেখানে পঞ্চা-য়েতের প্রধান ব্যক্তিকে লওয়া হইবে। গ্রাম্যসমিতির এরূপ নিয়ম থাকা উচিত যে, তাহাদের মনোনীত ব্যক্তি সমিতির হইয়া দেনা পাওনা করিতে পারিবে। তাহাতে দুই প্রকার সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ Central Bank হইতে যে অর্থ ধার করা হইবে, তাহার জন্য সমিতির অন্যান্য মেম্বার-গণের সহিত একত্রে ও পৃথকরূপে তাঁহারা দায়ী থাকিতে



স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেন

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA

পারেন। দ্বিতীয়তঃ যে সকল দেনা Central Bankএর আছে, তাহার জন্যও মেম্বরগণ পৃথক রূপে ও একত্রে অন্য গ্রাম্যসমিতির মেম্বরগণের সহিত দায়ী থাকিতে পারেন। Central Bank লাভালাভ নির্দ্ধারণ করিবে। ইহাতে Reserve fund বৃদ্ধি পাইয়া কালে মূল্যবান সম্পত্তিতে পরিগণিত হইবে ও হিসাবরক্ষার ব্যয়াদি অনায়াসে দিতে পারা যাইবে।

স্থানাভাব বশতঃ Central Bank ও গ্রাম্যসমিতির মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে আর বিশদরূপে বর্ণনের আবশ্যক নাই। এ বিষয়ে প্রবন্ধ ও নিয়মাদি প্রণয়ন করা হইয়াছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিলে বিনা মূল্যে পাইবেন:— J. Hope Simpson, Esq., Registrar of Co-operative Credit Societies, U. P., Lucknow.

এইরূপে বীজের জন্য টাকা উঠাইয়া ঐ টাকায় বীজ ক্রয় পূর্ব্বক সকলে ভাগ করিয়া লইতে পারেন। ফসল হইলে ধার ও সুদ বীজেই প্রত্যর্পণ করা উচিত। বীজ অধিক হইলে বেচিয়া ফেলিবেন এবং ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বের ধার লওয়া টাকা শোধ করিবেন।

বাঙ্গালায় কোন কোন পল্লীগ্রামে বীজরক্ষণের জন্য ধর্ম্মগোলা আছে। ধর্ম্মগোলা সম্বন্ধেও একত্রে কার্য্যকরণ প্রণালী ব্যবহৃত হইতে পারে। লাভও যথেষ্ট। সম্প্রতি গোরক্‌পুর জেলায় এরূপ একটী সমিতি শস্য একমাস রাখিয়া ও বীজের জন্য বিক্রয় করিয়া শতকরা ১৪৲ টাকা হারে সুদ দিতে পারিবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। পঞ্জাবের মত জমি-বন্ধক-সমিতি কিম্বা তদ্রূপ স্থানীয় অভাবের উপযোগী কোন সমিতি কোন সম্পত্তির অংশ অংশীদারের হাত হইতে উত্তমর্ণের হস্তে গমন হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে। যাহারা গুড় প্রস্তুত করে তাহাদের নিকট হইতে দাদন না লইয়া ইক্ষু-চাষীরা একত্র হইয়া অর্থসংগ্রহ করত গুড় প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করিলে অনেক লাভ হইতে পারে। জ্বাল দিবার এবং পরিষ্কার করিবার কল ব্যবহার করিলে তাহারা ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়া একেবারে বাজারে লইয়া যাইতে পারে।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষাল, বি, এ।

অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন।

মোহিতচন্দ্রের বংশপরিচয় সম্যক্ অবগত নহি। শুনিয়াছি, তিনি গরিফা (গৌরীভা) গ্রামের বিখ্যাত বৈদ্যবংশসম্ভূত এবং মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী সেন, মিরার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি মহাপুরুষগণের সহিত নিকট সম্পর্কিত। বিদ্যাবত্তায়, বুদ্ধিমত্তায়, চরিত্রের মহত্বে ও সারল্যে তিনি বংশমর্য্যাদা সম্যক্ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ৺জয়কৃষ্ণ সেন ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন (ইনি অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী সেনের সহিত এক বৎসরে ইংরাজীতে এম্,এ, উপাধিলাভ করিয়াছিলেন) এবং শেষ জীবনে কুচবিহারের ভূপবাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন (তাঁহার মৃত্যুর পর বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার পদ পাইয়াছিলেন)। তাঁহার অধ্যাপনা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল, এবং তাঁহার উদার ও মহৎ চরিত্র সকলের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল। মোহিতচন্দ্র উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তিনি পিতার নিকট হইতে জ্ঞানতৃষ্ণা ও পাণ্ডিত্যের আদর্শ পাইয়া স্বীয় অধ্যবসায় ও নৈসর্গিক প্রতিভাবলে অল্পবয়সেই সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ন্যায় তিনি যে কেবলমাত্র ইংরাজী সাহিত্য ও য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে, প্রাচীন জ্ঞানগবেষণার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবশতঃ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দু দর্শনশাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ যশস্বী ছাত্রের ন্যায় কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার জোরে প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পারদর্শিতার প্রকৃষ্ট পুরস্কারস্বরূপ পদক পারিতোষিক প্রভৃতি পাইয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, তাঁহার চিন্তাশক্তি সত্য সত্যই উন্মেষিত হইয়াছিল। তিনি নীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে যথার্থ দার্শনিকতার পরিচয় দিয়াছেন; বড় বড় ইংরেজ দার্শনিকগণ বাঙ্গালীর লিখিত এই গ্রন্থের আদর করিয়াছেন; অধিক কথায় কাজ কি, যে সকল ভারত-প্রবাসী ইংরেজ অধ্যাপক বাঙ্গালী জাতিকে অবজ্ঞা ও

অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, তাঁহারাও এই গ্রন্থের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এখানি কেবলমাত্র সংগ্রহ-গ্রন্থ নহে, লেখক বড় বড় দার্শনিকগণের মত সঙ্কলন করিয়া পুঁথি বাড়াইয়া সস্তায় 'গ্রন্থকার' নাম কেনেন নাই, ইহাতে প্রকৃত চিন্তাশীলতা ও মৌলিকতার পরিচয় আছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক বৎসর হইতে এই পুস্তকখানি বি,এ, পরীক্ষার দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচন করিয়া গুণের প্রকৃত সম্মান দেখাইয়াছেন।

দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য অনুরাগ ছিল। কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যেও তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তিনি অনার পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন ('প্রবাসী'-সম্পাদক ও এলাহাবাদ কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন) এবং ঐ বিষয়ে এম্-এ পরীক্ষা দিলেও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পঠদ্দশা হইতেই তিনি Wordsworth, Browning, Carlyle, Emerson প্রভৃতি ভাবুক লেখকদিগের গম্ভীর রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। যাঁহারা ইংরাজী সাহিত্যের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা অবশ্য বিলক্ষণ জানেন যে এ সকল লেখকদিগের ভাবের গভীরতা উপলব্ধি করা যার-তার কাজ নহে। মোহিতচন্দ্র প্রকৃত ভাবুক ছিলেন এবং ইঁহাদিগের ভাবে মগ্ন থাকিতেন। তিনি Wordsworth এবং Browning সম্বন্ধে যে দুইটি সমালোচনা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার বিশ্লেষণশক্তি ও ভাবুকতার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখকের নিকট মোহিতচন্দ্রের স্বহস্ত-লিখিত একটি অপ্রকাশিত রচনা আছে, সেটি Carlyleএর গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিলে কাহারও সাধ্য নাই যে তাহা Carlyleএর রচনা নহে বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারেন। ইহার ভাবের গভীরতা ও ভাষার ওজস্বিতা বাস্তবিকই উপাদেয় হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি এফ্,এ, পরীক্ষার্থিগণের জন্য একখানি ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকের (Macaulay's Essay on Croker's Boswell) সম্পাদনভার লইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি যেরূপ সংক্ষিপ্ত ও পরিপাটি টীকা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত আজকালকার বাজারের অর্থপুস্তকের আকাশপাতাল প্রভেদ। ঢাকাই কাপড়ে বুটিতোলা ও কাঁথাসেলাই করা এই দুই কার্য্যে যে তফাৎ, প্রকৃত টীকা লেখা ও কী (key) লেখার মধ্যেও সেই তফাৎ, মোহিতচন্দ্র ইহা বুঝিতেন। তবে তাঁহাকে এ কার্য্যের ভার দেওয়া ও ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবাকে রজকের ভার বহিতে দেওয়া একই প্রকারের অপকার্য্য।

বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে যদিও মোহিতচন্দ্র কৃতিত্ব দেখাইবার বিশেষ অবসর পান নাই, কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য তাঁহার অনধিগত ছিল না। তিনি কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলীর সম্পাদনকার্য্য যেরূপ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহাতে আশা ছিল তাঁহাকে সত্বর বঙ্গসাহিত্যের আসরে আসনপরিগ্রহ করিতে দেখিব। আরও আশা ছিল তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙ্গলা সাহিত্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এবং মাতৃভাষায় য়ুরোপীয় দার্শনিক তত্ত্বগুলি প্রচার করিয়া বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত অভাব দূর করিবেন। সম্প্রতি তিনি সরল বাঙ্গলা পদ্যে উপনিষদের অনুবাদ করিতেছিলেন। কার্য্যটি সম্পূর্ণ হইলে ইহা বঙ্গসাহিত্যে একটি উপাদেয় বস্তু হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু বিধাতা, তাঁহার কি অপরিস্ফুট উদ্দেশ্যে জানি না, আমাদের সকল সাধে বাদ সাধিলেন।

বিদ্যা ও প্রতিভায় মোহিতচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী সন্তানদিগের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র প্রশংসার বিষয় নহে; তাঁহার চরিত্রের মাহাত্ম্য ও হৃদয়ের মাধুর্য্য তাঁহার মানসিক সদ্গুণাবলীকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। বাস্তবিক এরূপ নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, পবিত্র ও মহৎ আদর্শের প্রতি এরূপ অবিচলিত লক্ষ্য, এরূপ ধর্ম্মপ্রাণতা, এরূপ অনাসক্তি, এরূপ সারল্য ও মাধুর্য্য এখনকার দিনে অত্যন্ত বিরল এবং তজ্জন্যই অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের বেশ মনে আছে, বহরমপুর কলেজ-গৃহে বিশ্রব্ধালাপে মোহিতচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন, 'দাস্য-ভাব আমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগে'। এই কথা শুনিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের তৎকালীন অধ্যাপক পলিতকেশ পিতামহ-কল্প মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত বলিয়াছিলেন, 'দেওয়ান রামকমল সেন তোমার পূর্ব্বপুরুষ, তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার বংশে জন্মিয়া তুমি ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিলেও দাস্যভাব

তোমারত ভাল লাগিবেই।' সত্যসত্যই দাস্যভাব মোহিতচন্দ্রের মজ্জাগত ছিল, শান্ত ও মধুর রস ইহা হইতে আপনা আপনি প্রস্ফুত হইত। সেবাধর্ম্ম (Service of God & Humanity) তাঁহার হৃদ্গত হইয়াছিল এবং 'যৎকরোমি যদশ্নামি তদেব তব পূজনম্' এই মহাবাক্যের তিনিই প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার কয়েকজন সমপ্রকৃতিক বন্ধু কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন; পরে তাঁহারা সকলেই দারপরিগ্রহ করেন।* কিন্তু বিবাহ করিয়াও তিনি আজকালকার কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের ন্যায় ঘোর সংসারী হইয়া পড়েন নাই; হিন্দু ঋষিদিগের নির্দ্দিষ্ট আদর্শ গ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মেও অনাসক্তির ভাব রাখিয়াছিলেন এবং পদ্মপত্রস্থিত শিশিরবিন্দুর ন্যায় সংসারে থাকিয়াও সংসারী হয়েন নাই। ঋষিগণের ন্যায় তিনিও শুদ্ধাচারী ও নিরামিষাশী ছিলেন। মোহিতচন্দ্রের পিতা মহাত্মা কেশবচন্দ্রের প্রভাবে নববিধান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, মোহিতচন্দ্রের হৃদয়ও সেই পবিত্র ধর্ম্মের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসে উদারতা ছিল, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বা পরধর্ম্মবিদ্বেষ তাঁহার উদার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। এটিও তাঁহার চরিত্রের অপূর্ব্ব বিশেষত্ব। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের ন্যায় প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরাও যে তাঁহার বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার উদারতার প্রমাণ। যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই কেবল যে তাঁহার সদ্‌গুণে মোহিত হইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইয়াছেন। একজন যুবকের পক্ষে সমসাময়িক এমন কি সমবয়স্ক লোকদিগের হৃদয়ে এরূপ ভাব সঞ্চারিত করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও অপার্থিব ভাব দেখিয়া অনেক সময়েই মনে হইয়াছে, তিনি বিশেষভাবে ঐশীশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই যুবক সাধক যখন ধর্ম্মপ্রচারকল্পে বক্তৃতা করিতেন, তখন বেশ বুঝা যাইত যে তাঁহার প্রত্যেক কথা হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আসিতেছে এবং তাহাতে কেমন একটা পারমার্থিক ভাব রহিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গকে যেন সাধকপ্রবর কেশবচন্দ্রের ভাব ও ভাষা স্মরণ করাইয়া দিত।

সচরাচর আমাদের দেশে শিক্ষকতা ব্যবসায় অধমতারণ। লোকে কোনও দিকে কোনও সুবিধা না পাইলে শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করে এবং একটা কিছু সুবিধা পাইলেই শিক্ষকের লীলা সাঙ্গ করিয়া অন্য পথ দেখে। এ সকল লোক শিক্ষকতাকার্য্যের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব বুঝে না। মোহিতচন্দ্র এই শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তিনি অর্থোপার্জ্জনের লালসায় বা দিনগতপাপ ক্ষয়ের উদ্দেশ্যে শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন নাই। তিনি প্রাচীন ভারতের জ্ঞাননিরত ব্রাহ্মণের ন্যায় জ্ঞানালোচনায় জীবন অতিবাহিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন এবং চিরজীবনের জন্য শিক্ষকের পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তাই মোহিতচন্দ্র ও তাঁহার সহপাঠী বাল্যসুহৃৎ শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াই শিক্ষাদানকার্য্যে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহাদের এতই উৎসাহ ও অকৃত্রিমতা ছিল যে তাঁহারা উভয়েই, তাঁহাদের গুণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত নিতান্ত অল্প বেতনে, বহরমপুর কলেজে অধ্যাপকের আসনগ্রহণ করেন। সে সময়ে বহরমপুর কলেজে তাঁহাদেরই মত শিক্ষাব্রতধারী এবং তাঁহাদের গুণমর্য্যাদার প্রকৃত বোদ্ধা সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী প্রখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অধ্যক্ষ ছিলেন। তখন বহরমপুর কলেজে প্রকৃতই মণিকাঞ্চন যোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের কার্য্যারম্ভের কিছুদিন পরেই বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক শুভাদৃষ্টবশতঃ তাঁহাদের সহকর্ম্মী হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সাহচর্য্যে প্রায় দুই বৎসর কাল কাটাইয়াছিলেন। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে নিজের সম্বন্ধে দুটি একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার মানসিক জীবনে যতকিছু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই জ্ঞানিত্রয়ের সঙ্গলাভ একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। যৌবনের plastic periodএ এই শূদ্র অধ্যক্ষ ও বৈদ্য অধ্যাপকদিগের নিকট ব্রাহ্মণসন্তান আমি যে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে কত শিখিয়াছি তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। শিক্ষকজীবনের আদর্শের মহত্ত্ব ও জ্ঞানোপাসনায় উৎসৃষ্ট জীবনের শান্তিসুখের পবিত্রতা ইহাদের

* এই আকস্মিক ও শোকাবহ মৃত্যুর সাত বৎসর পূর্ব্বে (১৩০৬ সালের ৩২এ শ্রাবণ) তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ সুবিদ্বান্ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভগিনী। মোহিতচন্দ্র দুইটি শিশুকন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

জীবনদৃষ্টান্তেই বুঝিয়াছি বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ইঁহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে এই দুই বৎসর পরমসুখে কাটিয়াছিল; চাকরী-জীবনে এই দুই বৎসরই বোধ হয় আমার সর্ব্বাপেক্ষা সুখময়। পরে বিনয়েন্দ্রনাথ ভাগলপুরে ও মোহিতচন্দ্র ঢাকায় সরকারী চাকরীতে গেলেন। ইঁহাদের শূন্যপদ পূরণ করিবার সময় অধিক বেতন দিয়াও ইঁহাদের সমকক্ষ লোক পাওয়া যায় নাই, ইহাতেই বুঝা যাইবে ইঁহারা কত অল্প বেতনে চাকরী স্বীকার করিয়াছিলেন। (বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকও ইহার এক বৎসর পরে মোহিতচন্দ্রের মৃত পিতার পরিত্যক্ত পদে কুচবিহার গিয়াছিলেন)। সরকারী কার্য্যে মোহিতচন্দ্র প্রথমে ঢাকা কলেজে নিযুক্ত হয়েন, পরে হুগলি কলেজে এবং শেষে আবার ঢাকা কলেজে বদ্‌লি হয়েন। শিক্ষাবিভাগের বড় কর্ত্তার একটি কথায় নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কর্ম্মত্যাগ করেন। কলিকাতায় বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে (যথা হুগলি) থাকিলে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে সহায়তা করিতে পারিবেন এই সাধুসঙ্কল্পও তাঁহার সরকারী চাকুরি ছাড়ার অন্যতম কারণ। কর্ম্মত্যাগের সময় মোহিতচন্দ্র যে তেজস্বিতা দেখাইয়াছিলেন তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ পরিত্যাগের কথা মনে পড়ে। ইহার পরে তিনি যথাক্রমে মেট্রপলিটান, রীপণ ও সিটি কলেজে দর্শনশাস্ত্র ও ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। কিছু দিনের জন্য বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। বহরমপুর ছাড়ার পর আবার মেট্রপলিটান কলেজে মোহিতচন্দ্রকে সহকর্ম্মিরূপে পাইয়াছিলাম। এই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি এই কলেজের সম্পর্কত্যাগ করার পরেও তাঁহার সঙ্গে কতবার দেখাশুনা হইয়াছে। তাঁহার সহিত আলাপে, তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে, হৃদয় পবিত্রতায় পরিপ্লুত ও উন্নত আদর্শে পরিপুষ্ট হইয়াছে। একদিনের ঘটনা বেশ স্মরণ আছে। ক্রমাগত পঞ্চদশ বৎসরকাল বৈদেশিক কাব্যের ছত্রে ছত্রে ব্যাখ্যা করিতে করিতে অবসাদগ্রস্ত হইয়া তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসু হইয়াছিলাম, কি করিলে এই অবসাদ দূর হয়? তাহাতে তাঁহার যে উপদেশ পাইয়াছিলাম তাহা চিরদিন মনে থাকিবে, কেন না তাহাতে হাতে হাতে ফল পাইয়াছি। এক্ষেত্রে তাঁহার নিকট দ্বিতীয়বার ঋণী হইয়াছি। হায়! এ ঋণ পরিশোধ করিবার আর কোনও উপায় নাই। অধ্যাপনাকৌশলে ও চরিত্রের প্রভাবে মোহিতচন্দ্র ছাত্রগণের প্রিয় ছিলেন ও ছাত্রদিগের সকল সাধু উদ্যমেই তাহাদিগের অকৃত্রিম বন্ধু ও আন্তরিক সহায় ছিলেন। যখন তাঁহার সমবয়স্ক ও সমব্যবসায়ীরা পর্য্যন্ত তাঁহার উপদেশে ও দৃষ্টান্তে উপকৃত, তখন তাঁহার ছাত্রগণ যে তাঁহার নিকট কতদূর উপকৃত তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

ছাত্রজীবনে যদিও মোহিতচন্দ্রের বন্ধুত্বলাভের সৌভাগ্য ঘটে নাই, তথাপি একই বিদ্যামন্দিরে অধ্যয়নহেতু তাঁহাকে বেশ চিনিতাম। বাস্তবিক, মহাত্মা কেশবচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার সেই পুরুষোচিত দীর্ঘদেহ ও ভাবুকতাব্যঞ্জক মুখশ্রী যে একবার দেখিয়াছে সে কখনও ভুলিতে পারে না। 'বেশ চিনিতাম' বলিলাম, তাহার একটু তাৎপর্য্য আছে; তখনকার দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিবৃত করিলেই কথাটা পরিষ্কার হইবে। তিনি যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে এফ,এ, শ্রেণীতে পড়েন, বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক তখন বি,এ, পড়িতেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক একদিন রঘুবংশের একটি আদিরসাশ্রিত শ্লোকের অত্যন্ত খোলসা করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বিশুদ্ধরুচি মোহিতচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না, অতিকষ্টে স্বাভাবিক বিনয় পরিহার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং "এই সকল কুৎসিৎ কথা শ্রবণের ও উচ্চারণের অযোগ্য, যাঁহাদের কিছুমাত্র সুরুচি আছে, তাঁহারা এই দণ্ডেই এস্থান ত্যাগ করুন।" এই কথা বলিয়া সবেগে পাঠাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কেহ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিল কি না, সে কথাটা পাঠকবর্গ অনুমান করিয়া লউন। দ্বিতীয় ঘটনা, মোহিতচন্দ্র তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে বি,এ, পড়েন ও বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক এম,এ, পড়েন। তথাকার একজন নামজাদা ইংরেজ অধ্যাপক ছাত্রদিগকে প্রকৃতরূপে ইংরাজী সাহিত্যরস আস্বাদন করাইবার সাধু উদ্দেশ্যে কতকগুলি নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তির ছবি প্রদর্শন করিতেছিলেন। এস্থলেও ইহা মোহিতচন্দ্রের অসহ্য হইয়াছিল; তিনি দুর্দ্দান্ত লালমুখকে না ডরাইয়া এই কুৎসিৎ ব্যাপারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সে স্থানত্যাগ করিলেন।*

* অনেক দিন পরে মোহিতচন্দ্র চাকরীর অবস্থায় একবার দার্জ্জিলিঙ্গে বেড়াইতে যান। তথায় সে সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত ইংরেজ অধ্যাপক পীড়িত

উভয় স্থলেই প্রবীণ অধ্যাপক লজ্জা পাইয়াছিলেন কি না জানি না। এখনকার disciplineএর দিনে এরূপ ঘটিলে মোহিতচন্দ্র দণ্ডিত ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নির্ব্বাসিত হইতেন সন্দেহ নাই। এই দুইটি ঘটনা হইতে যৌবনেই তাঁহার সৎসাহস ও সুরুচির কি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়!

এই দুইটি ঘটনা হইতে আপনারা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন না যে মোহিতচন্দ্র পরিণত বয়সে বিকট রুচিবাগীশ (Puritanical) ছিলেন। সাহিত্য ও কলাবিচারে তাঁহার যথেষ্ট উদারতা ছিল। Boccaccio বা Rabelais বা Zolaকে তিনি অস্পৃশ্য, "অদেয়মপেয়মগ্রাহ্যম" বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি সৌন্দর্য্যহিসাবে এগুলির উপযোগিতা ও প্রয়োজন স্বীকার করিতেন। তবে তরলমতি যুবকগণ যাহাতে সংযম ও পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তাঁহাকে যদি নিতান্তই puritanical বলেন, তবে তিনি মহাকবি Miltonএর মত puritanical ছিলেন, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিব।

প্রবন্ধের আরম্ভে বলিয়াছি, মোহিতচন্দ্রের মৃত পিতার ত্যক্ত পদ একদিন আমাকে অধিকার করিতে হইয়াছিল। মোহিতচন্দ্রের সহিত আমার এই সম্বন্ধ বিষাদে জড়িত। আজ হৃদয় তদপেক্ষাও বিষাদে আচ্ছন্ন। মোহিতচন্দ্র পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার নিতান্ত অযোগ্য বন্ধু এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ দ্বারা তাঁহার স্মৃতিরক্ষায় চেষ্টিত। তাঁহার গুণের ব্যাখ্যা করি, তাঁহার মহৎ চরিত্র ভাল করিয়া বুঝিতে বা বুঝাইতে পারি, এমন শক্তি নাই। মূক শোকই এই ঘটনার উপযোগী। তবে পুত্রহারা জননীর অর্থহীন প্রলাপের ন্যায় এই প্রবন্ধে হৃদয়ের ভার কিঞ্চিৎ লাঘব হইতে পারে এই ভরসা। তাঁহার গুণের স্মরণ ও কীর্ত্তনে মনের কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা। তাঁহার পবিত্র আদর্শ হৃদয়ে স্থাপন করিতে পারাই তাঁহার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা দেখাইবার একমাত্র উপায়।

মোহিতচন্দ্রের নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়াছে, তাঁহার প্রাণ মহাপ্রাণে বিলীন হইয়াছে, শান্ত অনন্তে মিলিয়াছে, তাঁহার জীবনপ্রবাহ কালসিন্ধুতে পড়িয়াছে, তাঁহারই স্বজাতীয় সাধক রামপ্রসাদের কথায় বলিতে গেলে, জলের বিম্ব জলে মিশিয়াছে। আমরা মোহিতচন্দ্রের প্রিয় কবির শান্তিদায়িনী বাণীতে উপসংহার করি।

A power is passing from the earth
To breathless Nature's dark abyss :
But when the great and good depart,
What is it more than this ?
That man who is from God sent forth,
Doth yet again to God return.
Such ebb and flow must ever be ;
Then wherefore should we mourn ?

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

অবস্থায় ছিলেন। মোহিতচন্দ্র তাঁহাকে একবার দেখিয়া আসা কর্ত্তব্য মনে করিয়া একদিন তাঁহার নিকট গেলেন। কিছুক্ষণ মিষ্টালাপের পরই সাহেবটি বলিলেন, 'দেখ মোহিত, তুমি আসিয়াছ ভালই হইয়াছে, আমি বিদ্যাসুন্দরের একটা ইংরাজী তর্জ্জমা পাইয়াছি, তর্জ্জমাটা ঠিক কি না একজন উপযুক্ত লোক অভাবে স্থির করিতে পারিতেছি না। তুমি একবার মিলাইয়া দেখ ত।' মোহিতচন্দ্রের তখন কি অবস্থা আপনারা অনুমান করিয়া লউন। সাহেবটির চরিত্রের ইহা অপেক্ষা সুন্দর illustration হইতে পারে না। গল্পটা আমাদের মোহিতচন্দ্রের মুখে শুনা।

ইংরাজ-রাজত্বে ভারতের স্বাস্থ্য।

পিয়াসন্ সাহেবের "জাতীয় জীবন ও চরিত্র" (Pearson's National Life and Character) এক খানি বহুজন বিদিত গ্রন্থ। লেখক তাহাতে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতে ইংরাজেরা যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় শান্তিতে লোকসংখ্যা বাড়িতেছে, পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞান প্রবর্ত্তিত করায় এবং ইংরাজী এঞ্জিনিয়ারী বিদ্যার প্রভাবে স্বাস্থ্যকর ঘর বাড়ী ও সহর নির্ম্মাণ করায় স্বাস্থ্যোন্নতি বশতঃ লোকসংখ্যা বাড়িতেছে এবং রেলরাস্তা নির্ম্মিত ও খাল খনিত হওয়ায় দুর্ভিক্ষ নিবারিত বা প্রশমিত হওয়ায় লোকসংখ্যা বাড়িতেছে।* ভারতবর্ষের মধ্যে এখন আর যুদ্ধে মানুষ মরে

* "Then again, in India, for one war that we have waged, we have prevented 20 by the mere establishment of a strong central authority. Accordingly, the population of India has increased at least fourfold, probably fivefold, within a century." P 88.

"There is another way in which we are the blind instruments of fate for multiplying the races that are now our subjects, and will one day be our rivals. We carry the Sanitary Science and the Engineering skill of Europe into the East. The Indian official who

না, ইহা সত্য কথা; কিন্তু মহামারী বা দুর্ভিক্ষে মানুষ মরিতেছে না বা পূর্ব্বাপেক্ষা কম মরিতেছে ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ১০০ বৎসরে সমস্ত পৃথিবীতে যুদ্ধে পঞ্চাশ লক্ষ লোক মরিয়াছে। এত বড় জাপানরুশ যুদ্ধে রণে মরিয়াছে ৪৭৩৮৭, ক্ষতে মরিয়াছে ১১৫০০ এবং পীড়ায় মরিয়াছে ২৭১৫৮। আর ভারতবর্ষে ১৯০৫ সালের শেষ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে কেবল প্লেগে ৩৭ লক্ষ ২৯ হাজার লোক মরিয়াছে! দুর্ভিক্ষের কথা আর কি বলিব? ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে! দুর্ভিক্ষ কমা দূরে থাক্ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে ১১৯ পৃষ্ঠায় পাদরী একেড্ সাহেবের যে কথাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বৎসরে ৫টি দুর্ভিক্ষ হয় ও ১০ লক্ষ লোক মরে, দ্বিতীয় ২৫ বৎসরে ২টি দুর্ভিক্ষ হয় ও ৫ লক্ষ লোক মরে, তৃতীয় ২৫ বৎসরে ৬টি দুর্ভিক্ষে মোট ৫০ লক্ষ লোক মরে এবং শেষ পঁচিশ বৎসরে ১৬টি দুর্ভিক্ষে ২ কোটি ৬০ লক্ষ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়! পিয়ার্সন সাহেব নিজে মহামারী ও দুর্ভিক্ষের কথা লেখায় আমরা এই সকল সংখ্যার উল্লেখ করিতেছি। তা ছাড়া, লোকসংখ্যাও এখন আর পূর্ব্বের মত বাড়িতেছে না। ভারতের অধিবাসীদের দশ আনার উপর হিন্দু; ১৯০১ সালের লোকসংখ্যা গণনায় তাহাদের সংখ্যা ১৮৯১ সাল হইতে হাজার করা ৩ জন কমিয়াছে। অনেকে বলিবেন, দুর্ভিক্ষ দৈব ঘটনার উপর নির্ভর করে, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টিতে হয়। উহাতে রাজার দোষ কি? জিজ্ঞাসা করি, ইংরাজের নিজের দেশে, বা জার্ম্মেনীতে, বা ফ্রান্সে কি অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হয় না? অবশ্যই হয়। কিন্তু সে সকল দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের কথা দূরে যাক্, ১০০।২০০ বা ২।১০ জন লোকও মরে না কেন? হয়ত আর কেহ বলিবেন, আমাদের দেশে ইংরেজ রাজত্বের আগেও দুর্ভিক্ষ হইত। হইত স্বীকার করি; কিন্তু এরূপ দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ এতবার হইয়াছে বলিয়া কি কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে? আর যদিই স্বীকার করা যায় যে, এখন পূর্ব্বের মতই দুর্ভিক্ষ হয়, বেশী নয়, তাহা হইলেই বা অসভ্য হিন্দু মুসলমান রাজাদের চেয়ে সুসভ্য ইংরাজ রাজা এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেন কিরূপে?

যাক্, এ প্রবন্ধে দুর্ভিক্ষ আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে; ইংরাজ রাজত্বে ভারতের স্বাস্থ্যই আমাদের আলোচ্য। প্রবন্ধের প্রথমেই আমরা প্লেগের উল্লেখ করিয়াছি। প্লেগ ক্রমে কিরূপ বাড়িয়াছে, তাহা ১৯০৪ সালের শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুসংখ্যা হইতে দেখুন। ১৮৯৬ সাল, ২২১৯; ১৮৯৭, ৫৩৮১৬; ১৮৯৮, ৯৮৬১; ১৮৯৯, ১৩৯০০৯; ১৯০০, ৭৩৫৭৮; ১৯০১, ২৩৭৬৮৮; ১৯০২, ৪৫৬৯৭৫; ১৯০৩, ৬৮৬৪৮৫; ১৯০৪, ৯৪০৬০৯। অনেকে বলিবেন, প্লেগ দৈবনিগ্রহ; ইহাতে ইংরাজের দোষ কি? হিন্দুমুসলমান রাজত্বেও ত প্লেগ হইত। উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য যে কয়েক শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপেও প্লেগ হইত, এখন তথায় লোকের ধন ও জ্ঞান বাড়ায় আর হয় না। আমাদের দেশে ইংরাজের তথাকথিত সভ্য শাসনে আমাদের ধন ও জ্ঞান

---

wishes to obtain favorable notice at head quarters is very apt to promulgate a new plan of some crowded native town, by which broad streets are to replace the sinuous alleys, and before which the worst quarter will disappear. No native can be compelled to build in conformity with the new regulations, but every native who refuses to do it knows or thinks that he will be a marked man with the police, and compliance is very general. The system does not make our "Raj" popular, but it compasses great good for the people at a comparatively small cost, and familiarises the masses with elementary notions of decency. * * * Accordingly, though India is still the breeding place of cholera, its epidemics are much more manageable than they were; and this though the conditions of health in an increased population are more difficult to compass. Anciently, there were periodical famines, sweeping away, it might be, millions at a time. At present, what with irrigation works and enhanced security, the produce of the country is far greater than it used to be, and railways enable it to be more rapidly distributed. A famine, like that which destroyed three-quarters of a million and one fourth of the population of Orissa, as lately as 1866, is becoming every year more and more improbable. Meanwhile, the people, as is only natural, are taking advantage of the prosperity by multiplying rather than by raising their standard of comfort. The education, the contact with other people, that could make the present form of existence appear deficient, are wanting." Pp 88-89.

না বাড়ায় আমরা দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞতা প্রযুক্ত মহামারীতে মারা যাইতেছি। ইহাতে কি ইংরাজকে বেকসুর খালাস দেওয়া যায়?

পিয়ার্সন সাহেব বলিতেছেন যে ভারত এখনও ওলাউঠার জন্মক্ষেত্র হইলেও ইহার মহামারীগুলাকে সহজে বাগে আনা যায়। ইহা কি সত্য? ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য কমিশনার সাহেবের ১৮৯৯ এবং ১৯০৪ সালের রিপোর্ট দু'খানি হইতে আমরা কতকগুলি সংখ্যা দিতেছি। তাহা হইতে পাঠকবর্গ নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিবেন। ১৮৯৫ সালে হাজার করা ১·৪৩ জন ওলাউঠায় মরিয়াছিল; ১৮৯৬ এ ২·১৭; ১৮৯৭ এ ২·০৫; ১৮৯৮ এ ·৭০; ১৮৯৯ এ ·৭৮; ১৯০০ এ ৩·৭০; ১৯০১ এ ১·২১; ১৯০২ এ ·৯৯; ১৯০৩ ১·৩৮; ১৯০৪ এ ·৮৫। অর্থাৎ প্রথমোক্ত ৫ বৎসরে গড়ে বার্ষিক হাজার করা ১·৫২৬ জন ওলাউঠায় মরিয়াছে; কিন্তু শেষোক্ত পাঁচ বৎসরে গড়ে বার্ষিক হাজার করা ১·৬২৬ জন ওলাউঠায় মরিয়াছে। সুতরাং ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব না কমিয়া বরং বাড়িয়াছে। ইউরোপীয়দের মতে সাংঘাতিক ওলাউঠা এশিয়া, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ হইতেই উদ্ভূত। তাঁহারা বলেন যে পূর্ব্বে অনেক শতাব্দী ধরিয়া মধ্যে মধ্যে আমাদের দেশে ইহার মহামারী হইত। কিন্তু তাঁহারা ইহাও স্বীকার করেন, যে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে যশোরে যে ভয়ানক মড়ক হয়, তখনই য়ুরোপীয়দের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়।* এই কথাটা আমাদের দেশের একটা প্রবাদের সঙ্গে বেশ মিলিয়া যাইতেছে। তাহা এই যে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের পরে আমাদের দেশে ওলাউঠার আবির্ভাব হয়। অবশ্য এই প্রবাদ কতদূর সত্য, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ১৮১৭ সালে যখন এই রোগ মহামারীর আকারে আবিভূ্ত হয়, তখন ইহা এক নূতন রোগ বলিয়া অতি বৃদ্ধ লোকেরাও মনে করিয়াছিলেন। ইহাতে এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক নহে যে পূর্ব্বে এই রোগের মড়ক অতি বিরল ছিল।

অনেকে মনে করেন, ইংরাজ ভারতের অনেক বড় বড় সহরে যে সকল জল-সরবরাহের কারখানা (water-works) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। এই ধারণা সত্য কি না, কয়েকটি সহরের মৃত্যুতালিকা পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। সকলেই জানেন বর্ত্তমান সময়ে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশ বঙ্গদেশের চেয়ে স্বাস্থ্যকর। আমরা এই অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর প্রদেশ হইতেই তালিকা সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। ১৯০১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারীর পাইয়োনীয়ার পত্রে সার্জ্জন কর্ণেল গাইল্‌স্‌ সাহেবের (Col. G. M. Giles, I. M. S.) একখানি চিঠি প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের স্বাস্থ্য কমিশনারের ঐবৎসরের রিপোর্টের ৩০ পৃষ্ঠা হইতে একটি তালিকা সংগৃহীত করিয়া দেন। তালিকাটি আমরা নীচে বাঙ্গলা ভাষায় দিলাম।

সহর	জলের কল হইবার পর গড় বার্ষিক মৃত্যুর হার।	জলের কল হইবার পূর্ব্বে গড় বার্ষিক মৃত্যুর হার।
কানপুর	৪৭·৮৩	৪১·১৫
এলাহাবাদ	২৮·৭০	২৫·৭৭
লক্ষ্ণৌ	৪৩·৭৯	৪৪·৬৮
বেনারস	৪৮·৮১	৩৯·৯৯
মীরট	৩৫·০৬	৩২·১৩
আগ্রা	৩৫·৪৬	৩২·২৩

এই সংখ্যাগুলি পাঁচ পাঁচ বৎসরের মৃত্যুসংখ্যার গড়। এই তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে কেবল মাত্র লক্ষ্ণৌয়ে মৃত্যুর হার সামান্য কমিয়াছে; জলের কলবিশিষ্ট অন্য সব সহরে বাড়িয়াছে। পাইয়োনীয়ারে প্রকাশিত বক্ষ্যমান পত্রে

* "Malignant cholera is probably the most severe and fatal of all diseases. This form of cholera belongs originally to Asia, more particulrly to India, where, as well as in the Indian Archipelago, epidemics are known to have occurred at various times for several centuries. It was not, however, till 1817 that the attention of European physicians was specially directed to the disease by the outbreak of a violent epidemic of cholera at Jessore in Bengal. This was followed by its rapid spread over a large portion of British India, where it caused immense destruction of life both among natives and Europeans."—Ency. Brit. Vol. 5. p. 682.

ডাক্তার গাইল্‌স্ সাহেব দেখাইয়াছেন যে জলের কলের দরুন ম্যালেরিয়া বৃদ্ধিই মৃত্যুর হার বাড়িবার কারণ।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারীর ইণ্ডিয়ান ল্যান্সেট্ পত্রে জলের কল হওয়ায় নানা প্রকার জ্বরের প্রকোপ বাড়িয়াছে এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে।*

জলের কল হওয়ায় ভারতবাসীদের কিরূপ ইষ্টানিষ্ট হইয়াছে, তাহা তর্কের বিষয় হইলেও, ইহাতে ইংরাজদের যে বেশ অর্থলাভ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, এই সকল জলসরবরাহের কারখানার সমুদয় যন্ত্র ও নল প্রভৃতি বিলাত হইতে আনা হইয়াছে। তারপর মোটা মোটা মাহিনার এঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মচারী ও ঠিকাদারগণ সব ইংরাজ। জলের কলের নলে আবদ্ধ জল সূর্য্যকিরণ ও মুক্ত বাতাস পায় না বলিয়া বড় স্বাস্থ্যকর নহে। অনেকে মনে করেন, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত জল মাত্রই পানের অযোগ্য, তাহাকে পরিষ্কার করিয়া লওয়া দরকার। বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। সুস্থ শরীরে কেহই খাঁটি (pure) জল (অর্থাৎ যাহাতে কেবল দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও ১ ভাগ অক্সিজেন আছে) কেহ পান করে না; তাহা করা নিষ্প্রয়োজন ও অনিষ্টকর। পানীয় জলে প্রায় কিছু না কিছু খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ ও জীবিত অণুজীব বর্ত্তমান থাকে। এরূপ জলকে কয়েকটি ব্যতিক্রম স্থল ব্যতিরেকে অস্বাস্থ্যকর বলা যায় না।*

জলসরবরাহের কারখানার পরিবর্ত্তে ভারতের সহরে সহরে যথাসম্ভব আর্টীসীয় কূপ (Artesian wells) খনন করিলে অধিক উপকার হয়। জলের কল করায় ভারতবাসীদিগকে বিশুদ্ধ জলযোগানই যদি ইংরেজদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে যে জলের অভাবে বাঙ্গলাদেশের কত গ্রাম জনশূন্য ও কত প্রজা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহা প্রচুর পরিমাণে যোগাইবার জন্য কেন কোন উপায় করা হয় না? ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় বঙ্গের গ্রামে

* "The change for the better in Mandalay in the weather, it is hoped, will also effect an improvement in the Bill of Health. * * Up to this, Mandalay was supposed to be immune from Enteric fever. * During the past nine, and especially during the last four, years increasing care has been bestowed by the authorities on the purification of the water-supply of the Cantonments, by the use of permanganate of potash, by boiling, and in other ways. Such precautions, of course, have been notably taken in regard to Indian towns, and yet, during these years, the number of cases of enteric fever has increased considerably. * * * * In spite of much evidence, however, some experts cling to the belief in the water theory, which as they point out, is quite reconcileable with the facts, on the supposition that the water, after it has been purified, affords a more favourable breeding ground for the fever bacillus than before. * * One Medical expert is of opinion that increased attention to the purification of the water supply has only resulted in an increase in the number of enteric cases. * "

Indian Lancet, Jan: 7, 1901 pp. 17—18.

* Dr. H. W. Wiley, Chief of the National Bureau of Chemistry, U. S. A., says —

"Pure water, perhaps, is never used as a beverage and very seldom for any other purpose, because of the great difficulty of preparing it. Only in vessels of platinum or gold or some other non-oxidizable substance can water be prepared by repeated distillation in a pure state. The term 'water,' then, for potable purposes, applies to the ordinary forms of drinking water containing more or less mineral substances in solution, more or less organic matter, and greater or less numbers of living germs. Such water, with certain restrictions, cannot be considered unwholesome. In fact, perfectly pure water would be unwholesome because carrying no mineral substances in solution, it would immediately upon entrance into the stomach begin to dissolve mineral substances from the fluids of the body, thus diminishing the power of osmotic pressure and to this extent interfering with the bodily functions. Pure water, therefore, should never be recommended as a beverage except in those conditions of the system which are entirely abnormal, where mineral matters in solution in the fluids of the body are in excess.

"The presence, therefore, of the ordinary dissolved minerals, such as the compounds of lime, iron, soda, magnesium, traces of organic matter and of nitrous and nitric acid, of sulphuric and hydrochloric acid and the presence of ordinary bacteria, and those which are not pathogenic in character, must be regarded as improving the character of the water for drinking purposes."

গ্রামে জলকষ্টের কথা তুলেন।* তিনি দুঃখের সহিত বলেন যে একটি ছোট পুকুরের জলের জন্য দাঙ্গা হইয়াছে; তাহা হইতে ১৪।১৫টি গ্রামের লোক জল লইত। আরও বলেন যে একস্থলে একজন লোক নিজের খালি কলসী রাখিয়া রাত্রে আর একজনের জলপূর্ণ কলসী চুরি করিয়া লইয়া পলাইয়াছে। তাঁহার কথার উত্তরে মাননীয় বেকার সাহেব বলেন, † জলের বন্দোবস্ত করা প্রজাদের কাজ; গবর্ণমেণ্টকে গ্রামে গ্রামে জলযোগাইতে বলাও যা, আর সকলকে খাইতে পরিতে বা কাজ দিতে বলাও তা। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট বড় সহরে জলের কল কেন করিয়াছেন, প্রজাদিগকে নিজের জলের বন্দোবস্ত করিতে বলেন নাই কেন? আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে কূপ ও পুকুর খনন প্রজাদেরই ত কাজ। কারণ আগেকার লোকে ত পুকুরপ্রতিষ্ঠা পুণ্যের কাজ মনে করিয়া করিত। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। ডিউকঅব্ আর্গাইল্ যখন ভারতবর্ষের সেক্রেটরী অব্ ষ্টেট্ ছিলেন, সেই সময়ে রোড্‌সেস্ আদায়ের বন্দোবস্ত হয়। রোড্‌সেস সম্বন্ধীয় সরকারী পত্রের ২৩ প্যারাগ্রাফে তিনি বলেন যে স্থানীয় রাস্তানির্ম্মাণ ছাড়া রোডসেসের টাকা কূপ ও পুষ্করিণী আদি খনন ও মেরামতের কার্য্যে নিযুক্ত হইবে।* তাহা কি হইতেছে?

কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি সহরে যেরূপ মাটীর নীচে আচ্ছাদিত নর্দ্দমা হইয়াছে, তাহা স্বাস্থ্যকর নহে। ঐ সকল নর্দ্দমায় সূর্য্যের কিরণ ও বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। তাহা হইতে যে বিষাক্ত বাষ্প বাহির হয়, তাহা নানা কঠিন রোগের হেতু। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২৮ শে জানুয়ারী তারিখের ইণ্ডিয়ান ল্যান্সেট্ পত্রে সার্জ্জন কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম্ ডি মহাশয়ের একটি বক্তৃতার মর্ম্ম দেওয়া হয়। ঐ বক্তৃতায় ডাক্তার গুপ্ত মহাশয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার মোয়াট ও চেভাসের মত উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে কলিকাতার বর্ত্তমান রূপ নর্দ্দামা হইতেই টাইফয়েড্ জ্বর ও অন্যান্য ময়লাজনিত পীড়ার উদ্ভব হয়। তাঁহার এই বক্তৃতাটি স্বাস্থ্যতত্ত্ব জিজ্ঞাসু মাত্রেরই পাঠ্য। †

বঙ্গদেশেই প্রকৃত প্রস্তাবে বৃটিশ রাজত্ব প্রথম স্থাপিত

* "Let him in the first place point out, that it was not a question of the purity of water-supply to which he was drawing attention, but of the difficulty in too many cases of getting any water at all. He had placed certain facts bearing on this question at a previous meeting of the Council. He now referred to facts relating to another district which he had the honor to represent in that Council. In the issue of the *Charu Mihir* published at Mymensing, which he received the previous week, an instance was given of a riot taking place for the water of a small tank which supplied drinking water to as many as 13 or 14 villages; another instance of a very pathetic character in which there was a theft committed by night of a *Kulsi*-ful of water, the thief leaving his own empty *Kulsi* behind. This was the first time he heard of a case of theft of water, and he confessed he was touched to read of it."

† "The task is one for the people themselves to undertake. The Government can no more undertake to supply pure water for the whole rural population, than it could supply the same population with food, clothing or employment. What is wanted is not so much new tanks, as that existing tanks should be re-excavated. If the villagers will only combine to provide the labour, and if landlords and Zemindars will sink their personal quarrels and make their tanks available, I am certain that the greater part of those difficulties and these complaints will disappear."

* "The making and improving of wells, tanks and other works of irrigation, affecting comparatively small areas of land."

† COL. K. P. GUPTA, M.D., in the course of a lecture delivered recently on typhoid fever gave it as his opinion that the present system of sewerage in Calcutta is very much responsible for outbreaks of typhoid fever and other filthy diseases. Col. Gupta's remarks deserve the careful consideration of all who are responsible for the health of the population not only of Calcutta but of people in all other parts of India. We quote his remarks:—Here I might refer to the fact that Dr. Mouat and Dr. Chevers who were justices of the peace before the elective system came into force, strongly protested against the introduction of the present sewerage system and predicted in so many words—that in a hot and tropical country the introduction of sewers and sewerage would be followed by outbreaks of typhoid fever and other filth diseases.

হয়। এখন আমরা একবার আলোচনা করিয়া দেখি, বঙ্গদেশে ইংরাজরাজত্বকালে মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও বলবীর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে কি না। মুসলমান রাজত্বকালে বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য অতি উৎকৃষ্ট ছিল বলিয়াই মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বঙ্গদেশকে ভূস্বর্গ (paradise on earth) বলিয়া বর্ণন করিতেন। কৈ এখন ত কেহ বঙ্গদেশকে ঐ নাম দেয় না? মুসলমান আমলে সীতারাম রায়, প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় প্রভৃতি নবাব বাদশাহের সহিত লড়িয়াছিলেন। মুসলমান আমলে বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজসৈন্য দুর্দ্ধর্ষ বর্গীদিগকে হারাইয়া দিয়াছিল। ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনকালে ক্লাইব বাঙ্গালী সৈন্যের সাহায্যে কত যুদ্ধ জয় করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও বাঙ্গালীর শরীর দেখিয়া লোকের তাক্ লাগিত। বর্ত্তমান লর্ড মিণ্টোর পূর্ব্বপুরুষ লর্ড মিণ্টো ১৮০৭ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে অনারেবল্ এ-এম এলিয়ট্‌কে বারাকপুর দর্শনানন্তর যে পত্র লেখেন, তাহাতে বাঙ্গালীর শরীরের কিরূপ প্রশংসা আছে দেখুন:—

"The men themselves are still more ornamental. *I never saw so handsome a race.* They are much superior to the Madras people, whose forms I admired also. Those were slender: these are tall, muscular, athletic figures, perfectly shaped, and with the finest possible cast of countenance and features. Their features are of the most classical European models with great variety at the same time: but the females seem still as hideous as at Madras, and one cannot conceive that they should be the mothers of such handsome sons."—*Lord Minto in India* by Countess Minto.

বলা বাহুল্য, আমাদের দেশে পর্দ্দা থাকায় কেবলমাত্র ইতরশ্রেণীর স্ত্রীলোক দেখিয়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের চেহারা সম্বন্ধে লেখক অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন।

আগে বাঙ্গলা "ভূস্বর্গ" ছিল, এখন হইয়াছে, ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত দেশ। তখন বাঙ্গালীর দেহ পুরুষোচিত ছিল, এখন বাঙ্গালী নিজেই নিজেকে ঘৃণা করে। কিছু দিন আগেও বর্দ্ধমান, চন্দননগর, চুঁচুড়া স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি স্বাস্থ্যলাভার্থ এই সকল স্থানে যাইতেন। এখন সর্ব্বত্রই ম্যালেরিয়া। বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের কারণ কি? ৺রাজা দিগম্বর মিত্রের মতে বঙ্গদেশে রেলপথ নির্ম্মিত হওয়ায় পর হইতে ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব হইয়াছে। রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য অনেক বাঁধ বাঁধিতে হয়। এইরূপ বাঁধ বাঁধায় স্বাভাবিক জল বাহির হইবার অনেক পথ বন্ধ হইয়া যায়; ব্যয়বাহুল্য ভয়ে বাঁধের নীচ দিয়া জল বাহির হইবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক সেতু রাখা হয় না। বাঁধ বাঁধিবার জন্য যে মাটি খনন করা হয়, তাহাতে যে সকল ডোবা হয়, তাহা ভরাট না করায় জল জমে। এইরূপে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে। এক জাতীয় মশা মানুষের শরীরে ম্যালেরিয়ার বিষ সঞ্চারিত করিয়া দেয় বলিয়া যে আধুনিক মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত মতের কোন বিরোধ নাই।

ম্যালেরিয়ায় বঙ্গদেশের কিরূপ ক্ষতি হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তথাপি এখানে একটা পুরাতন কথার উল্লেখ করিতেছি। ১৮৮৭ সালে ফরিদপুর জেলায় জ্বরে ১৬০২৪ জন লোকের মৃত্যু হয়, কিন্তু ১৮৯৬ সালে জ্বরে ৪৮০৫৬ জনের মৃত্যু হয়। ৯ বৎসরে মৃত্যুসংখ্যার তিনগুণ বৃদ্ধি! সরকারী কাগজপত্র হইতে অনেক জেলাতেই এইরূপ বৃদ্ধি দেখান যাইতে পারে।

ভারতবাসীদের অন্নকষ্টই তাহাদের পীড়ার প্রধান কারণ। অন্নকষ্টে নানা রোগ উৎপন্ন হয়; যথা, প্লেগ। কেবল বাহিরের চাক্‌চিক্যে, কেবল পথ ঘাট পরিষ্কার রাখিলেই কোন দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না। অন্নের অভাব দূর করা চাই। অন্নাভাবে যে নানাবিধ কঠিন পীড়া হয়, তাহা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ওয়ালেস তাঁহার একখানি পুস্তকে দেখাইয়াছেন।*

* Land Nationalisation.—Its necessity and its aims by Alfred Russel Wallace. London, Swan Sonnenschein & Co., Ld. 1896. p. 152.

"Their condition is further shown by the following extract from a petition of the peasants of Lombardy, in reply to a Ministerial circular warning them against the dangers of emigration:—

'What do you mean by the nation, Signor Minister? Is it the multitude of the miserable? Then we, indeed, are the nation. Look at our pale and emaciated faces, at our bodies exhausted by excessive labour and insufficient food. We sow and reap the wheat, but never eat white bread. We cultivate the grape, but never

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে সর্ব্ববিধ কারণে ৬৪৯০৮৫৫ জন লোকের মৃত্যু হয়। পাঁচ বৎসর পরে ১৯০৪ সালে মৃত্যু-সংখ্যা ৭৪৩৬৪৭২ বলিয়া সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ভারতের মৃত্যুসংখ্যা হাজার করা ২৪ ছিল, এখন হইয়াছে ৩৪। ঐ সময়ে ইংলণ্ডে মৃত্যুসংখ্যা কমিয়া ২১ হইতে ১৬ হইয়াছে।

প্রকৃতির প্রতি।

এ কি রূপে আজি সেজেছ হেথায়
বলনা মোরে,
গৈরিক বাস কেন পরিয়াছ
কিসের তরে?

ফেলে দিয়ে ফুল-কঙ্কণ বালা,
আজি পরিয়াছ রুদ্রাক্ষ মালা,
ভৈরবী বেশে দাঁড়াইয়া যেন
ত্রিশূল করে।
সুনীল বসন নাহিক অঙ্গে
শরতে যে বেশে সাজ গো বঙ্গে,
তারার কিরীট খুলে ফেলে দিয়ে,
পৃষ্ঠ'পরে
এলা'য়ে দিয়েছ মেঘময় জটা—
কিসের তরে?
লুটাইছে পায় বিকচ কুসুম
অশ্রু জলে,
তব মুখ পানে চেয়ে আছে শুধু
কথা না বলে'।
নির্ঝর ধায় গুরু গরজনে,
কাঁপে চৌদিক ভৈরব তানে,
কখন আঁধার ঘিরে চারিধার
সাগর পারা।
কখন আকাশে উঠে রবি শশী,
মত্ত পবন কভু যায় শ্বাস'
তুমি তার মাঝে আছ দাঁড়াইয়া
আত্মহারা;
কভু পদযুগ ধুয়ে দিয়ে যায়
বরষা ধারা।
ঊর্দ্ধে যেন কি দেখাইছ তুমি
প্রসারি' কর,
কি যেন শান্তি ভাতিছে তোমার
ললাট'পর।
ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মাথার বাঁধন,
মুছে ফেলে দিয়ে স্নেহের বেদন,
সংসার ছাড়ি' আসিয়াছ যেন
সাধনা তরে।
মুদিত নয়ন কাহার ধেয়ানে,
হৃদয় পূর্ণ কোন্ মহাজ্ঞানে,
শতেক ঝঞ্ঝা সহিছ নীরবে
হৃদয়'পরে।

drink its wine. We raise the cattle, but never taste meat. We are clad in rags. We dwell in dens of infection. We freeze in winter, and in summer we starve. Our only nourishment on Italian soil is a handful of maize, made costly by the tax. The burning fever devours us in the dry regions, and in the wet ones we are the prey of the fever of the marsh. Our end is a premature death in the hospital, or in our miserable cabins. And, in spite of all this, Signor Minister, you commend us not to expatriate ourselves! But can the land, where even the hardest labour cannot earn food, be called a native country?"

That this is not exaggeration is proved by the prevalence of *pellagra*, a frightful form of leprosy brought on by unwholesome food. M. de Laveleye says:—

'Twelve and eleven per cent. of the Lombard and Venetian population are smitten, and those who are not actually struck by the plague are debilitated by the bad nourishment. The statistics of the conscription for the Army give horrifying results. In 1878 the report of General Torre shows that the number of conscripts excused for constitutional infirmity was 20 per cent. in Lombardy and 18 p.c. in Venetia.* * * * Thus, in the fairest country in the world a fifth of the population, in the flower of their life, are incapable of military service, in consequence of extreme poverty.* * * The Commission of Inquiry on the subject of the *pellagra* says, 'The cause of this malady is extreme misery, so that under the medical question we find the social question.'

অচল অটল তবু দাঁড়াইয়া
মহিমা ভরে।
এরূপ তোমার পারিনা ত দেবি
দেখিতে আমি,
দাড়া'য়ে আছ কি মন্ত্র সাধনে
দিবস যামি।
খুলে ফেল ওগো গৈরিক বাস,
বদনে ফুটুক স্নেহমাখা হাস,
সোণার বসনে জননীর মত
সাজ গো আজি।
বিহগ আরতি করুক তোমারে,
বিটপী সাজাক্ দেহ ফুল ভারে,
শিশির বিন্দু-মুকুতার-হার—
শোভুক গলে।
শত শতদল ফুটুক ও রাঙা
চরণ তলে।

দার্জ্জিলিং, আশ্বিন, ১৩১২। শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবাদ।

আষাঢ়ের প্রবাসীর প্রথম প্রবন্ধে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অবতারত্ব প্রচার ও মহর্ষির সহিত বিচ্ছেদের পর হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ হইতে দূরে গমন, এই দুটি কথার প্রমাণ-ও-যুক্তিপূর্ণ দুইটি প্রতিবাদ পাইয়াছি। প্রতিবাদ দুটি দীর্ঘ। খৃষ্ট ও খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধে যাহা লিখিত ছিল, তাহারও দুটি দীর্ঘ প্রতিবাদ পাইয়াছি। বলা বাহুল্য স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন বা যীশুখৃষ্ট, নববিধান বা খৃষ্টধর্ম্ম, কাহারও নিন্দা করা প্রবাসীর উদ্দেশ্যবহির্ভূত।

প্রবাসী-সম্পাদক।

৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



মাতৃমূর্ত্তি ।

Kuntaline Press, Calcutta

প্রবাসী

"Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters."
"to look on noble forms
Makes noble thro' the sensuous organism
That which is higher."—*Tennyson.*

৬ষ্ঠ ভাগ। | ভাদ্র, ১৩১৩। | ৫ম সংখ্যা।

বিলাতী থিয়েটার।

বিলাতে আমার প্রথম থিয়েটার দর্শন হ্যামারস্মিথে। হ্যামারস্মিথ লণ্ডনেরই একটা অংশ, কিন্তু সহর হইতে দূরে—অর্থাৎ হ্যামারস্মিথ একটা "সবার্ব্ব"। বিলাতে পৌঁছিবার অল্প কয়েক দিবস পরেই আমি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিলাম—"হ্যামারস্মিথ থিয়েটারে" মিসেস্ হেনরি উড প্রণীত "ঈষ্টলিন" নামক উপন্যাসখানি নাটকাকারে অভিনীত হইবে। এই বহিখানি পূর্ব্বে আমার পড়া ছিল, সুতরাং বিবেচনা করিলাম, যাই, দেখিয়া আসি। অজ্ঞাতপূর্ব্ব কোনও নাটকের অভিনয় প্রথমে দেখিলে বুঝিতে পারি বা না পারি—"ঈষ্টলিন" বহিখানি জানা আছে, অভিনয় বেশ বুঝিতে পারিব। তখন লণ্ডনে মোটে আমার চারি পাঁচ দিন অতিবাহিত হইয়াছে, পথ ঘাট কিছুই চিনি না, কষ্টে স্পষ্টে টেম্পলে গিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসি মাত্র। আবার এদিকে হ্যামারস্মিথ নামটাও কিঞ্চিৎ ভীতিপ্রদ। রবি বাবুর "য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী"তে পাঠ করিয়াছিলাম, তাঁহার দ্বিতীয় বার লণ্ডন প্রবাস কালে একদিন বেড়াইতে বাহির হইয়া, ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে দিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি এবং তাঁহার "দাদা" কোথায় গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে স্থির করিতে না পারিয়া, পথ ভুলিয়া একেবারে হ্যামারস্মিথে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। শেষে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ ও বিস্তর গবেষণার পর, যথার্থ লাইন, যথার্থ ষ্টেশন প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া, বহু বিলম্বে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া "ঠাণ্ডা টিফিন" খাইয়াছিলেন। ভাবিলাম রবি বাবুর মত এত বড় একটা লোক যিনি এমন বহি লিখিতে পারেন, যাহার সকল স্থলের অর্থবোধের স্পর্দ্ধাও আমরা রাখি না, যিনি পূর্ব্বে এই লণ্ডনে এক বৎসর কাল বাস করিয়া গিয়াছেন, তিনি, দিনে দুপুরে যদি পথ হারাইয়া হ্যামারস্মিথে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তবে আমার মত একজন দীন হীন ক্ষুদ্র লোক, যে কলিকাতা নামক পল্লীগ্রাম হইতে চারি পাঁচ দিন মাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার পক্ষে সেই ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে দিয়া, রাত্রিকালে, হ্যামারস্মিথে পৌঁছিবার দুরাশা কি বামনের চন্দ্রস্পর্শের মত নয়?

আমি যাঁহাদের বাড়ীতে বাস করিতাম, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হ্যামারস্মিথে পৌঁছিতে পারিব ত?"

তাঁহারা অভয় দিয়া বলিলেন—"কোনও চিন্তা নাই। আমরা সব বলিয়া কহিয়া দিব, ঠিক যাইতে পারিবে।"

আমাদের সাড়ে সাতটার সময় ডিনার। থিয়েটার

আটটার সময় আরম্ভ হইবে। সুতরাং সাতটার মধ্যেই আমার রওনা হওয়া কর্ত্তব্য। তাই গৃহিণী ঠাকুরাণী সকালে সকালে আমার চারিটি খাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের নিকট যথোপযুক্তরূপে উপদিষ্ট হইয়া নব-ক্রীত মোটা ওভারকোট্ গায়ে দিয়া (তখন জানুয়ারি মাস) আমাদের বাড়ীর অনতিদূরে "রয়াল্ ওক্" নামক ষ্টেশনে গিয়া, পাঁচ পেনি না সাত পেনি মূল্যে হ্যামারস্মিথের জন্য এক খানি তৃতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট কিনিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে পদচারণা করিতে লাগিলাম। দুই চারি মিনিট অন্তর একখানি করিয়া ট্রেণ আসিতেছে। বাড়ীর লোকে আমায় বলিয়া দিয়াছিলেন, যে গাড়ী প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিবার সময় তাহার এঞ্জিনের সম্মুখে লাল আলোর অক্ষরে HAMMER-SMITH লিখিত দেখিবে, সেই গাড়ীতে চড়িয়া যাইও, কোথাও গাড়ী পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যক হইবে না, এবং হ্যামারস্মিথ গিয়া সে গাড়ী একেবারেই থামিয়া যাইবে, সুতরাং কোনও ভুল ভ্রান্তিরও আশঙ্কা নাই। আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে Ealing আসিল, Richmond আসিল, আরও বুঝি কি কি আসিল, ক্রমে আমার গাড়ীও আসিল, আমি তাহাতে আরোহণ করিয়া পনেরো কি বিশ মিনিটের মধ্যেই গন্তব্য স্থানে পৌছিলাম।

ভাবিয়াছিলাম, হ্যামারস্মিথটা যখন লণ্ডনের বাহিরের একটা উপনগর মাত্র, তখন একটু পাড়াগাঁ মত হইবে। বাহির হইয়া দেখি খাস লণ্ডনের মত না হউক, তথাপি সেই বিপুল প্রাসাদরাজি, সেই উজ্জ্বল বিপনিশ্রেণী, সেই জনসংঘ—পল্লীগ্রামের কোনও লক্ষণ নাই। পুলিসকে পথ জিজ্ঞাসা করিয়া, থিয়েটার গৃহে উপস্থিত হইলাম। তিন শিলিং না কত দিয়া একখানি ড্রেস-সার্কেলের টিকিট কিনিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

তখন যবনিকা উঠিয়াছে কিন্তু ড্রপসীন উঠে নাই। ড্রপসীনটা দেখিয়াই আমার পিত্ত জলিয়া গেল। সুরম্য চিত্রের পরিবর্ত্তে তাহাতে কি অঙ্কিত দেখিলাম?—নানাবিধ বিজ্ঞাপন, সাবানের বিজ্ঞাপন, পিলের বিজ্ঞাপন, ঘড়িওয়ালার বিজ্ঞাপন, জীবনবীমার বিজ্ঞাপন আরও কত কি বিজ্ঞাপন। দেখিয়া, আমার মনে যেরূপ বিরক্তি জন্মিল, সেইরূপ আত্ম-গরিমাও উপস্থিত হইল। ভাবিলাম—ইংরাজ! এই ত ধরা পড়িয়াছ! এই তোমার সৌন্দর্য্যবোধ! এই তোমার মার্জ্জিত রুচি! আমাদের কলিকাতার থিয়েটারে ত এরূপ নহে! সেখানকার ড্রপসীনে, এমন কি সর্ব্বদিগ্বিজয়ী কেশ তৈলের বিজ্ঞাপনও ত প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।*

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা, সাহিত্য ও শিল্প প্রভৃতি তুলনা করিতে গিয়া, আমরা সর্ব্বদা যে ভুল করিয়া থাকি, এ ক্ষেত্রে আমিও অজ্ঞাতসারে তাহাই করিলাম। আমাদের সর্ব্বোত্তমের সঙ্গে তাহাদের সর্ব্বাধমের তুলনা করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলাম। এই ভ্রমাত্মক তুলনার একটা উদাহরণ মনে পড়িতেছে। গল্প শুনিয়াছি, একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার পুত্রকে ইংরাজি পাঠাভ্যাস করিতে শুনিয়া, সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্যের তুলনা করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"দেখ দেখি আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যটা—কুমার সম্ভব, শকুন্তলা, কাদম্বরী প্রভৃতি পড়ে দেখ,—আর ওদের সাহিত্যে কেবল 'এক যে গরু, খায় সে ঘাস'—এই পর্য্যন্ত দৌড়।" হ্যামারস্মিথের পর, বিলাতে অন্ততঃ পঁচিশ ত্রিশটা ভিন্ন ভিন্ন থিয়েটারে প্রবেশ করিয়াছি—স্বয়ং আল্‌মা টাডেমার হস্তাঙ্কিত সীন প্রভৃতি দেখিয়াছি,—তাহা ছাড়িয়া দিলেও, সচরাচর কোনও ভাল থিয়েটরের সীন যেরূপ সুচিত্রিত, আমাদের কলিকাতার থিয়েটারের সীন তাহার তুলনার যোগ্যই নয়। সে দেশে যাহা অপকৃষ্টতম তাহার তুলনা এদেশে যেরূপ মিলে না, সে দেশে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহারও তুলনা এদেশে সেইরূপ দুষ্প্রাপ্য; এবং আমি যদি বলি, ইহা কেবল সীন প্রভৃতিতেই নয়,—শিল্পাদিতে নয়, বহির্জ্জগতের বিষয়েই নয়, অন্য অনেক বিষয়েই, তবে স্বদেশহিতৈষিগণ আমাকে মার্জ্জনা করিবেন কি?

অভিনয় সম্বন্ধে অধিক বলিতে হইবে না; মোটের উপর হতাশ হইতে হইল। তবে ইহা দেখিলাম, কলিকাতার রঙ্গ-মঞ্চে যেমন কথাবার্ত্তাটা—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের—অস্বাভাবিক সুরে হইয়া থাকে, এখানে তাহা হইল না, স্বাভাবিক সুরটাই বাহাল আছে। তবে নাট্যকলা সম্বন্ধে চাতুর্য্য কলিকাতার থিয়েটারেরই সমকক্ষ। হাস্যরস সৃষ্টি করিবার প্রধান উপায় দেখিলাম, প্লেটবাসন প্রভৃতি অসাবধানতার ভানে ফেলিয়া দিয়া ভঙ্গ করা। কোনও একটা বিশেষ রসের প্রাধান্য

* এখন পারিয়াছে শুনিতে পাই।—লেখক।

সময়ে, অন্য একটা অসাময়িক রসের অবতারণা করিয়া সমস্ত মাটী করিয়া দেওয়া ; যে সময়ে যে অবস্থায় যে কার্য্য বা কথা অশোভন বা অসম্ভব, সেই কার্য্য বা কথার অবতারণা ইত্যাদি, আমাকে বিধিমতে পীড়া দিতে লাগিল। কলিকাতা রঙ্গমঞ্চ হইতে একটা বা দুইটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইব। ক্লাসিক থিয়েটারে ভ্রমরের অভিনয় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। রোহিণী চোর বলিয়া ধরা পড়িয়াছে—ভ্রমর অন্তঃপুরে বসিয়া এ সংবাদ পাইলেন। পরে গোবিন্দলাল আসিলেন। গোবিন্দলাল বলিলেন—"আমার বিশ্বাস হইল না যে রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। তোমার বিশ্বাস হয়!" ভ্রমর বলিল—"না।" গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন তোমার বিশ্বাস হয় না আমায় বল দেখি? লোকে ত বলিতেছে।" ভ্রমর, গোবিন্দলালের অবিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। "তুমি আগে বল"—"তুমি আগে"—করিয়া পরস্পরের প্রতি একটু পীড়াপীড়ি চলিল। এই পর্য্যন্ত যথাযথ পুস্তকানুকরণ করিয়া শেষে, রঙ্গমঞ্চে ভ্রমর এইরূপ বলিতেছে:—"প্রাণেশ্বর, রোহিণী যে নিরপরাধিনী তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে। নিজের অস্তিত্বে আমার যতদূর বিশ্বাস রোহিণীর নির্দ্দোষিতায় আমি ততদূর বিশ্বাসবতী। কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ নেই। তুমি বলেছ সে নির্দ্দোষী, তাই আমার এ বিশ্বাস। তোমার বিশ্বাসেই আমার বিশ্বাস। নাথ!—" ইত্যাদি। অমনি চারিদিক হইতে ঘন করতালি এবং নব্য বাবুদের কণ্ঠ হইতে এক-সিলেন্ট—একসিলেন্ট—ভেরি নাইস্—ধ্বনি উত্থিত হইল। আমি যে ক্ষণে ভ্রমরের এই উক্তি ষ্টেজ হইতে শুনিলাম, তখন মনে হইল, আমার বক্ষে কে যেন কষাঘাত করিতেছে। অনেক বৎসর পূর্ব্বে, কৃষ্ণকান্তের উইল শেষবার পড়িয়াছিলাম, ভাল মনে ছিল না। ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মধ্যে "তুমি আগে" এইরূপ একটা কথা কাটাকাটি হইয়াছিল, তাহাই মাত্র ছায়াবৎ স্মরণ ছিল;—আর ভ্রমর চিত্রটিরও আভাস মনে অঙ্কিত ছিল। ভ্রমরের উক্তির সঙ্গে—পাঠক স্মরণ রাখিবেন,—আমি ভ্রমরের বাচনিক উক্তির কথাই বলিতেছি, তাহার মনের ভাবের কথা বলিতেছি না—ভ্রমরের উক্তির সঙ্গে, আমার মানসাঙ্কিত ভ্রমর-চিত্রের এত গরমিল হইল, এবং সে গরমিল আমাকে এমন আঘাত করিল,—যে আমি কাতর হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—বাস্তবিক কি বঙ্কিম বাবুর মত অমন একজন শিল্পী ভ্রমরের মুখে এ অবস্থায় ও কথা বসাইয়াছেন?—বাড়ী আসিয়া পুস্তক খুলিয়া দেখিলাম। দেখিয়া বাঁচিলাম। থিয়েটারওয়ালা যে স্থানে ভ্রমরের মুখে ও উক্তি বসাইয়াছেন,—সেখানে বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন—"ভ্রমর বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না—লজ্জাবনতমুখী হইয়া নীরবে রহিল।"—তাহার পর প্যারাগ্রাফে বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন:—

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন বলিয়া এত পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। রোহিণী যে নিরপরাধিনী, ভ্রমরের তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। আপনার অস্তিত্বে যত দূর বিশ্বাস, ভ্রমর উহার নির্দ্দোষিতায় ততদূর বিশ্বাসবতী। কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ ছিল না, কেবল গোবিন্দলাল বলিয়াছেন "সে নির্দ্দোষী আমার এইরূপ বিশ্বাস।" গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমরকে চিনিতেন। তাই সে কালো এত ভালবাসিতেন।

কৃষ্ণকান্তের উইল, ৪৯ পৃঃ।

সুন্দর ভাব—সুন্দর চরিত্র-বিশ্লেষণ। থিয়েটারওয়ালা দেখিলেন, এমন সুন্দর কথাগুলি কথোপকথনের মধ্যে না থাকায় বাদ পড়িয়া যায়, সুতরাং ভ্রমরের মন হইতে সেগুলি বাহির করিয়া তাহার মুখে লাগাইয়া দিলেন। যথাস্থানে যাহা সুন্দর, অযথাস্থানে তাহা যে পীড়াদায়ক হইতে পারে, তাহা বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষগণ কতদিনে বুঝিতে পারিবেন? রসগোল্লা রসনেন্দ্রিয়ের পক্ষেই তৃপ্তিদায়ক। তাহাকে দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্যে জোরে প্রবেশ করাইতে গেলে তাদৃশ সুখ সম্ভাবনা নাই।

আর একটা রসভঙ্গের উদাহরণ দিই। ভ্রমর মৃত্যুশয্যায়। সাত বৎসরের পরে গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিয়াছেন। কি অবস্থায়, তাহা আমার পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। ক্লাসিকের রঙ্গমঞ্চে গোবিন্দলাল ওরফে অমরেন্দ্র বাবু, ঝড়ের মত প্রবেশ করিয়া, ভ্রমরের বিছানায় ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া ভ্রমরের হাত ধরিয়া—"আমার কালো ভ্রমর—আমার সুন্দর ভ্রমর—" বলিয়া সাধা গলার এক সুদীর্ঘ ইস্পীচ ঝাড়িয়া দিলেন। যেমন নৈবেদ্য, তেমনি দেবতা। রঙ্গালয় প্রকম্পিত করিয়া পূর্ব্ববৎ চট্চটা ধ্বনি!—বঙ্কিম বাবু এইস্থল কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, দেখুন:—

যামিনী উঠিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে, নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে গোবিন্দলাল সাত বৎসরের পর নিজ শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দুইজনেই কাঁদিতেছিল। একজনও কথা কহিতে পারিল না।

ভ্রমর, স্বামীকে কাছে আসিয়া বিছানায় বসিতে ইঙ্গিত করিল। গোবিন্দলাল কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় বসিল। ভ্রমর তাঁহাকে আরও কাছে আসিতে বলিল। গোবিন্দলাল আরও কাছে গেল। তখন ভ্রমর আপন করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া, সেই চরণ যুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। বলিল—"আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই।"

গোবিন্দলাল কোনও কথা কহিতে পারিলেন না। ভ্রমরের হাত, আপন হাতে তুলিয়া লইলেন। সেইরূপ হাতে হাতে রহিল। অনেকক্ষণ রহিল। ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল।

কৃষ্ণকান্তের উইল ১৮৬ পৃঃ।

বঙ্কিম বাবু ইহাই লিখিয়াছিলেন। অমরেন্দ্র বাবু দেখিলেন, এমন লাগসই জায়গাটায় বক্তৃতা নাই। তাই স্থানটা সংশোধন করিয়া, বঙ্কিম বাবুর অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ করিয়া, বিস্তর কবিত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক "আমার কালো ভ্রমর—আমার সুন্দর ভ্রমর" ইত্যাদি স্বরচিত বক্তৃতাটি যোজনা করিয়া দিলেন। হায় বঙ্কিম! এমনি করিয়াই বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে অহরহ তোমায় হত্যা করা হইতেছে। ক্লাসিক থিয়েটার ও অমরেন্দ্র বাবু সম্বন্ধে যাহা বলিলাম—তাহা বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রতি সাধারণ ভাবেই প্রযুজ্য। ক্লাসিক থিয়েটার ও অমরেন্দ্র বাবুকে উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করিলাম মাত্র;—ব্যক্তি-বিশেষ বা থিয়েটার-বিশেষ আমার লক্ষ্য নহে।

প্রসঙ্গ ক্রমে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। হ্যামারস্মিথ থিয়েটারেও কালকৈতিক অভিনয় দেখিয়া, অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া, বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতরাশের সময়, বাড়ীর লোক জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন দেখিলে?"

যেমন দেখিয়াছিলাম, তাহা বলিলাম।

শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন—"ওটা কি আবার থিয়েটার! ওখানে উহার অপেক্ষা আর কি হইবে?—একদিন ওয়েষ্ট এণ্ডের কোনও ভাল থিয়েটারে যাইও।"

তাহার পর হইতে, আমার তিন বৎসর প্রবাসকালের মধ্যে, আমি লণ্ডনের ভাল ভাল থিয়েটারগুলিতে বহু সন্ধ্যা যাপন করিয়াছি। তাহাতে অনেক আমোদ পাইয়াছি, অনেক তৃপ্তি পাইয়াছি এবং হয় ত আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতার অনুরূপ কিছু শিক্ষা লাভও করিয়া থাকিব। প্রথম বার যখন আর্ভিংএর অভিনয় দেখিতে যাই, গ্রীষ্মকালে জনতার মধ্যে আমায় দেড় ঘণ্টাকাল ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া তবে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল—(কেন, তাহার পরে বলিব) কিন্তু অভিনয় দর্শন করিয়া আমার সে কষ্টের বহুগুণ ক্ষতিপূরণ হইয়া গিয়াছিল। এডেল্‌ফি থিয়েটারে একবার, বিখ্যাত ফরাসী লেখক আলফোঁস্‌ দোদে প্রণীত "সাফোর" ইংরাজি অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। মিস্ অল্গা নেদরসোল নায়িকা অর্থাৎ সাফো সাজিয়াছিলেন। সেদিন অভিনয় কালে সমস্ত সময় স্থানাভাবে আমায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল; অভিনয়ান্তে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়িতেছে, অমনিবসের ভিতরে আর স্থান ছিল না, উপরে* বসিয়া ছাতা মাথায় দিয়া ভিজিতে ভিজিতে বাড়ী যাইতে হইয়াছিল; কিন্তু সে দিন বিমল নাট্যসুধা পান করিয়া আমি এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলাম, যে কোনও কষ্টকেও কষ্ট বলিয়া বোধ হয় নাই।

লণ্ডনের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ থিয়েটারগুলিতে, বাহিরে তেমন কিছু জাঁকজমক নাই। প্রবেশের দরজাটি কিছু প্রশস্তাকার। প্রবেশ করিয়াই ভেষ্টিবিউল। একটা সুপ্রশস্ত হলের মত। নিম্নে মর্ম্মর প্রস্তরের টালি বিছান। স্থানে স্থানে মখমলমণ্ডিত বসিবার দীর্ঘাসন। সুচিত্রিত ভিত্তিগাত্রে স্থানে স্থানে তদানীন্তন অভিনয়ের দৃশ্যাদির ফোটোগ্রাফ, ষ্টেজ-পরিচ্ছদ-পরিহিত বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের ফোটোগ্রাফ প্রভৃতি টাঙ্গানো রহিয়াছে। এক দিকে বক্স-আফিস, এখানে টিকিট বিক্রয় হয়। বেলা দশটা হইতে আফিস খোলা থাকে। এই খানে রিজার্ভ সীট গুলির জন্য টিকিট কিনিতে হয়। রিজার্ভ সীট যথা—বক্স, ষ্টল, ড্রেস সার্কেল ও অপার সার্কেল। এই সকল আসনগুলির জন্য পূর্ব্ব হইতে টিকিট কিনিয়া রাখা যায়। পূর্ব্ব হইতে এমন কি একমাস আগে হইতেও টিকিট কিনিয়া রাখা যায়। প্রত্যেক দিনের তারিখ-অঙ্কিত একখানি করিয়া ছাপা প্ল্যান আছে। যে তারিখের যে শ্রেণীর যে যে নম্বর আসনের টিকিট বিক্রীত হইতেছে, কর্ম্মচারী অমনি প্ল্যানে সেই সেই নম্বরের আসন নীল পেন্সিল দিয়া কাটিয়া দিতেছে।

দর্শকগণের বসিবার স্থান কিরূপ ভাবে বিন্যস্ত এবার তাহাই বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। পাঠক, নিজেকে ষ্টেজের উপর দণ্ডায়মান বলিয়া কল্পনা করুন। আপনার সম্মুখে,

* অমনিবসে ভিতরে বারো জন এবং ছাদে চৌদ্দজন লোকের বসিবার আসন।—লেখক।

ষ্টেজের নিম্নেই, অর্কেষ্ট্রা, এখানে বাদ্যযন্ত্রিগণ স্ব স্ব যন্ত্র লইয়া অভিনয় কালে উপস্থিত থাকে। তবে তাহাদের বসিবার স্থান মেঝে হইতে কিছু নীচু, যাহাতে দর্শকগণের দৃষ্টির বাধা না জন্মে। অর্কেষ্ট্রার পরই ষ্টলস্। ইহা কলিকাতার থিয়েটারের ষ্টলের মত ছারপোকাবহুল বেতের চেয়ার নহে। ভূমিতে পাদপ্রোথিত দীর্ঘ বেঞ্চের আকারে, অথচ থাক থাক কাটা, প্রত্যেক দর্শকের জন্য নম্বরযুক্ত স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ স্থান, হেলান দিবার, হাত রাখিবার যথেষ্ট স্থান,—অতি কোমল, মরক্কোচর্ম্ম অথবা মখমল মণ্ডিত। প্রত্যেক সারিতে অন্ততঃ ১৫।২০ জনের বসিবার স্থান, এইরূপ পাঁচ, সাত বা দশ সারি থাকে। ষ্টলস্ যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে ধাতু নির্ম্মিত রেলিং। তাহার পশ্চাতে পিট। এগুলি কাষ্ঠাসন মাত্র। হেলান দিবার বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু হাত রাখিবার কিছু নাই। কোন থিয়েটারে একটু গদী আঁটা আছে, কোন থিয়েটারে বা তাহাও নাই। মেঝের উপর, পিট শ্রেণীর পশ্চাতে আর কোন শ্রেণী নাই।

ষ্টলসে যাহারা বসিয়া আছে, তাহারা ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলে, অনেক উচ্চে গৃহের ছাদটাই দেখিতে পাইবে। কিন্তু পিটে যাহারা আছে, তাহাদের মাথার অব্যবহিত উপরেই, অন্য একটা ছাদ। পিটের নানা স্থানে স্তম্ভের দ্বারা সে ছাদ ধৃত। পিটের মাথার উপর ড্রেস সার্কেল। এইরূপ, ড্রেস সার্কেলের সম্মুখ ভাগ অনাবৃত রাখিয়া পশ্চাদভাগ আবৃত করিয়া যে ছাদ, তাহার উপর অপার সার্কেল। এই নিয়মে অপার সার্কেলের উপর গ্যালারি। ষ্টেজের উপর হইতে দাঁড়াইয়া দেখিলে, এইগুলি সিঁড়ির মতই প্রতীয়মান হইবে। যদি কোনও দৈত্যের মস্তকে এমন খেয়ালই চাপে, তবে সে ষ্টলসে একটা পা রাখিয়া, দ্বিতীয় পদ ড্রেস সার্কেলের উপর তুলিয়া দিয়া, প্রথম পদ ষ্টলস্ হইতে অপার সার্কেলের উপর উঠাইয়া, আবার দ্বিতীয় পদ ড্রেস সার্কেল হইতে গ্যালারিতে তুলিয়া দিয়া, অট্টালিকার ছাদ ফুঁড়িয়া বাহির হইতে পারে।

ইহা ছাড়া ষ্টলসের পার্শ্বে, ষ্টেজের কাছ ঘেঁসিয়া, এ দিকে একটি ও দিকে একটি বা এ দিকে দুইটি ওদিকে দুইটি বক্স আছে। এই বক্স গুলির উপর তালায় অর্থাৎ ড্রেস সার্কেলের সমতলে, আরও দুইটি বা চারিটি এরূপ বক্স আছে। তাহার উপর তালায় অর্থাৎ অপার সার্কেলের সমতলে আবার ঐরূপ বক্স আছে। গ্যালারির সমতলেও ঐরূপ।

মূল্যাদির বিষয়। ষ্টলসে একটি আসনের মূল্য অর্দ্ধগিনি বা ৭৸০; ড্রেস সার্কেলের আসনের মূল্য কোথাও বা সাত সিলিং ছয় পেনি, কোথাও বা ছয় সিলিংও আছে—অর্থাৎ ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৫৷৵০ নিম্ন সংখ্যা ৪৷৷০, অপার সার্কেলের মূল্য পাঁচ বা চার সিলিং অর্থাৎ ৩৸০ অথবা ৩৲, পিটের মূল্য অর্দ্ধ ক্রাউন বা ১৸৵০; গেলারির মূল্য একসিলিং বা বারো আনা। নিম্নতম একটি বক্সের মূল্য ৪ গিনি বা ৬৩৲ টাকা; তাহার উপরে ৩ গিনি বা ৪৭৷০; তাহার উপরে দুই গিনি বা ৩১৷৷০ সর্ব্বোপরি অর্থাৎ গ্যালারির সমতলে যে বক্স, তাহার মূল্য একগিনি বা ১৫৸০ মাত্র। প্রত্যেক বক্সে চারিজন লোকের বসিবার স্থান। এই হইল প্রথমশ্রেণীর থিয়েটারগুলির আসন মূল্য। নিম্নদরের থিয়েটারে বা উপনগরস্থিত থিয়েটারে মূল্যাদি কম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রিজার্ভ সীটগুলির জন্য টিকিট অগ্রিম কিনিয়া রাখা যায়। সচরাচর, অভিনয় সময়ে উপস্থিত হইয়া টিকিট চাহিলে পাওয়া যায় না। ধরুন হয় ত আপনি দুইজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া থিয়েটারে লইয়া যাইবেন; বক্স আফিসে গিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—"মহাশয়, তিনটি ষ্টল আমায় কত শীঘ্র দিতে পারেন?" হয় ত উত্তর পাইবেন, —এক সপ্তাহের পূর্ব্বে নয়. কি দুই সপ্তাহের পূর্ব্বে নয় ইত্যাদি। হয় ত এই এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ মধ্যে কোনও দিন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তিনটি আসন পাইতে পারেন কিন্তু আপনার তিনটি পরস্পর সংলগ্ন আসন প্রয়োজন কি না। সুতরাং সামনে যেদিন পরস্পর সংলগ্ন তিনটি বা ততোধিক আসন খালি আছে, সেই তারিখের প্ল্যান খানি হাতে করিয়া আপনি বলিয়া দিলেন—"আমি অমুক নম্বর হইতে অমুক নম্বর পর্য্যন্ত আসনগুলি লইব।"—কর্ম্মচারী সে তারিখের সেই নম্বরযুক্ত টিকিট তিন খানি আপনাকে দিবে,—আপনি লইয়া মূল্য দিয়া চলিয়া আসিবেন। সে দিন আসিয়া আপনার আসনগুলি দখল করেন, উত্তম, না দখল করেন খালি পড়িয়া থাকিবে।

এরূপ অনেক সময় হয়, কোনও ফরাসী অভিনেত্রী স্বীয় দলবল লইয়া অভিনয় করিতে আসিবেন, কোনও থিয়েটর গৃহ ভাড়া লইয়াছেন; দুই সপ্তাহ কি তিন সপ্তাহ

কি একমাস অভিনয় করিবেন ধার্য্য হইয়াছে; একজন ধনী হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়া, প্রতিদিনকার সমস্ত রিজার্ভ সীটগুলির মূল্য হিসাব করিয়া নগদ কিনিয়া ফেলিল। বক্স অফিসে নিজের কর্ম্মচারী বসাইয়া, বাজার বুঝিয়া টিকিটগুলি স্বেচ্ছামত অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে লাগিল। হয় ত এই সুযোগে অনেক লাভ করিয়া ফেলিল, হয়ত বা লোকসানই হইল। লোকসান হওয়ার কথা শুনা যায় না, লাভই প্রায় হইয়া থাকে। একবার প্রসিদ্ধ ফরাসী অভিনেত্রী মাদাম সারা বার্ণার্ড আমেরিকায় অভিনয় করিতে গিয়াছিলেন। এক ধনী পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত টিকিট কিনিয়া রাখিয়াছিল; ক্রেতার ভীড় এত হইল যে সে এক একখানা টিকিট নীলামে চড়াইয়া শতগুণ পর্য্যন্ত মূল্য আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

তবে সকল কোম্পানির অভিনয়ের সময় দর্শকের বাজার যে সমান গরম থাকে, তাহাও নয়। যখন আবার যথেষ্ট লোক যোটে না, তখন থিয়েটারওয়ালারা বন্ধুবান্ধবগণকে ফ্রী পাস্ দিয়া আসন পূর্ণ করিয়া আপনাদের ঠাট বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। আমরা মাঝে মাঝে এরূপ বিনামূল্যেও দেখিয়াছি।

আমি স্থানান্তরে বলিয়াছি, লণ্ডনের থিয়েটারগুলিতে প্রতি রাত্রেই অভিনয় হইয়া থাকে—কেবল রবিবার ছাড়া। সান্ধ্য-অভিনয় ব্যতীত, কোনও থিয়েটারে শনিবারে, কোন থিয়েটারে বুধবারে, কোনটাতে বা শনি বুধ উভয় বারেই, "ম্যাটিনে" অর্থাৎ অপরাহ্ণ-অভিনয়ও হইয়া থাকে। এই ম্যাটিনে প্রধানতঃ স্ত্রীলোক ও মফস্বলবাসীর জন্য। সান্ধ্য-অভিনয় দেখিতে হইলে, স্ত্রীলোকগণের পক্ষে, পুরুষ অভিভাবকের escort (রক্ষকতা) প্রয়োজন। সুতরাং যে সকল স্ত্রীলোকের সে উপায় নাই, তাহারা অপরাহ্ণ-অভিনয়ই দর্শন করিয়া থাকে। আর যে সকল মফস্বলবাসী লণ্ডনে আসিয়াছে, হয় ত সন্ধ্যার গাড়ীতে বাড়ী ফিরিয়া যাইবে—লণ্ডনে রাত্রিযাপন করিতে সম্মত নয়, তাহারাও অপরাহ্ণ-অভিনয় দর্শন করিতে যায়। বস্তুতঃ আমি যখনই কোনও অপরাহ্ণ-অভিনয়ে উপস্থিত হইয়াছি, তখনই স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যধিক দেখিয়াছি। এই প্রসঙ্গে একটা রহস্যজনক কথার উল্লেখ করি। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই এ সময় বিবিধ কারুকার্য্যখচিত সুবৃহৎ হ্যাট মাথায় দিয়া অভিনয় দর্শন করিতে যান, এবং সেগুলি খুলিয়া রাখিয়া পশ্চাতের দর্শকগণের সুবিধা করিতে প্রায়ই চাহেন না। খুলিয়া রাখিলে সেগুলির শোভা লোকে দেখিতে পাইবে না,—সে হ্যাট মাথায় দিয়া যাওয়াটাই ব্যর্থ হইবে, কিন্তু তাঁহারা ইহা বিবেচনা করেন না যে পশ্চাতের দর্শকগণ পয়সা দিয়া তাঁহাদের হ্যাটের অতুল শোভাই দেখিতে আসেন নাই। কোনও কোনও থিয়েটারে এইরূপ নোটিস ভিত্তিগাত্রে অঙ্কিত থাকে—Ladies are respectfully requested to remove their hats during matinee performances; কিন্তু কে বা শোনে! কেহ কেহ নোটিস পড়িয়া পরস্পর বলাবলিও করিয়া থাকেন—This is a free country. I can do just as I like; সে সময় তাঁহাদের ক্রোধস্ফীত অধরকান্তি ও অনিন্দনীয় ভ্রূ-যুগলের কুঞ্চনশোভা দেখিয়া পুরুষ দর্শকগণ মোহিত হইয়া যায় এবং অভিনয়ের অদর্শনজনিত শোক বিস্মৃত হয়। সুপ্রসিদ্ধ "পঞ্চ" একবার ব্যঙ্গচ্ছলে লিখিয়াছিল,—"বাড়ীতে বসিয়া বিনা আয়াসে কিরূপে থিয়েটার দেখা যায় জান? বাজার হইতে গোটাকতক picture hat কিনিয়া আনিয়া, সারি সারি সাজাইয়া রাখিও। তাহার পর সেইগুলির পশ্চাতে একটি চেয়ার লইয়া বসিয়া অনায়াসেই কল্পনা করিতে পারিবে—'আমি ম্যাটিনে দেখিতেছি'।"—সান্ধ্য-অভিনয়ের সময় স্ত্রীলোকদিগের হ্যাট পরিয়া থাকার রীতি নাই,—প্রলোভনও নাই, কারণ কেহ দেখিতে পাইবে না,—কেন দেখিতে পাইবে না তাহা পরে বলিতেছি।

থিয়েটারগুলি ৮ টা বা সাড়ে ৮ টার সময় আরম্ভ হইয়া, রাত্রি সাড়ে ১১ টার মধ্যেই ভাঙ্গিয়া থাকে। এখানেও কলিকাতার সঙ্গে কত প্রভেদ দেখুন। কলিকাতায় আমরা মনে করি,—পয়সা যখন দিয়াছি, তখন রাত্রি দুই তিনটা অবধি বসিয়া দেখিব, তাহার পরদিন আমার অবস্থা যাহাই হোক না কেন? লণ্ডনে তাহারা ভাবে,—আমোদ করিতে আসিয়াছি, তাই বলিয়া রাত্রি জাগিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিব কেন? ইহাতেই জাতীয় মেজাজটুকু বোঝা যায়; যাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে আগ্রহ আছে, তাহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য অন্য বহুবিধ উপায় আছে,

সে সব তাহাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, থিয়েটার নহে সর্ব্বসাধারণের ব্যাপার নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বক্স, ষ্টলস্, ড্রেস সার্কেল ও অপার সার্কেল, এই চারি শ্রেণীর আসনগুলি পৃথক পৃথক সংখ্যা দ্বারা অঙ্কিত ও সেগুলির জন্য টিকিট পূর্ব্বাবধি কিনিয়া রাখা যায়। পিট ও গ্যালারির আসন সংখ্যাকৃত নহে, এবং তাহার জন্য টিকিট পূর্ব্বাবধি কিনিয়া রাখা যায় না। রিজার্ভ আসনগুলিতে প্রবেশ করিবার দ্বার ভেষ্টিবিউলের ভিতর। কিন্তু পিট ও গ্যালারিতে প্রবেশ দ্বার বাহিরে, রাজপথ পার্শ্বে। থিয়েটারগুলি প্রায়ই এমন স্থানে নির্ম্মিত হইয়া থাকে, যাহাতে তাহার পরস্পর সংলগ্ন দুই পার্শ্ব দিয়া দুইটা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। ধরুন, যেন উত্তর দিয়া একটা রাজপথ ও পূর্ব্ব দিয়া অন্য একটা রাজপথ। যেন উত্তর দিকের দেওয়ালে পিট্-দ্বার এবং পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে গ্যালারি-দ্বার নির্ম্মিত আছে। অধিকাংশ থিয়েটারেরই এই দরজার নীচেই প্রকাশ্য রাজপথ, সুতরাং যদি কেহ পিটে গিয়া উৎকৃষ্ট আসন পাইবার জন্য দরজাটির কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে চায় তবে তাহাকে প্রকাশ্য রাজপথে পেভ্‌মেন্টের (অর্থাৎ ফুটপাথের) উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। দরজা খুলিলে তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া তবে টিকিট ক্রয় এবং তৎপশ্চাৎ তাড়াতাড়ি সুবিধামত আসন দখল। এখন সেখানকার লোক, একটু সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য শারীরিক বহু ক্লেশ স্বীকার করিতে এতই বদ্ধপরিকর, যে পিট ও গ্যালারির দরজার বাহিরে এরূপ একটি অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া থাকে যাহা কলিকাতা থিয়েটার-যাত্রীর স্বপ্নাতীত। পিট ও গ্যালারি দ্বার খুলিবার অনেক পূর্ব্বে হইতেই, লোক জমায়েৎ হইতে আরম্ভ হয়। যাহারা প্রথম পৌঁছিল, তাহারা ঠিক দরজাটির কাছে গিয়া দণ্ডায়মান হইল। দরজা খুলিলে, তাহারাই সর্ব্বোত্তম স্থান দখল করিবে। জনতা বিশৃঙ্খল হইলে, পথে লোক চলাচল বন্ধ হইবে, তাই পুলিস সেখানে জনতা 'regulate' (যদিও রেগুলেশন লাঠি নাই) করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। দুই দুই করিয়া দাঁড়াইবার নিয়ম। দুইজন, তাহার পশ্চাতে দুইজন, তাহার পশ্চাতে দুইজন, এইরূপ করিয়া, পেভমেন্টের উপর দিয়া, লোকচলাচলের জন্য পথ রাখিয়া দেওয়াল ঘেঁসিয়া,—লোক আসিয়া জমিতেছে। এই লাইনটি ক্রমশঃই দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া যাইতেছে। দুয়ার খুলিলে, সর্প যেমন গর্ত্তে প্রবেশ করে, সেইরূপে জনতা সর্প ধীরে ধীরে দুয়ারের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। ধীরে, কারণ সর্ব্বসম্মুখবর্ত্তী ব্যক্তি টিকিট কিনিতেছে ফেরৎ টাকা কড়ি গণিয়া লইতেছে, তবে সে অগ্রসর হইয়া পরবর্ত্তীর জন্য স্থান খালি করিতেছে।

থিয়েটারে যাইতে হইলে, আমি প্রায়ই পিটে যাইতাম। আমি সচরাচর, দুয়ার খুলিবার আধ ঘণ্টা বা তিন কোয়ার্টার পূর্ব্বে গিয়া দণ্ডায়মান হইতাম। আমি যখন পৌঁছিতাম, তখন আমার সম্মুখে বহুলোক, আমার পশ্চাতেও ক্রমে বহু লোক আসিয়া জমা হইত। এই অপেক্ষার সময় টুকু অতিবাহিত করিবার জন্য, পুরুষেরা সংবাদপত্র পড়িতেছে, স্ত্রীলোকেরা গল্প করিতেছে; অথবা, রাজপথে কোনও তামাসা দেখিতেছে। লণ্ডনে যেখানেই লোক জমে, সেখানেই কেহ না কেহ আসিয়া কিঞ্চিৎ তামাসা দেখাইয়া কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লয়। হয় ত হঠাৎ এক স্থূলকায়, বিয়ার মদ্যের প্রভাবে রঞ্জিতনাসিক, অত্যন্ত পুরাতন মলিন বস্ত্রাবৃত বৃদ্ধ আসিয়া, টুপী খুলিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল "Lydies * and Gentlemen আমিও পূর্ব্বে একজন অভিনেতা ছিলাম। আমার খুব নামও হইয়াছিল। কিন্তু কোনও কুগ্রহ বশতঃ আমার রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করিতে হইল—এখন আমার বর্ত্তমান অবস্থা আপনারা চাক্ষুষ দেখিতেছেন। পূর্ব্বকালে আমি কিরূপ act করিতাম, এখন আমার নিকট তাহারই কিছু নমুনা শ্রবণ করুন" এই বলিয়া, হয় ত শেক্সপিয়রের কোনও প্রসিদ্ধ নাটকের প্রসিদ্ধ অংশ অভিনেতার ন্যায় আবৃত্তি করিল। শেষে বলিল—"আচ্ছা, এই অংশটি আপনারা এখনকার বিখ্যাত বিখ্যাত অভিনেতাগণের মুখেও শুনিয়াছেন—আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের অনুকরণ করি দেখুন।" বলিয়া Irving, Tree, Forbes Robertson একে একে এই তিন জনের অনুকরণ করিল। ঐ অভিনেতাত্রয়ের স্বর, সুর ও অঙ্গভঙ্গির অনুকরণে লোকে বিস্তর আমোদ পাইল। তখন লোকটি, টুপীটি হাতে করিয়া সেই শ্রেণীবদ্ধ জনতার

* ককনি উচ্চারণে 'এ' স্থানে 'আই' হইয়া থাকে, যথা day স্থানে die, paper স্থানে piper ইত্যাদি।—লেখক

মস্তকভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া, Thank you, Sir. Thank you madam, বলিতে বলিতে শেষ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া গেল। কেহ বা তাহার টুপীতে তুই একটা পেনি ফেলিয়া দিল, কেহ বা দিলও না। যে দিল, তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া, যে দিল না, তাহাকেও ধন্যবাদ দিয়া, বৃদ্ধ অনেকগুলি পেনি জড় করিয়া প্রস্থান করিল।

সে যাইতে না যাইতেই, হয় ত বছর দশ বারো বয়সের একটি বালক ও বালিকা আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। বালিকার হস্তে একটি ম্যাণ্ডোলিন;—বালক জনমণ্ডলীকে অভিবাদন করিয়া বলিল—"Lydies andGentlemen, we are tew poor orflings (orphans)—this 'ere my sister an' me. My sister will ply an' I'll give yer a song." বলিয়া বালকটি তাহার ক্ষুধাশীর্ণ গলার শিরাগুলি স্ফীত করিয়া গান আরম্ভ করিল—

Good bye, Dolly. I must leave yer,
It brikes my 'art to gow.
Good bye, Dolly Grey.

বালিকা বাজাইতে লাগিল। শেষ হইলে, বালক তাহার টুপী পাতিয়া পূর্ব্ববৎ পেনি সংগ্রহ করিয়া চলিয়া গেল। এইরূপ আরও তুই একটা তামাসা হইতে হইতে তুয়ার খুলিল—সকলে ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

কোনও কোনও বিশেষ সময়ে, অথবা কোনও অভিনয়ের প্রথম রজনীতে, গ্যালারি ও পিট দ্বারের বাহিরে অসম্ভব সময় হইতে লোকসমাগম আরম্ভ হয়। সেখানে অনেক লোক আছে, তাহারা নিজেকে first nighters বলিয়া গর্ব্ব করে;—কোন অভিনয় আরম্ভ হইলে, তাহার প্রথম রজনীতে তাহারা উপস্থিত থাকিবেই থাকিবে। বলিতে ভুলিয়াছি, সেখানে কলিকাতার মত আজ এক নাটক কাল অন্য নাটক অভিনয় হয় না। একটা নাটক একবার আরম্ভ হইলে, বহুদিন পর্য্যন্ত প্রতি রাত্রে সেই নাটকেরই অভিনয় হইয়া থাকে। এইরূপ একটা নাটক তুই মাস, তিন মাস বা লোকপ্রিয় গীতিনাট্য (musical comedy) হইলে এমন কি এক, তুই বা তিন বৎসর পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে অভিনীত হইতে থাকে। যাহারা প্রথম রজনীতে উপস্থিত থাকে, তাহারা পরে বন্ধুসমাজে তাহা প্রকাশ করিয়া বড়ই বাহাতুরী করে।

এক দিনের কথা মনে পড়িতেছে, সে দিন লাইসীয়মে আর্ভিং গইটের ফাউষ্ট আরম্ভ করিবেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা আরম্ভ নহে, revival মাত্র, কারণ পূর্ব্বেও তিনি লণ্ডনে ঐ নাটকের অভিনয় করিয়াছেন। পূর্ব্বে হইতেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে—আমিও স্থির করিয়াছি একদিন যাইব। প্রথম রজনীতে ত অবশ্যই নয়, তুই তিন সপ্তাহ যাউক, ভীড় একটু কমিলে একদিন যাইব। যে দিন প্রথম রজনী, আমি সে দিন প্রাতরাশের পর ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারে পড়িতে গিয়াছিলাম। বেলা একটা দেড়টার সময়, পুস্তকাদি নিজ স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া আধ ঘণ্টা খানেকের জন্য বাহির হইলাম, 'লাঞ্চ' খাইব বলিয়া। রাজপথে বাহির হইয়া দেখি, খবরের কাগজ বিক্রেতারা বেড়াইতেছে (যেমন প্রত্যহ বেড়ায়) তাহাদের কটিদেশে সেই সংস্করণ কাগজের (দিনের মধ্যে বহুসংস্করণ বাহির হয়) প্ল্যাকার্ড ঝুলিতেছে, তাহাতে অন্যান্য সংবাদের বৃহদক্ষরযুক্ত সূচনার সহিত ইহাও লেখা রহিয়াছে—"Revival of Faust Enthusiasts at the Lyceum."—দেখিয়া ভাবিলাম, অভিনয় আরম্ভ হইবে রাত্রি ৮টার সময়, এখন বেলা দেড়টা মাত্র, এখনি লোক গিয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে নিকটস্থ Express Dairy নামক ভোজনশালায় প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ আহার করিলাম। আহারান্তে ভাবিলাম, একবার লাইসীয়মে গিয়া তামাসাটাই দেখিয়া আসি। সেখান হইতে লাইসীয়ম অনুমান অর্দ্ধমাইল। সেখানে গিয়া দেখিলাম, পিট ও গ্যালারি দ্বারের বহির্ভাগে অন্ততঃ ২০।২৫ জন করিয়া নর নারী দাঁড়াইয়া আছে। ভাবিলাম, অধ্যবসায়ও ধন্য, পাগলামিও ধন্য। দেখিয়া পুনর্ব্বার পাঠাগারে ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম, প্রথম আগন্তুকগণ বেলা ১১টার সময় আসিয়াছিল। আট ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়াছে।

ফাউষ্টের অভিনয় চলিতে লাগিল। তুই তিন সপ্তাহ পরে একদিন ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করিব এই হিসাব করিয়া, লাইসীয়ম অভিমুখে রওনা হইলাম। গিয়া দেখি

তখনই এত লোক জমিয়াছে, যে তাহাদের পশ্চাতে আমি দাঁড়াইলে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভাল আসন পাওয়া দূরের কথা, বোধ হয় আসন অভাবে সারাক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিতে হইবে। সুতরাং আমি আর একদিন আসিব ভাবিয়া ফিরিয়া গেলাম।

আরও সপ্তাহখানেক কাটিল। সে দিন সন্ধ্যাবেলা আমি টেম্‌প্লে ডিনার খাইতে গিয়াছিলাম। ৭টার সময় ডিনার শেষ হইল। বাহিরে আসিয়া দেখি, খুব বৃষ্টি হইতেছে। সেখান হইতে লাইসীয়ম অল্প দূরেই। ভাবিলাম এই বেশ সুযোগ। এই বৃষ্টিতে আর খোলা রাস্তায় কে লাইসীয়মের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিবে?—যাই, গিয়া অপেক্ষা করি—আজ উত্তম স্থান পাইব। গেলাম। ও মহাশয়! গিয়া দেখি, সেই বৃষ্টিতেই ছাতা মাথায় দিয়া বহু নরনারী দাঁড়াইয়া আছে। প্রবেশ পাইলেও আসন পাইব না। সুতরাং, আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া গেলাম।

আরও কয়েক সপ্তাহ কাটিলে, একদিন দেড়ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া, একটি মাঝামাঝি রকমের আসন দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

আর একটি এই জাতীয় ঘটনার কথা বলি, তাহা শুনিলে পাঠক আরও বিস্মিত হইবেন। লণ্ডনে একটি পুরাতন থিয়েটর ছিল, তাহার নাম "গেয়িটি থিয়েটার।" আমি থাকিতে থাকিতেই সে অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া নূতন গড়া হইল। সেদিন "নিউ গেয়িটি থিয়েটারে"—"অর্কিড" নামক নূতন গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হইবে। এই ত এক প্রচণ্ড আকর্ষণ। তাহার উপর আবার স্বয়ং সম্রাট এডোয়ার্ড সেদিন দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিবেন। যথারীতি, সন্ধ্যা ৮টার সময় অভিনয় আরম্ভ হইবে। সেদিন দিবা-মধ্যভাগে কার্য্যোপলক্ষে সেই দিক দিয়া যাইতে যাইতে "নিউ গেয়িটির" দ্বারে বহুলোক দেখিয়াছিলাম, কিন্তু বিস্মিত হই নাই; কারণ "আজব সহরের" কাণ্ড কারখানা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অভ্যাস হইয়া আসিয়াছিল। পরদিন প্রভাতে সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম, যে ব্যক্তি সে একজন পুরুষ—প্রথম আসিয়াছিল, সে ভোর পাঁচটার সময় পৌঁছিয়াছিল। অভিনয়ান্তে সে ব্যক্তি গৃহে যাইবার সময় খবরের কাগজের রিপোর্টারগণ তাহার পিছু লাগিয়া তাহার বাড়ী গিয়া তাহাকে interview করিয়াছে ও তাহার ছবি তুলিয়া আনিয়াছে। কাগজে ছবি দেখিলাম, interview ও পাঠ করিলাম। সে বলিয়াছে—এক পকেটে জলমিশ্রিত ব্র্যাণ্ডির বোতল, অন্য পকেটে খাদ্য ভরিয়া পাঁচটার সময় পিটের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন আর কেহ আসে নাই, সেই প্রথম। ক্রমে যেমন বেলা হইতে লাগিল, দুই একটি করিয়া লোক আসিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইতে লাগিল। একস্থানে বলিয়াছে—"আমি দরজার কাছে যেখানটা দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার অনেক উপরে, দেওয়ালে, বেলা নয়টা, দশটার সময় মিস্ত্রীরা চূণকাম করিতে আসিল। আমাকে সরিতে বলিল—আমি সরিলাম না—সরিয়া কি স্থানটি খোয়াইব? উপর হইতে চূণ পড়িয়া আমার মাথা, গা, কাপড় চোপড় শাদা হইয়া গেল। আমি তবু দাঁড়াইয়া রহিলাম। চূণকাম শেষ হইল, মিস্ত্রীরা চলিয়া গেল। আমার অদ্ভুত চেহারা দেখিবার জন্য অনেক জনতা হইতে লাগিল। লোকে অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিল। এইরূপ কিছু সময় গত হইলে, এক পশলা বৃষ্টি আসিল। আমার গা, মাথা, কাপড়ের চূণ সব ধৌত হইয়া গেল। তাহার পর রৌদ্র উঠিলে কাপড় চোপড় শুকাইয়া গেল। আমি আবার পূর্ব্ববৎ হইলাম।"

বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, হে জন বুল, তোমার মত এত বড় বুদ্ধিমান এবং এত বড় নির্ব্বোধ, পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

এই জাতীয় আর একটি ঘটনা বলিয়া শেষ করিব। ইহা আমার সাক্ষাতে ঘটে নাই। সে দিন দেশে বসিয়াই সংবাদ-পত্রে পাঠ করিয়াছি। আমার পাঠকেরাও তাহা দেখিয়া থাকিবেন কিন্তু প্রসঙ্গানুরোধে এই স্থলে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।

সম্প্রতি বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী এলেন টেরির অভি-নয়ের জুবিলি হইয়া গিয়াছে—অর্থাৎ তিনি পঞ্চাশ বর্ষ অভিনয় সম্পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া বিলাতের অভিনেতৃ সমাজে উৎসব-আয়োজন হইয়াছিল। Drury Lane Theatreএ সেদিন তিনি অভিনয় করিয়াছিলেন, এবং সেদিনকার আয় শ্রীমতী এলেন টেরিকে benefit স্বরূপ উপহার দেওয়া

হইয়াছিল। অভিনয়টি অপরাহ্ণে হইয়াছিল। সেই অভিনয় দেখিবার জন্য, তৎপূর্ব্বদিন মধ্যাহ্নকাল হইতে দর্শকগণ Drury Lane থিয়েটারের পিট ও গ্যালারির দ্বারে অপেক্ষা করিয়াছিল—অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ দিন ও সম্পূর্ণ রাত্রি ঠায় দাঁড়াইয়াছিল। কেহ কেহ -বোধ হয় স্ত্রীলোকগণ- অত্যন্ত শ্রান্ত হইলে বসিবার জন্য বগলে করিয়া একখানি folding camp stool লইয়া গিয়াছিলেন। রাত্রি যখন বারোটা, তখন শ্রীমতী এলেন টেরি এ সংবাদ শুনিয়া আর থাকিতে না পারিয়া, গৃহ হইতে আগমন করেন, এবং অশ্রুপূর্ণ নেত্রে ভক্ত দর্শকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ সে দিনের আয় ছয় হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ নব্বই হাজার টাকা শ্রীমতী এলেন টেরিকে উপহার দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অভিনয়কালে সম্রাট উপস্থিত থাকিয়া শ্রীমতী এলেন টেরিকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

এবার প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল; এখন আর পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। বারান্তরে প্রধান প্রধান রঙ্গালয় ও নাটকাভিনয় প্রভৃতির বিবরণ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। সুবিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের চিত্রাদি সংযুক্ত করিয়া এই প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা নিবারণ করিবারও ইচ্ছা রহিল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ঐতিহাসিক ফেরিশ্‌তাহ্‌।

ইতিহাস প্রণয়ন মুসলমানগণের সাহিত্যানুশীলনবৃত্তির একটী মুখ্য অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ভারতেও ইতিহাসপ্রিয় মুসলমানগণের লেখনী নিশ্চেষ্ট ছিল না; সুতরাং মুসলমানশাসিত ভারতের ইতিহাসের প্রাচুর্য্যই পরিলক্ষিত হয়। ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত লিখিয়া যাঁহারা অক্ষয় খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে এক কৃতী ঐতিহাসিকের জীবনচরিত এই স্থানে আলোচনা করা গেল। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ফেরিশ্‌তার স্থান অতি উচ্চে।

আপনাপন আবির্ভাব ও জীবিতকালের ইতিহাস লেখকগণের জীবনকাহিনী জানিবার জন্য স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। কেন না ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ যাহা দেখিয়াছেন বা করিয়াছেন তৎপ্রণীত পুস্তকে তাহাও লিপিবদ্ধ থাকে—ফেরিশ্‌তাও এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক কিন্তু দুঃখের বিষয় এই লব্ধযশা লেখকের বিস্তারিত জীবনী প্রাপ্তির উপায় নাই। লিখিত গ্রন্থে ঐতিহাসিক কখন কখন আপনার উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা হইতে তাঁহার জীবনীর কিয়দংশ সঙ্কলন করা যায়।

ফেরিশ্‌তার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ হিন্দ্‌কাসেম শাহ; কিন্তু তিনি সচরাচর ফেরিশ্‌তাহ্‌ নামেই খ্যাত হইয়াছেন।

কাস্পিয়ানকূলবর্ত্তী আস্রাবাদে ফেরিশ্‌তার জন্ম হয়। পিতা গোলাম আলি হিন্দ্‌শাহ্‌ মনীষী, ধীমান ও সুপণ্ডিত ছিলেন। কালে সপরিবারে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতে পর্য্যটন করিতে করিতে পরিশেষে তিনি দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগরে উপনীত হয়েন। মোর্ত্তোজা নিজাম শাহ এই সময়ে আহম্মদনগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি ফেরিশ্‌তার পিতার পাণ্ডিত্যের কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে পুত্র মিরাণহোসেনের শিক্ষকত্বে নিয়োজিত করিলেন—ফেরিশ্‌তাহ্‌ যুবরাজের সহপাঠী হইলেন।

আহম্মদনগরে আসিবার অল্পদিন পরে গোলামহোসেন শাহের প্রাণবিয়োগ ঘটিল। কিন্তু পিতার মৃত্যু ফেরিশ্‌তার শিক্ষার পথে কোন বিশেষ অন্তরায় আনয়ন করিল না। স্বয়ং মোর্ত্তোজা নিজাম শাহ্‌ তাঁহার অভিভাবক হইলেন—রাজকীয় তত্ত্বাবধানে তাঁহার শিক্ষা চলিতে লাগিল—যুবরাজ মিরাণহোসেনের সহিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার অস্ত্রবিদ্যানুশীলনেরও সুবিধা ঘটিয়াছিল—প্রতিভাবান মেধাবী যুবক এদিকে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া মোর্ত্তোজা শাহের প্রভূত মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন। মোর্ত্তোজা শাহ তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় শরীররক্ষক সেনার অধিনায়ক করিয়া দিলেন।

১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ মীরাণ হোসেন স্বীয় পিতা মোর্ত্তোজা শাহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজ্যাধিকার করিলেন।

ফেরিশ্‌তাহ্‌ তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে কোথাও স্বীয় জন্মদিনের উল্লেখ করেন নাই—সুতরাং তাঁহার জন্মের তারিখ ঠিক নির্দ্দেশ করা দুরূহ। তবে তদ্বর্ণিত মোর্ত্তোজা শাহের সিংহাসনচ্যুতি ব্যাপার হইতে তাঁহার জন্মের সন অনুমান

করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে মীরাণহোসেন নিজাম শাহ পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন—ফেরিশ্তাহ্ বলেন, এই সময়ে মীরাণহোসেনের বয়স ষোড়শ বর্ষ। ফেরিশ্তাহ্ আরও বলেন যে তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তিনি আহম্মদনগরে নীত হইয়া মীরাণহোসেনের সমপাঠী হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার বয়স ও যুবরাজের বয়সের অনুরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে—এই হিসাবে অনুমান করা যায়, ১৫৭০ খৃষ্টাব্দেই ফেরিশ্তার জন্ম হয়।*

মোর্ত্তোজাশাহের সিংহাসনচ্যুতি সময়ে অন্যান্য রক্ষিগণের সঙ্গে ফেরিশ্তাকেও বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু মীরাণহোসেন স্বয়ং তাঁহার জীবন রক্ষা করেন। এই ঘটনার এক বৎসর পরে মীরাণহোসেন শাহ নিহত হইলে আহম্মদনগরে সর্ব্বনাশকারী রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল। অভিভাবকবিহীন ফেরিশ্তার বয়স তখন মাত্র সপ্তদশ বর্ষ। তিনি শিয়ামতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া রাজ্যের শক্তিসম্পন্ন সম্ভ্রান্তগণের মধ্যে তাঁহার তত সুপরিচয় ছিল না; সুতরাং এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সীমা অতিক্রম করিয়া আহম্মদনগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি বিজাপুর রাজ্যে গমন করিলেন (খৃঃ অঃ ১৫৮৯)। এই সময়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক দ্বিতীয় এব্রাহিম আদিলশাহ বিজাপুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাসন পরিচালনা, রাজাভিভাবক এবং প্রধান মন্ত্রী দেলওয়ার খাঁয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। দেলওয়ার খাঁ ফেরিশ্তার গুণপনার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সৈনিকবিভাগীয় এক উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে তাহার সুযশ ঘোষিত হইলে যথাসময়ে দেলওয়ার খাঁ তাহাকে এব্রাহিম আদিল শাহের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন।

এই সময়ে আহম্মদনগরের রাজত্ব লইয়া বোরহান নিজাম ও জুমাল খাঁয়ের মধ্যে ঘোর বিবাদ উত্থাপিত হয়। বোরহান দিলওয়ার খাঁয়ের সাহায্যপ্রার্থী হইলে তিনি ফেরিশ্তাকে স্বীয় সহকারীরূপে নিযুক্ত করিয়া জুমাল খাঁয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে দেলওয়ার খাঁয়ের পরাজয় হইল, তিনি পলায়ন করিলেন। ফেরিশ্তাহ্ আহত হইয়া জুমাল খাঁয়ের হস্তে বন্দী হইলেন; কিন্তু কৌশলক্রমে কারামুক্ত হইয়া পুনরায় স্বদলে যোগদান করিতে সমর্থ হইলেন। বোরহানের জন্য এই যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট হইতে এব্রাহিম শাহের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু দেলওয়ার খাঁ প্রভুর অমতেই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন—মন্ত্রীর এই যথেচ্ছাচারিতা এব্রাহিম শাহের ভাল লাগিল না। তিনি ইঁহাকে অপসারিত করিবার জন্য আয়েন-অল-মুলক নামক অন্য এক শক্তিশালী প্রধানের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া স্বীয় সৈন্যসহ গোপনে তাঁহার শিবিরে গমন করিলেন। ফেরিশ্তাহ্ জানিতেন ন্যায়তঃ এব্রাহিম আদিল শাহই তাঁহার প্রভু। এতদ্ভিন্ন দেলওয়ারের পলায়নের পর তিনি এনায়েৎ খাঁ সিরাজী কর্ত্তৃক রাজদরবারে সসম্মানে বিশিষ্টরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করা ঘোর অকৃতজ্ঞতার কার্য্য বিবেচনা করিয়া তিনিও এই গুপ্তযাত্রায় প্রভুর সহগামী হইলেন।

ইহার পর কতিপয় বৎসর পর্য্যন্ত ফেরিশ্তার গ্রন্থে তাঁহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই সময়ে তিনি তাঁহার ইতিহাস প্রণয়নে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। বাল্যকাল হইতে ফেরিশ্তার মনে, হিন্দুস্থানে মোসলেম-আধিপত্যের ইতিবৃত্ত লিখিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এক্ষণে তিনি স্বীয় প্রভুর নিকট আপনার মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। এব্রাহিম আদিল শাহ তাহাকে যথাসাধ্য উৎসাহিত করিয়া তাঁহার গ্রন্থের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করণার্থ অজস্র অর্থব্যয় করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। এ পর্য্যন্ত ভারতে মুসলমান অধিকারের পূর্ণ বিস্তারিত ইতিহাস কেহই প্রণয়ণ করেন নাই। নিজামাদ্দিন বখ্শী কৃত রওজাস্-উৎসাফা অসম্পূর্ণ এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। এব্রাহিম আদিল শাহ ফেরিশ্তাকে একখানি রওজাত্-উস্-সাফা প্রদান করিয়া, অনুরোধ করিলেন যেন তাঁহার গ্রন্থে এই সকল দোষের সমাবেশ না থাকে। প্রভুর প্রভূত অনুকম্পা ও সহায়তা লাভ করিয়া ফেরিশ্তাহ্ বিপুল উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত স্বীয় আকাঙ্খা পরিপূরণে বদ্ধপরিকর হইলেন।

* ফেরিশ্তার অনুবাদক ব্রিগ্স সাহেবের অভিমত এইরূপ। কিন্তু জার্ম্মান পণ্ডিত মোহ্লের মতে ফেরিশ্তার জন্মের সন ১৫৫০।১৫৮৭ সালে মোর্ত্তোজা শাহ সিংহাসনচ্যুত হয়েন—অবশ্য ফেরিশ্তাহ্ ইহার অগ্রেই তাঁহার শরীররক্ষী সেনার অধিনায়ক হইয়াছিলেন—১৫৭০ সালকে ফেরিশ্তার জন্মের বৎসর ধরিলে অধিনায়ক হইবার সময় তাঁহার বয়স পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শ বর্ষের অধিক হয় না। এত তরুণ বয়সে এরূপ পদপ্রাপ্তি কতটা সম্ভবপর, তাহা বিবেচনার বিষয়।

ফেরিশ্‌তাহ্‌ বলেন ৩৬ খানি বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে তিনি স্বীয় রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেন। অধিকন্তু তাঁহার গ্রন্থে আরও ২০ খানি পুস্তকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় তাঁহার গ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতা সাধন করিতে তিনি যত্ন ও গবেষণার ত্রুটি করেন নাই। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিজাপুর রাজগণের বিবরণ সমাপ্ত হইল। এই সময়ে ফেরিশ্‌তার বয়স মাত্র ২৬ বৎসর। অব্যবহিত কতিপয় বৎসরের মধ্যে গ্রন্থ শেষ হইল।

৩৪ বৎসর বয়সে ফেরিশ্‌তাহ্‌ বিজাপুর রাজকুমারী সুলতানা বেগমের সমভিব্যাহারে আহম্মদনগরে প্রেরিত হইলেন। অতঃপর ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের পুত্র শাহজাদা দানিয়েলের সহিত সুলতানা বেগমের পরিণয় সম্পাদিত হয়। এই সময়ে দানিয়েল বোরহানপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই পরিণয়ের পর সুলতানা বেগমের শিবিকার সঙ্গে ফেরিশ্‌তাহ্‌ বোরহানপুরে প্রেরিত হইলেন।

বিবাহের অল্পকাল পরে যুবরাজ দানিয়েলের প্রাণবিয়োগ হইল। ইহার কিছু দিন পরেই সম্রাট আকবর ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন (১৬০৫ খৃঃ অঃ)। (কথিত আছে, পুত্রের মৃত্যুশোকই আকবরশাহের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল) যুবরাজ সেলিম দিল্লীর সম্রাট হইলেন। আকবরশাহের মৃত্যুতে সমবেদনা এবং নূতন বাদশাহের অভিষেকে আনন্দ জ্ঞাপনার্থ বিজাপুর রাজ এব্রাহিমশাহ ফেরিশ্‌তাকে সম্রাট সমীপে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন (১৬০৬ খৃঃ অঃ)। সম্রাট জাহাঙ্গীর এই সময়ে লাহোরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ফেরিস্তা সেই স্থানেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ শেষ করিয়া যথাসময়ে বিজাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ফেরিশ্‌তাহ বেহারের রোটস্‌ দুর্গকেই ভারতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুর্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—তাঁহারি গ্রন্থে বাদাক্‌শানের বিবরণও পাওয়া যায়। লাহোর হইতে ফিরিবার সময় তিনি সম্ভবতঃ এই সকল স্থানও পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছিলেন।

বিজাপুর হইতে তিন মাইল পশ্চিমে তগ্‌রা নামক স্থানে এক রম্য নগরী স্থাপিত করিয়া এব্রাহিম আদিলশাহ্‌ তথায় স্বীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই নূতন রাজধানী নওরাস্‌ নামে খ্যাত হয়। নওরাসে অবস্থান কালে ফেরিশ্‌তাহ্‌ স্বীয় গ্রন্থ শেষ করেন। এই জন্য তাঁহার ইতিহাসের অন্যতম নাম "নওরাস্‌নামা"। ফেরিস্তা ১৬১১ খৃষ্টাব্দে সুরতে পর্ত্তুগীজ এবং ইংরাজ বণিক্‌গণের আবির্ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। তখন তাঁহার বয়স ৪১ বৎসর।

অতঃপর এব্রাহিম আদিলশাহ নওরাস্‌ হইতে রাজধানী পুনরায় বিজাপুরে স্থানান্তরিত করেন। তথায় ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৬১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ফেরিশ্‌তার আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাঁহার মৃত্যুর সন নির্দ্দেশ করা দুরূহ, ইহার কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে খৃঃ ১৬১১ সালের পর তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না এরূপ অনুমান একবারে ভিত্তিহীন নহে।

এব্রাহিম আদিলের মৃত্যুর (১৬২৬ খৃঃ অঃ) পূর্ব্বে বিজাপুর রাজধানী একটি সর্ব্ববিষয়ে শ্রীসম্পন্ন নগরী রূপে বিদ্যমান ছিল। গ্রন্থ শেষ হইবার পর (১৬১১ খৃঃ অঃ) অধিক দিন জীবিত থাকিলে তিনি বিজাপুরে প্রথিতযশা হইয়া তাঁহার স্মৃতির কোন-না-কোন নিদর্শন রাখিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার গ্রন্থ ব্যতীত আমরা অতঃপর আর তাঁহার কোন কীর্ত্তির পরিচয় পাই না। তাঁহার গ্রন্থে আমরা গোলকুণ্ডা রাজ্যের শুধু উল্লেখ দেখিতে পাই। গোলকুণ্ডার যে ইতিহাস এখন প্রাপ্ত হওয়া যায় সময় পাইলে তিনিই তাহা লিখিয়া যাইতেন, নিশ্চিত। অধিকন্তু বিজাপুরে অন্যান্য লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সমাধির উপর যে সমুদয় স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে অন্মধ্যে কোনটি তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য নির্ম্মিত বলিয়া প্রকাশ পায় না। তিনি নওরাস্‌ হইতে বিজাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার স্মৃতি অবশ্যই সমাদৃত হইত সন্দেহ নাই। সুতরাং—

"It seems extremely likely that the death of our author occured during the residence of the Court at Nowrus, as, subsequently to the abandonement of that city its buildings fell so rapidly to decay that with the exception of the part of the uncompleted wall and

some ruins of palaces little remains that is worthy of notice."*

ফেরিশ্‌তার বিস্তারিত পূর্ণ জীবনী অবগত হইবার উপায় না থাকিলেও তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী হইতেই তাঁহার চরিত্রতত্ত্ব উপলব্ধি করা যাইতে পারে। বাল্যকাল হইতেই তিনি মেধাবী ও প্রতিভাবান বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি পিতার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পূর্ণ অংশলাভে বঞ্চিত হইলেও তাঁহার জ্ঞানপিপাসা অতৃপ্ত থাকে নাই। দুর্লভ রাজকীয় সহায়তা ও অনুগ্রহের সহিত স্বীয় অতুলনীয় শ্রম ও অধ্যবসায় মিলিত করিয়া তিনি আপনাকে সর্ব্বাংশেই সমুন্নত করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি চরিত্রবান, সরলচিত্ত এবং সাতিশয় সত্যবাদী ছিলেন—বিশ্বস্ততা তাঁহার চরিত্রের একটী প্রধানগুণ ছিল। তাঁহার এইগুণে আকৃষ্ট হইয়াই আহম্মদনগররাজ তাঁহাকে স্বীয় শরীররক্ষী সেনার অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। এই গুণের পরিচয় পাইয়াই বিজাপুরপতি তাঁহাকে একাধিক দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন—তাই সুলতানা বেগমের শিবিকার অনুগমনে এবং দিল্লীর সম্রাট সমীপে দূত-প্রেরণ-কার্য্যে ফেরিশ্‌তাহ্‌ ব্যতীত কোন দ্বিতীয় যোগ্যতর ব্যক্তি বিজাপুররাজের মনঃপূত হয় নাই। এব্রাহিম আদিলসাহও এইগুণের যথাযথ সমাদর করিতে অবহেলা করেন নাই। ফেরেশ্‌তাই যখন তাঁহার আবাল্য পরিপোষিত হিন্দুস্থানের ইতিহাস প্রণয়ণাকাঙ্খা স্বীয় প্রভুর নিকট প্রকাশ করিলেন, তখন এব্রাহিম আদিল এই কৃতী কর্ম্মবীরের সাধনার পথে মূর্ত্তিমান উৎসাহ ও সহায়রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন—ফেরিশতাও স্বীয় সাধনা সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়া জগতে আপনাকে অমর করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে রাজধানী নওরাসের নামানুসারে ফেরিশ্‌তার লিখিত ইতিহাসের নাম হইয়াছিল "নওরাস্ নামা।" গ্রন্থকার প্রভু এব্রাহিম আদিল শাহের নাম অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় গ্রন্থের "গুলশান—ই—এব্রাহিম" আখ্যা প্রদান করেন। সচরাচর তাঁহার ইতিহাস "তওয়ারিখ্‌-ই-ফেরিশ্‌তাহ" নামে পরিচিত।

পূর্ব্বাভাস ও উপসংহার ব্যতীত "তওয়ারিখ-ই-ফেরিশতাহ" দ্বাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রস্তাবনায় গ্রন্থকার হিন্দুজাতি ও রাজত্ব, এবং ভারতে মুসলমানাবির্ভাবের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। উপসংহারে ভারতের জলবায়ু ও ভৌগোলিক তত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। দ্বাদশটী অধ্যায়ের বিষয় বিন্যাস এইরূপ—১ম অধ্যায়—গজনী ও লাহোরের রাজাগণ; ২য় অধ্যায়—দিল্লীর সম্রাটগণ; ৩য় অধ্যায়—দাক্ষিণাত্যের নৃপতিগণ; ৪র্থ অধ্যায়—গুজরাটের রাজাগণ; ৫ম অধ্যায়—মালবের রাজাগণ; ৬ষ্ঠ অধ্যায়—খান্দেশের রাজাগণ; ৭ম অধ্যায়—বাঙ্গালা ও বেহারের রাজাগণ; ৮ম অধ্যায়—মুলতানের রাজাগণ; ৯ম অধ্যায়—সিন্ধুর শাসনকর্ত্তাগণ; ১০শ অধ্যায়—কাশ্মীরের রাজাগণ; ১১শ অধ্যায় মালাবরের বিবরণ; ১২শ অধ্যায়—ভারতীয় সাধুপুরুষ-(Saint) গণের বিবরণ।

এই প্রকারে বিভক্ত "তওয়ারিখ-ই ফেরিশ্‌তাহ-সাতিশয় সুখ-পাঠ্যই হইয়াছে। গ্রন্থের রচনাপ্রণালী এরূপ সরল ও সরস যে বিরস যুদ্ধ বিগ্রহের বিবরণ পাঠ করিতে করিতেও পাঠস্পৃহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বর্ণিত বিগ্রহাদির কোন কোনটীতে গ্রন্থকার স্বয়ং সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সৈনিক জীবনজনিত অভিজ্ঞতাই তাঁহার যুদ্ধ ও অভিযানগুলির বর্ণনা প্রণালীতে এত সজীবতার সমাবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিকের গ্রন্থাবলিতে পুনরুক্তি দোষ পরিলক্ষিত হয় কিন্তু তওয়ারিখ-ই-ফেরিশতাহ এরূপ দোষে কলুষিত হয় নাই—গ্রন্থকার বিপক্ষ বা বিজাতি-বিদ্বেষ কিম্বা আড়ম্বরপূর্ণ রাজ-তোষামদের প্রশ্রয় আদৌ দেন নাই। "তওয়ারিখ-ই ফেরিশতাহ"র প্রমাণসিদ্ধতা ও ঐতিহাসিক মূল্যবত্তা অতি উচ্চ। ফেরিশ্‌তাহ্‌ গ্রন্থই মুসলমান শাসিত ভারতের পূর্ণও বিস্তারিত ইতিবৃত্ত। ফেরিশ্‌তা গ্রন্থ ইউরোপীয় সাহিত্যে যোগ্য সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে—জার্ম্মান ও ফরাসী ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ডৌ সাহেব ইংরাজীতে আকবর পর্য্যন্ত (দ্বিতীয় অধ্যায়) ইহার অনুবাদ করেন। "এসিয়েটিক্ মিস্‌লেনী"তে, মিঃ এণ্ডার্সন কর্ত্তৃক মালাবারের বিবরণাংশ

* See Brigg's "Life of the author"। ব্রিগস সাহেবের মতে, ফেরিশতার মৃত্যুকাল ১৬১২ খ্রীঃ অঃ। কিন্তু জার্ম্মান পণ্ডিত মোহল সাহেব বলেন, ফেরিশতা ১৬২৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করেন নাই। সুতরাং ব্রিগস সাহেবের মতে ফেরিশতা ৪২ বৎসর বয়সে প্রাণ ত্যাগ করেন (১৫৭০-১৬১২)। অন্য হিসাবে, তিনি ৭৩ বৎসর জীবিত ছিলেন, বলিতে হয় (১৫৫০-১৬২৩)।

(১১শ অধ্যায়) অনুবাদিত হয় (১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ)। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে জোনাথন স্কট সাহেব দাক্ষিণাত্য অধ্যায়ের অনুবাদ প্রকাশিত করেন। ব্রিগ্স সাহেবের অতুলনীয় অধ্যবসায়ে "তওয়ারিখ-ই ফেরিশ্‌তা"র পূর্ণ ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছে। ব্রিগ্স সাহেবের পুস্তক ১৮২৯ সালে প্রকাশিত হয়। অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করিয়া ব্রিগ্স সাহেব "তওয়ারিখ-ই ফেরিশ্‌তা"র ১২শ অধ্যায় পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু ইলিয়ট সাহেব বলেন ফেরিশ্‌তার লিখিত সাধুগণের বিবরণ ইতিহাসের হিসাবেও একেবারে মূল্যহীন নহে।

মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লা।

পালিভাষা।

(কাশী বঙ্গ-সাহিত্যসমাজান্তর্গত সুহৃৎসমিতির সাধারণ অধিবেশনে পঠিত)

প্রাচীন ও মৌলিক বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি যে ভাষায় লিখিত, তাহাই পালিভাষা নামে অভিহিত। কথিত আছে, ভগবান্ শাক্যসিংহ বোধিসত্ত্ব আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া, যখন নির্ব্বাণ উপদেশে উদ্‌যুক্ত হ'ন, তৎকালে মগধ কোশলাদি প্রদেশে কথোপকথন প্রসঙ্গে যে ভাষা ব্যবহৃত হইত, লোকশিক্ষার সুগমতা সম্পাদন মানসে, সেই প্রচলিত ভাষাতেই নবধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া ইহার যথোচিত গৌরববৃদ্ধি করেন এবং এই-রূপে একটি অচিরবিনাশী প্রাদেশিক ভাষাকে (Provincial dialect) অবিনাশী প্রাচীন ভাষায় (Classical language) পরিণত করেন। অধিক কি, আজ যে ধর্ম্মমহামহা-রুহ এসিয়াখণ্ডের এক তৃতীয়াংশ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহার প্রথম বীজ এই ভাষার সাহায্যেই উপ্ত হয়।

পণ্ডিতগণ সংস্কৃতভাষানুকারিণী সপ্তদশবিধ প্রাকৃত-ভাষার অন্যতম শ্রবস্তী ভাষা বলিয়া ইহার নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অলঙ্কার শাস্ত্রাদিতে সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতের উদাহরণ পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু সংস্কৃত নাটকাদিতে ব্যবহৃত প্রাকৃতের সহিত পালির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। স্থল বিশেষে ইহার উৎকর্ষও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বহু সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর প্রাপ্ত না হইয়াই পালিভাষায় ব্যবহৃত হয়; যথা ইন্দ্রিয়, সারথি, পণ্ডিত, বাল, দারু, কল্যাণ, পাপ, সুখ ইত্যাদি। এ অধিকার আধুনিক অনেক কথিতভাষারও (Vernacular) আছে সত্য, কিন্তু সংস্কৃতের ও প্রাকৃতের সহিত পালিভাষার রূপ-গত যে সামান্য প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয়, তাহাও অতি সামান্য ও সহজ বোধ্য; যথা,—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	পালি
স্থবির	ঠ্ঠবির	থের
কৃত্বা	করিয়	কত্বা
সার্থ	সথ	সথ ইত্যাদি

বস্তুতঃ ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, পালিভাষার জননী দেববাণী ব্যতীত অপর কেহই নহেন। আধুনিক হিন্দী প্রভৃতি ভাষার ন্যায় উচ্চারণবৈষম্যহেতু কতকগুলি শব্দের বানানাদিও ঈষদ্ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা অধোনিবেশিত তালিকার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই সম্যক্ উপলব্ধ হইবে:—

সংস্কৃত	পালি	সংস্কৃত	পালি
ধর্ম্ম	ধম্ম	কর্ম্ম	কম্ম
বর্ণ	বণ্ণ	দর্ব্বী	দব্বী
পুত্র	পুত্ত	মিত্র	মিত্ত
আত্মা	অত্তা	অদ্য	অজ্জ
রাষ্ট্র	রাট্‌ঠ	ওষ্ঠ	ওট্‌ঠ
বৃষ্টি	বুট্টি	অশ্ব	অস্‌স
শশ	সস	ব্যাঘ্র	ব্যাক্‌খো
কল্প	কপ্‌প	ইত্যাদি।	

সংখ্যা ও পূরণবাচক শব্দগুলির সহিত তত্তৎ প্রতিপাদক আধুনিক শব্দগুলির সহিত অত্যন্ত বিস্ময়জনক সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়; যথা,—

সংস্কৃত	পালি	হিন্দী বা বাঙ্গলা
ষষ্ঠ	ছট্‌ঠো	ছট্
ত্রয়োদশ	তের	তেরহ, তের
পঞ্চদশ	পন্নর	পন্নর, পনর
অষ্টাদশ	অট্‌ঠার	অট্‌ঠারহ, আঠার
ত্রয়োবিংশতি	তেবিস	তেইস
ষড়্‌বিংশতি	ছব্বিশ	ছব্বিস, ছাব্বিস ইত্যাদি

সংস্কৃত তক্ষক শব্দ পালিভাষায় 'তচ্ছক' শব্দে রূপান্তরিত। এস্থলে হিন্দীভাষীদিগের ক্ষকার স্থানে 'চ্ছ'কারের ন্যায়

উচ্চারণ ও ভিক্ষু প্রভৃতি শব্দের বঙ্গীয়দিগের ন্যায় 'কৃখ'এর ন্যায় উচ্চারণ,—যুগপৎ উভয়েরই উদাহরণ পাওয়া যায়। যাঁহারা বঙ্গীয়দিগের এতাদৃশ উচ্চারণ শ্রবণে নাসিকা আকুঞ্চিত করেন, তাঁহারা যেন সংস্কৃত 'ক্ষ' বিশিষ্ট শব্দের প্রাকৃত বানানের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন। প্রসঙ্গতঃ যাঁহারা সংস্কৃতভাষার মহারাষ্ট্রীয় উচ্চারণের একান্ত পক্ষপাতী, তাঁহারা দাক্ষিণাত্যদিগের 'জ্ঞ'কারের উচ্চারণ কিরূপে সমর্থন করেন ? জ্ঞান শব্দের 'দ্নানে'র ন্যায় উচ্চারণ প্রাকৃত প্রভৃতি কোন ভাষার দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস নাই। সংস্কৃত কৃষ্ণশব্দের পালি রূপান্তর 'কনহ'; অতএব হিন্দী 'কহ্নাই' ও বাঙ্গলা 'কানাই' সাক্ষাৎ পালি হইতেই নিষ্পন্ন, এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে।

কতকগুলি পালি শব্দের সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধ কিছু দূর বলিয়া আপাত প্রতীয়মান হইলেও, সংস্কৃত হইতে তাহারা একেবারে ভিন্ন নহে, যথা,—

পালি	সংস্কৃত
সম্মা	সম্যক্
ভীয্য	ভূয়ঃ
হুরং	অমুত্র ইত্যাদি

পালিতে প্রাকৃতের ন্যায় ক্রিয়ামাত্রই প্রায় পরস্মৈপদে প্রযুজ্য, আত্মনেপদের নামগন্ধ বড় একটা নাই। ইহার দ্বারা ভাষার অধিকতর সরলতা সম্পাদিত হইয়াছে। দুই একটি ক্ষুদ্র বাক্যে ইহার সংস্কৃতের সহিত সান্নিধ্য সম্বন্ধ ও সহজ বোধ্যত্ব অনায়াসেই উপলব্ধ হইবে।

(১) পালি ধীরো বালে অবেক্খতি
সংস্কৃত ধীরঃ বালান্ অবেক্ষতে
বাঙ্গলা পণ্ডিত শিশু (তুল্যমূর্খ)দিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

(২) পাঃ অপ্‌পমাদেন মঘবা দেবানাং সেট্‌ঠতাং গতো
সং অপ্রমাদেন মঘবা দেবানাং শ্রেষ্ঠতাং গতঃ
বাং অমূঢ়তাবশতঃ ইন্দ্র দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন।

(৩) পাং অত্তানাং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে।
সং আত্মানং উপমাং কৃত্বা ন হন্যাৎ ন ঘাতয়েৎ।
বাং আপনার সহিত তুলনা করিয়া (কাহাকেও) হনন বা আঘাত করিবে না।

কোন কোন পালি পণ্ডিত পালিভাষাকে সংস্কৃত হইতেও *পুরাতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও, এবং মাগধী প্রাকৃত হইতে* ইহার পৃথকত্ব প্রতিপাদন করিলেও সংস্কৃতের সহিত ইহার প্রভেদ পর্য্যালোচনা করিলে পালিকে সংস্কৃতের দুহিতা বলিয়াই একান্ত প্রতীতি জন্মে। যেহেতু পণ্ডিত মণ্ডলীদ্বারা ব্যাকরণাদি পরিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষাই প্রযুক্ত হইত—ইহা নাটকাদি পাঠে সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। তদতিরিক্ত প্রাকৃতজন বা অপণ্ডিতগণ যে অবিশুদ্ধ বা ঈষৎ বিকৃত ভাষায় কথোপকথন করিতেন, তাহারই সাধারণ নাম প্রাকৃত। এবং মগধাদি প্রদেশে মহারাজ বিম্বিসার প্রভৃতির সময়ে যে প্রাকৃতভাষার প্রচলন ছিল, তাহারই পরবর্ত্তী নাম 'পালি'তে পরিণত হইয়া থাকিবে। কাহারও কাহারও মতে এই 'পালি' শব্দটি পল্লী শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। তাঁহাদিগের মতে, সংস্কৃত ভাষার কেন্দ্রস্থল নগরাদিতে বিশেষতঃ রাজসভা প্রভৃতিতেই বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথনের বহুল প্রচার পরিদৃষ্ট হইত এবং পল্লী গ্রামাদিতে পণ্ডিতগণের একেবারে অভাব না থাকিলেও কৃষক ও শ্রমজীবিগণ প্রাচীন মগধ ও কোশলে বা আধুনিক বিহার * ও (অবধ বা) অযোধ্যাপ্রদেশে পালি ভাষাতেই কথোপকথন করিত বলিয়া অনুমিত হয়। কাহারও মতে মগধের প্রাচীন নাম 'পলাশ' শব্দ হইতে বা তাহার পরবর্ত্তী রাজধানী পাটলীপুত্র এবং তাহার গ্রীক প্রতিশব্দে 'পালি-বথ্রা' হইতে পালিশব্দটি নিষ্পন্ন। ইহার দ্বারা ইহাই প্রতীত হয়, যে ভগবান বুদ্ধ তদ্দেশ প্রচলিত ভাষার সাহায্যেই মগধরাজ অজাতশত্রু ও কোশলাধিপতি প্রসেনজিৎ হইতে আরম্ভ করিয়া পাংশুলপাদ হলবাহী পর্য্যন্ত স্বীয় নবীন মতে দীক্ষিত করিয়া বহুদেশব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম ভিত্তি সংস্থাপন করেন। এবং প্রচারকার্য্যে উহার যথেষ্ট কার্য্যকারিতা অবলোকন করিয়া, পরবর্ত্তী প্রচারক ও ভিক্ষুবর্গ কর্ত্তৃক পরম্পরাগত সংস্কৃত ভাষার পরিহার পূর্ব্বক উক্ত ভাষাতেই উপদেশাদি দান ও

* মগধের নাম পরবর্ত্তী সময়ে বিহারে পরিণতির কারণও বৌদ্ধধর্ম্ম। মগধ বোধিসত্ত্বের সর্ব্ব প্রথম ও বিশেষ শ্রদ্ধাবান শিষ্য। অতএব বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের সংখ্যাধিক্য বশতঃ তাঁহাদিগের আবাসার্থ অনেকগুলি মঠ স্থাপিত হইয়া, ক্রমে সমগ্র প্রদেশ বৌদ্ধমঠ বা বিহারে সমাচ্ছন্ন হইয়া 'বিহার' এই নূতন আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এখনও অনেক বৌদ্ধ পরিব্রাজক ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম ভিত্তি ও স্থানে স্থানে শেষ ভগ্নাবশেষ পরিদর্শন আশায় উক্ত প্রদেশে আগমন করিয়া থাকেন।

গ্রন্থাদি প্রণয়নে; মহারাজ অশোকবর্দ্ধনের ভারতব্যাপী শিলালিপি, ধর্ম্মনিদেশবাক্য ও তৃতীয় বৌদ্ধসংঘে; তদীয় পুত্র মহেন্দ্রের সিংহলে বৌদ্ধমত প্রচারে; কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের বৌদ্ধধর্ম্মে সহৃদয় আনুরক্তিতে * শকরাজ কনিষ্কের মধ্য এসিয়াখণ্ড পর্য্যন্ত বৌদ্ধমত প্রচারে ও চতুর্থ বৌদ্ধসংঘ সংগ্রহে; এবং অবশেষে নালন্দ মহাবিদ্যালয়ে নানা দেশীয় ছাত্রমণ্ডলীর শিক্ষালাভে ও কৃতবিদ্যগণের ধর্ম্ম প্রচারে; পালিভাষার ক্রমে যথোচিত পরিপুষ্টি সংসাধিত হয়। এবং এই জন্যই অধুনা জগতের কোন অংশেই ইহা কথিত ভাষা রূপে প্রচলিত না থাকিলেও, হিন্দুমাত্রের নিকট সংস্কৃতভাষার যেরূপ আদর এবং প্রায় সকলেই যেমন অল্প বিস্তর ইহার আলোচনা করিতে যত্নবান হন, প্রতি বৌদ্ধের নিকট পালিভাষা সেইরূপ গৌরবের ও শ্রদ্ধার সামগ্রী; এবং ইহার নিদর্শন স্বরূপ সিংহলে, ব্রহ্মে, শ্যামে, চীনে, জাপানে বহুসংখ্যক প্রাচীন পালিধর্ম্মগ্রন্থ অদ্যাপি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং তাঁহারা অতি আগ্রহের সহিত উহার আলোচনা ও অনুশীলন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে সংস্কৃতের সহিত পালিভাষার সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ট, যে সংস্কৃতসেবী মাত্রেই অল্পায়াসে পালি গ্রথিত সন্দর্ভনিচয়ের প্রায় অর্দ্ধেকের অর্থবোধে সমর্থ হ'ন। অধিকন্তু ভাষাটি সম্পূর্ণ ভারতীয়; এবং অধিকাংশ পালিগ্রন্থ ভারতে ও সিংহলে রচিত, অতএব ফল পুষ্প পর্ব্বত প্রভৃতি আমাদিগের চিরপরিচিত পদার্থনিচয়ের, এমন কি, আর্য্য দেবতাগণের নামাদি পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থাদিতে সাদরে সুবিন্যস্ত রহিয়াছে। অতএব ইংলণ্ডীয়, ফরাশীয় বা জাপানীয় ভাষা অপেক্ষা ইহার অনুশীলন যে কত সহজসাধ্য তাহা পূর্ব্বোদাহৃত দৃষ্টান্তনিচয়েই উপলব্ধ হইয়া থাকিবে। সুতরাং পালিভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত না হইলেও এত নৈকট্যরূপে সংস্কৃতানুকারিণী, যে সংস্কৃতসেবীদিগের তাহা উপেক্ষার বিষয় না হইয়া বরং বিশেষরূপে অনুরাগের সামগ্রীই হওয়া উচিত। বিশেষতঃ যখন এই ভাষার সাহায্যেই নারায়ণের নবম অবতার বুদ্ধদেবের উন্নত উপদেশ ও উদার নৈতিকতত্ত্বসমূহের রসাস্বাদে সমর্থ হই (নচেৎ আমাদিগকে জন্মের মত বঞ্চিত থাকিতে হয়,) তখন তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সংস্কৃতানুরাগী মাত্রেরই পালিভাষানুশীলনে সমুচিত যত্নবান্ হওয়া একান্ত অভিলষিত। এই সামান্য পরিশ্রমের বিনিময়ে যখন দেখিবেন, পালিগ্রন্থরত্নাকর হইতে সংগৃহীত অমূল্য রত্নরাজী তাহার জ্ঞানভাণ্ডার আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে; তখন তাঁহার ঈষৎ যত্ন, সামান্য অধ্যবসায় এতাদৃশ ফলোপধায়ক, উপলব্ধি করিয়া, আপনাকে যথার্থ ধন্য ও বাস্তবিক ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে হইবে।

বারাণসী প্রবাসী
শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

* বাণভট্ট বিরচিত হর্ষচরিতের শেষ অধ্যায়ে হর্ষের ভদন্তের প্রতি সম্মান সন্দর্শন দ্রষ্টব্য।

স্বর্গীয় রমাকান্ত রায়।

খবরের কাগজে সকলেই পড়িয়াছেন, জাপান-প্রত্যাগত রমাকান্ত রায় আর ইহলোকে নাই। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে যে সঙ্কীর্ণ ব্যবধান আছে, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন। আজ তিনি আমাদিগের নিন্দার ও প্রশংসার অতীত হইয়াছেন। রমাকান্ত বাবুর জীবনী লিখিতে গেলে, মনে হয় লিখিব কি, তাঁহার সমস্ত জীবন ত সম্মুখেই পড়িয়াছিল; বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় তিনি অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছেন। নৈসর্গিক জগতে দেখিয়াছি, যে কুসুম প্রস্ফুটিত হইলে একদিন সমস্ত বনভূমি সুগন্ধে প্লাবিত হইয়া যাইত, তাহাই কি জানি কেন বিকাশোন্মুখ অবস্থায় ঝটিকাহত হইয়া পৃথিবীর ধূলা মাটীর সহিত মিশিয়া যায়। রমাকান্ত রায়ও জীবনের প্রভাতকালে বিকাশোন্মুখ অবস্থায় তাঁহার বিপুল কর্ম্মক্ষেত্র হইতে কি জানি কেন হঠাৎ চলিয়া গিয়াছেন। একদিন যাহার সুগন্ধে সমস্ত বনস্থলী আমোদিত হইয়া উঠিত, সে ফুল ফুটিয়া না উঠিতেই অকালে কেন ঝরিয়া গেল তাহা বিধাতাই বলিতে পারেন। দেশের এই দুর্দ্দিনে রমাকান্তের ন্যায় মাতৃ-সেবককে ভগবান হঠাৎ কেন ডাকিয়া লইয়া গেলেন, তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন কে করিবে? মঙ্গলময়ের এই ইচ্ছার মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে যে কি রহস্য লুক্কায়িত আছে, তাহা বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, যে ফুল দেবপূজার জন্য ফুটিয়া উঠে তাহা পৃথিবীর পাপ মলিন বক্ষে অধিক দিন

শোভা বিতরণ করে না—যখনই বিধাতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় হয়, তখনই প্রভাত-বায়ু লতাপল্লবের স্নেহালিঙ্গন হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া লইয়া যায়। রমাকান্ত ভগবানের সেবক, দু'দিনের জন্য এই পৃথিবীতে তাঁহার মহিমা প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন; দেবদূত আসিয়া ডাকিবা মাত্র আমাদিগের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া আরব্ধ সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের পূর্ণ অভিনয় আমরা আর দেখিতে পাইলাম না, প্রথম অঙ্কেই যবনিকা পড়িয়া গেল!

কিন্তু তাঁহার জীবনের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে না পাইলেও আমরা যতটুকু দেখিয়াছিলাম, আজ তাহারই আলোচনা করিতে বসিয়াছি। তাঁহার বাল্যজীবনী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ "সঞ্জীবনী"তে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তদপেক্ষা অধিক কিছু আর সংগ্রহ করা যায় নাই। যৌবনে কর্ম্মক্ষেত্রেই তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হয় এবং এই কর্ম্মক্ষেত্রেই তাঁহাকে আমরা শেষ বিদায় দিয়া আসিয়াছি। সুতরাং কর্ম্মের ভিতর দিয়া আমরা তাঁহাকে যতটুকু চিনিতে পারিয়াছিলাম তাহাই বলিব।

৭ই আগষ্ট টাউন হলে যে বিরাট সভার অধিবেশন হয়, তাহা বাঙ্গালাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। বাঙ্গালী যে এরূপ বিপুল জনতাকে সংযত এবং সংহত করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে, এ বিশ্বাস পূর্ব্বে অনেকেরই ছিল না। আমাদিগেরও যে organisation করিবার ক্ষমতা আছে, আমরা এই দিন তাহার প্রথম আভাস পাইলাম এবং এই দিনই এই শালপ্রাংশু মহাভুজের সহিত প্রথম পরিচয় লাভ হইল। রমাকান্ত রায়ের বীরত্বব্যঞ্জক দীর্ঘবপু দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে পাঞ্জাবী বলিয়া মনে করিতেন; আমরাও সেদিন তাঁহাকে বাঙ্গালী মনে করিতে পারি নাই। শেষে অনুসন্ধানে জানিলাম তিনিই জাপানপ্রত্যাগত শ্রীযুত রমাকান্ত রায়। সমাজে এমন দু'একজন লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহাদিগকে দেখিলেই মনে হয় যে, তাঁহারা নেতৃত্ব করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং মানুষ দলবদ্ধ হইলেই তাঁহারা সমাজে অন্যের অনুমতি বা অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়া দলের নেতৃত্বগ্রহণ করেন; সে জন্য সমাজে কোনও রূপ বিক্ষোভ বা মতান্তর উপস্থিত হয় না—বরং তাহার বিপরীত হইলেই দলের মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হয়। ইহার কারণ এই যে, যোগ্য ব্যক্তি যোগ্য আসন গ্রহণ করিলে সমাজ ঠিক কলের ন্যায়ই চলিতে থাকে। রমাকান্ত রায়কে সেই যে ৭ই আগষ্টের বিরাট বাহিনীর নেতৃত্ব করিতে দেখিয়াছি, তাহার পরে কলিকাতায় যত মিছিল বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে রমাকান্তের উন্নত মস্তক সকলের অগ্রে দেখা গিয়াছে। আজিও মৌলভী লিয়াকৎ হোসেনের নেতৃত্বে প্রত্যহ আমাদিগের যে প্রোশেসন বাহির হইতেছে এবং রাজপথে মাতৃনাম গান করিয়া জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে, রমাকান্ত রায় জীবিত থাকিতে তাহার নেতৃত্ব আর কাহারও জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল না—তিনি সহজেই এ পদ পাইয়াছিলেন। ইহার জন্য সভা সমিতি করিতে হয় নাই অথবা নির্ব্বাচনের হাঙ্গামা পোহাইতে হয় নাই। এই সহজ নেতৃত্ব রমাকান্ত রায়ের চরিত্রে এক বিশেষ গুণ দেখিয়াছিলাম। একদিকে যেমন নেতা হইয়া তিনি যুবকদিগকে চালনা করিতেন, আবার অন্যদিকে প্রেমের দ্বারা সকলের হৃদয় এমনই জয় করিতেন যে তাঁহার বিশ্বপ্রেমের বিরাট ছায়ায় শান্তিলাভ করেন নাই যুবকদিগের মধ্যে এমন লোক প্রায়ই দেখি না। নেতৃত্বের সহিত ভ্রাতৃত্বের এই অপূর্ব্ব মিলনে তাঁহার চরিত্র এমন মধুর হইয়াছিল যে, তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যাইত না। এই গুণ ছিল বলিয়া সকলে তাঁহাকে নেতা বলিয়া মানিত এবং বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাঁহার চরিত্রে বিশ্বজনীন প্রেমের এমন এক বিকাশ দেখিয়াছিলাম যে, তাঁহার নিকট ধনী দরিদ্র ভদ্র অভদ্র বলিয়া কোনও ইতর বিশেষ ছিল না। সকলকেই তিনি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং সকলকেই তিনি শ্রদ্ধার সহিত ভাল বাসিতেন।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমাদিগের কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মধ্যে অনেক সময় আলাপ এবং আলোচনা হইত; এই সকল আলোচনায় বক্তৃতার অংশ আমরা লইতাম আর তিনি অনেক সময় শ্রোতা হইয়াই থাকিতেন; শেষে কাজের সময় দেখিতাম ষোল আনা অংশ তিনিই গ্রহণ করিয়াছেন আর আমরা তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছি। দেশের কথা বলিবার সময় তাঁহার

চোখে মুখে এমন বিদ্যুদ্দীপ্তি দেখিতে পাইতাম যে, তাহাতে আমাদের মনে দ্বিগুণ উৎসাহ হইত এবং প্রাণে অপূর্ব্ব বল পাইতাম। সে সময় রমাকান্তের সে সৌম্যমূর্ত্তি যেন কোথায় চলিয়া যাইত এবং সেই বিশাল শরীরের প্রতি লোমকূপ দিয়া বিদ্যুৎস্ফুরণ হইত।

অকালে এমন কর্ম্মী পুরুষকে হারান দেশের পক্ষে নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা। প্রত্যূষে উঠিয়াই তিনি আমাদিগের কর্ম্মকেন্দ্র আন্টি সারকুলার সোসাইটিতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং সমস্ত দিন কর্ম্মের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। তাঁহার বাসস্থান সোসাইটী হইতে অনেক দূরে ছিল; কিন্তু এতদূর হইতেও তিনি এত সকালে আসিতেন যে, কেহ কেহ তখন পর্য্যন্ত হয়ত শয্যাত্যাগ করে নাই। প্রত্যূষে তাঁহার সহিত কার্য্যে বাহির হইয়াছি, অক্লান্তভাবে সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘুরিতেছি—দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় এবং পরিশ্রমে সঙ্গীরা অবসন্ন হইয়া হয়ত বলিতেছে—"রমাকান্ত বাবু, ২টা বাজিয়া গেল, বাড়ী চলুন. অত্যন্ত বেলা হইয়াছে"; রমাকান্ত বাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বেলা ত হইয়াছে, কিন্তু যে জন্য আসিয়াছি সে কাজ ত এখনও হয় নাই।" অমনি শ্রান্তি চলিয়া গেল; কর্ত্তব্যের নিকট সুখ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল। এমনি করিয়া কত দিন কত রাত্রি চলিয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন শরীর অবসন্ন হইয়া আসিত, আমরা কেহ রমাকান্তের ক্রোড়ে, কেহ বা হাতে, কেহ বা শরীরের উপর মাথা রাখিয়া বিশ্রাম করিতাম; রমাকান্ত বাবু আমাদিগের মাথার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে ধীরে ধীরে গাহিতেন, "জীবন উৎসর্গ করি মায়ের সেবায়"; অমনি আমাদিগের প্রাণে তড়িৎসঞ্চার হইত। রমাকান্ত বাবু সুগায়ক ছিলেন না—তাঁহার এই সকল সঙ্গীতে তালমানের কোন সামঞ্জস্য থাকিত না, কিন্তু তাহা এমন সময়োপযোগী হইত এবং ইহাতে এমন উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা থাকিত যে, তাহা আমাদের হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া এক নূতন উন্মাদনা আনিয়া দিত। সে আবেগপূর্ণ সঙ্গীত আজ থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার সুরলহরী আজিও আমাদের কাণে ঝঙ্কার দিতেছে এবং তাহার প্রতিধ্বনি আমাদিগের বক্ষ-প্রকোষ্ঠে আঘাত করিতেছে।

যে দিন এন্টি সারকুলার সোসাইটীর কাপড়ের মোট মাথায় বহিয়া আনিবার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সে দিন তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল মুখে এক নবদীপ্তি দেখিয়াছিলাম; তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমার স্মৃতিপট হইতে কখনও মুছিয়া যাইবে না; কারণ সে কথা শিক্ষিত লোকের মুখে সেই প্রথম শুনিয়াছিলাম। আমি সেই কথাগুলি লিখিতেছি। রমাকান্ত বাবু বলিয়াছিলেন—"আমি যখনই শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইতাম তখনই যাত্রীদিগের প্রতি কুলিদিগের অসম্ভব অত্যাচার দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইতাম এবং তাহার মধ্যে প্রায়ই দেখিতাম যে বাবুরা ছোট একটী ব্যাগ বা ছোট একটী পুঁটুলি যাহা একজন ভদ্রলোক অনায়াসে হাতে করিয়া লইয়া যাইতে পারেন, তাহাই কুলির মাথায় দিয়া লইয়া যাইতেছেন এবং দু' আনার জায়গায় চারি আনা আক্কেল সেলামী দিয়া ও বিস্তর কটুকাটব্য শুনিয়াও বাবুগিরি বজায় রাখিতেছেন। সেই দিন হইতে আমার মনে হইত কেমন করিয়া মিথ্যা সম্মান লাভের এই ভ্রান্ত ধারণা লোকের মন হইতে দূর করিয়া দিব। শেষে জাপানে গেলাম, কিন্তু শিয়ালদহের কুলির অত্যাচারের কথা ভুলিলাম না। জাপানে যাইয়া দেখিলাম সেখানে সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ভদ্রলোক শারীরিক পরিশ্রম করাকে লজ্জার বিষয় মনে করেন না; কিন্তু আমাদের দেশের লোকের মধ্যে এমনি ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায় যে, যে লোক দশ টাকা মাহিনার চাকুরীর জন্য যাহার-তাহার পাদুকা স্পর্শ করিতে প্রস্তুত, সেই বাজার হইতে ডাঁটা গাছটী হাতে করিয়া বাড়ী ফিরিতে পারে না, কারণ সে যে ভদ্রলোক—এ কাজ করিলে যে তাহার সম্মান নষ্ট হইবে। কেমন করিয়া লোকের মন হইতে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দিব, কেমন করিয়া পাশ্চাত্য জগতের এবং নবজাগ্রত জাপানের এই dignity of labourএর (শ্রমগৌরবানুভূতির) উচ্চ আদর্শ আমাদিগের দেশের লোকের নিকট ধরিব, এই বিষয় আমি সর্ব্বদা চিন্তা করিতাম। এক এক সময় মনে হইত, শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইয়া কোট প্যাণ্ট্যালুন পরিয়া ভদ্রবেশেই কুলির কাজ

করিব, দেখি যদি তাহাতে বাবুদিগের ভ্রম কাটিয়া যায়। আজ আমার সেই আশা ফলবতী হইয়াছে; ভদ্রবেশে কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া কলিকাতার পথে পথে ফেরী করিয়া বেড়াইব এবং দেশের লোকের নিকট এক নূতন আদর্শ দেখাইব।" সেই দিনই সোসাইটীর সভ্যেরা কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া প্রথম মহানগরীর বিস্ময়বিমুগ্ধ জনমণ্ডলীর নিকট মুটের কাজ করিতে বাহির হইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী সম্ভ্রান্তবংশীয় ভদ্রসন্তানেরা যে দিন কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া লইলেন, সেই দিন বুঝিলাম যে, আমরা শুধু কাপড়ের মোটই কাঁধে লইলাম না—আমাদের দেশের মোটও আমরা মাথায় করিয়া লইলাম। এখন সোসাইটীতে দেখিতে পাই, কত উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া অম্লানবদনে গৃহে যাইতেছেন। আমরা আত্মসম্মানের প্রকৃত মর্য্যাদা এবার বুঝিতে পারিয়াছি ইহা কম লাভ নহে।

এমন কত দিন কত কার্য্যের মধ্যে তাঁহার চরিত্রের বিকাশ আমরা দেখিতে পাইয়াছি। সব কথা মনে নাই এবং লিখিতে গেলেও প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। আর দু' একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

৩০শে আশ্বিন রাখী-সংক্রান্তির দিন বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। মহানগরীতে এই দিনের গাম্ভীর্য্য এবং পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য যাঁহারা প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, রমাকান্ত বাবু তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। রাখী-সংক্রান্তির এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে আমাদের আহার নিদ্রা এক প্রকার ছিল না বলিলেই হয়। আমার বেশ মনে আছে, এই উপলক্ষে কোন স্থানে যাইয়া সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া রাত্রে আমরা একটী ফুটী ভাগ করিয়া খাইয়াছিলাম। তাঁহার সহিত ভ্রমণে সুখ ছিল, উপবাসে সুখ ছিল, অনশনেও সুখ ছিল, কারণ তিনি দুঃখ দুর্দ্দিনে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিতেন। এমন সরলহৃদয় ঈশ্বরবিশ্বাসী সঙ্গী আর পাইব না।

একদিন কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারে উপাসনান্তে প্রাণস্পর্শী স্বরে সঙ্গীত হইতেছিল:—

"তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবার দাও শকতি,
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ সহিবার দাও ভকতি।"

বিশ্বাসী ভক্তের কণ্ঠে যেদিন এই সঙ্গীত শুনিয়াছিলাম, সে দিন প্রথমেই ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি রমাকান্ত রায়ের ছবি আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। ঠিক্; পৃথিবীতে যাঁহারা বিশ্ববিধাতার বিজয়-নিশান একবার আলিঙ্গন করিয়াছেন, যাঁহারা শোকতাপিত জনগণের হৃদয়মন্দিরে তাঁহার পতাকা হস্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে দুঃখদৈন্য বহিবার শক্তি তিনিই দিয়াছেন—তিনিই তাঁহাদিগের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উপাসনার সঙ্গীতে যে বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল, সর্ব্ব প্রথমে রমাকান্ত বাবুর জীবনে তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। ভগবানের সেবক না হইলে কেহ কি এমন করিয়া "হাস্যমুখে অদৃষ্টকে পরিহাস করিতে পারে?"

তাঁহার প্রতিজ্ঞার মধ্যে এক ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল, অথচ তাহাতে কোনও আড়ম্বর ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথমাবস্থায় যখন রঙ্গপুরে ছাত্রপীড়ন আরম্ভ হয়, তখন রমাকান্ত বাবু ও আমি সেখানে গিয়াছিলাম। ফিরিবার সময় শীতের খুবই প্রকোপ; প্রাতঃকালে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে এবং প্রবল বাতাসের জন্য কন্‌কনে শীত পড়িয়াছে। আমরা যখন পদ্মার উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিলাম, তখন শীত অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। আমরা কেহই চা পান করিতাম না; কিন্তু শীতের প্রকোপ বশতঃ রমাকান্ত বাবু বলিলেন "চা খাইয়া শরীরটা একটু গরম করা যাক।" সোরাবজীর খানসামা দু' পেয়ালা চা আনিয়া দিল; তখন নূতন নূতন আমাদের মনে ছিল না যে সোরাবজীর ভাণ্ডারে দেশী চিনি থাকে না। পেয়ালাটী হাতে লইয়া নাড়িয়া দেখিলাম বিলাতী চিনির দানা চক্ চক্ করিতেছে; রমাকান্ত বাবুর নিকট বলিলাম এ চিনি ত আমরা খাইতে পারি না; অনেক শ্বেতাঙ্গ আমাদিগের দিকে কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া রহিল; সোরাবজী এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমাদিগের নিকট কাশীপুরের চিনি এখন নাই, এবার আনাইয়া রাখিব।" রমাকান্ত বাবু গম্ভীরভাবে খানসামার প্লেটে একটী আধুলি দিয়া পানীয়টুকু পদ্মার গর্ভে নিক্ষেপ করিলেন; ষ্টীমারে যাত্রীদের মধ্যে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল;

সাহেব যাত্রীদের মুখ চোক লাল হইয়া গেল—আমরা নিঃশব্দে আমাদের আসনগ্রহণ করিলাম। এই ঘটনা লইয়া আর কোনও উচ্চবাচ্য করা হইল না।

অসময়ে আহার, অনিদ্রা এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে রমাকান্ত বাবুর শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এবার তাঁহার অসুখের কিছু পূর্ব্বে রাণীগঞ্জে তিনি এক স্বদেশী সভার আয়োজন করেন; সেখানে তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া আমাদিগের সোসাইটীর এক শাখা স্থাপন করেন; যাহাতে রাণীগঞ্জের সভাতে আমরা উপস্থিত হই, এজন্য তিনি নিজে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; হায়! তখন জানিতাম না যে রাণীগঞ্জেই তাঁহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ হইবে।

সেখানে যে কি আনন্দে আমাদিগের সময় কাটিয়াছিল, তাহা মনে হইলে চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নানারূপ কথাবার্ত্তা হইল, শেষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়াই পারিবারিক উপাসনা আরম্ভ হইল, উপাসনান্তে রমাকান্ত বাবু একখানি ধর্ম্মপুস্তক হইতে কিয়দংশ পাঠ করিলেন, ভগবানের নাম তাঁহার কণ্ঠে সেই শেষ শুনিয়াছিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই রাণীগঞ্জে তিনি এক নব জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন এবং রাণীগঞ্জ, কালিপাহাড়ী, সীতারামপুর প্রভৃতি অঞ্চলের খনি ব্যবসায়ীদিগকে লইয়া যাহাতে একটী কয়লা-সমিতি গঠন করিতে পারেন, তাহার অনেক আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন; রমাকান্ত বাবু জীবিত থাকিলে একার্য্য সমাধা হইয়া যাইত। আজ আর তিনি নাই, সুতরাং এই সমিতির কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

এবার বরিশাল কন্‌ফারেন্স হইতে ফিরিয়া আসিয়া কার্য্যব্যপদেশে আমাকে ময়ূরভঞ্জ যাইতে হয়। সেখানে থাকিতে সংবাদ পাইলাম, রমাকান্ত বাবু আর ইহলোকে নাই; তাঁহার মৃতদেহ পুষ্পমণ্ডিত করিয়া সোসাইটীর হলে সভ্যেরা বহিয়া আনিয়াছিলেন এবং সেখানে তাঁহার আত্মার মঙ্গলোদ্দেশে প্রার্থনা হইয়াছিল। কর্ম্মীর বেশে যে গৃহে রমাকান্ত প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যে সোসাইটীর জন্য মফঃস্বলে কার্য্য করিতেছিলেন, জীবনের অবসানে তাঁহার প্রাণহীন দেহ সেই গৃহেই চিরশান্তি লাভ করিল—কর্ম্মের জন্য যে গৃহ হইতে একদিন তিনি বাহির হইয়াছিলেন, আজ কর্ম্মাবসানে তিনি সেখানে সজ্ঞানে ফিরিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণহীন দেহ সেই পরিচিত প্রিয়স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং মৃতেরা যে ভাষায় কথা বলে, তিনি সেই ভাষায় আমাদিগকে জন্মভূমির সেবার জন্য আকুল কণ্ঠে শেষ আহ্বান করিয়া গিয়াছিলেন। মরিবার পূর্ব্বে তিনি আমাদিগকে শেষ কথা বলিয়া গিয়াছিলেন—"প্রতিহিংসা"।

বরিশালে পুলিশের লোমহর্ষণ অত্যাচার-কাহিনী শুনিয়া তিনি অসুস্থাবস্থায় শয্যাগ্রহণ করেন; সে শয্যা হইতে আর উঠিতে পারেন নাই। প্রবল বিকারের সময় শুধু বরিশালের অত্যাচারের কথাই বলিতেন এবং "প্রতিহিংসা" "প্রতিহিংসা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। সোসাইটীর সভ্যদিগকে পুলিশ লগুড়াঘাতে জর্জ্জরিত করিয়াছে, এ নিদারুণ অপমান তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। মৃত্যুকালে সোসাইটীর সভ্যদিগকে ডাক্তারেরা রোগীর পার্শ্বে যাইতে দিতেন না; কারণ তাহাদিগকে দেখিলে তিনি আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেন এবং বিকার আরও প্রবলাকার ধারণ করিত। এইরূপ বিকারের মধ্যে হঠাৎ একদিন প্রত্যূষে তাঁহার প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

আজ আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, ওই উর্দ্ধলোকে, যেখানে রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রত্নসিংহাসনে বসিয়া আছেন, মেঘমণ্ডলের মধ্যে তাঁহাদিগের পদতলে দণ্ডায়মান হইয়া এই কর্ম্মবীর বাঙ্গলাদেশের যুবকগণকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।" কে বলে রমাকান্ত রায় মরিয়া গিয়াছেন? তুমি আমি মরিতে পারি, তাঁহার ন্যায় কর্ম্মবীর কখনও মরেন না।

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন-যৌবনং।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি॥

যাহা ক্ষণবিধ্বংসী, রমাকান্তের সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ অবশ্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু যাহা অমর, যাহা অবিনশ্বর, সেই কীর্ত্তি তাঁহাকে চিরজাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে।

আজ তাঁহার নিকট হইতে আমরা চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না যে পিপাসিত হইয়া তিনি এ বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া

গিয়াছেন। বিকারের ঘোরে চীৎকার করিয়া যখন তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইত, তখন শুশ্রূষাকারীরা তাঁহার শুষ্ক কণ্ঠে জল দিতেন, কিন্তু পিপাসার শান্তি হইত না। সে ত জলের পিপাসা নয় যে শীতল বারিদানে তাঁহার পিপাসার নিবৃত্তি হইবে। সে আকণ্ঠ পিপাসা তাঁহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে উঠিয়াছিল এবং সে জ্বালা-ময়ী পিপাসার নিবৃত্তির জন্য তিনি আকুলকণ্ঠে আমাদিগের নিকট চাহিয়াছিলেন—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতি-হিংসা। আমরা তাঁহার সে দারুণ পিপাসা আজিও মিটাইতে পারি নাই, তাই সর্ব্বদা সেই হতাশকণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনিতেছি এবং কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না যে, রমাকান্ত রায় তাঁহার শেষ নিশ্বাসবিন্দু গ্রহণের সময় আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন "প্রতিহিংসা"।

শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসু,
অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটী।

জ্যোতিনির্ব্বাণ।

(উপক্রমণিকা)

ঘনান্ধকারাচ্ছাদিত নির্জ্জন বনভূমির নিস্তব্ধতাকে কম্পিত মথিত করিয়া গম্ভীর স্বরে শব্দ উঠিল—"আমার মনস্কামনা কি পূর্ণ হইবে না ?"

সেই শব্দ বায়ুস্তরে সম্পূর্ণরূপে বিলীন না হইতে হইতেই অতি কোমলকণ্ঠে অথচ সুদৃঢ় স্বরে প্রতিধ্বনি উঠিল, "আত্মনির্ভর কর—নিশ্চয়ই আশা সিদ্ধি হইবে।"

প্রথমে যে কথা কহিয়াছিল—সে বুঝিতে পারিল না—এ প্রতিধ্বনি কোথায় হইতে আসিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্বেদজলে পরিষিক্ত, প্রতিভামণ্ডিত উজ্জ্বল বদনমণ্ডল শ্রম-ক্লান্তিতে মলিন। সে যেন পথভ্রান্ত।

গভীর বনের নিভৃত প্রদেশে পথিক পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। আকৃতিতে, পরিচ্ছদে তাঁহাকে বীর পুরুষ বলিয়াই বোধ হয়। কটিতটনিবদ্ধ সুতীক্ষ্ণ অসি, হস্তাগ্রে ধৃত শাণিত বর্শা—কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদামকে পরিবেষ্টন করিয়া সুরচিত শিরস্ত্রাণ—স্পষ্টই বলিয়া দিতেছিল—সেই পথহারা পান্থ দুর্জ্জয়শক্তিসম্পন্ন।

ঊর্দ্ধে আকাশে ভীমান্ধকার। শ্যামল পত্রখচিত বনস্পতির সর্ব্বোচ্চ শিখর হইতে ভূমিতল স্পর্শ করিয়া প্রলয়ান্ধকার। আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে; কিন্তু বোধ হয় আর ছইটী সেইরূপ আকাশ জুড়িয়া তারকা ফুটিলে সে অন্ধকারের বিকট ভাব অপসারিত করিতে পারিত না।

এই যোদ্ধৃবেশী, বাঙ্গালী যুবক, ক্রমশঃ সহিষ্ণুতা-বিহীন হইয়া উঠিতেছিলেন। আর প্রতিধ্বনি আসে না আর সে অজানিত কণ্ঠে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর আসে না। যুবক সেই নির্জ্জন অবস্থা অসহ্য বিবেচনা করিয়া বলিলেন, "আমি পথ হারাইয়াছি। কে নিকটে আছ আমায় পথ দেখাইয়া দাও। আমায় এই অন্ধকারময় বনের বাহির করিয়া দাও।"

কথা শেষ না হইতেই কে যেন ক্ষিপ্রগতিতে মন্ত্রবলে আসিয়া সেই বীরবেশীর স্কন্ধ স্পর্শ করিল। তিনি চমকিত হইয়া প্রশ্ন করিলেনঃ—

"কে তুমি? স্পর্শে বুঝিয়াছি তুমি স্ত্রীলোক। তুমিই কি আমার প্রশ্নের উত্তরের প্রতিধ্বনি করিয়াছিলে?"

সেই অপরিচিতা রমণীমূর্ত্তি কোন উত্তর দিল না। পথিক তাহার নির্ব্বাক অবস্থা দেখিয়া যেন একটু রুষ্ট হইলেন। তিনি বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"কে তুমি এ অন্ধকারে আমায় ছলনা করিতেছ? আমি পথ হারাইয়াছি। আমায় পথ দেখাইয়া দাও।"

এবার সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব রমণী বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে বলিল—"আমার সঙ্গে আসুন—পথ দেখাইয়া দিব।"

সে সুরে, সে শব্দে—সে ভাষায়—মেঘমল্লারের গম্ভীর প্রতিধ্বনি। তাহাতে যেন অতিরিক্ত পরিমাণে গাম্ভীর্য্যের সমাবেশ ছিল। ভৈরবীর কোমল ঝঙ্কার যে ছিল না তা বলিতে পারি না।

যোদ্ধৃবেশী বলিলেন—"কে তুমি? পরিচয় দিতে আপত্তি আছে?"

রমণী উত্তর করিল—"আমার সঙ্গে আসুন। পরিচয়ে এখন প্রয়োজন নাই। যদি সাহসে নির্ভর করিয়া আমার সঙ্গে আসিতে পারেন, বনের বাহিরে যাইতে পাইবেন।"

এ তিরস্কারমিশ্রিত কথায় সেই যোদ্ধৃবেশী যেন একটু

লজ্জিত হইলেন। তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"চল—কোথায় লইয়া যাইবে।"

দুইজনে সেই অন্ধকাররাশি মথিত করিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। রমণী অগ্রবর্ত্তিনী—পথ-প্রদর্শিকা। যুবক পশ্চাৎবর্ত্তী। পথিমধ্যস্থ লতাগুল্মাদি তাঁহাদের পথরোধ করিতেছে না, বৃক্ষশাখায় তাঁহাদের মস্তক প্রতিহত হইতেছে না দেখিয়া সেই যোদ্ধৃবেশী বুঝিলেন এই বনের পথ সেই রমণীর পরিচিত।

রমণী আগে, যুবক পশ্চাতে। পথ শেষ হইয়া আসিল। সেই রহস্যময়ী রমণী মধুর স্বরে বলিলেন—"আমরা মায়ের মন্দিরে আসিয়াছি। সম্মুখেই প্রবেশদ্বার, আজ রাত্রে আপনাকে মায়ের অতিথি হইতে হইবে। কোন আপত্তি আছে?"

যুবক দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—"না—কিছুই না" সেই মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল। ভিতর হইতে আলোক রেখার বিকাশ হইল। যুবক সেই আলোকে বিস্মিতচিত্তে দেখিলেন—তাঁহার অগ্রবর্ত্তিনী পথ-প্রদর্শিকা রমণী এক গৈরিক পরিহিতা ভৈরবী।

সম্মুখেই এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। সেই প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রস্তরময়ী কালিকা মূর্ত্তি। আপাদমস্তক পুষ্পমাল্যমণ্ডিতা হওয়ায় সেই মূর্ত্তির ভীষণতা অপসৃত হইয়াছিল। মন্দির মধ্যে দীপ জ্বলিতেছিল।

সেই দীপালোকে—সেই যোদ্ধৃবেশী একবার সবিস্ময়ে সেই ভৈরবীর মূর্ত্তি দেখিলেন। তাঁহার হৃদয় বিস্ময়ে আপ্লুত হইল। তিনি দেখিলেন—ভৈরবীর চক্ষু জ্বলিতেছে। ভৈরবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার সেই যোদ্ধৃবেশীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"মাকে প্রণাম কর।"

যুবক মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহাই করিলেন। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন—"কে তুমি মা।"

ভৈরবী—বলিলেন—"আমি অনীতা।"

যুবক প্রশ্ন করিলেন—"মা! আমায় এখানে আনিলে কেন?"

ভৈরবী স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"একটী ভিক্ষা চাই।"

যুবক। ভিক্ষা, আমার কি ক্ষমতা মা যে তোমায় ভিক্ষা দিই?

ভৈরবী। তুমি মনে করিলেই দিতে পারিবে। আমি দাতার যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছি।

যুবক। তুমি কি চাও মা?

ভৈরবী দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"আমি চাই তোমার অই বাহুর শক্তি। চাই তোমার মনুষ্যত্ব। চাই তোমার হৃদয়ের বল। আমার সহায়তা করিতে পারিবে?"

যোদ্ধৃবেশী যুবক এবার মহা সমস্যায় পড়িলেন। তিনি আগ্রহের সহিত বলিলেন—"আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির সহায়তায় আপনার কি উপকার হইবে? আমার সাহায্য লইয়া আপনি কি করিবেন?"

গম্ভীর স্বরে রমণী উত্তর করিলেন—"কি করিব? প্রতিশোধ লইব! স্বামিহত্যার জলন্ত প্রতিশোধ! এখনও আমি স্বামীর জলন্ত চিতার উজ্জ্বল অগ্নিশিখা এই চক্ষের উপর দেখিতেছি। কি করিয়া যন্ত্রণা দিয়া পাপিষ্ঠেরা আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব ইষ্টদেবতাকে জলন্ত অনলে ভস্মীভূত করিয়াছিল, সে ভীষণ দৃশ্য এখনও আমার চোখের সুমুকে!"

ভৈরবীর নেত্রদ্বয় জ্বলিতে লাগিল। সেই ক্ষীণ দীপালোকে যোদ্ধৃপুরুষ দেখিলেন প্রতিহিংসাপরায়ণা শান্তি-রূপিণী ভৈরবী কতদূর বিভীষণা হইতে পারেন! তিনি সোদ্বেগে প্রশ্ন করিলেন—"কে আপনার স্বামিহত্যা করিয়াছে!"

"কেন করিয়াছে? অর্থলোভে। কে করিয়াছে? পর্টুগীজ ডাকাত গঙ্গালিস। আমি গঙ্গালিসের শোণিতে স্বামীর প্রেত-তর্পণ করিব। তাই তোমার সহায়তা চাহিতেছি।"

যোদ্ধৃবেশী এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই যে তাঁহার সম্মুখস্থা দীপ্ততেজা ভৈরবী সধবার পূর্ণ লক্ষণযুক্তা। তাঁহার সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুর রাগ, পরিধেয় বস্ত্রের লাল পাড়। দুই হাতে শাঁখার বালা। তিনি ঔৎসুক্যের সহিত প্রশ্ন করিলেন—"মা! তোমার ত সধবার বেশ দেখিতেছি। কিন্তু বিধবা বলিয়া ত পরিচয় দিতেছ!"

সন্ন্যাসিনী দীপ্ততেজের সহিত বলিলেন—"কে বলে আমি বিধবা! যে হিন্দুধর্ম্ম পতিব্রতা সতীর অনন্ত কালের জন্য স্বামিসাহচর্য্য ব্যবস্থা করিয়াছে, যে হিন্দুধর্ম্ম

বলে—সতী ইহলোকে পরলোকে সমান ভাবে স্বামিমুখ-প্রেক্ষিণী, যে ধর্ম্মে স্বামিচিন্তায় আজীবন ব্রহ্মচর্য্যই বিধবার কর্ত্তব্য, সেই ধর্ম্মানুশাসনে লৌকিক আচারে আমি বিধবা হইলেও এখন সেই পরলোকস্থিত স্বামিদেবতার চরণাশ্রয় ত্যাগ করি নাই। এই সীমন্তের উজ্জ্বল সিন্দুর রাগ, আমার স্বামিহন্তার হৃদয়ের শোণিতে যে দিন মুছিতে পারিব, সেই দিন হইতে বিধবার বেশ ধারণ করিব।"

যোদ্ধৃবেশী বুঝিলেন এই শক্তিশালিনী বঙ্গরমণী তাঁহাকে নূতন পথ দেখাইয়া দিতেছে। তিনি নম্রস্বরে বলিলেন—"মা! আমার দ্বারা তোমার কি উপকার হইবে?"

রমণী সহাস্যে বলিলেন—"বৎস! মনে করিয়াছ আমি তোমার পরিচয় জানি না। তা নয়। তুমি বাঙ্গলার উজ্জ্বল রত্ন বিক্রমপুরাধিপতি রাজা কেদার রায়। তুমি সেই সিংহশক্তিসম্পন্ন বৃদ্ধ মহারাজ চাঁদরায়ের পুত্র। আজ তুমি এ গভীর বনে কেন প্রবেশ করিয়াছিলে তাহাও জানি। তুমি কালীমপুরের মোহানায় গিয়াছিলে। পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমস্থলে দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য স্থানানুসন্ধানে গিয়াছিলে। এই ভবানীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কর যে আমার সহায়তা করিবে।"

সেই যোদ্ধৃবেশী আর কেহই নহেন। বিক্রমপুরাধিপতি মহারাজ চাঁদরায়ের একমাত্র বীর পুত্র। কেদার রায় স্মিত-মুখে বলিলেন—"মা! আমার জীবন দিয়াও যদি আপনার উপকার করিতে পারি তাহাতেও আমি প্রস্তুত।"

অনীতা গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"বৎস! তোমায় দেশ-হিতের মহৎব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। খালি আমার নয়, আমার মত অনেক নিরাশ্রয় অনাথ এ দেশে আছে, তাহাদের রক্ষা করিতে হইবে। দেশ অরাজক। মোগল বাদসাহ খাজনা আদায় করিয়াই নিশ্চিন্ত, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ ফৌজদার সুবেদারে প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। তার উপর দেশে আবার নূতন সর্ব্বনাশ উপস্থিত। পর্টুগীজ বোম্বেটে দস্যুরা চট্টগ্রামের বন্দর দখল করিয়া এই সোনার বাঙ্গলায় পল্লী মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের অর্থনাশ করিতেছে। ঘরের কুললক্ষ্মীদের ক্রীতদাসীরূপে বিক্রয় করিতেছে। বাবা! প্রতিজ্ঞা কর আমার স্বামিহত্যার প্রতিশোধের সহায় হইবে, দেশের হিতের জন্য প্রয়োজন হইলে জীবন সমর্পণ করিবে। তোমার অর্থ, ঐশ্বর্য্য, সেনাশক্তি দেশের কাজে লাগাইবে।"

কেদার রায় একবার ভৈরবীর মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন সেই চক্ষু হইতে আর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে না। কয়েক বিন্দু অশ্রু আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত বলিলেন—"প্রতিজ্ঞা করিলাম"

"খালি প্রতিজ্ঞায় হইবে না। বাঙ্গালী অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, কিন্তু রাখিতে পারে নাই। তুমি ভবানীর প্রসাদিত এই নির্ম্মাল্য স্পর্শ করিয়া বল—"দেশের কাজে—আমার মত অনাথের কাজে—আত্মশক্তি নিয়োগ করিবে।" কেদার রায় সংকোচবিহীন মনে বলিলেন—"তাহাই করিব।"

ভৈরবী বলিলেন "এইবার মাকে প্রণাম কর। বল:—

"নমামি সর্ব্বমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্ততে।"

কেদার রায় সেই ভবানীমন্দিরে সেই গভীর নিশীথে সমগ্র বঙ্গভূমির অজ্ঞাতসারে, এক পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিলেন। সে ব্রত তিনি কিরূপে উদ্‌যাপিত করিয়াছিলেন তাহা বিবৃত করাই এই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

শুভদৃষ্টি *

যেন পূত প্রয়াগসঙ্গমে
জাহ্নবী ও যমুনা মিলন—
যেন শরতের গগন প্রাঙ্গণে
বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী পুণ্যদরশন!
তৃষিত ভকতনেত্রে যথা
সাবিত্রী প্রতিমা বিন্ধ্যশিরে
আজীবন আকাঙ্ক্ষিত যথা
তীর্থস্নান গোমুখীর নীরে!

* কোন আত্মীয়ার শুভ পরিণয়োপলক্ষে লিখিত।

যেন মর্ম্মরের শৈল নর্ম্মদার তীরে
অতুলন শরৎপূর্ণিমায়—
যেন অস্তমান রবি আবুর শিখরে,
শান্ত সন্ধ্যা সাগরবেলায়।
হিমের কুহেলিমুক্ত বাসন্তীনিশায়
যেন চিত্রাচন্দ্রমার হাস—
শেফালি সুরভি মগ্ন কার্ত্তিক রজনী,
শিপ্রাতটে ঊষার বিকাশ!

কাশ্মীরের চারু সরঃ, কি শিব সুন্দর,
বসোরার গোলাপ কানন
কুসুমিত গিরিপথ, স্নিগ্ধ কল্লোলিনী,
নির্ঝরেতে ঝঙ্কৃত গগন।
কমল-সুরভি-শ্বাসে পূর্ণ সরোবর—
সুখস্মৃতি যেথায় শয়ান,
শান্ত তন্দ্রাপূর্ণ সাগরের ঊর্ম্মিরব,
স্বর্গশোভা বালকবয়ান,—

চিরদরিদ্রের গৃহে দ্রবিণ সম্ভার,
বন্ধ্যাগর্ভে সন্তানউদয়,—
চিরবিরহীর স্বপ্নে বাঞ্ছিত মিলন,
মহাদুঃখে সুখ অভ্যুদয়।
বিবেক মাহেন্দ্রক্ষণ মহাপাপীহৃদে,
ঘাতকের করুণা সঞ্চার—
সশরীরে দৈববাণী—সন্তানরতন—
নয়ন-পুত্তলি বিধবার!

কি আছে সুন্দর হেন প্রকৃতিসীমায়
হতে পারে এ সুখ তুলনা!—
চিরপিপাসিত চারি আঁখির মিলন—
প্রেমের এ সুখের বেদনা!
নহে দুরু দুরু শুধু হিয়ার কম্পন
ব্যথা এযে অমূর্ত্ত আত্মার—
বধূর কম্পিত কর ভূমানন্দে যবে
অর্পে বরে পুষ্পমাল্যভার!

সুখে রেখো সুখে থেকো করি আশীর্ব্বাদ,
রহে যেন বিভুপদে মতি—
নিখিলের সার সুখ, ওহে সারাৎসার,
পায় যেন এ নবদম্পতী।
না আসে মালিন্য প্রেমে দৈন্য অবসাদ
নিত্য রহে অম্লান উজ্জ্বল,
ধর্ম্মে মতি কর্ম্মে প্রীতি ঈশ্বরে বিশ্বাস,
লোকান্তর পাথেয় সম্বল!

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

নেপালের অধিবাসিগণ।

নেপালের আয়তনের তুলনায় ইহার অধিবাসী বিভিন্ন জাতি সমুদয়ের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়া মনে হয়। একটি দেশে এরূপ বিভিন্ন জাতির সমাবেশ অতি অল্প স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়ী গুর্খাগণ বর্ত্তমান নেপালের প্রধান অধিবাসী হইলেও জনসংখ্যায় পূর্ব্বতন অধিবাসী নেওয়ারগণই অধিক। গুর্খা এবং নেওয়ার ভিন্ন, মগর, গুরুম, লিম্বু (Limbu), কিরাটী (Kirate), ভূটিয়া, এবং লেপচা (Lepcha)-গণও এই প্রদেশের অধিবাসী। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে যখন পৃথ্বীনারায়ণ নেপাল রাজ্য জয় করেন, তখন হইতেই গুর্খাগণ এদেশে সর্ব্বতোভাবে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। গুর্খাগণ হিন্দু এবং রাজপুত বংশোদ্ভব। মুসলমানদিগের অত্যাচারে ইহারা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ কাটমণ্ডুর ২০ ক্রোশ পশ্চিমে গোরখালী নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া বাস করিতে থাকে। গোরখালী হইতে ইহাদের গুর্খা নামের উদ্ভব। বর্ত্তমান রাজবংশ, প্রধান রাজপুরুষগণ, দেশের সমুদয় প্রধান ব্যক্তি গুর্খা বংশ-সম্ভূত। সৈনিক বিভাগের অধিকাংশ সৈনিক এবং প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারীগণ সকলেই গুর্খা। বিজয়ী গুর্খাগণের চরণে ধন, মান, সম্পদ সকলই উৎসর্গীকৃত হইয়াছে তাহাতে আর বিচিত্র কি? অধিকাংশ গুর্খাগণ দেখিতে সুশ্রী। নেপালের উচ্চবংশের মহিলাগণ দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী।



লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল কান্‌হোবারণছোড়দাস কীর্ত্তিকর, আই. এম্. এস্.

Kuntaline Press, Calcutta.

ব্রাহ্মণদিগের আকৃতির পার্থক্য সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাকৃত কৃশ, ক্ষিপ্র, আর্য্যলক্ষণযুক্ত। নেপালে যেমন বিচিত্র জাতির অধিবাস, কাটমণ্ডু সহরেও সেইরূপ বিচিত্রমূর্ত্তি মানবের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বা গৌরকান্তি দীর্ঘাকৃতি আর্য্যসন্তানের ন্যায়, কেহ বা বলিষ্ঠ দৃঢ় নাতিস্থূল নাতিদীর্ঘ পীতবর্ণ মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভব বলিয়া মনে হয়। আকৃতি এবং বর্ণের বৈচিত্র দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেহ বা উজ্জ্বল গৌরকান্তি, কেহ বা শ্যাম, কেহ বা কৃষ্ণবর্ণ, তবে এ কথা বলিতে হয় হিন্দুস্থানের কৃষ্ণকান্তি এখানে বিরল। অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর বর্ণের। কি গুর্খা, কি নেওয়ার স্ত্রী পুরুষের পরিচ্ছদ সুদৃশ্য এবং সুসঙ্গত। বাহ্যিক বেশবিন্যাসে নেওয়ার এবং গুর্খার পার্থক্য কিছুই নাই। পাজামা এবং চাপকানের ন্যায় একপ্রকার জামা, তার উপর সাদা কাপড়ের কোমর-বন্ধ, মস্তকে একটী কাপড়ের টুপী। সাধারণ পুরুষদিগের বেশ এই প্রকার, তবে বর্ত্তমান বিলাতী সভ্যতার সংস্পর্শে অনেকের দেহে বিলাতী ছাঁটের কোট দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত দীন দরিদ্র, পথের ভিখারীর পর্য্যন্ত সমুদয় দেহ বস্ত্রাবৃত; তাহা শতছিন্ন ধলী ধূসরিত হউক কিন্তু অৰ্দ্ধনগ্ন দেহ এ দেশের রাজপথে কখন দেখা যায় না। নারীগণ সচরাচর ২০।৩০ হস্ত দীর্ঘ বিচিত্র বর্ণের শাড়ী পরিধান করে। হিন্দুস্থানী মেয়েদের ন্যায় সম্মুখে কোঁচা তাহা প্রায় ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে। উৰ্দ্ধাঙ্গে জামা। প্রায় ১০ হাত লম্বা নাতিপরিসর কাপড় কোমরে জড়াইয়া রাখে। শাড়ী-খানা কোঁচা করিতেই যায়। দেহের উপরাৰ্দ্ধ আবরণের জন্য চাদর বা ওড়না ব্যবহৃত হয়। কুমারী সধবা কি বিধবা কাহারও মস্তকের আবরণ নাই। নেপালী রমণীদিগের কেশ বিন্যাসের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমরা সম্মুখে সিঁতী কাটিয়া পশ্চাতে বেণী রচনা করি; তাহারা পশ্চাতে সিঁতী কাটিয়া কপালের উপরে এক দীর্ঘ বেণী রচনা করে এবং তাহার শেষভাগে রক্তিম বর্ণের সূতার গুচ্ছ বাঁধিয়া আপনাদের সৌভাগ্য প্রকাশ করে। বিধবাগণ লাল সূতা বাঁধে না। বেণীতে লাল সূতা বাঁধা ভিন্ন সধবাদিগের আরও দুইটি লক্ষণ আছে। হাতে কাচের চুড়ী গলায় পুঁতির মালা। এই দুইটাই কিন্তু বিলাতী জিনিষ। সধবাদিগের এই দুইটী প্রধান লক্ষণ বিলাতী জিনিষ কিরূপে হইল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। রাজরাণী হইতে পথের ভিখারিণী পর্য্যন্ত হাতে কাচের চুড়ী গলায় পুঁতির মালা। নেপালে এবম্বিধ-লক্ষণযুক্তা রমণী দেখিলেই তাঁহাকে ভাগ্যবতী পতিযুক্তা স্থির করিতে হইবে। হিন্দুস্থানী কিম্বা বাঙ্গালী রমণীর ন্যায় নেপালী নারীকুলের অঙ্গে অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য নাই। মস্তকে সোণার গহনা, কানে বড় বড় পাশার ন্যায় সোণার ফুল, গলায় পদকের ন্যায় গহনা, চরণে পাঁয়জর ভিন্ন অন্য কোন অলঙ্কার দেখা যায় না। উপর হাতে কোন প্রকার অলঙ্কার কিম্বা নাসিকায় নথ এদেশে কখন দেখি নাই। রাজপরিবারের এবং ধনী গৃহস্থদের মহিলাগণ সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় কোঁচা করিয়া কাপড় পরিধান করেন না। তাঁহারা পাজামা, জ্যাকেট এবং ওড়না ব্যবহার করেন। প্রায় ২০ গজ কাপড়ে একটী পাজামা প্রস্তুত হয়! পরিধান-কালে তাহাকে পাজামা বলিয়া বোধ হয় না---অনেকটা পেটি-কোট কিম্বা বেলুনের ন্যায় দেখায়। বিধবা ভিন্ন কেহ শুভ্র বসন পরিধান করে না। উচ্চ পরিবারের রমণীগণ সৰ্ব্বদা জুতা মোজা পরিধান করিয়া থাকেন তাহাতে হিন্দু আচারের কোন ব্যতিক্রম হয় না। পূজা কিম্বা আহারের সময় জুতা মোচন করিলেই চলে। নেপালী সুন্দরীগণ যখন বেশবিন্যাস করিয়া শকটারোহণে রাজপথে বাহির হন, তখন তাঁহাদিগকে পরীর দল কিম্বা প্রজাপতির ঝাঁকের ন্যায় দেখায়। কজ্জল-শোভিত আয়ত নয়ন, তদুপরি অঙ্কিত ভ্রূযুগল, রক্তাভ অধরোষ্ঠ ও গণ্ডস্থল বিশিষ্ট শুভ্রমূর্ত্তি রমণীকুল যখন বিচিত্র বর্ণের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া রাজপথে দর্শন দেন, এবং তাঁহাদিগের সূক্ষ্ম ওড়না বায়ুভরে উড়িতে থাকে, তখন যে তাঁহাদিগকে পরীর দল বলিয়া ভ্রম হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? নেপালীরা গোঁড়া হিন্দু বটে কিন্তু আমাদের দেশের আচার ব্যবহারের সহিত ইহাদের পার্থক্য অনেক। শীতপ্রধান দেশ বলিয়াই বোধ হয় এখানে অবগাহন এবং বস্ত্র পরিবর্ত্তনের রীতি সেরূপ নাই। উচ্ছিষ্টের বিচার আমাদের দেশের ন্যায় নহে। এদিকে আবার রন্ধনশালায় বসিয়া আহার না করিলে চলে না। প্রস্তুত অন্ন রন্ধনগৃহের বাহিরে ভোজন করা বিধেয় নহে। এই জন্য ভিন্ন জাতীয়েরা এক রন্ধনশালায় আহার করিতে পারে না। পতি হয় ত ক্ষত্রিয়, পত্নী ভোটসূতা, এমন

স্থলে পতিপত্নীকে ভিন্ন রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া ভিন্ন রন্ধন-শালায় আহার করিতে হয়। একই গৃহে দুই সংসার। বলা বাহুল্য এখানে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ চলিত আছে। অন্য জাতীয় ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া পান তামাক কিম্বা জল পর্য্যন্ত পান করা চলে না। নেপালে আমাদের দেশের ন্যায় অবরোধ প্রথা নাই (নেপালের বাহিরে অবরোধ আছে); শ্বশুর শাশুড়ী কিম্বা অন্যান্য গুরুজনের নিকট বধূগণ অবলীলাক্রমে উপনীত হন ও প্রয়োজনীয় বাক্যালাপ করেন। কি স্ত্রী কি পুরুষ পূজাঅর্চ্চনায় এবং ধর্ম্মাচরণে দিবসের অনেক সময় ব্যয় করিয়া থাকেন।

গুর্খাগণ সাহসী সৈনিক বটে, কিন্তু পরিশ্রমী, কার্য্যকুশল জাতি নহে। তাহারা কৃষি কিম্বা শিল্পকর্ম্মে অনুরক্ত নহে, দেশের যতপ্রকার শ্রমসাধ্য কিম্বা সূক্ষ্ম কার্য্য আছে তাহার অধিকাংশই নেওয়ারদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কি স্বদেশে কি বিদেশে ব্যবসা বাণিজ্য অধিকাংশই তাহা-দিগের হস্তে, সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে অনেক সম্পন্ন ব্যক্তি আছে। লেখাপড়ার কার্য্যেও অধিকাংশ স্থলে নেওয়ারগণই নিযুক্ত। কাটমণ্ডু এবং তাহার নিকটস্থ স্থানসমূহে অধি-কাংশ নেওয়ারের বাস। নেপালের অন্যান্য অংশে তাহা-দিগের সংখ্যা তাদৃশ অধিক নহে। নেওয়ারগণই বস্তুতঃ নেপালের আদিম অধিবাসী। তাহারা অধিকাংশই বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু রাজার রাজ্যে নেপালে বৌদ্ধধর্ম্মের চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। আর কিছু দিন পরে ইহার অস্তিত্ব থাকিবে কি না সন্দেহ। নেওয়ারগণকে কিছুতেই অসভ্যজাতি বলা যায় না। অপেক্ষাকৃত শান্ত, কার্য্যকুশল, শ্রমনিপুণ হইলেও সামাজিক নীতিতে এজাতি গুর্খাদিগের তুলনায় হীন। জনসাধারণের ভিতর বিবাহ-বন্ধন অত্যন্ত শিথিল। নেওয়ারনীদিগের ভিতর পাতিব্রত্য ধর্ম্মের বিশেষ আদর আছে বলিয়া মনে হয় না।

নেওয়ারদের কন্যারা বিবাহযোগ্যা হইলে পিতামাতা সচরাচর তাহাদের বিবাহ দিয়া থাকে বটে, কিন্তু একই পতির গৃহে তাহাদের জীবনের অবসান হয় না। সুযোগ এবং সুবিধা হইলে যে কোন কারণে তাহারা পত্যন্তর গ্রহণ করে। বিধবা হইলে ত কথাই নাই। ধরিতে গেলে নেওয়ারনীগণ কখনই বিধবা হয় না। অনেক স্থলে সহোদর ভ্রাতাগণের ভিন্ন ভিন্ন পিতা। গুর্খাদিগের বিবাহবন্ধন কিম্বা সামাজিক নীতি এরূপ শিথিল নহে, অন্ততঃ নারীগণ সম্বন্ধে। যথায় বহুবিবাহ এবং দাসত্ব প্রথা বিদ্যমান তথায় পারিবারিক জীবনে ধর্ম্মনীতির উচ্চ আদর্শ অন্বেষণ করা বাতুলতা মাত্র। নেপালীদিগের ভিতর গুরুভক্তি এবং ব্রাহ্মণভক্তি অতিশয় প্রবল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতা মাতা কিম্বা অন্যান্য গুরুজনের চরণ মস্তকে ধারণ করিয়া অভিবাদন করিতে হয়। ব্রাহ্মণগণের পদরজঃ গ্রহণের ব্যবস্থা কিঞ্চিৎ হাস্যোদ্দীপক। ধূলিতে মস্তক রাখিয়া পদরজঃ গ্রহণের পূর্ব্বেই তাঁহারা অদ্ধপথে মস্তকে চরণ তুলিয়া দেন। সকল প্রকার ক্রিয়াকর্ম্মে বার-ব্রতে ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রে দান করিতে হয়। প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থ কুলপুরোহিতকে যথেষ্ট সম্মান এবং দক্ষিণা দিয়া থাকেন। অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ করিলেও ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা নাই। মহা-রাজ জঙ্গ বাহাদুরের সময় হইতে এদেশে সহমরণের ব্যবস্থা স্থগিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে দলে দলে গুর্খারমণীগণ পতির চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে নেপালে সহমরণ প্রথা একেবারে নাই। পূর্ব্বে নেওয়ারদিগের ভিতরও সহমরণ প্রথা ছিল।

কাটমণ্ডু সহরবাসিগণ ভিন্ন নেপালের জনসাধারণ কোন প্রকার বিলাসিতার ধার ধারে না। ভারতবর্ষের পুরাকালের অবস্থা যদি কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, তাহা হইলে নেপালের অবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। নেপালী মাত্রকেই কৃষক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক গৃহস্থ বৎসরের চাউল তরকারি আপনার ক্ষেত্রে উৎপাদন করে। ভারতবর্ষের ন্যায় নিরন্ন ব্যক্তির বাহুল্য এখানে নাই। গৃহে গাভী কিম্বা মহিষ, ক্ষেত্রে মোটা চাউল মক্কা গম, শাক তর-কারি অধিকাংশের গৃহেই আছে। প্রভাতে গাত্রোত্থান করি-য়াই দরিদ্র এবং ধনীর গৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। অরুণোদয় হইতে না হইতে সকলের আহারকার্য্য সম্পন্ন হয়। তৎপরে সকলে দিবসের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। কার্য্য করিতে করিতে ক্ষুধা পাইলেই শুষ্ক চিড়া বা অন্য কিছু জলযোগ করে। দিবাশেষে পুনরায় অন্নগ্রহণ করে। অনেক দরিদ্র লোকের দুই বেলা অন্ন জোটে না, কিন্তু সহজলভ্য ফল মূল দ্বারা উদর জ্বালা নিবারণ করে।

পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইলে কি হয় এ দেশের মৃত্তিকায় ফল শস্য প্রচুর জন্মে। ভারতবর্ষের কুত্রাপি এত প্রচুর এবং সুলভ ফল শস্য জন্মে কি না সন্দেহ। নেপালে শীত এবং গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের ফল ও শস্যের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশের নরনারী উপবাসদুঃখ সহ্য করিতে পারে না। বৎসরের মধ্যে একদিন (তীজব্রতে) নেপালী রমণীর নিরাম্বু উপবাস করিবার ব্যবস্থা আছে—সেই দিন তাহাদিগের নিকট এক বিশেষ দিন—সেই এক দিনের অনশন তাহাদিগের নিকট বিষম বলিয়া মনে হয়। বঙ্গ-দেশের বিধবাদিগকে দেখিলে না জানি তাহাদিগের কি বিস্ময়ের উদয় হয়! নেপালের জনসাধারণ অত্যন্ত মাংসা-হারপ্রিয়, তাহাদিগের নিকট ইহা অপেক্ষা ঈপ্সিত আহার্য্য আর কিছুই নাই। ভারতবাসীর অলীক সভ্যতা, অভাব, দারিদ্র্য, উপবাস ইহাদিগের নিকট অজ্ঞাত। নেপালের প্রজাবর্গ দরিদ্র বটে, কিন্তু ইহারা অর্থহীন দরিদ্র; নিরন্ন অনাহারক্লিষ্ট, করভারে প্রপীড়িত, জীর্ণদেহ মনুষ্যকঙ্কাল নহে। ইহারা দৃঢ়, বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ ও প্রসন্নমূর্ত্তি। তবে অত্যন্ত অপরিষ্কার থাকে বলিয়া ইহাদিগকে দেখিলে প্রীতির উদয় হয় না। গন্ধগোকুলের ন্যায় তাহারা যেখানে যায় দুর্গন্ধ বিস্তার করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নেপালী মাত্রেই কৃষক। ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই আপন আপন ক্ষেত্রের কর্ম্মে নিযুক্ত। জনসংখ্যার এক অংশ মাত্র সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত। নেপালের পশ্চিমাংশে অধিকাংশ মগর এবং গুরুঙ্গের বাস। তাহারা অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ। ইহাদিগের আকৃতি মঙ্গোলীয় জাতির ন্যায়। ইহারা সৈনিক কার্য্যের বিশেষ
১ উপযুক্ত। নেপালের পূর্ব্বাংশে লিম্বু ও কিরাতীদিগের বাস। তাহারাও সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত। ইহারাও মঙ্গোলীয় বংশজ এবং অতি উত্তম শিকারী।

শিকিমের নিকট লেপচাদিগের বাস। ইহারা দেখিতে ভুটিয়াদিগের ন্যায়। তিব্বত এবং নেপালের মধ্যপ্রদেশে ভুটিয়াদিগের বাস। ইহারা অত্যন্ত দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী। কিন্তু আকৃতি বড় কুৎসিৎ। দুরারোহ পার্ব্বত্য পথে ইহারা সর্ব্বদাই ভার-বহন-কার্য্যে নিযুক্ত। ইহারা এক একজন অবলীলাক্রমে দুইমণ ভার পিঠের উপর বহিয়া লইয়া যায়। নেপালে বিদেশী লোকেরা প্রায় বাস করে না, কাটমণ্ডুতে বাণিজ্য ব্যপদেশে কাশ্মীরী মুসলমান ও মাড়বারী-গণ বাস করেন। শীত ঋতুর সমাগম হইতে না হইতে তিব্বত হইতে দলে দলে লোক ছাগল, ভেড়া, কম্বল, লবণ, কস্তুরি প্রভৃতি লইয়া কাটমণ্ডু উপত্যকায় উপস্থিত হয়। শীতকালে এখানে বাসকরিয়া বসন্তের সমাগমে দেশে প্রত্যা-বর্ত্তন করে। নেপালে জাতিগত ভাষাগত আকৃতিগত এবং ধর্ম্মগত বৈষম্য অত্যন্ত অধিক। গুর্খাগণ হিন্দু আর্য্যবংশ সম্ভূত। তাহাদিগের পার্ব্বতীয় ভাষা সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশ, দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হয়। এই হেতু ভারতবর্ষীয়েরা অল্পায়াসে এই ভাষা আয়ত্ত করিয়া লয়। নেওয়ারগণ আর্য্য এবং মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের ভাষা তিব্বতের সহিত জ্ঞাতি সম্বন্ধ প্রকাশ করে। সে ভাষা আমাদিগের নিকট দুর্ব্বোধ্য। নেওয়ারগণ পূর্ব্বে অধিকাংশ বৌদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু এখন হিন্দুধর্ম্মের সহিত ইহার এরূপ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে যে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ আর নাই। মগর, গুরুঙ্গ হিন্দু। অন্যান্যজাতি সকলের ভাষা বিভিন্ন, তাহারা অধি-কাংশ বৌদ্ধ। ভুটিয়া এবং লিম্বুরা তিব্বতী ভাষা ব্যবহার করে।

দাসত্বপ্রথা।

নেপালে দাসত্বপ্রথা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহ 'ক্রীত' দাস-দাসীতে পূর্ণ। কাহারও অবস্থা মন্দ হইলে দাসদাসী বিক্রয় করিবার রীতি আছে। দাসদাসাদিগের সন্তানগণ জন্মের সহিত দাসত্বফাঁস গলায় করিয়া আসে। নেপালের দাসত্বপ্রথা ইউরোপীয়দিগের দাসত্ব প্রথার ন্যায় নহে। এখানে দাসদাসীগণের কোন কষ্ট আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহারা সন্তাননির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হয়। দাস হইতে দাসীর মূল্য অধিক—দাসী-গণের ১৫০৲।২০০৲ এবং দাসগণের ১০০৲।১৫০৲ পর্য্যন্ত মূল্য হইয়া থাকে। সুরূপ হইলে দাসীদিগের মূল্য অধিক হয়। দাসীগণ প্রভুর সন্তান গর্ভে ধারণ করিলে তাহা-দিগের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং চিরদিনের মত জীবিকার সংস্থান হয়। ভুটিয়াগণ অতি সহজে আপনাদের সন্তান বিক্রয় করে। অনেক সময় পিতা মাতা ঋণদায়ে সন্তান বন্ধক

রাখে। ঋণশোধ করিতে পারিলেই সন্তানের দাসত্ব মোচন হয়।

নেপালে গণকঠাকুর এবং বৈদ্যের বিশেষ প্রতিপত্তি।

নেপালে বিচারালয় আছে বটে কিন্তু বিচারের কোন পুঁথি লিখিত আইন আছে বলিয়া জানি না। সুবিচার সকল স্থলে না হইলেও মোটের উপর একপ্রকার বিচার হয়। গোহত্যা, ব্রাহ্মণহত্যা করিলে তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হয়। হত্যা অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিরও মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য অনেক নিষ্ঠুর অত্যাচারের ব্যবস্থা আছে।

নেপালে শিল্পবাণিজ্যের তদ্রূপ শ্রীবৃদ্ধি নাই। দেশে অত্যন্ত মোটা সুতার এবং মোটা পশমী বস্ত্র নির্ম্মিত হয়। নেপালীগণ সচরাচর বিলাতী কাপড় ব্যবহার করে। নেপালে একপ্রকার কাগজ হয়। পিত্তল কাঁসার বাসন ও হাতির দাঁতের মোটা কাজ ভিন্ন বিশেষ কোন শিল্পের প্রচলন নাই। স্বাধীন রাজ্যের এবিষয়ে এরূপ দুরবস্থা দুঃখের বিষয়।*

শ্রীহেমলতা দেবী।

প্রাণী ও উদ্ভিদের সাড়ার একতা।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, আঘাত উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া উদ্ভিদ মাত্রেরই একটা প্রধান ধর্ম্ম। নানা জাতীয় গাছে নানা প্রকারে আঘাত দিয়া, আচার্য্য বসু মহাশয় যে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সাড়ার একতা দেখাইয়াছেন, তাহাও আমরা ঐ প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। এখন দেখা যাউক, লজ্জাবতী, ভূমি আমলা (Biophytum) ও বনচাড়াল প্রভৃতি গাছে, বৈদ্যুতিক সাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পাতা উঠা নামা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সাড়া (mechanical response) কোথা হইতে আসে। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম, হাত পা ও মুখ বাঁধা প্রাণীকে প্রহার করিতে থাকিলে, হাত পা নাড়িয়া ও চীৎকার করিয়া সে যেমন প্রহারের অনুভূতি জানাইতে পারে না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে বেদনাটা পূর্ণমাত্রাতেই ভোগ করে, আহত গাছের অবস্থা কতকটা সেই প্রকারের। পাতা, বোঁটা ও ডালের গঠনবৈচিত্র্যে অন্তরের বেদনা কতকগুলি গাছ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়িয়া-চাড়িয়া বেশ প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু যাহাদের অঙ্গ খেলে না তাহাদিগকে আঘাত উত্তেজনায় কেবল অন্তরে অন্তরেই বেদনা অনুভব করিয়া নিরস্ত থাকিতে হয়। আচার্য্য বসু মহাশয় তাঁহার বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায়, এই আন্তরিক বেদনার অস্তিত্ব সকল উদ্ভিদেই দেখাইয়াছেন। কি অবস্থায় উদ্ভিদ হাত পা বাঁধা প্রাণীর ন্যায় নীরবে আঘাত যন্ত্রণা সহ্য করে, এখন তাহাই আলোচ্য।

একখণ্ড ইবনাইট্ ও তাহার সমান আকারের একটি রবার ফলককে শিরিসের আটা দ্বারা জুড়িয়া, উত্তাপ দিতে থাকিলে, উহাদের আকারের একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। তাপ পাইলেই এই জোড়া জিনিসটা ধনুকের আকারে বাঁকিয়া পড়ে। এই বাঁকা হওয়ার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন নয়। উত্তাপে প্রসারিত হওয়া ও ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়া পদার্থ মাত্রেরই একটা প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু একই রকম তাপে সকল জিনিস সমান পরিমাণে প্রসারিত হয় না। যে উত্তাপে পারদ প্রসারিত হইয়া দ্বিগুণ আয়তন প্রাপ্ত হয়, অপর পদার্থে সেই তাপ দিলে, প্রসারণের মাত্রা অত অধিক দেখা যাইবে না। মোট কথায় একই প্রকারে শীতল বা গরম করিলে, নানা পদার্থে নানা প্রকারের আকুঞ্চন ও প্রসারণ দেখা যায়। উপরোক্ত ইবনাইট্ ও রবারের আকুঞ্চন ও প্রসারণশক্তি এক নয়। কাজেই তাহাতে তাপ দিলে, অধিক আকুঞ্চনশীল রবারের ফলকটিকে নীচের দিকে (concave) রাখিয়া, জিনিসটাকে ধনুকাকারে থাকিতে দেখা যাইবে।

লজ্জাবতী, বনচাঁড়াল প্রভৃতি গাছ পরীক্ষা করিলে, তাহাদের পাতার বোঁটার গোড়ায় একটী বিশেষ অঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে ইংরাজিতে Pulvinus বলে। যাহাতে পাতাগুলি সহজে উঠানামা করিতে পারে, তজ্জন্য এই স্থানে কব্জার মত এক অংশ আছে, এবং তা'

---

* জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে "নেপালযাত্রা" প্রবন্ধে

যকসনে	স্থলে	রকসলে	হইবে
কষ্টেট	"	কার্পেট	"
বিচাকবির	"	বিচাকরি	"
ভীমকেশী	"	ভীমফেদী	"
কুনিসানি	"	কুলিখানি	"

ছাড়া অপর অংশের তুলনায় এই স্থানের কোষগুলিরও (Cells) একটা বিশেষত্ব দেখা যায়। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের কোষের যে প্রকার আকার, ঐ পত্রমূলের (pulvinus) নিম্নার্দ্ধের কোষগুলি যেন তাহা অপেক্ষা বড়, এবং শীতাতপে সেগুলি যেন অধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া পড়ে। পত্রমূলের নিম্নার্দ্ধ ও উপরার্দ্ধের কোষ সকল রসপূর্ণ হইয়া পত্রপ্রান্তের উপর সমান চাপ দিতে থাকিলে, পাতা ভূতলের সহিত সমান্তরাল হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই লজ্জাবতীর স্বাভাবিক অবস্থা। এখন যদি কোন প্রকার আঘাতাদি দ্বারা ঐ সাম্যাবস্থায় স্থিত পত্রমূলটিকে উত্তেজিত করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা পত্রমূলের নিম্নার্দ্ধের সেই বড় বড় কোষগুলি হইতে অধিক পরিমাণে রস নির্গত হইয়া, তাহা নীচে উপরের শাখা প্রশাখা ক্রমে চলাফেরা করিতে আরম্ভ করে। রসপূর্ণ বস্তু হইতে রস নির্গত হইলেই সেটি সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এখানে উপরিস্থ ক্ষুদ্রতর কোষগুলি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রস নির্গত করায় নীচেকার বড় কোষগুলি অত্যন্ত অধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পত্রমূলটিও পূর্ব্ব উদাহৃত রবার ও ইবনাইটের ফলকের ন্যায় ধনুকাকারে বাঁকিয়া পড়ে। পাতা ঐ পত্রমূলেই প্রোথিত থাকে, কাজেই উহার বক্রতার সঙ্গে সঙ্গে পাতাটিকেও নামিতে দেখা যায়। ইহাই লজ্জাবতীলতার পাতা গুটানোর কারণ।

লজ্জাবতী প্রভৃতির পাতা একবার নামিলে কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার সেগুলি পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য পত্রমূলের সেই বড় বড় কোষগুলিতে পুনঃ রসসঞ্চারই ইহার কারণ। বৃক্ষমূল হইতে সর্ব্বদাই এক রসপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া শাখাপ্রশাখাদি ক্রমে তাহা উদ্ভিদের সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। কাজেই যখন ঐ রস সঙ্কুচিত বৃহৎ কোষগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেগুলিকে আবার ফুলাইয়া তোলে, তখন পত্রমূলের সেই অসম দুই অর্দ্ধ পুনরায় সাম্যাবস্থায় আসিয়া পাতাগুলিকে দাঁড় করাইয়া দেয়।

পত্রমূলের ঊর্দ্ধ ও নিম্নার্দ্ধের কোষের আকারগত বৈষম্য ও তাহাদের আকুঞ্চনশক্তির বিভিন্নতাই যে, লজ্জাবতী প্রভৃতি উদ্ভিদ পত্রের উঠানামার কারণ, আচার্য্য বসু মহাশয় নানা পরীক্ষায় তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

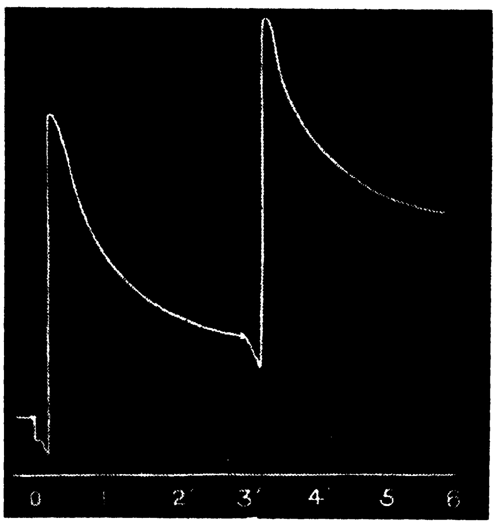
লজ্জাবতী লতার একটি সপত্র ও সবল শাখা নির্ব্বাচন করিয়া, তাহার মূলে দেশলাই জ্বালাইয়া তাপ দাও। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই উত্তাপপ্রাপ্ত স্থানের নিকটবর্ত্তী পাতাগুলি গুটাইতে আরম্ভ করিবে, এবং পরে সেই তাপের উত্তেজনা শাখা বাহিয়া তাহার সকল পাতাগুলিকেই গুটাইয়া শেষে প্রশাখার পাতাগুলিকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিবে। আচার্য্য বসু মহাশয় এই ব্যাপারের ব্যাখ্যানে বলেন, আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের কোষগুলি যে রস-নির্গমন করিয়া সাড়া দেয়, তাহা সেই খানেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পার্শ্বের কোষগুলিতেও সেই উত্তেজনা সংক্রামিত হইয়া পড়ে। কাজেই ধারাবাহিকরূপে কোষগুলি রস-নির্গমন করিতে করিতে, একস্থানের উত্তেজনাকে শাখা-প্রশাখাক্রমে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলে, এবং পথের মাঝে সেই অসম কোষবিশিষ্ট কোনও পত্রমূল পাইলেই তাহাকেও সাড়া দেওয়াইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ণিত অসম পত্রমূল (pulvinus) সকল গাছে নাই। সুতরাং সাধারণ গাছে, আমরা এই উত্তেজনা পরিচালনের কোন প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখিতে পাই না। এ অবস্থায় বৈদ্যুতিক প্রথায় ভিতরকার উত্তেজনা জানা ব্যতীত আর অন্য উপায় থাকে না।

কোষপরম্পরায় কিপ্রকার বেগে উত্তেজনা পরিচালিত হয়, আচার্য্য বসু মহাশয় অতি সুন্দর সুন্দর যন্ত্রদ্বারা তাহা সুকৌশলে গণনা করিয়াছেন, এবং কয়েকটি গাছের পরিচালন বেগ কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর প্রাণিদেহের বেদনা পরিচালনবেগের সহিত সমান দেখাইয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কোন স্থানে আঘাত দিলে সেখানকার কোষগুলি হইতে যে রস নির্গত হয়, এবং সেই আঘাত সংক্রামিত হইলে পর অন্য কোষ হইতে যে রস বাহির হয়, তাহার কি কোন কার্য্য নাই? আচার্য্য বসু মহাশয় কোষনির্গত এই রসের প্রবাহ লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন, এবং ইহা দ্বারা জানা গিয়াছে, এই রস-প্রবাহের বেগ ও উত্তেজনার পরিচালন বেগ এক নয়। কাজেই কোন কোষ উত্তেজিত হইলে যে রস নির্গত হয়,

তাহা সম্মুখের প্রকৃতিস্থ কোষগুলির ভিতর দিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইলে পর, প্রকৃত উত্তেজনা আসিয়া সেই কোষগুলিকে আক্রমণ করে। ইহার ফলে আচার্য্য বসু মহাশয় প্রত্যেক আঘাতে কোষে দুইপ্রকার সাড়া দেখিতে পাইয়াছেন। প্রথমে পূর্ব্ববর্ত্তী কোষনির্গত রসে ফাঁপিয়া উঠা, এবং পরে প্রকৃত উত্তেজনায় আক্রান্ত হইয়া সঙ্কুচিত হওয়া।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছের পত্রমূলের (pulvinus) ঊর্দ্ধ ও নিম্ন অর্দ্ধদ্বয় রসপুষ্ট হইয়া যখন পাতার ডগাতে দুই বিপরীত দিক হইতে সমান ভাবে চাপ দেয়, তখন পাতাটিকে আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় দেখি। তার পর উত্তেজনা দ্বারা নীচেকার অধিক আকুঞ্চনশীল বড় বড় কোষগুলি হইতে যখন রস নির্গত হইয়া পড়ে, তখন পত্রমূল পাতাটিকে সঙ্গে লইয়া ধনুকাকারে বাঁকিয়া যায়। সুতরাং উল্লিখিত দুইপ্রকার সাড়ার মধ্যে প্রথমটি দ্বারা পত্রমূলের বৃহৎ কোষগুলি যখন পশ্চাৎবর্ত্তী কোষ নির্গত রসে ফুলিয়া উঠে, তখন তাহাতে পত্রমূলে উপর দিকে একটা চাপ পড়িবার কথা। কাজেই প্রকৃত উত্তেজনার দ্বারা নামিয়া পড়িবার পূর্ব্বে, এখানে পাতাটিকে হঠাৎ উপরে ঝুঁকিতে দেখারই সম্ভাবনা।



১ম চিত্র।

পূর্ব্বোক্ত অনুমানগুলি যে অভ্রান্ত, ভূমি আম্‌লা ও জ্জাবতী প্রভৃতির সাড়ালিপি দেখাইয়া আচার্য্য বসু মহাশয় তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। পার্শ্বস্থ চিত্রটি ভূমি আম্‌লার একটি পাতার সাড়ালিপি। দূর হইতে পাতাটির উপর কোনপ্রকার আঘাত দেওয়া হইয়াছিল। সেই আঘাতে সেটি কি প্রকারে উঠা নামা করিয়াছিল, পাঠক চিত্র দৃষ্টে তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। চিত্রের শ্বেত বিন্দুদ্বয় আঘাত প্রদানের সময় জ্ঞাপক এবং ঊর্দ্ধরেখা পাতার পতন ও নিম্ন রেখা তাহার উত্থান নির্দ্দেশক। পাঠক চিত্রে দেখিতে পাইবেন, প্রত্যেক আঘাতের পরই পাতাটি হঠাৎ একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিয়মিত উঁচুনীচু সাড়ালিপির বিপরীত দিকে যে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উঁচু নীচু রেখাময় সাড়ালিপি রহিয়াছে, তাহাই পাতার ঐ আকস্মিক উৎপতনের নির্দ্দেশক। প্রকৃত উত্তেজনা পৌছিবার পূর্ব্বে যে এই উৎপতন হইয়াছিল, তাহাও চিত্রদৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।*

পত্রমূলস্থ কোষের বৈচিত্র্যই যে, লজ্জাবতী ও বনচাঁড়াল প্রভৃতি গাছের পাতার প্রত্যক্ষ সাড়া দিবার কারণ, আচার্য্য বসু মহাশয়ের পূর্ব্ব বর্ণিত নানা পরীক্ষা দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। যে সকল গাছে কোষবিন্যাসের ঐ প্রকার বৈচিত্র্য নাই, আচার্য্য বসু মহাশয় কৃত্রিম উপায়ে কোষের বিষমতা উৎপন্ন করিয়া, তাহাতে লজ্জাবতীর ন্যায় সাড়া দেখাইয়াছেন।

পেঁয়াজকলি যখন খুব ক[illegible] অবস্থায় থাকে, তাহার চারি ধারের কোষগুলিকে একই আকারের ও একই ধর্ম্মবিশিষ্ট দেখা যায়। কাজেই ইহার মূলে কোন আঘাত দিলে, সেটি কোন প্রকারেই সাড়া দিবে না। আচার্য্য বসু মহাশয় একটি পেঁয়াজকলির মাঝামাঝি চিরিয়া, তাহার এক অর্দ্ধকে কিছুক্ষণ ধরিয়া বরফজলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ইহাতে বরফজল সিক্ত অর্দ্ধভাগটার কোষগুলি অপরার্দ্ধের কোষের তুলনায় অল্প উত্তেজনশীল হইয়া পড়িয়াছিল। এই প্রক্রিয়ার পর, আচার্য্য বসু মহাশয়

* প্রকৃত উত্তেজনা পৌছিবার পূর্ব্বে এই রসসঞ্চার দ্বারা পুরোবর্ত্তী কোষের যে পুষ্টি হয়, তাহা অবলম্বন করিয়া আচার্য্য বসু মহাশয় উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি সম্বন্ধে অনেক রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। আমরা যথাস্থলে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিব। প্রকৃত উত্তেজনায় সঙ্কুচিত হইবার পূর্ব্বে কোষগুলি পিছনের কোষের রসে পূর্ণ হইয়া যে আকস্মিক সাড়া দেয় তাহাকে বসু মহাশয় Indirect effect of stimulation বলিয়াছেন। প্রকৃত উত্তেজনায় আকুঞ্চিত হইয়া সাড়া দেওয়াই তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ সাড়া (Direct effect of stimulation)।

ঐ দুই অংশকে সূতা দিয়া বাঁধিয়া, তাহাদের উপর কোন প্রকার উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই উত্তেজনায় জোড়া পেঁয়াজকলিটি লজ্জাবতীর পত্রমূলের ন্যায় ধনুকাকারে বাঁকিয়া গিয়াছিল।

যে প্রক্রিয়ায় আচার্য্য বসু মহাশয় সমকোষসম্পন্ন উদ্ভিদকে বিষমকোষবিশিষ্ট করিয়াছিলেন, তদনুরূপ প্রক্রিয়া স্বভাবতঃই নানা উদ্ভিদের উপর চলিতেছে। সূর্য্যের তাপালোক সকল জিনিসের উপর সমান ভাবে পড়ে না, সুতরাং ইহা দ্বারা সমকোষ-সম্পন্ন উদ্ভিদের বিষম হইয়া দাঁড়ানো অসম্ভব নয়। এই অনুমান যে সত্য, আচার্য্য বসু মহাশয় নানা পরীক্ষা দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং অনেক উদ্ভিদেই তিনি লজ্জাবতী লতার ন্যায় অল্পাধিক প্রত্যক্ষ সাড়া দেখাইয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, সাধারণ বৃক্ষের পত্রে কোষবিষমতাটা খুব সুস্পষ্ট নয়, এবং লজ্জাবতী লতার ন্যায় সেটা উহাদের কোন এক নির্দ্দিষ্ট অঙ্গেও সীমাবদ্ধ থাকে না, এজন্য এই অল্প বিষমতাজাত সাধারণ পাতার উঠানামা হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ে না ; কিন্তু বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিলে পাতা মাত্রেই অল্পাধিক উঠানামা দেখা অসম্ভব নয়।

প্রাণিদেহের কোন অংশে আঘাত দিলে, তৈজস-নাড়ী (Nerve) * তদুৎপন্ন বেদনা বহন করিয়া সর্ব্বদেহে ছড়াইয়া দেয়, এবং মাংসপেশী (muscles) সেই উত্তেজনায় আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হইয়া সাড়া দেয়। আচার্য্য বসু মহাশয় কোষবিষমতাজাত উদ্ভিদের সাড়াকে অবিকল মাংসপেশীর কার্য্যের অনুরূপই দেখাইয়াছেন। সুতরাং উদ্ভিদদেহের বিষমকোষযুক্ত স্থানই যে পেশী, এবং যে সকল কোষ-পরম্পরায় উত্তেজনা প্রবাহিত হইয়া চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাই যে উদ্ভিদের তৈজসনাড়ী, এখন আর কোন ক্রমে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের ঐক্য এখানেই শেষ হয় নাই, খুঁটিনাটি অনেক বিষয়েই আচার্য্য বসু মহাশয় উভয়ের একতা দেখাইয়াছেন। প্রাণিদেহে অতিমৃদু আঘাত দিলে, তাহার সাড়া পাওয়া যায় না, কিন্তু সেই আঘাতই ঘন ঘন পড়িতে থাকিলে, আপনা হইতেই কোথা হইতে সাড়া দেখা দেয়। আচার্য্য বসু মহাশয় উদ্ভিদদেহে পুনঃ পুনঃ আঘাত দিয়া অবিকল ঐ প্রকারের সাড়া দেখিতে পাইয়াছিলেন।

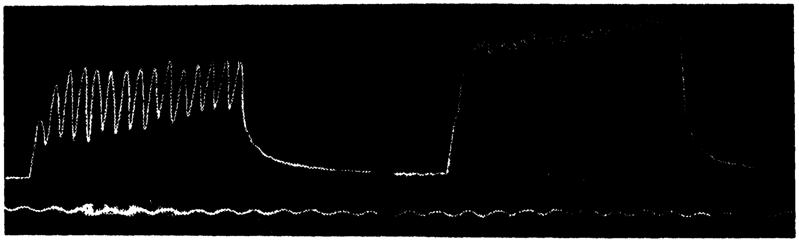
প্রাণীর পেশীতে আমরা সাধারণতঃ দুই প্রকারের সাড়া দেখিতে পাই। হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি অংশে যে পেশীগুলি (Cardiac muscles) থাকে, তাহারা মৃদু আঘাতে সাড়া দেয় না। আঘাতের মাত্রাকে ক্রমে বাড়াইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট সীমায় পৌঁছাইয়া দিলে পর তাহাদের সাড়া হঠাৎ অতি প্রবলভাবে চলিতে আরম্ভ করে। ইহাই এই শ্রেণীর মাংসপেশীর চরম সাড়া, এ অবস্থায় আঘাতের মাত্রা শতগুণ বৃদ্ধি করিলেও, এগুলিতে সাড়ার বৃদ্ধি দেখা যায় না। দ্বিতীয় প্রকারের সাড়া প্রাণীর সাধারণ মাংসপেশীতে (Skeletal muscles) দৃষ্ট হয়। ইহাদের মৃদু আঘাত দিতে আরম্ভ করিয়া, সেই আঘাতকে ক্রমে প্রবল করিতে থাকিলে, আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সাড়াও বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। আচার্য্য বসু মহাশয় ভূমি আমলা প্রভৃতি গাছের পাতায় হৃদপিণ্ডের পেশীর মত সাড়া দেখিতে পাইয়াছেন ; এবং পেশীর পূর্ব্ব বর্ণিত দ্বিতীয় প্রকারের সাড়া, অনেক গাছেই দেখাইয়াছেন।

প্রাণীর হৃৎপিণ্ড যে প্রকার তালে তালে স্পন্দিত হয়, তাহা একক প্রাণীরই বিশেষত্ব বলিয়া এপর্য্যন্ত স্থির ছিল। বনচাঁড়াল গাছের পাতায় আচার্য্য বসু মহাশয় অবিকল সেই প্রকার স্পন্দন দেখাইয়াছেন ; এবং প্রাণিহৃদয়ের ন্যায় স্পন্দনশীল স্থানই উদ্ভিদদেহে ধরা পড়িয়াছে। ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর আবিষ্কার আর কি হইতে পারে ? *

মাংসপেশীতে ঘন ঘন আঘাত দিলে, প্রত্যেক আঘাত-জাত আকুঞ্চন পৃথক পৃথক্ দেখা যায় না। প্রথম আঘাতের সাড়া দ্বিতীয়ের সাড়ার সহিত মিলিয়া গিয়া পেশীতে ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus) উৎপন্ন করে। আচার্য্য বসু মহাশয় উদ্ভিদ দেহে ঘন উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া তাহা অবিকল ধনুষ্টঙ্কারের মত দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয় চিত্রখানি পেশীর সাড়ালিপি। ঘন আঘাতে সাড়াগুলি কি প্রকারে ক্ষীণতর হইয়া একাকার ধারণ করে, এবং শেষে তাহাতে কি প্রকারে

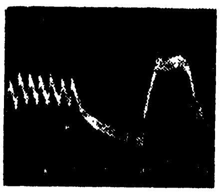
* ইংরাজী "Nerve"কে বাংলায় "স্নায়ু বলা হইয়া থাকে ; কিন্তু "স্নায়ু" ইংরাজী "muscle" এরই পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "Nerve"কে তৈজস্-নাড়ী বলিয়াছেন। আমরা এখানে সেই পরিভাষাই ব্যবহার করিলাম।

* প্রাণিহৃদয়ের স্পন্দনের সহিত বনচাঁড়াল ইত্যাদি গাছের সাড়ার একতা আমরা প্রবন্ধান্তরে দেখাইব।



২য় চিত্র

ধনুষ্টঙ্কার উৎপন্ন হয়, পাঠক চিত্রখানি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। তৃতীয় চিত্রখানি ধুতুরা ফুলের গর্ভকেশরের

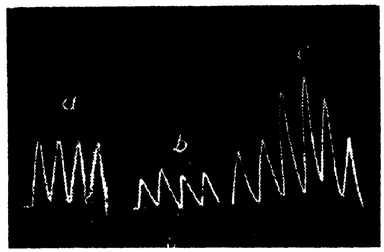


৩য় চিত্র।

(pistil) সাড়ালিপি। ইহার বামপার্শ্বস্থ অংশের সাড়াগুলি প্রায় গায়ে গায়ে আসিয়া লাগিয়াছে, এবং তারপর আঘাতের দ্রুততা আরো বৃদ্ধি করায়, চিত্রের দক্ষিণ অংশে আর পৃথক সাড়া অঙ্কিত হয় নাই; আহত অংশ ধনুষ্টঙ্কার-গ্রস্ত মাংসপেশীর ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

হৃৎপিণ্ডাদিস্থ স্পন্দনশীল পেশীর (cardiac muscles) ধনুষ্টঙ্কার হয় না। বনচাঁড়াল গাছের বিশেষ বিশেষ অংশেও বসু মহাশয় ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ দেখিতে পান নাই।

প্রাণিদেহে মদ্যপ্রয়োগ করিলে, তাহাতে প্রথমে উত্তেজনার লক্ষণ দেখা যায়, তারপর অবসাদ আসিয়া পেশীকে আক্রমণ করে। বিষ প্রয়োগে মাংসপেশী প্রথম হইতেই অসাড়তার দিকে অগ্রসর হয়, এবং পরে বিষঘ্ন কোন পদার্থ প্রয়োগ করিলে, সেটি ক্রমে বলসঞ্চয় করিতে আরম্ভ করে। আচার্য্য বসু মহাশয় উদ্ভিদে ঐ প্রকারের নানা উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া একই ফল পাইয়াছেন। আমাদের শ্বাসনির্গত বিষাক্ত বায়ু কার্ব্বনিক এসিডের (carbonic acid gas) প্রভাব চতুর্থ চিত্রটিতে অঙ্কিত রহিয়াছে। সুস্থ উদ্ভিদ দেহের উপর নিয়মিত উত্তেজনা দেওয়ায়, সেটি কিপ্রকার নিয়মিত ভাবে সাড়া দেয়



৪র্থ চিত্র।

চিত্রের "a" চিহ্নিত অংশে তাহা পাঠক স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। "b" চিহ্নিত অংশটি কারবনিক এসিডে উন্মুক্ত রাখার পরের সাড়া। এই অবস্থায় সাড়া কিপ্রকারে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে, একবার চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। কার্ব্বনিক্ এসিডে উন্মুক্ত থাকার পর, বিশুদ্ধ বায়ুতে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে থাকিলে প্রাণী মাত্রেই আবার সুস্থ হইয়া পড়ে। চিত্রের "c" চিহ্নিত অংশটি তদবস্থ উদ্ভিদের সাড়ালিপি। বিশুদ্ধ বায়ুস্পর্শে উদ্ভিদ কিপ্রকারে বলসঞ্চয় করিয়া নূতন তেজে সাড়া দিতে আরম্ভ করে, তাহা চিত্রের এই অংশ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

পঞ্চম চিত্রটিতে উদ্ভিদের উপরে মদ্য (Alcohol) প্রয়োগের ফল অঙ্কিত আছে। "a" চিহ্নিত অংশটি সুস্থ উদ্ভিদের সাড়ালিপি। তারপর মদ্যপ্রয়োগে উহার যে উত্তেজনা ও অবসাদ হয়, তাহা চিত্রের "b" ও "c" চিহ্নিত অংশদ্বয় দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন।

একই অবস্থায় প্রাণী ও উদ্ভিদের সাড়ার এই অবিকল একতা দেখিলে মনে হয়, যে প্রক্রিয়ায় ও যে প্রাকৃতিক কারণে প্রাণী সাড়া দেয়, উদ্ভিদের সাড়াও অবিকল তাহারি ফল। প্রাচীন ও আধুনিক শরীরতত্ত্ববিদ্গণ প্রাণি-রাজ্যকে



৫ম চিত্র।

বিধাতার একটা পৃথক সৃষ্টি মনে করিয়া, ইহাকে উদ্ভিদ্ হইতে পৃথক করিয়া দেখিতেন। কাজেই এই প্রকার গবেষণায় অনেক ভ্রমপ্রমাদ থাকিয়া যাইত। শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রচলিত নানা সিদ্ধান্তে, আজও সেই সকল ভ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। আচার্য্য বসু মহাশয় উদ্ভিদ্ ও প্রাণীকে একই গণ্ডীর ভিতর টানিয়া আনিয়া, উভয়ের জীবন মৃত্যু ক্ষয় বৃদ্ধি ও চলা ফেরার মূলে একমাত্র মহাসত্যের সন্ধান পাইয়াছেন। প্রচলিত সিদ্ধান্তে যে সকল শারীরিক ব্যাপারের সদ্‌ব্যাখ্যান পাওয়া যায় না, আচার্য্য বসু মহাশয় তাঁহার নূতন সিদ্ধান্তগুলি দ্বারা তাহাদের প্রত্যেকটিরও কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আঘাত উত্তেজনায় প্রাণিদেহে যে সাড়া দেখা যায়, তাহার উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আধুনিক শরীর-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন,—প্রাণিশরীরে সর্ব্বদাই একপ্রকার রাসায়নিক ভাঙাগড়ার (Assimilation and dis-similation) কাজ চলিতেছে। আঘাত দিলেই, সেই উত্তেজনায় জীবদেহের আহত অংশের বিশ্লেষণ আরম্ভ হইয়া যায়, এবং পরে এক সংগঠনশক্তি আসিয়া, ঐ ক্ষয় পূরণ করিতে থাকে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, এই ভাঙাগড়াই প্রাণীদিগের সাড়া। প্রাণীদিগের কোন অংশে ক্রমাগত আঘাত দিতে থাকিলে, আহত অংশ ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা প্রয়োগ করিলেও তাহাদের সাড়া পাওয়া যায় না। কিন্তু কিছু কালের জন্য বিশ্রাম করিবার অবকাশ দিলে, তাহারা সুস্থ হইয়া আবার ঠিক্ পূর্ব্বের ন্যায়ই সাড়া দিতে আরম্ভ করে। আচার্য্য বসু মহাশয় উদ্ভিদ দেহেও অবিকল এই প্রকার অবসাদলক্ষণ দেখাইয়াছেন। প্রাণীর অবসাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—প্রত্যেক আঘাতে প্রাণিদেহের যে ক্ষয়, তাহা সম্পূর্ণ সংগঠিত হইবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় আঘাত আসিয়া নূতন ক্ষয় আরম্ভ করাইয়া দেয়। কাজেই স্বাভাবিক সংগঠনশক্তি ক্ষয়ের পূরণ করিতে পারে না। শরীর-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই ক্ষয়াধিক্যই অবসাদের কারণ। এই প্রসঙ্গে ইহাঁরা আরো বলেন,—ঘন উত্তেজনায় প্রাণিশরীরে না কি একপ্রকার অবসাদক-পদার্থ (Fatigue Stuffs) উৎপন্ন হয়। এই জিনিসটা স্বাস্থ্যের অত্যন্ত হানিকর। প্রাণীকে বিশ্রামের অবকাশ দিলে, রক্তপ্রবাহ দ্বারা উহা নষ্ট হইয়া যায়, এবং তখন প্রাণী আবার নূতন ভাবে সাড়া দিতে আরম্ভ করে।

অবসাদ উৎপত্তির উপরোক্ত রাসায়নিক ব্যাখ্যানগুলি যে কত অকিঞ্চিৎকর, আচার্য্য বসু মহাশয় দুইটি পরীক্ষাসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। রক্ত-লেশশূন্য-মাংসপেশী লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সেটি রক্তময় পেশীর ন্যায়ই সাড়া দেয়, ও ঘন আঘাতে অবশ হইয়া পড়ে, এবং তার পর বিশ্রামের অবকাশ দিলে নূতন সাড়া আরম্ভ করে। সুতরাং রক্তই যে, অবসাদক পদার্থকে নষ্ট করিয়া জীবদেহে নূতন বলের সঞ্চার করে, এ কথা এখন আর বিশ্বাস করা চলে না।

মাংসপেশী বিশেষে (Cardiac muscles) নিয়মিত আঘাত দিলে সোপানাবলীর (Staircase effects) মত একপ্রকার সাড়া পাওয়া যায়, অর্থাৎ ইহাতে প্রত্যেক আঘাতের সাড়া, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আঘাতজাত সাড়া অপেক্ষা ক্রমেই প্রবলতর হইতে আরম্ভ করে। পার্শ্বস্থ ৬ষ্ঠ ও ৭ম চিত্রদ্বয় ঐ প্রকার সাড়ার ছবি। মাংসপেশীতে নিয়মিত আঘাত দেওয়ায় সাড়ার মাত্রা ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ৬ষ্ঠ চিত্রটিকে দেখিলেই বুঝা যাইবে। ৭ম চিত্রটি তদবস্থ উদ্ভিদের সাড়া। পূর্ব্ববর্ণিত রাসায়নিক সিদ্ধান্ত দ্বারা এই সাড়ার কারণ



৬ষ্ঠ চিত্র।

অনুসন্ধান করিতে গেলে, ব্যাপারটির কোনই সদ্‌ব্যাখ্যান পাওয়া যায় না, এবং তাহার অনেক গলদই বাহির হইয়া পড়ে। কারণ ঐ সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয় যে, যে



৭ম চিত্র।

সকল উত্তেজনায় প্রথমে প্রাণিদেহকে ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহাই পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হওয়ায় ক্ষয়ের পূরণ করে। এই প্রত্যক্ষ বিসদৃশ ব্যাপারের উপর কখনই বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

এখন এসম্বন্ধে আচার্য্য বসু মহাশয় কি বলেন দেখা যাউক। ইহাঁর মতে, আঘাত উত্তেজনার সাড়া দেওয়া একটা সম্পূর্ণ আণবিক ব্যাপার। আঘাত দ্বারা পদার্থস্থ অণুর বিকৃতি, ও আঘাত রহিত করার পর তাহাদের পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্তি, সাড়ামাত্রেরই মূল কারণ। যে কোন আকারে যে কোন পদার্থের উপর আঘাত দিলেই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার আণবিক বিকৃতি উপস্থিত হয়, কাজেই আমরা প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়েই একপ্রকারের সাড়া দেখিতে পাই। আচার্য্য বসু মহাশয় নির্জ্জীব বস্তুকেও ছাড়েন নাই। আঘাত উত্তেজনা দিয়া তিনি ইহাদের নিকট হইতেও প্রাণী ও উদ্ভিদের ন্যায় সাড়া পাইয়াছেন; এবং ঘন উত্তেজনায় নির্জ্জীব পদার্থও যে অবসাদগ্রস্ত হয় ও বিশ্রামে বলসঞ্চয় করে, তাহাও তিনি নানা পরীক্ষায় দেখাইয়াছেন।

অবসাদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আচার্য্য বসু মহাশয় বলেন,—আঘাত দিলেই, তাহার মাত্রা অনুসারে পদার্থের আহত অংশের অণুগুলি অল্পাধিক উলট্ পালট্ হইয়া যায়। কিন্তু অণুসকল এই বিকৃত অবস্থায় থাকিতে চায় না—পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবার জন্য সকলেরই চেষ্টা আসিয়া পড়ে। কাজেই ঐ চেষ্টার দ্বারা অণুসকল আবার পূর্ব্বের ন্যায় সজ্জিত হইয়া আহত অংশকে সুস্থ করিয়া তোলে কিন্তু প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য সময় না দিয়া পদার্থের কোন অংশে ক্রমাগত আঘাত দিতে থাকিলে ঐচেষ্টা বিফল হইয়া পড়ে। তখন বিকৃতির মাত্রা এত উপরে উঠে যে, প্রবলতর আঘাত প্রয়োগ করিলেও, অণুগুলি আর নূতন ভাবে বিকৃত হইবার পথ পায় না, কাজেই তখন আমরা পদার্থটিতে সাড়া দেখিতে পাই না। আচার্য্য বসু মহাশয়ের মতে, ইহাই সজীব নির্জ্জীবের অবসাদ।

আচার্য্য বসু মহাশয় এক আণবিক বিকৃতির উপরই নির্ভর করিয়া সজীব নির্জ্জীব সকল পদার্থের সকল প্রকার সাড়ারই সদ্‌ব্যাখ্যান প্রদান করিয়াছেন। জড়ের উপর কোন শক্তি প্রয়োগ করিলে সেটি যে চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহা প্রাচীন আধুনিক ছোট বড় কোন বৈজ্ঞানিকেরই অপরিজ্ঞাত ছিল না। আচার্য বসু মহাশয় জড় ও শক্তি সম্বন্ধীয় এই সুপরিচিত সত্যটির সাহায্যে, সজীব নির্জ্জীব প্রাণী উদ্ভিদ প্রভৃতির মূলগত রহস্য আবিষ্কার করিয়া আধুনিক জড়বিদ্যাকে প্রকৃতই এক নূতন মূর্ত্তি দিবার উপক্রম করিয়াছেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় উদ্ভিদাবলী।

২২। তন্দ্রা (Rhamnus purpureus. Natural Order Rhamnae.)।

এই গাছ মরী হইতে কুমাউঁ পর্য্যন্ত হিমালয় পর্ব্বতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে পাঞ্জাবী ভাষায় তন্দ্রা ও তুন্ধী বলে।

হাজারা প্রদেশে এই গাছের ফল রেচক বলিয়া ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

এই গাছের কাঠও অনেক কাজে আসে।

২৩। গুগু (Æsculus indica. Natural Order Sapindaceae.)।

এই গাছও হিমালয় পর্ব্বতে জন্মায়। কাশ্মীর প্রদেশে ইহাকে হানে, ও হনুদুন বলে। হিন্দীতে পাঙ্কর, কনোর, ও গুগু বলে।

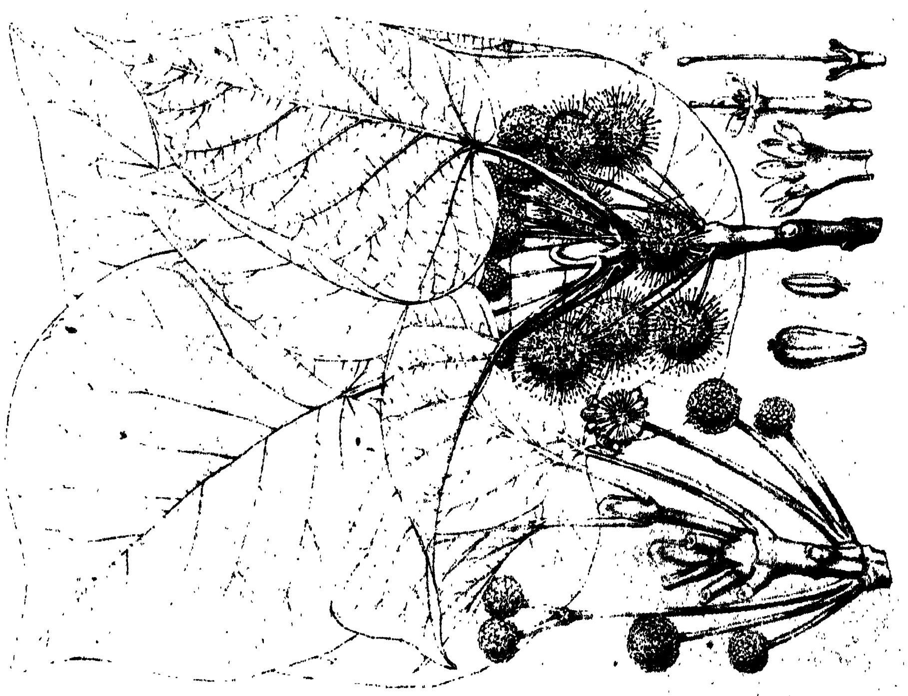
ইহার ফল হিমালয় প্রদেশে মানুষে ও গরুতে আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করে।



২২। তল্লা (Rhamnus purpureus. Natural Order Rhamne.)।



২১। ঙঙ (Æsculus indica. Natural Order Sapindaceae.)।



২৪। কেলিকদম্ব (Adina Cordifolia ; Natural Order, Rubiaceae.)।



২৫। কঙ্গু (Fraxinus floribunda. Natural Order, Oleaceae.)।

ইহার পাতাও গরু ছাগল প্রভৃতি ভক্ষণ করে।

ইহার ফল হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় তাহা বাতে লাগাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ঘোড়ার পেটের শূল বেদনায় ইহার ফল বড় উপকারী।

এই গাছের কাঠ গৃহ নির্ম্মাণ ও অন্যান্য নানাবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

২৪। কেলিকদম (Adina Cordifolia; Natural Order, Rubiaceae.)।

এই গাছ ভারতের অনেক স্থানে জন্মায়। ইহাকে বঙ্গভাষায় কেলিকদম ও হিন্দীতে হল্ দু ও কদামী বলে।

ইহার মূল আসাম প্রদেশে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

সাঁওতালেরা ইহার ফুলের কলি গোলমরিচের সহিত চূর্ণ করিয়া নস্য রূপে ব্যবহার করে। তাহাতে মাথা ব্যথা ভাল হয়।

ইহার কাঠ গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। তদ্ভিন্ন ইহা হইতে অনেক রকম আসবাব প্রস্তুত হয়।

২৫। কঙ্গু (Fraxinus floribunda, Natural Order, Oleaceae.)।

এই বৃক্ষ হিমালয় পর্ব্বতে জন্মায়। নেপালে ইহা কঙ্গু বলিয়া বিদিত।

এই গাছ হইতে ম্যানা (manna) পাওয়া যায়। তাহা রেচক বলিয়া ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

ইহার কাঠ বড় উপকারী। তাহা হইতে দাঁড়, ঝাম্পানের ডাণ্ডা, লাঙ্গল, বারকোশ, চরকা, প্রভৃতি নানাবিধ জিনিস প্রস্তুত হয়। [ক্রমশঃ]।

বৈদিক সভ্যতা

২। পশুপালন।

কৃষিবিদ্যা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে পশুই মানবের প্রধান সম্পত্তি ছিল এবং বৈদিক যুগেও আর্য্যগণকে অনেক বিষয়ে পশুর উপর নির্ভর করিতে হইত। ঋগ্বেদে ১০২৮টী সূক্ত আছে কিন্তু ১১০০ অপেক্ষাও অধিক স্থলে গো ও ধেনু শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। কোন স্থলে গোধন লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে, কোন স্থলে ঋষিগণ গাভীর স্তুতি করিতেছেন এবং কোন স্থলে বা উপমার জন্য গাভী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দুই একটী স্থল নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

হে ইন্দ্র! আমার মন যবাভিলাষী, গবাভিলাষী, হিরণ্যাভিলাষী ও অশ্বাভিলাষী হইয়া তোমার দিকেই গমন করিতেছে। ৮।৭৮

সেই বৃহস্পতি আমাদিগকে গাভী, ঘোটক, বীর মানবসহ আয়ু প্রদান করুন। ১০।১৬,১২।

হে ইন্দ্র। আমি যদি তোমার ন্যায় সর্ব্বধনের অধিপতি হইতাম— আমার স্তোতৃগণ গো-সখা হইত। হে শচীপতি। আমি যদি গোপতি হইতাম— তাহা হইলে এই স্তোতাকে সাহায্য করিতাম ও দান করিতে ইচ্ছা করিতাম। ৮।১৪।১,২।

হে স্তুতিভক্ত ইন্দ্র! কবে তোমার স্তোতা সুখী হইবে? কবে তোমার স্তোতাকে গোযুথ, অশ্বযুথ ও বস্ত্র প্রদান করিবে? ৮।১৩।২২।

নিম্নলিখিত সূক্তে ঋষি গাভীর স্তুতি করিতেছেন।

গোসমূহ আগমন করুক ও আমাদের কল্যাণ সাধন করুক। গোষ্ঠে উপবেশন করুক ও আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউক। বিচিত্র-বর্ণা গাভীসমূহ যেন প্রজাবতী হইয়া চিরদিন উষাকালে ইন্দ্রের জন্য দুগ্ধ প্রদান করে। তাহারা যেন বিনাশ প্রাপ্ত না হয়। তস্কর যেন তাহাদিগকে অপহরণ না করে; শত্রুদিগের অস্ত্র যেন তাহাদিগকে ধর্ষণ না করে। যে সমুদয় গাভী দ্বারা যজন করা হয়, যাহা ইন্দ্রকে প্রদান করা হয়, গোপতি যেন সেই সমুদয় গাভীর সহিত চিরকাল একত্র বাস করিতে পারে। রেণু উদ্ভেদক অশ্বসমূহ যেন এই গাভীসমূহের নিকট উপস্থিত না হয় (অর্থাৎ অশ্বারোহী যোদ্ধা যেন ইহাদিগকে লইয়া না যায়)। পশুবধশালায় ইহাদিগকে যেন যাইতে না হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানকারী মনুষ্যগণের সেই গাভীসমূহ নির্ভয়ে যেন বহুদূর পর্য্যন্ত বিচরণ করিতে পারে। আমার নিকট গোসমূহই ভগ (ভগ, দেবতা অথবা ধন)। আমার নিকট গোসমূহই ইন্দ্র। গোসমূহই শ্রেষ্ঠ সোমরস। হে জনসমূহ এমন যে গোসমূহ, ইহারাই ইন্দ্র। আমি হৃদয়মনের সহিত এই ইন্দ্রকে কামনা করি। হে গোসমূহ! তোমরা কৃশ ব্যক্তির পুষ্টি সাধন কর শ্রীহীন ব্যক্তিকে শ্রীসম্পন্ন কর। হে কল্যাণকর ধ্বনিযুক্ত ধেনুগণ। আমাদিগের গৃহকে কল্যাণযুক্ত কর। সভাতে তোমাদের মহতী ক্ষমতা কীর্ত্তিত হয়। তোমরা প্রজাবতী হও; সুন্দর তৃণ ভক্ষণ কর, সুন্দর জলাশয়ে বিশুদ্ধ জল পান কর। তস্কর কিম্বা পাপাত্মাগণ যেন তোমাদের অধিপতি না হয়; রুদ্রের অস্ত্র যেন তোমাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকে। ৬।২৮।

ঋষিগণ গাভীকে কি প্রকার সম্মান করিতেন তাহা এই সূক্ত হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

আজকাল নিম্নশ্রেণীর লোকই পশুপালন করিয়া থাকে; কিন্তু বৈদিকযুগে ঋষিগণকেও এই কার্য্য করিতে হইত। তখন কেহই এ কার্য্যকে অপমানসূচক বলিয়া মনে করিতেন না। যাহাকে সম্মান করা হয়, দেবতার মত পূজা করা যায়, যাহার উদ্দেশে সূক্ত রচনা করা হয় —তাহার সেবা শুশ্রূষা করা কি কখন অপমানসূচক হইতে পারে? ঋষিগণ বহুস্থলে দেবতাকে গোপ, গোপতি, অশ্বপতি,

পশুপালক বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ঋষিগণের দেবতা যদি পশুপালন করিতে পারেন—ঋষিগণ সে কার্য্য করিতে পারিবেন না কেন ? আর এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণও রহিয়াছে।

কক্ষীবানগণ এবং পজ্রবংশীয়গণ সুবর্ণ আভরণ বিশিষ্ট অশ্বগণকে মার্জ্জনা করিতে লাগিল। ১।১২৬।৪।

সায়ণের মতে উক্ত অংশের এই প্রকার অর্থও হইতে পারে—

কক্ষীবানগণ ঘাসাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক সুবর্ণ আভরণ বিশিষ্ট অশ্বগণকে মার্জ্জনা করিতে লাগিল।

কক্ষীবানগণ ঋষিবংশীয়। কক্ষীবান স্বয়ং একজন মন্ত্র-কর্ত্তা।

বুধ নামক ঋষি বলিতেছেন—

হে সখাগণ! অশ্বগণকে প্রীত কর……গোষ্ঠ প্রস্তুত কর। ১০।১০১।

দশম মণ্ডলে গোচারণ সংক্রান্ত একটী সূক্ত আছে। তাহার অংশ বিশেষ নিম্নে অনুবাদিত হইল।

"হে গাভীগণ। তোমরা ফিরিয়া আইস; কাহারও অনুগমন করিও না।"

তৎপর ঋষি আপনাকে বলিতেছেন :—

"পুনর্ব্বার ইহাদিগকে লইয়া চল। পুনর্ব্বার ইহাদিগকে সন্নিহিতকর।

"ইন্দ্র ইহাদিগকে লইয়া আসুন। অগ্নি ইহাদিগকে আমাদিগের সমীপে চালাইয়া আসুন। ইহারা গৃহে ফিরিয়া চলুক। এই গোপতির নিকটে থাকিয়া পরিপুষ্ট হউক। হে অগ্নি। এই স্থলেই ইহাদিগকে রাখ; এই যে ধন ইহা এই স্থানেই অবস্থিতি করুক।

"নিদান, ন্যয়ন, সঞ্জান, পরায়ন, আবর্ত্তন ও নিবর্ত্তন অর্থাৎ গোচারণ সংক্রান্ত বিবিধ জ্ঞান আমি প্রার্থনা করি। যিনি গো পালন করেন তাহাকেও আহ্বান করি।" ১০।১৯।

এই মন্ত্রে প্রমাণিত হইতেছে যে ঋষি স্বয়ং গোচারণ করিতেছেন এবং গোচারণ সংক্রান্ত বিবিধ জ্ঞানের জন্যও প্রার্থনা করিতেছেন।

উত্তরকালেও যে ঋষিগণ গোচারণ করিতেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

"সত্যকামের উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গুরু গোতম ৪০০ কৃশ ও দুর্ব্বল গো আনয়ন পূর্ব্বক বলিলেন 'সৌম্য! এই গো সমূহের অনুগমন কর।' গো লইয়া অরণ্যাভিমুখে যাইবার সময় সত্যকাম বলিলেন 'যে পর্য্যন্ত এই গো সমূহের সংখ্যা এক সহস্র না হয়—সে পর্য্যন্ত আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিব না'। তদনন্তর সহস্র সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত সত্যকাম প্রবাসে ছিলেন।" ছান্দোগ্যঃ ৪।৪।৫।

এই সত্যকাম উপনিষদের একজন খ্যাতনামা ঋষি।

উপমন্যু বিষয়ে মহাভারতে এইরূপ বর্ণিত আছে :—

আয়োদধৌম্য নামক এক ঋষি ছিলেন। উপমন্যু নামক তাঁহার এক শিষ্য ছিল। তিনি বলিলেন বৎস উপমন্যু। গো রক্ষা কর (গা রক্ষস্ব)। উপাধ্যায়বচন শ্রবণ করিয়া উপমন্যু গো রক্ষা করিতে লাগিলেন (অরক্ষৎ গাঃ)। তিনি দিবাভাগে গোচারণ করিয়া দিবাবসানে গুরুগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। আদি ৩।৩৩-৩৫।

ইঁহারাই যখন স্বয়ং গোচারণাদি করিতেন তখন সাধারণ লোকে যে এ সমুদয় কার্য্য করিত, তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না।

৩। চিকিৎসা।

ঋগ্বেদের সময় চিকিৎসাবিদ্যাও প্রচলিত ছিল। একটী সূক্ত হইতে এই বিষয়ক কয়েকটী ঋক উদ্ধার করা যাইতেছে।

হে মাতৃগণ (ওষধিগণ)! শত তোমাদিগের ধাম, এবং সহস্র তোমাদিগের উৎপত্তিস্থান। হে শতগুণসম্পন্ন ওষধি! তোমরা আমার রোগীকে রোগবিহীন কর।

হে পুষ্পবতী ও ফলবতী ওষধিগণ! রোগীর প্রতি সন্তুষ্ট হও। হে বিরুধ! তোমরা অশ্বের ন্যায় সিদ্ধিদায়িনী। তোমরা রোগীকে রক্ষা কর।

হে ওষধিগণ। অশ্বত্থবৃক্ষ তোমাদিগের সদন, পলাশ বৃক্ষে তোমাদিগের বসতি। তোমরা যদি এই পুরুষের কল্যাণ কর, আমি রোগীর নিকট হইতে গো লাভ করিব।

রাজা যেমন সমিতিতে উপস্থিত হন, তেমনি ওষধি যাঁহার নিকট উপস্থিত হন—সেই বিপ্রকে ভিষক্ বলে (বিপ্রঃ সঃ উচ্যতে ভিষক্)। তিনি রক্ষণ হনন ও ব্যাধি বিদূরিত করেন।

এই ব্যক্তির রোগ বিনাশ করিবার জন্য অশ্ববতী, সোমবতী, উর্জ্জয়ন্তী ও উদোজস্ নামক ওষধি সংগ্রহ করিয়াছি। তোমার মাতার নাম ইস্কৃতি (উদ্ধারকারিণী)। তোমরাও ইস্কৃতি স্বরূপ। তোমরা দ্রুতগামী পক্ষীর ন্যায়। যাহা শরীরকে রুগ্ন করে তাহা বিদূরিত কর।

রোগীর বল বিধান করিবার জন্য আমি ওষধি হস্তে ধারণ করিলাম। হিংস্র প্রাণী যেমন বিনষ্ট হয় তেমনি রোগের প্রাণ এখনই বিনষ্ট হউক।

হে ওষধি! তুমি যাহার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ও গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে প্রবেশ কর তাহার দেহ হইতে সমুদয় ব্যাধি বিদূরিত হয়।

যে তোমাকে খনন করিতেছে তাহার (অর্থাৎ আমার) যেন অনিষ্ট না হয় আর যাহার জন্য তোমাকে খনন করিতেছি তাহারও অনিষ্ট না হয়।

ওষধিগণ রাজা সোমের সহিত কথোপকথন করিয়া বলিয়াছে,"স্তোতা যাহার চিকিৎসা করিয়াছে হে রাজন্ আমরা তাহাকে রক্ষা করি"। ১০।৯৭

যাঁহারা মন্ত্র রচনা করিতেন তাঁহারা যে চিকিৎসা ব্যবসায়ীও ছিলেন এখানে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। একস্থলে বলা হইয়াছে—"সেই বিপ্রই ভিষক্।"

বৈদিক ঋষিগণ সম্ভবতঃ অস্ত্র বিদ্যাতে পারদর্শী ছিলেন।

"হে অশ্বিদ্বয়! যুদ্ধক্ষেত্রে খেল রাজার পত্নী বিস্পলার চরণ পক্ষীর ন্যায় ছিন্ন হইয়াছিল। তিনি যাহাতে যুদ্ধে গমন করিতে পারেন এই

জন্য তোমরা রজনীযোগে তাঁহাকে সদ্যই লৌহজঙ্ঘা অর্পণ করিয়াছিলে। ১।১১৬।১৫

পদ ছিন্ন হইবার পর বিস্পলা যে লৌহজঙ্ঘা ব্যবহার করিতেন তাহার প্রমাণ আরও অনেক স্থলে পাওয়া যায়। ১।১১৮।৮ ; ১।১১২।১০ ইত্যাদি।

৪। রথাদি নির্ম্মাণ

ঋগ্বেদে পরশু, বাইস ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ আছে।

ত্বষ্টা যেমন বনের বৃক্ষ ছেদন করিয়া নিপাতিত করে তেমনি হে ইন্দ্র! তুমি ওজ সামর্থ্য ও মহত্বসম্পন্ন হইয়া যেন পরশু দ্বারাই শত্রু ছেদন কর। ১।১৩০।৪।

বৈদিক যুগে অশিক্ষিত লোকেই যে সূত্রধরের কার্য্য করিত তাহা নহে।

কর্ম্মকুশল ও ধীর ব্যক্তি যেমন রথ রচনা করে তেমনি ধনাভিলাষী মনুষ্য তোমার স্তুতি রচনা করিয়াছে। ১।১৩০।৬।

বামদেব ঋষি বলিতেছেন ঃ—

ভৃগুগণ যেমন রথ নির্ম্মাণ করে সেইরূপ আমি ইন্দ্রের স্তোত্র রচনা করিতেছি। ৪।১৬।২০।

রমণী ঋষি ঘোষা বলিয়াছেন ঃ—

হে অশ্বিদ্বয়। ভৃগুসন্তানগণ যেমন রথ রচনা করে, আমি তেমনি এই স্তোত্র গঠন করিতেছি। ১০।৩৯।১৪।

ভৃগুসন্তানগণ ঋগ্বেদের বিখ্যাত ঋষি। দেখা যাইতেছে ইঁহারাও সূত্রধরের কার্য্য করিতেন। বশিষ্ঠ ঋষি নৌকায় আরোহণ করিয়া সমুদ্রে গমন করিয়াছিলেন (৭। ৮৮। ৩); ভুজ্যু নামক একজন রাজপুত্র শতদাঁড়যুক্ত নৌকায় (শতারিত্রম্নাবম) আরোহণ করিয়া নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন (১। ১১৬। ৫); ইহা ভিন্ন আরও অনেক স্থলে "নৌ" এবং 'প্লব' শব্দের উল্লেখ আছে। নৌকার ব্যবহার যখন ছিল তখন নৌকা প্রস্তুতও হইত। একস্থলে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

আনন্দদায়ক স্তোত্র রচনা করিয়া উচ্চারণ কর। অরিত্র সহযোগে পার হওয়া যায় এমন নৌকা প্রস্তুত কর। আয়ুধ সমুদয় প্রস্তুত ও অলঙ্কৃত কর। হে সখাগণ! পূর্ব্বে যজ্ঞ সম্পাদন কর। ১০।১০১।২।

এখানে দেখা যাইতেছে যাঁহারা মন্ত্র রচনা বা যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন তাঁহারা নৌকাও প্রস্তুত করিতেন।

৫। বস্ত্রবয়ন

"বে" ধাতুর অর্থ "বয়ন"। ঋগ্বেদে অনেক স্থলে মন্ত্র বয়নের কথা আছে (১।৬১।৪ ইত্যাদি)। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে বৈদিক আর্য্যগণ বস্ত্রবয়ন করিতে পারিতেন। যজ্ঞকে বয়ন করা হয় এরূপ ভাষাও ব্যবহৃত হইয়াছে।

চারিদিকে সূত্র প্রসারিত করিয়া যে যজ্ঞ বিস্তৃত করা হইয়াছে পিতৃপুরুষগণ এই স্থলে আগমন করিয়া তাহা বয়ন করেন। ইঁহারা তন্তর দিকে ('টানা'র দিকে) উপবেশন করিয়া বলেন "সম্মুখের দিকে বয়ন কর, পশ্চাতের দিকে বয়ন কর"! ১০। ১৩০। ১-

দ্বিতীয় ঋকে সামসমূহকে "তসর" অর্থাৎ পড়েনের সূতারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। মনিয়ার উইলিয়মস্ সাহেবের মতে "তসর" অর্থ Shuttle, অর্থাৎ মাকু। Griffiths সাহেবও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

মন্ত্র রচনার সময় একজন ঋষি বলিতেছেন—

আমি তন্তু (টানা)ও জানি না—আমি ওতু (পড়েন)ও জানি না কিন্তু বৈশ্বানর তন্তুও জানেন এবং ওতুও জানেন। ৬।৯।১,২।

দুই একস্থলে বস্ত্রবয়নের কথাও পাওয়া যায় ৭। ৩৩। ৯ ইত্যাদি। একস্থলে "বয্যা ইব" ২। ৩। ৬ এইকথা ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ "বয়ন কুশল রমণীদ্বয়ের ন্যায়"। সুতরাং বুঝা যাইতেছে দুইজন নারী একত্রিত হইয়া বস্ত্রবয়ন করিত। অপর একস্থলে বস্ত্রবয়নকারিণী স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে—বিততং বয়ন্তীঃ ২। ৩৮। ৪ বর্ত্তমান যুগে অনেক স্ত্রীলোক 'চরকা'য় সুতা কাটিয়া থাকে। বৈদিক যুগে ইহারা বস্ত্র বয়নও করিত।

৬। সীবনকার্য্য

ঋগ্বেদে সূচী ও 'বেশী' শব্দের উল্লেখ আছে। 'বেশী' অর্থও সূচী।

ইন্দ্র দুর্ব্বল দ্বারা এক কার্য্য করাইয়াছিলেন। ছাগ দ্বারা প্রবল সিংহকে হত করিয়াছিলেন; সূচী দ্বারা (বেশ্যা) যূপাদি কাষ্ঠের কোণ কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। ৭।১৮।১৭।

সীব্যতু অপঃসূচ্যা ২। ৩২। ৪— সূচী দ্বারা কর্ম্ম সীবন করুন। 'কর্ম্ম সীবন' করা অর্থ 'কর্ম্ম সম্পন্নকরা'। দরজীর কাজ জানা না থাকিলে এরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইত না।

৭। ক্ষৌর কার্য্য।

ঋগ্বেদে নাপিত ও ক্ষুরাদি শব্দের উল্লেখ আছে।

হস্তস্থিত ক্ষুরের ন্যায় (ভুরিজঃ ইব ক্ষুরম্) আমাদিগকে তীক্ষ্ণ কর। ৮।৪।১৬

হে অগ্নি! বায়ু যখন প্রবাহিত হইয়া তোমার দীপ্তি বর্দ্ধিত করে তখন তুমি ভূমি মুণ্ডন করিয়া থাক—নাপিত যেমন শ্মশ্রু মুণ্ডন করে (বপ্তা ইব শ্মশ্রু)। ১০।১১২।৪।

সুতরাং বৈদিক আর্য্যগণ ক্ষৌরকার্য্যের আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন।

৮ বৈদিক কর্ম্মকার।

এযুগে লৌহের ব্যবহারও অপরিজ্ঞাত ছিল না। কুলিশ, বাস (বাইস), অসি, ক্ষুর, স্বধিতি, সৃণ, দাত্র, খনিত্র ইত্যাদি বহুবিধ লৌহময় অস্ত্রের উল্লেখ আছে। যাহারা এই সমুদয় প্রস্তুত করিত তাহাদিগকে কর্ম্মার এবং কার্ম্মার নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহারা ভস্ত্রা কিম্বা তদনুরূপ কোন প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিয়া যে অগ্নির উত্তাপ বর্দ্ধিত করিত তাহারও প্রমাণ আছে। একস্থলে আছে 'ব্রহ্মণস্পতি এতা সম্ কর্ম্মারঃ ইব অধমৎ'—১০। ৭২। ২- কর্ম্মকার যেমন 'ধমন' কার্য্য করে তেমনি ব্রহ্মণস্পতি এই সমদয় সৃষ্টি করিয়াছেন। ভস্ত্রাদি চালনা করিয়া ধাতু দ্রব করার নাম ধমনকার্য্য।

৯। বৈদিক স্বর্ণকার

ঋগ্বেদে বহুবিধ অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। এই সময়ে হস্তে বলয় (৫। ৫৮। ২ ইত্যাদি), বক্ষে স্বর্ণ হার (৫। ৫৪। ১১ ইত্যাদি), পদে ও অন্যান্য অঙ্গেও নানাপ্রকার অলঙ্কার (৮। ২০। ৬ ইত্যাদি) ব্যবহার করা হইত।

একস্থলে এইরূপ উপমা দেওয়া হইয়াছে:—

দ্রবিঃ ন দ্রাবয়তি-স্বর্ণকার যেমন ধাতু দ্রব করে। ৬।৩।৪।

সুতরাং দেখা যাইতেছে আর্য্যগণ ধাতু দ্রব করিয়া অলঙ্কারাদি গঠন করিতেন।

১০। বৈদিক কুম্ভকার।

এই যুগে মৃণ্ময়পাত্র বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত।

অপক্ক কুম্ভের ন্যায় (নব ইৎ ন কুম্ভম) ইন্দ্র পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ১০।৮৯।৭

এখানে কাঁচা মাটীর কুম্ভের কথাই বলা হইতেছে।

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সুরা দ্বারা শতকুম্ভ পূর্ণ করিয়াছিলে। ১।১১৬।৭

রমণীগণ যেমন কুম্ভে জল লইয়া যায়, তেমনি একবিংশতি সংখ্যক ময়ূরী ও সপ্ত নদী বিষ অপহরণ করিয়া লইয়া যাউক। ১।১৯১।১৪

আমরা যেন তোমার নিকট হইতে দশটী হিরণ্যপূর্ণ কলস লাভ করিতে পারি। ৪।৩২।১৯

এ সমুদয় কুম্ভ সম্ভবতঃ মৃণ্ময়। মৃণ্ময় হইলে অবশ্যই কাঁচা মাটীর নহে—কারণ কাঁচা মাটীর কলশে সুরা, জল কিম্বা সুবর্ণাদি রাখা যাইতে পারে না।

১১। বৈদিক চর্ম্মকার।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা সহজে চর্ম্মময় পাত্র ব্যবহার করিতে চাহি না কিন্তু বৈদিক যুগে দধি, সুরা জলাদি রাখিবার জন্য দৃতি অর্থাৎ চর্ম্মময় মশক ব্যবহৃত হইত।

হে পূষা। অচ্ছিদ্র দধিপূর্ণ দৃতির ন্যায় ত্বদীয় সন্ধতা যেন সর্ব্বদা অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকে। ৬।৪৮।১৮

হে অশ্বিদ্বয়! মধুপূর্ণ চর্ম্মপাত্র মধ্যস্থলে স্থাপিত হইয়াছে; তাহা হইতে তোমরা মধুপান কর। ৮।৫।১৯

হে অশ্বিদ্বয় তোমরা মধুপূর্ণ দৃতি বহন করিয়া আন। ৪।৪৫।৩

মেঘ হইতে বৃষ্টিধারা মোচন কর এবং (জলপূর্ণ) চর্ম্ম যেমন ভূমি আর্দ্র করে, তেমনি তোমরা জল দ্বারা ভূমিকে সিক্ত কর। ১।৮৫।৫

সোম রসাদি প্রস্তুত করিবার জন্য গো চর্ম্ম ব্যবহৃত হইত।

এই সোম গো চর্ম্মের উপর (অধি ত্বচি গবাম্) প্রস্তরের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। ৯।৬৬।২৯

সোম সুগঠিত আধারে উপবেশন করিতেছেন। গো চর্ম্ম (গব্যয়ীত্বক) ও মেষচর্ম্ম (অব্যয়ী) ইহাকে শোধন করিতেছে। ৯।৭০।৭

হরিৎবর্ণ মনোহর সোম জমদগ্নি কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া গো চর্ম্মের উপরে (গোঃ অধি ত্বচি) ক্ষরিত হইতেছে। ৯।৬৫।২৫

অধিক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা অনাবশ্যক। এই যে গো-চর্ম্মের কথা বলা হইল ইহা অবশ্যই কাঁচা চামড়া নহে। কাঁচা চামড়া কি প্রকারে ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে হয় আর্য্যগণ তাহা নিশ্চয়ই জানিতেন।

এ সময়ে চর্ম্মরজ্জু ও (বরত্রা) ব্যবহৃত হইত (১০।৬০।৪, ৪।৫৭।৪ ইত্যাদি)। যোদ্ধৃগণ যুদ্ধের সময় বর্ম্ম পরিধান করিতেন। একস্থলে ঋষি সখাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "বহুল স্থূল বর্ম্ম সীবন কর"।

সুতরাং দেখা যাইতেছে বৈদিক সমাজের লোক চামড়ার কাজও করিত।

১২। জাতিভেদ।

এখন প্রশ্ন বৈদিক যুগে জাতিভেদ ছিল কি না? ইহার আংশিক উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে ভারতবর্ষে কেবলমাত্র দুইটী জাতি ছিল। শ্বেতকায়গণ আর্য্যনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অনার্য্য জাতিকে দাস, দস্যু এবং শূদ্র নাম দেওয়া হইয়াছিল। উভয় জাতির মধ্যে বহুকাল সংগ্রাম চলিয়াছিল; সুতরাং আর্য্য সমাজের সমুদয় কার্য্য আর্য্যগণকেই করিতে হইত; ইহারা অনার্য্য জাতির নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য লাভ করেন

নাই। বৈদিক আর্য্যগণ কোন কার্য্যকেই হীন বলিয়া মনে করিতেন না। বর্ত্তমান যুগে তুমি পাচক ব্রাহ্মণ; সূত্রধরের অন্ন জল তুমি গ্রহণ করিলে তোমাকে পতিত হইতে হইবে। "তুমি কাঠের কাজ কর সুতরাং আমি তোমার হাতে খাইব না"—এ কি প্রকার যুক্তি আমরা বুঝি না। কাঠের কাজের মধ্যে এমন কি আছে যে ইহা ঘৃণিত হইতে পারে? আমরা ইহার মধ্যে ঘৃণার্হ কিছু দেখিতেছি না এবং ঋগ্বেদের ঋষিগণও দেখেন নাই। ভৃগুসন্তানগণ ঋগ্বেদের বিখ্যাত ঋষি, ইঁহারা অনেক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। আবার ইঁহারা যে সূত্রধরের কার্য্যও করিতেন—তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সমাজ বিস্তীর্ণ হইলেই কার্য্যবিভাগ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে; বৈদিক সমাজেও কার্য্য বিভাগ হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্য বিভাগ হইলেই যে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে তাহা নহে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রমাণ করা হইয়াছে—বৈদিক যুগের আর্য্যগণ সকলেই কৃষিকার্য্য করিতেন এবং ঋষিগণও একার্য্যকে হীন বলিয়া মনে করিতেন না। ইঁহারা যে গোচারণাদি কার্য্যও করিতেন তাহাও প্রমাণ করা হইয়াছে। যে সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকেও কৃষি, গোচারণ ও সূত্রধরাদির কার্য্য করিয়া থাকে সে সমাজে জাতিভেদের স্থল কোথায়? বৈদিক যুগের শেষ ভাগে জাতিভেদের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল সত্য কিন্তু বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের যুগে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। প্রকৃত কথা এই বৈদিক যুগের প্রথম ও মধ্য ভাগে আর্য্য সমাজ এক অখণ্ড জাতিরূপে বর্ত্তমান ছিল। সূত্রধর, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, চর্ম্মকার ইত্যাদি জাতির কর্ত্তব্য আর্য্যগণকেই সম্পন্ন করিতে হইত। একই পরিবারের লোকে যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিত, ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।

"আমাদিগের কর্ম্ম নানা প্রকার, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন। তক্ষ (সূত্রধার) কাষ্ঠ তক্ষণ করে ভিষক্ রোগ প্রার্থনা করে এবং স্তোতা যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিকে চাহে। অতএব হে সোম তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

সুপক্ক ওষধি, পক্ষীর পক্ষ এবং উজ্জ্বল প্রস্তর দ্বারা ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত করিয়া কর্ম্মকার (কার্মারঃ) ধনাঢ্য ব্যক্তিকে অন্বেষণ করে। হে সোম তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

আমি স্তোত্রকার, পিতা (ততঃ—পিতা বা পুত্র) চিকিৎসক এবং মাতা প্রস্তরের উপর যব ভর্জ্জন করেন। ধনাভিলাষে আমরা নানা প্রকার কর্ম্ম করিয়া গাভীর ন্যায় বিচরণ করি। হে সোম তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৯।১১২

যে সমাজে পিতা মাতা পুত্র বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে, সে সমাজে জাতিভেদ থাকিতে পারে না।

মহেশচন্দ্র ঘোষ—বাঁকুড়া।

"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"।

প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়,

গত পৌষ মাসের প্রবাসীতে "আকবরের নিন্দুকগণ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছে উহাতে আকবরের চরিত্রে যে সকল দোষ পুরাকালে কোন কোন ইতিহাস-লেখকগণ দেখাইয়াছেন, বর্ত্তমান লেখক তাহারই অসারতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, সে বিষয় আমার কিছু বক্তব্য নাই; কিন্তু উক্ত প্রবন্ধলেখক কএক বার একটি অসম্পূর্ণ প্রবাদবাক্য যাহা বঙ্গদেশেই বিশেষরূপে প্রচলিত, তাহার উল্লেখ করিয়া আকবরের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন, এমন কি হিন্দুরা তাহাকে ঈশ্বরের তুল্য জ্ঞান করেন তাহাও বলা হইয়াছে, সেই বিষয় কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক বোধে এই কয়েক পংক্তি লিখিতে বাধ্য হইলাম, আপত্তি না থাকিলে প্রবাসীতে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

বাক্যটি এই "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"। ইহা কোন ব্যক্তি কোন সময়ে কি কারণে বলিয়াছেন এবং এই বাক্যটি সম্পূর্ণ অথবা কোন একটি বৃহদ্বাক্যের অংশ মাত্র ইহা কোথাও প্রকাশ নাই, কিন্তু সময়ে সময়ে এই বাক্যটি মাত্র লোকে উদাহরণ স্বরূপ দিয়া থাকে। অবশ্য লেখক নিজ উদ্দেশ্যানুসারে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু বাক্যটি শ্লোকের এক-পাদ বা চরণ মাত্র। ইহার অর্থ এই "দিল্লীশ্বর অথবা জগদীশ্বর"। পদটিতে কোন ক্রিয়া না থাকায় যিনি উক্তি করিয়াছেন তাহার উক্তি করিবার কারণ প্রকাশ পাইতেছে না, কিন্তু কোন কারণ ছিল অবশ্য মানিতে হইবে। সেই কারণটি শ্লোকের বাকি ৩ চরণে প্রকাশ পাইতেছে। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই:

"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা ধনেন মাংপুরয়িতুসমর্থঃ
অনশ্চ ভূপৈঃ পরিদীয় মানংশাকায় বাস্যাৎ লবণায় বাস্যাৎ"।

শ্লোকটি একজন সাধু মহন্তের উক্তি মাত্র, তাঁহার অনেক শিষ্য ছাত্রাদি ছিল এবং উহাদিগের প্রতিপালনে সদা অর্থাভাব হইত, এই নিমিত্ত শ্লোকটি লিখিয়া আকবরের তুষ্টির জন্য তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

মুসলমান সম্রাটদিগের মধ্যে কেবল আকবর মাত্র হিন্দুদিগের ভক্তি-ভাজন হইতে পারিয়াছিলেন তাহার কারণ এই যে, তিনি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদের প্রতি দ্বেষ করিতেন না, যেমন সাধারণ মুসলমানেরা করিয়া থাকেন। আমি আর একটি শ্লোক এই স্থলে দিতেছি, এই শ্লোকটির সঙ্গে আকবরের বিশেষ সম্বন্ধ আছে এবং সেই সম্বন্ধ থাকায় আকবরের ধর্ম্মবিদ্বেষ না থাকার কারণ প্রকাশ পায়।

শ্লোকটি এই:—

বসুরন্ধ্র বাণচন্দ্রে তীর্থরাজে প্রয়াগে তপসিবহুল পক্ষে দ্বাদশী
পূর্ব্বযামে, নখশিখতনু হোমে সর্ব্বভৌমাধিপত্যেঃ সকল দুরিতহারী
ব্রহ্মচারী মুকুন্দঃ॥

ইহা বাস্তবিক সত্য যে, যে উপরোক্ত শ্লোকে যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে উহার পর দশ মাসের মধ্যে আকবর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিরক্ত

হিন্দু সাধু হইয়া কেন সম্রাট হইবার মানস করিয়া নিজ শরীর দিয়া অগ্নিতে হোম করিয়াছিলেন তাহার স্বতন্ত্র কারণ আছে।

জনৈক প্রয়াগনিবাসী বাঙ্গালী।

স্বদেশী প্রসঙ্গ।

কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, এ বৎসর আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রধান স্বদেশী ঘটনা কি ঘটিয়াছে, তাহা হইলে আমরা কি উত্তর দিব? চুড়ি ভাঙ্গা নয়, বিলাতী কাপড় পোড়ান নয়, জাতীয় দলের সহিত মোকর্দ্দমায় পূর্ব্ববঙ্গের গবর্ণমেণ্টের পরাজয়ও নয়, এমন কি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়াদি স্থাপনও নয়;—সর্ব্বপ্রধান স্বদেশী ঘটনা বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর "উদ্ভিদের সাড়া" (Plant Response) নামক গ্রন্থ প্রকাশ। আমাদের পরাধীনতা নানাবিধ, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, শৈল্পিক, ইত্যাদি; কিন্তু তন্মধ্যে আমাদের মানসিক পরাধীনতাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। আমাদের সর্ব্বপ্রকার মানসিক শক্তি ইংরাজের চেয়ে কম, এই ধারণা যত বদ্ধমূল হইবে, আমরা ততই রসাতলে যাইব। জ্ঞানে, মানসিক শক্তিতে আমরা যত স্বাধীন হইব, সেই পরিমাণে আমাদের সর্ব্বপ্রকার অন্যবিধ পরাধীনতা কমিয়া আসিবে। দেহ ত মনের দাস; বিশাল বলশালী হস্তী ক্ষীণকায় দুর্ব্বল মাহুতের অধীন; কেন না, হাতী জ্ঞানে, মানসিক তেজে মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাই বলি, যাহাতে আমাদের কোনও স্বদেশবাসীর মানসিক শক্তির অসাধারণতা প্রমাণ করে, তাহাই গুরুতম স্বদেশী ঘটনা। আচার্য্য বসুর গ্রন্থকে কোন কোন ইংরাজ সমালোচক বিজ্ঞানজগতে বিপ্লব বা যুগান্তর সংঘটক বলিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের বড় বড় কাগজে ইঁহার অপূর্ব্ব আবিষ্ক্রিয়াগুলির আলোচনা দূরে থাক্, সংবাদ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। একমাত্র প্রবাসীতেই তাঁহার আবিষ্ক্রিয়াগুলিকে সংক্ষেপে বাঙ্গালীর বোধগম্য করিবার চেষ্টা হইতেছে। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা এত কম, যে, সন্দেহ হয়, যে কেহ কেহ হয় ত প্রবাসীর প্রবন্ধগুলিকে আচার্য্য বসুর ৫ বৎসর পূর্ব্বের আবিষ্ক্রিয়ার চর্ব্বিত চর্ব্বণ মনে করিয়া থাকিবেন!

এবার শ্রীযুক্ত ত্যাগরাজন্ নামক এক মান্দ্রাজী যুবক কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম র‍্যাংলার হইয়াছেন, এ খবরটি ছোট বড় সকল কাগজেই বাহির হইয়াছে। কেম্‌ব্রিজের এই গণিত পরীক্ষা খুব কঠিন; তাহাতে ইংরাজ প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাস্ত করায় খুব বাহাদুরী আছে। কিন্তু গণিতে ইহা অপেক্ষাও খুব কঠিন পরীক্ষা আছে। আর যদি ইহাই কঠিনতম হইত, তাহা হইলেও ইহাতে, পূর্ব্ব হইতে পরিজ্ঞাত গণিত বিদ্যায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় কে সকলের চেয়ে ভাল করিয়া দিতে পারিয়াছে, তাহাই জানা যায়। ইহাতে শিক্ষা করিবার শক্তি জানা যায় বটে, কিন্তু প্রতিভার, নূতন তথ্য বাহির করিবার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বড় বড় সম্পাদকেরা শ্রীযুক্ত ত্যাগরাজনের বাহাদুরীতে ভারতবাসীর মানসিক শক্তির বড়াই করিবার সুযোগ হইয়াছে মনে করিয়া কিছু-না-কিছু লিখিলেন; কিন্তু, সমস্ত পৃথিবীর পণ্ডিতমণ্ডলীর অজ্ঞাত নূতন তথ্য বাহির করায় জগদীশচন্দ্র অন্ততঃ ভারতে অতুলনীয় যে মানসিক শক্তির পরিচয় দিলেন, তৎসম্বন্ধে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। এমন কি আচার্য্য বসু যে ব্রাহ্ম সমাজের লোক, তাঁহাদেরও ইংরাজী ও বাঙ্গালা খবরের কাগজগুলিতে এ খবরটা পর্য্যন্ত বাহির হইল না!

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের শিক্ষালয় এবং বঙ্গীয় শিল্পশিক্ষাগার (Bengal Technical Institute) উভয়েরই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহাদের বদান্যতায় এই দুই মহৎকার্য্যের সূত্রপাত হইল, তাঁহারা ধন্য। বঙ্গীয় শিল্পশিক্ষাগারের আয় কিরূপ ঠিক জানি না; কিন্তু ৭ই আষাঢ়ের "সঞ্জীবনী"তে দেখিলাম ইহার প্রাথমিক বিভাগে ২৫ রকম কারিগরি এবং উচ্চতর বিভাগে ৬ প্রকার প্রধান প্রধান যন্ত্রশিল্প, বয়নবিদ্যা ও ফলিত রসায়ন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইবে। এতগুলি বিষয় ভালকরিয়া শিখাইতে হইলে প্রথমেই সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রাদিতে কত মূলধন লাগিবে এবং বার্ষিক ব্যয়ই বা কত হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা নাই। তবে, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কন্‌ফারেন্সের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুধোলকর প্রাদেশিক কমিটির সভ্যগণকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে দেখিলাম যে বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের মত একটি শিল্পশিক্ষাগার স্থাপন করিতে অন্ততঃ সাড়ে আটলক্ষ টাকা

চাই। এবং উহা চালাইতে আরও সাড়ে এগার লক্ষ টাকার দরকার। অথচ এই বোম্বাই শিক্ষালয়ে যন্ত্রনির্ম্মাণবিদ্যা (Mechanical Engineering) বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ারিং এবং বয়ন বিদ্যা, প্রধানতঃ এই তিনটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়।* সুতরাং আমাদের কলিকাতার শিক্ষাগারে ২০ লক্ষ অপেক্ষা অনেক বেশী টাকার দরকার। এত টাকা উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্য আমাদের বোধ হয় প্রথম প্রথম অল্পসংখ্যক বিষয় খুব ভাল করিয়া শিখাইবার বন্দোবস্ত করিলে ভাল হইত। খবরের কাগজে দেখিলাম জাতীয় শিক্ষাপরিষদেরও একটি শিল্পশিক্ষালয় খোলা হইয়াছে। যাঁহারা এই উভয় শিল্পশিক্ষালয়ের পরিচালক, তাঁহারা বিদ্যা-বুদ্ধি ও স্বদেশপ্রেমে বঞ্চিত নহেন। তাঁহারা দুটিকে এক করিয়া দিতে পারিলে একটি কাজের মত কাজ হয়।

বিদেশী চিনি ও বিলাতী নুন খাওয়া হইতে লোককে নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রধানতঃ এই যুক্তি দেখান হয় যে ঐ চিনি ও নুন পরিষ্কার করিবার জন্য গোরক্ত, এবং গোরু, শূকর প্রভৃতির হাড়ের কয়লার চূর্ণ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। যাঁহারা গোঁড়া হিন্দু ও মুসলমান, তাঁহারা এই যুক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন বটে; কিন্তু ইহার দোষ এই যে সর্ব্ববিধ বিদেশী চিনি বা বিলাতী নুন এই উপায়ে পরিষ্কার করা হয় না। তদ্ভিন্ন বিজ্ঞানের নানা পথ আছে। হিন্দু মুসলমান যাহাকে অশুচি মনে করেন না, এরূপ উপায়ে প্রস্তুত বিদেশী ও বিলাতী চিনি নুন পাইলে কি তাঁহারা খাইবেন? তাহা ত খাওয়া উচিত নয়। আসল কথা এই যে, যে উপায়েই প্রস্তুত হউক না, আমরা বিলাতী নুন ও বিদেশী চিনি খাইব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা চাই।

আমাদের স্বদেশীতে প্রাণপণ করিয়া লাগিয়া থাকা উচিত। ইউরোপের লোকেরা জাতিবিশেষের সামরিক শক্তি অপেক্ষাও শিল্পবাণিজ্য শক্তিকে অধিক ভয় করেন। পিয়াসন তাঁহার "জাতীয় জীবন ও চরিত্র" নামক পুস্তকে চীনদিগের সম্বন্ধে ঠিক এই কথা লিখিয়াছেন।†

অনেকে মনে করেন, ভারতবাসীরা শিল্পবাণিজ্যে কখন বড় হইতে পারে না। কিন্তু সেটা ভুল। ভারতবাসীদিগকে পদদলিত করিবার একটা প্রধান কারণ এই যে, এতদ্দেশীয়েরা কোনরূপ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইলেই বিলাতী বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবে ও করিতে সমর্থ। ইহা আমাদের কথা নয়। India for sale: Kashmir sold নামক পুস্তিকার ইংরাজ গ্রন্থকার কি লিখিয়াছেন দেখুনঃ—

"We do not appear to realise the fact that the loss of India will assuredly deprive us of all our Eastern trade, and yet it is easy to see that it will be so; for not only will the marts of India be closed against us if we lose it,—as firmly closed against us as are those of Central Asia now,—but besides this *India, with its raw produce and its people skilled in manufactures from of old, will soon, under a system of protection, become a great manufacturing nation,—will soon with its cheap labour and abundant supply of raw material supplant us throughout the East*". (Page 4 of India for sale: Kashmir sold. By W. Sedgwick, Major R. E. Calcutta W. Newman & Co., Ld., 1886. Price 12 annas).

উপরে উল্লিখিত বাণিজ্যে রক্ষণনীতি (protection) কাহাকে বলে তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। অন্যদেশ হইতে আমদানী সস্তা জিনিষ স্বদেশী শিল্পের ক্ষতি ও উচ্ছেদ যাহাতে না করিতে পারে, এইজন্য নানাদেশে বিদেশী আমদানী জিনিষের উপর ট্যাক্স বসাইয়া তাহার দাম বাড়াইয়া দেওয়া

---

* "The Victoria Technical Institute of Bombay has applied itself mainly to these three courses (mechanical and electrical engineering and textile manufacture). There was for some years provision made for teaching enamelling; but this course had to be abandoned owing to certain difficulties. The capital expenditure for establishing an institute like the Bombay one—and it is not very lavishly or sumptuously equipped would not fall bellow 8½ *lakhs*. The maintenance and the recurring charges would not be less than Rs. 50,000 a year. * * * Twenty *lakhs* of rupees would be required before a technical college which goes no further than the Bombay Institute can be established."

† "The military aggrandisement of the (Chinese) Empire, which would provoke general resistance, is, in fact, less to be dreaded than its industrial growth, which other nations will be, to some extent, interested in maintaining".

National Life & Character p. 111.

হয়। কিন্তু আমাদের বিদেশী গবর্ণমেন্ট বিলাতী শিল্পের ক্ষতিকারক এই রক্ষণনীতি কখনই অবলম্বন করিবেন না। সুতরাং আমাদের স্বদেশীভাব, বিদেশী জিনিষ আপাততঃ সস্তা ও ভাল হইলেও লইব না, এই যে ভাব, ইহাকেই রক্ষণনীতির কাজ করিতে হইবে। বিলাতের এক প্রধান অর্থনীতিজ্ঞ মিল্ দেশের শিল্পের শৈশবাবস্থায় রক্ষণনীতিকে কার্য্যকারী মনে করেন। তদ্রূপ জার্ম্মেন অর্থনীতিজ্ঞ লিষ্ট রক্ষণনীতির সমর্থক। আর ইহার ফল ত হাতে হাতে দেখা যাইতেছে। বিলাতী শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ও আমাদের শিল্পবাণিজ্যের অধোগতির মধ্যে এই নীতির কার্য্য দেখা যায়। সে কথা বিস্তৃতভাবে বলিবার ইচ্ছা আছে। আমেরিকার লোকেরা এই নীতি অবলম্বন করিয়া ধনশালী হইয়াছে। লেকী সাহেব তাঁহার এক গ্রন্থে একথার উল্লেখ করিয়াছেন।* ভারতের মত যে দেশের লোককে খাদ্যদ্রব্য অন্য দেশ হইতে আনিতে হয় না, তথায় এই নীতি খুব নির্ভয়ে চালান যায়। তবে শুধু এই নীতিতে কাজ হয় না। ক্রমাগত শিল্পের উন্নতির চেষ্টা চাই।

ইংরাজদের কোন কোন কাগজে স্বজাতির গুমর রক্ষার জন্য লেখা হয় যে, "ভারতবর্ষের লোক বিলাতী জিনিষ না লইলে আমাদের এমন কি ক্ষতি হইবে? সমস্ত পৃথিবীতে আমাদের কাটতি।" এটা কেবল ছেলে ভুলান কথা। আমরা এতে ভুলি না। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর তারিখে লণ্ডনে এক বক্তৃতায় ভারতের ভূতপূর্ব্ব লাট ডফারিণ সাহেব বলেন যে ভারতের সঙ্গে বিলাতের রাজনৈতিক সম্বন্ধ আংশিক ভাবেও বিচ্ছিন্ন হইলে বিলাতের কুটীরে কুটীরে এই দুর্ঘটনার ফল অনুভূত হইবে।*

ভারত লুণ্ঠন করিয়া ইংরাজ কিরূপ ধনবান্ হইয়াছেন, তাহা এই পরোক্ষপ্রমাণ হইতে বুঝুন। কিন্তু বিলাতের "পৌষমাসে" আমাদের "সর্ব্বনাশ" হইয়াছে।

আমাদের দেশের কতকগুলি অজ্ঞ বা তোষামোদকারী ভণ্ড লোকে বলে যে ইংরাজ আমাদের দেশের শিল্প রক্ষা ও উন্নতির জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাহারা বুঝে না, প্রতিকূল সমালোচনার জবাব দিবার জন্য ওরূপ দু একটা সরকারী ঠাট্ বজায় রাখিতে হয়। আসল কথা এই, যে সরকারের আমাদের প্রকৃত উপকার করিবার ইচ্ছা থাকিলে, জাপান ৫০ বৎসরে যাহা করিয়াছে, আমরা ইংরাজশাসনের ১৫০ বৎসরে তাহার সিকিও করিতে পারিতাম না কি? সত্য বটে, জাপানীদের মত স্বার্থত্যাগ ও স্বদেশপ্রেম আমাদের নাই। কিন্তু বুদ্ধিতে আমরা কম নই, এবং সময়ও ৫০ বৎসরের পরিবর্ত্তে ১৫০ বৎসর আমরা পাইয়াছি। তাহাতেও আমরা কিছুই করিতে পারিলাম না কেন? এক হিসাবে অবশ্য সমস্ত দোষই ভারতবাসীর। নতুবা তাহারা পরপদানত, লুণ্ঠিতসর্ব্বস্ব, আজন্ম অর্দ্ধাশনে মৃতপ্রায় হইবে কেন? সুতরাং আমাদের সম্পূর্ণ দোষ মানিয়া লইলাম। কিন্তু ইহাও নিশ্চয় যে ইংরাজ আমাদের শিল্পোন্নতি চান না। বড় বড় রাজপুরুষ যখন বলেন যে তাঁহারা "প্রকৃত" স্বদেশীর পক্ষপাতী, বয়কট বা বর্জ্জনের পক্ষপাতী নহেন, তখনই বুঝিতে হইবে যে তাঁহাদের স্বদেশীর মানে এই যাহাতে বিলাতী মালের কাট্‌তি না কমে। বিলাতী বর্জ্জন না করিলে স্বদেশীর যায়গা হয় কেমন করিয়া? আর আমরা, বিলাতী বর্জ্জন না করিয়া, বিলাতীর মত সুন্দর ও সস্তা জিনিষ তৈয়ার

* "The payment of the debt after the American war was due to the system of severe protection. Manufacturers by such protection made colossal fortunes. The working classes in America seem to have very generally adopted the opinion that a protective system, by raising the price of the articles they make and excluding similar articles made in other countries, has an effect, in raising wages and increasing employment, which is very beneficial to their interests".

Leckey's Democracy and Liberty, Vol. I, pp. 99 100.

* "Indeed, it would not be too much to say that if any serious disaster ever overtook our Indian Empire, or if our political relations with the peninsula of Hindostan were to be even partially disturbed, there is not a cottage in Great Britain—at all events in the manufacturing districts—which would not be made to feel the disastrous consequences of such an intolerable calamity.—*Cheers.*" Lord Dufferin's "Speeches in India," John Murray, p. 284.

করিয়া, তাহার পর স্বদেশী চালাইব, ইহা মনে করা বাতুলতা মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে কি কোম্পানীর আমলে কি ভিক্টোরিয়া ও এডওয়ার্ডের আমলে, আমাদের শিল্পোন্নতির আন্তরিক চেষ্টা সরকারের তরফ হইতে হয় নাই।

অনেকে জানেন না যে ইংরাজ জোর করিয়া আমাদের কারিগরদিগের নিকট হইতে তাহাদের অনেক গোপনীয় শিল্প প্রক্রিয়া জানিয়া লইয়া আমাদেরই টাকায় ঐ সকল তথ্যে পূর্ণ পুস্তক প্রস্তুত করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের কলওয়ালাদিগকে উহা বিনামূল্যে বিতরণ করেন। "তোমার শিল, তোমার নোড়া, তোমারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।" প্রমাণ নীচে দিলাম।—

Every one knows how zealously trade secrets are guarded. If you went over Messrs Doulton's pottery works, you would be politely overlooked, yet under the force of compulsion the Indian workman had to divulge the manner of his bleaching and other trade secrets to Manchester. A costly work was prepared by the India House Department to enable Manchester to take 20 millions a year from the poor of India; copies were gratuitously presented to Chambers of Commerce and the Indian ryot had to pay for them. This may be political economy, but it is marvellously like something else.

Major J. B. Keith in the
Pioneer Sept. 7, 1898.

আমরা বাধ্য হইয়া বাঙ্গলা কাগজে এত ইংরাজী দিতেছি। অনুবাদ দিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়।

আমরা যদি আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হই, তাহা হইলে আমাদের কোন উপায় উদ্ভাবন করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু যখন আমাদের রাজারা ভারতের হিতের জন্য কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তখন যাহাতে আমাদের নিজের উন্নতি সাধন হইতে পারে, নিজের উপর নির্ভর করিয়া তাহার উপায় আমাদের অবলম্বন করা উচিত। এই স্বদেশী আন্দোলন ভালরূপে প্রচলিত হইলে, স্বদেশী বস্তুর প্রচার হইলে ভারতের উন্নতি সাধিত হইবে। সবদেশবাসীরাই স্বদেশী বস্তু ব্যবহার করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন। এমন কি ইংলণ্ড দেশে যেখানে অবাধ বাণিজ্য এত প্রচলিত সেখানে এখন পর্য্যন্ত স্বদেশ নির্ম্মিত সামগ্রীকে তাঁহারা বিদেশী হইতে বেশী ভাল বাসেন ও আগ্রহের সহিত ব্যবহার করেন। প্রায় দশবৎসর হইল পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যদিগের বসিবার জন্য কিছু বিদেশী চেয়ার ক্রয় করা হইয়াছিল। তাহাতে একজন সভ্য যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া যেরূপ প্রশ্ন করেন, এবং রাজমন্ত্রী তাহার যাহা উত্তর দেন, তাহা স্মরণ রাখিবার যোগ্য বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"*Foreign-made goods.* In the House of Commons on August 11, 1896.

Mr. Mclure asked the First Commissioner of works whether the chairs in the Reporters' Gallery and furniture in other parts of the House were of foreign manufacture, and why preference was given to foreign over British and Irish trade.

Mr. Akers-Douglas. The only furniture of foreign manufacture in the House of Commons is limited to a number of chairs supplied to the Press gallery and this was done some years ago. With this exception, all the articles in use are of British manufacture."

স্বদেশের কল্যাণের জন্য বিদেশী জিনিষ বর্জ্জন কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা মার্কিনগণ, ইংরাজদাসত্ব হইতে স্বাধীন হইবার জন্য যুদ্ধের পূর্ব্বে, দেখাইয়াছিল। তাহারা তখন বিলাতী জিনিষ বর্জ্জন করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। তাহাতে একবৎসরের মধ্যে মার্কিনদের দেশে বিলাতী জিনিষের আমদানী ১৯৯৫০০০০ টাকার হইতে ৬০০০০০০ টাকার হইয়া যায়, অর্থাৎ একবৎসরেই এক তৃতীয়াংশেরও কম।* বাঙ্গালী, এমনি করিয়া বিলাতী বর্জ্জন কর। সমুদয় অনাবশ্যক বিলাতী বিলাসদ্রব্য ত্যাগ কর। দরকারী জিনিষ দেশী ক্রয় কর। মিহি মোটার বিচার

* "Already the commercial prosperity of the wester Country was grievously impaired. The colonists had met Charles Fownshend's policy by an agreement not to consume British goods; and the value of such goods exported to New England, New York, and Penusylvania fell in a single year from £1,330,000 to £400,000"
The American Revolution by Trevelyan, Part. 1. p. 114.

করিও না। বিলাসের ক্রোড়ে লালিতা ধনবতী মার্কিন মহিলারা কম্বলের মত কাপড়ের পোষাক পরিয়াছিলেন, তবু বিলাতী মোলায়েম পশমী কাপড় কিনেন নাই।

ডাক্তার কীর্ত্তিকর।

কানহোবা রণছোড়দাস কীর্ত্তিকর ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে বোম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঐ সহরের "পাতানে প্রভু" সম্প্রদায় ভুক্ত। বালক কীর্ত্তিকর স্কুল এবং কলেজে যশস্বী ছাত্র ছিলেন এবং অনেক পুরস্কার ও বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি ১৮৬৬ সালে প্রবেশিকা ও ১৮৬৮ সালে এফ্ এ পাশ করিয়া ১৮৭১ সালে বোম্বাইয়ের গ্র্যাণ্ট মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৭৪ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। তিনি তথায় লণ্ডনের য়ুনিভার্সিটী কলেজে অধ্যয়ন করেন। মানসিক ব্যাধি তাঁহার বিশেষ অনুশীলনের বিষয় ছিল। ঐ বিষয়ে তিনি ১ম রৌপ্যপদক ব্যতীত কিছু অর্থও পুরস্কার পান। তিনি অধ্যাপক কর্‌ফীল্ডের নিকট স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা করেন এবং ঐ বিষয়ে কতকগুলি পুস্তক পুরস্কার পান। তিনি ১৮৭৬ সালে রয়্যাল কলেজ অব সার্জ্জন্সের সদস্য এবং রয়্যাল কলেজ অব্ ফিজিশিয়ান্সের লাইসেন্সিয়েট হন।

তৎপর বৎসর তিনি ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগে (Indian Medical Service) প্রবেশ করেন। তিনি ইহার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করেন। তিনি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীকেই নিজের কার্য্যক্ষেত্র নির্ব্বাচন করেন। তিনি চাকরী উপলক্ষে শোলাপুর, করাচী ও সিন্ধুদেশস্থ হায়দরাবাদে দেশীয় সৈন্যদলের সহিত কাজ করেন।

আফগান যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি ১৯শ দেশী সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করেন। ১৮৭৮ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি যুদ্ধস্থলে ছিলেন। মেইওয়ান্দ যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজ সৈন্য পরাজিত হইয়া হটিয়া আসিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর গোলা গুলি বর্ষণের সীমার মধ্যে থাকিয়া এবং পলায়নের সময়ও তিনি বিশেষ সাহস ও তৎপরতার সহিত অবিচলিত চিত্তে আহত সৈন্য ও সেনাপতিদিগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করেন। তজ্জন্য তিনি ১৯শ সৈন্যদলের সেনাপতিদিগের শ্রদ্ধাভাজন হন। ঐ দলে এখনও তাঁহার নাম সম্মানের সহিত সকলের স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া আছে। তিনি ১৮৮১ সালে উল্লিখিত যুদ্ধে সাহসিক আচরণের জন্য ঠানার সিবিল সার্জ্জন নিযুক্ত হন।

১৮৮৩ সালে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য এবং ১৮৯৭ সালে চিকিৎসা বিষয়ে সিণ্ডিকেটের সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৮৩ হইতে ১৮৯৭ পর্য্যন্ত তিনি নানা বিষয়ে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৮৬-৮৭ সালে তিনি বোম্বাই মেডিক্যাল কলেজে কঙ্কালবিদ্যার (anatomy) অধ্যাপকতা করেন। তৎপর বৎসর তিনি ভৈষজ্যতত্ত্বের (Materia Medica) অধ্যাপকতা করেন। তিনি জে. জে. হাঁসপাতালে ২য় সার্জ্জন হন। তিনি তৃতীয়বার বোম্বাইয়ের স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী হন এবং ১৮৯৭ সালে প্লেগের জন্য বোম্বাই মিউনিসিপালিটির বিশেষ স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। এক বৎসর পরে তিনি রত্নাগিরির সিবিলসার্জ্জন নিযুক্ত হন এবং তথায় পাগলা হাঁসপাতাল ও কুষ্ঠাশ্রমের অধ্যক্ষতা করেন। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মের সিংহাসনচ্যুত রাজা থিবর ডাক্তার নিযুক্ত হন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রিগেড্ সার্জ্জন লেফ্‌টেনেণ্ট-কর্ণেলের শ্রেণীতে উন্নীত হন।

কর্ণেল কীর্ত্তিকর ৫৫ বৎসর বয়সে ২৭ বৎসর প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া ১৯০৪ সালে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

ডাক্তার কীর্ত্তিকর সাহিত্য এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ্ বিদ্যার বিশেষ অনুশীলন করিয়া থাকেন। মারাঠী সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য আছে। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক সমুদয় মারাঠী কবির রচনা অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং নিজেও সুললিত মারাঠী কবিতা লিখিতে পারেন। টেনিসনের প্রিন্সেস্ নামক কাব্যের অনুকরণে লিখিত তৎপ্রণীত ইন্দিরা কাব্য ১৯০১ ও ১৯০৩ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম যৌবনের রচনা ভক্তিসুধা নামক গ্রন্থ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা এখনও একেশ্বরবাদীদিগের উপাসনা মন্দিরে গীত হইয়া থাকে। তিনি ১৮৮২ সালে বিলাপ লহরী নামক কতকগুলি কবিতা প্রকাশ করেন। এ

গুলি, ১৮৮১ সালে পরলোকগতা তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী শ্রীমতী সোনাবাঈর স্মৃতিতে লিখিত। ইহা মারাঠীভাষিণী হিন্দু রমণীগণের মধ্যে আদৃত। সোনাবাঈ রাওবাহাদুর রামচন্দ্র বালকৃষ্ণ নামক একজন প্রধান সমাজসংস্কারকের কন্যা ছিলেন।

কর্ণেল কীর্ত্তিকর উদ্ভিদ্‌বিদ্যার একজন বিশেষ অনুরাগী অধ্যেতা। তিনি বোম্বাই ন্যাচর‍্যাল হিষ্টরী সভার উদ্ভিদ-বিদ্যা বিভাগের সম্পাদক। এই সভার পত্রিকায় তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন;--বিশেষতঃ বোম্বাই অঞ্চলের বিষাক্ত উদ্ভিদসমূহ বিষয়ে। বার্লিনের অধ্যাপক লেউইন (Prof. Lowin) সিড্‌নির অধ্যাপক এণ্ডাসন ষ্টুয়ার্ট, এবং মেলবোর্ণের অধ্যাপক ম্যাকাল্লিন্ এই প্রবন্ধগুলির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

কর্ণেল কীর্ত্তিকর ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও হলাণ্ডের অনেক বিদ্বজ্জনসমাজের পারিষদ।

১৮৯১ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্ণেল কীর্ত্তিকরকে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের উইলসন ভাষাতত্ত্ব অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করেন। তিনি এই উপলক্ষে যে ৬টি বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি দেখান যে মারাঠী সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পরীক্ষায় স্থান পাইবার যোগ্য। এখন বোম্বাইয়ে এম্, এ পরীক্ষায় ইংরাজীর সঙ্গে মারাঠী ২য় ভাষা স্বরূপ লওয়া যায়। এই ব্যবস্থা প্রধানতঃ স্বর্গীয় মহাদেব গোবিন্দরাণাড়ে মহাশয়ের চেষ্টায় হয়। কিন্তু ডাক্তার কীর্ত্তিকর তাহার এই বিষয়ে যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য নিশ্চয়ই তিনি যশোভাগী।

কর্ণেল কীর্ত্তিকর "পাতানে প্রভু সাহায্য ভাণ্ডার" সভার সভাপতি, আর্য্য শিক্ষা ইনষ্টিটিউটের একজন ট্রষ্টী, এবং দক্ষিণ শিক্ষা সভার একজন কার্য্যপরিচালক।

তাঁহার প্রধান পুস্তক, ভারতীয় অপুষ্পক উদ্ভিদাবলী (The cryptogamia of India) এখনও সমাপ্ত হয় নাই। তিনি উহা সম্পূর্ণ করিতে নিযুক্ত আছেন।

ডাক্তার কীর্ত্তিকর ইংরাজীতেও পদ্য রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতকগুলি English Buds নামে প্রকাশিত হইয়াছে ও কতকগুলি শ্রীমতী ক্যাথারিন বোসের সম্পাদকতায় শীঘ্রই ছাপা হইবে। ডাক্তার কীর্ত্তিকর গাছপালার সুন্দর রঙ্গীন ছবি আঁকিতে সিদ্ধহস্ত।

ভারতবাসীদের মধ্যে ডাক্তার কীর্ত্তিকরের মত পুস্তক-সংগ্রহ অল্পলোকেরই আছে। তাঁহার পুস্তকালয়ে শতশত ইংরাজী, লাটিন, মারাঠী, ও সংস্কৃত পুস্তক আছে। এই সকল পুস্তক সাধারণ সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, ললিত কলা, সমালোচনা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে লিখিত।

ডাক্তার কীর্ত্তিকরের অর্থ, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, অবসর, কিছুরই অভাব নাই। তিনি অভিনব তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করুন, ইহাই আমাদের বাসনা।

সাধনা।

যতনে দু'হাতে মুছি' অঙ্গ হ'তে কালি
করি কলঙ্কিত মোর করতল খালি।
প্রক্ষালিতে হস্ত, ঢালি অনুতাপ-জল
ধূলায় জনমে তাহে কর্দ্দম কেবল।

উজ্জ্বল বিমল পুণ্য শুভ্র অনিবার—
কোথা সে তাপস-ঋদ্ধি, সিদ্ধি সাধনার?
ধূলি বিনিময়ে মোরা সাধনার নামে
ধূলি-মাঝে লভি পঙ্ক, এ জগতধামে।

হাসিখেলা, ভালবাসা, আনন্দের গান,
রোদন, বিরাগ, ক্রোধ, কিম্বা অভিমান,
সাগরে তরঙ্গ সম মথিয়া জীবন,
তুলিয়া গরল, পরে করিছে সৃজন
দেবতাবাঞ্ছিত সুধা পরাণে পরাণে;
অমরত্ব লভে নর সে অমৃত পানে।
জনমি জীবন-মাঝে সহজ সাধনা,
আপনি সৃজিছে সুখ বিনাশি যাতনা।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

মধুসূদন-স্মৃতি।

বরষার ঘনমেঘ ঘিরেছে আকাশ!
হে কবি, তোমারি তরে আজ স্তরে স্তরে,
শ্যামল জলদরাজি আনিছে বহিয়া
কি শুভ সংবাদ হের, মেঘদূত সম!
বিরহী যক্ষের মত হৃদয় তোমার
উঠেছিল কেঁদে বুঝি বরষা-প্রভাতে—
আজি এই আষাঢ়ের উদাস দিবসে,
অসহ্য বিরহে বঙ্গ-কল্পনা-বধূর?
কবি তুমি, তাই আজ তোমার লাগিয়া,
মুছাইতে অশ্রু তব, তব হৃদয়ের
আতট-উচ্ছ্বাস, আহা প্রশান্ত করিতে
ঘুরিতেছে দলে দলে মুক্ত মেঘাবলী
ঊর্দ্ধনভোপটে তব সমাধির পরে;
বঙ্গের কল্পনা-দেবী সর্ব্ব কর্ম্ম হ'তে
অবসর ল'য়ে আজি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে,
অদৃশ্যে শিয়রে তব দাঁড়ায়ে নীরবে!

কি বলিয়া সম্বোধিব হে কবি তোমায়,
আজ শুধু আসে মনে কবে কালিদাস
অশ্রুসিক্ত বিরহীর প্রেম-ইতিহাস
লিখিলেন মেঘদূতে; তার পর তুমি,
মেঘমন্দ্রে কি লিখিলে অমৃত ঢালিয়া?
কি দিব্য মন্ত্রের বলে নিমেষের মাঝে
ফেলিলে খুলিয়া সেই লৌহের শৃঙ্খল—
শত শতাব্দীর মিত্র-অক্ষর-বন্ধন?
সমুত্থিত মেঘনাদে কাঁপিল আকাশ,
কাঁপিল গিরির গুহা, কাঁপিল জলধি,
চরণ-বন্ধন হ'তে মুক্ত হয়ে এসে
দাঁড়াইলা স্মিতমুখী কবিতা-সুন্দরী!

সৌন্দর্য্যের সার হ'তে তিল তিল করি,
কত রত্ন আহরিয়া তবে সাজাইলে
তিলোত্তমা সুন্দরীরে; অশ্রুমুক্তা দিয়ে
সাজাইলে সযতনে প্রেম-তুলিকায়
বিরহিনী রাধিকারে; পুরাণের কথা
রচিলে নূতন করে বীরাঙ্গনা নামে।
আপন অদৃষ্টফলে ভারত ছাড়িয়া,
মোহমরীচিকা বশে দেশ দেশান্তরে
ভূগিলে অশেষ দুঃখ সুখের আশায়,
কক্ষভ্রষ্ট, লক্ষ্যচ্যুত ধূমকেতু মত!
তব সেই সিন্ধুপারে হে কবি তোমার
করুণ হৃদয়খানি উঠিত কাঁদিয়া,
মানস-নয়নে হেরি সেই শৈশবের
প্রিয়তম ক্রীড়াস্থান, সন্ধ্যার তিমিরে
কলপ্রবাহিত আর কাচস্বচ্ছ নীরে
ভরাবুক, ঊর্ম্মিময় কপোতাক্ষ নদ!

কবিকুলগুরু তুমি, তবু কোন্ দুঃখে
বঙ্গভূমি সিক্ত আজো তব অশ্রুজলে?
অকৃতজ্ঞ গৌড়জন কোন্ তীক্ষ্ণ শরে
বিদ্ধ করিয়াছে তব অমর আত্মায়?
যতনে খুলিয়া দিয়া উৎস অমৃতের,
অভিষিক্ত করেছিলে, আজো অনুক্ষণ
হইতেছে উৎসারিত সে দিব্য নির্ঝর
বীণাপাণি-পদাম্বুজে; ঊর্ম্মিমালা তার
পশিছে নিয়ত বঙ্গ-কাব্য-সরোবরে,
শীতলিয়া গৌড়ভূমি অনন্ত সুধায়।
উর তবে, সুসময়ে, উর কবিবর,
ভুলিয়া অমর দেশ, মৃত্যু-আবরণ,
চিন্ময় আত্মার তব হোক্ অধিষ্ঠান
আজি তব সমাধির উদার প্রাঙ্গণে।
তোমার আঁখির তারা কৃষ্ণ মেঘ সম,
নিমেষের তরে আজি হোক্ বিস্ফারিত
আগ্রহে, বিস্ময়ে এই বিমুগ্ধ সন্ধ্যায়!

নীরবতা চিরদিন শ্মশানের ভাষা,
মৌন হয়ে তাই আজি তব সমাধির
চারিপাশে বিরাজিত ভকত-হৃদয়।

দারিদ্র্যের জীর্ণবাস, ব্যাধি-নির্য্যাতন,
সব হ'তে মুক্ত হয়ে সমুজ্জ্বল বেশে
যশের বেদীর পরে, রতনে খচিত,
আজ তুমি সমাসীন আপন গৌরবে।

অভাগা এ বঙ্গে তব স্মরি কবিবর
ফেলো তপ্ত অশ্রুজল ; যে পুণ্যপ্রবাহে
মগ্ন আজি গৌড়ভূমি, সেই প্রেমস্রোত,
সেই স্বদেশের প্রেম, প্রথম উচ্ছ্বাস,
পূর্ব্বরাগ, পূর্ব্বাভাস যত কিছু তার,
হয়েছিল অনুভূত হৃদয়ে তোমার।
ডাকিয়াছ কতজনে, "পথিক সুজন,
আমার বিশ্রাম-গৃহ দেখে যাও" বলি,
সে তব নীরব-বাণী শুনে নাই কেহ ;
আজ সবে অনাহূত এসেছে নিকটে !
চাহ তবে কবিবর, চাহ একবার
বৈতরণী-পার হ'তে এ প্রবাস পানে,
রাখ তব অশ্রুময়, অপলক আঁখি
ইহলোকে, একবার নিমেষের তরে।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থসমালোচনা।

১। The English Works of Raja Rammohun Roy. মূল্য ৫৲ টাকা। অতি অল্পদিন পূর্ব্বে এলাহাবাদের পাণিনি অফিস হইতে রাজা রামমোহন রায় কৃত বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত গ্রন্থগুলির সুন্দর এবং সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এবারে আবার সেই পাণিনি অফিস হইতেই রাজার সমগ্র ইংরাজি রচনা একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঁধা ভাল, কাগজ ভাল, ছাপা ভাল ; অথচ এই (ভূমিকা সহিত) ১০০৮ পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থের মূল্য ৫৲। এ পর্য্যন্ত অন্য কোন সংস্করণে যে সকল রচনা মুদ্রিত হয় নাই, তাহাও ইহাতে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথমেই Encyclopædia Britannica হইতে রাজার একটি জীবনচরিত উদ্ধৃত হইয়াছে ; এবং তাহার পর গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপে রাজার জীবন সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় একটি সুরচিত প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রাজার একখানি ফারসি পুস্তিকার ইংরাজী অনুবাদও ইহাতে আছে। যাঁহারা এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিলেন, তাঁহাদের নিকট ভারতবর্ষ ঋণী রহিল।

বেদান্তের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম, চারিখানি উপনিষদের অনুবাদ, গায়ত্রীব্যাখ্যা, হিন্দুজাতির ধর্ম্মতত্ত্ব ও নীতির ব্যাখ্যা, খৃষ্টপ্রচারিত ধর্ম্মের সমালোচনা প্রভৃতি ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক রচনা, চিরস্থায়ী সাহিত্য ; এবং ঐ গুলি চিরকালই সযত্নে পঠিত হইবে। আমাদের পতিত এবং পরাধীন দেশের মঙ্গল সংকল্পে মহাত্মা যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অনেক রচনায় তাহার ইতিহাস পাওয়া যায়। ঐ রচনাগুলির মূল্য কেবল মাত্র ঐতিহাসিক নহে। গবর্ণমেণ্ট যখন লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিতেছিলেন, আইন আদালতের নূতন ব্যবস্থা করিতেছিলেন, শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন পথ দেখিতেছিলেন, তখন ইংরাজ-নীতি-অনভিজ্ঞ স্বদেশীয়দিগের মুখপাত্র হইয়া রাজা গবর্ণমেণ্টকে যেভাবে উপদেশ দিয়াছেন, অনুনয় বিনয়ে সৎপথে ফিরাইয়াছেন, এবং গবর্ণমেণ্টের সাধু প্রস্তাবে সহায়তা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে যে ঐ সকল বিষয়ে কত সুশিক্ষা লাভ করা যায়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সহমরণ নিবারণ বিষয়ক আন্দোলনের বৃত্তান্তও এই পুস্তকে আছে।

এই গ্রন্থে মহাত্মার তিন খানি সুন্দর চিত্র এবং তাঁহার সমাধি মন্দিরের দৃশ্য মুদ্রিত হইয়াছে। এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে, স্বদেশসেবায় যিনি সর্ব্ব প্রথমে জীবন উৎসর্গ করিয়া মৃতপ্রায় স্বদেশীয়দিগকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, আশা করি তাঁহার গ্রন্থাবলী গৃহে গৃহে রক্ষিত এবং পঠিত হইবে। *

২। বঙ্গপরিক্রমা, ৺ নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রণীত, এবং পৌরাণিক ও ভৌগোলিক টিপ্পনী এবং গ্রন্থকারের জীবনচরিত সহ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত। প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক অনুসন্ধানে নগেন্দ্র বাবুর যোগ্যতার কথা সকলেই জানেন ; এরূপ স্থলে স্বনামখ্যাত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌সভা হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ যে সুপাঠ্য এবং শিক্ষাপ্রদ, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। ধর্ম্মের হিসাবে বৈষ্ণব পাঠকের নিকট ইহা উপাদেয় গ্রন্থ এবং রচনানৈপুণ্যে ইহা সকল শ্রেণীর পাঠকের আদরের জিনিষ। নগেন্দ্র বাবুর টিপ্পনীর গুণে প্রত্নতত্ত্বান্বেষিগণও এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হইতে পারিবেন।

৩। বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক---অর্থাৎ মৃত গ্রন্থকারদিগের চরিতাভিধান। শ্রীশিবরতন মিত্র মহাশয় সঙ্কলিত এই গ্রন্থের পূর্ব্ব দুইভাগ ইতিপূর্ব্বে সমালোচিত হইয়াছে। এই খণ্ডে প্রকাশিত জীবনীর মধ্যে সেকালের কাশীরাম দাস এবং কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কথা এবং একালের কেশবচন্দ্র সেনের সংক্ষিপ্ত চরিত্র, উল্লেখযোগ্য।

৪। স্বদেশী আন্দোলনের কবিতা---(১) শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায় প্রণীত গীতি-কবিতা প্রথম ভাগ। আমরা বাল্যকালে যে ভারত-বিলাপ এবং

* প্রকাশকগণ এই গ্রন্থ প্রবাসীর গ্রাহকদিগকে অর্দ্ধমূল্যে দেওয়ায় আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। সম্পাদক।

যমুনা লহরী কণ্ঠস্থ করিয়া সুখী হইয়াছিলাম, যে গান দুইটি প্রতিদিন গীত হইয়াও পুরাতন হইল না, সেই দুইটি গান বা কবিতা ২০ পৃষ্ঠার পুস্তিকায় এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এমন সর্ব্বত্র আদৃত জিনিষের নূতন সমালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

(২) শ্রীরামচন্দ্র দাস গুপ্ত প্রণীত দৈববাণী দৈববাণীর কবি স্বদেশ-প্রেমে যথার্থই উদ্বুদ্ধ। সম্ভবতঃ উৎসাহের আতিশয্যে পদ্যগুলিতে কবিত্বের তেমন বিকাশ হইতে পারে নাই। পদ্যের বাঁধন ভাঙ্গিয়া দিলে, একটা বক্তৃতা হইয়া দাঁড়ায়।

(৩) স্বদেশ গাথা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। স্বদেশ জাগাইবার গাথাগুলিতে নূতন ভাব বড় নাই, তবে গানগুলি সুরচিত বলিতে পারা যায়।

(৪) পল্লীবিলাপ ছাত্রভাণ্ডার হইতে প্রকাশিত। সম্ভবতঃ কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রের রচনা। পল্লীগুলি যাহাতে পরিত্যক্ত না হয়, সেজন্য কবিতায় পল্লীর গৌরব লিখিত হইয়াছে। ছাপা খুব ভাল।

(৫) বিজনে বিলাপ—শ্রীঅনাথবন্ধু মজুমদার প্রণীত। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, "কবিতা গুলিন্ স্বজাতীয় ভাবাপন্ন হওয়া বিধায়, আমার ভরসা আছে, যে দোষ দৃষ্ট হইলেও মার্জ্জনীয় হইবে।"

৫। স্বদেশ সেবার উপায়—(১) বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকা। লোকে যাহাতে সুবিধামত ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারে, নানা রকম কৌশল অবলম্বন করিয়া প্রয়োজনের জিনিষ পত্র প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার সাহায্যের জন্য এই পত্রিকায় নানাবিধ কথা প্রকাশিত দেখিলাম। এ পত্রিকা ভাল ভাবে পরিচালিত হইতে পারিলে মঙ্গলের কথা।

(২) উল্লিখিত বঙ্গলক্ষ্মীর উপহার স্বরূপে প্রকাশিত তিন খানি গ্রন্থ: শ্রীসতীশচন্দ্র কবিরত্ন প্রণীত। (ক) শিল্পভাণ্ডার, (খ) কৃষি-ভাণ্ডার, এবং (গ) গৃহস্থালী। তিন খানিতেই অনেক আবশ্যকীয় কথা আছে।

(৩) সচিত্র বয়ন বিদ্যা—বা তাঁত শিক্ষা শ্রীক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন সম্পাদিত। ৭০ পৃষ্ঠার এই বই খানির দাম ৬০; এটা খুব বেশি। প্রথম শিক্ষার পক্ষে বইখানি উপযোগী।

(৪) ভাত আর তাঁত। (গদ্য ও পদ্য)—কাজের কথা সোজাসুজি বলাই ভাল; পদ্য কেন? গ্রন্থখানিতে জ্ঞাতব্য বিষয় বড় অধিক নাই।

৬। (১) বারিদনাদ বধ (ব্যায়োগ), (২) দ্রৌপদীচীরহরণ (নাটক), (৩) বীর বালিকা (ক্ষুদ্র উপন্যাস), (৪) বামন বিনোদ (কয়েকটি দেব স্তোত্র), এবং (৫) শঙ্কা-ভঁর উচ্ছেদ (শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা)। গোস্বামী শ্রীবামনাচার্য্য গিরি এই পাঁচখানি হিন্দি গ্রন্থের প্রণেতা।

পরিব্রাজক। স্বামী বিবেকানন্দ। মূল্য ৬০ আনা। এই পুস্তকখানি সুদৃশ্য ও সুমুদ্রিত। ইহা স্বামী বিবেকানন্দের একবার বিলাতযাত্রার পথের বৃত্তান্ত। কিন্তু কেবল ভ্রমণবৃত্তান্ত নহে। ইহা যেমন সুখে আগ্রহের সহিত পড়া যায়, তেমনই শিক্ষাপ্রদ। ইহার পত্রে পত্রে লেখকের স্বদেশহিতৈষণার ও স্বজাতির উপর বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সকল মতের সহিত আমাদের মতের মিল নাই। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আমরা সকলকে ইহা পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। পুস্তকখানির ভাষায় দুটি দোষ দেখিলাম। স্থানে স্থানে ইয়ারকির হাল্কা সুরটার মাত্রা কিছু বেশী বোধ হইল। দু' এক যায়গায় "স্ত্রী" শব্দের গ্রাম্য ইতর প্রতিশব্দ অকারণ ব্যবহার করা হইয়াছে। ৯ পৃষ্ঠায় মুসলমানদিগকে "নেড়ে" না বলিলেই ভাল হইত। বিশেষতঃ যখন স্বামীজি পুস্তকের অন্যত্র তাহাদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধাই দেখাইয়াছেন। পুস্তকের শিক্ষণীয় বিষয় প্রায় নির্ভুলই বোধ হইল। কেবল মানবজাতির বিভাগ অংশতঃ অসম্পূর্ণ বোধ হইল। পুস্তক হইতে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"এই সকল বাঙ্গালী খালাসি, কয়লাওয়ালা, খানসামা, প্রভৃতির কাষ দেখে, স্বজাতির উপর যে একটা হতাশ বুদ্ধি আছে, সেটা অনেকটা কমে গেল। এরা কেমন আস্তে আস্তে মানুষ হয়ে আস্‌ছে, কেমন সবলশরীর হয়েছে, কেমন নির্ভীক অথচ শান্ত। সে নেটিভি পা-চাটা ভাব মেথর-গুলোরও নেই, কি পরিবর্ত্তন!"

"দেশী মাল্লারা কাষ করে ভাল, মুখে কথাটা নাই, আবার সিকি খানা গোরার মাইনে। বিলাতে অনেকে অসন্তুষ্ট; বিশেষ অনেক গোরার অন্ন যাচ্ছে দেখে, খুসী নয়। তারা মাঝে মাঝে হাঙ্গাম তোলে। আর ত কিছু বল্‌বার নেই; কাযে গোরার চেয়ে চটুপটে। তবে বলে, ঝড় ঝাপ্‌টা হলে, জাহাজ বিপদে পড়্‌লে, এদের সাহস থাকে না। হরিবোল হরি! কাযে দেখা যাচ্ছে—ও অপবাদ মিথ্যা। বিপদের সময় গোরা-গুলো ভয়ে, মদ খেয়ে, জড় হয়ে, নিকম্মা হয়ে যায়। দেশী খালাসি এক ফোঁটা মদ জন্মে খায় না, আর এ পর্য্যন্ত কোন মহা বিপদে একজনও কাপুরুষত্ব দেখায় নাই। বলি, দেশী সেপাই কি কাপুরুষত্ব দেখায়? তবে নেতা চাই। জেনেরল ষ্ট্রং নামক এক ইংরাজ বন্ধু সিপাহীর হাঙ্গামার সময় এ দেশে ছিলেন। তিনি গদরের গল্প অনেক করতেন। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করা গেল যে, সিপাহীদের এত তোপ বারুদ রসদ হাতে ছিল, আবার তারা নিজে সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী, তবে এমন কোরে হেরে মলো কেন? জবাব দিলে যে তাদের মধ্যে যারা নেতা হয়েছিল, সে গুলো অনেক পেছন থেকে "মারো বাহাদুর" "লড়ো বাহাদুর" কোরে চেঁচাচ্ছিল; অফিসার এগিয়ে মৃত্যুমুখে না গেলে কি সিপাহী লড়ে? সকল কাযেই এই। "শিরদার ত সরদার"; মাথা দিতে পার ত নেতা হবে। আমরা সকলেই ফাঁকি দিয়ে নেতা হতে চাই; তাইতে কিছু হয় না, কেউ মানে না!"

"আর্য্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরবঘোষণা দিন রাতই কর, আর যতই কেন আমরা "ডম্মম্" বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি!! যাদের "চলমান শ্মশান" বলে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্ত্তমান জীবন আছে, উহা তাদেরই মধ্যে। আর

"চলমান শশ্মান" হচ্চ তোমরা। তোমাদের বাড়ী ঘর দুয়ার মিউসিয়ম, তোমাদের আচার, ব্যবহার, চাল, চলন দেখ্‌লেও বোধ হয়, যেন ঠান্‌দিদির মুখে গল্প শুন্‌ছি। তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও, ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম! এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা, তোমরা; ভারতের উচ্চ বর্ণেরা। তোমরা ভূত কাল, লঙ্, লুঙ্, লিট্ সব এক সঙ্গে। বর্ত্তমানকালে, তোমাদের দেখ্‌ছি বলে, যে বোধ হচ্চে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ লোপ্‌লুপ্। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরি কচ্চ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন-কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না? ঁহ তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্ব্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্ব্বকালের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই, এখন ইংরাজরাজ্যে, অবাধ বিদ্যাচর্চ্চার দিনে, উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপ্‌ড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুটো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্‌টে দিতে পারবে আধখানা রুটী পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটী চুপ করে দিন রাত খাটা, এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি,—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও, হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটিজীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি "ওয়াহ গুরু কি ফতে"।*"

"ঐ যারা চাষাভুষা তাঁতি জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য, বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমান কাল নীরবে কায কোরে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না! কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য, ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমার নীরব, অনবরত নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরাণ, আলকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগ্‌দাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্ত্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য! আর তুমি?—কে ভাবে একথা। স্বামীজি! তোমাদের পিতৃপুরুষ দু'খানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্য-জাতির যা কিছু উন্নতি? তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্ম্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য, কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে, অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি, নির্ভীক কার্য্যকারিতা! আমাদের গরীবরা যে ঘর দুয়ারে দিন রাত মুখ বুজে কর্ত্তব্য কোরে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কায হাতে এলে অনেকেই বীর হয়। ১০ হাজার লোকের বাহবার সামনে, কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্য্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিস্বার্থতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা, ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী! তোমাদের প্রণাম করি।"

"তবে একটা কথা বলে রাখি, গরীব নিম্নজাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগলো, তখন থেকেই ইউরোপ উঠতে লাগলো। রাশি রাশি, অন্য দেশের, আবর্জ্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত দুঃখী গরীব আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায়; এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড! বড়মানুষ, পণ্ডিত, ধনী, এরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করলে, কিছুই এসে যায় না, এঁরা হচ্ছেন শোভা মাত্র, দেশের বাহার। কোটি কোটি গরীব নীচ যারা, তারাই হচ্ছে প্রাণ। সংখ্যায় আসে যায় না, কায়মনবাক্য যদি এক হয়; একমুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে পারে, এই বিশ্বাসটি ভুলোনা। বাধা যত হবে, ততই ভাল; বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে জিনিষ যত নূতন হবে, যত উত্তম হবে, সে জিনিষ প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাইত সিদ্ধির পূর্ব্ব লক্ষণ। বাধাও নাই সিদ্ধিও নাই। অলমিতি॥"

"আজ ২৩শে অক্টোবর; কাল সন্ধ্যার সময় পারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ পারিস সভ্যজগতের এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিক্‌দেশসমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশদেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ পারিসে। এ মহা কেন্দ্রের ভেরী-ধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্ব্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জর্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভ মণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির,

* গুরুই ধন্য হউন, গুরুই জয়যুক্ত হউন। উহা পাঞ্জাব প্রদেশের শিখ্‌সম্প্রদায়ের উৎসাহবাক্য এবং রণসঙ্কেত।

নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বোস! একা, যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্য মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ বসু ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধন্য বীর। বসুজ ও তাঁহার সতী, সাধ্বী, সর্ব্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধন করেন। ধন্য দম্পতী!"

মেরীকার্পেণ্টার। শিখের বলিদান নামক নবজীবনপ্রদ সুন্দর বহিখানির লেখিকা শ্রীকুমুদিনী মিত্র, বি. এ., প্রণীত, মূল্য।● আনা। একখানি চিত্র সহিত। প্রাতঃস্মরণীয়া মেরীকার্পেণ্টারের এই সুলিখিত জীবন চরিত খানি পড়িলে বঙ্গনারীগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন। আমাদের দেশের নারীগণের (শিক্ষিতা মহিলাগণেরও) কার্য্যক্ষেত্র, ইংরাজ-মহিলাদের কার্য্যক্ষেত্র হইতে স্বতন্ত্র রকমের। কিন্তু মহৎ জীবনের নকল করিয়া ত কেহ বড় হয় না। সেই জীবন হইতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়াই উন্নত জীবন লাভ করা যায়। অতএব সর্ব্বদেশের পুতশীলা নারীগণের জীবনচরিত আমাদের পাঠ্য। এই জন্য এই সুলিখিত পুস্তিকা-খানি আমাদের বালিকা, যুবতী ও প্রবীণাদের হাতে দিবার বন্দোবস্ত করা উচিত। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ বেশ সুন্দর।

জাপানপ্রভা। শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য বিরচিত। মূল্য ৵৹ আনা। জাপানরুষ যুদ্ধের কয়েকটি ঘটনা লইয়া এই কবিতা গ্রন্থ খানি নাট্যাকারে রচিত। ইহার কবিতা যেমন সরল, তেমনই উদ্দীপনাপূর্ণ। বালক-বালিকাগণ ইহা মুখস্থ করিয়া অভিনয় করিলে প্রাণে পবিত্র স্বদেশপ্রেম ও তেজের সঞ্চার হয়। আমরা ইহার অংশবিশেষের অভিনয় শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

গুলবাহার। শ্রীইন্দ্রপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৵৹। ইহাও একটি কবিতা পুস্তক। নাটকাকারে লিখিত। গুলবাহারের ইতিহাস অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী। এই পুস্তকখানি সরল ও সুমিষ্ট ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বালকবালিকাদিগের পাঠের ও অভিনয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী।

কালার কথা। শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা একখানি পদ্য বা গানের বহি।

গৃহ-শিক্ষা শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত প্রণীত। মূল্য বার আনা। ইহা ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য, নীতি, বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষাবিষয়ক একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। গ্রন্থের অন্তরাবরণে যে প্রবচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে গ্রন্থের উদ্দেশ্য সহজে বুঝা যায়, যথা- "The country needs nothing so much to promote its regeneration as good mothers." সুমাতা কেমন করিয়া হইতে হয় সে সম্বন্ধে পাঁচটি বিশিষ্ট অধ্যায়ে মাতা তাঁহার দুই কন্যাকে উপদেশ দিতেছেন। উপদেশগুলি কথোপকথনচ্ছলে রচিত; এবং দুই কন্যা (একজন সন্তানের জননী এবং অপরা অনূঢ়া বিদ্যার্থিনী) দ্বারা গ্রন্থোক্ত বিষয়গুলি কেবল নীরস উপদেশমালা না হইয়া সরস আলোচনাতে পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিতেছেন "গৃহ-শিক্ষা একটা জিনিষ, আমাদের দেশে নাই। অথচ জীবনের উন্নতি প্রায় ষোল আনা ইহার উপর নির্ভর করে। দেশের ছেলে মেয়েগুলোকে যদি মানুষ করিয়া তোলা যায়, তবে বোধ হয় দেশের উন্নতির জন্য এত আর ভাবিতে হয় না।" গ্রন্থের এক স্থলে "মা" বলিতেছেন "যে শিক্ষার গুণে ছেলে মেয়েদের চরিত্র সুন্দর হয়, সে শিক্ষা আমরা পরিবারের মধ্যে শিখি। নম্রতা, ভদ্রতা, সৎসাহস, সত্যবাদিতা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি চরিত্র-গুণ পারিবারিক শিক্ষার উপর নির্ভর করে।" ইহা হইতে সহজে বুঝা যায় যে ছেলে মানুষ করিতে হইলে জননীর কি করা কর্ত্তব্য তাহা শিক্ষা দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার কৃতবিদ্য ব্যক্তি। তাঁহার ভাষাও সহজ। বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া যেখানে যে কথা বলা দরকার, এবং কোন কথা সাধারণ বাঙ্গালি মেয়ের দুর্ব্বোধ হইলে যেমন করিয়া প্রশ্ন করিয়া তাহা সুবোধ করা যাইতে পারে গ্রন্থকার তাহাতে বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আজকাল যেমন গৃহে গৃহে পাকপ্রণালী প্রভৃতি গ্রন্থমালা দেখা যায়,তাহা অপেক্ষা এই গ্রন্থ প্রত্যেক সন্তানের জননীর নিকট অত্যধিক আদরণীয় ও উপাদেয় প্রতিপন্ন হইবে। সুভোজ্য আহারের তৃপ্তি ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু সুসন্তান দ্বারা মানুষের তৃপ্তি, অপর্য্যাপ্ত ও আজীবন স্থায়ী। সেই সুসন্তান কি উপায়ে লাভ করা যায় তাহার প্রণালী এই গ্রন্থে অতি বিশদ ভাষায় বুঝান হইয়াছে। আমাদের বিশেষ অনুরোধ প্রত্যেক জননী এই গ্রন্থখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করেন।

পতিত।

দিয়েছিলে দিব্য দৃষ্টি পবিত্র হৃদয়,
দিয়েছিলে হাসি মুখ, কণ্ঠ মধুময়;
পরাইয়া দিয়েছিলে সুন্দর বসন
গলে পারিজাতমালা দিলে অনুপম;
আসন পাতিয়া দিলে অমর-সভায়
শুনালে মধুর কণ্ঠে সঙ্গীত আমায়—
নাহি মৃত্যু, নাহি ভয়, নাহি অন্ধকার,
নাহি সেথা জীবনের শোকতাপভার,
আলোকের দেশ সে যে আনন্দের ধাম,
চারিদিকে উঠে শুধু আনন্দের গান,—
বুঝালে কি গান উঠে শূন্য দেশ হতে,
কি রাগ রাগিণী ছুটে—চৌদিকে জগতে;
খুলি দিলে আঁখি মোর—নাশিলে আঁধার
দেখিলাম কভু যাহা দেখিব না আর।

স্পর্শিলে হৃদয় তন্ত্রী, উঠিল ঝঙ্কার,
শিরায় শিরায় হলো তাড়িত সঞ্চার।
জাগিল নূতন আশা, দূরে গেল ভয়,
অদম্য উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হলো এ হৃদয়;
দেখিনু মানসনেত্রে, নিখিল জগতে,
ঊর্দ্ধে, নিম্নে পার্শ্বদেশে, সমুখে পশ্চাতে,
হে দেবি, তোমারি লীলা—আছ দাঁড়াইয়ে,
জগতের কেন্দ্রস্থলে হাতে বীণা লয়ে!
মধুর ঝঙ্কারে মুগ্ধ স্থাবর জঙ্গম,
সে মহা সঙ্গীতে পূর্ণ চরাচর ব্যোম।
সূর্য্যচন্দ্র গ্রহতারা জ্যোতিষ্কমণ্ডল,
তালে তালে করে নৃত্য হইয়ে বিহ্বল।
সঙ্গীতপ্রবাহ নামি আসিল ধরায়,
জড় নর সে সঙ্গীতে আত্মহারা প্রায়।
সেই সুর ফুটে উঠে ধরণীর ক্রোড়ে
পুষ্প হয়ে,—ফুটে উঠে পাখীর সুস্বরে,
বারিধি গম্ভীর নাদে, সেই গান গায়,
তটিনী করুণ কণ্ঠে সে গান বিলায়।
সেই সুর ফুটে উঠে মানবহৃদয়ে
প্রেম ভক্তি ভালবাসা দয়া মায়া হয়ে;
সেই সুরে মত্ত হয় বীরের হৃদয়,
সে ভাবে বিভোর কবি মগ্ন হয়ে রয়;
স্তিমিত লোচন যোগী নিস্পন্দ নিশ্চল
সেই ভাব উদ্দীপিত করিছে কেবল।
দেখিলাম আরো কত তোমার কৃপায়
স্মৃতি মাত্র আছে তার, স্বপনের প্রায়।

কোথা তুমি সঙ্গীতের রাণি,
কোথা তুমি কোথায় লুকালে?
বরষ বরষ চলে গেল,
তবু তুমি দেখা নাহি দিলে।

কত দিন সে মাধুরী তব
দেখে নাই নয়ন আমার,
কত দিন পশেনি শ্রবণে
সে মধুর বীণার ঝঙ্কার।

কোথা গেল আসন আমার
কোথা গেল সুন্দর বসন,
কোথা গেল আলোকের দেশ
কোথা গেল সে দিব্য নয়ন?

জানি নাক কোন দেশ হতে
সুন্দরী ললনা এক এল
অঙ্গে তার হীরক মুকুতা
নয়ন আমার ঝলসিল;

গর্ব্বে তার ভরা সর্ব্ব দেহ,
নয়নেতে লালসা প্রবল,
পৃথিবীরে শাসন করিতে,
ধাতা তারে জন্ম যেন দিল;

অবজ্ঞার হাসি মুখে তার
বলে "মূর্খ কি করিস্ বসে,
"ছায়া লয়ে কি হবে তোমার"
"ভাব লয়ে মরিবে কি শেষে"

"চল সঙ্গে আমার আবাসে"
"দিব তোরে নূতন আসন"
"উচ্চ স্থানে, দেখিবে সকলে"
"পরাইব উজ্জ্বল বসন"

"শিখাইব নব ভাব ভাষা"
"পাবে তাতে সুখ্যাতি সম্মান"
"নব নব বাসনা জাগাব"
'মিটাবার দেখাব সোপান'

"আলেয়ার পিছনে পিছনে
"মিছে কেন মর ছুটে ছুটে"
"যশ মান যদি পেতে চাও
"থাক তবে আমার নিকটে"

মন্ত্রমুগ্ধ ফণীর মতন
তেজ দর্প সব হারাইয়ে
গিয়েছিনু পিছু পিছু তার
কুহকিনী রেখেছে ভুলায়ে।

দৃষ্টি-শক্তি পুড়ে হলো ছাই,
লালসার প্রবল অনলে,
সৌন্দর্য্য দেখিতে শক্তি নাই,
পরাণে বাসনা শুধু জ্বলে।

কর্কশ কণ্ঠের কলরবে
হইয়াছে বধির শ্রবণ,
ছুটে লোকে দিশেহারা হয়ে
কে কারে জিতিতে পারে পণ।

ভাব ভাষা হয়েছে বিকৃত,
শিখিয়াছি চাতুরী ছলনা,
ভয়ে ভয়ে কাটে নিশি দিন
যশ লভি করি প্রবঞ্চনা।

রক্ষা কর, কাজ নাই যশে,
চাহি না গো সুখ্যাতি গৌরব,
কেড়ে লও ছদ্মবেশ মোর
কেড়ে লও বিষয় বিভব।

হে দেবি, কর মোরে পথের ভিখারী
এক বিন্দু লজ্জা নাই তায়,
কিন্তু কর তোমার সেবক
স্থান যেন মিলে তব পায়।

নয়নে অঞ্জন দিয়ে দাও
নষ্ট হোক আঁখির গরল,
কোমল পরশে, ওগো দেবি,
কর প্রাণ অমল ধবল।

বিকল হৃদয়তন্ত্রী মোর
বেঁধে দাও সুরেতে তোমার,
মত্ত হোক তাহার ঝঙ্কারে
দিবানিশি জীবন আমার।

এক বিন্দু কৃপাবারি দিয়ে
ভাব ভাষা কর সঞ্জীবিত
শীত গেলে আসে ত বসন্ত
শুষ্ক তরু হয় মুঞ্জরিত।

শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

BHARAT-MATA.

ABANINDRA NATH TAGORE.

We have here a picture which bids fair to prove the beginning of a new age in Indian art. Using all the added means of expression which the modern period has bestowed upon him, the artist has here given expression nevertheless to a purely Indian idea, in Indian form. The curving line of lotuses and the white radiance of the halo are beautiful additions to the Asiatically-conceived figure with its four arms, as the symbol of the divine multiplication of power. This is the first masterpiece, in which an Indian artist has actually succeeded in disengaging, as it were, the spirit of the motherland,—giver of Faith and Learning, of Clothing and Food,—and portraying Her, as she appears to the eyes of Her children. What he sees in Her is here made clear to all of us. Spirit of the motherland, giver of all good, yet eternally virgin, eternally rapt from human sense in prayer and gift. The misty lotuses and the white light set Her apart from the common world, as much as the four arms, and Her infinite love. And yet in every detail, of *shankha* bracelet, and close-veiling garment, of bare feet, and open, sincere expression, is she not after all, our very own, heart of our heart, at once mother and daughter of the Indian land, even as to the rishis of old was Ushabala, in her Indian girlhood, daughter of the dawn?

Nivedita—of Rk-V.

ভারত-মাতা।

এই ছবিখানি ভারতীয় চিত্রশিল্পে এক নবযুগের প্রারম্ভ সূচনা করিবে বোধ হয়। সত্য বটে ভাব ও চিন্তা ব্যক্ত করিবার আধুনিক যুগের নববিধ উপায়ের সাহায্য লইয়া অবনীন্দ্র বাবু এই ছবি আঁকিয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলেও চিত্রপটে তৎকর্ত্তৃক পরিব্যক্ত মানসিক আদর্শটি খাঁটি ভারতের জিনিস, আকার প্রকারও ভারতীয়। পদ্মগুলির বক্ররেখা ও শিরোবেষ্টক প্রভামণ্ডলের শুভ্র দীপ্তি সংযোগে

এশিয়োদ্ভূত কল্পনাজাত মূর্ত্তিটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। চারিবাহু দৈবশক্তির বহুত্বের চিহ্ন স্বরূপ। ইহাই প্রথম উৎকৃষ্ট ভারতীয় চিত্র, যাহাতে একজন ভারতীয় শিল্পী যেন মাতৃভূমির অধিষ্ঠাত্রীকে—ভক্তিদায়িনী, বিদ্যাদাত্রী, বসনদায়িনী, অন্নদা মায়ের আত্মাকে—দেশরূপী শরীর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহার সন্তানগণের মানসনেত্রে তিনি যেরূপে প্রতিভাত হন, সেইভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। মায়ে শিল্পী কি দেখিয়াছেন, তাহা এই চিত্রে আমাদের সকলের কাছে বিশদ হইয়া গিয়াছে।—কুহেলিকার মত অস্পষ্ট পদ্মরাজি ও শ্বেত আভা, তাঁহার চারিবাহু ও অনন্ত প্রেমেরই মত, তাঁহাকে অতিমানব করিয়া রাখিয়াছে। অথচ তাঁহার শাঁখা, তাঁহার সর্ব্বদেহাচ্ছাদক পরিচ্ছদ, তাঁহার খালি পা, তাঁহার খোলা, অকপট মুখের ভাব, এই সকলে তিনি কি আমাদের পরম আত্মীয়, আমাদের হৃদয়ের হৃদয়, একাধারে ভারতের মাতা ও দুহিতা বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন না?—প্রাচীনকালের ঋষিদিগের নিকট বৈদিক উষা যেমন ছিলেন?

রামকৃষ্ণবিবেকানন্দমণ্ডলীভুক্তা নিবেদিতা।

পারস্য পুষ্পমালা।

১

"আমদ্ বাহারে হরকস্, নামদ্ বাহারে মা,
গুল্ দর্ কেনারে হরকস্, খম্ দর্ কেনারে মা।"

*

সবার বসন্ত এল, এল না আমার।
পুষ্পাঞ্চল সবাকার, দুঃখই আমার॥

২

"উরফি আগর্ বগরিয়া ময়স্সর্ শুদে বিশাল,
সদ্সাল্ নেসস্তা বতমন্না মিতআঁ গিরিস্তন্।"

*

কাঁদিলে তাহারে যদি ফিরাইয়া পাওয়া যেত,
রে উরফি, ইচ্ছা করে' কাঁদিতাম বর্ষ শত।

৩

"মান্দে আম্ আজ্ ইয়ার্ দূর্ ও জেন্দে আম্।
জিঁ গুনাহ্ তা জেন্দে আম্ শর্মেন্দা আম্॥"

*

বন্ধু হ'তে বহুদূরে তবুও জীবিত।
এ দোষে যাবৎ প্রাণ রহিব লজ্জিত॥

৪

"দরদ্ সরে দোস্তান্ আহ্ ও ফেগাঁ মনস্ত্
কাহেসে জান্ তবিব্ দর্দ্ নেহা মনস্ত্॥"

*

প্রিয়দের শিরঃপীড়া ও মম মনস্তাপ
গুহাগুপ্ত; চিকিৎসক কেমনেতে পাবে মাপ।

৫

বিগুজর্ আয় নসিম্ সবা সুবেহ্ দম্ বতরফ্ চমন্
বুকহতে বেয়ার্ আজাঁ গুল্এজার ঘুঞ্চয়ে দহন্।"

*

প্রাতের শীতল বায়ু বাগানের দিকে ছুট,
মুখগন্ধ বহ যার পুষ্পগণ্ড পুষ্পপুট।

"আবর্ বাহার গিরিআঁ, ও বুনে চশম্ খুঁ ফেশাঁ হাম্।
বুলবুল্ ববাঘ্ নালা, আশক্ বসদ্ ফেগাঁ হাম্"

*

বসন্তের মেঘ বর্ষে ধারা, চক্ষুকোণে শোণিত বর্ষণ,
বাগানে বুলবুল কাঁদিছে, প্রেম করে সহস্র ক্রন্দন।

৭

"রোজ্ মারা সাখ্ত্ চুঁ শবে তীরা আঁ মাঃ আজ
ফেরাখ্।
চন্দ্ সোজম্ আজ্ ফেরাখ্, আহ্ আজ্ ফেরাখ্,
আহ্ আজ্ ফেরাখ্॥"

*

প্রেমচন্দ্র বিরহেতে মোর দিন অন্ধকার—
রাত্রি হ'ল জ্বালাময়, বিচ্ছেদে তাহার,
ওগো বিচ্ছেদে তাহার।

৮

"কম্‌জর্ফ্‌ অগর্‌ বুজুর্গ শবদ্‌
ইজাদেহদ্‌ দোস্তরা।
আনার্‌ অগর্‌ পোক্ত ববদ্‌
পারা কুলদ্‌ পোস্তরা।"

*

ক্ষুদ্র যদি বড় হয় বন্ধুজনে নাশে,
সুপক্ক ডালিম ত্বক্‌ বিদরে অনা'সে।

৯

"হর সোখ্‌তা জানি কে বকাশ্মীর্‌ দর আয়েদ্‌
গর্‌ মোর্গ্‌ কবাব্‌ আস্ত্‌ কে বা বাল্‌ ও পর্‌ আয়েদ্‌।"

*

যে-সকল দগ্ধ প্রাণী কাশ্মীরেতে যায়—
মোরগ হ'লেও ভাজা পালক গজায়।*

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রাহকদিগের দ্রষ্টব্য।

আমরা ১লা আশ্বিন ১৭ই সেপ্টেম্বর আশ্বিন মাসের কাগজ ডাকঘরে দিব। পূজার ছুটি উপলক্ষে যাঁহাদের ঠিকানা পরিবর্ত্তন করা দরকার, তাঁহারা ডাকঘরেই উহা করিয়া লইলে বাধিত হইব। আমাদিগকে যদি কেহ ঠিকানা বদলাইতে বলেন, তাহা হইলে গ্রাহকনম্বর দিতে হইবে। নতুবা ঠিকানা বদলান হয় না। কেহ কেহ গ্রাহকনম্বর লেখেন C. 277। উহা গ্রাহকনম্বর নহে। প্রবাসীর মোড়কে গ্রাহকের নামের উপর হাতের লেখা যে সংখ্যাটি থাকে, তাহাই গ্রাহকনম্বর।

অনেক গ্রাহক বহু বিলম্বে, এমন কি ২।১ মাস পরে, কোন মাসের কাগজ পান নাই বলিয়া দাবী করেন। তাঁহারা যে মিথ্যা কথা বলেন, তাহা নয়। কিন্তু যখন যে গ্রাহক কাগজ পান নাই বলিবেন, তখনই অমনি তাঁহাকে তাহা দিতে হইবে, এরূপ নিয়ম কোথাও নাই। মাসের প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে খবর দিলে ডাকঘরে অনুসন্ধান হইতে পারে; পরে অনুসন্ধানে কোন ফল হয় না। যথাসময়ে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিলে অনেক সময় দেখা যায় যে অভিযোগকারী গ্রাহক কাগজ পাইয়াছেন।

বহু বিলম্বে কাগজ না পাওয়ার খবর দিলে আমরা যদি কাগজ পুনর্ব্বার বিনামূল্যে দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করি, তাহা হইলে অনেক গ্রাহক অভদ্র ভাষা ব্যবহার করেন, আমাদিগকে প্রবঞ্চক বলেন; কেহ কেহ নানাপ্রকার ভয় দেখান, ও এরূপ ভাব প্রকাশ করেন যেন ৩৷৵০ দিয়া গ্রাহক হইয়া তাঁহারা প্রবাসীর স্বত্বাধিকারীর মাথাটা কিনিয়া লইয়াছেন। এই সকল অল্পবুদ্ধি লোকদের বুঝা উচিত যে কাগজের মূল্য দেওয়া ও মূল্য লওয়া একটা সাধারণ বাণিজ্যের ব্যাপার; ইহাতে কোন পক্ষই অনুগ্রাহক বা অনুগৃহীত নহেন।

প্রবাসীর নিয়মানুসারে যাঁহারা গ্রাহক হওয়া বা থাকা অসুবিধাজনক বা কষ্টকর মনে করেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমার এই অনুরোধ যে তাঁহারা যেন ইহার গ্রাহক না হন। ইতি

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
৩০শে শ্রাবণ, ১৩১৩।

* ইহা কাশ্মীরের স্বাস্থ্যপ্রদান-ক্ষমতার প্রশংসাবাচক।

৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু।

Block by U. Ray. Kuntaline Press, Calcutta.

প্রবাসী

"Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters.
"to look on noble forms
Makes noble thro' the sensuous organism
That which is higher."—*Tennyson.*

৬ষ্ঠ ভাগ। | আশ্বিন, ১৩১৩। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সর্ব্ববিধ সংস্কার পরস্পরসাপেক্ষ।

অনেকে সংস্কারের নামেই ভয় পান। কিন্তু যদি পরিবর্ত্তন বা উন্নতি শব্দটি ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে হয় ত তাঁহাদের ততটা ভয় হয় না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, সংস্কারকে ভয় করার অর্থ এই যে আমরা যে বিষয়ে সংস্কার ভালবাসি না, তাহাকেই ভয় করি। ভারতবাসী ইংরাজেরা সাধারণতঃ রাজনৈতিক সংস্কারের বিরোধী, কিন্তু সমাজসংস্কারের বা ধর্ম্মসংস্কারের বিরোধী নয়; যদিও ধীরে ধীরে সে বিষয়েও তাহাদের ভাবগতিক পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কারণ, সমাজসংস্কার ও ধর্ম্মসংস্কারের সহিত রাজনৈতিক সংস্কারের সম্পর্ক আছে। আমাদের দেশের জনকতক চাকুরীপ্রার্থী ও উপাধিপ্রার্থী ছাড়া অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেই রাজনৈতিক সংস্কারের পক্ষপাতী। কিন্তু অনেকে সমাজসংস্কার ও ধর্ম্মসংস্কারের বিরোধী। আবার অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোক ধর্ম্ম ও সমাজবিষয়ে সংস্কার প্রয়াসী, কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কারবিষয়ে তাঁহারা তাঁহাদের অবশিষ্ট শিক্ষিত স্বদেশবাসীদিগের সহিত একমত নহেন। শৈক্ষিক, স্বাস্থ্যিক ও আর্থিক উন্নতি ও সংস্কার বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের মতভেদ আছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক লোক শিক্ষাবিষয়ে সংস্কার ও উন্নতি চান, কিন্তু তাঁহারা রাজনৈতিক সংস্কারবিষয়ে উদাসীন বা তাহার বিরোধী।

যাহা হউক, ইহা একপ্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সকল শিক্ষিত ও চিন্তাশীল লোকেই কোন-না-কোন প্রকারের সংস্কার, উন্নতি বা পরিবর্ত্তন চান। কিন্তু অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সংস্কার পরস্পরসাপেক্ষ; কোন এক বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় সংস্কার সাধন করিতে হইলে অন্যান্য নানা বিষয়ে সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই প্রবন্ধে এই কথাই সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

১। রাজনৈতিক সংস্কার।

রাজনৈতিক সংস্কারের কথাই আগে ধরি; কারণ এই বিষয়েই আমাদের দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষিত লোকের আগ্রহ দেখা যাইতেছে।

ধর্ম্মের সহিত রাজনৈতিক সংস্কারের কি সম্পর্ক তাহা বিশেষভাবে বলিবার পূর্ব্বে, সাধারণতঃ সর্ব্ববিধ সংস্কারের সহিত ধর্ম্মের কি সম্পর্ক তাহা বলিয়া রাখি। তাহা হইলে অনেক পুনরুক্তির হাত হইতে বাঁচা যাইবে। যে বিষয়েই সংস্কার করিতে চেষ্টা করুন না, তাহাতে কোন-না-কোন

শ্রেণীর লোকের স্বার্থে আঘাত লাগিবে। সুতরাং তাহারা উহার বিরোধী হইবে। তজ্জন্য সংস্কারককে অল্পাধিক লোকের বিরাগভাজন ও নিন্দাভাজন হইতে হইবে; তাঁহাকে বিদ্রূপ সহিতে হইবে, অত্যাচার উৎপীড়ন সহিতে হইবে, হয় ত স্থলবিশেষে স্বাধীনতা বা প্রাণ হারাইতে হইবে। দৃঢ় কর্ত্তব্যজ্ঞান ব্যতিরেকে মানুষ প্রকৃত সংস্কারক হইতে পারে না। যাহা ভাল, তাহার দিকে মানুষের কেমন একটা প্রাণের টান আছে। এই প্রাণের টান যাহার যত বেশী, এই ভালটাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা যাহার যত বেশী, তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান তত প্রবল ও দৃঢ়। মানুষের ধর্ম্মমত নানাবিধ; নাস্তিকেরা ধর্ম্ম মানেন না বলেন; কিন্তু যাহা ভাল তাহাকে নিজ নিজ জীবনে ও অপরের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টাই ধার্ম্মিকতার আসল মাপকাঠি। যেখানে অযশ, অর্থনাশ, স্বাধীনতা-লোপ বা প্রাণনাশের ভয় আছে, সেখানে সংস্কারের পথে অটল থাকা যে সে লোকের কার্য্য নয়। যাঁহারা বিশ্বাস করেন, যে বিশ্বসংসার ন্যায়, সত্য ও পবিত্রতার নিয়মে বাঁধা, বিশ্বের প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মের উপর, বিশ্বের গতি সত্য, শিব ও সুন্দরের দিকে, তাঁহারাই সর্ব্ববিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সংস্কারের সমর্থক ও সংসাধক থাকিতে পারেন। তাঁহা-দিগকে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম, নাস্তিক ইত্যাদি যে নামেই ডাক না কেন, তাঁহারা ধার্ম্মিক লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা কি আশায় কি বিশ্বাসে নানা কুৎসা, বিভীষিকা ও উৎপীড়নের মধ্যে নিজের কাজ করিতে থাকেন? তাঁহাদের আশা ও বিশ্বাস এই যে তাঁহাদের চেষ্টা আপাততঃ বিফল হইতে পারে; কিন্তু যাহা ভাল, তাহা শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, হইবেই হইবে। এই বিশ্বাসকেই আমি ধর্ম্মবিশ্বাস বলি। ইহাই সর্ব্ববিধ সংস্কারের ভিত্তিভূমি। অনুকূল বাতাসে বা অল্প প্রতিকূল বাতাসে সংস্কারের পা'ল তুলিয়া জীবনস্রোতে ভাসিয়া যাইতে অধার্ম্মিক লোকেও পারে, কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রবিদ্যুতের মধ্যে সকল বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া শক্ত হাতে হাল ধরিয়া থাকা কেবল প্রকৃত ধার্ম্মিকের পক্ষে সম্ভবে।

রাজনৈতিক সংস্কার ও উন্নতির জন্য জগতে কত যুদ্ধ হইয়াছে, তাহা ইতিহাসপাঠকমাত্রেই জানেন। যে সকল দেশে যুদ্ধ হয় নাই, সেখানেও অনেক সংস্কারককে জেলে যাইতে বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইয়াছে। পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে দেখিতে পাইতেছি যে ম্যাট্‌সিনি, ওয়াশিংটন প্রভৃতি স্ব স্ব দেশের স্বাধীনতা সংস্থাপক মহাত্মাগণ ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও রুশিয়াতে যে স্বাধীনতার সমর চলিয়াছে, তাহাতে কত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি সাইবীরিয়ায় চিরনির্ব্বাসিত বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছেন। ইঁহারা বার বার অকৃতকার্য্য হইয়াও আশা ছাড়িতেছেন না। ইহার কারণ, বিশ্বনিয়ন্তার সনাতন মঙ্গলনিয়মে বিশ্বাস। আমাদের দেশে যে সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতাকে ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই, তাঁহারাও নিরাশার ঘন অন্ধকারের মধ্যে আশার কারণ এই মঙ্গলনিয়মেই দেখিতে পান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমরা সার্ ফিরোজ্ শাহ্ মেহতার গত বোম্বাই কংগ্রেসের বক্তৃতার একটি স্থলের উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলিয়াছেনঃ—"'আমি জগতের সৃষ্টি করি নাই, যিনি ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহাকে সুপথে চালাইবেন', আমি কবির এই বাক্য হইতে আশা ও সান্ত্বনা লাভ করি।"

ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতি ও রাজনৈতিক উন্নতির পরস্পর-সাপেক্ষতা ইতিহাস হইতে প্রমাণিত হয়। ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রীয় শক্তির অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে অনেক বৎসর হইতে মহারাষ্ট্রদেশে নামদেব, একনাথ, তুকারাম প্রভৃতি সাধুগণ জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। সমর্থ রামদাস স্বামী শিবাজীর গুরু ছিলেন এবং তাঁহাকে রাজনৈতিক বিষয়েও অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পঞ্জাবের শক্তিলাভ শিখ ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইতেই ঘটে। মুসলমানগণ ধর্ম্মোৎসাহে বলীয়ান হইয়াই এসিয়ার অধিকাংশ দেশ, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকা জয় করে। পিউরিটান ধর্ম্মবিপ্লবের সময় ইংলণ্ড সর্ব্বপ্রথম ইউরোপে শক্তিশালী জাতি হইয়া উঠে।

এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে যে ভাবে রাজনৈতিক সংস্কারের চেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে সংস্কারকদিগের বেশী ভয়ের কারণ জন্মে নাই। তথাপি ইতিমধ্যেই কাহারও কাহারও অর্থদণ্ড ও জেল হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভ

কোথাও কখনও সহজে হয় নাই। সুতরাং ইহা একপ্রকার নিশ্চিত যে আমাদের স্বাধীনতালাভের পূর্ব্বে অনেক সংস্কারপ্রার্থীর চিরনির্ব্বাসন হইবে, এবং অনেকের প্রাণ যাইবে। এখন রাজনৈতিক আন্দোলনে হুজুক্কে লোকমাত্রেই যোগ দিতে পারে, কয়েকজন দুর্বৃত্তলোকেও নেতা হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু যখন শাসক ও শাসিতের স্বার্থসংঘর্ষ ঘনাইয়া ঘোরতর হইবে, তখন এই সকল লোক রণে ভঙ্গ দিবে। কেবল সনাতন মঙ্গলনিয়মে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিবেন না।

রাজনৈতিকদিগের মধ্যে অনেক মিথ্যাবাদী, চক্রান্তকারী লোক আছে দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম্মের সম্পর্ক নাই। বাস্তবিক ইহা সত্য নহে। সকল দেশে পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যেও ত বিস্তর স্বার্থপর নীচাশয় দুর্বৃত্ত লোক দেখা যায়। তাহা হইলে কি আমরা মনে করিব, ধর্ম্ম জিনিসটা সব ফাঁকি? কোন মানুষই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে; কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে ম্যাট্‌সিনি, ওয়াশিংটন, ব্রাইট্‌, গ্লাড্‌ষ্টোন, মাইকেল ডেভিট্‌ প্রভৃতি বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন।

বাস্তবিক রাজনৈতিক সংস্কারের মানে কি? মানে এই যে কেহ উৎপীড়িত হইবে না, কাহারও প্রতি অবিচার হইবে না, সকলে নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার পাইবে, রাজ্যশাসনকার্য্যে যোগ্যতানুসারে সকলের ক্ষমতা থাকিবে, ভাল হইবার ও সুখী হইবার পথে কাহারও পক্ষে কৃত্রিম বাধাবিঘ্ন থাকিবে না। এই আদর্শের ভিত্তি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকট অনন্ত প্রেম ও ন্যায়পরায়ণতা এবং মানবের ভ্রাতৃত্বের উপর স্থাপিত তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। নাস্তিক নামধারী ব্যক্তিও এই আদর্শে বিশ্বাস করিলে ধার্ম্মিকপদবাচ্য। এই আদর্শে যাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহারাই প্রাণপণ করিয়া এই আদর্শ অনুসারে সারা জীবন পরিশ্রম করিতে পারেন। এই আদর্শ দেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা, যাহাকে সচরাচর ধর্ম্মসাধন বলা যায়, তদপেক্ষা কম পবিত্র ও আধ্যাত্মিক নহে।

এই আদর্শের সহিত সাম্যবাদ জড়িত। আমরা ইংরাজের সমান হইতে চাই। সুতরাং অন্ততঃ আমাদের বাক্যে ও আচরণে সঙ্গতি রক্ষার জন্যও আমাদিগকে, নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে উন্নত করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে আমাদিগের সমান অধিকার দিতে হইবে। নারীজাতির উন্নতি সাধন করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মে, সামাজিক অধিকারে আমাদের সমান করিতে হইবে। কিন্তু শুধু সঙ্গতি রক্ষার জন্যই যে এরূপ করিতে হইবে, তাহা নয়। ইহা না করিলে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ন্যায্য অধিকার পাইব না। আমাদের দেশের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যদি নিম্ন শ্রেণীর লোক দিগকে ঘৃণা করেন, মানবের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখেন, তাহা হইলে ত দেশের অধিকাংশ লোককে আমাদের শত্রুরা ভেদনীতি দ্বারা সহজেই নিজের দলে টানিয়া লইবে। শিক্ষিত শ্রেণীকে অগ্রাহ্য করিয়া সাধারণ লোকদিগকে সন্তুষ্ট রাখা লর্ড কার্জ্জনের শাসননীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সকল শ্রেণীর লোকে একপ্রাণ হইয়া, ভাই ভাই এক ঠাঁই হইয়া না খাটিলে আমরা কখনও রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইব না। এই জন্য জাতিভেদের মূলোচ্ছেদ করা চাই। অন্ততঃ, যদিই বা শ্রেণীবিভাগ থাকে, তাহা হইলেও অমুক বড় জাতি, অমুক নীচ জাতি, অমুক পবিত্র এবং অমুক অস্পৃশ্য, এই সংস্কারকে সমূলে বিনাশ করিতে হইবে। তাহার পর নারীদের কথা। যাহার মাতা, স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা, সংস্কারকার্য্যে সহায়, সে একা এক শ; কিন্তু ইহাঁরা বিরোধী হইলে কয় জন অক্লান্ত ভাবে, পূর্ণ উৎসাহে খাটিতে পারে? নারী যাহাতে আমাদের কাজে বাধা না দেন, কেবল তজ্জন্যই কি আমরা নারীকে উন্নত করিয়া মানবাত্মার সকল অধিকার দিব? তাহা নহে; নারী নিজেও দেশের মঙ্গলের জন্য খাটিবেন। দৃষ্টান্তের জন্য আমাদিগকে বিদেশে বা অতীত কালে যাইতে হইবে না। স্বদেশী আন্দোলনে দেখা যাইতেছে, যে পরিবারে, গ্রামে, সহরে, বা সম্প্রদায়ে নারী স্বদেশীকে প্রাণ দিয়া ধরিয়াছেন, তথায় স্বদেশী সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, অন্যত্র কেবল কথাই সার।

নিউজীলণ্ডে এবং ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌সের অনেক প্রদেশে নারীগণের রাজনৈতিক অধিকার পুরুষদের সমান। নারীগণের চেষ্টায় এই সকল স্থান মাদকনিবারণ, সামাজিক পবিত্রতা, স্বাস্থ্য, প্রভৃতি বিষয়ে অন্যান্য দেশের আদর্শস্থল হইয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবেও নারীশক্তি রাজনৈতিক জগতে কম্‌ কাজ করে নাই। জগতের নানা দেশে অনেক

রাণী রাজাদের চেয়ে দেশশাসন ভালই করিয়াছিলেন। শিবাজীর পত্নী সঙ্গবাঈ তাঁহার কিরূপ সহায় ও পরামর্শদাত্রী ছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই।

ভারতবর্ষে নানা ধর্ম্মাবলম্বী, নানা ভাষাভাষী ও নানা জাতীয় লোকের বাস। এত বিষয়ে অনৈক্য দূর হইয়া ঐক্য স্থাপিত হওয়া, অর্থাৎ কেবলমাত্র এক ধর্ম্ম, এক ভাষা প্রতিষ্ঠিত ও বৈবাহিক আদান প্রদান দ্বারা এক জাতি গঠিত হওয়ার আপাততঃ কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। অথচ ঐক্য ব্যতিরেকে প্রকৃত জাতীয়তা জন্মিবে না। কিন্তু সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মসংস্কার হইলে অন্যান্য বিষয়ে অনৈক্য সত্ত্বেও জাতীয় একতা সংস্থাপিত হইতে পারে। দেশভেদে, জাতিভেদে, জলবায়ু অবস্থাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকার ক্রিয়াকলাপ প্রচলিত আছে। কিন্তু সকল ধর্ম্মের সার শিক্ষার গতি এক দিকে;—পবিত্র সাধু জীবন যাপন ও পরের হিতের জন্য আত্মোৎসর্গের দিকে। যদি সকল ধর্ম্মের লোকে এই সার শিক্ষাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্যকে তত গুরুতর না মনে করেন, তাহা হইলে স্বদেশের ও জগতের মঙ্গলার্থ সমবেত চেষ্টার জন্য সাধারণ ভিত্তিভূমি সহজেই খুঁজিয়া পাইবেন। তাহা হইলে ধর্ম্মমূলক বিদ্বেষ ও ঝগড়া অন্তর্হিত হইবে ও জাতীয়ভাব বিকশিত হইবার পথে এক প্রধান অন্তরায় দূরীভূত হইবে।

সকল মানবে সমদর্শিতা, ধর্ম্মমতভেদ, আচারভেদ, জাতি ও বর্ণ ভেদ সত্ত্বেও অঘৃণা ও অদ্বেষ, কেবল প্রকৃত ধার্ম্মিকতা হইতেই জন্মে; তাহা আমরা দেখিলাম। এই সমদর্শিতা, অঘৃণা ও অদ্বেষ না জন্মিলে ভারতবর্ষের মত নানা জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অধ্যুষিত দেশে সকলে একপ্রাণ হইয়া স্বাধীনতা চাহিতেও পারে না, সুতরাং পাইতেও পারে না; তাহাও স্বতঃ সিদ্ধ।

খাটি ধর্ম্মবিশ্বাস ব্যতীত রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয় না, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু রাজনৈতিক উন্নত অবস্থার সঙ্গে যে ধর্ম্মোন্নতির সম্পর্ক আছে, তাহা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই। রাজনৈতিক দাসত্ব ও আশাহীন উৎপীড়ন সহন মানুষকে কার্য্যতঃ নাস্তিক করিয়া ফেলে। এ অবস্থায় মানুষের আত্মার মহত্ত্বজ্ঞান লোপ পায়। এ অবস্থায় মানুষের বিধাতার মঙ্গলনিয়মে সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নহে। মানবজীবনের উচ্চ আদর্শে বিশ্বাস এবং সেই আদর্শকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা, ধর্ম্মের এই দু'টি প্রধান অঙ্গ। রাজনৈতিক পরাধীনতা এই বিশ্বাস ম্লান করে, বা জন্মিতে দেয় না। দাসত্ব মানুষকে উদ্যমহীন, জড়প্রকৃতি, অদৃষ্টবাদী করিয়া আদর্শ ব্যক্তিগত-জীবন, পরিবার ও সমাজগঠনে উৎসাহহীন ও অসমর্থ করে। জাতীয় পরাধীনতা মানুষকে ক্ষুদ্রাশয় ও পরার্থে মহৎকার্য্যে উদ্যমহীন করে। পরাধীন দেশে নূতন ধর্ম্মমতের উত্থান হইয়াছে ও হইতে পারে; কিন্তু রাজনৈতিক শক্তিশালী জাতি ও দেশ ব্যতীত কোন ধর্ম্মমত পতিতপাবনী, পাপ-বিজয়িনী, পতিতোদ্ধারিণী শক্তি বহুল পরিমাণে পাইয়াছে কি?

আমরা পূর্ব্বে জাতিভেদের মূলোচ্ছেদ করার কথা লিখিয়াছি। ইহা বলিলে সচরাচর দু'টি কথা বুঝায়। সকলের সহিত সকলের রান্না খাদ্য দ্রব্য ভোজনে, এবং সর্ব্বজাতীয় লোকের সহিত বৈবাহিক আদানপ্রদানে সম্মত থাকা। কিন্তু আমরা এই বাহ্যলক্ষণে সন্তুষ্ট নহি। একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের বক্তব্য সহজে বুঝাইতে চেষ্টা করি। আমরা রেলপথে গত বোম্বাই কংগ্রেসে যে গাড়ীতে যাইতে-ছিলাম, তাহাতে একজন দেশী ব্যারিষ্টর ছিলেন। তিনি প্রায় অগ্নির মত সর্ব্বভুক্; বিবাহ বিষয়ে জাতি মানিবারও কোন লক্ষণ দেখিলাম না। তাঁহার ধর্ম্মমত কি জানি না। রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহার মত এই যে, রক্তপাত করিতে না পারিলে আমরা স্বাধীন হইতে পারিব না। অনেকে মনে করিবেন যে, এহেন ব্যক্তি নিশ্চয়ই বাক্যে ও আচরণে ঘোর সাম্যবাদী হইবেন। কিন্তু বাস্তবিক দেখিলাম, জাতি-ভেদের অনিষ্টকারিতার মূল যে অহঙ্কার তাহা তাঁহার বেশ রহিয়াছে। একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। তিনি চা আনাইয়া ধীরে ধীরে পান করিতে লাগিলেন। গাড়ী ছাড়িবার সময় হওয়ায় হোটেলের ভৃত্য বেচারা চায়ের পাত্র পাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল। সাহেব-বাবুটি ক্রুদ্ধ হইয়া কর্কশকণ্ঠে তাহাকে "সূয়ার কা বাচ্চা" বলিয়া সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুম্ ক্যা লাট সাহেব কা দামাদ," "তুই কি লাট সাহেবের জামাই," যে এক্ত

অধীর হইতেছিস্? হা অদৃষ্ট! ইনিই হয় ত কংগ্রেসে গিয়া "Our illiterate brethren, the dumb millions of India," "ভারতের অগণ্য মূক প্রজারূপ আমাদের নিরক্ষর ভ্রাতৃগণ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। এইরূপ দাম্ভিক সাহেব ও বাবুগণকে বলি, "হে 'সুয়ার কা বাচ্চা'র ইংরাজী-পড়া ও শাদা-কাপড়-পরা ভাইগণ, তোমরা যতদিন আচরণে ও হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে স্বদেশের হীনতম ব্যক্তিকেও ঘৃণা করিতে ক্ষান্ত না হইবে, ততদিন ইংরাজ তোমাদিগকে অবাধে সুয়ার কা বাচ্চা বলিতে ও লাথি মারিতে সক্ষম হইবে।" সে দিন মর্লী সাহেব পার্লিয়ামেণ্টে বক্তৃতায় বলিয়াছেন:—"But there is a root of statesmanship as well as of humanity contained in the lines—'Hath not a Jew eyes? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, affections, and passions?'" আমরাও বলি, "ছোট" লোকদের কি চোক নাই, তাদের কি হাত পা নাই, ভালবাসা ক্রোধ ঘৃণা নাই? আমরা যদি তাহাদের সাহায্য চাই, তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করিতে হইবে।

বাস্তবিক সেকেলে লোকদের মধ্যে জাতিভেদ সত্ত্বেও অনেক বিষয়ে সহৃদয়তা ও ভ্রাতৃভাব ছিল। মহা কুলীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের গ্রামসম্পর্কে কামার দাদা ও ছুতার পিসী ছিল। চাষা, সম্পন্ন ব্রাহ্মণ গৃহস্থের নিকটে বসিয়া একই কলিকা হইতে তামাক খাইতে পারিত। এখন ইংরাজীপড়া বাবুরা সে সব সম্পর্কের ভূতগুলিকে পর্য্যন্ত গয়ায় পিণ্ড দিয়াছেন; তাঁহাদের কার্পেটমণ্ডিত গৃহে "ছোট" লোকদের ফাটা ধূলামাখা পা যাইতে পারে না। তাঁদের ধপ্‌ধপে ইস্ত্রিকরা জামার কাছে ঘেঁসে কার সাধ্য? অথচ এই "ছোট" লোকেরাই সকল দেশের অস্থিমজ্জা। তাহারাই পৃথিবীর লোককে আহার দেয়; আবার তাহারাই স্বাধীনতার সমরে রক্ত দেয়, প্রাণ দেয়। বাবু না হইলে সংসার চলে, "ছোট" লোক না হইলে চলে না।

শিক্ষিত লোকদের রাজনৈতিক অধিকারের প্রার্থনা ও দাবীর উত্তরে গবর্ণমেণ্ট বলেন, "তোমরা ত দেশের মুষ্টিমেয় লোক; দেশের অগণ্য কোটি কোটি প্রজার প্রতিনিধি তোমরা নও। দেশের নামে প্রার্থনা ও দাবী করিবার অধিকার তোমাদের নাই।" সুতরাং সাধারণ লোকদিগকে উন্নত করিয়া সমাজে তাহাদের হীন অবস্থা দূর করিয়া তাহাদিগকে আমাদের দলে টানিতে হইবে। শিক্ষিতের দাবী যখন আপামরসাধারণ সকলের দাবী হইবে, যখন কোটি কোটি কণ্ঠ হইতে সেই দাবী উঠিবে, তখনই আমাদের জিত হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে। গত বোম্বাই কংগ্রেসের সময় প্রতিনিধিদের শিবিরের নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে দুজন সাধারণ লোকের কথা আমাদের কানে গেল। তাহাদের কথাবার্ত্তার বিষয়, এত বাবু লোক কেন বোম্বাইয়ে আসিয়াছে। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই হইল যে বাবুরা হাওয়া খাইতে আসিয়াছে!

হীন জাতি ও নারী জাতির অবস্থার উন্নতি ব্যতিরেকে আমাদের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইবে না, ইহা নিশ্চিত। আমাদের আরও অনেক সামাজিক রীতি রাজনৈতিক উন্নতির অন্তরায়। যেমন বাল্যবিবাহ প্রথা। মানবদেহের পূর্ণতাপ্রাপ্তির পূর্ব্বে বিবাহ হইলে, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, নষ্ট হয়। তাহাতে যে কেবল শরীরের বল যায়, তা' নয়, মানসিক দৃঢ়তা, সাহস, উৎসাহ ও উদ্যম নষ্ট হয়। অথচ এই সকল ব্যতিরেকে স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। কুতর্ক যিনি যতই করুন, ইহা ধ্রুব সত্য যে বাল্যবিবাহের সন্তান ক্ষীণপ্রাণ হয়। সুশ্রুতাদি ঋষির এই মত, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগেরও এই মত; এবং আমরা চোখের সামনে দেখিতেছিও তাহাই। যে জাতি ক্ষীণপ্রাণ ব্যক্তির সমষ্টি, স্বদেশ উদ্ধার তাহার কার্য্য নয়। বাল্যে বিবাহিত ব্যক্তি অল্প বয়সে বহু পরিবার পালনের ভারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহার স্বাধীনচিত্ততা ও উদ্যোগিতা (enterprise) থাকে না। এরূপ লোকদের দ্বারা রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির কোন আশা করা যায় না।

সমুদ্রযাত্রা নিষেধ আমাদের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির পথে আর এক অন্তরায়। দাসত্ব আমাদের এমন সহিয়া গিয়াছে, যে ইংরাজ যে আমাদিগকে সাক্ষাৎভাবে প্রাণে মারে নাই, এবং নিজের স্বার্থের জন্য আমাদিগকে কিছু কিছু সুখ সুবিধা দিয়াছে, ইহাতেই আমরা সন্তুষ্ট। উন্নত সভ্য বিদেশে, এমন কি অনুন্নত স্বাধীন দেশে গেলেও আমাদের চোখ

খুলিয়া যায়; আমরা আমাদের দরিদ্র, হীন ও হেয় অবস্থা বুঝিতে পারি।* আমরা তথায় গেলে দেখি, শারীরিক বলে ও বুদ্ধিতে আমাদের চেয়ে অশ্রেষ্ঠ অনেক জাতিও স্বাধীন. অনেকের রাজনৈতিক অবস্থা উন্নত। দেখিয়া শুনিয়া আমাদেরও তাদের মত হইতে সাধ যায়, তাহাদের মত যে হইতে পারি, এ বিশ্বাসও জন্মে। অনেক জাতির সংস্পর্শে আসিয়া আমরা তাহাদের স্বদেশপ্রেমে স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গে অনুপ্রাণিত হই। অতএব, বিদ্যাশিক্ষা, শিল্পবাণিজ্য শিক্ষা বা ধনোপার্জ্জনের জন্য না হইলেও, কেবল বিদেশভ্রমণ ও দর্শনে লাভ আছে। কিন্তু এখানে সামাজিক রীতি আমাদিগকে বাধা দিতেছে। সুখের বিষয় এ বাধা অনেকে আর মানিতেছেন না।

রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের জন্য আর এক কারণে বিদেশযাত্রা দরকার। আমরা ঠিক কি উপায়ে স্বাধীনতালাভ করিতে পারিব বলা যায় না। কেহ বলেন, বিলাতে আন্দোলন কর, কেহ বলেন অন্য কথা। বিলাতে আন্দোলন করিতে হইলেও সামাজিক নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া অনেক সুশিক্ষিত লোককে তথায় যাইতে হইবে; এক আধ জনের কর্ম্ম নয়। আবার মনে করুন কেহ যদি ম্যাট্‌সিনির পথ ভাল মনে করেন, তবে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র এখানে নাই। এখানে কারাগারই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র হইবে। তাঁহাকে বিদেশে কার্য্য করিতে হইবে। বর্ত্তমানে হাজার হাজার আয়র্লণ্ডবাসী বিদেশে গিয়া তথা হইতে নানা উপায়ে স্বদেশের উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আর কিছু না পারি, মন খুলিয়া সত্য কথাটা লিখিতে ও বলিতে যদি চাই ত বিদেশে প্রবাস ভিন্ন গতি নাই। অবশ্য এপথেও রাজনৈতিক পরাধীনতা আমাদের শত্রুতা করিতেছে। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বা অষ্ট্রেলিয়ায় মানুষের মত ভাবে যাইতে বা থাকিতে পারি না। যাহা হউক, আমেরিকা কতকটা আমাদের কাজের উপযোগী বটে।

* পারস্য ও চীনদেশে কতক পরিমাণে নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী (constitutional government) প্রবর্ত্তিত হইতে চলিল। আর মর্লী সাহেব বলিতেছেন ভারতে একজনের যথেচ্ছ শাসন (absolute personal rule) চলিবে। অথচ ইংরাজ স্বাধীনতার পক্ষপাতী! আমরাও ইংরাজের দাস হইয়া চীনা ও ইরানীদের চেয়ে আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান্ মনে করি!

সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করিতে না পারিলে শারীরিক বল, বা মানসিক দৃঢ়তা ও বল, কিছুই থাকিতে পারে না। দুর্ব্বল ও নিস্তেজ দেহ মন লইয়া কোন জাতি স্বাধীনতা লাভ বা রক্ষা করিতে পারে না। যখন রোমসাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়, তখনও রোমানেরা বাহ্য সম্পদ, সভ্যতা ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল। পক্ষান্তরে তাহাদের বিজেতারা অসভ্য ছিল। এরূপ ঘটিবার একটি গূঢ় কারণ এই যে রোমানেরা সাতিশয় পাপাচারী ও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিল। গথ, হূন, প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা চরিত্র বিষয়ে তত অধম ছিল না। ইহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। রোমানেরা তাহাদের ইতিহাসের সাধারণতন্ত্রযুগের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত সতীত্বের খুব আদর করিত। তাহারা সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য যত কঠোর নিয়ম করিয়াছিল, এমন আর কোন প্রাচীন জাতি করে নাই। তাহাদের মত সর্ব্বাভিভাবী প্রবল রাজনৈতিক শক্তিও আর কোনও প্রাচীন জাতির ছিল না ও হয় নাই। কিন্তু রোমের সাম্রাজ্যযুগে রোমানদের পাপাসক্তি ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা জগতে অনতিক্রান্ত রহিয়াছে। এই জন্যই তাহাদের পতন হয়। এই যুগে প্রথম প্রথম সম্রাটেরা অখৃষ্টান ছিল ও খৃষ্টানদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করিত। একটি অত্যাচার এই ছিল যে তাহারা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী কুমারীদিগকে জোর করিয়া বেশ্যা করিতে চেষ্টা করিত। এই ত সভ্য রোমানদিগের কার্য্য! অন্যদিকে রোমবিজেতা গথজাতীয় আলারিক রোমে আসিয়াই কড়া হুকুম প্রচার করিলেন যে খৃষ্টীয় নারীদিগের সতীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে।*

* "The Romans united the Jewish pride of race with the Greek regard for public decency, and in addition upheld a standard of austerity all their own. In early days female virtue was highly honoured and strenuously maintained among them, of which the institution of the vestal virgins was a visible sign. Their attitude towards prostitution differed, accordingly, from that of other ancient nations. Among them, alone, it was considered disgraceful to a man to frequent the company of prostitutes......Prostitution was more severely regulated by them than by any other ancient race......The profligacy of imperial Rome has never been surpassed for gross and obscene sensuality."

"The early Christian Church laid great stress on chastity, which probably suggested to its Roman

এখানে দেখিতেছি অসভ্যলোকেরা পবিত্রতার বলে বলীয়ান্ ছিল; কিন্তু "সভ্য" রোম পাপাচারে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের দেশে কৌলীন্যের ও সামাজিক বল-প্রয়োগে বালবিধবার চিরবৈধব্য রক্ষার গুণে খুব সামাজিক দুর্নীতি আছে। সেন্সস্ রিপোর্টে বেশ্যার সংখ্যা দেখুন। ইহাতে আমাদের জাতির সর্ব্বনাশ হইতেছে। যাঁহারা কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যস্ত, তাঁহারা বুঝিতে-ছেন না যে ইহাদ্বারা আমরা কিরূপ অসংযমী দুশ্চরিত্র জাতি হইতেছি। বাঙ্গলা ও ইংরাজী খবরের কাগজে কুৎসিৎ নানা রোগের বিজ্ঞাপন ইহার একটি প্রমাণ। রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা একবার মফঃস্বলের দাতব্য চিকিৎসা-লয়ের ডাক্তারদের কাছে খবর লইবেন যে সামাজিক অপবিত্রতা জনিত রোগ সকল কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। অতীতযুগে ভারতের বলবীর্য্য হ্রাস ও স্বাধীনতা-লোপের একটা কারণ সামাজিক দুর্নীতি। তাহার সাক্ষ্য জগন্নাথের মন্দির ও দক্ষিণভারতের অপরাপর প্রসিদ্ধ মন্দির গাত্রে অশ্লীল ছবিতে এবং দক্ষিণভারতে দেবমন্দির-সংস্পৃষ্ট বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বিনী দেবদাসী বা মূরলী নাম্নী তথা-কথিত "কুমারী" দিগের অস্তিত্বে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

সামাজিক কোন কোন প্রথার পরিবর্ত্তন বা উচ্ছেদ না হইলে রাজনৈতিক উন্নতি যে সুদূরপরাহত তাহা দেখিলাম। এখন রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যতিরেকে পূর্ণমাত্রায় সমাজসংস্কার যে দুঃসাধ্য, তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব।

আমাদের দেশে সমাজসংস্কারের অতীত ইতিহাস পর্য্যা-লোচনা করিলে দেখা যায়, আকবর বাদশাহ রাজশক্তির বলে সতীদাহ ও বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিতে এবং বিধবা-বিবাহ এবং ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাহ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ রাজত্বে সতীদাহ ও শিশুহত্যা আইনের বলে বন্ধ করিতে হইয়াছে; রাজশক্তির দ্বারা বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত করা হইয়াছে; যাহারা হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান কিছুই নয় তাহাদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক বরকন্যার বিবাহ আইন দ্বারা চালান হইয়াছে। সম্মতি আইন দ্বারা পরোক্ষভাবে বালিকাদের বিবাহের বয়স কিছু বাড়িয়াছে। এই সকল স্থলে রাজনৈতিক শক্তির সাহায্যে সমাজসংস্কার হইয়াছে। আমাদের যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে ঔষধার্থ ব্যতীত মদ, আফিং, কোকেন প্রভৃতি মাদক জিনিষ বিক্রী বন্ধ করিতে পারিতাম; বালক ও যুবকদিগকে চুরুট ও সিগারেট বিক্রী বন্ধ করিতে পারিতাম। অনেক সভ্যদেশে এরূপ আইন আছে ও হইতেছে। আমাদের বণিকজাতীয় শাসনকর্ত্তারা রাজস্ব ও বিলাতী বাণিজ্য হ্রাস ভয়ে এবিষয়ে কল্যাণকর আইন করিতে পারিতেছেন না। দেশীয় সংস্কারকদলের রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকিলে তাঁহারা সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য, ছাত্রদিগকে দুর্নীতির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বেশ্যা-গৃহ, এবং অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাদিগের ক্রয়বিক্রয়, বেশ্যাগৃহে অবস্থিতি ও প্রতিপালন, সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম করিতে পারি-তেন। কিন্তু দেশীয় সংস্কারকশ্রেণীর লোকেরা পরাধীন বলিয়া কিছু হইতেছে না। আবার দেখুন, রাজা দেশী হইলে আইন দ্বারা এমন অনেক বিষয়ে সংস্কারের সূত্রপাত করা যায়, বিদেশী রাজা যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিতেছেন না। বরোদা ও মহীশূর রাজ্যে শিশুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন হইয়াছে, কিন্তু বৃটিশশাসিত ভারতে হয় নাই। নেপালে হিন্দুর রাজত্ব আছে; তথায় এখনও শাস্ত্রসঙ্গত অনুলোম বিবাহ, যথা ব্রাহ্মণ বরের সহিত ক্ষত্রিয় কন্যার বিবাহ, চলিত আছে। কিন্তু এলাহাবাদ হাইকোর্টের মতে এরূপ বিবাহ ভারতবর্ষে আইনবিগর্হিত; হিন্দুর রাজনৈতিক অধিকার থাকিলে শাস্ত্রানুসারে মীমাংসা অন্যরূপ হইতে পারিত, এবং তাহাতে সমাজসংস্কারের পথ প্রশস্ত হইত। বৃটিশ রাজত্বে হিন্দুনারীগণ দায়াধিকার সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্র সঙ্গত ন্যায্য অধিকার হারাইয়াছেন। দেশীয় রাজত্বে হয় ত এবিষয়ে অন্যরূপ মীমাংসা হইতে পারিত। এ সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের ইংরাজী গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য।

রাজনৈতিক পরাধীনতায় মানুষকে যেমন সর্ব্ববিষয়ে

persecutors the horrible punishment of forcibly prostituting Christian maidens. Such malignity enhanced the glory of martyrdom without shaking the constancy of its victims; and the triumph of purity in an age of unbounded license was conspicuously recognised by Alaric, the Gothic conqueror, who gave strict orders in the sack of Rome that the virtue of Christian women was to be respected.—"Encyclopaedia Britannica, Vol. 32, pp. 26, 27.

জড়প্রকৃতি, ভীরু, স্বাধীনচিন্তাবিমুখ, নিরুদ্যম ও অদৃষ্টবাদী করে, সামাজিক বিষয়েও তাহাই করিয়াছে। "আমরা আর কি করিতে পারি," এই নিরাশার ভাব এক্ষেত্রেও আমাদের কার্য্যশক্তি কমাইয়া দিয়াছে। মহাত্মা শিবাজীর চেষ্টায় মারাঠাজাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিবার পর মহারাষ্ট্র সমাজের অনেক সংস্কার অনায়াসে সম্পন্ন হইয়াছিল। এখন সহজে তাহা হইবার নয়। ইহাতে সমাজসংস্কার বিষয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কার্য্যকারিতা বেশ বুঝা যাইতেছে।

এখন আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও জাতীয় আর্থিক অবস্থার পরস্পর সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিব। অনেক পুস্তকে ও খবরের কাগজে ইহা দেখান হইয়াছে, যে ইংরাজেরা তাহাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া আমাদের নানাবিধ শিল্পের বিলোপসাধন করিয়াছে। আমরা "প্রবাসী"র অনেক সংখ্যায় ইহা আংশিকভাবে দেখাইয়াছি। সুতরাং সে বিষয়ের এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অপরদিকে অন্যান্য দেশে রক্ষণনীতি, শিল্প বাণিজ্য শিক্ষার সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি দ্বারা রাজা যেরূপ দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিয়াছেন, ভারতে তাহা হয় নাই। অধিকন্তু, পক্ষান্তরে, বৎসর বৎসর কোটি কোটি টাকা সাহেব রাজপুরুষদের পেন্সান, রেলওয়ের মূলধনের সুদ, প্রভৃতি বাবদে ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং দেশের ধন না বাড়িয়া ক্রমাগত কমিতেছে। আমরা স্বাধীন হইলে দেশের ধন না বাড়ুক, এত ধন বিদেশে ত চলিয়া যাইত না। আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকিলে আমরা কখনই দেশের সমুদয় শিল্প নষ্ট হইতে দিতাম না। কৃষিবিষয়েও গবর্ণমেণ্টের সাহেব পোষণ, ও চা-কর নীল-কর দিগকে সাহায্যদানে যেরূপ উৎসাহ, প্রজার সুশিক্ষা সম্বন্ধে তাহা দেখা যায় না। তদ্ভিন্ন পরাধীনতাজনিত নিরুদ্যম ও নৈরাশ্য এক্ষেত্রেও আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ও করিতেছে। কত দেশের লোক নানাস্থানে গিয়া বাণিজ্যাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি দেশে অবাধে যাতায়াত বা বাণিজ্য করিতে পারি না। অথচ তৎতৎ দেশবাসী শ্বেতাঙ্গেরা আমাদের দেশ লুণ্ঠন করিতে পারে। আমরা স্বাধীন হইলে নিশ্চয়ই এই অপমান ও অসুবিধার প্রতিকার চেষ্টা করিতাম। শক্তের ভক্ত, নরমের যম; সাম্যবাদী মানবের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী তথাকথিত খৃষ্টশিষ্য ইংরাজ এক্ষেত্রে আমাদের কোন সাহায্য করিতেছে না।

পক্ষান্তরে, আমাদের দেশের লোক এত দরিদ্র, উদর-জ্বালায় এরূপ ব্যতিব্যস্ত ও অবসন্ন, যে অন্নচিন্তা তাহাদিগকে আর কিছু ভাবিতে দেয় না। যে খাইতে পায় না, পরিতে পায় না, সূর্য্যের প্রখর রশ্মি, বর্ষার জল যাহার মাথায় পড়ে, তাহার রাজনৈতিক অধিকার বুঝিবার, চাহিবার অবসর বা শক্তি কোথায়? এসব বুঝিতে হইলে কিছু শিক্ষাও ত চাই। এই পোড়া দেশে বিনা পয়সায় শিক্ষা পাওয়া যায় না। সুতরাং সেদিকেও সম্পূর্ণ অসুবিধা। আবার ইংরাজ-রাজত্বে রাজনৈতিক আন্দোলন বহু অর্থ সাপেক্ষ। স্বদেশে ও বিলাতে হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়া বক্তৃতা ও খবরের কাগজ দ্বারা আন্দোলন করিতে আমাদের সামর্থ্য কোথায়?

ভারতে সম্প্রতি অনেক শ্রেণীর লোক আয় বৃদ্ধির জন্য ধর্ম্মঘট করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া, এবং নিউজীলণ্ড প্রভৃতি স্বাধীন ইংরাজ উপনিবেশে শ্রমজীবিদিগকে আইনদ্বারা ন্যূনকল্পে সুস্থদেহে বাঁচিয়া থাকিবার মত মজুরী দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বিলাতেও অনেকে এদিকে ঝুঁকিয়াছেন। বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত জীবিকা অর্জ্জনে অক্ষম প্রত্যেক লোককে পেন্স্যান দিবার ব্যবস্থাও অনেক সভ্য-দেশে হইতেছে। আর আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে অর্দ্ধাহারে মারা যাইতেছে। অবশ্য আমাদের রাজারা আমাদিগকে ঠেঙ্গাইয়া বা গুলি করিয়া মারিতেছেন না, ইহা সান্ত্বনার বিষয় বটে!

আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাই রাজনৈতিক অধিকার চাহিতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন, "তোমরা যা চাও, নিরক্ষর প্রজারা যে তাহাই চায়, তাহার প্রমাণ কি? তোমরা উহাদের প্রতিনিধি নও।" অথচ কেমন সুব্যবস্থা, গবর্ণমেণ্ট প্রজাসাধারণকে শিক্ষা দিবারও কোন বন্দোবস্ত করিতেছেন না। প্রকৃত কথা এই, আমাদের দেশে জ্ঞানবিস্তার ব্যতিরেকে আমরা স্বাধীন হইতে পারিব না। ইংরাজ ইহা জানেন। এই জন্য ইংরাজ

ভারতে জ্ঞানবিস্তারের বিরোধী। দেড়শত বৎসর ইংরাজ রাজত্বের পর এখন এদেশে শতকরা ৫ জন নরনারী লিখিতে পড়িতে পারে। জাপানে শতকরা ৮০।৯০ জন লিখিতে পড়িতে সক্ষম। মান্দ্রাজের একজন ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সার্ টমাস মনরো বলিয়াছিলেন, "The spread of knowledge in India is quite incompatible with the English domination;" "ভারতে জ্ঞানবিস্তার ইংরাজ-প্রভুত্ব রক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী।" ভারতে বৃটিশ শাসনের ইহাই আসল নীতি।

কিছুদিন পূর্ব্বে লণ্ডনের ঈষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে শ্রীযুক্ত গোখলে "ভারতের জন্য স্বায়ত্তশাসন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উদারনৈতিক লর্ড রে সভাপতিরূপে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে "Self-government in England and the colonies was the result of compulsory and general education;" "ইংলণ্ড ও তাহার উপনিবেশ সমূহে স্বায়ত্তশাসন আইনবলে প্রদত্ত সার্ব্বজনীন শিক্ষার ফল।" অর্থাৎ আগে ভারতের সবলোক লেখা পড়া শিখুক, তাহার পর স্বায়ত্তশাসন পাইবে। কিন্তু উদারনৈতিকেরাও কোটি কোটি টাকা সৈনিক ব্যয় বাড়াইতেছেন, কিন্তু ভারতে বিনা বেতনে সার্ব্বজনিক শিক্ষার দিক্ দিয়াও যাইতেছেন না! আসল কথা এই যে, লর্ড রে ইতিহাসেও ভুল করিয়াছেন। ইংলণ্ডে স্বায়ত্তশাসন অনেক শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু যে এলিমেণ্টারী এডুকেশন আইনের (Elementary Education Act) বলে প্রত্যেক স্কুলে যাইবার বয়সের বালকবালিকাকে আইন-দ্বারা স্কুলে যাইতে বাধ্য করা হয় ও বিনা ব্যয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা ১৮৭৬ সালে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বাস্তবিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকিলে দেশে সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা হয় না। আবার আমাদের এখন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সকলে শিক্ষিত না হইলেও আমাদের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা নাই। এই উভয়সঙ্কট, ও এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য, শ্রাবণের "প্রবাসী"র প্রথম প্রবন্ধে বর্ণিত ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ঠিক্ যেরূপ শিক্ষায় জাতীয়তা বৃদ্ধি পায় ও জাতীয় শক্তির উন্মেষ ও দেশের ধন বৃদ্ধি হয়, তাহা গবর্ণমেণ্ট দিতেছেন না; গবর্ণমেণ্টের কাছে তাহা আশা করাও অসঙ্গত। এইরূপ শিক্ষা না পাওয়ায় আমরা রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি। অন্যদিকে, আবার, আমাদের রাজনৈতিক শক্তি না থাকায় আমরা অসহায় অবস্থায় দেখিতেছি যে ভারতরাজস্বের কোটি কোটি টাকা অপব্যয় হইতেছে, কিন্তু আমরা তাহার একপয়সাও প্রকৃত শিক্ষার দিকে টানিয়া আনিতে পারিতেছি না।

পূর্ব্বেবর্ণিত পরাধীনতাজনিত অবসাদ ও নৈরাশ্য এক্ষেত্রেও আমাদিগকে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে। অধিকন্তু, আমরা যতদুর শিক্ষিত হইতে পারি ও শিক্ষা দিতে পারি, গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে আমাদের সহায় না হইয়া শক্রতা করায়, আমাদের স্বীয় শক্তিতে বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইতেছে না। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে আত্মশক্তির পরিচয় পাইবামাত্র তথা-কথিত অক্ষম বাঙ্গালীই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

শ্রাবণের "প্রবাসী"তে প্রকাশিত "ইংরাজ রাজত্বে ভারতের স্বাস্থ্য" নামক প্রবন্ধ মনদিয়া পড়িলে বেশ বুঝা যায়, যে, যে যে কারণে ভারতবাসীর স্বাস্থ্যনাশ ও অকালমৃত্যু ঘটিতেছে, গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহা দূর করিবার যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে না। বরং দারিদ্র্য বৃদ্ধি হেতু ভারতবাসীর মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে। এই সকল বিষয়ের পুনরুক্তি দ্বারা প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিষয়ে সুপণ্ডিত সিম্‌সন সাহেব প্লেগ বিষয়ে যে নূতন পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি যে কোন কারণে কোন জাতির অবসাদ উৎপন্ন হয়, তাহাতে তাহাদের মধ্যে প্লেগের প্রকোপ খুব বাড়ে। তিনি ঠিক্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল।*

* *Plague commits its greatest ravages on people subject to depressing influences.*

"It is on this hypothesis that the varying degrees of susceptibility of communities is explained, that the influence of race, age, sex, comes into play, and that social and political forces, so far as they affect the food, welfare and condition of the people, are important factors in the spread of plague. Plague has nearly always committed its greatest ravages on

আমাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকিলে আমরা স্বাস্থ্যের প্রতিকূল অবস্থা দূর করিয়া অনুকূল অবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতে পারিতাম।

অন্যদিকে, আমরা দেখিতেছি, রুগ্ন, দুর্ব্বল, অকাল-বার্দ্ধক্যগ্রস্ত, অল্পায়ু লোকে কেমন করিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা, যুঝিয়া জিনিয়া লইতে পারিবে? তাহারা সে দিকে মনই বা দেয় কেমন করিয়া? যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া ও প্লেগের সর্ব্বাভিভাবী চিন্তা রাজনৈতিক অধিকার লাভের বাসনাকে জন্মিবার অবসর না দিতে, এবং জন্মিলেও অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিতে সমর্থ। রাজনৈতিক আন্দোলনে ও স্বাধীনতার লাভের চেষ্টায় একদিকে যেমন অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত কার্য্যশক্তি চাই, অপরদিকে তেমনি বহুদর্শিতাজনিত ধীর বুদ্ধির প্রয়োজন। আমরা রুগ্নদেহ ও অল্পায়ু; সুতরাং আমাদের দেশে কার্য্যক্ষম অতিবৃদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ নাই। আমাদের দাদাভাই নাওরোজী বিলাতপ্রবাসী বলিয়াই বোধ হয় এখনও কার্য্যক্ষম আছেন। আমরা সুস্থ সবল দীর্ঘায়ু জাতি না হইলে রাজনৈতিক অধিকার পাইব না।

২। ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কার।

ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কার ও রাজনৈতিক সংস্কারের পরস্পর সম্পর্ক আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে ধার্ম্মিক ও সামাজিক সংস্কারের সম্বন্ধ বিবৃত হইবে।

তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মসংস্কার বলিতে আমি কি বুঝি, তাহা সাধারণভাবে বলা দরকার। এই জগতে সর্ব্বত্র নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান; এই নিয়ম মঙ্গলকর; ইহার বশে জগতে ন্যায়, প্রেম, সত্য ও পবিত্রতা জয়যুক্ত হইতেছে ও সহস্র বাধা সত্ত্বেও হইবে;—সাক্ষাৎভাবে এই বিশ্বাস আত্মায় প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা এবং তদনুযায়ী আচরণ করাই ধর্ম্ম-সংস্কার। আমি নিজে বিশ্বনিয়ন্তা পরম পুরুষে বিশ্বাসী। আত্মায় তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভকেই আমি ধর্ম্মসংস্কারের বীজ মনে করি। কিন্তু, এই প্রবন্ধে, কোন কোন কারণে আমি, যাঁহারা মঙ্গলকর বিশ্বনিয়ম ও শক্তি মানেন অথচ দার্শনিক কারণে বিধাতা পুরুষের অস্তিত্বে সন্দিহান, তাঁহা-দিগকেও ধর্ম্মবিশ্বাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক অধিকার লাভের জন্য সংগ্রামে একটি গুরুতর প্রভেদ আছে। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে যাহারা রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত তাহারা নিজেই উহা পাইবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু যাহারা সামাজিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত, সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত, সামাজিক হিসাবে পতিত, তাহাদিগকে উন্নত করিবার ও অধিকার দিবার চেষ্টা বাহির হইতে হয়। যাহাদের অবস্থা উন্নত, যাহাদের সামাজিক অধিকার আছে, তাহারাই নিজের একচেটিয়া অধিকার ও স্বার্থ নাশ করিয়া অধঃপতিত লোকদিগকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রাজনীতিক্ষেত্রে নিজেদের জন্য, স্বার্থে, চেষ্টা, সামাজিক সংস্কারে অপরের জন্য, পরার্থে, চেষ্টা। রাজনৈতিক সংস্কারকার্য্যে ধর্ম্মভাবের আবশ্যকতা ও প্রভাব পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। সমাজসংস্কারে ইহার প্রয়োজনীয়তা এক হিসাবে আরও অধিক। কেন না, ন্যায়বুদ্ধির ও দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া অপরের জন্য খাটা কেবল ধার্ম্মিক লোকের পক্ষেই সম্ভব। ইহার মধ্যে আরও একটি কথা আছে। মানুষ নিজের লোকদের,—স্বীয় পরিবারের, প্রতিবেশীর, সমাজের বা দেশের লোকদের—নিন্দা প্রশংসার প্রভাব বেশী অনুভব করে, অপরের নিন্দা প্রশংসা তত গ্রাহ্য করে না। রাজনৈতিক সংস্কারক বিদেশী বিজেতা কর্ত্তৃক উৎপীড়িত লাঞ্ছিত হইলেও স্বদেশীদের প্রশংসা, অনুরাগ ও পূজা পান। পক্ষান্তরে সমাজসংস্কারক প্রতিবেশী বা স্বদেশবাসী দূরে থাকু, অনেক সময় নিজের পিতা মাতা, স্ত্রী, পুত্রকন্যা কর্ত্তৃক উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত হন। এ অবস্থায় কর্ত্তব্যপথে অটল থাকা অধিকতর মানসিক বলের কার্য্য। ধর্ম্মবিশ্বাস ব্যতীত এই মানসিক বল কোথা হইতে আসিবে? এইজন্য যাহারা ধর্ম্মের প্রেরণায়, ধর্ম্মের একটি অঙ্গ বলিয়া, সমাজসংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত

people whose vitality has been depressed by war, internecine conflicts, scarcity and famine.

"The ravages committed by the two great pandemics of plague in 543 and 1348, and the great prevalence of plague during the Mahommedan supremacy in the East and in Eastern Europe, have been attributed to social, economical, and political conditions, which at the time caused a decline in the general prosperity of the people affected, and rendered them more susceptible to the disease."

(Simpson's Plague, p. 172).

হয়, তাহাদের চেষ্টা অধিক সফল হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বিধবাবিবাহ প্রচলনের চেষ্টা ধরুন। হিন্দুসমাজের অগণ্য জনসংখ্যার তুলনায় ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজের লোক মুষ্টিমেয়। কিন্তু অধিকাংশ বিধবাবিবাহ এই দুই সমাজের লোকের চেষ্টাতেই হইয়াছে। কারণ এই দুই সমাজের লোক ধর্ম্মভাব হইতে সংস্কারকার্য্যে লাগিয়াছে। ধর্ম্ম-ভাবের প্রেরণায়, ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রী-শিক্ষা, বাল্য-বিবাহ নিবারণ প্রভৃতির চেষ্টা হিন্দুসমাজ অপেক্ষা অধিক ফলবতী হইয়াছে।

বিশুদ্ধ ধর্ম্মবিশ্বাসের বিস্তারও আবার সমাজ সংস্কারের উপর নির্ভর করে। মনে করুন আমি প্রচার করিতে চাই যে ভগবান মঙ্গলময় ও সর্ব্বজীবে সমদর্শী, ইত্যাদি। যে দেশে এই কথা প্রচার করিতে চাই, তথায় যদি দেখি যে অনেক শ্রেণীর লোক হীনদশাপন্ন, অজ্ঞ, ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত, নারীর অবস্থা হীন, নিজের কোন অপরাধ ব্যতিরেকেও হাজার হাজার বালিকা চিরবৈধব্যে দণ্ডিত ও অনেকস্থলে পাপগ্রস্ত, তথায়, এই সকল লোক কেমন করিয়া আমার কথা মানিবে? কিন্তু আমি যদি সকলকে ভাল হইবার, জ্ঞানী হইবার, উন্নত হইবার, সুখী ও সম্মানিত হইবার সমান অধিকার দিই ও তজ্জন্য চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমার বাক্যে ও আচরণে সঙ্গতি আছে দেখিয়া সকলে আমার কথায় আস্থাবান হইবে ও আমার প্রচারচেষ্টাও সফল হইবে। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। সকলেই জানেন আর্য্য সমাজের লোকেরা অনেক মুসল-মানকে আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন, অথচ তাহাদিগকে স্বসমাজে স্বতন্ত্র নিম্ন স্থান দিতেছেন। এইজন্য এই নব-দীক্ষিত একজন লোক প্রকাশ্যভাবে এই আচরণের নিন্দা করিয়াছেন। ইহা নিশ্চিত, যে আর্য্যসমাজীরা এইসব মুসলমানদিগকে সামাজিক হিসাবে ব্রাহ্মণের ঠিক্ সমান না করিতে পারিলে তাহাদের ধর্ম্মপ্রচার ব্যর্থ হইবে।

সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, যে সমাজসংস্কার ব্যতীত প্রকৃত ধর্ম্মসংস্কার হইতে পারে না। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। পবিত্রতা ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। আমাদের দেশে কৌলীন্য ও সামাজিক বলে রক্ষিত বালবিধবার চিরবৈধব্য থাকিতে, বাইনাচ আদি প্রথা থাকিতে, দক্ষিণে দেবদাসীর প্রথা থাকিতে, কখনই সামাজিক পবিত্রতা থাকিতে পারে না। সুতরাং চরিত্রের সংযমও রক্ষিত হইতে পারে না। বাল্যবিবাহও ব্রহ্মচর্য্য এবং সংযমনাশের একটি প্রধান কারণ। পবিত্রতা ও সংযম না থাকিলে ধর্ম্মও থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সমাজসংস্কারের উপর প্রকৃত ধর্ম্মসংস্কার নির্ভর করিতেছে। বাস্তবিক যতদিন স্ত্রীজাতির অবস্থা হীন থাকিবে, যতদিন নারী পুরুষের ভোগ্যা, প্রধানতঃ এই ভাব সমাজে থাকায় তাহাদের মানসিক, নৈতিক, ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা না হইবে, পুরুষ-সুলভ-ঈর্ষ্যা ও সন্দেহবশতঃ তাহারা বন্দীর মত থাকিবে, ততদিন সামাজিক সংযম ও পবিত্রতা অসম্ভব থাকিবে। বিবাহ সমাজের উৎপত্তি ও স্থিতির মূলীভূত কারণ। নারী সম্বন্ধে পুরুষের মনের ভাব উন্নত না হইলে সমাজের এই মূলই দূষিত ও অপবিত্র থাকায়, সমাজ কেমন করিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইবে? বস্তুতঃ নারীকে শ্রদ্ধা না করিলে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ অসম্ভব।

মাদকসেবন আর একটি সামাজিক কুপ্রথা, যাহা উন্মূলিত না হইলে প্রকৃত ধর্ম্মভাব জন্মিতে ও বিস্তৃত হইতে পারে না।

যাহারা দেশের ধন উৎপাদন করে, তাহারা নিজ নিজ শ্রম ও দক্ষতার যথাযোগ্য ফলভাগী হয়, ইহাই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে, যে, যাহারা মূলধন খাটাইয়া কোন ব্যবসা বা কারখানা চালায় তাহারাই লাভের অধিকাংশ গ্রহণ করে; শ্রমজীবী ও কারিগরগণ কোন প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়। এই কারণে আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ধর্ম্মঘট চলিতেছে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়;—কেবল শ্রমজীবী, কারিগর ও কর্ম্মচারীরা আপনাদের ন্যায্য অধিকার চাহিতেছে, অন্যদিকে মূলধনীরা বহুকাল যে লাভে ও প্রভুত্বে অভ্যস্ত তাহা ছাড়িতে চাহিতেছে না। এ সমস্যার সমাধান দু রকমে হইতে পারে। (১) মূলধনীরা বাধ্য হইয়া কাজ করিবার লোক না পাওয়ায় অধিকতর পারিশ্রমিক দিতে বাধ্য হইবে। (২) তাহারা ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া অধিকতর পারিশ্রমিক দিবে। প্রথমোক্ত প্রকার সমাধানই অধিকাংশ স্থলে হইতেছে; শেষোক্ত প্রকার সমাধান অতি অল্প স্থলে হইয়াছে, যদিও

উহাই প্রকৃত স্থায়ী সমাধান। নতুবা চিরকাল ঝগড়াই চলিবে। কেবল ধার্ম্মিক মূলধনীই ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায় ও দয়াপরবশ হইয়া শ্রমিকদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে। তাহাদের শিক্ষা আদির বন্দোবস্ত করিলে তাহারা অধিকতর কার্য্যক্ষম হয়। কিন্তু ইহাও উন্নতচরিত্র মূলধনীর কাজ।

প্রকৃত ধর্ম্মসংস্কার ব্যতিরেকে যে, দেশের আর্থিক অবস্থা ভাল হয় না, তাহা বেশ বুঝা যায়। সকল উন্নতির মূলে উদ্যম বা উদ্যোগ। কিন্তু অদৃষ্টবাদ আমাদের হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া আমাদিগকে নিরুদ্যম করিয়াছে। এক প্রকার মায়াবাদও সংসারের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া আমাদিগকে উদাসীন করিয়াছে। আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে এই দুই অনিষ্টকর মত দূরীভূত না হইলে আমাদের জাতীয় সম্পদ বাড়িবে না। প্রকৃত ধর্ম্মসংস্কার হইলে জাতীয় চরিত্রের উন্নতি হয়। এখন আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করি না। সুতরাং যৌথ কারবার বেশী চলে না। আমাদের শ্রমিক ও কারিগরদিগকে বিশ্বাস করিবার যো নাই। সুতরাং তাহাদের উপর নজর রাখিবার, তাহাদিগকে খাটাইবার জন্য আবার লোক চাই। ইহাতে খরচ বাড়িয়া যায়। কিন্তু কর্ত্তব্য-জ্ঞানবিশিষ্ট লোকদিগের দ্বারা যে কাজ হয়, হাজার তত্ত্বাবধানেও, যাহাদের ফাঁকি দেওয়া স্বভাব, বা যাহারা অলস, তাহাদের নিকট সেরূপ কাজ পাওয়া যায় না। এই জন্য আমাদের জাতীয় চরিত্রের উন্নতি না হইলে আমরা কল কারখানা ও ব্যবসায়ে কখনও পাশ্চাত্যজাতিদের সমকক্ষ হইতে পারিব না। কিন্তু এই উন্নতি প্রকৃত ধর্ম্মসংস্কার সাপেক্ষ।

আমাদের দেশের মায়াবাদ সংসৃষ্ট ভ্রান্তধারণা ও অন্যান্য কারণে সাধু সন্ন্যাসী ও বৈরাগী ভিক্ষুকের দল অত্যন্ত বাড়িয়াছে। লক্ষ লক্ষ কার্য্যক্ষম লোক পরিশ্রম না করিয়া আলস্যে ও পাপকার্য্যে স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতেছে। এই বিষয়ে ধর্ম্মসংস্কার আবশ্যক। হয় এই সব অকর্ম্মা-লোকদিগের নিকট হইতে যথাযোগ্য কাজ লওয়া উচিত, নতুবা ধর্ম্মসংস্কার দ্বারা, ইহাদিগকে ভিক্ষা দেওয়া পুণ্য নহে, পাপ, এইরূপ ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য আমরা প্রকৃত সাধুদের কথা বলিতেছি না। তাঁহারা ভিক্ষাব্যবসায়ী নহেন, এবং ভিক্ষার্থ লোকালয়ে আসেনও না।

অন্যদিকে আবার দেখুন, দুই চারি জন জ্ঞানী লোকের পক্ষে দারিদ্র্য অনিষ্টকর না হইলেও, মোটের উপর দারিদ্র্যে জাতির মধ্যে অধর্ম্ম বৃদ্ধি পায়। দারিদ্র্যে চুরি ডাকাতি ত বাড়েই, অধিকন্তু দরিদ্রতার মধ্যে উচ্চ ও কোমল মানসিক বৃত্তি ও ভাব সকল বিকাশ পায় না। কেবল গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহের জন্য যাহাদিগকে সকাল সন্ধ্যা খাটিতে হয়, তাহারা ধর্ম্মের কথা ভাবে কখন? তাহারা একটু অবসর পাইলেই অনিষ্টকর মাদকর্জনিত উত্তেজনা ও জঘন্য আমোদেই কাল যাপন করিতে চায়। যাহারা খাইতে পরিতে পায় না, তাহাদিগের নিকট সুপুষ্ট প্রচারকের ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাওয়া বৃথা। অনেকে ধরিয়া রাখিয়াছেন যে সংসারে চিরকালই অধিকাংশ লোক খুব গরীব থাকিবে ও কতকগুলি খুব ধনী থাকিবে। কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ঈশ্বরবিশ্বাসী লোকে ইহা মানিতে পারেন না। সকলকে ধনী করা যায় না, করিবার প্রয়োজনও নাই, কিন্তু সকলেরই অবস্থা সচ্ছল করা যায়, এবং তাহা না করিলে কখনও সংসারে ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

যাহারা মূর্খ, অশিক্ষিত, অনুন্নত, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া স্বার্থপর লোকের কাজ নয়। ধর্ম্মপ্রাণলোকেরাই এই সকল লোকদিগকে শিক্ষা দিতে পারে। বাস্তবিক দেখা যায় অনেক দেশেই হীনাবস্থাপন্ন লোকদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত ধর্ম্মপ্রচারক বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা হইয়াছে। আমাদের দেশে যে যে ধর্ম্মসম্প্রদায়কে গরীব, "অস্পৃশ্য", অজ্ঞ জাতি সকলের শিক্ষাদানে অগ্রসর হইতে দেখিব, তাঁহাদিগকেই ধার্ম্মিক বলিয়া বুঝিব। আর সকলে কেবল ধর্ম্মের খোসা লইয়া আছেন, বুঝিতে হইবে। যাঁহারা ভগবানকে পতিতপাবন মনে করেন, তাঁহারা নিজেও অধঃপতিত লোকদের উদ্ধারার্থ সচেষ্ট হন।

ধর্ম্মশিক্ষা ব্যতিরেকে কেবল ঐহিক জ্ঞান বৃদ্ধিতে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ হয় না। যাহাতে মানুষ সচ্চরিত্র ও পরার্থপর হয়, তাহাকেই আমি প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা বলি।

শিক্ষা ব্যতিরেকে জনসাধারণের মধ্যে কোন বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত ও ভাব সম্যক্রূপে বিস্তার লাভ করিতে পারে না। শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কত কুসংস্কার আপনা আপনি

অন্তর্হিত হইতেছে। আমাদের দেশে স্ত্রীলোক ও অশিক্ষিত লোকদের মন কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধর্ম্মবিশ্বাসের দুর্গস্বরূপ। এই দুর্গ ভূমিসাৎ করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষা।

সর্ব্ববিধ সংস্কার কার্য্যে ধর্ম্মের যেরূপ প্রভাব আছে, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ক কার্য্যেও তদ্রূপ। বাস্তবিক দেখিতে পাই, যখন দেশব্যাপী মহামারী হয়, তখন রোগীর চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা, প্রভৃতি কার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ধাম্মিক লোকেরাই অগ্রসর হন। যাঁহারা নিজে সুস্থ-দেহে সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন, ধর্ম্মই তাঁহাদিগকে চিররুগ্ন বা অস্বাস্থ্যজনক অবস্থার মধ্যে জীবনযাপক লোকদের জন্য চোখের জল ফেলিতে ও খাটিতে বাধ্য করে। ইহা যেমন সত্য, তেমনই ইহাও দেখা যায়, যে, দু একজন ধার্ম্মিক লোক বাদদিলে, অসুস্থ, দুর্ব্বল জাতির সংযমী ও উন্নতচরিত্র হওয়া কঠিন। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" সেই পরমাত্মা বলহীনের লভ্য নহেন। দৈহিক স্বাস্থ্য ও বলের সহিত আধ্যাত্মিক শক্তির নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। আমাদের দেশে স্নানাদি দ্বারা শুচি হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহার কারণই এই। প্লেগে ও দুর্ব্বলতায় বিক্ষিপ্তচিত্ত, ক্ষীণ মানসিক শক্তি বিশিষ্ট লোক, ভগবানের ধ্যান ধারণা কেমন করিয়া করিবে, উৎসাহের সহিত বহু আয়াসসাধ্য ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মাচরণই বা কেমন করিয়া করিবে?

৩। সামাজিক।

কোন মানুষ কোন কাজের উপযুক্ত, তাহা সকল সময় প্রথমেই বুঝা যায় না। যে যাহার উপযুক্ত, সে সেই কাজ করিলেই কাজও ভাল হয়, ধনোৎপাদনও অধিক হয়। কিন্তু আমাদের দেশে খাইতে পাক্ আর নাই পাক্, সকলেরই অল্পবয়সেই বিবাহ করা চাই। সুতরাং মানুষ দশরকম উপায় অন্বেষণ করিতে পায় না। নিজের ও পরিবারের পেটের জ্বালায় অস্থির হইয়া হাতের কাছে যে কাজ পায় তাহাতেই প্রবৃত্ত হয়। তাহাতে আয় অতি সামান্য হইলেও তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়; ধ্রুব আয় ছাড়িয়া অধ্রুব অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে সাহস হয় না। হয় ত তাহা করিতে পারিলে তাহার উপযুক্ত কাজ মিলিত। বাল্যবিবাহে মানুষকে অল্পবয়সে পরিবারের ভারাক্রান্ত ত করেই, তাহাকে ভাল করিয়া কিছু শিখিবারও সুযোগ দেয় না। তদ্ভিন্ন ইহাতে আয়বিহীন কতকগুলি লোকের সৃষ্টি করিয়া জাতীয় দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে। অতএব জাতীয় দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে এই কুপ্রথার মূলোৎপাটন করা দরকার।

আমাদের দেশে জাতিভেদ থাকায় একটা লাভ এই হইয়াছে, যে বহু শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্লবাদিতেও অনেক দেশীয় শিল্প পৈত্রিক বলিয়া রক্ষা পাইয়াছে, এবং বংশানুক্রমিক দক্ষতা পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও বদ্ধমূল হইয়াছে। অপরদিকে কিন্তু অনিষ্টও খুব হইয়াছে। নূতন নূতন লোক নূতন রকম বুদ্ধি লইয়া কোন ব্যবসায়ে না ঢুকিলে কার্য্য ও শিল্পপ্রণালীতে কোন উন্নতি হয় না। আমাদের দেশেও তাই হাজার বৎসর আগে যে সকল পদ্ধতি ছিল, তাহাই চলিতেছে। অন্য দেশে জাতিভেদজনিত রক্ষণশীলতা না থাকায় তাঁতি, কামার, প্রভৃতি সকলের কাজে নূতন প্রণালী অবলম্বিত হওয়ায় আমরা পরাস্ত হইয়াছি। তা ছাড়া, আমাদের দেশে কার্য্যভেদে উচ্চ ও নীচ জাতি বিষয়ক ধারণা থাকায় শ্রম-গৌরব বোধ নাই। তাহাতে শিল্পকাজসকল নিরক্ষর অল্প বুদ্ধি লোকদের হাতে থাকায় শিল্পের উন্নতি হয় নাই। "ভদ্র" ও বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোকেরা এ সকল হইতে দূরে থাকায় আমরা ক্রমশঃ পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছি। সুখের বিষয় এখন এবিষয়ে সুলক্ষণ দেখা দিয়াছে। জাতিভেদজাত এই সকল অনিষ্টকর ধারণা যত দূর হইবে, আমাদের পক্ষে ততই মঙ্গল।

জাতিভেদ সংসৃষ্ট আর এক মত এই যে সমুদ্রে গেলে ও ম্লেচ্ছসংস্পর্শ ঘটিলে জাতি যায়। ইহাতে আমাদের এই ঘোরতর অনিষ্ট হইয়াছে, যে আমরা শিল্পাদি শিক্ষার্থ ও বাণিজ্যার্থ বহুযুগ ধরিয়া বিদেশ যাই নাই। সুতরাং আমরা শিল্পাদিতে অক্ষম, মূর্খ, ভীরু ও উদ্যমহীন হইয়া রহিয়াছি। সুখের বিষয়, এ বিষয়েও ক্রমে ক্রমে আমাদের কুসংস্কার দূর হইতেছে।

তাহার পর আমাদের কেমন একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে পরিবার প্রতিপালন ক্ষমতা থাক্ আর নাই থাক্ বিবাহ করা চাই। এইরূপে সকলের পায়ে বেড়ী পড়ায় আমাদের মধ্যে উদ্যমশীল (enterprising) লোক কম। দশবার পড়িবে, দশবার উঠিবে, তাকে বলি মানুষ।

কিন্তু যাহার পতনের সঙ্গে দশটা কাচ্চাবাচ্চাও পড়ে, তাহার উদ্যম কোথা হইতে জন্মিবে?

আমাদের দেশে অনেক লোক পুত্রকন্যার বিশেষতঃ কন্যার বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত ও দরিদ্র হইয়া পড়ে। শ্রাদ্ধাদির ব্যয়েও বিস্তর লোক এরূপ ঋণগ্রস্ত হয় যে চিরজীবনে সে ঋণ আর শোধ করা যায় না।

এইরূপে দেখা যায় যে নানাবিধ সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূর না করিলে আমাদের জাতীয় সম্পদ্ বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক অনার্য্য শূদ্র রাজা হইয়া গিয়াছেন। রাজার মান্যও তাঁহারা পাইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও দেখা যায় শিক্ষালাভ করিয়া বা ব্যবসাদি দ্বারা অবস্থার উন্নতি করিয়া অনেক তথাকথিত "নীচ" জাতির লোক সমাজে সম্মানের স্থান পাইতেছেন। এই প্রকারে অর্থাগম একটা ভ্রান্ত সামাজিক কুসংস্কারের মূলে পরোক্ষভাবে কুঠারাঘাত করিতেছে।

আমাদের দেশে সকলে মুখে না বলুন (কেহ কেহ মুখেও বলেন), বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করিবার একটা কারণ আর্থিক। বাড়ীতে বিধবা ভগ্নী, বা মাসী পিসী থাকিলে যেমন বিনা বেতনে উৎকৃষ্ট চাকরাণী পাওয়া যায়, এমন আর কোন্ উপায়ে পাওয়া যাইবে? অবশ্য সকল পরিবারেই যে তাঁহারা দাসীরূপে ব্যবহৃত হন তা নয়। অনেকে তাঁহাদিগকে সেবাব্রতধারিণী দেবী বলিয়া বর্ণনা করিয়া আত্মপ্রবোধ দেন ও আত্মপ্রতারণা করেন। বিধবাদের মধ্যে উক্তরূপ দেবীপদবাচ্যা অনেকে আছেন, তাহাও স্বীকার করি। তবে ইহাও ঠিক্ যে তাঁহারা অধিকাংশ স্থলে দাসীর কাজ করেন ও অনেকটা দাসীর মত ব্যবহার পান। দেশের আর্থিক অবস্থা ভাল হইলে বাল-বিধবাদের বিবাহে আপত্তির প্রবলতা কিছু কমিবে বলিয়া আশা করা যায় কি?

বাল্যবিবাহ বন্ধ না হইলে ছেলেদের ভাল করিয়া শিক্ষা হয় না, মেয়েদের ত হয়ই না। এবিষয়ে বেশী লেখা নিষ্প্রয়োজন। বাল্যবিবাহের দেশে ব্রহ্মচর্য্য ও সংযমের কথা মুখে আনাও হাস্যকর। অবরোধপ্রথার বাড়াবাড়িতেও মেয়েদের স্কুলে পাঠাইয়া শিক্ষা দিবার ব্যাঘাত হয়; তা ছাড়া সংসার দেখিয়া শুনিয়া যে শিক্ষা ও সাহস জন্মে আমাদের দেশে তাহা ত হয়ই না। সংগ্রাম ও সংঘর্ষজনিত চরিত্রবল লাভও তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। মানসিক সংকীর্ণতা ও কুৎসাপরায়ণতা প্রভৃতি দোষও আমাদের দেশের নারী-জীবনের অবস্থাবশে দূর হইতে পায় না।

জাতিভেদে শিক্ষার অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে। এখনও বাঙ্গালা দেশে পর্য্যন্ত "নীচ" জাতির ছেলেরা সাধারণ স্কুলে ভর্ত্তি হইলে কোথায় বসিবে তাহা লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া যায়। মান্দ্রাজ অঞ্চলে ত শূদ্রের অপেক্ষাও হীন পারেয়া বা পঞ্চম শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র স্কুল করিতে হইয়াছে। থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর সভাপতি কর্ণেল অলকট এই শ্রেণীর লোকদের শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। খ্রীষ্টান মিশনরীদের ত কথাই নাই। গবর্ণমেণ্টও এবিষয়ে চেষ্টিত আছেন, কিন্তু যতটা চেষ্টা করা উচিত, তাহা করিতেছেন না।

সমুদ্রলঙ্ঘনে জাতি যাইবার ভয়ে আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে। যাহা হউক, এ জুজুর ভয় আর বেশীদিন টিকিবে না।

শিক্ষা যে সমাজসংস্কারের প্রধান উপায় তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন অনেক শিক্ষিত লোকও মনে মনে সমাজ-সংস্কারের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াও বাড়ীর মেয়েদের ভয়ে কিছু করিতে পারেন না। মেয়েরা শিক্ষা পাইলে এবিষয়ে সুবিধা হয়। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার না হইলেও সামাজিক কুপ্রথা সমূহ সকল শ্রেণীর লোকের মধ্য হইতে দূর হইতে পারে না।

সামাজিক কুপ্রথার সঙ্গে স্বাস্থ্যের খুব সম্পর্ক আছে। বাল্যবিবাহের কুফলের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; কৌলীন্য ও বালবিধবাদের চিরবৈধব্য হইতে যে দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব হয় ও তদ্দ্বারা কুৎসিৎ ব্যাধি বিস্তার লাভ করে, তাহাও বলা হইয়াছে। আমাদের দেশে সূতিকাগার সম্বন্ধীয় কুসংস্কারে কত মাতা ও শিশু যে প্রাণহারায় বা চিররুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়া থাকে, তাহা বলা যায় না। স্ত্রীলোক-দের মূর্চ্ছাদি অনেক রোগে ডাক্তারেরা মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ আদির বন্দোবস্ত করেন। ইহার মানে আর কিছুই নয়, অবরুদ্ধ বাতাসে কালযাপন স্বাস্থ্যের বিরোধী। শ্রমজীবী

শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরের বন্দিনী নহে। তাহাদের মধ্যে এই সকল রোগ কেহ বেশী দেখিয়াছেন কি? যাঁহারা যত "ভদ্র" ও "সম্ভ্রান্ত" তাঁহাদের মধ্যে এই সব রোগ তত বেশী। অবরোধপ্রথা অনেক স্ত্রীলোকের অকালে প্রাণ বিয়োগের কারণ, অনেকের আমরণ রোগের ও দুঃখের কারণ।

৪। আর্থিক।

সাধারণ ও শিল্প শিক্ষা যে জাতীয় সম্পদের কারণ তাহা শ্রাবণ মাসের "প্রবাসী"তে প্রথম প্রবন্ধে দেখান গিয়াছে।

আমরা যদি আমাদের দেশে নানা প্রকার গার্হস্থ্য শিল্পকার্য্য (home industries) চালাইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের আর্থিক অসচ্ছলতা বহু পরিমাণে দূর হইতে পারে। কিন্তু ইহা স্ত্রীলোকদের শিক্ষাসাপেক্ষ। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হওয়া প্রার্থনীয়।

শিক্ষা যে অর্থব্যয়সাপেক্ষ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। শ্রাবণের "প্রবাসী"র প্রথম প্রবন্ধে ইহাও দেখান হইয়াছে; গবর্ণমেণ্ট হউক বা আর কেহ হউক, টাকা খরচ করিলে ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে অল্পবয়স্ক নিরক্ষর লোক প্রায় কেহই থাকিবে না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অনেকে মনে করেন, আমাদের দেশের লোকদের কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতাই স্ত্রীশিক্ষার অল্প বিস্তারের একমাত্র কারণ। বাস্তবিক ইহা একটি প্রধান কারণ হইলেও ইহা জানা উচিত যে এপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট বা আর কেহই স্ত্রীশিক্ষার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন নাই। আর্থিক অবস্থার সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার আরও সম্বন্ধ আছে। সকলেই জানেন অনেক বালিকা গৃহস্থালীর কাজে মায়ের সাহায্য করে। তাহাদের গৃহকার্য্য শিক্ষার আমরা বিরোধী নহি, বরং সমর্থক। কিন্তু অনেক বালিকাকে, পিতামাতার দরিদ্রতাবশতঃ, এই কার্য্যেই সমস্ত সময় দিতে হয়; তা ছাড়া ছোট ভাই ভগিনীদিগকে কোলে লইয়া থাকিতে হয়। ইহাও ভাল। কিন্তু সকল কাজেরই সীমা থাকা চাই। কেবল রাঁধা বাড়া, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা ও ছেলে কোলে করা, ইহাই নারীজীবনের চরম আদর্শ, সফলতা ও বিকাশ নহে। এইজন্য বলিতেছি যে পিতামাতার আর্থিক অবস্থা ভাল হইলে অনেক বালিকা শিক্ষা করিবার অবসর ও সুযোগ পায়।

আর্থিক অবস্থার সহিত স্বাস্থ্যের সম্পর্ক শ্রাবণের "প্রবাসী"তে "ইংরাজ রাজত্বে ভারতের স্বাস্থ্য" নামক প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধেই পূর্ব্বে সিমসন সাহেবের প্লেগ বিষয়ক পুস্তক হইতে যে মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও দারিদ্র্য মহামারীর কিরূপ বন্ধু তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে দারিদ্র্যের সহিত মহামারীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা গিয়াছে। পাদটীকায় তাহার একটি প্রমাণ দেওয়া গেল।*

আর ইহা ত সহজ বুদ্ধিতেও বুঝা যায় যে মানুষ দারিদ্র্যের জন্য যদি না তা খাইতে বা উপবাস দিতে বাধ্য হয়, যদি শীত বৃষ্টি সহিতে বাধ্য হয়, মলিন জীর্ণ কাপড় পরিতে ও অন্ধকার আর্দ্র, বায়ুচলাচলবিহীন বাড়ীতে থাকিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই রুগ্ন হইবে।

যাহার শরীর সুস্থ ও সবল, কার্য্যক্ষেত্রে সে যে বেশী অর্থ উপার্জ্জন করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা আষাঢ় মাসের "প্রবাসী"তে দেখাইয়াছি যে বঙ্গদেশের অধিকাংশ কলকারখানায় অধিকাংশ শ্রমজীবী ও কারিগর আজকাল অবাঙ্গালী। ইহার সঙ্গে কি বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতা ও রুগ্নতার কোন সম্পর্ক নাই? অনেকেই জানেন না যে ইংরাজকুলি আমাদের দেশের ৫।৬ জন কুলির সমান কাজ করে। এক জন ইংরাজ কাপড়ের কলে প্রায় ৬টা তাঁতের উপর নজর রাখে ও চালায়। বোম্বাইয়ে দুজনে ৭টা তাঁত চালায়, বাঙ্গলাদেশে দুজনে তিনটা চালাইতে পারে। দৈহিক সামর্থ্যের সহিত কি এই ব্যাপারটির কোন সম্পর্ক নাই?

৫। শৈক্ষিক।

শিক্ষা না পাইলে মানুষ স্বাস্থ্যতত্ত্ব জানিতে পারে না। তাহা না জানায় আমাদের দেশে অনেক লোক অল্পায়ু ও

* "In connection with this epidemic it is interesting to note that the country people in France dwelt mostly in one-storied huts having mud or clay walls and thatched roofs. Windows were the exception. Over the door was usually an opening for air and light, which also served as an outlet for the smoke from the brushwood fire. The sleeping places were dark, airless recesses, in which the people having divested themselves of all clothing rested upon straw mattresses or sometimes on feather beds."

("The Great Pestilence A. D. 1348-9, by Francis Adian Gasquet, D.D., 1893) quoted in Simpson's Treatise on plague p. 24."

চিররুগ্ন হয়। অনেক বালিকা মাতা শিশু পালন করিতে পারে না। যে অজ্ঞতা ও অল্পবয়স প্রযুক্ত নিজের শরীরের যত্ন করিতে পারে না, সে কেমন করিয়া শিশুপালন করিবে? অন্যান্য কারণের মধ্যে এই কারণেও আমাদের দেশে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা ভয়ানক বেশী। আমাদের দেশে স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ক জ্ঞানের বহুল প্রচার আবশ্যক।

অসুস্থ ও দুর্ব্বল শরীর লইয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করাও দুঃসাধ্য। সুতরাং যেমন শিক্ষা ব্যতিরেকে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না, তেমনি স্বাস্থ্য রক্ষিত না হইলে শিক্ষাও হয় না।

ভারতে শিক্ষাপ্রণালীর অনেক সংস্কারের প্রয়োজন। ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত স্কুল গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী নহে। ইহার পরিবর্ত্তন চাই। কেবল স্মৃতিশক্তির উপর অতিরিক্ত বোঝা না চাপাইয়া বুদ্ধিবৃত্তি, পর্য্যবেক্ষণ ও চিন্তা-শক্তির অনুশীলন প্রার্থনীয়। হাতের দক্ষতা বর্দ্ধক শিক্ষার খুব প্রয়োজন। ইহাতে কেবল যে শিল্পশিক্ষার সাহায্য হয়, তাহা নহে, বুদ্ধিরও উন্নতি হয়। ছাত্রেরা যাহাতে শিক্ষা-কার্য্যে সুখ পায়, এরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। শৃঙ্খলাবিহীন ব্যায়াম ও ক্রীড়ায় অনেক সময় অনিষ্টই হয়। উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে, নিজ নিজ শরীরের উপযোগী ব্যায়াম ও ক্রীড়া করিতে সকল ছাত্রকে বাধ্য করা উচিত। আমাদের দেশী ক্রীড়া সকল এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত, যাহাতে দল বাঁধিবার ও দলের নায়কতা করিবার ক্ষমতা জন্মে; দলপতির আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, দলের জন্য নিজ সুখ ও গৌরব বিসর্জ্জন শক্তি জন্মে; এবং খেলোয়াড়গণ জয়ে অতিরিক্ত উৎফুল্ল ও পরাজয়ে সাতিশয় নিরুৎসাহ না হয়। ছাত্রগণকে বাল্যকাল হইতে দেশভক্তি এবং পৌর ও জানপদ-বর্গের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া উচিত। শিক্ষাকার্য্য এই রূপে চলিলে জাতি গড়িবার সুবিধা হইবে।

৬। স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয়।

অন্যান্য বিষয়ক সংস্কার প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যের বিষয়ও আলো-চিত হইয়াছে।

আমাদের শেষ কথা এই যে সংস্কারক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারই অবহেলার যোগ্য নহে; এইটি আগে, এইটি পরে, ইহাও বলিবার যো নাই। যিনি সংস্কারক তাঁহার কোন বিষয়ে উদাসীন হইলে চলিবে না। তবে, ইহা সত্য যে মানসিক প্রবণতা (tendency) ও শক্তির পার্থক্য বশতঃ কেহ বা এক বিষয়ে কেহ বা অন্য বিষয়ে হাত দিবেন; কেহ কেহ আবার একাধিক বিষয়েও হাত দিবেন। কিন্তু ইহা সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে সর্ব্ববিধ সংস্কার পরস্পর-সাপেক্ষ ও জাতীয় উন্নতি সর্ব্ববিধ সংস্কারসাপেক্ষ।

নেপালের পূজা পার্ব্বণ ও জাতীয় উৎসব।

বাঙ্গালা দেশে আমরা ১২ মাসে ১৩ পার্ব্বণের ব্যবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি, এখানে ১২ মাসের পূজা পার্ব্বণের সংখ্যা করিয়া উঠাই এক কঠিন ব্যাপার। কি গুর্খা কি নেওয়ার নেপালীদিগের ভিতর চির-উৎসব চলিয়াছে। এত পূজা পার্ব্বণ, আমোদ আহ্লাদ করিয়া কখন যে তাহারা জীবিকা উপার্জ্জনের অবসর পায় তাহাই ত এক সমস্যা। গুর্খাগণ হিন্দু, নেওয়ারগণ পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিল। এই উভয় সম্প্রদায়ের উৎসব এখন নেপালের জাতীয় উৎসব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণেই নেপালে পূজা পার্ব্বণের এত বাহুল্য দেখা যায়। বৌদ্ধদিগের দেবমন্দির হিন্দুদিগেরও দেবমন্দির হইয়া দাঁড়াইয়াছে—বৌদ্ধদিগের উৎসব হিন্দুরও উৎসব হইয়াছে। বিজয়া দশমী হিন্দুর উৎসব হইলেও নেপালের আপামর সাধারণের তাহাই এখন প্রধান জাতীয় উৎসব।

১। ১লা বৈশাখ হইতে নেপালীদিগের উৎসব আরম্ভ হয়। সেই দিন ভোগমতী গ্রামে নেপালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মহেন্দ্রনাথের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং রাজার তরবারি তাঁহাকে দেওয়া হয়। অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে উচ্চ বিচিত্রবর্ণের পতাকাশোভিত কাঠের রথে বসাইয়া তাঁহাকে পাটনে আনা হয়। আসিবার সময় পথে বিস্তর জনসমাগম হয়। এবং পথে এক এক দিন এক এক স্থানে মহেন্দ্রনাথ অবস্থিতি করেন। সেই দিন সেই স্থানের লোকেরা মহেন্দ্রনাথের সেবকদিগের সেবা করেন। এই প্রকারে প্রায় ৭ দিন ধরিয়া মহেন্দ্রনাথের যাত্রাকার্য্য সম্পন্ন হয়। পাটনে একমাস অবস্থিতি করিয়া পুনরায় শুভ দিন দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ ভোগমতিতে

প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই মহেন্দ্রনাথের যাত্রা বৌদ্ধ নেওয়ারদিগের উৎসব। এখন ইহাতে সর্ব্বসাধারণে যোগ দিয়া থাকে।

২। ৩রা বৈশাখ হইতে বজ্রযোগিনী যাত্রা আরম্ভ হয়। কাটমণ্ডুর সন্নিকটে মুনিচর পর্ব্বতে এই বজ্রযোগিনী দেবীর মন্দির অবস্থিত। প্রায় এক সপ্তাহ ধরিয়া এই উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। দেবীকে এই সময় ক্ষুদ্র কাষ্ঠের মন্দিরে স্থাপন করিয়া সকলে তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া সহর প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ইহাও নেওয়ারদিগের উৎসব।

৩। ২১শে জ্যৈষ্ঠ সিবিযাত্রা—এই দিবসে কাটমণ্ডু সহরের পশ্চিমাংশে বিষ্ণুমতী নদীর তীরে বালকেরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া নদীর উভয় পারে থাকিয়া পরস্পরকে প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি মারিতে থাকে। পূর্ব্বে এই পর্ব্বোপলক্ষে জীবননাশ, অঙ্গহানি পর্য্যন্ত ঘটিত। একবার ইংরাজ রেসিডেন্ট এই উৎসব দেখিতে আসিয়া দৈবাৎ গুরুতর আহত হন। তখন হইতে জঙ্গ বাহাদুর ইহাকে সংযত করিয়া এখন বালকদিগের ক্রীড়ামাত্রে পরিণত করিয়াছেন। এখন গুরুতর দুর্ঘটনা প্রায় ঘটে না।

৪। ঘাটে মঙ্গল—১৪ই শ্রাবণ নেপালের বালকগণ ঘাটাসুরের কুশপুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে বাজারে প্রদক্ষিণ করে, সকলে পড়িয়া তাহাকে উত্তমরূপ প্রহার করে এবং সকলের নিকট ধান্য ভিক্ষা করে। সন্ধ্যার পর মহা সমারোহে উক্ত অসুরের দাহকার্য্য সমাধা হয়। এই প্রকারে দেশ হইতে ঘাটাসুরের বিদূরণ ব্যাপার সমাধা হয়। ইহা বালকদিগেরই উৎসব।

৫। বাঁরযাত্রা—ইহা একেবারে নেওয়ারদিগের উৎসব, এবং নেওয়ারগণ কর্ত্তৃক বৎসরে দুই বার সম্পন্ন হইয়া থাকে, যথা ৮ই শ্রাবণ এবং ১৩ই ভাদ্র। বৌদ্ধমার্গী নেওয়ারদিগের মধ্যে পুরোহিত অর্থাৎ ভিক্ষুসম্প্রদায় বর্ত্তমান সময়ে বাঁরা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এখন বৌদ্ধধর্ম্মের দুর্গতির আর বাকি কিছু নাই। ভিক্ষুদিগের ভিক্ষাব্রত আর নাই। কিন্তু এই দুই দিবস তাহাদিগের পূর্ব্বব্রত স্মরণের দিন। এই দুই বিশেষ দিনে নেওয়ারগণ তাহাদিগের গৃহ বিপনি উত্তমরূপে সজ্জিত করে। নারীগণ গৃহদ্বারে ভাণ্ডপূর্ণ চাউল লইয়া বসিয়া থাকে। বাঁরগণ পূর্ব্বপুরুষদিগের ভিক্ষাব্রত স্মরণ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হয়। নারীগণ সকলকে ভিক্ষা দিয়া কৃতার্থ হয়। নেওয়ারগণ সময়ে সময়ে এই উৎসবে রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে রৌপ্যময় সিংহাসন স্বুবর্ণ ছত্র প্রভৃতি উপহার দিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে বৌদ্ধ নেওয়ারদিগের ইহা এক মহা উৎসব।

৬। রাখি পূর্ণিমা—শ্রাবণের সংক্রান্তিতে এখানে রাখিপূর্ণিমার উৎসব হয়। এই উৎসবে হিন্দু বৌদ্ধ সকলেই যোগ দিয়া থাকেন। বৌদ্ধগণ এই দিবসে নদীতে স্নান এবং দেবতা দর্শন করেন। ব্রাহ্মণগণ সকলের হস্তে রাখি বন্ধন করে, এবং প্রতিদানে বিস্তর দক্ষিণা লাভ করে। অনেকে এই সময় গোঁসাইথান নামক হিমালয়ের উন্নতশিখরে গমন করে।

৭। নাগপঞ্চমী—৫ই শ্রাবণ নাগপঞ্চমী পূজা সম্পন্ন হয়। এই দিবস নাগযুদ্ধে গরুড় জয়লাভ করিয়াছিল। পাটনে চন্দ্রনারায়ণ নামে গরুড়ের যে প্রস্তরময় মূর্ত্তি আছে এই দিবসে তাহা ঘর্ম্মাক্ত হয়। পুরোহিতগণ একখণ্ড কাপড়ে সেই ঘর্ম্ম মুছিয়া রাজার নিকট প্রেরণ করে। লোকের বিশ্বাস সর্পাঘাতগ্রস্ত রোগীকে এই কাপড়ের একটী স্তা জলে ডুবাইয়া পান করাইলে সর্প বিষ স্খালিত হয়।

৮। জন্মাষ্টমী—ভাদ্রমাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম দিনে এই উৎসব হইয়া থাকে। জনসাধারণ এই দিবসে আপন আপন গৃহ সুসজ্জিত করে।

৯। গাইযাত্রা—ভাদ্রমাসের প্রথম দিবসে এই পার্ব্বণ হয়। ইহা নেওয়ারদিগের মধ্যেই প্রচলিত। বৎসরের মধ্যে যাহাদিগের গৃহে কাহারও মৃত্যু হইয়াছে তাহারাই এই পার্ব্বণে যোগ দিয়া থাকে। এই দিবসে কোন ব্যক্তিকে সেই মৃত ব্যক্তির ন্যায় সজ্জিত করিয়া তাহাকে চতুষ্পদ বিশিষ্ট করিয়া রাজার বাড়ীতে লইয়া নৃত্য করে। ইহা এক অপূর্ব্ব উৎসব। স্বয়ং মহারাণীর মৃত্যু হইলেও তাঁহার এক গাভীমূর্ত্তি এই দিবসে করা হয়। এই মূর্ত্তিকে রাজ্ঞীর ন্যায় সুসজ্জিত করিয়া চতুষ্পদ বিশিষ্ট করে।

১০। বাঘ যাত্রা—ইহাও ভাদ্রমাসে হইয়া থাকে। ব্যাঘ্রমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া লোকেরা বাড়ী বাড়ী নৃত্য করিয়া আমোদ করিয়া বেড়ায়।

১১। ইন্দ্রযাত্রা—২৬শে ভাদ্র নেওয়ারদিগের মধ্যে এই মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই দিবসে একটী উচ্চ কাটের স্তম্ভ রাজার বাটীর সম্মুখে রোপণ করা হয়। তখন সকলে নানা প্রকার মুখোস পরিয়া ইহার চারিদিকে নৃত্য করে। তৃতীয় দিবস কয়েকটী কুমারীকে রাজার সম্মুখে আনিয়া পূজা করা হয়। কুমারীগণ পূজিত হইলে তাহাদিগকে রথে বসাইয়া সহর প্রদক্ষিণ করা হয়। সহর প্রদক্ষিণানন্তর রাজবাটীর সম্মুখে রথ উপস্থিত হইলে রাজার গদী কুমারীদিগের সম্মুখে বিস্তৃত করা হয়। কখন কখন রাজা তদুপরি স্বয়ং উপবেশন করেন, রাজার অবর্ত্তমানে তাঁহার তরবারি তদুপরি রক্ষিত হয়। ইন্দ্রযাত্রা নেওয়ারদিগের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। এই দিবস পৃথ্বীনারায়ণ গুপ্তভাবে কাটমণ্ডু সহরে কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। নেওয়ারগণ এতই উৎসবে মত্ত ছিল যে তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই। কুমারীগণ সহর প্রদক্ষিণ করিয়া রাজবাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে যখন রাজার গদী বিস্তৃত হইল, তখন পৃথ্বীনারায়ণ স্বয়ং তাহাতে উপবেশন করিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

১২। দশমী বা দুর্গোৎসব—বঙ্গদেশে যখন দুর্গোৎসব হইয়া থাকে তখন এখানেও দশমীর উৎসব হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইহাই নেপালের সর্ব্বপ্রধান জাতীয় উৎসব। নেপালের জনসাধারণ সমুদায় মনপ্রাণের সহিত এই উৎসবে যোগ দিয়া থাকে। বঙ্গদেশের ন্যায় এখানে দেবীর প্রতিমা নির্ম্মিত হয় না। সপ্তমীর দিনে সমুদায় সৈন্য ব্যূহাকারে টুনিখেলে সজ্জিত হয়। স্বয়ং রাজা, মন্ত্রী ও সমুদায় গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হন। রাণীপখরীর মন্দিরে যেমন নারীগণ ঘটস্থাপন করেন অমনি দিগদিগন্ত কম্পিত করিয়া ভীমগর্জ্জনে সমুদায় বন্দুক কামান ধ্বনিত হইয়া উঠে এবং দশমীর উৎসব আরম্ভ হয়। দরিদ্র, ধনী, সকলের গৃহে গৃহে ছাগ, মহিষ বলি দেওয়া হয়। নেপালে দশমীর উৎসবের ইহাই প্রধান অঙ্গ। এই সময়ে গৃহে গৃহে, পথে, হাটে, ঘাটে, সর্ব্বত্রই বলি, সর্ব্বত্রই রুধিরোৎসব। স্বয়ং রাজা, মহারাজা প্রভৃতি স্বহস্তে বলি দিয়া থাকেন। অষ্টমী ও নবমীতে সহস্র সহস্র ছাগ এবং মহিষ দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হয়। এই সকল পশু অধিকাংশই বহুদিন পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত হয়। দশমীর দিন উৎসবের অবসান। সেইদিন সকলে নববস্ত্র পরিধান করিয়া আত্মীয় স্বজনের গৃহে সমাগত হয়, এবং গৃহস্বামী সকলের কপালে টীকা দেন। সেই দিন রাজকর্ম্মচারিগণ রাজগৃহে সমাগত হয়—তাঁহাকে অর্থ দিয়া দর্শন করে এবং তিনি সকলের কপালে টীকা দিয়া আপ্যায়িত করেন।

১৩। বঙ্গদেশের ন্যায় এখানেও শ্যামাপূজার সময় গৃহ সকল আলোকমালায় সজ্জিত হয়। কিন্তু শ্যামাপূজা হয় না। লোকে লক্ষ্মীপূজা করে, এবং সমস্ত রাত্রি জুয়া খেলে। এই সময় তিন দিন নেপালীগণ উন্মত্তের ন্যায় পথে ঘাটে জুয়া খেলিয়া বেড়ায়।

১৪। ১৬ই কার্ত্তিক নেপালীদিগের কুকুর পূজার দিন। সে দিন পথে ঘাটে দেখি কুকুরের গলায় মাল্য, কপালে টীকা। ৩৬৪ দিন তাহারা সর্ব্বত্র প্রহার দ্বারা অভ্যর্থিত হয় কিন্তু এই একটি দিবস তাহারা সমাদর, আহার, পূজা সকলই লাভ করে। বোধ হয় 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম'-বাদী বৌদ্ধগণ জীবগণের প্রতি প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ এই উৎসবের প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন।

১৫। ভাইপূজা—আমাদের দেশে যে দিন ভগিনী ভাইএর কপালে ফোঁটা দেন সেই দিনই নেপালী সুন্দরীগণ ভাইপূজায় প্রবৃত্ত হন। ইহা রীতিমত ভাইপূজার ব্যাপার —জ্যেষ্ঠা ভগিনী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও এই দিবসে পূজা করেন, এবং নানাবিধ মিষ্টান্ন আহার করাইয়া পরিতৃপ্ত করেন।

১৬। বাল চতুর্দ্দশী—এই দিবসে বানরদিগের উৎসব। পশুপতিনাথের নিকটস্থ মৃগস্থলী নামক বনে গিয়া সকলে চাউল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করে। বানরেরা আসিয়া মহানন্দে আহার করে।

১৭। কার্ত্তিক পূর্ণিমা—এই দিবস নেপালের সধবা সুন্দরীগণ উপবাস করেন এবং সকলে পশুপতিনাথ দর্শন করিতে আসেন। পরদিন প্রাতে স্বামীর চরণ পূজা করিয়া জল গ্রহণ করেন।

১৮। গণেশ চৌথ—৪ঠা মাঘ উপবাসান্তে সকলে উত্তম আহার করিয়া থাকে।

১৯। বসন্ত শ্রীপঞ্চমী উৎসব।

২০। মাঘী পূর্ণিমা—যাঁহারা সমুদায় মাঘমাস বাঘমতীর জলে অবগাহন করিয়া স্নান করেন তাঁহাদিগকে সংক্রান্তির দিন ডুলীতে করিয়া দেব মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়, এবং তাঁহাদের বক্ষে, হস্তে, চরণে, প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ দেওয়া হয়। নেপালের দুরন্ত শীতে বাঘমতীর হিম জলে অবগাহন বড় সহজ ব্যাপার নহে।

২১। হোলি বা বসন্ত উৎসব—ফাল্গুনের সংক্রান্তি দিনে রাজবাটীর সম্মুখে একটা কাষ্ঠের স্তম্ভে নানাবিধ পতাকা প্রোথিত করিয়া রাখা হয়। নেপালে হোলি রাজবাটীরই উৎসব। সকলে শুভ্র বসন পরিধান করিয়া রাজবাড়ীতে গমন করে। সেখানে সকলকে ফাগ দিয়া রঞ্জিত করা হয়। স্বয়ং রাজাধিরাজ, মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত মহোৎসাহে ফাগ খেলা করেন। সাধারণ লোকে ফাগ খেলা করে না। রাজবাটীতেই ফাগ খেলার স্থান।

২২। ১৫ই চৈত্র ঘোড়াযাত্রা—এই দিবস রাজা, মন্ত্রী, ও প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ টুঁনিখেলে সমবেত হন; এবং তাঁহাদের সম্মুখে ঘোড়দৌড়, মনুষ্যদৌড় এবং নানাবিধ ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শিত হয়। ঘোড়াযাত্রার পর নেপালীগণ দুই দিন জুয়া খেলায় মত্ত হয়। ইহা ও দীপান্বিতা ভিন্ন অন্য সময় জুয়া খেলিলে দণ্ডার্হ হইতে হয়।

শ্রীহেমলতা দেবী।

তপস্যার ফল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

তপস্যা।

ডাক্তার ভট্টাচার্য্য, একদিন অপরাহ্ণ সময়ে বোনার্জির গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, যে মাদুর মোড়া মেজের উপর একখানি কার্পেটের আসনে, দুভাগ মহাভারত বালিষরূপে মাথায় দিয়া, অপর এক ভাগ মহাভারত পার্শ্বে রাখিয়া, বোনার্জি সাহেব লম্বমান। নৈমিষারণ্যের ঋষিগণও হয় ত বোনার্জির মতই চক্ষু মুদিয়া সৌতিবিবৃত কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু শুইয়া শুইয়া কুরুকুলকথার রসাস্বাদন করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। ভট্টাচার্য্য, ধ্যানমগ্ন বন্ধুকে কহিলেন, "কিহে, একেবারে যে কার্পেটের উপর ধরাশায়ী; বিরহ-শয়ন নাকি?" বোনার্জি একটু হাসিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, কিন্তু শয্যা ত্যাগ করিলেন না। ভট্টাচায্য ভাবিলেন, যে রোগীর রোগনির্ণয়ের এই উপযুক্ত অবসর; তখন তিনি একেবারে বন্ধুর উরুদেশে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, "তোমাকে নিশ্চয়ই প্রেমে ধরেছে; সত্য কি না বল।" কথাটা পরিহাসের মত; কিন্তু গলার আওয়াজে যে প্রীতি এবং সহানুভূতি ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহা বোনার্জির প্রাণস্পর্শ করিল। ভট্টাচার্য্যের মাথা, তাঁহার উরুর উপর যেমন ছিল তেমনি রাখিয়া, হাতে ভর দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "দেখ ভট্‌চাজ্,—" ভট্টাচার্য্য বেশ জাঁকিয়া শুইয়া চক্ষু মুদিলেন।

বোনার্জি সাহেব ডাক্তার ভট্টাচার্য্যের মাথায় অঙ্গুলি চালন করিতে করিতে বলিলেন, "আমরা যে কষ্ট পাই, সে কেবল আপনার স্বার্থপরতায়।" বোনার্জি মনে করেন নাই, যে তিনি দ্বিতীয় বুদ্ধ অবতার হইয়া সেই কথা গুলি বলিতেছিলেন; ভট্টাচার্য্যও বুঝিতে পারিতেছিলেন, যে বোনার্জি সত্যরাজ্যের কলম্বস্ সাজেন নাই, তাঁহার মনে মনে যাহা বিশেষ কারণে জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাই বলিতেছিলেন। বোনার্জি কহিলেন, "আমরা নিজেদের মহিমায় নিজেরা মুগ্ধ থাকি, এবং মনে করি যে আমরা সকলের সম্মান এবং অনুগ্রহ পাইবার যোগ্য।" ভট্টাচার্য্য চক্ষু মুদিয়া ভাবিলেন, "প্রেমের পাত্র হ'বার যোগ্য" কথাটা উহ্য রহিয়া গেল। বোনার্জি যখন ঐ কথাটুকু কহিয়াই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া রহিলেন, ভট্টাচার্য্য তখন তাঁহাকে একটু চিম্‌টি কাটিয়া বলিলেন, "তার পর কিরে রাস্‌কেল্? আসল কথাটা কি?" বোনার্জি তখন ভট্টাচার্য্যের কোটের বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "হালের শাস্ত্রে বলে, যে সামাজিকতায় স্বার্থনাশ হয়; কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রে নিরবলম্ব তপস্যা কত্তে বলে। এস না, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মত তপস্যায় লেগে যাই!" ভট্টাচার্য্য বুঝিলেন, যে বোনার্জি সকল কথা খুলিয়া বলিতে প্রস্তুত নহেন; অনেক কথা যে নিজের মনে লুকাইয়া রাখিলেই তাহার পবিত্রতা রক্ষিত হয়, তাহাও মনে করিলেন। কাজেই কথাটা লইয়া পীড়াপীড়ি না করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন।

ভট্টাচার্য্য তখন কোটের বোতামগুলি লাগাইতে লাগাইতে ভাবিলেন, যে যদি তিনি এখন অন্য কোন কথা না কহিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে বোনার্জি ভাবিতে পারেন যে তিনি রাগ করিয়াছেন। বোনার্জি এখন একাকী নির্জনে থাকিলেই সুখী হইতে পারিবেন, তাহাও মনে হইল। একটা কিছু কথা পাড়িয়া যাওয়া উচিত মনে করিয়া বলিলেন, "তপস্যা না হয় করা যাবে এখন; সুশীল মৈত্রের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক বেধে যাবার মত হয়েছে। অভয় কাকার মেয়ের সঙ্গে তার বে হবার কথা হচ্চে; তিনি ছুটি পেলেই পাটনা থেকে এসে সব বন্দোবস্ত করে যাবেন।" অভয় বাবুর মেয়ের সংবাদ বোনার্জি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন; কিন্তু অভয় বাবু যে ভট্টাচার্য্যের কাকা, একথা জানা ছিল না। বোনার্জি একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা বেশ, বর পক্ষেও আছি, কন্যা পক্ষেও আছি; আহারটা পূর্ণ মাত্রায় হবে।" ভট্টাচার্য্য কার্পেট হইতে উঠিয়া বলিলেন, "তবে দেখ, তদ্দিনে তুমি তপস্যা কত্তে বেরিয়ে না পড়।" বোনার্জিও উঠিয়া বলিলেন, "সে এক কথা বটে।"

ভট্টাচার্য্য রোগী দেখিবার জন্য বাহির হইয়া গেলেন। বোনার্জি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একখানি আরাম-চেয়ারে শুইয়া পড়িয়া কাতর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "বুদ্ধদেব, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন পরের সুখে সুখী হইতে পারি; আমার মনের মত হইল না বলিয়া যেন প্রীতি নষ্ট না হয়। হে জগদীশ্বর, হে রুদ্র, তোমার প্রসন্নমুখ দেখাইয়া আমাকে শান্ত কর।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সৌহার্দ্দ।

একদিন সন্ধ্যার পরে বোনার্জি সাহেব একটি গান শুনিবেন বলিয়া ভূমিকা করিয়া, সুশীলচন্দ্রের গৃহে গিয়া বসিয়াছিলেন। নানা গল্পে, নানা প্রসঙ্গে গানের কথা চাপা পড়িয়া গেল; বোনার্জিও দ্বিতীয়বার অনুরোধ করেন নাই, সুশীলচন্দ্রও ভূমিকার কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বোনার্জি আজি কখনো বা সুশীলচন্দ্রকে 'তুমি' কখনো বা 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতে করিতে, একবার বলিয়া ফেলিলেন, "এতটা ঘনিষ্ঠতার পর এখন 'আপনি' সম্বোধনটা বড় মুখে বাধে; 'তুমি' বলেই পরস্পরে সম্ভাষণ চলুক না কেন?" বোনার্জির এই সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া সুশীলচন্দ্র তাঁহার পার্শ্বে একাসনে আসিয়া বসিয়া বলিলেন, "এটা বিশেষ দয়ার কথা।" সুশীলচন্দ্রের মুখ দিয়া কিন্তু 'তুমি' বাহির হইল না।

বোনার্জি সাহেব তখন সুশীলচন্দ্রের ডাইন হাতখানি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমাকে একটা কথা বলব; মনের কথা খুলে বোলো ভাই,—যে কটা দিন সংসারে আছি, সোজা পথেই চলে যাই।" প্রশ্ন শুনিয়া সুশীলচন্দ্র সাগ্রহে বোনার্জির প্রশান্ত মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ঠিক সেই সময়ে সুশীলচন্দ্রের দরোয়ান, উদরপূর্ত্তি শেষ করিয়া, সুর করিয়া সুরদাসের পদাবলী পড়িতেছিল। বোনার্জি শুনিলেন, সে গাহিতেছিল—"বৈরাগ যোগ কঠিন উধো, হম ন করব হো।" বোনার্জির বুক, দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি অতি-স্থির-অবিচলিত-স্বরে সুশীলচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাটনায় তোমার বিবাহের কথা হচ্চে, শুনচি; কিন্তু তুমি ত পাত্রী দেখ নাই। তুমি কি মায়ের অনুরোধে বিবাহ কত্তে যাচ্চ?" সুশীলচন্দ্রের মনে হইল, যেন তিনি একটা অগাধ সাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন; সহসা এই প্রশ্ন উঠিল কেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। দিশেহারা হইয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া সময় লইবার অবসর না পাইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "না; মা আমাকে কখনো অনুরোধ করেন নাই, কিছুই বলেন নাই; তিনি উদ্যোগ কচ্চেন; আমি হাঁ, না, কিছুই বলি নাই।" আরো যেন কিছু বলিলে ভাল হইত মনে করিলেন, কিন্তু কিছুই মনে করিতে পারিলেন না। বোনার্জি সুশীলচন্দ্রের হস্তখানি একটু বেশি জোরে চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; এবং সেই সময়ে সুরদাসের আর একটি পদ কর্ণে প্রবেশ করিল;—"কৃষ্ণ বিরহ লাগি বরুথ ডূবি মরব হো।" বোনার্জি এবার সুশীলচন্দ্রের হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া, আপনার বাঁ হাতখানি তাঁহার কাঁধের উপর রাখিয়া বলিলেন, "যাঁর সঙ্গে তোমার বিবাহের কথা হচ্চে, তিনি হয় ত রূপে গুণে খুবই ভাল; কিন্তু তোমার যদি অন্য কোথাও মন বসে থাকে, তাহা হইলে গা ভাসিয়ে দিয়ে এমন করে বিবাহ কত্তে যাওয়া ভাল হবে কি?"

সুশীলচন্দ্র চমকিয়া বোনার্জির মুখের দিকে চাহিলেন। অন্য কেহ হইলে কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিত না; কিন্তু বোনার্জি যেন তাঁহার নিজের মনের সন্দেহের কথাটা সুশীলচন্দ্রের মুখে সুস্পষ্ট অঙ্কিত দেখিতে পাইলেন। বোনার্জি মনে মনে উচ্চারণ করিলেন, "কৃষ্ণ বিরহ লাগি বরুখ ডূবি মরব তো।" সুশীলচন্দ্র কোন কথাই বলিলেন না; বোনার্জি তখন তাঁহাকে সোদরস্নেহে বুকের ভিতর টানিয়া ধরিয়া বলিলেন, "যা মনে এল, বলে ফেল্লাম্; কিছু মনে কোরোনা ভাই। সংসারের পথটা সোজা কত্তে গিয়ে আরো বোধ হয় বাঁকা করে তুলছি।" সুশীলচন্দ্র, বোনার্জির বুকের উপর মাথা রাখিয়াই বলিলেন, "কাল সকাল বেলা আপনার বাড়ীতে গিয়ে চা খাব।"

অল্পক্ষণ পরেই বোনার্জি বিদায় হইলেন; এবং সুশীলচন্দ্র অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিয়া, ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন:—"স্পন্দনং চপলং চিত্তং দুরক্ষ্যং দুর্নিবারয়ং, উজ্জং করোতি মেধাবী উস্কারোব তেজনং"।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অসম্ভব কথা।

রায়-জায়া, আবার একটু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। অসুস্থতা তেমন অধিক নহে; কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য চলিতে ফিরিতে নিষেধ করিয়াছেন। সুশীলচন্দ্রের মাতা, রায়-জায়াকে যখন দেখিতে আসিয়াছিলেন, তখন সুশীলের পা মচকিবার কথা, আরোগ্যলাভের সংবাদ এবং যেরূপে তিনি তাহার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন, ইত্যাদি সকল কথাই বলিয়াছিলেন। বিদায়গ্রহণের সময়ে বলিয়া গিয়াছিলেন, যে সুশীলকে একবার পাঠাইয়া দিবেন। জননীর ধাত্রী সুশীলার তখন সহসা মনে পড়িল, যে তাঁহার চুলগুলি অসংযতভাবে লুটাইতেছে; তিনি একটু মুখ ফিরাইয়া চুল গুছাইয়া বাঁধিলেন।

তাহার পরদিন সুশীলচন্দ্র যখন রায়-গৃহে আসিলেন, তখন মেরী বাউরী তাঁহাকে কর্ত্রীর আদেশে তাঁহার শয়ন-কক্ষে লইয়া গেলেন। রায়-জায়ার শয্যা অতি পরিচ্ছন্ন ছিল, তবুও সুশীলাদেবী, সুশীলচন্দ্রের কক্ষপ্রবেশের সময়ে একখানি তোয়ালে দিয়া ধীরে ধীরে বিছানা মুছিতে লাগিলেন। রায়-জায়া যখন "এস বাছা এস" বলিয়া সুশীলচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিলেন, সুশীলচন্দ্র তখন খাটের পার্শ্বে মাথা নত করিয়া রায়-জায়াকে প্রণাম করিয়া নিকটস্থ একখানি চেয়ারে বসিতে বসিতে সুশীলাদেবীকে নমস্কার করিলেন। সুশীলাদেবী প্রতিনমস্কার করিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া, রায়-জায়া কন্যাকে বসিতে বলিলেন।

সুশীলকে দেখিয়া রায়-জায়ার মনে সেই ছবির কথা, এবং "সুন্দর, চিরসুন্দর," গানটি উদয় হইল। দু'চারটি অন্য কথার পর, তিনি সুশীলচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব; ভগবান্‌কে ডাক্‌তে হলে কেমন করে প্রার্থনা কর্ত্তে হয়, তাই জান্‌তে ইচ্ছা করে।" সুশীলচন্দ্রের মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি পণ্ডিত সাজিয়া, উপদেষ্টা সাজিয়া কেমন করিয়া গুরুজনের সঙ্গে কথা কহিবেন? বিশেষ তাঁহার মনে হইল, যে ধর্ম্মকথা কহিবার তাঁহার অধিকার কোথায়? তিনি প্রার্থনার কথা, ভগবানের কথা, কি জানেন? রায়-জায়া সুশীলচন্দ্রকে নীরব দেখিয়া পুনরপি কহিলেন, "তুমি আমার পেটের ছেলের মত; সুশীলা আমাকে কত বই পড়ে শোনায়; আমি ভগবানকে খুঁজছি।" সেই স্নেহ, সেই কণ্ঠস্বর! যে ধর্ম্মপথে চলে না, সেও যখন ভগবানের আহ্বান শুনিতে পায়, তখন মুগ্ধ এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া ধর্ম্মকথা কহিতে আরম্ভ করে। গুরুজনের স্নেহ সম্ভাষণ, ভগবানের ডাকের মত সুশীলচন্দ্রকে মুগ্ধ এবং বাচাল করিয়া তুলিল।

সুশীলচন্দ্র, খাটের উপর হাত রাখিয়া কহিতে লাগিলেন, "মা, আমাদের সারা জীবনটাই প্রার্থনা ভরা; আমরা কিছু হতে চাই, কিছু কর্ত্তে চাই, কিছু পেতে চাই, আশা করি, পথ চলি, এ সকলি প্রার্থনা। যারা ভগবানকে মানে না, তারা অদৃষ্টের কাছে প্রার্থনা করে, দৈবসুবিধার কাছে প্রার্থনা করে, এবং "যা থাকে কপালে হবে" বলে দৈবের প্রতীক্ষা কোরে উন্মুখ হয়ে বসে থাকে। আমরা যা চাই, তাই যে পাব, এমন কোন কথা নাই; কখনো পাই কখনো পাইনে এবং কি যে ঠিক পাব তা জানিনে। মনে ত প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রার্থনা উঠছে; কিন্তু সেই প্রার্থনার সময়, যারা ভগবানকে মানেন, তাঁরা অদৃষ্টের মুখ চেয়ে প্রার্থনা না

করে ভগবানের মুখের দিকে চান। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সুখ আছে বলেই লোকে তাঁর মুখের দিকে তাকায়। বিধির বিধান, যা হবার তাই হয়; কিন্তু দুরন্ত প্রার্থনার সময় ভগবানের দিকে চেয়ে প্রার্থনা কল্লে মন প্রশান্ত হয়, মা।” পার্শ্ববর্ত্তিনী সুশীলার কর্ণে সুমধুর সপ্তস্বরা বাজিতেছিল; তিনি তাঁহার জীবনের সমগ্র প্রার্থনা জমাট করিয়া লইয়া চিরসুন্দরের চরণের দিকে উন্মুখ করাইলেন। রায়-জায়ার মনে হইল, তিনি যাঁহাকে খুঁজিতেছিলেন, তিনি যেন আসিতেছেন। রায়-জায়া ধীরে ধীরে তাঁহার হস্তখানি প্রসারণ করিলেন এবং স্নেহের ইঙ্গিত পাইয়া সুশীলচন্দ্র তাঁহার করতলে হস্ত স্থাপন করিলেন। রুগ্না রায়-জায়া চক্ষু মুদিয়া, যিনি দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়, তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন।

ধ্যানমগ্না জননীর পার্শ্বে প্রার্থনাময়ী সুশীলা। সুশীলচন্দ্র যখন প্রার্থনাময়ীর মুখের দিকে তাকাইলেন, তখন আর চক্ষু ফিরাইয়া লইতে পারিলেন না। আমি পাঠকদিগকে এখন এই অসম্ভব কথা কেমন করিয়া বুঝাইব? সুশীলচন্দ্র দেখিলেন যেন, সুশীলা দেবীর সমগ্র প্রাণ প্রার্থনার বলে চক্ষুর পথ দিয়া বাহির হইয়া তাঁহার কাছে আসিতে চাহিতেছে। অনেকেই বলিতে পারেন, যে সুশীলচন্দ্রের এই অনুভূতি, ঈশ্বরদর্শনের কথার মত একটা ভিত্তিশূন্য কল্পনা। হইতে পারে, এ সকল বড় অসম্ভব কথা; কিন্তু যাহা যেমন ঘটিয়াছিল আমি তাহাই লিখিতেছি; যাহার মনে যে ভাব যেমন করিয়া উঠিয়াছিল, তাহাই বর্ণনা করিতেছি। অসম্ভবের উপর অসম্ভব কথা; সুশীলা দেবী দেখিলেন, সুশীলচন্দ্রের প্রাণটা তাঁহার প্রাণটিকে আদর করিয়া তুলিয়া লইয়া আপনার সঙ্গে জড়াইয়া ফেলিল। নীরবে নিঃশব্দে এমন করিয়া প্রাণ বিনিময় হইতে পারে কি না, মনস্তত্ত্ব-বিদেরা তাহার বিচার করিবেন।

রায়-জায়া চিকিৎসকের উপদেশে শয্যাগতা, সুশীলা দেবীকে সদাসর্ব্বদা মাতার পার্শ্বে থাকিতে হয়, কাজেই মাষ্টার নরেন্‌কে নিরন্তর বাড়ীতে রাখা চলে না। গৃহে থাকিলে সে কদাপি মাতার কক্ষ ছাড়ে না বলিয়া তাহার স্বাস্থ্যের জন্য রায় সাহেব তাহাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। যখন রায় সাহেব পুত্রটিকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন, তখনো সুশীল-চন্দ্র রায়-জায়ার কক্ষে। মাষ্টার নরেন গৃহে আসিয়াই একেবারে মাতার শয়নগৃহে উপস্থিত। বালক মনস্তত্ত্ববিদ্ যখন সুশীলচন্দ্রকে নিতান্ত আপনার লোকের মত মাতার শয্যাপার্শ্বে দেখিল, তখন সে নিঃসঙ্কোচে সুশীলচন্দ্রের হাঁটুর উপর ভর দিয়া পড়িয়া বলিল, “এত দিন আসেন্‌নি কেন?” সুশীলচন্দ্র তাহাকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া বলিলেন, তিনি আবার আসিবেন। উত্তরটা বালকের মনের মত হইল না; সে বলিল, “কাল্ আস্‌তে হবে, পরশু আস্‌তে হবে, রোজ আস্‌তে হবে।” যে অনুরোধ বালকের কণ্ঠে নিঃসৃত হইতেছিল, সেই অনুরোধ সুশীলা দেবীর চক্ষে, এবং সেই অনুরোধ রায়-জায়ার রুগ্ন মুখের হাসিতে। সুশীলচন্দ্র প্রাণ ভরিয়া বলিলেন—“আচ্ছা, কাল আস্‌ব।”

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

তপস্যার ফল, বা বিদায়।

মেরী বাউরী হয় ত তামাকুর অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিল; কারণ দারোয়ানটি একখানি চিঠি লইয়া সোমেশ্বর পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়াছিল, এবং কোচোয়ান, রায় সাহেব এবং মাষ্টার নরেন্‌কে হাওয়া খাওয়াইতে বাহির হইয়াছিল। গৃহের অন্য ভৃত্যেরা হয় ত প্রভুর অনুপস্থিতিতে রন্ধনগৃহে সভাসমিতি করিতেছিল। সুশীলচন্দ্র যখন রায়গৃহে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, তখন কাহাকে দিয়া সংবাদ পাঠাইবেন বুঝিতে না পারিয়া ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অনেক সময় কাটিয়া গেল; কেহই দেখা দিল না; সুশীলচন্দ্র ভাবিলেন, এবারে গৃহে আলো দিতে কেহ-না-কেহ আসিবে। সুশীলচন্দ্রের মাথার উপর দিয়া যুগযুগান্তর কাটিয়া যাইতেছিল; এমন সময়ে সেই আলোক-শূন্য গৃহে দীপ্তিময়ী সুশীলা দেবী আসিলেন; তিনি ভৃত্যদিগের তত্ত্বাবধানে বাহির হইয়াছিলেন।

সুশীলা দেবী যখন একেবারে সুশীলচন্দ্রের চেয়ারের কাছে আসিয়া পড়িলেন, তখন সুশীলচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুশীলা দেবী একটু বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, “আপনি একা একা এখানে বসে আছেন, কতক্ষণ এলেন? কেউ ত খবর দেয় নি?” সুশীলচন্দ্র অতি পরিমিত ভাষায় সত্য কথাই বলিলেন, যে তিনি অনেকক্ষণ আসিয়া বসিয়া আছেন। সেই পরিমিত কথায়ও জড়তা ছিল; সেই কথার সুরে সুশীলা দেবীর মনেও একটু গোল বাধিয়া গেল; তিনিও

একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিলেন, "কাকেও ডাক্‌লেন না কেন? দেখা কত্তে এসে এমন করে তপস্যা করা—"। কথাগুলি মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইতেছিল। সুশীলচন্দ্রের ভদ্রতাবিস্মৃতি ঘটিল; আপনি ছাড়িয়া তুমি বাহির হইল। তিনি বলিলেন, "তপস্যাই কচ্চি সুশীলা, তোমাকে না দেখে ছট্‌ফট্‌ কচ্চি: তোমাকে একেবারে প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছি।" কি সাহসে যে তিনি এত দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন, এত কথা কহিয়া ফেলিতে পারিলেন, ইহাই আশ্চর্য্য। ইহাও আশ্চর্য্য, যে যখন সুশীলচন্দ্র কথা কহিতেছিলেন, তখন সুশীলা দেবী মন্ত্রমুগ্ধার মত আত্মবিস্মৃতা হইয়া সুশীলচন্দ্রের শরীরে জড়াইয়া গেলেন। "তুমি আমার তপস্যার ফল" বলিয়া সুশীলচন্দ্র যখন বক্ষলগ্না দেবীর নিঃশ্বাসের সৌরভে পুলকিত হইতেছিলেন, তখন সুশীলা দেবী স্বীয় কম্পিত অধরে সুশীলচন্দ্রের কপোল স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "চল, মার কাছে যাই।"

সুশীলচন্দ্রকে জননীর কক্ষে বসাইয়া, সুশীলা দেবী বসিবার ঘরে আলো দিবার উদ্যোগে গেলেন। রায়-জায়া বালিশ ঠেশান দিয়া বসিয়াছিলেন, এবং সম্মুখে একখানি সংগীতগ্রন্থ পড়িয়াছিল; হয় ত পড়িতেছিলেন। আজি সুশীলচন্দ্র চেয়ারে বসিয়া খাটের উপর এমনি ভাবে মাথাটি নত করিলেন, যে তাঁহার মাথাটি প্রায় রায়-জায়ার ক্রোড় সংলগ্ন হইল। এ ত প্রণাম নহে! রায়-জায়া উঠিয়া বসিয়া সুশীলচন্দ্রের মাথায় হাত দিলেন। সুশীলচন্দ্র তেমনি মাথা নত করিয়াই বলিলেন, "মা, আমি ছেলে হব।" এই একটি কথায় রায়-জায়া অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত পড়িয়া ফেলিলেন। আনন্দে কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল; কোন কথা কহিতে পারিলেন না, কেবল সস্নেহে সুশীলচন্দ্রের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে রায় মহাশয় নরেন্‌কে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। যখন রায় মহাশয় সপুত্রকন্যা, পত্নীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন রায়-জায়া দেখিলেন, সুশীলার চক্ষে নবদীপ্তি ফুটিয়াছে এবং অধরে নব প্রফুল্লতা বিকশিত হইয়াছে। রায়-জায়ার আনন্দ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি রায় মহাশয়কে বলিলেন, "ছেলে মেয়েদের আশীর্ব্বাদ কর, সুশীল আমার ছেলে হবে বলচে।" বলা বাহুল্য, যে সুশীলচন্দ্র তাহার পূর্ব্বেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; মাষ্টার নরেন তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আপনি এসেছেন?" রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুশীল, তোমার পায়ের ব্যথা এখন আর নেইত?" পায়ের ব্যথা? রুগ্নার রোগ পর্য্যন্ত সারিয়া গিয়াছিল। রায়-জায়া চিকিৎসকের কথা অগ্রাহ্য করিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া সকলকে লইয়া বসিবার ঘরে গেলেন।

যে সময়ে রায়-পরিবারে আনন্দের স্রোত বহিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে বোম্বাই মেলে বোনার্জি সাহেব বড়োদা যাত্রা করিতেছিলেন। তিনি কবে যে সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া বড়োদায় চাকুরী স্বীকার করিয়াছিলেন, কেহই তাহা জানিত না। ডাক্তার ভট্টাচার্য্য প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া রুমাল নাড়িতেছিলেন, এবং বোনার্জি মন্দগতিতে চালিত গাড়ীর জানালা দিয়া হাত বাহির করিয়া তাঁহার রুমালখানি ধরিয়াছিলেন, এবং মনে মনে আবৃত্তি করিতেছিলেন:—

কৈসে তেজব ঐ সো দেশ,
জটা মুকুট ধরব কেশ
অঙ্গ বিভূতি লায় জহর খায় মরব হো।

গাড়ী যখন বর্দ্ধমানে পঁহুছিল, তখন তাঁহার চেতনা হইল; রুমালখানি পকেটে পুরিয়া, পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন না করিয়াই শুইয়া পড়িলেন।

সমাপ্ত

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

The Coronation of Sita & Rama.

This picture has been bought recently by the Committee of the Calcutta Art Gallery.

No idea of its beauty can be given to those who cannot see its colour for themselves. Though small, it is a master-piece, chiefly in different shades of yellow. Its date is supposed to be about 1700. The Artist is unknown. In style, it belongs to what it is convenient to call the School of Lucknow, representing a later development of the kind of missal-painting which was practised under the Moguls, and the whole history of which is to be studied in the magnificent library presented by a noble Mohammedan Family to the City of Bankipur.

In conception, 'The Coronation of Sita and Rama' is mediæval. It compares, in European Art, with

pictures of the Court of Heaven. But I cannot remember ever to have seen that idea expressed there with such masterly simplicity and thoroughness. We have here, it will be noticed, a King's Garden and throne, with a palace behind. It is the royal and divine household of Heaven. The Divine Pair sit to receive worship. Around them stand the other persons of the sacred drama, together with their retinue. In the background are seen the white walls of Ayodhya. And a magnifying glass makes only more evident the marvellous perfection of detail here. We may note also, in this old Indian picture, the perfect correctness of the perspective. There is no doubt in the artist's mind that the vertical is always vertical, and that parallel lines converge as they recede.

But Ayodhya here is a palace, not a city. The home of the soul, the white-walled vision is a royal and divine abode, not the country of a great multitude. In this, the idea of the artist is exactly the same as that which the church was always imposing on the mind of Europe. Yet in an Italian picture, of a corresponding thought and period, we should probably have had, as background to the sacred group, some fragment of a great city.

The Indian picture expresses unity. The Italian would have been full of broken suggestions. This is because the one speaks out of a full and coherent social order, present to the consciousness of all its children. The other would have been the utterance of something immeasurably more complex, but also less aesthetically perfect.

The pearls in this picture are real, being set into the painting. The frame is of mirror. The artist is unknown.

Nivedita of Rk-V.

সীতা ও রামের রাজ্যাভিষেক।

(ভগিনী নিবেদিতার কয়েকটী মন্তব্যের মর্ম্ম)

কলিকাতা চিত্রশালার কমিটি সম্প্রতি এই ছবিখানি কিনিয়াছেন। যাঁহারা স্বচক্ষে এই ছবি খানির রং না দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মনে ইহার সৌন্দর্য্যের কোন ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া যায় না। ছোট হইলেও ইহা একটি শ্রেষ্ঠ চিত্র, বিশেষতঃ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হলদে রং ফলাইবার নৈপুণ্যে। ইহা বোধ হয় ১৭০০ খৃষ্টাব্দের। চিত্রকরের নাম অজ্ঞাত। চিত্রাঙ্কণ রীতিতে ইহাকে লক্ষ্ণৌ শিল্পিসম্প্রদায়ের রীতির অনুযায়ী বলা যায়।

ইউরোপে মধ্যযুগে স্বর্গের দরবারের যে সকল ছবি আঁকা হইত, ইহা সেই ধরণের। ছবিতে একটি রাজোদ্যান ও সিংহাসন এবং পশ্চাতে একটি রাজপ্রাসাদ লক্ষিত হইবে। এখানে যাঁহারা উপবিষ্ট তাঁহারা পূজা গ্রহণার্থ বসিয়াছেন। পশ্চাতে অযোধ্যার শ্বেত প্রাচীর সকল দৃষ্ট হইতেছে। বিবর্দ্ধক কাচ দিয়া দেখিলে এখানে সূক্ষ্ম কারিগরির বিস্ময়কর উৎকর্ষ বেশ বুঝা যায়। এই পুরাতন ভারতীয় চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতবিষয়ক নির্ভুলতাও উল্লেখযোগ্য।

ছবিখানির মুক্তাগুলি প্রকৃত মুক্তা, অঙ্কিত নয়। (লেখিকার অনেকগুলি প্রগাঢ় ভাব ও চিন্তাপূর্ণ মন্তব্যের যথাযথ অনুবাদ করা কঠিন বলিয়া চেষ্টা করা গেল না।)

জ্যোতির্নির্ব্বাণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(বিপদের মুখে)

কি করিয়া কি হইল, বিক্রমপুরের যুবরাজ কেদার রায় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, কি এক অজানিত দৈবশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, তিনি নিজের শক্তি সামর্থ্য না বুঝিয়া এক ভীষণ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন। মনে ভাবিলেন, এ ভৈরবী বেশধারিণী, শক্তি উত্তেজনার আদর্শ গঠিত মূর্ত্তি কে এ রমণী? একবার মনে হইল মন্দিরে ফিরিয়া যান। কিন্তু তাহাও পারিলেন না। ভয়ে নহে, বিস্ময়ে নহে, যে পথ দিয়া তিনি মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন—সে পথ আজ চিনিতে পারিতেছেন না।

যে বৃক্ষ শাখায় তিনি অশ্ব বাঁধিয়াছিলেন, সেখানে সদ্যোচ্ছিন্ন বন্যলতা গুল্মাদির দ্বারা এক চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিলেন। কেদার রায় সবিস্ময়ে দেখিলেন সে চিহ্ন বর্ত্তমান, কিন্তু তাঁহার অশ্ব সেখানে নাই।

এ গভীর বন মধ্যে কে তাঁহার অশ্ব অপহরণ করিল তাহা তিনি ঠিক্ বুঝিতে পারিলেন না। অনুমানে বুঝিলেন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ। নৈশান্ধকারের ভীষণতা অনেকটা



সীতা ও রামের অভিষেক।

বিদূরিত। শীতল বাতাস, বন্য কুসুমের সৌরভ অপহরণ করিয়া তাঁহার স্বেদসিক্ত ললাটফলকের স্নিগ্ধতা সম্পাদন করিতেছিল।

অশ্বের জন্য তিনি চারিদিক অন্বেষণ করিলেন। কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অন্ধকারে পদচিহ্ন দেখিয়া অনুসরণ করাও অসম্ভব। স্থিরভাবে সেই গভীর বন মধ্যে দাঁড়াইয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন—"আমার অশ্ব কোথায় গেল।"

সহসা অদূরে যেন পদশব্দ শ্রুত হইল। এ পদশব্দ ধীর-বিক্ষিপ্ত, মনুষ্যের পদশব্দ। এই মনুষ্যসমাগমশূন্য বনমার্গে রজনীর তৃতীয় যামার্দ্ধে পদশব্দ শুনিয়া বীর পুরুষ কেদার রায় কিছু বিস্মিত হইলেন। হস্তস্থিত বর্ষা দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"এ বনমধ্যে কে আছ, আমার সম্মুখে এস ; নচেৎ আমার হস্তস্থিত বর্ষা তোমার বক্ষ বিদ্ধ করিবে।"

সহসা একজন ঢালতলোয়ারধারী সৈনিক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"যুবরাজের জয় হউক।"

কণ্ঠস্বরে কেদার রায় সেই সৈনিক পুরুষকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—"কালিদাস, তুমি এ গভীর বনমধ্যে কেমন করিয়া আসিলে ?"

কালিদাস বলিল—"আমাদের আপনি নদীতীরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। রজনী এক প্রহর উত্তীর্ণ হওয়ায় আমরা আপনার বিপদাশঙ্কায় অধৈর্য্য হইয়া এই জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছি।"

"তুমিই কি আমার অশ্ব লইয়া গিয়াছ ?"

"আপনার অশ্ব কালুসেখ লইয়া গিয়াছে।"

"সে কোথায় ?"

"নিকটেই অপেক্ষা করিতেছে। সে আপনাকে খুঁজিতে খুঁজিতে এক মন্দিরের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। মুসলমান বলিয়া সে মন্দির মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করে নাই। তার পর আসিবার সময় বৃক্ষতলে আপনার অশ্ব দেখিতে পাইয়া তাহা লইয়া আসিয়াছে।"

কেদার রায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আমি সেই মন্দিরেই গিয়াছিলাম।"

কালিদাস বলিল—"মন্দিরে কেন—সেখানে কে আছে ? কার মন্দির !"

কেদার রায় গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"সেখানে দেবীর পাষাণ মূর্ত্তি আছে—সজীব মূর্ত্তি আছে। সজীব মূর্ত্তিই এই পাষাণ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।"

"আপনাকে মন্দিরের পথ দেখাইল কে ?"

"সেই সজীব দেবীমূর্ত্তি !"

"পাপী মানব আমরা—কলিতে দেবতা নিদ্রিত—আমাদের তাঁহারা দর্শন দেন না !"

"তাঁহাকে দেখ নাই—তাই বলিতেছ—আমি সেই সজীব মূর্ত্তি দেখিয়াছি—যাহা এতদিন ধরিয়া খুঁজিতেছিলাম তাহাই পাইয়াছি।"

"কি পাইয়াছেন যুবরাজ ?"

"উৎসাহ, উত্তেজনা, কর্ত্তব্যপথ, আর পর্ত্তুগীজ দস্যুর উচ্ছেদবাসনার শক্তি।"

কেদার রায় সাগ্রহে, জ্বলন্ত ভাষায় ভবানীমন্দিরে, ভৈরবীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যাপার সমস্ত বিবৃত করিলেন। কালিদাস স্থির মনোযোগের সহিত সমস্ত শুনিয়া বলিল—"আমরা কি সেই দেবীমূর্ত্তির দর্শন পাই না ?"

কেদার রায় দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"পাইবে না যে তাহা বলিতেছি না। তবে সময়সাপেক্ষ। আমি চেষ্টা করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করি নাই—তিনি আপনিই দেখা দিয়াছেন।"

আর বাক্যব্যয় না করিয়া কেদার রায় বলিলেন—"যেখানে আমার সেনারা আছে সেই খানে চল। প্রভাত না হইলে এই বনভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া বড় দুরূহ দেখিতেছি।"

কালিদাস অগ্রসর হইল। রাজা পশ্চাতে। তাঁহারা প্রায় অৰ্দ্ধক্রোশ পথ অতি কষ্টে অতিবাহিত করিয়া এক বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়াছেন—এমন সময়ে কাতর কণ্ঠে সেই নৈশনিস্তব্ধতাপূর্ণ বনভূমিকে বিকম্পিত করিয়া কে যেন চীৎকার করিয়া উঠিল—"কে কোথায় আছ—আমায় রক্ষা কর—স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম রক্ষা কর।"

একবার, দুইবার, তিনবার সেই, কাতর কণ্ঠের করুণ ধ্বনি বনভূমি বিকম্পিত করিল। কেদার রায় অসি কোষ-বিমুক্ত করিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া কালিদাসকে বলিলেন—"এই মাত্র সেই সজীব দেবীমূর্ত্তি আমায় যে পবিত্র ব্রত গ্রহণ করাইয়াছেন—তাহার এক ক্ষুদ্র কার্য্য আমার সম্মুখে।

কালিদাস! তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত—তোমার তীরের লক্ষ্য অব্যর্থ; আমার সঙ্গে এসো।”

উভয়ে বিদ্যুদ্বেগে অগ্রসর হইলেন। বনানীপথ-সঞ্জাত কন্টকাকীর্ণ লতাগুল্ম তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। আবার সেই কাতর কণ্ঠে চীৎকার ধ্বনি! “কেউ কি নাই—যে অবলার সতীত্ব রক্ষা করে? হায় ঈশ্বর!”

কেদার রায় গম্ভীর কণ্ঠে সেই ধ্বনির উত্তর করিলেন—“ভয় নাই—ভগবান নাই একথা বলিও না।”

তখন অদূরে মশালের ক্ষীণ আলোকরেখা দেখা যাইতেছে। শষ্পপত্রাচ্ছাদিত বন অতি গভীর বলিয়া সে আলোক পূর্ণ তেজে জ্বলিয়াও নিজের দীপ্তি বিকাশ করিতে পারিতেছিল না।

কেদার রায় ও কালিদাস বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে দেখিলেন এক ভীমকায় দস্যু কোন কুলকন্যাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে। রমণীর হস্তদ্বয় আবদ্ধ। চক্ষুর্দ্বয়ও তদ্রূপ।

সহসা কালিদাসের হাত হইতে একটা তীর ছুটিয়া গিয়া সেই ভীমকায় দস্যুর মস্তক বিদ্ধ করিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা তীর আসিয়া দ্বিতীয় দস্যুর স্কন্ধ বিদ্ধ করিল। সে চীৎকার করিতে করিতে দূরে পলায়ন করিল। এ দ্বিতীয় তীর, কালু সেখের হস্তনিক্ষিপ্ত।

কেদার রায় দ্রুত গতিতে গিয়া, সেই রমণীর চক্ষুর ও হস্তের বন্ধন মোচন করিলেন। রমণী তখনও শর পত্রের ন্যায় থর থর কাঁপিতেছিলেন। কালুসেখ ও কালিদাস অগ্রসর হইয়া অপর দুইজন দস্যুকে আবদ্ধ করিল।

কেদার রায় স্নেহময় স্বরে বলিলেন—“কে আপনি! পরিচ্ছদে ত পশ্চিমপ্রদেশীয়া মুসলমানী বলিয়া বোধ হইতেছে। এ গভীর বনে আসিলেন কি রূপে?”

রমণী সেই বীরত্বব্যঞ্জক মুখমণ্ডল দেখিয়া সাহস পাইলেন। মাথায় অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

কেদার রায় পুনরায় সান্ত্বনা ও উৎসাহদানের স্বরে বলিলেন—“এ বিপদের সময় লজ্জা করিলে চলিবে না। আমার বোধ হয় নিকটেই এই দস্যুদলের আশ্রয়স্থান। আমার সঙ্গে মাত্র চারিজন শরীর-রক্ষী। দস্যুরা ফিরিয়া আসিলে আপনাকে লইয়া আমাদের বড়ই বিপদে পড়িতে হইবে। আপনার পরিচয় দানে আপত্তি আছে?”

সম্মুখে নূতন বিপদসম্ভাবনা দেখিয়া রমণী লজ্জা ত্যাগ করিয়া বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন—“আমার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। দয়া করিয়া আমায় এ বনের বাহির করিয়া দিন।”

কেদার রায় হাস্যমুখে বলিলেন—“এ বনভূমি আমার পরিচিত নহে। আমিও সসৈন্যে সারারাত্রি এই বনে বনে ঘুরিতেছি। প্রভাত না হইলে বন হইতে বাহির হইবার অন্য উপায় নাই।”

আবার কোকিলপঞ্চমপূরিত স্বরে প্রশ্ন হইল—“আপনি কে? এ অধীনীর ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।”

কেদার রায় হাস্যমুখে বলিলেন—“এ দীনের নাম কেদার রায়।”

রমণী সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন—“আপনিই কি বিক্রমপুরের রাজা চাঁদ রায়ের পুত্র কেদার রায়?”

“আপনি আমার নাম জানিলেন কিরূপে?”

“দিল্লীতে বাদশাহের মুখে শুনিয়াছি।”

“বাদশাহের মুখে? আপনি তবে কি দিল্লীশ্বরের অন্তঃপুরিকা।”

“আপনার অনুমান যথার্থ। আমি দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের বাঁদি।”

“কোথায় দিল্লী আর কোথায় বাঙ্গলা? আপনি এ বনের মধ্যে এ অবস্থায় কেন?”

“আমি বাদশাহের বেগম হইলেও এই বঙ্গদেশনিবাসিনী। বহু দিন পরে পিতামাতাকে দেখিতে যাইতেছিলাম। বাদশাহ সঙ্গে সওয়ার দিয়াছিলেন”।

“আপনার সওয়ার শিবিকা বাহক সব কোথায়?”

“দস্যুরা আমার বাহকদের বধ করিয়াছে। সমস্ত সওয়ার আমার সঙ্গে আসে নাই। ষোল জনের মধ্যে আট জনকে আমি রাজমহলে রাখিয়া আসিয়াছি। আট জন রক্ষী সঙ্গে ছিল।”

“আপনার পিত্রালয় কোথায়?”

“চট্টগ্রাম খিজিরপুরে।”

“এ পথে আসিলেন কেন?”

"দস্যুর ছলনায়। পথে একজন পথপ্রদর্শক পাই। সে আমাদের পথ দেখাইবার ভার লয়। কিন্তু সে যে ছদ্মবেশী দস্যু তা আমরা জানিতাম না। সেই পথ ভুলাইয়া এই গভীর বনে আনিয়াছে।"

"আপনি ত নিরাভরণা; অলঙ্কার কোথায় গেল?"

"দস্যুরা যখন শিবিকা আক্রমণ করে, তখনই আমি অলঙ্কারের পেটিকা জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়া দিই। দস্যুরা আমায় অলঙ্কারের জন্যই পীড়ন করিতেছিল।"

কেদার রায় এই আশ্রয়হীন গভীর বন মধ্যে রমণীকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। রমণী পথশ্রমে অত্যাচারে উৎপীড়নে কাতর। আশ্রয়স্থানের বড় প্রয়োজন। তিনি ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন—"হায়! যদি একটু আশ্রয়স্থান থাকিত?"

সহসা কে যেন তাঁহার পশ্চাৎ হইতে প্রতিধ্বনি করিল—"কেন থাকিবে না বাবা? ভবানীর মন্দির ত আর্ত্তপীড়িত নিরাশ্রয়ের জন্য।"

কেদার রায় চমকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিলেন। দেখিলেন—সেই গৈরিকপরিহিতা, আগুলফলম্বিতকেশা, দীপ্ততেজা ভৈরবী তাঁহার নিকটে। তিনি বিস্ময়াপ্লুত স্বরে বলিলেন "মা! এখানে আসিলে কিরূপে?" ভৈরবী হাসিয়া বলিলেন—"বৎস! তোমার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম কিরূপে? বিলম্ব করিও না। এই বিপন্না রমণী তোমার বাহুবলে বিপন্মুক্তা হইলেও পথশ্রান্তা। এঁর বিশ্রাম চাই।"

"ইনি ত মুসলমানী। ভবানী-মন্দিরে কি এঁর স্থান হইবে?"

দীপ্ত তেজে দৃঢ়স্বরে ভৈরবী বলিলেন—"কেন হইবে না বাবা? হিন্দু মুসলমান ত সেই ভবানীরই সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্ত্তা ত এক। আমরা কেবল গণ্ডগোল করিয়া মরি বই ত নয়। এস আমার সঙ্গে এস।"

ভৈরবী অগ্রবর্ত্তিনী, আর সকলে পশ্চাতে। কালিদাস অস্ফুটস্বরে বলিল—

"রাজা, ইনি কে?"

কেদার রায় বলিলেন—"ইনিই সজীব ভবানীমূর্ত্তি। তুমি পুণ্যবান তাই আজ দেখিতে পাইলে।" (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

প্রেমলাভের উপযুক্ততা।

১

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ভীমা ও নীরা নদীর সঙ্গমক্ষেত্রে মহেন্দ্রবিদার নগরে রাজা দ্রৌণায়ণ রাজত্ব করিতেন। দ্রৌণায়ণ রাজ্যকামুকতার জন্য সামন্ত রাজন্যবর্গের ভীতি ও অশ্রদ্ধার কারণ হইয়াছিলেন।

গজেন্দ্রগড়ের রাজা মল্লশূরই কেবল তাঁহাকে প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অকালে মল্লশূরের মৃত্যু হইলে, তাঁহার বালকপুত্র পুষ্পহাসের নামে রাজমন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

দ্রৌণায়ণ আপনাকে অপহৃত-কণ্টক মনে করিয়া পরম উল্লসিত হইলেন; এবং গজেন্দ্রগড় রাজপরিবারের অশৌচান্ত না হইতেই মহারাজ মল্লশূরের এ যাবৎ বাহুবলরক্ষিত রাজ্য আক্রমণ করিলেন।

ঝল্লকণ্ঠ প্রভুরাজ্য রক্ষার জন্য সসৈন্যে দ্রৌণায়ণকে বাধা প্রদান করিলেন। এই যুদ্ধে দ্রৌণায়ণের প্রধান সহায় এবং সহচর ছিলেন তাঁহার পুত্র ভদ্রমুখ এবং কন্যা ভদ্রসোমা।

ঝল্লকণ্ঠ যখন সমরাঙ্গনে নিশিত বাণ ত্যাগ করিতেছিলেন, তখন পুষ্পধন্বা তির্য্যককৃত ধনুঃ ভদ্রসোমার কুঞ্চিত ভ্রূতল হইতে দুই চারিটি খরকটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং ঝল্লকণ্ঠের হৃদয়ে বিশেষভাবে আঘাত করিয়াছিলেন।

দৈনিক সমরাবসানে যখন ঝল্লকণ্ঠ আপন শিবিরে সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে "তদ্বিষ্ণুর পরমপদ"—স্থলে ভদ্রসোমার ব্রীড়াবীর্য্যব্যঞ্জিত ফুল্ল মুখকমল বারংবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি কাতর হইয়া ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিলেন—

"হে মা ভবানী, একি হইল মা? চিরশত্রুতাসম্বন্ধিতজনের সহিত এ প্রীতিসম্বন্ধস্থাপনলালসা মনে কেন উদয় হইল? যাহাকে দিগ্ধশরবিদ্ধ করিতে হইবে, তাহার চরণনিম্নে আপনার হৃদয় পাতিয়া দিতে সাধ হইতেছে কেন? যাহার হৃদয়রক্তে কর্ত্তব্যের তর্পণ করিতে হইবে, তাহারই চরণতল আমারই হৃদয়রক্তরাগে রঞ্জিত করিতে বাসনা হইতেছে। হে মদনদহনশম্ভু, আমায় বল দেও, এই চিত্তবিক্ষোভ প্রশান্ত কর—"

উপাসনা শেষ হয় নাই, দ্বাররক্ষক আসিয়া সংবাদ দিল —বিপক্ষশিবির হইতে জনৈক দূত তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে।

তাঁহার উপাসনা শেষ হইল না। কি এক অব্যক্ত কারণে মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। পুষ্পধন্বা কত মধুময় আশার কথা কাণে গুঞ্জরণ করিতে লাগিল। প্রবল বাসনাঝঞ্ঝা ক্ষীণ সংযমচেষ্টাকে কোথায় উড়াইয়া দিল। তিনি দূতকে প্রবেশের আজ্ঞা দিলেন।

দূত আসিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। কম্পিত হস্তে আবরণ উন্মোচন করিয়া পড়িতে লাগিলেন—

"স্বস্তি শ্রী সমরবিজয়শ্রীঅভিনন্দিত গজেন্দ্রপুরাধীশ্বর-সচিবশ্রেষ্ঠ-ঝল্লকণ্ঠ-শ্রীকরকমলোপায়ন পত্রিকা—

"সমরকুশলী বীরশ্রেষ্ঠ, আবাল্য যে আদর্শীকৃত বীর মূর্ত্তি হৃদয়-মন্দিরে পূজা করিয়াছি, তাহা আজ আপনাতে শরীরী দেখিলাম। শত্রুকন্যার পূজোপচার গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। নিবেদন ইতি—রাজকন্যা ভদ্রসোমা।"

ঝল্লকণ্ঠ হর্ষাতিবেগস্তম্ভিত-হৃদয়ে লিপি খানি বারংবার পড়িতে লাগিলেন। আপনার চক্ষুকে বিশ্বাস হয় না, আপনার অনুভূতিকে প্রত্যয় হয় না। 'একি সত্য? একি সত্যই সত্য? উপহাস নহে, বিদ্রূপ নহে, ব্যঙ্গ নহে,—প্রকৃত সত্য? পিপাসাক্ষামকণ্ঠ পক্ষী জল চাহিতেই ধারাপ্রবাহ মুখে আসিয়া পড়িল? আজ আমি প্রকৃত জয়ী—রমণীর চিত্তজয় শতসাম্রাজ্য জয় তুল্য! আমি ধন্য, আমি জয়ী।'

রাজকন্যা ভদ্রসোমাকে উত্তর লিখিলেন—

"মন্মথমৈত্রীবশীকৃতা রাজকুমারীভদ্রসোমা-শ্রীকরকমলোপহৃতা পত্রিকা—

"ভদ্রে, আপনি মন্মথের পুষ্পধনুর সম্মোহন শর! আজ আমি জিত কি জয়ী ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আজিকার আনন্দ যেন আমার নিত্যোপভোগ্য হয়। নিবেদন ইতি—মুগ্ধ ঝল্লকণ্ঠ।"

পরদিন মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠের প্রস্তাবক্রমে উভয়পক্ষে সন্ধি হইয়া গেল। রাজা দ্রোণায়ণ মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠের সহিত কন্যা ভদ্রসোমার উদ্বাহ অঙ্গীকার করিলেন, এবং মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠ বাধাপ্রদানের ভাণমাত্র করিয়া ক্রমে ক্রমে গজেন্দ্রগড় রাজ্যের বহুলাংশ দ্রোণায়ণকে অধিকার করিতে দিবেন, এইরূপ গুপ্ত অঙ্গীকার স্বীকার করিলেন। কামোপহতচেতা ঝল্লকণ্ঠ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইলেন।

২

নীরা ও ভীমা নদীর সঙ্গমসম্মুখে রাজকুমারীর পুষ্পবাটিকা। নীলাঞ্জনদ্যুতি ক্রীড়াশৈলের প্রত্যন্ত দেশে সুরম্য কদলীকুঞ্জ, তন্মধ্যে মর্ম্মরশিলাপট্ট বেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্র পুষ্পতরুর পদতল-বাহিতা ক্ষীণা নির্ঝরিণীর রজতসূত্রধারা নীরার নির্ম্মল ক্রোড়ে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছিল। শয়নীয় স্নিগ্ধ শিলাপট্ট-সমাসন্না ভদ্রসোমা ভূষণশিঞ্জিত হস্ততালে তাঁহার প্রিয় ময়ূরটিকে নাচাইতেছিলেন; আর তাঁহার সখি পুষ্পিলা অশোকপলাশের মালা গাঁথিয়া তাঁহার শিরোমুকুট গড়িয়া দিতেছিল। অশোকপলাশের রক্ত স্তবক শুভ্রললাটে পড়িয়া দেব কন্যা ঊষার ললাটতিলক অরুণের মত শোভা পাইতে-ছিল। শ্রুতি-আশ্রিত মুক্তাগুচ্ছে সেই পুষ্পলালিমা প্রতি-ফলিত হইয়া শ্রুতিগণ্ডমূলে বিচিত্র পত্রলেখা রচনা করিতে-ছিল। গুঞ্জনমধুপপুঞ্জ কেলিকুঞ্জে ব্রততীবলয়াসঙ্গনা কুরুবক-শাখা হইতে কপোতবধূর করুণধ্বনি কি এক তরল বিষাদ বর্ষণ করিতেছিল। সহসা মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠ সেখানে উপস্থিত হইলেন।

কপোতবধূ উড়িয়া গেল, করকিশলয়তালমুগ্ধ নর্ত্তমান ময়ূর সংবৃতনৃত্য হইয়া উড়িয়া গিয়া বকুলবৃক্ষে বসিল; সখি পুষ্পিলা সরিয়া দাঁড়াইল; রাজকন্যা ময়ূরকণ্ঠী বাসখানি অঙ্গে টানিয়া দিয়া, চালিত দুকূলের সূক্ষ্মসুবাসে কদলীবিতান পূর্ণ করিয়া, অবনতমুখী হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখভাবে লজ্জাসম্ভ্রমের রেখামাত্র অঙ্কিত হয় নাই, বুঝি বিরক্তিমিশ্রা ঘৃণার ব্যঞ্জনা ব্যক্ত হইয়াছিল। তবু ভাবমুগ্ধ ঝল্লকণ্ঠ সেই লীলাচতুরার তদবস্থ ভাব দেখিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছিলেন।

কতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, ভদ্রসোমা আপনাকে উন্নত করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "মন্ত্রিন্, এ পুরন্ধ্রীর কেলিকুঞ্জ! রাজনীতিজ্ঞের উপযুক্ত স্থান নহে।"

ঝল্লকণ্ঠ হাসিয়া দুইপদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ছলকোপনে, আমাকে আসিবার অধিকার দিয়াছ, তাই আসিয়াছি। প্রেমময়ি, আবেগাতিশয্যহেতু যদি আচারের অতিক্রম করিয়া থাকি, অনুগত জনকে ক্ষমা কর,

আমি তোমারই।" সস্বেদপুলককম্পিতাঙ্গ মন্ত্রী দুইপদ সরিয়া ভদ্রসোমার হস্তধারণোপক্রম করিলেন।

রাজকন্যা পুচ্ছবিমর্দ্দিতা সর্পিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "মন্ত্রিন্, পুরন্ধ্রীর অমর্য্যাদা করিবেন না।"

ঝল্লকণ্ঠের বীরহৃদয়ও এই তর্জ্জনে সঙ্কুচিত, কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি বিনীতকণ্ঠে বলিলেন, "আর্য্যে, আপনি উৎসাহ দিয়াছিলেন বলিয়া এই ধৃষ্টতা করিতে সাহসী হইয়াছি। এক্ষণে আপনার সত্যরক্ষা করিয়া আমাকে আপনার প্রেমের অধিকার প্রদান করুন।"

ভদ্রসোমা পূর্ব্ববৎ তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "মন্ত্রিন্, বীরত্ব-বিমুগ্ধচিত্তার শ্রদ্ধা যদি অন্য অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন, আমায় ক্ষমা করিবেন; আমি সম্পূর্ণ আপনার অযোগ্যা,—যুদ্ধান্ত-প্রশান্তবুদ্ধিতে ইহা এখন আমি বুঝিতেছি। আমি আপনার ধৃষ্টতা যেমন মার্জ্জনা করিলাম, আপনিও আমার প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন।"

বাক্‌হত ঝল্লকণ্ঠ একবার সেই লাবণ্যবিচ্ছুরিত মুখের দিকে চাহিলেন; সেখানে অটলতা শাণিত খড়্গের মত উদ্যত দীপ্ত রহিয়াছে, সেখানে করুণাশ্রদ্ধার লেশ মাত্র নাই। ঝল্লকণ্ঠ ধীরে ধীরে কদলীকাননের মধুরশীতল ছায়া হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিরহতপ্ত হৃদয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল পথে চলিয়া গেলেন।

ঝল্লকণ্ঠ চলিয়া গেলে ভদ্রসোমা পুষ্পমুকুট ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; মনোজ্ঞকূর্পাসকপীড়িতস্তনা খেদবতী আপনার কঞ্চুলিকা ছিন্ন করিয়া তন্মধ্য হইতে ঝল্লকণ্ঠের প্রথম প্রণয়-দূতীকল্পা লিপিখানি বাহির করিয়া, চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া, বিলাপ করিতে করিতে শিলাপট্টের উপর পড়িয়া লুটিয়া লুটিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—

"এস এস ওহে দয়িত, তোমার অপমানক্ষত অশ্রুপ্রলিপ্ত করিয়া দিব; এস ওগো এস দেবতা, প্রেমশ্রদ্ধার স্রক্‌চন্দনে তোমার পূজা করিব; তোমার পূর্ণ গৌরবে এস গরবী, আমার হৃদয়মন্দিরে, তোমার গৌরব-কণিকা স্খলিত হইতে আমি দিব না; এস ওহে এস মনোহর, ও হে সৌম্য, আমার যৌবনবসন্তের প্রথম পুষ্পাঞ্জলি তোমার চরণে দিব; কোথা যাও, ও গো ফিরে চাও, ওহে দুরন্ত অভিমানী, অবহেলাহত অশ্রুকুম্ভ ভাঙিয়া গিয়াছে,—রুদ্ধ কর হে সক্ষম, সে প্রবাহ রুদ্ধ কর; কোথা যাও ও গো ফিরে চাও, ওহে তেজস্বী, আমার অন্তরে আগুন লাগাইয়াছ, স্নিগ্ধ কর, ওহে সন্তাপহর, অন্তর শীতলকর; ওহে প্রাণেশ্বর তুমি ফিরে এস, ওগো ফিরে এস।"

"অয়ি কঠোর, যশঃ কিল তে প্রিয়ং
কিমযশো নমু ঘোরমতঃ পরম্।
কিমভবদ্‌বিপিনে হরিণীদৃশঃ
কথয় নাথ কথং বত মন্যসে॥"

রাজকন্যাবিলাপব্যথিতচিত্তা সখি পুষ্পিলা দৌড়িয়া গিয়া হৃদয়ভারকৃতমন্থরগতি ঝল্লকণ্ঠকে ধরিয়া বলিল, "মন্ত্রিবর, রাজকন্যা আপনার জন্য কাঁদিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন, আপনি আসুন, ওগো সত্বর আসুন।"

ঝল্লকণ্ঠ শশাঙ্কদর্শনোচ্ছ্বসিতহৃদয় সাগরের মত উল্লাস-বিদ্রুতগতিতে কুঞ্জদ্বারে আসিয়া দেখিলেন, বিলুণ্ঠনবিশ্লথ-বেশা ভদ্রসোমা করুণক্রন্দনে তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছেন।

ভাববিহ্বল প্রীতিপ্রফুল্ল ঝল্লকণ্ঠ স্নেহস্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "প্রেয়সি, আমি আসিয়াছি, ওগো দেখ, আমি প্রেমের অর্ঘ্য রচনা করিয়া চরণোপান্তে আসিয়াছি—উঠ হৃদয়েশ্বরি, উঠ"।

বাক্‌কশাহতা কোপস্ফুরিতাধরা রাজকন্যা ত্বরিত উঠিয়া সংবৃত হইয়া বলিলেন, "তুমি কেন ওগো, এখানে কেন? যাও যাও তুমি চলিয়া যাও। অপমানের উপর অত্যাচার সংযোগ করিও না। যাও তুমি লৌকিকাচারচঞ্চুর, চলিয়া যাও। এখানে ওগো মন্ত্রী, তোমার কোন কাজ নাই, কোন কর্ত্তব্য নাই।"

বিস্মিত অবাক ঝল্লকণ্ঠ পুনরায় নিঃশব্দে বাহির হইয়া রমণীচিত্তের জটিল রহস্য জল্পনা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। সখি পুষ্পিলা বিস্ময়বাক্‌হতা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভদ্রসোমা আবার শিলাপট্টের উপর বিলুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—

"এলে যদি, তবে যাও কেন, ওহে চিরবাঞ্ছিত,—তুমি আপনার পূর্ণগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমার চিত্তক্ষেত্রে খেলা কর; ওহে দুর্লভ, তোমায় পাইয়া আবার হারাই কেন; ওগো বল্লভ, অশিথিলপরিরম্ভে আমাকে গ্রহণ কর।"

৩

প্রত্যাখ্যাত ঝল্লকণ্ঠ পত্র লিখিলেনঃ—

"ভদ্রে, অজ্ঞানঅনিচ্ছাকৃত যদি কোন পাপ থাকে, যথেষ্ট শাস্তিভোগ করিয়াছি,—ক্ষমা কর, আমায় রক্ষা কর। ইতি—

ত্বদর্পিতপ্রাণ
ঝল্লকণ্ঠ।"

দূত রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিল—রাজকুমারী পত্রোত্তর দেন নাই।

রাজকুমার ভদ্রমুখ ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "ভগ্নী সোমা, প্রণয়বিহ্বল সন্ধিমিত্র সচিব ঝল্লকণ্ঠকে কেন নিগৃহীত করিতেছ? তোমার লালসালুলিত ঝল্লকণ্ঠ তোমার সম্পূর্ণরূপে যোগ্য পাত্র।"

রাজকুমারী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ, তিনি আমার যোগ্য হইতে পারেন, কিন্তু আমি বুঝিতেছি যে আমি তাঁহার যোগ্যা নহি। তাঁহাকে আমার অনবস্থিত প্রগল্‌ভতা ভুলিয়া যাইতে অনুরোধ করিবেন।"

ব্যর্থদৌত্য রাজকুমার ফিরিয়া গেলেন।

ভ্রাতাকে বিদায় দিয়া ভদ্রসোমার বাহ্যতকঠোরপ্রতীত প্রতীপগামী চিত্ত কাঁদিয়া উঠিল—

"ওগো প্রেম যদি আসে, তবে যোগ্যতা লইয়া আসে না কেন; মন্মথমথিতমন যাকে চায়, তাকে নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না কেন, দোষ গুণ বিচারের প্রবৃত্তি আসে কেন? জগৎটা এই বিরাট 'কেন'—সূত্রে প্রতিচ্ছন্ন,—ইহার মীমাংসা হইল না, বুঝি হইবে না।"

রাজা দ্রৌণায়ণ স্বয়ং আসিয়া কন্যাকে বলিলেন, "বৎসে সোমা, সহসা একি বাতুলতা? ঝল্লকণ্ঠ তোমার পরিবর্ত্তে আমাকে বিশাল রাজ্যের অধিকার দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। বারংবার ব্যর্থীকৃত সর্ব্বপ্রচেষ্টা অনায়াসে সফল হইতেছিল, তুমি একি অনর্থপাত অকস্মাৎ আনয়ন করিলে? বালচাপল্য ত্যাগ কর; ঝল্লকণ্ঠকে বিবাহ করিতে স্থিরমতি হও; তোমার বালসুলভ নির্বুদ্ধিতার জন্য আমি হস্তগত বিশালরাজ্য ত্যাগ করিতে পারি না; তোমায় ঝল্লকণ্ঠকে বরণ করিতেই হইবে।"

রাজকুমারী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "পিতা, রাজশাসন চিত্তদমন করিতে নিতান্ত অক্ষম। কন্যার চিত্ত বিক্রয় করিয়া রাজ্য অধিকার না হয় নাই করিলেন।"

পিতা বিফলচেষ্ট হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে ভদ্রসোমা কাঁদিয়া উঠিল—"হায় হায়, চিত্ত যদি রাজশাসনেও দম্য হইত! আমার এ বিদ্রোহী চিত্তকে দমন করিতে কি প্রকৃষ্ট বাহ্যশক্তি বর্ত্তমান নাই? ওগো কে বলিয়া দিবে, প্রেম ও কর্ত্তব্যের জীবনান্তক যুদ্ধ কিসে বিরামলাভ করিবে;—বিজয়লক্ষ্মী একপক্ষ অভিনন্দিত করুক, আমার চিত্ত শান্ত হোক। বিষম ঝটিকাবিক্ষুব্ধ জলধিতরঙ্গের মত বিপরীত ভাবশ্রেণী আমার হৃদয়-বেলায় নিরাশ্রয়ভাবে আছাড়িয়া দুধারি ভাঙিয়া পড়িতেছে; ওগো বিধাতা, শান্ত কর, ওহে শান্তি দেও। প্রগ্রহে অশ্বের মত সবলে হৃদয়কে টানিতেছি; জানি না তাহাতে কতগুলি তন্তু ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া যাইতেছে।"

৪

মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠ অনায়ত্তীকৃত প্রভুরাজ্য দ্রৌণায়ণ রাজার নিকট ফেরত চাহিলেন। রাজ্যলোলুপ দ্রৌণায়ণ প্রথমতঃ যেন শুনিলেন না; তার পর যেন ভাল বুঝিলেন না; তারপর ইতস্ততঃ করিলেন; তার পর বলিলেন, "আমার কন্যাসম্প্রদান করিতে ত প্রস্তুতই আছি, আপনি তাহাকে সম্মত করুন।" বারংবার বিফলপ্রযত্ন নিরাশ্বাস ঝল্লকণ্ঠ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, রাজ্যাধিকার ফিরাইয়া চাহিলেন।

তখন দ্রৌণায়ণ বলিলেন, "স্বায়ত্তীকৃত রাজ্য কোন্ নির্ব্বোধ ত্যাগ করে। আমি উহা ত্যাগ করিব না।"

ঝল্লকণ্ঠ বলিলেন, "সামর্থ্য থাকে ফিরাইয়া লইব।"

দ্রৌণায়ণ বলিলেন, "সেই ভাল।"

ঝল্লকণ্ঠ বৈরনিশ্চিত হইয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন।

৫

অপমানোদ্বেজিত ব্যর্থপ্রণয়লালস ঝল্লকণ্ঠ উদ্বোধিতোগ্র-শৌর্য্যসাহায্যে উপর্য্যুপরি যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাজা দ্রৌণায়ণের কঠিন কবল হইতে সমস্ত নষ্টরাজ্য উদ্ধার করিলেন। এই উদ্ধারব্রতে ব্যয়িত সমস্ত অর্থ স্বসঞ্চিত অর্থ হইতে দিয়া প্রায়শ্চিত্তশুচি তপঃকৃশ যাজ্ঞিকের মত দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইলেন। তৎপরে রাজকোষ হইতে

অর্থ লইয়া দ্রোণায়ণের রাজ্য যুগপৎ তিন স্থানে আক্রমণ করিলেন।

দ্রোণায়ণ এই অনুতাপদৃপ্ত প্রায়শ্চিত্তপ্রয়াসী মন্ত্রীর দুষ্প্রধর্ষ আক্রমণ আর সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। বারংবার পরাজিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

ঝল্লকণ্ঠ স্বশিবিরে বসিয়া আছেন। বিজয়ীর প্রায়শ্চিত্ত-শুদ্ধ ললাটে চক্ষে সন্তোষের জ্যোতি স্ফূরিত হইতেছিল। কুঞ্চিত কেশকলাপ আবেষ্টন করিয়া লাবণ্যবিচ্ছুরিকা মুক্তা-মালা বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্যের মত শোভা পাইতেছিল। ক্রোড়ন্যস্ত কোষবদ্ধ কৃপাণ বিজয়ীর শান্তনিরুদ্বেগ প্রচার করিতেছিল। এবং ভদ্রসোমার প্রথম ও সকৃৎলিখিত পত্রখানি অনিমেষনয়নে দেখিতে দেখিতে তিনি ভাবিতে-ছিলেন—

"ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি
সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি।
এতানি তানি বচনানি সরোরুহাক্ষ্যাঃ
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি॥"

তাঁহার চিন্তায় বাধা পড়িল। দ্বাররক্ষক আসিয়া সংবাদ দিল, দ্রোণায়ণ রাজকুমার ভদ্রমুখ সন্ধিদূত হইয়া আসিয়াছেন। ঝল্লকণ্ঠ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন।

উভয়ে উপবিষ্ট হইলে, ভদ্রমুখ বলিলেন, "আপনার স্বরাজ্য আপনি পাইয়াছেন, এক্ষণে আর বিরোধ কেন? সন্ধি করিয়া শান্তি ও মৈত্রী সংস্থাপন করিতে আমরা ইচ্ছুক।"

ঝল্লকণ্ঠ বলিলেন, "রাজকুমার, আপনারা ইচ্ছুক হইতে পারেন, কিন্তু আমি ইচ্ছুক নহি। আমি যে উদ্বেগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছি, তাহার পূরণ ও প্রতিশোধ আমি চাই।"

তবে "এই লও প্রতিশোধ" বলিয়া ভদ্রমুখ গুপ্ত কৃপাণিকা আমূল ঝল্লকণ্ঠের বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন।

এমন সময় দ্বাররক্ষক প্রচার করিল, "রাজকুমারী ভদ্র-সোমার দূত আসিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় কাতরধ্বনি নিঃসৃত হইতে হইতে ক্ষান্ত হইল। কেহ জানিল না মন্ত্রীর কি সাংঘাতিক অবস্থা হইয়াছে। তিনি সকল কষ্ট ভুলিয়া আবেগোচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "কই, কই, সে দূত কই? তাহাকে শীঘ্র আসিতে দেও।"

রাজকুমারীর দূত জম্ভিল প্রবেশ করিয়া মন্ত্রীকে শোণিতা-প্লুত লুণ্ঠিত দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকারে বহুলোক সমবেত হইয়া মন্ত্রীকে তদবস্থ দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল।

মন্ত্রী সকলকে নিরস্ত হইতে আদেশ করিয়া, বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। সকলে অবসৃত হইলে জম্ভিলকে নিকটে আহ্বান করিলেন।

দূত নিকটস্থ হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ, এ কার্য্য কে করিল?"

মন্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "অদৃষ্ট!—উপলক্ষ রাজকুমার ভদ্রমুখ।"

জম্ভিল বলিল, "কেন কেন, তাঁহার এ দুর্ম্মতি কেন হইল? বীর হইয়া এই গুপ্তহত্যা-প্রবৃত্তি কেন জন্মিল।"

ঝল্লকণ্ঠ কষ্টনিঃসৃত কণ্ঠে বলিলেন, "এও অদৃষ্ট;—কর্ত্তব্যভ্রষ্ট আমি নিজের স্বার্থের জন্য প্রভুরাজ্য বিক্রয় করিয়া-ছিলাম;—সে প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করিয়াও প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি আমাকে উত্তেজিত করিয়াছিল;—বীর শত্রুর প্রার্থিতসন্ধি উপেক্ষা করিয়া অদৃষ্টের প্রতিদান এই পাইয়াছি।—যাক সে কথা, এক্ষণে তুমি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ, শীঘ্র বল—আমার সময় সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে।"

জম্ভিল আপনার উষ্ণীষাবরণ হইতে একখানি পত্র মুক্ত করিয়া ঝল্লকণ্ঠের হাতে দিল।

ঝল্লকণ্ঠ সেই চন্দনকুঙ্কুমলিপ্ত সুগন্ধী লিপিখানি লইয়া চোখের কাছে কিছুক্ষণ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু মৃত্যুচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে লিপি-খানির একটি বর্ণও পড়িতে পারিলেন না। কাতর হইয়া বুকে ললাটে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বনাচ্ছন্ন পত্রখানি জম্ভিলকে দিয়া বলিলেন, "জম্ভিল, ভগবান আমাকে প্রেয়সীর হস্তাক্ষর দর্শনসুখেও বঞ্চিত করিয়াছেন; শ্রবণশক্তি অবিকৃত থাকিতে থাকিতে তুমি ইহা পাঠ কর; আমার দৃষ্টিতে আবিল্য আসিয়াছে, মৃত্যুর প্রাণহীন শীতলহস্ত আমার

সর্ব্বেন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করিতেছে, সমস্ত মসীলিপ্ত দেখিতেছি,—তুমি পত্র পাঠ করিয়া শুনাও, শীঘ্র পাঠ কর।"

জজ্ঝিল আবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিল—

"স্বধর্ম্মকর্ত্তব্যনিষ্ঠ গরিষ্ঠ সচিবশ্রেষ্ঠ ঝল্লকণ্ঠ। শ্রীকর কমলোপায়ন—"ওহে দয়িত, ওহে বাঞ্ছিত, ওহে বল্লভ, তোমাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট স্বার্থান্ধ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, পুটপাকপ্রতীকাশা অন্তর্গূঢ় ঘনব্যথা হৃন্মর্ম্মে অস্ফুটিত ব্রণের রূঢ় গ্রন্থির ন্যায় ঘনীভূত শোক নিশিদিন বিষদিগ্ধ শল্যের মত জ্বালা দিয়াছে। তোমার আত্মোপলব্ধি তোমাকে সগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে দেখিয়া আজ আমার কৃতখণ্ডনব্যথ চিত্ত তাহার সমস্ত রুদ্ধ পূজা দিয়া অভিনন্দন করিয়া স্বাধিকারে আবাহন করিতেছে;—এস ওগো গৌরবদীপ্ত সুন্দর, ফিরে এস; ওহে হৃদিরঞ্জন, হৃদয় মন্দিরে ফিরিয়া এস; ওগো প্রত্যাখ্যাত, দ্বারোপান্ত হইতে ব্যর্থমনোরথ লইয়া ফিরিয়া গিয়া, ওহে প্রাপ্তসর্ব্বগৌরব বীরশ্রেষ্ঠ, আমার চিত্তরাজ্য জয় করিয়াছ, তোমার স্নেহচ্ছায়ে উহাকে পালন কর। আমার মানস-আদর্শ তোমার ব্যবহারে কলঙ্কম্লান হইয়াছিল, আজ তোমার প্রায়শ্চিত্তপূতচরিত্র তাহাকে রাহুমুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় উজ্জ্বলতর, ভাস্বরতর করিয়াছে—আমার মানসমুকুরে তোমার গৌরবমুকুটের দীপ্তচ্ছায়া দেখিবে, এস ওগো এস। আমার অটল বিশ্বাস, আমাদের মধ্যে পূর্ব্বকার সরল কোমল স্নেহবন্ধন অটুট, অক্ষুণ্ণ ও প্রীতি যোগ অপরাজিত রহিয়াছে। ওহে হৃদয়দেবতা, আমার সর্ব্বস্বরচিত বিচিত্র অর্ঘ্য তোমার চরণে ঢালিয়া দিব, এস ওহে ফিরে এস। ইতি—পূজার্থিনী ভদ্রসোমা।"

পত্র পঠিত হইলে ঝল্লকণ্ঠ মরণরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "জজ্ঝিল আমার হইয়া তুমি রাজকন্যাকে বলিও, আমি বলিতেছি—'দেবি,—মূঢ় আমি,—তোমায় পাইবার উপায় ভুল বুঝিয়া কর্ত্তব্যপথক্ষুণ্ণ হইয়া তোমায় পাইয়াও পাই নাই।—মূঢ়তা-গুণ্ঠিত পাপ তোমার জন্যই করিয়াছিলাম—ইহাই আমার সান্ত্বনা।—তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়াছ,—আমাকে তোমার পূজাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ,—ইহা জানিয়া মরিতেও সুখ।—মরণের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সর্ব্বগ্লানিহরা লিপিখানি আমার মৃত্যুসরণি সরল সুন্দর করিয়া দিল।—আমি ধন্য—আমি আজ সার্থকপ্রেম!—জজ্ঝিল, আমি আজ এই মৃত্যুমুহূর্ত্তে আমার অস্খলিত প্রীতির নিদর্শন কি দিব;—তাঁহার প্রথম প্রণয়সম্ভাষমধুরা লিপিখানি আমার বক্ষে নিশি দিন রক্ষা করিয়াছি—তাহাই লইয়া তাঁহাকে দিও।"

এই বলিয়া ঝল্লকণ্ঠ অঙ্গরক্ষণীর বন্ধনমুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন, জজ্ঝিল সসম্ভ্রম তৎপরতায় তাঁহাকে সাহায্য করিল। অঙ্গরক্ষা উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন, বক্ষবিদ্ধ কৃপাণিকা পত্রখানির একাংশ ছিন্ন করিয়া বক্ষোমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছে। সেই ছিন্ন রক্তানুলিপ্ত পত্রখানি চুম্বন করিয়া জজ্ঝিলের হাতে দিলেন; তার পর বক্ষ হইতে সবলে কৃপাণিকা-ফলক নিষ্কাসিত করিয়া জজ্ঝিলকে দিয়া বলিলেনঃ—

"যাও জজ্ঝিল,—আমার হৃদয়রক্তরঞ্জিত কৃপাণিকা তাঁহাকে দিয়া বলিও, 'এই কৃপাণিকা আমার শত্রু হইয়াও হিতকারী—সে প্রেয়সীর প্রণয়ানুপ্রাণিত হস্তাক্ষর আমার বুকের মধ্যে পূরিয়া দিয়াছে,—প্রেয়সির প্রণয়গর্ভ বাণী আমি হৃদয়ে বহন করিয়া মরিব,—আমাকে কেহ আর তাহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না,—আমি সার্থক প্রেমের পুষ্প-ক্রোড়ে মরিতেছি।—আমি সুখী।—ভগবান, পরকালে অপরিণত প্রণয়প্রসঙ্গ যেন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় প্রারম্ভমাত্র-সাঙ্গলীলা ভদ্রসোমাকে সান্ত্বনা দিও—হে ভগবান—"

বক্ষক্ষতমুখে রক্তোচ্ছ্বাস হইল, মরণস্তব্ধ মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠ শয্যায় অসাড় জড় পতিত হইলেন।

প্রত্যাবৃত্ত জজ্ঝিল প্রণয়প্রাণ মন্ত্রীর সকল বাক্য যথাযথ নিবেদন করিয়া প্রগাঢ়শোকোদ্বেগস্তম্ভিতা রাজকুমারী ভদ্রসোমার চরণপ্রান্তে রক্তরঞ্জিত কৃপাণিকা ও পত্রিকা দুখানি রাখিয়া দিল।

ভদ্রসোমার শোক উচ্ছ্বাসাতীত, অনমুমেয়গাধ; রক্ত-লিপ্ত উপহারগুলি দেখিয়া অক্ষিকোণে শুধু দুটি বিন্দু লাবণ্যবিচ্ছুরিত অশ্রু নিটোল মুক্তাফলের মত দীর্ঘ নীরন্ধ্র-পক্ষ্মাশ্রয়ে দুলিয়া উঠিল; তিনি রক্তলিপ্ত পত্রিকার একখানি মস্তকে কবরীর মধ্যে, অপর খানি বক্ষাবরণাস্তরালে রক্ষা করিলেন; তার পর, দয়িতহৃদয়রক্তরঞ্জিত কৃপাণিকাখানি চুম্বন করিয়া ললাটে মস্তকে স্পর্শ করিলেন;—সীমন্তললাটে রক্তরাগদীপ্তি সধবার প্রিয়ানুরাগচিহ্নিত সিন্দুরশোভার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।



মন্থরার কারামোচন।

Kuntaline Press, Calcutta.

আমার উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমি যখন শেষ পরীক্ষা দিয়া মেডিক্যাল কলেজ হইতে বাহির হইলাম তখন আমার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বর্ষ মাত্র। আমার যথেষ্ট পৈত্রিক সম্পত্তি থাকাতে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করার তাদৃশ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু গ্রামস্থ সকলেই বলিলেন,—যখন এত পরিশ্রম করিয়া, এত অর্থব্যয় করিয়া ডাক্তারিটা পাসই করিলে, তখন প্র্যাকটিস্ না করাটা মোটেই ভাল দেখায় না। কথাটা যথার্থ বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু ডাক্তারি চোগা চাপকান পরিহিত স্থূলকায় (কারণ ভাল পশার হইলে ঘি দুধ নিশ্চয়ই বেশী করিয়া খাইব) অত্যন্ত গম্ভীর নিজের ভবিষ্য মূর্ত্তিটি কল্পনা করিয়া বড়ই হাসি পাইতে লাগিল।

ডাক্তার হইবার উচ্চাভিলাষ আমার কোন কালেই ছিল না। আমার একমাত্র উচ্চাভিলাষ ছিল,—তাহা উপন্যাসের নায়ক হইবার জন্য। বাল্যকাল হইতেই উপন্যাস পাঠে আমার অতিরিক্ত পরিমাণ আসক্তি জন্মিয়াছিল। আমার প্রথম উপন্যাস পাঠ বঙ্কিম বাবুর "আনন্দ মঠ।" মনে আছে আমার বয়স তখন একাদশ বর্ষ মাত্র। সেই বৎসর নূতন "আনন্দ-মঠ" বাহির হইয়াছে। আমার মেজদাদা মহাশয় কলিকাতায় কলেজে পড়িতেন, পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিবার সময় বহিখানি আনয়ন করেন। তিনি আসিয়া হঠাৎ প্রচার করিয়া দিলেন যে তিনি একজন সন্তান। চিরদিন অবিবাহিত থাকিয়া দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন। গ্রামস্থ অন্যান্য নব্য যুবকগণের সহিত মিলিত হইয়া গোপনে অনেক পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলে আমায় কিছুই বলিতেন না,—আশা দিতেন, বড় হইলে আমায় দীক্ষিত করিবেন। অত্যন্ত কুতূহলী হইয়া "আনন্দ-মঠ" খানি অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু মেজদাদা সেখানি কোথায় যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, কিছুতেই পাইলাম না। হতাশ হইয়া অবশেষে তাঁহাদের মন্ত্রণাসভায় আড়ি পাতিলাম। যে ঘরে তাঁহাদের সভা বসিত, পূর্ব্বে হইতে একদিন সেই ঘরে চৌকির নীচে লুকাইয়া রহিলাম। যাহা শুনিলাম, তাহা আর এক্ষণে প্রকাশ করিব না, কারণ দাদা মহাশয় এখন পূর্ব্ববঙ্গের একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। সম্প্রতি একটি স্বদেশী মোকর্দ্দমায় কয়েকজন বিদ্যালয়ের বালককে জেলে দিয়া তাঁহার পদোন্নতির সম্ভাবনাও হইয়াছে।

অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা মেঝেতে উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকার জন্যই হউক অথবা অত্যধিক পরিমাণে তেঁতুল খাইয়াই হউক, ইহার অল্পদিন পরেই আমি জ্বরে পড়িলাম। জ্বর ছাড়িলেও কয়েকদিন অবধি আমার সাবধান পিতামাতা আমাকে সাগু বার্লি ভিন্ন কিছুই খাইতে দিলেন না। পেটের জ্বালায় অস্থির হইয়া খাদ্যান্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ "আনন্দ-মঠ" খানি একদিন হাতে পড়িল। সেই দিনই সমস্ত বহিখানি পাঠ করিয়া ফেলিলাম। স্মরণ আছে, দুর্ভিক্ষপীড়িতগণ ইন্দুর পোড়াইয়া খাইতেছে পড়িয়া আমারও মনে হইয়াছিল, আমিও এসময় দুই একটা পোড়া ইন্দুর পাইলে খাইয়া ফেলি।

তাহার পর হইতে যতই বয়স বাড়িতে লাগিল, বাঙ্গলা ইংরাজি বহু উপন্যাস গলাধঃকরণ করিতে লাগিলাম। নিজের দৈনন্দিন গদ্যময় জীবনটার উপর বড়ই অশ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল। অভিভাবকগণের নির্ব্বন্ধাতিশয় সত্ত্বেও বিবাহ করিলাম না; পূর্ব্বরাগবর্জ্জিত, অ্যাড্ভেঞ্চরলেশ, হীন বিবাহ করিতে কিছুতেই মন উঠিল না।

উপন্যাসের নায়ক হইবার পক্ষে আমার একটা বিশেষ ব্যাঘাতও ছিল, তাহা আমার বাহ্যাবয়ব। চেহারাটি আমার মোটেই উপন্যাসের নায়কের মত নহে।

কিন্তু বিধাতা যে কি উপায়ে কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন, বুঝা কঠিন। এই অনায়কোচিত মূর্ত্তিই একদিন আমাকে উপন্যাসের স্বপ্নরাজ্যে অবতীর্ণ করিয়া দিল।

বন্ধুগণের প্ররোচনায় ডাক্তারি ব্যবসায় করিব বলিয়াই কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম। গ্রামে বসিয়াই ডাক্তারি করিব—বিষয় সম্পত্তিও দেখিতে শুনিতে পারিব। ঔষধ, আলমারি প্রভৃতি কিনিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তখন বর্ষাকাল। কলিকাতায় প্রায়ই বৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব্বে যে মেসের বাসায় থাকিয়া পড়িতাম, সেইখানেই গিয়া

উঠিলাম। সপ্তাহ খানেক থাকিয়া, দেখিয়া শুনিয়া, আসবাব পত্র কিনিব ইচ্ছা ছিল। প্রাতে উঠিয়াই প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে যাইতাম,—এটি আমার বহুদিনের অভ্যাস। একখানি শুষ্ক বস্ত্র ও গামছা স্কন্ধে করিয়া নগ্নপদে সাতটার পূর্ব্বেই স্নানে বাহির হইতাম। গঙ্গাস্নানের জন্য একযোড়া স্বতন্ত্র বস্ত্র ছিল, কারণ সে সময় গঙ্গার জল অত্যন্ত ঘোলা, কাপড় ময়লা হইয়া যাইত।

তিন চারিদিন কলিকাতায় অতিবাহিত হইলে, একদিন স্নান করিয়া যেই মাত্র ঘাটে উঠিয়াছি, সিক্ত বস্ত্রখানি পরিবর্ত্তন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, একটি বাবু হন্ হন্ করিয়া ঘাটে আসিয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। লোকটির স্নানের বেশ ছিল না। কামিজের উপর চাদর লম্বমান ছিল। বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর। লোকটির চেহারা শুষ্ক, অনেকদিন ক্ষৌরকার্য্য না হওয়াতে মুখখানা দেখিতে বিশ্রী হইয়াছে,—যেন তাঁহাকে দেখিবার, যত্ন করিবার কেহ নাই বলিয়া বোধ হইল। তিনি আসিয়া স্নানকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে ব্যস্তভাবে যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ আমার কাছে আসিয়া আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"বামুন ঠাকুর?"

আমি ব্রাহ্মণ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই—কিন্তু বামুন ঠাকুর পদবীলাভ ইতিপূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। ভাবিলাম, বোধ হয় লোকটি অন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া আমাকে ভ্রম করিতেছেন।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া বাবুটি অধীর হইয়া বলিলেন— "কি বিপদ! উত্তর দাও না কেন? তুমি কি বামুন ঠাকুর?"

হায়, আমার মূর্ত্তি নায়কোচিত না হইলেও কি একেবারেই পাচক ব্রাহ্মণের মত? বুঝিলাম, বাবুটি একজন রাঁধুনি অন্বেষণ করিতেছেন। মস্তকে কি খেয়াল চাপিল, বলিলাম—"আজ্ঞা হাঁা।"

"কোথাও চাকরি কর?"

"আজ্ঞা না।"

"করবে?"

"পেলে ত করি।"

"রাঁধতে জান?"

"আজ্ঞা জাত-ব্যবসা,—ওটা আর জানিনে?"

"বাড়ী কোথা?"

"যশোর।"

"নাম?"

"শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায়।"

"কলকেতায় কতদিন এসেছ?"

"এই চার পাঁচ দিন হবে।"

"চাকরির চেষ্টায়?"

"আজ্ঞা তা নৈলে কি থিয়েটার দেখতে এসেছি?"

বাবুটি চটিয়া গেলেন। বলিলেন—"দেখ হ্যা, তোমার মুখটা ভাল নয়। তুমি বড় অসভ্য। ভদ্রলোকের সঙ্গে এই রকম করে কথা কইতে হয়?"

মনে মনে বড় আমোদ অনুভব করিলাম। ইহার রাঁধুনিগিরি দিন দুই করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? এই এক অ্যাডভেঞ্চরের সুযোগ জুটিয়া গিয়াছে। সুতরাং বিনীত হইয়া বলিলাম—"আজ্ঞা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, কিছু জানি শুনি না। তা, অপরাধ নেবেন না কর্ত্তা।"

বাবুটি নরম হইয়া বলিলেন—"হুঁ।" একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"সত্যি বামুন? না বামুন সেজেছ? গলায় একগাছা পৈতে দিয়ে অনেক ব্যাটা হাড়ি মুচি কলকেতায় এসে বামুন হয়।"

হায়! হায়! আমার মূর্ত্তিটি কি তবে হাড়িমুচির বলিয়াও ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা? বাবুটির "সভ্যতার" আমি বিশেষ প্রশংসা করিতে পারিলাম না। প্রকাশ্যে, একটু বিনীত হাস্য করিয়া বলিলাম—"আজ্ঞা ও সব জাল জুয়াচুরির ধার দিয়েও যাইনে।"

বাবুটি আবার আমায় জেরা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"আচ্ছা, কেমন বামুন গায়ত্রী বল দেখি?"

আমি গায়ত্রী আবৃত্তি করিলাম। এই ভণ্ডামি করিবার সময় সুপবিত্র গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, মনে সাপরাধ অনুশোচনা উপস্থিত হইল।

বাবুটি ওষ্ঠযুগল কুঞ্চিত করিয়া, সন্দিগ্ধভাবে মাথাটি নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন—"কিছু বোঝা গেল না। আজকাল ছাপার বই হয়েছে, চার পয়সা দিয়ে একখানা কিনে গায়ত্রী, সন্ধ্যা মুখস্থ করে নিলেই হল।"

একটু দুঃখের ভাণ করিয়া বলিলাম—"কর্ত্তা যদি বিশ্বাস না করেন তা হলে কি করি?"

বাবুটির মুখে একটু উৎসাহের চিহ্ন দেখা গেল। সহসা বলিলেন—"আচ্ছা, পৈতে গ্রন্থি দেয় কি মন্ত্র বলে বল দিকিন? এটা আর কোনও ছাপার কেতাবে নেই।"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম—"ভারদ্বাজ-আঙ্গিরস-বার্হস্পত্য-প্রবরস্য।"

শুনিয়া বাবুটি বলিলেন—"তবে ঠিক বামুনই বটে। কত মাইনে নেবে?"

"আজ্ঞা, কর্ত্তার কি হুকুম হয়?"

"তুমিই বল না।"

"কলকেত্তার রেট ত বাঁধা আছে।"

"কত?"

আমাদের বাসার বামুনের মাহিনা পাঁচ টাকা আর খোরাক পোষাক ছিল। তাই সাহস করিয়া বলিলাম—"পাঁচ টাকা।"

"পাঁচ টাকা না পঁচিশ টাকা! কে বল্লে তোমায় কলকেত্তার রেট্ পাঁচ টাকা?"

"আজ্ঞা, অনেক ছাত্রদের মেসের বাসায় ত বামুনের মাইনে পাঁচ টাকা আর খোরাক পোষাক আছে।"

"মেসের বাসা আর গেরস্তর বাড়ী সমান? ছাত্রদের মেসের বাসার চাকরি আজ আছে কাল নেই। যদি চার টাকায় রাজি হওত বল। চার টাকা, খোরাক, আর বছরে দু'খান কাপড় দু'খান গামছা।"

আমি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলাম—"আজ্ঞা চার টাকায় কি করে চলবে? বহু পরিবার, তাদের খাওয়াব কি?"

"বহু পরিবার? ক'জন খানেওয়ালা?"

"আজ্ঞে বুড়ো মা বাপ, ভাই,—"

বাধা দিয়া বাবুটি বলিলেন—"ঈশ্! রাঁধুনিগিরি করে বুড়ো মা বাপ ভাইকে খাওয়াবেন! আমার একশো টাকা মাইনে, আমিই পারিনে,—নিজের স্ত্রীসন্তানকে খাওয়াতেই সব টাকা খরচ হয়ে যায়। চার টাকা থেকে এক টাকা জমাবে,—তিন টাকা মাসে মাসে তোমার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিও এখন।"

"আজ্ঞা, বিবাহ করিনি।"

"কি, কুলীন বামুন এখনও বিবাহ করনি?"

"না।"

"কেন? কোনও দোষ টোষ আছে নাকি?"

"দোষ—দারিদ্র্যদোষ। এত গরীবকে কে মেয়ে দেবে?"

"বিয়ে করনি ভালই করেছ। সাহেবরা নিজে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করতে না পারলে বিবাহ করে না। যদি ইংরেজি জানতে, ওদের কেতাবেই দেখতে পেতে। আমাদের আপিসের ছোট সাহেব, পাঁচশো টাকা মাইনে পায়, এখনও বিবাহ করে নি।"

আমি চারি টাকা স্থানে পাঁচ টাকা করিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। অবশেষে সাড়ে চারি টাকায় রফা হইল। বাবুটি বলিলেন—যদি ভাল কাজকর্ম্ম করিতে পারি, পলায়ন না করি, তবে বৎসরান্তে বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে "বিবেচনা" করিবেন। এখনি আমাকে গিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তাঁহার গৃহিণী পীড়িতা। আজ দুই দিন তাঁহার বামুন পলায়ন করাতে বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপ অভাবনীয় ভাবে পাচক ব্রাহ্মণ হইয়া বাবুটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, অনেক আরাধনার পর অবশেষে আমার অদৃষ্টে এই এক অ্যাড্‌ভেঞ্চর জুটিল। দেখা যাউক, ইহার মধ্যে হইতে কোনও রহস্যলাভ হয় কিনা।

বাবুটির নাম কালীকান্ত রায়। ব্রাহ্মণ। তাঁহার বাসা চোরবাগানে। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ক্ষুদ্র উঠানটিতে আমের আঁটি, পরিত্যক্ত ভাত তরকারী ও শালপাতার রাশি স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। উঠানের এক কোণে একটি জলের কল, তাহার পার্শ্বে একটি হাউজ। কলের গলায় কাপড়ের পাড় দিয়া একটি বাঁশের চোঙা বাঁধা রহিয়াছে, তাহা বহিয়া জল হাউজে পড়িতেছে।

কালীকান্ত বাবু প্রবেশ করিয়া, ঊর্দ্ধে দ্বিতলের বারান্দার পানে চাহিয়া বলিলেন—"গিন্নী—অ গিন্নী—"

তাঁহার গলার স্বর শুনিয়া বারান্দায় একটি বালিকা

আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"বাবা চেঁচিও না। মা এখনও ঘুমুচ্ছেন।"

সেই আমাদের প্রথম চারিচক্ষে মিলন। রোমিও ও জুলিয়েটের অলিন্দ-দৃশ্য মনে পড়িল। আমার জুলিয়েট, আলুলায়িতকুন্তলা, দোতালার বারান্দা হইতে দেখিলেন, স্কন্ধে গামছা, হস্তে ভিজা কাপড়, পাচকব্রাহ্মণরূপী রোমিও মুগ্ধনেত্রে দণ্ডায়মান। জুলিয়েটের বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ ছিল, আমার জুলিয়েটের বয়সও তাহাই বলিয়া অনুমান করিলাম। তাঁহার দেহবর্ণটি ইতালীয় জুলিয়েট অপেক্ষা কিছু মলিন বটে, কিন্তু মুখ চক্ষুর সৌন্দর্য্য অপরাভূত।

কালীকান্ত বাবু বলিলেন—"প্রিয়, আয় নেমে আয় দিকিন।"

'প্রিয়'? প্রিয়তমা না প্রিয়ম্বদা? প্রিয়বালাও হইতে পারে। 'প্রিয়তমা' না হইলেই ভাল। পৃথিবীসুদ্ধ লোকেই কি প্রিয়তমা বলিয়া ডাকিবে? প্রিয়বালা নামটি মধুর। কিন্তু প্রিয়ম্বদা নামটি মধুর এবং কাব্যগন্ধি। প্রিয়ম্বদা শকুন্তলায় কিন্তু প্রিয়বালা আধুনিক উপন্যাসের মাত্র।

পায়ের চারিগাছি মল ঝুম ঝুম করিয়া, বালিকা নামিয়া আসিল। আসিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাঁহার মুখের প্রতি প্রশ্নযুক্ত দৃষ্টিপাত করিল।

আমাকে দেখাইয়া কালীকান্ত বাবু বলিলেন—"প্রিয়,এই একজন বামুন ঠাকুর এনেছি। সব যোগাড় যন্তর করে দে।"

হায়! এরূপ সূচনা ত কোন কাব্যেই লেখে না। বালিকা কি পরীকন্যা ও রাজকন্যাদের গল্প পাঠ করিয়া, জাগ্রতে বা নিদ্রায় স্বপ্ন দেখে নাই যে তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য কোনও পুষ্পময় রাজ্য হইতে একজন রাজপুত্র আসিয়া দণ্ডায়মান? তাহার কিশোর হৃদয়ে কোনও পাচক ব্রাহ্মণ কি ঈপ্সিতরূপে কখনও স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে?

আমার কবিত্বময় চিন্তাস্রোত বাধা দিয়া বাবু বলিলেন—"আটটা বাজে। দশটায় আপিসের ভাত চাই। পারবে?"

আমি বলিলাম—"আজ্ঞে, দেখি চেষ্টা করে।"

"যা হয় দুটো ভাতে ভাত। দুটো উনান জেলে এক দিকে ভাত একদিকে ডাল চড়িয়ে দাও। আমি বাজার থেকে মাছ কিনে আনি। তরীতরকারী সব ঘরেই আছে।"

প্রিয় বলিল—"সব আছে।"

অতঃপর বাবু একখানি গামছা লইয়া মাছ কিনিতে বাহির হইলেন।

আমি তখন বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"রান্নাঘর কোন্ দিকে?"

"এই দিকে এস।" বলিয়া প্রিয় আমাকে সঙ্গে করিয়া অন্য বারান্দায় লইয়া গেল। একটি ঘরের শিকল খুলিতে খুলিতে বলিল—"এই রান্নাঘর।"

প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তখনও চুল্লীতে অগ্নিসংযোগ হয় নাই। বলিলাম—"এখনও যে কিছুই যোগাড় হয় নি। ঝি কোথায়, উনুন ধরিয়ে দিক না।"

বালিকা বলিল—"ঝি ত আমাদের নেই। মাসখানেক হ'ল ঝি পালিয়েছে, মা বলেছেন ঝি আর রাখবেন না। আমিই সব করি। আমি উনুন ধরিয়ে দিচ্চি।"

দেখিলাম ঘরের এক কোণে একগাদা কয়লা রহিয়াছে। আমি বলিলাম—"ঝি নেই? আচ্ছা তবে আমিই ধরাচ্ছি। তোমায় কষ্ট করতে হবে না।" বলিয়া কয়লার গাদার নিকট গিয়া, একটি ডালায় করিয়া কয়লা ভরিয়া আনিলাম। উনান জ্বালিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

এ কার্য্য যে এত কঠিন তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। প্রিয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, আর মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। শেষে বলিল—"ঐ রকম করে বুঝি কয়লা ধরায়?"

আমি হতাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রকম করে ধরায় বল দেখি?"

"সব আমি ধরাই। তুমি বরং এই মাছের ঝোলের জন্যে আলু পটোলগুলো কুটে ফেল।"

এই ময়লা পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে বালিকাকে নিযুক্ত হইতে দিতে আমার দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু কি করি উপায় নাই। দশটায় ভাত না পাইলে বাবু মহাশয় হৈ চৈ কাণ্ড বাধাইয়া দিবেন। সুতরাং কয়লার চুলা বালিকাকে ছাড়িয়া দিয়া, হাত ধুইয়া আমি তরকারী কুটিতে বসিলাম।

দেখিলাম, বঁটিতে তরকারী কোটা মুস্কিল। ছুরী দিয়া এক রকম পারা যায়। আমাদের মেসে যখন ঠাকুর

পলাইত তখন আমরা অনেকে বসিয়া ছুরী দিয়া তরকারী কুটিতাম।

যাহা হউক, কোন মতে সাবধানে কুটিতে লাগিলাম। পাছে হাত কাটিয়া যায়, এ আশঙ্কাও ছিল। উনান ধরাইয়া প্রিয় আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, গালে হাত দিয়া বলিল—"ও হরিবোল!"

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি?"

"এই কি মাছের ঝোলের আলু কোটা না কি?"

"কেন?"

"মাছের ঝোলের আলু কি চাকা চাকা করে কোটে? ও ত ভাজার আলু হচ্চে। মাছের ঝোলের আলু চৌচির করতে হয়।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম—"ওঃ!"

প্রিয় বলিল "সর দেখি। আমি কুটি।"

আমি সরিলাম। কয়লার চুলায় পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম।

বালিকা একটু হাসিয়া বলিল—"রাঁধতে জান? না সেও এই রকম?"

আমি মনে মনে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিয়া বলিলাম—"এই রকম।"

"এই রকমই? আর কখনো এ কাজ করনি বুঝি? এই প্রথম না কি?"

"এই প্রথম।"

"তবে চাকরি নিলে কেন?"

আমি চাকরি কেন নিলাম, তাহার উত্তর এখন দিলে সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। দিন দুই পরে যাইবার সময়, আর কাহাকেও না বলি, এই বালিকাকে বলিয়া যাইব স্থির করিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া, বালিকা আমার মনোভাব অন্যরূপ বুঝিল। করুণায় তাহার মুখখানি ভরিয়া গেল। প্রশ্ন করিবার জন্য যেন অনুতপ্ত হইয়া বলিল—"তুমি বড় গরীব বুঝি?"

আমি চক্ষু নত করিয়া ধীরে ধীরে মাথাটি নাড়িলাম। তাহার সহানুভূতি গভীরতর করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম—"আমি যে নতুন, কিছু জানিনে,—তা শুনলে তোমার বাবা আমায় রাখবেন কি?—তাড়িয়ে দেবেন হয় ত।"

আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বালিকা বলিল—"আচ্ছা, আমি কাউকে বলব না। আমি সব তোমায় দেখিয়ে শুনিয়ে দেব এখন, তুমি দু'দিনে সব শিখে ফেলবে।"

"তোমার মা জানতে পারবেন না?"

"মা কি কখনও রান্নাঘরে আসেন? তিনি উপরেই থাকেন।"

"তাঁর না কি অসুখ করেছে শুনলাম?"

"তাঁর বারোমাসই অসুখ।"

"কি অসুখ?"

"এই কোন দিন মাথা ধরে, কোন দিন কিছু। তাঁর জন্যে কোন ভয় নেই। তিনি খুব বকেন বটে, কিন্তু উপর থেকেই বকেন। সিঁড়ি নামাওঠা করলে হাঁপিয়ে পড়েন।"

"খুব বকেন না কি? তাই বুঝি ঝি বামুন সব পালায়?"

বালিকা এ কথায় যেন একটু লজ্জিত হইল। কথা ফিরাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার নাম কি?"

"প্রিয়ম্বদা।"

"প্রিয়ম্বদা? বেশ নামটি ত!"

মেয়েটি লজ্জায় মুখ নত করিল। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমরা ভাই বোন্ কটি?"

"আমার আপনার একটি ভাই।"

"আরও যে দু তিনটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দেখলাম?"

"ওরাও আমার ভাই বোন। আমার এ মায়ের ছেলে পিলে।"

তখন বুঝিলাম—গৃহিণী প্রিয়ম্বদার বিমাতা। ঝি কেন আর রাখা হইবে না, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। এই কোমলা বালিকার জন্য সহানুভূতিতে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল।

এই সময় বাবু মাছ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"কত দূর?"

আমি বলিলাম—"আজ্ঞে আর বেশী দেরী নেই।"

"যা হয় চটপট—বুঝলে? বেশী বাহুল্য কোরো না। আমি আপিসে বেরিয়ে গেলে তার পর বাকী সব কোরো এখন।" বলিয়া তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, দিন দুই রাঁধুনিগিরির আস্বাদ গ্রহণ করিয়া আমার মাননীয় পূর্ব্ববর্ত্তিগণের পন্থানুসরণ

করিব—অর্থাৎ পলায়ন করিব। কিন্তু আজ একমাস যাবৎ স্থির নিশ্চল ভাবে চাকরি করিতেছি। বলা বাহুল্য, প্রিয়ম্বদার সুন্দর মুখখানিই আমার স্বর্ণশৃঙ্খলস্বরূপ হইয়াছে। অথচ প্রিয়ম্বদা আমাকে এখনও রাঁধুনি বামুন বলিয়াই জানে। তবে তাহার ব্যবহারে বুঝিতে পারি, আমাকে সাধারণ বামুন ঠাকুর হইতে একটু স্বতন্ত্র বলিয়াই সে মনে করে। প্রিয়ম্বদা মোটামুটি রকম বাঙ্গলা লেখাপড়া জানিত; আমি রান্নাঘরে বসিয়াই গৃহকার্য্যের ব্যবধানে, তাহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছি। এই এক মাসের মধ্যেই দুই তিন খানি ভাল বাঙ্গলা বহি সে অধ্যয়ন করিয়া ফেলিয়াছে। একদিন আমায় সে বলিয়াছিল,—"তুমি রাঁধুনি বামুন না হয়ে ইস্কুলের পণ্ডিত হলে না কেন?"

আমি বলিয়াছিলাম,—"তাই করব মনে করেছি। তোমার বিয়ে হয়ে গেলে আমিও চাকরি ছেড়ে চলে যাব।"

বিবাহের কথায় বালিকার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল।

পরে জানিয়াছি, প্রিয়ম্বদার বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ নহে,—ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র। কিন্তু তাহাকে বয়সের অপেক্ষা একটু বড় দেখাইত। এত বড় মেয়ের বিবাহ হয় নাই কেন, প্রথমে আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হইত। ক্রমে জানিতে পারিলাম—কালীকান্ত বাবুর পুত্রগণের প্রাইভেট মাষ্টারের নিকট শুনিলাম—প্রিয়ম্বদার বিবাহের সম্বন্ধ মাঝে মাঝে হয় বটে, কিন্তু ইহাঁরা যত সস্তায় খোঁজেন, তত সস্তায় কোন বর পাওয়া যায় না।

আমি ইহা শুনিয়া অবধি মনে করিয়া রাখিয়াছিলাম যে একদিন কালীকান্ত বাবুর নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিব। প্রথম দুই তিন দিন যাইতে না যাইতেই প্রিয়ম্বদার সাহচর্য্য আমার হৃদয়ে সুখসঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে সুখ, দিনের পর দিন ঘনীভূত হইতে লাগিল। সে সাহচর্য্যের বিচ্ছেদক্লেশ দিনের পর দিন তীব্রতর হইতে লাগিল। তখন ভাদ্র মাস। রাত্রে শয়ন করিবার জন্য, অল্পদূরে একটি ঘর ভাড়া লইয়াছিলাম। কর্ম্মান্তে, দিবসে ও রাত্রিকালে সেই খানেই অবস্থিতি করিতাম। অধিক মূল্য দিয়া ঘরটি ভাড়া লইয়াছিলাম। ছবিতে পুস্তকে, সুখসেব্য আসবাবে সেখানি সাজাইয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে আমি সুখ পাইতাম না। সেই প্রায়ান্ধকার, ধূমমলিন, অপকৃষ্ট রান্নাঘর খানিই আমার সুখের আগার হইয়া উঠিয়াছিল। গভীর রাত্রে এক একদিন নিদ্রাভঙ্গ হইলে বাহিরে অন্ধকারে মেঘগর্জ্জন শুনিতে পাইতাম; প্রবলভাবে বৃষ্টি আসিত। প্রিয়ম্বদাকে স্মরণ করিয়া কত সুখকল্পনা আমার মনকে ঘিরিয়া ফেলিত। ভাদ্র মাসে হিন্দুর বিবাহ হয় না। ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম, আশ্বিন মাস পড়িলেই কালীকান্ত বাবুকে বলিব, পূজার পূর্ব্বেই প্রিয়ম্বদাকে বিবাহ করিয়া বাড়ী লইয়া যাইব।

কিন্তু আবার শঙ্কাও হইত। কালীকান্ত বাবু যদি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন? করিবার ত কোনও কারণ দেখি না। তথাপি যদি করেন? মন হইতে এ আশঙ্কা কিছুতেই বিদূরিত করিতে পারিতাম না। আমার অদৃষ্টে যদি প্রিয়ম্বদা লাভ সুখ না থাকে? তবে কি হইবে? কেমন করিয়া দীর্ঘ-জীবন কাটাইব? তখন বৈষ্ণব-কবির পদ মনে মনে গাহিতাম—

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

আমার মন্দির যদি চিরদিনই শূন্য থাকিয়া যায়?

কিন্তু আশ্বিনমাস আগমন করিবার পূর্ব্বেই, দ্বিতীয় একটি অভাবনীয় ঘটনায়, আমার প্রিয়ম্বদালাভ, শুধু সম্ভাবিত নহে, অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। যে অমৃত পান করিবার জন্য পিপাসায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম, সেই অমৃত আমার মুখের কাছে আনিয়া একজন বলিল—"পান কর—পান করিতেই হইবে।"

একদিন প্রভাতে কর্ম্মে গিয়া দেখি, প্রিয়ম্বদা গায়ে একখানি র‍্যাপার দিয়া আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, রাত্রে একটু জ্বরের মত হইয়াছিল, এখনও যেন শীত শীত করিতেছে।

এইরূপ পর দিনও হইল। জ্বর গায়ে, উপবাসে, প্রিয় তাহার নির্দ্দিষ্ট গৃহকার্য্যগুলি করিতে লাগিল। সে কার্য্য বড় অল্প নয়। বাসন মাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি ঝির সমস্ত কার্য্যই তাহাকে করিতে হইত।

সেদিন কালীকান্ত বাবুকে বলিলাম তাঁহার কন্যার যেরূপ অসুস্থ দেহ, অন্ততঃ একটা ঠিকা ঝি আনিলে ভাল হয়।

শুনিয়া বাবু রাগিয়া বলিলেন—"তুমি ত বলে খালাস, পাই কোথা আমি ঠিকা ঝি ?"

বড় রাগ হইল, দুঃখও হইল। প্রিয়ম্বদার প্রতি অবহেলা আমার অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। কোথায় গেলে ঝির সন্ধান পাওয়া যায়, আমি ত কিছুই জানিতাম না। তথাপি বলিলাম—"একটা সন্ধান করে দেখব কি ?"

"পাও ত দেখ" বলিয়া বাবু মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন।

সেদিন আমি ঝির অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না।

আর এক বিপদ হইল, প্রিয়ম্বদা সাগু বার্লি কিছুই খাইতে চাহে না। প্রথম দিন সদ্য অনাহারে ছিল। দ্বিতীয় দিন তাহার জন্য মাত্র এক পয়সার খই ব্যবস্থা হইল।

প্রিয় খই খাইতে খাইতে বলিল—"এ আমার ভাল লাগে না।"

আমি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি খেতে ইচ্ছে করে তোমার ?"

"একটা বেদানা টেদানা পেলে খাই।"

পরদিন বাবুকে বলিলাম—"প্রিয় সাগু বার্লি খায় না, ওর জন্যে কিছু বেদানা কি আঙ্গুর আনিয়ে দিলে ভাল হ'ত।"

বাবু বলিলেন—"বেদানা! আঙুর! জ্বরের উপর ওসব খেলে সদ্য বিকারে দাঁড়াবে। সর্ব্বনাশ! ওসব ভারি ঠাণ্ডা জিনিষ।"

আমি নীরব রহিলাম। অথচ স্বচক্ষে দেখিয়াছি, গত সপ্তাহে বাবুর আদরের এ পক্ষের পুত্রটির যখন জ্বর হইয়াছিল,—বেদানা, আঙুর, বিস্কুট প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণেই বাড়ীতে আমদানি হইয়াছিল। মনে স্থির করিলাম, আজ ওবেলা আমি প্রিয়র জন্য কিছু খাদ্য আনিব;—তাহাতে যদি ইহাঁরা রাগ করিতে হয়, করিবেন।

সে দিন বৈকালে কর্ম্মে আসিবার সময় আমি এক বাক্স আঙুর, কয়েকটা বেদানা এবং কিছু বিস্কুট আনিলাম। কিন্তু প্রিয়ম্বদা সে দিন নামিল না। তাহার ছোট ভাই সুধীরচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, জ্বর খুব প্রবল।

মনের অশান্তিতে সান্ধ্যকর্ম্ম সমাপ্ত করিলাম। বাসায় গিয়া সারা রাত্রি আমার নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রভাতে গিয়া আবার সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার দিদি কেমন আছেন ?"

"দিদি সমস্ত রাত খালি জল জল করেছে।"

"গা কি খুব গরম ?"

"একবারে আগুনের মত।"

"এখন কেমন ?"

"এখন ঘুমুচ্ছে।"

"রাত্রে তাঁর কাছে কে ছিল ?"

"আমিই ছিলাম। আমি আর দিদি এক সঙ্গে শুই কি না।"

"তোমার মা কি বাপ দেখতে আসেন নি ?"

"বাবা শুতে যাবার আগে একবার দেখতে এসেছিলেন। অনেক রাত্রে দিদি যখন মা গো মা গো করে চেঁচাচ্ছিল, তখন মা একবার উঠে এসেছিলেন। বাইরে থেকে জানালা দিয়ে বল্লেন—'অত চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন? বাড়ীশুদ্ধ লোককে কি ঘুমুতে দিবিনে? চুপ করে শুয়ে থাক পোড়ারমুখী'। তাই শুনে দিদি ভয়ে চুপ করে শুয়ে রইল।"

আমি উপরে কখনও যাই নাই। ঘরগুলির অবস্থান জানিতাম না। গৃহিণীর ভাত উপরে যাইত, তাহা প্রিয়ম্বদাই বরাবর লইয়া যাইত। গতকল্য সন্ধ্যার সময় কেবল বাবু স্বয়ং লইয়া গিয়াছিলেন।

সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি আর তোমার দিদি যে ঘরে থাক, সেটা কোন খানে ?"

"সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ দিকে।"

মনে মনে স্থির করিলাম, আজ কর্ম্মান্তে, প্রিয়ম্বদাকে গিয়া দেখিয়া আসিব। সুধীরকে বলিলাম—"দেখ, তুমি আজ ইস্কুলে যেও না। তোমার দিদিকে ত দেখবার কেউ লোক নাই।"

বেলা সাতটার সময় দেখিলাম বাবু চাদর লইয়া বাহির হইতেছেন। ভাবিলাম, বুঝি বা ডাক্তার আনিতে যাইতেছেন। ঘণ্টা খানেক পরে ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে ডাক্তার নহে, একজন ঝি। বলিলেন—"একটি ঝি ডেকে এনেছি। কি করতে কর্ম্মাতে হ'বে একে সব বলে দাও।"

দুই দিন পূর্ব্বে, যতক্ষণ প্রিয় একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়ে নাই, ততক্ষণ অবধি ঝি দুষ্প্রাপ্য ছিল। আজ সেই

ঝি সুপ্রাপ্য হইল। দিন কতক আগে আনিলে হয় ত মেয়েটা এত অধিক পীড়িত হইয়া পড়িত না। লোকটার প্রতি ঘৃণায় আমার অন্তঃকরণ বিষাক্ত হইয়া উঠিল। ছি ছি দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলে কি আপনার সন্তানের প্রতি এতই নির্ম্মম নিষ্ঠুর হইতে হয়? একেবারে কি কসাই হইয়াই উঠিতে হয়? ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই, পথ্যও নাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আজ আমি উপরে গিয়া প্রিয়ম্বদাকে দেখিবই দেখিব। তাহার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিব। আমি যে নিজে ডাক্তার, সেজন্য আমি নিজেকে এই প্রথম অভিনন্দন করিলাম।

যথাসময়ে বাবু আপিসে বাহির হইয়া গেলেন। ছেলেরা (সুধীর ছাড়া) ইস্কুলে গেল। গৃহিণীর ভাত উপরে দিয়া আসিলাম। সর্ব্ব কর্ম্মান্তে যখন অবসর হইল, তখন সুধীরকে বলিলাম,—চল তোমার দিদিকে দেখি।

সুধীরের সহিত উপরে গিয়া প্রিয়ম্বদার কক্ষে প্রবেশ করিলাম। একটি মলিন ছিন্ন বিছানা মেঝের উপর পড়িয়া আছে। তাহাতে শুইয়া বালিকা রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

আমি কাছে গিয়া শানের উপর বসিলাম। তাহার হাত খানি লইয়া বলিলাম—"প্রিয়, কেমন আছ?"

প্রিয় চক্ষু মেলিল। আমাকে দেখিয়া বলিল—"বামুন ঠাকুর? আমার মাথা যে যায়। কি করি?"

দেখিলাম প্রবল সর্দ্দি জর। বলিলাম—"তোমার মাথা কামড়াচ্ছে? আচ্ছা, এখনি আমি ভাল করে দিচ্ছি।"

বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া, খানিকটা সরিষার তৈল গরম করিলাম। একটা সরায় করিয়া খানিকটা আগুন লইলাম। উপরে গিয়া, প্রিয়ম্বদার পায়ের নীচে সেই গরম তৈল দশ মিনিট ধরিয়া জোরে মালিস করিলাম। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন মাথাটা কেমন আছে?"

প্রিয় বলিল—"অনেক ভাল। আর কষ্ট নেই।"

তখন আবার প্রিয়ম্বদার নিকটে গিয়া বসিলাম। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া, একখানি প্রেস্কৃপ্সন লিখিলাম। বলিলাম—"প্রিয়, তুমি একটু শুয়ে থাক। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার জন্যে অষুধ আনছি।"

বলিয়া বাহির হইয়া, গাড়ি ভাড়া করিয়া, একটি প্রথম শ্রেণীর ঔষধালয় হইতে ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া আনিলাম।

সে দিন বৈকালের মধ্যে প্রিয় অনেকটা সুস্থতা লাভ করিল।

এইরূপে আমি তিন চারিদিন চিকিৎসা চালাইলাম। প্রথম দিন মনে করিয়াছিলাম, আমি ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা নিজ ব্যয়ে করিতেছি দেখিলে বাবু মহাশয় খাপ্পা হইবেন। দেখিলাম, তাহা কিছু হইল না। অনুরাগও নাই, বিরাগও নাই—ভাবটা সম্পূর্ণ অবহেলার। যায় যায়, থাকে থাকে। আমি মনে মনে আশা করিতে লাগিলাম, আমি যখন বাবুর নিকট তাঁহার জামাতৃপদপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইব, তখনও যেন তাঁহার মনে এই অবহেলার ভাবই থাকে। অনাদরে অবহেলায় যেন আমার হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়া দেন। কিন্তু শীঘ্রই একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমাকে আর আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রার্থী হইতে হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রিয়ম্বদা দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। আমিও কাহারও বিনা আপত্তিতে সারা দ্বিপ্রহর ও অপরাহ্ন-কাল তাহারই সহিত যাপন করিতে লাগিলাম। তাহাকে কত গল্প বলিতাম। অনেক ভাল ভাল পুস্তক আনিয়া দিতাম।

সে দিন মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে অধিক মূল্য দিয়া একগুচ্ছ কালো আঙুর কিনিয়া আনিয়াছিলাম, প্রিয়ম্বদা উহার কয়েকটি খাইল, এবং আমাকেও খাইতে অনুরোধ করিল। আমিও দুই একটি মুখে দিলাম।

তখন ভাদ্রের শেষ। ভারি গরম পড়িয়াছে। প্রিয়ম্বদার ললাটদেশ স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া আমি পাখা লইয়া তাহাকে মৃদু মৃদু বাতাস করিতে লাগিলাম।

ক্রমে প্রিয়ম্বদা ঘুমাইয়া পড়িল। বহুদিন তৈলাভাবে তাহার চুলগুলি পাতলা হইয়া গিয়াছিল। কপালের প্রান্তভাগের গুচ্ছগুলি বাতাসে ইতস্ততঃ উড়িতেছে।

আমি সতৃষ্ণনয়নে তাহার পাণ্ডুর মুখখানির পানে চাহিয়া রহিলাম। আজ ভাদ্রমাসের শেষ সপ্তাহ। এক সপ্তাহ

পরে আমি কালীকান্ত বাবুর নিকট প্রস্তাব করিব। পূজার পূর্ব্বেই বিবাহ করিব। আমার প্রতি প্রিয়ম্বদার স্নেহের আকর্ষণের যথেষ্ট প্রমাণ এ কয়দিনে পাইয়াছি। এ কয়দিনে আমাকে সে নিজের পরমাত্মীয় স্বরূপই জ্ঞান করিয়াছে।

যে বালিকাকে অল্পদিনের মধ্যেই আমি আমার ধর্ম্মপত্নী করিয়া সুখী হইব আশা করিতেছি,—সে বিশ্বস্তচিত্তে আমার শুশ্রূষাধীনে, আমার অতি নিকটে নিদ্রামগ্না। আমি যে মণিকে শীঘ্রই গলায় ধারণ করিয়া চিরজীবন সস্নেহে রক্ষা করিব, আমি তাহার সুনির্জ্জন শিয়রে বসিয়া। আমি অবনত হইয়া, আঙুরের রসসিক্ত, আঙুরেরই মত কোমল লাবণ্যপূর্ণ তাহার অধর যুগল একবার চুম্বন করিলাম।

মাথা তুলিয়া দেখিলাম, যে জানালা বারান্দায় খুলিয়াছে, তাহার বাহিরে একটি মহিলা দাঁড়াইয়া। অনুমানে বুঝিলাম তিনিই গৃহিণী। আমাকে দেখিয়াই তিনি সরিয়া গেলেন।

সে দিন সন্ধ্যাকালে যখন রন্ধনশালায় ব্যস্ত ছিলাম, হঠাৎ বাবু আসিয়া বাহির হইতে ডাকিলেন—"মুখুয্যে।"

"আজ্ঞে।"

"একবার এ দিকে এস ত।"

বাবুর স্বর রোষযুক্ত। ব্যাপার বুঝিতে আমার কিছুই বাকী রহিল না। মনে মনে হাস্য করিয়া আমি বাহিরে আসিলাম।

ছেলেরা যে ঘরে প্রাইভেট মাষ্টারের নিকট পড়িত, সে ঘর তখন শূন্য ছিল। কালীকান্ত বাবু আমায় সেই ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। রোষকষায়িত নেত্রে বলিলেন—"কি শুন্‌ছি?"

"কি শুন্‌ছেন?"

"তুমি জান, প্রিয়ম্বদা নিতান্ত বালিকা নয়?"

"জানি।"

"তোমাকে অতি সচ্চরিত্র জেনে, অসুখের সময় প্রিয়ম্বদার সেবা শুশ্রূষা করায় কোন আপত্তি করিনি তা জান?"

"আপনার অনুগ্রহ।"

"তুমি প্রিয়ম্বদাকে চুমো খেয়েছ?"

"খেয়েছি।"

"কাজটা কি রকম হয়েছে জান?"

"আপনিই বলুন।"

"পিনাল কোডের একটা ধারা অনুসারে অপরাধ হয়েছে। আমি যদি পুলিশ কোর্টে তোমার নামে নালিশ করি ত কি হয় জান?"

নিতান্ত ভালমানুষের মত, যেন কতই ভীত হইয়াছি এইরূপ ভাণ করিয়া বলিলাম—"কি হয়?"

"জেল হয়।"

"জেল—অ্যাঁ?"

বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"জেল হয়। সে দিন 'বঙ্গবাসী'তে পড়লাম, একজন মুসলমান, একটি ইউরেশিয়ান বালিকাকে বলপূর্ব্বক চুম্বন করেছিল, তার ছয় সপ্তাহ জেল হয়েছে।"

আমি অভিনয় করিয়া যাইতে লাগিলাম—"অ্যাঁ! বলেন কি? তবে আমার কি হ'বে?"

বাবু বলিলেন—"যদি তোমার নামে নালিশ করি ত তুমি কি করবে?"

কাতর স্বরে বলিলাম—"আজ্ঞে উকীল ব্যারিষ্টার দিয়ে একবার দেখব। নিতান্তই অদৃষ্টে থাকে ত জেল হবে।"

"উকীল ব্যারিষ্টার দেবে, পয়সা পাবে কোথা?"

"আজ্ঞে, দেশে যে সামান্য জমি জমা আছে তা বিক্রী করতে হবে।"

"জেল থেকে বেরিয়ে খাবে কি? আর ত কেউ চাকরি দেবে না।"

আমি অত্যন্ত ভীত ভাব দেখাইয়া, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া বাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

শেষে তিনি বলিলেন—"শোন। তুমি আমার যুবতী মেয়ের অজ্ঞাতসারে তার অঙ্গস্পর্শ করে, তার ভয়ানক অনিষ্ট করেছ। এখন, তাকে তোমায় বিবাহ করতে হবে।"

আমি পূর্ব্বেই ইহা বুঝিয়াছিলাম। উপন্যাসেও এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাঠ করিয়াছি। রঙ্গ দেখিবার জন্য বলিলাম—"আজ্ঞে—তা—তা—তাতে কিছু আপত্তি নেই। তবে আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ। গণ, পণ, কুলমর্য্যাদা, সকল বিষয়ে যদি মান রক্ষে করেন, তবে আর আমার আপত্তি কি?"

বাবু অত্যন্ত রাগিয়া বলিলেন—"বটে! কুলমর্য্যাদা! আচ্ছা, যাও একবার জেল খেটে এস;—তাতে তোমার

কুলমর্য্যাদা অনেক বাড়বে এখন। বিয়ে করে আরও বেশী রোজগার করতে পারবে।”

শেষে বলিলেন—“গণ পণ? চাও কোন লজ্জায়? তোমায় জেলে না দিয়ে যে মেয়ে দেবার প্রস্তাব করেছি এই তোমার পরম সৌভাগ্য।”

বিনয়ের ভাণ করিয়া বলিলাম—“আজ্ঞে, তা ত বটেই। তা ত বটেই। তবে কি না—”

বাধা দিয়া বাবু বলিলেন—“কিনা ফিনা নয়। আমার এক কথা। সিকি পয়সা পাবে না। রাজি হও, উত্তম। না হও, জেল। বস্।”

আমি আর একটু রঙ্গ দেখিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম—“আজ্ঞে, আপনার কন্যাকে বিবাহ করা আমার মত লোকের পক্ষে ত বিশেষ সৌভাগ্যেরই কথা—তবে কি না—তবে কি না—”

বাবু রাগিয়া বলিলেন—“তবে কি না কি? জেলে যাওয়াই যদি বেশী সৌভাগ্য বলে মনে কর, তাই যাও।”

“আজ্ঞা তা নয়,—উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিবাহ করাটা ত ঠিক নয়। খাওয়াব কি?”

“কেন, এই ত বল্লে, জমি জমা বিক্রী করে উকীল ব্যারিষ্টার লাগাবে,—সেই জমি জমা চাষবাস করে স্ত্রীর ভরণপোষণ করিতে পার না?”

“আজ্ঞে, সে অতি সামান্য। কোনও রকমে গ্রাসাচ্ছাদনটা চলতে পারে বটে;—কিন্তু তার উপর নির্ভর করে কি বিবাহ করা উচিত?—এই ধরুণ আপনাদের আপিসের ছোট সাহেব, পাঁচশো টাকা মাইনে পান, এখনও বিয়ে করছেন না।”

ইহা শুনিয়া বাবু জলিয়া উঠিলেন। বলিলেন—“ওরা সাহেব। আমরা কি সাহেব না কি? ওরা যা করবে তাই আমাদের করতে হবে? অন্ধ অনুকরণ করে করেই ত দেশটা উচ্ছন্ন গেল।”

ব্যাপারখানা এইখানেই শেষ হওয়া ভাল, মনে করিয়া বলিলাম—“আজ্ঞা, তবে না হয়—তবে না হয়—বিবাহই করব।”

“সেই ভাল কথা। এই আশ্বিন সম্মুখে। পূজোর ছুটি হলে, পশ্চিম বেড়াতে যাব। মধুপুর কি দেওঘর ঐ রকম কোথাও গিয়ে, পুরুত ডেকে, বিয়ে দিয়ে দেব।”

“আজ্ঞে, আবার অতদুর নিয়ে যাবেন? এখানে হয় না?”

“এখানে? রাধুনি বামুনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে সমাজে আর মুখ দেখাতে পারব? না না,—সে হবে না। সেখানে বিয়ে হলে কেউ জানবে শুনবে না, চুপ চাপ,—এখানে এসে প্রচার করে দিলেই হবে যে একটি ভাল পাত্র পেয়ে বিয়ে দিয়ে এসেছি।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পূজার ছুটি হইল। বাবু সপরিবার দেওঘর যাত্রা করিবেন,—আমাকেও সঙ্গে লইবেন। এ পর্য্যন্ত প্রিয়ম্বদা এ সকল বিষয় কিছুই শোনে নাই। তাহার পিতা মাতা গোপনে পরামর্শ করিয়া, সব ঠিকঠাক করিয়াছেন।

আমার একটি উকীল বন্ধু সে বার ছুটিতে মধুপুর যাইতেছিলেন। তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, আমার জন্য একখানি ভাল বাড়ী যেন ভাড়া করিয়া রাখেন।

শুভদিনে দেওঘরে আমাদের বিবাহ হইল। নববধূকে লইয়া যাত্রা করিলাম। শ্বশুর মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া নিজ ব্যয়ে আমাদিগকে দুই খানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া দিলেন।

বিবাহ-রজনীর পর, প্রভাতে কুশণ্ডিকা সম্পন্ন করিয়া তৎপরদিন প্রভাতে আমরা যাত্রা করিলাম। তখন প্রিয়ম্বদা জানে আমরা যশোরেই যাইতেছি।

মধুপুরে গাড়ী থামিলে, স্ত্রীলোকের কামরা হইতে প্রিয়ম্বদাকে নামাইলাম।

প্রিয় বলিল—“এখানে যে?”

আমি বলিলাম—“এখানে দিন কতক থেকে তার পর যাওয়া যাবে।”

যে বাড়ী ঠিক করা ছিল, সেই খানে গিয়া উঠিলাম।

প্রিয় বলিল—“এ বাড়ী কার?”

“এখন আমাদের। আমরা ভাড়া নিয়েছি। এইখানেই আমরা মাসখানেক থাকব দু'জনে।”

অপরাহ্নকাল। দুইজনে নিভৃতসুখে বসিয়াছিলাম। এইবার প্রিয়ম্বদাকে সমস্তই বলিলাম। ভাবিয়াছিলাম, প্রিয় খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। কিন্তু প্রিয় বলিল—“আমি ত জানি।”

"তুমি জান ? কেমন করে জানলে ?"

"কেন, সেই যে তুমি আমাকে অসুখের সময় একবার রবীন্দ্র বাবুর কাব্য-গ্রন্থাবলী পড়তে এনে দিয়ে ছিলে মনে পড়ে ?"

"পড়ে।"

"তার মধ্যে একখানি চিঠি ছিল। বোধ হয় তোমার কোনও বন্ধুর চিঠি।"

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—"বন্ধুর চিঠি ? কার চিঠি বল দেখি ? কি লেখা ছিল তাতে ?"

"নাম ত মনে নেই। তাতে লেখা ছিল, 'এ কি পাগলামি তোমার ! জমিদারের ছেলে হয়ে নিজে ডাক্তারি পাস করে, শেষে করছ রাঁধুনিগিরি ?' আরও সব লেখা ছিল।"

তখন আমার স্মরণ হইল। এই উকীল-বন্ধু, যিনি বাড়ী ভাড়া করিয়া দিয়াছেন, তিনিই সে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহাকে আমি পূর্ব্বাবধি সব কথাই জানাইয়াছিলাম। তাঁহার চিঠিতে ও কথা লেখা ছিল,—আরও লেখা ছিল, যদি আমি "প্রভু"-কন্যার প্রেমেই আবদ্ধ হইয়া থাকি, তবে সত্বর নজের পরিচয় দিয়া বিবাহ করিলেই ত পারি। প্রত্যহ হাঁড়িঠেলার ভিতর কি কবিত্ব আছে তাহা তিনি বুঝিতে না পারিয়া আমায় তিরস্কার করিয়াছিলেন।

আমি তখন প্রিয়কে বলিলাম—"ওহো মনে পড়েছে। আচ্ছা তাতে আর কি লেখা ছিল বল দেখি।"

প্রিয় সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল—"যাও বলব না।"

"না, বল।"

"না, বলব না।"

অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও বলাইতে পারিলাম না। শেষে বলিলাম—"আমি তোমায় ভালবাসি সে চিঠি দেখেই জানতে পেরেছিলে ?"

প্রিয় চক্ষু আনত করিয়া, আঙুলে আঁচল জড়াইতে জড়াইতে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

আমি তাহার গলদেশে বাহুবেষ্টন করিয়া তাহাকে চুম্বন করিলাম। বলিলাম—"তোমার ভারি অন্যায় ত !"

"কি ?"

"পরের চিঠি পড়া।"

"আমি বুঝি তোমার পর ?"

"তখন ত বিয়ে হয় নি ! আমি যে তোমায় ভালবাসি তা তখনও জানতে না। তখন আমি পর নই ?"

"তা বুঝি ?"

"তবে কি ?"

"আমরা যখন জন্মেছিলাম, তখনি ত বিধাতাপুরুষ আমাদের বিয়ে হবে তা ঠিক করে দিয়েছিলেন।"

প্রিয়ম্বদাকে আবার চুম্বন করিবার জন্য বাহুপ্রসারণ করিব, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—"হুজুর, মালী ফুল এনেছে।"

বাহিরে গিয়া দেখিলাম, মালী অজস্র পরিমাণ নানা বর্ণের ফুল আনিয়াছে। সেই ফুলে রজনীতে আমার ফুলশয্যা হইল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

পৌনঃপুনিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলন।

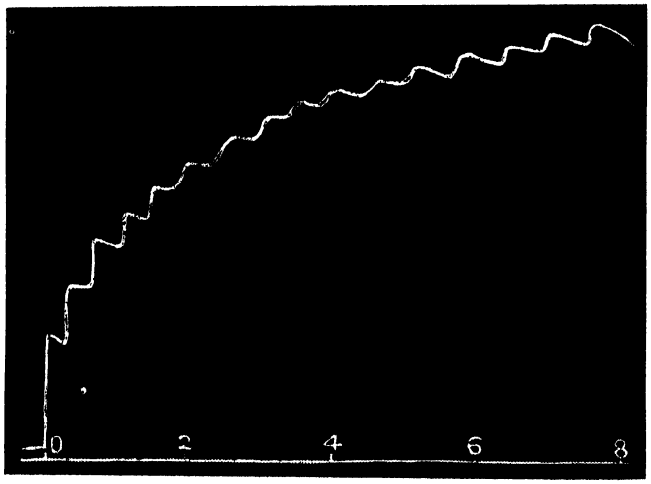
স্বতঃসঞ্চলন (Autonomous movements) প্রাণী ও উদ্ভিদের একটা প্রধান বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বটি দেখিয়াই অনেক সময়, সজীবকে নির্জীব হইতে বাছিয়া লওয়া হয়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রাণিদিগের স্বতঃসঞ্চলনের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোন্ মূল শক্তিতে প্রাণীর হৃৎপিণ্ড তালে তালে কাঁপিতে থাকে, তাহার সন্ধান না পাইয়া প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাকে স্বতঃসঞ্চলন বলিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন।

প্রাণীর হৃৎস্পন্দনের ন্যায় উদ্ভিদেরও স্বতঃসঞ্চলন আছে। বনচাঁড়াল ও ভূমি-আম্‌লা (Biophytum) প্রভৃতি গাছের পাতা আপনা হইতেই যে উঠানামা করিয়া থাকে, তাহা ইহার উদাহরণ। সরস অবস্থায় উদ্ভিদ সকল যখন প্রচুর তাপালোকে উন্মুক্ত থাকে, প্রায় সেই সময়েই তাহাদের স্বতঃসঞ্চলন দেখা যায়। এই ব্যাপারের উপর নির্ভর করিয়া উদ্ভিদের রসপুষ্ট অবস্থা (Tonic Condition) ও তাপালোকপ্রাপ্তিকেই উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ স্বতঃসঞ্চলনের কারণ বলিয়া স্থির করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু রসপুষ্টি ও শীতাতপের

সহিত উহার প্রকৃত সম্বন্ধটা যে কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে কোনই সদুত্তর পাওয়া যাইত না।

ভাষার 'মার পেঁচ্' ও শব্দাড়ম্বর অজ্ঞতাকে ঢাকিয়া রাখিবার একটা প্রধান উপায়। প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বতঃসঞ্চলনের প্রকৃত রহস্য এ পর্য্যন্ত কেহই দেখিতে পান নাই, কাজেই ব্যাখ্যান দিবার ছলে জীবতত্ত্ববিদ্গণকে "রসপুষ্ট অবস্থা" "জীবনীশক্তি" প্রভৃতি কতকগুলি নিরর্থক শব্দ রচনা করিতে হইয়াছিল, এবং এই সকল শব্দের আড়ম্বরে ইহাঁরা কোন গতিকে শিক্ষার্থীদিগের চোখে ধূলি দিয়া নিজেদের অজ্ঞতাকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সাধারণ বৈজ্ঞানিকের ন্যায় ঐ সকল শব্দে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। পাতার উঠানামা বা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের ব্যাখ্যানের জন্য যে জীবনীশক্তি বা অপর কোনও অদ্ভুত শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না, আচার্য্য বসু মহাশয় তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তিনি আরো বুঝিয়াছিলেন, সমগ্র প্রকৃতিটাকে দুর্বোধ করিয়া রাখা কখনই বিধাতার ইচ্ছা নয়। যাহা অতি সহজ ও সুস্পষ্ট, তাহার সহিতই প্রকৃতির কারবার। সুতরাং সরল পথে সহজ বুদ্ধিতে অনুসন্ধান করিলেই প্রাকৃতিক রহস্য মাত্রেরই সমাধান সম্ভবপর। আচার্য্য বসু মহাশয় তাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের ন্যায় ধীরে ধীরে স্বতঃসঞ্চলনের মূলকারণ অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বড় বড় পণ্ডিতদিগের বড় বড় জটিল সিদ্ধান্ত তাঁহাকে বিপথগামী করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই বসু মহাশয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই, অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

আচার্য্য বসু মহাশয় উদ্ভিদের স্বতঃসঞ্চলন প্রসঙ্গে যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছেন, তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমে পৌনঃপুনিক সাড়ার (multiple response) বিষয়টা জানিয়া রাখা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধগুলিতে প্রত্যেক আঘাতে এক একটি করিয়া যে সাড়া পাওয়া যায়, তাহারি বিষয় আলোচনা করিয়াছি। ইহা ব্যতীত যে আর এক শ্রেণীর সাড়া আছে, এখনো তাহার কথা বলা হয় নাই। ইহাকেই আচার্য্য বসু মহাশয় পৌনঃপুনিক সাড়া বা multiple response নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই শ্রেণীর সাড়ার বিশেষত্ব এই যে, একবার আঘাত দিলে তাহাতে কেবলি একটি মাত্র সাড়া উৎপন্ন না হইয়া, অনেকগুলি সাড়া তালে তালে পর পর দেখা দিতে আরম্ভ করে।



১ম চিত্র।

উপরিস্থ প্রথম চিত্রখানি ভূমি-আম্লা গাছের পাতার পৌনঃপুনিক সাড়ার ছবি। দোল্নাকে দুলাইবার জন্য একটা টান্ দিলে, সেটি যেমন অনেকক্ষণ ধরিয়া তালে তালে এদিক্ ওদিক্ দুলিতে থাকে, এখানে ভূমি-আমলা গাছের পাতার নিকট একটি প্রবল আঘাত দেওয়াতে পাতাটিও সেই প্রকারে তালে তালে বুজিতে ও খুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। চিত্রে দন্তুর বক্ররেখাটির এক একটি দাঁত পাতার খোলা বোজা প্রকাশ করিতেছে। ভূমি-আমলা গাছ সংগ্রহ করিতে পারিলে, পাঠক নিজের হাতে এই পৌনঃপুনিক সাড়ার পরীক্ষা করিতে পারিবেন। ঐ গাছের একটি ডাঁটার আগায় বা গোড়ায় দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইয়া অল্পক্ষণের তাপ দিলে পরীক্ষক দেখিবেন, সেই তাপপ্রাপ্ত অংশ হইতে পাতাগুলি ক্রমে গুটাইতে আরম্ভ করিতেছে, এবং এই প্রকার গুটানো শেষ হইলে, সেই তাপপ্রাপ্ত অংশ হইতে নূতন করিয়া এক গুটানো পালা আরম্ভ হইতেছে। গাছ ও পাতা সতেজ হইলে একবার

তাপপ্রয়োগ করিয়া পরীক্ষক পূর্ব্বোক্ত প্রকারের পাঁচ ছয় বার প্রত্যক্ষ সাড়া দেখিতে পাইবেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এক মাত্র আঘাতে উদ্ভিদে যে এই পৌনঃপুনিক সাড়া দেখা যায়, তাহা কি কেবল ভূমি-আম্‌লা প্রভৃতি গাছেরই বিশেষত্ব,—না উদ্ভিদসাধারণেরই তাহা একটি বিশেষ ধর্ম্ম? আচার্য্য বসু মহাশয় এই প্রশ্নের সুমীমাংসা করিয়াছেন; এবং সহজ পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন, সুস্থ ও সবল উদ্ভিদ মাত্রেরই দেহে আঘাত দিলে আহত স্থান হইতে পৌনঃপুনিক সাড়া আপনা হইতেই তালে তালে চলিতে আরম্ভ করে। বন-চাঁড়াল ও ভূমি-আম্‌লা প্রভৃতি গাছের পত্রমূলস্থ যন্ত্র (Pulvinus) ঐ সকল সাড়াকে প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারে। অপর গাছের পাতা উঠানামার ঐ সুব্যবস্থা নাই, কাজেই সে গুলিতে আমরা প্রত্যক্ষ সাড়া দেখিতে পাই না। এই সকল স্থলে বৈদ্যুতিক প্রথায় সাড়া-লিপি অঙ্কন করিলে, পৌনঃপুনিক সাড়ার অস্তিত্ব বেশ বুঝা যায়। Pulvinus-হীন নানা গাছে আঘাত দিয়া আচার্য্য বসু মহাশয় তাহাদের প্রত্যেকটিতেই পৌনঃপুনিক বৈদ্যুতিক সাড়া দেখিতে পাইয়াছেন।

ভূমি-আম্‌লার পাতা বা ডালে সাধারণতঃ স্বতঃসঞ্চলনের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু কোন একটি সুস্থ ও সবল ভূমি-আম্‌লা গাছ বাছিয়া লইয়া, তাহার কোন অংশে আঘাত দিলে, সেটি যখন পুনঃ পুনঃ পাতা উঠাইয়া নামাইয়া সাড়া দিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাকে বনচাঁড়ালের ন্যায় স্বতঃসঞ্চলনক্ষম উদ্ভিদ বলিয়াই মনে হয়। কোন প্রকার আঘাতে পৌনঃপুনিক সাড়া আরম্ভ হইলে, সেগুলি বৃক্ষের স্বতঃসঞ্চলন কি পৌনঃপুনিক সাড়া তাহা বাস্তবিকই ঠিক করা যায় না। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া স্বতঃসঞ্চলন ও পৌনঃপুনিক সাড়ার মধ্যে একটা কিছু ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে বলিয়া, আচার্য্য বসু মহাশয় কল্পনা করিয়াছিলেন।

কল্পনা জিনিসটা কেবল কবিজনসুলভ গুণ নয়। যে কোন প্রকার স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার সফলতা দিবার পক্ষে ইহা একটি মহা অস্ত্র। কল্পনাসম্পদহীন কোন ব্যক্তিই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হইতে পারেন না। আচার্য্য বসু মহাশয় পূর্ব্বোক্ত কল্পনায় চালিত হইয়া, নানা প্রকার বৃক্ষে নানা পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং শেষে পৌনঃপুনিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলনের অভেদ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভূমি-আম্‌লা গাছে আমরা কেবল পৌনঃপুনিক সাড়াই দেখিতে পাই। আচার্য্য বসু মহাশয় সেই ভূমি-আম্‌লাকেই সুকৌশলে স্বতঃসঞ্চলনক্ষম উদ্ভিদে পরিণত করিয়া সকলকে চমকিত করিয়াছিলেন, এবং বনচাঁড়ালের স্বতঃসঞ্চালন লোপ করাইয়া তাহাতে পৌনঃপুনিক সাড়ার অস্তিত্ব দেখাইয়াছিলেন। এই পরীক্ষাগুলির প্রত্যেকটিই এত সুন্দর যে, স্বতঃসঞ্চলন ও পৌনঃপুনিক সাড়ার অভেদে এখন আর কোনক্রমেই অবিশ্বাস করা চলে না।

পৌনঃপুনিক সাড়া বা স্বতঃসঞ্চলনের উৎপত্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আচার্য্য বসু মহাশয় কি বলেন, এখন দেখা যাউক। এই সাড়া লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, গাছ যখন বেশ সবল ও সুস্থ অবস্থায় প্রচুর তাপালোকে উন্মুক্ত থাকে, প্রায় তখনই তাহার পৌনঃপুনিক সাড়ার উৎপত্তি হয়। ক্ষীণ ও নিস্তেজ গাছ লইয়া পরীক্ষা কর, তাহাতে কেবল সাধারণ সাড়াই দেখা যাইবে,—পৌনঃপুনিক সাড়া দেখিতে পাইবে না। প্রাচীন জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা জানিতেন, এবং সেই জন্যই গাছের "Tonic Condition" বা সতেজ ও সরস অবস্থাই স্বতঃসঞ্চলন উৎপন্ন করায় বলিয়া তাঁহারা স্থির করিয়া গেছেন। কিন্তু "Tonic Condition" ও স্বতঃসঞ্চলনের মধ্যে সম্বন্ধটা যে কি, তাহা তাঁহারা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। কোন প্রকার গাঢ় তৈলে ইস্পাতের স্প্রিং ডুবাইয়া রাখিয়া, তাহাতে মৃদু আঘাত দিলে, সেটি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া প্রত্যেক আঘাতেই এক একবার সাড়া দিতে আরম্ভ করে। আঘাতের মাত্রা খুব বাড়াইয়া দাও, দেখিবে প্রবল আঘাতে স্প্রিং একাধিক বার আন্দোলিত হইয়া সাড়া দিতেছে। আচার্য্য বসু মহাশয় স্বতঃসঞ্চলনকে এই আন্দোলনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এক প্রবল আঘাতে প্রযুক্ত শক্তি, যেমন স্প্রিংএ সঞ্চিত থাকিয়া বারে বারে সেটিকে কাঁপাইতে থাকে, বাহিরের তাপালোক ইত্যাদি হইতে আগত শক্তি উদ্ভিদের দেহের ভিতরে সঞ্চিত হইয়া, তাহাকে অবিকল সেই প্রকারেই কাঁপায়। স্প্রিং যেমন প্রবল আঘাতে প্রাপ্ত শক্তিটাকে একবার কাঁপিয়া

নিঃশেষে ছাড়িতে পারে না, উদ্ভিদও সেই প্রকার বাহিরের তাপালোকের শক্তি পাইলেই, তাহাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগাইতে পারে না। বাহিরের শক্তি উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং সেই সঞ্চয় একটা নির্দ্দিষ্ট সীমায় পৌঁছিলে, উদ্ভিদ তাহা দ্বারা কাজ করাইতে পারে। আচার্য্য বসু মহাশয়ের মতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সঞ্চিত শক্তির কার্য্যই স্বতঃসঞ্চলন বা পৌনঃপুনিক সাড়া।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ শক্তিই যখন পৌনঃপুনিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলনের মূল কারণ, তবে পৌনঃপুনিক সাড়া সুরু করাইবার জন্য প্রবল আঘাতের আবশ্যকতা কি? আচার্য্য বসু মহাশয় ইহার উত্তরে বলিয়াছেন,—গাছের অন্তর্নিহিত শক্তি যখন স্বতঃ-স্বঞ্চলন আরম্ভ করিবার সীমার নিম্নে থাকে তখন তাহার পাতার কোন প্রকার নড়াচড়া দেখা যায় না। এই অবস্থায় উহাতে কোন প্রকার প্রবল আঘাত দিলে, সেই আঘাতের উত্তেজনাটা গাছের আহত অংশে সঞ্চিত হইয়া তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে পূর্ণতা প্রদান করে। কাজেই তখন সেই আহত অংশ হইতে একাধিক সাড়া উৎপন্ন হইতে থাকে, এবং যে পর্য্যন্ত এই নবাগত শক্তি সম্পূর্ণ ব্যয়িত না হয়, পাতার উঠানামা অবিরাম চলিতে থাকে।

বনচাঁড়াল প্রভৃতি গাছের পাতা যখন আপনা আপনি উঠানামা করিতে আরম্ভ করে, তাহাতে তখন কোন প্রকার আঘাত দেওয়ার আবশ্যক হয় না। আচার্য্য বসু মহাশয় নানা পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ দেখাইয়া, এই ব্যাপারের সুন্দর ব্যাখ্যান দিয়াছেন। ইঁহার মতে, বাহিরের তাপ আলোক ইত্যাদি হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া গাছ যখন সতেজ অবস্থায় থাকে, এবং এই সময়ে যখন তাহার উপর আবার নূতন শক্তি আসিয়া সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে, তখন গাছটি এই সমবেত প্রচুর শক্তি ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া, ডাল পাতা ইত্যাদি নাড়িয়া চাড়িয়া সাড়া দিতে আরম্ভ করে। আচার্য্য বসু মহাশয় একটা উদাহরণ দিয়া এই শক্তি সঞ্চয় ও তাহার ক্রমিক ব্যয়ের বিষয়টা বুঝাইয়া-ছেন। মনে কর একটা বড় টবে একটি ছোট নল দিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় জল সঞ্চিত হইতেছে। জল বাহির হইবার জন্য টবের নীচে আর একটি রবারের নল সংলগ্ন আছে, এবং ইহার মুখ একটি স্প্রিঙ্‌ দিয়া অবরুদ্ধ আছে। টবে জল জমিতে আরম্ভ করিলে, তাহার নীচেকার সেই রবারের নলের স্প্রিঙ্‌ চাপ পাইতে আরম্ভ করিবে, এবং এই চাপের মাত্রা প্রচুর হইলে স্প্রিঙ্‌ খুলিয়া যায় ও নলের মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে জল বাহির হইতে থাকে। টবের উপরে জল অবিচ্ছিন্ন ধারায় সমভাবে পড়া সত্বেও তাহার নীচেকার নল ঝলকে ঝলকে জল বাহির হওয়াকে, আচার্য্য বসু মহাশয় উদ্ভিদের তালে তালে সঞ্চলনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বাহিরের তাপালোকাদি হইতে বৃক্ষ সকল যে শক্তি আহরণ করে, তাহা অবিচ্ছিন্ন ধারাতেই আসে, কিন্তু তাহার কাজ পূর্ব্ব উদাহৃত টবস্থিত জলের বহির্গমনের ন্যায় তালে তালে চলিতে থাকে।

কোন উচ্চস্থানের চারিধারে বাঁধ দিয়া, জল ধরিয়া রাখিলে, জল বাঁধা থাকিয়া যায়। কারণ, চারিধারের বাঁধের প্রাচীর জলকে পলাইতে দেয় না। এক ধারের বাঁধ কাটিয়া দাও, জল বন্ধনমুক্ত হইয়া চলিতে আরম্ভ করিবে, এবং সেই বাঁধবেষ্টিত স্থান জলশূন্য হইয়া পড়িবে। যে কোন শক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, তাহার কার্য্য ঠিক্ জলেরই মত দেখা যায়। বন্ধনমুক্ত হইলে, তাহা নিঃশেষে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে! এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বাহিরের তাপ ও আলোক প্রভৃতির যে শক্তি বৃক্ষের অভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকে, তাহা স্বতঃসঞ্চলনাদিতে ব্যয়িত হয় সত্য, কিন্তু সেই সঞ্চলনের যে তাল ও শৃঙ্খলা তাহা কোথা হইতে আসে? আবদ্ধ শক্তি মুক্ত হইলে বিশৃঙ্খলভাবে ডালপাতা নাড়াইয়া চাড়াইয়া তাহার ব্যয় হওয়ারই ত সম্ভাবনা? আচার্য্য বসু মহাশয় ইহার উত্তরে বলেন, গাছের অভ্যন্তরীন শক্তি যখন প্রচুর হইয়া পাতাকে নামাইয়া দেয়, তখন এই উত্তেজনায় বৃক্ষের অণু সকল বিকৃত ও অসাড় হইয়া পড়ে। এজন্য চারিদিকের অণুর ভিতর দিয়া নূতন শক্তি পাতার দিকে আসিবার পথ পায় না। কাজেই পাতাটি একবার নড়িয়াই স্থির হইয়া পড়ে। তার পর কালক্রমে বিকৃত অণুগুলি প্রকৃতস্থ হইলে, সেই আবদ্ধ শক্তি চলিবার জন্য আবার পথ পায়, এবং আর একবার পাতাটিকে নাড়াইয়া দিয়া, অণুগুলিকে আবার নূতন করিয়া বিকৃত করে। কাজেই দেখা যাইতেছে,

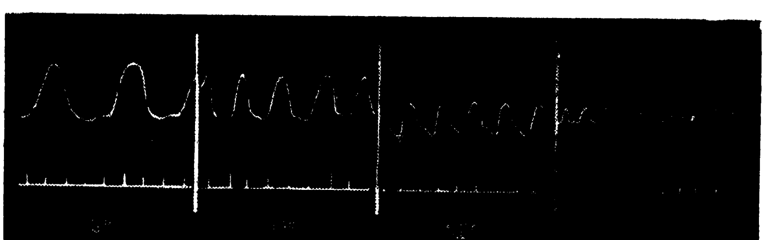


২য় চিত্র।

গাছের ভিতরকার শক্তি যতই অধিক হউক না কেন, তাহা কেবল গাছের সুস্থ অবস্থাতেই কাজ করিতে সুযোগ পায়। কিন্তু গাছের এই আণবিক স্বাস্থ্য সকল সময় অক্ষুণ্ণ থাকে না,—প্রত্যেক সাড়ার পরই আণবিক বিকৃতি উপস্থিত হয়; এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে শক্তির প্রবাহ রোধ পাইয়া যায়। কাজেই ইহাতে পাতার উঠানামা প্রভৃতি স্বতঃসঞ্চলন বিচ্ছিন্নরূপে তালে তালে চলিতে থাকে।

আচার্য্য বসু মহাশয়ের স্বতঃসঞ্চলন সম্বন্ধীয় আবিষ্কার এখানেই শেষ হয় নাই। প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বতঃসঞ্চলনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে তিনি এত মিল দেখাইয়াছেন যে, তাহা শুনিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। উপরিস্থ দ্বিতীয় চিত্র খানি, বনচাঁড়াল গাছের স্বতঃসঞ্চলনের চিত্র। তাপের মাত্রা ৩০ ডিগ্রি হইতে বাড়াইয়া ক্রমে ৩৯ ডিগ্রিতে আনায়, উক্ত গাছের পাতার আন্দোলনের মাত্রা কেমন কমিয়া আসে, চিত্র দেখিলে তাহা বুঝা যায়। তৃতীয় চিত্রখানি ভেকের হৃৎস্পন্দনের ছবি। ৩ ডিগ্রি হইতে ক্রমে ৩৩ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ বৃদ্ধি করায়, হৃদয়ের স্পন্দন মাত্রা কেমন কমিয়া আসিতেছে, পাঠক চিত্রখানির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রাণীর হৃৎস্পন্দনের সহিত উদ্ভিদের স্বতঃসঞ্চলনের এই অত্যাশ্চর্য্য ঐক্য প্রকৃতই বিস্ময়কর।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ হৃৎপিণ্ডের তালে তালে স্পন্দনের যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নিরপেক্ষ ভাবে সেগুলির আলোচনা করিলে, প্রত্যেকেরই অনেক গলদ বাহির হইয়া পড়ে। আচার্য্য বসু মহাশয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বতঃ স্পন্দনের ভিতরকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম একতা দেখাইয়া, উভয়েরই স্পন্দন একই প্রকারের হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলিয়াছেন। প্রাণীর হৃৎস্পন্দনের সদ্ব্যাখ্যান, উদ্ভিদের হৃৎপিণ্ডের অর্থাৎ তাহার পত্রমূলের (pulvinus) কার্য্য দেখিয়াই জানা যাইবে বলিয়া আশা দিতেছেন।



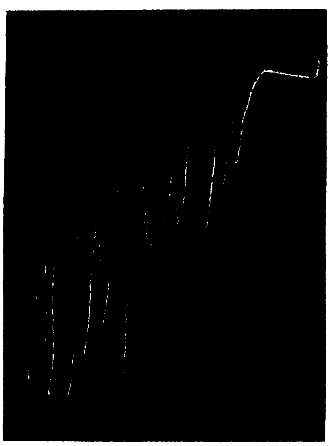
৩য় চিত্র।



৪র্থ চিত্র

এসিড প্রয়োগ করিলে হৃৎপিণ্ড অতিরিক্ত শিথিল হইয়া পড়ে এবং ক্ষার পদার্থের সংস্পর্শে সেটি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ইহার ফলে এই দুই পদার্থের দ্বারাই হৃৎস্পন্দন রোধপ্রাপ্ত হয়। ৪র্থ চিত্রটি ক্ষারপ্রয়োগজাত হৃৎস্পন্দনের ক্রমিক অবরোধের (stytolic arrest of heart-beats) চিত্র। সুস্থ হৃৎপিণ্ড কেমন পূর্ণমাত্রায় স্পান্দত হইতেছে, তাহা চিত্রের দক্ষিণপার্শ্বস্থ "a" চিহ্নিত অংশে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে। তার পর শর-চিহ্নিত অবস্থায় ক্ষার প্রয়োগ করায় স্পন্দন কি প্রকারে মৃদুতর হইয়া প্রায় লোপ পাইতে চলিয়াছে, তাহা পাঠক "c" চিহ্নিত অংশে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় বনচাঁড়ালের হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ তাহার পত্রমূলে এসিড ও ক্ষার প্রয়োগ করিয়া স্পন্দনের ঐ প্রকার ক্রমিক লোপ দেখা গিয়াছে।

পঞ্চম চিত্রটি বনচাঁড়াল গাছের পাতার স্পন্দন চিত্র। পাতাটি সুস্থ অবস্থায় কিপ্রকার নিয়মিত উঠানামা করিতেছিল, চিত্রের বাম প্রান্তে তাহা অঙ্কিত রহিয়াছে। তার পর শর-চিহ্নিত অবস্থায় ক্ষার প্রয়োগের পর, সেটির স্পন্দন যে কি প্রকারে লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, চিত্রের পরবর্ত্তী অংশে পাঠক তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন।



৫ম চিত্র।

হৃৎস্পন্দনের সহিত, উদ্ভিদের স্বতঃসঞ্চলনের একতা দেখাইয়াই আচার্য্য বসু মহাশয় ক্ষান্ত হন নাই। ইহা ছাড়া প্রাণী ও উদ্ভিদে দেহের ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও কত কাজের ভিতরে যে, তিনি একতা দেখাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা চলে না। সজীব নির্জীব এবং প্রাণী উদ্ভিদ সকলই যে একই অখণ্ড নিয়মের শাসনে যন্ত্রবৎ চলিতেছে, আচার্য্য বসু মহাশয়ের এই সকল আবিষ্কার দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

চিত্র।

বর্ত্তমান সংখ্যার স্বতন্ত্র মুদ্রিত চারিখানি ছবির মধ্যে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের মূর্ত্তি একখানি। তাঁহার সম্বন্ধে "ঢাকা প্রকাশে" প্রকাশিত একটি গল্প বড় সুন্দর। তিনি বাল্যকালে হার্ডিঞ্জ স্কুল নামক বঙ্গবিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলেন।

"একবার তিনি কার্য্যোপলক্ষে ময়মনসিংহ সহরে উপস্থিত হইয়াছিলেন; জন্মভূমি বলিয়া তথাকার সকলই তাঁহার অতীব প্রিয় ছিল। তিনি ঐ সময়ে হার্ডিঞ্জস্কুল দেখিতে গমন করেন। স্কুলের এ শ্রেণী ও শ্রেণী ঘুরিয়া আনন্দমোহন যখন মধ্যস্থিত কামরায় শিক্ষকগণের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, তখন একখানা চেয়ারে বসিবার জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা হইলে তিনি অম্লানবদনে উত্তর দিয়াছিলেন; "ইহা আমার শিক্ষকের আসন;" কিছুতেই তিনি তাহাতে উপবেশন করিলেন না; কাজেই সকলে আনন্দমোহনের উত্তর শুনিয়া নীরব হইয়া গেলেন। এতদপেক্ষা উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক আর কি হইতে পারে, তাহা আমরা জানি না। এ ব্যাপারে আনন্দমোহনের যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, বঙ্গের শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ে যদি তাহা প্রসৃত হইত, তবে সত্য সত্যই ভারত দেবনিকেতনে পরিণত হইত।"

সীতা ও রামের রাজ্যাভিষেক নামক চিত্রটি সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতার মন্তব্য অন্যত্র প্রকাশিত হইল। রবিবর্ম্মার চিত্রটি, যশোদা শিশু কৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয় পাইয়াছেন, এতদ্বিষয়ক। এই চিত্রে শিশুদ্বয়ের মূর্ত্তি অতি সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ধুরন্ধরের ছবিটির বিষয় বন্দীকৃতা মন্থরা। এই ছবিতে শিল্পী বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত গল্পটির অনুসরণ করেন নাই। মহারাষ্ট্রদেশপ্রচলিত গল্পের অনুসরণ করিয়াছেন। তাহাতে এইরূপ বর্ণিত আছে যে মন্থরা যখন ভরতের আদেশে শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সে বড় ভয় পাইয়াছিল। শম্বক নামক একব্যক্তি দাসীবেশে মন্থরাকে খাবার দিতে গিয়া তাহাকে কারা ও বন্ধন মুক্ত করে। এই গল্পে মন্থরা কুব্জা ছিল বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। এই চিত্র ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সিমলা চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল, এবং তথাকার শিল্পসমিতির পুরস্কার পাইয়াছিল। পাইয়োনীয়ার এবং টাইম্‌স্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া নামক কাগজ দুটিতে ইহা প্রশংসিত হইয়াছিল। মন্থরার মুখের ভীতিব্যঞ্জক ভাব অতিশয় স্বাভাবিক।

প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা।

কাশীস্থ বঙ্গসাহিত্য সমাজ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে যে পত্রখানি প্রেরিত হইয়াছিল, প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা প্রসঙ্গে জ্যৈষ্ঠসংখ্যার প্রবাসীতে তাহা প্রকাশিত হওয়ায় সমাজ সম্পাদকমহোদয়ের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিল। তাহার পর উক্ত সমাজের উন্নতির জন্য যে যে চেষ্টা হইয়াছে, সাধারণের গোচরার্থ, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে। সুহৃৎসমিতির কতিপয় সভ্যের এবং শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী বি, এ, ও নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের



শিশু কৃষ্ণের মুখে যশোদার বিশ্বরূপ দর্শন

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

বিশেষ চেষ্টায় উক্ত সমাজের সভ্য আপাততঃ ১২৫ সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে। সুহৃৎসমিতির সাপ্তাহিক আলোচনায় (debate) যুবক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছে বলিয়াই অনুমিত হয়। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক স্বকীয় মূল্যবান সময় অকাতরে দান করিয়া, প্রথম হইতে বিনাবেতনে উক্ত সমাজের পুস্তকাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ও সামাজিকগণের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া সমাজকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আপাততঃ প্রচলিত সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া ইহার অঙ্গীভূত একটি পাঠাগার স্থাপন করিবার সংকল্প চলিতেছে। আর্থিক অবস্থাগতিকে সম্পাদক মহাশয়দিগের অনুগ্রহলাভ ব্যতীত গত্যন্তর নাই দেখিয়া, তাঁহাদিগের সাহায্যভিক্ষার্থ পুনরায় প্রবাসীপত্রিকার শরণাপন্ন হইতে হইল, আশা করি মাতৃসেবক সম্পাদক মহাশয় পূর্ব্বের ন্যায় উদারতা প্রদর্শন পূর্ব্বক উপস্থিত পত্রখানিও প্রবাসীতে মুদ্রিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যসমাজের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি অব্যাহত রাখিবেন।

শ্রাবণ মাসের শেষ পর্য্যন্ত দান স্বরূপ যে যে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিম্নে তাহা স্বীকৃত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত বাবু মোক্ষদাদাস মিত্র মহাশয় (বারাণসী)	৮৲ টাকা	
,, বটুকপ্রসাদ খত্রী	৪৲	,,
,, মাণিকচন্দ্র মল্লিক	১৲	,,
,, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	১৲	,,
,, সুহৃৎ সমিতি	৩৯ পুস্তক	
,, রামেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী	১৭	,, *
,, কবিরাজ হরিদাস রায়	১৫	,,
,, ডাক্তার সতীশচন্দ্র চৌধুরী	১২	,,
,, কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১১	,,
,, চিন্তামণি মুখোপাধ্যায়	৩	,,
,, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়	৩	,,
,, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১	,,
,, অভয়তারণ ভট্টাচার্য্য	১	,,
,, চন্দ্রধর কাব্যসাংখ্যতীর্থ	১	,,
,, শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য	১	,,
,, ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১	,,
,, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১	,,
,, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ	১	,,
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বোলপুর)	১	,,
,, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা)	১	,,

* এতদ্ব্যতীত ৫০ অন্যান্য ভাষার পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে।

ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক, বঙ্গসাহিত্যসমাজ, কাশী।

"প্রবুদ্ধ-ভারত" নামক ইংরাজী মাসিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্বরূপানন্দ স্বামী মহোদয়ের দেহত্যাগে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার সচিত্র জীবনচরিত প্রবাসীতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই জন্য সম্প্রতি অধিক কিছু লেখা হইল না।

সান্‌ফ্রান্সিস্কো হইতে প্রাপ্ত একটি পত্রের কোন কোন অংশ নীচে প্রকাশিত হইল।

সবিনয় নিবেদন,

অগ্নিকাণ্ডের পরে বিশেষ ব্যস্ত থাকায়, অঙ্গীকার মত পত্র ও কৃষি-কার্য্য-কলাপ-প্রদর্শনী ছবি পাঠাইতে পারি নাই। আমি ও অন্যান্য ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের নিকট থাকি। উহা "সান্ ফ্রান্সিস্কো বে" র অপর প্রান্তে। কিন্তু আমার চিঠিপত্রাদি উক্ত ঠিকানায় 'বেদান্ত সমিতি'তে আসিয়া থাকে। উক্ত সমিতি নূতন গৃহ প্রস্তুত করিয়াছে। সহরের দূরে অবস্থান হেতু অগ্নিকাণ্ড হইতে রক্ষা পাইয়াছে। স্বামী ত্রিগুণাতীত উক্ত স্থানে থাকেন। নূতন ছেলেরা পঁহুছিলেই আমাকে খবর দেন। বেদান্ত সমিতির নূতন গৃহ নির্ম্মাণে আমাদের অনেক সুবিধা হইয়াছে। ছেলেরা আসিলেই স্বামীর নিকট পৌছে এবং তাঁহার অভ্যর্থনায় বিশেষ প্রীতিলাভ করে।

১৮ই এপ্রেল ভূমিকম্পের পর আমরা ৮ টার সময় কলেজে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম সান্ ফ্রান্সিস্কো অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হইতেছে। তথায় সামরিক আইন (martial-law) প্রচার জন্য আমরা কেহ যাইতে পারিলাম না। অনেক ভারতবাসী ও বন্ধু বান্ধব জন্য সমস্ত দিন উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিতে হয়। সন্ধ্যার সময় গবর্ণর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডেটদিগকে সহরে পাহারা দিবার জন্য আদেশ করেন। ছাত্রগণের উৎসাহ দেখিয়া বাস্তবিক স্তম্ভিত হইতে হইয়াছিল। যে যেখানে ছিল সকলে বন্দুক ও পুরাতন সৈনিক বেশ (uniform) লইয়া তৈয়ার হইল। চীন, ফিলিপিনো ও হিন্দু ছাত্র সকলেই সৈনিক বেশে স্পেশ্যাল ট্রেনে করিয়া সহরে উপস্থিত হইয়া যে ভয়ানক দৃশ্য দেখিল তাহা বর্ণনাতীত। ন্যাশন্যাল গার্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডেটগণ মত্ত অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে দাঁড়াইয়া দিন রাত্র পাহারা দিতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে ক্রমান্বয় ৪ দিন রাত্র পরে আমরা ফিরিয়া আসি এবং আসিয়া দেখি আমার ঘরটী সমুদয় ভারতবাসীতে ভরিয়া গিয়াছে। বিপদ সময়ে তাঁহারা আমার কাছে আসিয়াছেন দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম। এখানে শিখ, আফগান, পাঠান, পার্সী অনেক থাকেন। তাহাদের সকলেরই সহিত আমি সর্ব্বদাই দেখা শুনা করিতাম। শিখ, পাঠান প্রভৃতি ইঁহারা পূর্ব্বে হংকং ইংরাজের অধীনে সিপাহী ছিলেন। উপস্থিত এখানে আসিয়া নানা প্রকার কার্য্যাদি করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। প্রতি রবিবারে ইঁহাদের সহিত সাক্ষাতাদি হয় ও ভারতবর্ষ হইতে সংবাদপত্র লইয়া দেশের কথা আলোচনা হয়। অধুনা একটী ক্লাবের মত করা হইয়াছে। তাহাতে তাঁহারা সর্ব্বদাই দেশের কথা আলোচনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের নিকট খবর লইয়া কাহাকেও চামড়া কষ করিবার কারখানা, লোহা ঢালাইয়ের কারখানা প্রভৃতি স্থানে কার্য্য যোগাড় করিয়া দিই। ইহাতে তাহারা কিছু শিখিয়া যাইতে পারে।

জানি না, বঙ্গীয় বিজ্ঞান শিল্পোন্নতি সমিতির সহিত আপনার কোন সংস্রব আছে কি না। কারণ তাঁহারা যদি আমেরিকাতে চাষ শিখিবার জন্য ছেলে পাঠান, তাহা হইলে ভারতবর্ষের শস্যাদি যে প্রদেশে উৎপন্ন হয়, সেইখানে তাহাদিগকে পাঠাইলে ভাল হয়। নচেৎ কলেজ নাম শুনিয়া পাঠাইলে আশানুরূপ ফল পাইবেন না। প্রত্যেক প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য খ্যাত। প্রাচ্য প্রদেশ সকল যথা,—নিউইয়ক, ইলিনইস্, প্রভৃতিতে কলকারখানা, বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষা করা সুবিধাজনক। কৃষিবিষয়ক শিক্ষা পশ্চিম প্রদেশ সকল,—কালিফর্ণিয়া, ওরিগন প্রভৃতিতে ভাল হয়। লুইসিয়ানা, ভার্জ্জিনিয়া, জর্জ্জিয়া প্রভৃতি প্রদেশে ভারতীয় শস্যাদির অনেক চাষ হইয়া থাকে। সুতরাং এ সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া পাঠাইলে ভাল হয়।

বড়োদার রাজা সয়াজি রাও গায়কবাড় এখানে আসেন এবং আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত ছাত্রবৃন্দকে বিশেষ উৎসাহিত করেন, এবং দুই জন পাঞ্জাবী ছাত্রের আবেদনে তাহাদিগকে কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিবার জন্য রাহাখরচ তিন শত ডলার বৃত্তি দিয়া ওরিগন হইতে পাঠাইয়া দেন।

বিনীত
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় উদ্ভিদাবলী।

২৬। কাউ (Olea cuspidata; Natural order, oleaceæ.)

এই গাছ সিন্ধু, আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান প্রদেশে ও হিমালয় পর্ব্বতে জন্মে। ইহাকে ঐ সব প্রদেশে কাউ বলে।

ইহার ফল হইতে তৈল পাওয়া যায়। ঐ তৈল বিলাতী জল্পাই তৈলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

বাত ও চর্ম্ম রোগেও ঐ তৈল উপকারী। ইহার পাতা ও ছাল বড় কটু ও কষায়। জ্বর ও দুর্ব্বলতায় তাহা উপকারী।

ইহার ফল আহারার্থ ব্যবহৃত হয়। ছাগলে ইহার পাতা খায়।

ইহার কাঠ হইতে অনেক রকম জিনিস প্রস্তুত হয়।

২৭। পীলু (Salvadora oleoides; Natural order, Salvadoraceæ.)

সিন্ধু, পঞ্জাব ও রাজপুতানা প্রদেশে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। হিন্দী ভাষায় ইহাকে পীলু বলে।

ইহার ফল সুস্বাদ বলিয়া লোকে উহা প্রচুর পরিমাণে খায়।

ইহার বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়। ঐ তৈল ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়।

ইহার পাতা রেচক বলিয়া ঘোড়াকে খাওয়ান হয়। এই পাতা উটের ভক্ষ্য।

ইহার কাঠ গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়।

২৮। ঢেঙ্গন বা দহিপলাশ (Cordia Macleodii; Natural order Boragineæ.)

এই গাছ মধ্যভারত, কোঙ্কণ ও বেলগাঁও প্রদেশে জন্মে। হিন্দীতে ইহাকে ঢেঙ্গন ও দহিপলাশ এবং সাঁওতালী ভাষায় জুগিয়া বলে।

রাজপুতানা প্রদেশে এই গাছ হইতে একরকম গোঁদ পাওয়া যায়।

সাওতালেরা ইহার ছাল ঘাবা রোগে ব্যবহার করে।



২৬। কাউ (Olea cuspidata; Natural order, oleaceæ.)।



২৭। পীলু (Salvadora oleoides; Natural order, Salvadoraceæ.)।



২৮। ঢেঁজন বা দহিপলাশ (Cordia Macleodii; Natural order Boragineæ.)।



২৯। কোশী (*Briedelia retusa.* Natural order Euphorbiaceæ.)

এই গাছ ভারতের নানা স্থানে জন্মায়। সাঁওতালেরা ইহাকে কদ্রূপল ও ওড়িয়ারা কোশী বলে।

এই গাছের ছাল চামড়ার কষ ও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহা বাতরোগে ব্যবহৃত হয়।

ইহার ফল সুস্বাদ বলিয়া ভক্ষিত হয়। ইহার পাতা গরুকে খাইতে দেওয়া হয়।

ইহার কাঠ গৃহ নির্ম্মাণ, গরুর-গাড়ি ও কৃষিকার্য্যের জিনিস পত্র তৈয়ারি করিতে ব্যবহৃত হয়।

[ক্রমশঃ

২৯। কোশী (*Briedelia retusa.* Natural order Euphorbiaceæ.)।

ইহার কাঠ অত্যন্ত উপকারী। ওয়াট সাহেব বলেনঃ—

It is light brown. * * very hard, strong, tough and elastic; seasons well and works easily. It is used for furniture, picture-frames, and other ornamental work; also for fishing rods, which are said to be excellent. *It deserves to be better known and more used.* The Santals value the timber for making bullock yokes.

অর্থাৎ ইহা খুব শক্ত, চিমড় ও স্থিতিস্থাপক, বেশ পাকা হয় ও সহজে গঠন করা যায়। ইহা আসবাব, ছবির ফ্রেম ও অন্যান্য সাজগোজের কাজে ব্যবহৃত হয়; মাছ ধরিবার উত্তম ছিপও ইহা হইতে হয়। ইহা আরও বিস্তৃতরূপে পরিজ্ঞাত ও ব্যবহৃত হইবার যোগ্য। সাঁওতালেরা বলদের কাঁধের জোয়াল করিবার জন্য এই কাঠের আদর করে।

স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু।

২০শে আগষ্ট সোমবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় ভারত আকাশের উজ্জ্বল তারকা আনন্দমোহন বসু চিরদিনের মত অস্ত গিয়াছেন। সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া জননী জন্মভূমি মর্ম্মে মর্ম্মে রোদন করিয়াছেন। জননীর সেবাব্রতে দীক্ষিত যে কয়টী সুপুত্র তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, তন্মধ্যে প্রীতিভাজন প্রিয়দর্শন আনন্দমোহন অকালে বিদায় লইলেন। যদিও একবৎসরের অধিক কাল তিনি ভগ্নদেহে নিশ্চেষ্ট ভাবে রোগশয্যায় শয়ান ছিলেন, তথাপি তাঁহার প্রভাব, তাঁহার পবিত্র মুখচ্ছবি কত প্রাণে কত আশা কত উৎসাহের সঞ্চার করিত। সেই শ্রদ্ধাবিনয়ে আনত

প্রতিভাউদ্দীপ্ত মনোরম মুখচ্ছবি ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে। পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিলাইয়া গিয়াছে। আনন্দমোহন বসুর পার্থিব দেহ আর নাই। আছে তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি, আছে তাঁহার দেবচরিত্র, আছে তাঁহার অমৃত সৌরভ। তিনি আমাদিগের জাতীয় সম্পত্তি। তাঁহার কীর্ত্তিকথা বিবৃত করা আমাদিগের পরম গৌরব।

১৮৪৭ সালে এই আগষ্ট মাসে ময়মনসিংহের অন্তর্গত জয়সিদ্ধি গ্রামে আনন্দমোহন বসু ভূমিষ্ঠ হন। তিনি স্বর্গীয় পদ্মলোচন বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার জন্মসময়ে তদীয় পিতা উচ্চস্থানে কোন রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। বঙ্গের সহস্র সহস্র বালকের শৈশবশিক্ষা যেরূপে সম্পন্ন হয় আনন্দমোহনেরও তাহাই হইয়াছিল। প্রথমে বাঙ্গালা স্কুলে পড়িয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। তৎপরে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিলাভ করেন। এফ, এ, এবং বি, এ, পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিলেন। গণিতে এম, এ, পরীক্ষা দিলেন, তাহাতেও তিনি সর্ব্বাগ্রগণ্য হইলেন। উপাধি বিতরণের সভায় প্রসঙ্গক্রমে বক্তৃতার সময় ভাইস-চেনসেলার বলিয়াছিলেন, যে তাঁহার বিশ্বাস, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র তাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে গণিতের প্রশ্নের উত্তর লিখিতে পারে না। ইহা কি তৎকালীন ছাত্রের পক্ষে কম গৌরব? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত এখানেই তাঁহার সম্বন্ধচ্ছেদ হইল না—তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লইয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ভূষণ আনন্দমোহন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের "রেঙ্গলার" উপাধি লাভ করিলেন। তৎপূর্ব্বে ভারতবাসী কেহ ঐ গৌরব লাভ করে নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এ ক্ষেত্রে ভারতবাসী আনন্দমোহনের পদানুসরণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডে ৪ বৎসর বাস করিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখানেই আনন্দমোহনের ছাত্রজীবনের অবসান হইল। তিনি বিচিত্র বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন। এতদিন প্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়া তিনি খ্যাত ছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার ক্ষমতা এবং মহত্ত্বের পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। কেবল ব্যারিষ্টার হইয়া অগাধ ধনসঞ্চয় করিয়া আজ যদি তিনি গতাসু হইতেন, তবে এ হাহাকার, এ জাতীয় আর্ত্তনাদ দেশের চতুর্দ্দিকে শ্রুত হইত না।

অর্থোপার্জ্জনের জন্য তিনি ব্যবহারজীবীর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। সে ক্ষেত্রেও তিনি সামান্য পারদর্শিতা দেখান নাই। তবে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারেন নাই সত্য—সে তাঁহার যোগ্যতার অভাব হেতু নহে। তাঁহার মহৎ জীবনের সফলতা ব্যবসায় ব্যপদেশে সার্থক হওয়া কদাপি সম্ভব ছিল না। তাঁহার উন্নত চরিত্র, মহৎ প্রকৃতি বিষয়ান্তরে আত্মপরিতৃপ্তি অন্বেষণ করিয়াছিল। সুতরাং প্রভূত অর্থাগম কিম্বা ব্যবসায়ের সুযশ তাঁহার মহৎ প্রকৃতিকে কখনই বিমুগ্ধ করিতে পারে নাই। নচেৎ প্রখরা বুদ্ধি, ওজস্বিনী বাগ্মিতা, অদ্ভুত গবেষণাশক্তি যাঁহার সহায়, তাঁহাকে পরাভূত করা সহজ ব্যাপার ছিল না।

শিক্ষা বিভাগে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিরোভূষণ আনন্দমোহন বসু মহাশয় শিক্ষাবিভাগে তাঁহার কার্য্যকরী শক্তির অল্প পরিচয় দেন নাই। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যরূপে সেনেটে এবং সিনডিকেটে অনেক সংস্কারের প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বর্ত্তমান প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষার যে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তাঁহার প্রস্তাবই প্রধান ভাবে গৃহীত হইয়াছে। এদেশে ভূ-বিদ্যা শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহার ফলেই তৎকালীন ডাইরেক্টর সার আলফ্রেড ক্রফট্ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভূ-বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গুণগ্রাহী লর্ড রিপণ তাঁহাকে শিক্ষা-কমিশনের ভারতীয় সভ্য নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। এই ত গেল শিক্ষা সম্বন্ধে আনন্দমোহন বসুর পরোক্ষ কীর্ত্তি—প্রত্যক্ষ কীর্ত্তি সিটি কলেজ, এবং বেথুন কলেজ। ১৮৭৯ সালে জানুয়ারী মাসে শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আনন্দমোহন বসু মহাশয় সিটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-

নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার প্রথম শিক্ষক, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ইহার প্রথম সম্পাদক, আনন্দমোহন বসু মহাশয় ইহার প্রধান পরিপোষক,—তিনি অর্থে সামর্থ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহার পশ্চাতে ছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার সংশ্রব ত্যাগ করিলেও আনন্দমোহন বসু মহাশয় আজীবন পশ্চাতে রহিলেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে আপনার সমুদায় কর্তৃত্ব সিটি কলেজের সকল ভার কতিপয় ট্রষ্টীর হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

বেথুন কলেজ।

আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের ইংলণ্ডে অবস্থান কালে বঙ্গমহিলাগণের উচ্চ শিক্ষার জন্য স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, ৺ দুর্গামোহন দাস মহাশয় প্রভৃতির উদ্যোগে কুমারী এক-রয়েডের তত্ত্বাবধানে "হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়" নামে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আনন্দমোহন বসু মহাশয় স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গনারীদিগের উচ্চশিক্ষার জন্য বালীগঞ্জে এক প্রশস্ত উদ্যানবাটিকায় "বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়" স্থাপন করেন। ইহার ব্যয়ভার এই উভয় মহাত্মা বহন করিতেন। কালক্রমে এই "বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়" বেথুন স্কুলের সহিত মিলিত হইয়া বেথুন স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া বেথুন কলেজের স্থাপনা হইল। তৎপূর্ব্বে বেথুন স্কুলের অবস্থা যাহা ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। নারীগণের উচ্চশিক্ষার জন্য আনন্দমোহন বসু মহাশয় যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য মহিলাগণ তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধা।

রাজনীতি ক্ষেত্রে।

বর্ত্তমান সময়ে সভ্যজগতে স্বদেশহিতৈষণা মানবের শ্রেষ্ঠতম বৃত্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ আজ স্বদেশপ্রেমিকের অভাব নাই; কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সমুদায় ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া মুষ্টিমেয় স্বদেশপ্রেমিক মিলিত না। সেই সুদূর অতীতে স্বদেশের সেবাকল্পে যে কতিপয় বঙ্গমাতার সুসন্তান বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে আনন্দমোহন একজন। ১৮৭৬ সালে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য "ভারত সভা"র প্রতিষ্ঠা হয়। তখন শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে আসিয়া কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন। সেই "ভারত সভা" অদ্যাপি জীবিত থাকিয়া দেশের সেবা করিতেছেন। মদ্যপানে দেশ রসাতলে যাইতেছে দেখিয়া যাঁহারা এ ঘোর দুর্গতির উচ্ছেদ মানসে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আনন্দমোহন অন্যতম। ইংলণ্ডের রাজসভায় ভারতবর্ষীয় রাজনীতির আন্দোলনের সূত্রপাত তাঁহা দ্বারাই হইয়াছিল, এ কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাইটনে তিনি ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া ইংলণ্ডবাসীদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। ফসেট প্রভৃতির ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তিগণ ভূয়োভূয়ঃ তাঁহার অদ্ভূত শক্তির সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যলাভ তাঁহার উদ্দেশ্য হইলে কি হয়—দেশের জন্য যাঁহার প্রাণ দিবানিশি ক্রন্দন করিতেছে, তাঁহার আবার বিশ্রাম! তিনি সেখানেও দেশের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। নানা কার্য্যে, নানা চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন, রসনা অবিরাম দেশের কথাই বলিতে লাগিল। বিশ্রামের পরিবর্ত্তে তিনি দুরন্ত শ্রমে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বাস্থ্যলাভ হইল না। সকলে ব্যথিতচিত্তে দেখিলেন তিনি ভগ্নদেহে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু কি গৌরবে, কি সমাদরে ভারতবাসী তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। সেই এক স্বর্গীয় দিন! ১৬ই সেপ্টেম্বরে কলিকাতার টাউনহলে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য এক মহতী সভার অধিবেশন হইল। সেই সভায় বলিতে গিয়া তিনি মূর্চ্ছা গেলেন—সেই দিন যে মূর্চ্ছা রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিল, সেই রোগই তাঁহার কাল হইল। জীবনের শেষ দিনেও তিনি মূর্চ্ছা গেলেন, আর জাগিলেন না, আর চক্ষু মেলিলেন না—চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। গত বৎসর ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের দিন বঙ্গবাসী কি দৃশ্য দেখিয়াছিল! জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে অবস্থিত রোগশয্যায় শয়ান কর্ম্মবীর আনন্দমোহন ভক্তদিগের স্কন্ধে ভর করিয়া সেই বিপুল জনতা ভেদ করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। ক্ষীণ কম্পিত হস্তে, অতুল বিশ্বাসের

সহিত স্মিতমুখে অখণ্ড বঙ্গভবনের ভিত্তি স্থাপন করিলেন! বাঙ্গালীর জাতীয়জীবনের জন্মকথা ঘোষণা করিলেন! কি পূত সেই স্পর্শ! কি উন্মাদিনী সেই শক্তি! অস্তগমনোন্মুখ চন্দ্রের ক্ষীণ জ্যোতিঃ কি মনোহারিণী! কি বিষাদময়ী! বঙ্গবাসী সে দিন ভুলিবে না—সে দিনকার বাক্যহীন বক্তৃতার মত উন্মাদিনী বক্তৃতা বাঙ্গালী কখন শ্রবণ করে নাই। ধন্য আনন্দমোহন! ধন্য বঙ্গভূমি! সে দিনকার চিত্র মানসপটে চিরমুদ্রিত করিয়া রাখ। আনন্দমোহনের অদম্য উৎসাহ, অসীম উদ্যম, গভীর ধর্ম্মজ্ঞানের তুলনা নাই। সেই নির্ভীক, স্বাধীনচেতা অক্লান্ত কর্ম্মবীরের তুলনা কোথায়?

ধর্ম্মসমাজে।

এতক্ষণ আমরা আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের অবান্তর, গুণ সকলের আলোচনা করিতেছিলাম। তিনি সমাজ-সংস্কারক রূপে, শিক্ষাবিভাগে, রাজনীতি ক্ষেত্রে বহু কর্ম্ম করিয়াছিলেন, বিস্তর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু এ সকলকে আমরা তাঁহার জীবনের প্রধান কীর্ত্তি বলিতে পারি না।—তিনি বিধাতানির্দ্দিষ্ট জীবনের একমহান্ পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। সেই উচ্চ লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে গিয়া জীবনের পথ পার্শ্বে এই সকল অবান্তর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। যে সময় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্ম-সমাজে নবযুগের আবির্ভাব করেন, সেই শুভক্ষণে যে সকল ধর্ম্মপিপাসু আত্মা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে আনন্দমোহন বসু একজন। তিনি পঠদ্দশায় ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং ১৮৬৯ সালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যখন "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপন করেন, তখন আনন্দমোহন বসু মহাশয় কায়মনোবাক্যে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। এবং উক্ত মহাত্মার সহিত একই অর্ণবপোতে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে ধর্ম্মবিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। বিধাতার আহ্বান শুনিয়া তিনি ধর্ম্মসমাজে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। সেই আহ্বান শুনিয়াই চিরদিন এই পথে চলিয়াছিলেন। ধর্ম্মই তাঁহার একমাত্র সাধনার বস্তু, একমাত্র বাঞ্ছনীয় ধন, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ম্মের নির্দ্দেশ না বুঝিয়া তিনি একটী পাদবিক্ষেপ করিতেন না। মৎস্য যেমন জলে বিহার করে, খেচর আকাশে, আনন্দমোহনের ভগবদ্ভক্ত আত্মা সেই রূপ ধর্ম্মে বিহার করিত।

ব্রহ্মোপাসনায়, ধর্ম্ম প্রসঙ্গে, ধর্ম্মকার্য্যে তাঁহার যে আনন্দ, যে পরিতৃপ্তি, যে শক্তি স্ফুরিত হইত, এমন ত কিছুতেই হইত না। তাঁহার জীবনতন্ত্রীর যে সুমধুর মহান্ গীতি ভারতবাসীকে মুগ্ধ করিয়া নীরব হইয়াছে। ধর্ম্মই সেই তন্ত্রীর বাদক যন্ত্র। নরচক্ষুর অগোচরে বীজ ভূমিতে নিহিত হয়। নরচক্ষুর অগোচরে তাহা অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু পুষ্পবান ফলবান বৃক্ষ সকলকেই মোহিত ও চমৎকৃত করে। ধর্ম্মবীজ গোপনে নর-চক্ষুর অগোচরে আনন্দমোহনের ভক্তিমান হৃৎক্ষেত্রে পতিত হইয়া নরচক্ষুর অগোচরে তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছিলাম ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর আনন্দমোহন বসু। আমরা দেখিয়াছিলাম ব্রাহ্মসমাজের পরিপোষক সেবক আনন্দমোহন বসু। আমরা দেখিয়াছিলাম ধর্ম্মসংগ্রামে অপরাজিত আনন্দ-মোহন বসু। কি শক্তিতে আনন্দমোহন শক্তিমান হইয়া-ছিলেন, কি বলে বলীয়ান হইয়াছিলেন, কি সাহসে অকুতো-ভয় হইয়াছিলেন, কি সম্পদে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা ভিন্ন কে জানে? ধর্ম্মের গৌরব যাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে, তিনি কখন আনন্দমোহন বসুর ভক্ত্যশ্রু-প্লাবিত অপূর্ব্ব মুখশ্রী বিস্মৃত হইবেন না। এবং আনন্দমোহন বসুর হৃদয়তন্ত্রীর মহান্‌গীতি তিনিই যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ধার্ম্মিক ভিন্ন ধর্ম্ম-গত-প্রাণ মহাত্মাকে কে বুঝিবে? ভক্তি এবং বিনয় আনন্দমোহন বসুর চরিত্রের বিশেষত্ব। তাঁহার ঐকান্তিকী ভগবদ্ভক্তি যিনি দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন, যিনি দেখেন নাই তাঁহার আনন্দ-মোহনের চরিতরহস্য পাঠ করা হয় নাই।

শ্রীহেমলতা দেবী।

সমালোচনা।

A History of Hindu Chemistry from the earliest times to the middle of the sixteenth century A. D. with Sanskrit texts, variants, translation and illustrations. By Praphulla Chandra Ray, D. Sc., Professor of Chemistry, Presidency College, Calcutta. Vol. I. Second Edition : revised and enlarged. Price Rs. 3. হিন্দু রসায়নী বিদ্যার এই ইতিহাস খানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমরা ইহার পরিচয় দিয়াছিলাম। গ্রন্থকার মহাশয় তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ অনুক্রমণিকার ৪০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন,—The capacity of a nation must be judged by what it has independently achieved in the several fields of knowledge and branches of literature। অর্থাৎ কোনও জাতি স্বাধীনভাবে জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ও সাহিত্যের বিবিধ শাখায় কি করিয়াছে, তাহার দ্বারাই উহার ক্ষমতার বিচার করিতে হইবে। এমন এক সময় ছিল যখন ইউরোপীয়েরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নূতন কিছু করিবার ক্ষমতা স্বীকার করিত না। পরে নানা বিষয়ে তাঁহাদের প্রতিভা প্রমাণিত হয়। কিন্তু জড়বিজ্ঞানে তাঁহারা নূতন কিছু করেন নাই, এই মত সে দিনও ইউরোপে প্রচলিত ছিল। বিজ্ঞানাচার্য্য রায় মহাশয়ের পুস্তকের গুরুত্ব এই যে তিনি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মত খণ্ডন করিয়া স্বকীয় এই মত স্থাপন করিয়াছেন যে, রসায়নী বিদ্যায় হিন্দুরা স্বাধীনভাবে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। এখন রাসায়নিকেরা লেখক মহোদয়ের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রস্কো ও শর্লেমার তাঁহাদের বৃহৎ রাসায়নিক গ্রন্থের নূতন (১৯০৬) সংস্করণের ভূমিকায় হিন্দুদের স্বাধীন রাসায়নিক প্রতিভালব্ধ জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই জন্যই আমরা মনে করি, যে, ইংরাজীশিক্ষিত কোন স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি যদি এই বহিখানি না পড়েন, তাহা হইলে ইহা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। আমাদের দেশের লোকে মানসিক ক্ষমতার মূল্য এখনও বুঝেন নাই, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এমন কি যাহাকে লোকে প্রধানতঃ শারীরিক শক্তি ও সাহসের কাজ মনে করে, তাহাও প্রধানতঃ মানসিক শক্তির ফল। জাপান যে রুশিয়াকে হারাইয়া দিল, তাহাও মূলে জাপানের প্রবলতর মানসিক ক্ষমতার প্রভাবে। জার্ম্মেনী যে ফ্রান্সকে হারাইয়া দিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে বিখ্যাত ফরাসী লেখক রেনাঁ বলেন,—"What defeated Frenchmen in the Franco-German War? Not Moltke! Not Bismarck! but the mind, the high seriousness, the method, the thought of Germany! It was Luther, Kant, Fichte, Hegel, who fought with us in the Franco-German War!" অর্থাৎ ফ্রাঙ্কোজার্ম্মেন যুদ্ধে ফরাসীদিগকে কে পরাজিত করিয়াছিল? মল্টকে নয়! বিস্‌মার্ক নয়! কিন্তু জার্ম্মেনীর মন, উচ্চ একাগ্রচিত্ততা, সুনিয়মিত কার্য্যপদ্ধতি, চিন্তাশক্তি! ফ্রাঙ্কোজার্ম্মেন যুদ্ধে আমাদের সহিত লুথার, কাণ্ট, ফিক্‌টে, হেগেল যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

এই গ্রন্থ লইয়া রায় মহাশয় ১৭ বৎসর একাগ্রচিত্তে কঠোর শ্রম করিয়াছেন। এতদিনে তাঁহার কাজ একপ্রকার শেষ হইয়া আসিল। তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ড প্রস্তুত হইতে আর অধিক বিলম্ব হইবে না।

নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রণীত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ||৵০ আনা মাত্র। সাধারণতঃ অনেকে মনে করেন যে চটি বহি লিখিতে বেশী বিদ্যার প্রয়োজন হয় না। ইহা সেই রকমের ভুল যাহার দরুণ স্কুল পাঠশালায় অর্দ্ধশিক্ষিত লোকদিগকে ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষার ভার দেওয়া হয়। বাস্তবিক বিজ্ঞানাদি যে কোন বিষয়েই হউক না কেন, সহজ করিয়া বহি লিখিতে গেলে সেই বিষয়ে পারদর্শিতা থাকা চাই। গ্রন্থকার মহাশয়ের এইরূপ পারদর্শিতা আছে বলিয়াই এই বহিখানি এরূপ সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু রসায়নীবিদ্যারও সচিত্র সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আছে। ইহার ভূমিকাটিও মূল্যবান্।

পুস্তকখানির প্রুফ যিনি দেখিয়াছেন, তিনি আর একটু সাবধান হইলে ভাল হইত। আরও একটি ভুল অনেকে করেন বলিয়া এখানে উল্লিখিত হইতেছে। বঙ্কিমবাবুর বন্দে মাতরম্ গানে সাত কোটি বাঙ্গালীর উল্লেখ আছে। এ৹ গ্রন্থের ভূমিকায় আট কোটি বাঙ্গালীর উল্লেখ দেখিলাম। বাস্তবিক বাঙ্গালী অর্থাৎ বাঙ্গলাভাষীর সংখ্যা সাড়ে চারি কোটির কিছু কম।

হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোষ। কাশীস্থ নাগরী-প্রচারিণী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৩||০ টাকা। এই মূল্যবান গ্রন্থে ভূগোল, জ্যোতিষ, অর্থনীতি, রসায়নীবিদ্যা, গণিত, পদার্থবিদ্যা ও দর্শন, এই কয় বিদ্যার ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের হিন্দী প্রতিশব্দ আছে। ভূমিকায় ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এ বিষয়ে যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বিস্তৃততর সমালোচনা পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। ইহা বাঙ্গালী লেখকদেরও কাজে লাগিবে; কেন না অনেক প্রতিশব্দই সংস্কৃতমূলক। একটা কথা আছে,

অতি বড় সুন্দরী না পায় বর,
অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর।

আমাদের বাঙ্গালীদেরও সেই দশা। আমরা অহঙ্কার করি যে আমাদের মধ্যে খুব পণ্ডিতলোকেরাও বাঙ্গলার চর্চ্চা করেন। কিন্তু আমরা এ পর্য্যন্ত এরূপ একখানি বহি বাহির করিতে পারিলাম না। সত্য বটে এরূপ বহি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা যায় না, ও বাহির করিতে করিতেই অংশতঃ পুরাতন হইয়া যায়। কিন্তু এই কারণে নিরস্ত হইতে গেলে ত কোন অভিধান বা অন্যবিধ বহিই লেখা চলে না।

সোনার বাঙ্গলা। শ্রীনিখিলনাথ রায়, বি. এল্, প্রণীত। এই গ্রন্থে নিখিল বাবু প্রত্যেক কথার প্রমাণসহ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, প্রাচীনতম ঐতিহাসিক সময় হইতে আমাদের মাতৃভূমি ধনসম্পদে, সাহসে ও বিদ্যানুরাগে সত্য সত্যই সোনার বাঙ্গলা নামের উপযুক্ত ছিলেন। আমাদের শিল্পবাণিজ্য কিরূপে নষ্ট হইল, তাহাও প্রমাণসহ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই অংশে আরও মূল প্রমাণ থাকিলে ভাল হইত। গ্রন্থখানির ভাষা বেশ সুন্দর ও উদ্দীপনাপূর্ণ হইয়াছে। বক্তৃতার ধরণ একটু কম হইলে ভাল হইত। কারণ ইহা ঐতিহাসিক বহি। স্বদেশী আন্দোলনে সংসৃষ্ট, বক্তা শ্রোতা কার্য্যকর্ত্তা সকলেরই এই পুস্তকখানি পড়া উচিত ও নিকটে রাখা উচিত।

ব্যাধি ও প্রতীকার। শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী। মূল্য আট আনা। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের দুর্দ্দশার কারণ কি ও তাহা নিবারণের উপায় কি, তদ্বিষয়ে গ্রন্থকার মহাশয়ের মত এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার দুই একটি মতের সহিত আমাদের মতের মিল নাই। এই পুস্তকে অনেক ভাল কথা আছে।

গ্রন্থকার মহাশয় বলেন—"মুসলমানদের আগমনের পর হইতে মুসলমানরাজত্বের অবসান পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমান ভারত-ইতিহাসের আদ্যন্ত জুড়িয়া কেবল অশান্তির ঝড় তুলিয়া রাখিয়াছে। সেই প্রবল বায়ুপ্রবাহে হিন্দুরা তাহাদের সদ্‌গুণ রাশি উড়াইয়া দিয়া, একটা নির্জীব জড়তার মধ্যে আত্মসমাধি রচনা করিয়া লইয়াছে।" মহামতি রাণাডের

"আমি হিন্দুও নহি মুসলমানও নহি" শীর্ষক লক্ষ্ণৌয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা পড়িলে এই শেষোক্ত মত ভ্রান্ত বলিয়া বুঝা যায়। "ইংরাজের এই আগমন আমাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরম কল্যাণকর হইয়াছে।" সর্ব্বতোভাবে কি প্রকারে হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। "যোগ্য হইলে আমাদের সকলি মিলিবে।" ইহা এক হিসাবে সত্য; কিন্তু ইহাও সত্য যে কিছু কিছু না মিলিলেও যোগ্য হওয়া যায় না। আগে সাঁতার শেখ, তারপর জলে নামিতে পাইবে, ইহা বলা বোধ হয় যুক্তি-সঙ্গত নহে। তেমনি রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে কিছু কিছু প্রকৃত ক্ষমতা না পাইলে ক্ষমতা পরিচালনার যোগ্য হওয়া যায় না। সেই জন্যই গ্লাডষ্টোন বলিতেন, "It is liberty alone that fits men for liberty." স্বাধীনতাই মানুষকে স্বাধীনতার উপযুক্ত করে। যাহা হউক, আর ছোট ছোট বিষয়ের সমালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। দেবকুমার বাবুও সাড়ে চারি কোটি বাঙ্গালীকে সাত কোটি করিয়াছেন।

সমাজসংস্কারে মানুষের সম্পর্ক বিচার। শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত প্রণীত। মূল্য পাঁচ পয়সা। "সময়ের মত দ্বিতীয় সংস্কারক নাই, প্রকৃতির অন্তরালে থাকিয়া প্রকৃত সংস্কারক সংস্কার করিতেছেন; তাহার সংস্কারের জন্য আমাদের অপেক্ষা করা উচিত।" ইত্যাকার ভ্রান্তমতের যুক্তিমূলক উত্তর এই পুস্তিকায় দেওয়া হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মাবলী।

মুখবন্ধ।

জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া নিয়মাবলীর আলোচনা করিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়াছিলাম যে এই নিয়মাবলীর পুনর্ব্বিচার করিবার জন্য সিমলাশৈলে একটি সরকারী বৈঠক বসিবে। বৈঠকে ছয় জন বাছা বাছা সেনেটের সভ্য ছিলেন, ইহাদের মধ্যে পাঁচজন সহর ও মফঃস্বলের সরকারী বে-সরকারী ও মিশনরী কলেজের অধ্যক্ষ বা অধ্যাপক; এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলার ও হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় সভাপতি ছিলেন। মে মাসের প্রথমে বৈঠক বসিয়া দুইমাস কাল বৈঠকের কার্য্য চলে। পরে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত নিয়মাবলী ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ হয়। গত ১১ই অগষ্টের গেজেটে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সেই নিয়মাবলী মঞ্জুর হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ বৈঠকের নির্দ্ধারিত নিয়মাবলীর কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন করেন নাই। কিন্তু সেনেট সভা যে খসড়া নিয়মাবলী পেশ করিয়াছিলেন, বৈঠকে তাহা অবিকল গৃহীত হয় নাই; অনেকস্থলে একেবারে ঢালিয়া সাজা হইয়াছে, আবার অনেক স্থলে খসড়ায় যে সকল ব্যবস্থা ছিল না তাহার সমাবেশ হইয়াছে, কোনও কোনও স্থলে সেনেটের মত আদৃত ও পরিগৃহীত হইয়াছে।

নূতন নিয়মাবলী গেজেটে প্রকাশের দিন হইতেই আমলে আসিল। তবে নূতন নিয়মে ম্যাট্রিক্যুলেশান বা প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রথম ১৯১০ সালে হইবে এবং অন্যান্য পরীক্ষা ১৯০৯ সালে হইবে। সংশোধিত নিয়মে নিম্ন পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইবে তাহাদিগকে যথাসময়ে উচ্চ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিলেই সঙ্গত হইত। কিন্তু সেরূপ করা হয় নাই। বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ ধারণা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত সহর ও সুদূর মফঃস্বলের অসংখ্য স্কুলগুলির পক্ষে নূতন ব্যবস্থানুযায়ী শিক্ষাদান যত কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হইবে, কলেজগুলির পক্ষে তত হইবে না। আগামী বৎসর জুন মাসে যে সকল ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে ভর্ত্তি হইতে আসিবে তাহাদিগের বেলায়ই নূতন ব্যবস্থা খাটিবে। অতএব ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে, আগামী সেসন হইতেই নূতন তন্ত্রের পঠনপাঠনা আরম্ভ হইবে। শুভস্য শীঘ্রম্।

(১) শিক্ষার ব্যবস্থা।

স্কুলকলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত করিতে হইলে পূর্ব্বে যে প্রণালী অবলম্বিত হইত, এখন হইতে তদপেক্ষা কঠোর প্রণালী অবলম্বিত হইবে, একথা পূর্ব্বপ্রবন্ধে খসড়া ব্যবস্থার আলোচনাকালে বলিয়াছি। স্কুলকলেজের রীতিমত আয়ের সংস্থান থাকা চাই, উপযুক্ত বেতনে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা চাই, বিদ্যালয়গৃহ প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যকর হওয়া চাই, যন্ত্রাগার ও পুস্তকাগার ভালরূপ থাকা চাই, শিক্ষকগণের উপযুক্ত বেতন হওয়া চাই, শিক্ষকপরিবর্ত্তন হইলে কর্ত্তৃপক্ষকে জানান চাই, স্কুলকলেজ কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি না হইয়া রীতিমত কমিটির অধীন থাকা চাই এবং কমিটিতে শিক্ষকদিগের কেহ কেহ থাকা চাই, কলেজের বেলায় অধ্যক্ষ ও কোনও কোনও অধ্যাপক কলেজবাটীতে বা নিকটে বাস করা চাই, ইত্যাদি যে সব ব্যবস্থা হইল সেগুলি খুবই সুন্দর ও সুসঙ্গত সন্দেহ নাই; তবে ইহার ফলে কয়টা স্কুল কলেজ টিকিবে তাহা ভাবিবার বিষয়। বিশেষতঃ আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার এখন শৈশবকাল, এ সময়ে এত কড়াকড় করিলে সরকারী দুই চারিটি কলেজ ভিন্ন বোধ হয়

আর কোথাও বিজ্ঞানশিক্ষা চলিবে না। কোন্ বিজ্ঞান পরীক্ষায় কি কি যন্ত্রতন্ত্র দরকার এবং তাহার আনুমানিক মূল্য কত, নূতন নিয়মাবলীতে তাহার একটা তালিকা দেওয়া হইয়াছে। যে কলেজ যে বিজ্ঞানশাস্ত্রে যে পরীক্ষা পর্য্যন্ত পাঠনার বন্দোবস্ত করিবে, সে কলেজ হইতে ছাত্রগণ সেই পরীক্ষা দিতে পারিবে, তদতিরিক্ত পরীক্ষা দিতে পারিবে না।

সাধারণতঃ, ঘরে পড়িয়া কেহ কলেজের পরীক্ষা বিশেষতঃ বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পাইবে না। শিক্ষক হইয়া পরীক্ষা দিতে গেলে অন্ততঃ তিন বৎসর শিক্ষকতা না করিলে চলিবে না। কোন্ বিষয়ে অন্ততঃ কতগুলি লেকচার প্রদত্ত হইবে, অন্ততঃ কতক্ষণ (৫৫ মিনিট) লেক্চার দিলে তাহা লেক্চার বলিয়া পরিগণিত হইবে, ইত্যাদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবস্থা পর্য্যন্ত হইয়াছে। কলেজের ছাত্রগণকে শতকরা ৭৫ দিন (এখনকার মত ৬৬ দিন নহে) উপস্থিত থাকিতে হইবে এবং অনুত্তীর্ণ ছাত্রগণকে আবার এক বৎসরের জন্য (এখনকার মত ছয় মাস নহে) পড়িতে হইবে, ছাত্রগণকে রীতিমত Exercise দিতে হইবে, এবং কলেজের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে তাহার হিসাব রাখিতে হইবে, বিজ্ঞানে হাতে কলমে কাজ শিখিতে হইবে এবং কলেজের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে তৎসম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিতে হইবে, ছাত্রগণ যখন ইচ্ছা এ কলেজ ও কলেজ ঘুরিতে পারিবে না, transfer সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য সেনেটের সভ্যদিগের মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠিত হইবে, ইত্যাদি ব্যবস্থার কথা বলিয়াছি। কলেজপরিদর্শনের জন্য রেজিষ্ট্রারের তুল্য বেতনে একজন Inspector নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। বেতনের ব্যবস্থা খস্ড়া নিয়মাবলীতে ছিলনা।

(২) Discipline (সংযম)।

খস্ড়া নিয়মাবলীতে ব্যবস্থা ছিল, কলেজের প্রত্যেক ছাত্রকে হয় অভিভাবকের নিকট না হয় কলেজসম্পৃক্ত মেসে থাকিতে হইবে। নূতন নিয়মাবলীতে এত কড়াকড় থাকিল না, ছাত্রদিগের অনুরূপ মেসে থাকিলেও চলিবে। তবে সেখানেও কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের তত্ত্বাবধান করিবার ব্যবস্থা থাকিল এবং তজ্জন্য ছাত্রাবাস কমিটি ও পরিদর্শনকমিটি গঠিত হইবে। ছাত্রাবাসকমিটির ছয় জন সভ্যের মধ্যে অন্ততঃ তিন জন এ দেশের লোক হওয়া চাই, কেননা এ কার্য্যে দেশের সামাজিক রীতিনীতি পরিজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। ছয় জনই অবশ্য সেনেটের সভ্যদিগের মধ্যে হইতে লইতে হইবে। ইহা ছাড়া ছাত্রগণ কলেজে ভর্ত্তি হইলেই কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাদের নামের একটা রেজিষ্টারী রাখা হইবে, তাহাতে তাহাদের চরিত্রের কথা, কিরূপ পড়াশুনা করিতেছে তাহার কথা, কলেজ পরিবর্ত্তনের কথা, পাশ ফেলের কথা, ইত্যাদি সকল কথাই লেখা থাকিবে অর্থাৎ কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার তারিখ হইতে কলেজ ছাড়ার তারিখ পর্য্যন্ত একটা ধারাবাহিক ইতিহাস থাকিবে। ইহার জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে দুই টাকা ফী দিতে হইবে।

(৩) পরীক্ষা।

নূতন নিয়মাবলী চতুঃপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং মুখবন্ধস্বরূপ ভারত গবর্ণমেণ্টের একটা সুদীর্ঘ মন্তব্য আছে। ইহার সম্যক্ পরিচয় দিতে হইলে 'প্রবাসী'র গোটা এক সংখ্যায়ও কুলায়না। সুতরাং কেবল যে সকল ব্যবস্থা সাধারণের জানিবার প্রয়োজন আছে, আমরা সেইগুলির পরিচয় দিতেছি। পরীক্ষার সংখ্যা খস্ড়া নিয়মাবলীতে যেরূপ ছিল সেইরূপই থাকিল। নূতন নামকরণের কথা ও প্রবেশিকা পরীক্ষার পরেই বিজ্ঞান বা আর্টস্ এই উভয়ের মধ্যে একটা পথ অবলম্বন করিতে হইবে (তবে বিজ্ঞানের বা আর্টের ইন্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আবার এক বৎসর পড়িয়া অপরটির পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে) ইত্যাদি কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। ছাত্রগণ ষোল বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিবে না। এ ব্যবস্থাও পাঠকবর্গের অবিদিত নহে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইয়াই ছাত্রগণ মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিতে পাইবে এই একটি নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সম্বন্ধেও এই নিয়ম হইলে সঙ্গত হইত। ডাক্তারী, ওকালতী, এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পরীক্ষা সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি আইন পরীক্ষা প্রথম বৎসরের শেষে একটি ও দ্বিতীয় বৎসরের শেষে আর একটি দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এ ব্যবস্থা খস্ড়ায়ও ছিল।

শিক্ষকতাশিক্ষার জন্য দুইটি পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

এইটি নূতন ব্যাপার। আশা করা যায়, ইহার ফলে ভবিষ্যতে স্কুলে প্রকৃত শিক্ষক পাওয়া যাইবে এবং শিক্ষার উন্নতি হইবে। এদেশে শিক্ষার দুর্গতির প্রধান কারণ উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, ইহা বোধ হয় চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। ছাত্রগণ নিজের কথায় উত্তর লিখিবে, টানা মুখস্থ লিখিলে নম্বর পাইবে না, এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহাতে প্রকৃত বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়, প্রশ্নও এমন ভাবে দিতে হইবে, এ কথাও বলা আছে। যদি কোনও ছাত্র কোনও বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখায় বা মোটের উপর বেশ ভাল ফল দেখায় অথচ কোনও একটি বিষয়ে ফেল হয়, তাহা হইলে তাহার পাশ সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে। ইহার ফলে অনেক প্রকৃত মেধাবী ছাত্রের বিশেষ উপকার হইবে।

(ক) প্রবেশিকা পরীক্ষা।

ছাত্রগণকে নিম্নপরীক্ষায় এত রকম বিষয় আয়ত্ত করিতে হয় যে তাহাতে তাহাদের কোনও বিষয়েই প্রকৃতরূপ অধিকার হওয়া সম্ভব নহে, একথা কর্তৃপক্ষ বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। সেইজন্য এ সকল পরীক্ষায় বিষয়সংখ্যা যথাসম্ভব কমান হইয়াছে; সাধারণ শিক্ষার জন্য যে সকল বিষয় অবশ্যপ্রয়োজনীয় তাহাই কেবল রাখা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যবস্থায় প্রত্যেক ছাত্রকে ইংরাজী ভাষা, অপর কোনও একটি ভাষা, গণিত, এবং ইতিহাস ও ভূগোল এই চারিটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। চতুর্থ বিষয়টি ধরিতে গেলে দুইটি বিষয়, এবং ইহার উপর আবার 'বোঝার উপর শাক আটি' স্বরূপ বিজ্ঞান আছে। ইহা ছাড়া যে সকল ছাত্র বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে চাহে, তাহাদিগকে ড্রয়িং (রেখাঙ্কণ) শিখিতে হয়। নূতন ব্যবস্থায়, ইংরাজী ভাষা (দুইখানি প্রশ্নপত্র) গণিত (একখানি প্রশ্নপত্র) কোনও একটি প্রাচীন ভাষা (একখানি প্রশ্নপত্র) এবং মাতৃভাষায় (ইংরাজী হইতে) অনুবাদ ও প্রবন্ধ রচনা (একখানি প্রশ্নপত্র) [যাহাদের মাতৃভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফর্দ্দে নাই, তাহাদের জন্য ইংরাজীরচনা বা ফরাসী বা জর্ম্মান]—এই কয়টি বিষয় লইতে হইবে। ইহার উপর ইচ্ছা করিলে আরও দুইটি বিষয় লওয়া যায়, যথা, (ক) ইতিহাস (খ) প্রাকৃতিক ও সাধারণ ভূগোল (ভারতবর্ষের কথা বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে) (গ) গতিবিজ্ঞানের সরল সূত্র (ঘ) গণিতে বা (ঙ) প্রাচীন ভাষায় আর একখানি প্রশ্নপত্র। যাহারা উচ্চ পরীক্ষায় এই সকল বিষয় লইবে তাহাদিগের জন্যই বোধ হয় (গ) (ঘ) ও (ঙ)র ব্যবস্থা হইল। গণিতে এই প্রশ্নপত্রে এখনকার এফ, এ পরীক্ষার পাঠ্য বিষয়ের কতক অংশ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রশ্নপত্রে পূর্ণসংখ্যা একশত। ইহার মধ্যে ইংরাজীতে শতকরা ৪০, মাতৃভাষায় শতকরা ৩৬, এবং অন্যান্য বিষয়ে শতকরা ৩০ রাখিয়া মোটের উপর ২৫০ নম্বর রাখিলে পাশ। ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে, ছাত্রগণ শেষোক্ত দুইটি বিষয় না লইয়াও যদি মোটের উপর ২৫০ পায় তাহা হইলেই পাশ হইবে; ঐ দুইটি বিষয় লইতে হইবে না বা লইয়া পাশের নম্বর রাখিতে হইবে না।

বিষয়গুলির পরিমাণও অনেক স্থলে কমিয়াছে। ইংলণ্ডের ইতিহাস উঠিয়া (উচ্চ পরীক্ষায়) গেল এবং ইতিহাসের প্রশ্নের মাতৃভাষায়ও উত্তর দেওয়া চলিবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত বিষয়ের পাঠনাও মাতৃভাষায় চলিবে। 'ভারতশাসন ও ইংরেজের আমলে ভারতের উন্নতি' বিষয়টি বিশেষরূপে শিখাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একখানি অর্ডারী কেতাব প্রণয়ণের ফরমাশ হইয়াছে। গণিতের প্রথম প্রশ্নপত্রে পাটীগণিত ও বীজগণিতের এখনকার পাঠ্য কোনও কোনও অংশ বাদ গিয়াছে এবং ইউক্লিডের পরিবর্ত্তে ব্যবহারিক জ্যামিতি ও আধুনিক জ্যামিতির কিয়দংশ (ইউক্লিডের প্রথম চারি অধ্যায়ের প্রধান প্রধান প্রতিজ্ঞা কয়েকটি) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ইহার ফলে এই জটিল শাস্ত্রশিক্ষা করা সহজ ও হৃদয়গ্রাহী হইবে। খস্ড়া ব্যবস্থায় নানারূপ বিজ্ঞানের নির্দ্দেশ ছিল, তাহার প্রায় সবগুলিই বাদ গিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এ ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে। কেননা আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে বিজ্ঞানশিক্ষার সরঞ্জামের ও প্রকৃত শিক্ষকের যেরূপ অভাব তাহাতে বিজ্ঞানশিক্ষার কার্য্য এত নিম্নস্তরে কখনই সুচারুরূপে চলিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনও একথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। যে দুইটি বিজ্ঞান রাখা হইয়াছে তাহার বেলায়ও শিক্ষার রীতিমত সরঞ্জাম না থাকিলে কোনও স্কুল ঐ সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাইতে পারিবেনা, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। ফল কথা, বিষয়ের পরিমাণ ও সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইয়াছে তাহা

বেশ বুঝা গেল। এ অবস্থায় পাশের নম্বর কিঞ্চিৎ বাড়িলেও ক্ষতি নাই, কেননা এখন ছাত্রগণ রীতিমত শিখিবার সুবিধা ও অবসর পাইবে।

ইংরাজীর পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তক একপ্রকার উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে; ইহাতে ছাত্রগণের প্রকৃত ইংরাজীজ্ঞানের বিশেষ সহায়তা করিবে তাহা পূর্ব্বপ্রবন্ধে সবিস্তারে বুঝাইয়াছি, পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। এস্থলে খস্‌ড়া ব্যবস্থাই প্রায় অবিকল গৃহীত হইয়াছে; কেবল ইংরাজী হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থাটা থাকিল না। প্রচলিত ব্যবস্থায় যেমন ইহা মাতৃভাষার পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত আছে, নূতন ব্যবস্থায়ও সেইরূপ থাকিল। আমাদের বিবেচনায় খস্‌ড়ার ব্যবস্থাই সঙ্গত ছিল; কেননা এরূপ অনুবাদের ক্ষমতাও প্রকৃতপক্ষে ইংরাজীজ্ঞানের পরিচায়ক; পক্ষান্তরে মাতৃভাষার পরীক্ষায় বিদেশী ভাষা হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কুত্রাপি দেখা যায় না, এবং ইহা নিতান্তই অসঙ্গত। একটু চিন্তা করিলেই সকলেই ইহার অসঙ্গতি বুঝিতে পারিবেন। যাক্, ওসব তর্কে আর এখন ফল নাই। ইংরাজীর প্রথম প্রশ্নপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত কোনও না কোনও এদেশে প্রচলিত ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ (সাহেবসন্তানদিগকেও এই পরীক্ষা দিতে হইবে) এবং প্রবন্ধরচনার ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রে পঠিত (বা অপঠিত) পুস্তক হইতে ব্যাখ্যা প্রভৃতি এবং ব্যাকরণের কেযো প্রশ্ন থাকিবে। ব্যাকরণে ৩০ নম্বরের বেশী থাকিবেনা, এবং অনুবাদের জন্য বিদ্‌ঘুটে ফিরিঙ্গি বাঙ্গলা থাকিবে না, সুলেখকের রচনা হইতে দেওয়া হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রাচীনভাষাশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে বলিয়াছি এবং যাহাতে ইহা সকল আর্টস্ পরীক্ষায়, বিশেষতঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবশ্যশিক্ষণীয় হয় তদ্বিষয়ে (আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা সম্ভব) চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু সেনেট সভায় সে কথা গ্রাহ্য হয় নাই। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, নূতন নিয়মাবলীতে ইহা প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবশ্যশিক্ষণীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সংস্কৃতভাষায় শিক্ষা ও পরীক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধেও আমরা দুই বৎসর হইল 'প্রবাসী'তে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছিলাম। খস্‌ড়া নিয়মাবলীতে তথা নূতন নিয়মাবলীতে আমাদের প্রার্থিত সংস্কারের সকলগুলিরই ব্যবস্থা দেখিয়া সুখী হইলাম। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণ (প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের ব্যবহারোপযোগী) প্রণয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে, পাঠ্য স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট সাহিত্য পুস্তকের বাহির হইতেও ব্যাকরণের প্রশ্ন দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইংরাজী হইতে সংস্কৃতে অনুবাদের অনুপাত বাড়ান হইয়াছে এবং সংস্কৃতে ব্যাখ্যা অপেক্ষা ইংরাজীতে অনুবাদের উপরই বেশী ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। অপঠিত অংশের ইংরাজীতে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তার কথাও আমরা বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার ব্যবস্থা সংস্কৃতের দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রে (যাহা না লইলেও চলে) হইয়াছে। এ অংশে খস্‌ড়া নিয়মাবলীর ব্যবস্থাই ভাল ছিল। প্রথম প্রশ্নপত্রে এরূপ প্রশ্ন থাকিলে সংস্কৃত শিক্ষার আরও উন্নতি হইত। নতুবা শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই পাঠ্য পুস্তকের চতুঃসীমার মধ্যে রহিয়া যাইবে, গণ্ডীর বাহির হইবেনা।

বাঙ্গলা ভাষার যে প্রশ্নপত্রের কথা বলিয়াছি, ইহা ঠিক নূতন ব্যবস্থা বলা যায় না, কেননা ইহা প্রচলিতব্যবস্থায় দ্বিতীয় ভাষার অপরাঙ্কের প্রশ্নপত্রের সহিত অভিন্ন। তবে প্রচলিতব্যবস্থায় সংস্কৃত না জানিয়া এই প্রশ্নপত্রের জোরে অনেকে তরিয়া যাইত, এখন আর সেটি হইবে না। উভয় বিষয়ের প্রশ্নপত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইল, এবং উভয় বিষয়ে স্বতন্ত্র পাশ করিতে হইবে। আর পূর্ব্বের ন্যায় সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা লইলে চলিবে না। সকল ছাত্রকেই সংস্কৃত বা অপর কোনও প্রাচীন ভাষা লইতেই হইবে।

(খ) ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষা।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, এখন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইয়াই হয় বিজ্ঞান না হয় আর্টস্‌এর দিকে যাইতে হইবে (পূর্ব্বে এফ, এ, পরীক্ষার পর এই ব্যবস্থা ছিল) এবং বিজ্ঞান ও আর্টস্‌এ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষা হইবে। প্রচলিত নিয়মে এফ, এ, পরীক্ষায় অন্ততঃ ছয়টি বিষয় লইতে হয়, সাতটি লইলে আরও ভাল হয়, এই সাতটির মধ্যে কেবল ২।৩টি বিষয়ে বাছাবাছি চলে, কিন্তু অধিকাংশ বিষয় না লইলে গত্যন্তর নাই, এইরূপ ব্যবস্থা আছে। বলা বাহুল্য যে এইরূপ বিষয়সংখ্যার আধিক্য

বশতঃ ও জোর করিয়া সকল বিষয় শিখানর জন্য প্রকৃত শিক্ষা ঘটে না। নূতন ব্যবস্থায় আর্টস্ পরীক্ষার বিষয় সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে এবং নিয়ম হইয়াছে যে ইংরাজী সাহিত্য ও মাতৃভাষা এই দুইটি বিষয় লইতেই হইবে, ইহা ছাড়া আর যে কোনও তিনটি বিষয় লইতে হইবে তাহার ভিতর বিজ্ঞানও আছে, তবে বিজ্ঞান একটির বেশী লওয়া চলিবে না। বিষয়নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ ভার ছাত্রদিগের উপর রাখাতে তাহাদের বোঝা যথেষ্ট হাল্‌কা হইল; কেন না এখন আর কাহাকেও বাধ্য হইয়া যে বিষয় ভাল জানে না, তাহা লইতে হইবে না। ইহাতে যে ছাত্রদিগের কতদূর সুবিধা ও উপকার হইল তাহা আর বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। যখন যে যাহা ভাল জানে তাহাই লইতে উৎসাহিত হইবে, সে অবস্থায় পাশের নম্বর একটু বাড়িলেও ক্ষতি নাই; বরং তাহাতে শিক্ষার উন্নতি হইবে।

তবে আমাদের বিবেচনায় নূতন ব্যবস্থায় খস্‌ড়া ব্যবস্থার একটা দোষ রহিয়া গেল। আজকালকার দিনে জড়বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি সকলেরই পক্ষে জানা দরকার, যাহারা উচ্চ শিক্ষালাভ করিতে যাইবে তাহারা যে এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকিবে, ইহা শোচনীয় বলিতে হইবে। এই জন্যই আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছিলাম যে এই পরীক্ষায় সকল ছাত্রদিগকেই জড়বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল তথ্যগুলি আয়ত্ত করিতে হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইলে সঙ্গত হইত।

খস্‌ড়া নিয়মাবলীতে প্রাচীন ভাষা অবশ্যশিক্ষণীয় বলিয়া ব্যবস্থা ছিল, প্রচলিত ব্যবস্থাও তাহাই, কিন্তু নূতন নিয়মাবলীতে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। প্রাচীন ভাষার স্থান মাতৃভাষা অধিকার করিয়াছে এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাতৃভাষার পরীক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা, এস্থলেও সেইরূপ হইয়াছে। ইহাতে মাতৃভাষাশিক্ষার পক্ষে উপকার হইল বটে, কিন্তু প্রাচীন ভাষাকে কোণঠেসা করা হইল। আমাদের সম্পূর্ণ ধারণা যে সংস্কৃত শিখিলে বাঙ্গলাভাষা বুঝিবার ও লিখিবার পক্ষে যথেষ্ট উপকার হয়; কাজেই সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা অবশ্যশিক্ষণীয় হওয়াতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। এ সম্বন্ধে অনেক কথা ১৩১১ সালের চৈত্রসংখ্যা ও ১৩১২ সালের অগ্রহায়ণসংখ্যা 'প্রবাসী'তে বলিয়াছি। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাহাদের মাতৃভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফর্দ্দে নাই, তাহাদের জন্য তৎপরিবর্ত্তে ইংরাজী ভাষার আর একখানি প্রশ্নপত্র দেওয়া হইবে।

আর্টস্ পরীক্ষায় বিজ্ঞান (গণিতও ইহার অন্তর্গত) বিষয়গুলির পরিমাণ ও পরীক্ষাপ্রণালী বিজ্ঞান পরীক্ষার অনুরূপ। গ্রীস রোমের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের ইতিহাসও এই পরীক্ষার জন্য নির্দ্ধারিত হইল। তর্কশাস্ত্রে Deductive এবং Inductive দুই প্রকারই থাকিবে।

ইংরাজীতে তিনখানি প্রশ্নপত্র, মাতৃভাষায় একখানি প্রশ্নপত্র ও অপর সকল বিষয়ে দুইখানি করিয়া প্রশ্নপত্র থাকিবে। প্রত্যেক প্রশ্নপত্রে পূর্ণসংখ্যা একশত। ইংরাজীর তৃতীয় প্রশ্নপত্রখানিতে (এইখানি নূতন) রচনা, ছন্দঃ ও অলঙ্কার, এবং অপঠিত পুস্তক হইতে ব্যাখ্যা প্রভৃতি থাকিবে। তবে সেরূপ পুস্তক প্রবেশিকা পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট পুস্তক অপেক্ষা কঠিন হইবে না। খস্‌ড়া নিয়মাবলীতে ভাষাতত্ত্বের ব্যবস্থা ছিল, আমরা তাহা সঙ্গত বিবেচনা করি নাই; এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তে ছন্দঃ ও অলঙ্কার হইল।

সংস্কৃতের বেলায় (অন্যান্য প্রাচীন ভাষার বেলায়ও এইরূপ ব্যবস্থা) রীতিমত ব্যাকরণের ব্যবস্থা হইয়াছে, প্রবেশিকার ন্যায় এই ব্যাকরণ খানিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কলিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি হইবে। এস্থলেও সংস্কৃতে ব্যাখ্যা অপেক্ষা ইংরাজীতে অনুবাদের উপর ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। তবে পাছে তজ্জন্য মল্লিনাথ প্রভৃতি টীকাকারের প্রামাণিক টীকা অবজ্ঞাত হয়, সেই জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে, ছাত্রগণকে টীকার সহিত পরিচয় রাখিতে হইবে, কিন্তু সে পরিচয় দিতে হইবে ইংরাজী ভাষায়। ইহাকেই বলে 'কাজীর বিচার'। দুইটি পরস্পর প্রতিকূল মতের সমন্বয় করিতে গিয়া এই অদ্ভুত ব্যবস্থা উদ্ভূত হইয়াছে! ইংরাজী হইতে সংস্কৃত অনুবাদে নম্বরের অনুপাত বাড়ান হইয়াছে এবং অপঠিত অংশের ইংরাজীতে অনুবাদের ব্যবস্থা হইয়াছে, তবে গদ্য অংশ দেওয়া হইবে এবং সে অংশগুলি প্রবেশিকা পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট পুস্তক অপেক্ষা কঠিন হইবে না, সে বিষয়ে সাবধান করা হইয়াছে। আমরা দুই বৎসর পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে কয়েকটি ধারাবাহিক

প্রবন্ধে এ সমস্ত সংস্কার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। অতএব এ ব্যবস্থায় আমরা খুসী। এই পরীক্ষায় গদ্য ও পদ্য এই উভয়-বিধ পাঠ্য থাকিবে; গদ্য অংশ দশকুমারচরিত ও মহাভারত হইতে, এবং পদ্য অংশ ভট্টিকাব্য এবং রঘুবংশ বা কুমারসম্ভব হইতে, সঙ্কলিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের যখন এই পরীক্ষায় মূলব্যাকরণপাঠের ব্যবস্থা নাই, তখন এ ক্ষেত্রে ভট্টিকাব্য পাঠ্য করা আমাদিগের সমীচীন বিবেচনা হয় না। অনারে ভট্টিকাব্য দেওয়া ঠিক হইয়াছে। সংস্কৃত সম্বন্ধে এত খুটিনাটি বিচার খস্‌ড়া নিয়মাবলীতে ছিলনা।

বিজ্ঞান পরীক্ষায়ও ইংরাজীর ও মাতৃভাষার পরীক্ষা দিতে হইবে (আর্টস্ পরীক্ষার অনুরূপ) এবং তাহার উপর রসায়ন ও গণিত বা পদার্থবিদ্যা লইতে হইবে। এই চারিটা বিষয়ের উপর আর একটা বিষয় লইতে হইবে। (যে কোনও বিজ্ঞান)। প্রাকৃতিক ভূগোল বিজ্ঞানের পর্য্যায়ভুক্ত আছে। এই পাঁচটি বিষয় হইলেই পাশের পক্ষে যথেষ্ট। তবে ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে আরও একটা বিজ্ঞান বা ফরাসী বা জার্ম্মান লইতে পারিবে। তাহাতে যে নম্বর পাইবে তাহা হইতে শতকরা ৩০ নম্বর কাটিয়া বাকী নম্বর অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরে যোগ হইবে, তাহার ফলে ছাত্রগণ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিবে। এই বিষয়টিতে শতকরা ৩০এর কম নম্বর ধর্ত্তব্য নহে। ইংরাজী ও মাতৃভাষা ছাড়া অন্যত্র প্রত্যেক বিষয়ে দুই খানি প্রশ্নপত্র এবং প্রত্যেক প্রশ্নপত্রে পূর্ণসংখ্যা একশত। বিজ্ঞানের 'হাতে কলমে' পরীক্ষা হইবে না কিন্তু 'হাতে কলমে' যে শিক্ষা হইয়াছে কলেজের কর্তৃপক্ষগণ তাহার সার্টিফিকেট দিবেন। পাশের নম্বর ইংরাজী ও মাতৃভাষায় শতকরা ৩৬, এবং অন্যান্য বিষয়ে শতকরা ৩০ ও মোটের উপর শতকরা ৩৪। আর্টস্ পরীক্ষায়ও ঠিক এই নিয়ম।

আমরা বিজ্ঞানপরীক্ষা সম্বন্ধে, পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, এ স্থলেও তাহাই করিব। আর্টস্ পরীক্ষার তুলনায় বিজ্ঞানপরীক্ষা নানারূপে কঠিন করা হইয়াছে। তবে উভয় পরীক্ষায়ই যে পূর্ব্বাপেক্ষা বিষয় সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে, ইহাই পরম লাভ বলিতে হইবে। গণিতে বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম ছয় অধ্যায়ের সমতুল্য আধুনিক জ্যামিতি, Statics, Dynamics, Conics, Solid Geometry সমস্তই আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়জয়কার! এই রক্ষা যে এ বিষয়টা লওয়া না লওয়া ছাত্রগণের ইচ্ছা। তবে এস্থলে একটু খুটুনি কাটা আছে যে, এই পরীক্ষায় গণিত না লইলে উচ্চ পরীক্ষায় গণিত লইতে পারিবে না এবং এই পরীক্ষায় গণিত এবং পদার্থবিদ্যা এই দুইটি বিষয় না লইলে উচ্চপরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন লইতে পারিবে না। গণিতশাস্ত্রের কদর বাড়াইবার পক্ষে এটা একটা পাকা চাল বটে। তবে রসায়নশাস্ত্রের সঙ্গে গণিতশাস্ত্রের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিরূপে হইল ইহা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগোচর। বিজ্ঞান পরীক্ষায় বিষয়নির্দ্দেশ সম্বন্ধে খস্‌ড়া নিয়মাবলীর সঙ্গে নূতন নিয়মাবলীর বিস্তর অনৈক্য আছে।

(গ) ডিগ্রী-পরীক্ষা।

আর্টস্ বিভাগে বি, এ পরীক্ষা ও বিজ্ঞান বিভাগে বি, এস্ সি পরীক্ষা। তবে আর্টস্ বিভাগেও কোনও একটা বিজ্ঞান লওয়া চলে। এস্থলে খস্‌ড়া নিয়মাবলীর বড় একটা পরিবর্ত্তন হয় নাই। ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে কোনও একটি বিষয়ে অনার লইতে পারিবে, একের অধিক বিষয়ে নহে। মাতৃভাষায় অনার নাই। আর্টস্ পরীক্ষার্থীদিগকে ইংরাজী ও মাতৃভাষা লইতেই হইবে। যাহাদের মাতৃভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফর্দ্দভুক্ত নহে, তাহাদিগের জন্য তৎপরিবর্ত্তে ইংরাজীসাহিত্যের আর একখান প্রশ্নপত্র থাকিবে। ইহার উপর ছাত্রগণ কোনও দুইটি বিষয় লইতে পারিবে— যথা, প্রাচীন ভাষা, ইতিহাস, অর্থনীতি এবং রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান, গণিত অথবা কোনও একটি বিজ্ঞান। ইতিহাস ও অর্থনীতি এখন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। এখনকার মত আর্টস্ পরীক্ষার্থী ছাত্রমাত্রকেই দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে না। ইহাতে অনেক ছাত্রের সুবিধা ঘটিবে। যাহারা নিম্নপরীক্ষায় তর্কশাস্ত্র লয় নাই, তাহারা এস্থলে দর্শনশাস্ত্র লইতে পাইবে না। এইরূপ যাহারা নিম্নপরীক্ষায় গণিত লয় নাই, তাহারা এস্থলে গণিত লইতে পারিবে না, যাহারা নিম্নপরীক্ষায় কোনও একটা বিজ্ঞান লয় নাই, তাহারা এস্থলে সে বিজ্ঞান লইতে পারিবে না। সঙ্গত কথা, তবে আশ্চর্য্যের বিষয় ইতিহাস বা প্রাচীন ভাষার বেলায় এ নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়ার আবশ্যকতা হয় নাই। খস্‌ড়া নিয়মাবলীতে এত বাঁধাধরা ছিল না।

বি, এস্ সি পরীক্ষায় কোনও তিনটি বিজ্ঞান লইতে হইবে (গণিতও বিজ্ঞান বিভাগে আছে); মনোবিজ্ঞানও বিজ্ঞানবিভাগে স্থান পাইয়াছে। এস্থলে ইংরাজী সাহিত্য ও মাতৃভাষার ব্যবস্থা নাই। এ ব্যবস্থা বড় সমীচীন নহে আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। আর্টস ও বিজ্ঞান উভয়বিভাগেই বিজ্ঞানের পরীক্ষায় 'হাতে কলমে' পরীক্ষা হইবে এবং তাহার জন্য স্বতন্ত্র পাশের ব্যবস্থা হইয়াছে।

যে সকল ছাত্র নিম্নপরীক্ষায় গণিত এবং পদার্থবিদ্যা লয় নাই, তাহারা বি, এস্ সি পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন লইতে পারিবে না। ইহাতে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন এই দুই বিজ্ঞানপাঠী ছাত্রদিগের পক্ষে প্রকারান্তরে গণিত অবশ্যপাঠ্য করা হইল। তবে বি, এর বেলায় একথাটি বলা নাই।

ইংরাজীতে তিনখানি প্রশ্নপত্র ও মাতৃভাষায় একখানি; অন্যান্য বিষয়ে তিনখানি করিয়া। প্রত্যেক প্রশ্নপত্রে পূর্ণ সংখ্যা একশত। ইংরাজীতে ও অন্যান্য বিষয়ে পাশ নম্বর এক তৃতীয়াংশ, মাতৃভাষায় শতকরা ৩৩। তবে বিজ্ঞানে পূর্ণ-সংখ্যা ৩০০ র মধ্যে যে ১০০ রাখিতে হইবে, তাহার মধ্যে ৬০ পঠিত বিষয়ের উপর, ও ৪০ 'হাতে কলমে' পরীক্ষার উপর। এবং মোটের উপর শতকরা ৩৬ রাখিতে হইবে। সবশুদ্ধ অর্দ্ধেক নম্বর পাইলে সুখ্যাতির সহিত পাশ হইয়াছে বলা হইবে। এটা একটা নূতন ব্যবস্থা।

ইংরাজীতে তৃতীয় প্রশ্নপত্রে প্রবন্ধরচনা এবং অপঠিত পুস্তক হইতে ব্যাখ্যা থাকিবে। তবে অপঠিত পুস্তক নিম্নপরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা কঠিন হইবে না। প্রাচীন ভাষার বেলায়ও অপঠিত গদ্য অংশের ইংরাজীতে অনুবাদ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। সংস্কৃতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রস্তুত ব্যাকরণের রীতিমত স্থান করা হইয়াছে এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসও তৃতীয় প্রশ্নপত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন কালিদাসের গ্রন্থ না দিয়া মাঘ বা ভারবি দিতেই হইবে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। অনার পরীক্ষায় অলঙ্কারশাস্ত্রের ও ছন্দঃশাস্ত্রের স্থান করা হইয়াছে। আমরা দুই বৎসর পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়া এই সমস্ত সংস্কার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তবে নূতনের মধ্যে পাশকোর্শে মনুসংহিতার কিয়দংশ এবং অনারকোর্শে সায়নভাষ্যসমেত ঋগ্বেদসংহিতার কিয়দংশ ধার্য্য হইয়াছে। এইটুকু যেন 'ইদমধিকং' বলিয়া ঠেকে। এস্থলেও মল্লিনাথাদির টীকা পাঠ্যতালিকাভুক্ত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ইন্‌টারমিডিয়েট্ পরীক্ষার বিচারকালে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। মাতৃভাষার বেলায় কেবল মাত্র প্রবন্ধরচনার ব্যবস্থা হইয়াছে, নিম্নের দুইটি পরীক্ষার ন্যায় ইংরাজী হইতে অনুবাদের ব্যবস্থা নাই।

অনার, এম্ এ প্রভৃতি উদ্ধতন পরীক্ষায় যথেষ্ট সমারোহের আয়োজন হইয়াছে। তবে সে সমস্ত লইয়া পুঁথি বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। ঐ সকল পরীক্ষায় সাধারণ ছাত্রদিগের বড় যায় আসে না। প্রায় সকল পরীক্ষায়ই ফীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে; ইহা অবশ্য খসড়া অবস্থায়ই ঘটিয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় দশটাকার স্থলে বারো টাকা, ইন্‌টারমিডিয়েট্ (অর্থাৎ এফ্ এ) পরীক্ষায় কুড়িটাকার স্থলে পঁচিশ টাকা, বি এ পরীক্ষায় ত্রিশ টাকার স্থলে পঁয়ত্রিশটাকা, ও বি এস্‌সি পরীক্ষায় চল্লিশ টাকা হইয়াছে। যখন নূতন ব্যবস্থায় শিক্ষার উন্নতি হইবে, পরীক্ষার প্রণালী সংশোধিত হইবে, এবং উত্তীর্ণ ছাত্রগণের জ্ঞান পূর্ব্ব আমলের ছাত্রগণের অপেক্ষা পাকা হইবে, তখন 'সেলামীর' পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াই ত ন্যায্য। ইহাতে বোধ হয় কেহ আপত্তি করিবেননা।

উপসংহার।

শিক্ষার উন্নতিকল্পেই বিশ্ববিদ্যালয়সংস্কারের ধূয়া উঠিয়াছিল। নূতন ব্যবস্থায় কি কি অংশে শিক্ষার উন্নতির সূত্রপাত হইল, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখিলে মন্দ হয়না। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, অনেকে দোকান খোলার হিসাবে স্কুল কলেজ খুলিতেন, তবে দোকানের সঙ্গে এইটুকু প্রভেদ যে দোকান করিতে অল্পবিস্তর মূলধন দরকার হয়, এস্থলে তাহাও দরকার হইত না। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত করিবার জন্য যেরূপ নূতন নিয়ম হইল তাহাতে আর এরূপ স্কুলকলেজ থাকিতে পাইবে না, ব্যবসার হিসাবে স্কুলকলেজ করা চলিবে না। দ্বিতীয়তঃ, স্কুলকলেজে অনেক স্থলে যেরূপ শিক্ষকনিয়োগ সস্তায় 'নমোনমঃ' করিয়া সারা হইত, তাহাও আর এখন চলিবে না। দেশহিতের জন্য রীতিমত স্কুলকলেজ চালাইতে হইলে তাহাতে বেশ দু'পয়সা খরচ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, নূতন নিয়মে স্কুলকলেজের কর্তৃপক্ষগণের (এবং পরোক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের) ছাত্রদিগের রীতিনীতির উপর খরদৃষ্টি থাকিবে; এখনকার মত নগদমূল্যে বিদ্যাবিক্রয় করিয়া এবং উপযুক্ত মাশুলে বিদ্যার যাচাই করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। চতুর্থতঃ, নিম্ন পরীক্ষায় বিষয়সংখ্যা কমানতে এবং উচ্চনীচ সকল পরীক্ষায় ছাত্রগণকে নিজের শক্তি ও পছন্দমত বিষয় নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা দেওয়াতে ছাত্রদিগের ভার যথেষ্ট লঘু হইবে; এখন তাহাদের শিখিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইবে এবং শিক্ষাকার্য্যে উৎসাহ ও আনন্দ হইবে। পঞ্চমতঃ, ছাত্রগণকে এইরূপ স্বাধীনতা দেওয়াতে শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিমাণ স্থলবিশেষে বাড়াইবার ও পাশের নম্বর উচ্চ করিবার অবসর হইল, কোনও অবিচার অত্যাচার হইল না; ইহাতে শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি হইবে। ষষ্ঠতঃ, ছাত্রগণ মুখস্থ বিদ্যার জোরে তরিয়া যাইতে পারিবেনা এই নিয়ম করাতে শিক্ষক ও ছাত্র উভয় পক্ষই সঙ্গত ও সাধু উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। ইহার ফলেও শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি হইবে। অপদার্থ শিক্ষক, ফাকিবাজ ছাত্র এবং ব্যবসাদারী বিদ্যালয় এই ত্রিবিধ উপসর্গ দূরীভূত হইলেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা দুর্ণাম ছিল যে কেবল পরীক্ষা কার্য্য (কেহ কেহ বলিবেন, সংহারকার্য্য) বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়। নূতন ব্যবস্থায় সে দুর্ণাম ঘুচিল। এখন বিশ্ববিদ্যালয়, উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ হইলে, অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে পারিবেন অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে শিক্ষাদান করিতে পারিবেন। এবং সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার গবেষণা প্রভৃতির জন্য পুরস্কার বৃত্তি প্রভৃতি দিতে পারিবেন। বাঙ্গালাভাষায় প্রাচীন গ্রন্থাদির

প্রকাশক বা সম্পাদককে এইরূপে উৎসাহিত করিতে পারিবেন সেকথা পূর্ব্বপ্রবন্ধে সবিস্তারে বলিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাত্রদিগকে মাতৃভাষায় রচনাশক্তির সম্যক্ পরিচয় দিতে হইবে এই ব্যবস্থাটি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মায়াদেবীর দেবপূজা।

"অগ্নিদেব, দেব প্রভাকর,
স্বর্ণ-বর্ণে প্রদীপ্ত সুন্দর,
পুণ্যতাপে দগ্ধ কর পাপ!
সুখসিন্ধুনিধি চন্দ্র, তারা,
কিরণেতে করুণার ধারা
বরষিয়ে হরিও সন্তাপ!"

শুচিস্নাতা মায়াদেবী, কৌষিকবসনে
উজলি সুবর্ণ কান্তি, বসি কুশাসনে—
বিরচি অঞ্জলি রক্তকরপদ্মদলে,
শুক-সুকোমল কণ্ঠ বেড়িয়া অঞ্চলে—
গাহি স্তুতি প্রণমিয়া দেবতা চরণে,
স্তম্ভিত করিলা দৃষ্টি আয়ত নয়নে।

নিজ হাতে রাজরাণী ভিখারীর হাতে
দিবেন বসন অন্ন; তাই শুভ প্রাতে
দ্বারেতে দরিদ্র কত বসি অপেখিয়া,—
'দে বসন, দে মা অন্ন' কহিল ডাকিয়া।
বসি পুত্রার্থিনী দেবী পূজার ভবনে
শুনিলেন "মা মা" ধ্বনি ভিখারীবদনে।

মাতৃসম্ভাষণ কর্ণে মধু উগারিল;
'এস বাছা' বলি' যেন প্রাণ উত্তরিল।
উছলিল স্নেহসুধা জগতের হিতে।
চলিলেন ধীরপদে ভাবিতে ভাবিতেঃ—
"যৌবন সেবায় তৃপ্তা নহে রে রমণী;
এ জীবন হয় ধন্য, হইলে জননী।"

দরিদ্রে বিতরি' অন্ন বসন সুন্দর,
তৃপ্তি সুখে পরিপূর্ণ করিয়া অন্তর,
প্রবেশিতে কক্ষমাঝে হেরিলেন রাণী
রাজা শুদ্ধোদন দেবে। বক্ষ মাঝে টানি
আদরে চুম্বিয়া স্নাত মুখপদ্ম, পতি
কহিলেন, "কি সুন্দর শোভিয়াছ সতী।"

মাতৃত্ব-গৌরব-স্বপ্নে পূর্ণ ছিল প্রাণ।
অধর-অমৃত সহ করিলেন দান
যৌবন-কুসুম-অর্ঘ্য পতি-পদ-তলে।
ত্রিদিবে দেবতা-বক্ষে জগত-মঙ্গলে
উছলিয়া বরষিল করুণা-নির্ঝর।
সুলভ প্রীতির মন্ত্রে দেবতার বর।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত



দ্রৌপদী ও কীচক।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

প্রবাসী

"Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters."
"to look on noble forms
Makes noble thro' the sensuous organism
That which is higher."—*Tennyson.*

৬ষ্ঠ ভাগ। | কার্ত্তিক, ১৩১৩। | ৭ম সংখ্যা।

কাব্যের অভিব্যক্তি।

গত শ্রাবণের বঙ্গদর্শনে "কাব্যের প্রকাশ" নামক একটি প্রবন্ধ পড়িলাম। তাহা অস্পষ্ট কাব্যের সমর্থন। শুদ্ধ তাহা নহে, যাঁহারা স্পষ্ট কবি, লেখক তাঁহাদিগকে একটু ব্যঙ্গ করিতেও ছাড়েন নাই। যদি এটি রবীন্দ্র বাবুর মতের প্রতিধ্বনি মাত্র না হইত, তাহা হইলে ইহার এই প্রতিবাদ করিতাম না।

লেখকের মতে এই অস্পষ্ট কবিদিগের মধ্যে একটা "বৃহৎ আইডিয়া" আছে। "সেই আইডিয়াটি দু'এক কথায় বুঝাইবার নহে—তাহা অনেকাংশে কবির নিকটেই প্রচ্ছন্ন।"

লেখক একটা কারণ দিলেন যে এই অস্পষ্ট কবিগণ কেন অস্পষ্ট। তাহাদের মধ্যে একটা "বৃহৎ আইডিয়া" বা ভাব আছে। কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ দিয়াছেন কি? কাব্য অস্পষ্ট হইবার নানা কারণ থাকিতে পারে। যথা—(১) ভাবের জড়তা, (২) ভাষার দৌর্ব্বল্য, (৩) অবহেলা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বঙ্গীয় কবিগণের কাব্যের অস্পষ্টতা যে উপরোক্ত কোন কারণপ্রসূত নহে, সে যে "বৃহৎ আইডিয়ার" বা বৃহৎ ভাবের ফল, তাহা লেখক প্রমাণ করিবার চেষ্টাও করেন নাই।

লেখক সম্ভবতঃ নিম্নবৎ যুক্তি করিয়াছেন—

(১) ভাব অত্যন্ত গভীর হইলে ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না।

(২) এ কবিতাটির ভাব ভাষায় প্রকাশ করা যায় নাই।

(৩) অতএব এ কবিতাটির ভাব অত্যন্ত গভীর।

এরূপ যুক্তিকে ইংরাজি ন্যায়শাস্ত্রে fallacy of undistributed middle বলে।

কাব্যের জড়তা সাধারণতঃ আইডিয়ার জড়তা হইতেই প্রসূত হয়। যেখানে আইডিয়া স্পষ্ট, সেখানে ভাষা প্রাঞ্জল। যেখানে আইডিয়া অনেকাংশে কবির নিজের নিকটেই প্রচ্ছন্ন, সেখানে ভাষা অবশ্য অস্পষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু সেটা বৃহৎ আইডিয়ার ফল নহে, অস্পষ্ট আইডিয়ার ফল।

বঙ্গের অস্পষ্ট কবিগণ বড়ই অধিক শেলি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও ব্রাউনিঙ্গের দোহাই দেন। এই ইংরাজ কবিগণ স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ্য বটে। কিন্তু (ব্রাউনিং ছাড়া) তাঁহাদের কাব্যের মূল বা কেন্দ্রস্থ ভাব ধরিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু আমাদের বঙ্গীয় অস্পষ্ট কবিগণের কাব্যে কোন ভাবই ধরা যায় না। শেলি ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ অনেক সময় অনেকখানি ভাব অল্প কথায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে

অনেক স্থলে ভাব ঘনীভূত হইয়া কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে; কোন কোন ভাব এত বেশী ঘনীভূত হইয়াছে, যে, দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে ও সৌন্দর্য্যের হানি করিয়াছে। কিন্তু ঐ কবিগণ নিজের ভাব নিজে বুঝিয়াছিলেন নিশ্চয়ই। তাঁহারা যদি সে সব কবিতা সাধারণ দুই চারিজন পাঠককে শুনাইয়া ছাপাইতেন, যে স্থানে কবিতাটি দুরূহ সে স্থানে আরো সুবোধ্য করিয়া দিতেন বোধ হয়। তাঁহারা ভাব লইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই ভাব ভাষায় যখন ভাব প্রকাশ করিলেন, তখন ভাবিলেন যে, ভাব বেশ প্রকাশ হইয়াছে; কারণ তাঁহাদের ত সে কবিতার ভাব বুঝিতে কোন কষ্ট বোধ হইতেছে না। কিন্তু কবিতার ভাষা হইতে ভাব যে পাঠকের টানিয়া বুঝিতে হইবে, তাহা তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ভুলিয়া যান। আমি বলিব শেলীই হৌন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থই হৌন, আর গেটেই হৌন, অত্যধিক দুর্ব্বোধ্যতা তাঁহাদের দোষ, গুণ নহে। তাঁহারা স্বয়ং বা তাঁহাদিগের কোন বিশিষ্ট সমালোচক সে গুলিকে গুণ বলিয়া ধরেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের গুণের ভাগ এতই অধিক, কাব্যের সৌন্দর্য্য ও স্বাভাবিকতা এতই মর্ম্মস্পর্শী, ভাবের ভাণ্ডার এতই অক্ষয়, যে, সেই গুণের খাতিরে আমরা তাঁহাদের সে দোষ ক্ষমা করি।

তাঁহারা যে ভাব লইয়া বসিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের প্রত্যেক কাব্যেই দেখিতে পাই। কারণ সে কবিতাগুলির মূলভাব বুঝিতে কষ্ট হয় না। দু'চারিটা শ্লোক বুঝিতে কষ্ট হয় বটে। কিন্তু আমাদের দেশের আধুনিক অস্পষ্ট কবিগণের দুই এক শ্লোক নহে—সমস্ত কবিতাটির খুঁজে না পাওয়া যায় মাথা, না পাওয়া যায় লাঙ্গুল। মাথা খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে কোনই ভাব পাওয়া যায় না। বাঙ্গালীর যা স্বভাব—আমাদের কবিরা ইংরাজি কবিগণের গুণভাগ অনুকরণ না করিয়া দোষভাগ অনুকরণ করিয়াছেন।

একটা উদাহরণ লইতে হয়। আমাদের দেশে এই অস্পষ্ট কবিদের অগ্রণী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অতএব তাঁহার কাব্য হইতেই উদাহরণ লইতে হয়।

রবি বাবুর ভক্তগণ রবি বাবুর 'সোনার তরী'কে তাঁহার সকল কবিতার প্রায় শীর্ষে স্থান দেন। সভায় সভায় ইহার আবৃত্তি হইয়াছে। একজন সমালোচক এইটি পড়িয়া লিখিয়াছিলেন যে, "তাঁহার সোনার লেখনী অক্ষয় হউক"। দেখা যাক ইহার সৌন্দর্য্য কোথায় ও এ কাব্য হইতে কি ভাব সংগ্রহ করিতে পারি। বলা বাহুল্য কবিতাটি যার-পর-নাই অস্পষ্ট।

প্রথমতঃ দেখা যাক কবিতার গদ্যার্থ কি দাঁড়ায়।

কবিতাটির গদ্যার্থ এই:

একজন কৃষক শ্রাবণ মাসে রাশি রাশি ধান কাটিয়া নির্ভরসা হইয়া কূলে বসিয়া আছে। পরে সে দেখিল যে এক "যেন চিনি" মাঝি পাল তুলিয়া দিয়া নৌকা করিয়া যাইতেছে। সে তাহাকে ডাকিয়া ধানগুলি দিল। পরে নিজেও যাইতে চাহিল। মাঝি তাহাকে লইয়া যাইতে অস্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল। কৃষক শূন্য নদীর তীরে পড়িয়া রহিল।

এখন কবিতাটির গদ্যার্থ যা দাঁড়ায় তাহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। কোন কৃষক রাশি রাশি ধান কাটিয়া, কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া, কূলে নির্ভরসা হইয়া বসিয়া থাকে না; সে ধান সে বাড়ী লইয়া যায়। এবং কোন কৃষক ধান কাটিয়া গৃহে না লইয়া গিয়া, স্ত্রীপুত্রগণকে বঞ্চিত করিয়া এক "যেন মনে হয় চিনি" "মাঝির সহিত পলাইয়া যাইতে চাহে না। কৃষকের নির্ভরসা হইবার কোনই কারণ কবিতার কোন স্থানে পাওয়া যায় না। বরং রাশি রাশি ধান কাটিয়া তাহার বিশেষ উৎফুল্ল হইবারই কথা। কবিতাটি নিশ্চয় রূপক। কবি তাঁহার "বৃহৎ আইডিয়া" প্রকাশ করিবার জন্য যে উপমা বাছিয়া লইয়াছেন, তাহা মূলে অস্বাভাবিক। তবে ইহা হইতে পারে যে কৃষক হয় উন্মাদ না হয় কবি। কিন্তু এরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব কৃষকচরিত্র একটা উপমাস্বরূপ লওয়া যাইতে পারে না। প্রকৃতির যে রূপ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই উপমাস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। যদি কোন কবি কহেন, যে, সেই আজানুলম্বিতবাহু গুম্ফময়ী রমণী গম্ভীরস্বরে তাঁহার কোকিলকণ্ঠ কুঞ্চিত-দীর্ঘকেশ কুসুমকোমল স্বামীকে কহিলেন, "চন্দ্রবদন! কেন মান করিয়া বসিয়া আছ";—তাহা রূপকস্বরূপ ব্যবহৃত হইলে, তাহা হইতে হাস্যরস ভিন্ন অন্য রস বা অন্য ভাব কোন রূপেই মনে আসিবে না। অথচ নারীর গুম্ফ, দীর্ঘবাহু ও গম্ভীরস্বরও দেখা গিয়াছে এবং পুরুষের কোমল-

কণ্ঠ, কোমলদেহ ও কুঞ্চিতকেশও দেখা গিয়াছে। অসম্ভব কিছুই নহে। তবে যখন কোন প্রাকৃতিক বিষয় উপমা দিতে হইবে তখন তাহার প্রচলিত জাত্যর্থ লইতে হইবে। আকাশের মত নীলই বলে; আকাশের মত ধূসর বলে না—যদিও আকাশ কখন কখন ধূসরও হয়।

এখন পাঠক দেখিলেন ত যে উপমা কিরূপ স্বাভাবিক। ইহা হইতে আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিতে হইবে। এই কবিতার আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিবার জন্য রবি বাবুর অনেক ভক্তের নিকটে গিয়াছি। তাঁহাদের—"এ্যা—ও—কি জানেন" ইত্যাদিই প্রায় শুনিয়াছি। কোন আদ্যন্তসঙ্গত ব্যাখ্যা পাই নাই। কেবল রবি বাবুর একটি ভক্তের নিকট একটি ব্যাখ্যা পাইয়াছি—যাহা কতক লাগসৈ বোধ হইল। সেটি এই।—কবি তাঁহার জীবনের সঞ্চিত ধন তাঁহার জীবন-দেবতার (idealএর) পদে সমর্পণ করিলেন; পরে নিজের জন্য কিছু চাহিলেন। জীবন-দেবতা তাঁহার ধনরাশি অর্থাৎ পরিশ্রমের ফল লইলেন, পুরস্কার দিলেন না। অর্থাৎ সকলেরই নিজের কর্ম্ম দেবতার চরণে অর্পণ করিবার অধিকার আছে; পুরস্কারে তাঁহার কোন দাবী নাই।

ব্যাখ্যাটি বেশ আধ্যাত্মিক। ইহা ভগবদ্গীতার কথা। কিন্তু কবিতা হইতে কি এই অর্থ দাঁড়ায়?

যিনি আমার দেবতা, তিনি আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিদ্যমান। তিনি এই মাঝির মত কোথা হইতে আসিয়া ভাসিয়া বিদেশে চলিয়া যান না। যিনি এরূপ আসিয়া ভাসিয়া চলিয়া যান, যাঁহাকে "যেন মনে হয় চিনি," তাঁহাকে কেহই সর্ব্বস্ব অর্পণ করে না। তাহার পরে এই "বিদেশে" "কোন দিকে নাহি চায়" "গান গায়," "ছোট সে তরী" এ সকলেরই বা আধ্যাত্মিক অর্থ কি? ব্যাখ্যাকার বলিবেন যে ওসবগুলো উপসর্গ। সব কথারই কি আধ্যাত্মিক অর্থ থাকিবে!—ভালো! তাহার পর এক শ্লোকে কবি আরাধ্য দেবতাকে তাঁহার সর্ব্বস্ব বিনা সর্ত্তে দান করিতে চাহিতেছেন; পর শ্লোকেই বলিতেছেন, "আমাকে লহ করুণা করে"! একি সুসঙ্গত? ভক্ত বলিবেন হয় ত এটি কবির চিন্তান্তর (after thought.) যখন কবি দেখিলেন যে দেবতা সর্ব্বস্ব লইয়া চলিয়া যান, তখন তাঁহার ঐ সর্ব্বস্বের জন্য মায়া হইল, তাই সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। কিন্তু আমি বলি যখন এ স্বার্থচিন্তা কবির সম্ভব, তখন ধান বিলাইয়া দিবার জন্য পূর্ব্বক্ষণেই তাঁহার এত আগ্রহ অসম্ভব। তাহার পরে সর্ব্বস্ব স্বেচ্ছায় বিলাইয়া দিয়া কবির শেষে এরূপ হতাশ ভাব (যাহা শেষ শ্লোকে পাই তাহা) অস্বাভাবিক। আর "আমাকে লহ" ইহার অর্থ কি সত্যই এই দাঁড়ায় যে "আমায় কিছু দাও?"

কবিতাটির ছয়টি ক্ষুদ্র শ্লোক। তাহার মধ্যে মূলভাবগুলি এত পরস্পর বিরোধী! কি করিয়া বুঝিব যে কবিতাটির অর্থই ঐ। তাহার পরে কর্ম্মীর ফলাফল দাবী করা উচিত নহে, কিন্তু কৃষক তাহা দাবী করিতেছেন। কর্ম্মী ফলাফল দাবী না করিলেও কে অস্বীকার করিবে, যে, সে ফলাফল আছে; যে, কর্ম্মীর প্রত্যেক কর্ম্মের ফল কর্ম্মী অযাচিতভাবেও লাভ করে। জীবনে একটি চিন্তা নাই, একটি কার্য্য নাই, যাহা চরিত্র গঠন না করে; এবং যাহা তাহার লাভ বা লোকসান স্বরূপ না হয়। কিন্তু এ কবিতায় দেখিতেছি, দেবতা কবিকে তাঁহার কর্ম্মের কোন ফলই দিলেন না, যদি কবি নিজে তাহা চাহিলেন। ইহা গীতাবাদের ঠিক্ বিপরীত।

আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিব বলিয়া বসিলে "পাখী সব করে রব" হইতে তাহা বাহির করা যায়। কালিদাসের বিবাহে দুষ্ট পণ্ডিতেরা মূর্খ ব্রাহ্মণের চাষাড়ে অঙ্গভঙ্গী হইতে দ্বৈতবাদ, পঞ্চভূতের সমষ্টি ইত্যাদি নানারূপ নিগূঢ় অর্থ বাহির করিয়াছিলেন।

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ বিলাতের এক অতি দুর্ব্বোধ্য কবি। তাঁহার Ode on the Immortality of the Soul এক অতি দুর্ব্বোধ্য কবিতা। এ দীর্ঘ কবিতাটির মধ্যে পরস্পরবিরোধী একটি ভাব নাই। সে কবিতাটি বোঝা যায়। পরের ভাষায় পরের দেশের প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বোধ্য কবির প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বোধ্য কবিতা বুঝিতে পারি। কিন্তু আমার মাতৃভাষায় আমার বাঙ্গালীভ্রাতার কবিতা বুঝিতে গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হয়। এই যদি ইঁহাদের বৃহৎভাবের ফল হয় ত বলিতে হইবে, যে, সে ভাব বড়ই বৃহৎ। কারণ এ কবিতাটি দুর্ব্বোধ্য নয়, অবোধ্যও নহে—একেবারে অর্থশূন্য, স্ববিরোধী।

পাঠক কবিতাটির গদ্যার্থ দেখিলেন, পদ্যার্থও দেখিলেন,

এখন দেখুন ইহার বর্ণনা কিরূপ স্বভাবসঙ্গত। কৃষক ধান কাটিতেছেন বর্ষাকালে, শ্রাবণ মাসে। বর্ষাকালে ধান কেহই কাটে না; বর্ষাকালে ধান্য রোপণ করে। ধান তিন প্রকার (১) হৈমন্তিক তাহাই কৃষকের আসল ধান্য—কাটে হেমন্তকালে, অগ্রহায়ণ মাসে: (২) আশু (নিজে খাইবার জন্যই প্রায় করে)—কাটে শরৎকালে, ভাদ্রমাসে; (৩) বোরো (উড়িষ্যা অঞ্চলেই অধিক হয়)—কাটে গ্রীষ্মকালে, বৈশাখ মাসে। কবি এমনি কল্পনা করিয়াছেন যেন ইচ্ছা করিয়া প্রকৃতির পাশ কাটিয়া গিয়াছেন। নহিলে অন্ধকারে ঢিল মারিলেও হয় ত তিনটার মধ্যে একটায় লাগিত। রবি বাবুর এক ভক্ত এক ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, তাহা এতই মনোরম যে আমি তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন—"যদি এ আশুধান্য হয় ও এটা বত্রিশে শ্রাবণ হয়।* পরের দিনই ত ভাদ্র।" তিনি ত ইহাও বলিতে পারিতেন, যে, কৃষক ত দেখা যাইতেছে পাগল, যদি ধান না পাকিতেই কাটিয়া থাকে। বলদ যদি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় নাড়ে। রবীন্দ্র বাবু যদি জানিতেন যে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার দুই এক ভক্ত কি বিপদগ্রস্ত হ'ন! যাক্।—তাহার পরে শ্রাবণ মাসে "এল বরষা" কিরূপ? বঙ্গদেশে আষাঢ় মাসেই বর্ষা আসে। তাহার পরে "একখানি ছোট ক্ষেত" হইতে "রাশি রাশি ভারা ভারা" ধান হইয়াছে! ক্ষেত বড়ই উর্ব্বরা! ক্ষেতের "চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।" ক্ষেত খানি তবে একটি দ্বীপ। তবে এ চর জমি। এরূপ জমিতে ধান করে না। এ সব জমি শ্রাবণ ভাদ্রমাসে ডুবিয়া থাকে। শীতকালে নদীগর্ভ হইতে বাহির হয়। তাহার পরে এক শ্লোকে পড়িলাম মাঝি "তরী বেয়ে" আসিতেছে! তাহার পরেই দেখি "ভরা পাল"। এরূপ অবস্থায় অর্থাৎ ভরা পালে কেহই তরী বায় না। শ্লোকের এক ছত্রে দেখিলাম নৌকা "আসে পারে"। পরে একছত্রে দেখি সে যায় "কোন্ বিদেশে"। নিশ্চয় মাঝি নৌকা হঠাৎ ফিরাইয়া লইয়াছে। পরপারে তরুছায়া মসীমাখা মেঘে ঢাকা গ্রামখানির ছবিখানি রবি বাবুর এই ভক্তদের নিশ্চয় বড়ই ভালো লাগিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেঘে ঢাকা গ্রামে তরুচ্ছায়া হয় না, অন্ততঃ এপার হইতে তাহা দেখা যায় না। রৌদ্র হইলেই ছায়া হয়। তাহার পরে "শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন-মেঘ ঘুরে ফিরে"—কি শব্দবিন্যাস! আহা! তবে কি না শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ জমাট হইয়া একদিক হইতে আর এক দিকে আসে—সে লাঠিমের মত "ঘুরে ফিরে" না। —রবিবাবুর অন্ধ ভক্তগণ বলিবেন আঃ ওসব ধরিতে নাই। কেমন শুনাতে বল দেখি "শ্রাবণ গগন ঘিরে"—যেন কেহ ধাই করিয়া তবলায় চাঁটি দিল—তাহার পরে হউক বেতালা। কিন্তু ললিত শব্দবিন্যাস হইলেই বর্ণনা উত্তম হয় না। যদি কেহ লেখেন "মধুর আষাঢ় মাসে আহা কি মলয় বায়, সুনীল জলধি জল, কমল ফুটেছে তায়"; তাহার পর "মরি হায়" ভিন্ন আর কিছু শীঘ্র মুখে আসে না।

তাহার পর এ কবিতায় "খরপরশা" "কোন দিকে নাহি চায়" "থরে বিথরে" ইত্যাদি সব "ধরে ভদ্রে" মিল, কোনই অর্থ নাই। রবীন্দ্র বাবু এই কবিতা লিখিতে যেন কলম এলাইয়া দিয়াছেন। সুর নাই, তাল নাই, অথচ এই কবিতা পড়িয়া তাঁহার অন্ধ ভক্তগণ মোহিত। কেন? কারণ হেঁয়ালী বোঝা যায় না, এও বোঝা যায় না। তার উপর রবীন্দ্রবাবু স্বয়ং এ কবিতা লিখিয়াছেন! একি হয় যে এ কবিতার অর্থ নাই? আর লেখকের মতে অর্থ যদি বোঝাই গেল সে ত পদ্য হইয়া গেল?—গভীর!

আমি এ কবিতাটির একটু দীর্ঘ ও তীব্র সমালোচনা করিলাম। কারণ রবীন্দ্রবাবুর অনেক ভক্তদের মুখে এ অর্থহীন কবিতাটির বড়ই বেশী প্রশংসা শুনিতে পাই। আমার বলা উদ্দেশ্য, যে হেঁয়ালিতে কবিতা লিখিলেই কবিতা উত্তম হয় না। অনেক সময় আমার মনে হয় যে নব্য কবিগণ (অর্থাৎ যাঁহারা রবি বাবুর শিষ্য, তাঁহারা) ইচ্ছা করিয়া, চেষ্টা করিয়া, অর্থ ঢাকিয়া পদ্য লেখেন। কবিতা হেঁয়ালী নহে। কবিতা মিষ্ট ছন্দোবদ্ধ নহে। যে কবিতা পড়িতে পড়িতে হৃদয় আলোড়িত হয়, উৎসাহে আনন্দে, কারুণ্যে হৃদয় ভরিয়া যায়, যাহা প্রকৃতির বা মানব-হৃদয়ের সুচিত্র, যাহা আত্মাকে প্রসারিত করে ও বহির্জগতের দিকে মহা সহানুভূতিতে টানিয়া লইয়া যায়, তাহাই কাব্য। কাব্য

* এরূপ হইতে পারে যে কোন স্থানে কোন বৎসর কেহ শ্রাবণ মাসে আশু ধান কাটিয়াছে। কিন্তু এরূপ exceptional instance উপমায় দেয় না।

যদি দুর্ব্বোধ্য হয় তাহা হইলে এ উদ্দেশ্য সুসাধিত হয় না। রবি বাবুর অন্ধ ভক্তদিগকে রবি বাবুরই "যেতে নাহি দিব" "পুরাতন ভৃত্য" ইত্যাদি বহু কবিতা, যাহা তাঁহার নিজস্ব; যাহা প্রতীচ্য বা পুরাতন প্রাচ্য কবির অধম অনুবাদ বা অন্বয় নহে; বা নিজের কষ্ট কল্পিত অধমতম হেঁয়ালী নহে; যাহা মনুষ্য-হৃদয়ের কমনীয় চিত্র; তাহাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সত্যই তাহা পড়িতে পড়িতে তাঁহারা আনন্দ পাইবেন; নিষ্ফল মাথা ঘামাইতে হইবে না। তাঁহাদের রবি বাবুই অনেক সত্যই উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহারা তাহা ছাড়িয়া এই অর্থশূন্য শব্দসমষ্টির দিকে কেন মনোনিবেশ করেন, জানি না।

লেখক একস্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন—যে এই অস্পষ্ট কবিগণ কলম ধরিলেই কাব্য বা গান তৈয়ার হইয়া যায়; তাহার পর কবি নিজে আশ্চর্য্য হইয়া তাহা অবলোকন করেন। অর্থাৎ কাব্য বা গান তাঁহার প্রায় অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া যায়—যেন গুটিস্থতা;—টানিলেই হইল !!!

উৎকৃষ্ট কাব্য লেখা যে এত সহজ হইতে পারে, তাহা আমার জ্ঞান ছিল না। যাহা কিছু পৃথিবীতে উৎকৃষ্টরূপে রচিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ পরিশ্রম করিয়া রচনা করিতে হইয়াছে। কি যুদ্ধ, কি নৌবিদ্যা, কি চিত্রকলা, কি সঙ্গীত-শাস্ত্র—সব বিদ্যাতেই পরিশ্রম দরকার। কবিতা কি একা পরিশ্রমের রাজ্যের বাহিরে? কলম ধরিলেই হইল! লেখক যেন এমার্সনের বাক্য মনে রাখেন যে Genius is capacity for taking infinite pains. অর্থাৎ প্রতিভা অসীম শ্রম করিবার ক্ষমতা।

তবে এরূপ হইতে পারে যে, এই নব্য কবিদিগের ভাব এতই গভীর যে মানবীয় ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। যেখানে ভাবের অনুরূপ ভাষা সৃষ্ট হয় নাই (যদিও তাহা সম্ভব কি না তাহা একটি সুন্দর দার্শনিক সমস্যা) তখন অবশ্য কিরূপে তাহা প্রকাশ করা যাইবে!—

তাহা হইলে ভাব যে গভীর তাহা কবির নিজের সিদ্ধান্ত মতে পাঠকের ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ তাহা জানিবার অন্য উপায় নাই।

পৃথিবীর সর্ব্বদেশে সর্ব্ব কবি কিন্তু এই ক্ষুদ্র মানবীয় ভাষায়ই তাঁহাদিগের ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কবি কেন? আমাদের অবতারগণ (বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ) এই মর্ত্তের ভাষায়ই তাঁহাদের নূতন ভাব সকল প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহা সকলে জলের মত বুঝিতেছে। তবে কি বুঝিতে হইবে যে আমাদের এই নব্য কবিগণের ভাব উক্ত মহাত্মাগণের ভাব অপেক্ষাও মহৎ?

লেখক লিখিয়াছেন, "বহুদিন ধরিয়া যে জিনিষটা আমার মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে তাহাকে এক মুহূর্ত্তে পরিষ্কার করিয়া কি করিয়া বা বলা যাইবে!" আমি উত্তরে বলি সময় লউন, এক মুহূর্ত্তে নাই বা বলিলেন। তবে, রাশি রাশি বস্তা বস্তা কাব্য লিখিয়াও যদি সে মহৎ বৃহৎ ভাব প্রকাশ না হইল, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে কবির সে "মহৎ ভাব" দাবী করা একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা দাবী।

আসল কথা দাঁড়ায় এই যে, আধুনিক অস্পষ্ট বঙ্গ কবিগণ সাধারণতঃ কোন আইডিয়া লইয়াই চলেন না। লেখক স্বীকার করিতেছেন যে "যেখানে আমি জানিনা আমি কি বলিতে যাইতেছি" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বলি যখন আপনি জানেন না কি বলিতে যাইতেছেন, তখন কিছু না বলাই ভালো।

এ প্রবন্ধে স্পষ্ট কবিদের উপর বিদ্রূপ আছে। তাঁহাদের কেহই বড় বলে নাই। শেক্স্‌পীয়ার, কালিদাস, বায়রন্, ভিক্টর হিউগো, মাইকেল—এঁদের কেহই কি বড় বলে নাই? শেলীর skylark ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের গার্হস্থ চিত্রগুলি, বার্ণসের "For a that" বঙ্কিমবাবুর "বন্দে মাতরম্", হেম বাবুর "ভারত সঙ্গীত"কে কেহ উচ্চ কাব্য কহে নাই?

—আস্পর্দ্ধা!

যে সব গানে ও কবিতায় একটা একটা জাতির বা শ্রেণীর উপকার হইয়া গিয়াছে, মানুষকে আরও স্বর্গের দিকে লইয়া গিয়াছে, সেগুলি কাচের মত স্বচ্ছ। যেখানে সত্য সত্যই অনুভূতির তাড়নায় কাব্য লিখিত হয়, সেখানে উপযোগী ভাষা আপনি আসিয়া পড়ে (অবশ্য সমুচিত ভাষা জ্ঞান থাকিলে)। যেখানে কষ্ট কল্পনা সেখানে ভাষাও খঞ্জ।

যদি স্পষ্ট করিয়া লিখিতে না পারেন, সে আপনার অক্ষমতা। তাহাতে গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। অস্পষ্ট হইলেই গভীর হয় না; কারণ ডোবার পঙ্কিল জলও অস্পষ্ট, স্বচ্ছ হইলে shallow বা অগভীর হয় না; কারণ, সমুদ্রের

জলও স্বচ্ছ; অস্পষ্টতা লইয়া বাহাদুরী করিয়া,"miraculous" দাবী করিয়া, স্পষ্ট কবিদের ব্যঙ্গ করিবার কারণ নাই। অস্পষ্টতা একটা দোষ; গুণ নহে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সেবিকা।

গৌড়নগরনিবাসিনী শ্রীমতী কুলীনকন্যা, কুলীনপত্নী, কৌলীন্যের অন্যতম প্রথম বলি। শৈশবে জ্ঞানাবকাশের পূর্ব্বেই সামাজিক উপদ্রব বিবাহ নামক একটা উপসর্গ তাহার জীবনে ঘুটিয়াছিল; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। সজ্ঞানে এক দিনের জন্যও স্বামী নামক অপূর্ব্ব জীবের শ্রীপদারবিন্দ-সন্দর্শন তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

স্বামিদেবতা বিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিয়া, কাল তাহাকে ভুলিয়া ছিল না। কালে ফুল্ল যৌবনশ্রী তাহার নিতান্ত অজ্ঞাতসারেই তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল; পুষ্পস্তবক-বিভূষণা নবমল্লিকার মত শ্রীসম্পদে দীপ্ত হইয়া উঠিল। নয়নে অলসমদিরভাব, চরণে সবিলাস গতি, সর্ব্বাঙ্গে সরম-সঙ্কোচ জাগিয়া উঠিল; মানসক্ষেত্রে মনোভব সমরতাণ্ডবে নাচিয়া উঠিল। সামাজিক শাস্ত্র প্রতিনিয়ত তাহার কর্ণরন্ধ্রে স্বামিদেবতার বিচিত্র মাহাত্ম্যের দুন্দুভিনিনাদ করিতে থাকিলেও, বিষমসমরবিজয়ীর বিজয়নিশান প্রণয়াকাঙ্ক্ষা বিচিত্র বিভবে প্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল।

একদা বিহঙ্গসঙ্গীতনন্দিত পুষ্পবহুল বসন্তের অরুণিত প্রভাতে সে দেখিল গঙ্গাস্নাত, কৌষেয়পরিহিত গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী হাতে সাজি ধরিয়া পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছে; নবারুণের লালিমদ্যুতি তাহার তিলকাগ্রপুণ্ড্রচর্চ্চিত প্রশান্ত প্রশস্ত ললাটে মহেশের শশিনেত্রের মত জ্বলিতেছে। পুষ্প-বনে দীপ্ত স্থলপদ্মের মত তাহাকে দেখিয়া শ্রীমতীর ভ্রমরকৃষ্ণ চক্ষু চঞ্চল হইল, মনোভব হাসিল, শ্রীমতীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—

'তুমি কে, তুমি কে গো, এই দীপ্ত প্রভাতে পুষ্পবনে অরুণের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছ? তোমার বৈদ্যুতশক্তি যে আমার অন্তরের অন্তরে প্রস্তুত হইয়া পড়িল! এ কি, ওগো এ কি! আমার প্রাণে আজ মধুপঝঙ্কৃত শত শতদল বর্ণগন্ধ-গানে এক সঙ্গে কেন ফুটিয়া উঠিল? এস, এস, ওহে শতদল-বিহারী আমার অন্তরে এস, ভাবরাগবাকতানে তোমার পূজা করিব, এস এস হে'।

শ্রীমতী দাবদগ্ধা হরিণীর মত শ্রীমতী সর্ব্বসন্তাপহা শীতল জাহ্নবীজলে গিয়া পড়িল, তবু চিত্তজ্বালা নিভিল না; 'শিবায় নমঃ' বলিয়া ফুল দিতে গিয়া 'গোবিন্দায় নমোনমঃ' বলিয়া অন্তরবিজয়ার পূজা করিল। শ্রীমতী গহন মাঝে দিক্‌বিদিক্ হারা হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল—

'হে ভগবান, এ কি করিলে, এ কি হইল? এই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকে আবাল্য কতদিন কতবার দেখিয়াছি, কিন্তু আজ এ কি কুক্ষণে বা সুক্ষণে সে আমায় দেখা দিল? হে অন্তর্য্যামী, তার মধ্যে আজ এমন কি ঐশ্বর্য্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে তাহাকে আজ অতুল শোভায় সজ্জিত দেখিলাম; অথবা হে বিধাতা, আমার মনেই কি এমন কিছু অঘটন ঘটনা ঘটিল যাহাতে আজ আবাল্যদৃষ্ট অবিশেষকে সবিশেষ শোভন করিয়া গ্রহণ করিল? এ কোন অয়স্কান্তমণি, যাহার স্পর্শে লৌহ কনককান্তি লাভ করিল, এ কোন স্পর্শমণি যাহার সংসর্গে মৃৎপিণ্ড রত্নদ্যুতি বিকীর্ণ করিল? ও গো এ কি, কি এ?'

শ্রীমতীর চিত্তবিপ্লব গোবিন্দের অন্তরে গিয়া আঘাত করিতে লাগিল। গোবিন্দ বুঝিল, মনোভব সরসভাবের দিব্য সরণি নির্ম্মাণ করিয়া উভয়ের চিত্তসংযোগ সাধন করিয়াছে। গোবিন্দের প্রাণও কাঁদিল—

'হে মনোমথ, তোমার এ কি খেলা? তোমার মোহন-স্পর্শে আমার চিত্তে যে অসংখ্য ভাবকুসুম প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, হে অঘটনঘটনপটু, তাহা সার্থকতা লাভ করিবে কোথায় হে, ওহে কেমন করিয়া?'

এক্ষণে মন্মথ যদি বাদ সাধিল, তবে তাহাদের সহজ দৃষ্টিমিলন প্রথমে চকিত হইল, ক্রমে সলজ্জ, অবশেষে করুণ হইয়া উঠিল। যখন দুটি প্রাণ প্রণয়ের আকর্ষণে পরস্পরাভি-মুখী হয়, তখন কি জানি কেন আন্তরিক নৈকট্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য দূরত্ব আসিয়া পড়ে।

এক্ষণে শ্রীমতীর স্বামিদেবতার কাল্পনিক পদারবিন্দ অপেক্ষা তাহার প্রতিবেশী গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর ফুল্ল মুখারবিন্দ অধিক তৃপ্তি, সান্ত্বনা ও স্বর্গসুখের আভাস দিতে লাগিল।

পল্লীধুরন্ধরগণের ইহা বুঝিতে বিলম্ব ঘটিল না—প্রণয়ের ধর্ম্মই প্রকাশ। কটাক্ষ, বিদ্রূপ, তিরস্কার তাহাদের সঙ্কুচিত দুটী প্রাণকে সহানুভূতির গূঢ়স্রোতে অতি দ্রুত অতি দৃঢ় মিলিত করিয়া দিল। উভয়ে উভয়কে বলিল—

'এস এস, ও গো বাঞ্ছিত, আমার নিগ্রহনির্ভিন্নহৃদয়ে তোমার মধুমুরতি বরণ করিয়া লই। তুমি দুঃখরূপে, লজ্জারূপে, কলঙ্করূপে এস আমাকে অধিকার কর, ও গো আচ্ছন্ন কর!'

শ্রীমতীর বিভলপ্রেম রত্নমালার মধ্যমণির মত গোবিন্দের বক্ষ উজ্জ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; গোবিন্দের প্রণয় চন্দন-প্রলেপের মত শ্রীমতীর জ্বালাময় হৃদয় শীতল করিল।

মিলনের প্রথম উল্লাস ও উন্মাদনা যখন শ্লথ হইল, তখন শ্রীমতী দেখিল, সমাজ সমাজ, সে একের সুখদুঃখের প্রতি দৃক্‌পেপ করে না। সে বেশ বুঝিল, তাহাদিগকে নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, গৃহতাড়িত, পতিত, ঘৃণিত, পরিত্যক্ত করিবার বিপুল আয়োজন উদ্যোগ হইতেছে। তখন শ্রীমতী চিন্তা করিতে লাগিল—

'সমাজ, তোমার প্রবল ইচ্ছার কাছে আমরা কি কিছু নহি? আমাদের হৃদয়, প্রেম, বাসনা, ইচ্ছা, স্বাধীনতা বলিয়া কি সম্মানযোগ্য কিছু নাই? আমার চিত্ত যাহাকে চাহে, সে আমার কেহ নয়; তুমি যাহাকে দয়া করিয়া দিবে, সেই প্রসাদ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে? আচ্ছা বেশ! প্রবলের জয় হউক! আজ আমি একজনকে ভাল বাসিয়াছি বলিয়া তোমার গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইয়াছে; এমন দিন আসুক আমার জীবনে, হে ভগবান, যখন সমাজের প্রত্যেককে আমি গোবিন্দের মত ভালবাসিব, অথচ লোকে আমার জয়গান করিবে। এখন যাহারা ঘৃণায় নাসিকাকুঞ্চন করিতেছে, তাহারা আমার প্রসাদলাভের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিবে।'

তদবধি শ্রীমতী আত্মসংবরণ করিল।

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী শ্রীমতীকে দেখিয়া বিস্মিত হইল, স্তব্ধ হইল, সম্ভ্রমে মুহ্যমান ও সঙ্কুচিত হইল। তাহাকে দেখিয়া যে শ্রীমতীর তুষারকুন্দেন্দুমৃণালরজতপ্রভ শুভ্র-শীতল হাসি খানি মেঘবেষ্টনী বিদ্যুতের মত তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিত, জলবিন্দুলোলচপল দৃষ্টি তাহাকে অভ্যর্থনা করিত, কপোলরাগ অরুণিত হইয়া উঠিত, সেই তাহাকে দেখিয়া সেই শ্রীমতীর মুখের একটি ক্ষুদ্রতম পেশীও বিচলিত হইল না। শুধু চিত্তজয়ের অনবদ্য বিরাট আনন্দ তাহার চক্ষু হইতে চ্ছুরিত হইতে দেখিয়া গোবিন্দ শ্রদ্ধাসম্ভ্রমে পুলকাঞ্চিত হইল, মনে মনে শ্রীমতীর সংযমনশক্তিকে প্রণাম করিল।

এইরূপে দিন গেল, মাস গেল, বর্ষ গেল। আচারের ব্যতিক্রম ঘটিল না। গোবিন্দ শুধু সপ্রশংসদৃষ্টিতে শ্রীমতীকে নীরব পূজা দান করে; শ্রীমতীর প্রশান্ত দৃষ্টি তাহাকে কি বলে, সে তাহা ঠিক বুঝিতে পারে না। শ্রীমতীর যে দৃষ্টিতে শুধু তরল প্রেম ক্ষরিত হইত, তাহা লইয়া গোবিন্দ নিপুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, তাহা তাহার একলার নিজস্ব নহে, তাহা সকলেরই, তাহা সাধারণের। সেই অকাতর অসঙ্কুচিত দৃষ্টিতে গোবিন্দ তাহার জন্য বিশেষ কিছু খুঁজিয়া পাইত না,—তবু গোবিন্দ তাহা হইতে নির্ব্বিকার প্রীতি লাভ করিত।

সমাজ অগত্যা শান্ত হইল। বুঝি পূতসংযমশীলা শ্রীমতীর কাছে নতি স্বীকার করিল।

শ্রীমতী সর্ব্বদা প্রার্থনা করিত,—'ভগবান, তুমি একের প্রীতি সকলকে বাঁটিয়া দিলে; সেই শুভ অবসর আসুক—সকলে ইহা ভোগ করুক, আমার জীবন সার্থক হোক। তুমি আমার জীবনে সেই শুভ মুহূর্ত্ত আনিয়া দাও, যখন আমি দ্বিধা-বিরহিত হইয়া সকলকে প্রাণের প্রীতি পরিবেশন করিয়া দিতে পারি। তুমি গোবিন্দকে আশ্রয় করিয়া, প্রীতিরূপে আমার চিত্তমন্দিরে প্রকট হইয়াছিলে, এখন বিশ্বরূপে যদি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে, তবে, হে প্রভু, আমাকে সেই বিশ্বরূপের পূজার অবকাশ দেও; আমার শরণীয় শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ পন্থা নির্দ্দেশ কর।'

ভগবান সে প্রার্থনা অবশেষে পূর্ণ করিলেন। গৌড়-নগরে মহামারী উপস্থিত হইল। প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি মৃত্যুকবলিত হইতে লাগিল। যত সম্পন্ন গৃহস্থ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। শ্রীমতীর পিতা সনাতন বন্দ্যোপাধ্যায় পলায়নের উদ্যোগ শেষ করিয়া যখন শ্রীমতীকে আহ্বান করিলেন, তখন শ্রীমতী বলিল—

'আমার জীবনের শুভ মুহূর্ত্ত আজ আসিয়াছে, ও গো আজ আসিয়াছে। আজ আমি বিশ্বজনের সেবা করিয়া

ধন্য হইব, পবিত্র হইব, পূর্ণ হইব। আমার ব্যর্থ জীবন রক্ষার জন্য কেন পলাইব? সেবাউৎসর্গিত জীবন আমার সার্থক হউক, ও গো সার্থক হউক। শুভাকাঙ্ক্ষী যে কেহ থাক আশীর্ব্বাদ কর, ও গো আশীর্ব্বাদ কর।'

শ্রীমতী রহিল। আর রহিল নগরত্যাগসক্ষম গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। তাহারা পীড়িত ও আর্ত্তের সেবা ও যত্নে আপনাদিগকে ঢালিয়া দিল।

নিপুণ সেবিকা শ্রীমতী নিত্য দ্বারে দ্বারে ঔষধ ও সেবা লইয়া ফিরে, গোবিন্দ তাহার নিরাপত্ত মূক অনুগত আজ্ঞা-বহ। শ্রীমতীর বিশ্বসেবায় যে সুখ, সেবিকার সাহায্যে গোবিন্দের সেই আনন্দ—অনাবিল, অনবদ্য।

যাহারা কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমতীকে তাড়িত লাঞ্ছিত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহারাই এখন তাহার সঙ্গলাভের জন্য অধিক ব্যস্ত। এবং তাহার সাক্ষাৎ পাইলে এখন তাহারা কাতরকণ্ঠে বলে, 'থাক মা থাক, শরীরিণী শুশ্রূষা বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদের মত আমাদের রোগাক্লিষ্ট শিয়রে বসিয়া থাক।'

যাহারা তাহাকে অসতী বলিয়া বিশেষভাবে নাসিকা-কুঞ্চন করিয়াছিল, তাহারাই এখন বলে, 'তুমি পুণ্যবতী, ওগো সতী সাধ্বী।'

ক্রমে গোবিন্দের পালা আসিল। সে রোগগ্রস্ত হইয়া কাতর হইয়া পড়িল; সে কাতরতা রোগযন্ত্রণায় নহে, শ্রীমতীকে মহৎব্রত উদ্‌যাপনে সাহায্য করিতে বঞ্চিত হইয়া।

তপোনিষ্ঠা শ্রীমতী গোবিন্দের শয্যাপার্শ্বে দিব্য প্রশান্ত মুখে আসিয়া দেখা দিল। গোবিন্দ প্রথম মুহূর্ত্তে সুখাতিশয্যে একটু বিচলিত হইল, তাহার ভাবভারি অক্ষিপুট নিমীলিত হইল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—

'শ্রী, শ্রী, ওগো শ্রী, তুমি এখানে কেন? কত অনাথ তোমার সেবালাভের জন্য সোৎসুক প্রতীক্ষা করিতেছে; তুমি তাহাদের, তাহাদের কাছে যাও, আমার কাছে থাকিও না।'

শ্রীমতীর মুখ সহাস নহে, অথচ প্রদীপ্ত। এ দিব্য শ্রী সেই তপঃকৃশা কোথায় পাইল? সে অকম্পিত কণ্ঠে বলিল, 'গোবিন্দ, তুমি মনে করিও না, যে আমি অধিক প্রীতি লইয়া তোমার সেবা করিতে আসিয়াছি। তুমি নগরের দরিদ্রতম ভিক্ষুক হইলেও এখন আমি আসিতাম এখন তোমার সেবার পালা; আমার কর্ত্তব্য শেষ হইলে অন্যের সেবায় চলিয়া যাইব। গোবিন্দ, দীনতম হীনতম নাগরিক আমার যতখানি প্রিয়, তুমিও ততখানি, এখন একটুও বেশী নও। একটু কৃতজ্ঞতার ঋণ শুধু তোমার নিকট আছে; ভগবান তোমাকেই উপলক্ষ করিয়াই আমার রুদ্ধ-চিত্তের গুপ্তভাণ্ডার বিশ্বের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।'

গোবিন্দের মৃত্যুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন চক্ষু প্রশংসা, সম্ভ্রম, প্রীতি, ভক্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল 'ঈশ্বরের করুণা ও প্রেম ধন্য, শ্রীমতী তুমি ধন্য, আর তোমাদের দয়াতে আমিও ধন্য। ঈশ্বরের চরণে কোটি নমস্কার, তোমার চিত্তজয়ের বিরাট শক্তিকে শত শত নমস্কার, দেবি, তোমার অপূর্ব্ব বিশ্বপ্রীতিকে সহস্রবার নমস্কার, সাধ্বি, তোমার চরণে বার বার নমস্কার!'

আবেগ-উত্তেজিত প্রেমিকের উত্থিত মস্তক শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। শ্রীমতী ডাকিল, 'গোবিন্দ'! মরণাহত প্রেমিক উত্তর দিল না। অবিকম্প অনিস্পন্দ কণ্ঠে শ্রীমতী আশীর্ব্বাদ করিল 'তুমি আজ ভগবানের চরণসদাব্রতে চিরঅতিথি হইলে, যাও, তোমার আত্মার কল্যাণ হোক।'

তারপর শ্রীমতী মরণাক্রান্ত অপরগৃহে চলিয়া গেল,—গোবিন্দের জন্য একটা দীর্ঘনিশ্বাসও বুঝি নির্গত হইল না।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৌদ্ধ-বেদ।

কেবল গোব্রাহ্মণের হিতের জন্য নহে, সমগ্র জগৎবাসীর হিতের জন্য বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বেদ বেদান্ত দ্বিজজাতির জন্য এবং উহা ব্রাহ্মণের নিজস্ব সম্পত্তি; মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের গৌরব ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য রচিত। বুদ্ধদেবের কৃপায় ত্রিপিটক নামে যে ধর্ম্মশাস্ত্র সুরক্ষিত রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বলোকের জন্য, এবং পাপী পুণ্যাত্মা নির্বিশেষে সকলের জীবন কথা লইয়া রচিত হইয়াছিল। আমরা এ যুগে যে প্রকারে জাতিভেদ ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেছি, বুদ্ধদেব তাহা করেন নাই; হয় ত

তাঁহার সময়ে ঐ প্রকার চেষ্টার প্রয়োজনই হয় নাই। আহার বিবাহ প্রভৃতি লইয়া জাতিভেদের কঠোর বন্ধনে তখনো এদেশ বাঁধা পড়ে নাই। কঠোর না হউক, কিন্তু শিথিল ভাবেও সে বন্ধন যতটুকু ছিল, বুদ্ধদেব তাহাও সাক্ষাৎ ভাবে ভাঙ্গিবার জন্য কোন উদ্যোগ করিয়াছিলেন, দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি রোগের মূল নাশ করিবার জন্য ঔষধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ব্যাধিজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপসর্গের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহার বচনগুলিতে ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন শ্রেণী স্বীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কাহাকে ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, এবং যথার্থ ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, ইহা তিনি অন্যপ্রকারে বলিয়াছেন। সেকালে বেদপাঠক হইলেই ব্রাহ্মণ হইত বলিয়া বুদ্ধদেবের উপদেশে ব্রাহ্মণবর্গের কথা অন্য ভাবে দেখিতে পাই। মন্বাদিতে ব্রাহ্মণের যথার্থ লক্ষণ বলিয়া যে সকল কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বুদ্ধবচনের ছায়া মাত্র।

ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যেমন তাঁহার সংজ্ঞা নূতন, বেদ সম্বন্ধেও সেই প্রকার। দেশ সাধারণের লোকের প্রচলিত ভাষায় বেদের নাম ছিল পিটক; মজ্ঝিম নিকায়ের চঙ্কীসুত্তন্তে পিটক শব্দে বেদ উল্লিখিত আছে। অতিপ্রাচীন ত্রিপিটকের (ত্রিবেদের) মত বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রও ত্রিপিটক নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। প্রাচীন বেদ এবং বৌদ্ধের ত্রিপিটকের স্বরূপ এবং প্রকৃতিতে অনেক প্রভেদ; এ স্থলে কেবল একটী বিষয়ের পার্থক্য উল্লেখ করিব। বেদে কেবল দেবতা এবং দেবযাজক ঋষিদিগের কথা; এই ঋষিরাও আজন্ম পুণ্যাত্মা এবং এক হিসাবে দেবতা বলিলেই হয়। কোন কোন স্থলে ত ঋষিগণ দেবতাদিগের অপেক্ষাও অধিক মহিমা সম্পন্ন। কিন্তু ত্রিপিটকে নীচ শূদ্র এবং পতিতা রমণীর জীবনকাহিনী বেদের মত পূজ্য বলিয়া সংগৃহীত রহিয়াছে।

এই জীবন লইয়া ধর্ম্ম; যাগ যজ্ঞ এবং দেবতা লইয়া নহে। আমাদের দুঃখদারিদ্র্য, পাপসন্তাপ, ব্যাধিমরণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের এক একটি অধ্যায়। যাঁহারা যথার্থতঃ পবিত্রতা লাভের জন্য ধর্ম্মসেবা করিয়াছেন, তাঁহারা কদাচ কেবল মাত্র শাস্ত্রের বোঝা মাথায় করিয়া ফিরিতে পারেন নাই; তাঁহারা প্রতি মনুষ্যের জীবনকাহিনীকেই বেদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র জীবন বেদ লিখিয়া গিয়াছেন।

ঋষি নহেন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নহেন, কিন্তু অতি নীচ শূদ্র ধনিয় গোপ বুদ্ধদেবের উপদেশে মুক্তি লাভ করিয়া থের (স্থবির) হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার গাথা থের গাথায় রহিয়াছে। (থের গাথায় তিকনিপাতো, ২২৮—২৩০)। এই ধনিয় গোপ আপনার চাষার মত ভাষায় স্বীয় মুক্তির কথা যেমন করিয়া রচনা করিয়াছিলেন, সুত্তনিপাতের প্রথম বর্গের (উরগ বগ্‌গ) দ্বিতীয় সুত্তে তাহা সুরক্ষিত। থেরথেরী গাথা এবং সুত্তনিপাতাদি যে ত্রিপিটকের অন্তর্গত, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। সুশিক্ষিতা পতিতা রমণী অম্বপালির গাথা যাঁহারা ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পড়িতে পারেন, তাঁহারা যথার্থই ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন। ধনিয় সুত্ত এবং অম্বপালির গাথার কিঞ্চিৎ নমুনা পাঠকবর্গকে আজি উপহার দিতেছি।

ধনিয় সুত্ত, ধনিয় গোপের সহিত বুদ্ধদেবের কথোপকথন। কিন্তু উহার মর্ম্ম এই, যে বুদ্ধদেবের উপদেশ পাইয়া, এবং তাঁহার মহামূল্য কথা স্মরণ করিয়া, যেরূপ ভাবে মাহী নদীর তীরবর্ত্তী (গুজরাট দেশ) স্থানে একজন শূদ্র নিজের সাংসারিকতা তুচ্ছ করিয়াছিল, তাহাই বর্ণিত আছে। ঐ স্থানটি যে তখন আর্য্যাবর্ত্তের সীমার প্রায় বহির্ভাগে ছিল, তাহা পাণিনিবর্ণিত আর্য্যাবর্ত্তের সংজ্ঞায় বুঝিতে পারা যায়। (পতঞ্জলি মহাভাষ্যে শূদ্রানাং সংজ্ঞা এবং তাহার টীকা দ্রষ্টব্য)। মূলটি উদ্ধৃত না করিলে, প্রাচীন ভাষায় চাষার কথা কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না।

ধনিয়ো গোপো—পক্কোদনো দুদ্ধখীরোহমস্মি,
অনুতীরে মাহীয়া সমান-বাসো।
ছন্নাকুটি আহিতো গিনি, অথচেপত্থয়সি পবস্‌স দেব।
ভাত্ রাঁধা রয়েছে ঘরে দুধ্‌দোহানো শেষ;
আপন্ জনের সঙ্গে আছি মাহী তীরে বেশ্।
কুটীর খানি ছাউনি করা, আগুন্ আছে ঘরে।
বর্ষ বৃষ্টি যত খুসি যতক্ষণ ধোরে।
ভগবান—অক্কোধনো বিগতখিলোহমস্মি, অনুতীরে
মাহিয়া একরত্তিবাসো।
বিবটাকুটি নিব্বুতো গিনি, অথচে—ইত্যাদি।
ক্রোধ দ্বেষ আদি সব হয়েছে বিনাশ;
মাহী নদী তীরে সুধু এক রাত্রি বাস।

নাই কুটীর, অগ্নিতাপ নাহিক অন্তরে।
বর্ষ বৃষ্টি—ইত্যাদি।

এখানে ভাষা সম্বন্ধে একটা কথার আলোচনা করিব। একরত্তি শব্দের অর্থ যে এক রাত্রি, তাহাতে কোন ভুল নাই; কিন্তু পরবর্ত্তী পঞ্চম শ্লোকে যে দীঘরত্তি কথা আছে, উহা ঠিক দীর্ঘ রাত্রি দ্বারা অনুবাদ করা চলে না, সকলেই উহা "বহুকাল" বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। সিংহলদেশীয় অক্ষরে মুদ্রিত সুত্তনিপাতের পরমৎথজোতিক টীকায় "দিঘ-রত্তিম্ সংবাসিয়া মনাপা"র ব্যাখ্যায় লিখিত আছে, "দীঘরত্তিং=চিরকালং সঙ্গং বসমান।" শ্লোকগুলি যেমন বিভিন্ন ভাবের Contrast দ্বারা রচিত, শব্দগুলিতেও সেইরূপ Contrast এবং শ্লেষ আছে অনুমান হয়। তাহা হইলে একরত্তি অর্থে অল্প সময় বা বাঙ্গলায় একরত্তি বলিতে পারি। বাঙ্গলায় 'একরত্তি' যে এক+রতি হইবে, তাহাতে সন্দেহ হয়। সরল রতি কথা, রত্তিতে পরিণত হওয়া বড় সম্ভব নহে; ঐ প্রকারের পরিণতির অন্য দৃষ্টান্ত নাই। কিন্তু অতি প্রাচীনকালের phrase যে আমাদের ভাষায় চলিয়া আসিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এত গেল লোক-প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা; সংস্কৃত সম্বন্ধেও দৃষ্টান্ত আছে। বৈদিক সংস্কৃতে 'যথা কথা' একটা phrase ছিল, উহা ক্রিয়ায় বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইত; এবং উহার অর্থ ছিল যেমন তেমন করিয়া। "অন্যে চৈবং যথা কথা; (বৃহদ্দেবতা ২য়ঃ অঃ ৯৮)। এ কালের সংস্কৃতে 'যথা কথা' অপ্রচলিত; অথচ বাঙ্গলা ভাষায়-ঐটি ঠিক পূর্ব্ব অর্থে ব্যবহৃত পাওয়া যায়।

পতিতা অম্বপালি থেরীর গাথাটি, সাহিত্যের হিসাবে অতি সুরচিত। যে যুগে থেরীগাথা রচিত হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমকালীন কোন আলঙ্কারিক সংস্কৃত রচনা পাওয়া যায় না। অম্বপালি বৃদ্ধা হইয়া আনন্দের গাথা রচনা করিয়া গাহিয়াছিলেন। আনন্দের কারণ এই, যে জরা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তিনি প্রত্যক্ষ দেখিলেন। যৌবনের পর, জরা ত আসেই; কিন্তু বুদ্ধদেব যে ভাবে তাহা বলিয়াছিলেন, সেই ভাবটুকু প্রাণে অনুভূত হইয়াছিল বলিয়া এত আনন্দ। Pischel সাহেবের পাঠ পরিত্যাগ করিয়া E. Muller প্রকাশিত ধম্মপালের পরমৎথদীপনী টীকাধৃত পাঠ উদ্ধৃত করিলাম।

কাল-ভমর-বণ্ণসদিসা বেল্লিতগ্গা
মম মুদ্দজা অহুম্।
তে জরায় সানবাক সদিসা
সচ্চবাদি বচনং অনঞ্ঞথা।

কাল-ভ্রমরের মত বর্ণ বিশিষ্ট আমার যে বেল্লিতগ্গা (কুঞ্চিতাগ্রা) কেশপাশ ছিল, আজি জরায় তাহা শণের মত শাদা হইয়া গিয়াছে। হে সত্যবাদী, তোমার বচনের অন্যথা নাই।

বাসিতো ব সুরভিকরণ্ডকো পুপ্ফপূরম্
মম উত্তমঙ্গ ভূতো
তং জরায় সস-লোম গন্ধিকং। সচ্চবাদি…

করন্ডক=চূর্ণ; পুপ্ফ=পুষ্প; সস-লোম=শশকের লোম।

কাননং ব সহিতং সুরোপিতং
কোচ্ছসূচি বিচিতাগ্গ শোভিতং
তং জরায় বিরলং তহিং তহিং। সচ্চবাদি…

যত্নে রোপিত ঘনসন্নিবিষ্ট কাননতরুর মত কেশরাজি জরায় বিরল হইয়াছে। কোচ্ছসূচি=সুবর্ণসূচি; সুবর্ণসূচি দ্বারা কেশজটা গ্রথিত হওয়ায় তাহার বিচিত্র অগ্রভাগ, স্বর্ণ-পল্লবসূচিশোভিত কাননের মত হইত।

কন্হ (কৃষ্ণ) গন্ধক (গন্ধযুক্ত) সুবণ্ণ মণ্ডিতং
সোভতে সু বেণি হি-অলংকতং (অলংকৃত)
তং জরায় খলিতং সিরং কতং। সচ্চবাদি…

চিত্তকার সুকতা বলেখিতা
সোভতেসু ভমুকা পুরে মম
তা জরায় বলিহি পলম্বিতা।

চিত্রকার দ্বারা নীলবর্ণে আঁকা; ভমুকা=জুল্‌ফি?

ভস্সরা (ভাস্বর) সুরুচিরা যথা মণি,
নেত্তাহে (নেত্রদ্বয়) সুং অভিনীলমায়তা।
তে জরায় অভিহতা ন শোভতে।

সন্হ তুঙ্গ সদিসী চ নাসিকা
সোভতে সু অভিযোব্বনং পতি
সা জরায় অভিকূলিতা বিয়।

সন্হ তুঙ্গের টীকা এইরূপঃ—পিত হরিতাল বত্তি বিয়। আমার যে নাসিকা চিত্রিত যৌবনপটখানির উপর পীত হরিতাল তুলিকাটির মত ছিল।

পত্তলিম কুলবগ্ন সদিসা

সোভতে সু দন্তা পুরে মম।

তে জরায় খন্তা যবপীতকা।

পত্তলিম="কদলিমকুলসদিসবগ্গা"; এ টীকায় কিছু বুঝিলাম না। দালিম বা ডালিম হইলে প্রচলিত উপমার সহিত মিলিত।

কাননম্হি বনসন্তচারিণী

কোকিলা ব মধুরং নিকূজিতং

তং জরায় খলিতং তহিং তহিং।

পীন বট্ট পহিতুগ্গতা উভো

সোভতেসু থনকা পুরে মম।

তে রিন্দীব লম্বতে নোদকা।

পীন; বট্ট (বর্ত্তুল), পহিত (পৃথুল), উগ্গত (উদ্ধগত বা উন্নত), থনকা (স্তনদ্বয়)। নোদকা (জলশূন্য), রিন্দীব (রিন্দি=চর্ম্ম নির্ম্মিত ভস্ত্রা, যাহাতে জল রাখিত, তাহার মত)। এ কালের স্মৃতিগ্রন্থেও জলের জন্য চর্ম্মভস্ত্রা অশুদ্ধ বলিয়া কথিত নহে।

সণ্হ কম্বুরিব সুপ্পমজ্জিতা

সোভতে সু গীবা পুরে মম।

সা জরায় ভগ্গা বিনামিতা।

সুমার্জ্জিত স্বর্ণকম্বুর মত গ্রীবা। তুলনাগুলি চিরকাল চলিয়াছে।

বট্ট (বর্ত্তুল) পলিঘ (পরিঘঃ=অর্গল) সদিসোপমা

উভো সোভতেসু বাহা (বহু দ্বয়) পুরে মম।

তা জরায় পাতিতা দুব্বলিকা।

কঞ্চনফলকং ব সুমট্ঠম্

সোভতে সু কায়ো পুরে মম;

সো বলিহি মুখুমা হি (সূক্ষ্ম, সরু) ওততো।

ওততো=ওত প্রোত=সকল দিকে বা স্থানে।

নাগভোগ সদিসোপমা উভো

সোভতে সু উরূ পুরে মম।

তে জরায় যথা বেলুনালীয়ো।

"করিকর রামরম্ভা" অনেক কালের সম্পত্তি। বেলুনালীয়ো=বেণু বা বাঁশের নলের মত হইয়াছে।

সণ্হ নুপূর সুবগ্ন মণ্ডিতা

সোভতে সু জংঘা পুরে মম।

তে জরায় তিলদণ্ডকা রিব (ইব)।

তূল পুগ্ন (তুলা ভরা) সদিসোপমা উভো

সুভতেসু পাদা (পাদতল) পুরে মম।

তে জরায় ফুটিকা বলীমতা।

(থেরী গাথা বীসতি নিপাত ২৫২-২৭০)।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

স্বদেশী।

(মিঃ পি, এন, বসু, বি, এস, সির, বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত।)

সম্প্রতি বঙ্গবাসীর হৃদয়ে স্বদেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা স্ফুরিত হইয়াছে। চারিদিকে এই প্রবল আকাঙ্ক্ষার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে। তাদৃশ নূতন ভাবোদয়ে স্বদেশের শুভার্থী মাত্রেই আশা ও আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছেন। দশবৎসর পূর্ব্বে কদাচিৎ কোন স্থানে শিল্পপ্রদর্শনী হইত। বর্ত্তমান সময়ে প্রধান প্রধান নগরে প্রতি বৎসর শিল্প প্রদর্শনী হইতেছে। জাতীয় মহাসমিতির সংশ্রবে নেতৃগণ বর্ষে বর্ষে শিল্প প্রদর্শনী করিতেছেন। গত বৎসর হইতে শিল্প-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতির কার্য্য সুপরিচালিত হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ আমাদের দেশে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু এতদিন ইহার গতি অতি মন্থর ছিল, দেশের অধিকাংশ লোক এতৎসম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। গত বৎসর হইতে বাঙ্গালী প্রবলোৎসাহে স্বদেশী আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; বাঙ্গালীর হৃদয়ে নূতন ভাব, নূতন আশা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশের শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে বলিয়া আশা জন্মিতেছে। পনর বৎসর পূর্ব্বে শিল্প শিক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল; বস্তুতঃ তজ্জন্য আবেদন নির্জ্জন অরণ্যে রোদন তুল্য নিরর্থক ছিল। কিন্তু গত দুই বৎসরে একমাত্র বঙ্গদেশেই শিল্পশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য নূনাধিক দশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

স্বদেশের শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা বঙ্গদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়ও বটে। কি শিক্ষার বিস্তার, কি রাজনৈতিক আন্দোলন, কি সমাজ সংস্কার, সর্ব্ববিষয়েই বঙ্গবাসী ভারতবর্ষে অগ্রগামী। কিন্তু শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে বাঙ্গালী বোম্বাইবাসীর এমন কি, পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানীরও পশ্চাতে রহিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রধানতঃ সূতা ও কাপড়ের কল লইয়াই বোম্বাইর শিল্পব্যবসায় চলিতেছে। এই সকল কলের সমস্ত গুলি না হইলেও অধিকাংশই বোম্বাইবাসীর অর্থে তাঁহাদেরই কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছে। পাট

এবং কয়লা বঙ্গদেশের ব্যবসায়ের প্রধান সম্বল। এই দুই ব্যবসায়ই বিদেশী বণিকের হস্তগত রহিয়াছে। যাহা হউক, বঙ্গবাসী আপনার পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এরূপ আশা হইতেছে যে, অচিরে শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধে বঙ্গবাসীর অবনতি অতীতের কুক্ষিগত হইয়া পড়িবে। বাঙ্গালী একটী বড় কাপড়ের কল সংস্থাপন করিয়াছেন;* উন্নত প্রণালীর তাঁত বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইতেছে। আধুনিক উন্নত প্রণালীর কলের সাহায্যে মৃৎপাত্রাদি প্রস্তুত জন্য একটী কারখানা স্থাপিত হইয়াছে; প্রধানতঃ বাঙ্গালীর উদ্যোগে একটী জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়া কয়লার খনির কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং দেশলাই, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত জন্য ছোট ছোট কারখানার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা কার্য্যে পরিণত হইতেছে।

বস্তুতঃ সুশৃঙ্খল ভাবে সমস্ত কাজ আরম্ভ হইয়াছে। যদি ভবিষ্যতেও এই নব জাগ্রত কার্য্যশীলতা সুপরিচালিত হয়, তবে নিশ্চয়ই দেশের মহাকল্যাণকর বহু সুফল লাভ হইবে। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রধানতঃ ইউরোপীয় বণিকের উদ্যমেই ভারতবর্ষের অর্থাগমের ক্ষেত্র সকল উন্মুক্ত হইয়া আসিতেছে এবং সে সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদেরই প্রায় একাধিপত্য রহিয়াছে। বিশেষ খনিজ সম্পদ কেবল মাত্র বিদেশীদের দ্বারাই উদ্ঘাটিত হইতেছে। গত দশ বৎসরে (১৮৯৪-১৯০৪) ভারতবর্ষের খনি সমূহের উৎপন্ন অনেক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; আমরা একটী তালিকা দিতেছি।

খনিজ পদার্থের নাম।	১৮৯৪ সনে উৎপন্ন।	১৯০৪ সনে উৎপন্ন।	১০ বৎসরে যতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।
ম্যাঙ্গেনিজ ধাতু	১১৪১০ টন,	১৬৫০০৬ টন,	১৫
কেরোসিন তৈল	১১৪৫২৬৪৯ গ্যালন	৮৭৮৫৯০৬৯ গ্যালন	৭
অভ্র	২৮৫ টন,	১৯৭৭ টন,	৪
সোণা	২১০৪১২ আউন্স	৬০৩২১৬ আউন্স	৩

কয়লার উৎপন্ন দ্বিগুণ অপেক্ষাও বেশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

অন্যান্য নূতন ব্যবসায় সম্বন্ধেও ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি পরিদৃষ্ট হইতেছে।

কলের নাম।	১৮৮১-২ সনের সংখ্যা।	১৯০৪-৫ সনের সংখ্যা।	গত ২৪ বৎসরে যতগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে।
পাটের কল	৮	২২	৩
পশম রেশম ও অন্যান্য কল	৩	৩১	১০
চিনির কল	৪	৯	২
কাগজের কল	১	৫	৫

এই সকল ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে ভারতবাসীর কার্য্যশীলতার সম্পর্ক অতি নগণ্য। ১৯০৪-৫ সনে খনিজ ব্যবসায়ে জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর হিসাবে ৩৭১৫৪০০০ টাকা মূলধন নিয়োজিত ছিল। এই বিপুল ধনের ত্রিংশ ভাগের একভাগও ভারতবাসী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ। আধুনিক প্রণালীতে ভারতবর্ষে লৌহ এবং ইস্পাত উৎপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে দেড়কোটী টাকা মূলধন লইয়া একটা কোম্পানী গঠিত হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই অর্থ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ (যদিও তাঁহারা ভারতবাসী) বিলাতে কোম্পানীর অংশ বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, নূতন ব্যবসায়গুলির সমস্তই বিদেশীর হস্তগত রহিয়াছে। ভারতবাসী নব উদ্যমে শিল্পবাণিজ্যের শ্রীসাধন জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে সফলকাম হইতে হইলে বিদেশী বণিকের সহিত প্রবল প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বহু সুবিধা ইউরোপীয় বণিকের আছে, আর ভারতবাসীকে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া কাজ করিতে হইবে। ইউরোপীয় বণিক পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনীসম্প্রদায়ভুক্ত; ভারতবাসী সর্ব্বাপেক্ষা নির্ধন। ইউরোপে অর্থ এত প্রচুর যে, শতকরা ৩।৪ টাকা লাভ পাইলেই তত্রত্য ধনীরা সন্তোষ লাভ করেন। কিন্তু ইহার তিনগুণ লাভ পাইলেও লোকসান হইবার সম্ভাবনা আছে এরূপ কোন ব্যবসায়ে আমাদের দেশের লোক অর্থন্যস্ত করিতে স্বীকৃত হইবেন না। গত অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ ইউরোপে উচ্চ অঙ্গের শিল্পশিক্ষা প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে শিল্পশিক্ষার সূচনা মাত্র হইয়াছে; আধুনিক প্রণালীতে ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন করিতে হইলে ঈদৃশ শিক্ষালাভ অপরিহার্য্য বলিয়া ভারতবাসী এই মাত্র বুঝিতে পারিয়াছেন। কি কি উপায়ে ভারতবর্ষের অর্থসংস্থান বৃদ্ধি পাইতে পারে, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি অল্পব্যক্তিরই আছে; এমন কি কিছুদিন পূর্ব্বেও ভারতের অর্থসংস্থানের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য অভিলাষী শিক্ষিতের সংখ্যাও অল্প ছিল। বিদেশী বণিক ব্যবসায়ে সহযোগিতার মাহাত্ম্য সম্যক অবগত আছেন। এজন্য তাঁহারা কোন বৃহৎ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে তাহা সাধারণতঃ জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ভারতবাসী অতি অল্পদিন যাবৎ ব্যবসায় ক্ষেত্রে সহযোগিতার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা উল্লেখ করিতেছি যে, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ১১০টী ক্ষুদ্র

---

* বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল ব্যতীত বঙ্গদেশে আরও কতিপয় কাপড় ও সুতার কলের অনুষ্ঠান হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে তৎসমুদায়ের বিবরণ এখানে প্রদান করিতেছি। (১) ত্রিপুরা কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী কে, এম, দে এণ্ড কোম্পানী এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্। মূলধন ১২ লক্ষ টাকা। ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুরে কারখানা স্থাপিত হইবে। আপাততঃ কেবল সুতা নির্ম্মিত শীতবস্ত্র প্রস্তুত হইবে। (২) ইণ্ডিয়ান স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোম্পানী লিমিটেড। মূল ধন ১২ লক্ষ টাকা। এই কোম্পানীর কলে ২২ হাজার চরকা ও ৩ শত তাঁত চলিবে। কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত পি এম, গুহ প্রভৃতি এই কোম্পানীর ডাইরেক্টর। (৩) চট্টগ্রাম স্পিনিং এণ্ড জিনিং কোম্পানী। চট্টগ্রামের নেতৃগণ এই কোম্পানীর উদ্যোগী। এই কোম্পানীর কারখানায় তুলার বিচি বাছাই এবং সুতা প্রস্তুত হইবে। মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকা। এই কোম্পানী এ পর্য্যন্ত রেজেষ্টরী হয় নাই। কিন্তু ইতি মধ্যেই অনেক টাকার অংশ বিক্রয় হইয়াছে। (৪) ময়মনসিংহ সুতা ও কাপড়ের কল। ময়মনসিংহের উকীল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এই কলের উদ্যোগী। মূল ধন ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এই কোম্পানী শীঘ্রই রেজেষ্টরী হইবে; এপর্য্যন্ত ৩০ হাজার টাকার অংশ বিলি হইয়াছে। (৫) জলপাইগুড়ি উইভিং কোম্পানী লিমিটেড। জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী পরিচালনে সুপটু শ্রীযুক্ত উমাগতি রায় প্রভৃতি এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। মূলধন ৩০ হাজার টাকা। এই কোম্পানীর কারখানায় ২৫ খানা তাঁত চলিবে। কোম্পানীর সমস্ত অংশ বিক্রয় হইয়াছে, শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হইবে। (৬) কলিকাতা উইভিং কোম্পানী লিমিটেড। কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মিঃ এ, কে ঘোষ প্রভৃতি এই কোম্পানীর পরিচালক। মূলধন ৩০ হাজার টাকা। ৫০ খানি তাঁত চলিবে। অক্টোবর মাসে কাজ আরম্ভ হইবে। (৭) চন্দননগর কাপড়ের কল। স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষ। ৫০ খানি তাঁত চলিতেছে। (৮) জহুরি লুম ফ্যাক্টরী। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগৎরাম শুকুল। কলিকাতা হোগল কুঁড়িয়ায় ফ্যাক্টরীর বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে।

কয়লার খনির কাজ হইয়াছে এবং এই সকল খনির স্বত্বাধিকারীর সংখ্যাও প্রায় ১১০ জন হইবে; ইঁহাদের প্রায় সকলেই ভারতবাসী। এই সকল খনির কাজের জন্য স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী, স্বতন্ত্র কারখানা এবং অনেক স্থলে স্বতন্ত্র রেলওয়ে সাইডিং রহিয়াছে। অন্যদিকে ঐ সনে ১৪০টী বৃহৎ খনির কাজ হইয়াছে এবং এই সকল খনির স্বত্বাধিকারী মাত্র ৪১টী জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী; এই সকল কোম্পানীর প্রায় সমস্তগুলিই বিদেশী বণিক কর্ত্তৃক পরিচালিত। এদেশীয়দের আয়ত্তাধীন কয়লার খনি হইতে মাত্র ৭৮৬৬৭০ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে, ইহা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী উত্তোলিত কয়লার পরিমাণে অতি নগণ্য: এই সকল কোম্পানীর খনি হইতে ৬২৭৭০০০ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল। যদি ঐ সকল ক্ষুদ্র কয়লার খনির স্বত্বাধিকারীরা সহযোগিতার সুবিধা উপলব্ধি করিতে পারিয়া নিকটবর্ত্তী কয়লার খনিগুলি এক সঙ্গে মিলিত করিয়া লইতেন, তবে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে অধিকতর সুশৃঙ্খল ভাবে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত এবং অধিক লাভ দাঁড়াইত; বর্ত্তমানের ন্যায় যত আয় তত ব্যয়ের মত অবস্থা থাকিত না।

মূলধনের অসচ্ছলতা, শিল্পশিক্ষার অবিদ্যমানতা এবং যথোপযুক্ত সহযোগিতার অভাব,—আমাদের ব্যবসায় ক্ষেত্রের এই সকল বিঘ্ন ব্যতীত আর একটী প্রবল অন্তরায় আছে; তাহা ব্যবসায়ের প্রতি উচ্চশ্রেণীর বংশানুগত বিরাগ। আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশের কেবল নিম্ন শ্রেণীর লোকেই ব্যবসায় লিপ্ত রহিয়াছে। সভ্য সমাজ মাত্রেই এইরূপ বিরাগ কম বেশী দেখা যাইয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীক সমাজে ব্যবসায়ের প্রতি উচ্চ শ্রেণীর যথেষ্ট বিরাগ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশ সকলে বণিগ্‌বৃত্তির সহিত অন্যান্য বৃত্তির পার্থক্য প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রধানতঃ ব্যবসায়মূলক। পক্ষান্তরে বর্ণভেদ প্রথার দরুন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবর্ণ এবং শিল্পী ও ব্যবসায়ীর মধ্যে যে অসামাজিকতা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য এত দিনে চেষ্টা হইতেছে। আমাদের দেশের প্রতিভা ও প্রজ্ঞা শিল্প এবং বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে দূরে রহিয়াছে, ইহাই বর্ত্তমান অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তি একমাত্র শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি চেষ্টার অনুবর্ত্তিনী হইবে, ইহা অবশ্য প্রার্থনীয় নহে। কিন্তু আমাদের ভদ্র সমাজে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন জন্য আরও কিঞ্চিৎ আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে এবং ব্যবসায় সম্বন্ধে তাঁহাদের জন্মগত ঔদাসীন্য পরিত্যক্ত না হইলে তদ্বিষয়ে আমাদের দেশের স্থায়ী উন্নতি অসম্ভব।

ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আমাদের দেশের প্রভূত মঙ্গলসাধন করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা বাঙ্গালীর শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন পক্ষে বিঘ্নকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে আমাদের দেশের ধনীরা ভূসম্পত্তিতেই আপনাদের ধন ন্যস্ত করিতেই পটু। বোম্বাই প্রদেশে বণিকদিগকে লইয়া অভিজাত সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে; ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, ঐ প্রদেশে জমীদার বলিয়া কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নাই। যাহা হউক, জমিদারগণও শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে অনেক পরিমাণে মনোযোগী হইয়াছেন এবং আমরা আশা করি যে, এতদিন যাহা বিঘ্নকর ছিল, এখন তাহাই আমাদের শিল্পবাণিজ্যবিষয়ক উদ্যমশীলতার গতি পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিবে।

বর্ত্তমান অবস্থায় চামড়া পরিষ্কার, সাবান তৈয়ার, সুগন্ধি প্রস্তুত প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ নির্ব্বাহ করিয়াই আমাদের নবজাত উদ্যমশীলতা অনেক স্থলে তৃপ্তিলাভ করিতেছে। কিন্তু এই সকল জিনিসের ব্যবসায় প্রয়োজনীয় হইলেও ইহাতে দেশের সবিশেষ ধনাগম হয় না। অতএব আমাদের উদ্যমশীলতাকে বৃহৎ কাজ সম্পাদন জন্য পরিচালিত করিতে হইবে। আর একটী কথা আছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যবসায়, এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ অতি অল্প। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যে সকল জিনিস প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সাধারণতঃ ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য বৃহৎ কারখানা স্থাপন করিলে অধিক লাভ দাঁড়াইতে পারে।

অবশ্য ছোট ছোট কারখানা স্থাপন করিয়া আমরা বড় বড় কারখানা অর্থাৎ ঝুঁকির কাজে প্রবৃত্ত হইবার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, সময় অমূল্য, এবং ইউরোপীয় বণিক অতি সতর্ক ও অবহিত। তাঁহারা অর্থসংস্থান ক্ষেত্রে এদেশবাসীর প্রবেশোদ্যমে অন্তরায় জন্মাইবে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের কদাচিৎ কেহ ম্যাঙ্গেনিজ নামক খনিজ ধাতুর নাম অবগত ছিল; কিন্তু গত ১৫ বৎসর মধ্যেই এই ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়া এতদূর পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ অর্থসংস্থান ক্ষেত্রে ভারতবাসীর স্থান হওয়া সম্ভবপর নহে। এখন আমাদিগকে চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, অর্থাগমের কোন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র তথায় প্রবেশ জন্য উদ্যম করিতে হইবে; নতুবা সে ক্ষেত্রে প্রবেশপথ সম্ভবতঃ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইবে। পাশ্চাত্যদেশে শিল্পবাণিজ্যের পরিপুষ্টিসাধন জন্য এই প্রাণপণ প্রতিযোগিতা, অর্থসঞ্চয়ের জন্য এই অশ্রান্ত কর্ম্মশীলতার মূল কারণ কি, তাহা প্রাচ্য ভাবের সম্পূর্ণ অধিগম্য নহে। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃতি ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃতি হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। কিন্তু যদি ভারতবাসী স্বদেশের অর্থাগমের উপায় বর্দ্ধন করিতে সংকল্প করেন (এ বিষয়ে এখন আর মতদ্বৈধ নাই) তবে আমাদিগকে চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থার উপযোগী এবং পাশ্চাত্যসুলভ শিল্প বাণিজ্যের আবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইতে হইবে।

বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনের ফলে আমাদের আত্মনির্ভর জন্মিয়াছে; ইহাই বর্ত্তমান আন্দোলনের অন্যতম সুমধুর ফল। কিন্তু আমাদিগকে দেখিতে হইবে যেন আত্মনির্ভর আত্মাভিমানে পরিণত না হয়। কোন কোন বিষয়ে,—যথা ধর্ম্ম,—বিদেশীর সহায়তা ব্যতীতও আমাদের চলিতে পারে। কিন্তু এরূপ অনেক বিষয় আছে, যাহাতে বিদেশীর সহায়তা গ্রহণ না করিলে সাফল্য লাভ অসম্ভব। শিল্পবাণিজ্যের পরিপুষ্টি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কল, কারখানা, খনি, এই সকল কাজ সম্পাদন কালে আমাদিগকে বিদেশী বণিকের অনুকরণ করিতে হইবে।

ইউরোপীয় বণিকগণের সহিত ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে হইলে আমাদের কি কি বাধা বিঘ্ন আছে, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, এই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য যত্ন করা হইতেছে। দৃঢ় সংকল্প হইয়া অধ্যবসায় সহকারে যত্ন করিলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যই হইবে। গত বৎসর বঙ্গদেশে অন্ততঃ ছয়টী জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইহাই বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আন্তরিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ।*

---

* বর্ত্তমান আন্দোলনের ফলে যে সকল কাপড় এবং সূতার কলের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কাপড় ও সূতার কল ছাড়া আর যে সকল অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা আমরা সংক্ষেপে লিখিতেছি। দুইটী ষ্টিমার কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রথম, বেঙ্গল ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী লিমিটেড, মূলধন বার লক্ষ টাকা। সমস্ত মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে। এই কোম্পানীর ষ্টিমার মাল ও যাত্রী লইয়া রেঙ্গুন হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতেছে। চট্টগ্রামের মোসলমান বণিকেরা এই ষ্টিমার কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয়, ইষ্ট বেঙ্গল রিভারস্ ষ্টিম সারভিস্ লিমিটেড। কলিকাতা হাটখোলার প্রসিদ্ধ ধনী রায় সীতানাথ রায়, বাহাদুর এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। মূলধন ছয় লক্ষ টাকা। এই কোম্পানীর ষ্টিমার কেবল মাল লইয়া কলিকাতা হইতে নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে

পনর বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে আর একবার শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ চেষ্টা সময়োপযোগী ছিল না বলিয়া সফল হইতে পারে নাই। ঐ চেষ্টার ফলে ৭।৮ টা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ২।১টা মাত্র অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই বিষয় চিন্তা করিয়া আমাদের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই; বরং তৎকালের চেষ্টা ও যত্ন কি কি কারণে সফল হইতে পারে নাই, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি। আমাদের দেশের শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ কার্য্যাবলীর গতিবিধি যাহারা গত পচিশ বৎসর যাবৎ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ না করিয়া স্বীকার করিবেন যে, বাঙ্গালীর বর্ত্তমান সংকল্প পূর্ব্ববারের সংকল্প অপেক্ষা অনেক সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছে এবং উপযুক্ত যত্ন ও সতর্কতা সহকারে সংকল্প সাধনে প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূরীভূত হইবে। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমভাগে রাজপুরুষগণ আমাদের শিল্পবাণিজ্যের সম্পর্কে যেরূপ ভাবই পোষণ করিয়া থাকুন না কেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান ভাব অনুকূল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; এমন কি, অনেক স্থলে সহানুভূতিও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। স্বদেশী আন্দোলন সুগঠিত ও সুপরিচালিত হইলে উহা দেশ মধ্যে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সাধনের অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিবে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বণিকের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার সুবিধাও কোন কোন বিষয়ে আমাদের আছে; ইহাও বিবেচ্য। আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত অতি অল্প বেতনে লোকে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, এইটা আমাদের অনুকূল অবস্থা। অবশ্যই ইহা স্বীকার্য্য যে, পারিশ্রমিক অল্প হইলেই কারখানাজাত দ্রব্যাদির নির্ম্মাণ ব্যয়ও নিশ্চয়ই অল্প হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। কিন্তু আমাদের দেশে শিল্প শিক্ষা বিস্তার লাভ করিলে লোকের কল কারখানার কাজে দক্ষতা জন্মিবে। তখন অল্প পারিশ্রমিকের সহিত দক্ষতা মিলিত হইয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পক্ষে অতি অনুকূল অবস্থা দাঁড়াইবে। দেশীয় রাজন্যগণের রাজ্যে এবং জমিদারগণের জমিদারীতে এরূপ অনেক ভূমি আছে, যাহা মূল্যবান খনিজ সম্পদপূর্ণ। এই কারণে তাঁহাদের পক্ষে খনিজ সম্পদের কারবার প্রতিষ্ঠা করিবার বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া কৃষি কার্য্যের উন্নতি সাধন করিবার জন্যও যথেষ্ট সুযোগ তাঁহাদের আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল সুযোগ সত্ত্বেও তাঁহারা ইহার কোন কাজেই অবহিত হন নাই। যাহা হউক, আমরা আশা করিতে পারি যে, তাঁহারা অতঃপর আপনাদের সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

আমাদের দেশের শিল্প বাণিজ্যের পরিপুষ্টি সাধন ব্যাপারে ভারতবাসীর সম্মুখে সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে ভূসম্পত্তির প্রতি লোকের বর্ত্তমান অত্যধিক আগ্রহ (আমাদের অনেক শিল্প বিলুপ্ত হওয়াতে বহুলোক স্ব স্ব পৈতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ভূমির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে) কমিয়া আসিবে, মধ্যবিত্তশ্রেণী অর্থ উপার্জ্জনের সুন্দর উপায় প্রাপ্ত হইবেন, বিদেশাভিমুখী ধনের প্রবল প্রবাহ শীর্ণ হইবে। আর একটা বিষয় বিবেচনার যোগ্য। সভ্যদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলন ইংরেজজাতির ন্যায়বুদ্ধির নিকট আবেদন নিবেদন মাত্র। কিন্তু তাঁহাদের ন্যায়বুদ্ধি অদ্যাবধি এরূপ বিকশিত হয় নাই যে, রাজনীতি ক্ষেত্রেও উহার গত্যুৎপাদক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে দুর্ব্বলজাতির প্রতি তাঁহাদের ব্যবহার লক্ষ্য করিলে প্রতীতি জন্মায় পাশ্চাত্য দেশের নৈতিক আদর্শ ক্রমশঃ উন্নত ভাব লাভ করিতেছে না, বরং অবনতির দিকেই হেলিয়া পড়িতেছে। আধুনিক ইউরোপের পরপীড়ক সাম্রাজ্যবাদের মূলে শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া অর্থসংস্থান জন্য তীব্র তৃষ্ণা বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রধানতঃ ব্যবসায়ক্ষেত্র প্রসারিত করিবার অভিপ্রায়েই ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজশক্তি এসিয়া ও আফ্রিকার দুর্ব্বল জাতির উপর আধিপত্য স্থাপন জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন। যদি এই সকল দুর্ব্বলজাতি প্রবলোৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অর্থাগমের পথ খুলিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং স্বদেশজাত দ্রব্য দ্বারাই আপনাদের অভাব মোচন করিতে আরম্ভ করে, তবে বৈদেশিক শিল্পিকুলের তাণ্ডবে তাহাদের পণ্যক্ষেত্র এক্ষণে যেরূপ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে, তাহা আর হইতে পারিবে না এবং তাহাদের দেশ আর প্রতীচ্য শিল্পবাণিজ্যের লীলাক্ষেত্র থাকিবে না। তখন পরপীড়ক সাম্রাজ্যাদি আপনা আপনি নীরবে অন্তর্হিত হইবে; অন্ততঃ সাম্রাজ্যবাদসুলভ পরপীড়ন এবং সমরশীলতা দূরীভূত হইয়া যাইবে। এই বিপ্লব সাধিত হইলে তাহার ফল অতি মঙ্গলজনক এবং বহুদূরবিস্তৃত হইবে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয় দেশেরই মহদুপকার সাধিত হইবে। ফলত প্রাচ্যজাতি তাদৃশ ফল লাভ কল্পে মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হইলে তাহার যত্ন ও পরিশ্রম কিছুই অযথা নিয়োজিত হইবে না।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

যাতায়াত করিতেছে। যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর আর একটা ষ্টিমার কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। হাইকোর্টের উকীল ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় একটি দিয়াশলাইর কারখানা স্থাপনের জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ করিয়াছেন; কেবল তাঁহার প্রদত্ত মূলধনে এই কারখানা স্থাপিত হইতেছে। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সি, এস, আই, প্রভৃতি মহোদয়গণ জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী করিয়া আর একটি দিয়াশলাইর কারখানা স্থাপন করিতেছেন। দিয়াশলাই, ছুরি, কাঁচি, সাবান, প্রভৃতি প্রস্তুত জন্য দুই লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education of Indiansএর তত্ত্বাবধানে একটা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সরকার, ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকালী গুহ প্রভৃতি মহোদয়গণ সাবানের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। নীলরতন বাবু ও প্রমথ বাবুর কারখানার কাজ আরম্ভ হইয়াছে; উপেন্দ্র বাবু এবং কালীকৃষ্ণ বাবুর কারখানার কাজও শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। ঢাকাতে আর একটি সাবানের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। আধুনিক উন্নত প্রণালীতে কলের সাহায্যে মৃৎপাত্রাদি প্রস্তুত জন্য কাশিমবাজারের মহারাজা এবং শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় জাপানপ্রত্যাগত মিঃ সত্যসুন্দর দেবের তত্ত্বাবধানে একটা কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু প্রভৃতি মহোদয়গণ ঐ উদ্দেশ্যেই জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী করিয়া আর একটা কারখানা স্থাপন করিবেন বলিয়া সম্প্রতি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে।

"বঙ্গালে কী লড়াঈ"

বা

বাঙ্গলার যুদ্ধ।

"আল্‌হা খণ্ড"* নামক হিন্দী ভাষার প্রাচীন গ্রন্থের এক অধ্যায়ের নাম "বঙ্গালে কী লড়াঈ" অর্থাৎ "বাঙ্গলার যুদ্ধ।" যে সময় ভারতে হিন্দু-সাম্রাজ্য-সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ, সেই

*আলহা খণ্ডের বৃত্তান্ত ১৩১২ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে দেওয়া হইয়াছে।

সময় কান্যকুব্জেশ্বর জয়চন্দ্রের সহিত গৌড়েশ্বরের এই যুদ্ধ হয়। বঙ্গদেশের কোন্ স্থানে উক্ত সমর সংঘটিত হয়, "আল্‌হা"য় সে কথার কোন উল্লেখ নাই। বঙ্গেশ্বর "আদি শূরে"র নাম, হিন্দীতে "সূরজভান" রাখা হইয়াছে।

নিম্নে "বঙ্গালে কী লড়াঈ"র মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল।

বঙ্গদেশে সূরজভানু নামে এক মহাপরাক্রমশালী নরপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার অলোকরূপলাবণ্য-সম্পন্না "চম্পাবত" নাম্নী এক কন্যা আর "মতী" ও "জওয়াহর" নামক দুই পুত্র ছিল। "বিঝাঁ যোগী" নামক রাজার এক দীক্ষাগুরু ছিলেন। ইনি অসাধারণ যাদুবিদ্যাবিশারদ; মন্ত্র প্রভাবে মনুষ্যকে পাষাণে অথবা মানবেতর প্রাণীতে পরিণত করিতে পারিতেন। রাজকন্যা চম্পাবত প্রাপ্ত-বয়স্কা হইলে, বঙ্গেশ্বর তাঁহার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইলেন। কথায় বলে "জাকে কন্যা সামরথ হোগঈ, ওনকে কৈসে নীদ সোহায়" অর্থাৎ যাহার কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, সে কি নিদ্রা যাইতে পারে? কাজেই রাজার নিদ্রাত্যাগ হইল। যাহা হউক, শুভদিন দেখিয়া, সূরজভানু "নেগী"-(ঘটক) দিগকে ডাকিয়া, কন্যার বর অন্বেষণার্থে ভারতের নানা প্রদেশে প্রেরণ করিলেন। নেগীদের হাতে রাজোচিত "টীকা"* দেওয়া হইল। যে পাত্রের সহিত কুমারীর সম্বন্ধ স্থির হইবে তাহাকে "টীকা" দিবার অনুমতি প্রদান করা হইল। নেগীর হস্তে বঙ্গেশ্বরের একখানি পরিচয়পত্র দেওয়া হইল। পত্রে রাজার পরাক্রম ও রাজকুমারীর রূপ গুণের উল্লেখ যথেষ্ট ছিল। সূরজভানু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "যে বীরশ্রেষ্ঠ সসৈন্যে আমাকে রণে পরাজিত করিবেন ও যাদুমন্ত্র প্রভাবে মদীয় গুরু বিঝাঁ যোগীকে পরাস্ত করিবেন, তিনি (পুত্রবধূ রূপেই হউক বা পত্নী রূপেই হউক) রাজকন্যা চম্পাবতকে লাভ করিবেন।" বলা বাহুল্য, পত্রখানিতে এই প্রতিজ্ঞার উল্লেখ ছিল। বঙ্গেশ্বর নেগীর প্রতি আদেশ করিলেন, "যে ভারতবর্ষীয় সকল রাজগণের রাজধানীতে যাইবে, কিন্তু মহোবায়† কদাপি যাইবে না। উহারা চঁদেলাদের দাস, উহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলে আমার বংশ অপবিত্র হইবে, অপাত্রে বা ভীরুকে কন্যা সম্প্রদান করিলে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম কলুষিত হইবে।"

ঘটকবর্গ প্রায় তিন বর্ষ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন রাজন্যবর্গের রাজধানী পর্য্যটন করিল, কিন্তু গৌড়েশ্বরের অমিত পরাক্রম, বিঝাঁ যোগীর যাদু বিদ্যা,সর্ব্বোপরি সূরজভানুর নিদারুণ প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া টীকা লইতে স্বীকৃত হইলেন না। সর্ব্বশেষে নেগীগণ কান্যকুব্জে উপনীত হইল, জয়চন্দ্র নিজ পুত্র কুমার "লক্ষণে"র সহিত বঙ্গেশ্বর দুহিতার বিবাহ দিতে অভিলাষী হইলেন, কিন্তু সূরজভানুর পত্র খানা পাঠ করিয়া উহাঁর শরীর হিম হইয়া গেল, হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল। পত্রখানি হস্তচ্যুত হইয়া ভূপতিত হইল। কিছুক্ষণানন্তর প্রকৃতিস্থ হইয়া জয়চন্দ্র নেগীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা বিবাহের সম্বন্ধ করিতে আইস নাই, যমরাজের নিমন্ত্রণ পত্র আনিয়াছ; যাহার মৃত্যু ঘনাইয়াছে সে বঙ্গদেশে গিয়া তোমাদের রাজকন্যাকে বিবাহ করিবে। আমার পুত্র আজন্ম অবিবাহিত থাকিলেও আমি তোমাদের টীকা লইব না। একটী রাজ-কুমারীর জন্য অনর্থক আমি নিজ সৈন্যকে হত্যা করিতে চাহি না, তোমরা নিজের পথ দেখ।" জয়চন্দ্রের এতাদৃশ দুর্ব্বলতা, রাজ-জামাতা উদলের বড়ই অসহ্য হইল। তিনি শ্বশুরকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন, "ছিঃ ছিঃ! আপনার মত ক্ষত্রিয় বীরের মুখে এমত ভীরুতাব্যঞ্জক বাক্য শোভা পায় না। আপনি সাগর হইয়া পুষ্করিণীকে ভয় পাইতেছেন? কানৌজের সিংহাসনে বসিয়া, গৌড়পতিকে ডরাইতেছেন, ক্ষত্রিয়ের আর ইহাপেক্ষা দূরপনেয় কলঙ্ক কি হইতে পারে? আপনি একজন পরাক্রমশালী নরপতি আর আমরা এক ক্ষুদ্র জায়গীরদার মাত্র; কিন্তু তথাপি সম্রাট পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হই নাই। এই টীকা গ্রহণ করিয়া বঙ্গেশ্বরকে উচিত

* বঙ্গদেশে যেরূপ বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইলে "পত্র" বা "আশীর্ব্বাদ" করা হয় এ প্রদেশে তাহাকে টীকা দেওয়া বলে। টীকায় অবস্থানুসারে বস্ত্রালঙ্কার ও নগদ অর্থ যৌতুক দিতে হয়।

† মহোবা রাজ আল্‌হা চঁদেরী রাজ "পরিমালে"র কৃপায় রাজ্যলাভ করেন। ইহাঁরা রাজবংশীয় ছিলেন না। আল্‌হার "উদল" "মলখান" "ধাঁধূ" ও "পরসা" নামে আরো চারিটী সহোদর ছিলেন। ইহাঁরা সকলে অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। একবার পৃথ্বীরাজের সহিত ইহাঁদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহাঁরা শৌর্য্যবলে দিল্লীশ্বরকে পরাজিত করেন ও তাঁহার "গড় সিরসা" নামক দুর্গটী কাড়িয়া লন। সেই দুর্গ মলখানের হস্তগত হয়। সেই সাহস বাড়িয়া গেল। বক্ষ্যমান আখ্যায়িকার লিখিত ঘটনার সময় পরিমালের সহিত কোন কারণে মনোমালিন্য ঘটায় ইহাঁরা সপরিবারে রাজ্যত্যাগ করিয়া জয়চন্দ্রের অতিথি হইয়াছিলেন বা আশ্রয় লইয়া-ছিলেন। উদল জয়চন্দ্রের জামাতা হইতেন।

শিক্ষা দিতে হইবে। যতক্ষণ শরীরের সহিত মস্তক সংযোজিত থাকিবে, যতক্ষণ হস্তে তরওয়াল থাকিবে, ততক্ষণ বিনা যুদ্ধে কোন রূপে গৌড়েশ্বরের সমীপে হীনতা স্বীকার করা যাইবে না।"

অগত্যা জামাতার হঠকারিতায় জয়চন্দ্র টীকা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কান্যকুব্জে মহা সমারোহের সহিত বরসজ্জা ও রণসজ্জা হইতে লাগিল। যত সব মরিচাপড়া অব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র গুলি পরিষ্কার ও ব্যবহারোপযোগী করা হইল। গোলা, গুলি, বারুদ, ইত্যাদি যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত হইতে লাগিল। সৈন্যদিগকে নানা যুদ্ধকৌশল শিক্ষা দেওয়া হইল। আলহা নিজে সেনাপতি হইয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন, "বীরগণ! মহারাজ তোমাদের সর্ব্ববিধ সুখশান্তির সুবিধা করিয়া দিয়া, উচ্চহারে বেতন দিয়া যে রাজভোগে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, তাহা কেবল এই সব দিনের জন্য। কনৌজের আশা ভরসা তোমরাই। মহারাজের মান সম্ভ্রম তোমাদেরই হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। আশা করি তোমরা নিজ কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হইবে না, তোমাদের মধ্যে যাহারা স্ত্রী পুত্রের মায়া পরিত্যাগ করিয়া মরিতে প্রস্তুত আছ তাহারাই যুদ্ধার্থে বঙ্গদেশে যাইতে পারিবে। যাহারা মরিতে ভয় পায় তাহারা নিজ নিজ বেতন লইয়া বাড়ী যাউক, কাপুরুষকে লইয়া সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে আমরা চাহি না।" সৈন্যগণ এক বাক্যে বলিল, "আমরা মরিতে ভয় করি না, এবং নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে সদাই তৎপর রহিব। অস্ত্রযুদ্ধে আমাদিগকে কেহ পরাস্ত করিতে পারিবে না; কিন্তু যাদুবিদ্যায় আমাদের দ্বারা কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা দেখি না। বাঙ্গালাদেশের স্ত্রী, পুরুষ সকলেই যাদু মন্ত্র জানে * আর বিঝাঁ যোগী ত মন্ত্রদ্বারা "পথর কো পানি কর ডালে নর মানুষকী কৌন বসায়া"; অর্থাৎ প্রস্তরকে জল করিয়া দেন মনুষ্য ত কোন ছার।" যাহা হউক "গতস্য অনুশোচনা নাস্তি" আর ত উপায়ান্তর নাই। জয়চন্দ্র ঘটকদিগকে প্রচুর পরিমাণে ধনরত্ন দিয়া বিদায় করিলেন। উহারা ফিরিয়া গিয়া বঙ্গেশ্বরকে সবিশেষ বৃত্তান্ত কহিল। মহবিয়া (মহোবার রাজা) সাহস করিয়া "টীকা" লইয়াছেন জানিয়া তিনি একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন; বলিলেন "কি উহাদের এতবড় আস্পর্দ্ধা হইয়াছে? ভাল, রণ ক্ষেত্রে দেখিব কে কত বড় বীর।"

যথাসময়ে জয়চন্দ্র বরযাত্র রণযাত্র লইয়া বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন। রাজধানীর কিয়দ্দূরে শিবির সংস্থাপন করিয়া গৌড়রাজসভায় দূত প্রেরণ করা হইল। কন্যা সম্প্রদানের পরিবর্ত্তে উভয় পক্ষ হইতে দপ্ দপ্ করিয়া সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দ্বাদশদিনব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধের পর বঙ্গেশ্বরের পরাজিত হইবার আশঙ্কা হইল। তখন সুরজভানু গুরুদেবকে স্মরণ করিলেন। বিঝাঁ যোগী ইন্দ্রজাল প্রভাবে সৈন্যদিগকে ও অস্ত্র, শস্ত্র, অশ্ব, হস্তী, সব প্রস্তরাকার করিয়া দিলেন। আর জয়চন্দ্র, আলহা, উদল ইত্যাদি, পঞ্চজনকে মেষ, মৃগ, গর্দ্দভ, কুক্কুট, ভেক এই পঞ্চপশু করিয়া দিলেন। জয়চন্দ্রের দলস্থ এমন একটী প্রাণীও রহিল না যে এই সকল দুঃসংবাদ কনৌজে প্রেরণ করে। বঙ্গেশ্বরের এই কপটাচরণে রাজকুমারী চম্পাবত বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। কান্যকুব্জেশ্বর যে সবংশে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেন ইহার কারণ যে তিনি নিজেই, এই কথা ভাবিয়া উহাঁর বড়ই আত্মগ্লানি উৎপন্ন হইল; রাজকন্যা আত্মহত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। রাজকুমারীর একটী শুকপক্ষী ছিল, কুমারী তাহাকে বড় যত্নে পুষিয়াছিলেন। রাজকুমারীর দুঃখে কেবল এই পক্ষীটীর হৃদয় দ্রবীভূত হইল। শুক বলিল, "কুমারী তুমি ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক একখানি পত্র লিখিয়া আমার কণ্ঠে বাঁধিয়া দাও, আমি গিয়া কনৌজে সংবাদ দিয়া আসিব। দেখি যদি কেহ আসিয়া ইঁহাদের উদ্ধার করিতে সক্ষম হন"। রাজকুমারী শুকপক্ষীর পরামর্শানুসারে কার্য্য করিলেন। বলা বাহুল্য এ সংবাদ কেহ জানিতে পারিল না।

কান্যকুব্জে উপস্থিত হইয়া পক্ষী রাজান্তঃপুরের প্রাচীরোপরি বসিল। একটী পরিচারিকা তাহাকে ধরিয়া অন্তঃপুরিকাদিগের সমীপে লইয়া আসিল। পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া অন্তঃপুরে শোকের বন্যা প্রবাহিত হইল। কনৌজে এমন কেহই ছিলেন না যে, সুদূর বঙ্গদেশে গিয়া উহাঁদের উদ্ধারসাধন করিতে পারেন। আলহার মহিষী রাণী সুমনা সিরসা দুর্গে দেবর মলখানকে এই সংবাদ দিতে মনস্থ

* এদেশীয় অশিক্ষিত নরনারীদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে এখনও বঙ্গদেশে এরূপ যাদুমন্ত্র প্রচলিত আছে যাহার দ্বারা মনুষ্যকে ভেড়া করা যাইতে পারে।

করিলেন, এবং শিক্ষিত পারাবত দ্বারা* পত্র লিখিয়া ঠাকুরপোকে সব খবর জানাইলেন। বীর মলখান সংবাদ পাইবামাত্র ক্রোধে আরক্তবর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধসজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন যে, সৈন্য দ্বারা বঙ্গেশ্বরকে বিজয় করা কঠিন, শঠের সহিত শঠাচরণ করাই বিধেয়। মলখান পরামর্শগ্রহণের জন্য নিজ দীক্ষাগুরু অমর যোগীর নিকট গমন করিলেন। গুরুদেব তখন গভীর অরণ্যানী অভ্যন্তরে যোগসাধনে রত ছিলেন। মলখানের আগমনে উহাঁর যোগভঙ্গ হইল। মলখান নিজ বক্তব্য গুরুপদে নিবেদন করিলেন ও সৎপরামর্শ চাহিলেন। গুরুদেব কিন্তু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমি আর কি সৎপরামর্শ দিব? শান্তিতে রাজ্যশাসন করা ত তোমাদের কুষ্ঠিতে লেখে না। নিত্য যুদ্ধ, বিগ্রহ, নরহত্যা ব্যতিরেকে জলগ্রহণ করাটা তোমরা মহাপাতক মনে কর! আমি আর তোমাদের প্রশ্রয় দিয়া পাপের ভাগী হইব না।" উদ্ধতপ্রকৃতি মলখান এই বাক্য শ্রবণে গুরুহত্যায় উদ্যত হইলেন। তখন গুরুদেব হাস্য করিয়া স্নেহপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস! আমি তোমাকে পরিহাস করিতেছিলাম। আমি সতত কায়মনে তোমাদের শুভচিন্তক, কিন্তু বৎস, আমার এমন বিদ্যা নাই যে, আমি তদ্দ্বারা তাহাকে পরাস্ত করি। আমি তোমাকে পরামর্শ দিতেছি, তুমি আত্মগোপন পূর্ব্বক শিষ্যরূপে বিঝাঁর সকাশে গমন কর, তুমি উহার কাছে সম্পূর্ণ যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিবে। সেবা ও শ্রদ্ধা দ্বারা বিঝাঁকে বশ করিবে। বিঝাঁ তোমার উপর তুষ্ট হইয়া পুরস্কার দিতে চাহিলে তুমি উক্ত পঞ্চপশু পুরস্কার চাহিয়া লইও, তাহা হইলেই তুমি সফলতা লাভ করিবে।" মলখান গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বিঝাঁর আশ্রমে উপনীত হইলেন ও উহাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। বিঝাঁ যোগী হৃষ্টচিত্তে শিষ্যকে নিত্য নব বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে অমর যোগীর ভবিষ্যদ্বাণী ফলিল; বিঝা যোগী মলখানের সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া, শিষ্যকে নিজ ঈপ্সিত পুরস্কার চাহিতে বলিলেন। শিষ্য পূর্ব্ব শিক্ষানুসারে সেই আশ্রমস্থিত পঞ্চ পশু পুরস্কার চাহিলেন। বিঝাঁ বলিলেন, "উহা আমি দিতে পারিব না, তুমি আর যাহা চাও তাহা দিব।" মলখান বলিলেন, "আপনি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে আমি যাহা চাহিব তাহাই দিবেন, এখন তাহার অন্যথা করা ভবাদৃশ মহাত্মার শোভা পায় না। দেখুন, রাজা দশরথ প্রতিজ্ঞাপালনার্থে প্রাণোপম পুত্রকে বনবাস দিতে বাধ্য হইলেন। বলি রাজা অঙ্গীকার রক্ষার্থে পাতালে গমন করিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র সত্যপালনার্থে স্ত্রী, পুত্র পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছিলেন। আশা করি আপনিও এই পঞ্চ পশু প্রদানে নিজ কথা রক্ষা করিবেন।" বিঝাঁ যোগী মলখানের তর্কে লজ্জিত হইয়া শিষ্যকে পুরস্কার দিলেন। মলখানও হৃষ্টচিত্তে পুরস্কার লইয়া গুরুচরণে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া মন্ত্রপূত জলসিঞ্চন করিয়া পশুদিগকে মনুষ্যাকারে পরিণত করিলেন। পরে ওই প্রণালীতে সৈন্যদিগকেও পূর্ব্বাকারে পরিণত করিলেন। কান্যকুব্জেশ্বর পুনরায় নব বলে বলীয়ান হইয়া বঙ্গেশ্বরকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন। এবারে আর গুরুদেবের বিদ্যায় কিছু ফল দর্শিল না। তিন দিন স্থায়ী সংগ্রামের পর জয়চন্দ্র জয়লাভ করিলেন। বঙ্গেশ্বর কান্যকুব্জেশ্বরের সহিত সৌহার্দ্দ সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে কনৌজের যুবরাজের সহিত রাজকুমারীর উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। জয়চন্দ্র বহু ধনরত্ন অশ্বহস্তী, ও লক্ষ্মীস্বরূপিণী পুত্রবধূ লইয়া স্বরাজ্যে গমন করিলেন।

প্রবাসিনী।

* শিক্ষিত পারাবত দ্বারা সংবাদ প্রদান করা বা ডিনামাইট দ্বারা শত্রুসৈন্য ধ্বংস করা বা সুড়ঙ্গ খনন করা ইত্যাদি যে পাশ্চাত্য রণকৌশলের একটী অঙ্গ বিশেষ তাহাই নহে, "আল্‌হা খণ্ডে" ইহার ভুরি ভুরি উল্লেখ আছে।

নেপালের প্রধান তীর্থ পশুপতিনাথ।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পর ভারতবর্ষে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে। বৈদিক সময়ে ভারতবর্ষে দেবমন্দিরও ছিল না, বিগ্রহপূজাও ছিল না। এখন হরিদ্বার হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কতই তীর্থ—কতই মন্দির—কতই বিগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-

যুগের পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ ছিল না। মহাত্মা শাক্যসিংহ তাঁহার শিষ্যদিগের জন্য কোন প্রকার পূজা অর্চ্চনা, যাগযজ্ঞ, স্তবস্তুতির ব্যবস্থা দিয়া যান নাই। অথচ সেই বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দুধর্ম্মের এইরূপ রূপান্তর হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের অনেক তীর্থ এবং অনেক দেবমন্দির একসময়ে বৌদ্ধদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্রাট অশোক যে ৮৪০০০ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ স্তূপই যে এখন দেবমন্দিরে পরিণত হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় কি? নচেৎ সে সকল কোথায় অন্তর্ধান করিল? হিন্দধর্ম্মের কবলে বৌদ্ধধর্ম্ম লয় পাইয়াছে, বৌদ্ধদিগের বিহার স্তূপ স্মৃতিচিহ্ন সকল, হিন্দুতীর্থ ও দেবমন্দির সকলে পরিণত হইয়াছে। পুরীর জগন্নাথ এবং নেপালের পশুপতিনাথ এই শ্রেণীর তীর্থ বলিয়া বোধ হয়।

নেপালের ইতিহাসে পশুপতিনাথের জন্মকথা এইরূপ বিবৃত আছে:—পুরাকালে নেপাল উপত্যকা বিশাল নাগহ্রদ নামে অভিহিত ছিল। তথায় নাগকুল বাস করিত। সত্যযুগে বিপাশ্ব বুদ্ধ বন্দুমতি দেশ হইতে আসিয়া নাগহ্রদের পশ্চিমে নাগার্দ্দন নামক পর্ব্বতে বাস করেন, এবং হ্রদের জলে একটী পদ্মের মূল রোপণ করেন। তৎপরে তিনি শিষ্যগণকে সেখানে রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ যুগেই পদ্মের মূল হইতে শতদল বিকশিত হইল, এবং তন্মধ্যে স্বয়ম্ভূ ভগবান প্রকাশিত হইলেন। এই বাণী শ্রবণ করিয়া শিখিবুদ্ধ অমরাপুরী হইতে আসিয়া সেই আলোকে বিলীন হইয়া যান। তৎপরে ত্রেতাযুগে বিশ্বভূ বুদ্ধ অনুপথ হইতে আসিয়া ফুলচক পর্ব্বত হইতে জ্যোতি দর্শন করিয়া লক্ষ পুষ্পের অঞ্জলি দেন। উক্ত ত্রেতাযুগে মঞ্জুশ্রী বুদ্ধ চীন হইতে আসিয়া দিব্য জ্যোতি দর্শন করেন, এবং তিনি তববারির আঘাতে কাটওয়ার নামক স্থান দিয়া হ্রদের জল বাহির করিয়া দেন। হ্রদের জলের সহিত নাগগণ বাহির হইয়া গেলে তিনি কর্কটক নামক নাগরাজকে অনুরোধ করিয়া টাউদা নামক জলাশয়ে স্থাপন করিলেন, এবং উপত্যকায় সমুদয় ধন সম্পত্তির উপর তাঁহার আধিপত্য অপ্রতিহত হইল। তিনি বিশ্বরূপের মধ্যে স্বয়ম্ভু জ্যোতি দর্শন করিলেন; এবং বিশ্বরূপের ভিতর গুহেশ্বরীকে দর্শন করিলেন। পদ্মের মধ্যস্থিত স্বয়ম্ভূ জ্যোতিকে পূজা করিলেন; এবং সেই পদ্মের মূল যে গুহেশ্বরীতে নিহিত ছিল তাহাও তিনি লক্ষ্য করিলেন। গৃহস্থ ব্যক্তিগণের বাসের জন্য তিনি মঞ্জুপাটন নামক সহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভিক্ষুদিগের জন্য বিহারও স্থাপন করিয়াছিলেন। পরিশেষে ধর্ম্মকরকে রাজা করিয়া তিনি চীনে প্রস্থান করিলেন। মঞ্জুশ্রীর শিষ্যগণ মঞ্জুশ্রীর পূজার জন্য স্বয়ম্ভুর নিকট এক মন্দির স্থাপন করিল।

ত্রেতাযুগে করকচাদ বুদ্ধ ক্ষেমবতী নামক স্থান হইতে আগমন করিয়া স্বয়ম্ভু জ্যোতির ভিতর গুহেশ্বরীকে দর্শন করেন। তিনি ব্রাহ্মণজাতীয় ৭০০ ব্যক্তিকে ভিক্ষুব্রতে দীক্ষা দেন। কিন্তু কোথায়ও আর জল দেখিতে পাইলেন না। তখন পর্ব্বত গাত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ মাত্র বাঘমতী নদী নামিয়া আসিল। ৭০০ শিষ্যের কেশ লইয়া শূন্যে ছড়াইয়া দিলেন, অমনি কেশমতী নদীর জন্ম হইল।

দ্বাপরযুগে কনকমুনি বুদ্ধ শোভাবতী হইতে আসিয়া স্বয়ম্ভূ ও গুহেশ্বরীর পূজা করেন। তৎপরে কাশ্যকবুদ্ধ কাশী হইতে আগমন করেন। তিনিও স্বয়ম্ভূ ও গুহেশ্বরীর পূজা করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তৎপরে তিনি গৌড়ে (বাঙ্গালা) গিয়া প্রচণ্ডদেব নামক রাজাকে স্বয়ম্ভূ এবং গুহেশ্বরীর পূজা করিতে আদেশ করেন। তাঁহার আদেশানুসারে প্রচণ্ডদেব শান্তশ্রী নাম ধারণ করিয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন। তিনি স্বয়ম্ভূ জ্যোতি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। কিন্তু কলিযুগ সন্নিকট জানিয়া স্বয়ম্ভূ জ্যোতিকে আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কালে সেই স্বয়ম্ভুর মন্দির ধূলিসাৎ হয় এবং স্বয়ম্ভু জ্যোতি ভগ্নাবশেষের ভিতর প্রোথিত হন। এবং সকল চিহ্ন কালে বিলুপ্ত হইল। একদা এক গাভী নিত্য নির্জ্জনে বনের মধ্যে তথায় আসিয়া দুগ্ধধারা সেচন করিতে থাকে। একদিন গোপালক পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া গোপনে সমুদয় ব্যাপার দর্শন করিল এবং কৌতূহলপরবশ হইয়া সেস্থান খনন করিতে আরম্ভ করে। এবং খনন করিতে করিতে সহসা স্বয়ম্ভূ জ্যোতি প্রকাশিত হইয়া তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। নীমুনি (যাহা হইতে নেপাল নামের উদ্ভব) এই গোপালকের পুত্রকে রাজা করিলেন। এবং ইহাঁরই রাজত্বকালে পশুপতিনাথের

পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। পুরাকালের সেই স্বয়ম্ভূ বর্ত্তমান কালের পশুপতিনাথ। কিন্তু এখনও কাটমণ্ডু সহরের অদূরে স্বয়ম্ভূ নাথের (সিম্ভুনাথের) প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়ে নেপালে প্রায় ২৭৩৩টী দেবমন্দির আছে; তন্মধ্যে পশুপতিনাথের মন্দির সর্ব্বপ্রধান। নেপালের উপত্যকায় কাটমণ্ডু সহরের প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে বাঘমতী নদীর পশ্চিম তীরে পশুপতিনাথের প্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত। বর্ত্তমান মন্দিরটী কতদিন নির্ম্মিত হইয়াছে নিশ্চিত বলা যায় না। তবে বৎসরের হিসাব না করিয়া শতাব্দীর হিসাব করিতে হয়। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ধর্ম্ম নেপালেও ম্লান হইয়া আসিয়াছে এবং সমুদায় বৌদ্ধস্মৃতি বিসর্জ্জন দিয়া উক্ত দেবালয় মহাদেবের মন্দির হইয়াছে। বস্তুতঃ পশুপতিনাথের বিগ্রহে মহাদেবের কোন বিশেষত্ব দেখা যায় না, তবে মন্দিরের প্রাঙ্গণে ত্রিশূল, বৃষ, শিবলিঙ্গ সকলই বিদ্যমান। মন্দিরটী অতি সুদৃশ্য এবং উচ্চ। নেপালের সকল নৃপতি, সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি পশুপতিনাথের মন্দিরের কিছু-না-কিছু শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। নেপালরাজ সদাশিব দেব পশুপতিনাথের মন্দিরের ছাদ স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রী ভীমসেন থাপা পশুপতিনাথের মন্দিরের কারুকার্য্যশোভিত প্রকাণ্ড রৌপ্যনির্ম্মিত দ্বারসকল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। কেহ বা সুবর্ণ ছত্র, কেহ বা সুবর্ণ ত্রিশূল ইত্যাদি দান করিয়াছেন। পশুপতিনাথের মন্দিরের প্রাঙ্গণে সুবর্ণমণ্ডিত একটা প্রকাণ্ড বৃষ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন কত যে স্বর্ণময় বৃষ, কত যে শিবলিঙ্গ আছে তাহা গণনা করা দুঃসাধ্য। পশুপতিনাথের মন্দিরে স্বর্ণ রৌপ্যের অতিশয় প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ভারতের প্রায় অন্য সকল তীর্থ মুসলমানদিগের হস্তস্পর্শে হতশ্রী হইয়াছে ; এই সকল তীর্থের ধনসম্পত্তি বারম্বার লুণ্ঠিত হইয়াছে—কেবল পশুপতিনাথ ইহার ব্যতিক্রম স্থল। নেপালে বুদ্ধ গিয়াছেন, অশোক গিয়াছেন, বিক্রমাদিত্য গিয়াছেন, শিলাদিত্য গিয়াছেন, শঙ্কর গিয়াছেন, কেবল যান নাই মুসলমান দিগ্বিজয়ীগণ! বৌদ্ধ এবং হিন্দুগণ নেপালে অনেক কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, অনেক দেবালয় অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন কিন্তু মুসলমান হস্তে কোন দিনও তাহা স্পর্শ করেন নাই, স্পর্শ করা দূরে থাকুক দৃষ্টিপাতও করেন নাই। পশুপতিনাথের প্রভূত ঐশ্বর্য্য সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পুঞ্জীকৃতই হইতেছে লুণ্ঠন করিতে কেহ আসে নাই। তাই বোধ হয় অন্য কোন তীর্থে এরূপ স্বর্ণ-রৌপ্যের প্রাচুর্য্য দেখা যায় না। যে স্থানে পশুপতিনাথের মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত আছে, বস্তুতঃ তাহা অতি রমণীয়। পশুপতিনাথের মন্দিরের নিকটে বহুদূর পর্য্যন্ত বাঘমতী নদীর উপর পার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত কত সোপান, কত ঘাট, যথা—গৌরী ঘাট, আর্য্য ঘাট প্রভৃতি! পশুপতির ঘাটে দাঁড়াইয়া দেখিলে বাঘমতীর দৃশ্য কি সুন্দর। উভয় পার্শ্বস্থিত উন্নত পর্ব্বতের মধ্য দিয়া যেন কোন অদৃশ্য লোক হইতে, আঁকিয়া বাঁকিয়া পুণ্যতোয়া নির্ঝরিণী কুল কুল করিয়া নামিয়া আসিতেছে। যেন ব্রহ্মার পাদপদ্ম হইতে মন্দাকিনী নামিয়া আসিতেছে। অন্য সময় এই অপরিসর পার্ব্বত্য নদীর জল অতি অল্প থাকে, কিন্তু বর্ষায় তাহার কি খর স্রোত! কি কল্লোল! আর্য্যঘাটের পুলের উপর দাঁড়াইয়া বাঘমতীর খর স্রোত ও কল্লোল দর্শন করিলে প্রাণ এরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে যে সেই খরস্রোতের মুখে লম্ফ দিয়া পড়িয়া ভাসিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। বাঘমতীর এই নৃত্যময়ী লীলা দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত হয় না এবং কল্লোলিনীর কল্লোল শুনিয়া শুনিয়া কর্ণ যেন আর তৃপ্ত হয় না। নেপালীদিগের নিকট পশুপতিনাথ অতি পবিত্রস্থান। মৃত্যুর সময় সকলে পশুপতিনাথের চরণ পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলকে মৃত্যুর পূর্ব্বে পশুপতিনাথে লইয়া যাওয়া হয়। পশুপতির ঘাটে দুইখানি প্রশস্ত শিলা এরূপ ভাবে নিহিত আছে, যাহার উপর কাহাকেও শয়ন করাইলে পদদ্বয় বাঘমতীর বারি স্পর্শ করে। এই দুইখানির একখানি রাজপরিবার সকলের জন্য, অপরখানি মন্ত্রীর পরিবারের সকলের জন্য। রাজা মহারাজা মহারাণী সকলেই অন্তিমে এই শিলাশয্যায় শায়িত হন, ও বাঘমতীর জলে চরণ রাখিয়া পশুপতিনাথের নাম জপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। পূর্ব্বে এই স্থানেই সতীদাহ হইত। এখন পশুপতিনাথের অদূরেই সকল মৃতদেহের সৎকার হইয়া থাকে। পশুপতিনাথের মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত মন্দির আছে। বিশ্বরূপের মন্দির, গুহ্যেশ্বরীর মন্দির ইত্যাদি অসংখ্য মন্দির।

গুহ্যেশ্বরীর মন্দিরে একটী উৎস আছে। সেই উৎসের মুখ স্বর্ণময় আবরণে আবৃত, খুলিয়া হাত দিলেই হস্তে উৎসের জল লাগে। গুহ্যেশ্বরীর মন্দিরে সর্ব্বদাই পূজা অর্চ্চনা চলিতেছে। পশুপতির প্রাঙ্গণে সাধু সন্ন্যাসীর অন্ত নাই। কোথাও বা শাস্ত্রপাঠ হইতেছে, কোথায় ভজনগীত হইতেছে, কোথায় ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে, কেহবা পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে, কেহবা মস্তকে পবিত্র বারিসিঞ্চন করিতেছে, কেহবা কপালে টীকা দিতেছে, কেহবা মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে, দিবারাত্রি যাত্রিসমাগম, দিবারাত্রি পূজা অর্চ্চনা চলিয়াছে। এই লোকারণ্যের মধ্যে স্থূলকায় বৃষ মহাশয় সগর্ব্বে বিচরণ করিতেছেন। পশুপতিনাথের মন্দিরের অদূরে মৃগস্থলী নামক পর্ব্বতের উপর এক রমণীয় বন আছে। সেখানে বানর সকল দলে দলে বিহার করিতেছে। বৌদ্ধযুগে এই পশুপতিনাথেরমন্দিরের সন্নিকটে বৌদ্ধ বিহার বৌদ্ধ মঠ সকল ছিল। এখন আর কিছুই নাই। পশুপতিনাথের নিকট এখন যে সকল পল্লী আছে তাহা অতি কদর্য্য। প্রতি বৎসর শিবরাত্রির সময় পশুপতিনাথের মন্দিরে বিপুল সমারোহ ব্যাপার হইয়া থাকে। সেই সময় প্রায় ২০,০০০ যাত্রী নানা দেশবিদেশ হইতে পশুপতিনাথকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়া থাকে এবং ৬ দিন নেপাল রাজ্যের দ্বার অবারিত থাকে। এই সময় পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় যাত্রিদল পশুপতিনাথের উদ্দেশে ধাবিত হয় এবং নেপাল উপত্যকায় পদার্পণ করিয়াই "জয় পশুপতিনাথ" বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠে। কি পথক্লেশ স্বীকার করিয়া দেশ দেশান্তর হইতে লোকে পশুপতিনাথকে দর্শন করিতে আসে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পশুপতিনাথ হিন্দুদিগের অতি প্রসিদ্ধ তীর্থ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নেপালে প্রায় ২৭৩৩টী দেবমন্দির আছে। ইহার অধিকাংশ বিদেশীরা কখনও দেখিতে পায় নাই। কিন্তু কাটমণ্ডু সহরের অদূরে নেপালের উপত্যকায় অনেক পবিত্র স্থান অনেক দেবমন্দির আছে। এতৎসম্বন্ধে বারান্তরে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহেমলতা দেবী।

জ্যোতি-নির্ব্বাণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বকথা)

যে সময়ের কথা আমরা লিখিতে বসিয়াছি, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। বাঙ্গালী অদৃষ্টগুণে আজ যেমন রুগ্নদেহ জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনশত বৎসর পূর্ব্বে তাহা ছিল না। তখন বাঙ্গালীর বাহুতে শক্তি ছিল, তীরে লক্ষ্য ছিল, ঢালে আত্মরক্ষার ক্ষমতা ছিল, লাঠিতে আততায়ীর মুণ্ড চূর্ণ করিবার সামর্থ্য ছিল। তখন বাঙ্গালীর ক্ষেত্রে শস্য, গোলায় ধান, গাভীতে দুগ্ধ, নদীতে নীরধারা, আর নিজের একটা জাতীয়তা ছিল। শত ক্রোশ দূরে একজন আর একজনকে স্বজাতি বলিয়া চিনিতে পারিত।

বাঙ্গলার ভূস্বামিগণ, তখন বাঙ্গলার প্রকৃত রাজা। টোডরমল, মানসিংহ, বাঙ্গলা দখল করিয়াও বাঙ্গালীকে দখল করিতে পারেন নাই। পাঠান বঙ্গদেশ হইতে সুবর্ণরেখার পারে বিতাড়িত। বঙ্গের ও উড়িষ্যার প্রধান নগর ও রাজধানী সমূহে মোগলের রক্তপতাকা প্রোথিত—কিন্তু তবুও দুষ্ট বাঙ্গালী স্বীকার করিতে চাহে না, মোগল সম্রাট তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ভারতের সার্ব্বভৌমিক অধীশ্বর। সেকালের বাঙ্গালী জমীদারেরা এখনকার জমীদারদের ন্যায়, বিলাস-ব্যসন-নিমগ্ন ছিলেন না। প্রজাকে তাঁহারা সন্তানের মত দেখিতেন। মোগল বাদশাহ বাঙ্গলায় ফৌজদার সুবেদার পাঠাইয়া, ফৌজ পাঠাইয়া বঙ্গ-শাসনের বন্দোবস্ত করিতেন, তাহাদের উপর প্রজারক্ষণের ভার দিতেন। কিন্তু এই সুদূর বাঙ্গলার মাটীর গুণে সেই সব সুবেদার ফৌজদার বাদশার অধিক শক্তিসম্পন্ন হইতেন। প্রজার রক্ষক হইয়া ভক্ষকবৃত্তি অবলম্বন করিতেন।

সম্রাট আকবর-শাহের পবিত্র দেহ মর্ম্মরখচিত সেকন্দ্রার সমাধিগর্ভে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছে। সুলতান সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। জাহাঙ্গীর ভোগবিলাসী, আত্ম-সুখ-নিরত স্বার্থপর সম্রাট। বাঙ্গলার রাজস্বের সহিতই তাঁহার সম্পর্ক, প্রজার সহিত নহে। তাঁহার নিয়োজিত ফৌজদার, মহল হইতে খাজানা আদায় করিয়া রাজধানীতে সুবেদারের কাছে পাঠাইতেন।

আর সুবেদার সাহেব দিল্লীতে বা আগরায় আসরফিগুলি চালান দিয়া ভাবিতেন, তাঁহার বাঙ্গলা-শাসনের কর্ত্তব্য শেষ হইল।

আকবরশাহের রাজত্বের শেষাংশে বাঙ্গলায় দ্বাদশটী উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ন্যায় ইহাঁরা অন্ধকারপ্লাবিত বঙ্গাকাশকে উজ্জ্বল জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান করিয়াছিলেন। এ তীব্র জ্যোতি-রেখা সুদূর আগরায়, আকবর শাহের উৎক্রোশ-দৃষ্টির উপর গিয়া পড়িল। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি আকবরশাহ বিদ্রোহী পাঠানদিগের অপেক্ষা এই শক্তিসম্পন্ন একতাবন্ধনে আবদ্ধ বঙ্গের দ্বাদশজন জমীদারকে স্বরাজ্যের অনিষ্টকারী বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কালে বল সঞ্চয় করিয়া তাঁহারা যে শস্যশ্যামলা সোণার বাঙ্গলায়, তাঁহার কষ্টার্জ্জিত রাজ্যের ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া দিতে পারেন ইহাও তাঁহার নিকট সুদূরপরাহত বলিয়া বোধ হইল না।

বঙ্গের এই দ্বাদশ ভৌমিকগণ সাধারণতঃ—"বারো ভুঁইয়াঁ" নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের কেল্লা ছিল, তোপ ছিল, তীর ছিল, লক্ষ্যশক্তি ছিল, সেনা ছিল, তরবারিতে শাণ ছিল। এই দ্বাদশ ভৌমিকের সকলেই সমুদ্রতীর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান পূর্ব্ববাঙ্গলা অধিকৃত বিস্তৃত ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহারা প্রয়োজন হইলে বাদশাহের ফৌজদারের বা সুবাদারের সহিত সদ্ভাব করিতেন, আবার কখনও বা প্রজারক্ষার জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেন। বাঙ্গলার প্রজা, মোগল রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ইহাঁদের শরণাপন্ন হইত। বঙ্গের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলির মধ্যে যশোরের প্রতাপ-আদিত্য রায় ও ঢাকা বিক্রমপুরের চাঁদরায়, কেদার রায় সাহসে অদ্বিতীয় ও প্রচুর সেনাবলসম্পন্ন ছিলেন। অসীম বুদ্ধিশালী আকবর শাহ এই দুই জনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য যখন দিল্লীর রাজস্ব বন্ধ করিয়া রাজমুকুট পরিয়া সিংহাসনে বসিলেন, সেই সময়ে আকবর শাহের সিংহাসন টলিয়া উঠিল। তিনি মানসিংহকে সেনাপতি করিয়া প্রতাপকে দমন করিবার জন্য বাঙ্গলায় পাঠাইলেন।

বিশ্বাসঘাতক বাঙ্গালী ভবানন্দের সহায়তায়, প্রতাপাদিত্য কিরূপে মানসিংহের হস্তে বন্দী হইয়া, যশোময়ী যশোহরের উজ্জ্বল দীপ্তি নির্ব্বাপিত করেন—তাহা সাধারণে জানেন। প্রতাপাদিত্যকে ধ্বংস করিয়া আকবর শাহ শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে সেকন্দ্রা-সমাধি আশ্রয় করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার বংশধর জাহাঙ্গীর, বিক্রমপুরের চাঁদরায় কেদার রায়ের শক্তিবৃদ্ধি দর্শনে আরও শঙ্কিত হইলেন।

বৃদ্ধ রাজা চাঁদরায় তেজ ও প্রতিভার পূর্ণ আদর্শ। সেই বার্দ্ধক্য-মণ্ডিত বদনমণ্ডলে প্রয়োজন হইলে যৌবনের প্রদীপ্ত তেজ দেখা দিত। তাঁহার পুত্র কেদার রায়ও পিতার ন্যায় তেজোদীপ্ত অসমসাহসিক বীর পুরুষ ছিলেন। ফৌজদার ও সুবেদারকে উৎকোচ দিয়া, চাঁদরায় পদ্মাতীরে নিজ রাজধানী শ্রীপুরে নূতন দুর্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার শেলেখানায়, কামান, বন্দুক, বারুদের কোন অভাব রহিল না। চাঁদ-রায়ের অসংখ্য পদাতিক, পাঁচশত সজ্জিত বৃহৎ কোশা,* অপরিমেয় তীরন্দাজ ও গোলন্দাজ, পদ্মা মেঘনা ও ধবলেশ্বরীর অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগে তাঁহার একাধিপত্য বিস্তার করিল।

ক্ষমতায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র নবাব ঈশা খাঁ। নবাব সাহেব চট্টগ্রাম প্রদেশের একচ্ছত্রা অধিপতি। তাঁহার বাহুবল ও সৈন্যবল যথেষ্ট ছিল। খিজিরপুর তাঁহার সুরক্ষিত রাজধানী। দশ বারটী সুদৃঢ় কেল্লার তিনি মালিক।

নবাব ঈশাখাঁ মসনদ আলির পিতা, কালিদাস গজদানী জাতিতে ক্ষত্রিয়। ব্যবসায় উদ্দেশে বাঙ্গলায় আসিয়া তিনি প্রভূত সম্পত্তি সঞ্চয় করেন। পাঠানেরা তাঁহার সঞ্চিত সম্পত্তি লুঠ করিয়া তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। পাঠানগণ আকবর শাহের ক্রোধানলে বাঙ্গলা হইতে সমূলে বিনষ্ট হইলে তাঁহার পুত্র ঈশাখাঁ, লুণ্ঠিত পিতৃ সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করিয়া নবাব উপাধি ধারণ করেন। রাজা চাঁদরায়ের সময়ে তিনজন ঈশাখাঁ এই বঙ্গদেশে ক্ষমতাশালী ছিলেন। একজন হিজলীর ঈশাখাঁ মসন্দরী, ইনি প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের সহিত পাগড়ী বদল করিয়া বন্ধুত্বে আবদ্ধ হন। দ্বিতীয় ঈশাখাঁ এই চট্টগ্রাম প্রদেশাধিপতি নবাব ঈশাখাঁ মসনদ আলি। তৃতীয় ব্যক্তি উড়িষ্যায় ছিলেন—জাতিতে পাঠান। নামে, প্রতিপত্তিতে, বাহুবলে চট্টগ্রামের ঈশাখাঁই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এই নবাব ঈশাখাঁ চাঁদরায়ের বন্ধু হইলেও, মোগলের

* দ্রুতগামী সুবৃহৎ নৌকা। ইহাই সেই অতীত যুগের বাঙ্গালীর Naval power বা নৌশক্তির একমাত্র নিদর্শন।

বিরুদ্ধাচরণে যদি প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সাহায্য করিতেন—তাহা হইলে শত মানসিংহ, শত কিলমক আসিলেও বাঙ্গলার স্বাধীনতা নষ্ট করিতে পারিতেন না। কিন্তু বঙ্গের ভাগ্য-লিপির ফলানুসারে তাহা হয় নাই। কেন হয় নাই, পাঠক এই উপন্যাসের ভবিষ্যৎ পরিচ্ছেদে তাহার পরিচয় পাইবেন।

আকবর শাহের জীবদ্দশায় ঈশাখাঁর সহিত একবার মোগল সৈন্যের সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়। জয় পরাজয় নির্দ্দিষ্ট না হওয়ায়, ঈশাখাঁ মানসিংহকে অসিযুদ্ধে আহ্বান করেন। যুদ্ধকালে মানসিংহের তরবারি ভাঙ্গিয়া যায়। ইচ্ছা করিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ অস্ত্রহীন শত্রুকে বন্দী করিতে পারিতেন। কিন্তু মহত্ত্ব প্রকাশে তাহা না ক'রয়া তাঁহাকে আর একখানি তরবারি দেন। মানসিংহ ঈশাখাঁর এই উদারতা দেখিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। মানসিংহ ঈশাখাঁকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীতে গিয়া বাদশাহের নিকট তাহার মহত্ত্বের পরিচয় দেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি আকবর শাহ দেখিলেন, ঈশাখাঁকে মোগল সরকারের বন্ধুরূপে চট্টগ্রাম উপকূলে রাখিলে—পাঠানদের প্রতাপ অনেকটা কমিয়া আসিবে, এবং চট্টগ্রাম উপকূলের পর্টুগীজ দস্যুরাও দমনে থাকিবে। সেই অবধি নবাব ঈশাখাঁ মোগল সরকারের অধীনে চট্টগ্রাম প্রদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। প্রচুর অর্থদানে ঈশাখাঁকে বশীভূত করিয়া পর্টুগীজ দস্যুগণ সন্দীপের মোহানায় চট্টগ্রামের উপকূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-নিবেশ ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। এই প্রবল প্রতাপ পর্টুগীজ জল-দস্যুগণ বঙ্গোপসাগরগামী বাণিজ্যজাহাজ লুঠ করিয়া প্রচুর ধনশালী হইয়াছিল। বাঙ্গলায় বাণিজ্য নিবাস স্থাপন করিয়া রাজ্য বিস্তারই তাহাদের আন্তরিক উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য অন্তরালে রাখিয়া তাহারা লুঠতরাজেই উদর পূর্ত্তি করিতে লাগিল। যদি পর্টুগীজেরা এই সময়ে বাঙ্গলার উপর অত্যাচার না করিয়া বাণিজ্য-স্বার্থে অধিক মনোযোগী হইত, তাহা হইলে আজ আমরা ইংরাজ রাজত্বের এ শান্তি সুখ ভোগ করিতে পারিতাম না।

ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াইল—যে কেবল সমুদ্র উপকূলে নহে, পর্টুগীজ বোম্বেটেরা শান্তিপূর্ণ বঙ্গপল্লীতে নদীপথে প্রবেশ করিয়া নিরীহ পল্লীবাসীর স্ত্রী কন্যা অপহরণ করিতে লাগিল। সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিতে লাগিল। ইহাদের অত্যাচারে অনেক অনূঢ়া ও পরিণীতা সুন্দরী ব্রাহ্মণ কায়স্থ কন্যাগণ সুদূর দিল্লী আগরার বাদশাহের অন্তঃপুরের শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। বোম্বেটে ডাকাতের অত্যাচারে দেশে একটা হাহাকারের রোল উঠিল।

প্রজা কাঁদিয়া গিয়া কাজীর কাছে আরজী করে, কাজী পর্টুগীজের অর্থপুষ্ট। নালিশবন্দ প্রজাকে কাজিসাহেব "মিথ্যাবাদী" "বদমায়েস" বলিয়া তাড়াইয়া দেন। ফৌজদার বড় লোক, তাঁর কাছে গরীব প্রজা যাইতে পারে না। যাঁহারা একটু অর্থশালী শক্তিসম্পন্ন, তাঁহারা ফৌজদারের কাছে গিয়া নালিস করিলে ফৌজদার বলেন,—"অপরাধীকে ধরিয়া লইয়া আইস। শাস্তি দিতেছি।" নরঘাতক বোম্বেটেকে ধরিয়া আসামী খাড়া করিতে কাহারও শক্তিতে কুলায় না। কাজেই মামলা ফাঁসিয়া যায়। লোকে কানাকানি করে, ফৌজদারও ঘুস্‌খোর।

দেশের সকল সংবাদ বিক্রমপুরাধিপতি ভূস্বামী বৃদ্ধ চাঁদ-রায়ের কাণে পৌছিতে লাগিল। তিনি উপযুক্ত পুত্র কেদার রায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, ফৌজদার সুবেদারের হাতে অত্যাচারের প্রতিকার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে প্রজাকুল নির্ম্মূল হইবে। লোকের জাত থাকিবে না। শাসনশক্তি নিজের হাতে না লইলে বোম্বেটের জাত জব্দ হইবে না। ঠিক এই সময়েই রাজপুত্র কেদার রায়, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে কথিত পর্টুগীজ-অত্যাচার-পীড়িতা অভাগিনী অনীতার উত্তেজনায় স্বজাতিরক্ষার পুণ্যব্রত গ্রহণ করিয়া-ছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মানুষ না দেবতা!

প্রচণ্ড সলিলরাশি সবেগে উৎক্ষিপ্ত ও প্রতিহত করিতে করিতে, পদ্মা সমুদ্রসঙ্গমে ছুটিয়াছে। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আছাড়িয়া পড়িতেছে। তরঙ্গাঘাত-প্রসূত শুভ্র-ফেনরাশি ছুটিয়া গিয়া, স্থানান্তরের পুঞ্জীকৃত ফেনরাশির সহিত অস্তিত্ব লুকাইতেছে। কেবল কল কল ছল ছল শব্দ। অবিরাম অব্যাহত অস্থির তরঙ্গে নৌকা দুলিতেছে, বজরা কাঁপিতেছে,

চিপ চঞ্চল হইতেছে। নীলাকাশ উপর হইতে নিজের প্রতিবিম্ব পদ্মার প্রশস্ত বক্ষে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু বড় চঞ্চল বলিয়া পারিতেছে না।

দূরে—অতিদূরে,—সীমান্তে, বেলাভূমির পার্শ্বে শ্যামল শষ্পাচ্ছাদিত বনরাজি। মাঝে মাঝে দুই একখানি গ্রাম্য কুটীর। তাও এত দূরে—যে দৃষ্টি চলে না।

সন্ধ্যা হয় নাই, কিন্তু তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্ধকার, প্রকৃতির মুখ ঢাকিয়া ফেলিতেছে। সূর্য্য অতি ক্ষীণাভ হইয়া সুদূর প্রসারিত পদ্মার পর প্রান্তে ডুবিয়া পড়িতেছে। একটা স্থির শান্ত গম্ভীর ভাব—তখন সেই ক্ষুদ্র বিশ্বের উপর আধিপত্য করিতেছে।

পদ্মার উপরই রাজা চাঁদরায়ের গগনস্পর্শী দুর্গ। নবনির্ম্মিত নবসজ্জিত বিরাট দুর্গপ্রাকারের সুগঠিত ছিদ্রাংশে বজ্রনাদী কামান সকল সুরক্ষিত। পদ্মার তরঙ্গময় সলিলে সেই সন্ধ্যান্ধকারে—দুর্গের ছবি প্রতিফলিত হইলেও অন্ধকারে তাহা দেখা যাইতেছিল না।

এই দুর্গের পশ্চিম দিকে রাজান্তঃপুর। অন্তঃপুরের এক অলিন্দের উপর বসিয়া এক অনিন্দ্য-সুন্দরী! তিনি সেই সান্ধ্য প্রকৃতির মনোমোহন দৃশ্য দেখিয়া একটা আকাঙ্ক্ষিত তৃপ্তি সম্ভোগ করিতেছিলেন।

সহসা আর এক সুন্দরী, পশ্চাৎ হইতে অতি ধীরে আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিলেন। অলিন্দোপবিষ্টা সুন্দরী এই স্পর্শে চমকিতা হইয়া মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিলেন। নবাগতা সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—"চল বহিন্! নীচে যাই। সন্ধ্যা হইয়াছে।"

পাঠক! এই দুই জনের একজন আপনার পূর্ব্ব পরিচিত। ইনি মজনু বেগম। ইহাঁকেই রাজা কেদাররায়, দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। অপরা কমলা—কেদার রায়ের পত্নী।

মজনু ও কমলা নীচের কক্ষে নামিয়া আসিলেন। সে কক্ষ সুবাসিত—দীপোজ্জলিত। অগুরুর গন্ধে আমোদিত স্বর্ণপাত্রে থরে থরে ফুলরাশি। রূপার বাটীতে অগুরুমিশ্রিত চন্দন। গোলাপপাশে অতি সুগন্ধি গোলাব জল।

দুইজনে একখানি মখ্‌মল-মণ্ডিত গদীতে উপবেশন করিলেন। কমলা আবার প্রশ্ন করিলেন—"আমাদের বাঙ্গলা দেশ কি আপনার ভাল লাগে?"

মজনু। কেন ভাল লাগিবে না বোন্? এই বাঙ্গলাই ত আমার জন্মভূমি!

কমলা। আপনার জন্মস্থান কোথায়?

মজনু চট্টগ্রামের খিজিরপুরে। আপনি ভাব্‌ছেন—আমি মুসলমানী বলে পশ্চিমেই আমার জন্ম, তা নয়!

কমলা। আপনার এ দশা হলো কেন?

মজনু। অদৃষ্টের ফলে! সাহাবাজখাঁ খিজিরপুর লুঠ কল্লেন। আমার পিতা সপরিবারে বন্দী হলেন। আমায় সুন্দরী দেখে সেই পাপিষ্ঠ দস্যু সম্রাটের তুষ্টির জন্য আমায় দিল্লীতে পাঠিয়ে দিলে। আমি সব হারালুম।

কমলা। আপনার পিতার নাম?

মজনু। কমলাকান্ত বসু।

কমলা। তবে আপনি কায়স্থ কন্যা! আপনার বিবাহ হয়েছিল?

মজনু। হয়েছিল—কার সঙ্গে জানিনি। স্বামীর মুখ কখনও দেখিনি। যৌবনের সীমায় পদার্পণ করেছিলুম। তার রূপই আমার সর্ব্বনাশ কল্লে। আমি আগ্রায় এসে নানা যন্ত্রণায় ভুগে শেষ সম্রাট জাহাঙ্গীরের ভোগ্যা হলুম।

কমলা। স্বামীকে মনে পড়ে?

মজনু। অতি বাল্যের স্মৃতি! অনেক ভাব্‌লে, একটু মনে পড়ে। খালি সেই বিবাহ-বাসরের কথা! তার পর আর নয়। তাঁর কথা হলেই বাবার মার মুখ ছল ছল কর্ত্তো। কোন বিশেষ কারণে তাঁরা তাঁর সন্ধান কর্ত্তেন না। কি কারণ তা জানিনা। তবে আমি সিঁথেয় সিঁদুর দিতুম, পাড়ওলা কাপড় পর্ত্তুম। আর মনে মনে সেই ইষ্টদেবতার ছায়ামূর্ত্তিকে পূজা কর্ত্তুম। কেউ আপত্তি কর্ত্তোনা।

কমলা দেখিলেন বেগমের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। দীপালোকে দেখিলেন, সেই আয়ত ইন্দীবরনেত্রে দুইবিন্দু অশ্রুজল!

কমলা বুঝিলেন, তাঁহার এ প্রশ্নে বেগম মর্ম্মবেদনা পাইয়াছেন। কমলা রাণীর মত রাণী। নিজের অঞ্চলে তাঁহার সেই গণ্ডবাহী মুক্তাবিন্দু দুইটির বিলোপ সাধন করিয়া, একটু লজ্জিত ভাবে বলিলেন—"দিদি! আমায় মার্জ্জনা করুন। আমি না বুঝে ও প্রশ্ন করেছিলুম!"

মজন্নু বেগম, দিল্লীর রঙ্গমহলে জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত করিয়াছেন। কমলার ন্যায় বুদ্ধিমতী, সরলহৃদয়া রমণী তিনি আর কখনও দেখেন নাই। কমলাকে অপ্রতিভ দেখিয়া মজন্নু আবার মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিলেন, "বহিন্! এ অভাগিনী আপনার কষ্টের কারণ হইবে জানিলে আমার চোখের অই দুইটী অশ্রুবিন্দু অতি গোপনে ফেলিতাম। আপনার এতে লজ্জা কি? আমি জীবনে যা করিয়াছি আজীবন চোখের জল ফেলিলেও প্রাণের জ্বালা মিটিবে না।"

এ প্রসঙ্গ হইতে দূরে যাইবার জন্য, কমলা হাসিয়া বলিলেন—"এবার বোন্! তোমার সঙ্গে "তুমি আমি" করে কথা কবো। "আপনি" সম্বোধনে প্রাণে যেন একটা সংকোচের বাধা আসে। সত্যি ভাই! তুমি দেখ্‌তে বেশটী; এমন রূপ না হইলে বাদশার রঙ্গমহলে মানায়!"

মজন্নু রূপের প্রশংসা শুনিয়া একটু লজ্জিতা হইয়া বলিলেন,—"তুমিও ত বোন্ কম নও। তোমার কাছে আমি! তোমার যেমন দেবতুল্য স্বামী—রূপে গুণে তুমি তেমনি তাঁর উপযুক্ত মহিষী।"

মজন্নু বেগম পূর্ণমাত্রায় তাঁর রূপপ্রশংসার প্রতিশোধ লইলেন।

কমলা দেখিলেন, তিনি সহজ লোকের সহিত কথার কারবার করিতেছেন না। কমলা আদৌ আত্ম-প্রশংসা শুনিতে পারিতেন না। অন্য উপায় না দেখিয়া কমলা বলিলেন,—"দিদি! সে দিন যে ব্রজবুলি গানটা গাহিতেছিলে আজ একবার গাও না?"

"তুমি কেমন করিয়া শুনিলে?"

"বসন্তের পঞ্চম ঝঙ্কার শুনিয়া যে না শোনে, তার জীবন বিড়ম্বনাময়। আমি লুকাইয়া শুনিয়াছি।"

"যদি রাজা সাহেব এখানে আসেন?"

"কোন সম্ভাবনা নাই। হুকুম না লইয়া আমার মহলে আসিলে তাঁহার জরিমানা করিব। একবার তুমি সেই গানটী গাও।"

পুনঃ পুনঃ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, মজন্নু গান ধরিলেন। সুরের পরদায় পরদায়, গ্রামে গ্রামে, পরতে পরতে, পঞ্চম কাকলী ফুটিয়া উঠিল। মজন্নু বেগম গাহিতেছিলেন:—

আয়ত লোচনে কেন বহত বারি!
আধ আঁচরে, বদন কেন
ঝাঁপিলি কিশোরি!
মধুর অধরে নাহি সুমধুর হাস,
কম্পিত-হৃদি-চুম্বিত, মৃদু শ্বাস,
হিয়ার মাঝারে জাগে আশ নিরাশ;
চাহসি ফিরি ফিরি নয়ন বিথারি।
যব আওব মন্দিরে, নাগর বর কান
দিঠি ভরি হেরবি সে চান্দবয়ান
করবি আলিঙ্গন, দূর করি মান।
যমুনা কিনারে অই বাজিল বাঁশরী।

গান থামিল—সুরের ঝঙ্কার কাণে বাজিতে লাগিল। খালি তাই নয়—মর্ম্মের স্তরে স্তরে, যেন সেই ভৈরবী-ঝঙ্কার, মৃদু করুণার কম্পিত বাতে, একটা ধীর কম্পন তুলিল। কমলা মজন্নু বেগমের সুকণ্ঠস্বরে মোহিত হইয়া বলিলেন—"এমন না হ'লে রূপ মানায়! এতটা না হ'লে বাদশার মন ভোলে! হাঁ দিদি! বাদশা তোমায় বড় ভাল বাসেন—না? যেমন রূপ—তেমনি গুণ!"

মজন্নু বেগম একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। কমলা সে দীর্ঘনিশ্বাসের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। আবার প্রশ্ন করিলেন, "বলনা দিদি! বাদশা তোমায় ভালবাসেন কি না?"

মজন্নু বিষাদপূর্ণ হাস্যের সহিত বলিলেন,—"দিল্লী আগরার রঙ্গমহলে "ভালবাসা" বলিয়া কোন জিনিস নাই। মধুলুব্ধ ভ্রমর প্রবৃত্তিবশে নানা ফুলে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে ফুলটা একটু রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়া, রূপের জ্যোতি বিস্তার করে, তারই ভাগ্য প্রসন্ন হয়।"

"আজকাল এরূপ ভাগ্যবতী কে?"

"সের-পত্নী মেহের উন্নিসা।"

"তবে যে শুনিয়াছিলাম বাদশা তাঁর প্রতি বিরূপ?"

"রূপের আকর্ষণে বিরূপের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। এখন জাহাঙ্গীর শাহ মেহেরের জন্য উন্মাদ! তিনি আর এখন মেহের উন্নিসা নন—নূরজাহান বেগম।"

কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া, কমলা বলিলেন—"চল দিদি! তোমার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিই।"

মজন্নু বেগম বলিলেন, "আমায় অত ভাল বাসিতেছ, অজ্ঞাতসারে প্রাণটী আমার হাতে তুলিয়া দিতেছ, রাজা সাহেব কি মনে করিবেন?"



সেণ্ট জেনভীভ।

কমলা হাসিয়া বলিলেন, "আমার প্রাণ যাহাকে ইচ্ছা দিব। রাজা সাহেবের বাঁদী আমি। আমার এ প্রাণ আমার বাঁদী।" [ক্রমশঃ।]

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

সেণ্ট জেনভীভ্।

সেণ্ট জেনভীভ্ পারিসের রক্ষয়িত্রী দেবীরূপিণী। [খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে তাঁহার জন্ম হয়। ঐ শতাব্দীতে যখন পারিসনগরী ফ্রাঙ্কদিগের দ্বারা আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হয়, তখন উহার অধিবাসীরা অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই বিপদে এই পুতশীলা নারী শত্রুদিগকে ভয় না করিয়া একটি নৌকায় নগর হইতে পলায়ন করেন এবং ফ্রান্সের নগরে নগরে ভিক্ষা করিয়া ১২টি জাহাজ বোঝাই খাদ্য পারিসে আনিয়া নগরবাসীদের প্রাণরক্ষা করেন। আর একবার তিনি পারিসবিজেতা হিল্পারিকের শিবিরে গিয়া তাহাকে তাহার নিষ্ঠুরতার জন্য তিরস্কার করেন। তাহাতে বন্দীকৃত পারিসবাসীদের প্রাণরক্ষা হয় এবং নগরবাসী অপর সাধারণের প্রতি হিল্পারিক দয়া প্রদর্শন করে। এইরূপ নানা অবদানপরম্পরা দ্বারা সেণ্ট জেনভীভ্ পারিসবাসীদের রক্ষয়িত্রী দেবী পদে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন।] এই চিত্রে তিনি নিদ্রিত নগরীর জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। পারিসের প্যান্থিয়নের দেওয়ালে Puvis de Chavannes কর্ত্তৃক অঙ্কিত সেণ্ট জেনভীভের জীবনচরিতবিষয়ক উৎকৃষ্ট চিত্রাবলীর ইহা অন্যতম। ফরাসীরা তাঁহাদের পূজ্যতম ব্যক্তিগণের চিরবিশ্রামস্থল এই মহান্ উপাসনামন্দির নানা পৌর ও ঐতিহাসিক প্রাকারচিত্রে বিভূষিত করিয়াছেন,—আমরা যেমন ভবিষ্যতে কোন দিন আমাদের মিলন-মন্দিরকে (Federation Hall) অলঙ্কৃত করিতে পারি।

এই ছবিখানি একখানি প্রাচ্য ছবি হইতে পারিত। এই প্রাচীনা পুণ্যবতী নারী অবগুণ্ঠনাবৃতা। সত্য বটে, এই অবগুণ্ঠন খৃষ্টীয় সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন, প্রাচ্য গৃহস্থাশ্রমের অবগুণ্ঠন নহে। তথাপি ইহাতেই তাঁহার সহিত আমাদের সম্পর্ক সূচিত হইতেছে। আমরা নিদ্রিত নগরীর অলিন্দের ছাদ, অনেক গৃহের সমতল ছাদ, এবং টাইল-আচ্ছাদিত অট্টসমূহ দেখিতে পাইতেছি। আমাদের তুলসী গাছের মত, গৃহের বাহিরে গোলাপ গাছ ও ভিতরে ক্ষুদ্র দীপ রহিয়াছে। সেণ্ট জেনভীভের মুখ ও মূর্ত্তি অনায়াসে কোনও হিন্দু বিধবার মুখ ও মূর্ত্তি হইতে পারিত। ঠিক্ এই ছাঁচের চেহারার শত শত হিন্দু বিধবাকে আমরা জানি না কি?

এই চিত্রখানি বোধ হয় আধুনিক শিল্পে পুরপ্রেমের সুন্দরতম অভিব্যক্তি। নিদ্রিত জগতের হিতার্থ রাত্রি-জাগরণ ও পরার্থ প্রার্থনা নারীর শাশ্বত বিধিনির্দ্দিষ্ট জীবনোদ্দেশ্য। এই জীবনোদ্দেশ্য এই চিত্রে আমাদের নিকট প্রকটিত হইয়াছে। অতীতে গৃহস্থাশ্রমে ও ধর্ম্মমণ্ডলীতে নারী যেমন ছিলেন, ভবিষ্যতেও তেমনি, বিশালতর চিন্তা ও আয়ততর অনুভূতির আলোকে, তিনি পৌরজন ও জাতির উপর প্রসারিতা প্রেমস্পন্দনশালিনী কল্যাণ-ধ্যান-নিমগ্না প্রার্থনাশক্তিরূপিণী হইবেন।

রামকৃষ্ণবিবেকানন্দমণ্ডলীভুক্তা নিবেদিতা।

Sainte Genevieve watching over Paris.

Sainte Genevieve is the Patron Saint of Paris. And here she is represented as praying over the city while it sleeps. This is one of the series of great frescoes of the Life of Sainte Genevieve painted by Puvis de Chavannes on the walls of the Pantheon in Paris. For the French have decorated this great Church,—the resting-place of their most honoured dead,—with civic and historic mural paintings, just as we may do in the future with our Federation Hall.

This particular picture might almost be oriental. The elderly saint wears a veil. True, it is that of the nun, not that of the eastern household. Yet, it suffices to strike the note of kinship. We note also the terrace-roof, the many flat house-tops and tiled towers of the sleeping city, the rose-tree, so like our *tulsi*, in the sun outside, and

the tiny lamp within, the doorway. The face and figure of Sainte Genevieve herself might well be those of some Hindu widow. Do we not all know a hundred of just this type ?

And so, in what is perhaps the finest expression of the civic spirit in modern art, we have again the eternal mission of womanhood revealed to us as intercessor and vigil-keeper for the sleeping world. As in the past to household and to church, so also in the future, in the light of a larger thought and wider consciousness, a brooding power of prayer throbbing above the city and the nation.

NIVEDITA OF RK.-V.

হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশ।

(১ম সমালোচনা)

কয়েক বৎসরাবধি আমরা বারাণসীর নাগরীপ্রচারিণী সভার নাম শুনিয়া আসিতেছি। এতদিন সাধারণে এই সভার কার্য্য সম্বন্ধে বড় কিছু জানিতে পারে নাই।* সম্প্রতি এই সভা হইতে হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশ নামক ৩৫৮ পৃষ্ঠব্যাপী এক গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। এই কোশে পাশ্চাত্য আধুনিক ভূগোল, জ্যোতিষ, অর্থশাস্ত্র, রসায়ন, গণিত, পদার্থবিদ্যা এবং দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক দশসহস্রাধিক পারিভাষিক শব্দের হিন্দী প্রতিশব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি হস্তগত হইবামাত্র অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ইহার আদ্যন্ত পাতা উল্টাইয়া দেখিয়া তবে নিবৃত্ত হই। এত আগ্রহের অনেকগুলি কারণ ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এতকাল যাহা করিতে পারেন নাই, তাহা সম্পন্ন দেখিতে কে না ইচ্ছা করে? বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ কিংবা প্রবন্ধ লিখিবার সময় ভুক্তভোগী মাত্রেই পারিভাষিক শব্দের অভাব বোধ করেন। কার্য্যকালে এই হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশ দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার কত উপকার হইবার সম্ভাবনা, তাহাও দেখিবার বিষয় বটে।

কোশের বিষয়গুলি স্মরণ করিলেই বুঝা যাইবে যে, এরূপ গ্রন্থ সঙ্কলন অল্প সময়ে কিংবা কোন এক ব্যক্তির সাধ্য নহে। বস্তুতঃ প্রত্যেক বিষয়ের শব্দসঙ্কলনে সেই বিষয়ে অধিকারী বহুব্যক্তি সাহায্য করিয়াছেন। মান্দ্রাজ ব্যতীত ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ স্থানের সুধীগণ পরামর্শ করিয়া বহু যত্ন পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে শব্দ নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ব্যাপার বৃহৎ, চেষ্টাও বৃহৎ। এমন গ্রন্থের সমালোচনা করিতে বসিলে বর্ত্তমান লেখকের যে ধৃষ্টতা প্রকাশিত হইবে, তাহা ক্ষমার যোগ্য হইবে না। পরন্তু সে উদ্যম মক্ষিকার ব্রণেচ্ছার ন্যায় প্রতীয়মান হইবার আশঙ্কাও আছে। 'প্রবাসী'র পাঠকবর্গ যে নীরস সমালোচনায় প্রীত হইবেন, এরূপ আশাও নাই। আরও চিন্তার বিষয়, হিন্দীভাষা লেখকের অজ্ঞাত। এত অসুবিধা সত্ত্বেও যে দুই একটি কথা লিপিবদ্ধ করিতে যাইতেছি, তাহার কারণ প্রথমেই প্রকাশ করা আবশ্যক। প্রথমতঃ কোশের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার বহু শব্দ আছে। কোন কোন স্থলে অন্য ভাষার পরে সংস্কৃত ভাষার শব্দও যোজিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গালীরও পৈতৃক সম্পত্তি। দ্বিতীয়তঃ গড়া কঠিন বটে, কিন্তু ভাঙ্গা সহজ। তৃতীয়তঃ, অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে না পারে, তাহা বাসোপযোগী হইয়াছে কি না, বোধ হয় তাহা সকলেই বলিতে পারে। এস্থলে অবশ্য সকলের রুচি ও অভাব কখনও এক হইবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি বাঙ্গালীর একটা রুচি ও অভাববোধ থাকিতে পারে। চতুর্থতঃ, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের নাম শুনিলেই সাধারণ পাঠক ভীত হয়েন। অন্ততঃ 'প্রবাসী'র পাঠকগণের মধ্যে এরূপ ভীতি থাকিলে পারিভাষিক শব্দের সহিত পরিচয়ে তাহার অপনোদন হইতে পারিবে। পঞ্চমতঃ, কোশকারগণ বহু বহু শব্দ নির্ব্বাচনে ও রচনায় এমন পটুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন যে, সে সুসংবাদ অন্যকে জ্ঞাপন না করিয়া থাকা যায় না। তর্ক বিতর্ক ব্যতীত সত্যের উদ্ধার হয় না। দুঃখের বিষয় সে তর্ক বিতর্কের স্থান 'প্রবাসী'র কলেবরে নাই। এজন্য বক্তব্য সংক্ষেপে লিখিত হইল। তাহাও কোশের সপ্তাধিকারের মধ্যে তিন চারিটি অধিকার লইয়াই শেষ করা যাইবে।

* গত বৎসর পৌষ মাসের প্রবাসীতে "কাশী" প্রবন্ধে ইহার কার্য্যের একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবাসী সম্পাদক।

এই কোশের ভূমিকা পাঠে জানা যায় যে, খ্রীঃ ১৮৮৮ অব্দে বড়োদা মহারাজ গায়কোয়াড়ের অনুমত্যনুসারে অধ্যাপক গজ্জর দেশীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক কোশ প্রণয়ন করিতে প্রথমে চেষ্টা করিয়াছিলেন। নানা কারণে তিনি কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তদনন্তর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। হিন্দী কোশের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে যে, "উক্ত পরিষদ্ হইতে রসায়ন, ভূগোল এবং জ্যোতিষ বিষয়ক পরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশের কিছু পরে পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে বিসম্বাদ উপস্থিত হওয়াতে বঙ্গীয় সাহিত্য সভা নামে আর এক সভার উৎপত্তি হয়। ইহার ফলে পরিষদের শক্তি খর্ব্ব হয়, এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনকার্য্যেরও অবসান হয়। তারপর নাগরীপ্রচারিণী সভা উক্ত কার্য্যে অগ্রসর হয়েন, এবং সপ্তবর্ষাধিক কাল পরিশ্রম করিয়া এই আলোচ্য কোশ সঙ্কলনে সমর্থ হইয়াছেন।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ দ্বিধা বিভক্ত হওয়াতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়ন কার্য্য শেষ হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু মন্তব্য টুকু পাঠ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই লজ্জিত হইবেন, সন্দেহ নাই। বোধ হয় একথা যথার্থ যে, নাগরী-প্রচারিণী সভার ন্যায় উদ্যোগ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছিল না।

কি নিয়মে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা জানিতে কৌতূহল জন্মে। কোশের সম্পাদক বলিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল :—

১। চলিত হিন্দী শব্দ পাইলে তাহাই গ্রাহ্য হইবে।

২। না পাইলে

(ক) মরাঠি, গুজরাতি, বাঙ্গলা এবং উর্দু ভাষা হইতে শব্দ গৃহীত হইবে।

(খ) এই সকল ভাষায় না পাইলে

(/০) পুরাতন সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করা যাইবে।

(৵০) ইংরাজি শব্দই রাখা যাইবে।

(৷/০) সংস্কৃত ভাষা হইতে নূতন শব্দ রচনা করা যাইবে।

সকল স্থলে এই নিয়মাবলী অনুসৃত হইয়াছে কি না, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। কি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত উহাদের উৎপত্তি, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বরং উপকার হইবে। বঙ্গদেশে একদল লোক আছেন, তাঁহারা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংস্কৃত রূপের পক্ষপাতী। এই মতের পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, সংস্কৃত শব্দ দ্বারা পরিভাষা প্রণীত হইলে সংস্কৃতমূলক সমুদয় প্রাদেশিক ভাষার সুবিধা হইবে। প্রাদেশিক ভাষা থাকাতে বিভিন্ন প্রদেশের লোকদিগের সহিত কথোপকথন করা চলে না। সংস্কৃত শব্দ লইয়া বৈজ্ঞানিক পরিভাষা হইলে অন্ততঃ পরিভাষা এক হইবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বকালে (এবং এখনও কোন কোন বিজ্ঞানে) য়ুরোপে যেমন লাটিনে বিজ্ঞান গ্রন্থ কিংবা পরিভাষা রচিত হইত, সেইরূপ এদেশের পক্ষে সংস্কৃত লাটিনের স্থান অধিকার করিবে। এই মতের বিপক্ষে অনেক কথা বলিবার আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, বর্ত্তমান কালে সংস্কৃত ভাষা কোন প্রদেশের লোকদিগের মাতৃভাষা নহে। সংস্কৃত ভাষায় পরিভাষা রচিত হইলে বিজ্ঞানশিক্ষা এদেশে কদাপি জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইবে না। চলিত ভাষায় কথা কহিলে জনসাধারণ যেমন সহজে সে কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, কথার মধ্যে সংস্কৃত শব্দবাহুল্য ঘটিলে সে সুবিধা কদাপি হইতে পারে না। শিশু মাতৃভাষায় কথা কহিতে শিখে, এবং সেই ভাষার শব্দ শুনিয়া শুনিয়া তাহার বস্তুগ্রহ করিবার সামর্থ্য জন্মে। অতএব শিক্ষার সাফল্যের পক্ষে মাতৃভাষাই প্রশস্ত। দ্বিতীয় দলের যুক্তি এই। তৃতীয় দলও আছেন। তাঁহাদের মত এই যে, শিক্ষার প্রথমাবস্থায় মাতৃভাষাই শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের উচ্চাঙ্গে প্রবেশের সময় মাতৃভাষার, এমন কি সংস্কৃত ভাষার শব্দও পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রচলিত দেশীয় ভাষার এমন শক্তি নাই যে, সে ভাষার সাহায্যে দুরূহ ভাবনা (idea—হিন্দী কোশ হইতে লইলাম) প্রকাশ করা যাইতে পারে। তখন অতুলসম্পত্তিশালিনী সংস্কৃত ভাষার আশ্রয়গ্রহণ কর্ত্তব্য। কোন কোন স্থলে যে কোন ভাষার উপযুক্ত শব্দ পাইলে, তাহাকেই স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক দলের মতের মধ্যে কিছু-না-কিছু সার আছে। আমাদের মত এই যে, পারিভাষিক শব্দ অনুসারে চলিত ভাষা, সংস্কৃত ভাষা এবং ইংরাজি ভাষা—এই তিন ভাষা হইতেই সাহায্য লওয়া

কর্ত্তব্য। শিশুপাঠ্য গ্রন্থে যে ভাষা চলে, বয়স্ক লোকদিগের গ্রন্থে সে ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করা চলে না। সংস্কৃতমূলক প্রাদেশিক ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ, অন্ততঃ লিখিত রূপে চলিত আছে। যদি সেইরূপ সহজ সংস্কৃত শব্দ দ্বারা পরিভাষা প্রণীত হয়, উত্তম কথা। এই সকল শব্দ সুবোধ্য সুখোচ্চার্য্য ও হ্রস্ব হইলে তাহাদের প্রচলনের অধিক সম্ভাবনা। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নে এইখানেই কৃতিত্ব। ইংরাজি শব্দ গ্রহণ করিব না, এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলে বৈজ্ঞানিক যাবতীয় ইংরাজি শব্দেরই চলিত ভাষার কিংবা সংস্কৃত ভাষার প্রতিশব্দ রচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, সে চেষ্টা বৃথা হইবে। কালের গতি রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই মানুষ স্বভাবতঃ অলস। সে সম্মুখে যাহা পায়, তদ্দ্বারাই কাজ চালাইতে চেষ্টা করে। আবশ্যক হইলে সে তাহাকে ভাঙ্গে, তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করে, তাহার অঙ্গে অন্য বস্তু যোগ করে। এইরূপে সে কাজ চালাইয়া থাকে। ভাষা এবং ভাষার শব্দ লইয়াও সে প্রত্যহ এইরূপ ভাঙ্গাগড়া করিতেছে। কাহারও উপদেশ মানে না, ভাষা বিকৃত হইল কি না ভাবে না। ভাষার এই বৈরূপ্যই কালে স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। যদি টেরন ও টেরাম ও ইষ্টীমারে কাজ চলে, তাহা হইলে কেহ বাষ্পীয় শকট ও বাষ্পীয় পোতের দিকে তাকায় না। (ট্রামের বাঙ্গলা কি ?)। ভাষার এই উচ্ছৃঙ্খলতাই তাহার জীবনী শক্তি ঘোষণা করে। যিনি এই জীবনী শক্তি অনুভব করিতে পারেন, তাঁহার রচিত শব্দই চলিত হয়। নূতন শব্দ রচনায় কোন কোন ভাষার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। বোধ হয় বঙ্গদেশীয় কেহই অনুমান করিতে পারেন না যে, আদালতের 'টৌরী' (tout or attorney) 'তরনী' হইতে পারে, কিংবা বাঙ্গলা সংবাদপত্রের দ্বিচক্রযান অর্থাৎ ইংরাজি বাইসিকেল 'শূন্ গাড়া' (শূন্য গাড়ী) হইতে পারে। কিন্তু ওড়িশার সাধারণ লোকে অবলীলাক্রমে ঐ দুই শব্দ ব্যবহার করিতেছে। বোধ হয় হিন্দী ভাষারও এইরূপ শক্তি আছে। 'করনেবালা' ও 'দার' যোগ করিয়া হিন্দী ভাষায় কত শব্দই রচিত হইতেছে।*

তথাপি হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশে সংস্কৃত শব্দেরই বাহুল্য দেখা যায়। দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও গণিতের পরিভাষার অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত, তেমনই অর্থনীতি শাস্ত্রের অধিকাংশ শব্দ হিন্দী। বোধ হয়, এইরূপ প্রভেদ রাখা আবশ্যক ছিল। ইহার একটা কারণও কতকটা বুঝা যায়। বাণিজ্য ব্যাপারে হিন্দী শব্দ প্রচুর চলিয়াছে, দর্শন ও গণিত শাস্ত্রে পৈতৃক সংস্কৃত সম্পত্তি আছে। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও ভূগোলের শব্দের মধ্যে কতক হিন্দী, কতক সংস্কৃত, এবং কতক অবিকল ইংরাজি। বাঙ্গলা ভাষার পক্ষ হইতে দেখিলে মনে হয়, সে ভাষায় বরং ইংরাজি শব্দ চলিতে পারে, তবু হিন্দী শব্দ চলিত হইবার আশা কম। অতএব দেখা যাইতেছে, হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশ প্রচারিত হইলেও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে নাই।

আর একটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ এখনও বাকি আছে। যদি দেশীয় চলিত শব্দ, সংস্কৃত শব্দ, এবং ইংরাজি শব্দ সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন করিতে হয়, তাহা হইলে কি প্রকার শব্দ চলিত ভাষা হইতে, কি প্রকার সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত হইবে, এবং কি প্রকারই বা ইংরাজি থাকিবে, তাহা নির্দেশ করিলে পরিভাষাসঙ্কলনকার্য্য লঘু হয় এবং পরিভাষার সার্থকতা বুঝিবার সুবিধা হয়। একথা কেহই বলিতে পারেন না যে, যে কোন ইংরাজি বৈজ্ঞানিক শব্দ অবিকল ইংরাজি রাখিলে চলে কিংবা তাহার সংস্কৃতরূপ দেওয়া চলে, কিংবা দেশীয় চলিত শব্দ দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিলে চলে। এমন কতকগুলি শব্দ আছে বা থাকিতে পারে, যেগুলির দেশীয় চলিত ভাষায় কিংবা সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করা বৃথা। অনেকস্থলে অনুবাদে উদ্দেশ্য পণ্ড হইতে পারে। কোন কোনস্থলে হিতে বিপরীত হইতেও পারে। আমাদের মতে উক্ত তিন জাতীয় শব্দই চাই। স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে যে, ইংরাজি রূঢ় শব্দ ইংরাজি রাখাই কর্ত্তব্য। যোগরূঢ় পারিভাষিক শব্দের সংস্কৃত ভাষায় এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক শব্দ দেশীয় চলিত ভাষায় করিলে সকল উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশ প্রণেতৃগণ এই জটিল প্রশ্নের

* হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশেই দেখিতেছি, ruminant=পাগুর করনেবালা, জুগালী করনেবালা, Consumer=খর্চ্ করনেবালা, Consignee=চলান পানেবালা, Consigner=চলান করনেবালা, ইত্যাদি। বাঙ্গলা ভাষায় 'কারী' ও কম নহে।

কি মীমাংসা করিয়াছেন তাহা জানিতে বাসনা হয়। দুঃখের বিষয়, সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে নির্ব্বাক রহিয়াছেন। যাহা হউক, ভূগোলবিষয়ক পরিভাষায় নিম্নলিখিত শব্দগুলি দেখিতেছি:—

Lake—ঝীল, সরোবর
Loch—ঝীল
Lagoon—লগুন
Hot spring—গরম ঝরণা, গরম সোতা
Geyser গরম ঝরণা
Gulf stream—গল্‌ফ ষ্ট্রীম
Pampas—পম্পাস
Moraine—মোরেন
Fossil—ফোসিল
Lava—লাবা
Eruption—উৎক্ষেপ, প্রস্ফুটন
Upheaval—উৎক্ষেপ
Quartz—কার্টজ পথর, বিল্লৌরী পথর
Compass—কম্পাস, ধ্রুবমৎস্য যন্ত্র

কি নিয়মে বা কোন্‌ উদ্দেশ্যে fossil ফোসিল রহিল এবং Loch ঝীল হইল; কেনই বা Compass কম্পাস কিংবা ধ্রুবমৎস্যযন্ত্র হইল এবং স্থলভ quartz কার্টজ পাথর কিংবা বিল্লৌরী পাথর হইল, তাহা জানিতে পারিলে ভাল হইত। অন্যদিকে ভৌতিক পরিভাষায় Compass দিগ্‌দর্শক হইয়াছে। যদি আকাশের ধ্রুবকে মর্ত্ত্যে আনিতে হয় তাহা হইলে কেবল তাহাকে আনিয়া মৎস্যকে পরিত্যাগ করিলে চলিতে পারে। বস্তুতঃ ধ্রুবমৎস্য দ্বারা শিশুমার নক্ষত্র (Little bear) বুঝিবার সম্ভাবনা আছে।

এইরূপ অপর কতকগুলি শব্দ সম্বন্ধে আপত্তি উঠিতে পারে। যথা:—

Barometer—বারোমীটার, বায়ুভারমাপক যন্ত্র
Thermometer—তাপমাপক যন্ত্র, থরমামীটার
Conglomerates—পিণ্ডাকৃত গণ্ডশৈল
Contour line—আকার রেখা
Equator—ভূমধ্য রেখা, বিষুবৎ রেখা
Equinox—অয়ন, সম্পাত
Geology—ভূগর্ভ বিদ্যা
Gravitation—আকর্ষণ
Halo—প্রভামণ্ডল
Heat—গরমী, উষ্ণতা, তাপ, তেজ
Mountain range—পর্ব্বত প্রণালী
Vertical circle—দেশান্তর বৃত্ত, ইত্যাদি।

কোশের ভূমিকা পাঠে জানিতেছি যে বেব্‌স্টর সাহেবের ইংরাজি বৃহৎ অভিধান হইতে হিন্দী কোশের সপ্তাধিকার বিষয়ক যাবতীয় শব্দ প্রথমে সংগৃহীত হইয়াছিল। তার পর সপ্তব্যক্তির শব্দ সংগ্রহ সপ্ত অনুবাদকের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। আমাদের বিবেচনায় এরূপ না করিয়া এক এক বিষয়ের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দুই পাচখানি গ্রন্থ হইতে শব্দ একত্র করিলে বহু অনাবশ্যক শব্দের অনুবাদের ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না, অথচ কোন কোন আবশ্যক পারিভাষিক শব্দও ভ্রমক্রমে অবশিষ্ট থাকিত না ভৌগোলিক কোশে দেখা যায়:—

Bank—কিনারা, তট, তীর	Coast—কিনারা
left—বায়োঁ কিনারা	Earth—পৃথিবী, ভূমি
right—দহিনা কিনারা	East—পূর্ব্ব
Current—প্রবাহ, ধারা	South—দক্ষিণ

ইত্যাদি সামান্য ভাষার কোশের শব্দ আছে, অথচ Coral reef, atoll, organic rock, weather, weathering, প্রভৃতি শব্দ বৈজ্ঞানিক কোশে পাইলাম না। অধিকন্তু ন দোষায় হইতে পারে, কিন্তু শব্দের পারিভাষিকত্ব না থাকিলে তাহাকে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক শব্দ বলিতে পারা যায় না। স্থূলভাবে বলিতে গেলে, ভৌগোলিক কোশ এবং রাসায়নিক কোশ তেমন সন্তোষপ্রদ হয় নাই। কোশসম্পাদক মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, এই দুই অধিকারের কোশ সঙ্কলনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পারিভাষিক শব্দ আধার হইয়াছিল। সম্প্রতি উক্ত পরিষদের পারিভাষিক শব্দ মিলাইয়া দেখিবার সুযোগ নাই। তথাপি বোধ হয়, পরিষদের ব্যক্তিবিশেষের প্রস্তাবিত পরিভাষা পরিষদের নিষ্পত্তি মনে করা ঠিক হয় নাই। যতদূর জানি, পরিষদ বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ-কোশ এপর্য্যন্ত প্রচারিত করেন নাই।

এবারে এইখানেই বক্তব্য শেষ করা যাইতেছে। আগামী বারে অন্য কয়েকটি কোশের শব্দ বিচার করা যাইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

দেবশিশু।

কোলে করি মাতৃহীন শিশুটি আদরে,
রাজা শুদ্ধোদন পানে চাহিয়া কাতরে,
অভাগিনী ভাগিনীর কথা স্মরি মনে,
কহেন গোতমী দেবী, সজল নয়নে,

স্নেহসিক্ত করি বাণী অধর স্পন্দনেঃ—
"মহারাজ, কভু নাহি কহিও নন্দনে
ধরিনি জঠরে ওরে। দুর্ভাগ্য মাতার
শুনিলে ব্যথিত হবে শিশু সুকুমার।"

কহিতে কহিতে কথা, মুছিয়া বদন
পূরিলেন শিশু-মুখে ঘনপীনস্তন।
তরল বক্ষের স্নেহ সুধা হয়ে ঝরে;
তৃষিত অধর কচি কাঁপে পয়োধরে।

যৌবন-বসন্ত-কুঞ্জে প্রেম-পুষ্পদলে
ত্রিদিব-দুর্লভ নব এ অমৃত ফলে
বিকশি' রূপসী রাণী মিলিল ছায়ায়।
অভিভূত রাজ-চিত্ত মায়ার মায়ায়।

মনে মনে দেবতার চরণ বন্দিয়া,
গোতমীর আঁখিধারা চুম্বনে মন্দিয়া,
কপোল লম্বিত কেশ সরায়ে যতনে,
কহিলেন শুদ্ধোদন, কম্পিত বচনেঃ—
"দেবী তুমি, হে গোতমী, অনাথ জননী;
তোমার কুমার, এই নয়নের মণি।

সুধা-তৃপ্ত-কণ্ঠে শিশু পড়িল ঘুমায়ে।
অতৃপ্ত নয়নে দেবী, বদন নুয়ায়ে,
হেরিতে শিশুর কান্তি জাগিল বিস্ময়;
দেবতা কি হবে শিশু? উদিল সংশয়।
হেরিয়া অঙ্গের চিহ্ন ভাবেন আবার,
মহারাজ চক্রবর্ত্তী হবে বা কুমার।
হাত পায়ে পদ্ম আঁকা সোণার বরণে;
যাচিবে নিখিল বিশ্ব শরণ চরণে।

অপার্থিব সুখ-রস উথলে অন্তরে
জাগরণে স্বপ্ন যেন শিরায় সঞ্চরে।
ঢাকি তনু, দেবগণ দীপ্তি আচ্ছাদনে,
গাহিল যে নরে গীতি বীণার বাদনে।
সুর যেন সুর-নদী পুণ্যধারা ঢালে;
তরঙ্গে তরঙ্গে বিশ্ব নাচে তালে তালে।
করিছেন দেবগণ দেবের আরতি;
শিশুকোলে ধ্যানমগ্না মহা প্রজাপতী।

* * *

আগত ভবে সুগতদেব জগত তারিতে।
হবে সুশীত তৃষিত জন করুণা বারিতে।
ব্যাধি ও জরা- ব্যথিত ধরা
বিষাদে আর কাঁদিও না।
মুক্তি পাবে ক্ষুব্ধজন বুদ্ধ-শ্রীপদে।
দীপ্তপথ ভাতিবে চোখে ভ্রান্তি বিপদে।
চরণে ফাঁস——মরণ-পাশ——
মায়ায় ভুলে বাধিও না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

"সর্ব্ববিষয়ে স্বদেশী।"

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কেবল বাজারে গিয়া জিনিষ কিনিবার সময় স্বদেশী হইলেই চলিবে না, সর্ব্ববিষয়েই স্বদেশী হইতে হইবে। তাঁহাদের মতে যাঁহারা হ্যাটকোট পরেন, তাঁহারা ধুতি চাদর ধরুন; যাঁহারা টেবিলে খান, তাঁহারা আসন পাতিয়া মেঝেতে বসুন; বাবুর্চ্চি ছাড়াইয়া ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করুন; বিলাত যাওয়া বন্ধ করুন; এক কথায় বলিতে গেলে সকলেই—টিকি রাখুন।

এক সময় ছিল যখন উক্তরূপ "অপকার্য্য" অর্থাৎ হ্যাটকোট পরা, টেবিলে খাওয়া প্রভৃতি, কেবল বিলাত-প্রত্যাগতগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। অদ্যাবধি যদি তাহাই থাকিত, তবে বর্ত্তমান আলোচনার প্রয়োজন হইত না; কারণ সংখ্যা হিসাবে বিলাতপ্রত্যাগতগণ সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কিন্তু এখন দেখিতে পাইতেছি, অনেক রাজা, জমিদার, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, হ্যাটকোট ব্যবহার করিতেছেন, টেবিলে বসিয়া "ফয়জু খানসামা"র হস্তপক্ব খানা খাইতেছেন এবং অন্যান্য আচারেও "সাহেব" হইয়াছেন। ইহাতে কোনও গর্হিত কার্য্য হইতেছে কি না, তাহাই এ প্রবন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

উক্ত আচরণগুলি সাহেবদের অনুকরণ সন্দেহ নাই। কিন্তু অনুকরণমাত্রই কি দূষণীয়? যে বন্দে মাতরমের প্রভাবে আজ একথা উঠিয়াছে, সে বন্দে মাতরম্ কি? তাহা প্রাচ্য না পাশ্চাত্য? তাহা পূর্ব্বাবধিই আমাদের নিজস্ব ছিল, অথবা ঘৃণিত সাহেবদের নিকট হইতেই আমরা তাহা পাইয়াছি?

এই যে বন্দে মাতরম্—অর্থাৎ patriotism—অর্থাৎ স্বদেশপ্রীতি, ইহার জন্য আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট ঋণী। পূর্ব্বে আমরা রাজার জন্য যুদ্ধ করিয়াছি, ধর্ম্মের জন্য মাথা দিয়াছি—কিন্তু দেশের জন্য প্রাণদান, এ ভাব আমাদের মনে পূর্ব্বে ছিল কি? আমি ত কোথাও দেখিতে পাই না। যদি কোনও শাস্ত্রদর্শী মহাত্মা, সংস্কৃত সাহিত্য হইতে patriotism শব্দের প্রতিশব্দ বাহির করিয়া দিতে পারেন, কেহ দেশকে মা বলিয়া অথবা অন্য কিছু বলিয়া পূজা করিতেছে দেখাইয়া দিতে পারেন, তবে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও আহ্লাদিত হইব।

এই 'বন্দে মাতরম্' বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে প্রথম অবতারণা করিয়াছেন, সেখানে তিনি কি লিখিয়াছেন দেখা যাউক। তিনি লিখিয়াছেনঃ—

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না, সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মাতা কে,—জিজ্ঞাসা করিল "মাতা কে?"

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গাইতে লাগিলেন—

শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

মহেন্দ্র বলিল—"এ ত দেশ, এ ত মা নয়।"

ভবানন্দ বলিলেন—"আমরা অন্য মা জানি না, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—"

মহেন্দ্রের মুখ দিয়া বঙ্কিম বাবু যাহা বলাইয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর কথা,—বাঙ্গালীর বিস্ময়। বাঙ্গালীর নিকট এ ভাব সম্পূর্ণ নূতন। দেশ যে মা, ইহা আমরা কস্মিন্ কালেও জানিতাম না। বঙ্কিম বাবুকে মুখপাত্র করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতালক্ষ্মীই আমাদিগকে এ মধুরবাণী শুনাইলেন। ঐ যে সংস্কৃত শ্লোকার্দ্ধটুকু ভবানন্দের মুখে বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে হঠাৎ এমন মনে হইতে পারে বটে, এ ভাব আমাদের চিরপুরাতন। হইলে অত্যন্ত সুখী হইতাম। কিন্তু সম্পূর্ণ শ্লোকটি এবং স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করিলে সে সুখকর মোহ বিদূরিত হইয়া যায়। শ্লোকটি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে আছে। যুদ্ধ অবসিত, সীতার উদ্ধার সম্পন্ন হইয়াছে, চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসকালও শেষ হইয়া আসিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া বিভীষণকে বলিতেছেন—

ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা মিত্রাম্মভ্যং ন রোচতে।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী॥

হে মিত্র, এমন যে স্বর্ণপুরী লঙ্কা, ইহাতে আমার আর তৃপ্তি নাই। আমি এখন গৃহে গিয়া জননী কৌশল্যা ও জন্মভূমি অযোধ্যানগরীকে দর্শন করিতে পারিলে বাঁচি, কারণ আমার জননীদেবী ও অযোধ্যানগরী আমার নিকট স্বর্গাপেক্ষাও গরীয়সী। ইহাই ঐ উক্তির ভাবার্থ। ভবানন্দ যে মহাভাবে অভিভূত হইয়া দেশকে মা বলিতেছেন, সে ভাব এখানে কোথায়? রামচন্দ্রের জন্ম যদি অযোধ্যায় না হইয়া বারাণসীতে হইত, তাহা হইলে বারাণসীই তাঁহার কাছে স্বর্গাদপি গরীয়সী হইত, অযোধ্যা কিছুই হইত না। আরও একটা বিষয় পাঠক লক্ষ্য করিবেন। জন্মভূমিকে জননী বলা হইতেছে না। একটা "চ" থাকিয়া জননীকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং জননী অর্থে যে কৌশল্যা দেবী তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

দেশকে মা বলিয়া পূজা করিবার কল্পনা আমরা কখনও যে করি নাই তাহার আর একটা প্রমাণ, ভারতমাতা বা বঙ্গমাতা নামে আমাদের কোনও দেবীপ্রতিমা নাই। ভবানন্দ যে ভাবে দেশকে মা বলিয়াছেন, সে পূজার ভাব আমাদের মনে থাকিলে, নিশ্চয়ই পূজার জন্য দেবীমূর্ত্তি থাকিতেন, পঞ্জিকায় সে পূজার তিথি নক্ষত্র নির্দ্দিষ্ট থাকিত এবং নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতিতে তাহার মন্ত্রও পাওয়া যাইত।

"বন্দেমাতরমে"র মধ্যে দুইটা বিভিন্ন idea বা ভাব পাওয়া যাইতেছে—উভয়টার জন্যই আমরা ঐ ঘৃণিত সাহেবদের নিকট ঋণী। প্রথম idea ভারতবর্ষ একটি দেশ,—তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি প্রদেশ মাত্র। দ্বিতীয় idea এই দেশ আমাদের জন্মভূমি বলিয়া জননীর ন্যায় পূজনীয়এবং এই দেশের কল্যাণের জন্য আমাদের ধনপ্রাণ উৎসর্গ করা আমাদের পরম ধর্ম্ম।

এখন প্রথম ভাবটির বিষয় চিন্তা করুন। ভারতবর্ষ একটি সমগ্র দেশ এবং আমাদের জন্মভূমি, এভাবটি আমরা কি উপায়ে পাইলাম? ইংরাজ যদি সমস্ত ভারতবর্ষের একচ্ছত্র অধিপতি না হইত, তবে সমস্ত ভারতবর্ষকে একটি দেশ বলিয়া আমরা মনে করিবার অবসর পাইতাম কি? পূর্ব্বেও সমগ্র ভারতবর্ষ একচ্ছত্রী সম্রাটের অধীন ছিল বটে, কিন্তু কোনও কালে সমস্ত ভারতবর্ষের প্রজাপুঞ্জের রাজনৈতিক একত্বভাব জন্মায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিচার, ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্তই বিভিন্ন ছিল। যিনি সম্রাট, তিনি করগ্রাহী সম্রাট ছিলেন মাত্র, দূর প্রদেশের শাসনকার্য্য তাঁহার হস্তে ছিল না। একরাজা যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজা হইতে পারেন, সেইরূপ ভাবটাই ছিল। রাজা এক হইলেও, দেশ এক হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষ যে এক এ ideaটাই খাঁটি স্বদেশী নহে; যেহেতু বিদেশী আসিয়াই এরূপ ঘটাইয়াছে। এবং এ ideaটা এখনও পর্য্যন্ত আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশও করে নাই। এখনও বাঙ্গালী কলিকাতা হইতে কটকে গিয়া "প্রবাসীর আক্ষেপ" শীর্ষক কবিতা লিখিয়া কলিকাতার মাসিক পত্রে প্রকাশ জন্য পাঠায়। এখনও বেহারে, উত্তরপশ্চিমে, বাঙ্গালী কেরাণীরা দরখাস্ত লেখে—"Foreign countryতে বাস করিতেছি, ২০৲ বেতনে আমার কুলায় না, কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি প্রার্থনা করি।"

দ্বিতীয়তঃ, দেশপ্রীতির ভাবটাও যে আমাদের নিজস্ব নহে, পরের নিকট পাইয়াছি, তাহা উপরেই দেখাইয়াছি। য়ুরোপীয় জাতিগণের ইতিহাসে যুদ্ধ বিগ্রহ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। তাই স্বদেশপ্রীতির ভাবটা তাহাদের মধ্যে বিশিষ্টরূপে জাগ্রত হইবার অবসর ঘটিয়াছে। হিন্দুরাজত্বের ইতিহাস য়ুরোপীয় ইতিহাসের তুলনায় শান্তিময়। মাঝে মাঝে বড় বড় রাজা দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন বটে, কিন্তু ঘোড়াটি ফিরাইয়া লইয়াই চলিয়া আসিয়াছেন, ভিন্ন রাজার প্রতি কোনও রূপ উৎপাত করেন নাই। মুসলমান আবির্ভাবের পূর্ব্বে, হিন্দুকে কেহ হিন্দুস্থান হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করে নাই, সুতরাং দেশকে মা বলিয়া জড়াইয়া ধরিবার অবকাশও হয় নাই।

এই স্বদেশপ্রীতি আমরা পরের ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়া আনিয়াছি, তথাপি ইহা মহামূল্য রত্ন। এই রত্নকে আমরা চিরকাল যেন বক্ষে করিয়া রক্ষা করিতে সমর্থ হই।

জাতীয়তার ভিত্তিস্থাপনের জন্য, স্বদেশপ্রীতিই মূলমন্ত্র বা বীজমন্ত্র। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি মন্ত্র সাধনা আমাদিগকে করিতে হইবে,—যথা প্রজাতন্ত্রতা। যিনি রাজা তিনি দেশের প্রকৃত রাজা নহেন, প্রজাগণই দেশের রাজা। "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই স্বদেশী ideaটি পরিবর্জ্জন করিয়া প্রজাতন্ত্রতার উপাসনা না করিলে দেশের মঙ্গলের "নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" "সর্ব্ববিষয়ে স্বদেশী" হইয়া কি আমরা পাশ্চাত্য প্রজাতন্ত্রতা গ্রহণ করিতে বিরত থাকিব?

তাহার পর ধরুন, দেশের ধনবৃদ্ধি না করিতে পারিলে কোনও উন্নতিই আমরা করিতে পারিব না। দেশীয় শিল্পকলার উন্নতিকল্পে য়ুরোপে, আমেরিকায় আমাদিগকে গিয়া দীর্ঘকাল বাস করিয়া শিক্ষালাভ করিতেই হইবে। "সর্ব্ববিষয়ে স্বদেশী" হইতে গেলে আমার পুত্রটিকে কেমন করিয়া বিদেশে পাঠাই? কি খাইয়া সেখানে সে জীবন ধারণ করিবে? সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য গঙ্গাজলই বা সে পাইবে কোথায়? টিকি দুলাইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় "সর্ব্ববিষয়ে স্বদেশী হও" বলিয়া ত খালাস, কিন্তু এ প্রশ্নের তিনি কি উত্তর দিতে চাহেন? তাহা ছাড়া বর্ণ অনুসারে শিল্পশিক্ষার্থী পাওয়া যাইবে কোথা? আমাদের বাণিজ্যের উন্নতি হইলে, ক্রমে আমাদের স্বদেশী জাহাজের আবশ্যক হইবে, এবং জাহাজ নির্ম্মাণ প্রণালী য়ুরোপে বা জাপানে গিয়া বহুসংখ্যক লোককে শিখিয়া আসিতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষার্থী সূত্রধরসন্তান কোথায় মিলিবে? যদি ব্রাহ্মণ কায়স্থের সন্তান এই বিদ্যা শিক্ষা করিতে যায়, তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুমোদিত "সর্ব্ববিষয়ে স্বদেশীয়তা" রক্ষা হইবে কি?

সুতরাং দেখা গেল, বিদেশযাত্রা, শিল্পশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও পুরাতন আচারের মর্য্যাদা রক্ষা করা অসম্ভব। এ বিষয়েও বিদেশী আচার অবলম্বন ভিন্ন "নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

পুরাতনের মধ্যে যাহা সত্য, যাহা শিব, তাহা থাকুক। তাহা বিসর্জ্জন দিলে আমাদের কোনও উদ্দেশ্যই সফল হইবে না; বরঞ্চ বিশেষ ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা। দেশের লোক,

আদর্শ সম্বন্ধে নিজ নিজ মত নির্দ্ধারিত করুন। আদর্শটা কি? জাতীয় উন্নতিটাই আদর্শ? না "সর্ব্ববিষয়ে স্বদেশীয়তাই" আদর্শ? যদি জাতীয় উন্নতিই আদর্শ হয়, তবে যে বিষয়ে "স্বদেশীয়তা" করিতে গেলে সে উন্নতির বিঘ্ন হইবে, তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

উপরে যাহা লিখিলাম, তাহার সহিত যিনি একমত হইবেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে কোনও জিনিষ বাহির হইতে আসিতেছে বলিয়াই, বিদেশীর নিকট হইতে পাইতেছি বলিয়াই, তাহা নিন্দনীয় নহে। স্বদেশভক্তি, প্রজাতন্ত্রতা, বর্ণনির্ব্বিশেষে বাণিজ্যাদি সেবা, দেশান্তর গমন, এই সমস্ত বিষয়ে যদি আমরা সনাতন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয়ের অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি, যদি এই সকল বড় বড় ভাবগত ব্যাপারে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট ঋণী হইতে সম্মত হই, তবে পরিচ্ছদাদি সামান্য বহির্ব্বিষয়ক ব্যাপারে অনুকরণই কি মহাপাতক বলিয়া সাব্যস্ত হইবে? পশ্চিমের হাতীই যদি গলিয়া গেল, তবে মশাগুলিকে লইয়া এত টানাটানি কেন?

প্রথমতঃ পোষাকের কথা ধরা যাউক। যাঁহারা বলেন— "হ্যাট কোট ছাড়িয়া ধুতি চাদর ধর, উহাই আমাদের জাতীয় পোষাক"—তাঁহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি. আমি কি বাঙ্গালী জাতি না ভারতবর্ষীয় জাতি? বাঙ্গালীকে স্বতন্ত্র জাতি বলিলে ভারতবর্ষের একজাতীয়ত্ব অস্বীকার করা হয়। তাহা কোন্ স্বদেশভক্ত করিতে প্রস্তুত আছেন? যদি আমি ভারতবর্ষীয় জাতিই হই, তবে জিজ্ঞাসা করি, ধুতি চাদরই কি ভারতবর্ষীয় জাতির পোষাক? অবশ্যই না। দুর্ভাগ্য বশতঃ ভারতবর্ষীয় মাত্রের জন্য এখনও এক পোষাক আবিষ্কৃত হয় নাই। এক পোষাক আবিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষাও এক হওয়া আবশ্যক। আমরা দেখিতে পাইতেছি, সমাজের উচ্চস্তরে, ইংরাজিই সেই এক ভাষার স্থান অধিকার করিয়াছে। পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ—(আমি ইচ্ছা করিয়াই 'পাশ্চাত্য' শব্দ ব্যবহার করিলাম—কারণ ও পরিচ্ছদ শুধু ইংরাজেরই ইজারা মহল নয়, সমগ্র য়ুরোপীয় ও আমেরিকান জাতিরও বটে)—পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ, সেটাও না হয় চলিয়া যাউক না। তাহাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইবে? জাতীয়তা ম্লান হইবে? ঐ দেখুন জাপান, যাঁহার পদতলে বসিয়া এখন এক শতাব্দী ধরিয়া আমরা জাতীয়তা শিক্ষা করিতে পারিলে ধন্য হই—সেই জাপান পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া কি তাঁহাদের স্বদেশপ্রীতি ম্লান হইয়াছে? সে দেশে গবর্ণমেণ্ট আফিসের সমস্ত কর্ম্মচারী ও রাজপুরুষ কর্ম্মস্থানে পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ ধারণ করিতে রাজাজ্ঞায় বাধ্য। ইহা হইতে বুঝা যায়, জাপানীরা স্থির করিয়াছেন, ঐ পরিচ্ছদই তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। যাঁহারা রাজাজ্ঞায় বাধ্য নহেন,—এরূপ শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিগণও স্বেচ্ছায় পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকেন। কই, কোনও জাপানী ভট্টাচার্য্য ত বলেন নাই—"পরিচ্ছদে স্বদেশী হও।" যদি বলিয়া থাকেন, তাঁহার কথা কেহ শুনে নাই স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। জাপান যদি জাপানী বন্দে-মাতরম্ গান করিয়া ও বিদেশী মাল বয়কট করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত, যদি বিদেশীয় জ্ঞান বিদেশীয় শিল্পশিক্ষা, বিদেশীয় রাজনীতি, বিদেশীয় যুদ্ধ কৌশল এ সমস্তের বিরুদ্ধে স্বীয় দ্বার রুদ্ধ করিয়া "সর্ব্বতোভাবে স্বদেশী" হইয়া, স্বদেশী অহিফেন সেবন করিয়া, স্বদেশী পালঙ্কে নিদ্রিত থাকিত, তবে আজ তাহাদের নামও আমাদের শ্রুতিগোচর হইত কি না সন্দেহ।

এখন, আমাদের "জাতীয়" পোষাকটা কি দেখা যাউক। ধুতি কামিজ বা কোট ও চাদর। যাঁহারা একটু সৌখীন, তাঁহাদের ধুতি পাঞ্জাবী ও শিল্কের চাদর। যাঁহারা প্যাণ্টালুন কামিজ ও কলারের উপর গলাবন্দ কোট, তাহার উপর পাগড়ি বা টুপী পরিধান করেন, তাঁহারাও বিশেষ নিন্দাভাজন নহেন। যত অপরাধ করিয়াছে ঐ হ্যাট আর নেকটাইটা। যাঁহারা ঘোরতর টিকিবাদী স্বদেশী, তাঁহারা শার্ট, কোট ও প্যাণ্টালুনেরও বিপক্ষ, কারণ মুনিঋষিগণ এ তিনের কোনটাই পরিতেন না। আচ্ছা না হয় ধরিয়াই লইলাম মুনিঋষিগণ পাঞ্জাবী ও চাদরটা ব্যবহার করিতেন। আজি কালি দেখিতে পাইতেছি, অনেক নব্য বিলাতফেরত, হাইকোর্ট হইতে ফিরিয়া সুসূক্ষ্ম শিমুলিয়ার ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবী পরিয়া, তাহার উপর শিল্কের চাদরের বাহার দিতেছেন। পরিবর্ত্তন দেখিয়া দুঃখ হয়। তাঁহারা যতক্ষণ পাশ্চাত্য পোষাকে থাকেন, তাঁহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, হাঁ, এই লোকটা ঘুঁসির বিনিময়ে ঘুঁসি দিতে পারে বটে। আবার তাঁহাদিগকেই

"দেশীয়"পোষাকে দেখিলে মনে হয়—কাহার বাছনি রে,নিছনি লয়ে মরি। মনে হয়, ইঁহাকে বর করিয়া বিবাহসভায় বসাইয়া দিলে মানাইবে ভাল। মনে হয়, ড্রয়িং রুমের গালিচার উপর বেড়াইতে ইঁহার পায়ে ব্যথা বাজিতেছে না ত? হেমবাবু লিখিয়াছেন—

> যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
> গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,
> বায়ু, উল্কাপাত, বজ্রশিরে ধরে
> স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।

মনে হয়, যদি ইহাঁকেই এখনি যাইতে হয়, তবে ভূধর-শিখরে উঠিবার বহু পূর্ব্বেই ইহাঁর কোঁচার ফুলটি নষ্ট হইয়া যাইবে, কোঁচার কাপড় পায়ে পায়ে লটপট করিয়া জড়াইয়া ইনি আছাড় খাইয়া পড়িবেন, বায়ু একটু জোরে বহিলেই যতনের রেশমী চাদর খানি উড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইবে, উল্কাপাতের সম্ভাবনা দেখিলেই ইনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন, এবং বজ্রপাত শব্দ শ্রবণ মাত্র ইহাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইবে।

আমাদের ধুতি চাদরের মত effiminate পোষাক আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এই স্বদেশী আন্দোলন যখন আরম্ভ হইল, তখন বঙ্গীয় যুবকের ধুতি চাদরেই এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিলাম। একটি যুবক গ্রাজুয়েট আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। দেখিলাম, তিনি "মালকোঁচা দিয়া" আসিয়াছেন। সেদিন একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম। তাহার পর দেখিলাম, দলে দলে স্কুল কলেজের ছাত্রগণ প্রকাশ্য রাজপথে, ঐ রূপ "মালকোঁচা" দিয়া বেড়াইতেছে। তখন বুঝিলাম, ইহা পরিচ্ছদ ব্যাপারে ক্রমাভিব্যক্তির একটা বিকাশ মাত্র। পূর্ব্বে মানুষ কিছুই পরিত না। তাহার পর সম্ভবতঃ গাছের ছাল পরিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর, যখন বস্ত্র বয়ন করিতে শিখিল, তখন খানিকটা লম্বা চৌড়া একটা বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া, গাছের ছাল যেরূপে অঙ্গে জড়াইত, সেই রূপ করিয়া জড়াইতে লাগিল। আমাদের "জাতীয় পোষাক" এখনও ঠিক সেই stageএ আছে। আজ বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে বাঙ্গালীর শীতল শোণিতে উত্তাপ সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহার হস্ত পদাদি যেন স্বাধীনতার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাই কোঁচায় আর সুবিধা হয় না। কোঁচা অদৃশ্য হইল। পদদ্বয় স্বাধীন হইল। আজিকার এই মালকোঁচা, আগামী কল্যের প্যাণ্টালুনেরই পূর্ব্বপুরুষ।

আরাম করিবার পক্ষে ধুতি চাদরই পরম উপাদেয় জিনিষ সন্দেহ নাই। কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একটু পুরুষোচিত-ভাবে চালনা করিতে হইলেই প্রমাদ। গত ১০ই শ্রাবণের সঞ্জীবনীতে "শ্বেতাঙ্গের স্পর্দ্ধা" নামক একটি প্রবন্ধ পড়িলাম। একদিক হইতে একজন বাঙ্গালী ও অপর দিক হইতে একজন শ্বেতাঙ্গ বিডনষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ সাহেবের গায়ে বাঙ্গালীর গা লাগাতে সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালীকে গালি দিল। তখন বাঙ্গালীটি "কাপড় সামলাইয়া লইয়া," সাহেবকে আক্রমণ করিল। অপমানের প্রতিশোধ লইবার পূর্ব্বে, যে কাপড়কে সাবধানে "সামলাইয়া" লইতে হয়, সে কাপড় কোনও মহাজাতির জাতীয় পরিচ্ছদ হইবার উপযুক্ত বলিয়া আমি মনে করি না।

যদি কোনও দিন আমাদের স্বপ্ন সফলই হয়, আমরা যদি একটা স্বাধীন মহাজাতি হইয়া দাঁড়াই, তখন পৃথিবীর অন্যান্য মহাজাতিগণের সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক ও সংযোগ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে। তখন যদি আমরা শ্রীযুত অমুকচন্দ্রকে আমাদিগের Ambassador করিয়া ইংলণ্ডের রাজসভায় পাঠাই, তবে তিনি ধুতি পাঞ্জাবী ও রেশমী চাদর লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইবেন ত? সম্ভবতঃ মাঝে মাঝে Buckingham Palaceএ বা অন্যান্য Palaceএ State Ballএ তাঁহার নিমন্ত্রণ হইবে এ কথা স্মরণ রাখিবেন। আর, হঠাৎ যখন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোনও য়ুরোপীয় জাতি, শত্রু দমন করিবার জন্য আমাদের নিকট সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা করিবেন, তখন শ্রীযুত তমুকচন্দ্রকে যদি আমরা সেনাপতি করিয়া সে দেশে পাঠাইতে চাই, তবে তিনি যাইতে কোনও আপত্তি করিবেন না ত? রাঁধুনি বামুন সঙ্গে লওয়া হয় ত বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়া উঠিবে। আর যখন আমেরিকা হইতে "সর্ব্বজাতীয় ধর্ম্মমণ্ডলী" আমাদিগকে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিবেন, তখন মহামহোপাধ্যায় মহাশয়, আপনি পশ্চাৎপদ হইবেন না ত? আমেরিকায় আলোচাল মিলিলেও মিলিতে পারে, কিন্তু গব্যঘৃত ও কাঁচকলার "অত্যন্তাভাব"।

চিরকাল হইতে একটা যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহা

ছাড়িয়া দিতে হইলে কষ্ট হয়, দুঃখ হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা যদি স্বজাতির পক্ষে স্বদেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, তবে সে দুঃখ সে কষ্ট বক্ষ পাতিয়া পুরুষের মত বহন করিতে হইবে। নাকে কাঁদিলে চলিবে না। আমরা স্ত্রীলোকের মত Sentimental হইয়া পড়িয়াছি; এটার বিরুদ্ধে আপত্তি ওটার বিরুদ্ধে আপত্তি, আমাদের সেই Sentimentalityর ফল মাত্র। আমরা কি চিরদিনই School girlই থাকিয়া যাইব? কোনও দিন কি practical হইব না, মানুষ হইব না, পুরুষ হইব না? দেশের উন্নতি, জাতির উন্নতিই আমাদের ধ্রুব লক্ষ্য হউক। সেই ব্রত-সাধনের পক্ষে, সেই লক্ষ্যে উপনীত হইবার পক্ষে যতটুকু স্বদেশীয়তা আমাদের সহায়, তাহাই আমরা প্রাণপণে অবলম্বন করি আসুন। যতটুকু তাহার বিঘ্ন, তাহা অসঙ্কোচে পরিত্যাগ করি আসুন। দেশোন্নতিই লক্ষ্য, স্বদেশীয়তা তাহার উপায় মাত্র। আমরা লক্ষ্য ভুলিয়া যেন উপায়টিকেই পরমার্থ জ্ঞানে আঁকড়াইয়া না ধরি। সকল জিনিষেরই ব্যবহার ও অপব্যবহার আছে। ঈশ্বর আমাদিগকে আগুন দিয়াছেন রাঁধিয়া খাইবার জন্য, গৃহের চালে লাগাইয়া দিবার জন্য নহে। স্বদেশীয়তার উপযোগী অংশের দ্বারায় আমরা আমাদের দেশোন্নতিরূপ কার্য্যসাধন করিয়া লই আসুন, অনুপযোগী অংশের প্রতি অন্ধভক্তি বশতঃ আমাদের চরম লক্ষ্যের যেন সর্ব্বনাশ না করিয়া বসি। একটি জাপানী গল্প আছে—একব্যক্তি কোনও জাপানী যুবককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"দেখ, যদি বুদ্ধদেব স্বয়ং সেনাপতি হইয়া, কনফুসিয়স্ তাঁহার সহকারী হইয়া, জাপান আক্রমণ করিতে আসেন, তবে তুমি কি কর?" যুবক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "বুদ্ধদেবের মাথা কাটিয়া ফেলি, কনফুসিয়স্‌কে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করি।" ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে,—জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম, শিন্তোধর্ম্ম, কনফুসিয়ান ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা ধর্ম্ম আছে বটে, কিন্তু সেখানে সর্ব্বধর্ম্মের সারধর্ম্ম স্বদেশপ্রীতি বা বন্দেমাতরম্। আমরাও সেই বন্দেমাতরম্ ধর্ম্মকে জীবনের সারভূত করি আসুন। নানারূপ নিষেধ, বিধান, অনুস্বার বিসর্গের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া, জীবনের একমাত্র মহাব্রত করি আসুন—স্বদেশোন্নতি।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

[পাশ্চাত্য পরিচ্ছদের প্রতি বিদ্বেষ মনের একটা সংকীর্ণতা মাত্র। অনেক সাহেবী পোষাক পরিহিত বাঙ্গালীকে জানি, যাঁহারা স্বদেশপ্রেমে ধুতিচাদর পরিহিত কোন বাঙ্গালীর চেয়ে নিকৃষ্ট নহেন। বিদেশী যাহা ভাল ও আমাদের লওয়া দরকার, তাহা সমস্তই লইতে প্রস্তুত থাকা উচিত। এমন কি, যদি কেহ প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন যে, স্বদেশী সমুদয় ছাড়িয়া বিদেশী যাহা কিছু সব লইলেই দেশের ও জাতির প্রকৃত মঙ্গল হইবে, তাহা হইলে আমাদের তাহাই করা কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রমাণ চাহিতে সকলেরই অধিকার আছে।

প্রভাত বাবু অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আরও কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। ১। গ্রীষ্মের রৌদ্রে সোলা-টুপি খুব কাজ ও আরাম দেয়। অন্য ঋতুতে কোন প্রকার হ্যাট, বাঁধা (readymade) পাগড়ী অপেক্ষা বেশী কাজ বা আরাম দেয় কি? ২। নেকটাই ও উল্টা কলার দ্বারা কোন প্রয়োজন সাধিত হয় কি না? ৩। ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশ গ্রীষ্মপ্রধান। জাপান শীতপ্রধান দেশ। জাপানে যে পরিবর্ত্তন সঙ্গত ও হিতকর, ভারতবর্ষের তাহা উপযোগী কি না? অর্থাৎ সাহেবী পোষাক স্বাস্থ্য ও আরাম হিসাবে ভারতবর্ষের উপযোগী কি না? আরামও স্বাস্থ্যরক্ষার একটি উপায়। ৪। ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে নানা অঙ্গসম্পন্ন সাহেবী পোষাক উপযোগী কি না? ৫। Sentiment জিনিসটা অনেক স্থলে বাজে হইলেও উহাকে বাদ দিতে পারা যায় না। আমাদের দেশের সাধারণ লোক ও শিক্ষিত লোকদের মধ্যে অনেকটা দূর দূর ভাব আছে। যাহাতে এই ভাব নষ্ট হইয়া ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, তাহা করা দরকার। সাধারণ লোকে সাহেবী পোষাক পরা লোককে সহজে নিজের লোক মনে করে না। এ ভাবটা অযৌক্তিক হইতে পারে। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব ও বলবত্তা অস্বীকার করা যায় না। সাহেবী পোষাক পরিলে ঘুসি মারিবার সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, জাতীয় ঘনিষ্ঠতা লাভ বাঞ্ছনীয়তম জিনিষ কি না, এবং এমন কিছু পরিবর্ত্তন করা উচিত কি না, যদ্দ্বারা এই ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির বিঘ্ন জন্মে।* প্রভাত বাবু রাজদূতের ও সেনাপতির

---

* রুশীয় গ্রন্থকার টলষ্টয় What shall we do then? নামক বহিতে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে, যে যে কারণে পাশ্চাত্য দেশসকলে গরীব ও ধনীর দূর দূর ভাব জন্মিয়াছে ও রক্ষিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নানা অঙ্গবিশিষ্ট পোষাক একটি। তিনি বলেন:—

"If a rich man wore simple garments, which only protected the body against the cold, he would need very little, and he could not help, if he had two fur coats, but give one to him who had none; but the rich man begins by having made for himself wearing apparel that consists of several parts and is good only for certain occasions, and so is of no use to the poor man. He has dress coats, vests, sack coats, patent leather boots, capes, shoes with French heels, garments that for the sake of fashion are cut up into small pieces, hunting coats and travelling ulsters and so forth, which can be put to use only in a condition removed from poverty. Thus the wearing apparel also becomes a means of segregating oneself from the poor. Fashion makes its appearance, that is, that which separates the rich from the poor."

পরিচ্ছদের কথা তুলিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় যে বেশে বিলাতে দৌত্য করিয়াছিলেন, তাহা স্বদেশী বলা চলে, এবং তাহা মন্দও নহে। দেশীয় ফৌজের দেশীয় সেনাপতিদের বেশ মন্দ নয়। সৈনিক-বিভাগে রণজিৎসিং সাহেবী পোষাক চালাইয়াছিলেন। নেপালে এখনও এই পোষাক সিপাহিরা পরে। প্রবাসী সম্পাদক।]

চিত্র।

পারিসের রক্ষয়িত্রী সেণ্ট জেনভীভের ছবি সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা শ্রদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতা প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছেন।

দ্রৌপদীকে কীচকের ভোজ্য বস্তু তাহার নিকট লইয়া যাইতে বাধ্য করা হয়। দ্রৌপদী কীচকের সম্মুখে যাইতে সাতিশয় নির্বেদ ও লজ্জা অনুভব করিতেছেন। ইহাই রবিবর্ম্মার অঙ্কিত চিত্রটির বিষয়।

গ্রন্থ সমালোচনা।

মহাভারত। (মূল আখ্যান) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্কলিত। মূল্য ৪৲ টাকা। এই পুস্তক খানি গদ্যে লিখিত; মোটামুটি ছয় শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পুরাকালে পুস্তকের সংখ্যা কম ছিল, জ্ঞানবৃক্ষও এখনকার মত নানা শাখাপল্লব সহযোগে সুবিশাল ছিল না, লোকের অবসরও প্রচুর ছিল। সুতরাং মহাভারতের মত সুবৃহৎ পুস্তক আদ্যন্ত প্রক্ষিপ্ত অংশ সমেত পড়িবার সুযোগ হইত। এখন শিক্ষার্থী ও শিক্ষিত লোক-দের সে ভাবে ইহা অধ্যয়ন করিবার অবসর কচিৎ ঘটে। এই কারণে মহাভারতের আসল গল্পটি স্বতন্ত্র করিয়া বলিবার দরকার ছিল। অথচ তাহা ছাত্রদের পরীক্ষা পাশ করিবার সাহায্যার্থ লিখিত সারসংগ্রহ-পুস্তকের মত নীরস না হয়, সে দিকেও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক ছিল। মূল আখ্যানের কিছু বাদ না পড়ে, বা স্বকপোলকল্পিত কিছু আসিয়া না পড়ে, তদ্বিষয়েও সাবধান হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। সুরেন্দ্র বাবু সব দিক্ বজায় রাখিয়া পুস্তকখানি লিখিতে প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা সমগ্র বহিখানি পড়িবার এখনও সময় পাই নাই; কিন্তু যতটুকু পড়িয়াছি তাহাতে তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য, এবং সাহিত্যরসের প্রাচুর্য্যে মনোজ্ঞ হইয়াছে। আমাদের বাড়ীর মেয়েছেলেরা যে ভাবে পুস্তকখানিকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাই ইহার সরসতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুরেন্দ্র বাবুর ভাষা সহজ, অথচ বিষয়োপযোগী গাম্ভীর্য্য বিশিষ্ট। পূর্ব্বোল্লিখিত কারণ ব্যতীত আরও একটি কারণে এইরূপ একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। মহাভারত রত্নখনি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু রত্নান্বেষণ করিতে গিয়া অনেক পঙ্ক, কর্দ্দম, ক্লেদও ঘাঁটিতে হয়। শিশু, বালকবালিকা ও তরুণবয়স্ক লোকদের চিত্ত ইহাতে কলুষিত হয়। এই জন্য এরূপ আশঙ্কাবর্জ্জিত একটি সংস্করণের দরকার ছিল। আমরা যতদূর পড়িয়াছি, তাহাতে সুরেন্দ্র বাবুর বহিখানি নির্ভয়ে সকল শ্রেণীর পাঠকের হাতে দেওয়া যায় বোধ হইল। এক হোমরের মহাকাব্যদ্বয়ের গল্প ইউরোপের কত লেখক কত আকারে বলিয়াছেন। সুতরাং সুরেন্দ্র বাবুর প্রদর্শিত পথের আরও অনেক পথিক জুটিবে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে বেদব্যাসকে অম্বিকা ও অম্বালিকার দেবর বলা হইয়াছে। সংস্কৃতে স্বামীর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উভয়বিধ ভ্রাতাকেই দেবর নামে অভিহিত করা হয়। বাঙ্গলা ভাষায়ও এরূপ প্রয়োগ শিষ্ট কি না, তাহা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের বিবেচ্য।

English in our Schools—এই প্রবন্ধ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকগণের সমিতির এক সাধারণ অধিবেশনে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করেন। পরে ইহা বঙ্গবাসী কলেজ পত্রিকায় ছাপা হয়। আমাদের স্কুল সকলে ছাত্রেরা ভাল ইংরাজী কেন শিখিতে পারে না এবং কি প্রণালী অবলম্বন করিলে শিখিতে পারে, ললিত বাবু তাহার বিচার করিয়াছেন। তিনি ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের বহুদর্শী এবং যোগ্য শিক্ষক। সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধ স্কুলের শিক্ষকগণের যে অবশ্য পাঠ্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় উদ্ভিদাবলী

৩০। (Tetranthera monopetala, Natural order Laurineæ.)

এই বৃক্ষ পঞ্জাব, হিমালয় প্রদেশ, আসাম, ব্রহ্মদেশ, সাতপুরা পর্ব্বত ও করোমণ্ডল প্রদেশে জন্মায়।

ইহার বীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যায় তাহা হইতে মোমবাতী প্রস্তুত হয়। এই তৈল অনেক উপকারী মলম প্রস্তুত করিতে কাজে লাগে। এই বৃক্ষের ছাল, বীজ ও তৈল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

ইহার কাঠ হইতে কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি প্রস্তুত হয়।

ইহার পাতা আসাম প্রদেশে গুটি পোকাকে খাইতে দেওয়া হয়।

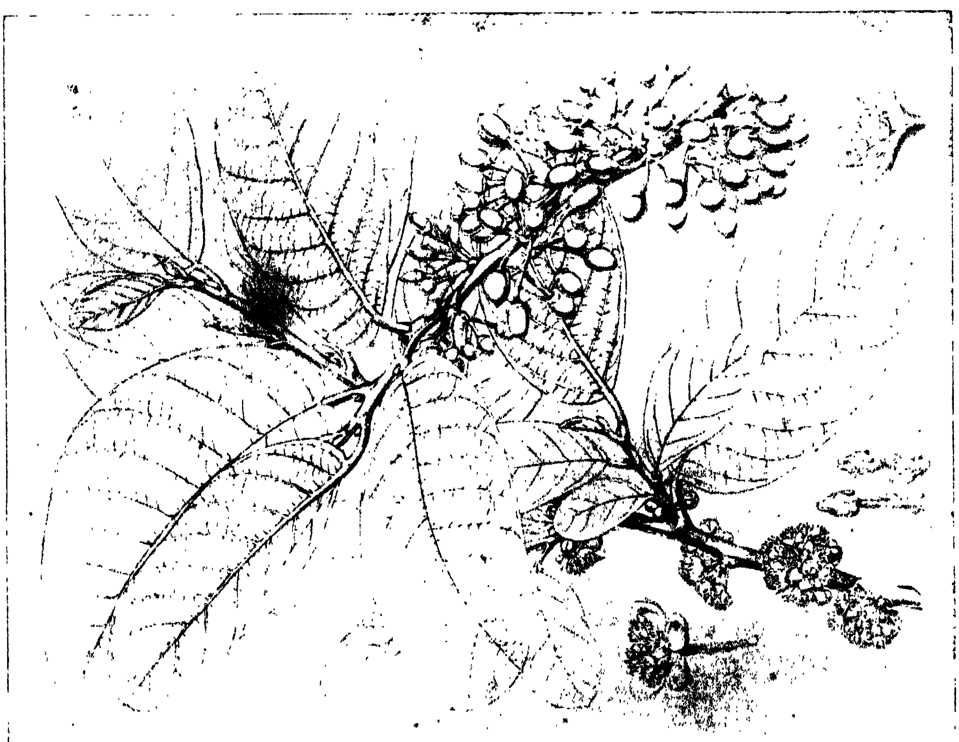
তেজপাতার মত ইহার পাতা সুগন্ধি।

৩১। (Juniperus excelsa, Natural order Coniferæ.)

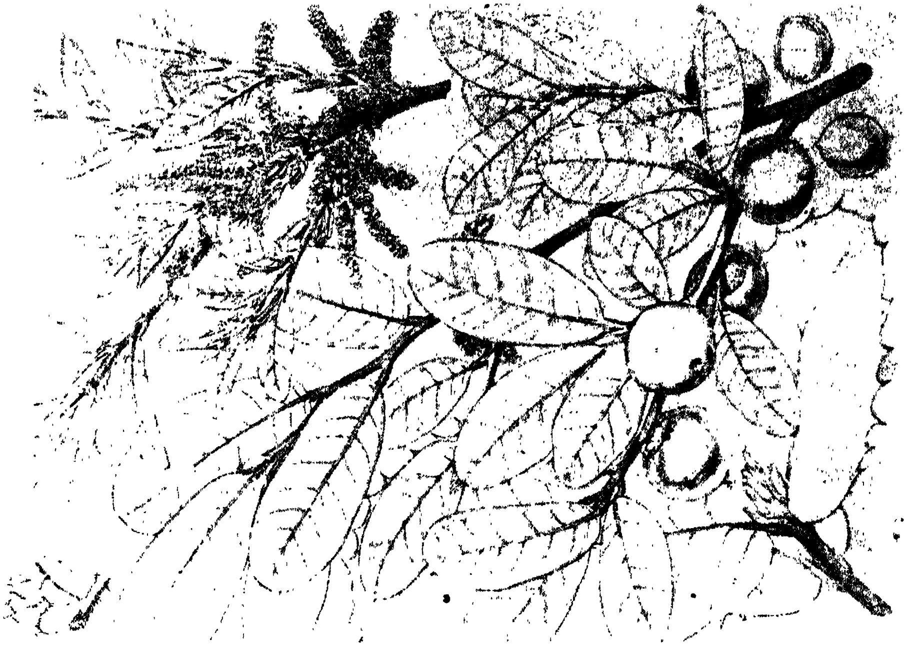
এই বৃক্ষ হইতে ধূপ প্রস্তুত হয়। ইহা হিমালয় পর্ব্বত, নেপাল, তিব্বত, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, পারস্য ও আরব দেশে জন্মায়।

এই বৃক্ষের ফল সুস্বাদ; ইহা জ্বরে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

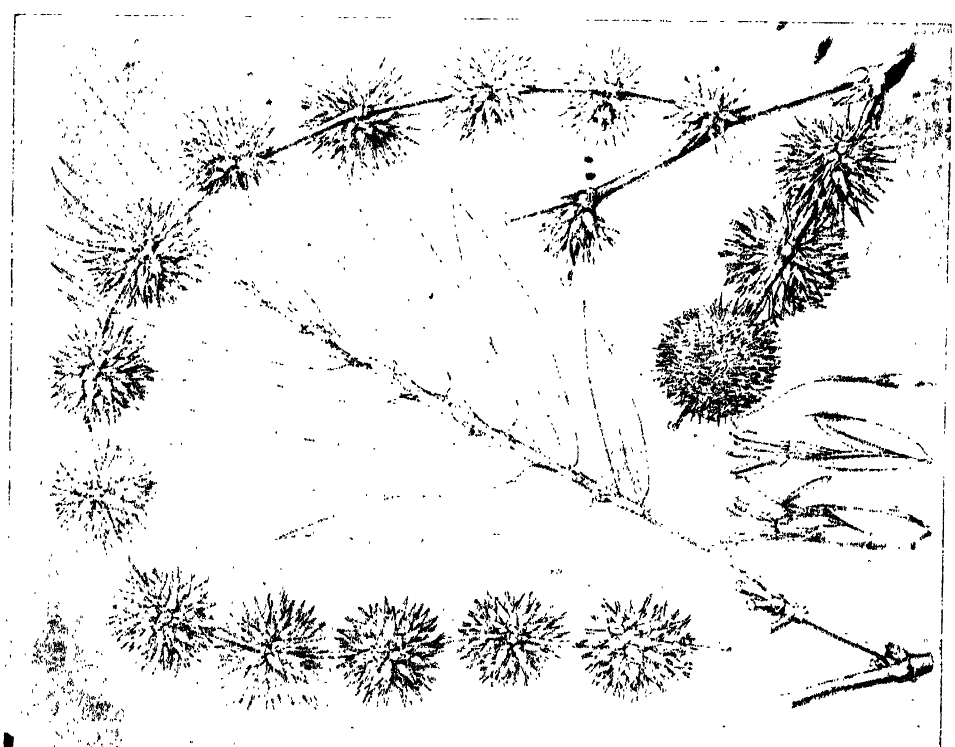
ইহার কাঠ হইতে অনেক আসবাব প্রস্তুত হয়। পেন্সিল তৈয়ার করিতে যে কাঠের আবশ্যক, তাহা এই গাছ যোগাইতে পারে। ইহার কাঠ হইতে ধূপ প্রস্তুত হয়।



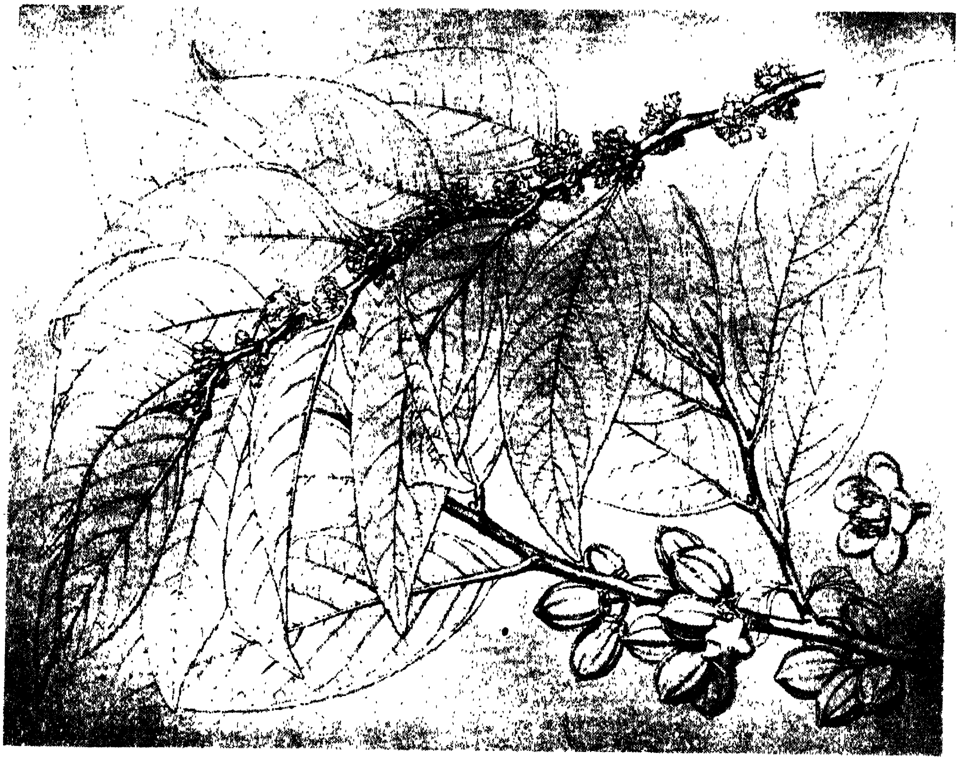
৩০। Tetranthera monopetala, Natural order Laurineæ.



৩১। Juniperus excelsa, Natural order Coniferæ.



৩২। বাঁশ, Dendoocalamus Strictus, Natural order Gramineæ।



৩৩। মউঁ, Casearia tomentosa, Natural order Samydaceæ।

৩২। বাঁশ (Dendoocalamus Strictus, Natural order Gramineæ.)

ইহার দেশী নাম বাঁশ। ভারতের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার তন্তু বা আঁশ হইতে কাগজ প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

বেহার প্রদেশে বাঁশ হইতে হাত-পাখা প্রস্তুত হয়।

বাঁশে তবাসীর বলিয়া যে দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়।

ইহার পাতার ক্বাথ (decoction) স্ত্রীলোকদিগকে প্রসবের পর দেওয়া হয়।

ইহার পাতা গরু প্রভৃতি অনেক জন্তুদিগের ভক্ষ্য।

ইহার বীজ দুর্ভিক্ষের সময় মানুষেরাও ভক্ষণ করে।

বাঁশ অন্যান্য অনেক কাজে লাগে।

৩৩। মাউঁ (Casearia tomentosa, Natural order Samydaceæ.)

এই বৃক্ষ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে হিন্দী ভাষায় চিল্লা, ও মানভূম জেলার লোকেরা মাউঁ বলে।

ইহার ছাল তিক্ত; সাঁওতালেরা এই ছাল উদরী রোগে প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহার করে।

ইহার পাতা ও ফল ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়।

ইহার কাঠ হইতে চিরুণী প্রস্তুত হয়।

আনন্দমোহন বসু।*

অদ্য আনন্দমোহন বসুর জীবনের ইতিহাস সবিস্তারে প্রকটন করিবার সময় নহে। বিগত ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ হইতে যে কার্য্যবহুল জীবন দেশের সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের সহিত অভিন্নরূপে মিলিত হইয়া আপনাকে তাহার বিপুল তরঙ্গে সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহার ইতিবৃত্ত এ স্থলে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। তাহা জীবনবৃত্তের জাতীয় ভাণ্ডারে ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্য অনেক দিন হইল রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার যে চরিত্র লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল, অদ্য তাহারই সৌন্দর্য্য প্রধানতঃ বিবৃত করিব।

আনন্দমোহন বসু মহাশয় ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে আশ্বিন মাসে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জয়সিদ্ধি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পদ্মলোচন বসু মহাশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতাগুণে দরিদ্র অবস্থা হইতে অচিরকালমধ্যে প্রভূত ধন সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পুত্রগণের অপ্রাপ্তব্যবহার অবস্থায় তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। তখন বিষয় সম্পত্তি রক্ষা ও পুত্রগণের শিক্ষার ব্যবস্থার ভার তদীয় বিধবা দেবী উমাকিশোরীর স্কন্ধে পতিত হয়; পতি-বিয়োগের পর প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত তিনি এই গুরুভার অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল ও অতুলনীয় দৃঢ়চিত্ততা সহকারে বহন করিয়াছিলেন। দেবী উমাকিশোরী পুত্রগণের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, "আপনার অতুল সম্পত্তি। সুতরাং পুত্রদের অধিক বিদ্যালাভের প্রয়োজন কি? পিতা যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে উহাই উহাদের যথেষ্ট।" কিন্তু ইহাদের জননী সম্পত্তি রক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় জটিল প্রশ্নের মীমাংসা যেমন অন্যসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং সমাধা করিয়াছিলেন, পুত্রগণের শিক্ষা সম্বন্ধেও তদ্রূপ বাহিরের কাহারও পরামর্শ না লইয়া কেবল তাহা-দেরই প্রবৃত্তি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র আনন্দমোহন বসু মহাশয় শিক্ষালাভের উদ্দেশে প্রথম বার ইংলণ্ড যাওয়ার জন্য মাতার অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে প্রথমে এ প্রস্তাবে অসম্মত হন। পরে যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলা হইল, যে ইহাতে তাঁহার পুত্রের উত্তরোত্তর উন্নতির বিলক্ষণ সম্ভাবনা, তখন আর কোন আপত্তি উত্থাপন করিলেন না।

তিনি ধর্ম্মজীবনে অতিশয় উন্নত ছিলেন। স্বকীয় বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম্মাচরণে তাঁহার অবিচলিত আগ্রহ, অনুরাগ ও নিষ্ঠা দেখিয়াছি। বৈধব্যদশাপ্রাপ্তির পর বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত তাঁহার সমুদয় সময় পূজা, ব্রতপালন, ধর্ম্মকথা শ্রবণ ও তীর্থ পর্য্যটনে পর্য্যবসিত হইত। ধর্ম্ম মতে পুত্রেরা তাঁহা হইতে ভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সাতিশয় মনঃপীড়ার কারণ হইলেও তিনি

* স্বর্গীয় মহাত্মার শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত।

তাঁহাদের স্বাধীনতার পথে কখনও অন্তরায় উপস্থিত করেন নাই। একদা কেহ তাঁহার সমক্ষে পুত্রদিগকে বিধর্ম্মী বলিয়া উল্লেখ করিলে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া উত্তর করিয়াছিলেন, "আমার পুত্রেরা বিধর্ম্মী কিসে? উহারা কি সুরাপায়ী? না পরদ্রব্যলোভী? না অসচ্চরিত্র? সাবধান! তাহাদের সম্বন্ধে এমন কথা আমার সম্মুখে উচ্চারণ করিও না। আমি তাহাদের ঈশ্বর পূজা ও ধর্ম্মে নিষ্ঠা দেখিয়াছি। আমার ধর্ম্ম অনুসরণ করে না বলিয়াই কি উহারা বিধর্ম্মী হইল?" তিনি পুত্রদের সর্ব্বদাই এই মর্ম্মে পত্র লিখিতেন, "যাহাই কর, ধর্ম্মে নিষ্ঠা ও দেবতায় ভক্তি রাখিয়া করিবে।"

আনন্দমোহন বসু মহাশয় এই মনস্বিনী জননীর হৃদয় ও আত্মার সমগ্র কমনীয় গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। পিতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মাতার আত্মার অনুপম সৌন্দর্য্য এতদুভয়ই তাঁহার চরিত্রে অপূর্ব্বরূপে মিলিত হইয়াছিল।

আনন্দমোহন ছয় বৎসর বয়সে ময়মনসিংহ বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন ও তাহার তিন বৎসর পরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক চারি টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া আঠার টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পরীক্ষার পাঁচ মাস পূর্ব্বে তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়াতে তিন মাস তাঁহাকে বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল; নতুবা তিনি নিশ্চয়ই প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। পরবর্ত্তী পরীক্ষা সকলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ, এ পরীক্ষা দেন এবং সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তৎপরে ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই বৎসর জুলাই মাসে তাঁহার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পর বৎসর ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে এম, এ পরীক্ষাতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার বুদ্ধিমত্তার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করে না। শুনিয়াছি, তাঁহার ছাত্রাবস্থায় প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতের অধ্যাপক একদা তিনটী প্রশ্ন দিয়া বলিয়াছিলেন, "যে ছাত্র প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে, বুঝিব, সে এই শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান। আর যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম হইবে।" আনন্দমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর যে তিনটীরই উত্তর দিতে পারিবে?" অধ্যাপক হাসিয়া কহিলেন, "তাহা কেহ পারিবে না।" আনন্দমোহন পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি পারে?" অধ্যাপক বলিলেন, "যদি কেহ পারে, তবে সে আমার আসন গ্রহণ করিবে।" আনন্দমোহন অনতিবিলম্বে সকল প্রশ্নেরই উত্তর মীমাংসা করিয়া দিলেন। বি, এ পরীক্ষায় অঙ্কে তিনি এত অধিক নম্বর পাইয়াছিলেন, যে পরীক্ষকেরা তাহাতে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে এম, এ উপাধি প্রদান করিবার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার সভা সমক্ষে বিশেষ ভাবে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেন। তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে এমন সম্মান করিতেন, যে, গবর্ণর জেনারেল যখন একবার প্রেসিডেন্সী কলেজ দর্শন করিতে আসেন, তখন কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ সাট্‌ক্লিফ্ তাঁহাকে রাজপ্রতিনিধির সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। আনন্দমোহন এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই মিঃ সাট্‌ক্লিফ্ তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অঙ্কের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তখন তাঁহার বয়স একুশ বৎসর। এই কার্য্য করিতে করিতে পর বৎসর তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত বৃত্তির যোগ্যপাত্র বলিয়া স্বীকৃত হন। এই বৃত্তির টাকা লইয়া আনন্দমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তথায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া সেখানেও তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভা বলে সকলকে চমৎকৃত করেন। সেখানে তাঁহাকে গ্রীক ও লাটিন শিখিতে হয়। তৎপূর্ব্বে তিনি এই দুই ভাষা জানিতেন না। দুইটী নূতন ভাষা শিক্ষা করাতে অপর ছাত্রগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহার বড়ই অসুবিধা ছিল। যাহা হউক, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ গণিত পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করিয়া তিনি র‍্যাঙ্গলার উপাধি প্রাপ্ত হন। গণিত শাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য প্রতিভা দর্শনে তাঁহার অধ্যাপকগণ সকলেই আশা করিয়াছিলেন, যে আনন্দমোহন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিবেন। এমন কি, বিলাতের বিখ্যাত দৈনিক ডেইলী নিউসে প্রকাশিত হইয়াছিল, যে তিনিই প্রথম র‍্যাঙ্গলার হইয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে কোন ভারতবাসী এই গৌরবস্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। আনন্দমোহন এই কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া কেবল যে স্বয়ং সম্মান লাভ করিলেন এমন নহে, কিন্তু চিরদিনের জন্য তাঁহার দেশবাসীকে বিদেশীয়গণের সম্ভ্রমে উত্থিত করিলেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে শিক্ষা সমাপন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। তাঁহার চিরসুহৃৎ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত কবিতায় প্রবাস-প্রত্যাগত বন্ধুকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন :—

সাধিয়ে অসাধ্য কাজ, সুযশে ভূষিত,
হয়ে আজ পুনঃ বঙ্গে হইলে উদিত!
কি দিব তোমারে মোরা দীনহীন বেশে,
দীন হীন হয়ে আছি দুখিনীর দেশে।
দুঃখিনী জনমভূমি প্রাণের সন্তান
দিলেন তোমারে পুনঃ নিজ কোলে স্থান।
তোমার সুযশ শুনি আজি ঘরে ঘরে,
রত্নগর্ভা বঙ্গভূমি বলে নারী নরে।
ধন্য তুমি, যার নামে উজ্জল ভবন,
দেশের গৌরব তুমি অমূল্য রতন।
বাড়ালে দেশের মান তুমি যে প্রকার
তার মত বঙ্গবাসী কিবা উপহার
দিতে পারে? তাই বলি, হৃদয় খুলিয়া
ঘরে এস বন্ধুবর! লই হে বরিয়া।
ঘরে এস, জন্মদুঃখী বঙ্গের রতন,
যা আছে তোমারে সব করি সমর্পণ।
কি আছে? হৃদয় আছে, আছে আলিঙ্গন,
দিব তাহা। অশ্রু আছে করি বিসর্জ্জন।

ময়মনসিংহ অবস্থান কালে আনন্দমোহন বসু মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স অতি অল্প। ইহার পর তিনি যখন শিক্ষালাভের উদ্দেশে কলিকাতা নগরীতে আগমন করেন, তখন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় নবানুরাগে উদ্দীপ্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। তরুণ যুবক আনন্দমোহন কলিকাতায় আসিয়া বহ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় এই ধর্ম্মের অগ্নিশিখায় আপনাকে আহুতি দেন এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই ভাদ্র পূজ্যপাদ আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ অপর বিংশ জনের সহিত আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকটে পবিত্র ধর্ম্ম দীক্ষা গ্রহণ করেন। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহা অনুশাসন তাঁহার জীবনে যেমন শক্তি বিস্তার করিয়াছিল, তদ্রূপ অন্যত্র দেখি নাই। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের সামঞ্জসীভূত মিলন, যাহা ব্রাহ্মের উচ্চতম লক্ষ্য, তাহা ইঁহার জীবনে সত্য হইয়াছিল। মানবজীবনের গাম্ভীর্য্য এমন প্রগাঢ়রূপে উপলব্ধি করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি এই জীবন যে কি পবিত্র ও গম্ভীর নয়নে দেখিতেন, এবং ইহার প্রতি মুহূর্ত্ত ও শক্তি কিরূপ সতর্কতা ও নিষ্ঠা সহকারে ব্যয় করিতেন, তাহা যিনি তাঁহার সহিত একত্র বাস না করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সম্যক্ ধারণা করা সম্ভব নহে। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত তিনি আত্মোন্নতি সাধন এবং ঈশ্বর ও মানব-সেবায় অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। যদি বলি, যে পাঁচ মিনিট কাল তাঁহাকে অসার গল্প, লঘু ব্যাপার, বৃথা আমোদ বা আলস্যে কাটাইতে দেখি নাই, তবে যাঁহারা তাঁহার দৈনন্দিন জীবন দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন, ইহা আমার অত্যুক্তি নহে। যে দুরন্ত রোগে তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে জীবনের শেষ দেড় বৎসর চিকিৎসকের আদেশে সর্ব্ব কর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া তাঁহাকে অধিকাংশ সময় শয্যাশায়ী থাকিতে হইয়াছিল। তিনি রোগের যাতনা অম্লান বদনে অপরিসীম ধৈর্য্য সহকারে বহন করিতেন, কিন্তু নিষ্কর্ম্ম জীবনের বোঝা তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইত। শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া বালকের ন্যায় অধীর ভাবে ইহা বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেন, "এরূপ ভাবে দিন কাটাইতে হইবে ইহাই যদি চিকিৎসকের আদেশ, তবে আর কেন? ইহলোক হইতে ত্বরায় আমায় বিদায় দাও।" বাস্তবিক সময় অপব্যয় করিতে তিনি এমনই অবর্ণনীয় যাতনা অনুভব করিতেন।

আমরা আনন্দমোহন বসুকে তিন ভাবে দেখিয়াছি, স্বদেশসেবক, জ্ঞানান্বেষী ও ঋষি। ভারতের সর্ব্বত্র তিনি স্বদেশসেবক বলিয়া পরিচিত আছেন। সকলে ইঁহাকে বর্ত্তমান সময়ে দেশের রাজনৈতিক যুগপ্রবর্ত্তকগণের মধ্যে এক জন বলিয়া জানেন। কিন্তু অপর সকলের স্বদেশপ্রীতির সহিত ইঁহার স্বদেশানুরাগের কিছু বিশেষত্ব আছে। ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ ইঁহার মনশ্চক্ষে যেমন উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, তদ্রূপ আর

কাহারও নয়নে হইয়াছিল কি না জানি না। কঠোর সাধনায় যে সর্ব্বতোমুখীন ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উচ্চ জীবন তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই আলোকে তিনি দেখিয়াছিলেন যে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক এই ত্রিবিধ উন্নতিতে ভারতের কল্যাণ; ইহার কোনটী ত্যাগ করিলে আমাদের মঙ্গল নাই। ব্যক্তিগত জীবনে আমরা বলিতে পারি, যে আনন্দমোহন বসুতে বর্ত্তমান ভারতবাসীর জীবনের পূর্ণতম বিকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জাতীয় জীবনে যে সমুদয় আকাঙ্ক্ষা উত্থিত হইতেছে, তাঁহাতে সে সমুদয়ের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। এই বিষয়ে তিনি যুগ-প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়েরই যোগ্য বংশধর। সমসাময়িক ভারত-ইতিহাসে এই জন্য তিনি আদর্শ চরিত্ররূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার স্বদেশসেবা তাঁহার ধর্ম্মেরই অঙ্গ ছিল। উহা সঙ্কীর্ণ বা একমুখীন ছিল না, কিন্তু সর্ব্বতোমুখী ও উদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলন তাঁহার নিকট অবসর সময়ের ক্রীড়া বা খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের সুলভ উপায় অথবা নীতিনিরপেক্ষ বাগ্‌যুদ্ধ ছিলনা। দেশের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য সমুদয় প্রয়াস তিনি গভীর নিষ্ঠা ও প্রগাঢ় ভক্তিভরে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার নিকট রাজনৈতিক আন্দোলন পবিত্র ঈশ্বর পূজার অন্যতম আকার ধারণ করিয়াছিল। এ বিষয়ে তিনি ইটালীয় স্বদেশসেবক ঋষিবর ম্যাটসিনির অনুরূপ ছিলেন। মান্দ্রাজ জাতীয় মহাসমিতিতে সভাপতিরূপে বৃত হইয়া তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া এক জন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ বলিয়াছিলেন, "ইনি বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবেন।"* তাঁহার বক্তৃতাতে অবশ্য ব্রাহ্মসমাজের কোন কথা ছিল না; কিন্তু উহাতে এমন অবর্ণনীয় গাম্ভীর্য্য, এমন একাগ্র নিষ্ঠা ও স্বদেশসেবার এমন উন্নত ও উদার আদর্শ ছিল, যাহা সেই সম্ভ্রান্ত ইংরাজের মতে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন আর কাহারও মনে প্রতিভাত হওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা যাহাকে সাত্ত্বিক প্রকৃতি বলিয়াছেন, আনন্দমোহনের প্রকৃতি সেই শ্রেণীর ছিল। যাঁহাদের কথা স্মরণ করিয়া মহর্ষি ঈশা বলিয়াছিলেন, "দীনাত্মারা ধন্য", আনন্দমোহন সেই শ্রেণীর দীনাত্মা ছিলেন। বিনয়, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, নম্রতা, ভক্তিপ্রবণতা ও ঐহিকসুখে নিস্পৃহতা তাঁহার আত্মার ভূষণ ছিল। সাধারণতঃ ঐহিক সম্পদ ও জীবনের অবিচ্ছিন্ন সুখলাভের সঙ্গে সঙ্গে মানবমনে অলক্ষ্যে এক প্রকার তেজের আবির্ভাব হয়, যাহাকে আমাদের দেশে রাজসিক ভাব বলে। আনন্দমোহন বিধাতার আশীর্ব্বাদে মানব জীবনের স্পৃহনীয় সমুদয় সম্পদ ও উহার সকল শ্রেষ্ঠ সুখ অজস্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু রাজসিকতা তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত সৌম্যমূর্ত্তিতে রেখামাত্র পাত করিতে পারে নাই। তাঁহার কথাবার্ত্তা, তাঁহার আচার ব্যবহার, তাঁহার ভাবভঙ্গী, সমুদয় সুশোভন মধুর বিনয়ে চিরঅলঙ্কৃত ছিল। দীনতম ব্যক্তিও তাঁহার নিকট সম্ভ্রম ও সমাদর প্রাপ্ত হইত। অতি বিরক্তি ও উত্তেজনার মুহূর্ত্তেও তাঁহার মুখ হইতে রূঢ় কথা বাহির হইতে শুনি নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাতে তেজের অভাব ছিল না। অন্যায়ের প্রতিবাদে ও উৎপীড়নের দমনে তাঁহার স্বভাবধীর সৌম্য মূর্ত্তিতে নিমেষমধ্যে ভীমের বল ও সিংহের তেজ যুগপৎ আবির্ভূত হইত। এইরূপ বিবিধ বিরোধী গুণের সমবায়ে তাঁহার উচ্চ চরিত্র গঠিত হইয়াছিল।

সারা জীবন তিনি বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত তাহাতেই লিপ্ত ছিল না। রাজনৈতিক ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন ও তদুৎপন্ন ঘাত প্রতিঘাত সাধারণতঃ মানবকে গভীরতাশূন্য ও বহির্ম্মুখীন করিয়া তোলে, কিন্তু আনন্দমোহন কার্য্যের স্রোতে পড়িয়া কোন দিন তাহার খর প্রবাহে ভাসিয়া যান নাই। তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ব্রত অক্ষুণ্ণভাবে পালন করিয়াছেন, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, বাহিরে প্রভূত যশ ও উত্তেজনার মাদকতার মধ্যে এবং রাজনৈতিক আন্দোলন ও সমাজ-

* আমি কংগ্রেসের কয়েকটি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। কোনটিতেই সভাপতির বক্তৃতা শুনিয়া কাহাকেও অশ্রুপাত করিতে দেখি নাই। কিন্তু মান্দ্রাজে স্বর্গীয় বসুমহাশয়ের প্রথম ও শেষ বক্তৃতায়, বিশেষতঃ শেষ বক্তৃতায়, শ্রোতৃবর্গ বাষ্পাকুললোচন হইয়াছিলেন। তিনি মান্দ্রাজের ব্রাহ্মসম্মিলনীতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আমরা কেহ কেহ উপস্থিত ছিলাম। তাই কংগ্রেস মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া আমাদিগকে বলিলেন, "আমি যাইতে পারি নাই; কিন্তু যাহা হউক, এখানেও (অর্থাৎ কংগ্রেসমণ্ডপেও) ব্রাহ্মসমাজের কিছু কার্য্য করিলাম।" শ্রীযুক্ত গোখলে কিছু দিন হইতে বলিতেছেন যে আমাদের স্বদেশহৈতষণাকে আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পূত ও উন্নত করিতে হইবে। স্বর্গীয় বসুমহাশয়ের স্বদেশানুরাগ আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ ছিল। প্রবাসী সম্পাদক।

সংস্কারের চির ঘূর্ণায়মান আবর্ত্তে চিরদিন বাস করিয়াছেন, কিন্তু এ সকলের জন্য কোন দিন ধর্ম্মের সাধনা হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। দীক্ষার দিন যে পবিত্র ধর্ম্মের টীকা তিনি ললাট পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার একাগ্র সাধনা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কৃপণের সুবর্ণরাশি রক্ষার ন্যায়, সাগ্নিক ব্রাহ্মণের আচারপূত দেহমনে পবিত্র অগ্নি রক্ষার ন্যায় চিরদিন সযত্নে পালন করিয়া গিয়াছেন। যতদিন শরীর সুস্থ ছিল, সারাদিনের দুরন্ত শ্রমের পর গভীর রাত্রি জাগিয়া জ্ঞানানুশীলন, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, তাহার আলোচনা ও ধ্যান ধারণা করিতেন। রাত্রি একটা বা দুইটার পূর্ব্বে তাঁহাকে শয়নাগারে প্রবেশ করিতে দেখি নাই। এই জন্য আমরা স্বদেশসেবক আনন্দমোহনের অন্তরালে ব্রাহ্মধর্ম্মের চির নবীন শিষ্য ও সাধক আনন্দমোহনকে নিত্য প্রত্যক্ষ করিতাম।

আরও গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিলে তাঁহার জীবনের স্থায়ী ভাব যে ঋষিত্ব, তাহা দর্শন করা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার মন বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়াও তাহার মধ্যে ছিল না। স্বভাবতঃ তাঁহার মন সুরম্য অট্টালিকা অপেক্ষা কুটীর, বিবিধ উপাদেয় ভোজ্যবস্তু অপেক্ষা হবিষ্যান্ন, এবং রাজা বা পদস্থ লোকের সঙ্গ অপেক্ষা তাঁহার ঈশ্বর-পিপাসু ধর্ম্মবন্ধুগণের সঙ্গ অধিক ভাল বাসিত। বৈরাগ্য তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ ছিল। প্রয়াস করিয়া স্বাভাবিক প্রবণতাকে সংযত করিয়া তাঁহাকে বাহ্য আড়ম্বর এবং মান ও খ্যাতির প্রখর দীপ্তির সমক্ষে আসিতে দেখিয়াছি। এ সকলের অপেক্ষা ভগবৎপ্রসঙ্গে পূরিত তপোবনের পর্ণকুটীরে বাস করিতে তাঁহার আত্মা সর্ব্বদা তৃষিত হইত। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার পূজ্যপাদ ধর্ম্মগুরু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। বাহিরের কেহ জানেন না তাঁহার আত্মা অনুক্ষণ কোন্ পুরে বাস করিত। আমি ইহা অনেকবার অনুভব করিয়াছি, যে এই পরিদৃশ্যমান জগতে তিনি যত সময় বাস করিতেন, ইহার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন যে জগৎ, তথায় তিনি ততোধিক সময় যাপন করিতেন। তাঁহার প্রাণের নিভৃত কন্দর হইতে ঈশ্বরপ্রীতির জলন্ত অগ্নি হোমশিখার ন্যায় অনুক্ষণ উর্দ্ধে উত্থিত হইত। ইহারই গুণে তিনি তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে যে বিমল বায়ুমণ্ডল প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার প্রভাব অপর আত্মার পক্ষে কিরূপ স্বাস্থ্যপ্রদ ছিল, যাঁহারা তন্মধ্যে বাস করিয়াছিলেন কেবল তাঁহারাই তাহা জানেন। ঋষিত্ব যদি জটাজূটধারণ, বিভূতি লেপন, ফল মূল ভক্ষণ ও অরণ্যবাসের নামান্তর না হইয়া অনুক্ষণ ঈশ্বরে অর্পিত আত্মার শান্ত ও সমাহিত অবস্থা হয়, তবে আমাদের প্রিয়তম ভ্রাতা সর্ব্বাংশে সেই স্পৃহনীয় উপাধির যোগ্য ছিলেন। আপনার রুচি ও ইচ্ছা অনুসারে বাস করিবার সুবিধা পাইলেই তিনি ঋষির আচারে বাস করিতেন। এ নিয়মের অন্যথা তিনি কখনই হইতে দেন নাই।

১৮৯৮ খৃঃঅব্দে তিনি শেষ বার ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার অভিনন্দন উদ্দেশে কলিকাতা টাউন হলে ১৬ই সেপ্টেম্বর যে মহতী সভা আহুত হয়, তাহাতে উত্তর দিতে গিয়া তিনি সহসা মূর্চ্ছিত হন। তাঁহার সাংঘাতিক ব্যাধির এই প্রথম প্রকাশ। ইহার পরবর্ত্তী আট বৎসর তাঁহাকে বহুবার জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে পতিত হইতে হইয়াছে। এই ঘটনার পর হইতে তিনি পরলোক-প্রস্থানের জন্য দ্রুত প্রস্তুত হইতেছিলেন। বিগত ১৯০১ খৃঃঅব্দে কলিকাতা মহানগরীতে জাতীয় মহাসমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে যাইবার সময় জাতীয় মহাসভায় এই শেষ যোগদান বলিয়া পরিবারস্থ সকলকে সঙ্গে লইতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। বিগত ১৯০৫ খৃঃঅব্দের ১১ই মাঘ প্রভাত হইতে রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত ব্রহ্মোৎসবে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। রোগভগ্ন শরীরে এত দীর্ঘ সময় উৎসব ক্ষেত্রে থাকিলে পীড়া বৃদ্ধি পাইবে, পরিজন এই আশঙ্কা প্রকাশ করিলে উত্তর করিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে মাঘের উৎসব সম্ভোগ, এই আমার শেষ, ইহার জন্য প্রাণ গেলে ক্ষতি কি?" তৎপর দিন ১২ই মাঘ পীড়া সঙ্কটভাব ধারণ করিল, প্রলাপ অবস্থায় কেবল এই কথা, "মা আমায় ডাকিতেছেন, আমায় আর এখানে ধরিয়া রাখিও না।" সেই বর্ষের ১৬ই অক্টোবরের স্মরণীয় দিনে অখণ্ড বঙ্গভবনের ভিত্তি স্থাপন উদ্দেশে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে পরিবারস্থ সকলের নিকট সস্নেহে বিদায় লইলেন। মৃত্যুর এক মাস পূর্ব্বে যাহা করিয়াছেন, যাহা বলিয়াছেন, সমুদয় অন্তিম দিন নিকটবর্ত্তী স্মরণ করিয়া করিয়াছেন। মৃত্যুর জন্য এমন দিনে দিনে পলে পলে প্রস্তুত হইতে আমি কাহাকেও দেখি নাই।

বিগত ১৮ই আগষ্ট রাত্রিতে যথারীতি ভোজন করিলেন, তাহার পর পরিজন সকলের সহিত সার্দ্ধ দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রফুল্ল মনে কথাবার্ত্তা কহিলেন। পত্নীর নিকট জীবনের ভ্রম প্রমাদ ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা চাহিলেন। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমার মৃত্যু হইলেই তুমি সুরেন্দ্রনাথকে সর্ব্বাগ্রে টেলিগ্রাম করিও।" ইহাই তাঁহার শেষ কথা। পর দিন প্রভাত হইলে দেখা গেল, তাঁহার সংজ্ঞা নাই। তিনি আমাদের অনেকবার বলিতেন, "প্রগাঢ় শান্তিতে আমি পৃথিবী হইতে বিদায় লইব।" তাহাই হইল। ২০এ আগষ্ট সোমবার সন্ধ্যা সার্দ্ধ ছয় ঘটিকার সময় সূর্য্যের শেষ জ্যোতির সহিত তাঁহার আত্মাকে যখন ধীরে ধীরে এ জগতে অস্তমিত হইতে দেখিলাম, তখন শোক স্তম্ভিত মন মথিত করিয়া এই প্রশ্ন উদিত হইল, "এই কি মরণ?" তাহার পর,

জগত জননী, লহ লহ কোলে,
বিরাম মাগিছে, শ্রান্ত শিশু এ,
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি,
জুড়াও তাহারে, স্নেহ বরষিয়ে।

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্ত।

ইনি যশোহর জেলার অন্তর্গত ইতিনাগ্রামে অনুমান ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺নীলমণি গুপ্ত। পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব এবং বেহারের অকৃত্রিম সুহৃৎ স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহোদয় ইঁহার মাসতুতো ভাই ছিলেন। স্বর্গীয় সেন মহাশয় গুপ্ত মহাশয়ের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন এবং আজীবন গুপ্ত মহাশয়কে অগ্রজ সহোদরের ন্যায় ভক্তি করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্ত মহাশয় বাল্যকালে ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যৌবনকালে তিনি কলিকাতায় কর্ম্মোপলক্ষে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। সে সময়ে স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মমন্দিরে তিনি সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। তৎপরে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রের সমাজের সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। অদ্যাপি উক্ত সমাজদ্বয়ের প্রাচীনদিগের সহিত তাঁহার ভালবাসার বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইয়া যায় নাই।



শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্ত।

গুপ্ত মহাশয় যে কয়খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার মধ্যে হেমপ্রভা, বিক্রমোর্ব্বশী ও ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র এই তিনখানির নাম উল্লেখ-যোগ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি তৎকালীন মাসিক পত্রিকাদিতেও লিখিতেন। ভাস্কর, সোমপ্রকাশ, প্রভাকর ও পরিদর্শকে তাঁহার অনেক রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার "হেমপ্রভা" সম্ভবতঃ ১২৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক লিখিয়া তিনি তৎকালীন Vernacular Literature Society (দেশীয় সাহিত্য সভা) হইতে পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ১২৬৮ সালে তাহার "বিক্রমোর্ব্বশী" মুদ্রিত হয়। ইহা মহাকবি কালিদাস রচিত বিক্রমোর্ব্বশী অবলম্বনে লিখিত। ইহার পূর্ব্বে আর কেহ উক্ত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন নাই। ইহা পাঠ করিতে করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা বলিয়া ভ্রম হয়। গুপ্ত মহাশয়ের শেষ রচনা "ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র"। উহা ১২৭০ সালে মুদ্রিত হয়। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই অমর কবি মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। তখনও নব-প্রবর্ত্তিত ছন্দ সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা চলিতেছিল। সেই সময়েই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এই ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র প্রকাশিত হয়। মধুসূদন গুপ্ত মহাশয়ের রচনায় সমধিক প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিশেষ উৎসাহ দান করেন। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ভগবৎসম্বন্ধীয় এমন সুন্দর কবিতা রচিত হইয়াছিল ইহা ভাবিলেও আমরা বিস্মিত হই। পাঠকপাঠিকাগণের অবগতির নিমিত্ত আমরা উহার কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"——————কার না জুড়ায়
প্রাণ, শুনি প্রভাতী মঙ্গল, গায় যবে

পাখীদল মিলি একতানে মঞ্জুকুঞ্জ-
বনে,—কেনা ভাসে আনন্দের স্রোতে ?"

* * * *

"এ শান্ত সময়ে নাথ, কে পারে থাকিতে
ভুলিয়া তোমায় ? তব আনন্দ-কাননে
করিয়া বসতি, কেবা ভুলিবে তোমারে ?
তুমি শান্তি-নিকেতন, হৃদয়ের ধন
অমূল্য রতন, চিরপ্রীতি প্রস্রবণ—
তুমি চিত্ত-বিনোদন, মানস-রঞ্জন !"

অন্যত্র—

"এই দিবাকর করে নিখিল ভুবন
হইয়াছে যেইরূপ আলোকিত এবে
কত শত আত্মা হইয়াছে সেইরূপ
তোমার কিরণে জ্যোতিষ্মান্ ; জ্ঞাননেত্রে
দেখিয়া তোমার জ্যোতি অন্তরে বাহিরে
পরিতৃপ্ত হইতেছে কত পুণ্যবান্ ;—
প্রেমভরে ঝরিতেছে অশ্রু-অবিরল—
আর্দ্রীকৃত হইয়াছে কোমল হৃদয়।"

সায়ংস্তোত্র হইতে স্থান বিশেষ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না

"দেখিতে দেখিতে তারা-রতনে শোভিল
গগন প্রাঙ্গণ, কিবা দৃশ্য মনোহর !
বৃক্ষের আড়ালে ঐ দেখা দিল শশী
পূর্ণ ষোল কলা, দিগ্‌বলয় হাসিলা-
ফুটিলা শশাঙ্কবধূ সরসী সলিলে
ভুবন শোভিল চারু কনক রঞ্জনে।"

* * * *

"বনস্পতি পরিধিলা জোনাকির হার।
নিরখি এ সন্ধ্যা শোভা মানস রঞ্জন,
আর্দ্রিল হৃদয় হায় আহ্লাদ সলিলে
হে নাথ, হে বিশ্বশোভা ! তোমার নিপুণ
লেখনী লিখিত অনুপম বিশ্বশোভা
নিরখি ভুলিল আঁখি—হইনু অবাক্
অনুপম রূপ তব ভুবন-মোহন !"

* * * *

"ওরূপ আকর হ'তে পাইয়াছে প্রভা
প্রভাকর—মনোহর রূপ ঘনশ্রেণী
কুসুম সাগর, গিরি নদ মেঘমালা
মনোহর রূপ পাইয়াছে সুধানিধি।
না জানি তুমি হে নাথ কতই সুন্দর !"

পাঠকগণ রচনাকাল স্মরণ রাখিয়া উক্ত কয় পংক্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন। গুপ্ত মহাশয় এক্ষণে জীবনের সন্ধ্যাকালে উপনীত হইয়াছেন। বেহারের প্রধান নগর বাঁকিপুর—যেখানে তাঁহার অনুজ স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহোদয় সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তদীয় অগ্রজ সেই বাঁকিপুরেই বহুদিন হইতে বাস করিতেছেন। তাঁহার দুই পুত্র কর্ম্মোপলক্ষে বাঁকিপুরেই বাস করিয়াছেন। স্বদেশী প্রচারের নিমিত্ত বৎসরাধিক কাল হইল ইঁহারা দশ সহস্র মুদ্রা মূলধনের একটী স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন।

স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হইলেও গুপ্ত মহাশয় বাংলা সাহিত্যের সংবাদ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন এবং ঘটনাক্রমে কোনও নবীন লেখককে নিকটে পাইলে তাঁহার সহিত সাহিত্যালোচনায় হৃদয়ে গভীর আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রসশোষণ।

উদ্ভিদ মাটি হইতে কি প্রকারে রসশোষণ করিয়া, তাহার শাখাপত্র ও পুষ্পফলাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সেই রসের সঞ্চার করে, তাহা জানিবার জন্য গত শতাব্দীতে অনেক পরীক্ষাদি হইয়া গেছে; কিন্তু বিষয়টার গোল সেই চেষ্টাতে মিটে নাই। বরং ঐ সকল গবেষণার ফলে বহু মতবাদের সৃষ্টি হওয়ায়, উহার জটিলতা আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। সত্য সংগ্রহের জন্য গ্রন্থ খুঁজিলে পদে পদে নানা উল্টা পাল্টা কথায়, অনুসন্ধিৎসু বেচারার মাথা ঘুরিয়া যায়। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় উদ্ভিদের রস শোষণ ব্যাপারের উপর যে এক নূতন আলোকপাত করিয়া গোড়ার কার্য্য দেখাইয়াছেন, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারি আলোচনা করিব।

ষ্ট্রাস্‌বর্গার (Strasburger) ও পেফের (Pfeffer) দু'জনেই খুব নামজাদা উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোন বিষয় জানিতে হইলে, আজকাল তাঁহাদেরি গ্রন্থ নাড়া-চাড়া করা হইয়া থাকে। ইঁহাদের রচিত পুস্তকে রসশোষণের অনেকগুলি ব্যাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমেই ইঁহারা বায়ুর চাপের (atmospheric pressure) কথা উত্থাপন করিয়াছেন। পাঠক অবশ্যই জানেন, আমাদের পৃথিবীর উপর যে পঞ্চাশ যাইট মাইল গভীর এক বায়ুমণ্ডল আছে, তাহা সর্ব্বদাই ভূপৃষ্ঠের উপর কাজ করিতেছে। মাছ যেমন তাহার দেহের উপরকার জলের ভার অনুভব

না করিয়া জলের ভিতর অনায়াসে চলাফেরা করে, আমরাও সেই প্রকার সহসা বায়ুর চাপ বুঝিতে পারি না। কারণ কোন জিনিসের উপরকার বায়ু যে চাপ দেয়, নীচেকার বায়ু অবিকল সেই প্রকার চাপ দিয়া জিনিসটাকে সাম্যাবস্থায় রাখিয়া দেয়। যখন আমরা বায়ুশূন্য স্থান লইয়া পরীক্ষা করি, তখনই আমরা বায়ুর চাপ বুঝিতে পারি। কোন পাত্র হইতে বায়ু বাহির করিয়া পাত্রটির মুখ জলে ডুবাইয়া রাখ; দেখিবে পাত্রের ভিতর আপনা হইতেই জল প্রবেশ করিতেছে। এখানে পাত্রের বাহিরের জলের উপর যে প্রকাণ্ড বায়ুর চাপ পড়িতেছে, তাহাই জলকে শূন্য পাত্রের ভিতর ঠেলিয়া তুলে। উদ্ভিদের জলশোষণ প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, সূর্য্যতাপে যখন গাছের রস পাতার উপর দিয়া বাষ্পীভূত হইতে আরম্ভ হয়, তখন গাছের ভিতরটা শূন্য হইয়া পড়ে। কাজেই তখন বায়ুর চাপে মাটির রস মূল দিয়া সেই শূন্য স্থান অধিকার করিবার জন্য উপরে উঠিতে থাকে, এবং তাহাই গাছকে সরস রাখে।

আচার্য্য বসু মহাশয় রসশোষণের এই ব্যাখ্যানটিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বায়ুর চাপ খুব প্রকাণ্ড হইলেও তাহার একটা সীমা আছে। সাধারণতঃ তাহা ত্রিশ ইঞ্চি গভীর পারদ বা ৩৪ ফুট উচ্চ জলকে উপরে ঠেলিয়া রাখিতে পারে। আচার্য্য বসু মহাশয় বলিতেছেন, বায়ুর চাপ গাছের রসশোষণের কারণ হইলে, আমরা কেবল ৩৪ ফুট পর্য্যন্ত গাছকে সরস দেখিতাম। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ গাছ আমরা ত প্রতিদিনই দেখিতে পাই; সুতরাং বায়ুর চাপ দ্বারা যে শিকড় দিয়া জল উপরে উঠে, তাহা বলা যায় না; অন্ততঃ এটা কোনক্রমেই জলশোষণের মূল কারণ নয়।

রসশোষণের দ্বিতীয় ব্যাখ্যান,—কৈশিকাকর্ষণ (capillarity)। পাঠক বোধ হয় জানেন, খুব সরু নল জলে ডুবাইলে, নলের ভিতর দিয়া জল অনেকটা উপরে উঠিয়া দাঁড়ায়। কাপড়ের এক অংশ জলে ডুবাইলে, পাত্রের জল আপনা হইতেই উঠিয়া উপরকার শুষ্ক অংশকে ভিজাইয়া দেয়। এই ব্যাপারটাও কৈশিকাকর্ষণের ফল। এখানে কাপড়ের সূতার সরু আঁশ গুলি পরস্পরের গায়ে লাগালাগি থাকিয়া সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট নলের ন্যায় কার্য্য করে। কাজেই সেই সকল নলাকার সূতার ভিতর দিয়া জল উঠিয়া কাপড়খানিকে ভিজাইয়া দিতে পারে।

গাছের রসশোষণ ব্যাপারেও বৈজ্ঞানিকগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ব্যাখ্যান দিয়া থাকেন। ইহাঁরা বলেন,—শিকড় মাটির সরস স্থানে ডুবান থাকে, এবং গাছের ভিতরে ছিদ্রেরও অভাব নাই; কাজেই কাপড়ের এক অংশ জলে ডুবাইলে যেমন পাত্রের জল সূতা বাহিয়া তাহার অনেকটাকে ভিজাইয়া ফেলে, এখানেও সেই প্রকার মাটির রস শিকড় দ্বারা গাছের আঁশ বাহিয়া উঠিয়া গাছকে সরস রাখে।

আচার্য্য বসু মহাশয় ঐ ব্যাখ্যানেও আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—কৈশিকাকর্ষণে রস ঊর্দ্ধগামী হয় সত্য, কিন্তু তাহারো একটা সীমা আছে। কৈশিকাকর্ষণ দ্বারা পঞ্চাশ ষাইট হাত উচ্চ স্থানে জল উঠিতেছে, এ প্রকার ব্যাপার কখনই দেখা যায় নাই। সুতরাং কৈশিকাকর্ষণ দ্বারা যে গাছের সরসতা রক্ষা হয়, এ কথা স্বীকার করা যায় না।

অন্তঃপ্রবাহ (Osmotic action) রসশোষণের আর একটি ব্যাখ্যান। চর্ম্মের থলিতে চিনির রস বা অপর কোনও গাঢ় জিনিস আবদ্ধ রাখিয়া, থলিটিকে জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখ। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, থলিতে বাহিরের জল প্রবেশ করিয়া সেটাকে ফুলাইয়া তুলিয়াছে। কেবল চিনির রস বলিয়া নহে, কোন দুই তরল পদার্থের ঘনতার পার্থক্য থাকিলে, সকল সময়েই তাহারা মধ্যের ব্যবধান ভেদ করিয়া মেশামিশি করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণ তরল পদার্থের এই ধর্ম্মটিকে অবলম্বন করিয়া বলেন,—গাছের ভিতরকার রস মাটির রস অপেক্ষা গাঢ়; কাজেই শিকড়ের সচ্ছিদ্র ব্যবধান ভেদ করিয়া ঐ অন্তঃপ্রবাহ দ্বারাই গাছের দেহে রস প্রবেশ করিয়া থাকে।

আচার্য্য বসু মহাশয় উল্লিখিত ব্যাখ্যানটিতেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন,—অন্তঃপ্রবাহে পাত্‌লা ও গাঢ় তরল পদার্থ মিশিবার চেষ্টা করে সত্য, কিন্তু এই মিশামিশি সাধারণতঃ এত ধীরে ধীরে চলিয়া থাকে যে, তাহাকে কোন ক্রমে গাছের রসশোষণের মূল কারণ বলা যায় না।

এই সকল ব্যাখ্যান ব্যতীত মূলের চাপ (Root-pressure) ইত্যাদি কতকগুলি শব্দ গঠন করিয়া উদ্ভিদ্‌-তত্ত্ববিদ্‌গণ রসশোষণ ব্যাপার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ মূলের চাপ ইত্যাদি কথাগুলির যে প্রকৃত অর্থ কি তাহা কোন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌ই পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারেন না। সুতরাং ঐ সকল কাল্পনিক বিষয় লইয়া আলোচনা বৃথা।

জলি ও ডিক্‌সন্ (Jolly & Dixon) উভয়েই বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্। রসশোষণ সম্বন্ধে সম্প্রতি ইঁহাদের এক মত প্রচারিত হইয়াছে। এই মতে, সূর্য্যতাপে পাতার বিশেষ বিশেষ কোষের (mesoplyl Cells) জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হওয়াকেই রসশোষণের মূল কারণ হইয়াছে। কারণ এ স্থলে কোষস্থ জল বাষ্পাভূত হইলে, তাহার ভিতরকার রস গাঢ়তর হইয়া পড়ে এবং অন্তঃপ্রবাহের নিয়ম অনুসারে বৃক্ষ-দেহস্থ স্বল্প গাঢ় রস কোষে প্রবেশ করিতে আরম্ভ হয়। কাজেই ইহাতে একটা রসপ্রবাহ মূল হইতে উপরের দিকে চলিতে থাকে।

আচার্য্য বসু এই মতবাদটির বিরুদ্ধেও দাঁড়াইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—পূর্ব্বোক্ত কথা সত্য হইলে, গাছের পাতা হইতে রসের উদ্গমন বন্ধ থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে রসশোষণও বন্ধ থাকা উচিত। কিন্তু পরীক্ষায় তাহার বিপরীত কার্য্যই দেখা যায়, সুতরাং অন্তঃপ্রবাহের মৃদু কার্য্যকে কখনই রসপ্রবাহের সূচক বলা যায় না। তা ছাড়া অবস্থা বিশেষে বসু মহাশয় অন্তঃপ্রবাহের ঠিক্ বিপরীত কার্য্য (অর্থাৎ গাঢ়তর জিনিস হইতে পাৎলার দিকে প্রবাহ) সকল গাছেই দেখাইয়াছেন। কাজেই ডিক্‌সনের মতবাদটিকে কখনই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

রসশোষণের প্রচলিত মতবাদগুলি যে কত ভ্রমপূর্ণ, পাঠক পূর্ব্ববিবৃত বাদ প্রতিবাদ হইতে কতকটা জানিতে পারিবেন। পেফের প্রভৃতি উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণও ইদানীং তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। ইনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থের (Physiology of Plant) একস্থলে স্পষ্টই বলিয়াছেন, —"উদ্ভিদের রসশোষণ ব্যাপারের যিনি যতই মতবাদ প্রচার করুন না কেন, অদ্যাপি ইহাকে জীববিজ্ঞানের একটি অমীমাংসিত তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। নানা মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াও বিষয়টির অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান আজও পাই নাই,—কাজেই আপাততঃ এই ব্যাপারটিকে গাছের জীবনীশক্তিরই কোন প্রকার কার্য্য বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই।"

পেফের সাহেবের উল্লিখিত মতটি প্রচারিত হওয়ার পর রসশোষণ ও বৃক্ষের কোষের কার্য্য লইয়া ষ্ট্রাস্‌বর্গার সাহেব গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ইহার ফলে কোষের সক্রিয়তার সহিত রসশোষণের কোন সম্বন্ধই দেখা যায় নাই। ইনি একটি পরীক্ষায় গাছের গুঁড়ির তলার কোষগুলিকে পোড়াইয়া নির্জীব করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি মূল হইতে শাখাপ্রশাখাদি ক্রমে মাটির রস গাছের সর্ব্বাঙ্গে কয়েকদিন ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তার পর তিনি গাছের কোন অংশ কাটিয়া তাহাতে তুঁতের জল ইত্যাদি বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও জলশোষণের কোনই বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই,—বিষমৃত কোষগুলির ভিতর দিয়া রস আপনা হইতেই উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে উদ্ভিদকোষের সক্রিয়তার উপর নির্ভর করিয়া পেফের সাহেব জলশোষণের যে ব্যাখ্যানের আভাস দিয়াছিলেন, এই সকল পরীক্ষায় বিশ্বাস করিলে, তাহা অমূলক হইয়া দাঁড়ায়। ষ্ট্রাস্‌বর্গার সাহেব তাঁহার স্বহস্তে কৃত পরীক্ষার ফলে অবাক্ হইয়া তাঁহার গ্রন্থের (Text-book of Botany) একস্থলে স্পষ্টই বলিয়াছেন,— গাছের জীবন্ত কোষগুলিরই যে কোন অজ্ঞাত কার্য্যকে রসশোষণের কারণ বলিয়া অনুমান করা হইতেছিল, তাহা আর এখন বিশ্বাস করা চলে না।

আচার্য্য বসু মহাশয় রসশোষণের কি ব্যাখ্যান প্রদান করেন এখন দেখা যাউক।

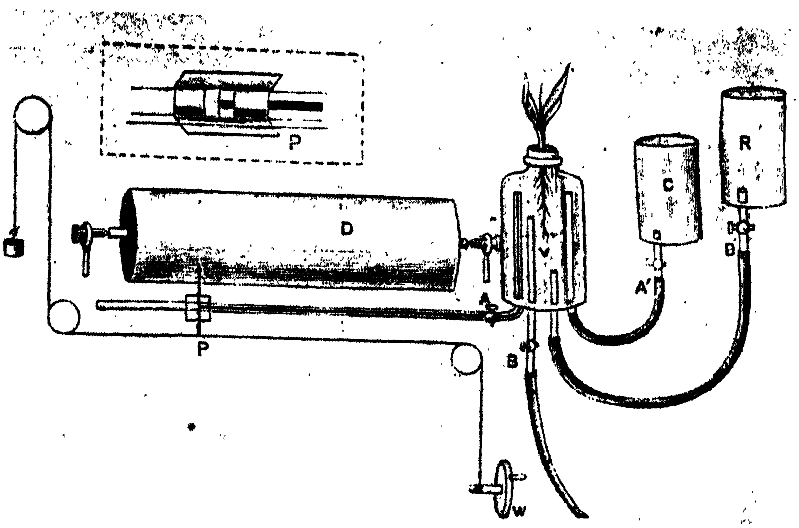
আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, গাছের কোন অঙ্গে কোন প্রকার প্রবল আঘাত দিলে, আহত স্থান হইতে বার বার উত্তেজনা চালিত হইয়া, গাছটিকে সাড়া দেওয়াইতে থাকে। ভূমি-আম্‌লা (Biophytum) ও বনচাঁড়াল (Desmodium) প্রভৃতি গাছে এই সাড়া পাতার পুনঃ পুনঃ উত্থান পতনে দেখা যায়, এবং অপর গাছে বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে

হয়। তা' ছাড়া ঐ প্রবন্ধে আরো বলা হইয়াছিল যে, যাহাকে আমরা গাছের স্বতঃসঞ্চলন (autonomous movements) বলি, তাহা ঐ পৌনঃপুনিক সাড়ারই রূপান্তর মাত্র। স্বতঃসঞ্চলনের জন্য সকল সময় বাহির হইতে আঘাত দিবার আবশ্যক হয় না; গাছপালার উপর স্বভাবতঃই তাপালোকের যে আঘাত পড়িতেছে, তাহাই অনেক সময়ে কোষ হইতে কোষান্তরে রসচালনা করিয়া স্বতঃসঞ্চলন সুরু করাইয়া দেয়। এখন মনে করা যাউক, গাছের মূলদেশের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে যেন পৌনঃপুনিক সাড়া (Multiple response) সুরু হইয়াছে। সাড়া চলিতে আরম্ভ করিলেই প্রথমতঃ কোষ হইতে কোষান্তরে রসের চলাচল আরম্ভ হয়, এবং তৎপরে তাহাদের আণবিক বিকৃতি আসিয়া পড়ে। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে এবিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে গাছের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া, কোষপরম্পরায় রস চলিতে আরম্ভ করিলে, পিছনের কোষগুলির যে রসাভাব হইবে তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। পৌনঃপুনিক উত্তেজনার চলাচল হইতে উৎপন্ন কোষের এই শূন্যতার সাহায্যে আচার্য্য বসু মহাশয় রসশোষণের ব্যাখ্যান দিয়াছেন। ইনি বলিতেছেন,—কোষ রসশূন্য হইলেই নিকটস্থ সরস পদার্থ হইতে রসশোষণ করিয়া পুষ্ট হইবার জন্য, তাহাতে আপনা হইতেই এক শক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। মূলের চারিপার্শ্বের মাটিতে রসের অভাব নাই। সুতরাং যখন প্রত্যেক উত্তেজনার স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে মূলের নিকটবর্ত্তী কোষগুলি শূন্য হইয়া পড়িতেছে, তখন সেগুলি যে মৃত্তিকা হইতে রস শোষণ করিয়া পুষ্ট হইবে, এবং পরে উপরকার শূন্য কোষপরম্পরায় সেই রসকেই চালাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকিতে গাছের পৌনঃপুনিক সাড়া তাহার মূলদেশ হইতেই আরম্ভ হয় কেন? আচার্য্য বসু মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—মূল যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কঠিন মাটির ঘর্ষণে সেগুলি উত্তেজিত হইয়া পড়ে। তা' ছাড়া মাটিতে মিশ্রিত নানা রাসায়নিক পদার্থও মূলকে উত্তেজিত করে। কাজেই উত্তেজনার কেন্দ্রটা গাছের অপর অংশে না থাকিয়া মূলেই আসিয়া দাঁড়ায়, এবং তাহাতেই রস নীচের দিক্ হইতে তালে তালে উপরে উঠিতে আরম্ভ করে।

কোন গাছের ডাল কাটিয়া, তাহার কাটা প্রান্তটা জলে ডুবাইয়া রাখিলে, কাটা দিক্ হইতে উপরে জল উঠিতে দেখা যায়। আচার্য্য বসু মহাশয় ইহারো কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—এস্থলে কাটার আঘাতই উত্তেজনা সুরু করায়, এবং সেই অংশ হইতে উত্তেজনাটা তালে তালে পুনঃ পুনঃ উপর দিকে চলিয়া, সঙ্গে সঙ্গে জলকেও উপরে টানিতে আরম্ভ করে। আচার্য্য বসু মহাশয় গাছের ডগায় আঘাত দিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় আহত স্থানের রস উপর হইতে নীচের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

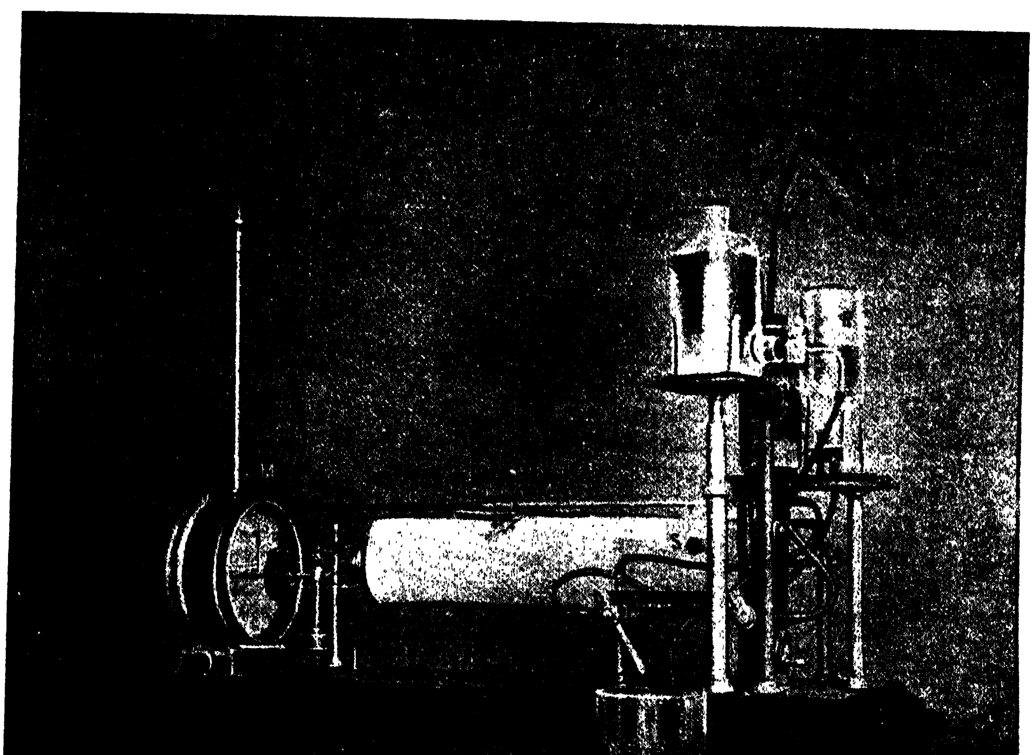
গাছের রসশোষণ-শক্তি সকল সময়ে সমান থাকে না। আঘাত উত্তেজনার মাত্রা অনুসারে এবং গাছের ভিতরকার সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ মত তাহার হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায়। তা' ছাড়া ঠাণ্ডা বা গরমের আধিক্য এবং গাছে প্রযুক্ত পদার্থের গুণেও শোষণের মাত্রার পরিবর্ত্তন হয়। রসশোষণের এই প্রকার অত্যল্প হ্রাস বৃদ্ধি বাহির হইতে বুঝা অসম্ভব, অথচ না বুঝিলেও তাহাদের গোড়ার খবর পাওয়া কঠিন। এপর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক রসশোষণের মাত্রা নির্ণয় করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। আচার্য্য বসু মহাশয় অতি অল্পদিনের চেষ্টায় "শোষণ-গ্রাফ্" নামক একটি সুন্দর যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া, রসশোষণ-পরিমাপ অতি সহজ করিয়া তুলিয়াছেন, এবং এই যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া তিনি যে সকল ফললাভ করিয়াছেন, তাহা অতি আশ্চর্য্যজনক। ইহা দ্বারা রসশোষণের পরিমাণ আপনা হইতেই কাগজে লিপিবদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং ভুল ভ্রান্তি হইবার আশঙ্কা মোটে থাকে না। পার্শ্বস্থ ১ম চিত্রটিতে শোষণগ্রাফ্ যন্ত্রের প্রধান প্রধান অংশের ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে, এবং দ্বিতীয় চিত্রখানি যন্ত্রের সম্পূর্ণ ছবি। ১ম চিত্রের "V" চিহ্নিত অংশ একটি জলপূর্ণ কাচের পাত্র। উহার মুখের ছিপির ভিতর দিয়া গাছ বা ডাল প্রবেশ করাইয়া, সেটি কি পরিমাণ জল শোষণ করে, তাহা দেখা হইয়া থাকে। পাত্রের নিম্নে "A" "B" এবং "A´" "B´" এই চারিটি নল সংযুক্ত আছে। "A´" নলের পেঁচ্



১ম চিত্র।

ঘুরাইলে পাত্রে ইচ্ছামত জল প্রবেশ করান যাইতে পারে, এবং "R" পাত্রে রাসায়নিক দ্রব্যমিশ্রিত জল রাখিবার

ব্যবস্থা আছে। ঐ জল "V" পাত্রে প্রবেশ করাইয়া গাছের জল শোষণের উপর তাহার প্রভাব নির্ণয় করা



২য় চিত্র।

হইয়া থাকে। "A" অংশটি একটি কাচের নল ব্যতীত আর কিছুই নয়। "V" পাত্র হইতে গাছ জল শোষণ করিলে, ঐ কাচের নলের ভিতরকার জল দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ করে। কত সময়ে উহা কতটা চলিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া গাছের জল শোষণের মাত্রা স্থির করা হয়।

চোখের দেখায় অনেক সময় নানা ভুল হইয়া পড়ে, এই জন্য কাচের নলের জলটা কত সময়ে কত সরিয়া যায় তাহা নির্ভুলরূপে স্থির করিবার জন্য, আচার্য্য বসু মহাশয় যন্ত্রটির এক অংশে একটা সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। চিত্রের "P" চিহ্নিত অংশটি একটা পিত্তলনির্ম্মিত, অঙ্গুরীয়াকার জিনিস। নলের উপর দিয়া এটিকে বেশ সহজে টানিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই অঙ্গুরীয়তে একটি পেন্‌সিল সংযুক্ত থাকে, এবং যাহাতে পরীক্ষক সর্ব্বদাই পেন্‌সিলটিকে "A" নল-স্থিত জলের চলা ফেরার সহিত চালাইতে পারেন, তজ্জন্য "W" চিহ্নিত চাকা ও দড়ির ব্যবস্থা আছে। "D" একটি কাগজ মোড়া চোঙ্। এটি সর্ব্বদাই নিজের অক্ষ রেখার চারিদিকে ধীরে ধীরে ঘুরিতে থাকে এবং সেই পেন্‌সিলটি উহার গায়ে লাগিয়া থাকিয়া কাগজে দাগ কাটিতে থাকে।

মনে করা যাউক জলপূর্ণ "V" পাত্রটিতে যেন কোন গাছ নাই, এবং A^1, B ও B^1 এই তিনটি নলের পেঁচ্ বন্ধ আছে; কেবল "D" চিহ্নিত চোঙটি তাহার গায়ে জড়ান কাগজ পেন্‌সিলের মুখে রাখিয়া ক্রমাগত ঘুরিতেছে। "V" পাত্রে গাছ নাই, কাজেই উহার জলের শোষণও নাই। সুতরাং "P" চিহ্নিত নলের জল ও তৎসংলগ্ন পেন্‌সিলটি একস্থানেই দাঁড়াইয়া থাকিবে, এবং তাহার ফলে, চোঙের কাগজে একটা লম্বা রেখা অঙ্কিত হইয়া পড়িবে।

এখন মনে করা যাউক, পাত্রে গাছ প্রবেশ করান হইয়াছে, এবং জলশোষণও চলিতেছে। এস্থলে "A^1" চিহ্নিত নলের জল আর স্থির থাকিতে পারিবে না। জলশোষণের সহিত জলের গভীরতা কমিয়া যাওয়াতে, নলের জল দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ করিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পেন্সিলটিও সেই দিকে চলিবে। কাজে কাজেই তখন "D" চোঙে জড়ান কাগজে আর সরল রেখা অঙ্কিত না হইয়া স্পষ্টই একটি বক্র রেখা অঙ্কিত হইতে থাকিবে। এখন ঐ রেখা পরীক্ষা করিয়া জলশোষণের মাত্রা নির্ণয় করা কঠিন হয় না। কারণ জলশোষণ সমভাবে চলিলে রেখার বক্রতাও সমভাবে চলিবে, এবং কোন কারণে জলশোষণ হঠাৎ বৃদ্ধি পাইলে, রেখার বক্রতায় আর সে শৃঙ্খলা দেখা যাইবে না। তখন রেখাটিকে হঠাৎ যেন দাঁড়াইয়া উঠিতে দেখা যাইবে।

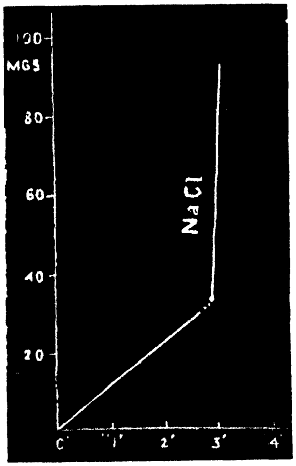
আচার্য্য বসু মহাশয় শোষণগ্রাফ যন্ত্র সাহায্যে উল্লিখিত প্রথায় ও আরো দু'টি পৃথক পদ্ধতিতে গাছের নানা অবস্থার শোষণশক্তি পরিমাপ করিয়াছেন। মূলের চাপ (Root-pressure) ও বায়ুর চাপ ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্য্যন্ত রসশোষণের যে সকল ব্যাখ্যান দিয়া আসিতেছিলেন, সেগুলি যে কত ভ্রমপূর্ণ, শোষণগ্রাফের দু' একটি পরীক্ষার ফল বিবৃত করিলে পাঠক বেশ বুঝিতে পারিবেন।

আচার্য্য বসু মহাশয় পাতা-বাহার গাছের (Croton) একটি পত্রশূন্য ডাল কাটিয়া শোষণগ্রাফে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন। ডালে পাতা ছিল না ও তাহার শিকড়ও ছিল না। সুতরাং প্রচলিত সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়,—এ স্থলে ডাল আর জলশোষণ করিতে পারিবে না। কিন্তু ডাক্তার বসু মহাশয় তাহার ঠিক বিপরীত কার্য্যই দেখাইয়াছিলেন,—ডালের কর্ত্তিত প্রান্ত দিয়া, প্রচুর জল উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কাজেই পাতা হইতে জলীয় বাষ্প উদ্গত হইলেই যে নীচেকার রস উপর দিকে চলিতে আরম্ভ করে, এ কথা আর বলা যায় না; এবং "মূলের চাপ" কথাটা যে নিতান্ত কাল্পনিক তাহাও ইহা হইতে বুঝা যায়। গাছের ভিতরকার কোষ ও অণুর উত্তেজনাই যে রসশোষণের মূল কারণ, এই পরীক্ষা দেখিয়া তাহা আর অস্বীকার করা যায় না।

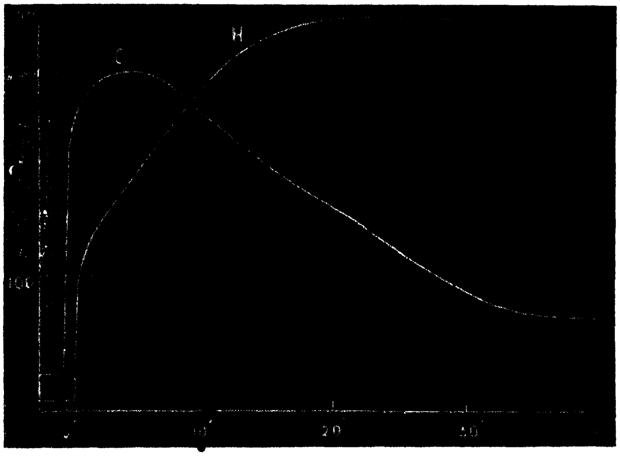
আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অন্তপ্রর্বাহকে (Osmotic-action) রসশোষণের একটি প্রধান কারণ বলিয়া বৈজ্ঞানিক গণ মানিয়া আসিতেছেন। এই বিশ্বাসও যে কত ভ্রমপূর্ণ তাহা আচার্য্য বসু মহাশয়ের একটি সহজ পরীক্ষা বিবৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব। অন্তপ্রর্বাহের নিয়মে যে দিকে রসচালনা হওয়া উচিত, আচার্য্য বসু মহাশয় কেবল উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া এই পরীক্ষায় বিপরীত দিকে রসচালনা দেখাইয়াছেন। লবণমিশ্রিত জল, এসিড ও

ক্ষারপদার্থের ন্যায় গাছকে উত্তেজিত করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে গাঢ়তার আধিক্য প্রযুক্ত গাছের ভিতরকার রসের সহিত ইহার অন্তপ্রর্বাহও চলে। আচার্য্য বসু মহাশয় লবণ মিশ্রিত জলদ্বারা শোষণগ্রাফের পাত্র পূর্ণ করিয়া, তাহাতে একটি গাছের ডালের কাটা প্রান্ত ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, অন্তপ্রর্বাহ জলশোষণের মূলকারণ হইলে, এ স্থলে ডালের তরল রস বাহির হইয়া গাঢ় লবণের জলের সহিত মিশিবারই কথা। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাহার বিপরীত ফল দেখা গিয়াছিল,—লবণ জলে ডুবান ডালের রসশোষণ অতি প্রবল ভাবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শোষণের মূল কারণ, ইহা অপেক্ষা তাহার আর কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতে পারে ?

নানাজাতীয় বিষ ও মাদক পদার্থ প্রয়োগে শোষণ-ক্রিয়া কি প্রকার চলে, আচার্য্য বসু মহাশয় তাঁহার শোষণ-গ্রাফ যন্ত্র দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। মাদক পদার্থ দ্বারা প্রাণিদেহের কার্য্য প্রায়ই হঠাৎ বৃদ্ধি পায়; এবং তার পরই তাহা কমিয়া আসে। আচার্য্য বসু মহাশয় রসশোষণেও সেই প্রকার কার্য্য দেখাইয়াছেন। নিম্নস্থ ৪র্থ চিত্রটি পরীক্ষা করিলে, শীতাতপে রসশোষণের কি প্রকার পরিবর্ত্তন হয়, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিবেন।



৩য় চিত্র।



৪র্থ চিত্র।

উপরিস্থ ৩য় চিত্রখানি লবণের জলে ডুবান ডালের শোষণলিপি। লবণ প্রয়োগের পূর্ব্বে কি প্রকার শোষণ চলিতেছিল চিত্রের নিম্নাংশের হেলান রেখা দেখিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন; এবং তার পর লবণ দিবামাত্র শোষণ কি প্রকার প্রবলভাবে চলিয়াছিল, তাহা ঐ চিত্রেরই উপরকার প্রায় দাঁড়ান রেখাটি দেখিলে বুঝা যাইবে। বলা বাহুল্য, লবণমিশ্রিত জলের গাঢ়তার জন্য যে পরিমাণ রস অন্তপ্রর্বাহ দ্বারা বাহিরে আসা সম্ভব, লবণ দ্বারা কোষ সকল উত্তেজিত হওয়ায় এখানে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক জল উপরে উঠিয়াছিল। কাজেই এই পরীক্ষায় আচার্য্য বসু মহাশয় রসনির্গমন না দেখিয়া রসশোষণই দেখিতে পাইয়াছিলেন। কোষের উত্তেজনাই যে রস-

"C" ও "H" চিহ্নিত রেখাদ্বয় যথাক্রমে শীতল ও গরম জলে নিমজ্জিত গাছের শোষণলিপি। শীতল ও গরম উভয় প্রকারের জলই প্রয়োগ করিবামাত্র, গাছের শোষণ-ক্রিয়া হঠাৎ কি প্রকার প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল এবং কিয়ৎকাল পরে সেই প্রবলতা যে কি প্রকারে কমিয়া আসিয়াছিল, পাঠক চিত্রস্থ রেখাদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

স্বর্গীয় রাজা রবিবর্ম্মা।

আমরা সাতিশয় দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে গত আশ্বিন মাসে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর রাজা রবিবর্ম্মা

৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুদক্ষ চিত্রকর রাজা রাজবর্ম্মার মৃত্যু হয়। সেই শোক তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তদবধি প্রায়ই তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ পাইতাম। গত ২২শে আগষ্ট তিনি আমাদিগকে যে পত্র লেখেন, তাহা তাঁহার শেষ পত্র বলিয়া মুদ্রিত করিতেছি।

KILIMANUR,
22nd August, 1906.

MY DEAR SIR,

Yours of the 4th instant duly to hand. I am sorry to note that I have not as yet acknowledged receipt of the Bengali primers you kindly sent me a few days back. But my health being for the last two months gradually worse, I was prevented from attending to anything else. Nor am I yet better. I am almost confined to bed owing to the frequent attacks of fever and the weakness therefrom. I hope you will therefore kindly excuse me for the delay in replying to your letters.

I send herein enclosed two photos taken out of some of my original paintings, which I hope you will find sufficient for the present.

Awaiting your reply on receipt of the photos,

I remain
Yours Sincerely
RAVI VARMA.

এই পত্রে যে বাঙ্গলা বর্ণপরিচয়ের পুস্তকের উল্লেখ আছে, তাহা আমি তাঁহার অনুরোধ অনুসারে পাঠাইয়াছিলাম;—তিনি বাঙ্গলা অক্ষর চিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। রবিবর্ম্মা অতি সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক। ত্রিবাঙ্কুরের জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা মহারাণী তাঁহার দৌহিত্রী। তাঁহার মত ভদ্রলোক অতি অল্পই দেখা যায়। আমাদের সহিত তাঁহার কখনও চাক্ষুষ পরিচয় হয় নাই। কিন্তু তিনি অনেক অপ্রকাশিত তৈলচিত্রের ফোটাগ্রাফ দিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বাজারে তাঁহার যে সকল ছবি কিনিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ই "প্রবাসী"তে ছাপিতে তিনি অনুমতি দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে আর কেহ এ অনুমতি পান নাই, তাহাও লিখিয়াছিলেন।

১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের "প্রবাসী"তে তাঁহার সচিত্র জীবনচরিত আছে। এই জন্য আমরা আর তাঁহার চিত্র বা জীবনচরিত দিলাম না। তাঁহার সচিত্র ইংরাজী জীবনচরিত এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রকাশিত করিয়াছেন।

তাঁহার চিত্রাঙ্কণরীতি পাশ্চাত্য, কিন্তু চিত্রের বিষয় সমস্তই দেশীয়। দক্ষিণ ভারতের নরনারীর সৌন্দর্য্যের আদর্শ তাঁহার চিত্রাবলীতে সুপরিস্ফুট হইয়াছে। দরিদ্রের গৃহেও আজ তাঁহার পৌরাণিক চিত্রাবলী বিরাজিত। তাঁহার চিত্রগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

তাঁহার পত্রে যে দুইখানি চিত্রের ফোটোগ্রাফের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে একখানি আশ্বিনের "প্রবাসী"তে ছাপা হইয়াছিল; অপরখানি এবার ছাপা হইল।

৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত



বুদ্ধদেব।

শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

প্রবাসী

"Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters."
"to look on noble forms
Makes noble thro' the sensuous organism
That which is higher."—*Tennyson.*

৬ষ্ঠ ভাগ। | অগ্রহায়ণ, ১৩১৩। | ৮ম সংখ্যা।

শাহ জাহানের রাজ্য-নাশ।

বাদশাহ ও কুমারগণ।

৭ই মার্চ্চ, ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে, বাদশাহ শাহ জাহানের রাজ্যাভিষেকের ৩১ বৎসর আরম্ভ হইল। মহা সমারোহে শুভ দিন কাটিয়া গেল। এই সুদীর্ঘ রাজত্ব-কালে প্রজাগণ শান্তি ও সমৃদ্ধি ভোগ করিতেছিল। কেবল শেষের দিকে একটি বিপদের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল—কুমারগণের বড়ই অমিল ও ঈর্ষা; বাদশাহ তাঁহাদিগকে খুব দূরে দূরে রাখিয়া কোনরকমে শান্তি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠ কুমার দারাশিকো পিতার বড়ই প্রিয় ছিলেন। তিনি বাদশাহের সঙ্গে থাকিতেন; তাঁহার উচ্চ উপাধি (শাহ-ই-বুলন্দ্-ইক্‌বাল্), ৬০ হাজার অশ্বারোহীর সেনাপতি এই সর্ব্বোচ্চ পদ, এবং প্রতিপত্তি দেখিয়া প্রজা ও সৈন্যগণ তাঁহাকে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করিত। বাদশাহও যেন তাহাই ইচ্ছা করিতেন। একখান মণি-খচিত স্বর্ণ-আসন বাদশাহের সিংহাসনের সম্মুখে রাখা ছিল; যখন দারা দরবারে আসিতেন উহার উপর বসিতেন। রাজ্যের কোন কাজই দারাকে না জানাইয়া করা হইত না। কুমার আদর্শ পতি ও পিতা ছিলেন; তাঁহার জ্ঞানও গভীর কিন্তু সুদীর্ঘ কাল রাজসভায় থাকায় যুদ্ধ-বিদ্যা ভুলিয়া গিয়াছিলেন; ফকীর ও যোগীদিগের সঙ্গ এবং সুফী ও উপনিষদের গভীর দর্শনের আন্তরিক চর্চ্চা তাঁহার বিষয়-বুদ্ধি লোপ করিয়া দিয়াছিল।

দ্বিতীয় কুমার শাহ শূজা, বাঙ্গলার সুবাদার, বড়ই বিলাসী এবং অকর্ম্মণ্য ছিলেন। ১৭ বৎসর বাঙ্গলার জলবায়ু তাঁহার শরীর ও মন নিস্তেজ করিয়া দিয়াছিল; রাজ-কার্য্যে ও সৈন্য বিভাগে চারিদিকে বিশৃঙ্খলতা ও শ্লথতা রাজত্ব করিত।

তৃতীয় কুমার আওরাংজীব, অক্লান্ত পরিশ্রমী, দ্রুত অশ্বারোহী, অসীম কৌশলী, স্থির, গম্ভীর, সংযমী, বিলাস-ত্যাগী, দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন। তাঁহার সংযত সাহস ও অনিদ্র সতর্কতা কেবল তাঁহার প্রগাঢ় রাজ-নৈতিক চতুরতা ও কপটতার সঙ্গেই তুলনা করা যাইতে পারে। সত্য বটে তাঁহার মনে ঔদার্য্য বা বিস্তৃতি ছিল না; কিন্তু মন সংকীর্ণ হওয়ায় এই সুবিধা হয় যে উদ্দেশ্যটি সতত সর্ব্ব শক্তি দ্বারা অনুসরণ করা যায়। ইহা তাঁহার বিজয়ের একটি কারণ। দয়া দাক্ষিণ্য কৃতজ্ঞতা বাৎসল্য প্রভৃতি "হৃদয়ের দুর্ব্বলতা" তাঁহার চাণক্যনীতির সফলতার বিঘ্ন করিত না। সুদূর দাক্ষিণাত্যে তাঁহার সৈন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত ও দক্ষ অবস্থায় রাখা হইত। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আওরাংজীব সেখানেই অনেকগুলি কর্ম্মপটু এবং বিশ্বাসী ভৃত্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন—যথা খলিলুল্লা খাঁ জমান্, মির আস্করী (আকিল খাঁ রাজী,) মুর্শিদ কুলী খাঁ, এবং রণ ও মন্ত্রণায় অদ্বিতীয় কুশলী মির জুম্‌লা।

কনিষ্ঠ কুমার মুরাদ্‌বখ্‌শ্ অন্ধ সাহসে যুদ্ধ করা ও বিলাসে গা ঢালিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। বুদ্ধি বিদ্যার কোনই ধার ধারিতেন না। এসময় গুজরাত প্রদেশ তাঁহার শাসনে ছিল।

বাদশাহের স্বাস্থ্য ভঙ্গ।

হঠাৎ দৃশ্যপট পরিবর্ত্তন হইল। ৬ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে শাহ্ জাহান কঠিন মূত্রকৃচ্ছ্র ও তাহার উপসর্গে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। রাজ-বৈদ্যগণ কোনই উপকার করিতে পারিলেন না। বাদশাহের এতটুকু শক্তি রহিল না যে দরবারে আসেন অথবা "দর্শনের জানলায়" (ঝারোখা-ই-দর্শন্) বসিয়া ভক্ত প্রজাবর্গকে একবার মুখ দেখান। দারা অক্লান্ত যত্নে দিবা নিশি পিতার সেবা করিতে লাগিলেন। রোগ-গৃহের বাহিরের ঘরটি তাঁহার বাস-স্থান হইল। ভ্রাতাগণ সংবাদ না পান এই জন্য সভাসদগণের বাদশাহ্-দর্শন বন্ধ করিয়া দিলেন, আওরাংজীবের প্রতিনিধি-(উকীল) কে কয়েদ করিলেন, এবং রাজধানীর বাহিরের পথ ও খেয়া ঘাটে পাহারা বসাইয়া রাখিলেন যেন কোন দূত না যাইতে পারে। কিন্তু ইহার ফল ঠিক বিপরীত হইল। সংবাদ না পাইয়া কুমারগণ ব্যস্ত ও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। রাজ্যময় অদ্ভুত গুজব প্রচার হইতে লাগিল; চারিদিকে দুষ্ট লোক গোলমাল বাধাইয়া স্বার্থলাভের সুযোগ পাইল। কিছু দিন পরে বাদশাহ একটু সুস্থ হইয়া জানলায় দেখা দিলেন; কিন্তু তাহাতে কি হইবে? লোকে বলিতে লাগিল যে আসল বাদশাহ মরিয়া গিয়াছেন, ওটা একজন দাস বাদশাহের পোষাক পরিয়া তাঁহার আকৃতির অনুকরণ করিয়া জানলায় বসিয়া দূর হইতে লোকের সালাম লইতেছে ও প্রতিদান করিতেছে!

সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ আর থামাইয়া রাখা অসম্ভব হইল। ছোট তিন কুমার সসৈন্যে আগ্রার দিকে ধাবমান হইলেন। বাদশাহ নিজ হস্তে লিখিত ও নিজ মোহরযুক্ত চিঠি পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে স্ব স্ব প্রদেশে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা এইরূপ উত্তর পাঠাইলেন, "আমরা সিংহাসনাকাঙ্ক্ষী বিদ্রোহী নহি, ভক্ত প্রজা ও বিনীত পুত্র। ভীষণ জনরব শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়াছি। একবার স্বধু বাদশাহের নিকট গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষু সার্থক এবং মন নিশ্চিন্ত করিব। তার পর বাদশাহের যাহা আজ্ঞা হয় তাহাই পালন করিব।" দারা ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিলেন। আত্মরক্ষার জন্য দুই দল সৈন্য শূজা ও আওরাংজীবের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন এবং পিতাকে ধীরে ধীরে দিল্লী হইতে আগ্রায় আনিলেন।

দারার পরাজয়।

পথে আওরাংজীব ও মুরাদ একত্র হইলেন এবং উজ্জয়িনীর যুদ্ধে দারার প্রেরিত সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন। দারা সর্ব্বস্ব এক যুদ্ধের ফলে সঁপিয়া আগ্রা হইতে সৈন্য লইয়া স্বয়ং যুদ্ধে আসিলেন। ২৯এ মে ১৬৫৮ খৃঃ অসহ্য রৌদ্র ও গরম বাতাসের মধ্যে, আগ্রার ১৩ মাইল দক্ষিণে সামুগড় গ্রামে, দুই সৈন্যের সংঘর্ষ হইল। বিপক্ষের সুচালিত তোপের সম্মুখে দারার সৈন্যগণ শস্যের মত কাটা পড়িতে লাগিল। তাঁহার প্রবল আক্রমণ গুলি ব্যর্থ হইল; তাঁহার নায়কগণ (রুস্তম্ খাঁ, রাও ছত্রশাল প্রভৃতি) যুদ্ধ করিতে করিতে মারা গেলেন। অবশেষে দারা দ্বিতীয়পুত্র সিপিহর শিকো এবং জনকত অনুচর সঙ্গে দ্রুত অশ্বে চড়িয়া পলায়ন করিয়া, সন্ধ্যার পর আগ্রায় নিজ বাড়ীতে পৌঁছিয়া একেবারে শোকে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। অন্তঃপুরে ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদের রোল পড়িয়া গেল এবং এই দুঃসংবাদ চারিদিকে প্রচার হইল। শাহ জাহান জানিতে পারিয়া সেই রাত্রে দারাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "দৈবক্রমে তোমার এ দুর্দ্দশা হইয়াছে; তুমি কি করিবে? এখন একবার দুর্গে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করা এবং কয়েকটি আবশ্যক কথা শুনা তোমার পক্ষে ভাল। তার পর যেখানে ইচ্ছা যাইও এবং যাহা তোমার কপালে থাকে ঘটিবে।" কিন্তু দারা মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন; মান সম্পত্তি ক্ষমতা সব হারাইয়া তাঁহার আর মুখ দেখাইবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি পিতাকে উত্তর পাঠাইলেন, "আর কোন্ মুখে, কি দশায়, আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারি? এ সহরে দেরী করিলে শত্রুগণ আমার চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিবে। এ অপমানিত হতভাগ্য পুত্রকে দেখার ইচ্ছা ছাড়িয়া দিন। স্বধু আমার সম্মুখে যে সুদীর্ঘ বিপদপূর্ণ ভ্রমণ রহিয়াছে তাহার আরম্ভে আপনার আশীর্ব্বাদ চাই।" এ সংবাদে বাদশাহ ও অন্তঃপুরের মহিলাগণ শোকে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। প্রভাতে ৩টার সময় দারা স্বীয় পত্নী নাদিরাবানু বেগম (যুবরাজ পর্ব্বেজের কন্যা) এবং অপর কয়েকটি স্ত্রীলোক এবং কয়েকটি হস্তীবোঝাই ধনরত্ন লইয়া আগ্রা হইতে দিল্লীর দিকে পলাইলেন।

আগ্রার দুর্গ অবরোধ।

যুদ্ধ জিতিয়া সে রাত্রি আওরাংজীব রণক্ষেত্রের পশ্চাতে দারার পরিত্যক্ত শিবিরে কাটাইলেন। তিন দিন পরে (১লা জুন) আগ্রার সহরতলীতে নূর মঞ্জিল বা ধারা নামক বাগানে আসিয়া তাম্বু ফেলিলেন। পুরবাসিগণ মহা ভয় ও চিন্তায় রহিল। মুরাদের সৈন্যগণ বড়ই উচ্ছৃঙ্খল; সহরে ঢুকিয়া লুট ও অত্যাচার আরম্ভ করিল। তৃতীয় দিবস আওরাংজীব তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সুলতানকে খাঁ খানান্ ও একদল সৈন্য সহ সহরের মধ্যে শান্তি রক্ষা করিতে ও প্রজাবর্গকে আশ্বস্ত করিতে পাঠাইলেন। প্রতিদিন দলে দলে বাদশাহী কর্ম্মচারী ও ওমরাহগণ নূর মঞ্জিলের বাগানে আসিয়া "উদীয়মান সূর্য্য"-কে উপাসনা করিতে লাগিলেন এবং আওরাংজীবের অধীনে কর্ম্ম লইলেন।

শাহ জাহান দুই জন প্রবীণ কর্ম্মচারীকে চিঠি দিয়া

আওরাংজীবের নিকট পাঠাইলেন; কিন্তু কোনই সন্তোষ-জনক উত্তর আসিল না। অবশেষে হতাশার বলে বলীয়ান্ হইয়া বৃদ্ধ নরপতি দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া অবরোধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

আওরাংজীব জুল্‌ফিকার খাঁ ও বাহাদুর খাঁকে দুর্গ জয় করিতে পাঠাইলেন। তাহারা রাত্রে পৌঁছিয়া আক্রমণ করিল, কিন্তু সেই অজেয় দুর্গের উপর দন্তস্ফুট করিতে পারিল না। সে কালে অবরোধে বড় দেরী হইত, তার উপর আওরাংজীব দাক্ষিণাত্য হইতে কোনই অবরোধের সরঞ্জাম আনেন নাই। সেনাপতিদ্বয় যমুনার তীরে দারার বাড়ীতে রহিল, তাহাদের সৈন্যগণ অনেকেই দুর্গদেওয়ালের ও বাহিরের গাছের নীচে বেশ আশ্রয়ে রহিল; দুর্গের তীর ও গোলা তাহাদের মাথার উপর দিয়া উঁচায় চলিয়া গেল। আওরাংজীবের একটি তোপ জাহানারার মসজিদের উপর দাঁড় করান হইল; ইহার প্রথম গোলাতে দুর্গদ্বারের উপরের তোপটির মুখ খণ্ড খণ্ড হইল। আর একটি তোপ দারার বাড়ীর ছাদ হইতে গোলা চালাইয়া দুর্গপ্রাসাদের দোতালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। দুর্গরক্ষীদের কামান ভাল চালান হয় নাই। ঐতিহাসিক ঈশ্বরদাস নাগর বলেন যে ইহার দারোগা ইতিকাদ খাঁ ঘুষ খাইয়া ফাঁকা বারুদের আওয়াজ করিয়াছিল এবং রাত্রে দ্বার খুলিয়া আওরাং-জীবের লোকদিগকে মধ্যে আসিতে দিয়াছিল। কিন্তু দুর্গের ১৫০০ পদাতিক —কালমক্, হাবশী, ও তুর্ক—বিশ্বাসী ও বীর যোদ্ধা ছিল; তাহাদের বন্দুকের চোটে কেহ দুর্গের বাহিরে মাথা দেখাইতে পারিল না। দুর্গমধ্যের অনেক ওমরাহ ও মনসবদার অবরোধ-ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রথম দিন সন্ধ্যার সময়, যে ভিস্তিরা যমুনা হইতে একটি ছোট দ্বার দিয়া দুর্গমধ্যে জল আনিত, তাহাদের তদারক করিবার ভাণ করিয়া, বাহিরে গিয়া পলায়ন করিল।

তবুও দুর্গ জয়ের কোনই আশা দেখা দিল না। তখন আওরাংজীব মন্ত্রণা করিয়া এই ফন্দি বাহির করিলেন যে যমুনার জল লওয়া বন্ধ করিয়া দুর্গবাসীদিগকে পিপাসায় মারিয়া দুর্গ জয় করিবেন। পর দিন তাঁহার সৈন্যগণ হাজরি দরজা অবধি আগাইয়া জল লইবার পথ বন্ধ করিল এবং নদীর ধারে দিনরাত পাহারা দিতে লাগিল। দুর্গের মধ্যে যে কি কষ্ট হইতে লাগিল. তাহা সহজে কল্পনা করা যাইতে পারে। বাদশাহ ও ওমরাহগণ চিরদিন "গলিততুষার" যমুনার বিশুদ্ধ জল পান করিয়া আসিয়াছেন, এখন কি আর দুর্গের পুরাতন অব্যবহৃত কূপ কয়টির কষায় জল খাইতে পারেন?

পিতা পুত্রে।

তখন শাহ জাহান এই মর্ম্মস্পর্শী চিঠিখানি আওরাং-জীবকে পাঠাইলেন:—

"বাবা আমার! বীর আমার! এইমাত্র কাল্ আমি নয় লক্ষ অশ্বারোহীর অধীশ্বর ছিলাম। আর আজ্ আমার একটি জল দেবার চাকরের অভাব!

(পদ্য) হিন্দুদের, যাহা হউক, ধন্য বলি,
তাহারা মৃত (আত্মীয়)কে জল দান করে।
কিন্তু, হে পুত্র! তুমি এমন অদ্ভুত মুসলমান
যে আমি জীবিত থাকিতে জল হইতে বঞ্চিত
করিয়াছ!"

আওরাংজীব চিঠির পৃষ্ঠে উত্তর লিখিলেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! আর বেশী লেখা বেআদবী।"*

বাদশাহ নিরুপায় হইয়া এই গম্ভীর চিঠি তাঁহার বিজয়ী নির্ম্মম পুত্রকে পাঠাইলেন, "পিতৃভক্তি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ। আমাকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা কর এবং আমাকে যে সব কষ্ট দিতেছ তাহাতে তোমার ইহ জগতে লজ্জা ও পরকালে সর্ব্বনাশ হইবে। শেষ-বিচারের দিন কি বলিয়া আত্ম-রক্ষা করিবে? যুদ্ধ-জয় করিয়াছ বলিয়া উন্মত্ত হইও না। আশা করিও না ভাগ্য চিরকাল তোমার পক্ষে থাকিবে, কারণ ভাগ্য বড় পরিবর্ত্তনশীল। যাহাতে নিজের ক্ষতি হইবে এরূপ কাজ করিও না। জগৎজন আমার রাজত্বের গৌরব ও সমৃদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ ছিল, ইহার শেষ অংশ তুমি বিষময় করিও না। সাধু পুত্রের মত কার্য্য কর, যেন তোমার নাম ও যশ চিরস্থায়ী হয়।"

আওরাংজীব উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমি বাধ্য পুত্র। অধুনা যাহা করিয়াছি তাহার কারণ এই যে ভয় ও নিরাশায় আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধরিতে বাধ্য হইয়াছি। নচেৎ আপনার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া চরণে উপস্থিত হইতাম। এখন দুর্গটা আমার লোকদের হাতে ছাড়িয়া দিন; তার পর আমি বিনীত ভাবে উপস্থিত হইয়া আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করিব।"

শাহ জাহান সম্মত হইলেন। অবরোধের তৃতীয় দিন তাঁহার লোকগুলি দুর্গ ছাড়িয়া দিল, এবং আওরাংজীবের পুত্র মহম্মদ সুলতান সসৈন্যে প্রবেশ করিয়া দখল লইলেন (৮ই জুন)। এইরূপে আগ্রাদুর্গ ও তাহার অসীম ধনরাশি,

* এই উত্তরের নৃশংসতা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে ভাল বুঝা যাইবে; মির মহম্মদ মাহ্সুম্ তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন:—

একদিন কোন কার্য্যোপলক্ষে আগ্রা প্রাসাদে বাদশাহের ঘুসালখানাতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম একজন সুন্দর সুসজ্জিত যুবক শাহ জাহানকে ময়ূর-পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে। অনেক বৎসর পরে রাজসভায় আসিয়াছি বলিয়া তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। একজন বন্ধু বলিয়া দিলেন, "উনি কুমার আওরাংজীব।" পরদিন আমার প্রভু শাহ শুজার সঙ্গে বাদশাহী শিকার-স্থানে গেলাম। ফিরিবার সময় দেখি যে সেই যুবক একটা পানদান কোমরে বাঁধিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিতেছে। বন্ধু বলিলেন "ওটা বাদশাহের পানদান; তাঁহাকে পান পরিবেশন করার ভার উঁহার হাতে।"

যাহা বাদশাহেরা তিন পুরুষ ধরিয়া জমা করিয়াছিলেন—অতি সহজে হস্তান্তর হইল।

শাহ জাহান বন্দী।

বিজিত "শাহান্‌শাহ" এই ভ্রাতৃদ্রোহী যুদ্ধ থামাইবার এক শেষ চেষ্টা করিলেন; তিনি এখনও আশা ধরিয়া রহিলেন যে তাঁহার সাম্রাজ্য চারি পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া শান্তি স্থাপন করিবেন। বয়োবৃদ্ধ মান্যবর উজীর জাফর খাঁ, জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী জাহানারা, দু'জনে ক্রমান্বয়ে আওরাংজীবের নিকট গিয়া বাদশাহের প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা আওরাংজীবকে জানিতেন না। তাঁহারা জানিতেন না যে

"রাজধর্ম্মে ভ্রাতৃধর্ম্ম বন্ধুধর্ম্ম নাই,
শুধু জয়ধর্ম্ম আছে।"

আওরাংজীব উত্তর করিলেন যে তিনি পিতার অত্যন্ত বাধ্য বটে, কিন্তু তাঁহার মত ধার্ম্মিক মুসলমানের পক্ষে "কাফির" দারাকে দূর করিয়া দেওয়া "লোকহিতের জন্য" অবশ্য কর্ত্তব্য।

১১ই জুন আওরাংজীব নূর মঞ্জিল বাগান হইতে মহা সমারোহে রওনা হইলেন, ইচ্ছা বাদশাহের সঙ্গে দেখা করা। এমন সময় শায়েস্তা খাঁ ও শেখ মির আসিয়া অনেক রকম যুক্তি দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিল। একখান বাদশাহী চিঠিও ধরা পড়িল, যাহা হইতে বুঝা গেল যে বৃদ্ধের হৃদয় এখনও জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য কাঁদিতেছিল। সুতরাং সাক্ষাৎ করার সংকল্প ত্যাগ করিয়া আওরাংজীব গিয়া আগ্রা সহরে দারার প্রাসাদ অধিকার করিলেন।

জীবনে আর পিতাপুত্রের দেখা ঘটিল না। ১২ই জুন হুকুম হইল যে শাহ জাহানের কয়েদ আরও কঠিন করিতে হইবে; তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা লোপ করা হইল এবং আগ্রা দুর্গের অন্দরের বাহিরে আইসা বন্ধ হইল। এই প্রাসাদ-কারাগারে বৃদ্ধ জীবনের শেষ আট বৎসর কাটাইলেন; একমাত্র সান্ত্বনার আধার সেই অবিশ্রান্ত সেবিকা দেবকন্যা জাহানারা, "মোগলরাজ্যের এণ্টিগনি"। কিন্তু তিনি বিজয়ী পুত্রের ব্যবহার ভুলিতে পারিলেন না। এই শেষ কয় বৎসরে তিন বার জাহানারা অত্যাচারী ভ্রাতার জন্য পিতার ক্ষমা ভিক্ষা করেন; দুইবার বাদশাহ অস্বীকার করিলেন। কিন্তু দয়া জগতে অজেয়; তৃতীয়বার তাঁহার চেষ্টা সফল হইল, শাহ জাহান আওরাংজীবকে ক্ষমা করিলেন।

[দলিল—(১) আকিল খাঁ রাজীর লিখিত "জফরনামা-ই-আলম্‌-গিরি", কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পারসী হস্তলিপি নং ডি ২৩৯। (২) মির মহম্মদ মাসুমের "তারিখ্‌-ই-শাহশুজাই" ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীর পারসী হস্তলিপি নং ৫৩৩। (৩) ঈশ্বরদাস নাগরের "ফতুহাৎ-ই-আলম্‌গিরি" ব্রিটিশ মিউজিয়মের পারসী হস্তলিপি নং এডিশানাল ২৩৮৮৪। (৪) ঐ স্থানের পারসী হস্তলিপি নং এডিশানাল ১৮৮৮১এর ৭৭ ক পৃষ্ঠায় "মর্ম্মস্পর্শী চিঠি" খানা আছে। (৫) মুদ্রিত আলম্‌গিরনামা হইতে কেবল তারিখ লওয়া হইয়াছে এবং (৬) খাফি খাঁর ইতিহাস হইতে কেবল শেষ ঘটনাটি উদ্ধৃত হইল। এই সব গ্রন্থ সমসাময়িক; উর্দ্দু ইতিহাসের মত ঘটনার অনেক পশ্চাদ্‌বর্ত্তী এবং গুলিখুরী গুজব-পূর্ণ নহে। বলা বাহুল্য, আওরাংজীবের চাটুকার সভাসদ্‌গণের লিখিত ইতিহাসে এই প্রবন্ধের অনেক ঘটনাই নীরবে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

চারি নম্বরে বর্ণিত চিঠিখানির আসল এইরূপ :—

"বাবা-এ-মন্‌, বাহাদুর্‌-ই-মন্‌, দিরোজ্‌ সাহিব্‌-ই-নঃ লাখ্‌ সোয়ার্‌ বুদেম্‌, ও ইম্‌রোজ্‌ বা এক্‌ আব্‌দার্‌ মুহ্‌তাজ।

(মস্‌নবী)

আফ্রিন্‌ বর্‌ হনুদ্‌,দর্‌ হর্‌ বাব্‌
মুদারা মি দেহন্দ দায়েম্‌ আব্‌।
আয়্‌ পেসর্‌ তু আজব্‌ মুসলমানি
জিন্দা জানম্‌ বা আব্‌ নারসানি॥"

জবাব আজ্‌ তর্‌ফ্‌-ই-আলম্‌গির বর্‌ পুশ্‌ৎ-ই রোকা——————"কদা-এ-খেশ্‌ আয়েদ্‌ পেশ্‌। জিয়াদা হদ্‌-ই-আদব্‌।"

পারসী হইতে অনুবাদ করিতে সর্ব্বত্রই সংক্ষেপ এবং কয়েক স্থানে সরল করিয়াছি, অবিকল রাখি নাই।]

যদুনাথ সরকার,
পাটনা কলেজের অধ্যাপক।

ঘরের কথা।*

আমরা যে কথায় অধিক সময় কাটাই তাহা পরের কথা। রাজার অথবা রাজকর্ম্মচারীর কথা পরের কথা, অপর জাতির কথাও পরের কথা, কারণ তাহাতে আমরা লিপ্ত হই না। আর সকল কথাই হয় কেবল ঘরের কথা হয় না। ঘর কেবল প্রত্যেক পরিবার লইয়া নয়, সমস্ত দেশ জড়াইয়া। যে কথায় দেশের লোক লিপ্ত, যে কথা আমাদের সকলকে লাগে, সেই ঘরের কথা। সেই কথার আলোচনায় আমাদের প্রবৃত্তি নাই। রাজার পক্ষ হইতে কি অন্যায় কর্ম্ম হইতেছে, কোন রাজকর্ম্মচারী কোথায় কোন অত্যাচার করিতেছেন, সে কথা লইয়া আমরা যথেষ্ট আন্দোলন করি, আমরা স্বয়ং কি অন্যায় কর্ম্ম করিতেছি, আমাদের কোথায়

* ৩০শে আশ্বিন প্রয়াগবাসী বাঙ্গালীদিগের সভায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত।

কি ত্রুটি হইতেছে, সে কথার আন্দোলন করি না। যদি বলা যায় মানুষ নিজের দোষ দেখিতে পায় না; তাহার উত্তর, যে মানুষ নিজের দোষ কখন দেখিতে পায় না তাহার দ্বারা কোন মহৎ কর্ম্মও সাধিত হয় না। আবার যদি বলা যায় যে আমরা যেমন রাজকর্ম্মচারীদিগের ছিদ্র অন্বেষণ করি তাঁহারাও সেইরূপ আমাদের দোষ দেখাইয়া দেন, সে কথাও কাজের নয়, কারণ তাঁহাদের কথা আমরা মানি না। যখন একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী, স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি বলিয়াছিলেন, যে এদেশে সত্যের তেমন সম্মান নাই, এবং এদেশের শাস্ত্রেও সত্যের তেমন সমাদর নাই, তখন আমাদের বড় রাগ হইয়াছিল। হইবারই কথা, কারণ রাজপ্রতিনিধি এ দেশের লোককেও জানেন না, এ দেশের শাস্ত্রও জানেন না। অনেক রাজপুরুষ গায় পড়িয়া এত কথাও বলেন না। বলিবার মধ্যে তাঁহারা কখন আমাদিগকে রাজভক্ত, কখন রাজদ্রোহী বলেন, কখন বুদ্ধিমান কখন মূর্খ বলেন। আর তাঁহাদের সংবাদপত্রগুলি সময়ে অসময়ে আমাদের গালি দেয়। তাঁহাদের পক্ষে ইহা পরের কথা, কিন্তু ইহাতে আমাদের কোন লাভ বা ফল হয় না। তবে আমাদিগকে ঘরের কথা বলিবে কে?

এক রকম ঘরের কথা আমাদের মুখে অনেক সময় লাগিয়া থাকে। ধনীর সন্তান নির্ধন হইলে সে পিতৃপিতামহের ঐশ্বর্য্যের বারম্বার উল্লেখ করিয়া কিঞ্চিৎ আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। উচিত ইহাতে তাহার পরিতাপ ও মনের ক্লেশ বর্দ্ধিত হওয়া, কিন্তু ফলে সে পায় শান্তি ও আত্মগৌরব। স্থানে অস্থানে, সময়ে অসময়ে আমরা যে ভারতবাসী প্রাচীন আর্য্যের কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষণা করি তাহাতে বিপুল আনন্দ ও তৃপ্তির উদ্রেক হয়, কিছুমাত্র আত্মগ্লানি অথবা অনুতাপ হয় না। পূর্ব্বপুরুষের অল্পবিস্তর কিছু-না-কিছু ত আমাদের আছে—কুছ না হো তো থোড়া থোড়া। অল্পই হউক, বিস্তরই হউক, কি আছে জিজ্ঞাসা করিলে কিছু মুস্কিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে কে? জিজ্ঞাসা করিতে আমরা স্বয়ং, কিন্তু ওরূপ জিজ্ঞাসু হওয়া আমাদের স্বভাব নয়।

এ প্রকার ঘরের কথায় ঘর বাঁধা দূরে থাকুক আরও ভাঙ্গিয়াছে। আমাদের পর্ণকুটীর ঝড়ে জলে ভূমিসাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছে, আমরা চক্ষু বুজিয়া লুপ্তচিহ্ন বহু প্রাচীন অট্টালিকার কল্পনা করিতেছি! পদ্মার ভাঙনে বাস্তুগৃহ ভাসিয়া গিয়াছে, আমরা নূতন ঘর বাঁধিবার চেষ্টা না করিয়া, রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করিয়া, বালুকা তীরে বসিয়া ভাবিতেছি ঐ খরস্রোত বিপুলসলিলা তরঙ্গভঙ্গশালিনী নদীর গর্ভে আমাদের গৃহ নিহিত আছে! এমন করিয়া কত দিন থাকিব? এখন যেন মনে হইতেছে নূতন বাতাস উঠিয়াছে, দেশের প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। মনে হয় ঘরের লোককে ঘরের কথা বলিবার সময় আসিয়াছে।

আমাদের ঘরের কথা আমরা যত জানি পরে তাহা কেমন করিয়া জানিবে? আর এই যে এতদিন আমরা ঘরের কথা কখনও তুলি নাই সেটাও একটি মন্দ লক্ষণ, কারণ রোগী প্রায় রোগ গোপন করিবার চেষ্টা করে। যে কথা লইয়া আমরা এত স্পর্দ্ধা গৌরব করি সেই ঘরের কথা আর এখনকার ঘরের কথা তুলনা করিলে আমাদের গৌরবের কোন কারণ আছে কি না তাহাও বুঝিতে পারা যায়। এমন কথা বলিতেছি না যে এই দুর্ব্বলতা কেবল আমাদের জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যতদিন এই দুর্ব্বলতা থাকিবে ততদিন জাতীয় উন্নতির পথের কাঁটা ঘুচিবে না। যদি অতীতের অনুধ্যানে তৃপ্তিলাভ করিয়া আমরা নিশ্চেষ্ট থাকি তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমরা কিরূপে কর্ম্মক্ষম হইব? মাত্র অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করা অলসের কাজ। আলস্য অথবা কর্ম্মে বিরতির শিক্ষা আমাদের দেশে কোন্ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়? শাস্ত্রের শিক্ষা ঠিক বিপরীত—অক্লিষ্টকর্ম্মা কর্ম্মবীর জগতের আদর্শ। শিক্ষা এই দেশের, সেই শিক্ষা, সেই শাস্ত্র লইয়া আমরা বৃথা আস্ফালন করি, অপর জাতি সেই কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে।

স্পষ্ট কথা যদি বলিতে হয় তাহা হইলে কয়েকটা মৌলিক কথা প্রথমে বুঝিতে হইবে। যে জাতি বহুকাল পরাধীন থাকে সে জাতির নানা বিষয়ে বুদ্ধিভ্রম ঘটে। আমাদেরও তাহাই হইয়াছে। মানুষের উন্নতির প্রথম সোপান আত্মসম্ভ্রম। আমাদের সেই সোপান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আত্মসম্মান আমরা ভুলিয়া গিয়াছি কিন্তু আত্মপ্রশংসায় আমরা সর্ব্বদা অনুরত। আমি ধনী অথবা আমি যশস্বী, আমি সুবক্তা অথবা সুলেখক, আপনার মুখেই স্থানে অস্থানে, সময়ে অসময়ে আমরা এ কথা প্রচার করিয়া থাকি। পরকে সাক্ষী মানিবার অবসরই হয় না। আত্মনিন্দার চলে আত্মপ্রশংসা আরও নিন্দিত, কিন্তু কয়জন সে প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারে? এ শিক্ষা কি শাস্ত্রানুযায়ী? শাস্ত্রের শিক্ষা এই যে কদাচ আত্মপ্রশংসা অথবা আত্মনিন্দা করিবে না। শুধু তাহা নহে, আত্মনিন্দা ও আত্মপূজা, পরনিন্দা ও পরস্তব অকর্ত্তব্য। কোন গুরুতর অপরাধ করিলে শাস্তিস্বরূপ ব্যবস্থা হইত যে হয় অপরাধী তুষানলে আত্মবিসর্জ্জন করিবে অথবা প্রকাশ্য সভায় বসিয়া আত্মপ্রশংসায় রত হইবে, এবং কথিত আছে যে অপরাধী আত্মপ্রশংসা অপেক্ষা তুষানলে দগ্ধ হওয়া সহজ বিবেচনা করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিত। প্রকাশ্য সভায় বসিয়া আত্মপ্রশংসা করিতে এখন কয়জন লজ্জা অনুভব করে?

রাজদ্বারে সম্মানিত হওয়া অথবা রাজপ্রদত্ত উপাধি প্রাপ্ত হওয়া গৌরবের কথা বটে, কিন্তু আমাদের দেশে যাহারা ঐরূপ সম্মান প্রাপ্ত হয় তাহারা সাধারণতঃ কোন্

শ্রেণীর লোক? তাহাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক স্বজাতিদ্রোহী, নীচপ্রকৃতি, ঘোর স্বার্থপর। অথচ রাজদ্বারে ঐ শ্রেণীর লোকের অধিক সমাগম এবং উহারাই সম্মানিত হয়। উপাধিলালসা সম্বন্ধে ইংরাজ জাতিতে ও ভারতবর্ষবাসীতে প্রভেদ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। প্রথম কথা, এ দেশে উপাধির সৃষ্টি কবে হইল? যে কালের, যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আমরা এত গর্ব্ব অনুভব করি তখন ত উপাধির কোন বালাই ছিল না, কারণ তখন সত্য প্রবল, মিথ্যার সমাদর ছিল না। মানুষ মানুষকে দেখিত, ফিতা লইয়া উপাধির দৈর্ঘ্য মাপিত না। চণ্ডাল রাজার বন্ধু ছিল, সত্যবাদী, অজ্ঞাতবংশসম্ভব বালককে শাস্ত্রাচার্য্য ঋষি ব্রাহ্মণ বলিয়া আলিঙ্গন করিতেন, তপস্যাবলে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইত। এখন উপাধিলালসা এরূপ বাড়িয়াছে যে রাজকর্ম্মচারীরা উপাধি বিতরণ করিবার পূর্ব্বে কাহাকে কখনও জিজ্ঞাসাও করেন না। উপাধি গ্রহণ করিতে কেহ যে অস্বীকার করিতে পারে এ কথা তাঁহারা কল্পনা করিতে পারেন না। ইংরাজেরা অনেকে উপাধির প্রতি দৃকপাতও করেন না। কার্লাইলকে কয়েক বার উপাধি প্রদান করিবার প্রস্তাব হয়, তিনি সে কথা কানেই তুলিতেন না। টেনিসন কয়েকবার অস্বীকৃত হইয়া অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে উপাধি গ্রহণ করেন। গ্লাড্‌ষ্টন্ কতবার কত লোককে উপাধি দান করেন, কিন্তু তাঁহার নিজের সে প্রবৃত্তি কখন হয় নাই। আমাদের দেশে যে এমন লোক দেখিতে পাওয়া যায় না এমন নয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড লিটন দিল্লী দরবারে কেশবচন্দ্র সেনকে উপাধি দান করিতে চাহিয়াছিলেন তখন কেশবচন্দ্র দরিদ্র ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া উপাধি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে যখন মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিবার প্রস্তাব হয় তখন তিনি রাগিয়া অস্থির হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রাজকর্ম্মচারী বলিয়া উপাধি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই, কিন্তু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন।

উচ্চ রাজকর্ম্মচারী অথবা পদবীধারীর সমাজে বিশেষ সম্মান, অথচ যথার্থ বুঝিতে গেলে, তাঁহারা নিতান্ত দয়ার পাত্র। যেখানে ঘরের কি দেশের দু'টা কথা হয় সেখানে কোন্ রাজকর্ম্মচারীর মাথার উপর মাথা আছে যে তিনি উপস্থিত হন? আত্মসম্মান তাঁহার অধিক, না যাহার মুখ ফুটিয়া দুইটা কথা বলিবার অধিকার আছে, যাহাকে সর্ব্বদা রাজদ্বারে সশঙ্ক চিত্তে দণ্ডায়মান থাকিতে হয় না, তাহার অধিক?

আত্মসম্মানজ্ঞানের অবনতির এই একটী প্রধান লক্ষণ। যে জাতির আত্মসম্মানজ্ঞান গেল তাহাদের কি অবশিষ্ট রহিল? ছিল আমাদের দেশে পণ্ডিতের সমাদর, এখন ধনবান মূর্খের সমাদর হইয়াছে। দরিদ্রতা সকল গুণের ভূষণ স্বরূপ ছিল, এখন দারিদ্র্য লজ্জার ও ঘৃণার সামগ্রী হইয়াছে।

এই ভুল আমাদের প্রথমে ভাঙ্গিতে হইবে, মানুষ কিসে মানুষ হয় তাহা বুঝিতে হইবে, ও যথার্থ মনুষ্যত্বের সমাদর করিতে হইবে। আমাদের আর একটি বিপদের কারণ আমাদের লঘুচিত্ততা। সকল কর্ম্মই আমরা তুচ্ছ মনে করি, তাহার কারণ কোন যথার্থ কর্ম্ম আমরা করিতে শিখি নাই। আজ যে কারণে আমরা সমবেত হইয়াছি আমার আশঙ্কা হয় যে সেটা আমরা একটা বাৎসরিক উৎসবের মধ্যে গণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। অরন্ধন, রাখীবন্ধন কোন কারণে প্রচলিত রাখিতে হইবে। এ বিষয়ে কি আমরা কখন স্থিরচিত্তে কিছু ভাবিয়াছি? জাতির মর্ম্মবেদনার যদি কোন উৎসব থাকে তাহা হইলে ৩০শে আশ্বিন সেই উৎসব বটে, কিন্তু এ উৎসব হৃদয়ের মন্দিরে অতিশয় সংযমের সহিত রক্ষা করিতে হয়। ইচ্ছা করিয়া আমরা এই পরীক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। এই পরীক্ষা অগ্নিপরীক্ষা, আমরা জাতির গৌরব, জাতির সম্মান রক্ষা করিতে পারিব কি না সেই পরীক্ষা। শত্রু হাসুক তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু আমরা আপনার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিব কি না আমাদিগকে তাহাই দেখিতে হইবে।

কিসে কি হয় সে কথা বলা বড় কঠিন, কার্য্যকারণের সম্বন্ধ নির্ণয় সকল সময় করিতে পারা যায় না। মনে করা যাক্, গত বৎসর এই দিনে যে রাজাজ্ঞা প্রচার হইয়াছিল তাহা রহিত হইয়া যাইবে অথবা পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ একত্র করিয়া বেহার ও উড়িষ্যাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া হইবে। তাহা হইলে কি আমাদের এই আন্দোলন ত্যাগ করিতে হইবে? তাহাই যদি হয় ত আমাদের প্রার্থনা যেন রাজাজ্ঞা অখণ্ডিত থাকে, কারণ যে মঙ্গলের সূত্রপাত হইয়াছে বঙ্গদেশ পূর্ব্বের মত হইলেও সেই মঙ্গলের দীর্ঘজীবন প্রার্থনীয়। মনে কর আমি নিদ্রিত আছি, কোন ডাক্তার বন্ধু আসিয়া ছুরীর খোঁচা দিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর দেখি আমার অঙ্গে রক্তপাত হইতেছে। আমাকে বিস্তর চেঁচামেচি করিতে দেখিয়া বন্ধুবর কহিলেন, "আমি প্রলেপ দিয়া তোমার ক্ষত আরোগ্য করিতেছি, তুমি আবার নিদ্রা যাও।" আরোগ্য লাভের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই, কিন্তু তাঁহার কথায় আবার নিদ্রা যাইব কি না সেটা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। একে ত নিদ্রাবস্থায় আবার ছুরীর খোঁচার ভয় থাকে তাহার পর ক্ষতস্থান অক্ষত হইলেও ক্ষতচিহ্ন থাকিয়া যায়। মিথিলার কবি বলিয়াছেন, "তোড়ি জোড়িয় জাঁহা, গেঠে পয় পড় তাঁহা," ছিঁড়িয়া যদি আবার জোড়া দাও ত সেখানে গাঁইঠ পড়িয়া যায়। যেটী ছিল সেটি আর হয় না। দীর্ঘনিদ্রিত জাতিকে যখন খোঁচা দিয়া জাগাইয়াছ তখন প্রলেপ প্রদানে আর তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিবে না।

ফুলর সাহেবের কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধেও কয়েকটা কথা

বলিবার আছে। অনেক বাঙ্গালীর বিশ্বাস যে, বাঙ্গালীর জোরে ফুলর সাহেবকে কর্ম্মত্যাগ করিতে হইয়াছে। অপর দেশের লোকেরাও মনে করেন যে বাঙ্গালী ও সাহেবে বিবাদ হইয়া এই প্রথমবার সাহেব হারিল। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয় কিন্তু যথার্থ পক্ষে ফুলর সাহেব নিজে নিজের শত্রু। তাঁহার স্থানে হেয়ার সাহেব আসিয়াছেন। হেয়ার সাহেবকেও তাড়াইতে পারিব এমন স্পর্দ্ধা কোন বাঙ্গালী করেন না। ফুলর সাহেব যেরূপ করিয়া দেশ শাসন করিতেছিলেন তাহাতে প্রজার যত না অমঙ্গল রাজার আরও অধিক অমঙ্গল। অত্যাচার উৎপীড়ন এখনকার রাজার উদ্দেশ্যই নয়। অতএব যদি কোন রাজপুরুষ খুব বেশী বাড়াবাড়ি করেন তাহা হইলে তাঁহাকে বিপদে পড়িতে হয়। অত্যাচার উৎপীড়ন হইলে একটা ভরসা থাকে। ক্রমাগত লাঠি খাইলে -যদি লাঠির ঘা নিতান্ত গুরুতর না হয়—অবশেষে লোকে লাঠি ঘুরাইয়া মারিতে শিখে।

আমাদের আশঙ্কা এই যে, জাতি দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। মাংসপেশীর দুর্ব্বলতা, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা। বন্দুক তলওয়ার ত অনেক দূরের কথা, ঘরে একখানা বড় ছোরা রাখিবার জো নাই, রাজার ভয় যদি কখন রাগ করিয়া আমরা সেখানা নিজের গলায় বসাইয়া দিই। এখন রাজার উপর রাগ করিয়া আমরা একদিন উনানে আগুন জ্বালি না, আর একটু রাগ হইলে হয় ত জলে ডুবিয়া মরিব। শারীরিক দুর্ব্বলতার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। যতক্ষণ নানা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করি ততক্ষণ একটি বা ততোধিক সাংঘাতিক রোগ দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে। যদি এই দুর্ব্বলতা আমরা দূর না করিতে পারি তাহা হইলে জাতি কিছু দিনে মৃতকল্প হইয়া পড়িবে।

আজ একটু বলের সূচনা হইয়াছে বলিয়া এত কোলাহল। কিন্তু আমরা এমন কিছু করি নাই যাহাতে আমরা গৌরব করিতে পারি। যদি কখন একটা বড় কাজ করিতে পারি তখনই কি গৌরব করিতে হইবে? ইংরাজ জাতি আত্মগর্ব্বে অদ্বিতীয়। ইংরাজের কেতাব পড়, ইংরাজের বক্তৃতা শোন, এত আত্মশ্লাঘা যে জগতে কোন জাতির ছিল এমন বোধ হয় না। জাপানী অনেক বিষয়ে ইংরাজের চেয়ে বড়, কিন্তু জাপানীর আত্মশ্লাঘা নাই। আমরা দিবারাত্র পথে ঘাটে জাপানের কথা বলি, যেন জাপানের আদর্শ ভুলিয়া না যাই। পরের পদানত হইয়া যে বাঙ্গালীর এত আস্ফালন সে বাঙ্গালী সত্য সত্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিলে না জানি কি করিবে!

যখন ঘরের কথা বলিতে আসিয়াছি তখন রাখিয়া ঢাকিয়া কিছু বলিব না। বাঙ্গালী জাতির দোষ অনেক, অভাব অনেক। বিশেষ, বিদেশে বাঙ্গালীকে দেখিলে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতে হয়। প্রবাসের দোষ অনেকগুলি সহজে জুটিয়া যায়, প্রবাসের আত্মনির্ভর ও চরিত্রবল বাঙ্গালীর পক্ষে বড় দুর্লভ। কিন্তু আশার কথাও অনেক আছে। দুই বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী যাহা করিয়াছে সমগ্র ভারত তাহাতে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর সম্মান ভারতবাসীর চক্ষে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। যাহাতে সেই সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে, যে মন্ত্র আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহা সাধন করিতে হইবে।

আজিকার এই মিলন উৎসব মাত্র নয়। আজ আমরা হৃদয়ে দৃঢ় বল ধারণ করিবার জন্য মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। যিনি দুর্ব্বলের বল, কর্ম্মে সিদ্ধিদাতা, তিনি আমাদের সহায় হউন!

নিউইয়র্কে পাঁচ মাস।

জলবায়ুতে যে নিউইয়র্ক সহর লণ্ডন সহর অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, তাহা আমি কিছুতেই বলিতে পারি না। আমি ঠিক দেড় বৎসর পূর্ব্বে গ্রীষ্মকালে একাদিক্রমে প্রায় পাঁচ মাস কাল নিউইয়র্ক সহরে থাকিয়া আসিয়াছি। তাহার পূর্ব্বে কার্য্যের জন্য আমাকে লণ্ডন সহরে থাকিয়া দুইটী গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। তাহার পরেও আর একটী গ্রীষ্মকাল লণ্ডন সহরে কাটিয়াছে। লণ্ডনের গ্রীষ্মকালের সহিত নিউইয়র্কের গ্রীষ্মকালের যে অনেক প্রভেদ আছে, তাহা আমি এখন নির্ব্বিবাদে বলিতে পারি। লণ্ডনের গ্রীষ্ম কিছুতেই নিউইয়র্কের গ্রীষ্মের মত এত গরম নহে। নিউইয়র্কে খুব দেরীতে প্রত্যেক দুই এক দিন অন্তর এত গরম পড়ে যে আমি যখন তখন ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেছিলাম বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইতাম!

লণ্ডনের গ্রীষ্মকালে প্রকৃতি দেবীই বিশেষ ভাবে জাগিয়া উঠেন। কিন্তু নিউইয়র্কের গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশের মত মশা মাছী ও পোকা মাকড়েও সহরটা ভরিয়া যায়। সেখানে তখন কোনও বাগানে গিয়া ঘাসের উপর কোথাও উপবেশন করিবার উপায় নাই। পিপীলিকা যেন সর্ব্বত্রই সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে! মশার উপদ্রবও নিউইয়র্ক সহরে বড় কম নহে। কোন কোন বাগানে দিনের বেলায়ই তাহারা মানুষকে মন্ত্র জপাইতে আসে! লণ্ডনের গ্রীষ্মকালে কিন্তু এ সকল কিছুই নাই। সেখানে রাত্রেই কদাচিৎ মশা দেখিতে পাওয়া যায়। আর বাগানে গ্রীষ্মকালে নিম্নশ্রেণীর যুবকযুবতীগণ ঘাসে ছাড়া প্রায় অন্য কোথাও সন্ধ্যার সময় উপবেশন করে না।

নিউইয়র্ক ও লণ্ডন সহরের শীতকালেও অনেক পার্থক্য আছে। আমি লণ্ডনের তিনটী শীত যদিও উপভোগ করিয়াছি বটে, কিন্তু নিউইয়র্কের শীতটা কেমন তাহা নিজ জীবনে কখনো বুঝিয়া দেখি নাই। তবে সেখানকার অনেক বন্ধুবান্ধবের নিকট একাধিকবার শুনিয়াছি যে, তাহা লণ্ডন সহরের শীত অপেক্ষা অনেক অধিক কষ্টকর। নিউইয়র্কে লোক শীতের উপদ্রবে মরিয়া যায়। তাহাদের সংখ্যা কখনো কখনো দিনে দশ বার পর্য্যন্ত উঠিয়াছে! যখন তখন পথে ঘাটে বরফ পড়িয়া সেখানে এমনি ঘটনা ঘটে যে, বরফ চাঁচিয়া না দিলে গাড়ী যাওয়া তো দূরের কথা, এমন কি রেলের উপর দিয়া ট্রামগাড়ীও চলিতে পারে না। লণ্ডনের শীতে আজকাল এরূপ কোন ঘটনা একবারে ঘটেই না বলিলে হয়।

লণ্ডন সহরে যাতায়াতের জন্য 'বাস' নামক এক প্রকার অশ্বযান আছে। তাহার ভিতরে উপরে প্রায় সর্ব্বত্রই বসিতে পারা যায়। গত বৎসর শীতকালে আমি দিন ভোরে বেলা আন্দাজ ৮টার সময় প্রায় একমাসকাল ২।৩ মাইল পথ তাহার উপরে বসিয়া যাতায়াত করিয়াছি, কেবল একদিন ছাড়া আমার আর কোন দিন কোন প্রকারের অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু নিউইয়র্ক সহরে 'বাস' বলিয়া কোন জিনিস যদি থাকিত, তবে তাহার উপরে বসিয়া শীতকালে কোনও ব্যক্তি একদিনের জন্যও কোথাও যাইতে পারিত কি না সন্দেহ। নিউইয়র্ক সহর একেবারে সমুদ্রের উপর অবস্থিত বলিয়া সেখানে শীতের সময় এত শীত হইয়া থাকে। সেখানে গ্রীষ্মের সময় এত গরম হইবার অর্থ এই যে, তাহা লণ্ডনের তুলনায় বিষুবরেখার অনেক নিকটে।

* * *

শীতাতপের এত আত্যাধিক্য সত্ত্বেও নিউইয়র্ক কিন্তু লণ্ডন সহরকে প্রাসাদ অট্টালিকায় অনেক নিম্নে স্থান দান করিয়াছে। কি সংখ্যায়, কি উচ্চতায়, কি প্রস্থে—সকল বিষয়েই লণ্ডনের ঘর বাড়ী নিউইয়র্কের ঘর বাড়ীর নিকট দাঁড়াইতে পারে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নিউইয়র্কের 'ফ্ল্যাট্ আয়ার্ণ বিল্ডিং এর' কথা কে না জানে? সমগ্র পৃথিবীতে তাহার মত উচ্চ 'স্কাই স্ক্রেপার' (অভ্রংলিহ গৃহ) আর কোথাও নাই। এই আকাশস্পর্শী, সুদীর্ঘ প্রাসাদের ঠিক সম্মুখে প্রায় কুড়ি হাত দূরে 'হোটেল বারথল্ডীতে' আমাকে প্রায় এক সপ্তাহকাল দিন কাটাইতে হইয়াছিল। বৃষ্টির সময় স্বচক্ষে দেখিয়াছি, লোকে বজ্রপাতের ভয়ে সহজে ইহার পাশ দিয়া যাতায়াত করিতে চাহে না! নিউইয়র্ক সহরের 'এম্পায়ার বিল্ডিং'ও বড় কেও কেটা নহে। নবাগত বিশেষতঃ আমাদিগের মত কুটীরবাসী পথিকের দৃষ্টি আপনা হইতেই ইহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। লণ্ডনের কোনও গৃহ নিউইয়র্কের এই দুইটী গৃহের সহিত উচ্চতায় তুলনীয় হইতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না। প্যারিতেও এত উচ্চ কোনও প্রাসাদ নাই। নিউইয়র্ক সহরের হোটেল গুলিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবাড়ী। 'ফিফ্‌থ্ অ্যাভিনিউ' হোটেলটী বাহির হইতে দেখিতে যেমনি হউক না কেন, ভিতরে ইহাকে সাজাইতে অর্থের পিতৃশ্রাদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি।

'স্যাভয় হোটেল'ও নিউইয়র্কের উপযুক্ত বই অনুপযুক্ত নহে। ইহা পঞ্চম অ্যাভিনিউ ও ৫৯ ষ্ট্রীটের উপর অবস্থিত। পঞ্চম অ্যাভিনিউ হইতেছে এজগতের এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। ইহার এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত যতগুলি গৃহ আছে, প্রায় সকল গুলিই কোন-না-কোন লক্ষপতি বা ক্রোড়পতির গৃহ। লণ্ডন সহরের 'রয়েল এক্সচেঞ্জে' অনেক টাকা কড়ির কারবার হইয়া থাকে বটে, এবং বোধ হয় তাহা নিউইয়র্ক সহরের 'ওয়ালষ্ট্রীট' অপেক্ষা ধনীও। কিন্তু আমার বিশ্বাস, নিউইয়র্ক সহরের পঞ্চম অ্যাভিনিউর ধনের নিকট এজগতের কোন স্থানের ধনের তুলনা হইতেই পারে না। শুনিয়াছি এখানে এমন লোক আছেন, যাঁহার দৈনিক আয় মাত্র ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার ডলার, বা দেড় লক্ষ টাকার উপর।

নিউইয়র্ক সহরের 'ওয়ালষ্ট্রীটটা'ও একটী দেখিবার এবং চিন্তা করিবার বস্তু। এখানে কত ব্যক্তি যে সামান্য অবস্থা হইতে একবারে 'মিলিয়নেয়ার' বা ক্রোড়পতি হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাহা কেবল নিউইয়র্কবাসীগণই জানেন। এই 'ওয়ালষ্ট্রীটেই' সুবিস্তৃত মার্কিন রাজ্যের নাভিক্ষুদ্র—রাজকোষ বলিব না—ধনাগার বিনির্ম্মিত রহিয়াছে। ইহার একটী বিশেষত্ব এই যে ইহা 'রয়েল এক্সচেঞ্জের' মত এত রক্ষণশীল নহে। 'রয়েল এক্সচেঞ্জে' লোকের প্রথমে যেন একটা অপরিচিত ভাব মনের মধ্যে উদয় হয়। 'ওয়ালষ্ট্রীটে' সর্ব্বদাই কত বড় বড় লোক চলাফেরা করিতেছেন, কিন্তু কোনও বিদেশীকে কখনো সেখানে কোন অচেনা অচেনা ভাব উপলব্ধি করিতে হয় না। আমেরিকার ধনীগণের চলন ফিরনের ভিতর এমনি সরলতা ও উদার ভাব সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হয় যে, তাহা অন্যত্র খুঁজিয়া পাওয়া প্রায়ই অসম্ভব।

* * * *

'ওয়ালষ্ট্রীট' হইতে চোখ বাঁধিয়া কেহ যদি আমাকে একেবারে 'বাওয়ারীতে' লইয়া যায়, তবে আমি যে সেই নিউইয়র্ক সহরের অন্য এক অংশে উপস্থিত হইয়াছি, একথা আমার সহজে স্বীকার করিতে ইচ্ছা হইবে না। এখানে 'ওয়ালষ্ট্রীটের' সে সৌন্দর্য্য, সে ভাবভঙ্গি, এক কথায় সে সভ্যতা নাই। কারণ 'বাওয়ারীতে' হইতেছে যত দরিদ্র ও বদমায়েসের আড্ডা। এখানে না হইতে পারে এমন কুকাজ এ বিশ্বসংসারে হইতে পারে না। আমেরিকা স্বাধীন দেশ, সেইজন্য সেদিন পর্য্যন্ত সেখানে যাওয়ার জন্য কাহাকেও

কোন বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। ফলে ইয়োরোপ হইতে যত বিখ্যাত বিখ্যাত ইতালীয়ান্ ও স্প্যানিশ বদমায়েস সেখানে পলাইয়া যাইত ও এখনো যায়। আর লোকে বলিয়া থাকে যে, এই 'বাওয়ারী' হইতেছে তাহাদের নব লীলাভূমির একমাত্র দিব্য কেন্দ্রস্থল।

'বাওয়ারী' বদমায়েসদিগের আড্ডা হইবার একটী বিশেষ কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। লণ্ডন সহরে মাটীর নীচে লোক চলাচলের জন্য যেমন 'টিউব' আছে, নিউইয়র্ক সহরে তেমন কোনও 'টিউব' সে দিন পর্য্যন্ত একবারেই ছিল না। নিউইয়র্কের তাহারা উৰ্দ্ধগামী কি না; তাহারা মাটির নীচে না গিয়া, পথের উপরেই লোহার থাম পুতিয়া তাহার উপর তাহারা রেল চালায়। এই রেলের রাস্তার নীচে মানুষ চলে এবং তাহার পার্শ্বে ট্রাম ও গাড়ী ইত্যাদি যাতায়াত করিয়া থাকে। 'বাওয়ারী'তে এইরূপ দুইটী রেলওয়ে লাইন আছে। এই দুইটী রেলওয়ে লাইন এক রাস্তার উপর ঘন ভাবে থাকার দরুণ, রাস্তাটী দিনের বেলায়ও বড় অন্ধকার দেখায়। কাজেই যেখানকার রাস্তা অন্ধকার, সেখানকার ঘরবাড়ীও অন্ধকার। আর যেখানকার ঘরবাড়ী বৎসরের মধ্যে বার মাস এক রকম অন্ধকারেই থাকে, সেখানে যে মশা যুটিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু প্রকৃত 'বাওয়ারী' যায়গাটা এত খারাপ হইলেও তাহার অনতিদূরে নিউইয়র্ক সহরের অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত খবরের কাগজের আফিস আছে। 'ওয়াল্ড' নামক দৈনিক পত্রিকার আফিস 'বাওয়ারী' হইতে এক মিনিটেরও পথ নহে। 'ট্রিবিউন' আফিস আবার তাহার ঠিক পার্শ্বেই। নিউইয়র্ক সহরের খবরের কাগজের কি প্রতিপত্তি ও কত অর্থ, তাহা 'ওয়াল্ড' ও 'হেরাল্ড' আফিসের বাড়ী দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 'হেরাল্ড' আফিসে যে ছাপাখানা আছে, শুনিয়াছি এ পৃথিবীতে তাহার মত ক্ষিপ্রকারী ও বৃহৎ ছাপাখানা এ জগতে কোথাও নাই। 'বাওয়ারী'র এত সন্নিকটে নিউইয়র্কের অনেক দৈনিক কাগজের আফিস হইলেও, কাগজের সম্পাদকগণ যেখানে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়া থাকেন, সেই 'কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী', 'বাওয়ারী' হইতে অনেক দূরে।

'কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী'টী বুঝি সমগ্র নিউইয়র্ক সহরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থিত। ইহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেহ যদি চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করে, এবং সে যদি নিউইয়র্ক সহরের কোন খবরই না জানে, তবে সে কখনো একথা বলিতে পারিবে না যে সে একটী বাদে এই পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ সহরের ঠিক বুকের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কি পূর্ব্বে কি পশ্চিমে, কি উত্তরে কি দক্ষিণে, চারিদিকে কেবল গ্রীষ্মের নীল ও শীতের পাঁশুটে আকাশ ভিন্ন আর সেখানে কাহারো এক রকম কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কারণ ইহা একটী পাহাড়ের উপর অবস্থিত, এখানে যাইতে হইলে সহরের দিক হইতে পাহাড় বহিয়া যাইতে হয়। পাহাড়ের স্থানে স্থানে শিঁড়ির পাশে পাশে বসিবার অনেক সুব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া যে আমি মার্কিনদেশের মত কঠোর, কর্ম্মঠ, গদ্যময় দেশে আসিয়া পৌছিয়াছি, তাহা অন্ততঃ একবারের জন্যও ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

* * * * *

'কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী'র সম্মুখে দাঁড়াইলে যেমন একটা বিশাল ভাব আপনা হইতেই মানবমনকে অধিকার করিয়া ফেলে, ঠিক সেইরূপ ভাবই নিউইয়র্কবাসী অধিকাংশ লোকের কার্য্যকলাপে অনেক সময় দৃষ্টিগোচর হয়। আগে ধনী পুরুষদিগের কথাই বলি। আমি নিউইয়র্ক সহরে থাকিতে থাকিতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সেখানে এক খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। আমি সেইখানি সেখানকার 'আউটলুক্' পত্রিকার জন্য সমালোচনা করি। সমালোচনা প্রকাশিত হইবার পর, কোনও উপায়ে, আমার সহিত একজন ধনী ব্যক্তির বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার ওখানে বসিয়া আছি, এমন সময় তাঁহার 'হেড্ পোর্টার' বা সর্দ্দার বেহারা সেই ঘরে উপনীত হইলেন। পরিচিত ধনীটী তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমার সহিত তাঁহার বেহারার আলাপ করাইয়া দেন। আমি ইহাতে একটু অপ্রতিভ হইয়াছিলাম। সুতরাং তাঁহার বেহারা চলিয়া যাইবার পর তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিয়াছিলেন—'He is a good man!' (উনি খুব সৎলোক)। বাস্তবিকই মার্কিনদেশে কোন ব্যক্তি যদি 'উত্তম' হয়, তবে দরিদ্রতার জন্য তাহাকে কখনো কোন ধনীর সহবাস পরিহার করিতে হয় না। সে ধনীদিগের মত সুখে বসবাস না করিতে পারে, তাহার পোষাক পরিচ্ছদ ধনীদিগের পোষাক পরিচ্ছদ অপেক্ষা হয় তো ময়লা এবং জঘন্য, কিন্তু কোনও মার্কিন ধনী কখনো তাহাকে দেখিয়া ঘৃণার হাসি হাসেন না বা তাহার প্রতি বিদ্রূপের কটাক্ষপাত করেন না। ঘৃণার হাসি হাসা বা বিদ্রূপের কটাক্ষপাত করা তো দূরের কথা, অনেকে হয় তো শুনিয়া থাকিবেন, সেদিন দাতাকর্ণ এণ্ড্রু কার্ণেগীর বাড়ীর কোনও মেয়ে একজন 'কোচম্যানের' সহিত বিবাহ করিতে চাওয়ায় ও বিবাহ করায় কার্ণেগী বলিয়াছিলেন যে, বিলাতের কোন 'ডিউক' অপেক্ষা তিনি তাঁহার 'কোচম্যান্‌কে' উৎকৃষ্টতর পাত্র বলিয়া মনে করেন। শুনিয়াছি এই মেয়েই এণ্ড্রু কার্ণেগীর অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী!

নিগ্রোদিগের প্রতি ব্যবহারের কথা ছাড়িয়া দিলে, মার্কিনবাসী দরিদ্রদিগের মত সরলতা, উদারতা ও সার্ব্বভৌমিকতাও এ জগতের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়

কি না সন্দেহ। আমাকে এক সময়ে ইহাদিগের সহিত একবার একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইয়াছিল। আমাদিগের সঙ্গে অনেক গরীব রুশীয় ইহুদীও সেই স্থানে যাইতেছিলেন। রুশীয় ইহুদীগণ আমাদিগের ইংরাজীর কিছুই বুঝিতেন না। একদিন তাঁহাদিগের একজন ইঙ্গিতে আমাদিগের নিকট সিগারেট ধরাইবার জন্য দীয়াশলাই চাহেন। অমনি একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক মার্কিন দরিদ্র তাঁহার মস্তকে চাঁটী বসাইতে আরম্ভ করে। আমি তাহাতে কেবল মাত্র একবার এই কথা কয়টি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তাহাকে যদি সেই রুশীয় ইহুদীর পদে কখনো বাধ্য হইয়া উপবিষ্ট হইতে হয়, তবে তখন সে কি করিবে? কিন্তু এই প্রশ্নের পর আমি তাহাদিগের একমাত্র অদ্বিতীয় নেতা হইয়াছিলাম; আমি যে বিদেশী তাহা তাহারা একবারে ভুলিয়া গিয়াছিল।

আমেরিকার কেবল পুরুষগুলিই যে এইরূপ, তাহা নহে। সেখানকার স্ত্রীলোকগুলিও এইরূপ—কেবল তাঁহারা যেন একটু বেশী সুখান্বেষিণী।—তবে একটা সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়াই কথাটার ব্যাখ্যা করিয়া দিই। একদিন আমাকে নিউইয়র্ক সহরের কোনও একজন স্ত্রীলোক তাঁহার বাড়ীতে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। ইংলণ্ডে থাকিতে থাকিতে শিখিয়াছিলাম যে, আহারের সময় টেবিলের উপর হাত ঠেশ দিয়া উপবেশন করা অভদ্রতার একশেষ। কিন্তু গৃহকর্ত্রীর কন্যাকে সেখানে সেইরূপে উপবেশন করিতে দেখিয়া স্বভাবতঃই আমার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল। আহারের পর সুবিধা পাইলে আমার সহিত স্ত্রীলোকটীর উপযুক্ত রূপ আলাপ পরিচয় আছে জানিয়া, আমি তাঁহাকে তাহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করি। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন—'Get away with your English conceitedness: let my Daughter do whatever she likes to be comfortable!' (তোমার বিলাতী আত্মম্ভরিতা রেখে দাও; আরামের জন্য আমার মেয়ের যা মন যায় করুক)।

* * * * *

মার্কিন রমণীর এই সুখান্বেষণের ভিতর অনেক অপবিত্রতা বিমিশ্রিত রহিয়াছে বলিয়া অনেকেই ইয়োরোপে তাহা বার বার বলিয়া থাকেন। অপবিত্রতা তাঁহাদিগের এই সুখান্বেষণের ভিতর থাকুক বা না থাকুক, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে সকলের নিকট বলিব যে তাঁহাদিগের স্বাধীনতানুরাগ তাঁহাদিগকে এই দোষে দোষী বা এই গুণে গুণী করিয়াছে। আমাদিগের দেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোকদিগের মত তাঁহারা বেশীর ভাগ অশিক্ষিতা নহেন। অন্য পক্ষে পুরুষগণ কেবল কাজের সংবাদই রাখে এবং তাঁহারাই যত সেক্সপীয়র, যত মিল্টন, যত গেটে, যত ভল্টেয়ার ও যত এমার্সনের বরপুত্রী। আর লেখাপড়া শিখিয়া, নিজেদের কর্ত্তব্য কি তাহা মস্তিষ্কে একবার অনুভব করিয়া আমাদিগের মত আর 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে'? স্বাধীনতার নামে তাঁহাদের গায়ের রক্ত গরম হইয়া যায়, মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠে! এই জন্যই আমরা পরাধীন কেহ মার্কিন দেশে গেলে আমরা তাঁহাদিগের নিকট এত সহানুভূতি পাইয়া থাকি। আমাদিগের আধ্যাত্মিকতা ও ধ্যানধারণার কথা, তাঁহাদিগের উল্লিখিত সহানুভূতিকে দ্বিগুণতর করে মাত্র।

মার্কিন রমণীর এই স্বাধীনতানুরাগের ফলে সমগ্র মার্কিন জাতি এত গভীর ভাবে স্বাধীনতাধনকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি করে যে, তাহা বলিয়া প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। যেদিন আমি সর্ব্ব প্রথম নিউইয়র্ক সহরের মাত্র নিকটবর্ত্তী হইতেছিলাম, সেদিন আমার জীবনের একটী দিন গিয়াছে। তখন পশ্চাতে প্রভাতগগনে তরুণ তপন সবে সমুদ্রগর্ভ হইতে মস্তকোত্তোলন করিতেছিল। সম্মুখে গ্রীষ্মসমাগমে সমুদ্রতীরস্থ বৃক্ষ সকল লতা পাতায় পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যে এক স্থানে জলে দেখিয়াছিলাম—'Statue of Liberty! মার্কিন দেশে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে সকলকেই এই স্বাধীনতা-মূর্ত্তির সম্মুখ বা পার্শ্ব দিয়া যাইতে হয়। ইহা যেন সুবিস্তীর্ণ মার্কিন দেশ ও উহার হৃদয়, মহাস্বাধীন মার্কিন জাতির পক্ষ হইয়া, নিউইয়র্ক সহরের দ্বারের নিকট হস্তে পবিত্র ও প্রজ্জলিত স্বাধীনতার আলোক সহ, সকলকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমুদ্রের উপর দিবারাত্র দণ্ডায়মান রহিয়াছে!

এই দৃশ্যের মহান্ ভাব সকল পরাধীন কাহারো সম্যক হৃদ্গত হইবার পূর্ব্বে, তাহাকে নিউইয়র্ক সহরে পদার্পণ করিতে হয়। কিন্তু নিউইয়র্ক সহর আমেরিকার বাহিরে নহে; সেখানেও পদার্পণ করিতে না করিতেই, জেটির স্থানে স্থানে 'smoking strictly prohibited' এর পরিবর্ত্তে এক নূতন জিনিষ ভারতবাসীর দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করে। সেটা—'Gentlemen should not smoke'। আমি সত্যই বোকার মত একদিন একজনকে ইহার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, দেশ তাঁহাদের ও আইন তাঁহাদেরই। তাঁহারা আবার কাহাকেও কিছু করিতে 'নিষেধ' করিবেন কি? যাহার যেটা করা উচিত নয় বা করা উচিত, তিনি যদি সেটা করেন বা করেন না; তবে তিনি 'অভদ্র'! হায় রে মার্কিন! তোর এই গুণটীর যদি শতাংশেরও একাংশ আজ বঙ্গদেশের এই দুর্দ্দিনে বঙ্গদেশে দেখিতে পাইতাম!

বাঙ্গালী জাতির কিন্তু এই মার্কিন জাতির মত এত উচ্চ কর্ত্তব্য জ্ঞান না থাকিলেও, আমাদিগের সহিত মার্কিন জাতির অন্য দুইটী বিশেষগুণে প্রভূত সাদৃশ্য আছে।

কেবল বাঙ্গালী জাতির কথাই বা বলি কেন, সমগ্র প্রতীচ্যের সহিত মার্কিনের এই সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। প্রতীচ্য হইতে পাশ্চাত্যে গেলেই আমাদিগের দুইটী গুণকে পাশ্চাত্যবাসী অতিশয় খাতির করে। সে দুইটি গুণের নাম হইতেছে, আমাদের ভাবের আবেগ ও আমাদের পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা। আমি রুষ, ফরাসিস্, জার্ম্মণ, সুইস ও ইংরাজের সহিত মিশিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু মার্কিনদিগের মত ইহাঁরা কেহই এত 'emotional' এবং 'acute' নহেন। বাঙ্গালী গেলেই যে আমেরিকায় কিছু-না-কিছু করিয়া আসিতে পারেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রকৃত কারণ ইহার ভিতরও লুক্কায়িত রহিয়াছে।

*　　*　　*　　*

মার্কিন জাতির সহিত সকল প্রাচ্য জাতির—অন্ততঃ ভারতবাসীর, একটা বিশেষ পার্থক্যও আছে। আমরা আমাদের এই বুদ্ধের দেশে অন্যান্য অনেক বিষয়ে আদর্শে অনাসক্ত হইলেও, আমরা বাস্তব জীবনে আজো মনুষ্য প্রাণের প্রতি কখনো এমন উদাসীন হই নাই যে তাহার জন্য লোকে আমাদিগকে নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম বলিয়া গালাগালি দিতে পারে। মার্কিন দেশে কিন্তু স্ত্রীলোকগণ দোকান সকলে বলদের মত বেলা ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন, কেহই তাহার সংবাদ রাখে না। শুধু ইহাই নহে, ইহাকে 'American Indifference' বলা হয় এবং তজ্জন্য ইয়োরোপে তাঁহাদিগের কত খাতির। কিন্তু ইহাও অতি সামান্য কথা। কেবল ইহাই যদি হইত, তাহা হইলেও কথা ছিল। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি একজন ব্যক্তিকে, তাহার জামার পকেট হইতে টাকা কাড়িয়া লইবার জন্য, অন্য একজন মদ বলিয়া কি এক জিনিষ পান করাইয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, আর অদূরে সকলে স্থির ভাবে যে যাহার কাজে চলিয়া যাইতেছিল!

তবে ঘটনাটা একটু খুলিয়াই বলি। একদিন সকালে আমি নিউইয়র্ক সহরের 'সেন্ট্রাল পার্ক' নামক বিখ্যাত পার্কে বসিয়া একখানি খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম, দুইজন পুরুষ অন্য একদিক হইতে আসিয়া অনতিদূরে একখানি বেঞ্চের উপর উপবেশন করিল। তাহাদের কথাবার্ত্তায় তাহাদিগকে আপনাআপনির বন্ধু ভিন্ন আমি তাহাদিগের সম্বন্ধে অন্য কিছুই তখন মনে করিতে পারি নাই। কিন্তু খুব বেশী মাত্র পাঁচ মিনিট কাল অতিবাহিত হইয়াছে, আর দেখিলাম—তাহাদিগের একজন মাটিতে পড়িয়া রক্তবমন করিতেছে ও তাহার চোখ দুইটী কপালে! আমি তৎক্ষণাৎ অন্য ব্যক্তিটীর নিকট দৌড়িয়া গিয়া কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায়, সে নির্ব্বিবাদে উত্তর দিল—সে কিছুই জানে না! আমি একটু আগে তাহাদের দুইজনকে একসঙ্গে আসিতে ও কথা বলিতে শুনিয়াছিলাম, আর এখন তাহার মুখে এই উত্তর শুনিয়া আমাকে বাস্তবিকই অশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইয়াছিল।

সাহায্যের আশায় কাজেই অন্য এক দিকে আমাকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। অদূরে প্রায় ৭।৮ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন ভদ্রবেশী যুবককে দেখিতে পাইলাম। দ্রুতগতিতে তাঁহার নিকট গিয়া সকল কথা বলায় ও ভূতলশায়ী লোকটীর জন্য জল কোথায় পাওয়া যাইবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে বলিলেন—'তুমি এখানে বিদেশী, না? কেন মিছামিছি নিউইয়র্কের পুলিসের হাতে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইবে? তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। ওই চালাক লোকটা ওই বোকা লোকটাকে তাহার টাকা ফাঁকি দিয়া লইবার জন্য তাহাকে কি এক জিনিষ খাওয়াইয়াছে!' এই কথা বলাও যা, আর সেখানকার তিনি ও অন্যান্য স্ত্রীলোক সকল একে একে উঠিয়া গেলেন! ইহাকে কেহ যদি সংসারের প্রতি উদাসীনতা বা আসক্তিহীনতা বলিতে ইচ্ছা করেন বলিতে পারেন, আমি ইহাকে অন্য কিছু বলিয়া খুলিয়া না লিখিলেও ইহাকে নিষ্ঠুরতা ও নির্ম্মমতা বলিয়া খুলিয়া লিখিতেছি।

ভগবান না করুন, কিন্তু এ জগতে প্রত্যেক ব্যক্তি যদি সত্যই এইরূপ মনুষ্যজীবনের প্রতি ও মনুষ্যজীবনের দুঃখকষ্টের প্রতি এত উদাসীন হয়, তবে এ পৃথিবী মনুষ্যের সুবিশাল পৃথিবী না হইয়া সিংহ ব্যাঘ্রের মহাভয়ঙ্কর পর্ব্বতকন্দর হইবে। আমি কথা প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক সহরের (তিনি এখন বষ্টনে আছেন) কোনও এক ধনী ধর্ম্মযাজককে এই কথা বলিতে বলিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ধনীর মহত্ত্ব কি দরিদ্রের জন্য জীবনপাতে বৰ্দ্ধিত হয় না? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—হয় বটে, কিন্তু দরিদ্র ধনীর অযাচিত দান গ্রহণ করিবে কেন? উত্তরটা পবিত্র স্বাধীন মার্কিনদেশের ধর্ম্মযাজকের মতই হইয়াছিল, কিন্তু, কাউন্ট টলষ্টয় যেমন বলিয়া থাকেন, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বিভিন্ন ব্যক্তি উপযুক্ত রূপে যত দিন না শিক্ষিত হইতেছেন, ততদিন মনুষ্যসৌভাগ্যের সে দিনের কথা কেবল কল্পনার বস্তু। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বিভিন্ন ব্যক্তি এক সময়ে একযোগে এক উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারে কি না, তাহা কালে সময়ই স্থির করিবে।

*　　*　　*

মার্কিন জাতি মনুষ্যজীবনের প্রতি এইরূপ ভয়ঙ্কর ভাবে উদাসীন হইলেও, তাহারা তাহাদের রাজনীতির প্রতি কখনো এতটুকু আসক্তিহীন নহে। আসক্তিহীন হওয়া দূরের কথা, রাজনীতি—একটু বাড়াইয়া বলিলে বলিব—তাহাদের ধর্ম্ম। গত ১৯০৪ সালে যখন থিয়োডোর

রুজভেল্টে ও জজ পার্কারে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট হইবার জন্য তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ই আমি নিউইয়র্ক সহরে প্রায় পাঁচ মাসের জন্য অবস্থান করিতেছিলাম। সেই বৎসর ৯ই নবেম্বর রাত্রে সভাপতি নির্ব্বাচন হয়, এবং আমি সেই দিন রাত্রে নিউইয়র্ক সহরে বিরাট ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এদেশের গঙ্গাসাগর মেলা আমার তৎপূর্ব্বেই দেখা ছিল, কিন্তু নিউইয়র্ক সহরের ১২৭ ষ্ট্রীটে ও হ্যারল্ড্ স্কোয়ারে আমি সে রাত্রে যে মহাসমারোহ দেখিয়াছিলাম, তাহার নিকট গঙ্গাসাগর মেলার তুলনাই হয় না। সকলে যেন সত্যই পাগল হইয়া গিয়াছিল!

সকলের অর্থ টা এই যে, কি বৃদ্ধ কি যুবক, কি বালক কি বালিকা, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, কি ধনী কি নিধন, নিউইয়র্ক সহরের সকলেই সে দিন পথে ঘাটে কাতারে কাতারে, টিনের বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে, বাঁশের নল ফুঁকিতে ফুঁকিতে, যে যাহার দলের অবশ্যম্ভাবী বিজয় ঘোষণা করিতেছিলেন। বাস্তবিকই সে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়াছিলাম! তারযোগে অহরহ কোন কোনও স্থানে অন্যান্য ষ্টেট্ হইতে নির্ব্বাচন সংবাদ আসিতেছিল, এবং তাহা যখন বিজয়ী বীরের প্রতিমূর্ত্তিসহ খবরের কাগজওয়ালাগণ প্রকাশ্য রাজপথে, কিন্তু সকলের মস্তকের উপর বায়স্কোপ যন্ত্রের দ্বারা, প্রচার করিতেছিলেন, তখন আনন্দের বজ্রনিনাদে ও হস্তের নিদারুণ করতালিতে এ ধরিত্রীটা এক একবার কাঁপিয়া উঠিত বলিয়া মনে হইত! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, নিউইয়র্কের মত সুসভ্য সহরে সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে আনন্দে পুরুষ স্ত্রীলোকের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে ও স্ত্রীলোক পুরুষের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে।

১৯০৪ সালে মার্কিনদেশের এই সভাপতি নির্ব্বাচনের সময়, সমগ্র মার্কিনদেশে এশিয়া খণ্ডের একটা বিশেষ সমস্যার বিস্তৃত সমালোচনা হইয়াছিল। জাপান বাদে আমরা এশিয়া খণ্ডের কেহই এখনো স্বায়ত্বশাসনের উপযুক্ত নই, ইহাই সকলের ধারণা।—সকলেই অবগত আছেন, গত শতাব্দীর শেষ ভাগে আমেরিকা স্পেনের নিকট হইতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ক্রয় করিয়া লয়েন। আমেরিকা ইংলণ্ড নহেন; ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ গ্রহণ না করিতে করিতেই আমেরিকা বলিয়াছিলেন যে, ফিলিপিনোদিগকে তাঁহারা ক্রমে স্বায়ত্বশাসন ও পরে স্বাধীনতা প্রদান করিবেন। গত ১৯০৪ সালে মার্কিনদেশে প্রশ্ন উঠিয়াছিল—ফিলিপিনোগণ স্বায়ত্বশাসনের উপযুক্ত কি না? মার্কিনের উদারনৈতিকগণ জজ্ পার্কারের নেতৃত্বে থিয়োডোর রুজভেল্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নানান কারণে জয় লাভ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু উদার আমেরিকার উদারনৈতিকতা কত প্রকৃত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তাহা তাঁহাদের কথাবার্ত্তায়, তর্ক বিতর্কে এ জগত পড়িয়া লইতে পারে।

রক্ষণশীল থিয়োডোর রুজভেল্টের যে ফিলিপিনোদিগকে স্বায়ত্বশাসন দিবার ইচ্ছা ছিল না, এমন নহে; তিনি এই বলিয়াছিলেন যে, ফিলিপিনোগণ স্বায়ত্বশাসনের উপযুক্ত হইলেই তাহারা তাহা প্রাপ্ত হইবে। জজ্ পার্কার ইহার উত্তরে মেকলের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, যদি তুমি একজনকে কখনো জলের নিকট যাইতে না দাও, তবে কখনই সে সন্তরণ করিতে শিখিবে না। থিয়োডোর রুজভেল্ট ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি একজন অযোগ্য ব্যক্তির উপর অকালে একটা কোনও গুরুতর কার্য্যের ভার প্রদান করা হয়, তবে সে এখন অযোগ্য বলিয়া কালে কখনো আর আপনাকে সেই গুরুতর কার্য্যের জন্য উন্নত করিতে চেষ্টা পাইবে না। মানুষ মানুষ, তাহাকে খুঁটিয়া খাইতে শিক্ষা দাও!

*   *   *   *

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট রক্ষণশীলই হউন আর উদারনৈতিকই হউন, তাঁহাকে আমি কোটি কোটি বার নমস্কার করি। তিনি যে নিজের গায়ের রক্ত দিয়া, হৃদয়ের উচ্চাশা দিয়া, মনের পবিত্র, নির্ম্মল, অনাবিল আদর্শ ও উদ্যম দিয়া আপনাকে এত বড় করিতে পারিয়াছেন তাহা এ জগতে এখন কে অস্বীকার করিতে পারে? তিনি নিজেই নিজের হাতের গড়া পুতুল বলিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন—'মানুষ মানুষ, তাহাকে খুঁটিয়া খাইতে শিক্ষা দাও!' আর ধন্য মার্কিন দেশ! সে-ও সেদিন করতালির উপর করতালি দিতে দিতে আকাশ বিদীর্ণ করিয়াছিল। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কি আমাদিগকে কেহ বলিতে নাই—'মানুষ মানুষ, তাহাকে খুঁটিয়া খাইতে শিক্ষা দাও? এত মিনতি কেন, এত পায়ে পড়া কেন; যাও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তপস্যাব্রত গ্রহণ কর, দেখিবে পূর্ব্বদিকে ফুটিয়া ভাঙ্গিয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে?'

আমাদিগের সহিত ফিলিপিনোদিগের এক্ষেত্রে প্রভেদ এই যে, তাহাদিগকে স্বায়ত্বশাসনের জন্য কেবল প্রস্তুত হইতে বলা হইয়াছে। তাহারা প্রস্তুত হইলেই তাহারা স্বায়ত্বশাসন পাইবেই পাইবে। আমাদিগকে প্রস্তুত হইবার জন্য কেহ কখনো তো কিছু বলেই নাই, তাহার উপর আমরা প্রস্তুত হইতে চাহিলে পশ্চাৎদিক্ হইতে, সম্মুখ দিক্ দিয়াও, আমাদিগকে যাইয়া ধরা হয়! কাজেই এ বিষয়ে ফিলিপিনোদিগের অবস্থা আমাদিগের অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল। এবং সেই জন্যই আমাদিগের একজন নহে, দুই জন নহে, খুব কমে বিশজন থিয়োডোর রুজভেল্ট আবশ্যক। তাঁহারা বুকের রক্ত মুখে লইয়া হৃদয়ের বল হাতে ধরিয়া ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে দেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার নিকট প্রচার করুন—'মানুষ মানুষ, তাহাকে খুঁটিয়া খাইতে শিক্ষা দাও!'

মনে পড়ে, লর্ড কর্জ্জন একবার গিল্ড্‌হলে বলিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডের লোকেরা অর্দ্ধেক বর্ত্তমানে ও অর্দ্ধেক অতীতে অবস্থান করিয়া থাকে। মার্কিন সম্বন্ধে কাহারো কাহারো এই মত যে আমেরিকার লোকেরা অর্দ্ধেক বর্ত্তমানে ও অর্দ্ধেক ভবিষ্যৎ কালে অবস্থান করিয়া থাকেন। আমাদিগের দেশের নেতাগণ কোথায়? তাঁহারা কি এখনো দেখিতে পাইতেছেন না যে, ভারতবর্ষে আমরা না অবস্থান করি অর্দ্ধেক বর্ত্তমানে ও অর্দ্ধেক অতীতে, না বসবাস করি অর্দ্ধেক বর্ত্তমানে ও অর্দ্ধেক ভবিষ্যৎ কালে? ভবিষ্যৎকালের কথা তো দূরের কথা, আমরা বর্ত্তমানেও ইংলণ্ড কিম্বা আমেরিকার মত অর্দ্ধেক জীবন যাপন করি না। আমাদের ঘুমন্ত, এই অসাড় চলৎশক্তিবিহীন কার্য্যকলাপ অবলোকন করিয়া কেহ কি আমাদিগকে বলে না যে, আমরা খুব বেশী মাত্র সিকি অংশ বর্ত্তমানে দিন কাটাইয়া বাকী সমগ্র জীবনটাকে অতীতের নিগূঢ় নিগড়ে এতদিন বাঁধিয়া রাখিয়াছি?

তাই বলি ভাই ভারতবাসী, যদি জাগিতেছ, তবে চারিদিক দেখিয়াই জাগ। রক্ষণশীলতা যে এখনো তোমাদের দেশে লোকের বুকের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না? মনে করিও না যে আমি তোমাদিগকে তোমাদের অতীতের সকল কথা ভুলিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছি আমি এই বলিতেছি যে, এ সময়ে যেমন তোমাদিগকে রক্ষণশীল থাকিতে হইবে, তোমরা যদিও এখন বিপ্লবকারী হইবে না বটে, কিন্তু তবুও তোমাদিগকে উদ্ভাবনশীল হইতে হইবে। তবেই এদেশের লোক তাঁহাদিগের সামাজিক জীবনে পরিমিতাচারী হইতে পারিবেন এবং সামাজিক জীবনে পরিমিতাচারী হইতে পারিলেই, আমরা আমাদিগের অন্যান্য বাঞ্ছনীয় বস্তু শীঘ্রই করতলগত করিতে পারিব। সত্য, আমাদিগের সমাজ-গঠনের জন্যও আমাদিগের এই সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের চারিদিকে আজো এমন কোনও দুইটী শক্তিশালী সম্প্রদায় নাই, যাঁহাদিগের সংঘর্ষণে বা মন্থনে এই পতিত ভারতবর্ষে আবার একবার অমৃত উত্থিত হইতে পারে। কিন্তু এই সকল দল বা সম্প্রদায় নাই বলিয়া যে এইরূপ দল বা সম্প্রদায় ভারতবর্ষে কখনো গঠিত হইবে না, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। আমার মনে হয়, শীঘ্রই ভারতবর্ষে কি সমাজসংস্কারক কি রাজনীতিবিশারদ উভয়েই এক নূতন রাজ্যে প্রবিষ্ট হইবেন।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল।

মহাভারতের প্রকৃতি এবং প্রক্ষিপ্ত রচনা।

যাঁহারা কেবলমাত্র ধর্ম্মশিক্ষা নীতিশিক্ষা প্রভৃতির জন্য মহাভারত পাঠ করেন, তাঁহাদের পক্ষে, মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত রচনা আছে কি না, একথার বিচারের তত প্রয়োজন নাই। সভাপর্ব্বের ৫ম এবং তৎপরবর্ত্তী কোন কোন অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেও, নারদ সংবাদে যে রাজনীতির কথা আছে তাহার মূল্য কমিল না; যিনিই লিখুন, যে সময়েই লিখিত হউক, ঐ কথাগুলি যখন শিক্ষাপ্রদ, তখন সুশিক্ষার জন্য প্রক্ষিপ্ত বিচারের প্রয়োজন নাই। ভাল কথার মূল্য, উহা ভাল বলিয়াই; প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন বলিয়া নহে।

কিন্তু ইতিহাসের জন্য এই বিচারের বিশেষ আবশ্যক। মহাভারতের মধ্যে যে সময়ে সময়ে অনেক রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, মহাভারত-পাঠকেরা কথকতা করিবার সময় যে সকল নূতন দৃষ্টান্ত বা আখ্যায়িকা যোজনা করিতেন, তাহাও যে অনেকস্থলে মূল মহাভারতের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে, একথা একালের ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই প্রথম বলেন নাই। এদেশের প্রাচীন পণ্ডিত এবং টীকাকারেরাও প্রক্ষিপ্ত স্বীকার করিয়াছেন, এবং অনেকস্থলে যথার্থ পাঠ নির্দ্ধারণের জন্য তর্ক করিয়া গিয়াছেন।

মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত রচনা আছে; কিন্তু কি উপায়ে এবং কি প্রকার বিচার-প্রণালীতে উহা ধরা যাইতে পারে, এই হইল কথা। সেই উপায় এবং বিচার-প্রণালী স্থির করিবার পূর্ব্বে দেখিয়া লইতে হইবে, যে মহাভারত সংহিতা কি অবস্থায়, কি ভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে রচিত বা সংগৃহীত হইয়াছিল। মহাভারতের প্রকৃতি কি, তাহা একটু বুঝিয়া লইতে পারিলে, কোন রচনা অসঙ্গতভাবে কেহ জুড়িয়া দিয়াছে কি না, তাহা ধরিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

প্রাচীন কালের কোনও একটি আখ্যান (আদি ৬২ তম, ১ ও ৫২, ও অন্যত্র), ইতিহাস (আ-৬৩ তম, ১৭ ও ১৯; ও অন্যত্র), বা কাব্য (আ-১ম, ৭২-৭৫ ইত্যাদি), কুরুপাঞ্চাল চরিত বা কুরু-চরিত নামে হউক, অথবা ভারতী কথা কিম্বা মহাভারত নামে হউক, (আ-৬২ তম, ১ এবং অন্যত্র), প্রচলিত ছিল বলিয়া মহাভারতে স্বীকৃত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে ব্যাসদেব নাকি স্বীয় পুত্র শুকদেবকে চব্বিশ হাজার শ্লোকে ঐকথা রচনা করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন; এবং পরে উহার বিস্তৃতিও করিয়াছিলেন (আ-১, ১০২ ও পরবর্ত্তী)। সে ভারতী কথা যে কি ছিল, তাহা ব্যাসদেবই জানেন। যে সকল শিষ্য ঐ ভারতী কথা শিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে বৈশম্পায়ন একজন; এবং জনমেজয়ের সর্পসত্রে

পঠিত বা গীত সেই বৈশম্পায়ন-ভারত না কি সৌতি বিবৃত করিয়াছেন। এই সৌতিবিবৃত মহাভারত, মহাভারত সংহিতা নামে (আ-১, ৬২, ৬৩ এবং অন্য পর্ব্বের অধ্যায়) প্রচারিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে কাব্য প্রচলিত ছিল, এবং যাহা অবলম্বনে এই নূতন সংহিতা রচিত হইল, তাহাতে অবান্তর আখ্যান আখ্যায়িকাদি না কি ছিল না (আ-১, ১০২; ও ৬৩ অধ্যায়)। নূতন সংহিতা রচিত হইবার পূর্ব্বেও ঐ ভারতী কথা লইয়া অনেক কবি অনেক কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছিলেন (আ-১ম, ২৬, ২৭)।

প্রাচীনকালে নীতি বা ধর্ম্মকথার দৃষ্টান্তে যে সকল আখ্যান প্রচলিত ছিল, তাহার নাম ছিল ইতিহাস; এবং এই প্রকারের ইতিহাসকে পুরাণও বলিত (আ, ১৩শ, ৬ ও অন্যত্র)। যে সময়ে প্রাচীন ভারতী কথাকে কেন্দ্র করিয়া, সংহিতা রচনার সময়ের প্রচলিত সকল প্রকার পুরাণেতিহাস একসঙ্গে সংগৃহীত হইয়া যুক্ত হইল, অর্থাৎ মহাভারত সংহিতার সৃষ্টি হইল, তখন সেই বিপুল আয়তনের মহাভারত কেবলমাত্র কাব্য নামে অভিহিত হইতে পারে নাই। তবে চিরকাল যে ভারতী কথা একমাত্র কাব্য নামেই পরিচিত হইয়াছিল, তাহাকে দেশের লোকে কাব্যই বলিত (আ-১ম, ৭২-৭৫), এবং এখনও বলে।

মহাভারত সংহিতাখানি কাব্য এবং পুরাণেতিহাস; কেবল তাহাই নহে, ইহা সংহিতারূপে সর্ব্বশাস্ত্রের সমষ্টি। "ধর্ম্ম শাস্ত্র মিদং পুণ্য মর্থ শাস্ত্র মিদং পরং, মোক্ষশাস্ত্র মিদং প্রোক্তং" (আ-৬২, ২৩)। সংহিতা সঙ্কলনের সময়ে যাহা কিছু পুরাণেতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি প্রচলিত ছিল, সে সমুদায়ই ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া, একথা উল্লিখিত হইয়াছে, যে অন্যান্য কবির রচনায় বা ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে মহাভারতে আখ্যাত কথা থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা মহাভারতে নাই তাহা অন্যত্র কোথাও নাই;—"যদি হাস্তি তদন্যত্র, যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ (আ-৬২, ৫৩)"। যখন কথা হইল, যে যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে, তখন এ গ্রন্থের বিশেষ মূল্য বাড়িয়া গেল। সেই জন্য মহাভারতের যথার্থ পাঠ নির্দ্ধারিত হইলে সংহিতারচনার যুগে সাহিত্য, ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতির প্রকৃতি কি ছিল তাহা অনেক পরিমাণে বুঝিয়া লইতে পারা যায়।

সর্ব্বশাস্ত্র গ্রাস করিয়া মহাভারত বেদের মত পূজ্য হইয়াও ছাড়েন নাই; যিনি মহাভারত পাঠ করিবেন তাঁহার আর বেদ পাঠের প্রয়োজন হইবে না, কেন না তিনি মহাভারত পড়িয়াই বেদজ্ঞ হইবেন, এই কথা উক্ত হইয়াছে আ-৬২, ৩২)। মহাভারত যে এত পূজ্য হইল, পঞ্চম বেদ বলিয়া স্বীকৃত হইল, তাহার উপযুক্ত কারণ ছিল। খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ব্বের কোন সাহিত্যে বা লিপিতে মহাভারতের এই অতিপূজনীয়তার নিদর্শন পাওয়া যায় না বলিয়া, অনেক পণ্ডিতের এই প্রকার ধারণা, যে এই প্রকার গৌরব এবং সম্মান লাভ করিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল; কাজেই মহাভারত সংহিতা ঐ যুগের বহু পূর্ব্বে সংকলিত হইয়াছিল। সময়ের বিচার, স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু মহাভারতকে ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইয়াছিল, একথা একেবারেই ঠিক নহে। মহাভারতের প্রকৃতিটুকু বুঝিতে না পারিয়াই এই প্রকার ভুল ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। সেই জন্যই মহাভারতের যথার্থ প্রকৃতি বুঝিবার জন্য, এত কথার আলোচনা করিতেছি।

যে পুরাণেতিহাস সংগ্রহ করিয়া মহাভারত সংহিতা, এবং যে পুরাণেতিহাসের আধার বলিয়া মহাভারত সংহিতা নিজেই পুরাণেতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই পুরাণেতিহাস বৈদিক যুগ হইতেই পঞ্চম বেদনামে আখ্যাত হইয়া আসিয়াছে। অতিপূজ্য বেদত্রয়ে উল্লিখিত না থাকিলেও, ঐ বেদত্রয়ের পরবর্ত্তী অথর্ব্ববেদে পুরাণেতিহাস পবিত্র শাস্ত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (১১-৭, ২৪ এবং ১৫-৬-৪, বোম্বাই শঙ্কর পাণ্ডুরাং পাণ্ডিতের সংস্করণ)। শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে, যে ব্রাহ্মণেরা বেদসহ শিষ্যদিগকে পুরাণেতিহাস শিক্ষা দিয়া থাকেন (১১-৫, ৭ [১]; এবং ১৪-৫, ৪ [১০])। উপনিষদগুলিতে ত পুরাণের উল্লেখ আছেই, তাহা ছাড়া উপনিষদগুলির মধ্যে বৃহদারণ্যকের মত অতি প্রাচীন ছান্দোগ্য উপনিষদে পুরাণেতিহাস পঞ্চম বেদ বলিয়াই অভিহিত হইয়াছে। "* * * যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণম্ পঞ্চমং বেদানাং বেদং ইত্যাদি"। মনে রাখিতে হইবে, যে ইতিহাস পুরাণ, সর্ব্বদাই প্রাচীন গ্রন্থে একবচনে উল্লিখিত। পুরাণ যে ইতিহাস হইতে অভিন্ন এবং অচ্ছেদ্য ছিল তাহা পতঞ্জলির মহাভাষ্যের সময় পর্য্যন্ত উল্লেখ হইতে জানা যায়। পতঞ্জলির সময়, খৃঃ পূঃ ১৪০। যাহা সত্য সত্যই পঞ্চম বেদ, তাহা যে গ্রন্থে সংকলিত হইল, তাহা সংকলনের দিন হইতেই পঞ্চম বেদ নামে আখ্যাত না হইয়াই পারে না।

প্রাচীনকালে, অর্থাৎ অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ১৪০ পর্য্যন্ত, পুরাণেতিহাস বলিয়া একটি শাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়; এবং উহা বহু ছিল না বলিয়াই উহার নাম কেবলমাত্র পুরাণ বা পুরাণেতিহাস। বহু পুরাণ হইবার পরেই বায়ু বিষ্ণু প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম হইয়াছে। শাস্ত্র কথার প্রমাণের জন্য প্রাচীন যে সকল দৃষ্টান্ত, আখ্যান নামে চলিত ছিল, তাহারই নাম পুরাণেতিহাস, অর্থাৎ প্রাচীন আখ্যান। এই পুরাণ কথা, যজ্ঞস্থলে অথবা তদ্রূপ পবিত্র অনুষ্ঠানের সময়, যে সূতদিগের দ্বারা পঠিত হইত, তাহা প্রাচীন বৈদিক-গ্রন্থ বৃহদ্দেবতা, এবং মহাভারত সংহিতাতেই জানিতে পারি। এখনো শ্রাদ্ধাদিতে পুরাণপাঠকেরা মহাভারতাদি পড়িয়া থাকেন। কি জন্য এইরূপ পুরাণ পাঠের প্রয়োজন

হইয়াছিল, তাহাও বৈদিক বৃহদ্দেবতা অবলম্বনে বুঝাইয়া বলিতেছি।

গত বৎসরের পৌষ মাসের "প্রবাসী"তে বৃহদ্দেবতা গ্রন্থের পরিচয়স্বরূপ একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম; যাঁহারা এই প্রবন্ধটি সমালোচকের মত পড়িবেন, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া সেই প্রবন্ধটির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। প্রাচীনকালে যজ্ঞাদি পবিত্র অনুষ্ঠানের সময়ে, ঋক্ উচ্চারিত হইত, সাম গীত হইত এবং যজুর্ব্বেদের নিয়মে বাহ্যিক কার্য্যপ্রণালী চলিত। কোন্ সময়ে কোন্ ঋক্ মন্ত্র পড়িতে হইবে, ঐ ঋকের ইতিহাস কি, পূর্ব্বে ঐ ঋক্ পাঠে কে কি অবস্থায় কি প্রকার ফললাভ করিয়াছিল, এই সকল কথা লইয়া যে সকল পুরাণেতিহাস ছিল, তাহা যজ্ঞাদির সময়ে সূতেরা আবৃত্তি করিতেন। সূতসম্প্রদায়ের কর্ত্তব্যই ছিল, যে তাঁহারা পুরাণেতিহাস কণ্ঠস্থ রাখিবেন, এবং যজ্ঞাদিকালে সেই আখ্যানগুলি আবৃত্তি করিতে থাকিবেন। অর্থাৎ পুরাণেতিহাসগুলিতে বৈদিক অনুষ্ঠানের ফলশ্রুতি বিশেষ ভাবে থাকিত। বৃহদ্দেবতায় যে সকল বৈদিক পুরাণ-কথা পাওয়া যায়, তাহার কোনও কোনটি মহাভারতে অক্ষুণ্ণ আছে, কোনটি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং কোনটির ভিত্তিতে একেবারে নূতন কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে। পুরাণেতিহাস ভিন্ন বেদের ব্যাখ্যাই হয় না। দৃষ্টান্ত দিতেছি। কাহাকেও অন্ধত্বের প্রতীকারের জন্য যজ্ঞ করিতে হইবে; এখন, এজন্য কোন্ ঋক্ পাঠ করিয়া আহুতি দিতে হইবে, কোন্ দেবতাকে পূজা করিতে হইবে, এ সকল কথা যজুতেও নাই, সামেও নাই; আছে পৌরাণিক আখ্যানে। দীর্ঘতমার গল্পটি বৃহদ্দেবতায় উদ্ধৃত হইয়াছে; তিনি যে কারণে অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছিলেন, এবং যে ঋক্ পাঠ করিয়া যে দেবতাকে পূজা করিয়া চক্ষু পাইয়াছিলেন, তাহা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ঋক্‌টির উৎপত্তির ইতিহাস হইতে ফলশ্রুতি পর্য্যন্ত সবটা পাওয়া গেল। এই কারণে পুরাণেতিহাস অতি আদরের সামগ্রী ছিল; এবং সূতদিগের মুখে উহার অনেক আশ্চর্য্য আখ্যান শুনিয়া অনেকেরই লোমহর্ষণ হইত। এই লোমহর্ষণকারী সূতবংশীয়ের মুখেই মহাভারত সংহিতা বিবৃত বলিয়া, মহাভারতে উল্লিখিত পাই।

পুরাণেতিহাস সম্মানিত হইত, এবং হইবারই কথা; এই পুরাণেতিহাস পঞ্চম বেদ নামে পূজ্য হইয়াছিল। যখন সংহিতারূপে প্রচলিত সকল পুরাণেতিহাস, জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত পাণ্ডব-ধার্ত্তরাষ্ট্র কথার সহিত যুক্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল, তখন কোন কৃত্রিম উপায়ে, অথবা সময়ের সাহায্যে মহাভারতকে পূজ্য করাইতে হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে মহাভারতে অঙ্গীকৃত রহিয়াছে, যে যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে। একটি আখ্যায়িকা যদি ভিন্ন ভিন্ন রকমে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল; অথবা যদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচিত গাথা এবং আখ্যায়িকা প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে সেগুলি একই সংহিতাতে যুক্ত হইয়াছিল। এইজন্য তিন চারি রকমের রচনা দেখিয়া বলা যাইতে পারে না, যে মহাভারতে সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রক্ষিপ্ত। কালক্রমে যখন পুরাণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, নূতন ধর্ম্মমতের বা সাম্প্রদায়িক মতের বিকাশ হইয়াছিল, তখন মহাভারত সংহিতার গৌরবের জন্য সেগুলিও মহাভারতে যোজিত হইয়াছিল। এইজন্যই মহাভারত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রক্ষিপ্তভারগ্রস্ত। মহাভারতের প্রকৃতি বুঝিয়া লইবার পর, এখন দেখিতে হইবে যে সংহিতা খানি প্রথম সঙ্কলিত হইবার সময় উহাতে কি ছিল, বা থাকা সম্ভব ছিল; এবং পরবর্ত্তী কালেই বা কোন্ রচনা ঐ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ইংরেজশাসন ও দেশব্যাপী অসন্তোষ।

স্বদেশী আন্দোলনের মূল কারণ।

কেহ কেহ মনে করেন, বৎসরাধিক হইল ভারতবর্ষে যে প্রবল আন্দোলন-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, একমাত্র ইংরেজ-বিদ্বেষই তাহার মূল। ইঁহাদিগের কথার ভাবে বোধ হয় যে, যে সমস্ত শিক্ষিত ভারতবাসী এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন, বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রধান আপত্তি এই যে ইংরেজ বিদেশী—কোনও স্বদেশীয় রাজা তাঁহাদিগের স্থান অধিকার করিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়। এই সংস্কার ভ্রান্ত। কারণ, শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে, বোধ হয়, এমন নির্ব্বোধ কেহই নাই, যিনি মনে করেন, রাজা স্বদেশীয় হইলেই প্রজাসাধারণকে স্বাধীন বলা যাইতে পারে। কোনও দেশের অধিবাসিগণ স্বাধীন কি না, তাহা বিচার করিতে হইলে, তাহাদিগের রাজনৈতিক অধিকার কি প্রকার, তাহাই দেখিতে হয়, রাজা স্বদেশী কি বিদেশী, এ প্রশ্নের সহিত উহার সম্পর্ক বড় কম। অর্থাৎ, আরও সোজা কথায় বলিতে হয়, রাজা বিদেশী হইলেও প্রজাসাধারণ বহুপরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, আবার রাজা স্বদেশীয় হইলেও দেশবাসিগণ ক্রীতদাসরূপে পদ-দলিত হইতে পারে। দুই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। ইংরেজগণ স্বাধীনতার জন্য যত সংগ্রাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহাদিগকে কঠোরতম সংগ্রাম করিতে হইয়াছে তাঁহাদিগের স্বদেশীয় প্রথম চার্লস ও দ্বিতীয়

জেম্‌সের সহিত। পক্ষান্তরে, ওলন্দাজ তৃতীয় উইলিয়ম তাঁহাদিগের বর্ত্তমান স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা, এবং তাঁহার পরে, প্রথম জর্জের সময় হইতেই পার্লিয়ামেণ্ট ও মন্ত্রিগণ সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে আরম্ভ করেন। প্রথম জর্জ্জ তো পূর্ণমাত্রায় বৈদেশিক ছিলেন, তিনি এক বর্ণ ইংরেজী বলিতে পারিতেন না, ভাঙ্গা লাটীনে প্রধান মন্ত্রীর সহিত প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা চালাইতেন, ইংলণ্ড ছাড়িয়া হানোবরে যাইতে পারিলে হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিতেন। আবার তৃতীয় জর্জ্জ ইংলণ্ডেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে ইংরাজ (born Englishman) বলিয়া তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন, অথচ তিনিই আজীবন প্রজাগণের ন্যায্য অধিকার হরণ করিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইয়াছেন। নেপোলিয়নের প্রসিদ্ধ সেনাপতি বার্ণাডট (Bernadotte) সুইডেনের রাজা নির্ব্বাচিত হন এবং চার্লস নাম গ্রহণ করিয়া উহার সিংহাসনে আরোহণ করেন। আর সে দিন নরোয়ে-বাসিগণ সুইডেন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ডেনমার্কের এক যুবরাজকে রাজত্বে বরণ করিয়াছে। ইহাতে সুইডেন বা নরোয়েবাসীদিগের স্বাধীনতা কিছু মাত্র খর্ব্ব হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতবাসী যে আপনাদিগকে পরাধীন বলিয়া অনুভব করিতেছে, তাহার একমাত্র ইহাই কারণ নয় যে, ভারতের রাজা বিদেশী। আমরা জানি, এডোয়াড আমাদের রাজা থাকিলেও আমরা হিন্দু বা মুসলমান আমলের অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে পারি। তবে এই যে দেশব্যাপী অসন্তোষ স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে, ইহার কারণ কি? কারণ, ভারতবাসীর উল্লেখযোগ্য কোনও রাজনৈতিক অধিকার নাই, এবং তজ্জন্য তাহারা কতকগুলি বিষম কুফল ভোগ করিতেছে।

ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার। বিভিন্ন প্রকারের রাজশক্তি।

ভারতবাসীর রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে পূর্ব্বে ভারত-রাজশক্তির অন্তর্ব্যবস্থান বা Constitution of the State ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। তদর্থে বিভিন্ন প্রকারের রাজশক্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে।

প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যত প্রকারের রাজশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাদিগের সকলের যথাযথ বর্ণনা না করিয়া মোটামুটী দুটী মেরু (poles) বা সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। একমেরু, পূর্ণ একনায়কত্ব বা absolute despotism। ফ্রান্সের সর্ব্বপ্রধান নৃপতি চতুর্দ্দশ লুইর একটী কথাতে ইহার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। একদা তিনি কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, "L'etat? c'est moi!" "রাজ্য? সে তো আমি!" এই তন্ত্রের মূলকথা, রাজা স্বয়ং ঈশ্বর, বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তিনিই রাজ্য। প্রজাসাধারণের কোনও স্বত্ব নাই, অম্লানবদনে রাজার আদেশ পালন করাই তাহাদিগের ধর্ম্ম। প্রাচীন ভারতে, পারস্যে, মিসরে, মধ্যযুগে ইউরোপে, এবং বর্ত্তমান সময়ে চীন ও অন্যান্য দেশে এই একনায়কত্ব দৃষ্ট হয়। ইহার বিপরীত মেরু, প্রজাতন্ত্র। অর্থাৎ যে তন্ত্রের ব্যবস্থানুসারে দেশের সমগ্র প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসী (পুরুষ ও রমণী) সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে রাজক্ষমতা পরিচালন করে। বলা বাহুল্য, এইরূপ প্রজাতন্ত্র আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোনও দেশে দেখা যায় নাই। কিন্তু চিন্তাশীল সুধীজনের আশা এই, পৃথিবীতে কোন-না-কোন দিন এই প্রকারের রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভবিষ্যতের আশা, যাহাই হউক, আজকাল যত প্রকারের শাসনপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা ঐ উভয় মেরুর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীতে স্থাপনযোগ্য, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এবং ইহাও বুঝা যাইতেছে, ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রথম মেরুর অতি নিকটবর্ত্তী। এক কথায় বলা যাইতে পারে ভারতবর্ষে একনায়কত্ব বা Despotism প্রতিষ্ঠিত।

মানবজাতির আদিম অবস্থায় যথেচ্ছাচার শাসনপ্রণালী (অথবা absolute despotism tempered by assassination) উপযোগী ছিল। কিন্তু কালক্রমে বিভিন্ন জাতি যতই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছে, ততই উহা অনুপযোগী হইয়া পড়িতেছে। এ জন্য সভ্য দেশ মাত্রেই প্রজাশক্তি ক্রমেই প্রসারলাভ করিতেছে। এবং কোথায়ও বা বিনা রক্তপাতে, কোথায়ও বা লক্ষ লোকের শোণিতবিনিময়ে একনায়কত্ব স্থলে বহুনায়কত্ব (বা democracy) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের চক্ষে ভারতবর্ষ সভ্য নয় সুতরাং এদেশে প্রজাশক্তি প্রতিষ্ঠার আশা বাতুলতা বলিয়া উপহাসাস্পদ। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, অপ্রতিহত রাজশক্তি প্রজারঞ্জক বা প্রজাপীড়ক উভয়ই হইতে পারে। হিন্দু রাজাদিগের ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল, কিন্তু মনুসংহিতা ও মহাভারতে যে রাজকর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে মনে হয়, প্রাচীনকালে এ দেশে প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই রাজার প্রধান কার্য্য ছিল। অর্থাৎ হিন্দু despotism benevolent despotism ছিল। আকবরের সম্বন্ধেও ঐ কথা প্রযোজ্য। প্রশ্ন এই, ইংরেজ শাসন কি পূর্ণমাত্রায় প্রজারঞ্জক? British despotism কি benevolent despotism? অথবা ভারত গবর্ণমেণ্ট অসীম ক্ষমতাশালী হয় হউক, কিন্তু উহা কি গবর্ণমেণ্টের অবশ্যকর্ত্তব্য সকল পালন করিতেছে? ইংরেজ শাসনের গুণাগুণ এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করিতেছে।

রাজশক্তির প্রধান কর্ত্তব্য—স্পেন্সারের মত।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হয়,

গবর্ণমেণ্টের অবশ্যকরণীয় কার্য্য কি। আমরা এ বিষয়ে প্রথমে হার্বার্ট স্পেন্সারের মত আলোচনা করিব। যে সমাজ বর্ব্বরাবস্থা অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত সুসভ্যাবস্থায় উপনীত হইয়াছে, সে সমাজস্থ নরনারীগণের একটী নৈসর্গিক অধিকার এই যে তাহারা প্রত্যেকে অপরের স্বাধীনতায় হস্তার্পণ না করিয়া ইচ্ছানুরূপ আপনাদিগের শক্তির ব্যবহার করিতে পারে।

[Every man has freedom to do all that he wills provided he infringes not the equal freedom of any other man—*Social Statics*, p 54.]

এই নীতি অনুসারে প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি স্বত্ব (rights) আছে। সে যাহাতে এই স্বত্বগুলি অব্যাহতভাবে ভোগ করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করাই গবর্ণমেণ্ট বা রাজশক্তির কর্ত্তব্য। দেশে শান্তি রক্ষা করা অর্থাৎ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, এবং বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে নিরাপদ রাখা, এই কর্ত্তব্যেরই অন্তর্গত।

[When we agreed that it was the essential function of the State to protect—to administer the law of equal freedom—to maintain men's rights; we virtually assigned to it the duty, not only of shielding each citizen from the trespasses of his neighbours, but of defending him, in common with the community at large, against foreign aggressions—*Social Statics*, p. 115.]

এই আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে, ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালীও দোষশূন্য নয়, ভারতর্ষের সম্বন্ধে আর কা কথা! যে দেশের অধিবাসীরা সমুদ্রতীরে বাস করিয়াও পয়সা দিয়া লবণ কিনিতে বাধ্য হয়, সে দেশে মানবজাতির নৈসর্গিক স্বাধীনতার কথা উপস্থিত করাই বিড়ম্বনা। অতএব অতঃপর অন্য আদর্শের অনুসন্ধান করা যাক।

রাজশক্তির গুণ পরীক্ষা—মিলের মত।

উৎকৃষ্ট শাসনপ্রণালী (good government) কাহাকে বলে? মিল্ বলেন :—

"The most important point of excellence which any form of Government can possess is to promote the virtue and intelligence of the people themselves."—*Representative Government*, p. 12.

পুনশ্চ, "All government which aims at being good is an organization of some part of the good qualities existing in the individual members of the community, for the conduct of its collective affairs."—*Do* p. 13

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, নিম্নোক্ত কথায় তাহার সার সংগৃহীত হইয়াছে :—

"We have now, therefore, obtained a foundation for a twofold division of the merit which any set of political institutions can possess. It consists partly in the degree in which they promote the general mental advancement of the community, including under that phrase advancement in intellect, in virtue, and in practical activity and efficiency; and partly of the degree of perfection with which they organize the moral, intellectual, and active worth already existing, so as to operate with greatest effect on public affairs"—*Do* pp. 13,14.

মিল যাহা বলিতেছেন, তাহার মর্ম্ম এই। উৎকৃষ্ট শাসন প্রণালী তাহাকেই বলা যাইতে পারে, যদ্দ্বারা জনসাধারণের মানসিক, নৈতিক ও কার্য্যকরী শক্তিসমূহ সম্যক বিকশিত হয়, এবং যাহা ঐ সকল শক্তিকে যথাসম্ভব কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের হিত সাধন করে। এক্ষণে যদি দেখা যায় কোনও দেশের শাসনকার্য্যে তদ্দেশবাসীদিগের মোটেই কোন হাত নাই—তাহারা কেবল কর প্রদান করে, কিন্তু তাহার ব্যয় সম্বন্ধে উচ্চ বাচ্য করিতে পারে না—তাহারা দিন দিন আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে, উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রের অভাবে তাহাদিগের মানসিক শক্তি বিকশিত হইতে পারিতেছে না এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নৈতিক বল হারাইতেছে—যদি দেখা যায়, সে দেশের উচ্চতর রাজকার্য্য সমস্তই বৈদেশিকদিগের একচেটিয়া, জনসাধারণ স্বদেশে ভারবাহী গর্দ্দভ মাত্র,—তবে বলিতে হইবে, মিলের আদর্শানুসারে এই রূপ শাসনপ্রণালী নিতান্ত দোষযুক্ত। বস্তুতঃ প্রাচীন হিন্দু আদর্শ বা বর্ত্তমান উন্নততর ইয়ুরোপীয় জ্ঞান—যাহা দ্বারাই বিচার করি না কেন, এক্ষণে এ দেশে যে প্রকারের শাসনপ্রণালী প্রচলিত আছে, রাজপুরুষগণের স্বার্থপরতা ভিন্ন তাহার সপক্ষে বলিবার আর কিছুই নাই। কথাটা যে একান্তই অসঙ্গত ও মিথ্যা নয়, তাহা বুঝাইবার জন্য ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

ইংরেজ শাসনের দোষ ও অভাব।
স্পেন্সারের উক্তি।

এ কথা বলিবার অপেক্ষা করে না যে অপরের দেশ জয় করিতে হইলে ন্যায় ধর্ম্মকে পদদলিত করিতে হয়। ইংরেজের ভারত জয়ে এই সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হইবে, ইহা কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই আশা করিতে পারেন না। সুতরাং ইংরেজ কি কি উপায়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ অধিকার করিলেন, তাহার অনুসন্ধান করার আবশ্যক নাই। প্রশ্ন এই, অতীতকালে যাহাই হউক, এক্ষণে কি ইংরেজের রাজদণ্ড ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুজ্ঞানুসারে পরিচালিত হইতেছে? ইহার উত্তরে হার্বার্ট স্পেন্সারের ন্যায় নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠ দার্শনিক লেখক কি বলেন শুনুন। ভারতে ইংরেজগণ যে সকল বহুবিধ কুকর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার কতকগুলি উল্লেখ করিয়া স্পেন্সার ক্ষোভসহকারে বলিতেছেন :—

"Even down to our own day kindred iniquities are continued. Down to our own day, too, are continued the grievous salt-monopoly, and the pitiless taxation which wrings from the poor ryots nearly half the produce of the soil. Down to our own day continues the cunning despotism which uses native soldiers to maintain and extend native subjection."—*Social Statics*, p. 194.

[এখনও পূর্ব্বের ন্যায় অন্যায় আচরণ চলিতেছে। এখনও ভারবহ লবণের একচেটিয়া রহিয়াছে এবং নির্দ্দয়রূপে প্রজাগণের নিকট হইতে ভূমির প্রায় অর্দ্ধেক শস্য কররূপে গৃহীত হইতেছে। এখনও এই ধূর্ত্ত যথেচ্ছাচার তন্ত্র ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে ভারতবাসীকে পরাধীন করিয়া রাখিতেছে ও নূতন নূতন প্রদেশ জয় করিতেছে।]

আর একজন ইংরাজের মত।

বর্ত্তমান ভারত শাসনের মূল প্রকৃতি কি? ইহা এদেশে সুফল না কুফল প্রসব করিতেছে? একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ বলেন, যে সকল কুকীর্ত্তির জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর কুফল তাহা অপেক্ষাও ভীষণ। সেই কুফল কি?

It is the alien rule of India in its present form! it is the economic drain of India's resources; it is the subordination of the interests of the sons of the soil to the interests of the foreigners; it is the consideration always of England before India.—*Digby's Prosperous British India*, p. 638.

অর্থাৎ সেই কুফল আর কিছুই নহে—বর্ত্তমান আকারের বৈদেশিক শাসন হইতে যাহা প্রসূত হইতে পারে তাহাই। উহা ভারতের শোষণ, বৈদেশিকদিগের স্বার্থের নিকট ভারতবাসীর স্বার্থের বলিদান, ভারতের কথা ভাবিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের কথা ভাবা। ইহাতে দেশের যে দশা হওয়া সম্ভব, তাহাই দিন দিন স্পষ্টীকৃত হইতেছে।

দাদাভাই নৌরোজীর মত।

শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী Poverty and un-Birtish Rule in India নামক প্রসিদ্ধগ্রন্থে ভারতবাসীর অবস্থা ও ইংরেজশাসনের দোষ গুণ সম্যক্ আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন:—

"The existing system of British Rule is an un-British, debasing, destructive, despotic and impoverishing Rule."

এই কথার মধ্যে একবর্ণ অত্যুক্তি নাই। ক্রমে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

[un-British অবৃটিশ]

বৃটিশ রাজনীতির মূলসূত্র কি? No Representation no taxation, অর্থাৎ কেবল প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিগণই করস্থাপন করিতে পারে, তাহাদিগের সম্মতি ব্যতীত রাজার করস্থাপনের অধিকার নাই। ইহা হইতে দ্বিতীয় এই সূত্র প্রসূত হইয়াছে যে প্রজাসাধারণের অমতে রাজস্ব ব্যয়িত হইতে পারে না, তাহাদিগের মত বিরুদ্ধ কোনও কার্য্য করিতে চাহিলে প্রজাগণ রাজার আয়ের পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু ভারতে কি দেখিতে পাই? বড়লাটের মন্ত্রিসভায় রাজস্বের হিসাব উপস্থিত করা হয় বটে, কিন্তু দেশীয় সদস্যগণ তদুপরি শুধু বক্তৃতা করিতে পারেন, প্রজার রক্তশোষণ করিয়া যে কর আদায় হয়, তাহা শত অপকর্ম্মে অপব্যয়িত হইলেও তাঁহাদিগের কোনও প্রতীকার করিবার সাধ্য নাই। ফলে দিন দিন যুদ্ধের আয়োজনে কত অর্থ জলের ন্যায় খরচ হইতেছে, তাহার ঠিকানা নাই। এদিকে শিক্ষা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক কার্য্যে একান্ত অর্থাভাব। শুধু তাই নয়। পূর্ব্বে চীন হইতে পশ্চিমে মিসর পর্য্যন্ত যেখানে ইংরেজগণ প্রয়োজনে নিষ্প্রয়োজনে যে যুদ্ধে ব্যাপৃত হউন না কেন ভারতবাসীকে তাহার খরচ জোগাইতেই হইবে। কাবুলের আমীর বা তাঁহার পুত্র বিলাতে গেলে তাঁহার অভ্যর্থনার ব্যয় দরিদ্র ভারতবাসীকে বহন করিতে হইবে। পারস্যের শাহ বিলাতে ভোজ খাইলে সে আতিথেয়তার ব্যয়টাও আমাদিগকেই দিতে হইবে। আরও দেখুন, কি ন্যায় বিচার! উপনিবেশ সমূহের জন্য বিলাতে যে আফিস আছে, উপনিবেশবাসীরা তাহার ব্যয় স্বরূপ এক কপর্দ্দকও দেয় না, অথচ ভারত-সচিবের বেতন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার আফিসের কাগজ কলম, আলপীনটীর ব্যয় পর্য্যন্ত কড়া ক্রান্তি হিসাব করিয়া সমস্তই ভারতবাসীকে দিতে হয়। এদেশে গোরা সৈন্য পাঠাইতে হইবে, বিলাতে তাহাদিগের সংগ্রহ ও শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হয় তাহা তো ভারতবর্ষ দিতে বাধ্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় সৈন্য রাখার ব্যয়টা যে ভারতবাসীর স্কন্ধে পড়ে নাই, সেটা তাহাদিগের নিতান্ত কপালের জোর। এই সমস্ত যদি un-British—ন্যায়বিরুদ্ধ—না হয়, তবে আর ন্যায় অন্যায় বলিয়া দুটা কথা অভিধানে আছে কেন?

[*Debasing* অবনতিজনক]

বৃটিশ ভারতে শিক্ষিত ভারতবাসীর উচ্চতর মানসিক শক্তি বিকাশের সুযোগ নাই। প্রথমতঃ সমগ্র ভারতবাসী নিরস্ত্র, সৈনিক বিভাগের উচ্চকর্ম্মে তাহাদিগের প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং তাহারা দিন দিন নির্ব্বীর্য্য, অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে। বহিঃশত্রুর কথা দূরে থাকুক, তাহারা বন্য জন্তুর হস্ত হইতেও আপনাদিগকে বাঁচাইতে পারে না। উচ্চতর রাজকার্য্যের দ্বারও তাহাদিগের নিকট রুদ্ধ। ফলে, বৃটিশ ভারতে মাধবরাও, সালরজঙ্গ, কৃপারাম, দিনকর রাও, ফয়জআলি খাঁ, পূর্ণিয়া, শেষাদ্রি আয়ার প্রভৃতি মনস্বী লোকের স্থান নাই। আনন্দমোহন বসু,

রমেশচন্দ্র দত্ত, গোপালকৃষ্ণ গোখলে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিলে শাসনবিভাগে কোন্ পদ লাভ করিতেন, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এ বিষয়ে আকবরের উদার ও দূরদর্শী নীতির সহিত ইংরেজের অনুদার, সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থান্ধ নীতির কোন তুলনাই হয় না। আকবর মানসিংহকে কাবুলের ন্যায় একটী নিরবচ্ছিন্ন মুসলমান অধ্যুষিত দেশের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের কথা ত বলাই নিষ্প্রয়োজন। কেহ কি কল্পনা করিতে পারেন, ইংরেজগণ গাইকোয়াড়কে কানাডার গবর্ণর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত করিতে পারেন? কানাডা তো পরের কথা,—মর্লীর অত বড় বক্তৃতার পরেও তো বাবু কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত বঙ্গের অস্থায়ী ছোটলাট না হইয়া মৎস্য-রক্ষণকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। আরও নীচে অবতরণ করা যাক। রমেশ বাবু বর্দ্ধমানের কমিসনরের পদে উন্নীত হইলে ইংরেজ কর্ম্মচারীগণের মধ্যে কি বিষম কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল—ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় যাহাতে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ হইতে না পারেন, তদুদ্দেশ্যে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ যেদিন প্রধান বিচারপতির আসন গ্রহণ করেন সেদিন শ্বেতাঙ্গব্যবহারাজীবগণ অনুপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন—ইহা যখন স্মরণ করি, তখন ইংরেজ চরিত্রের সঙ্কীর্ণতা ভাবিয়া বস্তুতঃই বড় ক্ষুব্ধ হইতে হয়। একটী অপরিবর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে চর্চ্চার অভাবে কোনও শক্তিই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। ভারতবাসীর জন্য উচ্চতর মানসিক শক্তি বিকাশের ক্ষেত্র নাই, সুতরাং তাহারা যে দিন দিন নানা প্রকারে শক্তিহীন হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর বৈচিত্র কি? "আগে উপযুক্ত হও, পরে আশা করিও", এই প্রবাদ বাক্য ইংরেজের মুখে সর্ব্বদাই শুনা যায়। কিন্তু আগে সন্তরণ শিখিয়া পরে কেহ জলে অবতরণ করে কি? বুদ্ধি প্রকাশের কোনও সুযোগ না দিয়া কাহাকেও নির্ব্বোধ বলিয়া উপহাস করা, রাজনীতি হইতে পারে, কিন্তু উহা ধর্ম্মনীতি নহে।

[*Destructive and impoverishing* সর্ব্বনাশী ও দারিদ্র্যোৎপাদক]

অনেকেই জানেন, একশত বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধে যত লোক মরিয়াছে, এক ভারতবর্ষে বিগত পঞ্চাশ বৎসরের দুর্ভিক্ষে তদপেক্ষা অনেক অধিক লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ইহার কারণ কি? অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি তো পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঘটিতেছে। তবে শুধু ভারতবর্ষেই লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হইতেছে কেন? ইহার একমাত্র উত্তর, ভারতের সাংঘাতিক দারিদ্র্য। দাদাভাই নৌরোজী বা ডিগবীর গণনা না হয় নাই স্বীকার করিলাম। লর্ড ক্রোমার এবং লর্ড কার্জ্জনের উক্তি অনুসারেও ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র। প্রতি ইংরেজের আয় বার্ষিক ত্রিশ পৌণ্ড, প্রতি ভারতবাসীর আয়, সরকারী গণনানুসারে, মোটে দুই পৌণ্ড। অথচ প্রত্যেক ইংরাজ আয়ের শতকরা আটভাগ কর স্বরূপ প্রদান করেন, আর প্রতি ভারতবাসীকে আয়ের শতকরা পনর ভাগ দিতে হয়। এই ঘোর দারিদ্র্য কি ভারতবাসীর অলঙ্ঘনীয় কর্ম্মফল, না ইহার জন্য রাজপুরুষগণও কিয়ৎ পরিমাণ দায়ী? দায়ী বই কি। ইংরেজগণ অধর্ম্মাচরণ করিয়া ভারতীয় শিল্পের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন, এবং বর্ষে বর্ষে প্রায় পঁয়তাল্লিশ কোটী টাকা শোষণ করিতেছেন। এই দুই কারণে ভারতবাসী হৃতসর্ব্বস্ব ও রক্তহীন হইয়া পড়িতেছে। এই জন্যই দিনের পর দিন প্রায় দশকোটী ভারতবাসী অর্দ্ধাশনে জীবনপাত করিতেছে—এই জন্যই যখনই দৈব কিঞ্চিন্মাত্র প্রতিকূল হন, তখনই পঙ্গপালের ন্যায় ভারতীয় প্রজা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

[*Despotic* যথেচ্ছাকারী]

১৮৩৩ সনে, পার্লিয়ামেণ্ট ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নূতন সনন্দ দিবার সময় আইন করিলেনঃ—

That no Native of the said territories, nor any natural-born subject of his Majesty resident therein, shall, by reason only of his religion, place of birth, descent, colour, or any of them, be disabled from holding any place, office, or employment under the said Company.

অর্থাৎ ভারতীয় কোনও প্রজা কেবল জাতি বা ধর্ম্মগত পার্থক্য নিবন্ধন কোনও রাজকার্য্য হইতে বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু ১৮৫৮ সন পর্য্যন্ত এই বিধি শুধু কাগজপত্রেই আবদ্ধ রহিল। ঐ সনে মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতসাম্রাজ্য গ্রহণ করিয়া ঘোষণা করিলেনঃ—

"And it is our further will that, so far as may be, our subjects, of whatever race or creed, be freely and impartially admitted to offices in our service, the duties of which they may be qualified, by their education, ability, and integrity, duly to discharge.

[শিক্ষা, দক্ষতা ও সততা দ্বারা উপযুক্ত হইলে ভারতবাসী জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যত দূর সম্ভব সমস্ত রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে।] ইহার পরে ১৮৬০ সনে, এই অভিপ্রায় কার্য্যে কতদূর পরিণত হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য, ভারত-সচিবের কয়েকজন সদস্য লইয়া একটী কমিটী গঠিত হয়। কমিটী রিপোর্ট দিলেন, ইংলণ্ডে ও ভারতে যুগপৎ সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা গৃহীত হইলে ভারতবাসীর প্রতি ন্যায্য ব্যবহার হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন, মহা বিপদ; রিপোর্টটী প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষে একটা তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইবে। অতএব রিপোর্টটীকে বেমালুম চাপা দিলেন। এমন চাপা দিলেন

যে আজ পর্য্যন্ত অল্পলোকেই উহার খোঁজ রাখেন; দাদাভাই অনেক আয়াস স্বীকার করিয়া তাহার তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহার ৩৩ বৎসর পরে, ১৮৯৩ সনের ২রা জুন হাউস্ অব্ কমন্স এই মর্ম্মে এক মন্তব্য নির্দ্ধারণ করেন যে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে যুগপৎ গৃহীত হইবে। বলা বাহুল্য, এই মন্তব্যও বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্টের একটী এতবড় নির্দ্ধারণ এমন ভাবে পদদলিত হইল, অথচ তজ্জন্য ইহার সভ্যগণ একটীবার উচ্চবাচ্য করিলেন না, ইহার অর্থ কি? লর্ড সল্‌সবেরীর কথায় সেই অর্থ প্রকাশিত হইতেছে—ভারতবাসীকে বহুলভাবে রাজকার্য্যে নিয়োগের কথা একটা রাজনৈতিক ভণ্ডামি বা প্রবঞ্চনা—political hypocrisy. লর্ড লিটনের এক গোপনীয় পত্রেও এই উক্তি সমর্থিত হইতেছে:—

We have had to choose between prohibiting them and cheating them: and we have chosen the least straightforward course * * * Since I am writing confidentially I do not hesitate to say that both the Governments of England and of India appear to me up to the present moment, unable to answer satisfactorily the charge of having taken every means in their power of breaking to the heart the words of promise they had uttered to the ear.

অর্থাৎ ভারতবাসী রাজকার্য্য পাইবে না, স্পষ্ট এরূপ না বলিয়া, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে মিথ্যা আশায় প্রবঞ্চিত করিতেছেন। মুখে আশার বাণী শুনাইয়া কার্য্যতঃ সে আশায় নিরাশ করা—এই অভিযোগ হইতে কি ভারত গবর্ণমেণ্ট কি বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ, কেহই মুক্ত নহেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের কেমন অকপট সুহৃৎ, দাদাভাই নৌরোজীর নিম্নোক্ত কথায় তাহা ব্যক্ত হইতেছে:—

"The way of the Indian authorities is first to ignore any Act or Resolution of Parliament or Report of any Committee or Commission in favour of Indian interests. If that is not enough, then to delay replies. If that does not answer, then openly resist, and by their persistence carry their own point unless a strong Secretary of State prevents it."—*Poverty and un-British Rule in India*, p. 432.

অর্থাৎ ভারতবাসীর হিতকল্পে যদি পার্লিয়ামেণ্টের কোনও আইন বা নির্দ্ধারণ থাকে, অথবা কোনও কমিটী বা কমিশন কোনও রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন, তবে ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রথমে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া চলেন। তাহাতে না কুলাইলে, ভারত-সচিব এইরূপ নির্দ্ধারণের প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে, তাঁহারা পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব করেন। (কোন কোনও স্থলে এইরূপ দীর্ঘসূত্রিতা দ্বারা দশ বৎসর অতিবাহিত হয়—প্রমাণ ষ্ট্যাটুটরী সিবিল সার্ব্বিস সম্বন্ধে ভারত-সচিবের আদেশ ও তৎপ্রতিপালনে ভারত গবর্ণমেণ্টের তৎপরতা)। যখন ইহাতেও কুলায় না, তখন তাঁহারা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন, এবং সর্ব্ববিধ উপায়ে ভারতবাসীর পক্ষে হিতকর প্রস্তাবটীকে পণ্ড করিবার জন্য প্রয়াস পান। এরূপ বীর্য্যবান্ ভারত-সচিব আজ পর্য্যন্ত অতি অল্পই দেখা গিয়াছে, যিনি তাঁহাদিগের প্রাণপণ প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া এরূপ কোনও প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছেন। যাঁহারা দাদাভাইএর এই মন্তব্যের প্রমাণ চান, তাঁহারা তাহার গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন।

আমাদিগের উন্নতির জন্য রাজপুরুষগণ কেমন ব্যগ্র, আর একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখান যাইতেছে। ভারতবাসীর অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার উদ্দেশ্যে সরকার বাহাদুর জনপ্রতি উচ্চশিক্ষায় এক পয়সা ও নিম্নশিক্ষায় এক আনার কম ব্যয় করিতেছেন। আর ১৯০৪-৫ সালে বিলাতী গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ হইতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে জনপ্রতি প্রায় সাত শিলিং (৫।০) ও আয়র্লণ্ডে ৬ শিলিং ৫॥০ পেন্স (প্রায় ৫ টাকা) দিয়াছেন। ইহার উপর স্থানীয় কর ও অন্যান্য ভাণ্ডার হইতেও যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছে।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দাদাভাই হাউস্ অব কমন্সে বলিয়াছিলেন:—

"The evil of foreign rule involved the triple loss of wealth, wisdom, and work."

বৃটিশ শাসনে ভারতের ত্রিবিধ ক্ষতি হইতেছে। প্রথম—ভারতের রক্তশোষণ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বর্ষে বর্ষে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা বিলাতে যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ ভারতবাসী জ্ঞান ও বুদ্ধি হারাইতেছে, কারণ তাহারা দেশ-শাসন ও সংরক্ষণে বঞ্চিত বলিয়া তাহাদিগের জ্ঞান-বুদ্ধির উপযুক্ত পরিচালনা হইতেছে না। তৃতীয়তঃ রাজকার্য্যে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তাহাদিগের প্রাপ্য স্থান ইয়ুরোপীয়গণ গ্রহণ করাতে তাহারা জীবিকোপার্জ্জনে ক্লেশ পাইতেছে।

দেশীয় রাজ্যের সহিত তুলনা।

এই তো বৃটিশ ভারতবর্ষের অবস্থা। এখন একবার একটা দেশীয় রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ১৮৮১ সনে মহীশূর দেশীয় নৃপতির হস্তে প্রত্যর্পিত হয়। তখন—সুদীর্ঘ বৃটিশ শাসনান্তে—উহার ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট আশীলক্ষ টাকা ঋণ ছিল, এবং আয়ের অপেক্ষা সমগ্র ঋণের পরিমাণ পোণে একত্রিশ লক্ষ টাকা অধিক ছিল। স্বদেশীয় শাসনাধীনে মহীশূরের কি দ্রুত উন্নতি হইতেছে! ১৮৮১ সনে উহার বার্ষিক রাজস্ব এককোটি তিনলক্ষ ও ১৮৯৪-৫ সনে এককোটী আশী লক্ষ টাকা ছিল। আর গত বৎসর

উহা (১৯০৫-৬) দুই কোটি একচল্লিশ লক্ষ আঠার হাজার টাকা হইয়াছে। সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া গত বৎসর নয় লক্ষ বিরনব্বই হাজার টাকা উদ্বর্ত্ত হয়। বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভে রাজকোষে প্রায় এককোটি টাকা সঞ্চিত ছিল। অথবা মহীশূরের ন্যায় উন্নত দেশীয় রাজ্যের সহিত তুলনারই বা প্রয়োজন কি? স্বদেশী ও বিদেশী শাসনের তুলনা করিয়া লর্ড সল্‌সবেরী স্বয়ং বলিতেছেন :—

"The British Government has never been guilty of the violence and illegality of Native Sovereigns. But it has faults of its own, which, though they are far more guiltless in intention, are more terrible in effect"—*Poverty, &c.*, p. 370.

"বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দেশীয় নৃপতিদিগের ন্যায় অবিচার অত্যাচার করেন না"---(মোটেই করেন না, এমন এখন আর বলিতে পারি না,—নাতু ভ্রাতৃদ্বয় এবং বরিশাল প্রাদেশিক সমিতি ইহার সাক্ষী)। "কিন্তু ইহার এমন কতকগুলি দোষ আছে যাহা কর্তৃপক্ষগণের অভিপ্রায় বিশুদ্ধ হইলেও অতি ভীষণ ফল প্রসব করিতেছে।" এই জন্যই দাদাভাই নৌরোজী বলিয়াছেন :—

"The romance is that there is security of life and property in India; the reality is that there is no such thing."—*Do.*, p. 224.

এখন ভারতবাসীর জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ, এটা নিতান্তই কবিকল্পনা। দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ নাই, সত্য বটে, কিন্তু ইংরেজের গ্রাস হইতে ভারতবাসীর ধনপ্রাণ কে রক্ষা করিবে?

হিন্দু বা মুসলমান রাজারা অত্যাচার করিতেন, সত্য কথা। কিন্তু হিন্দু বা মুসলমান despotism এর সঙ্গে Britsh despotism এর পার্থক্য কি? পার্থক্য এই, তখন রাজা ছিলেন একজন, এখন রাজা প্রায় চারি কোটি। জন ষ্টুয়ার্ট মিল যথার্থই বলিয়াছেন :—

"It is not certain that the despotism of twenty millions is necessarily better than that of a few or of one."

"এক জনের যথেচ্ছাচার অপেক্ষা দুই কোটিলোকের যথেচ্ছাচার নিশ্চয়ই শ্রেয়ঃ হইবে, এমন কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না।"

প্রতীকারের পন্থা—বৈদেশিক শাসনের অপরিহার্য্য ত্রুটি।

আমাদিগের নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকে মনে করেন পার্লিয়ামেণ্ট যদি ভারতবর্ষের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেন, ইংলণ্ডের জনসাধারণ যদি এ দেশের প্রতি আর একটু দৃষ্টিপাত করেন, তবেই আমাদিগের ভাগ্য ফিরিতে পারে। এ বিষয়ে মিল্ কি বলেন, শুনুন :—

"To govern a country under responsibility to the people of that country, and to govern one country under responsibility to the people of another, are two very different things. What makes the excellence of the first is that freedom is preferable to despotism: but the last *is* despotism."—*Repr. Government*, p. 135.

অর্থাৎ ইংলণ্ড শাসনের জন্য ইংরাজদিগের নিকট জবাবদিহী থাকা, আর ভারতশাসনের জন্য ইংলণ্ডের নিকট জবাবদিহী থাকা, দুই স্বতন্ত্র বস্তু। প্রথমটার অর্থ প্রজাসাধারণের স্বাধীনতা; দ্বিতীয়টার অর্থ ভারতের পূর্ণ পরাধীনতা। মোট কথা, ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি পার্লিয়ামেণ্টের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করেন, ইংলণ্ডের জনসাধারণ যদি দিবা রাত্রি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ভারতের মঙ্গলামঙ্গল পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতেও ভারতবাসীর দুঃখ দূর হইবে না, তাহাতে বরং ভারতের ভাগ্যে কেবল এক লাট কার্জ্জনের স্থলে লক্ষ লাট কার্জ্জন লাভ হইবে। ইহার কারণ কি? কারণ মিল নিজেই বলিতেছেন :—

"It is always under great difficulties and very imperfectly, that a country can be governed by foreigners. Foreigners do not feel with the people.—*Repr. Government*, p. 135.

"বৈদেশিক শাসন সর্ব্বদাই অতি দুরূহ ও অসম্পূর্ণ—বৈদেশিকেরা কখনও প্রজাসাধারণের সহিত একহৃদয় হইতে পারে না।" পুনশ্চ—

"The government of a people by itself has a meaning, and a reality; but such a thing as government of one people by another, does not and cannot exist. One people may keep another as a warren or preserve for its own use, a place to make money in, a human cattle-farm to be worked for the profit of its own inhabitants. But if the good of the governed is the proper business of a government, it is utterly impossible that a people should directly attend to it."—*Repr. Government*, p. 135.

"একজাতি আপনাদিগের শাসনকার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতেছে, ইহা সম্ভবপর; কিন্তু এক জাতি অপর জাতিকে শাসন করিতেছে, ইহা কখনও হইতে পারে না। এক জাতি অপর জাতিকে আপনাদিগের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করিতে পারে; অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্র বা গোশালারূপে আপনাদিগের লাভের জন্য তাহাদিগকে লইয়া ব্যবসায় চালাইতে পারে। কিন্তু প্রজাগণের হিতসাধন যদি রাজ্যশাসনের উদ্দেশ্য হয়, তবে ইহা নিশ্চিত যে একটী সমগ্র জাতি কখনও সাক্ষাৎভাবে তাহাতে মনোযোগী হইতে পারে না।"

এতক্ষণ যাহা আলোচনা করিলাম, তদ্দারা বুঝা গেল, ভারত শাসনে যে সকল দোষ রহিয়াছে তাহার মধ্যে কতকগুলি বৈদেশিক শাসন হইতে উৎপন্ন—সেগুলি বর্ত্তমান প্রণালীর সংশোধন না হইলে অপরিহার্য্য। আর কতক-

গুলি অনায়াসেই দূর হইতে পারে, যদি মহারাণীর ঘোষণাপত্র ও পার্লিয়ামেণ্টের বিধান কথার কথা থাকিয়া না যায়, যদি কেবল ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য ভারতবর্ষ শাসিত হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই, ভারতবাসী যে দিন দিন ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার কোনও উপায় আছে কি? আছে। স্বদেশী আন্দোলন সেই উপায় প্রদর্শন করিতেছে। প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

জাতিভেদ—আধুনিক ও পৌরাণিক।

জাতিভেদ সম্বন্ধে এতদিন ব্রাহ্মসমাজের লোকেরাই আলোচনা করিতেন; হিন্দুসমাজের লোকেরা এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা আবশ্যক মনে করেন নাই। সম্প্রতি একদল শিক্ষিত হিন্দু জাতিভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। তাঁহারা যে ঠিক্ জাতিভেদের নাম করিয়াই জাতিভেদের আলোচনা করেন, তাহা নয়। কখনো ব্রাহ্মণজাতির প্রাধান্য, কখনো বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—এইরূপ নূতন নূতন নামে জাতিভেদ সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান সময়ে এই পুরাতন বিষয়টির নূতনভাবে আলোচনা করাও আবশ্যক হইয়াছে। কারণ, আগে যাঁহারা জাতি বাঁচাইয়া চলিতে অসম্মত হইতেন, হয় তাঁহারা খ্রীষ্টান হইতেন, নয় ত তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন। কিন্তু এখন এমন অনেক লোক আছেন, তাঁহারা জাতিভেদও মানেন না, হিন্দুসমাজও ছাড়েন না; তাঁহারা বলেন প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্গে জাতিভেদের সম্পর্ক কি? এই জন্য প্রকাশ্যে কিম্বা গোপনে ইহারা হোটেলে খানা খান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান ও মুসলমানের বাড়ী গিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন; আবশ্যক হইলে নিজের বাড়ীতে বসিয়াও নিম্ন জাতির অন্ন গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না।

তদ্ভিন্ন এখন বিলাতপ্রত্যাগত শিক্ষিত বাঙ্গালীর দলও প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন। পূর্ব্বে ইহারা হিন্দুসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতেন। এখন ইহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়াই পরিচয় দিতেছেন। শুধু তাহাই নহে; বিলাতপ্রত্যাগত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যার সঙ্গে মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর পুত্রের বিবাহ হইয়াছে—হিন্দু মতেই হইয়াছে। আবার রাজকুমার হিন্দুসমাজে থাকিয়াই বিলাতযাত্রা করিয়াছেন। হিন্দুসমাজের সাধ্য নাই যে ইঁহাদিগকে অহিন্দু বলেন। অহিন্দু বলিলে ইঁহারাই যে হিন্দুসমাজের লোকদিগকে অহিন্দুর মধ্যে গণ্য করিবেন! কারণ অর্থে এবং জ্ঞানে এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই বাঙ্গলাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতেছেন। সুতরাং জাতিভেদ মানিয়া চলিলে সমাজের কল্যাণ হইবে না অকল্যাণ হইবে,—ইহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক হইয়াছে।

ইহা ছাড়া বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষেও দেশের লোকের মনে জাতিভেদ সম্বন্ধে নূতন চিন্তার উদয় হইয়াছে।

প্রথমতঃ সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় দেশের একশ্রেণীর নেতৃস্থানীয় লোক মনে করিতেছেন, জাতিভেদের দ্বারা ভারতের ঘোর অনিষ্ট হইয়াছে। জাতিভেদের জন্য ভারতে জ্ঞানবিস্তার হয় নাই, জাতিভেদের জন্য শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হয় নাই, জাতিভেদের জন্য জাতীয় একতা সংস্থাপিত হয় নাই;—রমেশ বাবু তৎপ্রণীত ইতিহাস গ্রন্থে এই জাতিভেদের দ্বারা দেশের নানা প্রকার অনিষ্টের কথাই বর্ণনা করিয়াছেন।

শুধু যে এই সকল রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগণই জাতিভেদের দ্বারা ভারতবর্ষের অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা নয়। স্বদেশহিতৈষী কবি হেমচন্দ্র তাঁহার হৃদয়োন্মাদকারী ভারত-সঙ্গীতে লিখিয়াছেনঃ—

"একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমাধ্বজা।"

কবি নবীনচন্দ্র তাঁহার কুরুক্ষেত্র কাব্যে লিখিয়াছেন,—

"রাজভেদ, গৃহভেদ জাতিভেদ প্রভু,
ভারতের যে দুর্দ্দশা ঘটাইছে হায়।"

তার পর আজ যে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে মৃতদেশ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই মহামন্ত্রের ঋষি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বহু পূর্ব্বেই লিখিয়া গিয়াছেন যে,—

"পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালিক বর্ণবৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই।

* * *

"এই গুরুতর বর্ণ-বৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনতির পথে দাঁড়াইল। সকল উন্নতির মূল জ্ঞানোন্নতি। * * বর্ণ বৈষম্যে জ্ঞানোন্নতির পথ রোধ হইল। শূদ্র জ্ঞানালোচনার অধিকারী নহে; একমাত্র ব্রাহ্মণ তাহার অধিকারী। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক মূর্খ হইল। মনে কর যদি ইংলণ্ডে এরূপ নিয়ম থাকিত যে রসেল, কাবেন্দিষ, ষ্টান্‌লি প্রভৃতি কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বংশের লোক ভিন্ন আর কেহ বিদ্যার আলোচনা করিতে পারিবে না, তাহা হইলে ইংলণ্ডের এ সভ্যতা কোথায় থাকিত? কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানবিৎ দূরে থাকুক, ওয়াট, ষ্টিবিনসন, আর্করাইট কোথায় থাকিত? ভারতবর্ষে প্রায় তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। অনন্যসহায় ব্রাহ্মণেরা যে বিদ্যার আলোচনা করিলেন, তাহাও বর্ণ বৈষম্য দোষে কুফলপ্রদা হইয়া উঠিল।

* * * * *

"তখন বিশুদ্ধাত্মা শাক্যসিংহ অনন্তকালস্থায়ী মহিমা বিস্তার পূর্ব্বক, ভারতাকাশে উদিত হইয়া দিগন্তপ্রধাবিত রবে বলিলেন, * * তোমরা সবাই সমান। ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান। * * বৈষম্যপীড়িত ভারতে এ মহামন্ত্র শুনিয়া হিমগিরি হইতে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত বিচলিত হইল। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত হইল বর্ণ বৈষম্য কতকদূর বিলুপ্ত হইল। প্রায় সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত রহিল। পুরাবৃত্তজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে, সেই সহস্র বৎসরই ভারতবর্ষের প্রকৃত সৌষ্ঠবের সময়। যে সকল সম্রাট হিমালয় হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত যথার্থই একচ্ছত্রে শাসিত করিয়াছেন—অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, শিলাদিত্য প্রভৃতি এই কাল মধ্যেই তাঁহাদিগের অভ্যুদয়। এই সময়েই তক্ষশীলা হইতে তাম্রলিপ্ত পর্য্যন্ত বহু জনসমাকীর্ণ মহাসমৃদ্ধিশালিনী সহস্র সহস্র নগরীতে ভারতবর্ষ পরিপূরিত হইয়াছিল। এই সময়েই ভারতবর্ষের গৌরব পশ্চিমে রোমকে, পূর্ব্বে চীনে গীত হইয়াছিল—তদ্দেশীয় রাজারা ভারতবর্ষীয় সম্রাটদিগের সহিত রাজনৈতিক সখ্যে বদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মপ্রচারকেরা ধর্ম্ম প্রচারে যাত্রা করিয়া অর্দ্ধেক আসিয়া ভারতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শিল্প বিদ্যায় যে এই সময়ে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে।" (১)

তৎপর বঙ্কিমচন্দ্র অন্য একস্থানে লিখিয়াছেনঃ—

"যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে তাহা এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজ না থাকিলে রাজ্যের উন্নতি হয় না। এই জন্য ভারতবর্ষ মুসলমানের হাতে গেল।" (২)

বঙ্কিমচন্দ্র এই সকল কথা বহু পূর্ব্বে বলিয়াছেন বটে; কিন্তু এখনও এ সকল কথার মূল্য নিতান্ত সামান্য নহে। তাঁহার প্রত্যেকটি কথার মধ্যেই গভীর সত্য নিহিত আছে। জাতিভেদের জন্যই সাধারণ প্রজাপুঞ্জ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহারা শিক্ষা পাইলেই ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য বজায় থাকিত না। কিন্তু তাহারা শিক্ষা পায় নাই বলিয়াই তাহাদের দ্বারা দেশের উন্নতি হয় নাই, তাহারা জন্মভূমির মূল্যই বুঝিতে পারে নাই, তাহাদের মধ্যে স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধিত হয় নাই। তদ্ভিন্ন তাহাদের হস্তে যে দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের ভার অর্পিত ছিল, তাহারও উন্নতি করিতে পারে নাই। কেমন করিয়াই বা করিবে? একে ত তাহারা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত, ব্রাহ্মণজাতির নিকট ঘৃণিত, তাহাদের অবস্থা অতি হীন; তার পর তাহাদের শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি প্রভৃতি ব্যবসায়কে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন; ইহাতে কি দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হইবার যো আছে? বঙ্কিমচন্দ্র ইংলণ্ডের উল্লেখ করিয়া কি সুন্দর দৃষ্টান্তটিই দেখাইয়াছেন! মনে করুন, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে যদি এই সংহিতা প্রচার হইত যে, শিক্ষায় শুধু পাদ্রীদিগেরই অধিকার; তদ্ভিন্ন অগণ্য অসংখ্য লোক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকিবে, তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি যে সকল ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, তাহাকেও নিকৃষ্ট বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখা হইবে; তাহা হইলে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান উন্নতি কি সম্ভব হইত?

(১) বঙ্কিম চন্দ্রের গ্রন্থাবলী তৃতীয় ভাগ ২৪৩। ২৪৪। ২৪৫ পৃঃ
(২) " " " ২৬০ পৃঃ

দ্বিতীয়তঃ স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি আর একটি বিষয়ের উপর পতিত হইয়াছে। জাপান শত শত জাপানীকে ইউরোপে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা ইউরোপে শিল্পবিজ্ঞান ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল; এবং স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া স্বদেশে শিল্পবিজ্ঞান ও যুদ্ধবিদ্যার আশ্চর্য্য উন্নতি করিয়াছিল। এ দেশের শিল্পবিজ্ঞান ও বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইলেই শত শত ভারতবাসীকে ইউরোপে, আমেরিকায় ও জাপানে পাঠাইতে হইবে; তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া, কলকারখানা স্থাপন করিলেই দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হইবে।

কিন্তু জাতিভেদ মানিলে জাতিচ্যুত হওয়ার ভয় থাকিলে, কোন মতেই হিন্দুর ছেলেকে আর ভিন্ন দেশে পাঠান যায় না। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, জাতিভেদ মানিয়া চলিলে দেশের উন্নতির আর আশা নাই। জাতিভেদ মানিলে কোন্ বিবেকপরায়ণ ব্যক্তিরই বা যুবকদিগকে ভিন্ন দেশে পাঠাইয়া তাহাদের জাতি মারিতে ইচ্ছা হইবে? কোন্ বিবেকপরায়ণ যুবকের বা জাতি খোয়াইয়া ভিন্ন দেশে যাইতে ইচ্ছা জন্মিবে?

তৃতীয়তঃ জাতিভেদ মানিলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলন হওয়া এক রকম অসম্ভব। মুসলমানেরা ত পরিষ্কারই বলিয়া থাকেন—তোমরা যদি আমাদিগকে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ জাতি বলিয়াই ঘৃণা কর, আমাদের বাড়ীতে আসিয়া জলটুকু স্পর্শ করিতেও অসম্মত হও, তবে তোমাদের সঙ্গে মিলন হইবে কি রূপে? এ কথা অতি সত্য। আমরা যে একজন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমানের গৃহে গমন করিয়াও জলটুকু গ্রহণ করি না, অথবা উক্ত শ্রেণীর মুসলমানদিগকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিতে ও তাহাদিগের সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে স্বীকৃত হই না; তাহার মূলে কি? কেবলই ঘৃণা বই ত নয়। দেশের একটা উন্নত জাতির প্রতি এইরূপ ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব থাকিলে কিরূপে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হইবে?

তাহা হইবে না মনে করিয়াই কলিকাতার সুরেন্দ্র বাবু, ভূপেন্দ্র বাবু এবং জে, চৌধুরী প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের চেষ্টায় গত বৎসর হিন্দু মুসলমানের প্রকাশ্য ভোজ হইয়াছিল, এবারও হইয়াছে।

এ বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত দু'একটি কথা বলিলে, ভরসা করি কোন অপরাধ হইবে না। আমরা "সঞ্জীবনী" সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য মফঃস্বল গমন করিয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে "সোলতান" পত্রিকার লেখক মহম্মদ হোসেন মহাশয়ও গমন করিয়া-ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে জাতিভেদের বাঁধন এমন শিথিল হইতেছে যে, অথবা মুসলমানদিগের প্রতি হিন্দুদিগের

অনুরাগ এরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে যে, অনেক হিন্দু যত্নপূর্ব্বক উক্ত মুসলমান বন্ধুকে আপন আপন গৃহে স্থান দান করিয়াছেন। এমন কি, এক বাড়ীতে চাকর চাকরাণীগণ মুসলমান বন্ধুর উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে অসম্মত হওয়ায়, সে বাড়ীর মেয়েরা স্বহস্তে তাঁহার থালা বাসন মাজিয়াছেন। আমরা স্বদেশী আন্দোলনের জন্য যখন বাঁকুড়ায় "প্রবাসী" সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ রামানন্দ বাবুর গৃহে উপস্থিত হইলাম, সেখানে তিনি উক্ত বন্ধুকে ঠিক্ আপনার আত্মীয়ের ন্যায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমাদের বন্ধু মহম্মদ হোসেন মহাশয় যেরূপ হিন্দুদের আদর আপ্যায়নে প্রীত হইয়া হিন্দু মুসলমানের সম্মিলন অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাও মনে করিয়াছি। আমরা স্বদেশী আন্দোলনের জন্য যখন মেদিনীপুর গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন মহম্মদ হোসেন মহাশয় একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের গৃহে অতিথি হইলেন। উক্ত মুসলমান মহোদয় মেদিনীপুরের মুসলমানদিগের একজন নেতা। তিনি বলিলেন—হিন্দুগণ যদি আমাদিগকে অবজ্ঞা না করেন, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দান করিতে পারি। তাঁহার কথার জবাবে কহিলাম—আমরা মুসলমানদিগকে কখনই অবজ্ঞার চক্ষে দেখি না। আমরা অনায়াসে আপনার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারি। তিনি পরীক্ষা করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে জলযোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা তাঁহার প্রদত্ত রুটি মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলাম। তখন তিনিও প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের সভার সভাপতি হইতে স্বীকৃত হইলেন।

এই সকল ঘটনার দ্বারাই বুঝিতে পারি যে, যতদিন আমরা জাতিভেদের প্রতি আস্থা রাখিব, ততদিন মুসলমানদিগের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব থাকিয়াই যাইবে। কিন্তু তাহা থাকিলে হিন্দু মুসলমানে মিলন হওয়ার আর আশা নাই। হিন্দু মুসলমান এই উভয় জাতি মিলিত হইতে না পারিলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হওয়াও অসম্ভব।

অনেক স্বদেশানুরাগী চিন্তাশীল ব্যক্তি এই সকল গুরুতর বিষয় চিন্তা করিয়াই জাতিভেদের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইতেছেন, এবং কি উপায়ে এই অনিষ্টকর প্রথা দেশ হইতে দূর করা যায়, তাহার উপায় চিন্তা করিতেছেন।

কিন্তু এদেশে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেই এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা জাতিভেদ প্রথাকে হিন্দুর গৌরবের সামগ্রী বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি এবং জাতিভেদই হিন্দুধর্ম্মের লৌহ-প্রাচীর। যদি এই ভিত্তিই টলিয়া যায় এবং এই প্রাচীরই ভাঙ্গিয়া ফেল—তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষারই বা উপায় কি?

হিন্দুধর্ম্ম রক্ষারই বা উপায় কি? সে বিষয়ে কোন আলোচনা করিব না। আমরা শুধু দেখাইব, প্রাচীনকালে জাতিভেদ যে ভাবে ছিল, এখন আর ঠিক্ সেভাবে নাই। প্রাচীনকালের লোকেরা জাতিভেদ বলিতে যাহা বুঝিতেন, এখনকার লোকেরা আর তাহা বুঝিতে পারেন না। সুতরাং প্রশ্ন এই যে, প্রাচীনকালের জাতিভেদ প্রথা বজায় না রাখিয়াও যদি হিন্দুধর্ম্ম রাখিতে পারা গেল, তবে এই বর্ত্তমান সময়ের অনিষ্টকর জাতিভেদ প্রথা না থাকিলেই কি হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করা যাইবে না?

প্রাচীন কালের জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ের জাতিভেদ প্রথার যে বিস্তর পার্থক্য ঘটিয়াছে, অনেকে হয় ত সেই কথাই স্বীকার করিতে রাজি হইবেন না। আমরা সেই জন্যই এই প্রবন্ধে প্রাচীন কালের জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে বিবাহ ও অন্নভোজন—এই দুইটি ব্যাপারের উপরই জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত আছে। নচেৎ জাতিভেদের অন্য কোন প্রকার লক্ষণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এখন এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি সবর্ণে বিবাহ করেন, স্বজাতির অন্ন গ্রহণ করেন এবং অসবর্ণ বিবাহের প্রশ্রয় না দেন, কিম্বা অন্য জাতির হাতের অন্নগ্রহণ না করেন, তবেই তাঁহার জাতিভেদ রক্ষা করা হয়; তদ্ভিন্ন তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি শূদ্রের দাসত্ব করেন, ম্লেচ্ছের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হন, বৈশ্যের বাণিজ্য ও কৃষিব্যবসায়ে লিপ্ত হন, ইংরাজের বিচারাসন অলঙ্কৃত করেন,—অথবা মদ্যপান প্রভৃতি পঞ্চ মহাপাতকের দুই তিনটি পাতকের দ্বারাও পতিত হন,—তথাপি তিনি উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তা'ছাড়া স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু, স্বর্গীয় বিবেকানন্দের ন্যায় ধার্ম্মিক কিম্বা মাননীয় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের তুল্য শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানী পণ্ডিতও ব্রাহ্মণেতর জাতি বলিয়া ব্রাহ্মণের মধ্যে গণ্য হইতে পারিবেন না।

কিন্তু পূর্ব্বকালে জাতিভেদ প্রথা এরূপ ত ছিল না। তখন ব্রাহ্মণের যে শুধু সবর্ণের মেয়েই বিবাহ করিতে হইবে, এমন কথাই ছিল না। তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় অন্নবিচারও ছিল না। ব্রাহ্মণ শূদ্র এবং কয়েক প্রকার ব্যবসায়ীর গৃহে অন্নগ্রহণ করিতেন না বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাদের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণে কোথাও নিষেধ ছিল বলিয়া মনে হয় না। আর তখন তপস্যা ও বিদ্যানুশীলনের দ্বারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, তিন জাতির লোকই ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন এবং ব্রাহ্মণ জাতিও অসৎ কার্য্যের দ্বারা পতিত হইয়া শূদ্রাদি নিম্নজাতি মধ্যে গণ্য হইতেন।

তবে প্রাচীন কালে কিরূপ জাতিভেদ ছিল? প্রাচীনকালে কর্ম্মবিভাগ ও শূদ্রাদি জাতির প্রতি অবজ্ঞার উপরই জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। রামায়ণ, মহাভারত

মনুসংহিতা—হিন্দুর এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তিন খানি গ্রন্থ পাঠ করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে—যে জাতির জন্য যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা না করিলেই তিনি ধর্ম্মদ্রোহী হইতেন, এবং শূদ্রাদি নিম্নজাতি উচ্চবর্ণের সম্মান লাভের প্রত্যাশী হইলেই তাঁহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। নব পর্য্যায় বঙ্গদর্শনের "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধলেখক বলেন যে—

"সকল সংহিতার এই বিধি যে, কর্ম্মভ্রষ্ট হইলেই বর্ণমর্য্যাদা নষ্ট হয়। * * * কোন দ্বিজ যদি কৌলিক ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়া উপায়ান্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে যাইত, তাহা হইলে তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"।

বাস্তবিক ইহাই প্রাচীন কালের জাতিভেদের মূলসূত্র ছিল।

অতঃপর রামায়ণ মহাভারত ও মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে আমরা কয়েকটি বিষয় প্রমাণ করিব। প্রথমতঃ, প্রাচীন কালে অসবর্ণ বিবাহে কেহই জাতিচ্যুত কিম্বা ধর্ম্মচ্যুত হইত না; তদ্ভিন্ন উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের অন্নভোজন করিতেন, তাহাতেও তাঁহারা ধর্ম্মচ্যুত কিম্বা জাতিচ্যুত হইতেন না। দ্বিতীয়তঃ, তপস্যা ও কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণের মধ্যে গণ্য হইতেন ও নিকৃষ্ট কার্য্যের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণও পতিত হইয়া নিম্ন জাতির মধ্যে গণ্য হইতেন। তৃতীয়তঃ, কর্ম্মবিভাগ ও নিম্নজাতির প্রতি অবজ্ঞা—ইহার উপরই জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

প্রাচীনকালে অসবর্ণ বিবাহে যে কেহই জাতিচ্যুত হইতেন না এবং উচ্চবর্ণ যে নিম্নজাতির অন্ন ভোজন করিতেন, সর্ব্বাগ্রে তদ্বিষয়েই আলোচনা করা যাউক। কিন্তু আলোচনার গোড়াতেই বলা আবশ্যক যে, আমরা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নহি। সেই জন্য প্রথমেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মত উদ্ধৃত করিব। তারপর শাস্ত্র হইতেও কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য প্রণীত "বজ্রসূচী" নামে ক্ষুদ্র একটি গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থে তিনি জাতিভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উহার এক স্থানে লিখিয়াছেন:—

"যদি জাতি শব্দে জন্ম কহ অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হইতে জন্ম যাহার হয় সেই ব্রাহ্মণ, তবে শ্রুতি স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ অনেক মহর্ষিদের ব্রাহ্মণত্ব ব্যাঘাত হইল। যেহেতু ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি মৃগী হইতে জন্মেন এবং পুষ্পস্তবক হইতে কোসিব মুনি, কলস হইতে অগস্ত্য, ভেকের গর্ভে মাণ্ডুকা, হস্তিগর্ভে অচর ঋষি, শূদ্রাগর্ভে ভরদ্বাজ মুনি, কৈবর্ত্ত কন্যাতে বেদব্যাস, ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্মেন, ইঁহাদের তাদৃশ জন্ম ব্যতিরেকেও সম্যক প্রকার জ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব শাস্ত্রে শুনিতেছি; অতএব জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।"

. স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষ জীবন হিন্দুশাস্ত্র আলোচনায়ই অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি তৎপ্রণীত কৃষ্ণচরিত্রের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের পাদটীকায় লিখিয়াছেন:—

"মহাভারতীয় নায়কদিগের সকলেরই জাতি সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ। পাণ্ডবদিগের সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ। পাণ্ডবদিগের পিতামহী সত্যবতী দাসকন্যা। ভীষ্মের মার জাতি লুকাইবার বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এজন্য তিনি গঙ্গানন্দন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত। ব্যাস নিজে সেই ধীবর নন্দিনীর কানীন পুত্র। অতএব পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের জাতি সম্বন্ধে এত গোলযোগ যে এখনকার দিনে তাহারা সর্ব্বজাতির অপাংক্তেয় হইতেন। * * এ সময়ে কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে কোন গোলযোগ ছিল না। অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের কথা বলিতেছি না। অনেক ঋষির ধর্ম্মপত্নীও ক্ষত্রিয়কন্যা ছিলেন; যথা—অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা, ঋষ্যশৃঙ্গের স্ত্রী শান্তা, * * ইত্যাদি। এমনও কথা আছে যে, পরশুরাম পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করিলে ব্রাহ্মণদিগের ঔরসেই পরবর্ত্তী ক্ষত্রিয়েরা জন্মিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানী ক্ষত্রিয় যযাতির ধর্ম্মপত্নী। আহারাদি সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি ছিল না, তাহাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতেন।"

শাস্ত্রজ্ঞ ও ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাহার প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রাচীনকালের জাতিভেদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

"এক জাতীয় পুরুষ ও অন্য জাতীয় কন্যা হইতে মিশ্র জাতির উৎপন্ন হওয়া জনশ্রুতি মিথ্যা; সভ্যতার সহিত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় সৃষ্টি হওয়ায়, সেই সেই ব্যবসায়াবলম্বনকারীগণ এক একটি ভিন্ন জাতীয় বলিয়া পরিগণিত হইল। সেকালে এক্ষণের ন্যায় ভিন্ন জাতীয় লোকগণ একত্র আহার করিলে বা অন্য জাতীয়া রমণীকে বিবাহ করিলে জাতিভ্রষ্ট হইত না; প্রকৃত পাপ করিলেই লোক জাতিভ্রষ্ট হইত।

"এই কালে বিবাহ প্রণালী এক্ষণকার প্রণালী হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন ছিল। উচ্চ জাতীয় পুরুষ নীচ জাতীয় স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে পারিত।"

শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতামত আর অধিক উদ্ধৃত করিব না। যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাই আমাদের বক্তব্য বিষয়ের পক্ষে যথেষ্ট। এই বার শাস্ত্রাদি গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব।

প্রথমেই মনুসংহিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্যেই বিবাহ সম্বন্ধীয় অনেক বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহার চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে:—

"গুরুর অনুমতি লইয়া ব্রত স্নান সমাপনের পর দ্বিজ ব্রহ্মচারী লক্ষণান্বিতা সবর্ণা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেন।"

তাহার পর দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে,—

"দ্বিজাতিগণের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্তা। স্বেচ্ছাকৃত পুনর্ব্বিবাহে নিম্নলিখিত স্ত্রীলোকই পর পর শ্রেষ্ঠ হয়। শূদ্রাই কেবল শূদ্রের ভার্য্যা হইবে; শূদ্রা ও বৈশ্যা বৈশ্যের বিবাহযোগ্যা। শূদ্রা, বৈশ্যা এবং ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয় বর্ণের বিবাহযোগ্যা এবং শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী – ব্রাহ্মণের বিবাহযোগ্যা হইবে।"

মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ১৪৯ শ্লোক হইতে ১৫৪ শ্লোক পর্য্যন্ত লিখিত আছে যে:—

"ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্রমশঃ বিবাহিত চারিজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজ সন্তানদিগের প্রাপ্য বিষয় বিভাগ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে। * * *

একজন বিভাগধর্ম্মবিদ্ ব্যক্তি সমস্ত সম্পত্তি দশধা বিভক্ত করিয়া নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে বিভাগ করিবেন। ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তান চারি অংশ, ক্ষত্রিয়াসুত তিন অংশ, বৈশ্যাসুত দুই অংশ এবং শূদ্রাসুত এক অংশ প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা—কাহারও গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হউক বা না হউক, শূদ্রাগর্ভজ সন্তান দশম ভাগের অতিরিক্ত পাইবে না।"

মনুসংহিতা হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিতেছেন প্রাচীনকালে অসবর্ণ বিবাহের বিধি ছিল। কিন্তু এই বিধি সম্বন্ধেও বিবেচনার বিষয় আছে। মনুসংহিতায় অসবর্ণ বিবাহের বিধি থাকিলেও প্রশংসা নাই। বরং অনেক স্থানেই নিন্দা আছে। অসবর্ণ বিবাহের দ্বারা যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহারা পিতৃকুল প্রাপ্ত না হইয়া মাতৃকুল প্রাপ্ত হইবে। তদ্ভিন্ন মনুসংহিতায় উচ্চবর্ণের নিম্নজাতির কন্যা বিবাহ করিবার বিধি আছে বটে; কিন্তু নিম্নজাতির উচ্চবর্ণের কন্যা বিবাহ করার বিধি নাই।

আমরা এখন এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সম্প্রতি "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" শীর্ষক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বকোষ-সঙ্কলিয়তা ও সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক খ্যাতনামা নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উহার লেখক। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানলাভ করা যায়। এই গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় লেখক লিখিয়াছেন:—

"চাতুর্ব্বর্ণের বিধি-নিষেধাদি সমাজগঠনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবর্ত্তিত হইল বটে, কিন্তু অনুলোম, বর্ণশঙ্করদিগকে লইয়া সমাজে গোলযোগ বাধিল; তাহাদের মধ্যে কেহ পিতার ধর্ম্ম, কেহ বা মাতার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চলিতে চাহিল। অথচ বিশুদ্ধ দ্বিজাতিগণ তাঁহাদিগকে প্রকৃষ্ট অধিকার দিতে ও প্রকৃষ্ট জাতি বলিয়া সমাজে গ্রহণ করিতে সহজে সম্মত হইলেন না। কাজেই একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সমাজরক্ষক ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ সঙ্করগণের মাতৃজাতি স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও ঘোষণা করিলেন যে, যাহারা সদাচার অবলম্বন করিয়া উৎকৃষ্ট জাতিতে কন্যাদান করিতে থাকিবে, তাহারা পাঁচ ছয় পুরুষ পরে ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপে কত হীনবর্ণ উচ্চবর্ণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কত শূদ্রধর্ম্মা জাতি ক্রমশঃ বৈশ্য ক্ষত্রিয়, এমন কি ব্রাহ্মণ বর্ণের সহিত সম্মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্কের মিতাক্ষরায় তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।"

শুধু মিতাক্ষরায় কেন? মনুসংহিতায় ইহার প্রমাণ আছে। মনুর দশম অধ্যায়ের ৬৪।৬৫ শ্লোকে আছে:—

"শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্যুগাৎ॥
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈবচ॥

উৎকৃষ্ট জাতি ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র কন্যাতে যে সন্তান জন্মে, সেই নিকৃষ্ট ও সপ্তম জন্মে উৎকৃষ্ট জাতিত্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে! ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম জানিবে।"

এ স্থানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। মনুসংহিতা ইতিহাস নয়, ব্যবস্থা-শাস্ত্র মাত্র। উহাতে যে সকল কার্য্যে বিধিনিষেধ আছে, সমাজ যে ঠিক্ তাহাই মানিয়া চলিত, ভরসা করি তাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বিশ্বাস করিবেন না। বাঙ্গলাদেশের নব্য স্মৃতিতে ত সমাজ সম্বন্ধে কতই কঠোর ব্যবস্থা আছে; কিন্তু এক শত বাঙ্গালীর মধ্যে পাঁচজন বাঙ্গালীও উহা মান্য করিয়া চলেন কি না সন্দেহ। প্রায় সকলেই সাময়িক আদর্শ ও লোকাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন। প্রাচীনকালের লোকেরাও যে ঠিক্ এইরূপ ভাবেই চলিতেন, প্রাচীন গ্রন্থেই তাহার প্রমাণ আছে। মনুসংহিতায় অত ত নিষেধ-বিধি; কিন্তু যে মহাভারত প্রাচীনকালের ইতিহাস বলিয়া গণ্য, তাহাতে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, সংহিতার শাসন অপেক্ষা সাময়িক আদর্শ ও লোকাচারের অধীন হইয়াই অনেকে চলিতেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। বেদ-সংগ্রহকর্ত্তা ও বিবিধ পুরাণ-রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস যে একজন সুব্রাহ্মণ, ভরসা করি তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। কিন্তু মহাভারতের আদি পর্ব্বের পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ে দেখিতে পাই পরাশর মুনি তাঁহার পিতা এবং ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধা বা সত্যবতী তাঁহার মাতা। তবেই এ স্থানে দেখুন, ব্রাহ্মণ পিতা বলিয়া ধীবরকন্যার পুত্রও পরমোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের মধ্যে গণ্য হইতেছেন।

ইহার পর মহাভারতের আদি পর্ব্বের শততম অধ্যায়ে দেখিতে পাই, ক্ষত্রিয় নৃপতি শান্তনুর সঙ্গেই সত্যবতীর বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে। আমরা এ স্থানে স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনূদিত মহাভারত হইতেই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"শান্তনু রাজা এক দিবস যমুনা নদীর উভয় পার্শ্বস্থিত এক অরণ্যে গমন করিলেন। তথায় অকস্মাৎ সৌরভের আঘ্রাণ পাইলেন। * * অনন্তর অসিতলোচনা দেবরূপধারিণী এক ধীবরকন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভীরু, তুমি কে? কাহার পত্নী? এবং কি নিমিত্তই বা এখানে আসিয়াছ?' সে কহিল, 'মহাশয়, আমি ধীবর-কন্যা, পিতার আদেশে তরণী বাহন করিয়া থাকি।' রাজা শান্তনু ধীবর-কন্যার অনুপম রূপমাধুরী সন্দর্শনে ও অঙ্গ-সৌরভ আঘ্রাণে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার মানসে তাহার পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।"

বলা বাহুল্য যে, এই ধীবর-কন্যার সঙ্গেই শান্তনুর বিবাহ হইল; এবং সকলেই জানেন এই ধীবর-কন্যাই পাণ্ডবদিগের পিতামহী। এখানে দেখিতেছি মনুর বিধি কোনই কাজে আসিল না; ধীবর-কন্যার পুত্রগণই ক্ষত্রিয় মধ্যে গণ্য হইলেন।

আর একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। মহাভারতের আদিপর্ব্বের ৮১।৮২ অধ্যায়ে দেবযানীর পরিণয়োপাখ্যান বর্ণিত আছে। সকলেই জানেন শুক্রাচার্য্য একজন ক্ষমতাশালী সুব্রাহ্মণ। দেবযানী তাহার প্রিয়তমা দুহিতা। এই দেবযানী ক্ষত্রিয় নৃপতি যযাতিকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন,

এবং তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু যযাতি দেবযানীকে কহিলেন—

"তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, আমি ক্ষত্রিয় জাতি, আমি কোনরূপেই তোমার উপযুক্ত পাত্র নহি, আর তোমার পিতা শুক্রাচার্য্য কদাচ এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিবেন না। দেবযানী কহিলেন, মহারাজ, ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই ক্ষত্রিয়ের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকেন, সুতরাং এই উভয়ের যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহাতে আমাকে ভার্য্যাস্বরূপে অঙ্গীকার করা তোমার পক্ষে দোষাবহ নহে।"*

অবশেষে রাজা সম্মত হইলেন। শুক্রাচার্য্য খবর পাইয়া রাজার কাছে আসিলেন এবং রাজাকে কহিলেনঃ—

"আমার কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, অতএব আমি প্রসন্ন মনে সম্প্রদান করিতেছি, তুমি ইঁহাকে মহিষীরূপে গ্রহণ কর।"

দেবযানীর যযাতির সঙ্গে বিবাহ হইল, দেবযানীই রাজ্ঞীপদে বৃতা হইলেন।

দেবযানীর উপাখ্যানের দ্বারা দুইটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ই প্রমাণিত হইতেছে। একটি বিষয় এই যে, শুক্রাচার্য্য সুব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয় নৃপতির করে স্বীয় প্রিয়তমা কন্যাকে সমর্পণ করিলেন; কাজটা যে অন্যায় বা অশাস্ত্রীয় তাহা তাঁহার মনেও আসিল না; ইহা লইয়া সমাজেও কোন প্রকার বাক্যের লাঠালাঠি চলিল না। সুতরাং স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীনকালে নিম্নজাতির লোকেরাও উচ্চবর্ণের কন্যাদিগকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতেন। তারপর দ্বিতীয় কথা এই যে—অসবর্ণ বিবাহের সন্তানাদি পিতৃকুলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহা না হইলে দেবযানী যযাতির প্রধান পত্নী হইতে পারিতেন না।

এই সকল আখ্যায়িকা হইতে আমরা ইহাও বুঝিতে পারিতেছি যে, তখন উচ্চবর্ণের লোকদিগের নিম্নজাতির অন্ন ভোজনেও কোন বাধা ছিল না। কারণ যেখানে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, সেখানে অন্নগ্রহণ সম্বন্ধে কোন কড়াক্কড় নিয়ম থাকিতেই পারে না। ব্রাহ্মণেরা চারি জাতির কন্যা বিবাহ করিয়া পত্নীদিগের অন্ন কি গ্রহণ করিতেন না? বেদব্যাস কি তাঁহার জননীর স্পৃষ্ট অন্ন কখনো গ্রহণ করেন নাই? শান্তনু কি তাঁহার পত্নীকে রান্নাঘরে যাইতে দেন নাই? দেবযানী কি দিল্লীর বাদশাহের হিন্দু বেগমের মত স্বতন্ত্র পাচক ব্রাহ্মণ রাখিয়া অন্ন প্রস্তুত করাইতেন? ইহা যিনি বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহার বিশ্বাসের প্রশংসা করি, কিন্তু বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। যাহা হৌক, এ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় কি আছে, একবার দেখা যা'ক। মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে অন্ন গ্রহণ সম্বন্ধীয় অনেক বিধি ব্যবস্থা আছে। উহার ২০৯।২১০।২১১ শ্লোকে আছে :—

"চৌর, গীতবাদ্যোপজীবী, কৃপণ, নিগড়বদ্ধ, মহাপাতকী, ক্লীব, ব্যভিচারিণী, কপটধর্ম্মচারীদিগের অন্ন গ্রহণ করিবে না। শুক্ত, পর্য্যুষিত দ্রব্য, শূদ্রের অন্ন এবং কাহারও উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইবে না।"

ইহার পর লিখিত আছেঃ—

"চিকিৎসকের, ব্যাধের, ক্রূরব্যক্তির, নিষ্ঠুর কর্ম্মকরির পতিপুত্র-বিহীনা নিঃসম্পর্কীয়া রমণীর, দ্বেষকারী শত্রুর, পতিতের, যে মিথ্যা সাক্ষী দেয় তাহার, যে নটবৃত্তি করে তাহার,—তদ্ভিন্ন তাঁতি, দরজি, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, নিষাদ, লৌহবিক্রয়ী, কুক্কুরপোষণকারী, শৌণ্ডিক, বস্ত্রধাবক, বস্ত্রাদির রং কর্ত্তা, যাহারা স্ত্রীর বুদ্ধিতে চলে, তাহাদের অন্ন গ্রহণ করিবে না।"

আজকাল যদি মনুর এই বিধি মানিয়া চলিতে হইত, তাহা হইলে নব্যতন্ত্রের লোকদিগকে একঘরে হইয়াই থাকিতে হইত। কারণ নব্যবাঙ্গালী যে অনেকটা স্ত্রীর বুদ্ধিতে চলেন, ইহা জনপ্রবাদ হইয়া দাড়াইয়াছে।

সে কথা যাক। এই যে অন্ন গ্রহণ করিবে না—বলা হইল, ইহার তাৎপর্য্য কি? আমাদের ত মনে হয়, এই সকল জাতির বাড়ীতে আহার করিতেই নিষেধ করা হইতেছে। এই সকল লোকের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিতে নিষেধ করা বোধ হয় শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আমরা শাস্ত্রজ্ঞ নহি; সেই জন্য কোন কথাই সাহস করিয়া বলিতে পারি না। যদি ঐ সকল লোকের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করায় অপরাধই হয়, তাহা হইলেও দেখিতেছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি পরস্পর পরস্পরের অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন; মনুসংহিতার কোন জায়গায়ই ইহাতে নিষেধ লেখা নাই। তদ্ভিন্ন এই মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের ২৫৩ শ্লোকেই দেখিতেছি— কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চজাতির শূদ্রাদির অন্ন গ্রহণ করিতেও বিধি আছে। মনু বলিতেছেনঃ—

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ। ৪।২৫৩

ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এই বচনটার অর্থ করিয়াছেন যেঃ—

"যে যাহার কৃষিকর্ম্ম করে, যে পুরুষানুক্রমে আপন বংশের মিত্র, যে যাহার গো পালন করে, যে যাহার দাস্য কর্ম্ম করে ও যে যাহার ক্ষৌরকর্ম্ম করে—শূদ্রের মধ্যে ইঁহাদিগের অন্ন ভোজন করা যায় এবং যে যাহার নিকট আত্মসমর্পণ বা নিবেদন করিয়াছে তাহারও অন্ন ভোজন করা যায়।"

তার পর আর একটি কথা। মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ের ১৫৩ শ্লোকে লেখা আছে যে—অভোজ্যদিগের অন্নভোজনে, স্ত্রী ও শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে ও অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণে সপ্ত দিবারাত্র যবের যাউ পান করিয়া থাকিবে। স্ত্রী-শূদ্রের উচ্ছিষ্ট অন্ন গ্রহণেই যখন এত লঘু শাস্তি, তখন স্ত্রী-শূদ্রের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিলে যে কতটা অপরাধ হইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

যাহা হউক, এ বিষয়ে মনুসংহিতা লইয়া আর অধিক বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। উহা হইতে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করা গিয়াছে, আমাদের বক্তব্য বিষয়ের পক্ষে

* স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারত হইতে উদ্ধৃত।

তাহাই যথেষ্ট। আমরা বলিয়াছি যে, মনুসংহিতা ব্যবস্থা-শাস্ত্র মাত্র; পূর্ব্বকালে সমাজে উহার কোন্ কোন্ ব্যবস্থা প্রতিপালিত হইত, তাহার সাক্ষী রামায়ণ ও মহাভারত। এইবার আমরা রামায়ণ ও মহাভারত হইতেই প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, প্রতিপন্ন করিব যে, পূর্ব্বকালে অন্নবিচার ছিল না।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের পঞ্চাশ অধ্যায়ের বিবরণ অনেকেরই জানা আছে। রামচন্দ্র অরণ্যে গমন করিবার সময়, তাঁহার মিত্র গুহ নামক চণ্ডালের গৃহে অতিথি হইলেন। গুহ রামকে পৃথক পৃথক গুণ সমন্বিত অন্ন ব্যঞ্জনাদি বিবিধ ভোজ্যদ্রব্য ও অর্ঘ্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে আবার এই বাক্য বলিলেনঃ---

"হে মহাবাহো, এই সমগ্র পৃথিবীই আপনার; আপনি আমাদের ভর্ত্তা এবং আমরা আপনার ভৃত্য; আপনি আমাদিগের এই রাজ্য শাসন করুন। আপনার নিমিত্ত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন ও মুখ্য মুখ্য শয়ন আনীত হইয়াছে এবং আপনার অশ্বগণের নিমিত্ত ঘাসও আনয়ন করা হইয়াছে।"

"রাম কহিলেন, * * তুমি প্রীতিপূর্ব্বক আমার নিমিত্ত যে সকল দ্রব্য আনয়ন করিয়াছ, তৎ সমস্ত প্রতিগ্রহ করিতে পারি না; কেন না, অধুনা তাপসদিগের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বনবাসী, কুশ চীরাজিন পরিধায়ী ও ফল মূল ভোজী হইয়াছি।" (রামায়ণ অঃ কাঃ ৫০ সর্গ।)

রামচন্দ্র অন্য সময় হইলে যে এই চণ্ডালের অন্ন গ্রহণ করিতেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। রামায়ণের সময় অন্ন বিচার থাকিলে একজন চণ্ডাল কি রামচন্দ্রের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিতে সাহস পাইত, না সে কথা রামায়ণেই স্থান প্রাপ্ত হইত?

মহাভারতের বন পর্ব্বের ২৬১ অধ্যায়ের বিবরণ* হয় ত অনেকে অবগত আছেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ যখন দ্রৌপদীসহ বনে বাস করিতেছিলেন; তখন মহর্ষি দুর্ব্বাসা দশ সহস্র শিষ্য সঙ্গে লইয়া দ্রৌপদীর কুটীরে অতিথি হইলেন। অতিথিগণ স্নান করিতে গেলেন। কিন্তু রমণীরত্ন দ্রৌপদী অন্নের নিমিত্ত অতিশয় চিন্তান্বিতা হইলেন। কারণ দ্রৌপদীর অন্নপাত্রে অন্ন নাই, অথচ দুর্ব্বাসা ঋষি স্নান সমাপন করিয়াই অন্ন ভোজন করিতে চাহিবেন। ঋষির যেরূপ রাগ, ক্ষুধার সময় অন্ন না পাইলেই একটা ভয়ানক কাণ্ড করিয়া বসিবেন। দ্রৌপদী এই বিপদ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর কাছে আসিয়াই আহারের জন্য অন্ন চাহিলেন। তখন দ্রৌপদী লজ্জাবনতমুখী হইয়া কহিলেনঃ—

"দেব, আমার ভোজন পর্য্যন্ত সূর্য্যদত্ত স্থালী অন্নে পরিপূর্ণ থাকে; কিন্তু আজ আমি ভোজন করিয়াছি, এখন ত আর তাহাতে কিছু নাই।" বাসুদেব কহিলেন—'শীঘ্র যাও, সেই স্থালী আনিয়া আমাকে প্রদর্শন কর।' দ্রৌপদী সেই স্থালী আনিয়া প্রদর্শন করিলেন। সেই স্থালীর কণ্ঠে কিঞ্চিৎ শাকান্ন সংলগ্ন ছিল। বাসুদেব তাহা ভোজন করিয়া কৃষ্ণাকে কহিলেন—ইহাতে বিশ্বাত্মা প্রীত ও পরিতুষ্ট হউন এবং ভীমসেনকে কহিলেন,—'তুমি শীঘ্র ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করিতে আহ্বান কর।' কৃষ্ণের এই কৌশলে দুর্ব্বাসা এবং তাহার শিষ্যগণ ভোজন না করিয়াই পরিতৃপ্ত হইলেন, এবং ভীমসেনকে কহিলেন, 'আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে অন্ন প্রস্তুত করিতে কহিয়া স্নানার্থ আগমন করিয়াছি, কিন্তু আমরা অধুনা এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছি যে, কোন প্রকারেই আহার করিতে পারিব না'।

এখানে ত দেখিতেছি, দুর্ব্বাসা ঋষি একজন গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ হইয়াও দশ হাজার ব্রাহ্মণ শিষ্যসহ দ্রৌপদীর হস্তের অন্ন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।

এইবার আমরা দেখাইব মহাভারতে অতি পরিষ্কার রূপে লেখা রহিয়াছে যে, সকল জাতিই সকল জাতির অন্ন ভোজন করিতে পারে। পাঠকদিগের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ১৩৫ অধ্যায় হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"যুধিষ্ঠির কহিলেন পিতামহ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ বর্ণের মধ্যে কোন কোন বর্ণের অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন। ভীষ্ম কহিলেন 'ধর্ম্মরাজ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা পরস্পর পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারেন, কিন্তু কুকর্ম্মান্বিত শূদ্রের অন্ন ভোজন করা কাহারও বিধেয় নহে।"

আর অধিক দৃষ্টান্তের দ্বারা এই দীর্ঘ প্রবন্ধকে আরো দীর্ঘ করিয়া তুলিব না। যাঁহারা প্রত্যেক কথার মধ্যেই একটা কুতর্ক না তুলিয়া, প্রকৃত সত্য গ্রহণ করিতে চাহিবেন, তাঁহারা ভীষ্মের এই উক্তি দ্বারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রাচীন কালে এখনকার দিনের ন্যায় অন্নবিচার আদবেই ছিল না।

এখন আমরা দেখাইব, তপস্যা ও কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতেন; এবং নিকৃষ্ট কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণও শূদ্রজাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রমাণের আর অভাব নাই। আমরা কোন্ পুস্তক হইতে কোন্ কথাটি তুলিব, বুঝিতে পারি না। যাঁহারা পুরাণ এবং শাস্ত্রালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণের উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন।

সকলেই জানেন ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। কিন্তু শুধু কি বিশ্বামিত্রই তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছেন? এই প্রবন্ধের মধ্যেই ত আমরা দেখাইয়াছি যে, নিম্ন জাতিও ব্রাহ্মণের সঙ্গে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত বিবাহ সম্পর্কে সম্পর্কিত হইয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারে,—মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে ইহার বিধান ব্যবস্থা আছে। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৬৫ শ্লোকে লিখিত আছে—"শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

এ বিষয়ে শাস্ত্রে যে কত প্রমাণ আছে, তাহা যিনি জানিতে চাহেন, তিনি যেন সুপণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" পাঠ করেন। তাহা

* স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুদিত মহাভারতের বন পর্ব্ব দেখ।

হইলেই তাঁহার কৌতূহল নিবৃত্ত হইবে। উক্ত গ্রন্থ হইতে কয়েকটী মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি :—

"গার্গ্যগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগবত ৯।২১।১৯। সকল পুরাণেই লিখিত আছে যে, ত্রয়ারুণ পুষ্করী ও কপি এই তিন জনই ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। হরিবংশের ১১ অধ্যায়ে লিখিত আছে, নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য, তাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ১৪৩ অধ্যায়ে আছে যে, মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন 'যে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রাহ্মণধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে সে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম পালন করে সে আবার ব্রাহ্মণধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ক্ষত্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ যে অল্পমতি ব্রাহ্মণ দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া মোহের বশে বৈশ্যের কর্ম্ম আশ্রয় করে, সে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণও স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে এবং বৈশ্যও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। যথাঃ—

স দ্বিজো বৈশ্যতামেতি বৈশ্যো বা শূদ্রতামিয়াৎ।
স্বধর্ম্মাৎ প্রচ্যুতো বিপ্রস্ততঃ শূদ্রত্বমাপ্নুতে॥
এভিস্তু কর্ম্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥"

পূর্ব্বকালে কর্ম্মানুসারে শূদ্রাদি জাতি যে ব্রাহ্মণ হইতেন, এবং ব্রাহ্মণাদি জাতি যে শূদ্র জাতির মধ্যে গণ্য হইতেন, এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রন্থ হইতেও প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ধর্ম্মতত্ত্বের দশম অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—

"মহাভারতের বন পর্ব্বে মার্কণ্ডেয়সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে ঋষিবাক্য এইরূপ আছে,—পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্র সদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমরা ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করি। কারণ ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।"

* * পুনশ্চ গৌতম সংহিতায় ২১ অধ্যায়ে আছে ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে; আর সকল শূদ্র। যাহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত শুচি, উপবাসরত, দান্ত, দেবতারা তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন :—

ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

হে রাজন, জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।"

সর্ব্বশেষে আমরা দেখাইব, কর্ম্মবিভাগ ও নিম্ন জাতির প্রতি অবজ্ঞার উপরই প্রাচীন কালের জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদিগকে বেশি কিছুই বলিতে হইবে না। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রেই ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। আমরা এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের মধ্যে শাস্ত্রাদি হইতে যে সকল কথা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পাঠ করিলেই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সমগ্র মনুসংহিতা খানি যাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন, তাঁহারা কি দেখিতে পান? দেখিতে পান, বেদপাঠ, অধ্যাপনা, যজন, যাজন ও ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ এবং বিচারকার্য্য ব্যতীত, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসা প্রভৃতি সকল কার্য্যকেই শাস্ত্রকারগণ অতীব হীনচক্ষে দর্শন করিতেন। মনুর তৃতীয় অধ্যায়ে লেখা আছে :—

"চিকিৎসক ব্রাহ্মণ, এবং যে বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে রাজার সরকারী ভৃত্য, যে পশুপালক, যে নৃত্য গীতাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে সমুদ্রযাত্রা করে,—নক্ষত্রাদি গণনা করা যাহার উপজীবিকা, যে ব্রাহ্মণ যুদ্ধের আচার্য্য- ইহাদিগকে দৈব ও পৈত্র্য, উভয় কর্ম্মেই পরিত্যাগ করিবে।"

মনুর চতুর্থ অধ্যায়ে আছে—যে চিকিৎসক, যে নটবৃত্তি করে, যে দরজির কাজ করে, যে রক্ষোপজীবী, যে কর্ম্মকার, যে স্বর্ণকার, বেণুবাদক, লৌহবিক্রয়ী, ধোপা, যে শিল্পী—ব্রাহ্মণ কদাচ তাহাদের অন্ন গ্রহণ করিবে না; করিলেই পতিত হইবে।

এ জায়গায় প্রসঙ্গক্রমে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। আজকাল যে সকল ব্রাহ্মণ লম্বা পৈতা ঝুলাইয়া ব্রাহ্মণত্বের বড়াই করিয়া বেড়ান, শাস্ত্রের বিধান মানিয়া চলিলে তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব থাকে কোথায়? এমন যে আমাদের ভক্তিভাজন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, হিন্দুগণ যাঁহাকে নিষ্ঠাবান সুব্রাহ্মণ বলিয়া কতই গৌরব অনুভব করেন; শাস্ত্রের অনুশাসন মানিলে তিনিও আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না। কারণ ব্রাহ্মণ বেতন লইয়া রাজার অধীন হইয়া রাজকার্য্য করিলেই পতিত হইবেন। শাস্ত্র মানিতে হইলে বলিতে হইবে, এখন আর ব্রাহ্মণও নাই, ক্ষত্রিয়ও নাই, বৈশ্যও নাই, শূদ্রও নাই; এখন আমরা হিন্দু-ম্লেচ্ছ মিশ্রিত এক নূতন জাতি, আমাদের আচার ব্যবহারও নূতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে; প্রাচীন কালের শাস্ত্র বলিয়া কেন, প্রাচীন কালের কিছুর সঙ্গেই আমাদের আর ঐক্য নাই।

এ সকল বাজে কথা যাক। শাস্ত্রের বচন দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রাহ্মণগণ বৈশ্য ও শূদ্রাদি জাতির কর্ম্মকেই অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। বৈশ্য ও শূদ্রজাতি এই সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া উচ্চবর্ণের অবলম্বিত কোন কার্য্যে ব্রতী হইলে তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য হইতেন। পরন্তু ব্রাহ্মণগণ এই সকল নিকৃষ্ট কার্য্যে ব্রতী হইলে পতিত এবং শূদ্রাদি জাতির তুল্য ঘৃণিত বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

অতএব প্রাচীন কালের জাতিভেদ যে অনেকটা কর্ম্মবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তদ্ভিন্ন নিম্নজাতির অবজ্ঞার উপর যে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। এখন কোন চণ্ডালের ঘরে টাকা থাকিলেও তিনি সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত লোক হন; ব্রাহ্মণ গিয়া তাঁহার দ্বারস্থ হয়, ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে বেড়ায়, একাসনে বসে, একত্র আমোদ প্রমোদ করে। এমন কি, চণ্ডাল যদি বিদ্যার জোরে হাকিমী পদ পান, তাহা হইলে তিনি বিচারাসনে বসিয়া

ব্রাহ্মণ অপরাধীরই ফাঁসীর হুকুম দিতে পারেন। পূর্ব্বকালে কিন্তু তেমনটি হইবারই যো ছিল না। মনুসংহিতা অষ্টম অধ্যায়ে এ বিষয়ে কি লেখা আছে, তাহা ত সকলে জানেন? মনু বলিতেছেনঃ—

"যে রাজার সম্মুখে শূদ্র ন্যায়ান্যায় ধর্ম্ম বিচার করে সেই রাজার রাষ্ট্র পঙ্কে পতিত গরুর ন্যায় শীঘ্রই অবসন্ন হয়। ৮।২১। শূদ্র যদি দর্পিত ভাবে ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ করে, তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করিবেন। ৮।২৭২। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করে, তবে রাজা উহার কটিদেশ লৌহময় তপ্ত শলাকায় অঙ্কিত করিয়া উহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন; অথবা যেন না মরে এই ভাবে পাছা কাটিয়া দিবেন। ৮।২৮১। ক্রীতই হউক বা অক্রীতই হউক, শূদ্র দ্বারা ব্রাহ্মণ দাস্য কর্ম্ম করাইয়া লইবেন। যেহেতু বিধাতা দাস্যকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ৮।৪১২। "শূদ্র স্বামিকর্ত্তৃক বিমুক্ত হইলেও দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হয় না। দাসত্ব কর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক, অতএব কে তাহাকে মুক্ত করিতে পারে? ৮।৪১৪।

এখানেই দেখিতে পাইতেছি নিম্নজাতির প্রতি অবজ্ঞা, নিম্নজাতির প্রতি বিদ্বেষ ও অত্যাচারের উপরই জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এখন সকলেই একবার চিন্তা করিয়া দেখুন—প্রাচীনকালের জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ের জাতিভেদ প্রথার আকাশ পাতাল প্রভেদ হইয়াছে কি না?

আমরা একথা সাহস করিয়াই বলিতে পারি যে, যাঁহারা মনের একটা সংস্কারের দ্বারা চালিত না হইয়া, উদার ভাবে জাতিভেদের বিষয় চিন্তা করিবেন, তাঁহারা কি প্রাচীন, কি আধুনিক, কোন প্রকার জাতিভেদেরই সমর্থন করিতে পারিবেন না। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি উদারচিত্ত ও অকপট স্বদেশহিতৈষী বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"বর্ণবৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনতির পথে দাঁড়াইল। যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে তাহা এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজ না থাকিলে রাজ্যের উন্নতি হয় না। এই জন্য ভারতবর্ষ মুসলমানের হাতে গেল।" সুপণ্ডিত, চিন্তাশীল ও স্বদেশহিতৈষী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন—জাতিবিচ্ছেদের জন্যই আমাদের শিল্পবাণিজ্যের অবনতি হইয়াছেন। তিনি বলেনঃ—

"সকল দেশেই বিদ্যা ও অস্ত্রব্যবসায়ী লোক অন্য লোক অপেক্ষা প্রভুত্ব লাভ করে; কিন্তু সেই প্রভুত্বটি বংশানুগত হইলে অনিষ্ট ফল ফলে। * * সামান্য ব্যবসায়ী লোকগণ জন্মহেতুই আপনাদিগকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করিতে শিখে, সুতরাং কখনও উন্নত হইতে পারে না। * * স্বাধীন চিন্তা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের একচেটিয়া; স্বাধীন চিন্তা নিম্ন লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ। যে বিদ্যা জীবনের জীবন স্বরূপ এবং ক্ষমতার মূলীভূত কারণ স্বরূপ, তাহাও ব্রাহ্মণগণ প্রথমে নিম্ন জাতির নিকট হইতে, পরে ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া একচেটিয়া করিল; বিদ্যাহীন নিম্নজাতিগণ, সুতরাং পদানত হইয়া পড়িল, তাহাদিগের মানসিক উন্নতির পথ রহিল না।"

"এক জাতি প্রভু ও এক জাতি দাস হইলে কেবল যে দাস জাতির অমঙ্গল হয়, তাহা নহে, প্রভুদিগেরও অমঙ্গল হয়।"

এই সকল কথা কি শুধুই ইংরাজের মুখে শোনা কথা? ইহা কি সত্য নহে? আমরা ইহাকে সত্য মনে করি। রমেশ বাবুর মত লোক যে হিন্দুজাতিকে নিন্দা করিবার জন্য কোন কথা লিখেন নাই, তিনি যে আমাদের সামাজিক অন্যায়াচরণে মর্ম্মপীড়িত হইয়াই ইহা লিখিয়াছেন—তাহাও বিশ্বাস করি। কারণ, আমরা চিন্তা করিলেই দেখিতে পাই,—প্রাচীনকালের স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, তাঁতি, দরজি প্রভৃতি শিল্পবাণিজ্যব্যবসায়ী ও সমুদ্রগামী বণিকদিগের প্রতি ব্রাহ্মণেরা যেরূপ ঘৃণা প্রকাশ করিতেন, তাহাতে তাঁহাদিগের অবলম্বিত ব্যবসার প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ জন্মিতে পারে নাই। আজকাল একটা কথা উঠিয়াছে যে, তাঁতির ছেলে, কামারের ছেলে, সুতারের ছেলে, দোকানদারের ছেলে দু'পাতা ইংরাজী পড়িয়া যে তাহাদের জাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করে এবং পনর কুড়ি টাকা বেতনে ইংরাজের গোলামী স্বীকার করিয়া জীবনকে ধন্য মনে করে—ইহাতে দেশের বড় অনিষ্ট হইয়াছে; এরূপ হইলে দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির কি আশা আছে? অতএব ইহার প্রতীকারের জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কর—আবার প্রাচীনকালের জাতিভেদ প্রথাকে ফিরাইয়া আন। কারণ যে জাতির যে কাজ, যে ব্যবসায়, সেই জাতি যদি সেই কাজ ও সেই ব্যবসায়ের মধ্যে বাঁধা পড়ে, তবেই এ দেশে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হইবে; সেই সকল জাতি বাধ্য হইয়াই আপন আপন ব্যবসায়ে কৌশল ও বুদ্ধি প্রকাশ করিতে যত্নবান হইবে।

একথা যাঁহারা বলেন, তাহাদের কি ভ্রান্তি! তাঁহারা শুধুই আপন আপন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মুদিত নেত্রে এক একটা বিষয় কল্পনা করেন, কিন্তু দেশের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া কোন কথাই বলেন না। তাঁহারা ভাবেন না যে জাতিভেদের জন্যই তাঁহাদের কল্পনা সফল হইবার আশা নাই। তাঁতি, কর্ম্মকার প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ দু'পাতা ইংরাজী পড়িয়া পৈতৃক ব্যবসায় পায়ে ঠেলিতে চাহে কেন? ইংরাজের গোলামীর জন্যই বা ব্যস্ত হয় কেন? তাহাতে কি উপার্জ্জন খুব বেশী হয়? কাহারও কাহারও হয় বটে; কিন্তু অনেকেরই ত তা হয় না। তবুও যে তাহারা চাকুরীর জন্য উমেদার, তাহার কারণ কি? আমরা ঐ সকল জাতিকে ছোট জাত মনে করি, তাহাদের ব্যবসায়কে অবজ্ঞার চক্ষে দেখি, আর চাকুরীটাকে বড়ই সম্মানের কাজ মনে করি, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ চাকুরীর জন্য লালায়িত—এই জন্যই নয় কি? দেশে শিল্পশিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সুযোগে যদি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের সন্তান তাঁতি, কর্ম্মকার ও সূত্রধর প্রভৃতির কার্য্য শিক্ষা করেন ও হাতে কলমে তাহা করিতে থাকেন, তাহা হইলে দেখিব—তাঁতি, কর্ম্মকার

ও সূত্রধরের সন্তানগণও তাঁহাদের পৈতৃক ব্যবসায় অনুরাগী হইয়াছেন। নচেৎ যে ব্যবসায় উচ্চজাতি কর্ত্তৃক ঘৃণিত, কে সে ব্যবসায়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিবে? কে ঘৃণিত হইয়া থাকিতে চাহিবে? সকলেই চাহে উচ্চ সম্মান, উচ্চ অধিকার। যতদিন সমাজপতিগণের হাতে শক্তি ছিল, তত দিন ঐ সকল জাতিকে তাঁহারা উচ্চ সম্মান ও উচ্চাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন; এখনও যদি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার বিচিত্র কৌশলে তাঁহাদিগকে জ্ঞান ও উচ্চাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন,—তাহা হইলে বুঝিব আমাদের সমাজপতিগণ ভাগীরথীর স্রোতকে ফিরাইয়া হিমালয়ের অভিমুখে লইয়া যাইতে চাহেন।

তারপর যাঁহারা কোন ব্যবসায় বিশেষকে একটি জাতির মধ্যেই বদ্ধ রাখিতে চাহেন আমরা তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করি না। প্রায়ই ত দেখিতে পাই—একটি পরিবারের পাঁচটি ছেলের পাঁচ রকম শক্তি—পাঁচ দিকেই তাঁহাদের বুদ্ধি খেলে। একজন আইনে বেশ মাথা খাটাইতে পারেন; একজনের ডাক্তারী বিদ্যায় বুদ্ধি খেলে; একজনের চিত্রবিদ্যায় হাত খুব পাকা; একজনের সঙ্গীতে কণ্ঠ অতি মধুর—সাহিত্যে প্রতিভা অসাধারণ; একজনের ব্যবসা-বুদ্ধিতে মস্তিষ্কটি পরিপূর্ণ। এরূপ স্থলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুরোধে পাঁচ ভাইকেই যদি যজন যাজন ও অধ্যাপনায়, কিম্বা লড়াই করিতে, কিম্বা ব্যবসায়, কিম্বা ব্রাহ্মণের দাসত্বে নিযুক্ত করা হয়—তাহা হইলে সেটা কি খুব বুদ্ধির কাজ হয়—না, তাহাতে কোন ব্যবসায়েরই উন্নতি হয়?

আমরা আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? এখন ক্ষত্রিয়দের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কি হইবে? এখন ত বাঙ্গালী কায়স্থগণও ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছেন। তাঁহারা ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরা কোন্ সৈন্যদলে ঢুকিয়া কি অস্ত্র লইয়া কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন?

অতএব জাতিভেদের শৃঙ্খলে প্রত্যেক জাতির পা বাঁধিয়া তাহাদিগকে পুরুষানুক্রমে কোন বিশেষ কার্য্যের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে এবং কাজের ছোট বড় হিসাব করিয়া তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে, কখনই জাতীয় উন্নতি সম্ভব হইবে না। দেশের মধ্যে এ বিষয়ে যাহাতে খুব আলোচনা হয়, সেই জন্যই আমাদের ক্ষমতার অভাব সত্ত্বেও এই গুরুতর বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করিলাম এবং তাহা পাঠকদিগের সম্মুখে প্রকাশ করিলাম।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

দীপাবলী।

বহু দেবদেবীর উপাসক হিন্দুদিগের বাসভূমি ভারতভূমিতে যে কত প্রকার পার্ব্বণ, উৎসব, পূজা, ব্রতানুষ্ঠান, প্রচলিত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীদের কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উৎসব, পার্ব্বণ, ব্রত কাছে, সে গুলি সেই সেই প্রদেশে সীমাবদ্ধ বা তথাকার অধিবাসীদিগের জাতীয় উৎসব বলা যাইতে পারে। আবার কতকগুলি এমন আছে যাহা হিন্দু মাত্রেরই পালনীয় বা করণীয়। শেষোক্ত পার্ব্বণ বা উৎসবের মধ্যে দীপাবলীটী যেমন ভারতব্যাপী তেমন বোধ হয় আর কোনটী নহে। বহু অহিন্দুকে এই উৎসবে যোগদান করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতসাম্রাজ্যের মুকুটমণি রাজধানী কলিকাতায় ইহার যেমন আধিপত্য, বঙ্গদেশ হইতে শত শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী সুনীল লবণাম্বু পরিবেষ্টিত, ব্রিটিশ শাসনাধীন দ্বিতীয় নগর বাণিজ্যের বিস্তৃত বন্দর সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর বরপুত্র ধনকুবের পার্শী ও ভাটিয়াগণের বাসস্থান বোম্বাই নগরেতেও ইহার তেমনি আধিপত্য। ভারতের সকল প্রদেশবাসী সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু মাত্রেই এই উৎসবে যোগদান করেন। প্রতি পল্লী বা প্রতি নগরের অধিবাসিগণ ঘোর তমোময়ী অমানিশাকে দীপমালা দ্বারা সজ্জিত করিয়া কৃত্রিম পৌর্ণমাসীতে পরিণত করেন।

বঙ্গদেশাপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলে দীপাবলীর আড়ম্বরটা কিছু অধিক। এ দেশের দেওয়ালীর কথা বলিতে গেলে, সম্পূর্ণ কার্ত্তিক মাসটিরই একটু বিবরণ দিতে হয়। বৈশাখ ও মাঘ মাসের মতন ইহাও একটি পুণ্যময় মাস। শরৎ পূর্ণিমা হইতে * কার্ত্তিক পূর্ণিমা (রাস পূর্ণিমা) পর্য্যন্ত, এই একমাস কাল পূজা অর্চ্চনা দীপ দান করিবার নিয়ম। এদেশীয়া পুরললনারা একমাস কাল অতি প্রত্যূষে প্রতিবেশিনীগণ সমভিব্যাহারে গঙ্গা স্নান (অবশ্য যে স্থানে গঙ্গা আছেন) করিতে যান, এবং অতি কোমল কণ্ঠে দেবগুণগাথাপূর্ণ ভজন গাহিয়া রাজপথ গুঞ্জরিত করিয়া তুলেন। অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় যখন ইহাঁদের সেই সুমধুর বন্দনাগীতি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তখন মন বড়ই প্রফুল্লিত হয়, হৃদয়ে এক পবিত্র স্বর্গীয় ভাবের সমাবেশ হয়। জগদীশ্বরের নাম যে কোন ভাষায় বা যে কোন রূপেই লওয়া হউক না কেন, তাহাই চিত্তশান্তিকর, শ্রুতিমধুর হইবে। সে সময় বন্দনাকারিণীদিগের ধর্ম্মপ্রাণতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এই মত প্রত্যহ প্রাতঃস্নান ও দেবপূজা দেবদর্শন করিয়া ইহাঁরা বাটী প্রত্যাগমন করেন। এই সময় গঙ্গাতটে

* এদেশীয়রা পূর্ণিমার হিসাবে মাস গণনা করেন, এই জন্য বৎসরে দিন সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইয়া যায়। প্রতি তৃতীয় বর্ষান্তে একটি করিয়া মাস বৃদ্ধি করিয়া বা "মল মাস" দ্বারা ঠিক করিয়া লওয়া হয়।

বহুবিধ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আইসে। বালিকাদের খেলনা পুতুলের অভাব হইলে, গৃহিণীরা সাংসারিক কোন তৈজস-পত্রের অভাব হইলে, কার্ত্তিকের মেলায় ক্রয় করিতে মনস্থ করিয়া রাখেন, ও সকলেই নিজ প্রয়োজনানুসারে কিছু কিছু ক্রয় করেন। কাশীধামে কার্ত্তিকের মেলাটা খুব জাঁকাল রকমের হয়। ইহাকে "পঞ্চগঙ্গা"র মেলা কহে। মণিকর্ণিকার ঘাটে ও বেণীমাধবের ঘাটে খুব জনতা হয়। বৈকালে প্রবীণারা দেবালয় এবং ভাগিরথী তটে সোপানোপরি ঘৃতপ্রদীপ জ্বালাইয়া আইসেন। এ দৃশ্যটীও দেখিতে বড় মনোরম। বাটীস্থ তুলসীমঞ্চে ও স্বর্গগত পিতৃলোকোদ্দেশে আকাশপ্রদীপ দিবার নিয়ম বঙ্গদেশে ও পশ্চিমাঞ্চলে উভয় স্থানেই প্রচলিত আছে।

এ প্রদেশে দেওয়ালী উৎসবের প্রধান কর্ত্তব্য ঘর দ্বার পরিষ্কার করা। কার্ত্তিক মাস পড়িতেই পরিষ্কারকার্য্য আরম্ভ হয়। দেওয়ালী যত নিকটবর্ত্তী হয়, উক্ত কার্য্যেও তত শীঘ্রতা দেখা যায় এবং জন মজুর, কলি চূণও অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য হয়। দরিদ্রেরা এক প্রকার শ্বেত মৃত্তিকা দ্বারা গৃহের দেওয়াল ও গোময় দ্বারা ঘরের মেঝে লেপন করিয়া রাখে। এ ব্যবস্থাটা মন্দ নহে। আমাদের হিন্দুধর্ম্মের প্রায় সকল কার্য্যই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সম্পন্ন হয়, স্বাস্থ্যরক্ষাও ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে। এ প্রদেশে গৃহ পরিষ্কার করাটাও ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, "বেগারে গঙ্গা স্নানের" মত বৎসরান্তে গৃহপরিষ্কার করাটা স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক। অমাবস্যার পূর্ব্বের ত্রয়োদশীকে "ধনতেরশ" বলা হয়। বঙ্গদেশে কালীপূজার রাত্রে গৃহস্থের বাড়ী লক্ষ্মীপূজা হয়, এ দেশে ত্রয়োদশীর দিনে লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে। এই দিনে বাজারে লক্ষ্মী গণেশের মূর্ত্তি বিক্রয় হয়। গৃহস্থগণ এই লক্ষ্মী গণেশ ক্রয় করিয়া, ধূপ, দীপ, পুষ্প, মিষ্টান্নাদি দ্বারা দেবপূজা করেন এবং ভাণ্ডার ঘরে সমস্ত রাত দীপ জ্বালাইয়া ইন্দিরার অনুগ্রহ কামনা করেন। ধনতেরশের দিন কাঁসারীগণ নিজ বিপণি উত্তমরূপে সজ্জিত করে, উক্ত দিবসে সকলেই নিজ নিজ অবস্থানুসারে একটী বা ততোধিক বহুমূল্য বা স্বল্প মূল্যের নূতন বাসন ক্রয় করে। চতুর্দ্দশীর দিন আমাদের মত চৌদ্দশাক, বা চৌদ্দ প্রদীপের ব্যবস্থা নাই। সন্ধ্যাকালে একটী পুরাতন প্রদীপ জ্বালিয়া তাহাতে একটী কাণা কড়ি দিয়া গৃহদ্বারে রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে "যমকে দীয়া" বা যমের প্রদীপ বলে। যাঁহার ঘর দ্বার সে দিন পর্য্যন্ত পরিষ্কৃত হয় না, তাঁহাকে বড়ই নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, কারণ দ্বিগুণ মজুরী দিয়াও জন মজুর পাওয়া যায় না।

অমাবস্যার দিন অতি প্রত্যূষেই হাটে বাজারে পথের ধারে, সকল স্থানেই রাশীকৃত ধবলাকার, মুড়ী, চিঁড়া, ধানের খই, জনরা বা ভুট্টার খই বিক্রয় হইতে থাকে। ধনী দরিদ্র সকলেই দুই চারি টাকা হইতে, দুই চারি আনার ক্রয় করেন। দাস, দাসী, ধোপা নাপিত, আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে এই জলপান দিতে হইবে ও ২।১ মাস পর্য্যন্ত ইহার দ্বারা জলযোগ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ভোর হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত এই জলপান ক্রয় বিক্রয় হয়। ময়রা বা হালুইকর-দিগের এসময় মাহেন্দ্রযোগ। তাহারা দোকানের উপরি-ভাগে ক্ষুদ্র চন্দ্রাতপ ও তাহাতে একটী মস্ত অভ্রের "কাণ্ডিল" (লণ্ঠন) খাটাইয়া, পথের ধূলি নিবারণার্থে জল ছড়াইয়া, দোকানটী উত্তমরূপে জাঁক জমক সহকারে সজ্জিত করিয়া, লাল, নীল, পীত, ইত্যাদি রংয়ের মিষ্টান্ন বিক্রয় করে। এই মিষ্টান্নগুলি দেখিতে যেমন সুশ্রী, খাইতে তেমনি বিশ্রী, কিন্তু তবু কি ক্রেতার অভাব হয়? অবশ্য উত্তম দ্রব্য যে একেবারে নাই তাহা নহে। জলপানের সহিত মিষ্টান্নও সকলকে বিতরিত করা হয়। এই উপলক্ষে কুম্ভকারেরাও বেশ উপায় করে। সম্পূর্ণ কার্ত্তিকমাস পর্য্যন্ত গঙ্গার ঘাটে, গৃহিণীদের ভাঁড়ার সজ্জোপকরণ ছোট ছোট হাঁড়ি, সরা, তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খুরী (এক পয়সায় একশত করিয়া), বালিকাদের পুতুল খেলার উনান, হাঁড়ি হাতা বেড়ী, ছোপা ভাড় ইত্যাদি বিক্রয় হয়। দীপাবলীর সময় নানা রংয়ের, নানা ঢংয়ের, নানা ভাব-ব্যঞ্জক মাটীর খেলনা বিক্রয় হয়। খেলনাগুলি দেখিতে বেশ সুশ্রী, মূল্যও দু'আনা চারি আনা, হইতে একটাকা, দু'টাকা পর্য্যন্ত হয়। দু'একটী মনুষ্যাকৃতি ইজার চাপকান টুপী পরিহিত খেলনাও দেখিতে পাওয়া যায়। সৌখীন ধনিলোক নিজ বৈঠকখানার শোভাবৃদ্ধি করিবার জন্য দশটাকা বারটাকা মূল্য দিয়া উহা গ্রহণ করেন। গৃহস্থেরা সম্বৎসরের জন্য "দীয়া, দায়লী" (ছোট খুরী ও বড় খুরী) কিনিয়া রাখেন। খেলনার বাজারে ক্রেতা অপেক্ষা মস্ত মস্ত পাগড়ী মাথায় গ্রাম্য দর্শকবৃন্দের জনতাই অধিক। কন্যার শ্বশুরালয়, বধূর পিত্রালয়ে তত্ত্ব করিবার সময় সে বাটীস্থ প্রত্যেক বালকের জন্য মাটীর পুতুল ও বালিকার জন্য ছোপা ভাঁড় দিবার নিয়ম আছে। দেওয়ালীর সময় কাগজের বা অভ্রের "কাণ্ডিল" (লণ্ঠন) সকলে একটী দুটী করিয়া ক্রয় করেন।

কৃষিজীবীরা ক্ষেত্রের মধ্যে মাটিতে দীপ দান করেন। ফল বাগানের মালিকেরা গাছে গাছেও আলো দেন। আঁধারে এই দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখায়।

ধনবানের গৃহে ঝাড় লণ্ঠন, পরিষ্কার করা তৈল, বাতি দ্বারা সজ্জিত করা, অট্টালিকার দ্বিতল, ত্রিতল বারাণ্ডায় ভিজা মাটীর উপর কেরোসিন তেলের মাটীর টীম বা প্রদীপ-গুলি বসাইয়া, সমস্ত দিন ধরিয়া এইরূপ রোসনাইর বন্দোবস্ত করা হয়। গৃহস্থেরা থানকত খুরী জলে ভিজাইয়া, তুলার সলিতা পাকাইয়া, একসের বা আধসের "মিঠাতেল (পাঁচ



উপাসনার ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে।

মিসালি তেল) কিনিয়া রাখেন। কুঠিওয়ালা সাহেবরাও হিন্দু কর্ম্মচারীদের অনুরোধ বা আগ্রহে কুঠিতে "সাফাই ও রোসনী" করেন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে আদালত, হাঁসপাতাল ও টাউনহলে আলো দেওয়া হয়। সন্ধ্যা সমাগম মাত্রেই চারিদিক আলোকাকীর্ণ হইয়া উঠে। রাত্রে ব্যবসায়ী মহাজনদের গদিতে খাতাপত্র পূজা ও নূতনখাতা করা হয়। রাত্রে ইতর ভদ্র ধনী নির্ধন সকলে সহরে ঘুরিয়া আলো দেখে। ধনীরা গাড়ী জুড়ী হাঁকাইয়া, আবার যাঁহাদের সখ আছে অথচ গাড়ী রাখিবার ক্ষমতা নাই তাঁহারা এক্কা করিয়া আলো দেখিতে বাহির হন। সাহেব বিবিরাও বাদ যান না। জেনানা মিশনের কর্ত্রী ঠাকুরাণী নিজের শিষ্যা, সহচরী, সমভিব্যাহারে পদব্রজে আলো দেখিয়া বেড়ান।

এ প্রদেশবাসীরা জুয়া খেলাটা দীপাবলীর প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। দীপাবলীর পাঁচ ছয় দিবস পূর্ব্ব হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জুয়া খেলিবার অনুমতি লইবার জন্য দরখাস্তের উপর দরখাস্ত দিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। জুয়া খেলিবার হুকুম পাইবা মাত্র চারিদিকে জুয়ার আড্ডা বসিয়া যায়, বদমাইসেরা আবার দু'চারি দিন পূর্ব্ব হইতে গোপনে জুয়া খেলিতে আরম্ভ করে ও পুলিসের হস্তে নানারূপ নিপীড়ন সহ্য করে, অনেক স্থলে অর্থদ্বারা আপোসে নিষ্পত্তি হইয়া যায়। এই কয় দিন নিম্নশ্রেণীর লোকেরা জুয়া খেলিবার জন্য একেবারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া যায়। মাতা বা স্ত্রীর গাত্রাভরণ বন্ধক দিয়া ধার করিয়া, সুবিধা পাইলে চুরী করিয়া, জুয়া খেলে। "এই বার জিতিব" "এই বাজিতে দ্বিগুণ লাভ করিব" কিন্তু আশাই সার, তারপর দিন হয় ত বাড়ীতে মড়াকান্না পড়িয়া গেল। কেহ হারিলে কেহ অবশ্য জিতিবে, কিন্তু কে যে জিতিল তাহা অনুভব করা দুঃসাধ্য; সকলেই ত হারিয়া অনুতাপ করিতে বসে। জুয়া খেলিবার জন্য ইহারা কেমন পাগল হয় তাহার একটী উদাহরণ নিম্নে দিলাম।

আমাদের বাড়ী একটী অল্পবয়স্ক চাকর ছিল। সে স্ত্রীর হাতের বাজু বন্ধক দিয়া পাঁচটী টাকা লইয়া দুইরাত্র জুয়া খেলিল ও হারিল, তৃতীয়দিবসে আমার জননী দেবীর কাছে একমাসের মাহিনা ৪৲ টাকা "পেসগী" (অগ্রিম) চাহিল। একটা বৃদ্ধা চাকরাণী তাহাকে উপদেশ দিয়া বলিল, "মত্ খেল বেটা! নাহীঁ ত ইহো হার যাবে"। চাকরটা উপেক্ষাভরে কহিল, "বুড়িয়ার কথা শোন! না খেলিলে জিতিব কি? আর না জিতিলে ধার শোধ হইবে কি রূপে?" একদল জুয়াচোর আছে তাহারা পথপার্শ্বে তাস লইয়া জুয়া খেলায়। প্রথমে ইহাদের দলস্থ পাঁচ, সাত জন "অপরিচিত" লোক আসিয়া খেলিতে আসে, তাহাদের ক্রমাগত জিতিতে দেখিয়া নিরীহ দর্শকগণ ভ্রমে পতিত হয়, প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা কিছু হাতে থাকে সব হারিয়া বাড়ী ফিরিতে হয়। বড়লোক মহাজনদের বৈঠকখানায় টাকার ঝন ঝন শব্দে কর্ণে তালা লাগিয়া যায়। একজনের বৈঠকে আড্ডা হয়। যত যক্ষরাজের কৃপাপাত্রেরা টাকার তোড়া লইয়া জুড়ী হাঁকাইয়া জুয়া খেলিতে আইসেন। সে স্থানে দশ কুড়ী টাকার নাম নাই। ১০০র নিম্নে বাজী রাখাটা উহাঁরা অপমানজনক বোধ করেন। কেহ বা দু' দশ হাজার হারিবার নিরানন্দ উপভোগ করেন, কেহ বা দু'দশ হাজার জিতিবার আনন্দ উপভোগ করেন। খাজাঞ্চি মহাশয় টাকার তোড়া লইয়া হাজির থাকেন, ইঙ্গিত মাত্রেই ঢালিয়া দেন। অল্প টাকা লইয়া ইহাঁদের বাজীর মধ্যে দু'দশ টাকা মিশাইয়াও অনেক ভদ্রলোক জুয়া খেলেন; আশ্রয়দাতা জিতিলে, কিছু অংশ পাইবেন, হারিলে উহাঁর সহিত হারিতে হইবে। রাত্রিকালে অসভ্য জুয়াওয়ালাদের "ছক্কা হ্যায়" "পঞ্জা হ্যায়" ইত্যাদি চীৎকারে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। গবর্ণমেণ্টের অনুকম্পায় এই উৎপাত দু'চার দিনের বেশী স্থায়ী হয় না, তাই রক্ষা। এ দিকে রাত্রি শেষ হইতে না হইতে গৃহিণীগণ অলক্ষ্মী দূর করিবেন। পাড়ায় চারি দিকে কুলা বাজাইবার শব্দে নিদ্রাদেবী স্বল্প কার্য্য বাকী রাখিয়াই প্রস্থান করেন। ব্যাপারটা পূর্ব্ব হইতে অবগত না থাকিলে বিপদ আর কি? বাটীর সব ঘর, দালান, হইতে কুলা বাজাইয়া অলক্ষ্মীকে যেন বলপূর্ব্বক তাড়াইয়া সদর দ্বারে আনিয়া কুলায় অগ্নি সংযোগ করা হয়। বালক বালিকাদের সম্বৎসর নীরোগ থাকিবার জন্য উক্ত অগ্নির তাপ দেওয়া হয়। এই কার্য্যের নাম "দরিদ্র খেদা" অর্থাৎ অলক্ষ্মী দূর করা। এদেশীয়রা বলেন দেওয়ালীর মত ব্যয়-সাপেক্ষ "তেওহার" (পার্ব্বণ) আর নাই। ইহাঁরা আরও বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির চারটী পার্ব্বণ আছে, যথা রাখি পূর্ণিমা ব্রাহ্মণের, দশমী (বিজয়া দশমী) ক্ষত্রিয়ের, দীপাবলী বৈশ্যের ও হোলী বা দোল শূদ্রের পার্ব্বণ।

এই প্রদেশবাসী ভদ্রলোকগণ অধিকাংশ বৈষ্ণবসম্প্রদায়-ভুক্ত, প্রায় সকলের বাড়ীতে রাম সীতা, রাধাকৃষ্ণ, ঠাকুরজী আছেন। ঠাকুরজীর জন্য কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হয় না। ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলেই স্বপাক ডালরুটী, আচার চাটনি দিয়া ঠাকুরজীর ভোগ দেন, এবং জন্মাষ্টমী, রাম নবমী, অন্ন-কূট, দোলাদি উৎসবে অবস্থানুযায়ী ব্যয় ও ঘটা করেন ও প্রসাদ বিতরণ করেন। প্রতিপদের দিন গৃহস্থদের বাড়ী অন্নকূটের ধূম পড়িয়া যায়। নূতন আলু বেগুন পালমশাক ইতিপূর্ব্বে কেহ আহার করেন না, কারণ অন্নকূটে ঠাকুরজীকে নূতন "ভাজী" (তরকারী) ভোগ দিতে হয়। এদেশে সকল তরকারীই আলাহিদা আলাহিদা ছক্কা করিবার বা রাঁধি-বার নিয়ম, দুটা তিনটার সংমিশ্রণে কোন ব্যঞ্জন তৈয়ারী

হয় না। যে সকল আনাজের তরকারি রান্না হয়, ভিন্ন প্রণালীতে তাহারই আচার তৈয়ারী হয়। লুচি, কচুরী, মালপো, মোহনভোগ, পাঁপর ভাজা, নানাবিধ নোন্‌তা খাদ্য, বিবিধ মিষ্ট খাদ্য, ক্ষীর, দই, ঠাকুরজীকে ভোগ দেওয়া হয়। দ্বাপরে গোকুলবাসী গোপবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ছাপ্পান্ন কোটি প্রকারের অন্নব্যঞ্জন ভোগ দিয়াছিলেন। এখন অন্নক্লিষ্ট ভারতবাসী অতি সংক্ষেপে সেই কার্য্য সমাধা করেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্ত্রী পুরুষ সকলে নগরস্থ দেবালয়ে অন্নকূট দর্শন করিতে গমন করেন। এ দেশীয়া ভদ্রমহিলাদের যেমন অবরোধ প্রথার বাঁধাবাঁধি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই জন্য চাদর গায় দিবার একটি সুন্দর সুরুচিসঙ্গত নিয়ম প্রচলিত আছে।* দেবালয়ের প্রাঙ্গণে ১০০ বা ১৫০ লোকের আহারোপযোগী অন্ন পাতা পাড়িয়া স্তূপাকারে রক্ষিত হয়, তদুপরি গামলা করিয়া তিন চারি প্রকারের ডাল, বেসম দিয়া দধির অম্ল ও পরমান্ন বসাইয়া দেওয়া হয়। ইহাকে "কাচ্চী" ভোগ কহে। এই উঠানে কেহ নামিতে পায় না। এই অন্ন রাত্রে দেবালয়াধিকারীর আত্মীয় স্বজন, দাস, দাসী, শিষ্যবর্গ আহার করেন। উঠানের চারি পার্শ্বস্থ রোয়াকে "পক্কী" ভোগ অর্থাৎ ঘৃতপক্ক সামগ্রী সজ্জিত থাকে; আচার, চাটনী, মোরব্বার সংখ্যাই বেশী। অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যগুলি প্রায় একমাস পনর দিন আগে তৈয়ার করা হয়। জনসাধারণে ঠাকুরজীকে প্রণামী স্বরূপ কিছু মূল্য দিয়া এই প্রসাদ ক্রয় করেন। কাশীধামের গোপালমন্দির নামক বৈষ্ণবদিগের প্রধান দেবালয়ের অন্নকূটের প্রসাদ অতি উপাদেয় বস্তু। ধনবানেরা আগ্রহ করিয়া এই মন্দিরের প্রসাদ ক্রয় করেন। এই দিবসে গোময় দ্বারা গোবর্দ্ধন শৈল নির্ম্মাণ করিয়া প্রতি দেবালয়ে তাহার পূজা করা হয়।

অন্নকূটের পরদিন "ভইয়া দুইজ" বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতা ভগ্নীর ইহা বড়ই আনন্দের দিন। ভ্রাতা যে ভগ্নীর কত স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসার পাত্র ও ভগ্নী ভ্রাতার কতদূর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী তাহা এই দিনে বেশ উপলব্ধি করা যাইতে পারে। এ প্রদেশীয়া ললনারা ভাইফোঁটার দিন একটী গোময় প্রতিমা তৈয়ার করিয়া, ফুলমালা, ঘৃত প্রদীপ, চন্দন, মিষ্টান্ন, পান সুপারি, কাঁচা ছোলা দিয়া তাহার পূজা করেন। হস্ত দ্বারা তুলার সূতা পাকাইয়া প্রত্যেক ভ্রাতার জন্য এক একটী ক্ষুদ্র বাণ্ডিল প্রস্তুত করেন, তাহার নাম "আয়ুজোড়া"। তাৎপর্য্য ভ্রাতার পরমায়ু বৃদ্ধি হউক। প্রসাদী মালা ভাইকে পরাইতে হয়, প্রসাদী চন্দন দিয়া ফোঁটা দেওয়া হয়, সর্ব্ব প্রথমে প্রসাদী ছোলা সাতটী করিয়া ভ্রাতাদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। এই ছোলা চর্ব্বণ করিবার নিয়ম নাই, আস্ত গিলিতে হয়। এখনকার নব্য ভ্রাতৃবৃন্দ ছোলা গিলিতে বড়ই নারাজ; সেই জন্য ছোলা কয়েকটী পেটে না গিয়া পকেটে আশ্রয় লয়। এদেশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠা ভগ্নীর অন্ন গ্রহণ করেন না, কিন্তু ভাইফোঁটার দিন তাঁহাকে ছোটবোনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হয়। এদেশীয় কায়স্থগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন দোয়াত কলমের পূজা করেন।

কার্ত্তিক মাসের "দিঠওয়ন" বা দেবোত্থান একাদশীটী এপ্রদেশে একটী পার্ব্বণের মধ্যে গণনীয়। উক্ত দিবসে গঙ্গার ঘাটে তুলসী বৃক্ষের সহিত নারায়ণের বিবাহ দেওয়া হয়। ঘাটের উপর একটা প্রকাণ্ড মৃণ্ময় মনুষ্যাকৃতি গঠিত করিয়া রাখা হয়। তাহার নাম "ভীমসেন"। যাঁহারা গঙ্গাস্নান করিতে যান, তাঁহারা এই ভীমের পূজা করেন। কথক মহাশয় পুরাণোক্ত একাদশীব্রতমাহাত্ম্য পাঠ করেন। স্নানকারী স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই কিছুক্ষণ পাঠ শ্রবণ করেন ও ব্রাহ্মণকে ফল মূল এবং দক্ষিণা দান করেন। গৃহস্থেরা একটী পিঁড়াতে আলিপনা দিয়া, তদুপরি, নূতন চাল, নূতন গুড়, আখ, ছোলার শাক, পানফল, রাঙ্গা-আলু, মূলা, কচু, ইত্যাদি সজ্জিত করেন। বাটীর কর্ত্তা এই সকল বস্তুর পূজা করেন ও "উঠ, উঠ, বাসদেও" বলিয়া তিন বার পিঁড়াটী উত্তোলন করেন বা দেবতার নিদ্রাভঙ্গ করেন। একাদশীর দিন অন্নাহার করিতে নাই, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলেই ফলাহার করিবেন। সেদিন হালুইকরেরা পানফলের ময়দা দ্বারা প্রস্তুত বহুবিধ খাদ্য বিক্রয় করে। সম্পন্ন গৃহস্থগণ, উক্ত ময়দার লুচী, মোহনভোগ, ফুলুরী, ইত্যাদি বাড়ীতে তৈয়ার করিয়া ফলাহার করেন। গরীব মনুষ্যেরা "কন্দা" (রাঙ্গা-আলু) "বণ্ডা" (কচু) "সিংঘাড়া" (পানিফল) সিদ্ধ করিয়া ফলাহার করেন। দাস, দাসী, ধোপা, নাপিত, সকলকে কিছু কিছু ফলাহার বণ্টন করিতে হয়।

যাঁহারা নিয়ম পূর্ব্বক কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃস্নান করেন, রাস পূর্ণিমার পর প্রতিপদের দিন তাঁহাদের স্নান শেষ হয়। উক্ত দিবসে ময়দা দ্বারা গঠিত একটী পুতুল মাথায় করিয়া স্নান করা হয়। এই পুতুলটী স্নানের বা পুণ্যকার্য্যের সাক্ষী রহিলেন। ইহার নাম "ত্রিজটাকে নহান" বা ত্রিজটার স্নান। এই ত্রিজটাটী রাবণ রাজের অন্তঃপুরস্থিতা ত্রিজটা রাক্ষসী বা অন্য কেহ তাহা আমরা জানি না। প্রতিপদের দিন গঙ্গাদেবীকে দীপদান করিয়া কার্ত্তিক মাসের দীপদান সমাপ্ত হয়। শুনিতে পাওয়া যায় নৈষধপতি মহামতি নলরাজাই নাকি এই দীপাবলী উৎসবের প্রবর্ত্তক। এইদিনে তিনি পুষ্করের সহিত অক্ষ ক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হয়েন। সম্ভবতঃ উক্তদিবসেই চঞ্চলা লক্ষ্মী দেবীর

* প্রবাসিনী বঙ্গমহিলাগণও চাদর গায়ে দিতে বেশ অভ্যস্ত হইয়াছেন। আমাদের বঙ্গদেশবাসিনী ললনারা যেমন ইংরাজ রমণীর জ্যাকেট শেমিজ ব্যবহার করিতেছেন, সেইরূপ এদেশীয়াদের মত চাদর গায় দিবার প্রথাটীও চলিত করিবার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

ও শনি মহাশয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের বিচার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, ভারতবাসী সুখে দুঃখে হাসি মুখে আজও তাঁহার প্রবর্ত্তিত উৎসবের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। দীপমালিকার সময় অমৃতসরের শিখ সম্প্রদায়ের পবিত্র গুরুদরবারের বা গ্রন্থসাহেবের সুবর্ণমণ্ডিত মর্ম্মর মন্দিরে অতি সমারোহ সহকারে দীপদান করা হয়। অমৃত সরোবরের স্ফটিকনিভ স্বচ্ছনীর-রাশিতে অসংখ্য দীপরাজীর প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া মানব-নয়নমুগ্ধকারী এক অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করে। ভগবান রামচন্দ্রের প্রিয় বনভূমি চিত্রকূট তীর্থের দীপমালিকার উৎসবও দর্শনীয়।

প্রবাসিনী

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।*

কোন অপরিচিত লোকের সহিত আলাপ পরিচয় হইলে তাহার নাম না জানিলে আমাদের তৃপ্তি হয় না। নাম মনে থাকিলে তাহার বিষয় যেন সমস্ত জানিতে পারিলাম বলিয়া বোধ হয়। বৈজ্ঞানিকেরা নিত্যই নূতন নূতন জিনিষ আবিষ্কার করিতেছেন, কিম্বা পূর্ব্বপরিচিত জিনিষ-গুলির মধ্যে নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছেন। যিনি যে জিনিষের আবিষ্কারক, তিনি সেই জিনিষের নামকরণ করেন। তাঁহার সেই নামটী দ্বারা অপরে সেই জিনিষ জানিতে ও চিনিতে পারে। তবে মনুষ্যসমাজে শিশুর অন্নপ্রাশনের সময় যেরূপ প্রথা প্রচলিত আছে, ঠিক সেরূপ ব্যবস্থা হয় না। সন্তানের অভিভাবকেরা যাহা ইচ্ছা তাহাই নাম দিতে পারেন, অন্য লোকের এ বিষয়ে বলিবার কোন অধিকার নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণের এত দূর স্বাধীনতা নাই। কোন নূতন জিনিষের নামকরণ করিতে হইলে, কেন এরূপ নাম হইবে তাহার বিশেষ প্রকারে কারণ নির্দ্দেশ করিতে হয়। নামটী প্রকৃত পক্ষে সেই বস্তুর গুণজ্ঞাপক কি না তাহাও দেখাইতে হইবে। আমাদের দাক্ষিণাত্যবাসী ভ্রাতৃ-বৃন্দের নাম দেখিলে, অনেক সময়ে তাহাদের নিজেদের নাম ছাড়া, পিতার নাম ও তাহাদের গোষ্ঠীর কোথায় আদি নিবাস তাহা জানা যায়। এ হিসাবে ব্যক্তিগত নামগুলিও কতক পরিমাণে গুণজ্ঞাপক। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। বাস্তবিক পিতামাতা ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদের কাণা ছেলের নাম 'পদ্মলোচন' কিম্বা দুর্দ্দান্ত ছেলের নাম 'সুশীলকুমার' রাখিতে পারেন। বৈজ্ঞানিক জগতে কিন্তু এরূপ নামকরণ সাধারণের গ্রাহ্য হইবে না। দ্রব্যের গুণের সহিত নামের ধাতুগত অর্থের সামঞ্জস্য থাকা চাই। নাম-গুলি যাহাতে সাধারণের বোধগম্য হয় এবং বিশেষ প্রকারে শ্রুতিকঠোর না হয়, তাহারও চেষ্টা করা উচিত।

নামকরণ সময়ে আর একটা বিষয়ে লক্ষ্য থাকা উচিত। সমাজবদ্ধ হইয়া একত্র বাস করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। পণ্ডিতেরা বলেন, এই ধর্ম্ম অনুসারে মানবেরা প্রথমে সঙ্কেত-চিহ্ন দ্বারা ভাববিনিময় করিত। পরে ক্রমশঃ ভাষার সৃষ্টি হয়। ভাববিনিময়ের জন্য একান্ত আবশ্যক বলিয়াই ভাষার উৎপত্তি হয়। আমি যে জিনিষটাকে নীল বলিলাম, অন্য লোকে তাহাকে লাল বলিলে ভাষার উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইবে। বাইবেলে কথিত আছে যে ঈশ্বর মানবদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য এক সময়ে ভাষাবিভ্রাট ঘটাইয়া দিয়া-ছিলেন। বস্তুত সকল প্রকার বিপ্লব অপেক্ষা ভাষাবিভ্রাট অধিক গোলযোগ উৎপন্ন করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে নূতন নামকরণ করিতে হইলে, যাহাতে তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত হয়, বিশেষভাবে তাহার চেষ্টা করা উচিত।

বিভিন্ন প্রকারের ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। ভাষাবিজ্ঞানের পুস্তকে ইহার বিস্তারিত আলোচনা আছে। ভাষা লিপিবদ্ধ হইলে অনেকটা স্থায়িভাব অবলম্বন করে। বহুবৎসরব্যাপী ব্যবহারের পর এক একটা ভাষা সর্ব্বাঙ্গীন হয়। অনেক পরিবর্ত্তনের পরই এইরূপ হওয়া সম্ভবপর হয়। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন করিতেও কি আমাদের এতটা বিলম্ব করিতে হইবে? সুসভ্য ইউরোপে নিত্যই নূতন জিনিষের সৃষ্টি হইতেছে। সেখানে একজন পোলাণ্ডদেশবাসী বহু-ভাষাবিৎ পণ্ডিত বিশ্বামিত্রের নূতন সৃষ্টির মত একটা আন্‌-কোরা নূতন ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন। কয়েক সহস্র বৈজ্ঞানিক শব্দ এক ভাষা হইতে ভাষান্তরিত করা ইহা অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম নয়।

আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় দীক্ষিত লোকের সংখ্যা অল্পমাত্র। অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকের মধ্যে মতের বিশেষ অমিল হইবার কোন কারণ নাই। তাঁহারা সকলে মিলিয়া যেরূপ পরিভাষা সৃজন করিবেন, তাহাই সকলে গ্রহণ করিবেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সে যে প্রকারে রাসায়নিক পরিভাষা সৃষ্ট হইয়াছিল, ইহাই তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। লাবোয়াসিয়ে দাহনক্রিয়ার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিয়া পুরাতন রসায়নের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন।* পুরাতন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সকল জিনিষের নাম দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদের আগাগোড়া পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইল। লাবোয়াসিয়ে, লাপ্লাস্, ডি মর্ভো, ফুরক্রয়, প্রভৃতি ফরাসিদেশীয় বৈজ্ঞানিক-গণ তখন একত্র হইয়া জিনিষগুলির নামকরণের একপ্রকার

---

* The Hindi Scientific Glossary: edited by Syam Sundar Das.

* "নব্য রসায়নী-বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি" দ্রষ্টব্য।

প্রথা নির্দ্দেশ করিলেন। তাহা এখনও বৈজ্ঞানিক জগতে প্রচলিত আছে। ইহার একশত বৎসর পরে জেনিভা সহরে ইউরোপের সকল দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ মিলিত হইয়া আর একটী সভা করেন। এই একশত বৎসরের ভিতর জৈব রসায়নে প্রায় ৬০।৭০ হাজার নূতন যৌগিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়। ইহাদের নামকরণে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দূরীভূত করিবার জন্য এই সভা নামমালা সংগ্রহের জন্য কয়েকটী নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। এই নিয়মগুলি ইউরোপের প্রায় সকল দেশের বৈজ্ঞানিকগণ শিরোধার্য্য করিয়াছেন।

সংস্কৃত বা তৎসংসৃক্ত প্রাকৃত হইতে যেরূপ ভারতবর্ষীয় অনেক ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, প্রাচীন লাটিন ভাষা হইতে সেইরূপ ফরাসী, ইতালীয় প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষাগুলি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই লাটিন এবং স্থলবিশেষে গ্রীক ভাষা অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা প্রায়ই তাঁহাদের পরিভাষা সঙ্কলন করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় লাটিন নামের এত প্রাচুর্য্য যে লাটিন ভাষা শিক্ষা না করিলে, অনেক স্থলে চিকিৎসাবিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ইউরোপে লাটিন ভাষা যেরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, সংস্কৃত আমাদের দেশে তদপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিবর্গ যাহাতে একতাসূত্রে বদ্ধ হয়, ভারতহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই তাহা চিন্তনীয়। ভাষাভেদ, ধর্ম্মভেদ, আচারভেদ যাহাতে ক্রমশঃ পরিমাণে স্বল্প হইয়া আসে তাহার প্রভূত চেষ্টা হইতেছে। কেহ কেহ যাহাতে ভারতবাসীর ভাষা এক হয় এরূপ প্রস্তাবও করিতেছেন। এ সকল অবশ্য কার্য্যে পরিণত করা সুকঠিন ও সময়সাপেক্ষ। কিন্তু যাহা করা না করা আমাদের নিজের আয়ত্তাধীন, যাহা আমরা নিজে হাতে গড়িয়া করিব, তাহা বিভিন্ন প্রকারে করিয়া অনৈক্যবর্দ্ধন করা সমীচীন নহে। সম্প্রতি নাগরীপ্রচারিণী সভা কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। হয় ত কালে ভারতবর্ষীয় অন্য কোন ভাষায় আর এক প্রকারের বৈজ্ঞানিক অভিধান প্রকাশিত হইবে। ভাষার অনৈক্য হেতু ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসেবিগণের মধ্যে ভাববিনিময়ের বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইবে। জনসাধারণ মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচার হওয়া উচিত ইহা যাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা, তাঁহাদের এখন সচেষ্ট হওয়া উচিত।

নাগরীপ্রচারিণী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সাতটী পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ভূগোল, খগোল, অর্থশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়নীবিদ্যা এই সপ্তশাস্ত্রের প্রায় দশসহস্র নামের হিন্দী ভাষায় অনুবাদ আছে। ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদ্বিদ্যা প্রভৃতির তত্ত্বগুলি জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং বহু ব্যয়সাধ্য যন্ত্র ব্যতিরেকেও বোধগম্য করা যাইতে পারে। ইহাদের পরিভাষা সঙ্কলনে এই সভা হস্তক্ষেপ করেন নাই, ইহা ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে। বিশেষতঃ বাঙ্গলা ভাষায় এই সকল বিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে এবং বহুল পরিমাণে পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রায় ১৪ বৎসর অতীত হইল এই প্রবন্ধলেখকদ্বয়ের অন্যতর প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধে এক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহাতে সুশ্রুতের "শারীরস্থান" অধ্যায় হইতে অনেক শব্দ গৃহীত হয়। আশা করি নূতন সংস্করণে এই অসম্পূর্ণতা তিরোহিত হইবে।

এই পুস্তকখানি যে ভ্রমশূন্য ও সর্ব্বাঙ্গীন হয় নাই, তাহা সঙ্কলনকারীরা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এবিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। অনেকস্থলে ইংরাজী ভাষার অনুকরণ করিতে গিয়া ভাবের বিষম বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে।* ইহা দ্বারা সকল প্রকারের অসুবিধা যে দূরীভূত হইবে তাহা আশা করা যায় না। ইংরাজী ওয়েবষ্টারের অভিধান দেখিয়া এই পুস্তকের জন্য অধিকাংশ শব্দ সঙ্কলন করা হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের ব্যবহৃত অভিধানে বৈজ্ঞানিক শব্দের সংখ্যা স্বল্পমাণ। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়নকালে ইহা অপেক্ষা অন্যূন বিশ ত্রিশ গুণ বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে।

ভিন্ন ভাষার অনেক শব্দ প্রত্যেক ভাষায় বর্ত্তমান আছে। ইংরাজেরা আমাদের শাল, নবাব, বাজার প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ নিজেদের মত করিয়া লইয়াছে। বিদেশীয় বহু দ্রব্য সচরাচর ব্যবহার করি বলিয়া আমরা অনেক ইংরাজী শব্দ গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের ছেলেরা শিশুকাল হইতে মার্ব্বেল লইয়া খেলে, পেন্সিলে লেখে, ব্লটিং দিয়া মসী শোষণ করে, গ্লাস হইতে জল পান করে, বোতল হইতে ঔষধ সেবন করে। এরূপ অবস্থায় বিজ্ঞানে কোন ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিব না বলিলে চলে না। বৈজ্ঞানিকের ঘরকরনার অত্যাবশ্যক জিনিষ—যেমন gas, burner, screw, spring, beaker, basin, flask প্রভৃতির হিন্দী নাম আমাদের সমালোচ্য পুস্তকে নাই। ইহাদের ঠিক অনুবাদ করা দুঃসাধ্য, কেন না প্রচলিত জিনিষের অন্য নাম দিলে তাহা দুর্ব্বোধ্য হইবে। অনেক বিষয়ে অনেকে বিলাতী বর্জ্জন করিতেছেন কিন্তু এ ক্ষেত্রে

* গুটিকতক উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। কুইনাইন, কোকেন প্রভৃতি কতকগুলি কটুগুণসম্পন্ন উদ্ভিজ্জ দ্রব্য সর্জ্জিকা ক্ষারের ন্যায় ক্ষার ধর্ম্মাবলম্বী। এই জন্য ইহাদের বঙ্গভাষায় উপক্ষার এবং ইংরাজীতে alkaloid বা Organic base বলে। সমালোচ্য পুস্তকে Organic baseএর অনুবাদ "সজীব পদার্থ ভস্ম" দেওয়া হইয়াছে। সজীব পদার্থ ভস্মীভূত করিলে কি হয় তাহা সকলেই জানেন।

ইহা এক প্রকার অসম্ভব। আর একটী কথা—এক প্রসিদ্ধ-নামা বৈজ্ঞানিক তাঁহার আবিষ্কৃত জিনিষের হয় ত নাম এক প্রকার দিলেন। সেই জিনিষের অন্যপ্রকার নাম দেওয়া সভ্যসমাজে অশিষ্ট ও দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইবে। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে জাতিগত ঈর্ষ্যা দ্বেষ থাকা উচিত নহে এবং থাকেও না। বৈজ্ঞানিকেরা আপনা আপনির ভিতর একটা স্বতন্ত্র জাতি গঠন করিয়া তোলেন।

পরিভাষা সম্বন্ধে যে সংস্কৃত ভাষার নিকট আমাদের বেশী ঋণী হইতে হইবে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সংস্কৃতে অনেক সুন্দর সুন্দর বৈজ্ঞানিক শব্দ ছিল, আমরা তাহাদিগকে বিকৃত করিয়া কিম্ভূতকিমাকার করিয়া তুলিয়াছি। নবপ্রকাশিত "নব্যরসায়নী বিদ্যা"য় ইহার একটা উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।* রত্নপরীক্ষাশাস্ত্রে "অগ্নিমাত্রা নিরূপণ" বলিয়া যে কথা আছে তাহা ইংরাজী Thermometry কথাটীর প্রকৃত ভাবজ্ঞাপক। এইরূপ শব্দগুলির যাহাতে অপব্যবহার না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

দুঃখের বিষয় হিন্দী পরিভাষা অধিকাংশ স্থলেই পুরাতন নামের মর্য্যাদা রাখেন নাই। সৰ্জ্জিকাক্ষার এবং যবক্ষার এই দুই প্রকার ক্ষারের নাম আমাদের দেশে সুশ্রুতের কাল হইতে প্রচলিত আছে (History of Hindu Chemistry—Chemistry in the Susruta অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সমালোচ্য গ্রন্থে ইংরাজী সোডা এবং পটাস বজায় রহিয়া গিয়াছে। ক্ষার দুই প্রকার হইতে পারে। ক্ষারের গুণ কতক পরিমাণে বিনষ্ট হইলে তাহাকে মৃদু ক্ষার কহে। ক্ষার গুণ অক্ষুণ্ণ থাকিলে আয়ুর্ব্বেদে তাহাকে তীক্ষ্ণক্ষার বলা হইয়াছে। এই প্রকার সুন্দর সুন্দর শব্দ থাকিতেও হিন্দী পরিভাষা অন্য নাম "দাহক" সৃজন করিয়াছেন। উদ্ভিজ্জ দ্রব্য কতকগুলি ক্ষারগুণসম্পন্ন আছে। তাহাদের উপক্ষার নাম প্রচলিত আছে। এই গ্রন্থে ইহাদিগকে "ক্ষারপ্রায়" এই নূতন নামে অলঙ্কৃত করা হইয়াছে। ধাতু সম্বন্ধেও এইরূপ গোলযোগ করা হইয়াছে। দুই কিম্বা তিন ধাতুর মিশ্রণে কাংস্য প্রভৃতি যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় তান্ত্রিক রাসায়নিক গ্রন্থে তাহা-দিগকে কৃত্রিম ধাতু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; এবং স্বর্ণরৌপ্য ব্যতিরেকে সকল ধাতুকে হীন ধাতু বলা হইয়াছে। ইহাদের পরিবর্ত্তে "ধাতুমেল" ও "নীচ ধাতু" এই নাম-দ্বয় অধিকতর উপযুক্ত হয় নাই। সুখের বিষয় জ্যোতিষ এবং গণিতের পরিভাষা সংগ্রহের ভার উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত ছিল বলিয়া এই দুইটীতে এরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের মত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এই ভার লইয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ভারতবর্ষে এই কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার ন্যায় আর একটী লোক পাওয়া সুকঠিন।

নূতন কোন নাম দিলে, কেন এইরূপ নাম দেওয়া হইল তাহা লোকের জানিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের সমালোচ্য পুস্তকে ইহার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। টীকা ও ফুটনোট দ্বারা কোন নাম কিরূপে সৃষ্ট হইল ও ইহা কিরূপ অর্থবাচক তাহা বিবৃত করা উচিত ছিল।*

নাগরীপ্রচারিণী সভা এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া সাধা-রণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও, ইহা হইতে অনেক সুফল ফলিতে পারে। আশা করি আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা বিজ্ঞান চর্চ্চার দিকে মনোযোগ পূর্ব্বক মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিবেন। পুস্তকাদি প্রণয়ন ব্যতিরেকে এইরূপ অভিধান সঙ্কলন শুষ্ক বৃক্ষে জলধারা সেচনের ন্যায় নিষ্ফল হইবে। বস্তুতঃ পরিভাষার জন্য বিশেষ কার্য্য আটকায় না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ভক্তিভরে এক একটা কল্পিত দেবতার উদ্দেশে শত সহস্র নাম রচনা করিতেন। আমাদেরও এবিষয়ে যদি সেইরূপ আভিনিবেশ থাকে, তাহা হইলে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব।

গ্রন্থের মুখবন্ধে গ্রন্থসম্পাদক শ্রীযুত শ্যামসুন্দর দাস মহাশয় বলিয়াছেন যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনে অধ্যাপক গজ্জর বড়োদাধিপের সাহায্যে ১৮৮৮ অব্দে যে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন সময় হিসাবে ভারতবর্ষের মধ্যে তাহাই প্রথম। কিন্তু এই সংস্কার ভ্রমাত্মক। চল্লিশ বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত এবং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বঙ্গভাষাতে পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, প্রাকৃতিক ভূগোল প্রভৃতি বিজ্ঞানগুলির পরিভাষা সৃজন করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এবং বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রকাশ করেন। হিন্দী-পরিভাষা সম্পাদক সম্ভবতঃ ইহা না জানিয়াই এইরূপ কথা লিখিয়াছেন। বাস্তবিক অক্ষয়কুমার এবং রাজেন্দ্রলালের পরিভাষা অবলম্বন করিয়া বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক নামগুলি আজও চলিতেছে। ইঁহারা ইঁহাদের মূল্যবান্ সময় বিজ্ঞান-চর্চ্চায় নিয়োজিত করিয়া দেশের প্রভূত উপকার সাধন

* "নব্য:রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি ৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা" দ্রষ্টব্য।

* দৃষ্টান্তস্বরূপ রসায়নশাস্ত্র বিবৃত কতকগুলি মূল পদার্থের হিন্দী নাম উদ্ধৃত করিতেছি। Aluminium স্ফটিক্ হইতে এবং arsenic হরিতাল হইতে উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের নাম "স্ফট" ও "তাল" হইয়াছে। কোথা হইতে নামটা সৃষ্ট হইল তাহা জানা থাকিলে অনেক জ্ঞানলাভ হয়। এই প্রকারেই বোধ হয় antimonyর "অঞ্জন" Fluorineএর "প্লব" ও lithiumএর "গ্রাব" প্রভৃতি নামকরণ হইয়াছে। Nitrogen নত্রজন, manganese "মাঙ্গল," Rubidian রূপদ প্রভৃ-তির নাম শুধু উচ্চারণ সৌকর্য্যার্থে ইংরাজী হইতে অল্প পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

করিয়াছেন। আমাদের দেশবাসীরা ইহাদের কার্য্য বিস্মৃত হইলে, ইহাদের স্মৃতির অবমাননা করা হইবে এবং আমাদের পক্ষেও ইহা বিষম অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীবিধুভূষণ দত্ত এম্, এ।

জেহন্দর্ ও লালকূয়র।

যখন এই চতুরা সুন্দরী ধূমকেতুর মত প্রৌঢ় জেহন্দর্ শাহের জীবনাকাশে উদিত হইলেন তখন মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ। তৈমুরলঙ্গ যে রাজ্যের সূচনা করিয়াছিলেন, বীরকেশরী উদারহৃদয় বাবর যে রাজ্যের ভিত্তিস্থাপনা করিয়াছিলেন, মোগলশ্রেষ্ঠ মহামতি আকবর স্বীয় অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে যে বিশাল সাম্রাজ্যের আয়তন বর্দ্ধিত ও ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করিয়াছিলেন, তখন সে জগৎপ্রথিত বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার অক্ষম ইন্দ্রিয়পরায়ণ উত্তরাধিকারীদের হস্তে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল। সম্রাট্ আওরঙ্গ্জেব সঙ্কীর্ণ অনুদার ভেদনীতি ও ধর্ম্মান্ধতায় পিতামহের অটল সিংহাসনের সুদৃঢ় স্তম্ভরাজি ক্ষয়িতমূল করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তখনও মোগলাধিকৃত ভারতের সর্ব্বত্র মোগলের দৃঢ় শাসন অনুভূত হইত। কিন্তু ইঁহার পরবর্ত্তী মোগল-সম্রাটেরা কেবল কলচালিত পুত্তলিকার ন্যায় মন্ত্রীদের হস্তের ক্রীড়নকমাত্র ছিলেন। ঘৃণিত পানাসক্তি, কুৎসিত সংসর্গ ও জঘন্য ইন্দ্রিয়পরায়ণতা তাঁহাদিগকে সিংহাসন হইতে বিলাসমন্দিরে ও বিলাসমন্দির হইতে ঘাতকের নির্ম্মম অস্ত্রসমীপে নীত করাইত! এরূপ একটী অক্ষম দুর্বৃত্ত মোগল সম্রাটের জীবনের চিত্র এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রদত্ত হইবে।

যে উপায়ে আওরঙ্গ্জেবের পৌত্র ও সম্রাট্ বাহাদুর শাহের তৃতীয় পুত্র মৈজুদ্দীন জেহন্দর্ শাহ্ চতুর কুশলী মন্ত্রী জুল্ফিকারের সাহায্যে অগ্রজ ও অনুজদের রক্তে সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সব বর্ণনা করা আমাদের অভিপ্রেত নয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন তিনি সিংহাসনাধিরূঢ়। প্রৌঢ় জুল্ফিকার তখন রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা। সম্রাট্ কেবল তাঁহার হস্তচালিত ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র। ঐতিহাসিক কাফি খাঁর কথায় তখন "ভাট নকীব ও নটনটীদেরই মরসুম পড়িয়াছিল।" এই পাপোন্মত্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ নৃপতির শাসন-প্রণালী ও সভাসদ্বর্গকে বিদ্রূপ করিয়া কাফিখাঁ বলিয়াছেন যে "যেরূপ অত্যাচার ও জঘন্য ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সময় পড়িয়াছে তাহাতে কাজি ও মুফ্তিদিগকে কোরান ও কল্মা ছাড়িয়া সাকী ও সিরাজীরই বা উপাসনা করিতে হয়!" সম্রাট্ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাঁহার ধাত্রী-পুত্র কোশলতাস্ খাঁকে (?) 'খাঁ জহাঁ বাহাদুর' খেতাব দিয়া রাজ্যের মধ্যে একটী প্রধান পদে উন্নীত করিলেন। "সৈয়র-উল্-মুতাক্ষরীণ্" ইতিহাসগ্রন্থের ভাস্বর লিপিকার গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন যে, যে রমণী সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহভাগিনী ছিলেন তাঁহার নাম লালকূয়র।

লালকোঙর বা লালাকূয়র বা লালকূয়রের (গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন 'লালকুর,' সম্ভবতঃ ইহা 'লালকুমারী' শব্দের অপভ্রংশ, এখনও বিহার ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে 'যমনা-কূয়র' 'ব্রজকূয়র' প্রভৃতি নামের প্রচলন আছে) শৈশবাবস্থা তিমিরাচ্ছন্ন। তাঁহার জন্মস্থান বা জন্মবৃত্তান্ত বা রাজধানীতে আগমনের কারণ না গোলাম হোসেন না কাফি খাঁ ('মুন্তখবুল্ লুবাব অত্যুত্তম (ঐতিহাসিক) সারসংগ্রহ গ্রন্থের রচয়িতা) না সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইরাদৎ খাঁ কেহই এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। তবে স্পষ্ট না বলিলেও লালকূয়রের যে খুব নীচ বংশে জন্ম তাঁহাদের সকলের বর্ণনার আভাসে সহজেই অনুমিত হয়। কথিত আছে যে লম্পট সম্রাট ইহাঁকে নর্ত্তকীসম্প্রদায় হইতে বেগমে উন্নীত করিয়াছিলেন। মোগল সম্রাটেরা কখন কখনও এইরূপে যে মহিষী বরণ করিয়া লইতেন সে কথা মেনুষী হইতে সঙ্কলন করিয়া বঙ্গদর্শন পত্রে "রঙ্গমহল" প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। জগদ্বিখ্যাত নূরজহাঁর সৌন্দর্য্যের কথা যেরূপ প্রত্যেক ঐতিহাসিক বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাঁর সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে সেরূপ কোন সবিশেষ আলোচনা নাই। গোলাম হোসেন বলেন যে জেহন্দর্ সম্রাট্ হইয়াই ইহাঁকে 'ইম্তিয়াজ মহল বেগম' (অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) এই উপাধি দিয়াছিলেন ও ইনি বাদশাহী সৈন্যাদির কুচের সময় সম্রাটের নিকটেই চন্দ্রাতপযুক্ত হাওদায় হস্তীপৃষ্ঠে সমারূঢ় হইয়া যাইবার উচ্চ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মোগল দরবারে ইহা অতি উচ্চ সম্মান। এ সম্মান কেবল মাত্র রাজবংশীয় বেগম ও শাহ্জাদা শাহ্জাদীদের প্রাপ্য। গোলাম হোসেন বলিয়াছেন যে এই রমণীর উপর বাদশাহের বিশেষ পক্ষপাত পরিদৃষ্ট হইত। তাঁহার সন্তোষ বিধান করা যেন সম্রাটের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। লালকূয়রের ভ্রাতা খোসল্ খাঁকে নগণ্য অবস্থা হইতে সাতহাজারী মন্সব্দার ও তাঁহার খুল্লতাত নেয়ামৎ খাঁকে পাঁচহাজারী মন্সবদারের উচ্চপদে উন্নীত করেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি রাজ্যের একজন প্রধান ওমরাহকে আকবরাবাদের সুবাদারী হইতে বিচ্যুত করিয়া তাঁহার প্রিয়তমার ভ্রাতাকে সেস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু এ স্থলে তাঁহার এ অন্যায় পক্ষপাত অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতিহত হইয়াছিল। প্রধান সচিব জুলফিকার খাঁ, যিনি জেহেন্দরের রাজ্যলাভের প্রধান হেতু, সম্রাটের এরূপ উত্তরোত্তর যথেচ্ছাচারের বৃদ্ধি দেখিয়া সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন ও যেরূপে হয়

এ অত্যাচারের স্রোত প্রতিরোধ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। জুলফিকার চতুর, কর্ম্মঠ, রাজনীতিজ্ঞ, সাহসী ও তেজস্বী। সম্রাট্ অদূরদর্শী, কাপুরুষ, সুরামত্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। সম্রাটের জঘন্য চরিত্রে যখন প্রজাসাধারণ ও প্রধান আমীর ওম্‌রাহবর্গ ক্রমশঃই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন তখনও জুলফিকার কোনও কথা কহেন নাই; সম্রাটের পক্ষাবলম্বন করিয়া আসিতেছিলেন। কারণ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মোগল সম্রাট কার্য্যতঃ তিনি, জেহন্দর নামে রাজা, তাঁহার ইচ্ছা সাধনের উপকরণ মাত্র। কিন্তু লালকুয়রের প্রভাব যখন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল তখন কূটবুদ্ধি ভবিষ্যৎদর্শী মন্ত্রী সে প্রভাব ধ্বংস করা স্থির করিলেন। কাফি খাঁ বলেন যে আকবরাবাদের সুবাদারীর ফর্ম্মান্ ও এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্র বখ্‌শী-উল-মুল্ক্ কয়েক দিন বিলম্ব করিয়াছিলেন। গোলাম হোসেন বলেন যে খোশল খাঁ যখন বাদশাহের সম্মতিযুক্ত কাগজপত্র জুলফিকারের নিকট উপস্থিত করিলেন তিনি কাগজপত্র দেখিয়া নিজের পদোচিত অর্থ গ্রহণ না করিয়া ইহাতে নিজের স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করিলেন। এ কার্য্যে কত অর্থ প্রয়োজন এ কথা প্রশ্ন করাতে উত্তর হইল যে "পাঁচ সহস্র সারেঙ্গী ও সাত সহস্র তব্‌লা।" বলা বাহুল্য যে এ বিদ্রূপে খোশল্ খাঁর ও তাঁহার ভগিনীর পূর্ব্ব নর্ত্তকের ব্যবসায়ের প্রতি কটাক্ষ ছিল। এই তীব্র শ্লেষে মর্ম্মাহত হইয়া তিনি নিজ ভগিনীকে এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে উত্ত্যক্ত করেন। সম্রাট্ প্রিয়তমার উত্তেজনায় মন্ত্রীকে ডাকাইয়া মিষ্ট কথায় এ সম্বন্ধে তদন্ত করিতে বলিলেন (কারণ জুলফিকারকে ভৎর্সনা করিতে সহজে তাঁহার সাহসে কুলাইয়া উঠিতেছিল না) ও মন্ত্রী যে খোশল খাঁকে বাদ্যযন্ত্রঘটিত উৎকোচের কথা বলিয়াছেন সে কথা পরিহাসের স্বরূপ বলা হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। স্পষ্টভাষী সৎসাহসসম্পন্ন জুলফিকারের ন্যায়বুদ্ধি সুপ্ত ছিল না। তিনি সম্রাট্‌কে সদুত্তর প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। গোলাম হোসেন ও কাফি খাঁ উভয়েই সে উত্তর একটু বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ স্থলে গোলাম হোসেনের সে বর্ণনার মর্ম্মাংশমাত্র সঙ্কলিত করিবার স্থান হইবে। প্রধান মন্ত্রী গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন, "জাঁহাপনা, বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধীয় উৎকোচের কথা কেবল মাত্র পরিহাস নহে। জাঁহাপনার অবিদিত নাই যে আপনার গোলাম আমীর ওমরাহেরা যেরূপ সে সব পদ উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়া আসিতেছে এ সুবাদারীর কার্য্যও তদ্রূপ। পক্ষান্তরে, রাজদরবারের গায়ক ও নর্ত্তকীরাও সেরূপ বৃত্তি ও রাজপ্রসাদ পুরুষানুক্রমে উপভোগ করিয়া আসিতেছে। এখন কালগতিকে যদি উভয় সম্প্রদায়ের লোকের পদবিনিময় হয়, যদি নর্ত্তক ও গায়কেরা আমীর ওম্‌রাহদের পদপ্রার্থী হয় ও সে সব পদমর্য্যাদা প্রাপ্ত হয় তবে আমীর ওম্‌রাহদের নৃত্যগীতাদি শিক্ষা না করিয়া আর উপায় কি? এ জন্যই আপনার নফর সারেঙ্গী ও তব্‌লার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।" এই স্পষ্টোক্তিতে জেহন্দর লজ্জিত, নির্ব্বাক্ ও অধোবদন হইয়া রহিলেন। সুতরাং খোশল খাঁর সেবারে আর রাজপ্রতিনিধিপদে উন্নীত হওয়া ঘটিল না।

লালকুয়র যখন সাধারণ নর্ত্তকী মাত্র ছিলেন তখন জহরা নাম্নী একজন ফল বিক্রেত্রীর সহিত আলাপ হয়। উভয়ের মধ্যে 'দোগানা' (সখী)* সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। সখীর স্বপ্নাতীত সৌভাগ্যের সময় সঙ্গে সঙ্গে জহরাও বাদশাহের বিশেষ অনুগ্রহভাগিনী হইয়া উঠিল। সে প্রকাশ্য রাজপথে সখীবৃন্দে পরিবৃত হইয়া প্রায়ই স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত হাওদায় সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহের মত বায়ুসেবনে বহির্গত হইত। রঙ্গমহলে যখন লালকুয়রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত তখন মোগলের রাজপুরীর অসূর্য্যম্পশ্য অন্তঃপুরদ্বার, যেখানে শমনও সশঙ্কচিত্তে যাতায়াত করিতেন, সেই রাজান্তঃপুরের প্রকাশ্য দুর্গমধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া বেগমদের মহলে প্রবেশ করিবার আজ্ঞা পাইয়াছিল এ আদেশ ও উচ্চ সম্মান কেবল রাজবধূ ও রাজকুমারীগণের প্রাপ্য। নীচকুলোদ্ভবা কোন সামান্যা রমণী এরূপ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাগ্যবিপর্য্যয়ে যে মদগর্ব্বে অন্ধ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? তাহার অনুচরবর্গও স্বামিনীর দৃষ্টান্তে মদোদ্ধত ও গর্ব্বিত হইয়াছিল। সম্রাটের এরূপ প্রশ্রয় পাইয়া সামান্য কারণে বা অকারণেও প্রকাশ্য রাজপথে ভদ্রসন্তানদের অপমান করিত। গোলাম হোসেন এরূপ ঘটনার একটি ভাস্বর চিত্র দিয়াছেন। একদিন চিন্‌খিলিজ খাঁ নামধেয় একজন অতি সম্ভ্রান্ত ওম্‌রাহ রাজপথে সানুচর বহির্গত হইয়াছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব ইহাঁর কার্য্যকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের মত রাজকার্য্যে বিচক্ষণ দক্ষ রাজকর্ম্মচারী সংগ্রহে ও নিয়োজনে পটু চতুর সম্রাটের নিকট যখন তিনি এরূপ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন ইহাই তাঁহার যোগ্যতার প্রকৃত পরিচয়। আওরঙ্গজেব ইহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন ও উক্ত নৃপতির মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীদের নিকট কোন পদপ্রার্থী হইয়া খিলিজ খাঁ কখনও রাজদরবারে উপস্থিত হন নাই। প্রায় নিজ গৃহে নির্জ্জনেই অতিবাহিত করিতেন, প্রকাশ্যে বড় বাহির হইতেন না। দৈবদুর্ব্বিপাকে যেদিন

* 'মুতাক্ষরীনের' ইংরাজ অনুবাদক ব্রিগস্ সাহেব 'দোগানা' কথার 'রূপান্তর' বা 'দ্বিতীয়' (Duplicate or double) এই অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে সপত্নীদের মধ্যে এ সম্বোধন প্রচলিত। ব্রিগস্ সাহেবের শব্দগত অনুবাদ যথার্থ কিন্তু সপত্নীদের মধ্যে এ কথার প্রচলন খুব কম। সচরাচর এখনও যুক্তরাজ্য ও বিহার প্রদেশে, আমাদের বঙ্গীয় নারীদের 'সই' বা 'সখী' শব্দের মত, সমবয়স্কা যুবতীদের মধ্যে এরূপ প্রণয়ের সম্বোধন প্রচলিত দেখা যায়।

তিনি সদলবলে বাহির হইয়াছেন সেই দিনই পথে জহরা ও তাহার অনুচরবর্গ বাহির হইয়াছিল। তাহারা এই মানী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অপমান করিবে পূর্ব্ব হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই যেন তাঁহার অনুচরবর্গকে অপমানসূচক বিদ্রূপ করিতে লাগিল। দূরদর্শী ধীর খিলিজ খাঁ সে সব অপমানে অধীর না হইয়া সময় বুঝিয়া স্বীয় অনুচরবর্গকেই নিরস্ত করিতেছিলেন। এমন সময় জহরা হস্তিপৃষ্ঠ হইতে উচ্চৈঃস্বরে ব্যাপার কি জানিতে চাহিল ও সম্যক ব্যাপার অবগত হইয়া ঘেরা হাওদার পরদা হইতে মুখ বহির্গত করিয়া উক্ত ওমরাহকে সম্বোধন করিয়া শ্লেষপূর্ণ তীব্র স্বরে কহিল, "ওহে খিলিজ খাঁ, বোধ হয় তুমি নিশ্চয়ই অন্ধের সন্তান; কেন সম্মুখের পথ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছ না?" এ অপমান মানী ওমরাহের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইল। তাঁহার ইঙ্গিতে তাঁহার অনুচরেরা জহরা ও তাহার পারিষদবর্গকে তৎক্ষণাৎ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে টানিয়া ভূতলে ফেলিয়া বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিল। কিন্তু প্রবীণ ওমরাহ কিয়ৎকাল পরে ক্রোধোপশম হইলে নিজের অপরিণামদর্শিতার ফলাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। উপায়ান্তর স্থির করিতে না পারিয়া তিনি একবারে সরাসরি প্রধান সচিব জুলফিকারের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া কেহ কখনও খিলিজ খাঁকে রাজদরবারে বা কোন রাজপুরুষের কাছে যাইতে দেখে নাই। সুতরাং সহসা তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া জুলফিকার সসম্ভ্রম অভিবাদন ও সাদর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে বসিবার আসন দিলেন। যথাযোগ্য অভ্যর্থিত হইবার পর প্রধান মন্ত্রী সবিস্ময়ে এরূপ সাক্ষাৎসৌভাগ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে খিলিজ খাঁর আসন্ন সমূহ বিপদের সকল কথা অবগত হইলেন। খিলিজ খাঁর সৌভাগ্যবশতঃ জুলফিকার তাঁহার জহরাকে প্রহাররূপ কার্য্যের কেবল অনুমোদন বা প্রশংসা করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, যাহাতে তাঁহার কোন বিপদ না ঘটে তাহার সাধ্যমত যথোচিত প্রয়াস পাইবেন এরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন। খিলিজ খাঁর বিদায়ের পর জুলফিকার একটুকরা কাগজে সম্রাটকে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়া পাঠাইলেন। "জাঁহাপনার ওমরাহবর্গের একজনের মানাপমান সকল ওমরাহের মানাপমানের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ও আপনার নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ অনুগত ক্রীতদাসের সম্মান খিলিজ খাঁর মানাপমানের সহিত অভিন্নভাবে সম্মিলিত জানিতে আজ্ঞা হয়।" এই পত্র লইয়া যখন সচিবের ভৃত্য সম্রাটের নিকট উপনীত সেই সময়েই রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া জহরা লালকুয়রের সমক্ষে স্বীয় মস্তকে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তাহার অনুচরবর্গও নানাবিধ পক্ষপাত দুষ্ট অতিরঞ্জিত বর্ণনায় দুর্ব্বলচিত্ত সম্রাটকে উত্তেজিত করিতেছিল। ভাগ্যে জুলফিকারের সময়োচিত পত্র পাইয়াছিলেন, নচেৎ বৃদ্ধ খিলিজ খাঁকে অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইত সন্দেহ নাই। জেহেন্দর্ প্রধান মন্ত্রীর ভয়ে কোন কথা বলিলেন না—খিলিজ খাঁও সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

লালকুয়রঘটিত আর একটী ঘটনা কাফি খাঁ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে এ গল্পটী প্রথমে রাজধানীর লোকসমাজে প্রচারিত ও ক্রমে নগর হইতে নগরান্তরে প্রসারিত হইয়া পড়ে। সম্রাট কখন কখন তাঁহার প্রিয়তমা ও কতকগুলি নর্ম্মসহচরকে সঙ্গে লইয়া গোশকটে রাজধানীর বাজার ও পানশালায় আমোদ প্রমোদ করিতে যাইতেন! এক রজনীতে এরূপ বহির্গত হইয়াছেন। কাফি খাঁর বর্ণনার ভাবে বোধ হয় যে, সে রাত্রিতে তাঁহার উপপত্নী ব্যতীত তাঁহার সঙ্গে আর কেহ ছিল না। ফিরিবার সময় উভয়ে এরূপ পানোন্মত্ত ও হতচেতন হইয়াছিলেন যে যখন শকটখানি রাজপ্রাসাদ দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল তখন লালকুয়র অতিরিক্ত মদ্যপানে এরূপ চৈতন্যহীন ছিলেন যে শকট হইতে নামিবার সময় পার্শ্বস্থ বাদশাহের কোন সন্ধান না লইয়া শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন ও শীঘ্রই গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। অতিরিক্ত সুরাপানে হতবুদ্ধি, হতচেতন ও সম্পূর্ণরূপে হৃতবল সম্রাট সেই অবস্থায়ই শকটে গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়া রহিলেন। শকটচালকও স্বচ্ছন্দে শকটখানি নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল ও বাহকযুগল খুলিয়া শকটখানি যথাস্থানে রাখিয়া দিল! রাজভৃত্যদের যখন চৈতন্য হইল যে লালকুয়র একাকিনী ফিরিয়াছেন তাঁহার পার্শ্বে সম্রাট নাই তাহারা তখন ভীত হইয়া লালকুয়রের প্রগাঢ় নিদ্রার ব্যাঘাত করিতে সাহসী হইল! নিদ্রাভঙ্গের পর সম্রাট যে তাঁহার পার্শ্বে নাই এতটুকু চৈতন্য হইল ও তাহার কারণ নির্ণয়ে অসমর্থা হইয়া মূঢ়ের মত কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজপুরীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল—সম্রাটের সন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরিত হইল—অবশেষে সমগ্র হিন্দুস্থানের বাদশাহকে কোটী কোটী লোকের মালিককে শকট হইতে উদ্ধার করা হইল!

এই সময়ে আর একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। গোলামহোসেন বলিয়াছেন যে, এই সময়েই লালকুয়রের সুযোগ্য (!) ভ্রাতা স্বীয় উচ্চপদের মদগর্ব্বে অন্ধ হইয়া নানা প্রকার অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতায় মত্ত হইয়া উঠিল। এই হঠাৎ-বড়লোকটী উজীর পদগর্ব্বে নিকটস্থ পল্লীর একটী সুন্দরী যুবতীকে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সহিত বিবাহিত হইতে দেখিয়া তাহার প্রেমে এত দূর উন্মত্ত হইয়া উঠিল যে তাহার আর হিতাহিত বিবেচনা রহিল না বিবিধ অনুনয় অপরিমিত উপঢৌকন প্রদানেও বিফলমনোরথ হইয়া বলে তাহাকে স্বকরায়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইল। এরূপ দারুণ অত্যাচারে

জর্জ্জরীভূত হইয়া রমণীর হতভাগ্য স্বামী বিচারপ্রার্থনায় মন্ত্রী জুলফিকারের সমীপস্থ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। ন্যায়পরায়ণ জুলফিকারকে এরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার কাহিনীর কথা শ্রবণ করিতে করিতে মনের উত্তেজনায় তাঁহাকে সহসা বসিবার আসন ছাড়িয়া উত্থিত হইতে দেখা গিয়াছিল। সম্পূর্ণ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ খোশলখাঁকে জীবিত কি মৃত যে অবস্থায় পারে তাঁহার সম্মুখে হাজির করিতে আদেশ করিলেন। অনুচরবর্গ তাঁহার আদেশ যথাযথ কঠোর ভাবে প্রতিপালন করিয়াছিল। তাঁহার সম্মুখে তাঁহার কক্ষে টানিয়া আনিয়া তাঁহার আদেশ মত কোড়া মারিয়া খোশলখাঁকে মৃতপ্রায় করিয়া তুলিল। ইহার পর জুলফিকারের আদেশ মত তাঁহাকে সেলিমগড় দুর্গে বন্দী করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়া রাজকোষে রক্ষিত হইল। প্রধান মন্ত্রী ও বাদশাহের মধ্যে এই ঘটনা লইয়া দিন কতক বিশেষ মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল; কিন্তু অক্ষম ইন্দ্রিয়পরায়ণ সম্রাট যে রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা প্রবলপ্রতাপ মন্ত্রীর কার্য্যের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন এরূপ সাহস আদৌ ছিল না। বিশেষতঃ কিছুকাল পরে তাঁহার সিংহাসন লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী আত্মীয়ের মধ্যে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল তাহাতে জুলফিকারের সাহায্য ব্যতিরেকে পদমাত্র নড়িবার ক্ষমতা ছিল না।

সম্রাট্শ্রেষ্ঠ আকবরের উত্তরাধিকারীর এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল! সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইরাদৎ খাঁ তাঁহার ইতিহাসগ্রন্থে ("তারিখি ইরাদৎ খাঁ") জেহন্দরের যে উজ্জ্বল চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, নিম্নে সে চিত্র উদ্ধৃত হইল। যদিও তিনি মন্ত্রী জুলফিকার ও সম্রাট্ জেহন্দর কর্ত্তৃক উৎপীড়িত, তথাপি তাহার নিম্নলিখিত চিত্রটী যে বিশেষ বিদ্বেষরঞ্জিত এরূপ অনুমান করিবার কারণ নাই।

ইরাদৎ খাঁ বলেন যে, "তিনি (অর্থাৎ, জেহন্দর) নিজে দুর্ব্বলপ্রকৃতি, ভোগবিলাসপ্রিয়, উদ্ধত ও রাজাশাসননীতি-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের অনেক দোষ ও অনেক কু-অভ্যাস সম্পূর্ণ নৃপতির অযোগ্য। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা, যাঁহারা দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সে সব দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি এই বিশাল সাম্রাজ্যকে বারবনিতার খামখেয়ালির মন্দিরে বলি স্বরূপ গণ্য করিয়াছিলেন। বাদশাহের উপপত্নীর বন্ধুবর্গ আত্মীয় স্বজন ও প্রিয়তমগণ রাজ্যের সর্ব্ববিধ-ক্ষমতাই নিজের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছিল। সম্ভ্রান্ত উচ্চ রাজপদ ও জায়গীর প্রভৃতি রাজপ্রসাদ নিতান্ত অযোগ্য গায়কদের মস্তকে প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হইত। পরিধেয় বস্ত্রালঙ্কারাদির জন্য ব্যয় ছাড়া কেবল সাংসারিক ব্যয়ের জন্যই বার্ষিক প্রায় দুই কোটী টাকা ব্যয়িত হইত!"

জেহন্দরের শুভাদৃষ্টের গুণে (?) তাঁহার প্রিয়তমাও তুল্যগুণশালিনী যুটিয়াছিলেন! অবস্থাসাদৃশ্যে লালকুয়রের সঙ্গে নূরজঁহার কথা কাহারও মনে উদয় হওয়া সম্ভব। ঐতিহাসিকেরও উভয় চরিত্রের তুলনা করিতে লোভ হয়। কিন্তু সম্যক্ বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই অনুমিত হয় যে উভয়েই দুই জন মোগলসম্রাটের প্রিয়তমা; এতদ্ব্যতীত উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত সময়গত চরিত্রগত কোন সাদৃশ্যই নাই। এরূপ অবস্থায় লালকুয়র প্রসঙ্গে নূরজঁহার নামোল্লেখও করিলে সেই অশেষগুণগরিমাশালিনী অসামান্যা রূপবতী মহিলার চরিত্রের অবমাননা করা হয়। বস্তুতঃ মোগলরাজবংশে, যে বংশে জেবুউন্নিসা, মুমতাজ্ মহল, জেহানারা, রোশেনারা প্রভৃতি অতুল্যরূপগুণশালিনী মহিলা জন্মিয়াছিলেন কিন্তু সেই বংশেও ইহাদের মধ্যে, সেই লোকললামভূতা রমণীকুলের মধ্যেও নূরজঁহা সৌন্দর্য্যে ও অতুলগুণবৈভবে অতুলনীয়া। অনেকেই হয়ত জানেন যে, নূরজঁহার সহিত বিবাহের পর জঁহাগীরের পানাসক্তি কমিয়াছিল। জেহন্দরের জঘন্য পানদোষ লালকুয়রের সংসর্গে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল মাত্র। জঁহাগীরের রাজকার্য্যে নূরজঁহার পরামর্শ ও প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইত; ও যদিও তিনি আসফ খাঁ প্রভৃতি নিজের আত্মীয়বর্গকে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কেহই লালকুয়রের অযোগ্য আত্মীয়দের মত নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই। ঐতিহাসিকেরা সকলেই একবাক্যে এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, রাজকার্য্য নূরজঁহার পরামর্শে বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইত। কাফি খাঁ বলেন যে, নূরজঁহা ভদ্রমহিলাদের পরিচ্ছদে নূতন প্রথা ও বৈচিত্র আনয়ন করিয়াছিলেন, অনেকগুলি নূতন সুদৃশ্য অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ও অনেক শিল্পী ও কলাবিদদের উৎসাহদাত্রী হইয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহার উৎসাহেই জঁহাগীরের রাজসভা অনেকানেক শিল্পী ও কলাকোবিদদের দ্বারা সমলঙ্কৃত ছিল। লালকুয়রের সৌন্দর্য্যের কথা কোনও ঐতিহাসিক সবিশেষ আলোচনা করেন নাই এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি অসামান্যা রূপবতী ছিলেন এরূপ অনুমানও যদি সত্য হয় তাহা হইলেও তাঁহার এমন কোন গুণের প্রমাণ পাওয়া যায় না যাহা ঐতিহাসিকের সম্মান বা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। জঁহাগীরের শেষ জীবন নূরজঁহার মত গুণবতী রমণীর চরিত্রগুণে উন্নততর হইয়াছিল এরূপ অনুমান মিথ্যা নহে। লালকুয়র আপনার অবিবেচনা ও চরিত্রহীনতায় এই ঘৃণিতচরিত্র সম্রাট্কে আরও মলিনতার পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু জেহন্দরকে বেশীদিন আর এরূপ ভাবে মোগল-সিংহাসন কলঙ্কিত করিতে হয় নাই। কিরূপে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোকশায়র ইংলণ্ডের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ওয়ার-উইকের সমতুল্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সৈয়দ ভ্রাতাদ্বয়ের (হোসেন

আলি ও আবদুল্লা) সাহায্যে মোগলসিংহাসন অধিকার করেন, কিরূপে ফিরোকশায়রের সহিত যুদ্ধে তাঁহার বিশ্বস্ত সাহসী মন্ত্রী জুলফিকারকে কাপুরুষের মত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া লালকুয়রের হস্তী অনুসরণে মৈশরীরাজ্ঞী ও রোমান বীর অ্যান্টনির ক্রিয়াকলাপের পুনরভিনয় করেন ও পরে কিরূপে নিশাযোগে হিন্দুর মত মুণ্ডিত হইয়া প্রচ্ছন্নবেশে লালকুয়র সমভিব্যাহারে জুলফিকারের পিতা আসাদখাঁকে আত্মসমর্পণ করেন ও আসাদখাঁর চাতুরীতে নূতন সম্রাট ফিরোকশায়রের আজ্ঞায় তাঁহার বিচ্ছিন্ন শির বর্ষাফলকে বিদ্ধ করিয়া ও তাঁহার শরীর হস্তীপৃষ্ঠে ও সেই হস্তীর লাঙ্গুলে তাঁহার প্রিয়মন্ত্রী জুলফিকারের শরীর বাঁধিয়া দিয়া রাজপথে প্রদক্ষিণ করাইয়াছিলেন তাহা জুলফিকার প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। জেহন্দরের প্রিয়তমার শেষ পরিণাম সম্বন্ধে সকল ঐতিহাসিকই নীরব।

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোষ—সমালোচনা।

ইহা কাশীস্থ নাগরীপ্রচারিণী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং সাত খণ্ডে বিভক্ত। তন্মধ্যে জ্যোতিষ ও গণিত খণ্ডদ্বয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের সমালোচ্য বিষয়। এই কোষ প্রকাশ করিয়া যে কাশীস্থ নাগরীপ্রচারিণী সভা সমগ্র হিন্দু ভারতের একটী মহৎ অভাব দূর করিবার সূচনা করিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য। ইহার নাম যদিও 'কোষ' রাখা হইয়াছে ; কিন্তু তাহা হইতে ইহা মনে করিতে হইবে না যে ইহাতে প্রদত্ত প্রতিশব্দগুলি কেবলমাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে,—বস্তুতঃ ইহার অধিকাংশ শব্দই নূতন রচিত; এ কারণ ঐ সকল শব্দের সুজ্যতাবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সেকারণ ইহা অস্বীকার করা হইতেছে না যে এই কোষ প্রচার দ্বারা নাগরীপ্রচারিণী সভা সমগ্র হিন্দুজাতির অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন ; কারণ এইরূপ গ্রন্থের আবশ্যকতা সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং বাঙ্গালাতে এইরূপ একখানা গ্রন্থপ্রকাশের সূচনা হইবার পূর্ব্বেই হিন্দীতে ইহার প্রচার একদিকে যেমন হিন্দুস্থানী হিন্দুদিগের প্রচুর কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিতেছে, তেমনই অপর দিকে বাঙ্গালীদিগের বিশেষ লজ্জার কারণ হইয়াছে।

গ্রন্থোক্ত প্রতিশব্দগুলি প্রথমতঃ বিষয়ানুক্রমে কোন ব্যক্তিবিশেষকর্ত্তৃক সঙ্কলিত বা রচিত হইয়া তৎপর এক পুনর্ব্বিচার কমিটি কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে দুই শাখার সমালোচনা করা হইবে, এই দুই শাখার সঙ্কলয়িতা বা রচয়িতা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বিবেদী। ইনি কাশী সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষ ও গণিতের অধ্যাপক। ইঁহার ন্যায় জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত এক্ষণে ভারতে দুর্লভ। ইনি পুনর্ব্বিচার কমিটিতেও ছিলেন। এতদ্ভিন্ন কোষের ভূমিকা পাঠে জানা যায় যে, গ্রন্থপ্রচারের পূর্ব্বে অনেক কৃতবিদ্য পণ্ডিতের মতামত গ্রহণ করা হইয়াছিল। এরূপ স্থলে যে গ্রন্থে দোষের ভাগাপেক্ষা গুণের ভাগ অত্যন্ত বেশী তাহা বুঝাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এবং ইহাও সহজে বুঝা যায় যে, কেবল গ্রন্থের গুণানুকীর্ত্তন দ্বারাই অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখা যাইতে পারে। কিন্তু গুণ অসংখ্য থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থের পরবর্ত্তী সংস্করণে যাহাতে দোষের ভাগ অল্পতর হয়, সেই উদ্দেশ্যেই সমালোচনা হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। একারণ গুণের উল্লেখ সংক্ষিপ্ত করিয়া দোষগুলির বিশেষ আলোচনা করাতে আশা করি কেহ আমাকে দুর্ম্মুখ কিম্বা গ্রন্থখানিকে কেবল দোষের আকর মনে করিবেন না। গ্রন্থে যে দোষ থাকিতে পারে তাহা সকলের আগে নাগরীপ্রচারিণী সভা অনুভব ও স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহার কারণ যথাসাধ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়া সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, এবং দোষভাগ ক্ষালনের জন্য পাঠক সাধারণের সাহায্য কামনা করিয়াছেন।

ভূমিকাকার নিজেই বলিয়াছেন যে, শব্দ সঙ্কলন বা রচন ভাববিকাশের ফল ; ও ভাববিকাশ জাতীয় বিকাশের ধারানুসারী হইয়া থাকে। একারণ একজাতি যে ভাবে যে বিষয় ভাষাতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, অপর জাতি ঠিক সেই ভাবানুযায়ী প্রতিশব্দ দ্বারা সেই বিষয় ব্যক্ত করিবে তাহা কখনও সম্ভব নহে। কথাটাকে আরও সঙ্কীর্ণ করিয়া, দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলে তাহার ভাবগ্রহণ সহজ হইবে। ধরুন ইংরাজি (বা লাটিন) Focus শব্দ ;—কেপলার যখন এই শব্দ প্রথমে বিন্দুবিশেষের ভাব প্রকাশার্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তখন তিনি গ্রহাদিগের কক্ষপথসংশ্লিষ্ট ঐ বিন্দুবিশেষে আলোক ও তেজের আকর সূর্য্যকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইয়ুরোপীয় গৃহসমূহে দেয়ালের গায়ে একটি অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অগ্নি জ্বালাইয়া সমস্ত ঘর আলোকিত ও উত্তপ্ত করা হয় ; সেইরূপ সূর্য্যকে ঐ বিন্দুতে নিবিষ্ট করিয়া সমস্ত সৌরজগৎ আলোক ও উত্তাপ গ্রহণ করিতেছে, ইহা দেখিয়া কেপলার ঐ বিন্দুর নাম 'অগ্নিকুণ্ড' বা Focus রাখিয়াছিলেন। নিউটন ঐ বিন্দুতে এক নূতন ভাবের আবির্ভাব দেখিতে পাইলেন,—তাঁহার কাছে আলোক ও উত্তাপ সব নিবিয়া গেল, তিনি দেখিলেন ইহা সৌরজগতের সমস্ত শক্তির মূল ; নরদেহের নাভিমূল হইতে যেরূপ সর্পিল গতিতে নাড়িমণ্ডল সমস্ত দেহে শক্তি সঞ্চার করে, সেইরূপ কোনও

অদৃশ্য উপায়ে ঐ বিন্দুস্থ সূর্য্য হইতে শক্তি প্রকটিত হইয়া সমস্ত সৌরজগতকে পরিচালিত করিতেছে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি ঐ বিন্দুর নূতন নামকরণ করিলেন—নাভি বা Umbilicus। (লাটিন অভিধানে Umbilicus অর্থ 'নাভি' লেখা আছে; কিন্তু হিন্দী কোষে Focusএর প্রতিশব্দ 'নাভি' এবং Umbilicus অর্থে 'অপবলয় বিন্দু' দেওয়া হইয়াছে,—কি অর্থে বুঝিতে পারিলাম না।) Focus অর্থ 'নাভি' সম্ভবতঃ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' পরিভাষা সঙ্কলন হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, কারণ বহুপূর্ব্বে আমি পরিষৎ পত্রিকায় Focus অর্থ 'নাভি' করিয়া Umbilicus উহ্য রাখিয়াছিলাম। তাই বোধ হয় নাগরী-প্রচারিণী সভা Umbilicus এর এমন অবোধ্য প্রতিশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভাষা হিসাবে Focus অর্থ 'অগ্নিকুণ্ড' ও Umbilicus অর্থ 'নাভি'; কিন্তু গণিতে যাহাকে একজন Focus বলিয়াছেন, তাহাকে অপর একজন Umbilicus বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ভাবের প্রসারানুসারে আমরা তাহাকে 'নাভি' শব্দে অভিহিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। এস্থলে দেখা গেল যে দুই ব্যক্তি একই বিষয়কে এক ভাবে না দেখার ফলে, তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য দুই বিভিন্ন প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যখন ব্যক্তিভেদে শব্দপার্থক্য ঘটে, তখন জাতিভেদে যে ভাব ও শব্দ উভয়ত্র পার্থক্য ঘটিবে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এজন্য অনুবাদের কঠিনত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে কোষকারকে প্রচুর ধন্যবাদ না দিয়া ও প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। অন্যদিকে আবার সমালোচককেও সাবধান হইয়া কথা কহিতে হয়।

কোষসঙ্কলনে আরও একটি প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে, যাহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। কোন কোন স্থলে বিষয়ের ভাবাত্মক শব্দ-চয়নের পরিবর্ত্তে তাহার ইয়ুরোপীয় শব্দের ধ্বন্যাত্মক প্রতি-শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে। Umbilicus অর্থ 'অপবলয়' বোধ করি ঐ প্রথার অপভ্রংসাবলম্বনে রচিত। কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র সুখকর হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে,—Harmonic অর্থ 'হরাত্মক'। 'হর' শব্দ দ্বারা বিভাজন বুঝায় এবং Harmony অর্থ মিল; গণিতে যে অর্থে Harmonic শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহা দ্বারা তরঙ্গায়িত সংখ্যাশ্রেণী উপলব্ধ হইয়া থাকে। সে অর্থে Harmonic অর্থ 'হরাত্মক' না করিয়া বরং 'লহরাত্মক' করিলে ঠিক মানাইত। আমি এক সময় Parabolaর প্রতিশব্দে 'সমক্ষেত্র' করিয়াছিলাম, কোষে সে স্থলে 'পরবলয়' করা হইয়াছে; ইহাতে কোনও অর্থবিরোধ ঘটায় না, একারণ প্রতিশব্দটি সহজে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে অর্থবিরোধ ঘটে এমন সকল স্থলে ধ্বন্যাত্মক প্রতিশব্দ বর্জ্জনীয় মনে করি। Epicycloidএর প্রতিশব্দ 'অপচক্রালদ' করা হইয়াছে, সেই অনুসারে Cycloidএর প্রতিশব্দ 'চক্রালদ' না করিয়া 'চক্রাভাস' করিবার কি কোনও কারণ আছে? 'চক্রাভাস' বলিতে যে ভাব মনে আসে তাহা Cycloid এ খাটান অসম্ভব; বরং 'চক্রাবর্ত্তের' ভাব খাটিতে পারে, কারণ সমতল পথে চক্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া Cycloid উৎপাদন করে।

আরও একটি কথা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন আছে। ভাষার বিস্তার বুঝিয়া শব্দচয়ন করা সুবুদ্ধির কার্য্য। কিন্তু Abilian Hyper-Elliptic Functionএর ন্যায় সংজ্ঞার প্রতিশব্দের সার্থকতা বর্ত্তমান হিন্দী-ভাষায় কতদূর আছে তাহা বুঝা শক্ত। Elliptic Functionএর প্রতিশব্দ যদি 'দৈর্ঘ্যফল' হয়, তবে Hyper-Elliptic Functionএর প্রতিশব্দ 'ক্রান্তিবৃত্তীয় ফল' কেন হইবে? শব্দচয়নকার কি Elliptic ও Eclipticএ গোল করিয়া ফেলিয়া-ছিলেন? পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদীর এরূপ বিষম ভুল বিশ্বাস-যোগ্য নহে। তা ছাড়া হিন্দী ভাষায় এই সকল সংজ্ঞার ব্যবহার উপস্থিত হইতে এখনও বহু বৎসর লাগিবে,—এমন কি অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে সেই ব্যবহার ঘটিতে পারে এমন কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। যাহার ব্যবহার এত সুদূরপরাহত, তাহার শব্দচয়ন ভবিষ্যৎ বংশের হাতে ন্যস্ত রাখিলেই ঠিক্ হইত।

অনেক স্থলে কোন শব্দের প্রতিশব্দ চয়ন করিতে গিয়া তাহার বিপরীত শব্দের অর্থের সহিত, এবং কুত্রাপি বা তাহার ভাবের সহিত, মিল রাখার দিকে লক্ষ্য করা হয় নাই। তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

Convergency—পরিচ্ছিন্ন মান
Divergency—অপসরণ

শেষোক্ত অর্থ ঠিক মানিয়া লইয়া Convergency শব্দের অর্থ 'অনুসরণ' করিলে বেশ মানাইত; 'পরিচ্ছিন্ন মান' একটি সুন্দর সংস্কৃত শব্দ বটে; কিন্তু তাহাতে Convergencyর কোনও অর্থবোধ হয় না।

Discontinuity ও Continuity উভয়েরই এক অর্থ—'অবন্ধ' বা 'অবিরাম' করা হইয়াছে; ইহার জন্য পুনর্ব্বিচার কমিটিকে প্রশংসা করা যায় না।

Constant ও Stationary উভয় শব্দের অর্থই 'স্থির' করা হইয়াছে। ইহারা কদাচ একার্থবাচক হয় না, Constant অর্থ 'সদাস্থির' করিলে মন্দ হইত না।

Differential অর্থ 'চলন' ও Integral অর্থ 'চল' করা হইয়াছে। আবার Differentiation অর্থ 'তাৎকালিক গতি'!—কোন্ 'কালিক'? যে ভাষায় Elliptic ও Hyper-Elliptic Functionএর কথা হইতেছে সেখানে অতি

সাধারণ Calculus দুইটির জন্য এরূপ অপশব্দ ব্যবহার মার্জ্জনীয় হইতে পারে না।

Elimination অর্থ 'লুপ্তীকরণ' অতি সঙ্গত; কিন্তু Discriminant অর্থও তাহাই হইবে কেন? সংখ্যা বিশেষের Elimination প্রক্রিয়া দ্বারা Discriminant সাধিত হইয়া থাকে বটে; কিন্তু কোন বস্তুর Discriminant তাহার জাতি বা বংশ (Species) নির্দ্দেশ করে; এরূপ স্থলে তাহার অর্থ 'জাতক' হইতে পারিত, কিন্তু 'লুপ্তীকরণ' ত কিছুতেই হইতে পারে না।

Involute অর্থ 'বক্রকৈন্দ্রিক' ও Evolute অর্থ 'অনুবক্রকৈন্দ্রিক' করা হইয়াছে। অনেক দিন হইল আমি ঐ শব্দদ্বয়ের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ 'অভিব্যাপক' ও 'অভিব্যাজ' করিয়াছিলাম; হিন্দী প্রতিশব্দদ্বয় হইতে বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দুইটি সার্থক মনে হয়।

Cone ও Pyramid উভয়ের অর্থ 'সূচী' করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকা অত্যাবশ্যক।

Uniform ও Isochronous একার্থবাচক নহে, কিন্তু কোষে উভয় স্থলেই 'সমগতি' অর্থ করা হইয়াছে।

Geometry অর্থ 'ভূমিতি' হইলে Geodesy অর্থ কি হইবে? আমি একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধে Geodesy অর্থে 'ভূমিতি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। Geometryর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' অতি উপাদেয়। আবার Geodesic অর্থ 'জীবাভাস' কেন হইল বুঝা যায় না। ইহা কি ধ্বন্যাত্মকের অপভ্রংশ? 'ভূ-রেখা' দ্বারা Geodesicএর ভাব বেশ সুবোধ হয়।

Mass অর্থ গণিত খণ্ডে 'মাত্রা' ও জ্যোতিষ খণ্ডে 'মাত্রামান' বা 'দ্রব্যমান' করা হইয়াছে। বাঙ্গালাতে তাহার অর্থ 'জড়মান' গৃহীত হইয়াছে। সেই অনুসারে Inertia অর্থ 'জড়ত্ব' বেশ খাটে। হিন্দী কোষের 'অকর্ম্মত্ব' অপেক্ষা বাঙ্গালা 'জড়ত্বে' বৈজ্ঞানিকত্ব আছে। Physics খণ্ডে Centre of Inertia অর্থ 'জড়ত্ব-কেন্দ্র' সম্ভবতঃ বাঙ্গালা পরিভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

Concentration অর্থ কি 'একীকরণ'? আমার বোধ হয় 'কেন্দ্রীকরণ' ইহার ঠিক প্রতিশব্দ। সেই রূপ Virtual অর্থ করা হইয়াছে, 'বাস্তবিক'; বস্তুতঃ তাহার ভাব গ্রহণ করিলে তাহাকে 'অবাস্তবিক' মনে হইবে। Physics খণ্ডে ইহার আর এক প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে, —'অদৃষ্ট'। যাহা 'অদৃষ্ট' তাহাই কি 'বাস্তবিক'? বিজ্ঞানে অদৃষ্টবাদের ইহা পূর্ব্বসূচনা মনে করা যাইতে পারে বটে!

Gyration অর্থ 'ভ্রাম্যভ্রমণ' যেমন কুকুর তেমন মুগুরের দৃষ্টান্ত; কিন্তু 'লোটন' দ্বারা তাহার অর্থ সুস্পষ্ট হয়। Hydraulic Lift কি 'জলোত্থাপক যন্ত্র'? যাহাদ্বারা জল উত্থাপিত হয় তাহাই ত 'জলোত্থাপক'; কিন্তু Hydraulic Liftএ জল দ্বারা অন্য কোন দ্রব্য উত্থাপিত হইয়া থাকে। Metacentre অর্থ 'অপকেন্দ্র' ঠিক হয় নাই, 'দোলকেন্দ্র' ইহার ঠিক অর্থ। Libration শব্দের অর্থ 'দর্শন স্থিতি' কিরূপে হইল? 'কম্পন' বলিলে তাহার অর্থ বুঝা সহজ হইত। তাহা 'স্থিতি' ত নহেই, 'দর্শন'ও তথায় চলে না। Neptuneএর নামকরণ হইয়াছে 'বরুণ' কিন্তু তাহাতে 'তারা' শব্দটি অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। 'গ্রহ' ও 'নক্ষত্র' বাচক শব্দ প্রয়োগে পার্থক্য রাখা একান্ত আবশ্যক। Uranusএর নামকরণ হইয়াছে 'বারুণী'। বাঙ্গালা পরিভাষায় আমি তাহার 'ইন্দ্র' নামকরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু হিন্দীকোষকার কি Orionএর একটি হিন্দী নাম পাইলেন না? এমন বিখ্যাত ও সুদৃষ্ট এবং সর্ব্বপরিচিত নক্ষত্রপুঞ্জের যে হিন্দী নাম নাই তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না। বাঙ্গালাতে ইহাকে 'কালপুরুষ' বলে। বাঙ্গালী পাঠকগণ এখন সহজে চিনিয়া লইতে পারিবেন Orion কি, এবং আমাদের ন্যায় আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, হিন্দীভাষায় আমাদের চিরপরিচিত 'কালপুরুষ'কে কেহ চিনে না!

আরও কতকগুলি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ অন্যরূপ করিলে ভালরূপ অর্থবোধ হইত; কিন্তু সঙ্কলিত প্রতিশব্দগুলি তেমন ভ্রান্ত নহে বলিয়া তাহার উল্লেখ করিলাম না।

পরিশেষে আবারও পুনরুক্তি করিতেছি যে, কোষের যে সকল দোষ দেখান হইল, সেরূপ দোষ যে প্রথম উদ্যমে অপরিহার্য্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু কোষের প্রথম উদ্যমে যাহা করা হইয়াছে, তাহাতে হিন্দী পরিভাষা ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবার যোগ্য।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

একটি লাভজনক ব্যবসায়।

সম্প্রতি আমি ২।১ দিনের জন্য কুমিল্লা গিয়াছিলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় লালমাই ষ্টেসনের নিকটে অনেক হলুদ গাছের মত গাছ দেখিয়া সঙ্গের বন্ধুকে এখানে হলুদ আপনি জন্মে কি না এই কথা জিজ্ঞাসা করায় বন্ধু বলিলেন "ওগুলি শঠি।" তখন আমিও একটু ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলাম যে শঠিই বটে। শঠির গাছ আমি অনেক দিন পূর্ব্বে যশোহর জেলার কোন কোন স্থানে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু হলুদের গাছের সঙ্গে ইহার গাছের মিল এতই বেশী যে, হঠাৎ ভ্রমে পড়া কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নহে।

তারপর লালমাই হইতে আরম্ভ করিয়া ভিঙ্গরা ষ্টেসন ছাড়াইয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত রেল রাস্তার দু'ধারে মাঠে, বাগানে, যেথানে-সেথানে অপর্য্যাপ্ত শঠির বন দেখিতে পাইলাম। চাঁদপুরের ওভারসিয়ার সাহেব আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি বলিলেন চাঁদপুর এলাকাতে ফরিদগঞ্জ রাস্তার ধারেই শঠি

যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। শঠি প্রকৃতির উদ্যানে স্বতঃই জন্মিয়া থাকে। অযত্নসুলভ এই উদ্ভিদ এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে মাঠে, বাগানে, রাস্তার ধারে দেখিতে পাওয়া যায়। জমিতে একবার ইহা জন্মিলে ইহার মূলোৎপাটন করা কঠিন ব্যাপার। কোনও পা'ট করিতে হয় না, সার দিতে হয় না, চাষ করিতে হয় না, ইহার উৎপাদনকল্পে অর্থব্যয় মাত্রই নাই। কেবল লোকজন সংগ্রহ করিয়া মূলগুলি উঠাইয়া লইতে যে খরচ এই মাত্র। অথচ এই উদ্ভিদের দ্বারা অনেক বস্তু প্রস্তুত হইতে পারে। শঠির আবির আজ কাল দুষ্প্রাপ্য হইলেও বাঙ্গলা ভাষা এখন তাহাকে নির্ব্বাসিত করিতে পারে নাই। পূর্ব্বে আবির প্রস্তুত করিতে শঠির খুব চলন ছিল। তারপর শঠির পালো অতি উত্তম জিনিস। বরিশাল জেলার অনেক স্থানে এখনও শঠির পালো অনেক পরিমাণে প্রস্তুত এবং বাজারে বিক্রীত হয়। ইহা অতি নির্দ্দোষ এবং পুষ্টিকর খাদ্য। এরারুটের পরিবর্ত্তে ইহা বেশ ব্যবহার করা যাইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বাহুল্য প্রচলনকালে যখন আমাদের দেশে শাগুদানা, এরারুট, বার্লি এবং নানাবিধ 'ফুডের' আমদানী হয় নাই, তখন কবিরাজ মহাশয়েরা খইএর মণ্ড, যবমণ্ড, শঠির পালো প্রভৃতিই রোগীর খাদ্য রূপে ব্যবস্থা করিতেন। দুঃখের বিষয় কবিরাজ মহাশয়েরাও আজ কাল ডাক্তার বাবুদের দেখা দেখি তাঁহাদের এ সব ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়া সাগু প্রভৃতিই ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আমার বোধ হয় এই সব স্বদেশী উপকরণে প্রস্তুত খাদ্য আমাদের দেশের রোগীর পক্ষে অধিক উপযোগী। বেশ সতর্কতা সহকারে প্রস্তুত করিলে শঠির পালো যে এরারুট প্রভৃতির স্থান অধিকার করিতে সক্ষম, তাহাতে আমি সন্দেহ করি না।

তারপর সুস্থ দেহীর খাদ্যরূপেও নানা উপায়ে এই পালো ব্যবহৃত হইতে পারে। দুগ্ধ সংযোগে পাক করিলে ইহা দ্বারা অতি সুন্দর মুখরোচক এবং রসনার তৃপ্তিপ্রদায়ক হালুয়া প্রস্তুত হইতে পারে; নানা রূপ পিষ্টক প্রস্তুত করিতেও চাউলের গুঁড়া ও ময়দার পরিবর্ত্তে এই পালো ব্যবহার করিলে বেশ ভাল হয় এবং পিষ্টকের স্বাদও এতৎ সংযোগে উপাদেয় হইয়া থাকে।

অনুসন্ধান করিলে আরও অনেক কাজে ইহাকে লাগান যাইতে পারে বলিয়া মনে করি। বরিশালে যে পালো প্রস্তুত হয় তাহা টাকায় ৵৪ চারি সের পাঁচ সের দরে বিক্রীত হয়। আমার বোধ হয় যদি কোন উৎসাহী ব্যক্তি কারখানা খুলিয়া এই শঠির পালোর কারবার আরম্ভ করেন, তবে তাহা দ্বারা যথেষ্ট লাভবান্ হইবার আশা আছে। উপাদান সংগ্রহ করিতে মজুরের ব্যয় মাত্র লাগিবে। শঠি হইতে পালো প্রস্তুত করিবার প্রণালীও কিছু বিশেষ কঠিন নহে। যাঁহারা গুলঞ্চের চিনি বা পালো করিতে জানেন, তাঁহারা অনায়াসে ইহাও করিতে পারেন। শঠির মূলই কেবল কাজে লাগে। এই সব মূল তুলিয়া আনিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া কোন পেষণযন্ত্র অথবা বঁটি দা প্রভৃতি সাহায্যে উপরের ছালগুলি ফেলিয়া দিতে হয়। সাধারণ লোকেরা বাজারে বিক্রয়ের জন্য যে পালো প্রস্তুত করে, তাহাতে ছাল অনেক সময় ফেলাও হয় না। তবে ছাল ছাড়াইয়া লইলে পালো দেখিতে বেশ পরিষ্কার ধবধবে হয়। উপরের খোসা ছাড়াইয়া লইয়া উহা পুনরায় ধৌত করণানন্তর পেষণযন্ত্রে ফেলিয়া উহাকে একেবারে পিশিয়া ফেলিতে হয়। এই কার্য্যে উদূখল অথবা ঢেঁকি ব্যবহার করা যাইতে পারে। বেশী রকম বড় কারবার হইলে 'পেষা-কল' খাটান যাইতে পারে। এইরূপ চূর্ণ করিয়া তাহা পুনরায় পরিষ্কার জলে ভাল করিয়া ধুইয়া থিতাইতে দেওয়া হয়। তারপর উপরের জলগুলি ফেলিয়া দিয়া তাহাকে পুনরায় ধৌত করিতে হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া থিতাইয়া লইলে পালো ক্রমশঃ বেশ পরিষ্কার ধব্‌ধবে হইয়া আসে। তখন উহা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চাপ বাঁধিয়া রাখিয়া দিলেই হইল। পালো এখন চূর্ণ করিয়া জলে ধুইলে উহার সার অংশটা নীচে পড়ে, আর ছিবড়েগুলি উপরে ভাসে। এই ছিবড়েও ফেলিবার নহে। উহা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উদূখল কি ঢেঁকিতে চূর্ণ করিয়া কাপড়ে কি সূক্ষ্মছিদ্রবিশিষ্ট চালুনি দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে সেই গুঁড়া দ্বারা আবির প্রস্তুত হইতে পারে। গুঁড়াতে ইচ্ছামত ম্যাজেণ্টা কি অন্য রং মিশাইয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই হইল।

অতি অল্প মাত্র মূলধন লইয়া এই কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। আমার বোধ হয় সামান্য ভাবে কারবার করিতে ২০০৲ টাকা মূলধনই যথেষ্ট। চাঁদপুরে যদি কারবারের স্থল মনোনীত করা যায়, তাহা হইলে স্থান-নির্ব্বাচন পূর্ব্বক একটা টিনের লম্বা ঘর উঠাইয়া লইয়া তাহাতে কয়েকটি ঢেঁকি বসাইয়া লইতে হয়। আর ধুইবার জন্য বড় বড় কয়েকটা গামলার দরকার। এখানে বসিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে শঠি উঠাইয়া আনিয়া দিবার জন্য কি রেলে পাঠাইবার জন্য লোক বন্দোবস্ত অনায়াসেই করা যাইতে পারে এবং তাহাতে খরচও বেশী নহে। যে সকল শিক্ষিত যুবক বসিয়া আছেন, তাঁহারা পরীক্ষা স্থলেও একবার দেখিতে পারেন। ইহাতে লোকসান হইবার কোনই কথা নাই, বরং লাভ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে কাহারও আগ্রহ বুঝিলে ইহার বিষয়ে অন্যান্য সংবাদ এবং একেবারে আয় ব্যয় ও স্থিতির হিসাব জানাইবার ইচ্ছা রহিল। এ সম্বন্ধে কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ৵১০ মূল্যের একখানি টিকিট সহ আমাকে পত্র দিলে আমি সানন্দে তাহার উত্তর দিব।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

রেক্‌টর, চাঁদপুর হাসানখালি জুবিলি হাইস্কুল চাঁদপুর পোঃ জেলা ত্রিপুরা।

আমেরিকার সার্ব্বজনীন বিদ্যালয়।

ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, জনসাধারণের শিক্ষার প্রতি সমাজের শীর্ষস্থানীয়গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষাসমিতি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এরূপ সময়ে আমেরিকার সার্ব্বজনীন শিক্ষাপ্রণালীর একটা আভাস বোধ হয় অসময়োচিত বা নীরস হইবে না।

আমেরিকার সার্ব্বজনীন (Public) স্কুল সমষ্টিটী একটী মাত্র শিক্ষাসমাজ ব্যতীত আর কিছুই নয়। তথাপি ইহার মহত্বের অতি সামান্য বর্ণনাও একটী সাম্রাজ্যের ইতিহাস বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এই বিদ্যালয় সমষ্টিটী যদি একটী পৃথক দেশ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে ইহা আয়তনে ফ্রান্সের এবং লোকসংখ্যায় স্পেনের সমকক্ষ হইবে।

এই শিক্ষাসমাজের ১৮০ লক্ষ ছাত্র ২ লক্ষ ৬০ সহস্র বিদ্যালয়ভবনে ৪ লক্ষ ৬০ সহস্র শিক্ষকের অধীনে শিক্ষা লাভ করিতেছে। ইহার জন্য বৎসরে ২৬ কোটী ডলার অর্থাৎ প্রায় ৮০ কোটী টাকা খরচ হইয়া থাকে। বিদ্যালয়-গৃহগুলির মূল্য আজ কাল ৭০ কোটী ডলার অর্থাৎ ২১৮ কোটী টাকার উপর হইবে। এই দুইয়ের সহিত যদি জমির মূল্য যোগ করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১০০ কোটী ডলার অর্থাৎ ৩৩০ কোটী টাকার উপর হয়। পুরাকালে বা আধুনিক সময়ে কোন দেশে শিক্ষার জন্য এত টাকা ব্যয়িত হয় নাই। মার্কিন তাঁহার সৈন্যপোতবাহিনীর জন্য যত ব্যয় করেন, শিক্ষার জন্য তাহাপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় করেন। এক মার্কিন শিক্ষাকার্য্যে যত ব্যয় করেন, ইউরোপের সমগ্র জাতি মিলিয়া তত ব্যয় করেন।

অধুনা উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অসংখ্য মুদ্রা প্রদত্ত হইলেও, আমেরিকায় প্রাথমিক শিক্ষারই বিশেষ প্রাবল্য। যদিও প্রত্যেক মার্কিন বালক ও বালিকা ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বিনাব্যয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে, তথাপি অর্দ্ধেক বালকবালিকার শিক্ষা ১৫ বৎসর বয়সেই সমাপ্ত হয়; এই বয়সে তাহারা স্ব স্ব জীবিকা অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করে। সপ্তদশ বৎসর বয়সে কেবল এক-চতুর্থাংশ বালকবালিকা বিদ্যালয়ে থাকিয়া যায়। মার্কিন চরিত্রের গঠনে এবং উৎকর্ষ সাধনে প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্য করিতেছে। অবশ্য মার্কিনের প্রাথমিক শিক্ষা ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। আমাদের এখানকার বিদ্যালয়সমূহের ন্যায় মার্কিন বিদ্যালয়ে একঘেয়ে ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয় না; তথায় কার্য্যকরী শিক্ষারই বিশেষ প্রাধান্য। ইহা যথাস্থানে দর্শিত হইবে।

টেক্সাস্, উটা, ওয়াশিংটন, মিচিগান, এবং মিনেসোটা এই পাঁচটী ষ্টেটের প্রত্যেকটী শিক্ষার জন্য প্রভূত সম্পত্তি দিয়া রাখিয়াছে, এবং তাহা হইতে বৎসরে ১০ হইতে ৩০লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৩১ লক্ষ হইতে ৯৩ লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে। সুপিরিয়র হ্রদের মহামূল্য লৌহ খনিগুলির কোন কোনটী প্রত্যেক টন অর্থাৎ প্রায় ২৭ মন লৌহের উপর ২৫ সেণ্ট অর্থাৎ প্রায় সাড়ে বার আনা শিক্ষার জন্য কর স্বরূপ দেয়। এই সকল খনি হইতে ৫ মিনিটে বাষ্প-শক্তিপ্রভাবে পঞ্চাশ টন অর্থাৎ প্রায় ১৩৫০ মন লৌহ বাহির হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এক একটী লৌহখনি প্রত্যহ শিক্ষার জন্য বহু টাকা দেয়।

আমেরিকার এই সকল সার্ব্বজনীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঊনাবিংশটী বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বাদশ বৎসরের মার্কিন বালককে যতখানি শারীর ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, একশত বৎসর পূর্ব্বে অক্সফর্ড ও কেম্ব্রিজের গ্রাজুয়েটকে ততটা শিখান হইত না। আমেরিকার সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে অনেক ব্যবহারজ্ঞ শাসন প্রণালী সম্বন্ধে যত জানিত, দ্বাদশ বৎসরের মার্কিন বালক এক্ষণে তদপেক্ষা অধিক জানে। আমেরিকার পব্লিক স্কুলে সঙ্গীত বিদ্যা, মানব জাতির দীর্ঘ ইতিহাস, কর্ত্তনকার্য্য, মৎস্য ধরা, জুতা সেলাই করা, বস্ত্র বয়ন করা, বৃক্ষ রোপণ করা, লৌহকে পিটিয়া রূপান্তরিত করা, প্রভৃতি বালকদিগকে শিখান হয়। বালিকাদিগকে কাপড় ধোয়া, ধূলি ঝাড়া, অন্নপ্রস্তুত করা, শিশু পালন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। নৌবিদ্যা শিখাইবার জন্য নিউইয়র্কে অর্ণবপোত আছে যাহাতে বালকদিগকে দুই বৎসর ধরিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। নিউ-ইয়র্কের সিওয়ার্ড পার্কের ন্যায় এত বহুব্যয়ে নির্ম্মিত ক্রীড়া-ভূমি পৃথিবীর অন্য কোথাও নাই। এখানে ২৫ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিন একর অর্থাৎ কিঞ্চিদ-ধিক ৯ বিঘা জমি ক্রীড়ার জন্য রক্ষিত হইয়াছে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এই বিস্তীর্ণ ক্রীড়াক্ষেত্রে সাত সহস্রের অধিক বালকবালিকা ক্রীড়া করে এবং একতান বাদ্য শ্রবণ করে।

উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় আমেরিকার একচেটিয়া নয়। তবে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের সার্ব্বজনীন (Public) বিদ্যালয়ের একটী বিশেষত্ব আছে, যাহা অন্য কোন দেশে নাই। পৃথি-বীর অন্য কোন স্থানে নানা জাতীয় বালকবালিকার এরূপ একত্র সমাবেশ নাই; অন্য কোথাও আইরিশ, জারমন, ইংরাজ, সুইড, রুষ, পোল, গ্রীক, ইতালীয়, হংগেরীয়, ইজিপ্‌শিয়ান, রুমানীয়, স্কচ, ফ্রেঞ্চ, আর্ম্মেনীয়, কানাডিয়ান, ডেন, ওলন্দাজ বালকবালিকাগণ একত্র কাজ করিতে, খেলা করিতে, একই ভাষার ব্যবহার করিতে একই পতাকার প্রতি অনুরক্ত হইতে শিক্ষিত হয় না। কোন বিদ্যালয়ের কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে গমন কর, দেখিতে পাইবে বিভিন্ন জাতীয় বালকবালিকাগণ তাহাদের প্রাত্যহিক অঙ্গীকার মন্ত্র এইরূপ আবৃত্তি করিতেছে:—"আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি

যে আমার পতাকার প্রতি এবং যে সাধারণতন্ত্রের জন্য এই পতাকা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই তন্ত্রের প্রতি অনুরক্ত থাকিব। আমরা সকলে এক জাতি, আমরা অবিচ্ছেদ্য; আমরা সকলেই স্বাধীন এবং আমাদের সকলের সমান অধিকার।" এইরূপ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিভিন্ন জাতীয়-গণ একটী মহাজাতিতে পরিণত হইতেছে; তাহারা আমেরিকারই লোক হইয়া যাইতেছে এবং আমেরিকাকে স্বদেশ বলিয়া ভালবাসিতে শিখিতেছে।

শুধু আমেরিকার যুক্ত-প্রদেশেই এরূপ একপ্রাণতার উদ্দীপনা হইতেছে তাহা নয়। যুক্তপ্রদেশের উপনিবেশ ও অধিকৃত দেশসমূহেও এভাব বর্দ্ধিত হইতেছে। পোর্টো রিকোতে ৪০ সহস্র এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে দুইলক্ষ বালকবালিকা "আমেরিকা" নাম গান করিতেছে এবং যে সাধারণতন্ত্রের সাম্য ও স্বাধীনতা মূল মন্ত্র সেই সাধারণ-তন্ত্রের প্রতি অনুরক্ত থাকিবার অঙ্গীকার করিতেছে। এমন কি আলাস্কাতেও দুই সহস্রেরও অধিক ছোট ছোট এস্কিমো বালকবালিকা আগ্রহের সহিত বিদ্যালয়ে যাইতেছে। সাত ফুট পুরু বরফের উপর দিয়া হাঁটিয়া ইহারা স্কুলে যায়; সকাল সকাল স্কুলে উপস্থিত হইবার জন্য ইহারা এত ব্যগ্র যে অনেক সময় আহার না করিয়াই চলিয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত এস্কিমোদিগের জন্য ১৫টী বলগাহরিণের স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। সাইবিরিয়া হইতে দশ সহস্র বলগা হরিণ (reindeer) ২ লক্ষ ৫০ সহস্র ডলার অর্থাৎ প্রায় ৭ লক্ষ ৮০ সহস্র টাকা ব্যয়ে আনা হইয়াছে এবং এস্কিমোদিগকে বলগা হরিণ পালনপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। পাঁচ বৎসরের শিক্ষার পর প্রত্যেক পরীক্ষোত্তীর্ণ এস্কিমোকে সরকারের দিক হইতে ৫০টী বল্‌গা হরিণ ধার দিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করান হয়। এইরূপে সমগ্র এস্কিমো জাতিকে শিক্ষিত করা হইতেছে। তিমি মৎস্যের সন্ধানে একস্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া না বেড়াইয়া এস্কিমোগণ এক্ষণে একস্থানে স্থির হইয়া বাস করিতে পারিবে এবং বলগা হরিণের ব্যবসায়ে সমৃদ্ধিশালী হইবে। আলাস্কা এক্ষণে অনায়াসে এক কোটী বল্‌গাহরিণ জোগাইতে পারে।

এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। আলাস্কার এই বল্‌গাহরিণ স্কুল ছাড়া আমেরিকার অন্যান্য স্থানে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকসংখ্যার ত্রি-চতুর্থাংশ রমণী। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রমণীর শিক্ষা সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইত যদি তিনি পশমের একটী অক্ষচক্ষুর্বিশিষ্ট পক্ষী তৈয়ার করিতে পারিতেন। কিন্তু আজ আমেরিকার সকল স্কুল বালকবালিকার জন্য উন্মুক্তদ্বার; সর্ব্বত্র বালকবালিকা উভয়ের পক্ষে সমান সুবিধা। এক্ষণে উচ্চ স্কুলসমূহের ছাত্রসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৬০ জন বালিকা।

আমেরিকার সার্ব্বজনীন স্কুল সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইংরাজ শিক্ষানীতিবিশারদ আল্‌ফ্রেড মোস্‌লি সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এক বৎসর পূর্ব্বে যখন মোস্‌লি মহোদয় আমেরিকার স্কুলের শিক্ষাপ্রণালীর পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে শেষ করেন, তখন আমেরিকার শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার কি মত এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার মত একটী ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে; আমি আমার দুই পুত্রকে ইয়েল (Yale) বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত হইবার জন্য নিউ-হেভেনের স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়াছি।"

শ্রীঅধরচন্দ্র মিত্র।

হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশ।

(২য় সমালোচনা।)

বৈজ্ঞানিক কোশের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলে পাঠকবর্গ এই দ্বিতীয় সমালোচনা দেখিয়া বিরক্ত হইবেন না। একথা পুরাতন যে, এদেশে বিজ্ঞানের চর্চা অত্যাবশ্যক হইয়াছে, এবং দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চার সফলতা পরিভাষার উপর নির্ভর করিতেছে।

হিন্দী কোশের ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, জ্যোতিষ ও গণিত বিষয়ক শব্দসমূহ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদি মহাশয় নির্ব্বাচন করিয়াছেন। যোগ্য ব্যক্তির হস্তেই ভার অর্পিত হইয়াছিল। জ্যোতিষিক কোশের প্রথম শব্দেই ইহার লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। Aberration অপেরণ, chromatic aberration বর্ণাপেরণ, envelope অন্বালোপ, irresolvable nebula অনির্ব্বচনীয় নীহারিকা, parabola পরবলয়, planetary system গ্রহসম্প্রদায়, ইত্যাদি নূতন শব্দ রচনা-নৈপুণ্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। সংস্কৃত পুরাতন গণিতের সহিত ঐক্য রাখিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য গণিতের উচ্চাঙ্গের সংস্কৃত শব্দ রচনায় প্রচুর পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে। স্ক্রুপের (screw) প্রতিশব্দ কর্ষণী করা যাইতে পারে, ইহা আমাদের কল্পনাতেও উদিত হয় নাই। তেমনই gravitation গুরুত্বাকর্ষণ, harmonic হরাত্মক, asymptote অসীম-পথ, inertia অকর্মত্ব, co-ordinate ভুজযুগ্ম, abscissa ভুজ, ordinate কোটি ইত্যাদি ভালই বোধ হইতেছে। বঙ্গদেশের কোন কোন গ্রন্থকার সংস্কৃত রেখাগণিত ভুলিয়া জ্যামিতি শব্দ নূতন রচনা করিয়া শিক্ষার্থীর নিকট প্রকৃত জ্যামিতি-শিক্ষায় অনর্থক বিঘ্ন জন্মাইয়াছেন। অন্যদিকে ৺বাপূদেব শাস্ত্রীর, এবং দ্বিবেদি মহাশয়ের লেখাতে জ্যা অ (sin. A) এইরূপ দেখিয়াছি। ইংরাজি অনুসারে sin A, sine of A বলা যেমন সঙ্গত, সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষায়

অ জ্যা (অ এর জ্যা) বলাও তেমনই। কথাটা যৎসামান্য বোধ হইতে পারে; কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুও যৎসামান্য নহে। বালকেরা পাটীগণিতে বন্ধনীর ব্যবহার বুঝিতে কত সময় লয়, তাহা ভাবিলে কিছুই বালক-শিক্ষার পক্ষে যৎসামান্য বোধ হয় না।

অমূর্ত্ত (abstract) গণিত বিষয়ক পারিভাষিক শব্দ রচনায় যেমন পটুত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রাকৃত জ্যোতিষ এবং ক্রিয়াত্মক গণিতের ন্যায় মূর্ত্ত গণিতে তেমন পটুত্ব দেখিতে পাইলাম না। স্থূলভাবে বলিতে গেলে, মূর্ত্ত পদার্থের ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের নামকরণে কোশকারগণ নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। বোধ হয় এ বিষয়ে বঙ্গ ভাষা অধিক উন্নতি দেখাইয়াছে। জ্যোতিষিক কোশে Right Ascension বিষুবাংশ ঠিক বোধ হইতেছে, কিন্তু Oblique Ascension ক্রান্ত্যংশ কিরূপে হয়? Declination ক্রান্তি আছে, সুতরাং Degrees of Declination ক্রান্ত্যংশ হইয়া পড়ে।

Asterism—তারা পুঞ্জ, নক্ষত্র পুঞ্জ।
Cluster of stars—নক্ষত্র পুঞ্জ, তারা পুঞ্জ।
Constellation of stars—নক্ষত্র পুঞ্জ।
Constellation, descending—অবরোহী নক্ষত্র।
Sub constellation—অবান্তর তারাপুঞ্জ।

এই কয়েকটি শব্দ একত্র করিলেই বুঝা যায়, তারা নক্ষত্র ও পুঞ্জ—এই তিন শব্দের পারিভাষিকত্ব নাই। কিন্তু চলিত ভাষায় যাহাই হউক, বৈজ্ঞানিক ভাষায় শব্দের অর্থ নির্দ্দিষ্ট থাকা চাই। নতুবা হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশের প্রয়োজন থাকিত না।

তারা ও নক্ষত্রের নামকরণ সম্বন্ধেও কোন নিয়ম পাইলাম না। অথচ আকাশের সমুদয় প্রধান প্রধান নক্ষত্র ও তারার নামও দেওয়া হয় নাই। যে স্থলে নাম দেওয়া হয় নাই, সে স্থলে নূতন লেখক কোন্ নিয়ম অনুসরণ করিবেন?

Draco—অজগর তারা।
Argo—আরগো।
Cassiopeia—কাশোপী, কেসিওপী?
Cygnus—সাইগনস, রাজহংস।
Dolphin—ডালফিন তারা।
Little bear—লঘু সপ্তর্ষি।
Lion—সিংহস্থ তারা।
Leo—সিংহ।
Ram—মেষ ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত শব্দগুলিরও প্রশংসা করিতে পারিলাম না। অন্ততঃ দ্বিবেদি মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত জ্যোতিষিক শব্দ আশা করিয়াছিলাম।

Atmosphere—বায়ুমণ্ডল।
Celestial equator—খগোলীয় নাড়ীমণ্ডল।
Digit—গ্রাস, স্থানাঙ্ক।
Halo—প্রকাশ মণ্ডল, প্রভামণ্ডল।
Corona—করোনা।
Photosphere—প্রকাশ মণ্ডল।
Equinox—সায়ন।
Precession of the equinoxes—সম্পাত, অয়নাংশ ভাগ।
Revolution—ভগণ।
Volume—আয়তন, ইত্যাদি।

এখন রাসায়নিক ও ভৌতিক পরিভাষা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাইতেছে। বঙ্গীয় পাঠকের দৃষ্টি প্রথমেই ভৌতিক বিদ্যার প্রতি পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে। শুনিয়াছি, দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ভৌতিকতী ভৌতিক বিদ্যা (physics) নামে এক পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। তাহার একাঙ্গের নাম সৌদামিনী কলা। যাঁহার নিকট উক্ত গ্রন্থের প্রশংসাবাদ শুনিয়াছিলাম, দুঃখের বিষয় তিনি সে গ্রন্থ মুদ্রিত করান নাই, কিংবা তাহার অনুলিপি দান করিতেও সম্মত হন নাই। সে যাহা হউক, পদার্থবিদ্যা কিংবা পদার্থবিজ্ঞান অপেক্ষা ভৌতিক বিদ্যা নামটি ভাল সন্দেহ নাই; এবং বঙ্গদেশে ভূত প্রেতের অত্যধিক ভয় না থাকিলে শক্তি বিদ্যার পরিবর্ত্তে ভৌতিক বিদ্যা বলা চলিত। অন্ততঃ পদার্থ শব্দটি নিস্তার পাইত, এবং দার্শনিকেরা একটু স্বস্তিবোধ করিতেন। সম্প্রতি অধ্যাপক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার নব্য রসায়নী বিদ্যা নামক পুস্তিকায় রসায়ন শব্দে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পুস্তিকার প্রথম পৃষ্ঠেই রসায়নী বিদ্যা স্থান না পাইয়া 'রসায়ন শাস্ত্র' পাইয়াছে। বস্তুতঃ রসায়ন বিদ্যা এবং রসায়নী বিদ্যা—এই দুই নামের মধ্যে অর্থের কোন প্রভেদ দেখিতে পাই না। বোধ হয়, ভৌতিক বিদ্যার পাশে কিমিতি বিদ্যা সাজিতে পারে।

হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশে রাসায়নিকের (কোশের মতে রসায়নজ্ঞের কিংবা রসায়নবিদের) সত্তর পঁচাত্তরটি ভূত (elements) মূলতত্ত্ব নাম পাইয়াছে। যুক্ত ভূতগুলির (compounds) সামান্য নাম হইয়াছে সম্মেলন। রসায়ন বা রসায়নী বিদ্যায় যদি যুক্ত ভূতগুলি না থাকিত, এবং যদি তাহারা ভূতনাথের প্রমথগণকেও সংখ্যায় পরাজিত না করিত, তাহা হইলে আলুমিনি নামক ধাতুকে 'স্ফট' বলি, কি আলু বলি, কিছুই আসিয়া যাইত না। মহাভারতে "ইতি পারীক্ষিতের সর্পযজ্ঞে বিনষ্ট নাগগণের নাম কথন," এক অধ্যায় পূর্ণ করিয়াছে। আর আমরা যে অজৈব ও জৈব রসায়নের (কোশমতে জড় রসায়ন, নির্জীব রসায়ন, নিরিন্দ্রিয় রসায়ন এবং সজীব রসায়ন, সেন্দ্রিয় রসায়ন, চেতন রসায়ন—রসায়ন শাস্ত্রের এই দুই ভাগের) যাবতীয় 'মূলতত্ত্ব' ও 'সম্মেলনের' নাম রচনা করিতে পারিব না, এ কথা আর্য্যানার্য্য বংশধরগণের মুখে সাজে না। কিন্তু মহাভারতের সময়ে

ঋষিগণের আয়ুঃ অতিশয় দীর্ঘ ছিল, এবং বোধ হয় রেল, ষ্টীমার,টেরাম,বাইসিকেল, মোটরকার প্রভৃতির উচ্চবংশীধ্বনি ও ঢং ঢাং শব্দ তাঁহাদিগের তপোবনের শান্তি ভঙ্গ করিত না। তাঁহারা পৃথিবীর সপ্তদ্বীপের সংবাদ পাইয়াছিলেন, আমরা শতাধিক দ্বীপের কেবল সংবাদ নহে তত্তৎদ্বীপবাসীর জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি, শ্বেতদ্বীপবাসীর সহিত একত্র বাস করিতেছি, তাঁহাদিগের দেখাদেখি সোডা ও লেমোনেড ও ডাক্তারখানার দাগ-কাটা বোতলে-পোরা বিবিধ 'মূলতত্ত্বের সম্মেলন' নিত্য উপচার করিতেছি, এবং অন্নের তরে দিবা দ্বিপ্রহরে বুরুষ-করা বুট পায়ে দিয়া গায়ে কোট আঁটিয়া রুমালে এসেন্স মাখাইয়া আফিস আদালতে দৌড়াদৌড়ি করিতেছি। অধ্যাপক ডাঃ রায় তাঁহার নব্য রসায়নী পুস্তিকায় রুসিয়া ও জাপানের বৈজ্ঞানিকগণকে নিজের নিজের ভাষায় বৈজ্ঞানিক পুস্তক লিখিতে দেখিয়া বলিয়াছেন, "আমাদেরও চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়।" ঠিক কথা। কিন্তু তিনি যে জোসেফ প্রীষ্টলী, ফ্লজিষ্টন, শীলে, লাবোয়াসিয়ে প্রভৃতি উৎকট নামগুলি বাঙ্গলা অক্ষরে বাঙ্গলা কথার মধ্যে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কি তাঁহার পুস্তিকা প্রণয়ন ব্যর্থ হইয়াছে? অক্সিজেনকে অম্লজান, নাইট্রোজেনকে যবক্ষারজান, কার্ব্বনিক অম্লকে অম্লাঙ্গারক বলিলে বিশেষ কি সুবিধা হয়, তাহা বুঝা যায় না। এ বিষয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, এখন আর তাহার পুনরুল্লেখে প্রয়োজন নাই। কিন্তু একথা সত্য যে, বাঙ্গালীর মেয়েরাও আলুমিনির বাসন বলিবার সময় কাতরোক্তি করে না। হিন্দী কোশের মতে Aluminic sesqui-oxide-এর হিন্দী নাম হইবে স্ফট একাৰ্দ্ধাম্লজিদ। যিনি এই পরিভাষা না জানিবেন, তাহার সাধ্য কি আছে তিনি ঐ শব্দ শুনিয়া কিংবা শব্দের লিখিত রূপ দেখিয়া বস্তু সংগ্রহ করেন। উক্ত নামের পরিবর্ত্তে আলুমিনিক সার্দ্ধ অকসাইড, কিংবা সার্দ্ধাক্‌সিদ বলিলেই বা কেন আপত্তি ঘটিবে তাহাও বুঝা যায় না। স্ফটীতে (ফটকিরিতে) আলুমিনি আছে বলিয়া, বোধ হয়, আলুমিনির হিন্দী নাম স্ফট রাখা হইয়াছে।* সকল স্থলে এরূপ বিচারের চিহ্ন পাইলাম না। Carbon কর্ব্বন, কিন্তু chlorine হরিণ, bromine ব্রম, iodine নেল, fluorine প্লব ইত্যাদি শব্দে মনের তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাই না।

ভৌতিক কোশ হইতে কএকটি শব্দ দেওয়া যাইতেছে।

Thermometer—তাপমাপক।
Temperature—তাপক্রম, তাপ পরিমাণ।
Calorimeter—উষ্ণতামাপক।
Colorie—তাপাঙ্ক, কলোরী।
Pyrometer—তাপীয় বৃদ্ধি মাপক।

রাসায়নিক কোশে—
Pyrometer—অত্যুষ্ণতা মাপক।

আমাদের বিবেচনায় ইংরাজি শব্দের ধাত্বর্থ দেখিয়া অনুবাদ করা সকল স্থলে শ্রেয়ঃ নহে। তাপ ও তপ্ততা, উষ্ণতা বা তাপমাত্রার মধ্যে প্রভেদ রাখা কর্ত্তব্য। তেমনই pressure দাব করিয়া barometer বায়ুভারমাপক করা সঙ্গত নহে। Electricity বিদ্যুৎ, বিজলী, electrification বিদ্যুৎকরণ (?), lightning তড়িৎ—বাঙ্গলার ঠিক উল্টা।

এক শাস্ত্রের পরিভাষা অন্য শাস্ত্রে অন্যবিধ হইয়াছে। ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়, এবং বোধ হয় ইহাই হিন্দী কোশের প্রধান দোষ। ভৌতিক পরিভাষায় Lens তাল, Object glass পদার্থ তাল, eye piece নেত্রতাল, aperture of a lens দূরদর্শক ব্যাস। কিন্তু জ্যোতিষিক পরিভাষায় Lens লেন্‌স, object glass প্রধান লেন্‌স eye glass or eye lens উপনেত্র, চক্ষুর্লেন্‌স, aperture of a lens লেন্‌স ব্যাস্। অন্যান্য শব্দ যাহাই হউক, aperture of a lens কে লেন্‌সের ব্যাস বলা চলে না। বরং রন্ধ্র কতকটা চলে।

ভৌতিক পরিভাষায়ঃ—
Telescope, achromatic- নীরঙ্গ দূরদর্শক, স্বচ্ছ দূরদর্শক।
" equational—দিবা দূরদর্শক।
Polariscope—ধ্রুবতেজ দর্শক।

জ্যোতিষিক পরিভাষায়—
Telescope, achromatic- স্বচ্ছ দূরদর্শক।
" equational—নাড়ী মণ্ডল দূরদর্শক।
Polariscope পোলরিস্কোপ, ধ্রুবদর্শক।
Ring micrometer—বলয়ক্রান্তি যন্ত্র।

ভৌতিক পরিভাষায় microscope কিম্বা micrometer শব্দ নাই। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ইংরাজি নামের শেষে meter, scope, er, graph এই কয়েকটী শব্দ বা প্রত্যয় থাকে। বাঙ্গলা ভাষায় meter=মান, metry—মিতি, scope=দর্শন বা বীক্ষণ, er=কর, অক, graph= লেখন—এই কয় শব্দ প্রায় প্রচলিত হইয়াছে। হিন্দী ভাষায় এই সকল শব্দ চলিতে পারে না কি?

ভৌতিক পরিভাষায়ঃ—
Potential—সম্ভাবনীয়।
" energy—সম্ভাবনীয় শক্তি।

অন্যত্র—
Energy—শক্তি।
" potential—উপপন্ন শক্তি।
" kinetic—চালনশীল শক্তি।
Difference of potential—শক্তিভেদ, শক্ত্যন্তর।

এইরূপ পরস্পর অনৈক্যের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জীবসর্গ ও বিভাগ সম্বন্ধীয় শব্দগুলি দেখুন। Kingdom

* কিন্তু স্ফট অর্থে ফণা বুঝি, এবং ফটকিরিতে স্ফট আছে বলিয়া নাম স্ফটী হইয়াছে।

কোথাও বর্গ, কোথাও সর্গ কিংবা যোনি হইয়াছে। কিন্তু class, order, genus, species, variety, race,অন্ততঃ এই কয়েকটির প্রতিশব্দ না পাইলে বর্গ চলিতে পারে কি না, তাহা বলা যায় না। দেখিতেছি race, জাতি (১৩ পৃঃ); genus জাতি, সামান্য; পরসামান্য, পরজাতি (২৮৪ পৃঃ); species জাতি, সামান্য, অপর সামান্য, অপর জাতি, উপজাতি (৩৪৪ পৃঃ); family জাতি, বংশ (১৭৩ পৃঃ) আছে। এক জাতি লইয়া এত টানাটানি করিলে সব কুল নষ্ট হইবে।

দার্শনিক পরিভাষার মধ্যে জীববিদ্যার কয়েকটি শব্দ আছে। দেখিতেছি কোশকার cell = (বাঙ্গলার) কোষের মায়ায় পড়েন নাই। উপস্থিত সমালোচক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিকট cell = কল প্রস্তাব করিয়াছিলেন। (কল অর্থে crude)। হিন্দীকোশকার করিয়াছেন কললবিন্দু, কললকণ, কণ, বিন্দু। এই কণ ও বিন্দুর প্রয়োজন দেখি না। আরও দেখিতেছি তিনি nerve কে স্নায়ু বলেন নাই। কখন কে nerve কে স্নায়ু বলিয়াছিলেন, আমরা স্নায়বিক 'দৌর্ব্বল্যে' তাঁহার কর্ম্মভোগ করিতেছি। ইংরাজি শব্দের ধাত্বর্থ ধরিয়া অনুবাদ করিলে যে কি বিষম ফেরে পড়িতে হয় স্নায়ু তাহার এক প্রমাণ। বিজ্ঞানের দেশে অনেক নূতন ভাল শব্দ পুরাতনকে তাড়াইয়া দিতেছে, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন শব্দ রচনা আবশ্যক হইতেছে। কিন্তু এই পোড়া দেশে যাহা একবার ঢুকে, তাহাকে তাড়ান দুষ্কর হইয়া উঠে। পরজীবী উদ্ভিদের ন্যায় আমরা বিকলাঙ্গ না হইলে স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যের সমর্থন করিতাম না।* হিন্দী কোশকার কিন্তু nerveকে কেবল নাড়ী করিলেন কেন? আমরা করিয়াছিলাম বাতবহা নাড়ী, সংক্ষেপে বাতনাড়ী, nervous বাতিক। কোশকার করিয়াছেন, nervous disease নাড়ীরোগ, nervous system নাড়ীসংস্থান, নাড়ীসম্প্রদায়। এই 'নাড়ী-টেপা' ও 'নাড়ী ছাড়া'র দেশে nerve নাড়ী বলা চলিবে না। কিন্তু systemএর প্রতিশব্দ সম্প্রদায় বেশ হইয়াছে। আমাদের সৌর জগৎ অপেক্ষা সৌরসম্প্রদায় সার্থক। দুঃখের বিষয় কোশের একাংশে সম্প্রদায় থাকিলেও অন্যাংশে অন্য শব্দ আসিয়াছে। mountain system = পর্ব্বতপ্রণালী (১১ পৃঃ) কিছুতেই ঠিক হয় নাই।

দার্শনিক পরিভাষার অন্তর্নিবিষ্ট জীববিদ্যার কয়েকটি শব্দের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে। দৃষ্টি আকর্ষণ নিমিত্ত কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

Tissue রেশা, শিরা।
(Vein শিরা, রুধিরোপবাহক শিরা) (?)
Spinal Cord—কশেরুনাড়ী, মেরুদণ্ড।
Nutrition জরণ, পরিপাচন, হাজিমা।
Microbes জীব সূচী।
Micro-organisms সূক্ষ্মজীব।
Lymph বসা, মেদস্।
Mammal পিণ্ডজ।
Convulsion সংক্ষোভ।

আমরা এইখানেই এই ঢেঁকির কচ্‌কচি বন্ধ করিতে বাধ্য হইলাম। বোধ হয় 'প্রবাসী'র পাঠক হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হয় ত কেহ কেহ ভাবিতেছেন, যে-সে একটা শব্দ লইলেই হয়, শব্দের নিমিত্ত এত মারামারি কেন। কিন্তু শব্দের ভিতরে যে জীবন আছে, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। দুঃখের বিষয়, আমরা হিন্দী কোশের শব্দরচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারিলাম না। দশ সহস্র শব্দের মধ্যে দুই পাঁচ শত যে মনোমত হইবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা কেবল নিম্নাঙ্গের শব্দ লইয়া আলোচনা করিলাম। কারণ এই সকল শব্দ সবিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক নির্ব্বাচন করা উচিত। পরন্তু যিনি বিজ্ঞানের উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ কিংবা তদ্‌বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিবেন, তিনি শব্দ নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। কোন সভা বা পরিষদ্ তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে পারিবেন না। যতদূর দেখা গেল তাহাতে বোধ হইতেছে, কোষের নূতন সংস্করণ না করিলে বঙ্গভাষায় বড় একটা উপকারে আসিবে না। হিন্দী ভাষায় আসিবে কি না, তাহা বলা আমাদের ধৃষ্টতা হইবে। নূতন সংস্করণের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় মনে রাখিলে সুবিধা হইতে পারে।

(১) যাবতীয় বিজ্ঞানের শব্দ আদ্যোপান্ত পৃথক্ পৃথক্ বিবেচনা না করিয়া সেগুলিকে বিজ্ঞান-বৃক্ষের বিভিন্ন শাখার শব্দ মনে করা উচিত। বৃক্ষের মূল কাণ্ড একই, শাখাই ভিন্ন হয়। তেমনই যাবতীয় বিজ্ঞান-শাখার সাধারণ শব্দ একত্র করিয়া পরে এক এক শাখার শব্দ সঙ্কলন করিলে অসঙ্গতির দোষ ঘটিতে পারিবে না। ইহাতে কোশের কলেবরও খর্ব্ব হইবে।

(২) বঙ্গীয় পরিষদের সহিত মন্ত্রণা করিলে নাগরী-প্রচারিণী সভার এবং বঙ্গীয় পরিষদের উভয়েরই কার্য্য লাঘব হইবে। বাঙ্গলার প্রচারিত বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকা অনুসন্ধান করিলে সাহায্য পাওয়া যাইবে।

(৩) রূঢ় ও যোগরূঢ় শব্দের প্রতিশব্দ কি নিয়মে করা কর্ত্তব্য, তাহা প্রথমে বিবেচনা করিলে অনেক গোল-যোগ ঘটিতে পারিবে না।

(৪) ভূ-বিদ্যা, খনিজ-বিদ্যা ও জীব-বিদ্যার শব্দ দিয়া

* এমন কি অধ্যাপক রায় মহাশয়ও যবক্ষারজানের টানে পড়িয়াছেন! মনে হইতেছে, ভাবপ্রকাশে সোরাক শব্দ আছে। সোরা শব্দই যে সংস্কৃতে সোরাক রূপ পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈজ্ঞানিক কোশ সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন করিলে ভাল হয়। অন্ততঃ অসঙ্গতির সম্ভাবনা থাকে না।

(৫) উপরিলিখিত অভিপ্রায় অনুসারে বৈজ্ঞানিক কোশ প্রণয়ন করিলে উহার কলেবর ক্ষুদ্র হইবে, মূল্যও সুলভ হইতে পারিবে। যেমন করিয়াই হউক, বৈজ্ঞানিক কোশ সুলভ করা কর্ত্তব্য এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে উহার বিজ্ঞাপন দেওয়া আবশ্যক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

জ্যোতি-নির্ব্বাণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একদিন মধ্যাহ্নে সূর্য্যকরোজ্জ্বল পদ্মাবক্ষে একখানি বজরা অতি মন্থর গমনে উৎক্ষিপ্ত সলিলরাশি বিভিন্ন করিয়া ধীরভাবে অগ্রসর হইতেছিল। গ্রীষ্মকাল, সমস্ত প্রকৃতি নিস্তব্ধ! অনলকণা বহন করিয়া মধ্যাহ্ন বায়ু মেদিনী সন্তাপিত করিতেছে। পক্ষীরা বৃক্ষের পত্র শাখায়, কাকলী বন্ধ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থিত। পদ্মার বুকে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের উজ্জ্বল জ্যোতি প্রতিফলিত। পদ্মার প্রত্যুৎ-ক্ষিপ্ত ফেনিল তরঙ্গ বাহিয়া লোহিত সূর্য্যকিরণ নীরবে খেলা করিতেছে। শুভ্র ফেনময় সলিল সংঘাতের প্রবল স্রোতে পড়িয়া সেই মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের দীপ্ত কিরণ কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছিল না।

বিহগকূজন নিস্তব্ধ, প্রকৃতি রুদ্রভাবময়ী জড় প্রকৃতি কি এক মহাগাম্ভীর্য্যে নিস্তব্ধ খালি ভীম তরঙ্গরাশিশব্দায়িত ফেনিত প্রক্ষিপ্ত উৎক্ষিপ্ত চমকিত চঞ্চলিত কোমল স্রোতধারা। এই সময়ে পদ্মার প্রবল স্রোতবেগের বিরুদ্ধে সংগ্রামমত্ত একখানি বজরা তাহার বৃহৎ শরীরটাকে প্রধাবিত করিবার শক্তিকে যেন ক্রমশঃ মৃদু বিরামের সীমায় পৌঁছাইতেছিল।

বজরার আরোহী একজন পর্টুগীজ। একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ অধিকার করিয়া এই ভীমকায় পর্টুগীজ বন্দুক হস্তে উপবিষ্ট। বজরার জানালা খোলা। সেই জানালার উন্মুক্ত পথে বন্দুকের নলী প্রবেশ করাইয়া সেই নৌকারোহী পর্টুগীজ্ আকাশের দিকে এক দৃষ্টে লক্ষ্য করিতেছিল। উদ্দেশ্য সেই সুদূর নীলিমাময়, মেঘশূন্য। শব্দশূন্য আকাশের তলবিহারী দুই একটী নিরীহ পক্ষীর জীবন গ্রহণ; বোধ হয় তাহাদের জন্য নহে, শিকারের সখ মিটাইবার জন্য। কিন্তু আকাশে একটীও পাখী দেখা দিতেছিল না। বোধ হয় তখন পক্ষীদলের সদ্য মোক্ষপ্রাপ্তির কোন বাসনা মনো-মধ্যে উদয় হয় নাই।

আরোহী স্থির দৃষ্টিতে, অক্লান্ত লক্ষ্যে অনেকক্ষণ আকা-শের দিকে চাহিয়া রহিল। শিকার জুটিতেছে না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বন্দুক রাখিয়া দিল। বজরার বাহিরে আসিয়া গম্ভীর স্বরে মাজিকে আদেশ করিল, "বজরা হিঁয়া লাগাও।"

কিন্তু সেইখানেই পদ্মা ও ধলেশ্বরীর মিলন মুখ। বজরা কোন ক্রমেই সে স্রোত-মুখে স্থির থাকিতে পারিল না। আরোহী বিরক্ত হইয়া পুনরায় হুকুম করিল, "গাঁওকা ভিতর চলা যাও। নোঙ্গর পানীমে ডারো।"

মাঝী মাল্লারা হুকুমের চাকর। এক ক্ষুদ্র শাখা ধলে-শ্বরীর এই সঙ্গমস্থল হইতে বাহির হইয়া বরাবর ফুলপুরের পাশ দিয়া শ্রীপুরের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। স্থানটী বেশ নির্জ্জন, ছায়া যথেষ্ট—নদীর দুই পার্শ্বে বড় বড় বাগান।

বজরার আরোহী সাহেব তীরে নামিলেন। সেইখানে একটী অতি ক্ষুদ্র তাঁবু পড়িল। তাঁবুতে সাহেবের খাবারের আয়োজন হইল। আহারান্তে শরীর ঠাণ্ডা হইবার পর সাহেব একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বন্দুক হাতে লইলেন। উদ্দেশ্য একটু শিকার। নিরীহ নিরপরাধী পক্ষি-শাবকের রক্তাক্ত দেহ দর্শনের একটা পৈশাচিক আনন্দ! সাহেব বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ছায়াসমন্বিত বৃক্ষরাজি পাশাপাশি থাকিয়া সেই প্রাণান্ত-কারী রৌদ্রেও বেশ ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। অনেক স্থলে বিটপীর শ্যামল আবরণ ভেদ করিয়া সূর্য্যরশ্মিও সচ্ছল ভাবে প্রবেশ করিতেছিল না। গুল্ম ও শুষ্ক পত্রাদি পদ-দলিত করিতে করিতে সাহেব একাকী সেই গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। মাঝিকে বলিয়া গেল, "আমি দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিব। বজরা এইখানেই থাকিবে।"

সাহেবটী আত্মনির্ভরের প্রিয় শিষ্য। সেইজন্য তিনি সঙ্গে মাঝী মাল্লাকে পথপ্রদর্শনের জন্য সঙ্গে লয়েন নাই। সেই প্রখর মধ্যাহ্নে, শষ্পচ্ছায়াসমন্বিত সুগভীর বনান্তরালে প্রাণীবধের একটু পবিত্র সুখের অধিকারী হইবার জন্য সাহেব গুল্মলতা বিদলিত করিয়া সেই গভীর বনমধ্যে নিজের পথ করিয়া লইতে লাগিলেন।

সাহেবের একটু পরিচয় প্রয়োজন। নাম ফ্রান্সিস্ কার্ভালো। জাতিতে পর্টুগীজ। ঢাকায় মোগল ফৌজ-দারের কাছে গিয়াছিলেন। প্রয়োজন নিজের নহে—বঙ্গের অন্যতম ভৌমিক নবাব ইশা খাঁ মসনদআলির প্রয়োজনে। গন্তব্য এই ইশাখাঁর রাজধানী খিজিরপুর।

হৃদয়ে অন্য কোন উদ্দেশ্য পোষণ না করিয়া সোজাসুজি বিশ্রামের ও শিকারের আনন্দ উপভোগের জন্যই যে কার্ভালো সাহেব এই নির্জ্জন স্থানে তাঁবু ফেলিয়াছিলেন, তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু ভাগ্যদোষে তাঁহার অদৃষ্টে এজন্য ভবিষ্যতে অনেক কষ্টভোগ হইয়াছিল।

এই ফ্রান্সিস্ কার্ভালোর ভবিষ্যৎ জীবন অতি অদ্ভুত। ভবিষ্যতে ইহার নাম, বাঙ্গালার ইতিহাসে চির প্রসিদ্ধিলাভ

করিয়াছিল। পর্টুগীজ উপনিবেশে জেনারেল গঙ্গালিসের অধীনে ইনি একজন সামান্য সেনানীরূপে প্রবিষ্ট হয়েন। যাহা কিছু দুঃসাহসিক কাজ উপস্থিত হইত—গঙ্গালিস্ তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য এই কার্ভালোকে নিযুক্ত করিতেন। এখন কার্ভালো পর্টুগীজদের অধীনে একজন সেনাপতি।

কার্ভালো যে কাজটী করিতে গিয়াছিলেন তাহাও এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। কার্ভালো কতবার যে ক্ষুদ্র নৌযুদ্ধে তরণী নিমজ্জিত হইয়া সমুদ্রে ও নদীতে তলাইয়াছিলেন তাহার তালিকা অসম্পূর্ণ। নগর লুঠ করিতে, গঞ্জ লুঠ করিতে, বন্দর লুঠ করিতে কার্ভালো অদ্বিতীয়। কার্ভালোর নাম শুনিলে রমণীরা শিহরিয়া উঠিত, বড় বড় যোদ্ধারা কাঁপিয়া উঠিত। এই কার্ভালোর স্মৃতিই—সাধারণের মনে পর্টুগীজ মাত্রের উপর একটা ভীতিভাব আনিয়া দিয়াছিল।

জেনারেল গঙ্গালিস ইশাখাঁর বিশেষ বশীভূত ছিলেন। কার্ভালোও আবার গঙ্গালিসের বিশেষ অনুগত। কার্ভালো প্রথমে চট্টগ্রাম উপকূলে ও সন্দীপের মোহানায় বন্দর চৌকী দিবার জন্য ইশাখাঁ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। সমুদ্রযাত্রী বাণিজ্য-জাহাজ, নৌকা প্রভৃতি দস্যুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করাই কার্ভালোর কার্য্য। কিন্তু কার্ভালো অনেক সময় রক্ষকরূপে ভক্ষকবৃত্তি অবলম্বন করিত। ইশাখাঁ শুনিলেন—নদীপথে, মোহানার মুখে উপকুলের বারো আনা ডাকাতিতে কার্ভালো অবান্তর ভাবে লিপ্ত। প্রজাবৎসল নবাব ইশাখাঁ এই জন্য কার্ভালো সাহেবকে নিজের অধীনে অন্য কার্য্যে নিয়োগ করিলেন।

সাহেব বনের মধ্যে কখনও বা বিশ্রাম করিতেছেন কখন বা বন্দুক ধরিয়া পাখী মারিতেছেন,—কখন পকেট মধ্যস্থ বোতলনিবদ্ধা মেডিরার সুখময় আস্বাদ গ্রহণে চিত্ত প্রফুল্ল করিতেছেন। অনেকগুলি মৃত পক্ষীর দেহ শিকারের চিহ্নস্বরূপ একটী পল্লবে বাঁধিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সহস্র চেষ্টায় বনের মধ্য হইতে বাহির হইতে পারিলেন না। যেন পথ ভুলিয়াছেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া সাহেব একদিক লক্ষ্য করিয়া এক গ্রামান্তভাগে উপস্থিত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা তখনও ধরণীর গায়ে আসন পাতে নাই, তবে সন্ধ্যারাণীর নকীবেরা ফুকারিয়া রাণীর আগমন সংবাদ দিতেছে। অস্তগামী সূর্য্য পদ্মার তরঙ্গময় সলিলে ডুবিবার জন্য প্রস্তুত। বিটপীশিরে পাতার ভিতর অন্ধকারের আমেজ। পাখীরা কুলায় অন্বেষণে দ্রুতগতিতে ধাবমান। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই মনোরম সময়ে, চারিজন কুলবধূ কেদার-দীঘির ঘাটে গা ধুইতে যাইতেছিলেন।

তাঁহাদের মধ্যে একটা গল্পের সূচনা আরম্ভ হইয়াছিল। উহার প্রথম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদও হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার আঁধার নামিবার সম্ভাবনা দেখিয়া রমণীরা দ্রুতপদবিক্ষেপে কেদারদীঘির বাঁধা ঘাটের চাতালের উপর গিয়া কক্ষের কলস নামাইলেন।

এই চারিজনের মধ্যে তিন জন যুবতী। অপরা প্রৌঢ়া। সকলের সঙ্গে একখানি রঙ্গিন গামছা ও পিত্তল কলস। কলসে গৃহকর্ম্মের জন্য বারি ভরিতে, গাত্র প্রক্ষালন করিতে সকলেরই আগমন। তবে অন্য দিন তাঁহারা এর চেয়ে সকালে কাজ সারিয়া যাইতেন। কিন্তু সে দিন কেমন একটু দেরী হইয়া পড়িয়াছিল।

এ সময়ে পথে ঘাটে, এরূপ সন্ধ্যার প্রাক্কালে বড় কেউ একটা বাহির হইত না। অনেক গ্রামে ছদ্মবেশী পর্টুগীজ দস্যু প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের উপর অত্যাচার করিতেছিল। ঢালী শড়কির কঠোর পাহারায় সুরক্ষিত রাজা চাঁদরায়ের শ্রীপুর রাজধানীতে যে এরূপ ঘটনা হয় নাই তাহা নহে। বোধ হয় এক সপ্তাহের উপর হইল, ঘোষালদের একটী যুবতী-বধূকে মুখ বাঁধিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই! প্রথমা রমণী যুবতী, রসিকা, সে নির্জ্জন অবসর দেখিয়া তাহার অল্পবয়স্কা ননদিনীর সহিত একটু রহস্যের অবতারণা করিতেছিল, এমন সময়ে অপর একজন জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ ক্ষান্ত পিসি! ঘোষালদের মেজো-বৌটার কি কোন সন্ধান হলো না?"

ক্ষান্ত পিসি যে এ ঘটনার সবিশেষ সংবাদ রাখিতেন তাহা নহে। তবে প্রবীণত্বের অভিমানে একটা সর্ব্বজ্ঞ ভাব আনিয়া দেয়। যেখানে প্রকৃত খবর পাওয়া যায় না, সেখানে কল্পনার সাহায্যে তাহাকে পুষ্ট করা হয়। পিসি ঠাকুরাণী—গ্রাম্য পিসি সম্প্রদায়ভুক্তা। রাজ্যের যত খবর তাঁহার কাছে। কাজেই তিনি উত্তর বলিলেন—"পাওয়া যাবে না কেন সুরো! পেলেও কি আর তারা ঘরে নিতে পারে? ফিরিঙ্গি-ডাকাতে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে! চার পাঁচ দিন তাদের কুটীতে ছিলো, লোকে বল্‌বে কি?"

সুরমা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ওমা এমন অধর্ম্মও করেছিল, ছুঁড়ীটা জন্মের মত গেল। আহা! এত শান্ত মেয়ে, দুটি ঠোঁট খুলতো না।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া অন্য যুবতী বলিল—"চল্ বোন্, গা ধুয়ে ঘরে ফিরে যাই। যে দিন কাল পড়েছে। কখন কি যে ঘটে। হাঁ ভাই! এ পোড়া ডাকাতগুলো কি দমন হয় না?"

অপরা বলিল—"ধর্ত্তে পাল্লে ত? রাজা চাঁদরায় এজন্য ঢালী, সড়কীদের ধলেশ্বরীর মোহানায় ঘাটী তৈরি করে দিয়েছেন। একখানা নৌকোও সহজে সে ঘাটী পেরবার যো নেই। যা হয়ে গেছে তাতো আর ফিরবে না বোন্।"

সুরমা এই কথোপকথনের অবসরে সেই ঘাটের পাশের

একটী ক্ষুদ্র বাগান হইতে কতকগুলি বেলফুল তুলিতে গিয়াছিল। সেকালের সাত্ত্বিক হিন্দুরাজার পুষ্করিণী সংলগ্ন উদ্যানে এক একটী ক্ষুদ্র বাগান থাকিত। উদ্দেশ্য—স্নানার্থী বৃদ্ধারা ফুল বিল্বপত্র তুলিয়া পূজার কাজ শেষ করিতে পারিবেন। সুরমা যৌবনস্বভাবসুলভ চঞ্চলতা বশে ননদিনীর ভ্রমর-কৃষ্ণ-বেণীতে দুই চারিটা আধফোটা বেলফুল গুঁজিয়া দিবার লোভেই দলছাড়া হইয়াছিল।

ক্ষান্ত পিসি বলিলেন—"তা বটে চাঁদরায় হলেন রাজার মত রাজা। আর কেদার রায়ও তেমনি। এমন দেশে বাস করায় কত সুখ বল দেখি! সেদিন শুনলুম রাজা নাকি ঘোষাল ঠাকুরকে ডাকিয়ে পাঁচশো টাকা আর দশ বিঘে জমী দিয়েছেন। যদি মেয়েটাকে ফিরে পায়, তার খোর পোষের বন্দোবস্ত হবে।"

সহসা যেন বোধ হইল অদূরে—এক ঘন ঝোপের পার্শ্বে শুষ্কপত্রবিস্তীর্ণ ধরণীবক্ষে কাহারও পদশব্দ শ্রুত হইতেছে। সে শব্দ অতি ধীরবিক্ষিপ্ত—অতি সন্তর্পণ-গমন-সঞ্জাত। সহসা সেই পদশব্দ আরও পরিস্ফুট হইল। হ্যাটকোটধারী এক জীবন্ত মূর্ত্তি সেই বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইল।

ঘাটের চাতাল-উপবিষ্টা রমণীগণ সে মূর্ত্তি দেখিলেন। খালি দেখা নয়,—নির্জ্জন ঘাটে সেই সন্ধ্যার সময় সাহেবকে দেখিয়া তাহারা আত্মহারা ও ভয়চকিত হইলেন। আর অবগাহন করা হইল না, শূন্য কুম্ভ ভরা হইল না—রসালাপ হইল না। সকলেই ঊর্দ্ধমুখে দ্রুতপদে গৃহমুখে ধাবিত। সুরমা যে সেখানে নাই সে বিষয়েও কাহারও হুঁস হইল না। এই সেদিন গ্রামের ভিতর একটা কাণ্ড ঘটিয়া ঘোষালদের বউএর সর্ব্বনাশ হইয়াছে—আজ আবার তাহার পূর্ব্বসূচনা। ক্ষান্ত পিসি ভয়ে বাক্যহীনা। কেবল সুরমার ননদিনী প্রমীলা চীৎকার করিয়া বলিলেন—"বৌ পালিয়ে আয়। পুকুরের পাড়ে সাহেব দেখা দিয়েছে।"

আওয়াজটা পুষ্পচয়নকারিণী সুরমার কাণে পৌঁছিল। কিন্তু ঘটনাটা কি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না। সে আঁচল ভরিয়া ঠাকুরঝির খোঁপায় পরাইবার জন্য অনেক বেলা, চাঁপা তুলিয়াছে। যৌবন-স্বভাব-সুলভ, একটা সরস প্রফুল্লতা তাহার চিত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া সঙ্গীতের সুর সৃষ্টি করিয়াছে। সুরমা গুণ গুণ স্বরে গাহিতেছিল:—

সই লো! সই ব্যাপার চমৎকার
সয়া এসে কুঞ্জবনে কচ্ছে হাহাকার।
আলতা পরা হলোনাক এলোচুলে এসে
হোচট খেয়ে পড়ল সই সয়ার ঘাড়ে শেষে।

গানের শেষ চরণ আর আবৃত্তি হইল না। সুরমা দ্রুতপদে চাতালের দিকে আসিতে আসিতে দেখিল, ঘাটের মুখে সাহেব তাহার পথ আগলাইয়া দণ্ডায়মান। সুরমা সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—"সাহেব! পথ আগলাইলে কেন! আমায় যাইতে দাও।"

সুরমা যুবতী, রূপে ভুবনমোহিনী। ফ্রান্সিস্ দুইচক্ষু ভরিয়া সেই মোহিনী রূপরাশি দেখিল। সুরমার সেই কটাক্ষবিহীন আয়ত ইন্দীবর নেত্র হইতে আগুন ছুটিয়া বাহির হইতেছে, তাহাও সে দেখিল। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ফ্রান্সিস্ বলিল—"Can you show me the way to the river, Fair Lady!"

সুরমা ইহার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না। আরও সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—"তুমি কি বলছ সাহেব—আমি যে কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি।"

তখনকার পর্টুগীজগণ বহুদিন বাঙ্গলায় বাস করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গলায় কথা কহিতে পারিত। ফ্রান্সিস্ দেখিল যে সেই সুন্দরী বিবি তাহার কথা বুঝিতে পারিতেছে না। কাজেই বাঙ্গলায় বলিল—"বিবি! হামাকে দরিয়ার পঠ্ দেখাটে পারে। হাম ডলেশ্বরী যায়ে গা।"

সুরমা বুঝিল সাহেব পথ হারাইয়াছে। ধলেশ্বরী নদীতে যাইবে। সুরমা অঙ্গুলী-সংকেতে পথ দেখাইয়া দিল।

সাহেব সুরমার সংকেত বুঝিল—কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাহাকে কয়েকটী টাকা পকেট হইতে বাহির করিয়া পুরস্কার রূপে দিতে গেল—"Here is your *buksis* fair Lady!"

সুরমা বলিল—"বক্সিস্ চাই না সাহেব! আমার পথ ছাড়িয়া দাও। আমি বাড়ী যাই।"

কোন একজন ইংরাজ পাদরী গির্জ্জায় বক্তৃতা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—"ভাই সকল সয়তান বাহিরে নাই, আকাশে নাই, নীচে নরকে নাই, শয়তান মানুষের মনে। যখন হৃদয়ের সৎপ্রবৃত্তি প্রলোভনের ছলনায় শিথিল হইয়া আসে—শয়তান তখনই হৃদয় অধিকার করিয়া বসে।" কথাটার মূলে যথেষ্ট সত্য নিহিত। অন্ততঃ এই ফ্রান্সিসের সম্বন্ধে কথাটা বড়ই অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গেল।

ফ্রান্সিস্ পাপ করিবে বলিয়া আসে নাই। সে পথ হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে চায় জঙ্গলের বাহিরে যাইতে, ধলেশ্বরীর মোহানায় তাহার নিজের বজরায় যাইতে। ভাবিতব্য তাহাকে আর এক নূতন ঘটনার মধ্যে আনিয়া ফেলিল।

কার্ভালো সাহসী;—বীর। এতদিন কাপুরুষ ছিল না। এখন ঘটনাবশে তাহাই হইল।

তাহার হৃদয়ের পুণ্যের আলোক মন্ত্রবলে সরিয়া গেল। পাপের ঘনান্ধকারময় কৃষ্ণ ছায়া তাহার স্থান অধিকার করিল। পাপ পুণ্য, বিবেক সন্দেহ, প্রবৃত্তি নিবৃত্তির মধ্যে তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে ক্ষণকালব্যাপী মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই সময়ে শয়তান সেনাপতি হইয়া আসায়, সৎপ্রবৃত্তি ভয়ে

পলাইল। ফ্রান্সিস্ কার্ভালো এ নির্জ্জন অবসরে, নিঃসহায়া অবলার উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইল।

সে মনে মনে ভাবিল—Nothing is amiss here. None to oppose me। ব্যাঘ্র শিকার ধরিবার পূর্ব্বে মুহূর্ত্তমাত্র স্থিরনেত্রে যেমন শিকারের দিকে চাহিয়া থাকে, ভীমকায় কার্ভালো সেইরূপে একবার সুরমার দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ করিল। স্কন্ধদেশস্থিত বন্দুক ও শিকারের মরা পাখীগুলি নামাইয়া বলিল—"Do not get flurried, my darling: I will make you my Queen. Your eyes are like my Mary's."

সুরমা দেখিল—সাহেব নরকের পথে নামিয়াছে। বিপদ সম্মুখে—কেহ তাহাকে রক্ষা করিবার নাই। সতীর শ্রেষ্ঠ সার ধর্ম্ম—সতীত্বরত্ন বিপদাপন্ন। সে ঊর্দ্ধমুখে যুক্তকরে আকাশের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিল—"ভগবান! হরি! এক দিন দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলে; প্রভু! আজ আমায় রক্ষা কর।"

নারায়ণের আসন টলিল। তাঁহার কৃপায় সুরমার হৃদয়ে—অভূতপূর্ব্ব সাহস সঞ্চার হইল। সে ক্ষিপ্রগতিতে সবলে এক বৃক্ষ শাখা ভাঙ্গিয়া লইয়া বলিল—"পথ ছেড়ে দে পোড়ার মুখো সাহেব! যদি আর একপাও এগুবি, এই ডালের বাড়ি তোর মাথা ভাঙ্গিবো।"

কার্ভালো বাঙ্গলাদেশে অনেক দিন জীবনযাপন করিয়াছে—সেকালের বাঙ্গালী সমাজের অনেক দেখিয়াছে শুনিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের মধ্যে যে এরূপ অপূর্ব্ব শক্তি থাকিতে পারে, তাহা সে কল্পনায় আনিতে পারিল না।

সুরমা তখন যেন দীপ্ত-তেজোময়ী সুবর্ণপ্রতিমা। সে প্রতিমার উজ্জ্বল অঙ্গ হইতে যেন আদ্যাশক্তি গৌরীর জ্যোতি উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত, ক্রুদ্ধ, চঞ্চল, কেশরাজি অসংযতভাবে অংশোপরি সংন্যস্ত—বৃক্ষশাখাসংলগ্ন হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ। কেশ এলায়িত অঞ্চল দোলায়িত, মুখ উদ্দীপ্ত প্রতিভায় পূর্ণ বিকশিত। কিন্তু দীপ্ততেজ, সে সময়োচিত দম্ভ, সে বিরাট মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি দেখিয়াও পাপিষ্ঠ কার্ভালো নিজের ঘৃণিত সংকল্প ত্যাগ করিতে পারিল না।

সে পাপিষ্ঠ দ্রুতবেগে সেই অসহায়া রমণীর দিকে অগ্রসর হইল। সুরমা অনন্যোপায় হইয়া সেই বৃক্ষশাখা দৃঢ়ভাবে সঞ্চালন করিতে—আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। হা! ভগবান! কি করিলে প্রভু! সতীর পবিত্র ধর্ম্মে যে কলঙ্কের ছায়া পড়ে!

সহসা এক অদৃষ্ট হস্তনিক্ষিপ্ত তীর আসিয়া ফ্রান্সিসের টুপি উড়াইয়া দিল, ফ্রান্সিস চীৎকার করিয়া বলিল—"who is the devil at my back!" কথা শেষ হইতে না হইতে আরও তিন চারিজন সবলকায় বাঙ্গালী সৈনিক দৃঢ় মুষ্টিতে ফ্রান্সিস্‌কে আবদ্ধ করিল। তাহার আর নড়িবার ক্ষমতা রহিল না।

ফ্রান্সিস্ তাহার কণ্ঠদেশস্পৃষ্ট অপরিচিত হস্তের তাড়না দেখিয়া বুঝিল তাহার অপেক্ষা না হয় সমশক্তিমান লোকেই তাহার গ্রীবা ধারণ করিয়াছে। সে ইতিপূর্ব্বেই তাহার বন্দুক নামাইয়া রাখিয়াছিল। কাজেই অস্ত্রহীন। ফ্রান্সিস্ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—৮।১০ জন ঢালী শড়কী তাহার চারিদিক বেষ্টন করিয়াছে। ফ্রান্সিস্ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—"টোম্ লোক কোন্ হ্যায়! কাহে হাম্‌কো পাকড়া।"

যে ব্যক্তি ফ্রান্সিসের গ্রীবাদেশ সবলে ধরিয়া বর্শা তুলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সে সম্মুখে আসিয়া বলিল—"তোমার খুব আপনার লোক! ঠাটার সম্পর্ক কিছুই নেই—কোন হ্যায়, এখনি টের পাবে।"

আর একজন সৈনিক বলিল—"চিনতে পাচ্ছো না সাহেব! এযে তোমার পিসে কালু সর্দ্দার।"

কার্ভালো ইতিপূর্ব্বে কালু সর্দ্দারের নাম শুনিয়াছিল। গতিক ভাল নয় দেখিয়া বলিল—"কাহে হাম্‌কো পাকড়া—ছোড় দেও।"

সে দলের প্রধান ছিলেন—কালি ঢালি। কালি ঢালি জাতিতে ব্রাহ্মণ, উপাধি মুখোপাধ্যায়। বাঙ্গালায় সেই সময়ে এতাদৃশ সাহসী পুরুষ অতি অল্পই ছিল। কালিদাস আগে রাজা প্রতাপাদিত্যের অধীনস্থ ছিল। এখন সে বিক্রমপুরের অধীনে।

সুরমা ভগবৎ প্রেরিত এই অচিন্তনীয় উদ্ধারে ভগবানকে অসংখ্য স্তুতি করিল। তাহার চক্ষে কৃতজ্ঞতার অশ্রু দেখা দিল।

কালিদাস গম্ভীর স্বরে হুকুম দিলেন—"এই নরাধমকে বন্দী করিয়া তোমরা কারাগারে লইয়া যাও। রাজা এর অপরাধের বিচারক। আমরা যে কার্য্যের জন্য যুবরাজ কেদার রায় কর্ত্তৃক নিযুক্ত, তাহার অতি সামান্য একাংশ আজ করিয়াছি। যাও, বিলম্ব করিও না।"

সৈনিকেরা ফ্রান্সিস্ কার্ভালোকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। যেখানে ঐ ঘটনা হইয়াছিল, সেখান হইতে রাজবাড়ী অর্দ্ধক্রোশ।

সৈনিকেরা চলিয়া গেলে কালিদাস সুরমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মা! তুমি কাদের বাড়ীর মেয়ে গা!"

সুরমা বলিল—"বাবা! আমি চৌধুরীদের বাড়ীর বৌ।"

"আমাদের গঙ্গাধর ঠাকুরের বাড়ীর?"

"হাঁ বাবা।"

"এসমা! আমার সঙ্গে। তোমায় বাড়ী পৌঁছিয়া দিব।"

সুরমাকে সঙ্গে লইয়া কালিদাস চলিয়া গেল। আর ফ্রান্সিস্! সে নরাধম ততক্ষণে শৃঙ্খলিত অবস্থায় চাঁদরায়ের কারাগারে।

(ক্রমশঃ।)

সোনার তরী।

১

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

২

এক খানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা,
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরু ছায়া মসী মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা,
প্রভাত বেলা।
এ পারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা।

৩

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে।
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা পালে চলে যায়,
কোন দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙ্গে দুধারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

৪

ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে!
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে!
যেয়ো যেথা যেতে চাও,
যারে খুসি তারে দাও,
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে!

৫

যত চাও তত লও তরণী পরে।
আর আছে?—আর নাই, দিয়েছি ভরে'।
এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে'
থরে বিথরে
এখন আমারে লহ করুণা করে!

৬

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই! ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণ গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে;
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি,
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

ফাল্গুন, ১২৯৮।

"সোনার তরী"র ব্যাখ্যা।

১

সারাজীবন সুধু খেটেছি এবং সাংসারিক কাজে ব্যস্ত হয়ে রয়েছি। শেষে দেখি যে আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। মৃত্যু প্রলয়-ঝড়ের মত আমাকে গ্রাস কর্‌বার উদ্যোগ করছে; আশপাশে পালাবার পথ নাই।

২

আমার যাহা জীবনের ব্রত, সে কাজে আমার সহচর নাই, সহায় নাই। (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিরা একক; জীবনের মধ্য দিয়া তাঁহারা নিজ কাজ করিয়া যান, সাহায্য পান না, উৎসাহ পান না, সফলতা বড় দূরবর্ত্তী বোধ হয়। তাই তাঁহাদের জীবন সঙ্গীহীন, বিষাদছায়া মাখা। পতিত জাতির কবি দান্তের, অথবা ঘোর কৃত্রিম ও বৈষয়িক ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগের প্রকৃতির কবি গ্রের জীবনে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।)

মরণ-নদীর ওপার হতে পরলোকের একটু আভাস পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু বড়ই অস্পষ্ট, কারণ "সে অনাবিষ্কৃত দেশের প্রান্ত হতে এ পর্য্যন্ত কোন পথিক ফেরে নাই"।

৩

এ নদীতে একমাত্র কাণ্ডারী কাল-তরঙ্গ-পরাজয়ী, অপ্রতিহতশক্তি ঈশ্বর। তাঁহাকে হৃদয়নিভৃতে অনুভব করা যায় কিন্তু চাক্ষুষ দেখা যায় না। ["তাঁহাকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত ফিরিয়া আসে"। তিনি "কল্পনা চিন্তা ধারণা ও সিদ্ধান্তের বাহির; যাহা পড়িয়াছি, শুনিয়াছি, বা লোকে বলিয়াছে তার চেয়ে বড়" (শেখ সাদী।) "মাঝে মাঝে তাঁর দেখা পাই, চিরদিন পাই না", তবে তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিয়া লইব কিরূপে?]

৪

তাঁহারই আশ্রয় লওয়া যাক্। আমার জীবনের কাজগুলি তাঁহাকেই অর্পণ করি। শ্রম করিয়াছি আমি, কিন্তু তাহার ফল চাহি না। তিনি সুধু খুসী হয়ে সেগুলি গ্রহণ করুন ও জগতে বিলিয়ে দিন।

"বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ
আমার সে নয়, সবার সে আজ,
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার মাঝ
বিবিধ সাজে!"

৫

ভোগবাসনার লেশমাত্র না রাখিয়া সমস্ত কর্ম্ম নিঃশেষ করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিলাম। শ্রমজীবনের শেষে সংসারে আমার আর কিছুর প্রয়োজন নাই, কর্ত্তব্য বাকী নাই। এখন সুধু ঈশ্বর-সন্নিধি চাই।

৬

কিন্তু তাহা পাইলাম না। তিনি সুধু আমার কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন; আমাকে মুক্তি দিলেন না। তাই এ প্রাচীন বয়সে একলা সুধু হাতে হতাশ হয়ে মৃত্যু অপেক্ষায় বসে আছি।

উপসংহার।

কাব্য বুঝিতে হইলে পাঠকের মনের সহায়তা অত্যাবশ্যক। সেক্ষপীয়র পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন "সর্ব্বোচ্চ নাটকও সুধু ছায়া মাত্র, যদি দর্শকের কল্পনা ষ্টেজের অভাবগুলি পূরণ করিয়া না লয়।" সমালোচনা আত্মপ্রকাশ; তাই একজন চতুর ফরাসী সমালোচক তাঁহার সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলির আরম্ভে বলিয়াছিলেন,—"Gentlemen, I am going to speak of *myself* in connection with Shakespeare." যে পাঠক যতটা পুঁজি লইয়া আসেন, কাব্য পাঠ করিয়া সেই পরিমাণেই লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথের গত ১৬ বৎসরের কবিতাগুলি সম্পূর্ণরূপে নূতন ভাব প্রচার করিতেছে। ("সোনার তরী"কে এ ভাবের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বা আদর্শ মনে করা ভুল।) এই ভাবগুলি আমাদের পুরাতন-স্মৃত অভ্যস্ত-ভাব হইতে ভিন্ন, অনেকের পক্ষেই নূতন। প্রথম পাঠেই যে এরূপ কবিতার প্রতি পংক্তি বোঝা যাইবে এরূপ আশা করা যায় না; এবং না বুঝিতে পারিয়া অমনি নব-বাণীর দূতের প্রতি অথবা রবি-ভক্তগণের মধুচক্রে ঢিল ছুড়িলে সুধু "হাসির সমালোচনা" রচনা করা হয়।

কেবল একটি কবিতা বা অধ্যায়ে চক্ষু নিবিষ্ট রাখিলে লেখকের মনের ভাব ধরা কঠিন হইতে পারে। কিন্তু এমন কোন লেখক নাই যাঁহার অনেকগুলি এক সময়ের রচনা পড়িলে অর্থবোধ অসম্ভব বা কঠিন। শেলী, ব্রাউনিং, এমার্সনও আজকাল বেশী পড়িয়া পড়িয়া অতি পুরাতনের মত সহজ বোধ হয়। আমাদের দেশের সমালোচকেরা যদি ভাব-বিকাশ তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া চিনিতেন, তবে এতদিনে রবীন্দ্রনাথের নূতন ধরণের কবিতাগুলি পাঠকসমাজে বড়ই পুরাতন হইয়া পড়িত। তাহা হয় নাই বলিয়া কি এগুলি অর্থহীন জটিলতা মাত্র, সুধু "মিছে কথা গাঁথা"? তাহাদের মধ্যে কি এক মহান্ শিক্ষা নাই? নির্দ্দোষ আমোদ ভাল জিনিষ। Laugh and grow fat. কিন্তু সুধু "হাসির গান" জীবন-গীতা হইতে পারে না; শুধু broad grinsএ কখনও জাতীয় উন্নতির ভিত্তি গাঁথা হয় নাই।

যদুনাথ সরকার,
পাটনা কলেজের অধ্যাপক।

"সোনার তরী"র অর্থাভাব।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় "সোনার তরী"র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং অতি সংক্ষেপে আমরা "সোনার তরী"তে দ্বিজেন্দ্রবাবুর আরোপিত অস্পষ্টতা (obscurity) দোষ দূর করিবার চেষ্টা করিব।

কবিতাটীর যে ব্যাখ্যা দ্বিজেন্দ্রবাবুর কতকটা মনঃপূত হইয়াছে, তাহার সহিত আর একটু যোগ করিলেই আমাদের মতে অর্থ সম্পূর্ণ হয়। কবির "সঞ্চিত ধন" বলিতে আমরা তাহার সমগ্র সাংসারিকতা বলিয়া বুঝিয়াছি। তাঁহার পার্থিব যত কিছু তাহার সমষ্টি ঐ "সোনার ধান" গুলি। আর ঐ সোনার ধান "চিনি মাঝি"কে দান করিয়া যখন কবি বলিতেছেন, "আমারে লহ করুণা করে" তখনই ভগবদ্গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইতেছে, কারণ সকল কামনা ও বাসনার পর আত্মদান না করিলে নিষ্কাম ধর্ম্মের পূর্ণতা সাধন হয় না। "আমাকে (?) লহ" বলিতে "আমাকে কিছু দাও" এরূপ বুঝাইবার কোন কারণ নাই। সর্ব্বশেষে জীবনদেবতার দ্বারা কবির প্রত্যাখ্যানের কারণ এই যে সকল কামনা বিসর্জ্জনের পরও মানবের সাধনার এবং অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন থাকে এবং শেষ stanzaয় কবির প্রতি জীবন-দেবতার সেই ইঙ্গিত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

"চিনি মাঝি" যখন কবির জীবন-দেবতা (Ideal) বলিয়া দ্বিজেন্দ্রবাবু স্বীকার করিয়াছেন, তখন কবি যে তাঁহাকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং জীবন-দেবতাকে চিনি অথচ চিনি না এই ভাবই অধিক স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

কবিতাটীর বহিরাকার pastoral, কিন্তু একটা বেশ সরল আধ্যাত্মিক অর্থ পাওয়া যায়। বাস্তব-রাজ্যের কৃষক চরিত্রের সহিত উহার সম্পূর্ণ মিল না থাকিতে পারে কিন্তু যে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে কবি উক্ত কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহার জীবন্ত ছায়া উহাতে পড়িয়াছে। শ্রাবণ মাসে পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে "সোনা দিঘা" ধান্য সুপক্ক হয় এবং ঐ সময়েই উহা কর্ত্তিত হইয়া থাকে। "খর পরশা," "থরে বিথরে" প্রভৃতি শব্দ অর্থহীন নহে, ব্যাকরণবিরোধী বলিয়াও মনে হয় না।

আমি দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে বসি নাই। স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট রবিবাবুর কবিতা পাঠ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত পাইয়াছিলাম, তাহা হইতে যে টুকু বুঝিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।



রায়বাহাদুর ডাক্তার আশুতোষ মিত্র



স্বামী অভেদানন্দ

ইচ্ছাপূর্ব্বক কবিতায় obscurity বা mysticism অভ্যাস করা দোষ; কিন্তু কবিতার ভাব একটু অস্পষ্ট (গভীর) হইলেই যে "অর্থ-শূন্য" বা "স্ববিরোধী" হইবে এরূপ মনে করা অন্যায়। কবিদিগের মধ্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলির অস্পষ্ট কবিতা এবং ঋষিকল্প এমার্সনের নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্বসমূহ obscure হওয়া সত্বেও অনাদৃত হয় নাই। উহা আয়ত্ত করিতে মস্তিষ্কের পরিচালনার প্রয়োজন হয় এবং উচ্চশিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল, প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের পক্ষে উহা একটি প্রধান সহায়। অস্পষ্ট হইলেই যেমন কোন কবিতা গভীর হইতে পারে না, তেমনি কোন কবিতা গভীর হইলেই "অর্থশূন্য" ও "স্ববিরোধী" হইবে ইহা মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধায়।

কাশ্মীরে বাঙ্গালী।

ভারতের সীমান্তবর্ত্তী সুদূর কাশ্মীরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহোদয় প্রমুখ যাঁহারা বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, রায় আশুতোষ মিত্র বাহাদুর তাঁহাদের অন্যতম।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতার সন্নিহিত কোন্নগর গ্রামে ডাক্তার মিত্র স্বীয় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার কে, ডি, ঘোষ মহোদয় তাঁহার মাতুল। মিত্র মহাশয় বাল্যকালে এক জন প্রতিভাবান্ ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি যে কোন বিভাগে প্রবেশ করিতেন, তাহাতেই তাঁহার প্রতিভা সম্যক স্ফুরিত হইত, কিন্তু গৃহে তিন জন উচ্চশ্রেণীর ডাক্তার থাকায় চিকিৎসা ব্যবসায়ের দিকেই তাঁহার একটা স্বাভাবিক টান পড়িয়াছিল। তিনি মেট্রোপলিটন ইন্‌সটিটিউশন হইতে প্রবেশিকা ও প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। তখন তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। অল্পকাল মধ্যেই তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে এরূপ অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দান করেন যে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ব্যবচ্ছেদের শিক্ষক এবং উদ্‌ভিদ্-বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান, রসায়ন ও চিকিৎসাসংস্পৃষ্ট-ব্যবস্থা-বিজ্ঞানের (Medical Jurisprudence) সহকারী শিক্ষকের কার্য্যে নিয়োজিত হন। ঐ সকল কার্য্য তিনি এরূপ দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন যে, কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ তাঁহার অনেক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তথায় লণ্ডনের কয়েকটী রুগ্নাবাসে চিকিৎসা করিয়া এডিনবরা মেডিকেল স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করিতে যান। তথাকার রয়েল কলেজের যুগপৎ ভৈষজ্য ও অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যার উচ্চ উপাধিতে সম্মানিত হইয়া তিনি ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিছুদিন তিনি কলিকাতায় জন-স্বাস্থ্যবিধায়িনী সভার (Calcutta Public Health Society) স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীর কার্য্য করেন। এই সময় তিনি স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বিবিধ আবশ্যকীয় সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ রচনা করেন। এবং উক্ত সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকায় সেই সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সময় তিনি বেথুন সোসাইটীর সভ্যগণ সমক্ষে চিকিৎসার উন্নততর ব্যবস্থা বিষয়ক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরলোকগত সার্জ্জন জেনারল হাবী প্রবন্ধটীর বহুল প্রশংসা করিয়া ডাক্তার মিত্র মহাশয়কে বলেন যে তিনি প্রবন্ধান্তর্গত বিষয়ের বিশেষ আন্দোলন করিবেন এবং উহা গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনিবেন।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে তিনি চিকিৎসাবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর পদে বৃত হইয়া কাশ্মীর যাত্রা করেন। এখানে তিনি স্বীয় প্রতিভা প্রকাশের প্রকৃত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলেন। কাশ্মীর অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বে য়ুরোপীয় চিকিৎসার বড় প্রচলন ছিল না; লোকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপকারিতাও ততদূর অনুভব করিত না। কিন্তু তাঁহার সুচিকিৎসাগুণে য়ুরোপীয় চিকিৎসাপ্রণালীর আদর এবং তাহার প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহারই অধ্যবসায়বলে এই দেশীয় রাজ্যে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম নিঃস্বার্থ জনহিতৈষণা এবং অনন্যসাধারণ কর্ম্মকুশলতার ফলে স্থানীয় সরকারী রুগ্নাবাসটী রোগজীর্ণ নিরাশ্রয়ের আশ্রয় এবং দরিদ্র আতুর নরনারীর ভরসাস্থল হইয়াছে। জনসাধারণ ইহার উপকারিতা এতদূর উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে, গ্রাম্য কুসংস্কারের বাঁধ লঙ্ঘন করতঃ পল্লীবাসী কৃষক পর্য্যন্ত রুগ্নাবাসে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে এবং ডাক্তার মিত্র মহাশয়ের সুচিকিৎসা-গুণে প্রাণ পাইয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে। ১৮৯৪ সালের ৭ই নবেম্বর তারিখের "পাইওনিয়র" পত্রিকা বলিয়াছিলেন :—

"That an institution like this should within the year be the means of administering to the wants of 200,000 sufferers from the poorer classes shows how well the hospital is known * * * *."

বস্তুতঃই যে রুগ্নাবাসে বৎসরে দু'লক্ষ দরিদ্র রোগী চিকিৎসিত হয়, তাহা যে আপামর সাধারণের নিকট সুপরিচিত তাহাতে আর সন্দেহ কি? বড়লাট ল্যান্সডাউন ও বুয়ারযুদ্ধজয়ী লর্ড রবার্টস বাহাদুর মহারাজার এই রুগ্নাবাস দর্শন করিতে আসিয়া ইহার কার্য্যকারিতায় বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১৩।১৪ বৎসর অতীত হইল যখন বিসূচিকা মহামারীর প্রবল আক্রমণের মুখে পতিত হইয়া কাশ্মীরের অসংখ্য নরনারী প্রাণ হারাইতেছিল, যখন অসহ্য যন্ত্রণাতাড়িত মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদে এবং প্রাণসম প্রিয়জনদিগের

অকালবিয়োগজনিত আবালবৃদ্ধবনিতার বিলাপধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তখন সেই দুর্দ্দিনে একজন বাঙ্গালী শত শত নরনারীর সান্ত্বনাস্থল হইয়াছিলেন। ডাক্তার মিত্র বাহাদুর ধনীর অট্টালিকায় দরিদ্রের কুটীরে, রুগ্নাবাসে এবং আতুরালয়ে দিবানিশি গমনাগমন করিয়া বহুসংখ্যক নরনারীকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার সেই পরিশ্রম, ধৈর্য্য, সাহস এবং কর্ম্মকুশলতা দর্শনে সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় চিকিৎসাবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী হার্বীপ্রমুখ পদস্থ ব্যক্তিগণ, ভারতীয় সংবাদপত্র ও মেডিকেল রিপোর্টার, মেডিকেল রেকর্ড, ল্যান্সেট প্রভৃতি চিকিৎসাবিজ্ঞানবিষয়িণী পত্রিকাদি ডাক্তার মিত্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের সিবিল হাসপাতালসমূহের ইন্‌স্‌পেক্টার জেনেরাল সার্জ্জন কর্ণেল হার্বী তাঁহার রিপোর্টের এক স্থানে লিখিয়াছিলেন:—

"The brunt of the work fell on Dr. A. Mitra who exerted himself in the most energetic manner throughout, not sparing himself day or night."

তাঁহার সহযোগী সার্জ্জন লেঃ কর্ণেল ডান বলিয়াছিলেন:—

"Dr. Mitra was ever to the fore and working in a manner that left nothing to be desired."

চিকিৎসা ব্যবসায়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি ও প্রসারে এতদঞ্চলে ডাক্তার মিত্রের সমকক্ষ কেহই নাই। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র, বর্ষার বারিপাত এবং পৌষ মাঘ মাসের তীব্র শীতের প্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। দিবা দ্বিপ্রহরে অথবা গভীর রজনীতে রোগীর গৃহে যাইতে তাঁহার আপত্তি নাই। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, মিষ্ট বচন এবং বদান্যতায় ছোট বড় সকলেই মুগ্ধ। দরিদ্র রোগীর নিকট হইতে তিনি এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা তাঁহার সাহায্য হইতে কখনও বঞ্চিত হয় না।

তিনি যে কেবল চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিয়াই ক্ষান্ত আছেন তাহা নহে—তাঁহার উপর রাজ্যের নানা বিভাগীয় গুরুভার সকল অর্পিত আছে। চিকিৎসা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর দায়িত্ব বড় সামান্য নহে। তিনি হাঁসপাতালের কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া থাকেন। তিনি স্বহস্তে ক্ষতাদি বন্ধন করেন এবং রুগ্নাবাসের ও বাহিরের প্রত্যেক রোগীর ব্যবস্থাপত্র স্বহস্তে লিখিয়া দেন। কারাগারের তত্ত্বাবধানের ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত আছে। তিনি স্বয়ং তাহার অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং তাহার সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক সামান্য বিষয়েরও তথ্য গ্রহণ করেন। তিনি কাশ্মীর রাজ্যের রাসায়নিক পরীক্ষক, বিষ প্রয়োগে, মৃত ব্যক্তির অন্ত্র, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির পরীক্ষা বিশ্লেষণাদি তিনি স্বহস্তে করিয়া থাকেন। তিনিই আবার ঐ রাজ্যের অন্তরীক্ষবিদ্যাবিষয়ক বৃত্তান্তের নিবেদক (Meteorological Reporter) এবং মানমন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক। শিক্ষাবিষয়েও তাঁহার ঔদাসীন্য নাই। তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহের তত্ত্বাবধায়ক। প্রায়ই তিনি সেই সকল বিদ্যালয়ে গিয়া ছাত্রগণকে অঙ্কশাস্ত্রে শিক্ষাদান করেন এবং যাহাতে শিক্ষার সুব্যবস্থা হয় তাহার জন্য চেষ্টা করেন। অবসর মত কাশ্মীরী বালকগণকে তিনি ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও শারীর বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট সুশিক্ষা পাইয়া হাস্পিট্যাল এসিষ্টেণ্টের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতেছে। কাশ্মীরে বাঙ্গালীর বিবিধ কীর্ত্তির মধ্যে শ্রীনগর স্কুল অন্যতম। এই বিদ্যালয় রায় আশুতোষ মিত্র বাহাদুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইতিপূর্ব্বে কাশ্মীরে মিউনিসপ্যালিটীর অস্তিত্বই ছিল না। তিনিই ইহার সৃষ্টি করেন। ডাক্তার মিত্র শ্রীনগর মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি এবং স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী। তাঁহার সভাপতিত্বে সভার প্রভূত উন্নতি ও সাধারণের মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। কাশ্মীর-শাসন বিবরণীতে প্রকাশ:—

"Dr. A Mitra, the chief medical officer, Kashmir, holds the office of the President of the Srinagar Municipality and is its sanitary adviser. He deserves great credit for his successful endeavours to make the Municipality a popular institution. He carried out many sanitary reforms in spite of some opposition which he succeeded in overcoming with singular tact and firmness."

এত কার্য্য করিয়াও তিনি অধ্যয়ন এবং পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করিতে পারেন। তাঁহার এই অসাধারণ কর্ম্মশক্তি অনেকের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছে। তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে স্বাধীন অনুসন্ধান দ্বারা অনেক অভিনব তত্ত্বসকল অবগত হইতেছেন এবং তৎসমুদয় প্রবন্ধাকারে দেশী ও বিলাতী কাগজপত্রে বহুদিন হইতে ক্রমাগত প্রকাশ করিতেছেন। "American International Journal of Medical Science" নামক পত্রে কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে তাঁহার একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি বহুমূত্র ও বিসূচিকা রোগের নিদানাদি নির্ণয়ে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং বহুদিন হইতে এই দুই ব্যাধি সম্বন্ধে গভীরগবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন। বিসূচিকা রোগ সম্বন্ধে তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ ১৮৯৩ সালের "Medical Annual" এ প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি শারীর-বিজ্ঞান বিষয়ে বঙ্গভাষায় একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

১৮৮৩ অব্দে তিনি Obstetrical Society of London নামক সভার সদস্য, ১৮৯৩ সালে লণ্ডনের

Imperial Instituteএর সদস্য এবং ঐ বৎসরেই ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন। উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে বাঙ্গালী সর্ব্বত্র অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন, রায় আশুতোষ মিত্র বাহাদুর তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে বাঙ্গালী যে প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন তথায় শিক্ষানীতি, সংস্কার ও উন্নতি তাঁহার অনুযাত্রী হইয়াছে। কাশ্মীরেও তাহার অন্যথা হয় নাই। ডাক্তার মিত্র যে রাজ্যের উন্নতিবিধানে আজ ২১ বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক যত্ন করিতেছেন সে রাজ্যের রাজা প্রজা উভয়ে তাঁহাকে কি চক্ষে দেখিয়া থাকেন তাহা পাদটীকায় সন্নিবেশিত কয়েকটি উদ্ধার হইতে স্পষ্ট অনুভূত হইবে।*

তিনি নিজগুণে সর্ব্বজনপ্রিয় এবং সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেরই সম্মানভাজন হইয়াছেন। ধর্ম্ম ও চরিত্র বলও তাঁহার কর্ম্মশক্তির অনুরূপ। তাঁহার ছাত্রাবস্থায় তিনি পরলোকগত মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুর নিকট সর্ব্বদা থাকিতেন এবং শিক্ষা পাইতেন। তিনি ইঁহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। তাঁহারই দ্বারা অল্পবয়সেই মিত্র মহোদয়ের হৃদয়ে নীতি ও ধর্ম্মের বীজ উপ্ত হয়। সেই ধর্ম্মপ্রাণ ও চরিত্রবান পুরুষের সংস্পর্শে এবং তাঁহার অমূল্য উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া ইনি প্রথম বয়সেই জীবনের দায়িত্ব ও গুরুত্ব অনুভব করিতে শিক্ষা করেন এবং উন্নত আদর্শ পোষণ করিয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। কাশ্মীরবাসিগণ তাঁহার উপকার কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবে না। তথাকার মিউনিসিপ্যালিটী ও শ্রীনগর স্কুল প্রভৃতি বাঙ্গালীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া তাঁহার জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবে। *

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

* "He worked splendidly and I am glad to think that his exertions during the out-break of cholera were especially recognised by the Government of India."

"Dr. Mitra has acquired an European reputation by his valuable contributions to current medical literature especially on subjects connected with Kashmir."

"Dr. Mitra has earned a very high reputation and popularity not only among the natives of the country, but also among the European visitors to Kashmir, and has been particularly fortunate in being complimented for the excellence of his work by such distinguished visitors as His Excellency the Viceroy, and the Commander-in-chief. This officer discharges his duties with exemplary devotion and energy, and the State Council has great pleasure in recording high appreciation of his valuable services. The fact that 283 major operations (including 19 amputations) were performed without a death reflects very great credit on Dr. Mitra. This is the second year such a thing has occurred, and it is indeed an occurrence that any Surgeon may be congratulated upon. *Annual Administration Reports of the Jammu and Kashmir States, 1891-93*

"Dr. Mitra is highly respected by all communities in Kashmir, and his services are valued in that State. It is not too much to say that he has hardly an enemy, and that is saying a great deal in a Native State. *The Medical Reporter, 16th January, 1894.*

* এই প্রবন্ধ প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ডাক্তার মিত্র মহাশয় শ্রীনগর মিউজিয়মের অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়করূপে কাশ্মীরের শাল ও অন্যান্য সুন্দর সুন্দর শিল্পজাত দ্রব্যের অবনতি ও তন্নিবন্ধন জনসাধারণের দারিদ্র্য সম্বন্ধে একটি অতি মূল্যবান্ পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে আলোচিত হইতেছে।—প্রবাসী-সম্পাদক।

Millet's Angelus.

Every one has heard of the controversy between realism and idealism in art. And yet no picture could offer us stronger proof than the one which is given herewith, that such distinctions are only verities in the hands of little men. For no one could be a greater realist than Jean Francois Millet, the leader of the little group of painters who have made of the French village of Barbizon a sacred name in European Art. No one could be a greater realist. And yet, was there ever such idealism, as casts its glow over his great masterpiece, the Angelus?

The word Angelus, it should be explained, is the name of a prayer, or, rather, of an act of worship. It consists of the words of salutation which the Angel said to Mary, the Blessed Virgin, when he told her that she was to be the mother of the Christ. "Hail Mary! full of grace! The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus!" In a very special sense, this salutation represents to the Christian what may be called the memorial of the Incarnation; it brings him closer than anything else to that mysterious union between the human and the Divine, which according to his belief sums up the mystery of Jesus. Pious Catholics, therefore, make a habit of saying these words over

to themselves at certain definite hours of morning, noon, and evening, and in Catholic countries, or in Catholic religious houses, a public signal is given for the prayer, by the ringing of the church-bell, when all work stops for a moment, while it is quietly repeated.

This is the moment, then, which we witness in this picture. A couple of peasants, hoeing potatoes in a field, are suddenly caught up, by their own simple reverence and the sound of the Angelus-bell, into the great drama of heaven and earth. And we who look at the picture, become aware, not of peasants at all, not of field nor hoe, nor even distant church, but of the far larger and greater truth of a Nation's Labour Sanctified by Prayer.

This picture has always seemed to me to have a special message for the Modern Indian Artist For there is nothing here that did not come to Millet straight from Nature. Everything in the scene is a reproduction from fact. Yet it is fact reproduced, not as by the photograph, but as by the poet, the prophet, the seer. It is Nature and fact *interpreted* by the mind and the heart of a great man.

It is realism. True. But it is also idealism. Ah, is there no scene, no figure in India to-day, that deserves the love that would struggle till it, too, had been expressed as worthily as this?

NIVEDITA OF RK.-V.

শ্রদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতা যে চিত্রটির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তাহার বিষয় এই। একটি কৃষক ও একজন চাষী স্ত্রীলোক দূরাগত উপাসনার ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া, মাঠে গোল আলু তুলিতে তুলিতে, ভক্তিভরে অবনতমস্তকে ভগবান্‌কে স্মরণ করিতেছে। একটি জাতির শ্রম ধর্ম্মের প্রভাবে পবিত্রীকৃত হইয়াছে, ছাবটি দেখিলে ইহাই আমাদের মনে হয়। ভগিনী নিবেদিতা আমাদের আধুনিক শিল্পীদিগকে এই ভাবের ছবি আঁকিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।

প্রবাসী-সম্পাদক।

গ্রন্থ সমালোচনা।

১। একলিপি বিস্তার পরিষদ—সমগ্র দেশে যাহাতে এক অক্ষর প্রচলিত হয় তাহার চেষ্টায় এই পরিষদ বা সভার জন্ম। এই সভার নিয়মাবলী, প্রথম অধিবেশনের বিবরণ, এবং দুইখানি বাঙ্গালা গল্পগ্রন্থের নাগরী অক্ষরে প্রকাশিত সংস্করণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ভারতের উত্তর প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র লইয়া গণনা করিলে, নাগরী অক্ষর অধিক সংখ্যক লোক কর্ত্তৃক ব্যবহৃত। ইংরাজী স্কুল কলেজে যখন সংস্কৃত পড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তখন অনেকের এই ভুল বিশ্বাস ছিল, যে নাগরী-ই প্রাচীন অক্ষর, এবং সংস্কৃত সাহিত্য প্রাচীন কালে ঐ অক্ষরেই লিখিত হইত। সেই বিশ্বাসে সংস্কৃত গ্রন্থগুলি নাগরী অক্ষরে ছাপাইয়া বঙ্গ এবং উৎকল দেশের বিদ্যালয়ে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পূর্ব্বকাল হইতে বঙ্গে এবং উৎকলে প্রাদেশিক অক্ষরেই পণ্ডিতেরা সংস্কৃত গ্রন্থ রক্ষা এবং পাঠ করিয়া আসিতেছিলেন; এবং এখনও অনেক পণ্ডিত নাগরী অক্ষরের সহিত পরিচিত নহেন। পরিষদের কৃতবিদ্য সদস্যদিগের মধ্যে এখনও ঐ ভুল ধারণা আছে; কারণ নিয়মাবলীর প্রথম পৃষ্ঠাতেই পড়িলাম, "অন্যান্য ভাষাওঁ কী পুস্তকোঁ কো সংস্কৃত অক্ষর মে ছাপানা—"। অধিকাংশ লোকের নিকট নাগরী অক্ষর পরিচিত বলিয়া যদি ঐ অক্ষর সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইবার সুবিধা থাকে; এবং ব্যবহৃত হয়, এবং উহাতে যদি জাতীয় একতার সহায়তা সাধিত হয়, তবে আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক ভ্রমটি ইতিহাসের খাতিরে দূর করা প্রয়োজন। নাগরী অক্ষরকে সংস্কৃত অক্ষর বলা চলে না। যে প্রাচীন অক্ষর খৃষ্টোত্তর অষ্টম শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে প্রচলিত ছিল, উহা প্রদেশবিশেষে একটু পরিবর্ত্তিত ভাবে লিখিত হইত। প্রাদেশিক সামান্য পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত যে লিপি পূর্ব্বাঞ্চলে প্রচলিত ছিল, উহারই ক্রম পরিবর্ত্তনে যুগপৎ বঙ্গ এবং উৎকল অক্ষরের উৎপত্তি, এবং যে লিপি মধ্য ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহার পরিবর্ত্তনে নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি। খৃষ্টোত্তর নবম শতাব্দী হইতে নাগরী অক্ষরের উৎপত্তির আরম্ভ। পরে কত দিনের কিরূপ পরিবর্ত্তনে বর্ত্তমান সময়ের নাগরীর পূর্ণ বিকাশ, Dr. Kirste তাহা কিয়ৎপরিমাণে Notes on Indian Paleography প্রবন্ধে গত Oriental Congressএ দেখাইয়াছিলেন। হইতে পারে, যে বঙ্গাক্ষর এবং উৎকলাক্ষর নাগরীর অতি অল্প পরবর্ত্তী, কিন্তু তাহাতেও সন্দেহ আছে। প্রায় একই সময়ে একই প্রাচীন লিপির আদর্শ হইতে এই সকল প্রাদেশিক অক্ষরের বিকাশ। ইতিহাসের বিচারে নাগরী অক্ষরের পক্ষে সম্মানের দাবি অধিক নহে।

অক্ষরের বাধা চলিয়া গেলেই যে বিভিন্ন প্রদেশের লোক এ উহার সাহিত্যপাঠে মনযোগী হইবেন, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। ইংরাজ অধিকারের সময়ের স্কুল কলেজে সংস্কৃত পাঠ হইতে বঙ্গে এবং উৎকলে নাগরী অক্ষর খুব পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হিন্দি বা মহারাষ্ট্র সাহিত্য পড়িবার দিকে বঙ্গের বা উৎকলের লোকের আগ্রহাধিক্য জন্মিয়াছে? মূলতঃ যে প্রকার মিলনের ফলে প্রদেশে প্রদেশে একতার ভাব এবং প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহা না হইলে এক অক্ষরের দ্বারা কিছুই হইবে না। যথার্থ একতা এবং প্রীতির ভাব জাগিয়া উঠিলে অক্ষরের বাধায় মিলনের বাধা জন্মিবে না। তখন হয় ত ষষ্ঠশতাব্দীর সাহিত্য ব্যবহৃত (Literary) প্রাকৃতের মত একটা প্রাকৃত ভাষা জন্মিয়া বিভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে আদর্শ ভাষারূপে জাগিয়া উঠিবে। অক্ষর এক করিতে হইবে বলিয়া যে চেষ্টা হইতেছে, ইহাতেই জাতীয় জাগরণের যে ভাবটা সূচিত হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতের প্রতি আশ্বস্ত হইতে হয়। এ প্রকার অনেক চেষ্টা হয় ত উঠিবে পড়িবে, অনেক অনুষ্ঠিত কার্য্য ভাঙ্গিবে গড়িবে; কিন্তু এই সকল অকৃতকার্য্য চেষ্টা হইতেই ভবিষ্যতের সফলতার জন্ম হইবে।

২। খেয়া—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, ৫৪টি খণ্ড কবিতা সম্বলিত গ্রন্থ। কবি রবীন্দ্রনাথের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও এই কবিতা কয়েকটীর একটু সমালোচনার প্রয়োজন; কেন না অনেকগুলি কবিতাই অনেক পাঠকের নিকট অস্পষ্ট বলিয়া প্রতীত হইবার ভয় আছে। কবিতা হইলেই যে তাহা জলের মত তরল হইবে, পড়িবা মাত্র অর্থ বোধ হইবে, একটুও ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার ভাব সংগ্রহ করিতে হইবে না, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। দুর্ব্বোধ্যতা যথার্থই দোষ, এবং উহাদ্বারা কবির অক্ষমতাই প্রকাশ পায়; কিন্তু অনেক স্থলে ভাবের গভীরতার ফলে

সাধারণ পাঠকেরা সহসা কাব্যমাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারেন না। বিদেশী দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া স্বদেশী সাহিত্য হইতে দৃষ্টান্ত দিয়াই বলিতে পারি, যে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জ্জন এবং দ্বিজেন্দ্রলালের পাষাণী অনেক পাঠক উপরে উপরে পড়িয়াও হয় ত ভাল কাব্য বলিয়া বুঝিতে পারেন, কিন্তু বিশেষ প্রণিধান না করিলে কেহ যথার্থ ভাবগ্রহণ করিতে পারেন না। অনেক শিক্ষিত লোকের মুখে শুনিয়াছি, যে পাষাণী খানি তাঁহাদের ভাল লাগে নাই।

সমালোচ্য কবিতাগুলি যে সকলের কাছে তেমন স্পষ্ট হইবে না, কবি তাহা নিজেই বুঝিয়াছেন; এবং বুঝিয়াছেন বলিয়াই উৎসর্গ-পত্রে এই কার্য্যকে লজ্জাবতী লতার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন:

যত্ন ভরে খুঁজে খুঁজে তোমায় নিতে হবে বুঝে;
ভেঙ্গে দিতে হবে যে তার নীরব ব্যাকুলতা।

জ্ঞানবৃদ্ধেরাই যথার্থ প্রবীণ; কিন্তু দীর্ঘব্যাপী সময়ের প্রভাবে যে প্রাচীনতা টুকু পাওয়া যায় তাহাতেও একটু খানি প্রবীণতা জন্মে। সেই প্রাচীনতা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, যুবকবর্গ অপেক্ষা তাঁহারা হয় ত এই কাব্যের রস অধিক অনুভব করিতে পারিবেন। ঠিক "পারের ঘাটের কিনারায়" না আসুন, কিন্তু যে "ঘরেও নহে পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে", অথবা "দিনের আলো ফুরাল যার, সাঁজের আলো জ্বলল না;" তাহারা বেশী অনুভব করিতে পারিবে। যাহাদের তরী, অনেকের তরীর সঙ্গে একত্রে এক বন্দরে অনেক কাল ছিল, তাহারা যখন দেখিবে যে এখন কত তরী "অস্তাচলে তীরের তলে, ঘন গাছের কোল ঘেঁসে—ছায়ায় যেন ছায়ার মত যায়," তাহাদের প্রাণে একটু বেশী রকম বাধিবে। যাহাদের "শেষ হয়ে গেছে জলভরা আজ," তাহারাই "ঘাটের পথ" তাকাইয়া কাঁদিবে।

যাঁহারা অত্যন্ত স্পষ্টতার প্রার্থী, তাঁহাদের নিকটে হয় ত অনেক কবিতাই উপেক্ষিত হইবে। 'বিদায়', 'কোকিল', 'সমুদ্র' এবং 'সমাপ্তি'র মত খুব স্পষ্ট কবিতা এ গ্রন্থে বেশী নাই। 'গোধুলিলগ্ন' এবং 'হারাধন' খুব অস্পষ্ট না হইলেও অনেককে ঐ সকল কবিতা বুঝাইয়া দিতে হয়। সত্য সত্যই ফুটিতে পারে নাই, কাজেই অস্পষ্টতাদোষে দূষিত হইয়াছে, এরকম কেবল তিনটি কবিতা এ গ্রন্থে আছে, যথা দান, বাঁশি এবং হার। অস্পষ্টতার কথা উঠিয়াছে বলিয়াই ৫৪টি কবিতার মধ্যে তিনটির বিকাশের অভাবের কথা বলিলাম।

কবিব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে একটু আপত্তি করিবার আছে। "সিন্ধু-শকুন" পড়িলে মনে হয়, যেন কবি ইংরাজি Sea-gullটি অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। সংস্কৃতে পাখী অর্থ চলিলেও, শকুন কথাটার বঙ্গ-ভাষায় বড় ভাল ভাব মনে উদয় হয় না। ভারতসমুদ্রের কূলপ্রদেশে ষ্টীমারে যাইবার সময় আমরা গাঙ্গচিল লক্ষ্য করিয়া থাকি; সেটা দেশী। "অন্তর হতে বাহিরে সকলি আলোকে হইল মিশা"; এখানে মিশা কথাটি মিশ্রিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মিশা বা মেশা কথাটা "কাহারো সঙ্গে মেশা," কিম্বা "মেলা মেশা" প্রভৃতিতে চলে। বাঙ্গলায় মিশে যায়, এবং মিশ্রিত হয়, এইরূপ ব্যবহার সঙ্গত। "ফুলগুলি সব নীল নয়নে—কোন ধেয়ানে রতা"; এখানে "রত"র পরিবর্ত্তে "রতা" বসিল কেন? মিলের খাতিরে অতটা বাঁধন ভাঙ্গা সঙ্গত মনে হইল না।

৩। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত (তৃতীয় সংস্করণ)—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নূতন করিয়া সমালোচনা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যথার্থ কথাই বলিয়াছেন যে চরিত বর্ণনের গ্রন্থ রচনায় কোন ব্যক্তি অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তৃতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, "মধুসূদনের লিখিত অনেক গুলি নূতন পত্র ও পত্রাংশ এবারে ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে, এবং পূর্ব্ব দুই সংস্করণে যে সকল ভ্রম ও ত্রুটি ছিল, তাহা যথাসাধ্য দূর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।" এই সংস্করণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবিখানি বড় সুন্দর এবং তাঁহার চরিত্রব্যঞ্জক হইয়াছে। উহাতে আমরা তাঁহার অটল প্রতিজ্ঞা ও সজল চক্ষু একাধারে দেখিতে পাই।

৪। ৺ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী। শ্রীরামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন লিখিয়াছেন, যে তর্কবাগীশ মহাশয় এ দেশের আচার্য্যকুলের শেষ প্রদীপ ছিলেন। অগাধ পাণ্ডিত্য এবং চরিত্রনিষ্ঠার জন্য তর্কবাগীশ মহাশয়ের স্মৃতি এদেশে চিরদিন পূজিত হইবে। সংস্কৃত শিক্ষার্থীগণের নিকট তাঁহার নৈষধের পূর্ব্বার্দ্ধের টীকা এবং রাঘবপাণ্ডবীয় কাব্যের টীকা চিরকাল সহায়রূপে রহিবে। গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছি যে এই গ্রন্থখানি আদৃত হইয়াছে।

৫। অশ্রুবিন্দু শ্রীসরলা দত্ত প্রণীত। কবিতা-গ্রন্থ। গ্রন্থকর্ত্রীর কবিতা লিখিবার বেশ ক্ষমতা আছে। এই গ্রন্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৩৫টি কবিতা আছে।

৬। কাব্যপরিচয় প্রণেতা শ্রীঅম্বিকাচরণ উকিল বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গ্রন্থের ১২টি পদ্য রচনার মধ্যে চারিটি অনুবাদ রচনা। রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গের অযোধ্যাপ্রয়াণের কবিতা মহাকবির অতি মনোহর রচনা। উহার একটি অনুবাদ পড়িয়াছিলাম; সেটি কবি নবীনচন্দ্র দাসের। এ গ্রন্থের এই বিষয়ক কবিতাটি তৃপ্তিপ্রদ হয় নাই। ইংরাজি কবিতার অনুবাদে বা ভাব অবলম্বনে যেগুলি রচিত হইয়াছে তাহাতে তেমন সরসতা নাই। গ্রন্থকারের পদ্য রচনায় ক্ষমতা আছে; হয়ত বিষয়ান্তর অবলম্বনে সেই ক্ষমতা বিকাশলাভ করিতে পারিবে।

৭। সোহাগ এবং ভাগবত স্তোত্র, শ্রীগোসাঁইদাস দে সরকার প্রণীত, কবিতার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইখানি পুস্তিকা। দুখানিই সুলিখিত; গ্রন্থকারের পদ্য রচনা বেশ মধুর।

৮। মাতৃপূজা—সন্তান রচিত এই পদ্যগ্রন্থে কয়েকটি ভাল কবিতা আছে; এবং ভাল হয় নাই, এমন কবিতাও আছে। দেশজাগরণের দিনে অনেকেই হয়ত উৎসাহে একটু তাড়াতাড়ি রচনা করিতেছেন; সেইজন্য এ সকল গ্রন্থ তেমন ভাল হইতেছে না।

৯। রুক্মিণী (কাব্য) শ্রীবিন্দুবাসিনী দাসী প্রণীত। সুশিক্ষিতা লেখিকা, আপনার নামটি আটপৌরে উচ্চারণের অনুরূপ না লিখিয়া বিন্ধ্যবাসিনী লিখিলেই ভাল করিতেন। এই ক্ষুদ্র কাব্যে রুক্মিণী হরণ কথা বেশ সরল পদ্যে লিখিত হইয়াছে।

১০। লেখা (পদ্যগ্রন্থ) শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মিত্র প্রণীত। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে অধিকাংশ কবিতাই তাঁহার বাল্যরচনা। তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইঁহার কবিতা খুব ভাল হইবে আশা করিতে পারি। কয়েকটি কবিতা বেশ সুরচিত; বন্দনা, যমুনা এবং সন্ধ্যা খুব ভাল লাগিল।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মণ্ডলীভুক্ত শ্রীযুক্ত স্বামী অভেদানন্দ প্রায় দশ বৎসর কাল আমেরিকায় বেদান্তসম্মত হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিয়া সম্প্রতি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। গত মাসে তিনি এলাহাবাদে আসিয়া দুটি বক্তৃতা করেন। তিনি দেখিলাম জাতিভেদের এবং "রান্নাঘর গত" হিন্দুধর্ম্মের সমর্থক নহেন। তিনি রাজনৈতিক

স্বাধীনতালাভের জন্য সকলে জাগ্রত হয়, এইরূপ আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বিদেশযাত্রার পূর্ব্বে কিছুকাল এলাহাবাদে থাকিয়া শাস্ত্রাধ্যয়নাদি করিয়াছিলেন। তিনি আমেরিকায় কয়েকটি বেদান্তসভা স্থাপন করিয়াছেন ও নিম্নলিখিত ইংরাজী পুস্তক ও পুস্তিকাগুলি লিখিয়াছেন:—

Cosmic evolution and its purpose. The philosophy of good and evil, Does the soul exist after death? The word and the cross in ancient India, Why a Hindu is a vegetarian, Divine communion, Religion of the Hindus, Why a Hindu accepts Christ and rejects Churchianity, Who is the saviour of souls? Woman's place in Hindu religion, Christian science and Vedanta, Simple living, Spiritualism, How to be a yogi, Divine heritage of man, Philosophy of work, Spiritual unfoldment, Way to the blessed life, Scientific basis of religion, Self-knowledge, Sayings of Sri Ramakrishna.

সম্প্রতি তাঁহার India and Her People নামক একখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে। আমরা এই পুস্তক দেখি নাই। কিন্তু "ইণ্ডিয়া" এবং "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকাদ্বয়ে দেখিলাম যে ইহা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে। ইহাতে লেখক মহাশয় হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন, খৃষ্টান, হিন্দু, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল আদি সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বস্থাপন, নারীগণকে শিক্ষাদান, জনসাধারণকে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে বিনামূল্যে সাধারণ ও শিল্পশিক্ষাদান, প্রভৃতির সমর্থন করিয়াছেন। ইহা (১) আধুনিক দর্শন, (২) ভারতের বর্ত্তমান ধর্ম্ম, (৩) ভারতবাসীর সামাজিক অবস্থা ও জাতিভেদ, (৪) ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলী, (৫) ভারতে শিক্ষা, (৬) পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর ভারতের প্রভাব ও ভারতের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এবং (৭) হিন্দুধর্ম্মে নারীর স্থান, এই কয় ভাগে বিভক্ত।

যে-কেহ বিদেশে ভারতবাসার সুনাম প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

কন্যার প্রতি।

ধে'য়ে, নেচে' নেচে' আয় ওরে দুলালী আমার!
হাসি-হাসি মুখখানি তোর
হেরিলে, নয়ন আমি ফিরা'তে না পারি আর;
তোরে পে'লে হইরে বিভোর!
আয়রে সোনার যাদু, বুকে করে' রাখি তোরে;
গণ্ডে দেই শত চুমা আয়;
দিব আয় রাঙা ফুলে রাঙা দুটি মুঠো ভরে';
আল্‌তা পরা'য়ে দিব পায়।
আয়রে নিষ্পাপ, শুভ্র, অম্লান শিশির-কণা,
আয়রে বুকের ধন, বুকে;—
করি আধ'-কথা শুনে তোর সনে আলাপনা,
ডুবে' যাই তোর প্রেমে সুখে।

সংসার-অরণ্যে হিংস্র জীব করে বিচরণ,
চারিদিকে ওঠে হাহাকার;—
তা'রি মাঝে তোর তরে গড়িয়াছি বাছা-ধন,
স্নেহ দিয়ে ক্ষুদ্র কারাগার।
সেথা তোর নাহি ভয়।—সেথা আমি তোরে লয়ে'
নিরালয়ে ছেলেখেলা করি;—
সেই মধু-সঙ্গে মাগো, ঘৃণিত জগতে র'য়ে
আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে পড়ি।
তোর কাছে রহি যবে, বাল্যকাল পড়ে মনে,
—মনে পড়ে প্রীতির জীবন;
সংসারের হিংসা-দ্বেষ ভুলে' গিয়ে সেইক্ষণে
লভি প্রাণে স্বর্গের কিরণ!

অয়ি ত্রিদিবের দূত, কেন এলি এ জগতে?
এ যে বড় নির্ম্মম প্রবাস!
এখানে বল্‌রে তোরে হিংস্র আক্রমণ হ'তে
কেমনে রক্ষিব বারোমাস?
কখন্ না জানি—যা'ব ডুবিয়া স্রোতের গ্রাসে
এ জীর্ণ জীবন-তরী বে'য়ে।
আমি চিরদিন হায়—রহিব না তোর পাশে,
তুইও র'বিনে মুখ-চে'য়ে!
তখন্—তখন মাগো পুণ্যময়ি, কে তোমারে
রাখিবে ঢাকিয়ে বুক দিয়ে?

যদি মা, যাতনা পে'য়ে ভাসিস্ অশ্রুর ধারে,
সান্ত্বনা লভিবি কোথা গিয়ে?—
বৃথা মোর সে ভাবনা। আছেরে আশ্রয় আছে,
সে আশ্রয়ে হ'বে তোর ঠাঁই!
(চিরদিন সত্যপথে চলিস্ সংসার মাঝে,
দূরে যাবে সকল বালাই।)
যে তোরে পাঠা'ল শিশু, এ ঘোর অরণ্যে তাঁ'র
চরণে রাখিস্ স্থির মতি;
তাঁহারি শরণ নিস্—জীবনের ব্যথা-ভার
বড় তীব্র মনে হয় যদি।

দূর হোক্ মিছে চিন্তা। আয়রে নয়ন-মণি,
আয় মোরা খেলা-ঘর পাতি।
পুতুলে পাড়ায়ে ঘুম, আয় পুঁতি গণি' গণি'
পুতুলের 'বিছে-হার' গাঁথি।

'বিছে-হার' ভালো হ'লে, মোরে কিন্তু দিতে হ'বে
তুই গালে সলোল চুম্বন।
সংগ্রামে বিক্ষত আমি ;—তুই চুমা দিস্ যবে,
আসে প্রাণে নব-সঞ্জীবন !

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

বিদুলা ও সঞ্জয়।

(মহাভারত।)

সঞ্জয়।

সত্য শুনিয়াছ মাতঃ, সিন্ধুরাজ সনে
রণে পরাজিত আমি।

বিদুলা।

হা ধিক্, কেমনে
কহিলি এ কথা তুই ? বহি নত শিরে
পরাভব অপমান, নিজ গৃহে ফিরে
কভু কি ক্ষত্রিয় বীর ? তুই কি সন্তান
দশ মাস দশ দিন লভেছিলি স্থান
ক্ষত্রিয় মাতার গর্ভে ? সৌবীর নৃপতি
জন্মদাতা পিতা তোর ? ওরে মূঢ়মতি,
এরি লাগি বক্ষঃ হতে স্তন্যধারা দানে
পালন করিনু তোরে, এত সাবধানে
রক্ষিনু শৈশবে ? বসি নির্নিদ্র নয়নে
রোগশয্যা প্রান্তে তোর উৎকণ্ঠিত মনে
কাটায়েছি দীর্ঘ নিশা ? জ্ঞানের বিকাশ
হেরি চিত্তে তোর, এত পুণ্য ইতিহাস
শুনায়েছি সযতনে ?

সঞ্জয়।

বৃথা এ গঞ্জনা
হে জননি, লাঞ্ছিতের কেন এ লাঞ্ছনা
দুঃসময়ে ? সাধ করি সম্মুখ সমরে
ভঙ্গ দিয়া কোন্ নর ফিরে আসে ঘরে
কলঙ্ক মাখিয়া মুখে ? কিন্তু প্রতিকূল
দৈব সনে যুদ্ধ, মাতঃ, সে কি নহে ভুল ?
শত্রু করে সুনিশ্চিত যবে পরাজয়
তখনো সংগ্রাম করা—সে কি শুধু নয়
বাতুলতা ? ছিন্ন ভিন্ন চতুরঙ্গ বল
শূন্য রাজকোষ,—মাতঃ, কি আছে সম্বল
যুঝিতে অরাতি সনে ?

বিদুলা।

ভীরু পুত্র মোর,
একি কথা তোর মুখে ! কর্ সুকঠোর
ক্ষত্রধর্ম্ম-আচরণ ; ওরে উঠে আয়,
কে না জানে ক্ষত্রিয়ের প্রধান সহায়
সাহস : সম্বল তার বীর্য্য আপনার ;
পুরস্কার যশোমাল্য। কে করে বিচার
কর্ত্তব্যের শেষ ফল—তুচ্ছ লাভ ক্ষতি ?
বীরধর্ম্ম নাহি চাহে ফলাফল প্রতি।
নহে নিত্য কর্ম্মফল—জানে জ্ঞানিজন,—
কর্ম্ম-অনুষ্ঠান হ'তে তা' বলে' কখন
বিরত কি কভু কেহ ? কখনো সফল
কভু বা বিফল চেষ্টা ; নিশ্চেষ্টতা-ফল
নিশ্চিত অভাব। সাধ কর্ত্তব্য আপন,
শ্যেনসম অতর্কিতে করি আক্রমণ
সিন্ধুরাজ-হস্ত হ'তে বংশের গৌরব
বলে কেড়ে লও বৎস।

সঞ্জয়।

এ যে অসম্ভব !
সুবিশাল সিন্ধুরাজ সেনা, সঙ্ক্ষিপ্ত
সিন্ধুসম ; জেনে শুনে বিনাশ নিশ্চিত
তবু ঝাঁপ দিব তায় ? ভুলি দুরাশায়
হারাইব রাজ্যপাট, আপন ইচ্ছায়
ডাকিয়া আনিব সর্ব্বনাশে ? কর্ত্তব্য এক্ষণে
আত্মরক্ষা তরে সন্ধি।

বিদুলা।

সন্ধি—কার সনে ?
জয়োদ্ধত পররাজ্যলোভী অরাতিরে
সমুচিত শাস্তিদান না করি অচিরে
সন্ধিভিক্ষা, রাজধর্ম্ম ক্ষত্রধর্ম্ম নহে।
হীন, ক্ষুদ্রাশয় যেই, সেই শুধু রহে
পরিতুষ্ট অল্পলাভে গোষ্পদ যেমন
পরিপূর্ণ স্বল্পজলে। ধিক্ সেই জন
মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে যে করে বহন
চির পরপদাশ্রিত নিষ্ফল জীবন
ক্ষত্রকুলে। চিরকাল হ'তে ধূমায়িত
কেবা চাহে ? তা'র চেয়ে দীপ্ত প্রজ্বলিত
হয়ে উঠা—শুধু ক্ষণকালতরে, জেনো
শতগুণে শ্রেয়স্কর। ওরে পুত্র, কেন
বৃথা আত্ম-অবমান, কেন এ দীনতা ?
রণ জিনি' সঞ্জয় নামের সার্থকতা

কর সম্পাদন। হায়, পিতৃরাজ্য তোর—
সোণার সৌবীর রাজ্য—সিন্ধুবাসী চোর
ভুঞ্জিবে বঞ্চিয়া তোরে! যাও বজ্র সম
পড় বিপক্ষের শিরে, প্রকাশি বিক্রম
রক্ষা কর নিজ রাজ্য।

সঞ্জয়।

জানি চিরদিন
স্নেহময়ী মা আমার; কেন এ কঠিন
বাণী আজ তব মুখে! কোথা সেই স্নেহ
লুপ্ত আজি! যদি যুদ্ধে যাই, নিঃসন্দেহ
যাবে প্রাণ। রাজ্য, ধন, সমস্ত ভুবন
একমাত্র পুত্র বিনা হবে না তখন
শূন্যময় তব কাছে? পাষাণ-হৃদয়া
বিমাতা কি তুমি মাতঃ, বিন্দুমাত্র দয়া
নাহি কি পুত্রের তরে?

বিদুলা।

বৎস, স্নেহময়
মাতৃহৃদয়ের কিরে পূর্ণ পরিচয়
এখনও আছে বাকি? আমি মাতা তোর;
কঠিন কর্ত্তব্য, বৎস, তাই আজি মোর
স্বধর্ম্মে রক্ষণ তোরে। স্নেহে অন্ধ হয়ে
যদি মাতা নাহি দেয় পীড়িত তনয়ে
তীব্র তিক্ত মহৌষধ,—সে কি শত্রু নহে?
শোন্ বৎস, পর-পরাক্রম নাহি সহে
কভু যার, তারেই পুরুষ কহে সবে।
পুরুষ যে বীরকুলে, সে কোথায় কবে
হয় পর-অনুগামী? রূপে ও যৌবনে
শিক্ষা দীক্ষা আভিজাত্যে, কে বল ভুবনে
শ্রেষ্ঠ নর তোর চেয়ে? জনম তোমার
যে পবিত্র কুলে, কভু জন্মে নাই আর
কাপুরুষ কেহ তায়। বীরবংশজাতা,
বীরজায়া আমি; ছিল সাধ বীরমাতা
বলি খ্যাতা হব বিশ্বে, চিরদিন তরে
ব্যর্থ হবে সেই আশা!—পশিয়া সমরে
দূর কর এই ক্ষোভ। এখনি সময়
অনুকূল; প্রজাবৃন্দ অনুরক্ত নয়
সিন্ধুরাজ প্রতি। বৎস, সহায়-সম্পদ
এখনও আছে তোর; যুদ্ধবিশারদ
দুঃখে সুখে তুল্য অনুগত বন্ধুগণ
এখনো গ্রহণ করি রণনিমন্ত্রণ
ত্বরিতে মিলিবে সবে আসি দলে দলে
তোর পতাকার তলে। অর্থাভাব বলে'
কেন মিথ্যা ভয়? নহে অক্ষয় কখন
সঞ্চিত ধনের রাশি; অর্থ উপার্জ্জন
তাহাও অসাধ্য নহে। শোন্ বৎস, শোন
সবার অজ্ঞাত আছে বহু গুপ্তধন
মোর কাছে; সে সকলি দিব যুদ্ধ তরে।
জয়ী হয়ে ধন্য হয়ে ফিরিবে সত্বরে
সগৌরবে; পুত্র বলি' করিব সম্মান,
গায়িবে সৌবীর-বালা তোর যশোগান
প্রতি গৃহে।

সঞ্জয়।

দেহ মাতঃ পদধূলি মোরে।
উদ্ধারিব পিতৃরাজ্য সম্মুখ সমরে,
নতুবা ত্যজিব প্রাণ বীরের মতন।
কাপুরুষ বলি খ্যাত হবে না কখন
পুত্র তব। মাতঃ তব অমৃত বচনে
ঘুচিয়াছে অবসাদ; অন্ধ এ নয়নে
দেখিতে পেয়েছি পথ চিরশ্রেয়স্কর।
লভিব উৎসাহভরে হয়ে অগ্রসর
জয়—কিম্বা মৃত্যু-করে অমর গৌরব।
বাঁচিব না মৃতপ্রায় সহি পরাভব।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



দাদাভাই নৌরোজী।

Kuntaline Press, Calcutta.

প্রবাসী

"Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters."

"to look on noble forms
Makes noble thro' the sensuous organism
That which is higher."—*Tennyson.*

৬ষ্ঠ ভাগ। পৌষ, ১৩১৩। ৯ম সংখ্যা।

রামকমল সেন।

আইন্-আক্‌বরী গ্রন্থে সেনবংশীয় রাজাদিগের উল্লেখ দেখা যায়। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদদিগের মত এই যে সেন-বংশ ক্ষত্রিয় বংশ, কিন্তু আইন্-আক্‌বরীর লেখক ইহাঁদিগকে বৈদ্যবংশোদ্ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। সেনবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেন বিদ্যা ও জ্ঞান চর্চ্চার উৎসাহদাতা রূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। বৈদ্যবংশে অনেকগুলি গ্রন্থকারের জন্ম হইয়াছিল। "নিদান"প্রণেতা মাধব কর, "বৈদ্যমধুকোষ"প্রণেতা বিজয় রক্ষিত, "সাহিত্য-দর্পণ" প্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজ, "চক্রদত্ত"প্রণেতা চক্রপাণি দত্ত, এবং "রত্নাবলী"প্রণেতা কবিচন্দ্র, ইহারা সকলেই বৈদ্যবংশীয়।

রামকমল সেনের পূর্ব্বপুরুষগণ বলিতেন যে তাঁহারা বল্লালসেনের বংশধর। রামকমল সেন গরিফা-গ্রামে ১৭৮৩ খৃঃ অব্দের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উহাঁর প্রপিতামহ গরিফা-গ্রামে প্রথম বসতি করেন। রামকমলের পিতার নাম গোকুলচন্দ্র। রামকমলের আর দুইটী সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। মদনমোহন জ্যেষ্ঠ, রামকমল মধ্যম, এবং রামধন কনিষ্ঠ।

যখন রামকমল জন্মগ্রহণ করেন, তখন কলিকাতা গ্রাম হইতে ধীরে ধীরে নগরে পরিণত হইতেছিল। ১৭৭১ সালে, অর্থাৎ রামকমলের ভূমিষ্ঠ হইবার বার বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার এখন যে স্থানে চাঁদপাল ঘাট তাহার দক্ষিণ-ভাগস্থ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড নিবিড় জঙ্গল ছিল। তখন কেবল চিৎপুরের নিকটবর্ত্তী স্বল্প স্থানই কলিকাতা নামে অভিহিত হইত। ক্রমে যতই লোকের বসতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল ততই কলিকাতার আয়তন বর্দ্ধিত আকার ধারণ করিল। ১৭৭৩ সালে সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হইল। ১৭৭৫ সালে পুলিসের সুবন্দোবস্ত হইল। ১৭৮০ সালে সহরের অস্বাস্থ্যকরতা দূর করিবার জন্য রাজপথ পরিষ্কারের বন্দোবস্ত হইল। এই কার্য্যের ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত হইল তাঁহারা "Commissioners of Conservancy" নামে অভিহিত হইলেন। ইহাঁরা ঐ কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য দোকানের ভাড়ার প্রতি টাকায় দুই আনা এবং বাড়ীর ভাড়ার প্রতি টাকায় এক আনা করিয়া কর নির্দ্ধারণ করিলেন। এই সময় হইতে কলিকাতা, দিনে দিনে সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হইয়া উঠিতে লাগিল। কলিকাতা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠাতে এবং ক্রমশঃ বাণিজ্যালয় ও গবর্ণমেণ্ট আফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে চতুর্দ্দিক হইতে বহুলোকসমাগম হইতে

লাগিল। ১৭৯৯ সালে লিখিত কলিকাতার একটী বৃত্তান্তে দেখা যায় যে ঐ সময়ে যে সকল অর্দ্ধশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালী ইয়োরোপীয় বণিকদিগের সহকারী হইয়া বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিতেন তাঁহারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অল্পকাল মধ্যে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিতেন। যাঁহারা এইরূপে ধনী হইয়া উঠিতে লাগিলেন তাঁহারা ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারী ও অন্যান্য ইংরাজদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া নগরের প্রধান লোক এবং সাধারণহিতকর অনুষ্ঠানাবলীর অগ্রণী রূপে সম্মানিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাঁদিগের মধ্যে সুশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বড়ই অল্প ছিল। বস্তুতঃ এই সময়ে লোকশিক্ষার কোন বন্দোবস্তই ছিল না। ১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ সংস্থাপন পর্য্যন্ত ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনুমান হয় ১৭৮০ সালের পর ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রতি লোকের আগ্রহের উদয় হয়। অনেকে পরিচিত ইংরাজগণের নিকটে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতেন। দুই চারিজন ইংরাজ দেশীয় বালকগণের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

রামকমলের পিতা গোকুলচন্দ্র হুগলীতে সেরিস্তাদারের কাজ করিতেন। তিনি পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, কিন্তু ইংরাজী ভাষা জানিতেন না। সেকালে পারসী ভাষাই বঙ্গদেশে আদালতের ভাষা ছিল; ইংরাজী ভাষা না জানিলেও দেশীয় রাজকর্ম্মচারীগণ কার্য্য পরিচালনে অসুবিধা বোধ করিতেন না, কেন না তখনকার সাহেবগণ পারসী বা অন্য কোন ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন। গোকুলচন্দ্র সেরিস্তাদারী করিয়া মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইতেন। রামকমল বাল্যাবস্থায় উপনীত হইলেই তাঁহার পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য এক জন পণ্ডিতের হস্তে অর্পণ করিলেন। রামকমল প্রথম হইতেই পাঠাভ্যাসের প্রতি বিশেষ অনুরাগের পরিচয় দিতে লাগিলেন। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে যে পাঠ দিতেন, রামকমল তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া অধিক পাঠ যাচ্ঞা করিতেন। পণ্ডিত মহাশয় ইহাতে একটু বিরক্ত হইয়াই বলিতেন, "পরিপাক শক্তি বুঝিয়া আহার করা উচিত।"

রামকমলের বাল্যাবস্থায় বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার সুবন্দোবস্ত ছিল না। জনসাধারণ ইংরাজী শিক্ষার আবশ্যকতা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিল, ইংরাজী না শিখিলে অর্থোপার্জ্জনের পথ পরিষ্কৃত হইবে না, ইহা সকলেই বুঝিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবার উপযুক্ত ব্যক্তির বড়ই অভাব ছিল। কোন কোন সাহেব পারিশ্রমিক লইয়া, এবং কোন কোন সাহেব অনুগ্রহ করিয়া বাঙ্গালী বালকগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন। বয়স্ক বাঙ্গালীদিগের মধ্যে কেহ কেহ অল্প মাত্র ইংরাজী শিখিয়া শিক্ষকতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। ক্রমে এই শ্রেণীর লোক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। সে সকল বিদ্যালয় দুই তিনটী মাত্র শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এক বৎসর বা দেড় বৎসর কালে শিক্ষাসমাপ্ত হইয়া যাইত। রামকমল সেন ১৮০১ সালে কলিকাতায় আসিয়া এই প্রকার একটী বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ঐ বিদ্যালয়টী "রামজয় দত্তের স্কুল" নামে বিদিত ছিল। উহা কলিকাতার কলুটোলা নামক পল্লীতে সংস্থিত ছিল। রামকমল সেন বলিয়াছিলেন যে ঐ স্কুলে ইংরাজী ব্যাকরণ ইতিহাস বা ভূগোল প্রভৃতি কিছুই শিক্ষিত হইত না, কেবল কয়েকখানি ইংরাজী গল্পের পুস্তক পঠিত হইত। তিনি ঐ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার কালে তথায় ইংরাজী আরব্য উপন্যাস পঠিত হইতেছিল। রামকমল এই বিদ্যালয়ে অন্যূন দেড়বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। তৎপরে চাকুরীর চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি যেটুকু ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাই চাকুরী প্রাপ্তির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিল। ১৮০২ সালে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি মিষ্টার নেমি নামক একজন ইংরাজ কর্ম্মচারীর কেরাণীর পদে নিযুক্ত হয়েন। সাহেব কলিকাতার প্রধান মেজিষ্ট্রেট্ ব্লাকোয়ার (Blacquiere) সাহেবের সহকারী ছিলেন। কয়েক মাস কাল এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া রামকমল গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী আর্ ব্লেচিন্‌ডেন সাহেবের অধীনে শিক্ষানবীশ হয়েন। পরে ১৮০৪ সালে তিনি মাসিক আট টাকা বেতনে "হিন্দুস্থানী প্রেস্" নামক মুদ্রাযন্ত্রে কম্পোজিটারের কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৮০৮ সালে "চাঁদনী হাঁসপাতালে" কিঞ্চিৎ অধিক বেতনে কেরাণীর কাজ প্রাপ্ত হয়েন। ১৮১২ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে কেরাণীর কাজ করিতে আরম্ভ করেন। কালেজের

অধ্যক্ষ কর্ণেল র্যামজে রামকমলের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ১৮১৯ সালে রামকমল ডাক্তার এইচ্ এইচ্ উইলসন সাহেবের প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়েন। তিনি রামকমলকে মাসিক বার টাকা বেতনে এসিয়াটিক্ সোসাইটীর এক কেরাণীর পদে নিযুক্ত করেন। এই সময়ের মধ্যে রামকমল স্বীয় ঐকান্তিকতা ও অধ্যবসায়ের গুণে ইংরাজী ভাষায় সুন্দররূপে কথোপকথন করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার কার্য্যনিপুণতা ও অন্যান্য সদগুণের পরিচয় পাইয়া ডাক্তার উইলসন্ তাঁহাকে এসিয়াটিক্ সোসাইটীর দেশীয় সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করিলেন। পরে রামকমল এই সোসাইটীর Council বা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সম্মানিত সভ্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে ডাক্তার উইলসনেরই সহায়তায় রামকমল উচ্চ বেতনে টাঁকশালের দেওয়ানের পদ লাভ করেন। এই পদে তিনি অসাধারণ পারগতার পরিচয় দেন। এখানে তিনি যে সুখ্যাতি লাভ করেন, তাহারই বলে কয়েক বৎসর পরে তিনি ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গলের দেওয়ানের পদে উন্নীত হয়েন। এখানে তিনি যে সতর্কতা, বিচক্ষণতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সততার পরিচয় দেন তাহা ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ-পদস্থ সাহেবদিগের বিশেষ প্রীতিকর ও সন্তোষকর হইয়াছিল। মিষ্টার জর্জ্জ অড্নি (Mr. George Udny) তখন ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি রামকমলের কার্য্যক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে কোন বিষয় লইয়া রামকমলের সহিত অড্নি সাহেবের মনান্তর ঘটে। ইঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে বিরোধের বিষয়টা ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ-(Directors) সমক্ষে বিচারার্থ উপস্থিত হয়। তাঁহাদিগের বিচারে রামকমলেরই সম্পূর্ণ জয় হয়। রামকমলের প্রতি অধ্যক্ষগণের অসীম বিশ্বাস ছিল। যখন অধ্যক্ষগণের সভার অধিবেশন হইত, তখন তাঁহারা তাঁহাদিগকে সৎপরামর্শ দিবার জন্য রামকমলকে প্রায়ই আহ্বান করিয়া লইয়া যাইতেন।

রামকমলের সাংসারিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাধারণহিতকর, দেশের উন্নতিসাধক কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। স্বদেশবাসীগণ সর্ব্ববিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে ইংরাজদিগের সমকক্ষ হইয়া উঠুক, এই উচ্চ বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী ছিল এবং ইহা চরিতার্থ করিতে তিনি যেমন আগ্রহ প্রকাশ করিতেন তেমনি আনন্দও অনুভব করিতেন। শিক্ষার বিস্তারই এ দেশের পক্ষে সকল মঙ্গলের আকর, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই নিমিত্ত তিনি এই উদ্দেশ্যসাধক সকল অনুষ্ঠানে উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন এবং সেই সকল অনুষ্ঠান যাহাতে সুসিদ্ধিলাভ করে, তজ্জন্য পরিশ্রম ও অর্থসাহায্য করিতে কিছুমাত্র এবং কখন পরাঙ্মুখ হইতেন না। ঐ সময়ে শিক্ষাপ্রণালীসম্বন্ধে ইংরাজ ও বাঙ্গালীদিগের মধ্যে দুইটী সম্প্রদায় হইয়াছিল। এক সম্প্রদায় বলিতেন যে এ দেশে কেবল ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক; সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং প্রচলিত দেশীয় ভাষা সমূহ শিক্ষা দিবার কোন প্রয়োজন নাই। অপর সম্প্রদায়ের এই অভিমত ছিল যে উভয় ইংরাজী এবং সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যাদি শিক্ষা দেওয়া যুক্তিসম্মত। রামকমল সেন এই শেষোক্তদলভুক্ত ছিলেন। ডাক্তার এইচ্ এইচ্ উইলসন্ সাহেবও এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষা শিক্ষার পথ বন্ধ করিয়া দিলে দেশের প্রকৃত উন্নতির পথে যে ঘোর অন্তরায় উপস্থিত হইবে তাহা সপ্রমাণ করিয়া উইলসন সাহেব রামকমলকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি তারিখে কলিকাতা নগরীতে হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কালেজের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য ("Managing Body") বা "কার্য্যনির্ব্বাহক সভা" নামে একটী কমিটী নিযুক্ত হয়। এই সভা সংস্থাপিত হইবার পর হইতেই রামকমল সেন ইহার একজন সভ্য হয়েন। হিন্দুকালেজ স্থাপনে যাঁহারা সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন, রামকমল সেন তাঁহাদের অন্যতম। কার্ (Kerr) সাহেব প্রণীত ("Review of Public Instruction") শিক্ষাবিভাগের কার্য্যবিবরণীতে ইহা বিবৃত হইয়াছে। রামকমল যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন হিন্দুকালেজের শিক্ষাকার্য্য যাহাতে সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। যখন ডিরোজিও সাহেব ছাত্রদিগকে নাস্তিকতা ও সংশয়বাদ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন* তখন যাঁহারা ঐ প্রকার

* "তাঁহার [ডিরোজিওর] প্রতি যে যে দোষারোপ করা হইয়াছিল

শিক্ষার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন তাঁহাদিগের মধ্যে রামকমল সেনের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ডিরোজিও সাহেবকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব তিনি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ সালে রামকমল "শিক্ষাসভা" বা "Council of Education"এর সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন। এই সময়ে সার এডওয়ার্ড রায়েন, সি, এচ্, কেমারন্, ডাক্তার গ্রাণ্ট এবং অন্যান্য খ্যাতনামা, ভারতবাসীদিগের শিক্ষার উন্নতিসাধনে তৎপর ইংরাজ এই সভার সভ্য ছিলেন। যে বৎসর হিন্দুকালেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৎসরেই "স্কুল বুক সোসাইটী" সংস্থাপিত হয়। স্কুলসমূহে পাঠোপযোগী পুস্তক নির্দ্ধারণ করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। রামকমল সেন ইহারও একজন প্রধান কর্ম্মশীল সভ্য ছিলেন।

কলিকাতার মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সূচনা স্বরূপ লর্ড উইলিয়াম্ বেণ্টিঙ্ক একটী কমিটী নিযুক্ত করেন। দেশীয় যুবকগণকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা প্রদানের ঔচিত্যানুচিত্য বিচার করাই এই কমিটীর উদ্দেশ্য ছিল। রামকমল সেন এই কমিটীর অন্যতম সদস্যরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৩৫ সালে কলিকাতার উত্তরাংশ অর্থাৎ এ দেশবাসীগণের বসতিপূর্ণ অংশের মধ্য স্থলে একটী চিকিৎসালয় স্থাপনের প্রস্তাব হয়। ঐ সময়ে ডাক্তার মার্টিন নামে কলিকাতায় একজন সদাশয় ও সুবিজ্ঞ ইংরাজ চিকিৎসক ছিলেন। তিনিই এই প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করেন। রামকমল সেন এই প্রস্তাব বিশেষ ভাবে সমর্থন করিয়া দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন। উহা পাঠে তাঁহার সদ্বুদ্ধি, কুসংস্কারশূন্যতা এবং নগরবাসিগণের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে আগ্রহের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। চিকিৎসালয় স্থাপনের প্রস্তাবের সহিত নগরের স্বাস্থ্যোন্নতির বিশেষ সম্বন্ধ থাকাতে তিনি তৎসম্বন্ধে নানা উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে রামকমল সেনের মন্তব্য পাঠ করিয়া প্যারীচাঁদ মিত্র বলিয়াছিলেন যে কলিকাতার মিউনিসিপালিটী কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যাহা কিছু করিতেছেন তৎসমস্তের ভিত্তি রামকমল সেনের ঐ মন্তব্যপত্র। কলিকাতায় মিউনিসিপালিটী সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে জষ্টিস্ অব্ দি পীস্ গণের কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যে নাগরিক সভা ছিল প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার সভ্য ছিলেন। সুতরাং মিত্র মহাশয় রামকমল সেনের উক্ত মন্তব্য পত্রে যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহা অগ্রাহ্য হইতে পারে না।

চিকিৎসালয় স্থাপনোদ্দেশে একটী সাধারণ সভা হয়। ঐ সভার প্রার্থনানুসারে গবর্ণমেণ্ট একটী কমিটী নিযুক্ত করেন। কমিটীর সভ্যগণের মধ্যে রামকমল সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, সার্ এড্ওয়ার্ড রায়েন্, সার্ জন গ্রাণ্ট, ডাক্তার মার্টিন প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়। কমিটী সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। গবর্ণমেণ্টও সবিশেষ অর্থসাহায্য করেন। পরে এই কমিটী ও গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা ও যত্ন ও সাহায্যে কলিকাতা মেডিকেল কালেজের সহিত সংশ্লিষ্ট চিকিৎসালয়টী সংস্থাপিত হয়।

জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতিবিধান সম্বন্ধে রামকমল সেনকে বিশেষ চেষ্টাবান দেখিয়া কলিকাতার শিক্ষিত ইংরাজসম্প্রদায় তাঁহাকে তাঁহাদের তৎকালীন প্রধান বিদ্যালয়ের কমিটীর সভ্যরূপে নিযুক্ত করেন। ঐ বিদ্যালয় "Parental Academy" নামে অভিহিত হইত। উহারই বর্ত্তমান নাম Doveton College ডব্‌টন্ কলেজ। উক্ত কমিটীর সভ্যরূপে রামকমল উক্ত বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। কলিকাতার "District Charitable Society" নামে সর্ব্বজাতীয় দীন, দরিদ্র, দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিবার জন্য যে বৃহৎ সভা আছে, ঐ সভা স্থাপনের অব্যবহিত পরেই রামকমল সেন উহার সভ্য পদে বরিত হয়েন। এই সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, রামকমল সেন তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া প্রভূত উৎসাহের সহিত এই সভার কার্য্য-বিস্তার উদ্দেশে পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করেন। সভার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তিনি দেশের ধনী ও অর্থবান লোকদিগের নিকট অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করেন। এ সম্বন্ধে তিনি যে আবেদন পত্র প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে

তিনি সে সমুদয় দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিলেন। বলিলেন তিনি কখনই নাস্তিকতা প্রচার করেন নাই, তবে ঈশ্বরের সপক্ষ বিপক্ষ দুই যুক্তি তুলিয়া বালকদিগকে বিচার করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন বটে"। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ১১৩ পৃঃ।

তাঁহার সহৃদয়তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। রামকমলের চেষ্টায় অনেক ধনশালী বাঙ্গালী সভার ধনভাণ্ডারে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ সালে রামকমল সেন এই সভার সহকারী সভাপতি পদে নিযুক্ত হয়েন। এই Societyর অধীনে দরিদ্র ইয়োরোপীয়দিগের বাস ও সাহায্য জন্য Alms House নামে কলিকাতায় যে প্রকাণ্ড আশ্রম আছে তাহা যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের উপর স্থাপিত তাহা রামকমল সেনেরই দান। District Charitable Societyর শৈশবাবস্থায় রামকমল সেনের ন্যায় উদ্যোগী ও উৎসাহী দেশীয় সভ্য না থাকিলে উহার বর্ত্তমান সমৃদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে অনেক কালবিলম্ব ঘটিত সন্দেহ নাই।

শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টীয়ান্ ধর্ম্মপ্রচারকগণের নেতা ডাক্তার উইলিয়ম্ কেরি বিবিধ প্রকারে বঙ্গদেশের মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। উইলকিন্স সাহেব বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবন করিবার পর উহা বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল; কেরি সাহেবই তাহা পুনঃ সংস্থাপন করেন। বঙ্গভাষায় পণ্ডিতদিগের দ্বারা গ্রন্থ রচনা করাইয়া এবং নিজে ঐ ভাষায় ধর্ম্মপুস্তক লিখিয়া বঙ্গভাষার গদ্য সাহিত্যের সেই শৈশব কালে কেরি সাহেব উহার যে পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। কেরি ও তাঁহার সহযোগী মার্শম্যান সাহেবকে বাঙ্গলা দেশের তৎকালীন জনসাধারণ বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি বিদ্রূপ করিবার জন্য নহে, পরন্তু উক্ত মহাত্মাদ্বয় এবং হেয়ার্, কলবিন্ ও পামার সাহেবদিগের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল;—

"হেয়ার্ কল্‌বিন্ পামারশ্চ, কেরি মার্শম্যান স্তথা।
পঞ্চ গোরা স্মরে ন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥"

এই কেরি সাহেব ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইলেও সেকালের সকল শিক্ষিত ও পদস্থ বাঙ্গালী তাঁহার নানা কার্য্যের সহযোগিতা করিতেন। এ দেশের কৃষির উন্নতি সাধনার্থ কেরি সাহেব "Agricultural and Horticultural Society of India"নামে একটী সভা সংস্থাপন করেন। গবর্ণর জেনেরল হইতে সামান্য সিবিলিয়ান পর্য্যন্ত বহু ইংরাজ এবং ইংরাজী-শিক্ষিত বহু বাঙ্গালী ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েন। এই সভা সেদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। ইহা দ্বারা কৃষি সম্বন্ধে উন্নতিকর নানা সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। রামকমল সেন কেরি সাহেবকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি উক্ত সভা সংস্থাপন করিলে সেন মহাশয় আগ্রহের সহিত উহার কার্য্যে যোগদান করেন। ১৮২৯ সালে তিনি ঐ সভার দেশীয় বা অন্যতর সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। এই সভার মাসিক বা ত্রৈমাসিক অধিবেশনে সভ্যগণ কৃষি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। ঐ সকল প্রবন্ধ সভার বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশিত হইত। রামকমল সেন এই সভার কোন এক অধিবেশনে বঙ্গদেশে কাগজ প্রস্তুত করা সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পাঠের কিছু কাল পূর্ব্বে হইতে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ একটী কাগজ প্রস্তুতের কারখানা খুলিয়াছিলেন। এইরূপ কারখানা ভারতের সর্ব্ব স্থানে স্থাপন করিবার আবশ্যকতা এবং সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে রামকমল সেন স্বরচিত উক্তবিষয়ক প্রবন্ধে স্বীয় মন্তব্য ব্যক্ত করেন। ১৮৪৪ সালে সেন মহাশয় কৃষি-সভার সহকারী সভাপতির পদে উন্নীত হয়েন।

রামকমল সেন শিক্ষার উন্নতি সাধন যে দেশহিতকর একটী প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন তাহার অনেক নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত ইংরাজী বাঙ্গালা অভিধান ঐ নিদর্শনের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে। এই অভিধান প্রণয়নে তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল (অভিধান খানির প্রথম সংস্করণের একখণ্ড আমি দেখিয়াছি)। উহা সাতশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইংরাজী ১৮৩০ শালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পরে যে কয়েক খানি ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলির ভিত্তি ও প্রধান অবলম্বন রামকমল সেন প্রণীত উক্ত অভিধান। এই অভিধান গ্রন্থ সে কালের ইংরাজী ভাষা শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়াছিল। ইয়োরোপীয় খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মপ্রচারকগণ ও ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীগণের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন তাঁহারা এই অভিধান অতীব মূল্যবান জ্ঞান করিতেন। শ্রীরামপুরের সুপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টীয়ান মিশনারিগণ এই অভিধানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্যতম মিশনারি জে, সি, মার্শম্যান্ সাহেব এই অভিধান সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন;—"এমত

সম্পূর্ণ ইংরাজীবাঙ্গালা অভিধান আর নাই। ইহা অতি মূল্যবান গ্রন্থ। ইহা রামকমল সেনের পরিশ্রমক্ষমতা, বিদ্যোৎসাহ, ও গভীর পাণ্ডিত্যের চিরস্থায়ী নিদর্শন স্বরূপ বর্ত্তমান থাকিবে। রামকমল সেনের এই কার্য্যই তাঁহার নাম বঙ্গবাসীর মধ্যে চিরজাগত রাখিবে।*" মার্শম্যান সাহেব যে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা সার্থক হইয়াছে বলা যাইতে পারে, কেননা অদ্যাপি রামকমল সেনের নাম করিলেই তিনি সর্ব্বপ্রথমেই ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান প্রণেতারূপেই আমাদিগের মনশ্চক্ষুর সমক্ষে আবির্ভূত হয়েন।

রামকমল সেন প্রণীত অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ অদ্যাপি প্রকাশিত হইয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। উহার আখ্যান-পত্রে প্রণেতারূপে রামকমলের নামের সহিত কেরি সাহেবের নামের উল্লেখ দেখা যায়। এই কেরি সাহেব সুবিখ্যাত মিশনারি ডাক্তার উইলিয়ম কেরি নহেন; ইনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফেলিক্স্ কেরি (Felix Carey)। যুবক কেরি রামকমল সেনের সহিত মিলিত হইয়া অভিধান রচনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু একবৎসর কাল অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন অভিধান গ্রন্থের একশত পৃষ্ঠারও মুদ্রনকার্য্য সমাপ্ত হয় নাই। ১৮২২ সালে এই ঘটনা ঘটে। রামকমল এই সময়ে গুরুতর সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হয়েন, সুতরাং অভিধান রচনা স্থগিত থাকে। ১৮৩০ সালে তিনি এই কার্য্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হয়েন, এবং একাকী প্রভূত পরিশ্রম করিয়া অভিধান সম্পূর্ণ করেন।

এশিয়াটিক সোসাইটীর সভ্যরূপে রামকমল সেন কয়েকটী প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধগুলি সভার অধিবেশনে পঠিত হয়। চড়ক পূজা সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ পূজা সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছিল; তৎকালে চড়ক পূজায় যে সকল যন্ত্র ও অস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত তিনি তৎসমস্তের যথাযথ ও বিশদ বর্ণনা করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটী সভ্যগণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৮২৯ সালের প্রারম্ভে তিনি ঐ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি রামকমল সেনের গভীর অনুরাগ ও ভক্তি ছিল। সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিত অধ্যাপকগণের সহিত সাহিত্য চর্চ্চায় কালক্ষেপণ করিতে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। এই নিমিত্ত তিনি সংস্কৃত কালেজের নিকট একটা বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তথায় পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া নিভৃতে তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিতেন। সংস্কৃত কালেজের কমিটীর সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইয়া রামকমল কালেজের উন্নতিবিধানার্থ সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

হোরেশ্ হেমেন্ উইলসন্ সাহেব সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ইংরাজী ভাষায় সংস্কৃত নাটকাবলীর বহুল অংশ অনুবাদ করেন। ঐ অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছিল। অদ্যাবধি ঐ অনুবাদগুলির আদর আছে। উইলসন্ সাহেব সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হিন্দুর নানা শাস্ত্র ও গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় গবেষণাপূর্ণ বিবিধ উপাদেয় প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উইলসন্ সাহেব রামকমল সেনের সহিত অকৃত্রিম ও গভীর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। উইলসন্ সাহেব বিলাত প্রত্যাগমন করিয়া রামকমল সেনকে সর্ব্বদা পত্র লিখিতেন। ঐ সকল পত্রের যে দুইচারি স্থলে রামকমল সেনের চরিত্র ও কার্য্যের পরিচায়ক কথা আছে, সেই স্থলগুলির ভাবার্থ অনুবাদ করিয়া দিতেছি :—

"নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিব, ইহা আমি কখনও কল্পনাও করিনা। কিন্তু আমি কর্ম্মপ্রিয় হইলেও, তুমি যেরূপ পরিশ্রমী ও কর্ম্মশীল, সেরূপ হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে। এই লণ্ডন নগরবাসীদিগের অনেক দোষ, অনেক ত্রুটী; ইহাদিগের সঙ্গ আমার প্রীতিকর নহে। বলিতে কি তোমার ন্যায় ভারতবাসী বন্ধুগণকেই আমি অধিক পছন্দ করি। ট্রেবিলিয়ান সাহেব সংস্কৃত চর্চ্চার পথ বন্ধ করিবার জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে তুমি যে মত প্রকাশ করিয়াছ তাহা সম্পূর্ণরূপে ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত। সংস্কৃত কালেজ ও মাদ্রাসার বিলোপসাধন করিলে বাস্তবিকই ভারতবাসীগণের প্রকৃত শিক্ষা হইবেনা।" "Oriental Text Society'র সম্পাদকের নামে তুমি যে পত্র লিখিয়াছ তাহা পাইয়াছি। ঐ সভার আগামী অধিবেশনে আমি উহা সভার সমক্ষে উপস্থিত করিব। তুমি সভার উন্নতি কল্পে যে অর্থদান করিয়াছ তজ্জন্য সভা বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ হইবে। তোমাকে সভার কলিকাতাস্থ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার জন্য আমি সভার আগামী অধিবেশনে প্রস্তাব করিব।

* The fullest and most valuable work of its kind which we possess. It will be the most lasting monument of his industry, zeal and erudition. It is perhaps the work by which his name will be recognised by posterity.

সভার উদ্দেশ্য সাধন জন্য কলিকাতায় যাহা কিছু করা আবশ্যক তৎসমস্তের সম্পূর্ণ ভার তোমার উপরই অর্পিত হইব।"

রামকমল সেন কলিকাতায় ইংরাজসমাজে বিশেষ সমাদৃত হইতেন। ইংরাজদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া মিষ্টান্নাদি ভোজন ও জলপান করাইতেন, কিন্তু কখন ইংরাজবন্ধুর ভোজে মদ্যমাংসের আয়োজন করিতেন না। নিজের ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ইংরাজের মনস্তুষ্টি করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতনা।

রামকমল ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিবিধ সৎ কার্য্যের জন্য উক্ত গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল কামনা করিতেন, কিন্তু তাহা বলিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কোন অন্যায় কার্য্যের পোষকতা করিতেন না। ১৮৩৯ সালে যখন কলিকাতার জমীদার সভা (Landholders' Society) গবর্ণমেণ্টের কোন কোন অন্যায়াচরণ সম্বন্ধে ঘোর আন্দোলন করিতে আরম্ভ করেন, তখন রামকমল সেন তাঁহাদিগের সহিত একমত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন।

রামকমল সেন ক্রমে কলিকাতার একজন শীর্ষস্থানীয় সুশিক্ষিত, সদ্বিদ্বান, সর্ব্বজনসম্মানিত, সম্ভ্রান্ত, সাধুপুরুষ রূপে প্রখ্যাত হয়েন। যুবা, প্রবীণ, বৃদ্ধ বহুলোক তাঁহার নিকট হইতে সুপরামর্শ গ্রহণাভিলাষী হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকট সমাগত হইতেন। অনেকানেক ধনী, পদস্থ সম্ভ্রান্ত নগরবাসী তাঁহার বন্ধুত্ব লাভাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাহার সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতেন। বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও ধনী মতিলাল শীল তাঁহাকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার সঙ্গলাভে পরম প্রীতিলাভ করিতেন। স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। গবর্ণর জেনেরাল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক মধ্যে মধ্যে বিবিধ বিষয়ে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদানীন্তন ইংরাজ-পরিচালিত প্রধান ইংরাজী সংবাদপত্র "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" লিখিয়াছিলেন :—

"His mansion in Colootolah was the resort of the wealthy and the learned and the fame of his greatness spread far and wide through Bengal." অর্থাৎ "তাঁহার কলুটোলাস্থ ভবন সহরের ধনী ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণের সম্মিলিত হইবার স্থান হইয়া উঠিয়াছিল এবং সমস্ত বঙ্গে তাঁহার অসাধারণ গুণাবলীর সুযশ প্রচারিত হইয়াছিল।"

রামকমল পরম বন্ধুপরায়ণ ছিলেন। বন্ধুতার প্রণয় ও বিশ্বাস তাঁহার চরিত্রে পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছিল। একবার তাঁহার এক ইংরাজ বন্ধু রামকমলকে তাঁহার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকার জামিন দিতে অনুরোধ করেন। রামকমল দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন।

রামকমল সেন স্বজাতীয় অর্থাৎ বৈদ্যজাতিভুক্ত কলিকাতা ও সংরতলী নিবাসী সমস্ত লোককে বিশেষরূপে বন্ধুত্ব-পাশে আবদ্ধ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। প্রতি বৎসর একবার তিনি স্বজাতীয়গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় ভবনে সমাদরে ভোজন করাইতেন। প্রায় বার শত বৈদ্য ঐ দিবসে তাঁহার বাটীতে জলযোগ করিতেন। ইঁহাদিগকে পত্র দ্বারা বা আত্মীয় বা কর্ম্মচারী দ্বারা নিমন্ত্রণ করা ভদ্রতানুযায়ী অথবা সম্পূর্ণ প্রীতিভাবের পরিচায়ক মনে করিতেন না। তজ্জন্য স্বয়ং প্রত্যেকের বাটী গমন করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতেন। সহৃদয়তার পরিচায়ক এই প্রথা আজ কাল বঙ্গের হিন্দুসমাজে বিলোপ প্রাপ্ত হইবার সূচনা দেখা যাইতেছে। রামকমল সেনের দৃষ্টান্তের শিক্ষা আধুনিক বঙ্গসমাজে প্রবর্ত্তিত হইলে উক্ত দুর্নীতি বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা আশা করা যাইতে পারে।

গভীর স্বধর্ম্মানুরাগ রামকমল সেনের চরিত্রের একটী প্রধান বিশেষত্ব। তিনি বৈষ্ণব বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া এক জন আদর্শ বৈষ্ণবের অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ে তিলমাত্র কপটতা বা বাহ্যিকতা স্থান পাইত না। ভক্ত বৈষ্ণব বলিয়াই তিনি কখন আমিষ আহার্য্য দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না, চিরকালই নিরামিষাশী ছিলেন। তৃণের ন্যায় নম্র ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। তিনি অতি বিনম্রস্বভাব ছিলেন। আহার বিহারে কখন কিছুমাত্র বিলাসিতা বা জাঁকজমকপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যাইত না। সন্ধ্যার পর পুরাণপাঠশ্রবণে বহুক্ষণ ক্ষেপণ করিতেন, কিম্বা পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রালাপ ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন। আহারের পূর্ব্বে কিয়ৎক্ষণ ভগবানকে স্মরণ করিতেন। ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকিতে বিশেষ আনন্দ

লাভ করিতেন। প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন যে রামকমল সেন ভগবানের ধ্যানে বহুক্ষণ নিমগ্ন থাকিয়া যখন উপলব্ধি করিতেন যে উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তখন তিনি ধর্ম্মসঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপে তিনি যে সকল ধর্ম্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় সেগুলি সংরক্ষিত হয় নাই। পুত্রপৌত্রাদিগণ যাহাতে ধর্ম্মানুরাগী হয় তজ্জন্য তাহাদিগের বাল্যাবস্থায় তিনি তাহাদিগকে প্রত্যহ নিকটে বসাইয়া ভগবানের নাম জপ করিতে শিক্ষা দিতেন। হরিসংকীর্ত্তনাদিতে নিমগ্ন হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেন। বৈষ্ণবোপযোগী আচার ব্যবহার হইতে তিনি ভ্রষ্ট হইতেন না। তিলক ধারণ করা ধর্ম্মকার্য্যের মধ্যে গণনা করিতেন। প্রত্যহ অতি ভক্তিভাবে পূজা করিতেন। দৃঢ়ভাবে একাদশী ব্রত পালন করিতেন। ইহাঁর দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেন ইহাঁরই ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ ভক্ত বৈষ্ণবভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক কেশবচন্দ্র সেন প্যারীমোহনের দ্বিতীয় পুত্র। রামকমল ও প্যারীমোহনের ধর্ম্মভাব ঘনীভূত হইয়া কেশবচন্দ্রে প্রকাশিত হয়। বাল্যকাল হইতেই কেশবচন্দ্র ধর্ম্মপ্রবণতার পরিচয় দেন। রামকমল পুত্র প্যারীমোহনকে বলিতেন,—"দেখ, প্যারী, তোমার ছেলে বেসো (কেশবচন্দ্রের গুরুজন তাঁহাকে "বেসো" বলিয়া ডাকিতেন) বড় লোক হবে; ও এক জন ধর্ম্মসংস্কারক হবে।" কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া, পিতা ও পিতামহ হইতে প্রাপ্ত সংস্কারবশে হরিসংকীর্ত্তন, খোলকরতালের ব্যবহার প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম্মসুলভ রীতি ও ভাবের প্রবর্ত্তন করেন। প্রায় পঞ্চত্রিংশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত "ভক্তিচৈতন্য চন্দ্রিকা" নামক গ্রন্থের সূচনায় এ বিষয় সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের মধ্যেও অনেকেই বৌদ্ধভাববিশিষ্ট শুষ্ক নিরাকারবাদী, হরির মাধুর্য্যরসে বঞ্চিত, তর্কবিতর্ক মতামতের বিবাদই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব। তবে ইদানীং কয়েক বৎসর হইতে গোস্বামিশিষ্য পরমবৈষ্ণব শ্রীযুক্ত রামকমল সেনের পৌত্র ব্রহ্মানন্দ শ্রীমান কেশবচন্দ্র সেন নীরস জ্ঞানকাণ্ডের স্রোত ফিরাইয়া দিয়া নিরাকার চিন্ময় অনন্ত ব্রহ্মেতে ভক্তি প্রেম অর্পণ করিবার শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহার ব্যবহার ও দৃষ্টান্ত শিক্ষা ও ভক্তিপথের অনুকূল বটে; তিনি কতক পরিমাণে এ বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।"

রামকমল সেন নিজে পরম বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু ভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বীকে কিছুমাত্র বিদ্বেষচক্ষে দেখিতেন না। সে সময়ে মধ্যবিৎ বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামকমল ইহাঁদিগের প্রতি সদয় ব্যবহারই করিতেন। একবার তাঁহার একজন পরিচিত ব্যক্তি খ্রীষ্টিয়ান হন; ঐ ব্যক্তির সম্পর্কীয় সকল লোককেই তাঁহাদের স্বজাতিয়গণ জাতিচ্যুত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন। রামকমল সেন বিশেষ চেষ্টা করিয়া এরূপ নির্যাতন হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। ইহা তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে উদারতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রামকমল সেন যেমন কর্ম্মঠ ছিলেন, কর্ম্মে তেমনি তাঁহার অনুরাগ ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধাবস্থায় স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ক্রমে পরিশ্রম হ্রাস করা প্রয়োজন, কিন্তু এমনিই তাঁহার কর্ম্মানুরাগ যে বয়ঃক্রম যখন ষাট বৎসর অতীত হইল তখনও তিনি প্রৌঢ়াবস্থার ন্যায় অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। যে বহুসংখ্যক সাধারণ-হিতকর কালেজ, বিদ্যালয়, সভা সমিতির তিনি প্রধান কর্ম্মশীল সভ্য ছিলেন, তাহাদের সকলের কাজই পূর্ব্ববৎ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। প্রধানতঃ এই কারণে তিনি একষটি বৎসর বয়সে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসক সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে আদেশ করিলেন। তিনি স্বাস্থ্যকর স্থানে জলবায়ু পরিবর্ত্তন জন্য গমন করিলেন, কিন্তু শরীর সুস্থ হইল না। পরিশেষে তিনি স্বগ্রাম গরিফায় যাত্রা করিলেন। তথায় কয়েক দিবস বাসের পর তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট হইল। মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্ব হইতে অতিকষ্টে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল; ঐ দুই দিন কাল তিনি হরিনামের মালা হস্তে লইয়া কেবল নাম জপ করিয়াছিলেন। বাকরোধ হইবার পূর্ব্বে আত্মীয়জনগণকে আহ্বান করিয়া প্রত্যেককেই আদেশ উপদেশ করিয়াছিলেন। ইংরাজী ১৮৪৪ সালের ২রা আগষ্ট তারিখে একষটি বৎসর বয়সে রামকমল সেন ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইলে তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, পরিচিত অপরিচিত, বহু বাঙ্গালী ও ইংরাজ শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরলোক গমনে শোকপ্রকাশ জন্য এসিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে এক সাধারণ সভা হয়। সার্ এড্ওয়ার্ড রায়েন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এইচ্ টরেন্স্

সাহেব তৎকালে সোসাইটীর সহকারী সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। তিনি রামকমল সেনের যশোকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। রামকমল সেন স্বদেশবাসিগণের উন্নতির জন্য কিরূপ নিঃস্বার্থভাবে প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেন, তাঁহার দ্বারা দেশের কি কি শুভকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে তাহা তিনি সমবেত শোক-সন্তপ্ত ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে বিশদভাবে বর্ণনা করেন। টরেন্স সাহেব বলেন যে তাঁহার মৃত্যুতে এসিয়াটিক সোসাইটী একজন উচ্চদরের মেধাবী সভ্য হারাইলেন; তিনি প্রথম অবস্থায় সোসাইটীর একজন কর্ম্মচারী ছিলেন; কর্ম্মচারীরূপে তিনি সোসাইটীর যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা সোসাইটীর পক্ষে অতীব মূল্যবান; রামকমল সেন অসীম পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে বিবিধ বিদ্যা ও গভীর জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন; তিনি নানা বিষয়ে যে সকল মত প্রকাশ করিতেন তাহাতে তাঁহার কুসংস্কারহীনতার যেমন পরিচয় পাওয়া যাইত তেমনি তাঁহার উত্তাল গাম্ভীর্য্যের লক্ষণ দেখা যাইত; তিনি স্বদেশে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার উন্নতি জন্য স্থির ও দৃঢ়ভাবে বহুকাল চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমশীলতার বহু প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে; কেবল স্বদেশবাসীগণের মঙ্গলের জন্য নহে, এদেশবাসী বা প্রবাসী ইউরোপীয়গণেরও মঙ্গলসাধনার্থ তিনি সময়, চিন্তা ও অর্থব্যয় করিতে কদাপি কুণ্ঠিত হইতেন না; তিনি অসংখ্য দীন দরিদ্রগণকে অর্থানুকূল্যে তাঁহার নিকট চিরঋণী করিয়া গিয়াছেন; তিনি দেশের একজন মহৎ লোক ছিলেন, কিন্তু অহঙ্কার কখন তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না; তিনি অতি বিনম্রস্বভাব ছিলেন, ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদ্ কোলব্রুক্, উইলসন এবং বেলি সাহেবগণ রামকমল সেনকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন; ইয়োরোপের অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত তাঁহাকে সম্মান করিতেন; রামকমল সেনের এই হৃদ্গত আকাঙ্ক্ষা ছিল যে ভারতবাসীগণ ক্রমে উন্নতিলাভ করিয়া পৃথিবীর প্রধান জাতিগণের পার্শ্বে স্থান লাভ করুক এবং এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার উদ্দেশে তিনি সমস্ত জীবন উৎসাহসহকারে কার্য্য করিয়াছিলেন। টরেন্স সাহেব এইরূপে রামকমলের জীবনকাহিনী বর্ণনা করিলে সভাপতি সার এডওয়ার্ড রায়েন প্রস্তাব করিলেন যে উক্ত মহাত্মার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ জন্য সোসাইটী তাঁহার পুত্র বাবু হরিমোহন সেনকে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। এই প্রস্তাবানুসারে সেক্রেটারী ও সহকারী সভাপতির স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত পত্র হরিমোহন বাবুকে প্রেরিত হয়:—

"মহাশয়, এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি ও সভাগণের অভিপ্রায়ানুসারে আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। তাঁহারা আপনার পিতার মৃত্যু সংবাদে ব্যথিত হইয়া আপনার ও আপনাদের পরিবারস্থ সকলের গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। সোসাইটী রামকমল সেন মহাশয়ের পরলোক গমনে আপনাদিগের নিকট ইহা মুক্তভাবে জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিতেছেন যে, তাহার বিদ্যাবত্তা, দেশীয়গণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার উৎসাহ ও যত্ন, তাঁহার বিবিধ মহৎ গুণ এবং সোসাইটীর উন্নতির জন্য তাঁহার বহু মূল্যবান্ কার্য্য জন্য সোসাইটীর সভ্যগণ এবং বহু ইয়োরোপীয় ও দেশীয় বিদ্যানুরাগী ও গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল, সোসাইটী তাহা কখন বিস্মৃত হইবেন না, এবং তাঁহার কার্য্যের গৌরব চিরকাল অম্লান রাখিয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিবেন। ইতি ৯ই আগষ্ট, ১৮৪৪।"

রামকমল সেন "Agricultural and Horticultural Society of India" নাম কৃষিসভার একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ সভার ১৮৪৪ সালের কার্য্যবিবরণী গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"এই বৎসরে সভার যে কয়েকজন সভ্য পরলোক গমন করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বোপরি রামকমল সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহারই মৃত্যুতে সভা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। সভার শৈশবাবস্থাতেই তিনি সভ্যপদভুক্ত হয়েন; তাঁহার সমকালীন অনেক সভ্য সভ্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু রামকমল তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন নাই। কয়েক বৎসরকাল তিনি সভার দেশীয় সম্পাদক ছিলেন, তৎপরে সভার সহকারী সভাপতি পদে উন্নীত হয়েন। যে সময়ে এদেশবাসীগণ স্বদেশের উন্নতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিল সেইকালে তিনি তাহাদিগকে স্বদেশানুরাগের যে সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। তিনি সভার প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতেন এবং কৃষির উন্নতিসাধন সম্বন্ধে বিশেষ তৎপর ছিলেন। দুঃখের বিষয় এই দুইটী বিষয় সম্বন্ধে এই সভার অন্যান্য দেশীয় সভ্যগণের মধ্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন।"

ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া (The Friend of India) সে সময়কার প্রধান ইংরাজী সংবাদপত্র ছিল। বিখ্যাত খ্রীষ্টীয়ান মিশনারি মার্শম্যান্ সাহেব ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রামকমল সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া" যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রকটিত করিতেছি:—

"বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান বা ধনরক্ষক রামকমল সেনের মৃত্যু হইয়াছে। রামকমল এদেশীয় লোকদিগের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার

করিয়াছিলেন এবং দেশীয়দিগের মধ্যে তাঁহার প্রভাব প্রভূতরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। যে সকল বাঙ্গালী বর্ত্তমান সময়ে সুযশ অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে রামকমল অগ্রগণ্য। ইনি ধন যেমন উপার্জ্জন করিয়াছেন, তেমনি দান করিয়াছেন। কিন্তু ইনি কেবল ধনী ও দানী ছিলেন না, বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জ্জনে ও চর্চ্চায় ইনি সর্ব্বদাই তৎপর ছিলেন। রামদুলাল দে, বিশ্বনাথ মতিলাল, আশুতোষ দেব, মতিলাল শীল ইঁহারা সকলেই সামান্য অবস্থা হইতে ধনী হইয়াছিলেন। রামকমল সেনও ইঁহাদিগের ন্যায় অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে আপনার চেষ্টা ও অধ্যবসায় বলে ধনী হইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্বান ও জ্ঞানীরূপে ইনি যে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত ধনী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে কেহই লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। স্বদেশবাসিগণের মধ্যে জ্ঞান ও সভ্যতা বিস্তার কার্য্যে রামকমল সেন যেরূপ উদ্যোগী ছিলেন তদ্রূপ আজকালকার অন্য কোন বাঙ্গালীকে দেখা যায় না।"

ডাক্তার হোরেস্ হেমেন্ উইলসন্ রামকমলের পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদে ডাক্তার উইলসন্ রামকমলের শোকসন্তপ্ত কোন আত্মীয়কে যে পত্র লিখেন তাহার কোন কোন অংশের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আমি রামকমলকে বিশেষভাবে জানিতাম, আমার নিকট তিনি সকল কথাই বলিতেন, তাঁহার অন্তরের গূঢ়তম স্থান পর্য্যন্ত আমার নিকট উন্মুক্ত ছিল। এরূপ সুপরিচয়ের সাহায্যে আমি তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছিলাম। তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া আমি তাঁহাকে হৃদয়ের অকপট স্নেহ ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছিলাম। কলিকাতায় যে সকল দেশীয় ও ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত আমার পরিচয় বা বন্ধুত্ব ছিল তাহাদিগের মধ্যে রামকমল অপেক্ষা সারবান ও সুদৃঢ় চরিত্রের লোক আমি একটীও দেখি নাই। দেশের মঙ্গল ও স্বদেশবাসীগণের উন্নতি সাধন, এই সংকল্পই তাঁহার জীবনের প্রধান পরিচালক ছিল, কিন্তু এই সংকল্প সর্ব্বসাধারণে জানিতে পারে ইহা তাঁহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। দেশহিতের জন্য তিনি যাহা করিতেন লোকের নিকট তাহা অজ্ঞাত রাখিতে তিনি চেষ্টা করিতেন। স্থিরভাবে, ধীরভাবে, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া দেশের সংস্কার সাধন করা উচিত ; তিনি এই মত প্রচার করিতেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিতেন। উন্নতি-সাধনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ভবিষ্যৎবিবেকহীন উষ্ণমস্তিষ্ক যুবকের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করিতে সম্মতি দিতেন না। এই জন্য তিনি অনেক উগ্র বাঙ্গালী সংস্কারকের প্রিয় ছিলেন না। আমি তাঁহার রক্ষণশীলভাবাম্ন-প্রাণিত উন্নতিশীলতার প্রতিপোষক ছিলাম। তাঁহার অবলম্বিত পথই আমি সমীচীন মনে করি। ত্রয়োবিংশ বৎসর কাল আমি কলিকাতায় ছিলাম ; ঐ দীর্ঘকাল আমি রামকমলের সহিত প্রণয়সূত্রে বদ্ধ ছিলাম, ঐ দীর্ঘ কালের সর্ব্ব সময়েই আমি তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পরিশ্রমশীলতা, সততা ও প্রশান্তচিত্ততার পরিচয় পাইয়াছি। আমি কখন দেখি নাই যে, তিনি কোন একটা বিষয় সহজে বুঝিতে পারিতেছেন না, কিম্বা তিনি পরিশ্রম করিতে কাতর হইতেছেন, কিম্বা ধীরতাবিচ্যুত হইয়া কাহারও উপর রুষ্ট হইয়াছেন। রামকমলের নিকট বিবিধ সাধারণ হিতকর কার্য্যের জন্য ব্যয়ার্থ বহু অর্থ সঞ্চিত থাকিত, আবার অনেক ভদ্রলোকও তাঁহার নিকট টাকাকড়ি সঞ্চিত রাখিতেন ; এই সকল অর্থ ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার প্রতি এক নিমেষের জন্যও সন্দেহ হইয়াছিল, একথা কেহই কখন বলিতে পারেন নাই। তিনি নানা কার্য্যে আমার সহকারী রূপে যাহা কিছু করিতেন আমি তাহাতে তাঁহার সুবিচারশক্তি ও সদ্বিবেচনার উজ্জ্বল প্রমাণ পাইতাম ; ভারতবাসীগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহাদের সহিত সদ্ভাবে থাকিতে গেলে কিরূপে চলিতে হয় তদ্বিষয়ে রামকমল আমাকে যে পরামর্শ দিতেন তাহার মূল্য নাই ; রামকমল আমার সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য যেমন বুঝিতেন তেমন আর কোন ভারতবাসী বুঝিতেন না। তজ্জন্য আমিও তাঁহার শ্রদ্ধা সহায়তা ও প্রতিপোষকতা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলাম। এক সময়ে আমি আমার সাংসারিক সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধারণের ভার তাঁহারই উপর অর্পণ করিয়াছিলাম ; তিনি যেরূপ নিয়মে তত্ত্বাবধারণ করিয়াছিলেন তাহাতে আমার সাংসারিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল ; আমার নিজের তত্ত্বাবধারণে সেরূপ উন্নতি হয় নাই। আমি রামকমল সেনকে যেমন শ্রদ্ধা করিতাম তেমনি ভাল বাসিতাম। কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার সময় তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ কালে আমার অত্যন্ত মনঃকষ্ট হইয়াছিল ; তাঁহার সহিত সর্ব্বদা পত্রব্যবহার করিয়া তাঁহার সহিত বিচ্ছেদের কষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হইত। যখন আমার কোনও অস্তিত্ব থাকিবে না, তখনই রামকমলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রেম অন্তর্হিত হইবে, তাহার পূর্ব্বে নহে।"

রামকমল সেনের চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ হরিমোহন সেন। ইনি ১৮১২ সালে ৭ই আগষ্ট তারিখে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি হিন্দু কালেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। যৌবনে ইনি ডাক্তার উইলসনের অধীনে পুরাণ-অনুবাদক পদে নিযুক্ত হয়েন। পরে ক্রমে টাঁকশালের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হয়েন। তৎপরে জেনারেল ট্রেজারির দেওয়ান হয়েন। ট্রেজারির অধ্যক্ষ ওকস্ (Oakes) সাহেব হরিমোহনের কার্য্যতৎপরতা ও পারগতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই পদে কিছুকাল অধিষ্ঠিত থাকিয়া হরিমোহন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ানের পদে উন্নীত হয়েন। ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী চার্লস হগ্ সাহেবের সহিত ইহাঁর মনোমালিন্য ঘটে। হরিমোহন বলিতেন ইনি তাঁহার স্বাধীনতার উপর অযথা হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। উভয়ের মধ্যে নানা বিষয়ে মতবিভেদ ঘটিত। এই কারণে তিনি এই পদ পরিত্যাগ করেন। হরিমোহন পিতার ন্যায় নানা সাধারণহিতকর কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। তিনি কলিকাতার যে সকল জনহিতকর সভার সভ্য ছিলেন সেগুলির নামোল্লেখ করিতেছি ;—ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটী, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্, ল্যাণ্ড হোলডারস্ সোসাইটী, মেকানিকস ইনষ্টিটিউট, লাইসিয়ম্, এসিয়াটিক্ সোসাইটী, এগ্রিহরটিকল্চরেল সোসাইটী অব্ ইণ্ডিয়া এবং ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবেল সোসাইটী। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয় আলোচনার্থ বেথুন সোসাইটি নামে একটী সভা ছিল ; হরিমোহন সেন ঐ সভার সহকারী সভাপতি

ছিলেন। এগ্রিকলচরেল সোসাইটী নামে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনোদ্দেশে যে সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল, হরিমোহন সে সভার সভ্যরূপে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্যমের পরিচয় দেওয়াতে তিনি ঐ সভারও সহকারী সভাপতি পদে বরিত হইয়াছিলেন। ১৮৫০ সালের ২১ আইনের বিরুদ্ধে হিন্দুগণ ঘোরতর আন্দোলন করেন। সেই আন্দোলনের ফল স্বরূপ এক কমিটি নিযুক্ত হয়। উক্ত আইনের দোষ গুণ নির্দ্ধারণ করিবার ভার কমিটীর উপর ন্যস্ত হয়। হরিমোহন সেন এই কমিটীর সভ্য নিযুক্ত হইয়া অতুল কার্য্যক্ষমতার পরিচয় দেন। লর্ড ডেলহাউসীর কর্তৃত্বাধীনে একটী শিল্পপ্রদর্শনী স্থাপিত হয়। হরিমোহন সেন এই প্রদর্শনীর সুসিদ্ধতাসাধনে সম্যক সাহায্য করিয়া লর্ড ডেলহাউসীর নিকট হইতে সাধুবাদ প্রাপ্ত হয়েন। যখন পাদ্রী ডফ্ সাহেবের বিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রগণের মধ্যে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল তখন স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতার হিন্দু ছাত্রগণের জন্য সাধারণের সাহায্যে একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। ঐ বিদ্যালয়ের দুই জন সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েন, হরিমোহন সেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সিপাহি বিদ্রোহের পর আগরা নগরে যে দরবার হয়, হরিমোহন তথায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে জয়পুরের মহারাজ রাম সিংহের সহিত হরিমোহনের সাক্ষাৎ হয়। তিনি ইতিপূর্ব্বেই হরিমোহনের বিবিধ গুণের কথা শুনিয়াছিলেন; সাক্ষাতে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতার সম্যক পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়েন। ১৮৬৪ সালে জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত শিবদিনের মৃত্যু হইলে মহারাজা হরিমোহনকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। হরিমোহনের এই উচ্চপদে নিয়োগের সংবাদে বাঙ্গালী মাত্রেই পুলকিত হয়েন। ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী কোন দেশীয় করদ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হয়েন নাই। জয়পুরের পরলোকগত মহারাজা রাম সিংহই এই বিষয়ে প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন।* হরিমোহন সেন জয়পুরের প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়া জয়পুর রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ও উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করেন। রাজ্যের শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি সুসংস্কৃত নিয়মের প্রবর্ত্তন করেন। মহারাজা রামসিংহ, জয়পুর রাজ্যের তৎকালীন পলিটিকেল এজেণ্ট, ভারতের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সকলেই একবাক্যে হরিমোহনের জয়পুর শাসনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।† পলিটিকেল এজেণ্ট মহাশয় হরিমোহনকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। জয়পুরের অন্যান্য ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারী ও প্রবাসীগণও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। মহারাজা তাঁহার পারগতা, কার্য্যক্ষমতা ও অন্যান্য সদ্‌গুণে মোহিত হইয়া সমগ্র শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং কয়েকজন সুযোগ্য বাঙ্গালীকে তাঁহার রাজ্যের কয়েকটি উচ্চ পদে নিযুক্ত করিলেন। তদবধি জয়পুরে বাঙ্গালীর যে প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। জয়পুরে হরিমোহন সেনের প্রধান কীর্ত্তি মহারাজার মন্ত্রীসভার প্রতিষ্ঠা, জয়পুর কালেজের সম্যক্ উন্নতিসাধন, শিল্পবিদ্যালয় সংস্থাপন, এবং জয়পুর

* এ বিষয়ে ১৮৬৪ সালের ২৭ জুন তারিখের হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি;—

The announcement that Baboo Hari Mohun Sen, the well-known son of the well-known Babu Ram Comul Sen, has been invited by the Maharajah of Jeypore to assume charge of the ministry of the Raj in succession to Pundit Sheodeen, the deceased Minister, is gratifying in the highest degree. If this rumour be true, it foreshadows a bright future for the State of Jeypore. But the policy of vesting educated Bengalees with ministerial powers in Native States, for the first time inaugurated by His Highness of Jeypore, involves a question of the deepest moment to the destinies of the subjects of the Native Princes and to the stability of the British power in the East.

† তৎকালে কাণপুর নগরে Bi-weekly Observer নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। ঐ পত্রে লিখিত হইয়াছিল;—"The reforms which have been introduced into the several branches of the administration of Jeypore are attributable to the influence chiefly of Babu Hari Mohun Sen, a very able and educated native of Bengal. The deep interest which this gentleman took in the welfare of the Jeypore State, and the vigorous decision with which he is carrying on important reforms there, notwithstanding the almost overwhelming opposition from intrigue and ambition, inseparable from a rich native court, deserve the highest commendation."

সহরে গ্যাসের আলোকের প্রবর্ত্তন। জয়পুর রাজ্যকে আদর্শ দেশীয় রাজ্যে পরিণত করিবার জন্য হরিমোহন সেন নানা সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ে তাঁহার মৃত্যু ঘটাতে তৎসমস্ত কার্য্যে পরিণত হইল না। হরিমোহনের পাঁচ পুত্র,—যদুনাথ, মহেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথ ব্যতীত সকলেই জয়পুর রাজ্যে চাকুরী করিতেছেন। হরিমোহনের একটী মাত্র কন্যা; ইনি সিবিলিয়ান্ শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্তের মাতা।

রামকমল সেনের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন। তিনি কলিকাতার টাকশালের দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চৌত্রিশ বৎসর বয়সে, ১৮৪৮ সালের ২৭শে অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার তিন পুত্র, নবীনচন্দ্র, কেশবচন্দ্র ও কৃষ্ণবিহারী।

রামকমল সেনের তৃতীয় পুত্রের নাম বংশীধর। প্যারীমোহনের মৃত্যুর পর ইনি টাকশালের দেওয়ান হয়েন।

রামকমল সেনের চতুর্থ পুত্রের নাম মুরলীধর। ইনি কলিকাতার প্রতিষ্ঠাবান এটর্ণী ছিলেন। ইনি হিন্দু-কালেজে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ হেতু ইনি কালেজ হইতে বিশেষ প্রশংসাপত্র পাইয়াছিলেন। ইনি কলিকাতার অবৈতনিক মেজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপালিটীর সভ্য ছিলেন।

রামকমল সেন বঙ্গদেশের এক চিরস্মরণীয় মহাপুরুষ। তিনি ধনীর সন্তান ছিলেন না, কিন্তু উদ্যম, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও সৎস্বভাবের বলে মাসিক আট টাকার বেতনভুক কর্ম্মচারী হইতে আপনাকে ধনবান গৃহস্থের পদে উন্নত করিয়াছিলেন। তিনি উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন নাই, কিন্তু জ্ঞানানুরাগের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া, আত্মচেষ্টার সাহায্যে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রৌঢ়াবস্থায় ইনি কলিকাতার শিক্ষিতমণ্ডলীর একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ধনী ও বিদ্বান হইয়া তিনি স্বীয় বিদ্যা ও ধন আপনাতে আবদ্ধ না রাখিয়া স্বদেশবাসীগণের মঙ্গলার্থ তাহা ব্যয় করিতেন। দেশবাসীগণের মধ্যে জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তার, তাহাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন, দীন দরিদ্রদিগের দুঃখমোচন, এই সকল কার্য্যেই অহরহ ব্যাপৃত থাকিয়া বাঙ্গালার দেশহিতৈষী মহাত্মাগণের মধ্যে তিনি উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের প্রধান গৌরব এই যে, তিনি যে সকল কার্য্যের সূচনা করিয়া গিয়াছেন তৎসমস্ত ক্রমে পরিপুষ্ট ও পরিব্যাপ্ত হইয়া অদ্যাবধি বঙ্গবাসীগণের মঙ্গলসাধনে সহায়তা করিতেছে।*

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

স্বদেশী আন্দোলন—উহার ত্রিবিধ কার্য্য।

১। রাজনৈতিক।

স্বদেশী আন্দোলনের ত্রিবিধ লক্ষ্য,—রাজনৈতিক, অর্থসম্বন্ধীয় ও শিক্ষাবিষয়ক। রাজনৈতিক লক্ষ্যসম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আগে গুটিকয়েক কথা বলিতে হয়।

ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ।

ভারতের ভাবী রাজনৈতিক আশা কি? এ প্রশ্নের তিন প্রকার উত্তর পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর ইংরাজ ও তাঁহাদিগের পদলেহনকারী কোন কোনও ভারতবাসী মনে করেন, ভারতবর্ষ এখনকার ন্যায় চিরকালই ইংলণ্ডের পদানত থাকিবে। ইঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, যখন জগতে সকল প্রকার বৈভবেরই উদয়াস্ত আছে, তখন কেবল ইংরাজের সৌভাগ্যসূর্য্য চিরদিন সমভাবে মধ্যাহ্ন-

* এই প্রবন্ধটি বৈদ্যনাথদেওঘর নিবাসী স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের লিখিত। ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাই তিনি সুন্দর লিখিতে পারিতেন, এবং ভারতবর্ষের ও ইউরোপের অনেক প্রসিদ্ধ পত্রের লেখক ছিলেন। প্রধানতঃ এই কাজ করিতেন বলিয়া, তিনি "অমরকীর্ত্তি" নামক ফাদার দামিয়েনের জীবনচরিত তাঁহার বন্ধু ও একনামধারী বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি-এ, মহাশয়ের সহিত রচনা করা ব্যতীত বঙ্গসাহিত্যের জন্য আর কোন স্থায়ী কার্য্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার শুভ্র চরিত্রের মত ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। কিন্তু অনুকূল অবস্থার অভাবে বঙ্গসাহিত্য তাঁহার দ্বারা সমুচিতরূপে অলঙ্কৃত হয় নাই। এই প্রবন্ধটি ত্রিপুরার রাজকুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা বাহাদুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত "বঙ্গভাষা" নাম্নী মাসিক পত্রিকার জন্য লিখিত হইয়াছিল। ঐ পত্রিকা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সম্পাদক মহাশয় এইটি এবং আর একটি প্রবন্ধ আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। 'বঙ্গভাষা" যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইতেছিল, এবং উহাতে বঙ্গের অনেক শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। কি কারণে উহা আর প্রকাশিত হইল না, বলিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু উহার তিরোভাব দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

প্রবাসী সম্পাদক।

গগনে বিরাজমান থাকিবে, ইহা কখনও সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয় একশ্রেণীর লোক আশা করেন, ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যলাভ করিবে। কত দিনে এই আশা পূর্ণ হইবে বলিতে পারি না, খুব শীঘ্র হইবার লক্ষণ তো বিশেষ কিছু দেখিতে পাই না—কেবল দেখিতেছি, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বা national autonomyর নাম শুনিয়াই কটনের ন্যায় ভারতবন্ধুও হাড়ে হাড়ে চটিয়াছেন। যে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার পক্ষে এখনও শতাব্দীর পর শতাব্দী বিলম্ব আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা লইয়া অনর্থক কাহারও সহিত কলহ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। তৃতীয় এক শ্রেণীর লোক—ইঁহারাই সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং আমাদের সমুদায় নেতৃবর্গ এই দলে—জনসাধারণকে বলিতেছেন, ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গরূপেই ঈপ্সিত রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিবে। স্বদেশী আন্দোলনের গতি এই দিকে। ইহার লক্ষ্য এই, মহারাণীর ঘোষণাপত্র ও পার্লিয়ামেণ্টের বিধান যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার জন্য সর্ব্ববিধ বৈধ উপায়ে চেষ্টা করিতে হইবে এবং ক্রমে শাসনকার্য্যে অধিকতর অধিকারলাভ করিতে হইবে। আইনসভাসমূহের প্রসার এই অধিকার লাভেরই অন্তর্গত। কিন্তু শুধু এখানেই দাঁড়াইলে হইবে না। যতদিন ভারতের জনসাধারণ আয়ব্যয়ের উপর কর্ত্তৃত্বলাভ না করিবে, যতদিন তাহাদের প্রতিনিধিগণ দেশশাসনে সুস্পষ্ট ক্ষমতালাভ না করিবে, ততদিন এই আন্দোলনের নিবৃত্তি হইবে না। কারণ, প্রজাশক্তি উপযুক্তরূপে স্বীকৃত না হইলে দেশের সুশাসন অসম্ভব।

২। শিল্পোন্নতি।

স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় কার্য্য স্বাবলম্বন প্রতিষ্ঠা বা দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার ও প্রচার। দেশীয় শিল্পের বহুল প্রচার ভিন্ন ভারতবাসীর বাঁচিয়া থাকিবার দ্বিতীয় পন্থা নাই। কে না জানে, ভারতীয় শিল্প লোপ হইয়াছে বলিয়াই শতকরা আশী জন ভারতবাসী কৃষিকার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছে, এবং এই জন্যই দেশে এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ দেখা দিতেছে? তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে! একথাও বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই যে, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ভিন্ন কোনও জাতি জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। বাহুবল ও অর্থবলের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ ঠিক বলিতে পারি না। তবে ইতিহাস বলিতেছে কার্থেজের সাম্রাজ্য অর্থবলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—আর বর্ত্তমান যুগেও জাপান বাহুবলে খ্যাতিলাভ করিবার পূর্ব্বে প্রভূত বৈষয়িক উন্নতি সম্পাদন করিয়াছিল। আর একটি কথা। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার একস্থলে বলিয়াছেন, মানবজাতির আদিম অবস্থায় যুদ্ধবিগ্রহ অপরিহার্য্য ছিল বটে—বর্ত্তমান অবস্থাতেও উহার প্রয়োজন লুপ্ত হয় নাই, কিন্তু বিভিন্ন-জাতিসমূহ জ্ঞান ও সভ্যতাতে যেমন উন্নত হইবে, তেমনি রাষ্ট্রবিপ্লবসমুদায় বিনা রক্তপাতে সংঘটিত হইবে। জ্ঞান ও সভ্যতার সহিত বিষয় বাণিজ্যের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং এদিক দিয়াও দেখা যাইতেছে, দেশীয় শিল্পের প্রচার আমাদিগের পক্ষে কত প্রয়োজনীয়।

বয়কট বা বিদেশীবর্জ্জন দেশীয় শিল্প প্রচারের অপরিহার্য্য অঙ্গ। বস্তুতঃ বিদেশী ত্যাগ না করিয়া তৎস্থলে স্বদেশী কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে, সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে তাহা দুর্জ্ঞেয়। অথচ দেখিতেছি, রাজপুরুষগণ মুখে দেশীয় শিল্পোন্নতির উৎসাহদাতা হইয়াও বিদেশীবর্জ্জনে একেবারে খড়্গহস্ত হইয়াছেন। অনেক ইংরাজ ইঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারকও আছেন—বলিতেছেন, পূর্ব্ববঙ্গে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জিত হওয়াতে কৃষকদিগের ক্লেশ হইতেছে, কারণ তাহারা বিলাতী বস্ত্রের পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ অধিক মূল্য দিয়া দেশী বস্ত্র ক্রয় করিতেছে। আহা কি জনহিতৈষণা! এই সে দিন যে তিব্বত মিশনে অনর্থক দরিদ্র ভারতবাসীর লক্ষ লক্ষ টাকা উড়িয়া গেল, তখন ইঁহারা নীরব ছিলেন, আর এক আনা কি দুই আনা অধিক দিয়া দেশীয় বস্ত্র ক্রয় করিতেছে বলিয়া প্রজাগণের দুঃখে ইহারা আর চোখের জল সামলাইতে পারিতেছেন না। ইহারা কেন দেখেন না যে চৌদ্দ আনা দিয়া এক খানি বিলাতী কাপড় কিনিলে তাহার তের আনাই বিলাতে যায়। আর এক টাকা দিয়া এক খানি মোটা দেশী কাপড় কিনিলে গোটা টাকাটাই দেশে থাকে? হায় ঈশা! ইহাঁরাই জগৎকে তোমার পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্ম প্রদানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। শিক্ষাবিস্তার।

স্বদেশী আন্দোলনের তৃতীয় কার্য্য, দেশে সাধারণ ও

অর্থকরী শিক্ষার বিস্তার। লর্ড কার্জ্জনের কৃপাতে ভারতে উচ্চশিক্ষার দ্বার সঙ্কুচিত হইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে নূতন বিধি প্রণীত হইয়াছে, তাহার ফলে শত শত যুবক উচ্চ শিক্ষায় বঞ্চিত হইবে। নিম্ন শিক্ষার অবস্থাও শোচনীয়—এদেশে শতকরা ঊননব্বই জন নিরক্ষর। কলাবিদ্যা দানে সরকারবাহাদুরের মনোযোগ অতি সামান্য। শিক্ষা ভিন্ন কোনও জাতি উন্নত হইতে পারে না। এই গুরুতর জাতীয় অভাব মোচনের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অতি কল্যাণকর হইয়াছে। যতদিন রাজ্যশাসনে ভারতবাসী অধিকতর ক্ষমতা লাভ না করিতেছে, ততদিন ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতি উন্নততর ও মহত্তর হইবে, ইহা আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। আজ হউক, কাল হউক, জনশিক্ষার ভার ভারতবাসীকে নিজ হস্তে গ্রহণ করিতেই হইবে। স্বদেশী আন্দোলন এই অবশ্যকর্ত্তব্যকর্ম্মকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে।

এক কথায় বলিতে হয়, স্বদেশী আন্দোলনের লক্ষ্য এই, যাহাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী জাতিসমূহ জ্ঞানে, অর্থে বলশালী হইয়া এক প্রবল স্বাবলম্বনশীল মহাজাতিতে পরিণত হয়। কিন্তু এ পথে কতকগুলি গুরুতর অন্তরায় আছে।

জাতিগঠনের ত্রিবিধ অন্তরায়।

জাতিভেদ (racial difference) ভাষাভেদ ও ধর্ম্মভেদ একজাতীয়ত্ব (nationality) গঠনের তিনটী প্রধান অন্তরায়। এগুলির কোনও একটীকে অতিক্রম করা তত কঠিন নয়, কিন্তু ভারতে তিনটীই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। ভারতবর্ষ যদি ক্ষুদ্র দেশ হইত, তবে জাতিগঠনের কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ হইত। সুইট্জারল্যাণ্ড তাহার প্রমাণ। মিল্ বলেন :—

"Switzerland has a strong sentiment of nationality, though the cantons are of different races, different languages, and different religions"—Rep. Government, p. 120.

কিন্তু ভারতবর্ষ একটী বিশাল মহাদেশ। সত্য বটে, ভাষাভেদরূপ অন্তরায় ইংরেজী শিক্ষা দ্বারা দূরীকৃত হইতেছে, এবং সমরাজনৈতিক স্বার্থ জাতিগত বিদ্বেষকে অনেক পরিমাণে পরাজিত করিয়াছে। আরও দীর্ঘকাল ইংলণ্ডের অধীনে বাস করিলে জাতিগত পার্থক্য ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িবে। মিল্ বলিতেছেন :—

"But the strongest of all is the identity of political antecedents; the possession of a national history, and consequent community of recollections; collective pride and humiliation, pleasure and regret, connected with the same incidents in the past.—p. 120.

দেখা যাইতেছে, দেশের গৌরবময় অতীত কাহিনী যেমন, পরাজয় ও দুর্গতি, সুখ ও দুঃখও তেমনি জাতিগঠনের সহায়। সুতরাং আমাদিগের এক বিষম চিন্তার বিষয় ধর্ম্মভেদ। এই ক্ষেত্রে স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান সহায় ব্রাহ্মসমাজ।

স্বদেশী আন্দোলনের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধ।

যাঁহারা স্বদেশী আন্দোলনের সহিত যুক্ত থাকিয়াও ব্রাহ্মসমাজকে বিদ্বেষের চক্ষে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারা মনে রাখিবেন, প্রেম ভিন্ন হিন্দু ও মুসলমানকে মিলিত করিবার আর কোনও উপায় নাই। প্রেম, ধর্ম্ম ভিন্ন হয় না। যে প্রেম স্বার্থ হইতে উৎপন্ন, তাহা বড় স্থায়ী নয়—"কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে?" ব্রাহ্মধর্ম্ম, বেদান্তধর্ম্ম, আর্য্যধর্ম্ম, থিওসফী—নাম যাহাই দেও না কেন, ধর্ম্মের বন্ধন ছাড়া আর কিসে ভারতের বিভিন্ন জাতিসমূহকে একত্র বন্ধন করিবে? আর, মুখে যতই ভালবাসা দেখাও না কেন, আচণ্ডালব্রাহ্মণ সকলের প্রতি কার্য্যতঃ সমদর্শী না হইলে সকল শ্রেণীর মধ্যে একপ্রাণতাই বা কিরূপে জন্মিবে? ব্রাহ্মসমাজ আশা করেন, ভারতে—শুধু ভারতে কেন, জগতে কালে এক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্রাহ্মসমাজ ভারতের কি কি উপকার করিয়াছেন, বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই। কেবল বলিতে চাই, হে স্বদেশ সেবক, ব্রাহ্মসমাজ তোমারই লক্ষ্য সাধনে পরম সহায়, ইহা ভুলিও না।

ধর্ম্মজীবন ও রাজনৈতিক অধিকার।

ব্রাহ্মসমাজও স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারেন না। এই যে দেশময় একটা ঐক্যবন্ধন দেখা যাইতেছে, এই যে বাঙ্গালী, মারাঠা, পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, সকলের মধ্যে একটা সমবেদনা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ইহা অতি আহ্লাদের ব্যাপার, কারণ ইহাতে পরোক্ষভাবে তাঁহারই লক্ষ্য সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু শুধু তাহাই নয়। ব্রাহ্মসমাজের পূর্ণতার পক্ষে স্বদেশী

আন্দোলন অত্যাবশ্যক। কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতেছে।

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ। ব্রাহ্মসমাজ—এবং সম্প্রতি রামকৃষ্ণমিশন, আর্য্যসমাজ প্রভৃতি সেই আধ্যাত্মিকতা সংরক্ষণ ও পোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশা করিতেছি, ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে দুরন্ত বিষয়ৈষণার পথ হইতে আধ্যাত্মিকতায় আনয়ন করিবেন। কিন্তু অবিসংবাদী রাজনৈতিক অধিকার লাভ না করিলে এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে না। কারণ ধর্ম্মজীবন জাতীয় চরিত্রের উপর নির্ভর করে—জাতীয় চরিত্র রাজনৈতিক অবস্থা দ্বারা নিয়মিত হয়। একধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বাস্তবিক স্বাধীন ও পরাধীন জাতির ধর্ম্ম এক নয়। একই খৃষ্টধর্ম্ম, বিভিন্নজাতি সমূহের মধ্যে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। দুই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ঈশা বলিয়াছিলেন, "সীজরের যাহা প্রাপ্য তাহা সীজরকে দেও।" এরূপ বলিবার দুটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এক, শত্রুগণ ঈশাকে বিদ্রোহিতার জালে ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিল—তিনি তাহাদের সে চেষ্টা বিফল করিবার জন্য ওরূপ বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, তাঁহার সময়ে ইহুদীগণ পরাধীন ছিল—ঈশাও পরাধীন জাতির পক্ষে যাহা সদুত্তর তাহাই দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তাঁহারই শিষ্যগণ অত্যাচারী রাজাকে হত্যা করিয়াছে—যথেচ্ছাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সুতরাং বলিতে হইবে, ঈশার ধর্ম্ম ও এই সকল জাতির ধর্ম্ম ঠিক্ এক নয়; সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জোসেফ্ চেম্বার্লেন, উভয়েই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু উভয়ের ঈশ্বর কি এক? আরও দেখুন একই খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মিসরবাসীদিগের মধ্যে সন্ন্যাস ধর্ম্মের প্রাবল্য উপস্থিত হইল, বাক্‌পটু কলহপ্রিয় গ্রীক্‌গণ তর্কযুদ্ধে শক্তিক্ষয় করিতে লাগিল, আর দিগ্বিজয়ী রোমকদিগের অধঃপতিত বংশধরগণ আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য লাভে যত্নবান হইল।

গিবন্ বলিয়াছেনঃ—

"In the profession of Christianity, the variety of national characters may be clearly distinguished. The nations of Syria and Egypt abandoned their lives to lazy and contemplative devotion: Rome again aspired to the dominion of the world; and the wit of the lively and loquacious Greeks was consumed in the disputes of metaphysical theology."—Decline and Fall, Chapter 54.

খৃষ্টধর্ম্মের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মেও এই নিয়মের কার্য্য দৃষ্ট হইবে। চার্লস্ ভয়সী ও আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি ঠিক্ এক? রাজভক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গ, পতিত বঙ্গদেশেই একথা বলা শোভা পাইয়াছে। রাজপুরুষগণ যদি অত্যাচার করেন, তাহার প্রতিবাদ না করিলে রাজা ও প্রজা উভয়েরই ক্ষতি। অব্যাহত, অপরিসীম ক্ষমতাপরিচালনা পতনের কারণ, নেপোলিয়ন তাহার প্রমাণ। অত্যাচার দ্বারা অত্যাচারীর চরিত্র অবনত হয়, তাহার ফল অত্যাচারীর শক্তিক্ষয়। সুতরাং রাজার কল্যাণের জন্যই তাঁহার অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতে হয়। ইহাই যথার্থ রাজভক্তি। এ অর্থে রাজভক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গ অবশ্যই হইতে পারে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কথা আছে। অম্লান বদনে সকল অত্যাচার অনাচার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলে প্রকৃত রাজভক্তি তো হয়ই না—তাহাতে ধর্ম্মজীবনও রক্ষা পায় না। যাঁহারা অপরিমেয় রাজভক্তির পক্ষপাতী, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহারাই অপরের ন্যায্য অধিকারের প্রতি উদাসীন। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের সততা বর্দ্ধিত হয়, তাহারা অপরের ধনপ্রাণের মর্য্যাদা করিতে শিক্ষা করে।

"The gradual decline of loyalty (in England) has accompanied an equally gradual increase of honesty, and of regard for people's lives and liberties.... Where belief in the sacredness of authority most lingers, belief in the sacredness of life, of liberty and of property is least displayed."—*Social Statics*, pp. 240, 241.

নিম্নোদ্ধৃত কথাটী বিশেষ অনুধাবনযোগ্য—

The Russians, to whom worship of their Emperor is a luxury, confess openly that they are cheats, and laugh over their confession.—Do., p. 239.

অর্থাৎ রুষিয়াবাসিগণ অতি রাজভক্ত এবং অতিশয় প্রবঞ্চক। তবে দেখুন, ধর্ম্মজীবনের অর্থ যদি জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয়, তবে রাজনৈতিক অবস্থার সহিত ইহার অতি নিকট যোগ আছে কি না। আর ব্রাহ্মগণকে এ কথা এত করিয়া বলিতে হইবে কেন? স্পেনে প্রজাতন্ত্র শাসন

প্রতিষ্ঠিত হইলে রাজা রামমোহন রায়ই না টাউনহলে ভোজ দিয়াছিলেন, আর নেটালের নিকটে ফ্রান্সের স্বাধীনতা পতাকাদর্শনের আগ্রহে তিনিই না আপনার পা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন? তিনি জানিতেন নিরবচ্ছিন্ন পরাধীনতা পূর্ণধর্ম্মলাভের পরিপন্থী।

ধর্ম্মের সহিত রাজনীতির অঙ্গাঙ্গীভাব কেবল আমাদিগের মনঃকল্পিত নয়। সেদিন স্বামী অভেদানন্দ বলিতেছিলেন, "রাজনৈতিক আন্দোলনও বেদান্তধর্ম্মের অন্তর্ভূত। আজ যদি ভারতবাসী দেশশাসনে পূর্ণ অধিকার পায়, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অমনি অন্তর্হিত হইবে।"

আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কি বলেন?

"যদি বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এক হইবে, পরস্পরবিচ্ছিন্ন ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্ব্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রৎ হইবে এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে। আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল।"—আত্মজীবনী, ৫৩ পৃঃ।

ব্রাহ্মসমাজ রাজদ্রোহী নয়—স্বদেশী আন্দোলনও রাজদ্রোহী নয়। ভারতবাসী ও ইংরেজের স্বার্থ এক সূত্রে গ্রথিত। মেকলে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া ইংলণ্ডের অধীন না থাকিয়া যদি স্বাধীন ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়, তাহাতেই ইংলণ্ডের অধিক লাভ। এক্ষণে আমরা কি দেখিতে পাইতেছি? গড়ে প্রতি ভারতবাসী বৎসরে মোটে এক শিলিংএর বিলাতী পণ্য ক্রয় করে। তাহাদের যদি শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহারা যদি বৎসরে গড়ে এক পৌণ্ডের পণ্য ক্রয় করিতে পারে, তবে ইংলণ্ডকে পৃথিবীর আর কোনও দেশের সহিত বাণিজ্য করিতে হয় না। মেকলে অতি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন:—

"That would indeed be a doting wisdom which would keep a hundred millions of men from being our customers in order that they might continue to be our slaves."—

পাছে ভারতবর্ষ হস্তচ্যুত হয়, এই ভয়ে ভারতবাসীর শোণিত শোষণ করা সেই রূপ নির্ব্বুদ্ধিতা, যেমন নির্ব্বুদ্ধিতা সেই মূর্খ প্রকাশ করিয়াছিল, যে স্বর্ণডিম্বের লোভে হংসীর প্রাণবধ করিয়াছিল।

উপসংহার।

আর দুই একটী কথা বলিলেই আমাদের বক্তব্য শেষ হয়।

কেহ বলিতে পারেন, আমরা এতক্ষণ কেবল বৃটিশ রাজত্বের দোষই প্রদর্শন করিলাম, গুণের কথা কিছুই বলা হইল না। এই আপত্তির উত্তর এই যে, আমরা যদি মনে করিতাম, ইংরেজ শাসনের আগা গোড়া সমস্তই মন্দ, তাহার গুণের ভাগ কিছুই নাই, তবে আর এই প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়োজন ছিল না। ইংরেজগণ ভারতের কি কি উপকার করিয়াছেন, তাহা সকলেরই জানা আছে, আপাততঃ সেগুলির বিশদ বর্ণনা না করিলেও চলে। ইংরেজ রাজত্বের দোষ ও অভাব কি, এবং সেগুলি কিসে দূর হইতে পারে, সেই আলোচনাই এখন প্রাসঙ্গিক ও হিতকরী।

স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশীবর্জ্জন কি উচ্চাঙ্গ ধর্ম্মসাধনের বিরোধী? ইহার উত্তর এক প্রকার দেওয়া হইয়াছে, তথাপি আরও কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজন। অভিসন্ধি বিশুদ্ধ না হইলে ভজন-পূজনও মলিন হয়। স্বদেশী আন্দোলনের তো কথাই নাই। চিত্ত অবিশুদ্ধ হইলে স্বদেশের সেবা নিষ্ফল। মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার দ্বারা কোনও জাতি বড় হইতে পারে না। এ সকলই যেমন ঠিক্, তেমনই ইহাও অতি ঠিক্ কথা যে বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রীতির সহিত বিশ্বপ্রেমের কোনও বিরোধ নাই। যাঁহারা বলেন, বিদেশী-বর্জ্জন প্রেমবিরোধী, উহাতে কেবল হিংসাবিদ্বেষ প্রশ্রয় পায়, হয় তাঁহারা স্বার্থান্ধ, নতুবা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ। যথার্থ মানবপ্রীতির অর্থ কি এই যে তোমার গৃহদ্বারে যে শত শত লোক অনশনে, অর্দ্ধাশনে কালযাপন করিতেছে, তাহাদিগের মুখপানে একটীবারও তাকাইওনা—কিন্তু সর্ব্বপ্রযত্নে দেখিও, যাহাতে প্রবল, বর্দ্ধিষ্ণু, সমৃদ্ধিশালী বৈদেশিকদিগের আরও ধনাগম হইতে পারে? এজাতীয় মানবপ্রীতি ঘোরতর স্বার্থপরতারই নামান্তর মাত্র। স্বদেশীয়দিগের প্রচণ্ড জীবনমরণ সংগ্রামের মধ্যে আপনার নিরাপদ গৃহকোণে বসিয়া শান্ত সমাহিত চিত্তে ভগবানের নাম করা ধার্ম্মিকতার লক্ষণ হইতে পারে। কিন্তু যে ধার্ম্মিকতা ইহ সংসারে কাহারও উপকারে আসিল না, তাহা যে পরকালেই বিশেষ কাজে লাগিবে, ইহা সন্দেহ করিলে, আশা করি, অতি গুরুতর পাষণ্ডতার কার্য্য হইবে না।

বিধাতার গূঢ় অভিপ্রায় কি বলিতে পারিনা, কিন্তু



শ্রীমতী কুচবেহারের মহারাণী।



শ্রীযুক্ত আর্ বেঙ্কটরত্নম্ নায়ডু।

Kuntaline Press, Calcutta.

আমাদের আশা এই, স্বদেশী আন্দোলন ও ব্রাহ্মসমাজ পরস্পরকে বলশালী করিবে, এবং কালক্রমে উভয়ের সহযোগিতায় ভারতে জ্ঞানধর্ম্মে সমুন্নত এক বিশাল জাতি সংগঠিত হইবে।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

জাপানী আদর্শ ও চীন জাতির শিক্ষা সংস্কার।

শুভক্ষণে রুষ-তুরস্ক যুদ্ধে রুষিয়া বিজয়ী হইয়া নিজের অপ্রতিহত ক্ষমতার পরিচয় পাইল। রুষজাতি আপন বাহুবলে আপনাকে অদ্বিতীয় মনে করিয়া ধরাকে সরাখানার ন্যায় জ্ঞান করিল। আত্মঅহংকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র রাজ্য সকল গ্রাস করিবার জন্য শনৈঃ শনৈঃ পদবিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এক দিকে যেমন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতি সকলের মনে রুষভীতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অপর দিকে রুষিয়ার বৃথা গর্ব্ব ও দর্পের মাত্রা সেই পরিমাণে বর্দ্ধিতভাবে দেখা দিতে লাগিল। পূর্ব্বপ্রান্তে মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, চীন প্রভৃতি হইতে পশ্চিমপ্রান্তে আফগানিস্থান ও পারস্য ও তুরস্ক পর্য্যন্ত রুষাতঙ্ক দেখা দিল। আবার শুভক্ষণে চীন-জাপান যুদ্ধ ঘটিল। সেই যুদ্ধে বিজয়ী জাপানের বিজয়-ফল-সদৃশ স্বকর-ন্যস্ত পোর্ট-আর্থার বন্দর রুষিয়ার চক্ষুশূল হইল। রুষিয়ার আত্মগরিমা চরমমাত্রায় জাগিয়া উঠিয়া নগণ্য ক্ষুদ্র হিদেন জাপানকে পোর্ট-আর্থার হইতে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিল। রুষ বহু অর্থব্যয় করিয়া পূর্ণগর্ব্বে পোর্টআর্থার বন্দরে এক অভেদ্য, অজেয় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে সুদৃঢ় করিল। এরূপ সুদৃঢ় দুর্গ পূর্ব্বাঞ্চলে আর ছিল না। যে সকল ইংরেজ সেই রুষিয়ানির্ম্মিত দুর্গ দেখিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারা জেদ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, "পোর্টআর্থার জয় করা কাহারো সাধ্য নাই!" রুষভল্লুক মুখব্যাদান করিয়া সমস্ত মাঞ্চুরিয়া দেশ আপন মুখগহ্বরে স্থাপন করিয়া কেবল গলাধঃকরণ করিবার উপক্রম করিল।* অমনি বিধির বিড়ম্বনায় সেই "নগণ্য, ক্ষুদ্র হিদেন" জাপান রুষিয়ার গলনলিতে কণ্টক-রূপে গিয়া বাধিল এবং সেই গ্রাস গলাধঃকরণে বাধা দিয়া জাপান রুষিয়ার ভয়ানক যন্ত্রণা উৎপাদন করিল। এলেক্‌সিপ্-প্রমুখ ভল্লুকগণ মহা হুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠিল। এদিকে অপমানে জর্জ্জরিত ক্ষুদ্র জাপান প্রতিহিংসার বহ্নি বুকে ধরিয়া অকুতোভয়ে সেই গর্জ্জনের উত্তর দিল। মাহেন্দ্রক্ষণে রুষ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই মহাযুদ্ধে বিজয়ী জাপান জগৎকে দেখাইল যে, আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও সাহস, তেজ, জেদ ও বুদ্ধি থাকিলে এবং আত্মবলি ও স্বার্থবলি দিতে জানিলে, প্রকাণ্ড বলশালী দৈত্যকেও পরাভব করা যায়! সেই মহাযুদ্ধের ফলে রুষিয়া প্রকাণ্ড-দেহধারী হইয়াও ক্ষুদ্রের নিকট পরাজিত হইয়া লজ্জায় মাথা অবনত করিল। আত্ম-অহংকারের ও বৃথা দর্পের কি দোষ, তাহা রুষিয়া বুঝিল।

সেই মহাহবের শুভফলে সমস্ত আসিয়া জাগিয়া উঠিল। জাপান নিঃশব্দে আত্মবলি দিয়া এক বৎসরে যে মহাফল প্রসূত করিল, বহুবৎসরব্যাপী বক্তৃতা, আলোচনা বা প্ররোচনা দ্বারা কিন্তু তাহা সম্ভব হইত না। প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা যে ফল হয়, বক্তৃতা বা লেখা দ্বারা সহসা সে ফল পাওয়া যায় না। এই কথাটী স্বদেশী লোককে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। জাপান যদি রুষ কর্তৃক পোর্টআর্থার হইতে অপমানিত ও লজ্জিত হইয়া তাড়িত না হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ রুষ-জাপান যুদ্ধ ঘটিত না। রুষ-জাপান যুদ্ধ না ঘটিলে খুব সম্ভব আসিয়ারও নিদ্রা এত শীঘ্র ভঙ্গ হইত না। এ কথা একরূপ নিশ্চয়-রূপে বলা যাইতে পারে। সুতরাং আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে সবল কর্তৃক দুর্ব্বল অত্যাচরিত ও প্রপীড়িত

---

* মাঞ্চুরিয়ার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহা আমেরিকার সাহিত্যপরিষদ্‌-কর্তৃক প্রেরিত ভ্রমণকারী মিঃগাইলের কথা দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে। তিনি সমস্ত মাঞ্চুরিয়া এবং চীনদেশ ভ্রমণ করিয়া ১৯০৩ সালে টেঙ্গিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট মাঞ্চুরিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন যে, Manchuria is gone. Li-Hung Chang (the Bismarck of China) has practically sold Manchuria to Russia. There are forts and Russian settlements everywhere in Manchuria. Manchuria could never be recovered by China.

না হইলে দুর্ব্বলের প্রাণে শক্তিসঞ্চার হয় না। বোধ করি দুর্ব্বলকে জাগাইবার জন্যই বিধাতার এ একটী বিধান। তার সাক্ষী বর্ত্তমান বঙ্গদেশ!

গত অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর হইল দুর্ব্বল চীনার উপর সবল কর্ত্তৃক বহু অত্যাচার হইয়াছে এবং হইতেছে। ক্রমাগত অত্যাচার সহ্য করিয়া আজ চীনার প্রাণে শক্তিসঞ্চার হইয়াছে। চীন আজি কুসংস্কার ও জাতীয় রক্ষণশীল স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যশাসননীতির ও সামাজিক দোষ সংশোধন এবং শিক্ষাসংস্কারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। বিনা শিক্ষায় রাজাশাসন, নীতিশিক্ষা বা সমাজ সংস্কার অসম্ভব। তাই সাধারণ শিক্ষার প্রতি চীনার আগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হইতেছে। চীনার সেই শিক্ষার আদর্শ জাপান। জাপানী আদর্শে শিক্ষার ঢেউ বিশাল চীন-সাম্রাজ্যের বড় ছোট সমস্ত নগর, উপনগর সকল প্লাবিত করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে।

চীনসাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশ সকলের তুলনায় ইউনান প্রদেশ অপেক্ষাকৃত কিছু পশ্চাৎপদ। সেই ইউনানের সর্ব্বপশ্চিম প্রান্তে টেঙ্গিয়ে সহরে ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের শিক্ষাপ্রণালীর যে পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে তাহাই উপলক্ষ্য করিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। উদ্দেশ্য আমার স্বদেশী লোককে চীনের প্রাচীন ও নব্য শিক্ষাপ্রণালীর আভাস দেওয়া মাত্র।

প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালী।

কোন বিষয়ে সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া মোটামোটী এদেশে তিন প্রকার শিক্ষার প্রথা দৃষ্ট হয়। যথাঃ—

১। প্রাথমিক বা সাধারণ শিক্ষা।

২। মাধ্যমিক বা শিল্প বাণিজ্য শিক্ষা।

৩। উচ্চ শিক্ষা।

১। প্রতি সহরে ও পল্লীগ্রামে বহু সংখ্যক দেবমন্দির আছে। এই মন্দিরগুলি অতিপ্রশস্ত এবং নানা বিভাগে বিভক্ত। সাধারণ শিক্ষার জন্য প্রায় প্রতি মন্দিরেই পাঠশালা আছে। ঠিক ব্রহ্মদেশেও এই প্রকার প্রতি মঠে ও ফুঙ্গি চাঁয়ে পাঠশালা দৃষ্ট হয়। এই সকল পাঠশালায় অধিকাংশেই হাতের লেখা পোক্ত করা, মোটামোটী হিসাব শিক্ষা করা এবং সহজ সহজ পুস্তক সকল পড়িতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ভদ্র হইতে কৃষক, কুলি মজুরের ছেলে পি[illegible] পর্য্যন্ত এখানে প্রাথমিক শিক্ষা পায়। বর্ত্তমানে জাপা[illegible] ভিন্ন এই প্রকার সাধারণ শিক্ষার প্রাচুর্য্য প্রথম ব্রহ্মদে[illegible] দ্বিতীয় চীনদেশ ভিন্ন আসিয়ার অন্য সকল দেশে দৃষ্ট হ[illegible] কি না সন্দেহ। প্রতি ছাত্র বৎসরে অবস্থানুসারে এ[illegible] শিক্ষানুসারে প্রতি বৎসর ২৲ টাকা হইতে ১৫।২০ টা[illegible] পর্য্যন্ত দিয়া থাকে।

২। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, যে সকল ছাত্রে[illegible] বয়স হইয়াছে, যাহাদের কোন একটা ব্যবসা শিক্ষা করি[illegible] জীবিকার্জ্জনের প্রয়োজন, তাহাদের আপন আপন রু[illegible] অনুসারে বা সুবিধানুযায়ী কেহ কোন মহাজনের গদিতে [illegible] দোকানে শিক্ষানবিশ নিযুক্ত হয়, কেহ স্বর্ণরৌপ্যের কা[illegible] শিক্ষার জন্য কোন দোকানে প্রবেশ করে, কেহ বা সূত্রধরে[illegible] কার্য্য শিখিতে আরম্ভ করে, কেহ রংএর কার্য্য, কেহ [illegible] চামড়ার কার্য্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে। এ[illegible] শিক্ষানবিশগণ বিনা বেতনে তিন বৎসর শিক্ষানবিশ রূপে[illegible] কার্য্য শিক্ষা করিতে বাধ্য। ইহারা খোরাকীটী দোকানদার ব[illegible] আড়ত হইতে পাইয়া থাকে। তিন বৎসর সমাপ্ত হইলে[illegible] নিজে স্বাধীনভাবে কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করে বা কাহারে[illegible] বেতনভোগী হইয়া চাকরি গ্রহণ করিয়া থাকে।

৩। প্রাথমিক শিক্ষায় যে সকল ছাত্রের মেধার পরিচ[illegible] পাওয়া যায়, এবং যাহাদের অবস্থা ভাল, আশু অ[illegible] উপার্জ্জনের যাহাদের প্রয়োজন নাই, সেই সকল ছা[illegible] ক্রমে দুরূহ বিষয় এবং প্রাচীন সাহিত্য ইত্যাদি শিক্ষা করিতে থাকে।

এদেশীয় প্রাচীন উচ্চশিক্ষা প্রণালীর আমাদিগের বর্ত্তমা[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়; কিন্তু এদেশের উচ্চশিক্ষায় মাত্র প্রাচীন (Classic) সাহিত্য, রচনা, হস্তলিপি, এবং চীনদেশের ইতিহাস কতকটা শিক্ষা দেওয়া হয়। এদেশের প্রাচীন উচ্চ শিক্ষা প্রণালীতে নিম্নলিখিত ডিগ্রি বা উপাধির জন্য পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে।

১। সেউ-ছাই। যে সকল ছাত্র এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে তাহারা আপন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বা ডেপুটী

ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক প্রথমে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ "সেউ-ছাই" পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং আমাদিগের প্রবেশিকা পরীক্ষার সঙ্গে এই পরীক্ষার মিল দৃষ্ট হয়।

প্রতি তিন বৎসর অন্তর প্রত্যেক ডিবিশন্যাল্ কমিশনারের তত্ত্বাবধানে এই পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। পেকিন হইতে পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিয়া এই পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। যত পরীক্ষার্থী আপন আপন দরখাস্ত এবং সচ্চরিত্রের প্রশংসাপত্র সহ এক কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত হন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার স্থানীয়। ইনি যদি কাহারো সচ্চরিত্রতা বা বংশমর্য্যাদার প্রতি সন্দেহ করেন তাহা হইলে সেই ছাত্র পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারে না। এই "সেউ-ছাই" পরীক্ষা গ্রহণের জন্য যে পরীক্ষক আইসেন, তাঁহাকে "স-ওয়েন" বলে। মোহরযুক্ত প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত কাগজ তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়। তিনি পরীক্ষার কাগজ সকল দেখিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে "সেউ-ছাই" উপাধির জন্য সুপারিশ করেন।

২। লিং-ছেন। কোন বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র লিং-ছেন উপাধি পাইয়া থাকেন।

৩। কুং-ছেন। লিং-ছেন উপাধিধারী ব্যক্তি তিন বৎসর অন্তর কোন প্রদেশের প্রধান নগর বা হেড কোয়ার্টার, যথায় গবর্ণরজেনেরালের বাস, তথায় পরীক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হন। এই পরীক্ষার জন্য প্রতি তিন বৎসর পেকিন রাজদরবার হইতে পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তাঁহাকে "চু-খাও" বলে। গবর্ণরজেনেরালের তত্ত্বাবধানে এই পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। এই পরীক্ষায় "লিং-ছেন" উপাধিধারী উত্তীর্ণ হইলে "চি-জেন" উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু পরীক্ষায় পুনঃ পুনঃ অনুত্তীর্ণ হইয়া দ্বাদশ বৎসরকাল যিনি অপেক্ষা করিতে পারেন, তাঁহাকে "কুং-ছেন" উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

৪। চি-জেন। "সেউ-ছাই" উপাধিধারী "লিং-ছেন" বা "কুং-ছেন" উপাধির পরীক্ষা না দিয়া একেবারে চি-জেন উপাধির পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে তিনি "চি-জেন" উপাধি পাইতে পারেন। সম্মানে "চি-জেন," লিং-ছেন বা কুং-ছেন হইতে শ্রেষ্ঠ।

৫। চিন-ছে। এই পরীক্ষা প্রতি তিন বৎসর অন্তর পেকিনে গৃহীত হইয়া থাকে। যিনি এই পরীক্ষা গ্রহণ করেন তাঁহাকে "ছুং-ছাই" বলে। প্রাদেশিক প্রধান নগরে যে "চি-জেন" উপাধির পরীক্ষা হয়, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ব্যতীত এই পরীক্ষায় আর কেহ উপস্থিত হইতে পারে না। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র "চিন-ছে উপাধি পাইয়া থাকেন।

৬। হান্‌লিন্। যে সকল ছাত্র সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পেকিনে তিন বৎসর থাকিয়া তবে "হান্‌লিন্" পরীক্ষা দিয়া থাকেন। এই "হান্‌লিন্" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে যিনি সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করেন তাঁহাকে (ক) চোয়াং ইয়েন, (খ) দ্বিতীয়ছাত্র—পাং ইয়েন, (গ) তৃতীয়ছাত্র—ঠান্ হোয়া (ঘ) চতুর্থ ছাত্র—কুয়েন-লু উপাধি এবং তদ্ব্যতীত আর সমস্ত উত্তীর্ণ ছাত্রকে হান্‌লিন্ উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হইয়া থাকে। ইহাকে Honor পরীক্ষার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।

এই সকল উপাধিধারী ব্যক্তিগণ রাজদরবারে মহা সম্মান পাইয়া থাকেন। ইঁহাদের কেহ কোন গুরুতর অপরাধ করিলে সাধারণ অপরাধীর ন্যায় ইঁহাদিগকে হাত-কড়া দেওয়া আদেশ নাই। উপাধি অনুসারে আরো নানা-প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রভেদ ও আচার ব্যবহার আছে। তাহা লিখিয়া প্রবন্ধ বাড়াইবার ইচ্ছা করি না। এই সকল উপাধিধারীগণের যদি কেহ খুন অপরাধে অভিযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার উপাধি গবর্ণমেণ্ট প্রত্যাহার না করা পর্য্যন্ত তাঁহার কোন শাস্তি হইতে পারে না।

"হান্‌লিন্" পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম ব্যক্তি আপন টুপি বা শিরোভূষণে হীরক বা মূল্যবান্ শ্বেতপ্রস্তরের চুড় (white button) পরিধান করেন, আর অপর সকলেই স্বর্ণময় চুড় ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাকে uniform বলা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন কোন কোন উপাধি অর্থ দ্বারা ক্রয় করা যাইতে পারে। যথা "চিয়েন-সেন্" নামক উপাধি ২১ টেল বা প্রায় ৪২৲ টাকা দিলে খরিদ করা যায়। যিনি এই উপাধি খরিদ করেন, তিনি "চি-জেন" উপাধির পরীক্ষা দিতে পারেন। আবার "সেউ-ছাই"

উপাধিধারী ব্যক্তি প্রায় ৪২ টাকা খরচ করিলে "কুং-ছেন" উপাধি খরিদ করিতে পারেন। এই উপাধি ক্রয়ের মূল্য সর্ব্বত্র সমান নহে। কোন কোন স্থানে কোন মাজিষ্ট্রেটের পদ খরিদ করিতে প্রায় ৬০০০৲ টাকা মূল্য দিতে হয় এবং কমিশনারের পদ খরিদ করিতে প্রায় ৪০,০০০৲ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হয়, ইত্যাদি। শুনিয়াছি, আমেরিকার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি, উপাধিও নাকি অর্থ দ্বারা খরিদ করা যাইত। চীনদেশের প্রাচীন শিক্ষা প্রণালীতে সাহিত্য ও ইতিহাস ভিন্ন, গণিতশাস্ত্র, ভূগোল ও বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চ্চা আদবেই ছিল না। চীনভাষায় কোনব্যাকরণ নাই। সুতরাং ছাত্রগণ সে আপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে চীনদেশের শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। আমাদিগের প্রাচীন ধরণের শিক্ষাপ্রণালীতে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ছোট বড় সকল লোকের ছেলেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিত। তথায় গুরুমহাশয় শতকিয়া, কড়াকিয়া, ফলা, বানান, নাম, পত্রাদি লিখিতে শিক্ষা দিলেই তাঁহার বিদ্যার শেষ সীমার সঙ্গে পড়ুয়াগণের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইত। পেতো পড়ুয়া অপেক্ষা কাগজ্যে পড়ুয়ার সম্মান অধিক ছিল। সর্দ্দার পড়ুয়া অনেক সময়ে গুরুমহাশয়ের প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতেন।

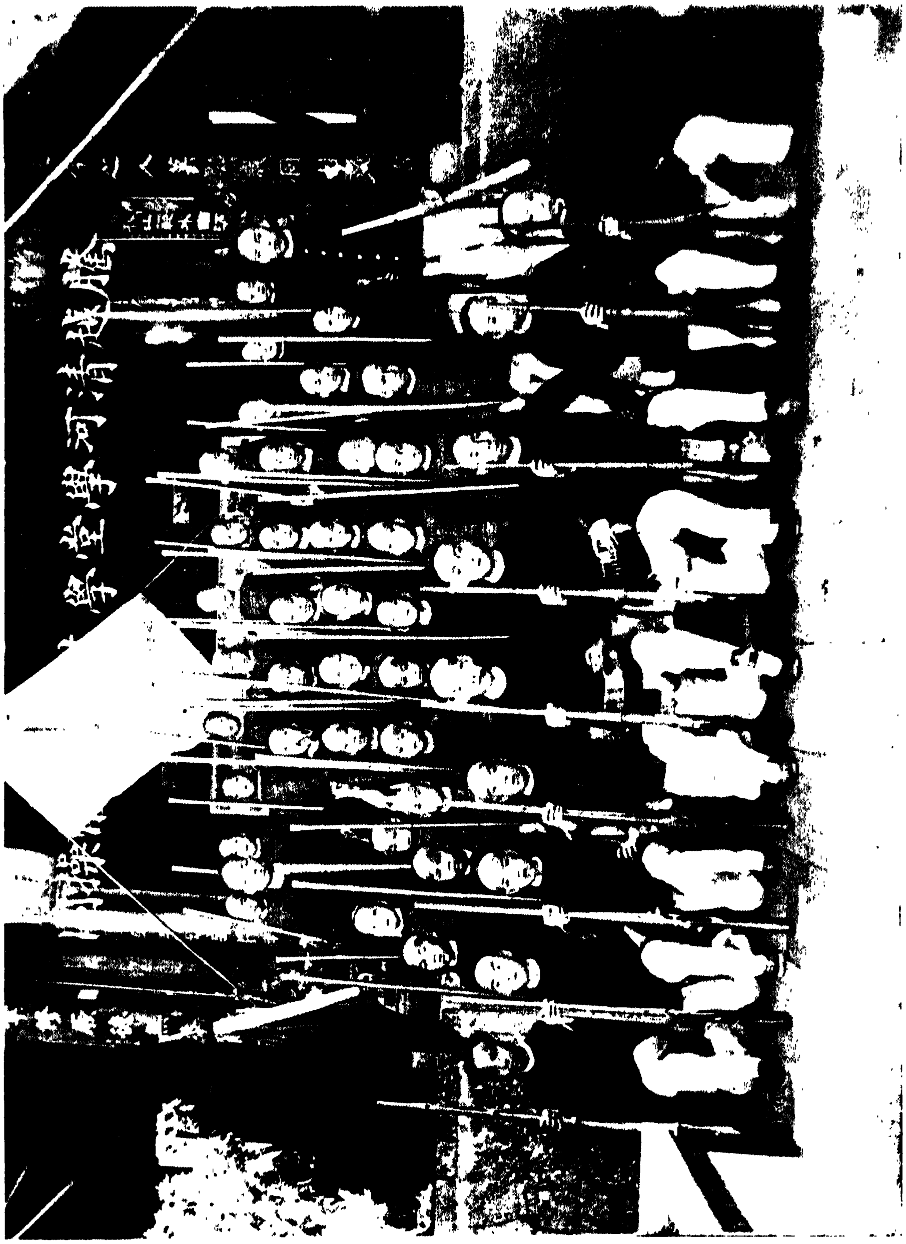
এই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অবস্থানুসারে কেহ কেহ মহাজনের গদিতে শিক্ষানবিশ হইয়া মহাজনী কার্য্য শিক্ষা করিতেন, কেহ বা জমিদারের সেরেস্তায় শিক্ষানবিশ হইয়া জমিদারির কার্য্য শিক্ষা করিতেন। এই শিক্ষা প্রণালীকে চীনদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। তবে এদেশে জমিদারির প্রথা প্রচলিত নাই। জমিদারি শিক্ষার পরিবর্ত্তে চীনারা রাজকার্য্যের দপ্তরে শিক্ষানবিশি করিতে পারে।

চীনদেশের উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে আমাদের দেশের টোলের উপাধি পরীক্ষার কতকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। চীনদেশের একের পর অন্য উপাধির জন্য ক্রমে পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে হয়, আমাদের পণ্ডিতী উচ্চ শিক্ষা কিন্তু সে ধরণের নহে। একই পরীক্ষা। কেহ পনর বিশ বৎসর যাবৎ আলোচাল আর কাঁচকলা খাইয়া অবশেষে নবদ্বীপ গিয়া উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিয়া থাকেন। যাঁহার যেমন মেধা ও বুদ্ধির তেজ শ্রাদ্ধের মজলিশে তাহার পরিচয়। যিনি তর্ক ও বিচারে সকলকে পরাস্ত করিতে পারেন, তিনি ষোল আনা বিদায় পান অর্থাৎ প্রথম নম্বরের পণ্ডিত তিনি। এই মত বিচারের ফলাফলানুসারে কেহ চৌদ্দ আনা, বার আনা বিদায় ইত্যাদি পাইয়া থাকেন। চীনদেশী পণ্ডিতগণের ন্যায় আমাদের পণ্ডিতগণের ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃত বিদ্যা একই প্রকার। চীনদেশী পণ্ডিত স্বদেশী ইতিহাস শিক্ষা করেন, আমাদের দেশী পণ্ডিত তাহার পরিবর্ত্তে ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আমাদের সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাচীন চীন ভাষার তুলনা করা যায়। সংস্কৃতও সাধারণ লোকে বোঝে না, প্রাচীন চীনভাষাও সাধারণ চীনা বুঝিতে পারে না। উভয় দেশী পণ্ডিতগণের উভয় দেশীয় দুর্ব্বোধ্য ভাষা অধ্যয়ন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের প্রাচীন উচ্চ শিক্ষারূপ পণ্ডিতী করিতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারো অধিকার ছিল না। কিন্তু এ দেশে তাহা নাই।

নূতন শিক্ষাপ্রণালী।

আমাদের দেশে যেমন নূতন প্রণালীর প্রবর্ত্তন প্রযুক্ত শিক্ষাপ্রণালীতে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে এ দেশেও সেই যুগান্তরের সুরু হইয়াছে। জাপানী আদর্শে চীন ভাষায় সরল সরল পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে; গণিত, ইতিহাস, ভুগোল, বিজ্ঞানাদির গ্রন্থসকল রাশি রাশি প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। ইংরেজী শিক্ষার জন্য চীনা ইংরেজী ভাষায় সরল সরল নানাবিধ পুস্তক বাজারে বিক্রীত হইতেছে। লোকে আগ্রহের সহিত সেই সকল অধ্যয়ন করিয়া আপনাদের কুসংস্কার দুর করিতেছে। শিক্ষাপ্রণালী এত সহজ করা গিয়াছে, যে, পূর্ব্বে যে বিষয় শিক্ষা করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হইত এইক্ষণ সেই বিষয় শিক্ষা করিতে তাহার অর্দ্ধেক সময় প্রয়োজন হয় না। যেমন পূর্ব্বে আমাদের দেশে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে হইলে ৫।৭ বৎসর মাত্র এক কলাপ ব্যাকরণই মুখস্থ করিতে হইত, কিন্তু এইক্ষণ ব্যাকরণ-কৌমুদী প্রভৃতি প্রণয়ন প্রযুক্ত সংস্কৃত শিক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে।

জাপান ও সাংহাই হইতে প্রতি ডাকে রাশি রাশি সংবাদ পত্র আসিয়া শিক্ষিত লোকের প্রতি গৃহে পঠিত



স্কুলের কাওয়াৎ শিক্ষা।

হইতেছে। এবং ইহার দ্বারা চীন জাতির মধ্যে এক নূতন ভাব ও তেজের সৃষ্টি করিয়া দিতেছে। স্কুলের ছাত্রগণকে কাওয়াৎ বা Drill শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কি করিয়া লড়াই করিতে হয়, কি করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, ছোট ছোট বালকগণের প্রাণে সেই মন্ত্রবীজ নিহিত করিয়া দেওয়া হইতেছে। কালে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া মহা বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইবে এমন আশা করা যায়।

টেঙ্গিয়ে হইতে তিন মাইল দূরে "হোসেনশাং" নামক এক বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী আছে। এই গ্রামে বহু ধনী মহাজনের বাস। এই গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ৬০০০ হাজার হইবে। তিন চারিটী পাঠশালা এই গ্রামে আছে। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৪০০ চারিশতের অধিক হইবে। একজন ধনী মহাজন, যাঁহার বাড়ী চিকিৎসার্থ আমি যাতায়াত করিতাম, এক দিন আমাকে তাঁহার পাঠশালা পরিদর্শন করিতে আহ্বান

করিলেন। পাঠশালা একটী সুন্দর মন্দির মধ্যে। ভিতরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং দেখিতে চমৎকার। তাঁহার স্কুলের ছাত্রগণের ড্রিল বা কাওয়াৎ আমাকে দেখাইলেন ও ছাত্রদের আদব কায়দা, কাওয়াতের ধরণ এবং discipline দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। ছাত্রগণকে উপদেশ দিবার জন্য চীন ভাষায় নীতিবিষয়ক কতকগুলি উপদেশ লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলাম; সেই উপদেশগুলি পাঠ করিয়া শুনাইলে নবীন ও প্রাচীন যত লোক উপস্থিত ছিলেন সকলেই আমার প্রতি মহা সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। শিক্ষিত বালকগণের মুখ দিয়া চীন ভাষায় আমার প্রশংসাবাদ করাইয়া সমস্ত ছাত্র ড্রিলের কায়দানুসারে আপন আপন দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক বদ্ধ মুষ্টি করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে সকলে এক যোগে সটান করিয়া আমাকে দেখাইয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিল। উৎকৃষ্ট ভাষাদ্বারা যে প্রশংসা প্রকাশ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারা যায় না, তাহাই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া প্রকাশ করা চীনদেশের নিয়ম। যাহাকে নিন্দা করিতে হইবে বা গালি দিতে হইবে তাহাকে কনিষ্ঠাঙ্গুলি দেখাইলেই চূড়ান্ত হইল।

এই পাঠশালায় ড্রিলের যে ফোটো তুলিয়াছি তাহার এক কাপি পাঠাইলাম। এই ছাত্রগুলি এক চাং পরিবারের ছেলে; অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন বাটীতে বাস। ছাত্রগণের সম্মুখের সারির হাতে রাইফল ও বন্দুক, কিন্তু পশ্চাতের ছেলেদিগের হাতে বাঁশের লাটি। একখানি তরবারি হস্তে যিনি দণ্ডায়মান, তিনিই প্রধান শিক্ষক। ইনি "চি-জেন" উপাধিধারী পণ্ডিত। ইনিও চাং পরিবারের লোক। চীনজাতীয় পতাকায় নাগ বা Dragonএর চিত্র দৃষ্ট হইবে।

বর্ত্তমান বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী নিজে লেখা পড়া জানেন। স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও স্বাধীনতাসম্বন্ধে একজন ইংরেজ রমণী সম্রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মনের ভাব যাহা জানিতে পারিয়াছেন তাহা এই :—

"Her majesty asked me how many children I had. And when I replied by an avowal of my single state, the Empress was astonished." "Her majesty cannot understand how the young ladies of the West can leave their paternal roofs and travel so far. Her majesty wishes to know what my father said when I left him and if he will forgive me." * * * * "She declared emphatically that the yellow races could make no progress until they had decided upon the emancipation of woman. For her own part, she was firmly resolved to give every encouragement to the movement and had commenced by prohibiting Chinese mothers from deforming the feet of their daughters." * * * * * I hope that before twenty-five years have passed every woman in the Empire will have feet like these."

রাজ্ঞী ইংরেজ মহিলাকে তাঁহার কথার সত্যতা প্রমাণার্থ তাঁহার পরিচারিকাগণের পদ দেখাইলেন।

স্ত্রীশিক্ষা এ দেশে আদবেই নাই। তাহা একটী কথা দ্বারা প্রমাণিত হইবে। কোন ছোট ছোট ছেলেপিলে দেখিয়া সে বালক কি বালিকা জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতে হইলে, বলে, "চৈইন কান্-টি, কে তুশু-টি ?" অর্থাৎ "ছেলেটা ভাত রাঁধার, কি লেখা পড়া শিখার ?" ভাত রাঁধার বলিলে মেয়ে বুঝায়।

শ্রীরামলাল সরকার।

মহাভারত এবং রামায়ণের ছন্দ।

মহাভারত এবং রামায়ণে ২৪।২৫টি বিবিধ ছন্দের রচনা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অধিকাংশ রচনা, শ্লোক এবং ত্রিষ্টুভ ছন্দে। এই দুইটি ছন্দই খুব প্রাচীন, এবং বৈদিক অনুষ্টুভ ও ত্রিষ্টুভ হইতে উহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উৎপত্তি। সুবৃহৎ মহাভারতের ৯৫ ভাগ ঐ দুই ছন্দে রচিত, এবং অবশিষ্ট ৫ ভাগ কেবল অন্যান্য নূতন ছন্দে রচিত। উভয় গ্রন্থেরই রচনা-কাল ও প্রক্ষিপ্ত-রচনার বিচারের জন্য এবং দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে কোন্ খানি প্রথমে রচিত, তাহা জানিবার জন্য অন্যান্য কথার বিচারের সহিত এই ছন্দগুলির সমালোচনার প্রয়োজন।

বৈদিক অনুষ্টুভ ও ত্রিষ্টুভ।—খাঁটি বৈদিক অনুষ্টুভ (শ্লোক) এবং ত্রিষ্টুভের রচনা, রামায়ণে নাই; কিন্তু মহাভারতে আছে। আছে বটে, কিন্তু উহার দৃষ্টান্ত এত অল্প, যে মহাভারত সংহিতায় উহা প্রাচীন কালের রচিত কয়েকটি পদ্যের সঙ্কলন মাত্র মনে করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব বিষয় সংগ্রহ এবং প্রক্ষিপ্ত রচনার বিশেষ বিচারের সময় ঐ রচনা কয়েকটির সমালোচনা হইতে পারে, এখানে নহে; কিন্তু

রামায়ণ এবং মহাভারতের ছন্দগুলি বুঝিয়া লইবার জন্য বৈদিক ছন্দের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিবার প্রয়োজন।

বৈদিক অনুষ্টুভ,—আটটি অক্ষরের এক একটি চরণের চারিটি চরণে রচিত। উহার দুইটি চরণকে এক চরণ করিয়া লইলেই প্রায় শ্লোক হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু অবৈদিক শ্লোকে পদগুলির হ্রস্বদীর্ঘের যে বাঁধা নিয়ম আছে, অনুষ্টুভে তাহা নাই। বৈদিক ত্রিষ্টুভ, সাধারণতঃ এগারটি অক্ষরের চরণে নিবদ্ধ; ঐ ছন্দেই একটি অক্ষর বেশী হইলে তাহার নাম হইল জগতী। এই ত্রিষ্টুভেও উপেন্দ্রবজ্রা এবং বংশস্থবিলাদির কড়া কড়ি নিয়ম নাই। মহাভারত এবং রামায়ণের শ্লোক রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়, এক একটি শ্লোকে এক একটি অতিরিক্ত চরণ যোজিত আছে; উহাও প্রাচীন রীতির আদর্শে হইয়াছিল। বৈদিক অনুষ্টুভে তিনটি চরণের পদ্য আছে; শ্লোকের হিসাবে ধরিলে উহা দেড়টি চরণের একটি পদ্য হইত। তিন চরণের অনুষ্টুভের নাম গায়ত্রী, পাঁচ চরণের অনুষ্টুভের নাম পংক্তি, এবং ছয় চরণের অনুষ্টুভের নাম মহাপংক্তি। মহাভারত এবং রামায়ণের তিন চরণের শ্লোককে—অক্ষরের বাঁধাবাঁধি নিয়ম উপেক্ষা করিলে,—মহাপংক্তি বলা যাইতে পারে। বৈদিক ত্রিষ্টুভেও কোথাও বা অর্দ্ধ ত্রিষ্টুভ (দুই চরণ) আছে, কোথাও বা তিন চরণের ত্রিষ্টুভ আছে। অর্দ্ধ ত্রিষ্টুভের নাম দ্বিপদাবিরাজ্ এবং শেষোক্তটির নাম বিরাজ। একালের বাঁধা নিয়ম উপেক্ষা করিয়া উপেন্দ্রবজ্রাদিকে ত্রিষ্টুভ বলিলে, মহাভারতে দ্বিপদাবিরাজের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বৈদিক বার অক্ষরের জগতী নানারূপে ত্রিষ্টুভের সহিত মিশ্রিত পাওয়া যায়। এই মিশ্রিত ছন্দ, ককুভ্, বৃহতী, উষ্ণী, এবং অত্যষ্টি প্রভৃতি নামে আখ্যাত। রামায়ণের উপজাতি, একটি বিশেষ নিয়মে বদ্ধ; কিন্তু মহাভারতের উপজাতিতে অনেক পরিমাণে বৈদিকমিশ্রিত ছন্দের স্বাধীনতা আছে। ত্রিষ্টুভের বিশেষ দৃষ্টান্তে তাহা দেখাইব।

কয়েকটি বৈদিক ছন্দের দৃষ্টান্ত না দিলে অনেকে উহার প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিলেও, হ্রস্ব দীর্ঘ করিয়া পড়িয়া গেলে ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে পারা যাইবে।

তু অম্ বলস্ত গোমতাঃ
অপাবরদ্রিবো বিলম্
তু অংদেব অবিভ্যুষম্
তুয্যমানা স আবিষুঃ। (অনুষ্টুভ)

বৃহস্পতিঃ প্রথমং যাজমানঃ
মহো জ্যোতিষঃ পরমে বিত্তমন্
সপ্তাসি অস্ত বিজাতো রবেণ
বি সপ্তরশ্মি রধমৎ তমাংসি। (ত্রিষ্টুভ)

পদ্যের প্রত্যেক পাদ অন্য পাদ হইতে স্বতন্ত্র; অন্য চরণের সহিত যোজনা না করিয়াই এক এক চরণের স্বাধীনতা রাখা হইয়াছে। এই জন্য যেখানে প্রথম পাদের শেষের সহিত পরপাদের প্রথমের সন্ধিযোগের কথা, সে স্থানে সন্ধিযোগ নাই। পরবর্ত্তী সময়ে যখন সন্ধির কড়াকড়ি নিয়ম হইয়াছিল, তখন বৈদিক পদগুলি সন্ধিযুক্ত করিয়া লিখিত হইতে আরব্ধ হইল; কিন্তু পাঠের বা সুরের নিয়মে, পূর্ব্ববৎ সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া পড়িবার নিয়ম রহিয়া গেল। এই জন্য এ কালের পাঠ দেখিয়া, কেহ সুর করিয়া বেদ পাঠ করিতে পারেন না; সুরটুকুও শিখিতে হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। এ কালের পাঠে পাওয়া গেলঃ—"বয়মদ্যেন্দ্রস্য প্রেষ্ঠাঃ"; কিন্তু যদি প্রাচীনকালের নিয়মে (অথবা পড়িবার সুরে) লেখা যায়, তাহা হইলে এইরূপ শুদ্ধ পাঠ হইবেঃ—"বয়ং অদ্য ইন্দরস্য প্রয়িষ্ঠাঃ"। ইন্দ্র, বৈদিকযুগে ইন্দর উচ্চারিত হইতেন; তবে "ই"টি দীর্ঘ উচ্চারিত হইত। সন্ধির মহা গোলযোগ নাই দেখিয়া, পণ্ডিতেরা বলেন, যে ঐ ভাষা এককালে কথোপকথনের ভাষা ছিল।

মহাভারত এবং রামায়ণের রচনাকালের সন্ধির বাঁধা বাঁধি নিয়ম চলিয়াছিল; কিন্তু প্রতিপাদ এবং প্রতিচরণ স্বতন্ত্র ভাবে যাহাতে উচ্চারিত হয়, এবং অর্থের জন্য অন্য পাদের সহিত অচ্ছেদ্যরূপে যাহাতে মিলিত না হয়, সে রীতিও কিছু কিছু ছিল। এই জন্য সন্ধির নিয়মপালনের জন্য অথবা 'চবৈতুহি' দ্বারা পাদে পাদে যোগ সাধনের প্রয়াসও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

পুরা কৃত্য যুগে তাত॥ (হ্যা-) আসীৎরাজা (হ্য-) অকম্পনঃ

যদিও ষোল অক্ষরের এক এক চরণের দুই চরণে শ্লোক

রচিত তথাপি মহাভারতের মূল গল্পটির রচনায়, পাদে পাদে এমন সুন্দর পার্থক্য আছে, যে শ্লোক গুলি চারি চরণে বসাইয়া দিতে পারা যায়। যথা—

(১) না তন্ত্রী বিদ্যতে বীণা॥ না চক্রো বিদ্যতে রথঃ।

(২) কিং নুমেস্যাদিদং কৃত্বা॥ কিং নুমেস্যাদ কুর্ব্বতঃ। ইত্যাদি

জোর করিয়া অষ্টম অক্ষরে বিরাম খুঁজিতে হয়, এরূপ রচনা মহাভারতে বিরল। ঐ প্রকার রচনা দেখিলেই, উহার সময় সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হয়; যথা—

দৃশ্যতে ত্বিধর্ম্মরূপেনা ধর্ম্মং প্রাকৃত শ্চরণ্

সমাসাদি দ্বারাও পাদে পাদে অচ্ছেদ্য মিলনের দৃষ্টান্ত, মহাভারতের মূল গল্পে বড় বিরল: নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত, মহাভারতে বড় কচিৎ, যথা—

মহামণি শিলা পট্ট-বদ্ধ পর্য্যন্ত বেদিকাং। ইত্যাদি।

জোর করিয়া বিরাম, পাদে পাদে অচ্ছেদ্যতা প্রভৃতি শ্লোক রচনায় অতিপরবর্ত্তী কালের প্রকৃতি, গীতা এবং হরিবংশে প্রচুর পরিমাণে আছে।

সংস্কৃত ত্রিষ্টুভ—খাঁটি ত্রিষ্টুভ, এগার অক্ষরের চরণের চারিচরণের কবিতা; এবং উহার শেষে একটি অতিরিক্ত দীর্ঘ অক্ষর যুক্ত হইলে জগতী হয়; একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বৈদিক্ ত্রিষ্টুভ এবং জগতী হইতে, যে কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দ সাক্ষাৎসম্বন্ধে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং যে গুলি খুব প্রাচীন, তাহাদের নাম (১) উপেন্দ্রবজ্রা, (২) ইন্দ্রবজ্রা, (৩) বংশস্থবিল, (৪) ইন্দ্রবংশা, এবং (৫) উপজাতি।

উপেন্দ্রবজ্রা এবং ইন্দ্রবজ্রায় প্রভেদ এই, যে ইন্দ্রবজ্রায় প্রথম অক্ষর গুরু। উপেন্দ্রবজ্রা এবং ইন্দ্রবজ্রায় চরণের শেষ অক্ষর হ্রস্বও রাখা যাইতে পারে; কারণ ঐ শেষ হ্রস্ব, দীর্ঘের মতই উচ্চারিত হয়। এই শেষোক্ত প্রকার উপেন্দ্রবজ্রা এবং ইন্দ্রবজ্রার চরণে যদি একটি অতিরিক্ত গুরু অক্ষর যোগ করা যায়, তাহা হইলে ক্রমান্বয়ে—বার অক্ষরের জগতী-জাতীয় বংশস্থবিল এবং ইন্দ্রবংশা হইয়া গেল। এই চারিটি ছন্দ লইয়া যে সকল রচনা হয়, তাহার নাম উপজাতি। মহাভারতের উপজাতিতে বৈদিক রচনার স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায়: অর্থাৎ একটি কবিতার চারি চরণে, উক্ত চারি চরণে, উক্ত চারিটি ছন্দের যে কোনটির এক একটি চরণ থাকিতে পারে। রামায়ণের উপজাতিতে এই স্বাধীনতা নাই; এই উপজাতি, আলঙ্কারিক কাব্যযুগের রচনার ম[illegible] নিয়মবদ্ধ এবং সুনির্দ্দিষ্ট।

ত্রিষ্টুভের ক্রম বিকাশেই শালিনী এবং বাতোর্ম্মির জ[illegible] বটে; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে। শালিনী এবং বাতো[illegible] (মহাভারতের কথা ছাড়িয়া দিলে), হালের রচনায় ভি[illegible] পাওয়া যায় না। রামায়ণে ত শালিনী এবং বাতোর্ম্মি[illegible] দৃষ্টান্ত নাই। মহাভারতের ত্রিষ্টুভ এবং জগতীর পা[illegible] কোথাও কোথাও এক একটি চরণ, শালিনী বা বাতো[illegible] হইয়া গিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ঐগুলিও খুব সন্দেহ যুক্ত স্থান। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শালিনী কেবল এই কয়েক[illegible] দৃষ্টান্ত মহাভারতে পাওয়া যায়; যথা—আদি ৫৮অ, ১৯ ২১; বন ৪ অ, ৪; দ্রোণ ৫৪ অ, ৪০; উদ্যোগ ৩৩ অ ১১[illegible] এবং উদ্যোগ ৪০ অ, ২৯। ইহাদের মধ্যেও আবার আ[illegible] ৫৮, ২১; এবং উদ্যোগ ৩৩—১১৫, সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ শালিনী মহাভারতের শালিনী ছন্দের চরণে কোথাও কোথাও যাহ বাতোর্ম্মির এক একটি চরণ পাওয়া যায়, সেই পর্য্যন্ত; পূ[illegible] বাতোর্ম্মি একটিও নাই।

গণচ্ছন্দ—গণচ্ছন্দ, অর্থাৎ আর্য্যা, গীতি, এবং উপগীতি প্রাচীন পালি রচনায় পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃ[illegible] রচনায় কুত্রাপি ব্যবহৃত দেখা যায় না। এই প্রাকৃত ছ[illegible] যে কখন্ প্রথমতঃ সংস্কৃত রচনায় গৃহীত হইয়াছিল, তাহ স্থির করা দুঃসাধ্য। সমগ্র অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের ম[illegible] কেবল অনুশাসন পর্ব্বের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ৬টি আর্য্যা রচিত কবিতা আছে। এই অধ্যায়টিই যে সম্পূ[illegible] প্রক্ষিপ্ত তাহা দেখান যাইতে পারে। এ বিষয়ে অন্য প্রব[illegible] লিখিতেছি।

গদ্যপদ্যযুক্ত রচনা—লৌকিক কথা বা আখ্যান লই[illegible] যখন প্রথম কাব্য রচিত হয়, তখন সেই কাব্য কি রীতিতে রচিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা সহজ নহে। অন্যা[illegible] দেশের কাব্যের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশপ্রসঙ্গে সুপণ্ডি[illegible] ওলডেন্‌বর্গ দেখাইয়াছেন, যে প্রথমে গদ্য কথার সঙ্গে এক পদ্য জুড়িয়া, কাব্যের উৎপত্তি। ধীরে ধীরে পরবর্ত্তী সম[illegible] পদ্যে পদ্যে যোগ করিয়া দিবার জন্য যে গদ্য থাকিত, অথব আরম্ভরূপে যে গদ্য থাকিত, তাহাও পদ্যে পরিণত হই[illegible] সমগ্র কাব্য পদ্যে রচিত হইয়াছিল। রীস্ ডেবিডস্ অ[illegible]

দক্ষতার সহিত দেখাইয়াছেন, যে, যে সময়ে প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায় (অর্থাৎ পালি ভাষায়) আখ্যানাদি রচিত হইয়াছিল, তখন গদ্য পদ্য জুড়িয়া রচনা করা হইয়াছিল। যে কোশল দেশে রামায়ণ রচিত, সেই দেশেই বৌদ্ধপ্রভাব অধিক ছিল; এবং সেই দেশের পুরাতন পালি রচনায়, অন্যান্য দেশের মত স্বাভাবিক ভাবে গদ্যপদ্যযুক্ত রচনায় কাব্যের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেশের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরাই পালিতে রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাও খুব বেশী ছিল। নিরবচ্ছিন্ন পদ্যে কাব্য রচনা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবার পর, যে রীতিতে কাব্য উৎপত্তি হয় বলিয়া অন্য দেশের দৃষ্টান্তে জানা যায়, সেই রীতি অবলম্বন করিয়া কেহ কাব্য রচনা করেনা। বরং পালি রচনা দেখিয়া তৎকালে কাব্য কিরূপ ভাবে রচিত হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যে সময়ে মহাভারত রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে সম্পূর্ণ পদ্যে কাব্য রচনার রীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। তথাপি মহাভারতে কয়েকটি স্থলে গদ্যপদ্যযুক্ত রচনা পাওয়া যায়। এ রীতির নিদর্শন, মহাভারতে আছে, কিন্তু রামায়ণে নাই। মহাভারতের প্রাচীন পালিরীতির অনুযায়ী গদ্যপদ্য মিশ্রণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আদিপর্ব্বের তৃতীয় অধ্যায় গদ্য-পদ্যময় রচনায় পূর্ণ। একটি শ্লোকের একটি পাদ পদ্যে এবং অন্যপাদ গদ্যে, ইহাও পাওয়া যায়; যথা—

(১) অথাচষ্ট মার্কণ্ডেয়ঃ [অপূর্ব্বমিদং শ্রূয়তাং]

(২) [ভূয় এব ব্রাহ্মণ মহাভাগ্যং] বক্তুমর্হসীত্যব্রবীৎ।

পদ্যের ছাঁচে ঢালা গদ্য রচনার দৃষ্টান্তও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য; যথা—

"তত্র যৎ সত্যং, স ধর্ম্মো; যো ধর্ম্মঃ স প্রকাশো, যঃ প্রকাশস্তৎ সুখং" ইত্যাদি।

বর্ণবৃত্ত বা অক্ষরচ্ছন্দ—এখন যে সকল ছন্দের উল্লেখ করিব, খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে তাহার কোনটিরও অস্তিত্বের প্রমাণ অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় না। বর্ণবৃত্তের মধ্যে রথোদ্ধতা, দ্রুতবিলম্বিত এবং শার্দ্দূলবিক্রীড়িত রামায়ণে পাওয়া যায় না, অথচ মহাভারতে পাওয়া যায়। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, মহাভারতে সাড়ে চারিটি আছে; কর্ণপর্ব্বে একটি (৯০অ ৪১), এবং অনুশাসনের ১৪ অধ্যায়ে ৩॥০টি। অনুশাসনের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের সন্দেহযুক্ততার কথা এইমাত্র বলিয়াছি। দ্রুতবিলম্বিতের কবিতা, কেবল দ্রোণপর্ব্বে ২টি আছে; এবং রথোদ্ধতা ছন্দের কবিতা কেবলমাত্র শান্তিপর্ব্বে ৬॥০টি পাওয়া যায়।

মহাভারতে নাই, কিন্তু রামায়ণে আছে, এরূপ একালের ছন্দ কেবল দুইটি পাইয়াছি; যথা—মৃগেন্দ্রমুখ এবং অসম্বাধা। "যদি বর্ধমিচ্ছসি রাবণস্য সংখ্যে" প্রভৃতি যে মৃগেন্দ্র-মুখটি রামায়ণে আছে (যুদ্ধ—১০১), তাহা আবার গোরে-সিওর ইতালীয় সংস্করণে নাই। কেবল বোম্বাই সংস্করণের রামায়ণের—অযোধ্যাকাণ্ডে (১১৬) একটি অসম্বাধা পাই; ইতালীয় সংস্করণ যে পাঠ অবলম্বনে, তাহাতে ঐটিও নাই।

আলঙ্কারিক যুগের যে কয়েকটি বর্ণবৃত্ত, রামায়ণ এবং মহাভারত উভয়েই আছে, সেগুলি এই:—বৈশ্বদেবী, ভুজঙ্গ-প্রয়াৎ, রুচিরা, প্রহর্ষিণী, বসন্ততিলকা এবং মালিনী।

বৈশ্বদেবী—গোরেশিওর সংস্করণের রামায়ণে নাই, কিন্তু বোম্বাই সংস্করণের পঞ্চমকাণ্ডে একটি আছে। মহাভারতে কেবল শান্তিপর্ব্বের মোক্ষপর্ব্বাধ্যায়ে একটি বৈশ্বদেবীর কবিতা আছে।

ভুজঙ্গপ্রয়াত—এটিও ইতালীয় সংস্করণে নাই; বোম্বাই রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ৭৭ অধ্যায়ে একটি কবিতা আছে। মহাভারতের শল্যপর্ব্বের ৪১ অধ্যায়ের সর্গভঙ্গে একটি এবং শান্তিপর্ব্বের ৩৪০ ও ৩৪২ (বঙ্গবাসী সং) অধ্যায়ে এক একটি, এইরূপ ৩টি আছে।

রুচিরা—মহাভারতে ৪১টি রুচিরা আছে। তাহার মধ্যে আদিতে ২২টি, বনপর্ব্বে ৩টি, দ্রোণে ৯টি, শান্তিতে ৪টি, এবং অনুশাসনে ৩টি। মহাভারতের প্রথম অনুক্রমণিটি যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পাঠমাত্রে প্রতীত হয়; সে যাহাই হউক, এই অনুক্রমণিতে সুস্পষ্ট স্বীকৃত আছে, যে মহাভারত সংহিতার প্রথম আরম্ভ কোন্ স্থান হইতে; সে বিষয়ে তর্ক আছে। উহাতে একথাও প্রকারান্তরে স্বীকৃত, যে উপরিচর আখ্যানের পূর্ব্বে যে আস্তিকপর্ব্ব যোজিত, উহা প্রথমতঃ সংহিতা রচিত হইয়া যাইবার পরে সন্নিবিষ্ট। আদিপর্ব্বের ২২টি রুচিরাই এই আস্তিকপর্ব্বে। রামায়ণে কেবল চারিটি কবিতা রুচিরা ছন্দে রচিত পাওয়া যায়।

প্রহর্ষিণী—মহাভারতের আদিতে ৪, শান্তিতে ৪, এবং

অনুশাসনে একটি আছে। দক্ষিণপ্রদেশের সংস্করণের যে নূতন রামায়ণ পাইয়াছি, উহাতে একটি প্রহর্ষিণীও নাই।

বসন্ততিলকা—মহাভারতের আদিতে ৩, অনুশাসনে ৩, এবং স্বর্গারোহণে একটি আছে। রামায়ণের দুইটি বসন্ততিলকাই উত্তরাকাণ্ডে। অনুশাসনের বসন্ততিলকা পূর্ব্বোল্লিখিত চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে।

মালিনী—মহাভারতের দ্রোণে ১, কর্ণে ৫, এবং অনুশাসনে তিনটি আছে। রামায়ণে চারিটি মালিনী আছে; তাহার মধ্যে যেটি উত্তরাকাণ্ডে আছে, সেটি সকল সংস্করণেই পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য স্থলের অন্য তিনটি সেরূপভাবে পাওয়া যায় না; একসংস্করণে আছে ত অন্য সংস্করণে নাই।

মাত্রাচ্ছন্দ—এই ছন্দের অন্তর্ভুক্ত, পুষ্পিতাগ্রা, অপরবক্ত্র এবং মাত্রা সমকের সমষ্টি ধরিলে মহাভারতে ৮১টি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ৮১টির মধ্যে আবার ৩১টি শান্তিপর্ব্বে এবং ৫টি কর্ণপর্ব্বে। আস্তিক পর্ব্বের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐ পর্ব্বেও অপরবক্ত্র এবং পুষ্পিতাগ্রা মিশ্রিত দুইটি কবিতা পাওয়া যায়। অনুশাসনের পুষ্পিতাগ্রাও পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডেই কেবল ঐ মাত্রাচ্ছন্দের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বৈতালীয় এবং ঔপচ্ছন্দসিকের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

কেবলমাত্র ছন্দগুলি লইয়া প্রক্ষিপ্ত বিচার চলেনা। কিন্তু অপরাপর কথার সঙ্গে এই ছন্দের বিচার খুব প্রয়োজনীয়। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত রচিত পালি গ্রন্থে কয়েকটি প্রাকৃত ছন্দ আছে; তদ্ব্যতীত যে সকল সংস্কৃত ছন্দ আছে, সে কেবল অনুষ্টুভ এবং ত্রিষ্টুভ। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মহাভাষ্যে উদাহরণচ্ছলে যে কয়েকটি ছন্দ পাওয়া যায়, তাহাও কেবল অনুষ্টুভ এবং ত্রিষ্টুভ। খৃষ্টোত্তর তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বের কোন প্লেট বা প্রস্তরলিপিতে আলঙ্কারিক বা বিশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত কোন রচনাই পাওয়া যায় না। নূতন ছন্দগুলি চতুর্থ শতাব্দী হইতে সম্পূর্ণ সুবিকশিত দেখিতে পাওয়া যায়। নূতন ছন্দগুলির উৎপত্তির কাল সুনির্দ্দিষ্ট না হইলেও, উক্ত অবস্থাগুলি দৃষ্টে উহাদের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা জন্মিতে পারে। কেবল ছন্দের বিচারে ঐটুকুই যথেষ্ট।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বৈদেশিকের হস্তে দেশীয় চিত্র।

বিগত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বহুতর বৈদেশিক ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। ইহাঁদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম জিন ব্যাপটিষ্ট ট্যাভার্নিয়ে, তৎপর ফ্রঁসোয়া বর্ণিয়ে, লিজিন থিভেনট্, জন কার্‌ডন, কারি, মেনুষী প্রভৃতি আগমন করেন। ইহাঁরা ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, কেহ বা মোগল দরবারে চাকুরি করিয়া, পরিশেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত করিয়াছেন। এই সকল ভ্রমণকাহিনীতে বহুতর ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত থাকিলেও, দেশীয়দের আচার ব্যবহার, ক্রিয়া কলাপ, ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ অসত্য, একদেশদর্শী ও বিদ্বেষকলুষিত। এই বিদ্বেষের মাত্রা কোন লেখকের গ্রন্থে অস্ফুট কোন লেখকের গ্রন্থে এমনি পরিস্ফুট ও প্রদীপ্ত যে পাঠমাত্র ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে।

গত বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামী 'পুরুষোত্তম' প্রবন্ধে হিন্দুর জগন্নাথদেব ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে বার্ণয়ের ধর্ম্মান্ধতা ও বিদ্বেষকলুষিততার পরিচয় তদ্গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি ট্যাভারনিয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। গোস্বামী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, ট্যাভারনিয়ে, পায়েৎরো, মেনুষী প্রভৃতির বর্ণনা বার্ণয়ের ন্যায় এত বিদ্বেষকলুষিত নহে। একথা সত্য কিন্তু তিনি ট্যাভারনিয়েকে যে বার্ণয়ের পরবর্ত্তী পর্য্যটক বলিয়াছেন, তাহা আমার নিকট সমীচীন বোধ হয় না। আমার মতে বর্ণিয়েই পরবর্ত্তী পর্য্যটক। ট্যাভারনিয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ছয়বার প্রাচ্য ভূখণ্ড পরিদর্শনে বহির্গত হন। তাঁহার প্রথম আগমন ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে, এবার তিনি কেবল আলেকজেণ্ড্রিয়া, মাল্টা, পারস্য প্রভৃতি পর্য্যটন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার দ্বিতীয় প্রাচ্য যাত্রা ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে। দ্বিতীয়বারে তিনি বঙ্গদেশের ঢাকানগর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভারতযাত্রা যথাক্রমে ১৬৪৩, ১৬৫১, ১৬৫৭, এবং ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনা ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় তাঁহার ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত করেন।

ট্যাভারনিয়ের ভারতভ্রমণের যে সময় পূর্ব্বে লিখিত হইল, তাহা অবশ্য সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। অর্মির (Orme) মতে ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে, ডাক্তার বলের মতে ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে ট্যাভারনিয়ে ভারতে পদার্পণ করেন। অধ্যাপক জোরেট (Joret) লিখিয়াছেন যে, ট্যাভারনিয়ে ১৬৩৯ অব্দের শেষে ইস্পাহান পরিত্যাগ করিয়া ১৬৪০ অব্দে প্রথমবার ঢাকায় গমন করেন। এ সম্বন্ধে নানা বিভিন্ন মত থাকিলেও সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, বর্ণিয়ের পূর্ব্বে ট্যাভারনিয়ে ভারতে আগমন করেন। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে বর্ণিয়ে সুরাতে পদার্পণ করেন, এবং কিছুকালপরে মোগলদরবারের চিকিৎসকরূপে নিয়োজিত হন। বর্ণিয়ে স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে হিন্দুস্থানের নানা দেশের ও নানা বিষয়ের বর্ণনা এবং শাজাহান ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের বিবিধ ঐতিহাসিক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ট্যাভারনিয়ের ভ্রমণবৃত্তান্তে সপ্তদশ শতাব্দীর আভ্যন্তরীন অবস্থা, ব্যবসায় বাণিজ্য, শস্য, আমদানী রপ্তানী, বিনিময়, ধাতু-খনি, ভ্রমণ-পথ, ডাক-বিভাগ, বিভিন্ন মুদ্রা, জীবজন্তু, সাধু-সন্ন্যাসী-ফকির, মঠ, দেবালয়, মসজিদ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ও অপেক্ষাকৃত সরল বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তিনি মোগল রাজত্বের ঐতিহাসিক বৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু তাহা অভ্রান্ত নহে। এভারার্ড সাহেব ট্যাভারনিয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

> "But among all the ancient and modern travellers, none had such fair opportunities and advantages as the illustrious Monsieur Tavernier had, to make a true profitable, and exact relation of the singularities of those remote parts of Asia, where he passed so many years in great splendour, as shall appear by the ensuing considerations and qualifications of a good traveller."

যা'ক্ এসম্বন্ধে আর অধিক কিছু না লিখিয়া ট্যাভারনিয়ের হস্তে দেশীয় চিত্র কিরূপ চিত্রিত হইয়াছে, তাহাই পাঠকগণকে প্রদর্শন করিব।

জগন্নাথদেব।

বীরেশ্বর গোস্বামী মহাশয় লিখিত প্রবন্ধে পাঠকগণ বর্ণিয়ে লিখিত পুরুষোত্তম দেবের বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন। এবার ট্যাভারনিয়ের বর্ণনা পাঠ করুন। ট্যাভারনিয়ে বলেন, —জগন্নাথ, বেনারস, মথুরা এবং ত্রিপেতি (Tripeti) এই চারি স্থানের মন্দিরচতুষ্টয় প্রসিদ্ধ। এতন্মধ্যে জগন্নাথ মন্দির গঙ্গার মোহনার উপর অবস্থিত। মূর্ত্তিপূজক-দিগের প্রধান পুরোহিত সকল তথায় বাস করে। মন্দিরস্থিত বেদীর উপর যে প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন, তাহার চক্ষু তারকায় দুইটি হীরক খণ্ড বসান আছে। এই মূর্ত্তির গলদেশেও একটী হীরক লম্বিত আছে, ইহার ক্ষুদ্রটির ওজন প্রায় ৪০ কারাট্ (carats)। কখন হীরার বালা কখন পদ্মরাগমণির বালা তাঁহার হাতে থাকে; এই সুপ্রসিদ্ধ দেব মূর্ত্তির নাম 'রেসোরা' (*Resora !*)। এই দেবতার উদ্দেশ্যে যে সকল ভূসম্পত্তি উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তাহার আয় হইতে প্রত্যহ ১৫।২০ হাজার তীর্থযাত্রীর আহার নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই পরিমাণ জনসমাগম নিয়তই তথায় পরিলক্ষিত হয়, কারণ সমগ্র ভারতে ইহা একটী প্রধান তীর্থস্থান। কিন্তু কোন স্বর্ণকার এই মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পায় না। তাহার কারণ একবার এক স্বর্ণকার রজনীযোগে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া দেবমূর্ত্তির চক্ষু হইতে এক খণ্ড হীরক অপহরণ করিয়াছিল। স্বর্ণকার সমস্ত রজনী মন্দিরেই অবস্থান করে, প্রত্যূষে হীরকটি লইয়া প্রস্থান করিবার সময় মন্দিরের বাহিরে দ্বারের নিকট মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লোকে বলিয়া থাকে তাহাদের ভগবান ঐ স্বর্ণকারের দুষ্কর্ম্মের প্রতিশোধ ঐ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের মধ্যে এই মন্দিরের মাহাত্ম্য এত অধিক হওয়ার কারণ ইহা গঙ্গাতীরে অবস্থিত। মূর্ত্তি-উপাসকদিগের বিশ্বাস গঙ্গোদকে পাতক বিনাশের আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। এই মন্দির-ভাণ্ডারে এত ধনরত্ন থাকার (মন্দিরের ব্যয়ে প্রায় বিংশ সহস্র গাভী রক্ষিত হয়) কারণ, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কুসংস্কারান্ধ যে সমুদয় জনগণের সমাবেশ হয়, তাহারা প্রত্যেকেই কিছু কিছু মন্দিরে দান করিয়া থাকে। এই দান যে দাতার ইচ্ছানুসারে প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা নহে, প্রধান পুরোহিত যাত্রিগণের ক্ষৌর ও স্নানকার্যসম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে তাহাদের প্রত্যেকের অবস্থার বিষয় পূর্ব্ব হইতে যেরূপ সংবাদ পাইয়া থাকে, তদনুরূপ ভিক্ষা আদায় করিয়া থাকেন। এবম্প্রকারে তিনি যে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেন তাহা নিজের কার্য্যে কিছুমাত্র ব্যয়িত না করিয়া মন্দির-

সংস্কার ও অতিথিসৎকারে ব্যয় করেন। প্রধান পুরোহিত প্রত্যহ যাত্রিগণের মধ্যে অন্ন, ঘৃত, দুগ্ধ, রুটি প্রভৃতি খাদ্য-সামগ্রী বিতরণ করেন। যাহারা প্রসাদ খাইতে চায়, তাহাদের বাসনাও অতৃপ্ত থাকে না। প্রাতঃকালে বিভিন্ন আকারের মৃৎপাত্রে চাউলসিদ্ধ করা হয়। পরে যাত্রিগণ আহারের নিমিত্ত আগমন করিলে, তাহাদের মধ্যে ঐ ভাত বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা দুইবার রন্ধন করেনা, একবার যাহা পাক করা হয় তাহাই তুল্য অংশে যাত্রীদিগকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। তাম্রপাত্র ব্যতীত মৃৎপাত্রে একাধিকবার রন্ধন হয়না। কতকগুলি বৃক্ষপত্র ব্যতীত তাহাদের ডিষ থালা কিছু নাই। একরকম বড় বাটী আছে, যাহাতে তাহারা ঘৃত উষ্ণ করে এবং আহারের সময় অঙ্গুলি সাহায্যে ভাত মাখিয়া লয়। আমরা যেমন মদ্য পান করি, তাহারা তদ্রূপ একরকম শম্বুক বা শঙ্খে (shell) তরল ঘৃত পান করে।

পূর্ব্বে যে দেব-মূর্ত্তিটির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার স্কন্ধদেশ হইতে নিম্নভাগ একটী বড় জামায় আবৃত থাকে, উৎসব অনুযায়ী স্বর্ণ-রৌপ্যের কাজ করা জামা ব্যবহৃত হয়। প্রথমে এই দেবতার হস্ত পদ ছিল না। পরে তাহাদের একজন মহাপুরুষ স্বর্গে গমন করিয়া এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিলে, এই মহাপুরুষের অনুরূপ একজন দেবদূত একটী সম্পূর্ণ দেবমূর্ত্তি গড়িতে মর্ত্ত্যে নামিয়া আসেন। দেবদূত যখন এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণে ব্যাপৃত, তখন লোকে অধৈর্য্য হইয়া দেবতার হস্তপদ নির্ম্মাণ শেষ হইবার পূর্ব্বেই দূতের হস্ত হইতে তাহা লইয়া গিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল হস্তপদশূন্য হেতু এ মূর্ত্তিটিও কদর্য্য হইয়াছে, তখন তাহারা, আমরা যাহাকে আউন্স্‌মুক্তা (ounce-pearls) বলি, সেই মুক্তা নির্ম্মিত বাহু তাহাতে সংযোগ করিয়া দেয়। এবং ঐ লম্বা জামাটি থাকার জন্য তাঁহার পা আছে কিনা তাহা দেখা যায় না। এই মূর্ত্তিটির মস্তক ও দেহ চন্দন-কাষ্ঠে নির্ম্মিত। মন্দিরটি আয়তনে ও দৈর্ঘ্যে প্রকাণ্ড বলিয়া ইহাতে আরও দেব-মূর্ত্তি আছে কিন্তু তাহার অধিকাংশই নানাবর্ণের ঘৃণ্য রাক্ষস আকৃতি। এই মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বেই ছোট ছোট অনেকগুলি মন্দির আছে, যাত্রিগণ তথায় অপেক্ষাকৃত অল্প দান ধ্যান করে। কোন ব্যক্তি পীড়িত হইয়া বা কোন গুরুতর কার্য্য ব্যপদেশে যে মানস করে, তাহা সে সঙ্গে করিয়া তথায় লইয়া যায়। পুরোহিতগণ মূর্ত্তিটি প্রত্যহ এরূপ সুগন্ধি তৈল দ্বারা মার্জ্জিত করে যাহাতে রং কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই মূর্ত্তির দক্ষিণে নানা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তাঁহার ভগিনী সোতোরা (!) (Sotora) দণ্ডায়মানা এবং তাঁহার বামে তদীয় ভ্রাতা বলভদ্র (Balbadar) বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। রেসোরা মূর্ত্তির সম্মুখে বামভাগে সরিয়া তাঁহার স্ত্রী রেমিন (Remin) পদে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। রেমিন-মূর্ত্তি কাঞ্চনময়, অপর মূর্ত্তিত্রয় চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত।

প্রধান ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত এবং দেবমন্দিরে যে সকল ব্রাহ্মণ সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, তাহাদের অবস্থানের নিমিত্ত দুইটি মন্দির আছে। এই ব্রাহ্মণগণ মস্তক মুণ্ডন করতঃ অনাবৃতশিরে মন্দিরে প্রবেশ করে। একখানি কালিকট্ বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ পরিধান করিয়া অপরার্দ্ধ উত্তরীয়ের ন্যায় ব্যবহার করে। জগন্নাথ-মন্দিরের নিকট কবীর নামে তাহাদের এক মহাপুরুষের সমাধি বিদ্যমান, তৎ-প্রতি তাহারা যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। তোমরা মনে রাখিও, তাহাদের দেবমূর্ত্তি লৌহ-রেলবেষ্টিত এক প্রকার বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ দেবসেবা-কার্য্যে প্রধান পুরোহিত কর্ত্তৃক নিযুক্ত কতিপয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহ উক্ত দেবমূর্ত্তি স্পর্শ করিতে পারে না।

বর্ণিয়ের ন্যায় ট্যাভারনিয়ে ভ্রমণ-কাহিনীতে তীব্র শ্লেষ উদ্গীরণ করেন নাই। তিনি যেরূপ জানিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেবমূর্ত্তি কয়টির যে অদ্ভুত নামকরণ এবং স্বর্ণকার ও দেব-দূতের যে আজগুবি গল্পের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ধর্ম্মান্ধতার পরিচায়ক বলিয়া আমার মনে হয় না; দেশীয় আচার ব্যবহারে অনভিজ্ঞ বলিয়াই ঐরূপ লিখিয়াছেন বলিয়া আমার ধারণা। দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও আচার পদ্ধতি বিষয়ে এরূপ অনভিজ্ঞতা ট্যাভারনিয়ে অনেক স্থানেই প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠক-গণের অবগতি নিমিত্ত নিম্নে আর একটু উদ্ধৃত হইল।

মূর্ত্তি-পূজকদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস।

ট্যাভারনিয়ে লিখিয়াছেন,—একমাত্র "সত্যং শিবং সুন্দরং"

ভগবানকে যেরূপ ভক্তি সম্মান করা উচিত তদ্রূপ ভক্তি সম্মান ভারতীয় মূর্ত্তি-পূজকগণ গাভী, মর্কট এবং বহুতর রাক্ষসের প্রতি প্রদর্শন করিলেও তাহারা সকলে একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান অনাদি পরব্রহ্মের সত্তা স্বীকার করে। তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং স্বর্গমর্ত্ত্যস্থিত যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা। করোমণ্ডল (Coromandel) তীরে অবস্থিত ব্রাহ্মণগণ এই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকে 'পরমেশ্বর', 'পেরিমায়েল', 'ওয়েষ্টনন' (westnon) প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করে। যেহেতু তাহারা শুনিয়াছে পৃথিবী অণ্ডাকার, তদ্ধেতু তাহারা পরমেশ্বরমূর্ত্তি অণ্ডাকৃতি কল্পনা করিয়া থাকে এবং তদ্ধেতু চূড়াকারে মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ গঙ্গাতীর হইতে অণ্ডাকার প্রস্তর আনয়ন করিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরমেশ্বর জ্ঞানে পূজা করে। তাহারা এই ভ্রান্ত মত এতই ভক্তির সহিত বিশ্বাস করে যে, তাহাদের মধ্যে জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্রাহ্মণও ঐ মতের বিরুদ্ধ কোন যুক্তিতে কর্ণপাত করে না। সুতরাং তাহারা যে এরূপ কুসংস্কারান্ধ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! তাহাদের একসম্প্রদায়ের ব্যক্তি এতই ধর্ম্মান্ধ যে, তাহারা এই অণ্ডাকার প্রস্তরখণ্ড পরমেশ্বর কল্পনা করিয়া গলদেশে বাঁধিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করে এবং অর্চ্চনার সময় তদ্দ্বারা বক্ষঃস্থলে আঘাত করে। অজ্ঞতার এই শোচনীয় ঘনান্ধকারে থাকিয়া মূর্ত্তি-উপাসকগণ বিশ্বাস করে যে, তাহাদের পরমেশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সময় সময় অবনীতে ভূমিষ্ঠ হন, পরে বিবাহ করিয়া স্ত্রীলাভ করেন। এমতে রামকে তাহারা পরম দেবতা মনে করে, কারণ তিনি পৃথিবীতে অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাম দশরথ (Deseret) নামক একজন ক্ষমতাশালী নরপতির পুত্র। দশরথের দুইটি (!) ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে যে সকল পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তন্মধ্যে রামই অধিক ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। রাম পিতার সাতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তিনিই পিতার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু রামের গর্ভধারিণী কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় (!), দশরথের অপর স্ত্রী, যিনি স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তে রাখিয়াছিলেন, রাম ও তদীয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে (Lokeman) গৃহ ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দিতে বায়না ধরেন। এইরূপে তাঁহারা নির্ব্বাসিত হইলে তাঁহার নিজের পুত্র রাজার উত্তরাধিকারী হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে পারে। রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা গৃহত্যাগ করিবার সময় রামের স্ত্রী সীতার (মূর্ত্তি-পূজকগণ ইঁহাকে পরমেশ্বরী জ্ঞান করে) নিকট বিদায় লইতে গেলে, সীতা রামকে বলেন যে, ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং এ ভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে, তিনিও তাঁহাদের সহযাত্রী হইতে ইচ্ছা করেন। এমতে সৌভাগ্য-ভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারা তিন জন গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা নানারূপ দুরবস্থায় পতিত হন। বনে যাইতে যাইতে রাম একটি পক্ষী (!) দেখিয়া, সঙ্গীদ্বয়কে ত্যাগ করিয়া তাহার পথানুসরণ করেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বিলম্ব হওয়ায় সীতা কোনরূপ দুর্ঘটনা কল্পনা করতঃ লক্ষ্মণকে তাঁহার অন্বেষণে যাইতে অনুরোধ করেন। লক্ষ্মণ প্রথমতঃ সীতাকে একাকী রাখিয়া যাইতে অস্বীকার করেন। কারণ রাম তাঁহাকে ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সীতাকে একাকী কোন স্থানে রাখিলে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিবে। কিন্তু সীতা নানারূপ অনুনয় বিনয় করায় লক্ষ্মণ অবশেষে তাঁহার প্রিয় ভগিনীকে (fair sister) একাকী রাখিয়া রামের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। ইত্যবসরে মূর্ত্তি-পূজকদিগের একতর দেবতা (!) রাবণ (Rhevan) ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া সীতার নিকট ভিক্ষা লইতে উপনীত হইলেন। রাম যাইবার কালে সীতাকে বলিয়াছিলেন যে, তাহাকে যে স্থানে রাখিয়া যাওয়া হইতেছে সে স্থান হইতে তিনি যেন তিলমাত্র অগ্রসর না হন। রাবণ ভিক্ষা চাইলে সীতা ঐ স্থান হইতেই ভিক্ষা দিতে উদ্যত হন। কিন্তু রাবণ বলেন যে, তিনি ঐ স্থান হইতে সরিয়া ভিক্ষা না দিলে তাহা গ্রহণ করিবেন না। সীতা অসাবধানতাক্রমেই হ'ক্ কি পূর্ব্ব নিষেধবাণী বিস্মৃতা হইয়াই হ'ক্, সে স্থান হইতে সরিয়া যাই ভিক্ষা দিতে হস্তপ্রসারণ করিয়াছেন, অমনি রাবণ তাঁহাকে ধরিয়া নিবিড়-কাননাভ্যন্তরে যথায় তাঁহার রথ ছিল তথায় প্রস্থান করিলেন। রাম প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সীতাকে দেখিতে না পাইয়া দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, পরে লক্ষ্মণের সেবায় প্রকৃতিস্থ হন। অতঃপর উভয় ভ্রাতা সীতার (যিনি স্বামীর বড়ই প্রিয়পাত্রী) অন্বেষণে বহির্গত হইলেন।

ট্যাভারনিয়েরর রামায়ণী কথা এখনও শেষ হয় নাই। তিনি বলেন,—"ব্রাহ্মণগণ যখন সীতার এই হরণকাহিনী পাঠ করে, তখন সকলের চক্ষুই জলভারাক্রান্ত হয় ও সকলেই দুঃখের দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে। এই ঘটনার সহিত রাবণের অনুসরণ ব্যপদেশে অনুষ্ঠিত আরও বহুতর আজগুবি গল্প মিশ্রিত করতঃ তাহারা রামের মহাবীরত্ব প্রকাশ করে। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণে যাবদীয় জীবকে নিযুক্ত করেন, কিন্তু হরমান (!) (Harman) নামক এক মর্কট ভিন্ন আর কাহারই তাঁহার সন্ধান পাইবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। হরমান এক লম্ফে সাগর উত্তীর্ণ হইয়া রাবণের উদ্যানে শোক-সন্তপ্তা বিবশা সীতাকে অবলোকন করিয়া রামের সংবাদ প্রদান করে। একটী বানরকে রামের কথা বলিতে দেখিয়া সীতা প্রথমে বড়ই বিস্মিতা হন এবং তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে চান না। অবশেষে হরমান তাহার দৌত্যকার্য্যের সত্যতা প্রমাণের নিমিত্ত রামপ্রদত্ত একটি অঙ্গুরীয়ক তাঁহাকে দেয়। অঙ্গুরীয়কটি সীতা তাঁহার জিনিষপত্রের মধ্যে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী রাম যে এ ভাবে বানরের মুখে কথা বলাইতে পারেন এবং তাহার দ্বারা নিজের কুশল সংবাদ দিয়া সীতার অবস্থা দর্শন করিতে প্রেরণ করিয়াছেন এরূপ অসম্ভব ঘটনা সীতা অনেক আলোচনার পর বিশ্বাস করিলেন। কিন্তু বানর হরমান নিজে আরও অদ্ভুত কাণ্ড করে। রাবণের ভৃত্যবর্গ তাহাকে গুপ্তচর বোধে ধৃত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবার উদ্যোগ করে। তাহার শরীরে ও লেজে ন্যাকড়া ও ছেঁড়া ছালা জড়াইয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দিলে, হরমান ভূমিতে গড়াইয়া নিজের দেহের অগ্নি নির্ব্বাপিত করতঃ জলন্ত বস্ত্রখণ্ডের সাহায্যে রাবণের প্রাসাদ প্রজ্জ্বলিত করে। রাবণের গৃহ দগ্ধ করিয়া হরমান ভয়ে যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই এক লম্ফে পুনরায় সাগর উল্লঙ্ঘন করিয়া রামের নিকট উপনীত হইয়া নিজের বিজয়-কাহিনী বিবৃত করিল। সীতা যে শোচনীয় অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন এবং নিরন্তর স্বামি-বিরহে রোদন করিতেছেন, এ কথাও হরমান রামের নিকট ব্যক্ত করিল। সীতার এই দুর্দ্দশা শ্রবণ করতঃ রাম প্রতিজ্ঞা করিলেন যেরকমেই হ'ক্ রাবণের হস্ত হইতে সীতাকে উদ্ধার করিবেন। পরে একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ঐ বানরের সহযোগে রাবণের আলয়-সকাশে উপনীত হইলেন। হরমানের প্রদত্ত অগ্নি এমনি ভীষণ বেগে প্রজ্জ্বলিত হয় যে, রাম সসৈন্য তথায় উপনীত হইয়া দেখেন রাবণের গৃহ হইতে ধূমরাশি উড্ডীন হইতেছে। এই ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতে ভীত হইয়া রাবণের অনুচরবর্গ পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল, সুতরাং রাম অক্লেশে প্রিয়তমা সীতার দর্শনলাভ করেন। রাবণও প্রাণভয়ে ভীত হইয়া সীতাকে পরিত্যাগ করতঃ গিরি-কান্তারে পলায়নপর হইয়াছিল। রাম সীতা পুনর্মিলিত হইয়া অসীম আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। হরমান যে মহদুপকার করিয়াছিল তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ তাহাকে বিশেষরূপে সম্মানিত করা হইল।

রামের সৈন্য কর্ত্তৃক স্বদেশ উচ্ছন্ন যাইতে দেখিয়া রাবণ প্রতিহিংসা-বহ্নি বুকে পোষণ করিয়া ফকিরের বেশে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই রাবণ হইতেই, বর্ত্তমান কালে ভারতে যে অসংখ্য ফকির ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা উৎপত্তি লাভ করে। রাবণই প্রথম ফকির!

ট্যাভারনিয়ে এক নিশ্বাসে যে ভাবে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ গাহিয়াছেন এবং যে সকল অসত্য বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার অধিক কারণ দেখা যায় না। কারণ তিনি বৈদেশিক, দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ। অপিচ দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতে যে সংস্কৃত জ্ঞান থাকার প্রয়োজন তাহা তাঁহার ছিলনা। তিনি যে কিছুমাত্র সংস্কৃত জানিতেন কুত্রাপি তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এইরূপ অনভিজ্ঞ হইয়া তিনি দেশীয়চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার যা দোষ। কিন্তু তিনি বার্ণিয়ের ন্যায় গোঁড়ামী প্রকাশ করেন নাই। বর্ণিয়ের রচনার আর একটু পার্থক্য এই যে, বর্ণিয়ের গ্রন্থে অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ অতি অল্প, ট্যাভারনিয়ে বড়ই হুজুকপ্রিয় ও আজগুবি গল্পের পক্ষপাতী। যেখানেই তিনি দেশীয় ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে লেখনী চালনা করিয়াছেন, সেইখানেই দুই একটী আজগুবি গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পোষকতায় কোনও প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। 'মূর্ত্তি-পূজকদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস' প্রসঙ্গে তিনি

যে ভাবে রাবণ হইতে বর্ত্তমান কালের ফকিরদিগের উদ্ভব কল্পনা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই হাস্তকর। তিনি কোথা হইতে যে এ তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। রাম কর্তৃক পরাজিত হইয়া রাবণ যে ফকিরী গ্রহণ করতঃ গিরিকান্তারে প্রয়াণ করেন, রাম যে শূন্য লঙ্কায় সীতাকে প্রাপ্ত হন এ সমুদয় বিবরণ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

স্নদের মায়া।

(১)

কলিকাতায় অরবিন্দ যখন কলেজে পড়িত তখন সে তাহার পিতৃবন্ধু যোগীন্দ্র বাবুর গৃহে অবস্থিতি করিত। যোগীন্দ্রবাবু একজন ধর্ম্মপ্রাণ লোক ছিলেন। ওকালতী ব্যবসায়ে তিনি কলিকাতার মধ্যে প্রভূত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সংসারে একমাত্র কন্যা অমিয়া ব্যতীত তাঁহার আর কোন সন্তানাদি ছিল না। বাল্যবন্ধু শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র অরবিন্দকে আত্মজবৎ স্নেহে ও সমাদরে নিজ আলয়ে সুশিক্ষিত করিয়া তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেন।

শ্রীনাথবাবু কল্যাণপুরের জমীদারদের অধীনে সদর দেওয়ানী কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত উগ্র ছিল। আত্মাভিমান বজায় রাখিবার জন্য তিনি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না।

যোগীন্দ্রবাবুর সহিত শ্রীনাথবাবুর ধর্ম্মমতের নানাবিধ অনৈক্য সত্ত্বেও তাঁহারা আশৈশব প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

কালক্রমে, অরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, ডিপুটিগিরি পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এই সময়ে, কল্যাণপুরের জমিদারের সহিত অপর আর একজন ক্ষুদ্র প্রতিবেশী জমিদারের একটা ক্ষুদ্র শিবমন্দির লইয়া ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। এই মকর্দ্দমায় উকীল হইবার জন্য কল্যাণপুরের তরফ হইতে আমলাবর্গ আসিয়া, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল। যোগীন্দ্রবাবু কাগজপত্র দেখিয়া বুঝিলেন,—মকর্দ্দমা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তিনি মকর্দ্দমা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

মকর্দ্দমায় নিম্ন আদালতে কল্যাণপুরের অধিপতিগণ পরাজিত হইলেন। বাধ্য হইয়া, শ্রীনাথবাবু পুনরায় যোগীন্দ্র বাবুকে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে সানুনয়ে অনুরোধ করিলেন। পত্রবাহক কর্ম্মচারীকে যোগীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলিয়া দিলেন যে, জানিয়া শুনিয়া, মিথ্যা মকর্দ্দমার সমর্থন করিয়া, তিনি পরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া আনিতে পারিবেন না।

সংবাদ যখন কল্যাণপুরে পৌঁছিল তখন বড়কর্ত্তা শ্রীনাথ বাবুর প্রতি বিদ্রূপ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"কিহে শ্রীনাথ, তোমার বন্ধুবরের কথা শুন্‌লে? তোমার অনুরোধের মূল্য তো খুব!" শ্রীনাথবাবু মাথা নিচু করিয়া রহিলেন,—তাঁহার অন্তরে অপমান-শেল তীব্রভাবে বিঁধিল।

একদিন প্রাতে যোগীন্দ্রনাথ গুড়্গুড়ির সহিত প্রেমালাপে তন্ময় রহিয়াছেন এমতকালে শ্রীনাথবাবু সেখানে আসিয়া দর্শন দিলেন। বলিলেন,—"যোগীন, মকর্দ্দমাটা না নিলে তো আর চলে না। সবজজ জাল অপরাধে মকর্দ্দমা ফৌজদারিতে দিয়েছে। আর ভালো কোন উকীলও পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি মকর্দ্দমাটা না নিলে বুঝি আমার চাকরিও যায়। জমিদারেরা খাপ্পা হয়েছেন; বলেন—"তোমার বন্ধুকে যেমন করে' পার রাজি কর্‌তেই হ'বে। এ তোমারই 'গাফেলি'; নইলে, তুমি ইচ্ছা করলেই তাকে রাজি করাতে পার্‌তে।" যোগীন্দ্র বিষণ্ণ মুখে উত্তর করিলেন,—"তা কি কর্‌ব ভায়া!—এ জাল মকর্দ্দমা কেমন করে' নিতে পারি? আমায় মাপ কর।" শ্রীনাথবাবু অপমানে ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"বেশ। তোমার সঙ্গে তবে আজ থেকে আমার সকল সম্পর্ক ঘুচল। বিধর্ম্মি, পাষণ্ড, তোমার এত অহঙ্কার!" যোগীন্দ্র বাষ্পাকুলনেত্রে কহিলেন—"কি কর্‌ব ভাই, নাচার!"

শ্রীনাথবাবু কম্পিত দেহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চীৎকার করিয়া ডাকিলেন,—"অরু।"

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, অরবিন্দ তখন প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছে। শ্রীনাথবাবু তৎক্ষণাৎ বেগে সে গৃহ ত্যাগ করিলেন।

সেই দিনই অরবিন্দ পিতার এক পত্র পাইল। পিতা অরবিন্দকে যোগীন্দ্রবাবুর সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া পত্রপাঠ অন্যত্র গিয়া বাস করিতে আদেশ করিয়াছেন। ব্যাপার জানিবার জন্য পিতার সে পত্র অরবিন্দ যোগীন্দ্র বাবুকে পড়িতে দিয়া, তাঁহার বক্তব্যের অপেক্ষা করিতে লাগিল। পত্র পাঠান্তে যোগীন্দ্রবাবু আদ্যোপান্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। অরবিন্দ সকল শুনিল। পিতার পত্রের কি উত্তর দিবে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে সে নিজের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহে আসিয়াই দেখিল,—অমিয়া তাহার অসাক্ষাতে তাহার পুস্তকাদি সযত্নে ঝাড়িয়া, পুঁছিয়া, গুছাইয়া রাখিতেছে। অরবিন্দ হাসিয়া কহিল,—"কি অমি, কি হচ্ছে? খালি ঘরে এমন চোরের মত ঢোকা অত্যন্ত অবৈধ,—তা জান?" অমিয়া ক্ষণেকের জন্য একটু অপ্রতিভ হইল। পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল,—"তা' চোর যদি হই ত পুলিশ ডাক। অপরাধ করিছি, এখন হুজুর যা' করেন!" এই বলিয়া, মৃদু হাস্য সহকারে গ্রীবাটী ঈষৎ হেলাইয়া, অমিয়া তাহার সেই রক্তাভ, কোমল কর-পল্লব বক্ষের নিকটে আনিয়া অপরাধিনীর ন্যায় সংযুক্ত করিল, এবং পলকমধ্যে, চকিতে সে গৃহ হইতে অন্তর্হিত হইল। অরবিন্দ মনে মনে ভাবিল,—"কি সুন্দর!"

অনেক চিন্তা করিয়াও অরবিন্দ যোগীনবাবুর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিবার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। সে পিতাকে তন্মর্ম্মে পত্র লিখিল, এবং সেই গৃহেই অবস্থিতি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। পত্র পাইয়া শ্রীনাথবাবু অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন। তিনি পুত্রের নিকটে তাহার আর কিছুই লিখিলেন না। ভাবিলেন—প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র যদি কথা না শোনে? কিছু বলিয়া শেষে বৃদ্ধ বয়সে অপমানিত হওয়ার চেয়ে নীরব থাকাই যুক্তিসিদ্ধ। এদিকে, পিতার নিকট হইতে আর আদেশ-পত্র না পাওয়ায় অরবিন্দ ভাবিল "মৌনং সম্মতিলক্ষণম্!" সে যোগীন্দ্রবাবুর আলয়েই বসতি করিতে লাগিল।

(২)

কিছু দিন যায়। অরবিন্দ ডিপুটিগিরি পরীক্ষা দিয়া স্বদেশে আগমন করিল।

মাতা অরবিন্দকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন,—"বাবা, বুড়ো হ'য়েছি,—কবে মরি, তার ঠিক নেই। এখন একটি ঘর-আলোকরা বউ আন্।"

অরবিন্দ সে দিন সে কথার আর কোন জবাব দিল না। পর দিন তাহার ধাই-মার মারফৎ বলিয়া পাঠাইল যে, সে বিবাহ করিতে সম্মত আছে। তবে, পাত্রী সে নিজে দেখিয়া পসন্দ করিবে। মাতা পুলকিত হইয়া, পুত্রের নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"তা বেশ তো! তুমি আমার নেকাপড়া শিখেছ, হাল আইনে কি আর ছেলেরা নিজে না দেখে' বিয়ে করে? তা' তুমিই পছন্দ কর। ও পাড়ার হরেন মুখুজ্জেকে আমরা কথা দিয়ে রেখেছি। আহা, তার কি রূপের মেয়েটি,—যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাক্রুণ!"

অরবিন্দ নতশিরে, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। মাতার এই কথা শুনিয়া সে নিজের অজ্ঞাতে বলিয়া ফেলিল—"না, তা' হ'বে না!" বলিয়াই অপ্রস্তুত ভাবে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

বাড়ী আসার পরেও শ্রীনাথ বাবু পুত্র অরবিন্দের সহিত বড় একটা কথা-বার্ত্তা কহিতেন না। তিনি মনে মনে তনয়ের প্রতি বিশেষ রুষ্ট হইয়াছিলেন। অরবিন্দ মাতার নিকট হইতে বহির্ব্বাটিতে চলিয়া আসিল দেখিয়া, তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ভার্য্যাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হ'ল? অরু রাজি হ'য়েছে?" গৃহিণী আদ্যন্ত কহিলেন। শুনিয়া, শ্রীনাথ বাবুর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি নির্ব্বাক্-ভাবে বহির্ব্বাটির দিকে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। কিন্তু, কি মনে করিয়া, পরক্ষণেই আবার ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, —"দেখ গিন্নি, অরুকে জানিও যে, ত'ার মনোনীত পাত্রীর সঙ্গে তা'র বিবাহ হওয়া অসম্ভব। হরেনকে যখন একবার আমরা বলেছি–তখন তার অন্যথা হ'বার নয়,—তা'রি বাক্‌দত্তা কন্যাকে অরুর বিয়ে কর্‌তেই হ'বে। অরু যদি এতে রাজি হয়, ভালো। তা'নইলে তার আমি মুখদর্শনও কর্‌তে চাইনে।"

গৃহিণী কর্ত্তাকে কি বলিতে যাইতেছিলেন,—বলা হইল না। কর্ত্তা ততক্ষণে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। গৃহিণী কর্ত্তারস্বভাব বিলক্ষণ জানিতেন। কর্ত্তার এই দৃঢ়স্বর তাঁহার প্রাণে শঙ্কাভয়-বিজড়িত করুণ বেদনা জাগাইয়া তুলিল।

* * *



মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA

দ্বিপ্রহর। অরবিন্দ পিতার নিকটে আহারে বসিয়াছে। জননী তালবৃন্তহস্তে মক্ষিকাকুলকে ব্যবধান করিবার উপলক্ষে স্বামী পুত্রকে ব্যজন করিতেছেন।

অরবিন্দ বলিল,—"মা, আমি তো পরশু কল্‌কাতা যেতে চাই। পরীক্ষার ফল বেরুবার বড় দেরি নেই। তা'ছাড়া, একটু তদ্বির-তলাপিও করা দরকার; নইলে, এসব চাকুরি জোটা ভার!"

মাতা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন,—"তাও কি হয় বাছা? বিয়ে-'থা' কর্, তবে তো যাবি। এই ১৬ই একটা ভালো দিন আছে; ঐ দিনেই বলিস্ তো সব হ'তে পারে।"

অরবিন্দ কোন উচ্চবাচ্য করিল না। সে একমনে পোনা মাছের মস্তিষ্কটি স্বাধিকারগত করিবার নিমিত্ত মুড়োটা থালার উপরে "ঠক্ ঠক্" করিয়া ঠুকিতে লাগিল।

অরবিন্দকে নীরব দেখিয়া মাতা পুনরপি কহিলেন,—"কি বলিস্? তবে ঐ দিনই কি ঠিক কর্‌ব?"

অরবিন্দ মাথা না উঠাইয়া বলিল—"তোমার সবতাতেই তাড়াতাড়ি। আমি কলকাতা থেকে আসি। শেষে, যা হবার হ'বে।"

অরবিন্দের প্রত্যুত্তর শুনিয়া, শ্রীনাথবাবু চটিয়া উঠিলেন। রুক্ষস্বরে বলিলেন—"দেখ অরু, কলকাতায় যাও আর যাই কর, এ বিবাহ তোমাকে কর্‌তেই হবে; হারানকে আমরা কথা দিয়ে রেখেছি। আর, কল্‌কাতায় গেলেও তুমি সে পাষণ্ড যোগীনের বাড়ীতে কিছুতেই থাক্‌তে পার্‌বে না।"

অরবিন্দ পিতার কথার ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রকাশ্যে বলিল,—"এখন ও সব হ'বে না।"

শ্রীনাথবাবু অরবিন্দের নিকটে এরূপ জবাব প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন,—"তোমায় এ বিবাহ করতেই হ'বে। মনে করেছ আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে সেই ধর্ম্মহীন পাষণ্ড যোগীনের বুড়ো মেয়েটাকে বিয়ে কর্‌বে।—তা' হচ্ছেনা। তুমি এতদূর গোল্লায় গেছ?—নচ্ছার! অপদার্থ! নরাধম!" ব্রাহ্মণ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে অর্দ্ধভুক্ত ভোজনপাত্র ত্যাগ করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অরবিন্দ পিতার এবম্বিধ ব্যবহারে উদ্ধত হইয়া পড়িল। তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে প্রেম অতি সঙ্গোপনে অঙ্কুরিত হইতেছিল,—যাহার অস্তিত্ব সে নিজেও স্পষ্টভাবে কখন উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই,—পিতার এই রূঢ়-বাক্যে তাহার সমুদয় মনোবৃত্তি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া উদ্বেলতা প্রাপ্ত হইল;—সে হৃদয় মধ্যে সত্য সত্যই যেন বেদনানুভব করিল। এই অস্বাভাবিক উত্তেজনায় অরবিন্দ উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিল,—"আপনি অন্যায় কথা বলিতেছেন।"

শ্রীনাথবাবু কহিলেন,—"কুলাঙ্গার, পাজি, দূর হ';—তোর মুখদর্শনও কর্‌তে চাইনে। তুই আজ হতে আমার কেউ ন'স্!"

অরবিন্দ রাগে, দুঃখে, অপমানে, সাশ্রুনেত্রে, অধৌত হস্তেই ভবন হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

জননী কাঁদিয়া কহিলেন,—"ওরে যাস্‌নি, আয়! আয়! আয়!—তুই যে আমার বড় দুঃখের ধন।"

শ্রীনাথবাবু সহধর্ম্মিণীর বাৎসল্যোচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া, বজ্র-গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"চুপ কর গিন্নি। ও আমাদের ত্যাজ্য পুত্র।"

(৩)

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘকালের অবকাশ গ্রহণ করিয়া, শ্রীনাথবাবু সস্ত্রীক নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। দম্পতিবক্ষে অশান্তির ঝড় বহিতেছিল। তাই, আজ শান্তির আশায় গদাধরপাদপদ্ম-পূত ৺ গয়াধামে আসিয়া তাঁহারা কিছুদিন বসবাস করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সহরের উপকণ্ঠে ক্ষুদ্র একখানি গৃহে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। গয়ায় পৌঁছিয়াই সামান্য যাহা কিছু দ্রব্যাদি সঙ্গে ছিল,—পাণ্ডার জিম্মা করিয়া দিয়া, পথ-শ্রম-কাতর, অনাহারী শ্রীনাথবাবু কর্ত্রীঠাকুরাণী ও পুরাতন ভৃত্য জীবনরামকে লইয়া ফল্গুস্নানে যাত্রা করিলেন। শ্রীহরির চরণারবিন্দে পূজা না দেওয়া অবধি তাঁহাদের অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই। স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া দেব-মন্দিরে যাত্রা করিয়াছেন,—পথে রাশি রাশি ভিক্ষুকের দল তাঁহাদিগকে ছাঁকিয়া ধরিল। সহসা, একটি গোলগাল, টুকটুকে হৃষ্টপুষ্ট ছেলে সেই ভিখারীদলের ভিতর হইতে তাহার কুঞ্চিত-কেশ-সমাচ্ছন্ন অনিন্দ্য মুখখানি বাহির করিয়া, নাচিতে নাচিতে আধ'-আধ' স্বরে বলিল,—

"একতি পয়সা দাও না গো?" শিশুটিকে দেখিয়া শ্রীনাথবাবু ও কর্ত্রীমাতা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহিণী কহিলেন,—"আহা এ কা'র ছুলাল গো?" শ্রীনাথবাবুও তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। বলিলেন,—"বোধ হয় কারো হারানো ছেলে। আহা কি রূপ!—যেন ব্রজবালকটি।" কেন জানি না, গৃহিণীর চক্ষে ধারা বহিল। কাতরে অনুনয় করিলেন,—"ওগো, একে সঙ্গে নিয়ে চল না! নইলে বাছা না খেতে পেয়েই খুন হ'বে। আহা কোন্ অভাগীর মেয়ের এমন কপাল ভেঙ্গেছে!" শ্রীনাথবাবু সমবেত জনসমষ্টিকে বলিলেন,—"এ ছেলেটি কা'র তোমরা কেউ জান?" কেহ সে কথার উত্তরে কিছু বলিতে পারিল না। ছেলেটি রৌদ্র-তপ্ত বালুকাতটে দাঁড়াইয়া ততক্ষণে কান্না 'সুরু' করিয়া দিয়াছে। শ্রীনাথবাবু জীবনরামকে ডাকিয়া সেই নগ্ন শিশুটির প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন। জীবন তাহাকে লুফিয়া কোলে তুলিয়া লইল, এবং নানাবিধ অস্বাভাবিক উপায়ে শান্ত করিয়া, অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুম পাড়াইয়া ফেলিল। পথে চলিতে চলিতে কর্ত্রীমাতা সস্নেহ নয়নে সেই ঘুমন্ত সৌন্দর্য্যটিকে লক্ষ্য করিয়া, বারম্বার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শ্রীনাথবাবুও কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে, পাণ্ডা বলিল—"এই সেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম!" সকলে মন্দির-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রণত হইলেন।

* * * *

পূজা সমাপনান্তে সকলে যখন বাসস্থানে ফিরিলেন তখন শিশুটি জাগিয়া ক্ষুধায় কাঁদিতেছে। শ্রীনাথ-সহধর্ম্মিণী মাতৃস্নেহভরে শিশুকে বক্ষে লইয়া, গৃহমধ্যে পদচারণপূর্ব্বক নানাবিধ অশাস্ত্রীয় সুরে বর্গীর বঙ্গাক্রমণ-বিষয়ে বালকের জ্ঞান জন্মাইবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছেন, এবং বার বার জীবনরামকে দুধ জ্বাল দেওয়া এখন শেষ না হওয়ার জন্য তিরস্কার করিতেছেন।

* * * *

হঠাৎ বাহিরে একটা গোল উঠিল। অল্পক্ষণ পরেই শ্রীনাথবাবু আসিয়া বলিলেন—"ছেলেটির সন্ধানে লোক এসেছে!" শুনিয়া বৃদ্ধা বিরসবদনে কহিলেন—"লক্ষ্মীছাড়ারা এতক্ষণ কোথায় ছিল? যা'র ছেলে সে এসে নিয়ে যাক্। তা' না হ'লে, আমি একে ছাড়্‌ব না। বিদেশ-বির্গায় যা'র তা'র হাতে আমি এমন চাঁদকে সঁপে দিতে পার্‌ব না। কা'র ছেলে বল্‌লে?" শ্রীনাথবাবু শিশু-আননে নির্ণিমেষ দৃষ্টি করিতেছিলেন। কহিলেন—"সেটা এখনো জানা হয়নি। বল্‌লে—ছেলের বাপ চাক্‌রির খাতিরে ছুপুরে বেরিয়ে গিছ্‌ল। এর মাও রোজকার মত চাকরের কোলে ছেলে দিয়ে, পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গল্প কর্‌তে বেরিয়েছিল। এদিকে, চাকর হতভাগা ছেলেকে নামমাত্র ঘুম পাড়িয়ে, নিজে 'বোঁস্ বোঁস্ করে' নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে 'সুরু' কল্লে। দুরন্ত ছেলে সেই সুযোগে উঠে', সটান বাইরে এসে, ভিখিরী সেজে' আমাদের কাছে পয়সা চাইতে লাগ্‌ল। যেখানে ওকে আমরা পাই শুন্‌লাম, তা'রি কাছে—সেই রাস্তারই ধারে এদের বাড়ি।"

ভার্য্যা বাললেন,—"তা তো যেন বুঝ্‌লুম। কিন্তু, ও কথায় চল্‌ছে না;—ছেলের মা কি বাপ এসে একে নিয়ে যাক্। আহা যাদু আমার ক্ষিধেয় এতক্ষণ কাঁদ্‌ছিল। এইমাত্তর একটু দুধ খাইয়ে দিলুম। বাছা আবার "মা মা" করে' কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।"

শ্রীনাথবাবু বিগলিতচিত্তে প্রেমময়ীর স্নেহ-প্রবণ মাতৃহৃদয়ের মাধুর্য্যে মুগ্ধ, ব্যথিত হইতেছিলেন। প্রকাশ্যে কহিলেন,—"গিন্নি, তা' ব'লে অতটা ভাল নয়;—হাজার হোক্ পরের ছেলে।" গিন্নি মলিনমুখে হাসিয়া বলিলেন—"আমার আর নিজের পরের বিচারে কাজ কি?" দুই বিন্দু জল সহসা তাঁহার গণ্ড বাহিয়া, ঝরিয়া পড়িল। শ্রীনাথবাবুও একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, বহির্ব্বাটিতে চলিয়া গেলেন।

(৪)

কিছুক্ষণ পরে, একখানি গাড়ি করিয়া লক্ষ্মীরূপা একটি যুবতী শ্রীনাথবাবুর বাড়ী আসিয়া পৌছিলেন। শ্রীনাথবাবুর স্ত্রী সাদরে গাড়ি হইতে নামাইয়া, তাঁহাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন।

বালক তখন একখানি খাটের উপর শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে। তাহার মুখ-কমলে তখনো শুষ্ক অশ্রু-রেখা দৃষ্ট হইতে ছিল। যুবতী ডাকিল,—"বাবা বিজু।"

সেই চিরপরিচিত, বাঞ্ছিত কণ্ঠস্বরে শিশু চমকিয়া উঠিয়া,

"মা মা" বলিয়া মায়ের বক্ষোমাঝে পরমানন্দে আসিয়া, ঝাঁপাইয়া পড়িল। মাও তখন "হারানো রতন"কে কোলে লইয়া, সপ্রেমে তাহার মুখে স্তন্য-সুধাধারার নির্ঝর খুলিয়া দিলেন; এবং হৃদয়ের আগ্রহে, তাহার ক্ষুদ্র মস্তকটির ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে নীরবে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা আশ্রয়দাত্রী একাগ্র সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সেই অনাবিল প্রেমলীলা এতক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছিলেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"বলি হাঁগা মা লক্ষী, সোণার যাদুকে কি এম্‌নি করে'ই তাচ্ছীল্য কর্‌তে হয়? আহা ছেলে তো নয় যেন হীরের টুক্‌রো,—নাড়্‌লে রূপ ঠিক্‌রে পড়ে,—এমন ছেলেকে ফেলে' গল্প কর্‌তে গিছ্‌লে কোন্ হিসাবে মা?"

যুবতী বৃদ্ধার অকপট সহৃদয়তায় বিস্মিত, বিমুগ্ধ হইয়া কহিল,—"তা মা, আমি এম্‌নিধারাই বোকা মেয়ে।" সহসা কৃতজ্ঞতায় তাহার চক্ষে জল আসিল। সে চোক মুছিয়া বলিল,—"মা আপনাদের হাতে না পড়ে' যদি মানিক আমার আজ চোর-ডাকাতের হাতে পড়্‌ত তা' হ'লে আর বাছাকে আমি এ বুকে ফিরে পেতাম না। মা, আমার অপরাধ নেবেন না।"

যুবতীর সরলতায় বর্ষীয়সী মন্ত্রচালিতার ন্যায় তাহার সন্নিকটবর্ত্তিনী হইলেন; এবং সমবেদনায় নিজেও অশ্রু বিসর্জ্জিয়া, তাহার আঁখিনীর মুছাইয়া দিতে লাগিলেন।

যুবতী উক্তি করিল,—"আপনারা শুন্‌লাম আজই এসেছেন। তা কেন আমাদের বাসাতেই চলুন না?—এখানে আপনাদের বড় কষ্ট হ'বে।"

মনের ইচ্ছা চাপিয়া রাখিয়া বৃদ্ধা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন—"না মা তা'ও কি হয়? তীর্থি কর্‌তে এসে পরের কোন সাহায্যি নিতে নেই।"

যুবতী ম্লান মুখে কহিল,—"আমারই অদৃষ্ট! 'আপনার' লোক হ'লেও বা দু'দিন আপনাদের পদসেবা করে' মনের সাধ মেটাতে পারতাম।"

বৃদ্ধা সে কথাটা উড়াইয়া দিয়া অন্য কথা পাড়িলেন। বলিলেন,—"মা, তোমার আর ক'টি ছেলেপিলে? এইটিই কি সব ছোট?"

যুবতী সে কথায় মাথার কাপড়টি একটু টানিয়া বলিল,—"আর আমার নেই,—এই-ই প্রথম।"

এইরূপে অতি অল্প কালের ভিতরে মোটামুটি আলাপ পরিচয় শেষ হইলে, উভয়ের মধ্যে অতি গাঢ় ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল। এমন সময়ে, বাহির হইতে কে ডাকিল,—"বিজু।" সে কণ্ঠ শ্রবণ-গোচর হইবা মাত্র বালক মাতৃক্রোড় হইতে উঠিয়া, শব্দানুসরণ করিয়া, "বাবা বাবা" বলিতে বলিতে সদরের দিকে ছুটিয়া গেল। বৃদ্ধা মাথার কাপড় একটু অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া সাগ্রহে কহিলেন,—"কেও—তোমার স্বোয়ামী এলেন বুঝি?" যুবতী মাথা হেঁট করিয়া, একটু হাসিয়া সে কথার উত্তরে সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িল।

আচম্বিতে অরবিন্দ "মাগো মা আমার" বলিয়া, বৃদ্ধার নিকটে আসিয়া, ব্যাকুল ভাবে, তাঁহার চরণে মুখ রাখিয়া, নয়নসলিলে তাঁহার পাদপদ্ম বিধৌত করিতে লাগিল। তৎপশ্চাতে, শ্রীনাথ বাবু পৌত্রকক্ষে তথায় প্রবেশ করিলেন। বর্ষীয়সী মাতা প্রেমোন্মাদিনীর ন্যায় অরবিন্দকে সবলে বক্ষের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং "ও আমার বুক-জুড়োনো ধন," "ও আমার ভাঙা ঘরের আলো", "ও আমার আঁচলের নিধি," বলিতে বলিতে একবার—দুইবার—শতবার তাহার মুখে উদ্দাম মাতৃস্নেহোচ্ছাসে চুম্বন করিতে লাগিলেন।

সেই মৌন গৃহটি অকস্মাৎ আনন্দমুখর হইয়া চঞ্চল শ্রী ধারণ করিল। স্নেহের প্রথম উদ্বেল বেগ প্রশমিত হইলে, যুবতী গলবস্ত্রে, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর পায়ের ধূলা খাইয়া আভূমি-প্রণতা হইল।

অরবিন্দ কহিল,—"মা, তোমাদের এখনো রান্নাও চড়েনি বুঝি?—বেলা যে পড়ে' এল!"

জননী বড় সুখে বলিলেন,—"তা'র জন্যে ব্যস্ত হ'স্‌নি। তুই আয়,—আমার কাছে বোস্;—আম তোকে একটু দেখ্‌ব।" বুঝি, মা'র এখনও এ দৃশ্য সুখ-স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল;—বুঝি, এখনও তাঁহার 'অরু'কে দেখিয়া আশ মিটিতেছিল না।

পলক মধ্যে খেয়ালী বিজয়কুমার "বাবা, বালি দাবো!" বলিয়া 'বায়না' ধরিল। অরবিন্দ কহিল—"সেই বেশ কথা! চল মা, বাসাতেই সব ঠিক আছে, সেখানেই চল। দেখ বিজু কি বল্‌ছে।"

সম্ভবতঃ অমিয়ার বুদ্ধিতেই, বিজয় তৎক্ষণে মাতৃবক্ষ হইতে নামিয়া, দিদিমার অঞ্চল ধরিয়া "বালি তলো" বলিয়া টানিতে লাগিল। সুখ-স্নেহ-পীড়িতা, কল্যাণী ঠাকুর মা করুণ নয়নে সভয়ে ভর্ত্তার নির্ব্বাক মুখের দিকে চাহিলেন। বিজুবাবু তখন কি মনে করিয়া জানি না ঠাকুরমাকে ছাড়িয়া দাদাকে ধরিল। দুই বাহু প্রসারিত করিয়া, অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল,—"বালি নিয়ে তল দাদা।"

তখন সে পাষাণ-হৃদয় নিমেষেই সেই অর্দ্ধস্ফুট মধুবাণী শুনিয়া কি এক যাদু-মন্ত্র-বলে একেবারে বিগলিত হইয়া গেলেন। শ্রীনাথবাবু সরোদনে, যোড়করে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কহিলেন,—"লীলাময়, একি লীলা প্রভু? নিমেষে আজ এই পাষাণকে এমন করে'ই বিগলিত কর্‌লে! গদাধর, এ স্বর্গ-দূত বুঝি তোমারি আদেশ প্রচার কর্‌ছে। দেব, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্!" বলিতে বলিতে পলিত-কেশ বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইল। তখনো বিজয় 'বায়না' ছাড়ে নাই; বৃদ্ধের জানুদেশ দুইহস্তে জড়াইয়া তখনও সে কাঁদিতেছে "বালি নিয়ে তলো দাদা"। বৃদ্ধ পৌত্রকে লুফিয়া একেবারেই মাথায় তুলিয়া লইলেন। আবেগ-কম্পিত, গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন—"জীবনরাম"! জীবন আসিলে আজ্ঞা করিলেন,—"গাড়ি ডাক্, সব জিনিষ-পত্র তোল্!" জীবন দাদাবাবু ও 'বহু' দিদির পায়ে গড় করিয়া, হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া গাড়ির সন্ধানে ছুটিল। পিতাপুত্র বহির্ব্বাটীতে আসিলেন।

অমিয়া বলিল,—"এত সুখের দিন আর কি হবে মা?"

মা সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। নীরবে, ধীরে, নিজের ডান হাতে অমিয়ার চিবুক স্পর্শ করিয়া, তাহার উদ্দেশে সেই হস্ত চুম্বন করিলেন।

মুখরা, বাল-স্বভাবা অমিয়া আবার কহিল—"আচ্ছা মা, বিজুকে দেখে কি বাবার মায়া পড়ে'ছিল?"

বৃদ্ধা এইবার উত্তর করিলেন। বলিলেন—"আশ্চার্য্য মা, সে আশ্চর্য্যি মায়া! একশোটি বার বাছার মুখের দিকে চে'য়ে চে'য়ে বল্‌ছিলেন,—'আহা কি রূপ!—যেন বেরজো-বালকটি! বোধ হয়—অরু এখানে না এলেও, মাণিককে নিয়ে শুধু তুই চলে গেলেই বাবু তোদের বাড়ি গে' বাস কর্‌তেন।' একি মুখের কথা মা? এ রক্তের টান, বড় শক্ত কথা!"

দুষ্টা অমিয়া হাসিয়া বলিল,—"তাই জন্যেই তো মা, কথায় বলে,—আসলের চেয়ে তার সুদের মায়া বেশি।"

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

স্বর্গীয় রবিবর্ম্মা।

পরলোকগত প্রসিদ্ধ চিত্রকর রাজা রবিবর্ম্মার জীবনীসম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে তাঁহার সহিত যে পরিচয়টা থাকা উচিত, অদৃষ্টক্রমে আমার সেটা ঘটিয়া উঠে নাই। বহু বৎসর হইল, চিত্রবিদ্যায় আমি তখন একজন শিক্ষার্থী মাত্র, সেই সময়, একদিন এই জগদ্‌বিখ্যাত চিত্রকর আমাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন; ঘরে না থাকায় আমার সহিত তাঁহার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে নাই। তিনি আমার তখনকার একখানা Sketch দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "It is rather ambitious for the young man" অর্থাৎ ছোকরার সাহস ত কম নয়! এই তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় এবং সম্প্রতি বোম্বাই শিল্পপ্রদর্শনীতে দেশীয় ধরণের আমার কতকগুলি ছবি দেখিয়া আমার সবিশেষ পরিচয় লইতে আমারই কোন বন্ধুকে পত্র লেখেন। সেই তাঁহার সহিত আমার শেষ আলাপ। এতটুকু পরিচয়ে রবিবর্ম্মা মানুষটী কেমন ছিলেন বলা আমার পক্ষে অসম্ভব; অতএব তাঁহার সহিত সবিশেষ পরিচিতের উপরে সে ভার দিয়া রবিবর্ম্মার শিল্প সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিয়া ক্ষান্ত হওয়াই ঠিক।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ২৯শে এপ্রিল ত্রিবাঙ্কুরের প্রাচীন রাজবংশে রবিবর্ম্মার জন্ম হয়। তের বৎসর বয়সে তিনি স্বলিখিত কতকগুলি চিত্র ত্রিবাঙ্কুররাজকে উপহার দেন। এবং সেই হইতে তাঁহার শিল্পশিক্ষার সুবন্দোবস্ত হয়; আজীবন তিনি শিল্পচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিয়া দেশে বিদেশে যশস্বী হইয়াছেন, বিজয়লক্ষ্মী কখন তাঁর প্রতি বিমুখী হন নাই! এইটুকু তাঁহার জীবনের ইতিহাস; কিন্তু এইটুকু জানিয়াই সন্তুষ্ট থাকিলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হইবে। উদ্যোগী পুরুষমাত্রকেই লক্ষ্মী আপনা হইতে বরণ করেন; ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। ত্রিবাঙ্কুর রাজের উদার মন, অগাধ ধন ছিল। তিনি বালক রবিবর্ম্মার সুশিক্ষায়

বন্দোবস্ত করিবেনই তো। রাজপুত্র কিম্বা লাটসাহেবের চোখে কোন ছবি সুন্দর ঠেকিলে চিত্রকরের ধনলাভের সম্ভাবনা, কিন্তু চিত্রখানির গৌরব যে কিছুমাত্র বাড়ে এরূপ তো মনে হয় না; অমর রহিবার ইচ্ছা সু, কু, সুরূপ কুরূপ সকল মানুষেরই সমান এবং রবিবর্ম্মার মত নিপুণ চিত্রকর পাইয়া ধনবান যে তাঁহার দ্বারা নিজেদের উপযুক্ত মূল্যে অমর করিয়া লইবে তাহা আর বিচিত্র কি? শিল্প-প্রদর্শনীর সুবর্ণ-পদক এবং খবরের কাগজের গুণগান একের অভাবে অন্যকে আশ্রয় করে! ব্যক্তিগত এই সকল সৌভাগ্য সম্পদ যদি আমরা রবিবর্ম্মার সারাজীবনের ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করি, তবে আমরা তাঁর জীবনের কিছুই জানিলাম না, অথবা অতি নিঃসার অংশটুকুই গ্রহণ করিলাম বলিতে হইবে। আমাদের পুরাণ ইতিহাস হইতে রবিবর্ম্মা যত চিত্র লিখিয়াছেন এত আর কোন এদেশীয় চিত্রকর লিখিয়াছেন কিনা সন্দেহ; দেশীয় সাহিত্যে বিলক্ষণ দখল এবং একটু বিশেষ অনুরাগ না থাকিলে এটুকু হয় না। রবিবর্ম্মা যে একজন পাকা রসজ্ঞের মত আমাদের কাব্য ভাণ্ডারের যা কিছু উত্তম বাছিয়া লইয়াছিলেন এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না এবং এ কথাও ঠিক যে আজ রবিবর্ম্মার সুনাম যে জন্য, দু'দশটা সুবর্ণ পদক তাহার কারণ নয়, কিন্তু একমাত্র স্বদেশপ্রীতি ও স্বধর্ম্মে আস্থাই তাহার মূল কারণ হইতে পারে। চিত্রকরের স্বদেশীতা ও স্বধর্ম্মের আস্থার অর্থ দেশীয় কাব্য সাহিত্য চর্চ্চা করা, দেশীয় ভাবরসে মগ্ন থাকা ও দেশীয় প্রণালী মতে পূর্ব্বতন শিল্পাচার্য্যগণের প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া দেশের শিল্পটাকে উন্নত করিতে চেষ্টা পাওয়া। রবিবর্ম্মার চিত্র-গুলিতে আমরা এই জাতীয়তার আভাস পাই এবং সেই জন্যই সেগুলি আমাদের কাছে এত যত্নের সামগ্রী। নচেৎ বিলাতী প্রণালী মত Shade Light Perspective grouping of figures, Human anatomny প্রভৃতি আড়ম্বরসার কতক তৈলচিত্র লিখিয়া গেলে রবিবর্ম্মা কোন হুবহু সাহেবের মত ইংরাজীবাগীশ কিম্বা বিলাতি গোরার মত ক্রিকেটবাজের অপেক্ষা আমাদের কাছে যে অধিক সমাদর লাভ করিতেন এরূপ তো বোধ হয় না।

ভারতবর্ষে ইংরাজরাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে একটা নব্যতার স্রোত আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। নবতর সভ্যতা এবং ভব্যতার সঙ্গে আমাদের চিত্রশিল্পেও Style, Perspective, Shade and Light এবং Anatomy রূপ কতকগুলা নব্যতা আসিয়া আমাদের প্রাচীন শিল্পটাকে বে-দখল করিয়া বসিয়াছে এবং নব্যতার অনুকূল দলের কাছে আমাদের যা কিছু পুরাতন যেমন হেয়, নূতন প্রণালী মতে শিক্ষিত শিল্পীর নিকটেও তেমনি আমাদের চিত্রশিল্পটা একেবারে অগ্রাহ্য হইয়া পড়িয়াছে; ইটালিয়ান Styleএর ন্যায় ভারতবর্ষের চিত্রকলার যে একটা বিশেষত্ব আছে এবং Perspective ও Light Shade বাদ দিয়া ঠিক anatomical না হইয়াও কোন চিত্র যে চিত্র নামের যোগ্য হইতে পারে এ কথা নব্যদলের ধারণাতেই আসে না। এই নব্যতার এমনি মোহ যে জগৎশুদ্ধ ভারত-শিল্পের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, কেবল আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না যে ভারতের চিত্রকলা—সে perspectiveএর কোন ধার ধারে না Shade Lightএর দিক দিয়াও যায় না—সে কেমন করিয়া চিত্র নামের যোগ্য হয়! রবিবর্ম্মা যে এই নব্যতার হাত এড়াইয়াছিলেন এ কথা বলা চলে না; বরং ইউরোপীয় চিত্রশিল্পের দিকে তাঁর একটু বিশেষ ঝোঁকই দেখা যায়। কিন্তু তথাপি তিনি সে নব্যতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন এ কথাও বলা চলে না। তিনি নূতন প্রণালীতে চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন বটে, কিন্তু চিত্রে সাজসরঞ্জাম ও আখ্যায়িকাটুকুর জন্য পুরাতনের শরণাপন্ন হইয়াছেন। একদিকে আমরা দেখি রবিবর্ম্মা ইউরোপের শিল্প-জগতের সহিত যোগ রাখিবার জন্য তথাকার চিত্র-পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতেছেন, আর একদিকে তিনিই আবার বড়োদারাজের নিকট পৌরাণিক চিত্র লিখিবার হুকুম পাইয়া আমাদের প্রাচীন সাজসজ্জা অলঙ্কারাদি দেখিবার জন্য ভারতের দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রবিবর্ম্মা নিজে এবং তাঁর অনেক বন্ধুই আক্ষেপ করিয়াছেন যে সমাজের কঠোর শাসন বশতঃ তিনি ইউরোপে শিল্প শিক্ষার জন্য যাইতে পাইলেন না! আমি তো বলি সেটুকু আমাদের সৌভাগ্যক্রমেই ঘটিয়াছিল। রবিবর্ম্মার চিত্রে যে জাতীয়তাটুকু পাই সেটুকুর খাতিরে তাঁর সকল দোষ মার্জ্জনা করা চলে; কিন্তু বিলাতি শিল্পচর্চ্চা করিতে গিয়া

তিনি যদি জাতীয়তাটুকু হারাইয়া বসিতেন তবে আমাদের ক্ষোভের সীমা থাকিত না। ভারতমাতা যে তাঁর এই প্রতিভাশালী সন্তানকে দৃঢ় শৃঙ্খলে গৃহকোণে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন সে আমাদেরই মঙ্গলের জন্য সন্দেহ নাই।

রবিবর্ম্মার চরিত্র অনুশীলন করিয়া দেখিলে আমরা বেশ বুঝি যে তিনি কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন এবং সাধনার কঠোরতা অনুযায়ী সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধিলাভ করিয়া কেবল মেডেলরূপ স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে যদি তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন যদি তাঁর প্রাণ দেশীয় শিল্পের জন্য না কাঁদিত এবং সাধনার ফল স্বদেশে বিতরণ না করিয়া বিলাতীর সেবায় যদি তিনি অর্পণ করিতেন তবে আজ তিনি আমাদের কাছে বাঙ্গালী সাহেব ও ধনীর ঘরের সাক্ষিগোপালগুলির মত একান্তই হেয় হইয়া থাকিতেন এবং আমরা বলিতে বাধ্য হইতাম যে, তিনি ক্ষমতা সত্ত্বেও নিজের দেশকে বঞ্চিত রাখিয়া গেলেন।

এত অসংখ্য এবং বিভিন্ন ধরণের চিত্র রবিবর্ম্মা লিখিয়া গিয়াছেন যে সেগুলির গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব এবং একই ব্যক্তি যে সেগুলির যথার্থ বিচার করিতে পারিবে এ আশাও বৃথা। রবিবর্ম্মার সকল চিত্রের যথার্থ মর্ম্ম বুঝাইতে বহুদিন ধরিয়া বহু লোকের মতামত সংগ্রহের প্রয়োজন, কিন্তু এটুকু অসংকোচে বলা চলে যে রবিবর্ম্মার প্রদর্শিত নূতন পথটা অনুসরণ এবং তাঁহার শিল্পটাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমরা একবার ভাবিয়া দেখিব আমাদের কি ছিল এবং যাহা ছিল সেইটাকে নবজীবন দান করা কিম্বা সেটাকে উপেক্ষা করিয়া একটা কিছু নূতন গড়িয়া তোলা প্রয়োজন!

আমাদের প্রাচীন চিত্রশিল্পের নমুনা আমরা অজন্টা প্রভৃতি পর্ব্বতগুহায় দেখিতে পাই। এককালে যে এই শিল্প সমস্ত ভারতের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়; কাশী, জয়পুর, উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, নেপাল এবং বাঙ্গালায় এখনও এই প্রাচীন চিত্রশিল্পের নিদর্শন বর্ত্তমান। জয়পুর ও কাশীতে গৃহভিত্তি এবং মসৃণ কাগজে সে সকল চিত্রপট অঙ্কিত হইয়া থাকে, উড়িষ্যার জগন্নাথের পট, মান্দ্রাজের ত্রিপতি মেলায় যে সকল চিত্রপট বিক্রয়ার্থ আসে, বোম্বাইয়ের দশ অবতার খেলিবার তাস, নেপালের চর্ম্মফলকে লিখিত বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি, বাঙ্গলা দেশের কাপড়ের উপর লিখিত এবং পুরাতন পুঁথির পাটায় রঞ্জিত সে সকল চিত্রাদি এখনও পাওয়া যায় সেগুলিতে অজন্টা শিল্পের প্রভাব বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। এই অতি প্রাচীন শিল্প যে এককালে সমস্ত প্রাচ্য দেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং পারস্য কাবুল তিব্বত চীন জাপান প্রভৃতি দেশের প্রাচীন চিত্রশিল্প যে এই অজন্টা শিল্পেরই অনুরূপ সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। দেশ কাল পাত্র ভেদে এই প্রাচীন শিল্পের কোথাও উন্নতি বা অবনতি ঘটিয়াছে বটে কিন্তু মূলতঃ একটার সহিত আর একটার পার্থক্য নাই বলিলেই হয়। দিল্লীর গজদন্তের পট আর জয়পুরের কাগজের ছবিতে আধার মাত্রের ভেদ, অঙ্কন এবং রঞ্জনপ্রণালী সেই সাবেক নিয়মে চলিয়া আসিতেছে। নেপালের চর্ম্মফলক এবং বাঙ্গালার কাঠের পাটা এ দুয়ের শিল্পগত পার্থক্য না থাকারই মধ্যে; যে প্রণালীতে উড়িয়া চিত্রকর জগন্নাথের পট লেখে সেই প্রণালীতেই মান্দ্রাজ বোম্বাইয়ের চিত্রশিল্পী খেলার তাস তৈয়ারি করে। চীন জাপানের জতুচিত্র, পারস্য কাবুলের চিত্রিত টালি এই শিল্পেরই সুন্দরতর বিকাশ মাত্র এবং এই শিল্প সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিত আজও সেই মতই চলিয়া আসিতেছে। তবে কাহারও হাতে পড়িয়া কোথাও এটা দিল্লীর পটরূপে আজ জগদ্‌বিখ্যাত আর কাহারও বা হাতে পড়িয়া কোথাও বা সেটা কালীঘাটের ও জগন্নাথের পটরূপে বিরাজমান। রবিবর্ম্মার শিল্প এই প্রাচীন ভারতশিল্প হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব সেটাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আদর্শ শিল্প এবং আদর্শ শিল্পী কাহাকে বলে, জানা থাকা আবশ্যক।

শিল্পীর পক্ষে হস্তের নিপুণতা যেমন, মনের ভাবগ্রাহিতা এবং মাস্তিষ্কের উদ্ভাবনীশক্তিও তেমনি অত্যাবশ্যক; ইহার একটাকে বাদ দিয়া আর একটাকে রাখিলে চলে না। এই তিনটি গুণের ন্যূনাধিক্য লইয়া শিল্পী ও শিল্পের গুণাগুণ নিরূপিত হয় এবং এই তিন গুণের সম্পূর্ণ অধিকারী আদর্শ শিল্পী বলিয়া কথিত হয়েন। এখানে জানা কর্ত্তব্য যে এই তিন গুণেরই একত্র সমন্বয় যুগান্তে একবার ঘটে কিনা সন্দেহ! হস্তের নিপুণতা মানুষের আয়ত্তাধীন কিন্তু ভাবের স্ফূর্ত্তি এবং জ্ঞানের উন্মেষ সুকৃতী বলে কদাচিৎ কোন মনুষ্য লাভ করে।

আমরা কোন একটা বিশেষ পদার্থ পাইলেই সেটা নাড়িয়া চাড়িয়া ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা পাই। তখন হয় চোখে চশমা লাগাই নয় তো দূরবীক্ষণ কিম্বা অণুবীক্ষণের সাহায্য লই। অভাবে হাতের জিনিষটাকে আলোর দিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়াও পরীক্ষা করি। একমুষ্টি ধূলা কিম্বা একরাশ খড় দেখিবার জন্য আমরা চশমা আঁটিতে যাই না; তেমনি কোন শিল্পে যদি কোন বিশেষত্ব থাকে তবেই সেটাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য নৈপুণ্য, উদ্ভাবনা এবং ভাব এই ত্রিগুণাত্মক তিনখানি চশমা চোখে লাগান আবশ্যক। রবিবর্ম্মার শিল্প জগতের চক্ষু আকর্ষণ করিয়াছে। অতএব আদর্শ শিল্পীর কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া এই শিল্পের গুণাগুণ বিচার করিলে তবে আমরা রবিবর্ম্মার মহত্ত্ব এবং তাঁর শিল্পেরও যথার্থ সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব; তাহা না করিয়া স্বজাতিপ্রেমের দোহাই দিয়া তাঁহাকে রাজমুকুটে ভূষিত করিয়া বসিলে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হইব এবং সেই পরলোকগত রবিবর্ম্মাকেও যে বিশেষ ভাবে উপেক্ষা করিব এ কথা বলাই বাহুল্য।

এই যে রাজবংশীয় যুবক, সে অনায়াসে মোটর গাড়ী হাঁকাইয়া সাহেবদের ভোজ দিয়া, 'বলে' নাচিয়া অথবা ঘোড়দৌড়ে জুয়া খেলিয়া জীবনটা সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইতে পারিত। সে যখন চিত্রকরের ব্যবসায় বাছিয়া লইল, তখন তার মনে নিশ্চয়ই কতকগুলা সুবর্ণপদক মাত্র বল সঞ্চার করে নাই, দেশের জন্য কিছু করিব এই উৎসাহই তাহাকে নবজীবন দান করিয়াছিল নিশ্চয়। নচেৎ যে ইচ্ছা করিলে Star of India পদক সহজে করগত করিতে পারে সে প্রদর্শনীর সোণার পদক পাইতে এত কঠোর করিয়া শ্রম করিতে যায় কেন? চিত্রকর হইতে যে উৎকট শ্রম দরকার এ কথা অনেকে বোঝে না; রবিবর্ম্মার যে শিল্প এত সুলভে আজ আমাদের ঘরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে সেগুলি উৎপন্ন করিতে রবিবর্ম্মাকে কত নিরাশা কত না উপহাস উপেক্ষা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি আজ যে আনন্দের সৌন্দর্য্যের দান আমাদের জন্য রাখিয়া স্বর্গে গিয়াছেন সেটুকু সংগ্রহ করিতে যে তিনি প্রাণপাত করিয়াছেন এবং সে জন্য রবিবর্ম্মা আমাদের কাছে যে চিরস্মরণীয় এ কথা দুই বার করিয়া বলিতে হইবে না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঐতিহাসিক বীর-গাথা।

ইশা খাঁ।

[বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বারভূঞাদের মধ্যে ইশা খাঁ, জন। ইনি মাতৃভূমির চরণশৃঙ্খল মোচনার্থ সচেষ্ট হইলে, সহর সোণার-গাঁয়ের শাসনকর্ত্তা ওই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ইশা খাঁ সহর সোণার-গাঁ ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলি অধিকার করিয়া লন ও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তৎকালীন মোগল সম্রাট আকবরের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি ইশা খাঁকে ধৃত করিবার জন্য প্রসিদ্ধ সেনাপতি সাহাবাজখাঁকে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইশা খাঁকে মোগলসেনাপতি কোন মতে পরাস্ত করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দেন।]

পূবের পাঠান বীর
বন্দী মায়ের বাঁধন কাটিতে
তুলিল যখন শির,
ভীত শাসক　　হ'ল পলাতক
পড়িল পাতশা পায়,
"প্রভুর ন্যায্য　　বঙ্গ রাজ্য
চোরেতে লুটিয়া খায়!"
ক্রোধে আকবর　　দিল্লীশ্বর
অধীর সে কথা শুনি,
"কোথা সেনাপতি　　যাও ত্বরা অতি
দেহ দ্রোহী শির আনি।"

পূবের পাঠান বীর,
বন্দী মায়ের বাঁধন কাটিতে
তুলিল যখন শির,
দিল্লী দুর্গে　　সাজিল গর্ব্বে
সেনা সেনাপতি সাদী,
রাজপুত দল　　প্রবল মোগল
কটিতটে অসি বাঁধি।
বাদশা আদেশ　　বাঙ্গলার দেশ
শোণিতে সিক্ত করি,
বিদ্রোহী দলে　　উড়াবে সমূলে
হৃদে প্রতিজ্ঞা ধরি।

পূবের পাঠান বীর,
বন্দী মায়ের বাঁধন কাটিতে
তুলিল যখন শির,
কাঁপিল নগর করি থর থর্,
হাজার হাজার দল,
বাহিরিল সবে রাজপথে যবে
করি অসি ঝলমল্।
"এবে বাঙ্গলার নাহিক উদ্ধার"
ভাবিল সকলে মনে,
"শের সাহাবাজ লয়েছে এ কাজ
কে আঁটিবে তার সনে!"

পূবের পাঠান বীর,
বন্দী মায়ের বাঁধন কাটিতে
তুলিল যখন শির,
বাদশার বাণী চরমুখে শুনি
মানিলনা মনে ভয়,
"ক্ষতি কিবা তাতে মায়েরে রক্ষিতে
মরিতে যদি বা হয়!
বাঙ্গলা আমার অতি আপনার
সে যে জননীর সম,
স্তন্যসমান শস্য তাহার
রাখিছে জীবন মম;
এ জননী পায় যে পরাতে চায়
লৌহ নিগড় খানি,
জনমে জনমে সে মোর শত্রু,
চোর বলে তারে মানি।
আসুক সাবাজ করি শত সাজ
হ'য়ে যা'বে সব মিছে,
বাঙ্গলা রক্ষিতে বাঙ্গালীর প্রাণ
যত দিন জেগে আছে।"

পূবের পাঠান বীর,
বন্দী মায়ের বাঁধন কাটিতে
তুলিল যখন শির,
উড়ায়ে পতাকা স্বাধীনতা লেখা
ডাকিল "আয় রে আয়,
মায়ের পায়েতে পরাবে নিগড়
নীরবে দেখিবি তায়!
আয়রে হিন্দু আয় মোশলেম্
মিলি এক সাথে ভাই,
জননীর কাজে চলেছি যখন
মত ভেদ সেথা নাই।"

পূবের পাঠান বীর,
বন্দী মায়ের বাঁধন কাটিতে
তুলিল যখন শির,
শুনি আহ্বান দিতে এল প্রাণ
কৃষক লাঙ্গল ফেলি,
ব্রাহ্মণ তার পূজা পাঠ আর
গাত্রের নামাবলী।
কায়স্থ লেখা লেখনী ফেলিয়া
লইয়া খড়্গ করে,
পাঠান তাহার পাষাণ বক্ষে
অতুল সাহস ধরে।

পূবের পাঠান বীর,
বন্দী মায়ের বাঁধন কাটিতে
তুলিল যখন শির,
ঝন্ ঝন্ ঝন্ বেজে গেল রণ
মোগল সৈন্য সাথে,
বাঙ্গালী দাঁড়াল বীরের মতন
জননীরে রক্ষিতে।
দিতেছে তপ্ত বুকের রক্ত
শত্রু শস্ত্র মুখে,
জয় জননীর গাহিয়া স্তুতিছে
সমর ক্ষেত্রে সুখে।

পূবের পাঠান বীর,
বন্দী মায়ের বাঁধন কাটিতে
তুলিল যখন শির,

সকল গর্ব্ব হইল খর্ব্ব
পলাল সাবাজ সেনা।
"এই পরিণাম তোদের যে হ'বে
ছিল রে ছিল রে জানা,
বাঙ্গলা রাখিতে বাঙ্গালীর প্রাণ
এখন রয়েছে জাগি,
মোগল রাজের সব সেনা লয়ে
এলেও যে'তিস ভাগি।"

পূবের পাঠান বীর,
বন্দী মায়ের বাঁধন কাটিতে
তুলিল যখন শির,
বাদশা অথির সাহাবাজ বীর
পরাজিত শুনি রণে,
"একি অদ্ভুত আমার বাঙ্গিনী
অজেয় ছিল যে মনে।"
বাজিল সমুখে আকাশের বাণী,
বীর ঈশা-বাণী মত
"বাঙ্গলা রাখিতে বাঙ্গালীর প্রাণ
আজ আছে জাগ্রত।"

শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ

ঠিক্ বলেছ।

(১)

তোম্‌রা কর শ্রমের বড়াই
আম্‌রা যে রে বাবু।
তুমি চাহ কর্ত্তে লড়াই,
আমি তাহে কাবু।
তোমার খেলা ছুটোছুটি,
আমার খেলা গ্রাবু।
তোমার খাদ্য গোস্তরুটি,
আমার পথ্য সাবু।
মোরা আর্য্য, অতি শিষ্ট;
তুমি বেটা ম্লেচ্ছ।
তুই লোকের নাহি ইষ্ট!
ঠিক্ বলেছ! হেঁচ্চো।

(২)

তোদের ধর্ম্ম রজ-তম,
মোরা অতি সাত্বিক;
তোদের মূর্ত্তি অসুর সম,
মোরা রূপে কার্ত্তিক।
পা-উঁচিয়ে কর রোষ,
ঘন ঘন মার কিক্;
আইন্ খুলে তস্য দোষ
দেখাই মোরা তার্কিক।
আর্য্য যাবে স্বর্গে হেঁটে;
তোরা দেবের তেজ্য।
মর্বি খালি রাজ্য ঘেঁটে।
ঠিক্ বলেছ! হেঁচ্চো।

(৩)

জানিস্? যখন ছিলি বনে,
কর্‌ল এই জা'তে কি?
ধনী হয়ে মোদের ধনে
লড়্‌বি মোদের সাথে কি?
আছে প্রাচীন ঘিয়ের ভাঁড়,
নাই থাকুক তাতে ঘি;
খাচ্চি এখন ভাতের মাড়,
দেখ্‌বি পরে পাতে কি!
শাস্ত্রগুলো করি জড়
ভাব্‌লে কথা নেয্য,
বুঝ্‌বি মোরা কত বড়!
ঠিক্ বলেছ! হেঁচ্চো।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

জ্যোতিনির্ব্বাণ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুরমার ভাগ্যলিপি।

কাশবনে আগুণ লাগিলে, প্রবল বায়ু যেমন তাহাকে দ্রুতবেগে একস্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চারিত করে, গঙ্গাধর চৌধুরীর পুত্রবধুর উপর পাপিষ্ঠ দুস্যু কার্ভালোর অত্যাচার সংবাদও সেইরূপ মুহূর্ত্ত মধ্যে শ্রীপুরের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। জনরব নিজের মন্ত্রময় শক্তিতে এক রাত্রির মধ্যে তাহার অনেক শাখা প্রশাখা জন্মাইয়া দিল। অনেক রূপক ও অলঙ্কারে সেই শীর্ণ জনরব অতি সুপুষ্ট কায়া ধারণ করিল।

অঙ্গনে বসিয়া ক্ষান্ত পিসি এই নবপুষ্ট গল্পের প্রথম ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। পাড়ার অনেক বৃদ্ধা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বালিকা তাহার চারিদিকে বসিয়া উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের সহিত তাঁহার কথাগুলি শুনিতে লাগিল। আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি, ক্ষান্ত পিসি এ যুগের লোক হইলে হয়ত উপন্যাস-জগতে কতকটা প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার কল্পনাকুশলতার একটু পরিচয় দিই।

ক্ষান্ত পিসি আরম্ভ করিলেন—"দেখ ন-গিন্নি! আমি ভাই আগে সেই সাহেব পোড়ার মুখোকে দেখ্‌তে পাই। আমি কি হঠ্‌বার মেয়ে? তবু আমি সাহসে ভর করে পুকুরে নেবে জল তুললুম। ছুঁড়ীগুলো কেউ জলে নাবতে চায় না। সব্বাইএর কলসীতে জল পুরে দিলুম। সাহেব ব্যাটা পুকুরের ওপার থেকে সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে। আমি ভয় পাইনি দেখে—সে যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। আমি এদের সঙ্গে করে জল থেকে উঠে আসছি—আর চোখটিপে বলছি, "ভয় কি আমি সঙ্গে আছি" এমন সময়ে দেখি, অশোক তলায় একটা কলসী পড়ে। সেটা সুরো'র কলসী। আমি অনেক ডাকলুম—সে শুন্‌তে পেলেনা। এমন সময়ে দেখি সাহেবটা সুরোর দিকে দৌড়ে গেল। গিয়ে তার হাত ধল্লে। তখন অন্ধকার নেবে এসেছে, পরে কি হলো ভাই দেখতে পেলুম না। তখন ভাবলুম—বাটীতে এসে খপর দিই। ভগবান সহায়। রাস্তায় রাজার লোকেদের সঙ্গে দেখা হলো। তাদের যাই বলা, অমনি তারা হুঙ্কার করে চলে গেল। কি করবো বল বোন! এই ছুঁড়ীগুলো সঙ্গে থেকেই ত আমায় কিছু কর্ত্তে দিলেনা। না হলে এই কলসীর বাড়ী সেই সাহেব পোড়ার মুখোর মাথাটা ভেঙ্গে দিয়ে—সুরোকে নিয়ে চলে আসতুম। আহা! গঙ্গাধর ঠাকুর-পো অতি ভাল মানুষ! তার বংশে একটা কলঙ্ক র'য়ে গেল।"

ক্ষান্ত পিসি ঠাকুরাণীর সৌভাগ্য ও গুরুবল যে, সে সময়ে তাঁহার পূর্ব্ব দিনের সঙ্গিনী যুবতীগণ কেহই সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন না! তাহা হইলে ক্ষান্ত পিসির সত্যবাদিতার সম্বন্ধে একটা মহা তর্ক-কোলাহল উঠিত। জনরবের এক ক্ষেত্রের একটা নমুনা উপরে দিলাম। অপর দিকেও এইরূপ আরও নূতন নূতন ঘটনার সমাবেশে, ব্যাপারটী আরও গুরুতর হইতেছিল। আর অভাগিনী সুরমা! সে নিষ্কলঙ্কা, দীপ্ত-তেজোময়ী হইয়াও নিজের অজ্ঞাতসারে, অকারণনিক্ষিপ্ত এই সমস্ত তীব্র শ্লেষের লক্ষ্যস্থল হইতেছিল!!

গঙ্গাধর ঠাকুর গৃহে আসিয়া গৃহিণীর প্রমুখাৎ পুত্রবধু-সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা শুনিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সে রাত্রে তখনই রাজবাড়ীতে না গিয়া একটা কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। কর্ত্তা গৃহিণীতে যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল তাহার আমরা খবর রাখিয়াছি।

গৃহি। হাঁ গা—সাহেবে ছুঁয়েছে—বৌমাকে ঘরে নিলে লোকে ত কাণাকাণি করবেনা? অই ঘোষালদের—

কর্ত্তা। চুপকর গৃহিণী! চুপকর। ওকথা মুখে এন না। বৌমা আমার সতীলক্ষ্মী! তাঁর অপরাধ কি? মা আমার সতীত্বের গৌরব দেখিয়ে আত্মরক্ষা করে এসেছেন।

গৃহি। তা লোকে যা বলে বলুক, আমি অমন সোনার বউ ত্যাগ করবো না। সমাজের কর্ত্তা রাজা চাঁদ রায়। তিনি সহায় থাকলে কাকেও ভয় করিনি। সকালে একবার রাজার কাছে যাওনা—সব বলগে না।

কর্ত্তা। সকালে ত দেখা হবে না। কাল বিকালে যাব। তাঁর কাছে আগে না গিয়ে—সকালে উঠেই যুবরাজ কেদার রায়ের কাছে যাবো।

এই কথা শেষ করিয়াই কর্ত্তা পুত্রবধুকে আহ্বান করিলেন।

সুরমা বাতাহত শরপত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যেন সে কত অপরাধিনী। আড়াল হইতে সে সব শুনিয়াছিল।

কর্ত্তা সস্নেহ স্বরে বলিলেন—"বৌমা! তুমি আমার কুল-লক্ষ্মী, আজ যে সাহস দেখিয়ে সতীত্বের গৌরব রক্ষা করেছ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন সকল বাঙ্গালীর মেয়ে বিপদে পড়ে এরূপ কর্ত্তে পারে। রাত হয়েছে—আমার ভাত বেড়ে এনে দাও।"

বলা বাহুল্য, পরদিন প্রাতে গঙ্গাধর চৌধুরী মহাশয় যুবরাজ কেদার রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কেদার রায় ইতিপূর্ব্বেই সমস্ত ঘটনা শুনিয়াছিলেন। কাজেই ব্রাহ্মণকে বেশী কষ্ট পাইতে হইল না। তিনি সুরমার সাহস, শৌর্য্য, সতীত্বগৌরবের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। আরও বলিলেন—"এ অপরাধের বিচার আমার দ্বারা হইবে না। মহারাজ নিজে এর বিচার করিবেন। আমি সেই নর-পিশাচকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছি। অপরাহ্ণে রাজা মামলার বিচার করিয়া থাকেন। আপনি সেই সময়ে আসিবেন। আমিও সঙ্গে থাকিব।"

বৃদ্ধ গঙ্গাধর চৌধুরী পৈতা হাতে লইয়া কেদার রায়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কার্ভালোর অপরাধের বিচার।

স্বর্ণখচিত হস্তিদন্ত নির্ম্মিত সুন্দর কারুকার্য্যময় শুভ্র শয্যার উপরে বসিয়া—রাজা চাঁদরায়। শুভ্র, কুঞ্চিত গুচ্ছময় কেশরাশি তাঁহার মস্তকের চারিধার বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উজ্জ্বল, উৎক্রোশদৃষ্টিময় চক্ষুর্দ্বয় সেই বার্দ্ধক্যমণ্ডিত মুখে শৌর্য্য বীর্য্যের মহিমা প্রচার করিতেছে। চিন্তাশূন্য মুখমণ্ডলে সে বৃদ্ধ বয়সে যেন তেজপ্রতিভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ত্রিবলী চিহ্নিত কপালে, মা কপালিনীর প্রসাদিত সিন্দুর টিপ্ ও ভস্ম ত্রিপুণ্ডক।

পার্শ্বে একখানি উচ্চ আসনে বসিয়া রাজগুরু গোঁসাই ভট্টাচার্য্য। গোঁসাই ঠাকুরের দেহ ব্রাহ্মণের হইলেও, তাহার সুগঠিত, মাংসপেশীময় অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, যেন ইহা কোন ক্ষত্রিয়ের দেহ। রাজগুরুরও অর্দ্ধপক কুঞ্চিত কেশ, মাথার চারিদিকে দোলায়িত, মৃদুপবনে চুম্বিত হইয়া অতি ধীরে কম্পিত। চক্ষুর্দ্বয় চাঞ্চল্য-বিহীন, দৃষ্টিও অচঞ্চল।

অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে। বিক্রমপুরেশ্বর ও তাঁহার গুরুদেব অষ্টভুজা মন্দিরের বাহিরের দালানে বসিয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। এই দালানটী অপরাহ্ণে বৈঠক খানারও কাজ করিত। এমন সময়ে রাজা সহাস্যে বলি-লেন, "গুরুদেব! দিন যায়—একটা মার নাম করুন।"

কাছে দাঁড়াইয়া শ্রীপুর-রাজসংসারের অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীমন্ত রায় চৌধুরী। শ্রীমন্ত ধূর্ত্ত, কপট, স্বার্থানুসন্ধী সম-বেদনা বিহীন। রাজা ও রাজগুরুর মধ্যে যে সব কথপো-কথন হইতেছিল, শ্রীমন্ত তাহাই শুনিতেছিল।

চাঁদরায় বড়ই সঙ্গীতানুরাগী। বিশেষতঃ রাজগুরুর মুখে শ্যামাসঙ্গীত শুনিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। তাই দিবা অবসান দেখিয়া পুনরায় অনুরোধ করিলেন,—"একটা মার নাম হোক না ঠাকুর।"

গোঁসাই ঠাকুরের চক্ষুর্দ্বয় জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "আর যে মার নাম নিতে ইচ্ছে হয় না মহারাজ! কলিতে রাজা নাই—দেবতা নিদ্রিত। দেশেও অত্যাচারের প্রতিকার নাই। ফৌজদারের লোকে প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে—কেউ তার প্রতিকারে অগ্রসর হলো না। ফিরিঙ্গি ডাকাতে গ্রামের ভিতরে ঢুকে সেদিন ঘোষালদের বউটীকে ধরে নিয়ে গেল—তারও প্রতিকার হলো না। গান যে আর মুখে আসে না মহারাজ! মল্লারের তীব্র-ঝঙ্কার যে ভৈরবীর কাতর-করুণায় পরিণত হয় মহারাজ!"

রাজা চিন্তিতভাবে একটু বিমর্ষের হাসি মুখে আনিয়া বলিলেন—"সত্য, কিন্তু এই পদদলিত জাতি এতদিন ধরে যে অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে আস্ছে—আপনার আমার চেষ্টায় একদিনে তার কি প্রতিকার হবে? আমার চেষ্টায় যতদূর সম্ভব—তা তো করেছি গুরুদেব! ধলেশ্বরীর মোহানায় নূতন কেল্লা নির্ম্মাণ করেছি। সে কেল্লায় কামান বন্দুক বারুদ গোলাগুলি সবই প্রস্তুত রেখেছি। ইশাখাঁর সহায়তায় পর্টুগীজ বণিকদের কাছ থেকে, এত অস্ত্র কিনেছি—যে তার ব্যবহারের লোক নেই। ঢালী, শড়কী, গোলন্দাজ, তীরন্দাজ, কোন আয়োজনেরই ত্রুটি রাখিনি। কিন্তু সব কাজ

গোপনে কর্ত্তে হয়েছে! পাছে দিল্লীশ্বর জান্‌তে পারেন—এই ভয়ে টাকা দিয়ে ফৌজদারের মুখ বন্ধ কর্ত্তে হয়েছে। এখন ফৌজদারের বিরুদ্ধে কোনরূপ আয়োজন কল্লে আমার এতদিনের চেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ বৃদ্ধের শক্তিতে এর চেয়ে আর কি বেশী সম্ভব ঠাকুর!"

রাজার যুক্তিযুক্ত বাক্যে দুর্ব্বাসা-সদৃশ দীপ্ত তেজোময় রাজগুরুর ক্রোধ শান্তি হইল। গোঁসাই ঠাকুর ঘোর তান্ত্রিক। স্মৃতি, শ্রুতি, পুরাণ, উপপুরাণ, ভাগবত, উপনিষদ ও সর্ব্বতন্ত্রেই তিনি সুপণ্ডিত। তবে ব্রহ্মণ্য তেজের সহজাত প্রবৃত্তি বশে বড়ই কোপন স্বভাব। প্রকৃতপক্ষে আর্ত্ত প্রজার রক্ষার্থে চাঁদরায় কোন চেষ্টারই ত্রুটি রাখেন নাই।

চাঁদরায় রাজগুরুর ধাত্‌টী বেশ বুঝিয়াছিলেন। কাজেই হাস্যমুখে বলিলেন,—"এখন ত দুর্ব্বাসার ক্রোধ শান্তি হইয়াছে। মার নাম একটা হোক।"

ভক্তিরসে মিশিয়া, রাগ মূর্চ্ছনা, কম্পন, সুর, উত্তেজনা কণ্ঠে লইয়া, গোঁসাই ঠাকুরের দেশ-দুঃখ-জর্জ্জরিত হৃদয় হইতে একটা মহাপ্রাণতা লইয়া সুকরুণ সঙ্গীতোচ্ছ্বাস উঠিল। নিকটস্থ মন্দিরচত্বরে, দালানে, প্রকোষ্ঠে, আঙ্গিনায় তীব্র সুরের মধুরোচ্ছ্বাস সুরতরঙ্গ লইয়া আছাড়িয়া পড়িতে লাগিল। সে উত্তেজনায়, বৃদ্ধ রাজা চাঁদরায়ের বার্দ্ধক্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল, দৈবীভক্তি ও প্রেম-প্রতিভায় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। রাজগুরু গাহিতে লাগিলেন—

তোর্ অই পাষাণ প্রাণটী, কোমল কর্ মা পাষাণী।
আর ত্রিনয়ন থাকিস্ না মুদে, একবার চেয়ে দেখ্ মা ঈশানী!
সবার বুক্ বেয়ে বয়—চোখের ধারা,
ডাকে তারা তারা! তারা!
মায়া ছেড়ে, যোগমায়া, একবার জাগ্, দেখি গো কপালিনী।
সবাই চেয়ে তোর্ অই মুখপানে,
একবার দেখ্ মা চেয়ে নয়ন-কোণে,
অপাঙ্গে করুণা এনে, শান্তি দে শান্তিরূপিণী!

সঙ্গীতের শেষ ঝঙ্কার বায়ুস্তরে না মিশাইতে মিশাইতে বাহিরের দরজার কাছে একটা মহাকোলাহল জাগিয়া উঠিল। চাঁদরায় দেখিলেন, দলে দলে লোক তাঁহার অঙ্গনে প্রবেশ করিতেছে। ঢালি, শড়কীরা একজন সাহেবকে বাঁধিয়া টানিয়া আনিতেছে। সঙ্গে যুবরাজ ও পাইকগণ। শ্রীপুরের অনেক মাতব্বর লোক এই জনতার সঙ্গে।

চাঁদরায়ের কাণে কার্ভালো ঘটিত কোন কথাই এ পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই। কাজেই তিনি বিস্মিতভাবে রাজগুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গোঁসাই ঠাকুর! এ সব কি ব্যাপার।" গোঁসাই ঠাকুরও এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না।

সংক্ষুব্ধ জনতা নিকটবর্ত্তী হইয়া মহাকোলাহলে চীৎকার করিয়া বলিল,—"মহারাজের জয় হউক।"

সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজ কেদার রায় পিতার সম্মুখে গিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

চাঁদরায় সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন,—"এ সব কি কেদার! সাহেবকে বাঁধ্‌লে কেন? এরা ফৌজদারের আশ্রিত, আমার প্রিয়বন্ধু নবাব ইশাখাঁ ইহাদের পৃষ্ঠপোষক। শেষ কি একটা হাঙ্গামা না বাধিয়ে ছাড়্‌বে না!"

কেদার রায় বিনীতভাবে পিতৃসম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"পিতঃ! এই নরাধম পর্টুগীজ্ গঙ্গাধর ঠাকুরের পুত্রবধূর উপর অত্যাচার করিতে গিয়াছিল। ভগবান রক্ষা করিয়াছেন তাই—নচেৎ আপনার রাজ্যে এই ব্রাহ্মণকন্যা—ব্রাহ্মণকুলবধূর সতীত্ব নষ্ট হইত। এই হতভাগা বোম্বেটের জাত, আজকাল গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কুলকন্যার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। চিরকাল যদি ফৌজদারের সঙ্গে হাঙ্গামার ভয় করিয়া মুখ বুজিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে আপনার এ নবপ্রতিষ্ঠিত বিক্রমপুর রাজ্যের রাজধানী শ্রীপুর একেবারে জনশূন্য হইবে। কাহাকে লইয়া রাজ্য করিবেন পিতঃ!"

ঠিক্ এই সময়ে, নামাবলী গায়ে গঙ্গাধর ঠাকুর, হাতে পৈতা জড়াইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জলন্ত ভাষায় বলিলেন—"মহারাজ! আমরা বাদসা জানিনা, ফৌজদার জানিনা—আপনি বিক্রমপুরের রাজরাজেশ্বর। আপনার রাজ্যে ব্রাহ্মণ-কুলবধূর সতীত্ব নাশের চেষ্টা! মহারাজ এখনও দেবতা জাগ্রত—এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠিতেছে। পাপীর দণ্ড দিন মহারাজ!"

ব্রাহ্মণের মুখে, উত্তেজনা—পুত্রের মুখে উত্তেজনা—সমবেত প্রজামণ্ডলীর মুখে উত্তেজনা—এ উত্তেজনা সংক্রামক হইয়া, বৃদ্ধ চাঁদরায়ের উদ্যমপূর্ণ হৃদয়তন্ত্রীতে বিচ্ছুরিত হইল। তাঁহার চক্ষু দিয়া অগ্নি বাহির হইতে লাগিল। ক্রোধে মুখমণ্ডল আরক্ত বর্ণ ধারণ করিল। তিনি পরুষ কণ্ঠে

কার্ভালোকে প্রশ্ন করিলেন,—"সাহেব! এ ব্রাহ্মণ ঠাকুর যে নালিশ আরজ করিতেছেন,—তাহা সত্য কি না?"

ফ্রান্সিস্ কার্ভালো অতি দুঃসাহসিক হইলেও বুঝিল, এই তেজদর্পিত বৃদ্ধ রাজার হাতে তাহার নিস্তার নাই; সত্য কথা বলিলে হয়ত সে মার্জ্জনা পাইতে পারে, এই ভাবিয়া সর্ব্ব প্রথমে মাথার টুপি খুলিয়া রাজাকে সম্মান প্রদর্শন করিল। তৎপরে দৃঢ়স্বরে বলিল—"খ্রীষ্টান কখনও মিট্টা বলে না। এ ব্রাহ্মণ যাবলিটেছে সট্ট। টবে হামি ইজ্জট নষ্ট করে নাই,—চেষ্টা করিয়াছে।"

চাঁদরায় পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"সাহেব! এই ব্রাহ্মণ এ রাজসংসারের আশ্রিত। আমার একজন গণনীয় প্রজা। ব্রাহ্মণ আমাদের পূজার জিনিস। ব্রাহ্মণ কন্যা আমাদের মাতৃস্বরূপা। তোমার এ অপরাধের অতি ভীষণ শাস্তি হইবে।"

ফ্রান্সিস্ মহাবিপদ গণিল। তবুও সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল "রাজা! এবার হামায় মাপ করুন। হামাডের দেবটা মেরীর নাম করে কিরে কর্‌ছি, দোস্‌রা বার ঐমন কাজ আর করবে না।"

চাঁদরায় বলিলেন—"এক্ষেত্রে মার্জ্জনা অসম্ভব! যদি চুরী করিতে, প্রাণী হত্যা করিতে, লুণ্ঠন করিতে, তাহা হইলে হয়ত তোমায় মর্জ্জনা করিতে পারিতাম। কিন্তু ব্রাহ্মণকুললক্ষ্মী এক নিঃসহায়া অবলার ধর্ম্মনাশের চেষ্টা,—এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই। তোমায় মার্জ্জনা করিলে আমার এসব প্রজা আমার উপর বিশ্বাস হারাইবে। আমার এই নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্য, ঐশ্বর্য্য সব পাপে ভস্মীভূত হইবে। আমি তোমার প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা করিলাম।"

কার্ভালো অতি সাহসী। কিন্তু তাহার সে সাহস এখন যেন কর্পূরের মত উড়িয়া গেল। মৃত্যু সম্মুখে! চাঁদরায়ের হুকুম টলিবার নয়। তবু সে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—"রাজা! জানেন হামি ডিল্লীর বাড্‌সার প্রজা! আমার জান নিলে, আপনাকে কৈফিয়ট্ ডিটে হবে।"

চাঁদরায় এ ধৃষ্টতা সহ্য করিতে পারিলেন না। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর স্ফীত হইয়া উঠিল। চক্ষুর্দ্বয় আরও জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কার্ভালোর সম্মুখে আসিয়া রক্তাক্তনেত্রে ভীমস্বরে বলিলেন—"তুই বড় বেয়াদব্! আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এরূপ বেয়াদবি কর্ত্তে তোর লজ্জা বোধ হইল না! ফৌজদারের কাছে,—দিল্লীশ্বরের কাছে,—কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তরবারিতে শোণিতাক্ষরে লিখে দোব। কালু! কালিদাস! শীঘ্র এ পাপিষ্ঠকে বধ করে এর ছিন্নমুণ্ড এনে আমায় দেখাও।"

আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র কালিঢালি ও কালুশেখ কার্ভালোর হস্তদ্বয় দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিল।

কার্ভালো ভাবিল—সে আসন্ন মৃত্যুর কবলে পড়িয়াছে। আর তাহার নিস্তার নাই। সে অবনত-জানুতে মাটীতে বসিয়া উর্দ্ধমুখে, যুক্তকরে বলিল—"Oh save me! Mary! Oh! Holy Virgin! I am to be cruelly butchered in cold-blood!!

কালুসেখ সবলে কার্ভালোর হস্তাকর্ষণ করিয়া বলিল,—"চল্‌না সাহেব! ভাবলে আর কি হবে।"

নিয়তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান! কার্ভালোর অদৃষ্টে মৃত্যু নাই—তাই এক নূতন ঘটনায় সে অদ্ভুত উপায়ে পরিত্রাণ পাইল।

সহসা নবাব ঈশা খাঁ সেই জনপূর্ণ সভাপ্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। কার্ভালো সাহস পাইল। তাহার নিরাশাকাতর মুখমণ্ডলে পুনরায় আশার জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল।

ঈশাখাঁকে দেখিবা মাত্রই চাঁদরায় দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহাকে সেলাম অভিবাদন করিলেন। দুই বন্ধুতে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন হইল। চাঁদরায় হাস্যমুখে প্রশ্ন করিলেন—"নবাব সাহেব! সহসা শ্রীপুরে আপনার এ শুভাগমন কেন?"

ঈশাখাঁ চিন্তিত ভাবে বলিলেন—"কেন,—তাহা নির্জ্জনে বলিব। আমি এই হতভাগার সন্ধানেই এতদূর আসিয়াছি। এ আমার আশ্রিত ও একজন অধীনস্থ সেনাপতি। কার্ভালোর অপরাধ ঘটিত সমস্ত কথাই আমি পথিমধ্যে শুনিয়াছি। কিন্তু মহারাজ! যে রাজা ন্যায়ের অনুরোধে দণ্ডদাতা, দয়ার অনুরোধে তিনি মার্জ্জনা করিতেও সক্ষম। এই নরাধম একদিন আমায় নদীগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া এ জীবন রক্ষা করিয়াছিল। আমি ইহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—"প্রয়োজন হইলে একদিন তোমার জীবন বাঁচাইব।" মহারাজ! আজ সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার দিন।"

চাঁদরায় হাস্য মুখে বলিলেন,—"আমার ইহাতে কোন

আপত্তি নাই। আপনি আমার দোস্ত। তবে এই ব্রাহ্মণ ঠাকুর বাদী, ইহার সম্মতি গ্রহণ আবশ্যক।

ইশাখাঁ ব্রাহ্মণকে যুক্তকরে প্রণাম করিলেন। তাঁহার শরীরেও ক্ষত্রিয়ের রক্ত প্রবাহিত। নবাব হাস্যমুখে গঙ্গাধর ঠাকুরকে বলিলেন—"ঠাকুর! এই নরাধম ফিরিঙ্গির অপরাধের জন্য আমি আপনাকে দশহাজার আসরফী দণ্ড স্বরূপ দিতেছি। ইহাকে মার্জ্জনা করিবেন কি?"

গঙ্গাধর ঠাকুর নবাবকে সেলাম করিয়া বলিলেন,—"আপনি মহানুভব! কিন্তু আমি অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ। কাহারও দান গ্রহণ করি না। আমি ইহাকে বিনা পণে মার্জ্জনা করিলাম।"

নবাব হাস্যমুখে গঙ্গাধর ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দণ্ড ব্যতীত অপরাধীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। আপনী মার্জ্জনা করিলেও ধর্ম্মের চক্ষে এ পাপিষ্ঠ মুক্তিলাভ করিবে না। আমি মুসলমান বলিয়াই, আপনি দণ্ডপণ-গ্রহণে অসম্মত। কিন্তু একটী কাজ করিলে সকল দিক রক্ষা হয়। করিবেন কি?"

সকলেই উৎসুক ভাবে ইশাখাঁর মুখের দিকে চাহিলেন। সকলেরই মুখে একটা আগ্রহ—ঔৎসুক্য; নবাব ইশা খাঁ আবার কি নূতন প্রস্তাব করেন!

মৌনভঙ্গ করিয়া ইশা খাঁ চাঁদরায়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! যে সতীর ধর্ম্ম-নাশের চেষ্টা করিয়া আজ এই পাপিষ্ঠ আপনার সম্মুখে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছিল, যে সতী- নিজের শক্তিতে আত্মরক্ষা করিয়া, নারীজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, সেই সতীর স্মৃতির স্মরণার্থে, আমি প্রস্তাব করিতেছি এই শ্রীপুরে আমার প্রদত্ত এই দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে এক বিস্তৃত সরোবর খনিত হউক। তাহার নাম থাকুক "সতীর দীঘি"।

সভাশুদ্ধ সকলেই নবাবকে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। সকলেই তাঁহার মহত্বে চমৎকৃত হইল।

চাঁদরায় বন্ধুর হৃদয়ের উদারতায় ও এই সৎপ্রস্তাবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ অনুভব করিলেন।

সেদিনের মত সভা ভঙ্গ হইল। চাঁদরায় পাথেয় দিয়া কার্ভালোকে মুক্তিদান করিলেন।

আর এই ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন বহন করিয়া চাঁদরায়ের রাজধানী শ্রীপুরে সেই "সতী-দীঘি" বহুদিন ধরিয়া দরিদ্রা বঙ্গকুলবধূ সুরমার সতীত্ব-স্মৃতি রক্ষা করিয়াছিল।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

কর্ম্ম-যজ্ঞ।

কর্ম্মের মহা যজ্ঞের তরে
বাজিছে বিপুল বাজনা
ডাকি নিদ্রিতে কহে আগ্রহে
উঠ উঠ আঁখি মেল না।
বাজিল তন্ত্রী হৃদয় যন্ত্রে
কাঁপিল বিশ্ব বিজয় মন্ত্রে
ছুটিল কর্ম্মী দশদিক্ হ'তে
শুনি সে সমর-ঘোষণা,
কর্ম্মের মহা- যজ্ঞের তরে
বাজিছে বিপুল বাজনা।

মিলন সূত্র সংসার মাঝে
ছিল অদৃশ্য অক্ষয় কাজে
আজি সে তন্তু বেষ্টন করি
কি মাল্য হতেছে রচনা,
কর্ম্মের মহা- যজ্ঞের তরে
বাজিছে বিপুল বাজনা।

প্রবাসে পান্থ উঠিল শিহরি
বিস্মৃত হ'ল আপনা
মার আহ্বানে চঞ্চল শিশু
ভুলিল আপন বাসনা;
জননীর শ্যাম অঞ্চল খানি,
করুণ মূর্ত্তি সুধাময়ী বাণী
একে একে মনে হইল উদয়
জাগিল নূতন চেতনা।
কর্ম্মের মহা- যজ্ঞের তরে
বাজিছে বিপুল বাজনা।

দিব্য পতাকা মন্দির পরে
ভকতবৃন্দ গৌরব ভরে
করি প্রতিষ্ঠা, মুগ্ধ নয়নে
গাহিল দিব্য-বন্দনা,
কর্ম্মের মহা- যজ্ঞের তরে
বাজিছে বিপুল বাজনা।

সমর-বাদ্য বাজিলে অশ্ব
করি ত্রিভঙ্গে তাড়না
অধীর নৃত্যে চলে আস্ফালি'
শুনি সে সমর-প্রেরণা;
দেশ দেশান্ত হ'তে নরনারী
ব্যাকুল চিত্তে আসে সারি সারি
মায়ের পূজায় ভকতি-অর্ঘ্য
কে কি দিবে তাই ভাবনা,
কর্ম্মের মহা- যজ্ঞের তরে
বাজিছে বিপুল বাজনা।

সকল যাত্রা তীর্থ দুয়ারে
মাগিছে সিদ্ধি সিদ্ধি-দাতারে,
উঠিল শব্দ জীমূত-মন্দ্রে
"পূরিবে পূরিবে কামনা,"
কর্ম্মের মহা- যজ্ঞের তরে
বাজিছে বিপুল বাজনা।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমেরিকার দাতাকর্ণ।

প্রভূত অর্থের অধীশ্বর হইয়া কিরূপ ভাবে তাহা সদর্থে নিয়োগ করিতে হয়, আমেরিকার ধনকুবের মহাপ্রাণ এণ্ড্রু কার্ণেগি তাহার দৃষ্টান্ত। এরূপ মহানুভব ব্যক্তির সম্বন্ধে দু' একটী কথা আজ প্রবাসীর পাঠককে উপহার দিব।

অষ্টাবিংশতি বর্ষ যাবৎ লৌহকারবারে লিপ্ত থাকিয়া অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় বলে কার্ণেগি শুধু নিজেই ধনকুবের হইয়াছেন এমত নহে; লৌহকারবারের উন্নতি বিধান করিয়া আমেরিকাকে লৌহউৎপাদনকারী দেশসমূহের শীর্ষস্থানে স্থাপন করিয়াছেন। আটাস বৎসর পূর্ব্বে গ্রেট্‌-ব্রিটেন আমেরিকায় উৎপন্ন লৌহের তিনগুণ উৎপাদন করিত; কিন্তু এক্ষণে আমেরিকা গ্রেটব্রিটেনে উৎপন্ন লৌহের দ্বিগুণ উৎপাদন করিতেছে। এই আটাস বৎসরের মধ্যে বিলাতী লৌহ অষ্টগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে—আমেরিকা এই অল্প সময়ের মধ্যে লৌহ কারবারে কি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। কার্ণেগির কারবারে আরও ৪ জন অংশীদার ছিলেন। কার্ণেগির কারবার ছাড়া আরও অনেক কারবার হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার ন্যায় উদ্যোগী এবং নিপুণ কেহ ছিল না। সেই জন্য বলিতে হইতেছে যে লৌহব্যবসায়ের উন্নতি কার্ণেগির নিকট যতটা ঋণী অন্যের নিকট ততটা নয়।

যখন কার্ণেগি এবং তাঁহার কারবারের অংশীদারগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহারা নিঃসম্বল নগ্নপদ বালকের ন্যায় ছিলেন; কিন্তু চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিতে না করিতে তাঁহারা এত ধন সঞ্চয় করিলেন, যে পুরাতন পৃথিবীর রাজন্যবর্গ অপেক্ষা অধিক ধনী হইলেন।

আটাশ বৎসর কার্য্য করিয়া কার্ণেগি যখন অবসর গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি আমেরিকার মধ্যে দ্বিতীয় ধনকুবের হইয়াছেন। এখন তাঁহার বার্ষিক আয় ১ কোটী ৩৭ লক্ষ ৫০ সহস্র ডলার, অর্থাৎ ৪ কোটী ৮০ সহস্র টাকার অধিক;—তাহা হইলে দৈনিক আয় ৪৪ সহস্র ডলারেরও উপর (অর্থাৎ ১ লক্ষ ৩৭ সহস্র টাকার উপর) হইল।

এরূপ কুবেরের সম্পত্তি হাতে পাইয়া অনেকের মাথা ঘুরিয়া যায়, অনেকে ধরাকে সরাখানা দেখে; কিন্তু মহানুভব কার্ণেগির ইহার কিছুই হয় নাই। তাঁহার কথাবার্ত্তায় ধনের প্রতি অবজ্ঞার ভাবই বিশেষভাবে বর্ত্তমান। তিনি বলেন, "আমি কখনও আমার কারবারকে ক্রীড়ার দ্রব্য ভিন্ন আর কিছু মনে করি নাই; গলফ খেলাই জীবনের সার কার্য্য; গলফে বলের (ball) এক একটা সুন্দর মার ১০ সহস্র ডলারের সমান।" তিনি অন্য স্থানে বলিয়াছিলেন, "যদি আমি পুনর্ব্বার জীবন আরম্ভ করিতে পাই তাহা হইলে অন্য কর্ম্ম অপেক্ষা পুস্তকাধ্যক্ষের কর্ম্মই বেশী পছন্দ করিব। আমার যাহা কিছু আছে আমি দিতে প্রস্তুত, যদি আমি পুনরায় বালক হইতে পারি।"

এত বড় মানুষ হইয়াও, মহৎ বস্তুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও, কার্ণেগি ক্ষুদ্র বস্তু হইতে দূরে কখনও থাকেন নাই। তিনি সকল স্থানে গিয়াছেন; সব দেখিয়াছেন; সকলের সহিত মিশিয়াছেন; তবুও তিনি ক্লান্তি বা বিরাগ বোধ করেন নাই; তিনি ২৬ সহস্র দিন অতিবাহিত করিয়াছেন, কিন্তু এখনও তাঁহাতে বাল্যসুলভ সজীবতা বর্ত্তমান। তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "হাস্যমুখ ধনী বিরল;" কিন্তু তিনি নিজে এখনও বালকের ন্যায় হাস্যমুখ এবং চিন্তাহীন।

কার্ণেগি দুইটী অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন। তিনি ২৫ কোটী ডলার অর্থাৎ ৭৮ কোটী টাকার উপর উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং এত সম্পত্তির অধিপতি হইয়াও আত্মহারা হন নাই। সামান্য লোকের নিকট একটা পরিচ্ছদের মূল্য যেমন, কার্ণেগির নিকট ২৫ কোটী ডলারও তেমন। তাঁহার যদি কোন দোষ থাকে ত ধনের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহার সে দোষ ধনগৌরব প্রসূত নয়। তিনি এ অগাধ ধনের অধীশ্বর হইবার পূর্ব্বে যেমন সরলচিত্ত, যেমন সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী, যেমন প্রফুল্লস্বভাব ছিলেন, এখনও ঠিক তেমনই আছেন। কার্ণেগি ধূমপান করেন না, পানাসক্ত নন, জাঁকজমক পছন্দ করেন না, কলপ দেওয়া কাপড়কে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, জুয়াখেলাকে এবং এইরূপ ভাবে ধনোপার্জ্জনকে গর্হিত কার্য্য বিবেচনা করেন। তিনি ভ্রমণ করেন, কিন্তু নিজের গাড়ীতে নয়; তিনি থিয়েটার দেখেন, কিন্তু সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর আসনে বসিয়া নয়। ধনরাজ্যের রাজাদিগের মধ্যে কার্ণেগির ন্যায় কেহ নিজের সুখের জন্য এত অল্প এবং পরের সুখের জন্য এত অধিক ব্যয় করেন না।

কার্ণেগি অপরের মহত্ত্বের প্রশংসা করেন; ইহাই তাঁহার নিজের প্রকৃত মহত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। তিনি বরাবরই মহত্ত্বের উপাসক। হার্বার্ট স্পেন্সারের ন্যায় দার্শনিক, জন মর্লির ন্যায় সাহিত্যসেবী, বি, এফ্, জোন্সের ন্যায় লৌহ নির্ম্মাতা, এবং এব্রাম এস, হিউইটের ন্যায় পৌরজন তাঁহার নিকট আদর্শ পুরুষ। তিনি বলিয়াছেন কার্ণেগিবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, অসামান্য মনুষ্যকে খুঁজিয়া বাহির করা। তাঁহার মতে কলেজসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য শক্তিমান পুরুষের সৃজন করা হওয়া উচিত—মার্জ্জিত পুরুষের সৃজন করা হওয়া উচিত নয়। একদা সার এড্উইন আরনল্ড বলেন যে লেখক হইতে হইলে গ্রীক এবং লাটিন জানা নিতান্ত আবশ্যক। ইহার উত্তরে কার্ণেগি বলেন, "কেন বর্ন্স্ এবং সেক্ষপিয়র কি লাটিন ও গ্রীক না জানিয়াও ভাল লিখিতে পারেন নাই? আধুনিক জগতের লেখকেরা খাটি সত্যের সহিত—যথার্থ বস্তুর সহিত—সম্পর্ক রাখিবে;—লেখার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য সুন্দর পদবিন্যাসের তাহাদের প্রয়োজন নাই।" আর এক সময়ে লর্ড রের সহিত কথোপকথন কালে কার্ণেগি বলিয়াছিলেন যে মনুষ্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা দিলে বাণিজ্যের ক্ষতি বিধান করা হয়। তাঁহার মতে মনুষ্যের উচিত অষ্টাদশ বৎসর বয়সেই, বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন চারি ঘণ্টা নষ্ট না করিয়া—দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের দস্যুদিগের ইতিহাস অধ্যয়নে বৃথা সময় ক্ষেপণ না করিয়া—ব্যবসায় বাণিজ্যে মনোনিবেশ করা।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে মহাপ্রাণ কার্ণেগির দানশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

১৪০০ পুস্তকাগার	৪,২০,০০০০০	ডলার
৫১টী কলেজ	৮০,০০০০০	"
কার্ণেগি বিদ্যালয়	১,০০,০০০০০	"
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদিগের পেন্সন	১,০০,০০০০০	"
কার্ণেগি রিলীফ্ ফণ্ড	৪০,০০০০০	"
ঐ বীর ফণ্ড	৫০,০০০০০	"
স্কচ্ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	১,০০,০০০০০	"
পিট্স্বর্গ টেকনিক্যাল স্কুলসমূহ	১,০০,০০০০০	"
হেগ্ শান্তি মন্দির	১৫,০০০০০	"
নিউইয়র্ক ইঞ্জিনিয়ার সমিতি	১০,০০০০০	"
পিট্স্বর্গ শিল্প প্রদর্শনী	২০,০০০০০	"
অন্যান্য প্রতিশ্রুত দান	১,৭০,০০০০০	"
	মোট—১২,০৫,০০০০০	ডলার

অর্থাৎ ৩৭ কোটী ৬০ লক্ষেরও অধিক টাকা। ইহার প্রত্যেক ডলার লৌহ হইতে উদ্ভূত।

শ্রীঅধরচন্দ্র মিত্র।



শ্রীযুক্ত বিঠলদাস দামোদর ঠাকরসী



শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

উদ্ভিদ্ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ।

গত বৈশাখ মাসে আমার বালিকা কন্যা স্বহস্তে কয়েকটি শসা, কুমড়া, ঝিঙ্গা প্রভৃতির বীজ বাসার একস্থানে রোপণ করিয়াছিল। গ্রীষ্মের বন্ধ উপলক্ষে যখন বাড়ীতে যাই, তখন গাছ গুলি অতি ছোট ছোট ছিল। বাটী হইতে আসিবার কালে কয়েকটি কারণে আমাকে একাকীই আসিতে হয়। পরিবারবর্গ বাটীতেই থাকেন। আমার আসিবারকালে কন্যা আমাকে বলিয়াছিল "বাবা, আমার গাছ গুলির দিকে যেন আপনি নিজে একটু মন দেন। তা না হলে বাসার দাদারা (পাচক ও ভৃত্য) যত্ন করবে না।" বাসায় আসিয়া বালিকার সেই অনুরোধ পালন করিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম সেই গাছগুলি প্রায় সেই অবস্থাতেই আছে, ঘাস জঙ্গলে ঢাকিয়া গিয়া প্রায় মরিয়া যাইবার মত হইয়াছে। বালিকা এখানে থাকিতে বীজ রোপণের পর হইতেই সেস্থানে প্রত্যহ জল সেচন করিত, দূর্ব্বাঘাসটি পর্য্যন্ত উঠিতে পারিতনা, বীজগুলি যেদিন অঙ্কুরিত হইল সেদিন কত আনন্দে আমাকে ডাকিয়া দেখাইল, ক্রমে গাছ বড় হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহারও আনন্দ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল; কি যে স্নেহের সহিত তাহাদের যত্ন করিত, একটি পোকা তার উপর বসিতে পাইতনা, একটি ঘাস তার গোড়ায় জন্মিতে পারিত না। বালিকার এই স্নেহকরস্পর্শে লতিকা গুলি যেন স্ফূর্ত্তির সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল; আজ সে স্নেহের অভাবে সে যত্নের অভাবে তাহারা অনাদরে উপেক্ষায় ধুল্যবলুন্তিত-শির হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া বাস্তবিকই কষ্ট হইল! আমি স্বহস্তে তাহাদের গোড়া পরিষ্কার করিয়া দিলাম, এবং জল সেচন করিতে লাগিলাম। প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে গাছগুলি কেমন আছে দেখিতে লাগিলাম এবং তাহাদের কখন কি আবশ্যক তাহারও অনুসন্ধানে বিরত হইলাম না।

ক্রমে সেগুলি প্রায় একফুট লম্বা হইল এবং তাহাদের শিরোদেশের গ্রন্থি হইতে আকর্ষণী বাহির হইতে লাগিল। তখন তাহাদের অবলম্বন দেওয়া দরকার বিবেচনায় আমি ছোট ছোট শলাকা, শাখা, প্রভৃতি তাহাদের নিকটে পুতিয়া দিলাম। তদবলম্বনে তাহারা উঠিতে লাগিল। এই সময় আমি প্রায়ই উহাদিগকে দেখিতাম এবং এইরূপ পর্য্যবেক্ষণের ফলে কতকগুলি ব্যাপার আমি পরীক্ষা করিয়া বিশেষরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি। সেই কথাগুলি সাধারণ্যে জ্ঞাপন করাই অদ্যকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ইহা অবশ্যই জানেন। তাঁহাদিগের জন্য আমার এ প্রয়াস নহে। অস্মদ্দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিরাও উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে বড়ই অজ্ঞ। বৃক্ষলতাদিগের কার্য্য প্রণালী পর্য্যালোচনা করা দূরে থাকুক, তাহাদের নাম, শ্রেণী ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞানও আমাদের অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। আমি যত নূতন স্থানে গিয়াছি, তথাকারই নূতন কোন বৃক্ষ, গুল্ম কি লতা দেখিলে তাহার সম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট জিজ্ঞাসু হইয়াছি, কিন্তু প্রায়শঃই "এক রকম গাছ, এ এক রকম লতা, ঘাস মাত্র কি তা জানিনা," এইরূপ উত্তরই পাইয়াছি। এতদ্বিষয়ক আলোচনা যে আমোদ ও শিক্ষাপ্রদ তাহা আমরা আদৌ মনে করিনা। উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের দিকে আমাদের শিক্ষিত ভ্রাতৃগণের দৃষ্টি একটু আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আমি অদ্য এইক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতেছি।

১। শসা প্রভৃতি লতার যে শুণ্ড অথবা আকর্ষণী বাহির হয় তাহা তাহাদের জীবনরক্ষার ও বৃদ্ধি পাইবার উপায়। আমরা যেমন হস্তদ্বারা কোনও জিনিস অবলম্বন করি, উহারাও শুণ্ডদ্বারা তদ্রূপ করিয়া থাকে। শুণ্ডগুলি যখন প্রথম বাহির হয় তখন তাহা ঠিক সোজাই থাকে; অবলম্বন প্রাপ্ত হইলে তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া তাহার মস্তক বক্রতা প্রাপ্ত হয়। অবলম্বনের জন্য যথেষ্টরূপ চেষ্টা করিয়াও যদি তাহা না পায় তবে উহার মস্তক স্বতঃই বক্রভাবাপন্ন হইয়া যায়; তখন কোন অবলম্বন উহার পার্শ্বে রাখিয়া দিলে আর তাহাকে ধরিতে পারেনা, তবে যদি অবলম্বন শলাকাটিতে শুণ্ডটি কেহ লাগাইয়া দেয় তবে তাহা তখন কার্য্যক্ষম হয়।

২। এই লতাগুলি যেদিকে সূর্য্যকিরণের প্রাচুর্য্য আছে সেই দিকেই যাইতে অভ্যস্ত। আমি একটি গাছকে একটা অন্ধকারময় কোণের দিকে পুনঃ পুনঃ ফিরাইয়া দিয়াছি, আবার আসিয়া দেখিয়াছি সেদিক হইতে লতাটি ফিরিয়া আলোকের দিকে চলিয়া গিয়াছে। তারপর একটা

অবলম্বনের সহিত তাহার একটি কি দুইটি শুণ্ড দৃঢ় বদ্ধ করিয়া তাহার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; সে নিরুপায় হইয়া অগত্যা আমার ইচ্ছামত দিকেই রহিয়াছে বটে; কিন্তু সে দুই একদিন মাত্র; তার পরে দেখিয়াছি তাহার যে যে অঙ্গ অবলম্বনে বদ্ধ আছে তাহা তদবস্থই রাখিয়া তাহার মস্তক আবার আলোকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। এক স্থানে আমি তাহার ডগা যাহাতে সে না ফিরাইতে পারে তাহার জন্য সে দিকটা বদ্ধ করিয়া দিয়াছিলাম; সে অগত্যা তাহার অঙ্গগ্রন্থিসমূহের একতম হইতে আর একটি প্রশাখা বাহির করিয়া আলোকের দিকে প্রধাবিত করিয়া দিল! সেটিকে আমি একবার মাত্র ফিরাইয়া দিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা সে কিছুতেই মানিল না! তখন আমার মনে যেন কেমন একটা কষ্ট হইল। আহা! বেচারার প্রতি আমি কতই না অত্যাচার করিতেছি। আমি আহারীয় অন্বেষণে যখন প্রবৃত্ত হই তখন আমাকে যদি কেহ ফলশস্যপূরিত ক্ষেত্রের দিক হইতে মরুভূমির দিকে লইয়া যায়, অথবা আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইতিমধ্যে যদি সে মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যায় তাহা হইলে আমার নিজের মনের কি অবস্থা হয়! সুতরাং আমি আর তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলাম না। বড় ডগাতে যে বাধা দিয়া ছিলাম, কয়েক দিন পরে দেখি, ডগা সেই বাধার সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিতে করিতে এক পার্শ্বে একটি ছিদ্র পাইয়া তাহার মধ্য দিয়াই আবার আলোকের দিকে মুখ বাহির করিয়াছে! আমি ইহার এই ভাব দেখিয়া মনে মনে নানা ভাব উপলব্ধি করিলাম!

আলোকের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া ইহার জীবনের একটা লক্ষ্য। এই লক্ষ্যসাধনের জন্য ইহা সর্ব্বদা প্রাণ পণে যত্ন করিতেছে। শত বাধা, শত বিঘ্ন, ইহার এই লক্ষ্যপথে অন্তরায় স্বরূপে দণ্ডায়মান হইলেও এই লতিকা তাহা সমুদয় অতিক্রম করিয়া স্বীয় লক্ষ্যপথ পরিষ্কার করিয়া লইবে। ইহার সামর্থ্যের অতীত না হইলে যেরূপে হউক সে সমুদয় বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিবে। স্বীয় বল সম্বন্ধে বিজ্ঞান-দর্প-গর্ব্বিত আমাদের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে এই ক্ষুদ্রা লতা আমাদের অপেক্ষা কত উচ্চ। আমরা প্রথমতঃ জীবনের লক্ষ্য কি, উদ্দেশ্য কি, তাহাই ভুলিয়া গিয়াছি। তারপর যদিই কোন কার্য্য করণীয় বলিয়া আমাদের লক্ষ্য স্থির হয় তাহা হইলেও তাহার মধ্যে এই লতিকার ন্যায় একাগ্রতা কোথায়? সামান্য একটু ভয়, সামান্য একটু বাধা, আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া দূরে থাকুক, উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইলেই আমরা ইতস্ততঃ করি, আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ি! আমাদের প্রতিজ্ঞা, আমাদের সাহস, আমাদের দৃঢ়তা কোথায় চলিয়া যায়!

এই লতার নিকট আমাদের লক্ষ্যসাধনের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে; দৃঢ়তা, অটলতা, এবং একাগ্রতার সহিত স্থির লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে হইবে; আসুক বাধা, আসুক বিঘ্ন, সব তৃণের ন্যায় ছিন্ন হইয়া যাইবে; আঁধার কাটিয়া যাইবে, আবার আলোক রশ্মিতে আমরা উদ্ভাসিত হইব।

এই ক্ষুদ্রা লতা যেমন সর্ব্বদা অন্ধকার হইতে আলোকে আসিবার জন্য স্বীয় ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিতেছে, আমরা কি সেইরূপ অজ্ঞান অন্ধকার হইতে সেই পরমালোকের রাজ্যে যাইবার জন্য এইরূপ ব্যাকুলতা প্রদর্শন করি? দৃঢ় আবরণে আবদ্ধ হইয়াও যেমন এই লতা সর্ব্বদা বহিরাগমনের ছিদ্রান্বেষিণী হয়, এবং কোনও সুযোগে সুবিধা পাইলেই আবরণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া আলোকে আনয়ন করে, মোহমায়ার আবরণে বদ্ধ আমরা কি সেইরূপ ভাবে ইহার জাল ছিন্ন করিয়া সেই পরম জ্ঞানময়ের পবিত্রালোকোদ্ভাসিত রাজ্যে উপনীত হইবার জন্য সেইরূপ আগ্রহবান্? আমরা নিশ্চেষ্টভাবে এই মায়া-বিজড়িত হইয়া অন্ধকার হইতে অন্ধতমসে প্রগাঢ়রূপে নিমজ্জিত হইতেছি, সহস্র সুযোগ পরিত্যাগ করিয়াছি, কখনও ইহা হইতে মুক্তির ইচ্ছা করি নাই! এই লতিকা স্বীয় সহজ জ্ঞানে যাহা করিতেছে, জ্ঞানাভিমানী আমরা তাহার শতাংশেরও একাংশ করিতেছি কি?

৩। এই লতাগুলি স্বীয় সহজ জ্ঞান প্রভাবে অবলম্বনের অন্বেষণে শুণ্ডাবলী প্রেরণ করিয়া থাকে। যে দিকে শুণ্ড প্রেরণ করিয়াছে যদি ঠিক সেই দিকে কোন অবলম্বনীয় শাখা প্রশাখা কি তাবৎ কোনও বস্তু না থাকে তবে স্বীয় আকর্ষণী প্রলম্বিত করিয়া আশে পাশে তাহার খোঁজ করিয়া থাকে।

মনে করুন লতার ডগা পূর্ব্বদিকে প্রসারিত। তাহার শুণ্ডদ্বয় বামে ও দক্ষিণে আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছে, দক্ষিণ দিকের শুণ্ডের এক অঙ্গুলি পরিমাণ ব্যবধানে একটি আশ্রয়-দণ্ড আছে। আমি সেইটিকে ঠিক সেই সোজাসুজি অর্দ্ধ হস্ত দূরে সরাইয়া দিলাম, এবং ডগাটি একটু অন্য দিকে ফিরাইয়া দিলাম, কিন্তু পর দিবস দেখিলাম, লতা স্বীয় দক্ষিণ দিকের আকর্ষণী প্রলম্বিত করিয়া সেই আশ্রয়-দণ্ডের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। আমি তখন দণ্ডটি সমসূত্রে না রাখিয়া একটু কোণাকোণি ভাবে পশ্চিমে হটাইয়া দিলাম, বৈকালবেলা দেখিলাম ডগা আমাকে পরাস্ত করিয়া পশ্চিমে হটিয়া আসিয়া শুণ্ড দ্বারা আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছে।

একটি লতার উপর আমি এই পরীক্ষাটি বিশেষ ভাবে করিয়াছি। সেই লতার চতুষ্পার্শ্ব বেশ পরিষ্কার ছিল, অন্য কোন গাছপালা ছিল না। তাহার জন্য যখন অবলম্বন খাড়া করিবার প্রয়োজন হইল, তখন আমি একই অবলম্বনকে তাহা হইতে কিছু দূরে রাখিয়া পুনঃ পুনঃ এদিকে ওদিকে নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম এবং দেখিতে পাইলাম আমিও যেদিকে কাঠিখানি সরাইয়াছি ডগাটিও সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। একটি লতার নিকট হইতে দুই তিন হাত দূরে একটি 'বড় ডাঁটা' গাছ ছিল; আর এদিক ওদিকে অত নিকটে কোনও গাছ ছিল না। লতা ঝুঁকিয়া মাটিতে পড়িয়া স্বীয় শুণ্ড অত্যন্ত প্রলম্বিত করিয়া অচিরে সেই ডাঁটা গাছের একটি পাতা ধরিল এবং তদবলম্বনে অতি শীঘ্রই ডাঁটা গাছটিতে স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করিয়া বসিল।

৪। এই সব লতার শুণ্ডগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিলে ইহাদের দেহ পুষ্টি ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। আমি একটি লতার আকর্ষণী বাহির হইবামাত্রই কাটিয়া ফেলিতে ছিলাম; তাহাতে সে অন্যান্য লতাগুলির মত বাড়েও নাই; সতেজও হয় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে কতকদিন পর ঐ লতাটি একটি গাভী দ্বারা ভক্ষিত হওয়ায় আমার পরীক্ষা আমি সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই।

৫। আশ্রয়ের প্রলোভনের দ্বারা এই লতাদিগকে যে পথে ইচ্ছা সেই পথে লইয়া যাওয়া যায়, কিন্তু আলোক হইতে নিরালোক স্থানে সহজে লইয়া যাওয়া যায় না। যেদিকে লতাটি যাইতেছে তাহা হইতে একটু অন্য দিকে একটি কাঠি পুঁতিয়া দিলে লতাটি সেই দিকে ফিরিবে এবং তাহাকে ধরিবে। আবার তাহা হইতে আর একটু সরাইয়া আর একটি কাঠি পুঁতিয়া দিলে সেই দিকেই যাইবে। এইরূপে তাহাকে আঁকা বাঁকা পথে ঘুরাইয়া হয় ত প্রথম সে যেদিকে যাইতেছিল তার বিপরীত দিকে লওয়া হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

৬। ইহাদের ফুল দুই প্রকারের দেখা যায়। এক প্রকারের পুংজাতীয় ফুল, অন্য প্রকারের স্ত্রীজাতীয়। স্ত্রীজাতীয় ফুলগুলির গোড়ায় ফলের চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুলিকে উহার ডিম্ব বলা যাইতে পারে। পুংজাতীয় পুষ্পের রেণু স্ত্রীজাতীয় পুষ্পে সংলগ্ন হইয়া উহাদের গর্ভাধান ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মিষ্ট কুমড়া বা বিলাতী কুমড়ার স্ত্রীজাতীয় ফুল নিষেক অভাবে অনেক সময় মরিয়া যায়। অনেক সময়ই দেখিতে পাওয়া যায় 'কুমড়ার' কলি হইতেছে বটে; কিন্তু থাকিতেছে না, মরিয়া যাইতেছে। আমি এইরূপ ক্ষেত্রে পুং পুষ্প হইতে রেণু সংগ্রহ পূর্ব্বক স্ত্রী পুষ্পে মাখাইয়া দিয়া ফল রক্ষা করিতে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছি। সব ক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হই নাই। সম্ভবতঃ যে সব স্থলে অসময়ে করা হইয়াছিল, সেই সব স্থলেই ফল পাওয়া যায় নাই। রেণু স্ত্রী পুষ্পের গর্ভকোষের উপরে মাখাইয়া দিতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক, যেন উহাতে নখ কি অন্য কিছুর আঘাত না লাগে। পালকে করিয়া মাখাইয়া দিলে বেশ সুবিধা হয় বোধ করি। অনেকে মিষ্ট কুমড়ার ফুল ভাজিয়া খাইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, গাছ হইতে পুং পুষ্পগুলি একেবারে মুড়িয়া লইলে ফলের আশায় অনেকটা হতাশ হইতে হইবে।

অদ্য এই খানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। ভবিষ্যতে এতদ্বিষয়ক আর আর যাহা বক্তব্য অথবা জিজ্ঞাস্য থাকে তাহা নিবেদন করিতে চেষ্টা পাইব।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

কলিকাতায় জাতীয় যজ্ঞ।

আমরা গত আশ্বিন মাসের প্রবাসীর প্রথম প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে সর্ব্ববিধ সংস্কার পরস্পরসাপেক্ষ। যদিও এখনও আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত এবং চিন্তা করিতে অসমর্থ এবং যদিও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও অধিকাংশ এখনও উক্ত সত্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই; অথবা বুঝিয়াও জীবনের অঙ্গীভূত করিতে পারেন নাই; তথাপি ইহা সুখের বিষয় যে বহুসংখ্যক লোক সকল প্রকার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেছেন, এবং জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই সংস্কারকের দল দেখা দিয়াছে।

বাস্তবিক ইহা যেমন সত্য যে সর্ব্ববিধ সংস্কার পরস্পর-সাপেক্ষ, তেমনি ইহাও সত্য যে সংস্কার কোন একদিকে আরম্ভ হইলে অন্য সকল দিকেও অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। কারণ সংস্কারের অন্য নাম জাতীয় অভ্যুত্থান ও জাতীয় জীবন রক্ষার প্রয়াস। এই অভ্যুত্থানের মূল কোথায় খুঁজিলে দেখা যায় যে স্বাধীনতার ইচ্ছাই ইহার মূল। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। স্বাধীনতা ব্যতিরেকে মানুষের কোন বৃত্তি বা শক্তিই পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। যদি জাতীয় জীবনের কোন এক বিভাগে মানুষ স্বাধীন হয় বা হইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে অন্যান্য বিভাগেও স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা অবশ্যম্ভাবী। এই ইচ্ছাকে দম্বলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কতকখানা দুধে অল্প দম্বল দিলে, সমস্তটাই দই হইবে। কেহ এরূপ হুকুম করিতে পারেন না যে অর্দ্ধেক দুধ বা সিকি পরিমাণ দুধ দই হইবে, ও বাকী অংশ দুধই থাকিয়া যাইবে। তেমনই স্বাধীনতার ইচ্ছা যে জাতির ভিতরে ঢুকিয়াছে, সে সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীন হইবেই হইবে। কেহ বাধা দিতে পারিবে না।

তাই আমরা দেখিতেছি যে আজ ভারতে রাজনীতিক্ষেত্রে আমরা রাজপুরুষদের স্বেচ্ছাকারিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছি; সামাজিক ব্যবস্থাক্ষেত্রে অনিষ্টকর লোকাচার, দেশাচার ও শাস্ত্রবিধির দাসত্বপাশ হইতে মুক্ত হইতে চাহিতেছি; শিল্পবাণিজ্যে কেবল ক্রেতা ও কুলিমজুর না থাকিয়া উৎপাদক, বিক্রেতা ও কলকারখানার পরিচালক হইতে চাহিতেছি; আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ধর্ম্মাচরণে আমরা আর পুরোহিত ও গ্রন্থাদির অবিচারিত বশ্যতা স্বীকার বা অনুবর্ত্তন করিতে চাহিতেছি না। ইত্যাদি। জাতীয় মহাসমিতি, জাতীয় সমাজ-সংস্কারসমিতি, শিল্পবাণিজ্যসমিতি, কৃষিশিল্প প্রদর্শনী, মাদক-নিবারিণী সমিতির আলোচনাসভা, মহিলা সমিতি, একেশ্বর-বাদীদিগের সম্মিলন, মুসলমানশিক্ষাসমিতি, থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ের সম্মিলন প্রভৃতি সমুদয় আয়োজন ও অনুষ্ঠানই জাতীয় অভ্যুত্থানের লক্ষণ।

কাশীতে থিয়সফিষ্ট সম্মিলন এবং ঢাকায় মুসলমান শিক্ষা সমিতি ব্যতিরেকে আর সমুদয় অনুষ্ঠান এবার কলিকাতায় হইবে। এবার, বয়সে পিতামহকল্প, চরিত্রে পূজ্যতম, জ্ঞানে ও কর্ম্মে গরীয়ান্, স্বার্থত্যাগে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দাদাভাই নাওরোজী জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। লণ্ডনে তাঁহাকে যে বিদায়ভোজ দেওয়া হয়, তাহাতে একজন বক্তা সত্যই বলিয়াছেন, দাদাভাই নাওরোজীর নাম সার্থক। তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের "দাদা" (অর্থাৎ দক্ষিণী ভাষায়, পিতা), ক্লিষ্ট, দরিদ্র, উপবাসী ও উৎপীড়িতের "ভাই", এবং ভারতের নও (নব বা নূতন) রোজ (দিন) অর্থাৎ স্বাধীনতার নূতন দিনের আগমনের জন্য যাঁহারা উদ্যোগী তাঁহাদের অগ্রণী। সমাজসংস্কার-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বিচারপতি সার্ চন্দ্রমাধব ঘোষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি সংস্কার কার্য্যে বহুদূর অগ্রসর না হইলেও তাঁহার মনে ও মুখে পার্থক্য থাকিবে না। একেশ্বরবাদীদিগের সম্মিলনে কোকনাদা সহরের পিট্টাপুর রাজার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত আর্ বেঙ্কটরত্নম্ নায়ুডু, এম্. এ., এল্. টি., সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। ইনি পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, নির্ম্মল চরিত্র এবং আধ্যাত্মিক প্রভাবশালিতার জন্য মান্দ্রাজ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। অকৃত্রিম দেশহিতৈষী, তেজস্বী ও কর্ম্মিষ্ঠ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদকতায় শিল্প-প্রদর্শনীর মহা আয়োজন চলিতেছে। দেশহিতৈষী বহুদর্শী বড়োদারাজ শ্রীযুক্ত সয়াজীরাও গায়কবাড় শিল্পআলোচনা-সমিতির প্রারম্ভিক বক্তৃতা করিবেন। বোম্বাইয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বণিক ও কাপড়ের কলওয়ালা শ্রীযুক্ত বিঠলদাস দামোদর ঠাকরসী এই সমিতির সভাপতি হইবেন।

কুচবেহারের মহারাণী মহোদয়া মহিলা সমিতির সভাপতিত্বে বৃত হইয়াছেন। শিক্ষায়, সামাজিক মর্য্যাদায়, ধনবলে, তিনি দেশের নারীকুলের প্রভূত উপকার করিতে সমর্থ। বয়োবৃদ্ধ ভারতহিতৈষী শ্রীযুক্ত সামুয়েল স্মিথ্ মাদক নিবারিণী সমিতির সভাপতি হইবেন।

কলিকাতায় দ্রষ্টব্য যাহা কিছু তাহা বাঙ্গালীর অবিদিত নাই। কিন্তু সেখানকার অনেক স্থান লোকে কেবল দেখিয়াই তৃপ্ত হয়; তাহা হইতে শিক্ষালাভের কোন আয়োজন নাই, এবং চেষ্টাও করা হয় না। মিউজিয়মে প্রাণিতত্ত্ব, খনিজতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি শিখিবার উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রহিয়াছে। নানা প্রকার কাঠ, গাছের নির্য্যাস, গাছের ছাল হইতে প্রাপ্ত সুতা, প্রভৃতি সর্ব্ববিধ অর্থকর উদ্ভিজ্জ পদার্থও এখানে সঞ্চিত রহিয়াছে। ইহা "স্বদেশী"ত্বের পরম সহায়। আলিপুরের জীবনিবাসে কত গবেষণা চলিতে পারে, কত শিক্ষা লাভ হইতে পারে। শিবপুরের কোম্পানীর বাগানে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিখিবার কত সুবিধা! কিন্তু বন্দোবস্তের অভাবে এবং আমাদের জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা না থাকায় এ সকল সুবিধা বৃথাই যাইতেছে। কোন জাতিকে বড় হইতে হইলে চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকল বিষয়েই অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

গ্রন্থসমালোচনা।

নারীজীবন—নারীগণের দেহতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যবিধান বিষয়ক সাধারণের পাঠোপযোগী পুস্তক। শ্রীহরিধন দত্ত, এল্. এম্. এস্., প্রণীত। মূল্য ১৷৹। এই পুস্তকখানি বিবাহিতা প্রাপ্তবয়স্কা নারীমাত্রেরই পড়া উচিত। পিতামাতারও পড়া উচিত। নারীগণ সর্ব্বাবস্থায় কিরূপে সুস্থদেহে জীবন ধারণ করিতে পারেন, তাহা ইহাতে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। নারীগণের বিশেষ বিশেষ ব্যাধির চিকিৎসাও ইহাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করিতেছি।

বন্দেমাতরম্—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত। পঞ্চম সংস্করণ। মূল্য ।৵৹ আনা। কাপড়ে বাঁধা ৷৵৹ আনা। এই সংস্করণে এই পুস্তকখানি ২০০ পৃষ্ঠা পরিমিত হইয়াছে। ইহার নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। যে কোন বাঙ্গালী লিখিতে পড়িতে জানে, তাহারই এই পুস্তক একখানি সংগ্রহ করা উচিত।

পল্লীভবনে।

আবার আসিনু ফিরে
জননি তোমার কোলে,
তাপিত পরাণ মোর
জুড়াও মধুর বোলে।

আঁচলে অঙ্গের ধূলি
মুছা'য়ে, লও মা তুলি'
স্নেহমাখা বুকে তব
আবার সোহাগ ভরে।

তোরে যে মা ভালবাসি,
তাই ফিরে ফিরে আসি,
তোরে না দেখিলে মাগো
দু'নয়নে অশ্রু-ঝরে।

কোন্ মোহে জানি না মা
বিমাতার কাছে যাই,
মুখে তা'র ভালবাসা,
পরাণে যে কিছু নাই।

সামান্য অর্থের আশে
ছুটে যাই তা'র পাশে,
লাঞ্ছিত হইয়া শেষে
তোর কাছে আসি ফিরে।

আজি মোরে বুকে লও,
হাসি মুখে কথা কও,
অঞ্চলে মুছা'য়ে দাও
মোর এ নয়ন নীরে।

তোমার নিকুঞ্জ ছায়
বিহগ বিহগী গায়,
পরিমল ছড়াইয়া
অনিল বহিয়া যায়।

আনন্দে নাচিছে ফুল,
ছুটে আসে ভৃঙ্গকুল,
গান গেয়ে কুলু কুল
তটিনী যেতেছে ছুটি'।

বিটপী বেড়িয়া কত
শোভে লতা শত শত,
ফুলভার অবিরত
চরণে পড়িছে লুটি'।

দিবা অবসানকালে
ধীরে গ্রাম্য পথ বাহি,'
ধেনু ল'য়ে যায় ঘরে
রাখালেরা গান গাহি'।

ফুটে উঠে যত ফুল,
নীড়ে যায় পাখিকুল,
গ্রামের মন্দির মাঝে
আরতির শঙ্খ বাজে।

নিশীথে আকাশ কোলে
তারার মাণিক জ্বলে,
চাঁদ ঢালে সুধা রাশি
বসিয়া গগন মাঝে।

হেন শান্তি হেন প্রীতি
কোথাও পাই না দেবি,
তাই সাধ চিরদিন
তোমার চরণ সেবি।

তব স্নেহমাখা বুকে
ঘুমাইয়া থাকি সুখে,
কভু প্রকৃতির সনে
প্রাণ খুলে গান গাই।

তুচ্ছ মানি ধন মান—
সংসারের শ্রেষ্ঠ দান,
তোমার ও স্নেহ ছাড়া
আর কিছু নাহি চাই।

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাসনা।

বকুল তলে, কুটীর মোর
কোমল পাতে ছাওয়া;
সন্ধ্যা হ'লে, দখিণ্ হ'তে
আসে পাগল হাওয়া।
সমুখে তার, বিপুল দিঘি
নিবিড় কালো জল;
সকাল বেলা, হাসিয়া ওঠে
বিমল শত দল।
ফাগুন দিনে, গাছের ডালে
কালো কোকিল ডাকে,
প্রথর রবি, আষাঢ় মাসে
নবীন মেঘে ঢাকে।
শ্রাবণ দিনে, মেঘের সনে
চাঁদের লুকোচুরি,
পলক হীন, নয়নে হেরে,
পরাণ ওঠে ভরি।
সকলি আছে, কেবল মোর,—
আঁধার ঘরে আলো,
করুণা মানি, হৃদয় রাণি,
তুমিই এসে জ্বালো।
সাঁঝের বেলা, শ্রান্ত পদে
যখন গৃহে ফিরি,
কোমল দুটি বাহুর পাশে
রাখিও মোরে ঘিরি।
পুলকে আঁখি, মুদিয়া আমি
রাখিব শির বুকে;
কাটিবে মোর, শেষের দিন,
গরবময় সুখে।

শ্রীরঙ্গলাল রায়

৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত।



মাননীয় ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ

Kuntaline Press, Calcutta.

প্রবাসী

"Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters."
"to look on noble forms
Makes noble thro' the sensuous organism
That which is higher."—*Tennyson.*

৬ষ্ঠ ভাগ। | মাঘ, ১৩১৩। | ১০ম সংখ্যা।

খলিফা অলিদ।

(৭০৫—১০ খৃঃ)

আব্দুল মালেকের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অলিদ খলিফার পদলাভ করেন। অলিদ বিলাসী ও আরামপ্রিয় ছিলেন। রাসেদিন খলিফাগণ এই সুখলোলুপ পৃথিবীতে মিতাচারিতা ও অবিলাসিতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। মাবিয়ার রাজপদলাভের সঙ্গে সঙ্গেই বিলাসিতা প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। ইহার কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দী পরে অলিদ ইসলাম সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় রাজধানী দামস্কাসে বিলাসিতার পূর্ণ প্রভাব। অলিদ আশৈশব বিলাসিতার মধ্যেই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তিনি রাজপদে বৃত হইয়া বিলাসস্রোতে শরীর মন ঢালিয়া দেন; অন্তঃপুরের প্রমোদতরঙ্গে তাঁহার জীবনতরী লীলায়িত প্রেমের ছন্দে ছন্দে ভাসিয়া চলে।

এই ভোগাসক্ত বিলাসপটু নরপতির আড়ম্বরপ্রিয়তা এবং সৌন্দর্য্যানুরাগ অতীব প্রবল ছিল। এই কারণ তাঁহার শাসনকালে বহুসংখ্যক মনোহর হর্ম্ম্য ও বৃহৎ মসজিদ নির্ম্মিত হয়।*

বিলাসকলার প্রসাধনে ও স্থপতি কার্য্যের তত্ত্বাবধানেই অলিদের সমগ্র সময় যাপিত হয় নাই; রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিবার অবসরও তাঁহার ছিল। তিনি বুদ্ধিমান,

---

করিতেছি :—He caused the principal mosque at Cairo to be demolished, and one erected of greater majesty, the pillars of which had gilded capitals. He enlarged and beautified the grand mosque on the site of the temple of Solomon, for he was anxious to perpetuate the pilgrimage to Jerusalem established by his father. He gave command that the bounds of the mosque at Medina should be extended, so as to include the tomb of the prophet, and the nine mansions of his wives. He furthermore orderd that all the buildings round the Caba at Mecca should be thrown down, and a magnificent quadrangular mosque erected, such as is to be seen at the present day. For this purpose he sent a body of skilful Syrian architects from Damascus. All these works were carried on under the supervision of his Emirs, but the Caliph attended in person to the erection of a grand mosque in his capital of Damascus. In making arrangements for this majestic pile he cast his eyes on the superb church of St. John the Baptist. * * The Caliph * * took possession of the church on his own authority. * * He employed twelve thousand men in this architectural enterprise, and

তীক্ষ্ণদর্শী ও যোগ্য ব্যক্তির নির্ব্বাচনক্ষম ছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজপুরুষগণও সাম্রাজ্যের হিতকল্পে নিঃস্বার্থচিত্তে পরিশ্রম করিতেন। ইহার ফলে রাজ্যশাসন সুশৃঙ্খলভাবে নির্ব্বাহিত হয়, এবং ইসলামের আধিপত্য বহু স্থানে বিস্তৃতি লাভ করে।

খলিফা অলিদ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমেই স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা (অলিদের ভ্রাতৃসংখ্যা তের) মোসলেমাকে বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে এসিয়া-মাইনর জয়োদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেন। তদনুসারে মোসলমান সৈন্য সে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক তত্রত্য প্রধান নগরী টায়ানার চতুর্দ্দিকবর্ত্তী প্রাচীর অতি নিবিড়ভাবে পরিবেষ্টন করিয়া রহিল; দুর্গ মধ্যে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের পথ একবারে রুদ্ধ করিয়া দিল। দুর্গবাসীরা খাদ্যাভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। এসিয়া-মাইনরের অধিপতি টায়ানাবাসীদের সহায়তার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সৈন্যদল অস্ত্রবিদ্যায় অনভ্যস্ত নূতন সংগৃহীত লোকে পূর্ণ ছিল। মোসলমান সৈন্য তাহাদিগকে সহজেই বিতাড়িত করিয়া দিতে সমর্থ হইল। ইহাদের পরাজয়ের পরে অবরুদ্ধ অধিবাসীরা হতাশ হইয়া পড়িল, এবং খাদ্যসামগ্রীর অভাব নিবন্ধন ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্ম-সমর্পণ করিল। অতঃপর মোসলেমা পণ্টাস এবং আর্ম্মেনিয়ার বিরুদ্ধে তরবারি উত্থিত করিলেন, এবং অবিলম্বে এই স্থানদ্বয়ের অধিকাংশ মোসলমানের অধিকারভুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন। মোসলেমা পণ্টাস ও আর্ম্মেনিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক গেলেসিয়া প্রদেশে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং এই প্রদেশ মন্থন করিয়া বহুমূল্য লুণ্ঠিত সামগ্রী এবং অগণিত বন্দী সমভিব্যাহারে দামস্কাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

একদিকে মোসলেমা এসিয়া-মাইনর বিজয়ে প্রবৃত্ত ছিলেন, অপরদিকে তদীয় তরুণবয়স্ক পুত্র খতিবা পূর্ব্বাঞ্চলে ইসলামের গৌরব-নিশান প্রোথিত করিতেছিলেন। খলিফা তাঁহাকে খোরসানের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই নবীন যুবকের বীর-হৃদয়ের উচ্চাভিলাষ স্বীয় প্রদেশের আধিপত্য করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। তিনি নির্ম্মলসলিল-অক্সাসনদ উত্তীর্ণ হইয়া তুর্কিস্থানে প্রবেশ লাভ করেন, এবং তারপর বহু জয় পরাজয় অন্তে, তুর্কি ও তাতারদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া রাজধানী বোখারা এবং বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র নগর করতল ন্যস্ত করিতে সমর্থ হন।

অতঃপর খতিবা খারিজম সাম্রাজ্যের অধিপতিকে পরাজিত করেন। তিনি নিরুপায় হইয়া চিরপ্রসিদ্ধ সমরকন্দে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সমরকন্দ সমগ্র এসিয়ার বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। নবজয়দৃপ্ত খতিবা এই নগর অবরোধ করিলেন। তত্রত্য অধিবাসীরা আপনাদের বলাধিক্যে অতিশয় বিশ্বাসী ছিল। তাহারা মোসলমানের আক্রমণে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইল না, নানা প্রকারে খতিবা ও তদীয় সৈন্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু খতিবার প্রাণগত সাধনায় অচিরেই তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল; তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া বার্ষিক এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও তিন সহস্র ক্রীতদাস কর-স্বরূপ দিতে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি স্থাপন জন্য প্রার্থনা করিল। খতিবা সমরকন্দবাসীদের প্রার্থনা মত সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক নগরের মধ্যস্থলে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়া খোরাসানে ফিরিয়া আসিলেন।

এইরূপ বহু যুদ্ধে মোসলমানের কণ্ঠদেশে বিজয় মাল্য অর্পিত হওয়াতে অলিদের রাজত্বকাল সাতিশয় গৌরবান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু স্পেন বিজয়ই অলিদের রাজত্বের সর্ব্ব-প্রধান কীর্ত্তি। এই কীর্ত্তির পার্শ্বে অন্যান্য যুদ্ধলব্ধ গৌরবশ্রী নিষ্প্রভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অলিদের সিংহাসনারোহণকালে সেনাপতি মুসা আফ্রিকায় মোসলমানের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্রতী ছিলেন। মুসা সময়ে সময়ে রণতরী সজ্জিত করিয়া ভূমধ্য-সাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণার্থ প্রেরণ করিতেন। লুণ্ঠনই এই সকল জলাভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। মোসলমান-সৈন্য এই সকল দ্বীপে স্থায়ী অধিকার স্থাপন করিতে যত্ন করিত না, লুণ্ঠনকার্য্য সমাধা হইলেই স্বস্থানে ফিরিয়া আসিত। এই ভাবে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইলে সেনাপতি মুসা নৌ-সৈন্যের ভার স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল্যার হস্তে অর্পণ করেন, এবং নিজে কনিষ্ঠ পুত্র আব্দুল আজিজকে লইয়া আফ্রিকার পশ্চিম অঞ্চলে মোসলমানের অধিকার বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হন। পুত্রদ্বয় যোগ্যতাসহকারে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিয়া পিতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে

আরম্ভ করেন। ফেজ, ওকুবেলা, মরকো ও সুস প্রভৃতি স্থান বিজিত হয়। ফলতঃ এই সময় মাউন্ট এটলাসের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত ইসলামের মহিমা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। জেনিটেসের বীরজাতি মুসার সহিত সন্ধি স্থাপন করে, অন্যান্য জাতিও ইসলাম সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমগ্র আলমাগ্রিত এবং আটলান্টিক উপকূলবর্ত্তী অন্তরীপসমূহ মোসলমানের আধিপত্যাধীন হয়।

কিন্তু আফ্রিকার উত্তরাংশের বিজয় সম্পূর্ণ করিবার পক্ষে একটী প্রদেশ অবশিষ্ট ছিল। এই প্রদেশের নাম টিঙ্গিস। এখানে আফ্রিকা ইউরোপের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য সাহস সহকারে হস্ত প্রসারণ করিয়াছে। এক দিকে আফ্রিকা, অপর দিকে ইউরোপ, মধ্যে একটা অপ্রশস্ত প্রণালী, সে প্রণালী ভূমধ্যসাগরের প্রবেশদ্বার। আফ্রিকার তটভূমে দুইটী নগর, কিউটা আর ট্যানজিয়ারস্। এই দুই নগর তৎকালে ভূমধ্যসাগরের প্রবেশ দ্বারের প্রহরী স্বরূপ বিদ্যমান ছিল। অলিদের রাজত্বকালে এই নগর-যুগল স্পেনের অধিপতি গথিক বংশীয় নরপতির প্রভুত্বাধীন ছিল।

সম্ভবতঃ সেনাপতি মুসা সর্ব্বশেষে এই স্থান জয় করাই সুবিধাজনক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি ৭১০ কি ৭১১ খৃষ্টাব্দে টিঙ্গিস বিজয়ে প্রবৃত্ত হন। মুসার অন্যতম সহকারী মারওয়ান দশ সহস্র সৈন্য সহ টিঙ্গিসের সীমান্তে শিবির সংস্থাপন করিয়া রহিলেন; আর রণকুশল সেনানায়ক তারিক মোলুয়া জলপ্রপাত হইতে অলদরল পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত সমগ্র স্থান অমিত পরাক্রমে বিলোড়িত করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। এই সময় বীরশ্রেষ্ঠ কাউন্ট জুলিয়ান টিঙ্গিসের শাসন কর্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জুলিয়ান মোসলমানের গতিরোধজন্য বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং সুকৌশলে মোসলমান সৈন্যের বাধা জন্মাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি মোসলমান সৈন্যের প্রবাহ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না; তাহারা ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। কাউন্ট জুলিয়ান তখন অনন্যোপায় হইয়া কিউটার দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। স্বয়ং সেনাপতি মুসা কিউটার দুর্গ অবরোধ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ এই দুর্গ তোপের মুখে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দুর্গবাসীর বিপুল বিক্রমে মোসলমান সৈন্য বিব্রত হইয়া পড়িল; বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট যোদ্ধা চির নিদ্রায় অভিভূত হইল। কিউটা দুর্গ প্রকৃতির দুর্ভেদ্য স্থানে অবস্থিত এবং সুদৃঢ় গঠনে নির্ম্মিত ছিল। মোসলমান সৈন্য পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও এই দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারিল না। তখন মুসা দুর্গ মধ্যে খাদ্য সামগ্রীর সরবরাহ বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল মরুভূমিতে পরিণত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় হইল না; স্পেন দেশ অদূরবর্ত্তী ছিল বলিয়া দুর্গ বাসীদের খাদ্য সামগ্রী লাভের কোনরূপ অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে নাই। মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল; কিন্তু জয়ের কোন লক্ষণ দেখা গেলনা, মোসলমান সৈন্য ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

এমন সময়ে একটা অসম্ভাবিত ঘটনায় সমস্ত অবস্থা হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইল; মোসলমান সৈন্য জয়াশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এতকাল কাউন্ট জুলিয়ান মোসলমানের গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে অমিত পরাক্রমে দণ্ডায়মান ছিলেন; এখন তিনিই সংসারের কুটিল চক্রের আবর্ত্তনে কিউটার দুর্গ সেনাপতি মুসার হস্তে অর্পণ করিবার প্রস্তাব পাঠাইলেন। কাউন্ট এই প্রস্তাব করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, মুসাকে স্পেন রাজ্য জয় করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কাউন্ট এই কার্য্যে তাঁহার উজ্জ্বল চরিত্র দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমায় আচ্ছন্ন করিয়াছেন এবং পৃথিবীর ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতকতার একটি স্মরণযোগ্য দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।*

---

* স্বদেশসেবক জুলিয়ান কি জন্য এই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন? স্পেনের অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি আপন আপন পুত্রকন্যার সুশিক্ষার জন্য তাহাদিগকে রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিতেন। বালকগণ রাজার আজ্ঞাবহ হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন; বালিকাগণ রাণীর সহচরী রূপে রাজান্তঃপুরে বাস করিতেন। এই সকল বালকবালিকা রাজভবনে নানাবিধ সুকুমার বিদ্যায় এবং বংশমর্য্যাদা-সমুচিত আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত হইত। কাউন্ট জুলিয়ানও স্বীয় কন্যা ফ্লরিন্দাকে রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজমহিষী অতি সমাদরে এই লজ্জাবতী লতাটীকে অন্তঃপুরে স্থাপন করেন। রাজান্তঃপুরে কিশোরী ফ্লরিন্দা নির্ম্মল কুসুমরাশির মত মধুর শোভায় বিকশিত হইয়া উঠে। একদিন রবিকরোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে ফ্লরিন্দা কতিপয় সখীসহ রাজোদ্যানের তরুচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল। তাহাদের [illegible]

কাউন্টের প্রস্তাব মুসার নিকট পৌছিলে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন; কিন্তু বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইলেই তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। মুসা কত দিন অপর তীরবর্ত্তী স্পেনের সূর্য্যকিরণদীপ্ত পর্ব্বতমালায় লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার স্পেনবিজয়ের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে উত্থিত হইয়া হৃদয়েই বিলীন হইয়াছে। মুসা চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাসঘাতক কাউন্টের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না, কাউন্টের বাক্য যথার্থ কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সেনানায়ক তারিককে কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে কাউন্ট জুলিয়ানের সঙ্গে স্পেন উপকূলে পাঠাইলেন। তারিক অনেক ধনরত্ন ও বহুসংখ্যক রূপসী বন্দিনীসহ মুসার নিকট ফিরিয়া আসিয়া নিবেদন করিলেন, "রডারিক পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতিকে হত্যা করিয়া বলপূর্ব্বক স্পেনের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিল।* তদুপরি তিনি প্রজাপীড়ক। এই দুই কারণে রডারিক জনপ্রিয় নহেন। স্পেন দেশে জুলিয়ানের পক্ষাবলম্বী লোকের অভাব নাই। আমরা অস্ত্রধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেই সমগ্র দেশ আমাদের পদতলে লুণ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা হয়।"

সেনাপতি মুসার সম্মুখে তরবারিহস্তে ধাবিত হইবার অভিনব পথ উদ্ঘাটিত হইল। তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া খলিফাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "স্পেনদেশ অতি সমৃদ্ধিশালী,—এ দেশের নগরমালা জনাকীর্ণ ও বিচিত্র শোভাশালী, ভূমি উর্ব্বরা ও ফলশস্য পূর্ণ এবং জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও স্বাস্থ্যকর। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি জাব, দেররে, জারা, মাজামুদা ও সুস বশীভূত করিয়াছি; ইসলামের বিজয়নিশান ট্যানজিয়ার্সের দুর্গপ্রাকারে উড্ডীন হইয়াছে। ইহার পর মাইল দূরে সমুদ্রের অপরতীরে স্পেন রাজ্য। বিশ্বাসিগণের অধিনেতার আদেশ প্রাপ্ত হইলেই আফ্রিকা-বিজয়ী মোসলমান সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সে দেশে প্রবেশ করিতে পারে।" এই লিপি পাঠ করিয়া খলিফা অলিদ ধনজনপূর্ণ স্পেন রাজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন; তাঁহার মনে পড়িল যে, একদা মোহাম্মদ বলিয়াছিলেন, "পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত সত্যধর্ম্ম প্রচারিত হইবে;" তিনি তৎক্ষণাৎ স্পেন রাজ্যে ইসলামের বিজয়নিশান উড্ডীন করিবার অনুমতি দিলেন।

সেনাপতি মুসা খলিফার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া বীরশ্রেষ্ঠ তারিককে সাত হাজার সৈন্য সহ স্পেন বিজয়ার্থ প্রেরণ করিলেন।† (এপ্রিল, ৭১১ খৃষ্টাব্দ।) তারিক স্পেনদেশে

আলাপ ও কলহাস্যে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল; একে অন্যের উপর আনন্দোচ্ছ্বাসে ঢলিয়া পড়িতেছিল। এমন সময় রাজা রডারিক হঠাৎ কোন প্রয়োজন উপলক্ষে তথায় উপনীত হন। তখন শিথিল-বসনা ফ্লরিন্দা সুন্দরীর উন্মুক্ত রূপরাশি চারিদিকে উছলিয়া পড়িতেছিল; সে রূপপ্রবাহে রডারিকের চিত্তসংযম ভাসিয়া যায়। বাৎসল্যের পরিবর্ত্তে রূপজমোহ উপস্থিত দেখিয়া রডারিক শিহরিয়া উঠেন, এবং আপন পাপ-লালসা দমন করিতে যত্নপরায়ণ হন। কিন্তু বাধা পাইয়া তাঁহার মোহ চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠে, তিনি পরাভূত হন। একদিন সন্ধ্যাকালে রডারিক পুষ্পতরুমূলে উপবিষ্ট ছিলেন;—পার্শ্বে একটা কৃত্রিম নির্ঝরিণী কুলু কুলু স্বরে বহিয়া যাইতেছিল। এমন সময় ফ্লরিন্দা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হয়। রডারিক সে অনুপম রূপমাধুরী দেখিয়া একবারে আত্মহারা হন,—তিনি ফ্লরিন্দাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলেন, "হাতে কাঁটা বিঁধিয়াছে, তুমি তুলিয়া দেও।" সরলহৃদয়া ফ্লরিন্দা হস্ত পরীক্ষা করিয়া বলে "কাঁটা কোথায়?" তখন রাজা ফ্লরিন্দার কুসুম কোমল হস্তখানি হৃদয়তলে ন্যস্ত করিয়া উত্তর দিল, "কাঁটা এখানে।" বিশুদ্ধমতি ফ্লরিন্দা অবজ্ঞাভরে এ পাপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে; কিন্তু অচিরে রাজার সুকৌশলে বংশীধ্বনিমুগ্ধা হরিণীর মত ফাঁদে পতিত হয়। কন্যার সর্ব্বনাশের কথা জুলিয়ানের নিকট পৌছিলে তিনি ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন, এবং সে ক্রোধ শান্ত করিবার জন্য স্বদেশ পর হস্তে অর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হন। অধিকাংশ ইতিহাসলেখকই কাউন্টের বিশ্বাসঘাতকতার প্রাগুক্ত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু হানাম প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ফ্লরিন্দার কাহিনীতে তাদৃশ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। একজন প্রাচীন ইতিহাসলেখক কাউন্টের বিশ্বাসঘাতকতার অন্যরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। কাউণ্ট জুলিয়ান রোমানবংশসম্ভূত ছিলেন। রডারিক গথিক বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। রোমান জুলিয়ান, গথিক রডারিকের বিদ্বেষী ছিলেন। এই জাতিবিদ্বেষই জুলিয়ানকে বিষম বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবৃত্ত করে। কাউণ্ট রডারিকের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা উটিকার পুত্রগণকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে স্পেনের সিংহাসনে স্থাপন জন্য অভিলাষী ছিলেন, ইতিহাসে এরূপ উল্লেখও দেখা যায়।

* He was son of a Duke of Cordova, and under King Witica had risen to a great renown, of which he had taken advantage to seize the throne and to banish the King (A. D. 708). Gilman's *The Saracens.*

† সেনাপতি তারিক কিরূপ অসমসাহসী ও আপনার বলাধিক্যে কিরূপ বিশ্বাসী ছিলেন, তাহা আমরা প্রদর্শন করিতেছি। মোসলমান সৈন্য স্পেনের উপকূলে অবতরণ করিলে তারিক তরীগুলি ভস্ম করিতে আদেশ করেন। অচিরে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া তরী সকল ভস্ম করিতে লাগিল। তখন মোসলমান সৈন্য ভীত হইয়া [illegible]

উপনীত হইয়া প্রথমতঃ আলজিয়ার্স আক্রমণ করিলেন। পথিকসৈন্য তাঁহার গতিরোধ জন্য দণ্ডায়মান হইল, কিন্তু পরাজিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিল। মোসলমান-সৈন্য আলজিয়ার্স অধিকার করিয়া টলিডোর অভিমুখে ধাবিত হইল। পথিমধ্যে নবপ্রেরিত পাঁচ হাজার সৈন্য আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল।

এই সময় স্পেনের অধিপতি রডারিক উত্তরাঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি মোসলমান সৈন্যের আগমন-সংবাদ শ্রবণ মাত্র রাজধানী করডোভার অভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন, এবং সামন্তবর্গকে সসৈন্যে সেখানে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। রাজার নিজের বিপুলবাহিনী ছিল; তার পর সামন্তবর্গের সৈন্য আসিয়া যোগদান করাতে রাজ-সৈন্যের সংখ্যা একলক্ষ হইল। রডারিক এই বিপুল সৈন্য-সহ মোসলমানের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। উভয় সৈন্য গোয়াডেলিটি নদীর তীরে পরস্পরের সম্মুখীন হইল। স্পেনের পূর্ব্ববর্ত্তী অধিপতির পুত্রগণ পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া প্রথম সংঘর্ষের পরেই স্পেনের পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এই ভেদ সত্ত্বেও স্পেনের সৈন্য বড় বেশী দুর্ব্বল হইল না। তাহারা মোসলমানদিগকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। কয়েকটী ক্ষুদ্র সংঘর্ষের পর একদিন তারিক সমস্ত সৈন্যসহ শত্রুসৈন্যের উপর কালান্তক যমের ন্যায় পতিত হইলেন। স্পেনিশ সৈন্য এ আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না, সমস্ত সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল, রডারিক পলায়ন করিবার সময় গোয়াডেলিটি নদী গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। এই যুদ্ধের ফলে মোসলমানের গৌরব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, এবং স্পেনিয়ার্ডগণ হতোদ্যম হইল।

অতঃপর সিডোলিয়া এবং কারমোশ বিজয়ী সৈন্যের সম্মুখে স্ব স্ব দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল। গোয়াডেলিটির যুদ্ধের পর হতাবশিষ্ট স্পেনিশ সৈন্য এসিজা নগরীতে সমবেত হইয়াছিল। মোসলমান সৈন্য এসিজা নগরীর সম্মুখবর্ত্তী হইলে তাহারা কিয়ৎকালের জন্য বাধা দিল, তার পর বশ্যতা স্বীকার করিল।

এক্ষণে তারিক মোসলমানসৈন্য চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া লইলেন। একজন সেনাপতি করডোভা জয় করিতে ধাবিত হইলেন। অন্য একজন সেনাপতির প্রতি মালগা জয় করিবার ভার অর্পিত হইল। তৃতীয় সেনাপতি গ্র্যানেডা ও এলডিরার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তারিক নিজে টলিডো আক্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন। মালগা করডোভা ও গ্র্যানেডা একে একে মোসলমানের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিল। পথিকগণ তারিকের ক্ষিপ্র গতি ও প্রবল শক্তি দেখিয়া ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িল। একজন মোসলমান লিখিয়া গিয়াছেন, "স্বয়ং ঈশ্বর বিধর্ম্মীদের হৃদয় ভয়পূর্ণ করেন।" সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বশ্যতা স্বীকার করিলেন অথবা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মযাজকগণ রোমে পলায়ন করিলেন। তারিক টলিডোর দ্বার দেশে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, স্পেনিয়ার্ডগণ নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তারিক টলিডোর শাসন সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করিয়া পলায়িত অধিবাসীদের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। এই সময় স্বয়ং সেনাপতি মুসা স্পেন দেশে পদার্পণ করিলেন। তিনি পূর্ব্বাঞ্চলের দিকে ধাবিত হইয়া সিভিলি ও মেরিডার বিজয় সম্পন্ন করিলেন। তারপর তিনি টলিডো নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই সেনানায়ক তারিক টলিডো নগরে আগমন করিয়া মুসার সঙ্গে মিলিত হইলেন। তারিকের বর্দ্ধমান সৌভাগ্যশ্রী দর্শনে মুসার হৃদয় ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। এ কারণে তাঁহাদের মধ্যে অচিরে ঘোর মনোমালিন্য ঘটিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের এই বিসংবাদ সহজেই নিরাকৃত হইল; তখন উভয় সেনাপতি মিলিত হইয়া আরাগনের অভিমুখে যাত্রাকরিলেন। সেরাগোসা, টারাগোনা, ব্যরসিলোনা প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানগুলি ক্রমশঃ বিজয়ী বীরদ্বয়ের নিকট মস্তক অবনত করিল, এবং ন্যূনাধিক দুই বৎসর মধ্যেই পিরানিস পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র স্পেনদেশ মোসলমানের অধিকৃত হইল।*

করিল, "যদি আমরা যুদ্ধে পরাজিত হই, তবে কি উপায়ে স্বদেশে প্রস্থান করিব?" তারিক উত্তর করিলেন, "ভীরুর পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলাম, বীরপুরুষ কখনও পলায়নের বিষয় চিন্তা করেন না। যুদ্ধে জয়-লাভ ভিন্ন তোমাদের উপায় নাই।" সৈন্যগণ বলিল, "তরী ব্যতীত আমরা কিরূপে স্বদেশে ফিরিয়া যাইব?" তারিক উত্তর করিলেন, "স্বদেশ তোমাদের সম্মুখে, কিন্তু তরবারি হস্তে অধিকার করিতে হইবে।"

* মোসলমানের স্পেনজয় সম্পূর্ণ হইলে তাঁহাদের প্রধান সহায় কাউণ্ট জুলিয়ান বহু রাজপ্রসাদ লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার ধার্ম্মিক

বিজয়শ্রী কর্তৃক ঈদৃশ অসাধারণরূপে সম্বর্দ্ধিত হওয়াতে মুসার জয়াকাজ্ক্ষা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল। তিনি ইউরোপ জয় করিতে করিতে কনষ্টাণ্টিনোপলের পথে দামস্কাসে গমন করিতে মনন করিলেন। তাঁহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইলে ইউরোপের ভাগ্যাকাশ ভিন্নাকার ধারণ করিত; পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত ভূমধ্যসাগরের কুলবর্ত্তী সমগ্র ইউরোপে ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকা উড্ডীন হইত। কিন্তু মুসার হৃদয়ে এই সংকল্প উদিত হইবার অব্যবহিত পরেই তারিকের সহিত তাঁহার মনোমালিন্যের সংবাদ খলিফার কর্ণগোচর হয়; তিনি তাঁহাদের মনোমালিন্যের ফলে বিষম বিপদের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাদের উভয়কেই রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ পাঠাইলেন। তাঁহারা রাজাজ্ঞা প্রতিপালন জন্য অগৌণে স্পেন পরিত্যাগ করিলেন; ইউরোপে ইসলামের প্রভুত্ব বিস্তারের আশা উন্মূলিত হইল।

স্পেন বিজয়ই অলিদের শাসন কালের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার সময়ের অন্য একটা বিজয়কাহিনী বঙ্গীয় পাঠকের অধিকতর কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়া থাকে। ইহা মোসলমানের সিন্ধু বিজয়। অলিদের শাসন কালে মহাবীর হেজাজ ইরাকের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। একবার বহুসংখ্যক মোসলমান সিংহল হইতে জলপথে ইরাকে গমন করিতেছিল। তাহারা সিন্ধুদেশের নিকটবর্ত্তী হইলে তদ্দেশবাসী কতিপয় জলদস্যু তাহাদের তরী আক্রমণ করে। দস্যুরা ধনরত্নসহ কতকগুলি স্ত্রীপুরুষকে ধৃত করিয়া লইয়া যায়। এই সময় একজন স্ত্রীলোক "কোথায় হেজাজ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। হেজাজ এই সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া বলেন, "আমি এখানে আছি।" অতঃপর তিনি বন্দীদিগকে মুক্ত করিতে সংকল্প করেন। হেজাজ প্রথমতঃ সিন্ধুদেশের অধিপতি দাহিরের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া মোসলমানদিগকে মুক্তি প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। দাহির প্রত্যুত্তরে বলিয়া পাঠান, "দস্যুরা আমার শাসনাধীন নহে, সুতরাং আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে অক্ষম।" হেজাজ এই উত্তর পাইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন, এবং সিন্ধুদেশ ধ্বংশ করিবার জন্য খলিফার অনুমতি প্রার্থনা করেন।

হেজাজ সিন্ধু বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া "দেবালের বন্দর আক্রমণ জন্য সেনাপতি ওবেদুল্যার অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ওবেদুল্যা যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। হেজাজ বুদেল নামক সেনাপতির অধীনে আর একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধকালে বুদেল অশ্ব হইতে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। আরব-সৈন্য পরাজিত ও বন্দীকৃত হইল। এই শোচনীয় সংবাদে হেজাজ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া উপযুক্ত প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হইলেন। পরে স্বীয় ভ্রাতা কাসেমের পুত্র মোহাম্মদকে বিপুল সৈন্যসহ দাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তখন মোহাম্মদের বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর মাত্র। মোহাম্মদ স্বীয় পিতৃব্য হেজাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ৭১২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মোহাম্মদ ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দাহির ভাবিয়াছিলেন, আরবেরা তাঁহার রাজ্য আর আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না। এজন্য তিনি রাজ্যরক্ষার্থে উপযুক্ত উপায় অবলম্বনে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, সুতরাং মোহাম্মদ অল্পকাল মধ্যেই দেবাল ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ সহজে জয় করিয়া সিন্ধুদেশের রাজধানী আলোর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। * * * মোহাম্মদ আলোরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন শুনিয়া দাহির স্তম্ভিত হইলেন, এবং অবিলম্বে পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহার

শান্তি অপহৃত হয়। দেশের আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিত। তাঁহার জীবন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। তিনি আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া মানসিক জ্বালা প্রশমিত করিতে যত্ন করেন। কিন্তু আমোদ প্রমোদও তাঁহাকে শান্তি দিতে পারে নাই। তাঁহার কন্যা ফ্লরিন্দার দিকে সকলেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিত, ইহার পাপেই আমাদের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে। ফ্লরিন্দা এ অনাদর ও অবজ্ঞা সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন আত্মহত্যা করে। প্রিয়তমা কন্যার শোকে মুহ্যমান হইয়া কাউণ্ট স্পেন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কার্থেজিনায় গমন করেন। অতঃপর তদীয় পত্নীও শিশুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া স্পেন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিউটায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। স্পেন জয়ের অব্যবহিত পরেই সেনাপতি মুসা খলিফার আহ্বানে দামস্কাসে গমন করেন। মুসার পর তদীয় পুত্র আবদুল আজিজ শাসনকর্ত্তা হন। আবদুল আজিজের মৃত্যুর পর আলাহর শাসনকর্ত্তৃ পদ লাভ করেন। কাউণ্ট জুলিয়ান নব নিয়োজিত শাসনকর্ত্তার বিষ-দৃষ্টিতে পতিত হন। আলাহর অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। তিনি কাউণ্টকে বিদ্রোহোন্মুখ বলিয়া সন্দেহ করেন। তাঁহার আদেশে কাউণ্টের পত্নী শিশুপুত্রসহ নৃশংসভাবে নিহত হন। ইহার পর কাউণ্টও ইহলোক হইতে অপসৃত হন। তিনি কিরূপে কালগ্রাসে পতিত হন, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু তাঁহার অপঘাত মৃত্যু সম্বন্ধে সকলেই একমত।

সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধারম্ভে তিনি "হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন, যখন দেখিলেন যে, তদীয় সৈন্যগণ নির্ভীক চিত্তে ভয়ানক যুদ্ধ করিতেছে, অথচ আরবদিগের বিক্রম ও যুদ্ধনৈপুণ্যে স্থির থাকিতে পারিতেছে না তখন তিনি হস্তী-পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত দিন বিপুল সাহস ও পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দাহির নিহত হইলেন, তাঁহার পুত্র ব্রাহ্মণাবাদের দিকে পলায়ন করিলেন। কিন্তু বীরাঙ্গনা দাহির মহিষী মোহাম্মদকে বাধা দিতে উদ্যত হইলেন। তিনি স্বয়ং দুর্গস্থিত সৈন্যদিগকে পরিদর্শন করিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য স্বদেশের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। মোহাম্মদ বিপুল বিক্রমে দুর্গ আক্রমণ করিয়া দুর্গপ্রাচীরের নিম্নভাগ খনন করিতে আদেশ দিলেন, এবং শত্রুপক্ষের প্রতি বর্ষা, তীর ইত্যাদি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুর্গে খাদ্যদ্রব্যের অভাব হওয়াতে রাণী হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি অবশেষে দুর্গস্থিত স্ত্রীলোক-দিগকে আহ্বান করিয়া এরূপ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে, আরবদিগের দ্বারা অবমানিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। তদনুসারে তাঁহারা সন্তান সন্ততিসহ প্রজ্বলিত হুতাশনে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। মোহম্মদ দুর্গ অধিকার করিয়া অস্ত্রধারী পুরুষ মাত্রকেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু ব্যবসায়ী, শিল্পী ও সাধারণ অধিবাসীদিগের কেশাগ্রও স্পর্শ করিলেন না।"* মোহাম্মদ সিন্ধুবাসীদের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট রাজকর ও জিজিয়া গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছামত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে অনুমতি দিলেন। আলোর বিজিত হইবার অল্পকাল পরেই মোহাম্মদ মুলতান স্বাধিকার-ভুক্ত করিলেন। অতঃপর ন্যূনাধিক তিন বৎসর মধ্যেই সমগ্র সিন্ধু রাজ্য অধিকৃত হইল।

পাঠকদিগকে অলিদের শাসনকালের যুদ্ধ ও দেশবিজয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপহার প্রদত্ত হইল। কেবল এই সকল যুদ্ধ এবং দেশবিজয় ব্যাপারেই অলিদের শাসনকাল প্রসিদ্ধ নহে; তাঁহার সময়ে প্রজাহিত কর্ম্মেও নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। আরবগণ সমুন্নত গ্রীক জাতির সংস্রবে আসিয়া জ্ঞানপিপাসু হইয়া উঠে, এবং জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়। অলিদ প্রকৃতিপুঞ্জের বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য নানা প্রকার বন্দোবস্ত করেন।* তাঁহার যত্নে শিল্পবাণিজ্যেরও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। বহুস্থানে সাধারণের জন্য উপাসনা মন্দিরের অভাবে সময় সময় ঈশ্বরো-পাসনার ব্যাঘাত জন্মিত। অলিদ এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রতি নগর উপনগরে উপাসনামন্দির নির্ম্মাণ করেন। সীমান্ত প্রদেশ সমূহ সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার আদেশে বহু দুর্গ নির্ম্মিত হয়। অলিদ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র রাজপথ প্রস্তুত ও কূপ খনন করান। তাঁহার রাজত্বকালে বহুসংখ্যক পাঠশালা ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অলিদ দরিদ্র, পীড়িত ও বিকলাঙ্গের ভরণ পোষণ জন্য যথেচ্ছামত দানের প্রথা বন্ধ করিয়া রাজকোষ হইতে নিয়মিত বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। তিনি অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও উন্মাদগ্রস্তের জন্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল আশ্রমে রাজ-ব্যয়ে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদের সর্ব্বপ্রকার অভাব দূরীকৃত হইত। অলিদ পিতৃমাতৃহীন শিশুর প্রতিপালন ও শিক্ষার জন্য অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। বাণিজ্যকেন্দ্র সমূহে পণ্যদ্রব্যের হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে খলিফা স্বয়ং অনুসন্ধান করিতেন।

ফলতঃ সর্ব্ববিষয়েই খলিফা অলিদের রাজত্ব চিরখ্যাত রহিয়াছে। এই সময় মোসলমানের গৌরবরবি মধ্যাহ্নাকাশে সমুপস্থিত হইয়াছিল। অলিদ মহাগৌরবে কিঞ্চিদধিক নয় বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন।

যে সকল রাজপুরুষের ঐকান্তিক সাধনায় অলিদের রাজত্ব গৌরবশ্রী লাভ করে, তাঁহার পরলোক গমনের পর

* মৌলবী আবদুল করিম প্রণীত "মোসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

* অলিদ বিদ্বজ্জনের উৎসাহবর্দ্ধন জন্য যথোচিত যত্ন করিতেন; কিন্তু তিনি নিজে মূর্খ ছিলেন। একদিন রু—ব—জিনবা নামক ঐতি-হাসিক খলিফা আব্দুল মালেককে বিমর্ষ দেখিতে পান। তিনি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। খলিফা উত্তর করেন, "আমি খলিফার পদে কাহাকে মনোনীত করি, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না।" রু বলেন, "অলিদ কি খলিফার পদের যোগ্য নহেন?" খলিফা প্রত্যুত্তরে বলেন, "অলিদ ব্যাকরণশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ।" অলিদ এই বিষয় জানিতে পারিয়া সমস্ত বৈয়াকরণকে আহ্বানপূর্ব্বক ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ছয়মাস অন্তে তাঁহার পরীক্ষা গৃহীত হয়। তখন দেখা যায় যে অলিদের ব্যাকরণজ্ঞান পূর্ব্বাপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। আবুজেলাদ নামক একজন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, অলিদ কোন শব্দ একটু কঠিন হইলেই তাহা উচ্চারণ করিতে পারিতেন না।

তাঁহাদের অনেকেই লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত হন। আমরা সংক্ষেপে তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

স্পেনবিজেতা মুসা ও তারিক রাজাদেশে বিজিতদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দামস্কাসে উপনীত হন। তাঁহাদের আগমনের অব্যবহিত পরেই অলিদ মৃত্যুমুখে পতিত হন, এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সোলেমান রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি মুসার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। এই কারণে খলিফার পদলাভ করিয়া তাঁহাকে নিগৃহীত করেন। মুসা রাজরোষে পতিত হইয়া দৈন্য-দশা-গ্রস্ত হন এবং তদবস্থাতেই পরলোক গমন করেন। মুসা স্পেন দেশ পরিত্যাগ করিলে তদীয় পুত্র আব্দুল আজিজ তত্রত্য শাসন-কর্ত্তৃপদ গ্রহণ করেন। মুসার পরলোক গমনের পর আব্দুল আজিজও খলিফার চক্রান্তে বিষপ্রয়োগে নিহত হন। অতঃপর সেনানায়ক তারিকও সোলেমানের বিরাগভাজন হয়েন, এবং নানারূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া ভগ্নচিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। ইরাকের শাসন কর্ত্তা হেজাজ অলিদের অব্যবহিত পূর্ব্বে পরলোক গমন করেন। সালেহ ইরাকের শাসন কার্য্যে প্রেরিত হন। সালেহ কোন কারণে হেজাজ পরিবারের প্রতি বিরূপ ছিলেন। এই জন্য তিনি ক্ষমতা-শালী হইয়াই হেজাজের আত্মীয় স্বজনের বিনাশ সাধনার্থ সংকল্পারূঢ় হন, এবং সর্ব্ব প্রথমেই হেজাজের জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র সিন্ধুবিজেতা মোহাম্মদের প্রতি হস্ত প্রসারণ করেন। সালেহের চক্রান্তে খলিফা মোহাম্মদকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ দেন। * সালেহের ইঙ্গিতে মোহাম্মদের প্রতি ঘোর অত্যাচার হইতে লাগিল; তিনি সে পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

স্বদেশী বনাম বিদেশী চিত্র।

শ্রীমতী রাধিকা একদিন নন্দসুতের উপর অভিমান করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি "কালবরণ" আর চক্ষে দেখিবেন না। সেই অভিমানের পালা ও তাহার পরিশিষ্ট বৈষ্ণব কবিগণের রচনায় নানা রসে ও বর্ণে জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। বঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে বাঙ্গালীর স্বদেশী পণ ও বিদেশী বর্জ্জন কতকটা শ্রীরাধিকার "কালবরণ" পরিহারের পুনরভিনয়। স্বদেশী প্রচেষ্টার বর্ত্তমান ফলাফল ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ থাকিতে পারে এবং এই প্রচেষ্টার আশানুরূপ ফল কি ফলিতেছে বা ফলিতে পারে তাহা বর্ত্তমান প্রস্তাবের বহির্ভূত। স্বদেশী প্রচেষ্টাকে সর্ব্ববিষয়-ব্যাপী করিতে হইলে আমাদের গৃহসজ্জার উপকরণাদি ব্যবহারিক সামগ্রীগুলি কেবল স্বদেশী শিল্পের উন্নতি কল্পেই, বিদেশী ভাবের বিজাতীয় স্পর্শ হইতে সংরক্ষণ করা, কতদূর যুক্তিযুক্ত তাহা আলোচনার যোগ্য। বিদেশী শিল্পের আদর্শ অন্ধভাবে "একঘরে" করিলে দেশী শিল্পের লাভালাভ কি— বিদেশী শিল্পে শিক্ষার বিষয় কিছু থাকিলে আমাদের বর্ত্তমান কালের ম্রিয়মাণ শিল্পকলার ক্ষতিবৃদ্ধি কি তাহা ভাবিবার বিষয়। প্রবন্ধের শীর্ষনাম অনুসারে আমাদের বক্তব্য চিত্র-শিল্পের মধ্যে বিশেষরূপে আবদ্ধ থাকিবে।

ভারতে যখন য়ুরোপীয় ভাব ও চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হয়, তখন সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সহিত এদেশে য়ুরোপীয় চিত্রপ্রণালী প্রথম প্রচলিত হয়। তখন এদেশে চিত্রশিল্পের অবস্থা অতীব শোচনীয়—সৌন্দর্য্যচর্চ্চার ক্ষেত্রে এক প্রকার দুর্ভিক্ষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। য়ুরোপীয় চিত্রের যে সকল নমুনা উপস্থাপিত হইল, ভারতের উপবাসী চক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অভিনব ও লোভজনক। ভারতের মোহ-নিদ্রা তখন সবেমাত্র ভঙ্গ হইয়াছে—তখনও তাহার মস্তিষ্কের জড়তা দূর হয় নাই, প্রতীচ্য ভাব চিন্তা ও বিজ্ঞানাদির

* কোন কোন ইতিহাসবেত্তা মোহাম্মদের শোচনীয় পরিণামের অন্যরূপ কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সিন্ধুবিজয় কালে তত্রত্য অধি-পতি দাহিরের দুইটী কন্যা মোহাম্মদের হস্তে বন্দী হন। মোহাম্মদ এই কন্যারত্নদ্বয়কে অন্যান্য রত্নসহ দামস্কাসে খলিফার নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহারা দামস্কাসে উপনীত হইলে খলিফা জ্যেষ্ঠা কন্যার অপরূপ রূপ-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় অঙ্কশায়িনী করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তখন এই কন্যা বলেন, "মোহাম্মদ আমাকে উচ্ছিষ্ট করিয়াছে, আমি জাঁহাপনার যোগ্যা নহি" এই বাক্যে খলিফা ক্রোধে আচ্ছন্ন হন, এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া মোহাম্মদকে নৃশংস ভাবে বধ করিবার জন্য আদেশ দেন। রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইবার পর প্রকাশ পায় যে, দাহিরদুহিতার অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা, তিনি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্যই তাদৃশ মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন। খলিফা মোহাম্মদকে নির্দ্দোষ জানিতে পারিয়া স্বীয় আচরণের জন্য অনুতপ্ত হন; তদীয় আদেশে দাহিরদুহিতাদ্বয় ঘাতকহস্তে জীবন বিসর্জ্জন করেন। অধিকাংশ ইতিহাসলেখকই এই রসাল কাহিনীর উল্লেখ করেন নাই।

ভালমন্দ বিচার করিবার শক্তিও নাই প্রবৃত্তিও নাই। ইংরাজ তাহার হাতে যাহাই তুলিয়া দিয়াছেন ভারত তাহাই গলাধঃকরণ করিয়াছে। উহা তাহার প্রাচ্য প্রকৃতির অনুরূপ ও স্বাস্থ্যকর কিনা তাহা বিচার করিবার অবসর, বুঝি, অবস্থাও ছিল না। দুর্ভিক্ষের দেশে ক্ষুধাতুরের খাদ্যাখাদ্যের বিচার থাকে না। এদেশে সে সময় চিত্রবিদ্যার কোনরূপ চর্চ্চা নাই—সুতরাং যুরোপের বিলাতী পাণ্ডা ভারতের লোলুপ নেত্রের সম্মুখে যখন তাঁহার চিত্রপট উদ্ঘাটিত করিলেন, ভারতীয় শিক্ষার্থীগণ কতক বুঝিয়া কতক না বুঝিয়া বিলাতী চিত্রপদ্ধতির অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল। বিলাতী চিত্রপদ্ধতির অন্তর্গত চিত্রশাস্ত্রের সার্ব্বজনীন তত্ত্বসংগ্রহের চেষ্টা অপেক্ষা, ইহার বাহ্যিক আকৃতি যান্ত্রিক ভাবে আত্মসাৎ করিবার অধিক আগ্রহ প্রদর্শিত হইল। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে ও কিছু পূর্ব্বেই মিশনরীগণ যিশুখৃষ্টের "সুসংবাদ" লইয়া ভারতের অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট করিতে উপস্থিত হইয়া অসভ্য ভারতবাসীর ধর্ম্মশিক্ষার ভার অযাচিতভাবে গ্রহণ করিলেন। এইরূপ সর্ব্বক্ষেত্রেই বিলাতী সভ্যতার পাণ্ডাগণ ভারতের তথাকথিত অসভ্য অশিক্ষিতগণকে সুশিক্ষিত করা ইংরাজ রাজত্বের অবশ্য কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলেন। বোম্বাই মান্দ্রাজ ও কলিকাতার সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ে যে সকল শিক্ষক আমদানী করা হয় তাঁহারা সকলেই এইরূপ মিশনরী প্রকৃতির। ভারতের স্বদেশী স্বজাতীয় চিত্রপদ্ধতির অনুসন্ধান করা দূরে থাক, ভারতীয়গণ যে কোনওরূপ উচ্চশ্রেণীর সূক্ষ্মশিল্পের অনুশীলনে সমর্থ, ইহা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সাহিত্যাদি সম্বন্ধে ইংরাজগণের জ্ঞান ও ধারণা তখন অতিশয় ভ্রমাত্মক, এসিয়াটিক সোসাইটী তখন ভ্রূণাবস্থায়, ভারতের প্রত্নতত্ত্বক্ষেত্রে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের তখনও আবির্ভাব হয় নাই। শিল্পবিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যখন ভারতের প্রতিভাক্ষেত্রে বিলাতী শিল্পের বীজবপন করিলেন তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন উহা যথাসময়ে বিলাতের প্রধান শিল্পবৃক্ষের চারারূপে ভারতে ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া ভারতে বিলাতী সভ্যতার গৌরব ঘোষণা করিবে। ইংরাজ-পণ্ডিতগণের এই ভুল বুঝিতে অনেক বৎসর লাগিয়াছে। গত কয়েক বৎসরের শিল্পবিদ্যালয়ের সরকারী কার্য্যবিবরণী নিরাশার দীর্ঘনিশ্বাসে উত্তপ্ত। শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে যে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই তাহার প্রধান কারণ আমাদের দেশের শিক্ষার্থীগণের অযোগ্যতা কিম্বা বিশেষজ্ঞগণের কার্য্যপ্রণালীর "ঠিকে" ভুল তাহা ঠিক বলা যায় না। যে কারণেই হউক আমাদের দেশের শিল্পশিক্ষার্থীগণ বিদেশী শিল্পশাস্ত্র একবারেই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, উহার বাহ্য আকৃতির হাস্যোদ্দীপক ছায়ানুকরণ করিতে শিখিয়াছেন মাত্র। বিদেশী চিত্রপদ্ধতি তন্ন তন্ন রূপে আদায় ও মজ্জাগত করিতে পারিলে আমরা কিরূপ কৃতি ও ধন্য হইতাম এবং তাহাতে ভারতীয় শিল্পবিদ্যার কিরূপ সার্থকতা হইত তাহা স্বতন্ত্র কথা। যাহা হউক সম্প্রতি আমাদের মধ্যে অনেকে একটী কথা উপলব্ধি করিয়াছেন যে ভারতীয় শিল্পের একটী গৌরবজনক ধারাবাহিক ইতিহাস আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে দেশী শিল্পপদ্ধতিতে এমন কতকগুলি উচ্চশিল্পের উপযোগী উপাদান আছে, যাহার সম্যক অনুশীলনে ও ক্রমবিকাশে এমন একটী সূক্ষ্মশিল্পের উদ্ভব হইতে পারে যাহা জগতের অতি উচ্চ শিল্পপদ্ধতির সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম।

ভারতের যে একটী নিজস্ব শিল্পসম্পত্তি আছে ইহা চিনিয়া লইতে বিদেশী পণ্ডিতগণের অনেক সময় লাগিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে কোনও জাতির শিল্প, সাহিত্য বা ধর্ম্মতত্ত্বের বিশেষত্ব ও প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করা একটী বিভিন্ন আদর্শপরায়ণ বিদেশী জাতির পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যাপার। প্রতীচ্য জীবন ও প্রকৃতির আদর্শের পরকলায় ভারতের প্রাচ্যপ্রতিভা সম্পূর্ণ নূতন বর্ণে, অনেক সময় উৎকট ভুল ধারণায় প্রতিভাত হয়। তাহাতে প্রাচ্যজীবনের আদর্শ বিকৃত ও রূপান্তরিত হয় এবং উহার যাথার্থ্য মূল্যহীন হইয়া পড়ে। আমরা য়ুরোপীয় ভাব ও চিন্তাপ্রণালী যদি আংশিকরূপেও বুঝিয়া থাকি, বিদেশীপণ্ডিতগণ প্রাচ্যপ্রতিভার সাধনা ও সভ্যতার বিশিষ্ট প্রকৃতি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, এবং যেটুকু বুঝিয়াছেন তাহা বিদেশী সংস্কারের বর্ণেই রঞ্জিত। যথার্থ সহানুভূতির চক্ষে ভারতীয় প্রতিভার অন্তঃস্থল অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা সম্প্রতি সূচিত হইয়াছে। আশা করা যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পরস্পর বোঝাপড়া ভবিষ্যতে আরও সন্তোষজনক হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা ও সাধনার একটা বিশেষত্ব ও জাতি-

ভাব আছে—নৈসর্গিক পরিবেধ, জাতীয় প্রকৃতি ও পর্য্যবেক্ষণ প্রণালী অনুসারে, চিন্তারীতির একটা মৌলিক পার্থক্য আছে—যাহাতে মানবের সর্ব্বসাধারণ প্রকৃতিকেও একটা বিভিন্ন বর্ণ, আকার ও স্বাতন্ত্র্য প্রদান করে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে এইরূপ একটা জাতিগত পার্থক্য আছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির শিল্পসাধনায় তাহার স্ব স্ব মৌলিক প্রকৃতির একটা ছাপ আছে—যাহা ছাড়িয়া দিয়া একই আদর্শের মাপকাটিতে বিভিন্ন শিল্পসাধনার দোষগুণ পরিমাণ করা যায় না। ভারতীয় শিল্পে ভারতীয় প্রতিভার জাতিগত বিশেষত্ব ফুটিয়া রহিয়াছে। এই বিশেষত্বগুলি কি তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি না করিলে দেশী ও বিলাতী শিল্পসাধনার যথার্থ সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় না। বিলাতী ও দেশী চিত্রের সম্বন্ধ চিরকাল গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ নহে। বর্ত্তমান অবস্থায় দেশী চিত্রশিল্প বিলাতী চিত্র হইতে অনেক শিক্ষা ও দান গ্রহণ করিতে পারে। পক্ষান্তরে দেশী চিত্রশিল্প জীবন্ত ও সুপুষ্ট হইলে বিলাতী চিত্রকে অনেক নূতন তত্ত্ব শিখাইতে পারে। বিদেশী সাধনার অতিমাত্র পক্ষপাতী হইয়া আমরা দেশের চিত্রশিল্প অবজ্ঞা করিতে শিখিয়াছি, অথচ বিদেশী চিত্রের আলোচনায় আমরা এমন শিল্পশিক্ষা পাই নাই, যাহাতে দীনতা ও অপরিপক্কতার মধ্য হইতে আমাদের দেশের শিল্পের মূল্য চিনিয়া লইতে পারি,—তাহার অভাব, দোষ, ত্রুটী বুঝিয়া উঠিতে পারি। বিদেশী চিত্রের স্বাভাবিকতা, সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ-ক্ষমতা ইত্যাদি কয়েকটী বিশিষ্ট প্রকৃতি আমরা অতিমাত্র লুব্ধ চক্ষে দেখি এবং এই বিশেষত্বগুলি আমাদের চিত্রশিল্পে নাই দেখিয়া অনর্থক হতাশ হইয়া পড়ি এবং উক্ত বিশেষত্বগুলিকেই উচ্চশিল্পের অতি আবশ্যকীয় প্রকৃতি বলিয়া ধরিয়া লই। আমরা বিচার করি না যে বিদেশী শিল্পের বাহিক আকৃতি ও প্রকৃতি আমাদের শিল্পে ধার করিয়া লইলে তাহার চিত্রপদ্ধতির অনুরূপ হইবে কি না—ভারতীয় চিত্রপদ্ধতির সহিত খাপ খাইবে কি না—উহার জাতি নষ্ট হইবে কি না। দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছে অলঙ্কৃত হইলে এক অদ্ভুত পক্ষী হইয়া উঠে। বিলাতী চিত্রের সকল রীতি পদ্ধতি দেশী শিল্পের প্রকৃতির উপযোগী নহে। তথাপি পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান একবারেই অসম্ভব নহে। ভারতের চিত্রশিল্প ইতিপূর্ব্বে মুসলমানযুগে পারস্য চিত্রশিল্পের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া অনেক নূতন ভাব ও রীতি পরিপাক করিয়া লইয়াছে এবং তদ্দ্বারা অনেক সুপুষ্ট ও সম্পত্তিশালী হইয়াছে। পারস্য শিল্পরীতির অনেক ভাব এইরূপে আপনার করিয়া লইয়াছে বটে; কিন্তু তথাপি ভারতীয় শিল্পের জাতি নষ্ট হয় নাই, তাহার ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্ব পারস্য চিত্রপদ্ধতি মগ্ন করিয়া দেয় নাই। য়ুরোপীয় চিত্রাদি হইতে স্বাস্থ্যকর পুষ্টিকারী ভাবগুলি ভারতীয় চিত্রশিল্পে যান্ত্রিকভাবে কার্য্য না করিয়া উহা পরিপাক করিয়া স্বীয় রক্তমাংসের সহিত এক করিয়া লইতে পারিলে উত্তম বটে। কিন্তু সম্প্রতি উহার জীবনীশক্তির একান্ত অভাব, বাহিরের বস্তু হইতে রস টানিতে পারে এমন শক্তি নাই। শিশুরা স্বতন্ত্র শক্তিশালী দেহ প্রাপ্ত না হইলে মাতৃস্তন্যরসেই তাহাদের দেহ পুষ্টি করে, বাহিরের আহার্য্য হইতে আপনার জীবনোপযোগী রস আকর্ষণ করিতে পারে না। আমাদের দেশের চিত্রশিল্প এখন ঠিক এই শিশু অবস্থায় রহিয়াছে। এই ভাবে ভারতীয় শিল্প বিদেশী শিল্প হইতে খাদ্য আদায় করিতে পারে এমন স্বতন্ত্র জীবনীশক্তি নাই। এই জন্য বিলাতী চিত্রে আমাদের অনুকরণীয় শিক্ষণীয় অনেক ভাব থাকিলেও অন্ততঃ কিছুকালের জন্য বিদেশী চিত্রের আদর্শ আমাদের চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে হইবে। নতুবা বিদেশী আদর্শের চাপে আমাদের দেশের চিত্রপদ্ধতির স্থানচ্যুতি ও অস্তিত্বলোপ হইবে। য়ুরোপের শিল্প জীবন্ত শিল্প, নানারূপে নানা ভাবে তাহার সজীবতার পরিচয় দিতেছে—অসংখ্য প্রতিভাশালী ও শিক্ষিত ব্যক্তি উহার ইন্ধন যোগাইতেছেন—নানা নূতন ভাব ও চিন্তার আহার যোগাইয়া উহার প্রকাণ্ড কলেবর পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করিতেছেন। বিলাতী চিত্রশাস্ত্র যখন অন্য জাতির শিল্পপদ্ধতি হইতে রস গ্রহণ করে, তখন উহা বাহ্য পরিচ্ছদের ন্যায় শরীরের বাহিরে লাগিয়া থাকে না—স্বপ্রকৃতির উপযোগী বিশেষভাবগুলি আত্মসাৎ করে, আপনার প্রাণ ও শক্তির সহিত এক করিয়া লয়—তাহাতে তাহার জাতীয় মৌলিক আকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না।

ভারতের প্রাচীন শিল্পে সেকালের মনীষিগণের চিন্তা ও সাধনা ধারাবাহিকরূপে গ্রথিত; প্রাচীন প্রচলিত শিল্পের ভাষা উক্ত ভাবরাশি বহুদিন বহন করিয়া সেই ভাবগুলি

প্রকাশ করিবার একটা বিশেষরূপ উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। বিদেশী ভাষা অবলম্বন করিয়া দেশীয় ভাব দেশীয় ভঙ্গীতে প্রকাশ করা অসম্ভব। শিল্পের ভাষা জাতীয় চিন্তা ও ভাব প্রকাশ করিবার আধ্যাত্মিক ভাষা। প্রাচ্যভাব প্রাচ্যপ্রতিভার মধ্য দিয়া যেরূপ মূর্ত্তি গ্রহণ করে, বিদেশী প্রতিভার স্পর্শে তাহার বর্ণ, আকার ও আস্বাদ ভিন্ন হইয়া যায়। অনেকে হয় ত মনে করিবেন যে বিদেশী শিল্পের সহিত কোনরূপ যোগ রাখাই দেশী শিল্পের পক্ষে মারাত্মক। আমাদের চক্ষুকে শিল্পশিক্ষিত করিতে হইবে, চিত্রশাস্ত্রের বিষয়গত সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি (technique) তলাইয়া বুঝিতে হইবে, বিভিন্ন দেশের চিত্রাদি আলোচনা করিয়া সৌন্দর্য্যের বিভিন্ন আদর্শের উপলব্ধি করিতে হইবে। বিলাতে যখন জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রথম সূত্রপাত হয়, তখন বিলাতের বিশেষজ্ঞগণ কি পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, গ্রীক ও রোমক শিল্পাদর্শের কি পরিমাণ গ্রহণ করিয়াছেন কি পরিমাণ বর্জ্জন করিয়াছেন, বিলাতী চিত্রশিল্পের ইতিহাস অনুশীলন করিয়া তাহার তত্ত্বানুসন্ধান আবশ্যক। এ পর্য্যন্ত আমরা যে শ্রেণীর বিলাতী চিত্রে বিড়ম্বিত হইয়াছি তাহাতে আমাদের উপকার অপেক্ষা অপকার অধিক হইয়াছে—বিদেশী চিত্রপদ্ধতির সম্যক জ্ঞানও লাভ করি নাই। রুচিপ্রমাদ হেতু আমাদের দেশীয় চিত্রের সৌন্দর্য্য দেখিবার চক্ষুও হারাইয়াছি। এই কুৎসিৎ সংস্কার মুছিয়া না ফেলিলে আমরা দেশী শিল্পের উন্নতিকর কার্য্যের উপযুক্ত হইব না। চিত্রশিল্পের সংস্কার কার্য্য একপ্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা বিদেশী চিকিৎসকের দ্বারা হয় না। আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের মন্দিরে যখন ফাট ধরে, খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকে তাহার সংস্কার করিতে পারে না। ভারতের চিত্রশিল্পের সংস্কার ভারতের শিক্ষিত সন্তানগণের মুখাপেক্ষী।

দেশীয় শিল্পকে শক্তিমান ও সৌন্দর্য্যশালী করিতে হইলে, যদি আমাদিগকে বিদেশী আদর্শ আহ্বান করিতে হয়, তাহা আমাদের এমন ভাবে করা উচিত যাহাতে উহা আমাদের জাতীয় চিন্তাকে অলঙ্কৃত করে করুক, উহার উপর প্রভুত্ব না উহাকে স্থানচ্যুত না করে। জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে শ্রীমতী বেসান্টের উক্তি এ স্থানে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য:—

"The needs of India are among others the development of a national spirit: an education founded on Indian ideals and *enriched* not *dominated* by the thought and culture of the West."

য়ুরোপীয় চিত্রশিল্পে ভারতের যতই শিখিবার বিষয় থাকুক, বর্ত্তমান অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় য়ুরোপীয় শিল্প এখন ঘোরতর দুর্দ্দশাপন্ন ও দৈন্যগ্রস্ত—বিশেষজ্ঞগণের মতে ইহা যেমন ধর্ম্মভাবহীন তেমনই অন্তঃসারশূন্য, যেমন হৃদয়হীন তেমনই বাণিজ্যবুদ্ধি প্রণোদিত—সুতরাং মলিন ও আবিলতাপূর্ণ।* ইংরাজের শিল্পের আদর্শ যে অভ্রান্ত নয়, "ইরাণদেশের কাজিদের"ও যে ভুল হইতে পারে তাহা আমাদের ভাবিবার বিষয়।

---

* সম্প্রতি Nineteenth Century পত্রিকায় Hamilton Fyffe ইংরাজী শিল্প লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন:—

"Tried by this test [capacity to arouse noble emotion], the painters of to-day are condemned almost in bulk. How many are there whose work is inspired by noble emotion? Of skill in handling crushes, and in laying on of paint, there is no lack. Of any feeling behind the painter's hand and brain there is little trace in any of our exhibitions. Our painters might achieve nobly if they were commissioned to execute traditional subjects. Left to themselves they fall victims either to the Scylla of the Trivial or the Charybdis of the Vague. They have technical ability, but no ideas."

E. W. Cook ইংরাজী চিত্রশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে লিখিতেছেন:—

"An unprecedented state of things has arisen in the Art-world which baffles the judgment, throws criticism into chaos, and brings anarchy into Art . ... The goddess of Vulgarity is ousting the modest muse of Painting; and some of the narrowest doctrines that ever gained a moment's credence of the unthinking are preached as saving evangels. Standards are debased that mediocrity may pose as genius, and the untrained as masters, at a time when all standards should be raised to exclude the incompetent. Decadence is mistaken for progess . ... Fads fudge, and foolish fashions displace first principles and bewilder the public. In face of this incipient anarchy we drift, drift, and drift; nobody tries to grasp the situation and discern its tendency and significance ... ... what is said, here, of the pictorial arts applies, *mutatis mutandis,* to other branches of Fine Art."

আপাতরমণীয় সভ্যতার শিল্প যবনিকার অন্তরালে ইংরাজের আধ্যাত্মিক জীবন উৎকট অর্থকামুকতা ও তাহার আনুসঙ্গিক নানা রোগে জর্জ্জরিত, জাতীয় জীবনের উৎপত্তিস্থল —জাতীয় জীবনের বক্ষকোটর রজত মুদ্রার উৎকট ধবলিমায় দারুণ কুষ্ঠগ্রস্ত। Diderot বলিয়াছেন—"The moment an artist thinks of money he loses the sentiment of the beautiful"। য়ুরোপের ব্যবসায়বুদ্ধি জাতীয় সৌন্দর্য্যবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

ভারতীয় চিত্রশিল্পে য়ুরোপীয় আদর্শ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় শিল্পের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, এক্ষণে শিল্পের প্রচলিত আদর্শ কি এবং তাহার গতি কোন দিকে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য এই বিচার ও নির্ব্বাচনকার্য্য এমন কোনও কলাবিদ্ পণ্ডিতের দ্বারা হওয়া উচিত যিনি স্বদেশী আদর্শের প্রতি ভক্তিপরায়ণ অথচ বিদেশী চিত্রাদির গুণদোষ বিচার করিবার উপযুক্ত শক্তি ধারণ করেন।

এ সম্বন্ধে বিদেশী চিত্রপ্রথা প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ব্বে জাপান যাহা করিয়াছিল তাহা আমাদের আলোচনার যোগ্য। য়ুরোপ যেদিন তাহার চাকচিক্যময় আপাতরমণীয় শিল্পবিজ্ঞানাদি প্রতীচ্য সভ্যতার পণ্যদ্রব্য লইয়া জাপানের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করে, সেদিন জাপান ভারতের ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইয়া য়ুরোপের চরণে আত্মবিক্রয় করে নাই, তাহার প্রাচীন প্রাচ্য আদর্শের কষ্টিপাথরে, অতি শঙ্কিত ও সন্দিগ্ধচিত্তে, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল্য করিয়াছিল—বিদেশী উপহার নির্ব্বিচারে গ্রহণ করে নাই। জাপানের সরকারী শিক্ষাবিভাগ হইতে য়ুরোপীয় শিল্পাদির বর্ত্তমান অবস্থা কি তাহা নির্দ্ধারণার্থে এক কমিশন নিযুক্ত হয়। ঐ কমিশন দুই তিন বৎসরকাল য়ুরোপের শিল্পালোচনার নানা কেন্দ্রস্থলে ভ্রমণ করিয়া য়ুরোপের শিল্পাদির আভ্যন্তরিক অবস্থা ও আদর্শ সম্বন্ধে চাক্ষুষ জ্ঞান আহরণ করেন এবং তৎসম্বন্ধে এক বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশ করেন। টোকিও সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাব্যবস্থা উক্ত বিবরণীর মন্তব্য ও উপদেশ অনুসারেই হইয়াছে।

তিন বৎসর পূর্ব্বে হ্যাভেল সাহেব শিক্ষিত ভারতবাসীকে লক্ষ্য করিয়া যে খোলা চিঠি লিখিয়াছিলেন পাদটীকায় তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম।*

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

"I fear that few educated Indians really unde stand what Indian Art is and has been; to see it o must go to other places than the great commerci centres of India, infected as they are with the grc materialism of modern Europe. To understar Indian Art, it is necessary to know something of past achievements, but I want mostly to interest y in the Indian Art of the present day, which to India shame be it said is slowly dying through the negle and indifference of Indian people. You may say th Government might do a great deal more to kee alive the art of the country. I myself have contin ally pointed out that the well-intentioned efforts ma by Government to encourage Indian Art generally more harm than good. The export trade in so-call Indian Art-productions, which the Government t to develop, is certainly dragging Indian Art dow to the same level as the modern commercial art Europe. I have no faith in art exhibitions, a museums or schools of art as agencies for preservi or stimulating the spirituality of Indian Art. Th is the concern of the people of India and theirs alon You do not expect Government to understand a aid you in your religious movements. Why shou you expect them to understand and keep alive yo art? Even supposing that Government did all th might possibly be done, it would not be the tho sandth part of what you could do yourselves. Th living art of India is crying to you in a voice of whi you, and you alone, can understand the meanin If you, who are India's children, will not listen her voice, how can you expect that English peo should do so? What I most want to impress up you is, that in the living art of India you hav priceless possession, because it still retains the spirit ality which modern European Art has almost entir lost. It will be a lasting shame to the present gener tion of Indians if the spiritual inheritance which yo fore-fathers have bequeathed to you is lost for ev through your indifference.........."—E. B. Havell, An open letter to Educated Indians, 1st August, 1903

কোহিনুর।

যে জগদ্বিখ্যাত হীরক আজ ইংলণ্ডেশ্বরের মুকুটের শ্রেষ্ঠরত্ন, উহা একদিন হতভাগিনী পরপদদলিতা হৃতসর্ব্বস্বা ভারত-মাতার রত্নভাণ্ডার উজ্জ্বল করিত! আজ উহা বিদেশীর করতলগত। এ অমূল্য রত্ন কালচক্রের আবর্ত্তনের সহিত অনেক নৃপতির ভাগ্যবিপর্য্যয় দেখিয়াছে—অনেক বিজিত নৃপতির কবল হইতে সৌভাগ্যশালী বিজেতার সৌভাগ্যশ্রী বর্দ্ধিত করিয়াছে।

অনেকের ধারণা ইহা আমাদের পুরাণবর্ণিত স্যমন্তক মণি। এই স্যমন্তক মণির কথা শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতি অনেক পুরাণে বর্ণিত আছে। আমাদের এ প্রবন্ধে সে আখ্যান সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিবার অবসর হইবেনা; সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা এখানে অনুসরণ করিব।—"সূর্য্যভক্ত সত্রাজিৎ সূর্য্যোপাসনার দ্বারা এই অমূল্য মহারত্ন লাভ করিয়া সেই মণিকে কণ্ঠে বন্ধন করিয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি-শালী হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করেন। মণির প্রচণ্ড তেজে সত্রাজিৎ বলিয়া কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিলনা। দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া জনগণের দৃষ্টিরোধ হইল। পরে দ্বারকাবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের নিকট যথার্থ তথ্য অবগত হইলেন। সত্রাজিৎ মঙ্গলময় গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ-গণ দ্বারা দেবগৃহে মণি স্থাপন করিলেন।" সময় ক্রমে এ মণিরও বহু ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতের নিকট এ মণি প্রার্থনা করেন; কিন্তু 'অর্থকামুক' সত্রাজিৎ সে কথা প্রথমে গ্রাহ্য করেন নাই। পরে একদা সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন ঐ মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে মৃগয়ার্থ প্রবেশ করেন ও এক সিংহহস্তে নিহত হন। জাম্ববান রত্নলোভে সিংহকে বিনাশ করেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে মণি প্রার্থনা করিয়া প্রাপ্ত হন নাই শ্রীকৃষ্ণই যে প্রসেনকে বধ করিয়া উক্ত মণি আত্মসাৎ করিয়াছেন সত্রাজিতের মুখ হইতে, জনসমাজে ভগবানের এ অপযশ ক্রমশঃ প্রচারিত হইল। এই অপযশ দূরীকরণার্থ ভগবান্ ভল্লূকরাজ জাম্ববানের "নিবিড়ান্ধকারাচ্ছন্ন ভয়াবহ গর্ত্তে" প্রবেশ করিয়া যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাহার দুহিতা জাম্ববতী ও এই মণি [illegible] প্রাপ্যস্বরূপ প্রাপ্ত হন ও সত্রাজিৎকে উহা প্রত্যর্পণ করেন। জনসমাজে মিথ্যাপবাদ রটাইয়াছিলেন বলিয়া অনুতপ্তচিত্ত সত্রাজিৎও ভগবানকে নিজ পূর্ব্বকৃত অপরাধ ক্ষালনার্থ এ মণি ও স্বীয় সুন্দরী তনয়া সত্যভামাকে ভগবানের হস্তে অর্পন করেন। ইহাই "কোহিনূরের" পৌরাণিক ইতিহাস। প্রাচীনেরা এ মহারত্ন বিশেষ শুভ-ফলদায়ক বিবেচনা করিতেন; শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বোদ্ধৃত আখ্যানে তাহা প্রকাশ। মহর্ষি শুক পরীক্ষিতকে ইহার সুলক্ষণের কথায় বলিতেছেন যে "মহারাজ! সেই মণি পূজিত হইয়া যে স্থানে থাকে তথায় প্রতিদিন অষ্টভার (৮০০ তোলা) স্বর্ণপ্রসব করে। এবং তথায় দুর্ভিক্ষ, অকাল-মৃত্যু, সর্প, ব্যাধি প্রভৃতি অশুভ ও মায়াবী সকল নষ্ট হয়।" *

'কোহিনূরের' ইতিহাস লেখকগণের মধ্যে কোন কোন এদেশী লেখককে এ মণির সহিত 'কোহিনূরের' ঐক্য সংস্থাপন করিতে যত্নবান দেখিতে পাই! কিন্তু এ কথার ঐতিহাসিক ভিত্তি নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। অনেকে সম্রাট্ বাবরের হীরক ও কোহিনুর এক বলিয়া বিস্তর বাদানুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ভারতভ্রমণকারী বিখ্যাত ফরাসী পর্য্যটক ও রত্নবণিক ট্যাভার্নিয়েরর ভ্রমণকাহিনীর ইংরাজী অনুবাদক বল্ সাহেব এ বিষয় লইয়া বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক সে স্থলে এ বিষয়সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাইবেন। আমরা সে বাদবিতণ্ডার পুনরালোচনা এস্থলে বিশেষ আবশ্যক বোধ করিনা। এজন্য সে সব তর্ক পরিত্যাগ করিয়া আমরা 'কোহিনূরের' ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করিব।

এ বিষয়ে আলোচনা করিলে মোগল সম্রাটদের সময় হইতেই যে এই মহারত্নের প্রথম উল্লেখ, একথা জানিতে পারা যায়। শাহ জাহানের রাজত্বের শেষভাগে ও আওরঙ্গ-জেবের রাজত্বের প্রারম্ভে যে তিন জন বিদেশী পর্য্যটক এদেশের তদানীন্তন সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই এই মহারত্নের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নাম মেনুষী বর্ণিয়ে ও ট্যাভার্নিয়ে। তন্মধ্যে ট্যাভার্নিয়ে নিজে রত্নবণিক, ও কথিত আছে যে আওরঙ্গজেবের নিজের রাজকোষের মণি-

* শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৫২ অধ্যায়। এবং স্যমন্তকোপাখ্যান। ("হিতবাদী" প্রকাশিত অনুবাদ।)

মাণিক্যের মূল্য ও মহার্ঘতা নিরূপণ করিতে তিনি রাজধানীতে সমাহুত হন। সুতরাং এবিষয়ে তাঁহার মতই আমাদিগের সমধিক শ্রদ্ধার যোগ্য। তজ্জন্য তাঁহার ভ্রমণকাহিনীর উপসংহারে তাঁহার গ্রন্থের অনুবাদক বল্ সাহেব এসম্বন্ধে যে উৎকৃষ্ট সারসংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন সেই বর্ণনা অবলম্বন করিয়া প্রধানতঃ এ প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।

কোহিনূর আবিষ্কারের যথার্থ তারিখ জানা দুঃসাধ্য। তবে ট্যাভার্নিয়ে বলেন যে বিখ্যাত মোগল সেনাপতি মীর জুম্লা সম্রাট শাজাহাঁকে এ মহারত্ন উপঢৌকন দিয়াছিলেন (ষ্টুয়ার্ট বলেন আওরঙ্গজেবকে এ রত্ন প্রদত্ত হইয়াছিল)। মীর জুম্লা তখন গোলকুণ্ডাধিপতি সুলতান আবদুল্লা কুতবশাহের অধীনে এক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। রাজ্যের আম্‌দানী ও রপ্তানীর অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত হইয়া দেশ বিদেশ হইতে সমাগত বহুবিধ মহার্ঘ দ্রব্যের রক্ষাকর্ত্তা হইয়া নিজে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। মেনুষীর ফরাসী অনুবাদক কাএ বলেন যে পাছে প্রভুর কোপে পতিত হন এজন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে য়ুরোপ হইতে সমাগত নানাবিধ বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার, চীনদেশীয় রত্নপ্রকোষ্ঠ, সিংহল হইতে সমানীত গজরাজি উপঢৌকন দিয়া গোলকুণ্ডাধিপতির মনস্তুষ্টি সংসাধন করিতে হইত। কিন্তু বহুদিন ধরিয়া প্রভু ও ভৃত্যের পূর্ব্বের সদ্ভাব আর রহিলনা। অসন্তোষের কারণের সম্বন্ধেও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ষ্টুয়ার্ট বলেন যে মীর জুম্লার পুত্র মীর মহম্মদ আমীন, যাহাকে মীর জুম্লা নিজের অনুপস্থিতিতে গোলকুণ্ডার রাজসভায় প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার ও মীর জুম্লার অতুল ধনৈশ্বর্য্যে হিংসা পরবশ হইয়া গোলকুণ্ডা রাজ মীর জুম্লার উপর জাতক্রোধ হন। ট্যাভার্নিয়ে বলেন যে সুলতানের মাতার সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হওয়াতে সুলতান পাছে এ কলঙ্ককাহিনী সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে এজন্য মীর জুম্লাকে সুদূর কর্ণাটকে প্রেরণ করেন, ও সে অবধি শেষোক্ত ব্যক্তি সুলতানের বিরাগ ভাজন হয়। সত্য যাহাই হউক, এ চতুর পারসীক এ অবস্থায়ও প্রাজ্ঞের ন্যায় স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে বিরত হন নাই। কর্ণাটকের শাসন কর্ত্তারূপ নূতন পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে গোলকুণ্ডার হীরকখনি তাঁহার শাসিত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি এ খনি হইতে অনেক মহার্ঘ রত্ন সংগ্রহ করিয়া স্বীয় ধনভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন। কিন্তু যে অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ড মোগল সম্রাট শাহজাঁহাকে উপঢৌকন প্রদত্ত হয় তাহা ঔজ্জ্বল্যে আকারে ও মহার্ঘতায় জগতে অতুল্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ঠিক কোন সালে এ মণি প্রথমে আবিষ্কৃত ও আহরিত হয় সে কথা অজ্ঞাত। তবে রত্ন-বণিক ট্যাভার্নিয়ে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কৌতূহলপ্রদ ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, প্রথমে তিনি ১৬৬৫ খৃঃ মোগল-রাজকোষে সম্রাট্ অওরঙ্গ্‌জেব কর্ত্তৃক এ মণি পরীক্ষা করিতে আহুত হন। যেরূপে মোগল সম্রাট্‌দের রত্নভাণ্ডারে এ মহারত্ন সমানীত হয় তাহার ইতিহাস বিচিত্র ও কৌতূহলো-দ্দীপক। ট্যাভার্নিয়ে যে হীরকখণ্ড দেখিয়াছিলেন সেখানিই জগদ্বিখ্যাত ‘কোহিনূর’ কি না এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও রত্নবণিকদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে এ কথা আমরা ইঙ্গিতমাত্র করিয়াছি। কারণ সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান নাই ও এস্থলে সে সব কূট তর্কের সুদীর্ঘ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক বোধ করি। কৌতূহলী পাঠক সে সব তর্কের আলোচনা ও মীমাংসা পূর্ব্বোক্ত বল্ সাহেবের গ্রন্থের উৎকৃষ্ট পরিশিষ্টে দেখিতে পাইবেন। এখানে এ কথা মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমরা ট্যাভার্নিয়ে কর্ত্তৃক পরীক্ষিত রত্নখানি ‘কোহিনূর’ বলিয়া অনুমান করিয়াছি। এক্ষণে এখানি মোগলরাজকোষে কিরূপে আসিল সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। বাঙ্গালার ইতিহাস লেখক ষ্টুয়ার্ট স্বকৃত ইতিহাসে মোগল-রাজপ্রতিনিধিদের মধ্যে মীর জুম্লার যে ইতিহাস দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে যখন মীর জুম্লা সুদূর কর্ণাটকে শাসনকর্ত্তারূপে গোলকুণ্ডাধিপতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হন, তখন তাঁহার পুত্র মহম্মদ আমীনকে রাজসভায় প্রতিভূস্বরূপ রাখিয়া যান, এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পিতার ঐশ্বর্য্য ও গর্ব্বে মহম্মদ এতদূর মদান্ধ হইয়া রাজসভায় এমন উচ্ছৃঙ্খল ও অসম্মানসূচক ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, রাজসভাসদ সকলেই তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। কথিত আছে যে, উত্তরোত্তর তাঁহার দুঃসাহস এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তিনি মত্তাবস্থায় রাজদরবারে উপস্থিত হইতে সঙ্কুচিত হইতেন না। এমন কি ঐ [illegible]

একদিন সুল্‌তানের মস্‌নদের উপরেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। এ অসহ্য বেয়াদবির কথা সুল্‌তানের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি মহম্মদকে কঠোরভাবে ভর্ৎসিত ও ভবিষ্যতে তাঁহার সমক্ষে যেন না আসেন এরূপ আদেশ করেন। মীর জুম্লা এ সংবাদ পাইয়া সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন যে তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার গুপ্তশত্রুরা সুল্‌তানের নিকট তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদা নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। এখন মোগলসম্রাটের আশ্রয়ভিক্ষা ব্যতীত তাঁহার আর গত্যন্তর নাই। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে শাহজাদা অওরঙ্গ্‌জেবও তখন দাক্ষিণাত্যে বাদশাহী সেনানায়ক স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। চতুর মীর জুম্লা এখন হইতে তাঁহার সহিত মৈত্রী সংস্থাপনা করিবার অবসর খুঁজিতেছিলেন ও ক্রমে এ প্রয়াসে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। শাহজাদা অওরঙ্গ্‌জেবের সুপারিষে মোগল-দরবার হইতে তাঁহাকে পাঁচহাজারি মন্সব্‌দার ও তাহার পুত্র মহম্মদকে দুই হাজারি মন্সবদারের পদে নিয়োগপত্র ও অবিলম্বে যেন তাঁহাদের উভয়কে অব্যাহতি দেওয়া হয় এই মর্ম্মে গোলকুণ্ডাধিপতির উপর বাদশাহী পরোয়ানা আসিয়া পৌছিল।

সুল্‌তান কুতুবশাহ বেগতিক দেখিয়া মহম্মদ আমীনকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার পিতার সমস্ত সম্পত্তি যাহা পাইলেন কাড়িয়া লইলেন। এই অপরিণামদর্শিতার ফলে অওরঙ্গ্‌জেবের পুত্র মহম্মদের অধীনে একদল সেনা তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হয় ও সুল্‌তানের রাজ্য তেলিঙ্গানাকেবিধ্বস্ত ও উৎখাত, এবং হায়দ্রাবাদনগরীকে লুণ্ঠিত করায় সুল্‌তান নিজ কন্যার সহিত অওরঙ্গ্‌জেবের পুত্র মহম্মদের বিবাহ দিতে স্বীকার করিতে বাধ্য হন। উপরন্তু প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপও তাঁহাকে মোগল রাজকোষে দিতে হইল।

এদিকে মীর জুম্লা মোগলশিবিরে মহম্মদের নিকট মহা সমাদরে গৃহীত ও উভয়ে অওরঙ্গ্‌জেবের নিকট উপনীত হইলেন। অওরঙ্গ্‌জেব তাঁহাকে পরম যত্নে দিল্লীশ্বরের নিকট লইয়া উপস্থিত হন। ষ্টুয়ার্টের মতে মীর জুম্লা শাহ্‌জাঁহাকে দুই লক্ষ ষোল হাজার মুদ্রা মূল্যের একখণ্ড হীরক ৬০টা হস্তী ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া প্রায় ষোল লক্ষ মুদ্রা মূল্যের দ্রব্যসম্ভার তাঁহাকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে ছয়হাজারি মন্সবদার, দেওয়ান প্রভৃতি যে সব উচ্চ সম্মান প্রদত্ত হয়, উপস্থিতক্ষেত্রে সে সব কথার আলোচনার প্রয়োজন নাই।

এই বহুমূল্য হীরকখণ্ডই ইতিহাসপ্রথিত কোহিনূর। তবে ইহার মূল্য সম্বন্ধে ষ্টুয়ার্ট ভ্রমে পড়িয়াছেন। মীর জুম্লার প্রদত্ত এই হীরকখণ্ডই যদি কোহিনূর হয় ও সেখানিই যদি অওরঙ্গ্‌জেবের অনুরোধে ১৬৬৫ খৃঃ ট্যাভার্নিয়ে কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া থাকে তবে তাহার মূল্য ষ্টুয়ার্টলিখিত এই মণির অপেক্ষা বহুমূল্য হওয়াই সম্ভব। কোহিনূরের ওজন ও মূল্যের সম্বন্ধে আমরা পরে নির্দ্ধারণ করিব। এখন ইহার ভাগ্যান্তরের কথা বলিয়া যাই। ১৭৩৯ খৃঃ এই মহামণি অওরঙ্গ্‌জেবের অক্ষম উত্তরাধিকারী মহম্মদ শাহের ক্ষীণ হস্ত হইতে নাদিরশাহ কর্ত্তৃক দিল্লী লুণ্ঠন সময়ে লুণ্ঠিত হয়। কথিত আছে যে, এই লুণ্ঠনে তিনি প্রায় ৭০।৮০ কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ ১২০০ কোটী মুদ্রা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান!* ইহাতেই ভারতবর্ষের স্বপ্নাতীত ধনবৈভবের কতক অনুমান করা যায়। কত শত বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন বিদেশীয় তস্করেরা কত ছলে কত মূর্ত্তিতে ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কোথায়? এখনও সে কার্য্য স্থগিত হয় নাই! কবে যে হইবে একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন! যাহা হউক কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। কোহিনূরের ভুবন-বিখ্যাত ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া মুগ্ধচিত্ত নাদিরশাহ ইহাকে "কোহিনূর" (আলোক-শৈল) এই নাম প্রদান করেন।

১৭৪৭ খৃঃ যখন খোরাশান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত কিলাট নগরীতে নাদিরশাহ হত হন, তখন কোহিনূর তাঁহার পৌত্র শাহরুখের ধনভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে। মীর আলম খাঁ ওরফে আগা মহম্মদ এই কোহিনূরের লোভে শাহরুখকে মেশেদ্‌ নামক স্থানে কারারুদ্ধ করিয়া নানা প্রকার যন্ত্রণা প্রদান করেন। কিন্তু এতাদৃশ শারীরিক ও মানসিক কষ্টেও তিনি উক্ত অমূল্য রত্নকে হস্তান্তর করিতে সম্মত

* হণ্টার সাহেবের মতে এই লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ ৩২ কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ ৪৮০ কোটীরও উপর টাকা। See his Imp. Gazetteer Vol. VI, p. 314.

হন নাই। ১৭৫১ খৃঃ কাবুলে দুরানি বংশের স্থাপয়িতা আহম্মদশাহ শাহরুখ্‌কে সাহায্য করিবার জন্য ইহা পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ক্রমে ইহা আহম্মদের পুত্র তৈমুরের হস্তে আসে ও ১৭৯৩ খৃঃ তৎপুত্র শাহ জমান ইহা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন। কিন্তু রাজ্য ও ধনসম্পত্তির কি দুস্তর মোহ! ঐশ্বর্য্যমদমত্ত মানবদের হিতাহিত বুদ্ধিও তিরোহিত হয়, ঐরূপ দশাগ্রস্ত লোকের পৃথিবীতে কোন কুকার্য্যই দুঃসাধ্য বলিয়া বিবেচনা হয় না! তৈমুরের তিন পুত্র—শাহ জমান্, শাহ মহম্মদ ও শাহ সুজা। শাহ জমানের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার রাজ্যের ও রাজকোষের শ্রেষ্ঠতম রত্ন কোহিনূরের লোভে শাহ মহম্মদ অগ্রজ শাহ জমানকে সিংহাসন হইতে বিতাড়িত ও তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করান। এই বিজাতীয় যন্ত্রণায়ও শাহ জমানের নিকট হইতে কোহিনূর গৃহীত হইতে পারে নাই। দুই বৎসর পরে সুলতান শাহ সুজা কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভ্রাতা মহম্মদকে বন্দী করেন ও পরে মহম্মদ যখন কারামুক্ত হইয়া সিংহাসনে পুনরধিরোহণ করেন তখন তাঁহার ভয়ে শাহ জমান ও শাহ সুজা পলাইয়া গিয়া পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের শরণাগত হন।

১৮১২ খৃঃ এই ঘটনা সংঘটিত হয়। রণজিৎ সিংহ উভয় ভ্রাতাকে আশ্বস্ত করেন। কোহিনূরের বিনিময়ে সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে পুনরধিকার ও তাঁহার স্ত্রীকে মহম্মদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া দিবেন এরূপ প্রতিশ্রুত হন। এ স্থলে বল্ সাহেবের সংগৃহীত বিবরণ কিছু অস্পষ্ট। শাহ জমান্ এরূপে আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়াই হউক আর উপায়ান্তর নাই বুঝিয়াই হউক এ মহারত্ন মহারাজকে উপহার দিতে বাধ্য হন। শিখজাতির ইতিহাসলেখক সত্যনিষ্ঠ সহৃদয় কনিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন যে স্বেচ্ছায় শাহ জমান রণজিৎকে ইহা প্রদান করেন।

১৮১৩ খৃঃ শাহ জমান্ শাহ সুজা লাহোর হইতে পলায়ন করিয়া বাজোরী নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া আশ্রয় লাভ করেন। এই পলায়নকাহিনীর কথা পড়িলে স্বেচ্ছায় কোহিনূর দানের কথাতে বিশ্বাস শিথিল হয়। যাহা হউক এ স্থল হইতে নানাবিধ দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় লুধিয়ানা সহরে আসিয়া উপনীত হন। তথায় মাননীয় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিবর্গ কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হন ও তাহাদের পদমর্য্যাদানুরূপ একটী প্রচুর বৃত্তি (পেন্সন) তাহাদিগকে প্রদত্ত হয়। বল্ সাহেব বলেন যে এ সব বর্ণনা জেনারেল্ শ্রীমান্ লিখিত বর্ণনা হইতে সংগৃহীত। জেনারেল শ্রীমান্ আবার এ কথা লুধিয়ানার ইংরেজ ফৌজের তদানীন্তন অধিনায়ক জেনারেল স্মিথের লিখিত ঘটনা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। স্মিথ্ সাহেব এ ঘটনা স্বয়ং বৃদ্ধ অন্ধ নৃপতি শাহ জমানের প্রমুখাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শ্রুত হন। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের শাসন সময়ে ১৮৩৯ খৃঃ শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসন প্রদান করা হয়।

মহারাজ রণজিৎসিংহের বাহুতে যে অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ড শোভা পাইত তাহাই ট্যাভার্নিয়ে বর্ণিত কোহিনূর এ সম্বন্ধে তৎসাময়িক লেখকবর্গের এবং দিল্লীর ও কাবুলের রত্নবণিকদের মধ্যে মতভেদ নাই। তদানীন্তন অনেক ইংরাজ পর্য্যটক ইহার বর্ণনা করিয়াছেন যে রণজিৎ সিংহ ইহা সচরাচর পারধান করিতেন না। বিশেষ প্রকাশ্য দরবারে ধারণ করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের মতে এ সময় ইহার ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষাকৃত ম্লান বোধ হইত। ইহার ওজনও প্রায় ৭৩ রতি (৮৩ ক্যারাট) ন্যূন হইয়া গিয়াছিল। বল্ সাহেব অনুমান করেন যে শাহ জমান্ শাহ রুখ্ বা সাহ সুজা এই ব্যক্তিত্রয়ের মধ্যে যে কেহ অবস্থাবিপর্য্যয়ের সময় অর্থের অনাটন প্রযুক্ত এ মণির অংশ কর্ত্তন ও বিক্রয় করিয়া নিজের অভাব দূর করিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে কোন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ রণজিৎকে ইহার মূল্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে মহারাজা রণজিৎ সিংহ তদুত্তরে ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলেন যে "ইস্‌কে কিমৎ পাঁচ জুতি।" মহারাজের কথার মর্ম্ম এই যে ইহা চিরকালই বিজেতার প্রাপ্য পুরস্কার স্বরূপ চলিয়া আসিতেছে কেহ ইহা মূল্য দিয়া ক্রয় করে নাই। অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে অনেকে এ কথার অবতারণা করিয়াছেন কিন্তু আমরা শ্রীম্যান্, কনিংহাম্, ষ্টাইন্‌ব্যাক্, স্মিথ্ প্রভৃতি শিখজাতির ও রণজিৎ সিংহের জীবনী লেখকদের গ্রন্থে অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু এ কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি অন্বেষণ করিয়া পাইলাম না। হয়ত আমাদের অনুসন্ধানের ত্রুটী থাকিতে পারে।

১৮৩৯ খৃঃ মৃত্যুশয্যাশায়ী রণজিৎ সিংহ তাঁহার মৃত্যুর পর



রাজা রবিবর্ম্মা

Kuntaline Press, Calcutta.

পুরুষোত্তমে ৺জগন্নাথ দেবের সেবার্থ এ মণি যাহাতে প্রেরিত হয় এরূপ আদেশ দিয়া যান। কিন্তু ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য ক্রমে এ আদেশ নানা কারণে কার্য্যে পরিণত হয় নাই। দুর্ভাগ্য ক্রমে এ জন্য বলিতেছি যে, এরূপ প্রেরিত হইলে ঐ জগদ্বিখ্যাত রত্ন আজ আর সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বিদেশীর রত্নকোষ সমৃদ্ধতর করিতে পারিত না। ইহা পঞ্জাবের রাজকীয় রত্নপ্রকোষ্ঠে সযত্নে রক্ষিত হয়। রণজিতের শিশু পুত্র দলীপ সিংহ সাবালক হইয়া পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন ইহা তাঁহার হস্তে আসে।

১৮৪৯ খৃঃ পঞ্জাব যখন ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়, তখন এ রত্ন নবনিযুক্ত গর্ভমেণ্টবোর্ড নামীয় শাসনসভার হস্তে অর্পিত হয়। উক্ত সভা অবিলম্বে ইহা স্যারজন্ (পরে লর্ড) লরেন্সের হস্তে ইহাঁর জিম্মায় সমর্পণ করেন। আদেশ রহিল যে, ইহা সত্বরে যেন মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নিকট প্রেরিত হয়। লরেন্স্ এ রত্ন একটী ক্ষুদ্র টীনের বাক্সে রাখিয়া নিজের কোট পকেটে ফেলিয়া রাখিয়া ইহার কথা আদৌ ভুলিয়া যান। ছয় সপ্তাহ পরে যখন এ বিষয়ে তাগিদ আসে তখন সাহেবের চক্ষু স্থির। কি বিষম সর্ব্বনাশ! নিজের অনবধানতা বশতঃ এ মহামূল্য রত্ন যদি তিনি হারাইয়া ফেলিয়া থাকেন তবে তাঁহার অকিঞ্চিৎকর প্রাণের বিনিময়েও যে ইহার মূল্যের পরিশোধ হইবে না! সাহেব উর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে দৌড়িলেন। গিয়া নিজের ভারতীয় ভৃত্যকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে সে উক্ত বাক্সটী বাহির করিয়া দিল। নষ্ট দ্রব্যটী আশাতীত ভাবে প্রাপ্ত হইয়া মহা আশঙ্কা দূর হওয়াতে তাঁহার দেহে যেন পুনর্জীবন সঞ্চার হইল। লরেন্সের জীবনী লেখক স্মিথ্ বলেন যে এ দেশের (ভারতের) ভৃত্য দ্রব্যের মূল্য না বুঝিয়াও যেমন ছাইপাঁস খড়কুটা যাহা পায় তুলিয়া রাখে এ রত্নও সেরূপ তুলিয়া রাখিয়াছিল। স্মিথ্ সাহেবের এ কথার উত্তরে আমাদের ইহাই বক্তব্য যে, যে ভারতীয় ভৃত্যের নির্ব্বোধ সাবধানতার বিরুদ্ধে, সাহেব একটু কটাক্ষ করিয়াছেন, উপস্থিত ক্ষেত্রে সে নির্ব্বুদ্ধিতা লরেন্সের পরম সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছিল, নচেৎ সাহেবকে বিষম বিপদে পড়িতে হইত তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই!

প্রদর্শিত হয়। ঐরূপ প্রদর্শিত হইবার পূর্ব্বে উহা মেসার্স গ্যারার্ড নামক প্রসিদ্ধ রত্নবণিককে শাণ যন্ত্রে আরোপিত করিবার জন্য প্রদত্ত হয়। এমাষ্টার্ডামের কষ্টিরের নামক বিখ্যাত রত্নশ্রেষ্ঠার কারখানার প্রধান শিল্পী ভসেঞ্জার এ শাণ কার্য্যে নিযুক্ত হন। এ কার্য্য ৩৮ দিনে সমাপ্ত হয়। শাণ যন্ত্রে আরোপিত হইবার পর ইহার ১০৬১৬ ভাগ কমিয়া যায়। (১ রতি = ১ ক্যারাটের ⅞ ভাগ।) প্রায় লক্ষ টাকা (৮০০০ পাউণ্ড) এ কার্য্যে ব্যয়িত হয়।

প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা কোহিনূরের মূল্য ও ওজনের সম্বন্ধে কিছু বলিব। এ সম্বন্ধেও বল্সাহেব বাবর ও মোগলদের অন্যান্য হীরকের সহিত ওজন আকার ও মূল্যের তুলনা মূলক তালিকা দিয়া সুদীর্ঘ গবেষণা করিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে সে আলোচনা এস্থলে উদ্ধৃত করিলে সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিবে। এজন্য ও অনাবশ্যক বোধে সে সব নীরস তর্ক পরিত্যক্ত হইল। তবে তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে ইহার মূল্য ২ লক্ষ ১৬ সহস্র মুদ্রা (ইলিয়ট্) হইতে ১ কোটি মুদ্রা পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়াছে। রণজিৎ সিংহের রাজকোষ হইতে যখন ইংরাজরাজ এ মণি আহরণ করেন তখনও ইহার মূল্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ মুদ্রারও উপর!! ইহাতেই ইহার সাবেক মূল্য কত ছিল অনুমান করা যাইতে পারে। ইলিয়ট্ বাঙ্গালার ইতিহাসে বলিয়াছেন যে অওরঙ্গ্জেবের প্রীতি-বিধানার্থ যে সব মহামূল্য উপহার মীর জুম্লা প্রদান করেন তাহার মধ্যে একখণ্ড হীরকের মূল্য ২ লক্ষ ১৬ সহস্র মুদ্রা। অনেকে মনে করেন, ইহাই কোহিনূর। যদি তাহাই হয়, তবে ইলিয়ট ইহার মূল্য সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন সন্দেহ মাত্র নাই। কারণ ইংরাজেরা যখন ইহাকে শাণ যন্ত্রে পালিশ করিতে দেন সে খরচ প্রায় লক্ষমুদ্রা লাগিয়াছিল। তাঁহারা ২ লক্ষ মুদ্রার দ্রব্যে সখের খাতিরে যে ১ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিবেন তাঁহারা এরূপ অদূরদর্শী নহেন। ১৬৬৫ খৃঃ ট্যাভার্নিয়ে প্রথমে এখানি দেখিতে যান, তখন ইহার ওজন ৩১৯½ রতি (২৬৮$\frac{7}{16}$ ইংরাজি ক্যারাট্)। যখন প্রথমে কোল্লুরের হীরকখনি হইতে ইহা পাওয়া যায়, তখন ইহার সাবেক ওজন ৯০০ শত রতি ছিল। তাহার পর মোগল রাজত্ব কালীন হোরটেনশিও বর্জিও নামধারী

ইহার অপব্যবহার করিয়া ইহাকে ৩১৯২/ রতিতে দাঁড় করাইয়া ছিলেন। ইংরাজরা শাণ দেওয়াইয়া ইহাকে ১০৬১/৬ ক্যারাটে দাঁড় করাইয়াছেন! যদিও আয়তনে জগতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ হীরকের অপেক্ষা কম, তথাপি ঔজ্জ্বল্যে এখনও ইহা অমূল্য।*

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

মহাভারতের প্রকৃতি।

লিপিকৌশল জানা থাকিলেও শ্রুতি এবং পুরাণেতিহাসাদি কণ্ঠস্থ রাখিবার রীতি অত্যন্ত প্রবল ছিল, এবং এখনও কিয়ৎ পরিমাণে আছে। হইতে পারে যে, প্রথমতঃ অক্ষরের সৃষ্টি হয় নাই বলিয়া, অথবা প্রকৃষ্ট উপায়ে লিখিত ভাবে সাহিত্য সুরক্ষিত করিবার সুবিধা ছিলনা বলিয়া, সমগ্র শাস্ত্র কণ্ঠস্থ রাখিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; এবং লিপি-কৌশল ও উপযুক্ত উপকরণের আবিষ্কারের পরেও প্রাচীন প্রথা পরিত্যক্ত হয় নাই। বেদাদি শ্রুতিসাহিত্য লিখিয়া রাখিলে অন্যলোকে তাহা অধ্যয়ন করিতে পারিবে, এবং তাহা হইলে শ্রুতিব্যবসায়ী বিশেষজাতির বিশেষত্ব চলিয়া যাইবে, কেবল এই ভয়েই ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রাদি লিপিবদ্ধ হইতে দিতেন না, এ কথা ঠিক বলিয়া মনে হয় না।

প্রথমতঃ দেখুন, যে বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের পাঠের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল; শ্রমণেরা উহা কদাপি নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া লুক্কায়িত রাখিতে চেষ্টা পান নাই; অথচ ত্রিপিটক, গ্রন্থরূপে সঙ্কলিত হইবার পরেও, শ্রমণ, ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীরা বর্ষা-কালে উহা কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করিতেন। অতি প্রাচীন (খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর) বিনয় পিটকে এবং নিকায়ে লিপিজ্ঞানের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে; এবং উহা অপেক্ষাও প্রাচীন নিরুক্তে "গ্রন্থের" উল্লেখ পাওয়া যায়; তথাপি অনেক পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থবদ্ধ হয় নাই। খুদ্দক নিকায়ের মধ্যে থের-থেরী গাথা ও অপদান প্রভৃতি গ্রন্থ, একবার ত্রিপিটক সঙ্কলিত হইবার পরেও গ্রন্থরূপে ত্রিপিটকে যোজিত হইয়াছিল। ঐ সকল গাথা প্রাচীন; এবং লোকে উহা কণ্ঠস্থ রাখিয়াই চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু পরে আবার উহা লিপিদ্বারা গ্রন্থবদ্ধ হইল। ঐবিষয়ে ধর্ম্মপাল তাঁহার পরমত্থ দীপনী টীকায় লিখিয়াছেনঃ—"তাহি (থেরীগণ) উদানাদি বসেন, তত্থ তত্থ ভাসিতা গাথা পচ্ছা সঙ্গীতি কারকেহি একজ্ঝং কত্বা একনিপাতাদি বসেন সংগীতং আরোপয়িংসু।"

ঐ সঙ্গেই আর একটি কথা বলিব। বেদের মন্ত্রাদির মত ত্রিপিটকে যে সকল সার সার কথা সঙ্কলিত হইয়াছে, ঐ সকল কথা বুঝিতে হইলে অন্যান্য আখ্যানাদি দ্বারা বুঝিতে হয়। বেদের জন্য যেমন পুরাণেতিহাস এবং আখ্যানাদি বেদ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে পঞ্চম বেদ রূপে চলিয়া আসিয়াছে এবং ঐ সকল পুরাণাদি অবলম্বন না করিলে যেমন বেদের অর্থ হয় না, ঠিক সেইরূপ ত্রিপিটকের জন্যও পুরাণেতিহাস পাই। বুদ্ধঘোষ যখন পরবর্ত্তী যুগে টীকা করিতে বসিয়াছিলেন, তখন লোকের কণ্ঠস্থ এবং পরম্পরাগত আখ্যানাদি দ্বারা সুবোধ্য টীকা রচনা করিয়াছিলেন। অনেক সাহিত্য কেবল মাত্র মুখস্থ করিয়া রাখিবার প্রথা এদেশে অত্যন্ত প্রবল ছিল। শ্রুতি এবং পুরাণেতিহাস মুখস্থ করিবার প্রথার অনুরূপ প্রথা যখন বৌদ্ধ শাস্ত্রেও পাই, তখন ব্রাহ্মণের ভীতির কথা অগ্রাহ্য করিতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ কথা এই, শ্রোতব্য কথাগুলি শিখিয়া ফেলিতে পারিলেই যে লোকেরা ব্রাহ্মণের আদর করিবে না, এরূপ কারণ প্রাচীন কালে ছিল না, এবং এখনও নাই। বিশেষ লোকের বিশেষ ভাবে শ্রুতি পাঠ এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠান না হইলে যখন ধর্ম্মক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তখন কেবল মাত্র মন্ত্র-তন্ত্র, মৃত শাস্ত্রের মত। যাহা গুরু সম্মানে সম্মানিত তাহা সর্ব্বজনের পাঠ্য নহে বটে; কিন্তু কেহ বেদ একবার পড়িয়া ফেলিলে বা বেদমন্ত্র শুনিলেই বেদের পবিত্রতা নষ্ট

* পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বাবর ও মোগল সম্রাট্‌দের হীরক ও কোহিনুরের ঐক্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এ সম্বন্ধে তিন প্রকার মত প্রচলিত আছে। ১ম, যাঁহারা বাবরের হীরকের সহিত কোহিনুরের একত্ব সংস্থাপনে সমুৎসুক—(Erskine, Rev. C. W. King, E. W. Stricter প্রভৃতি); ২য়, যাঁহারা মোগল বাদশাহদের হীরকখণ্ডের সহিত কোহিনুরের ঐ অভিন্নতা স্বীকার করেন বটে কিন্তু বাবরের হীরকের সহিত কোহিনুরের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন বা সে কথা আদৌ বিচারই করেন নাই—(Forbes, Major General Sleeman, Ball ইত্যাদি); ৩য়, যাঁহারা বাবর ও মোগল বাদসাহদের হীরক ও কোহিনুরের অভিন্নতা প্রতিপাদন করেন—(Kluge, Prof. N. S. Maskelyne, General Cunningham, Prof. Nicol ইত্যাদি)। এ সম্বন্ধে বল্ সাহেবের উৎকৃষ্ট উপসংহার অনুসন্ধেয়।

না। মহাভারতেই দেখিতে পাই, যে খাঁটী বেদমন্ত্র কয়েকটি স্থানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত রহিয়াছে; (দৃষ্টান্ত—আদি ৩ অধ্যায় ৫৭) বনপর্ব্বের ৩০৫ অধ্যায়ে স্ত্রীলোককেও বেদ শিক্ষা দিয়া বেদমন্ত্র বলা হইয়াছে। মহাভারত যখন শূদ্রাদি সকলের পাঠ্য, তখন বেদের জাতি যাইবার ভয় থাকিলে, ঐরূপ হইত না (যথা,—আ-৬৩, ২২; আ—৯৫, বন—৮৫; ১০৩; শান্তি-৩৪২, ১১৬ ইত্যাদি)। যেমন বৃথা পরমেশ্বরের নাম লইবে না কথা আছে, তেমনি অপবিত্র ভাবে কিম্বা উপযুক্ত আচার অনুষ্ঠানসহ বেদমন্ত্র উচ্চারণ না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, এ বিশ্বাস যথার্থতঃই সকলের মধ্যে ছিল। ইহাতে ব্রাহ্মণের চালাকি কিছুই নাই। ব্রাহ্মণেরাও ঐরূপ বিশ্বাস করিতেন বলিয়া, যখন তখন বেদ পাঠ করিতেন না।

মহাভারত সংহিতা, যে সকল পুরাণেতিহাস আখ্যান এবং আখ্যায়িকা লইয়া গঠিত, ঐগুলি যে সূতদিগের মুখে মুখে ছিল, এবং উহারাই উপযুক্ত সময়ে ঐগুলি আবৃত্তি করিত, একথা মহাভারতের মধ্যেই অনেক স্থানে উল্লিখিত আছে। প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া যেমন শ্রমণ, ভিক্ষু প্রভৃতি বৌদ্ধগণ এক সঙ্গে মিলিত হইয়া একসময়ে, সমগ্র কণ্ঠস্থ শাস্ত্র একসঙ্গে সংগৃহীত করিয়া বৃহৎ ত্রিপিটক সুরক্ষিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ কোন প্রয়োজন বিশেষেই পঞ্চম বেদরূপে মহাভারত সংহিতা গঠিত হইয়াছিল। যাঁহারা পুরাণেতিহাস এবং আখ্যানাদি শুনাইয়া লোকের লোমহর্ষণ করাইতেন, সেই সূতগণ সমগ্র মহাভারত সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এমন নহে। কিন্তু বৌদ্ধ শ্রমণ দিগের মত বহুসংখ্যক সূত সমবেত হইয়া যে সুদীর্ঘ মহাভারত সংহিতা গঠনে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা মহাভারতের আখ্যানগুলির আভ্যন্তরিক অবস্থার প্রমাণ দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে। একই আখ্যান একটু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে কি করিয়া মহাভারত সংহিতায় স্থান পাইয়াছে, সেই কথার বিচারে তাহা বিশেষ করিয়া দেখাইব।

এরূপ ভাবে মহাভারত সংহিতা গঠিত হইলে, উহাতে নূতন পুরাতন রচনা অনায়াসে একস্থানে স্থাপিত হইতে পারে; এবং অতি দীর্ঘ হইলেও একখানি মহাভারত সংহিতা গঠিত হইতে বহুকালের প্রয়োজন হয় না। কোন সময়ে এই সংগ্রহ বা সঙ্কলন কার্য্য হইয়াছিল, তাহা মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত রচনার বিচারের পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। মহাভারতের সঙ্কলন প্রণালীর এই বিশেষত্ব মনে না রাখিলে প্রক্ষিপ্ত বিচারে অনেক ভ্রম প্রমাদ ঘটিতে পারে বলিয়া, সূচনা স্বরূপে এই কয়েকটি কথা লিখিলাম। মহাভারতের প্রকৃতির কথা পূর্ব্ব এক প্রবন্ধেও লিখিয়াছি, এবং একটি প্রবন্ধে উহার ছন্দের বিচারও করিয়াছি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

মানববৃক্ষের উৎকর্ষসাধন।

১৩১২ সালের জ্যৈষ্ঠের "প্রবাসী"তে "বৈজ্ঞানিক যাদুকর" শীর্ষক প্রবন্ধে কালিফর্ণিয়ার লুথার বরব্যাঙ্ক (Luther Burbank) সাহেবের অত্যাশ্চর্য্য বৃক্ষসৃষ্টিকৌশলের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইনি যেরূপ দুই বা ততোধিক স্বজাতীয় বা ভিন্নজাতীয় বৃক্ষের মিলন সাধন করিয়া নূতন বৃক্ষরাজির জন্ম বিধান করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহাকে কলির বিশ্বামিত্র আখ্যা প্রদান করিতে পারা যায়। ইনি বাস্তবিকই যাদুকর। সেঞ্চুরি ম্যাগাজিনে ইনি "মানববৃক্ষের উৎকর্ষসাধন" (The Training of the Human Plant) শীর্ষক এক জ্ঞানগর্ভ ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আজ প্রবাসীর পাঠককে তাহারই সারমর্ম্ম উপহার প্রদান করিব। বরব্যাঙ্ক মহোদয় বৃক্ষোৎপাদন সম্বন্ধে যেরূপ অভাবনীয় ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কথামত কার্য্য করিলে বোধ হয় সমাজের সমূহ হিতসাধিত হইবে।

বহু বৎসর যাবৎ উদ্ভিদজীবনের রহস্যানুসন্ধানে, নব বৃক্ষের উৎপাদনে এবং প্রাচীনের সংস্কারসাধনে ব্যাপৃত থাকিয়া বরব্যাঙ্ক সাহেব এই তথ্য অনুভব করিয়াছেন যে, যে উপায়ে বৃক্ষজীবনের উৎকর্ষ বিধান করিতে পারা যায়, সেই উপায়ে মানব জীবনেরও উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায়। বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের মিলন দ্বারা নূতন বৃক্ষের সৃষ্টিতেই উদ্ভিদ জগতের উন্নতির মূল নিহিত রহিয়াছে। আবার এই মিলনসম্ভূত বৃক্ষগুলির মধ্য হইতে উৎকৃষ্টগুলিকে রাখিয়া নিকৃষ্টগুলিকে ফেলিয়া দিলেই প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ উদ্ভিদজগতের যথার্থ উন্নতি সাধন

করিতে হইলে "যোগ্যতমের রক্ষণ" (survival of the fittest) এই মূল মন্ত্রের অনুসরণ করিতে হইবে। যখন পৃথিবীর ভিন্নপ্রান্ত হইতে আনীত বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের মিশ্রণ সম্পন্ন করা যায়, যখন একটী সম্পূর্ণ স্বভাবজাত বন্য বৃক্ষের সহিত একটী বহুকালের প্রযত্নপালিত সুসংস্কৃত তেজোহীন বৃক্ষের মিলন বিধান করা যায় তখন এই মিলন-সম্ভূত নববৃক্ষগুলির মধ্যে একটী না একটী পিতা মাতা অপেক্ষা অধিক বীর্য্যবান হয়-ই। সেইরূপ দুই ভিন্ন জাতীয় মানবের সংমিলনে পিতা মাতা অপেক্ষা উচ্চ প্রকৃতির নব জাতির সৃষ্টি হইতে পারে।

আমেরিকার ন্যায় অন্য কোন দেশে বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে নূতন জাতির এত সৃষ্টি হয় নাই। প্রতি বৎসরই আমেরিকায় নানা দেশের লোক আসিয়া বাস করিতেছে। ১৯০৪ সালে প্রায় পঞ্চাশটী বিভিন্নজাতিভুক্ত মোট ৭৫২, ৮৬৪ জন লোক আমেরিকায় আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে উত্তরদেশীয় লোকেরা শক্তি ও পুরুষত্বের জন্য খ্যাত; দক্ষিণদেশীয়েরা বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তার জন্য প্রসিদ্ধ। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন বিশেষ জাতির মধ্যে কোন বিশেষ গুণ বা দোষের বিকাশ সাধন হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট জাতিগণের মধ্যে বিবাহাদি দ্বারা যে সকল নূতন জাতির সৃষ্টি হইতেছে তাহাদের যেগুলি উৎকৃষ্ট সেগুলিকে নিকৃষ্টগুলি হইতে পৃথক করিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আবার শুধু পৃথক করিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না; যাহাতে ইহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়—তাহার উপায় করিতে হইবে। এইরূপ করিলেই জগতে ক্রমশঃ এক সর্ব্বগুণসম্পন্ন উৎকৃষ্ট জাতির অভ্যুদয় হইবে এবং তদ্দ্বারা জগতের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে।

মানবহৃদয়ে উন্নতির বীজ যাহাতে উপ্ত হয় শৈশবাবস্থা হইতেই তাহার উপায় করিতে হইবে। সকল জীবের উপরই বাহ্যজগতের (surroundings) প্রভাব দৃষ্ট হয়; এবং শিশুগণের উপর এ প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্য করে। শিশু যাহা কিছু দেখে তাহারই ছাপ তাহার কোমল হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং এইরূপে ইহার কোন কোন নৈসর্গিক বৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে নিষ্প্রভ হইয়া যাইতে পারে,—ইহা যাহা কিছু নূতন শিখে তাহাই ক্রমে ইহার প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে। অতএব এই সময় যদি সতর্কতার সহিত ইহাকে ঠিক পথে চালিত করা যায়, তাহা হইলেই পরিণাম শুভ হইতে পারে।

কিণ্ডারগার্টেন দ্বারা অনেক উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু যে বয়সে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা আরম্ভ হয় বরব্যাঙ্ক সাহেব তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহার মতে দশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে কোন শিশু বিদ্যালয়ের ত্রিসীমা যাইবে না। জীবনের প্রথম দশ বৎসরই সর্ব্বাপেক্ষা কোমল, অতএব বাহ্যজ্ঞান গ্রহণে বিশেষ সক্ষম। এ দশ বৎসর বালক তাহার প্রকৃতির উপযোগী স্থানে থাকিবে প্রকৃতির লীলাভূমি শস্যশ্যামল পল্লীগ্রাম বা ক্ষুদ্র নগর তাহার উপযোগী। বিদ্যালয়ের রুদ্ধ বায়ু তাহার কোমল শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। আবার বিদ্যালয়ের ভা মন্দ নানা প্রকার বাহ্য প্রভাব তাহার প্রকৃত উন্নতির পথে অন্তরায়। কেহ কেহ বলিবেন যে দশ বৎসর পর্য্যন্ত যা বালক বিদ্যালয়ে না যায় তাহা হইলে কলেজ হইতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া বাহির হইবার সময় তাহার বয়স বে হইয়া যাইবে। ইহার উত্তরে বরব্যাঙ্ক সাহেব বলেন। যদি প্রথম দশবৎসর বালককে তাহার ভবিষ্য জীবন সংগ্রামে জন্য ভাল করিয়া প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে তাহার অধিক সময় লাগিবে না শীঘ্র শীঘ্র এ শিক্ষা আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা তাহাতে জন্মিবে

আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে সকল বালক বালিকা কেই একই রকম শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাদের বিশে বা ব্যক্তিত্বের প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখা হয় না। এ জন্য আরও বিশেষ প্রয়োজন যে দশবৎসর পর্য্যন্ত বা বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে না পাঠান হয়। কোন্ প্রক শিক্ষা কোন্ বালকের উপযোগী তাহা জানিবার চেষ্টা কে করেন না; সকলেরই জীবনকে এক ছাঁচে ঢালিয়া গড়ি চেষ্টা করা হয়; ইহার ফল অতীব ভয়াবহ। ইহা দ্ব যে বালকের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় শুধু তাহাই নহে; ইহ প্রকৃতির অনুপযোগী কতকগুলি বিষয় শিক্ষা দিয়া ইহ শারীরিক স্বাস্থ্যের অপকর্ষ সাধন করা হয়।

প্রথম দশ বৎসর বালক বালিকাগণকে প্রাকৃতিক নি অনুসারে খোলা যায়গায় লালিত করিতে হইবে। উ

দিগকে ভালবাসার মধ্যে—ভালবাসার বস্তু দ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিতে হইবে। যে বালক অনাদরে লালিত হয় সে কখনও উন্নত জীবন লাভ করিতে পারে না। সকল পিতামাতাই যে নিজ সন্তানগণকে আদর যত্নে পালন করিতে পারেন তাহা অবশ্য সম্ভব নয়, কিন্তু জাতীয় চরিত্র উন্নত করিতে হইলে সকলেরই উচিত যাহাতে সকল শিশুই যত্নে পালিত হয় তাহার উপায় করা। যাহারা সন্তানগণকে যত্ন করে না তাহাদিগকে গন্তব্যপথ অনুসরণ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে; যাহারা অসমর্থ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। ইহার ফল আশু ফলিবে না; বহু শতাব্দী ধরিয়া কার্য্য করিলে তবে বাঞ্ছিত ফল লাভ হইবে; কিন্তু কার্য্য এখনই আরম্ভ করিতে হইবে।

শিশুদিগের সহিত চাতুরি খেলিও না; তাহাদিগকে কখনও মিথ্যা কথা দ্বারা ভুলাইবার চেষ্টা করিও না; ইহার পরিণাম ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে। কায়মন ও বাক্যে কোন প্রকারেই যেন প্রতারণার ভাব প্রকাশ না পায়। পৃথিবীতে প্রতারকের সংখ্যা অনেক কম হইত যদি বাল্যকালে শিশুগণের সহিত তাহাদের পিতা মাতারা প্রতারণা না করিত। শিশুর নিকট হইতে শারীরিক ও নৈতিক উভয় ভয়কে দূরে রাখ। দশবৎসরাবধি বালক যেন ভয় কাহাকে বলে জানিতে না পায়। যদি বালক সুস্থশরীর হয় তাহা হইলে উহাকে উহার শরীরের বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়া উহার মনে বৃথা ভয় উৎপাদন করার প্রয়োজন হইবে না। তেমনই পরকাল সম্বন্ধে যে সমুদয় বিভীষিকাময় বিশ্বাস আছে সেগুলি শিশুকে শিখাইওনা। বরব্যাঙ্ক সাহেব ধর্ম্মে বিশ্বাসবান। কিন্তু নরকের ইতিহাস বিবৃত করিয়া শিশুর মনে ভয় সঞ্চার করার পক্ষপাতী তিনি নন। যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু সুন্দর, তাহা শিশুর সম্মুখে রাখ এবং উহার আত্মাকে তাহার আস্বাদ গ্রহণের অবসর দাও; শিশু আপনা হইতেই ঈশ্বরপরায়ণ পবিত্র জীবন লাভ করিবে। যেমন বৃক্ষ সূর্য্যরশ্মি ও শিশির শোষণ করে তেমনি যে বালক পূতাত্মা পুরুষ ও স্ত্রীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত সে নিশ্চয়ই পবিত্র ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে।

শিশুকে প্রথম হইতে আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান শিক্ষা দাও। উহাকে শিখাও ইহার অর্থ কি এবং ইহার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তাই বা কি। যখনই ইচ্ছা তখনই যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ উহাকে দিও না; যাহা দিবে তাহার হিসাব দিতে শিখাও। যাহা উৎকৃষ্ট তাহা উহাকে শিখাও, এবং মনে রাখিও যে পুনঃ পুনঃ একটা জিনিস শিখাইলে ক্রমে তাহা শিশুর মনে গাঁথিয়া যায়। যদি কোন বিষয়ে বিফলপ্রযত্ন হও ত হতাশ হইও না; মনে রাখিও তুমি একটী মানবাত্মার উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ।

যথেষ্ট পরিমাণ সূর্য্যকিরণ না পাইলে সুবৃক্ষ উৎপাদন করিতে পারা যায় না। মানুষের পক্ষে সূর্য্যকিরণের অর্থ দুই ভাবে লইতে পারা যায়। আসল সূর্য্যকিরণ ত চাই-ই; কারণ যে গৃহে সূর্য্যকিরণ যথেষ্ট পরিমাণে প্রবেশ করিতে পারে না সে গৃহে শিশুসন্তানেরা সুস্থকায় ও সবল হইতে পারে না। সূর্য্যকিরণের দ্বিতীয় অর্থ প্রফুল্লতা। বাড়ীর সকলেই সর্ব্বদা হাস্যমুখ ও প্রফুল্লচিত্ত থাকিবে। শিশুর নিকট কেহ বিষণ্ণবদন বা ভ্রূকুঞ্চন দেখাইবে না। শিশুর উপর রাগ করিও না; তাহার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিও না। ছবিদ্বারা, হাস্যামোদ দ্বারা, শিশুকে প্রফুল্ল রাখ; সর্ব্বদা আমোদপূর্ণ কার্য্যে তাহাকে ব্যাপৃত রাখ। সকল প্রকার সুন্দর বস্তুর দ্বারা তাহাকে পরিবেষ্টিত কর।

বৃক্ষের পক্ষে যেমন পবিত্র বায়ুর প্রয়োজন, তেমনই মানুষের পক্ষে। শৈশবাবস্থায় বালক যত গৃহের বাহিরে খোলা বাতাসে থাকে ততই ভাল। এই জন্যই ইহাকে বিদ্যালয় হইতে প্রথম দশ বৎসর দূরে রাখা কর্ত্তব্য। গৃহের রুদ্ধ বায়ু ইহার স্বাস্থ্য জন্মের মত নষ্ট করিয়া দেয়। শিশুকে গৃহের বাহিরে এবং পুস্তক হইতে দূরে রাখ। বিশুদ্ধ বায়ুতে নীলাকাশতলে খেলা করিয়া শিশুজীবন অতিবাহিত হওয়া উচিত।

বৃক্ষকে সতেজ ও বলিষ্ঠ করিবার জন্য যেমন উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন তেমনই মানুষের জন্য। শিশুর পরিপাক শক্তিকে যথেষ্ট ও পরিমিত আহার দ্বারা সবল করা প্রয়োজন, যে খাদ্য যে পরিমাণে দরকার তাহা হওয়া চাই। বরব্যাঙ্ক সাহেব এমন এক জাতির সংসর্গে আসিয়াছিলেন যাহাদের ধর্ম্মে মাংস, ডিম্ব ও দুগ্ধ প্রভৃতি আহার নিষিদ্ধ। তাহারা প্রধানতঃ শাকান্ন দ্বারাই উদরপূর্ত্তি করিত। ইহার ফলে ইহাদের বালকবালিকাদিগের শরীর স্বল্পরক্তবিশিষ্ট ও

রোগপ্রবণ। ইহাদের শরীরে তেজের কোন চিহ্ন নাই। প্রথম দশ বৎসর শরীরের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত, কেন না ভবিষ্য জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার উপযোগী ক্ষমতা এই সময় শরীরে উৎপাদন করা প্রয়োজন। অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সকল শিশুর পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া কি প্রকারে সম্ভবপর? ইহার উত্তর এই যে প্রত্যেক জাতি আপনাপন জাতিভুক্ত দরিদ্র ও অক্ষম ব্যক্তিগণের ভরণপোষণের সুবিধা করিবেন। তাহাদিগকে অবশ্য বসিয়া খাইতে দিবেন না; তাহাদের জন্য কার্য্যের বন্দোবস্ত করিবেন, এবং তাহাদের সন্তানগণ যাহাতে উত্তমরূপে লালিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন। এরূপ না করিলে জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। যে পরিমাণে কোন জাতির একাংশের শারীরিক অবস্থা হীন, সে জাতি সেই পরিমাণে দুর্ব্বল।

জাতীয় চরিত্র উন্নত করিতে হইলে আর একটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। দুর্ব্বল পুরুষ বা স্ত্রীর বিবাহ রহিত করিতে হইবে। দুর্ব্বল স্ত্রীপুরুষের বিবাহের ফল সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। একটী বিষাক্ত বৃক্ষের সহিত যদি একটী ভাল বৃক্ষের মিলন করা যায়, তাহা হইলে ভাল বৃক্ষটীকে খারাপ করা হয়; আর যদি দুইটী বিষাক্ত বৃক্ষের মিশ্রণ করা হয় ত ইহা হইতে যে নূতন বৃক্ষের সৃষ্টি হইবে তাহা আরও অধিক বিষাক্ত হইবে। মনুষ্য সম্বন্ধেও এই নিয়ম। অতএব এরূপ বিবাহের যাঁহারা প্রশ্রয় দেন তাঁহারা সমাজের শত্রুস্থানীয়। এরূপ বিবাহ দ্বারা সমাজ ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়ে।

উপরে যে জাতীয় চরিত্রের উন্নতি বিধান করিতে বলা হইল আপাততঃ দশ বারটী শারীরিক বা মানসিক বিকৃতিশূন্য পরিবারকে সেই উপায় অবলম্বন করিতে দেওয়া হউক। ইহার ফল যে শুভ হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কোন বৃক্ষের পুরাতন গুণ নষ্ট করিয়া উহাতে নূতন গুণের অবতারণা করিতে ছয় হইতে দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সময় লাগে। এই সময়ের মধ্যে নূতন বৃত্তি সকল ইহার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়াবদ্ধ হইয়া যায় এবং আর ইহা পূর্ব্ব বৃত্তির অনুসরণ করে না। ইহা হইতে যে সকল বৃক্ষের উৎপত্তি হইবে তাহারা যেন ইহা হইতে উদ্ভূত নয় এইরূপ বোধ হইবে। সেইরূপ উপরোক্ত দশ বার পরিবারের মধ্যে দশ পুরুষে নূতন জীবনের সৃষ্টি হইয়া যাইবে। যে কাজ এক শত সহস্র বৎসরেও সমাধা হইবে না, সে কাজ পাঁচ ছয় শত বৎসর মধ্যে সম্পন্ন হইবে। মনুষ্য চরিত্রে কোন একটী পরিবর্ত্তন সাধন করিতে দুই পুরুষের অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না। উদ্ভিদ অপেক্ষা মনুষ্য-বৃক্ষে নূতন বৃত্তির সঞ্চার করা অনেক সহজ।

বৃক্ষচরিত্রের পরিবর্ত্তন সাধনে বরব্যাঙ্ক সাহেবের ন্যায় কাহারও অধিক পারদর্শিতা নাই; অতএব তাঁহার কথাগুলি যে সারগর্ভ তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। আমেরিকা আজ যে অপরাপর সকল জাতিকে ছাড়াইয়া উঠিতেছে, তাহার প্রধান কারণ মার্কিনগণ ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে সমুদ্ভূত জাতি। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী মহামতি ব্রায়ান সাহেব তাঁহার এলাহাবাদের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন তাঁহার শরীরে জারমান, ফ্রেঞ্চ, স্কচ, আইরিশ প্রভৃতি জাতির রক্ত বহমান। ইউরোপের এক একটী জাতি এক একটী বিশেষ গুণের জন্য বিখ্যাত। মার্কিনগণ অনেক জাতির সমষ্টি বলিয়া অধিক উচ্চ গুণসম্পন্ন। বরব্যাঙ্ক সাহেবের কথা মত কার্য্য হইলে আমেরিকা অচিরে পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান গ্রহণ করিবে।

আমাদের দেশেও সকল জাতির মিশ্রণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বঙ্গ ও পঞ্জাবে মিলনের সূত্রপাত হইয়াছে—ইহা শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। পঞ্জাবের শারীরিক বল ও বঙ্গের মস্তিষ্কবল মিশ্রিত হইয়া একটী উৎকৃষ্ট জাতির সৃষ্টি হইবে। আমাদের দেশের জাতিবিভাগ প্রথা বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতেছে। ইহার উপর আবার প্রত্যেক জাতিবিভাগের মধ্যেও বিবাহ সম্বন্ধে বিভাগ আছে, যথা—ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ত্রিকুলগোষ্ঠী। এইরূপ বিবাহ দ্বারা সমাজের দৈহিক এবং নৈতিক অবনতি সাধিত হইতেছে।

শ্রীঅধরচন্দ্র মিত্র।

মুক্তি।

১

কৈলাস জাতিতে কর্ম্মকার। বাল্যকালে সে জাতীয় ব্যবসায় তাহার পিতার নিকট কিছু কিছু শিখিয়াছিল, কিন্তু এই

ব্যবসায়ে সে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ এ দেশ হইতে কামার কুমারের ব্যবসায় এক রকম উঠিয়াই গিয়াছে। তালা, চাবি, ছুরি, কাঁচি, হইতে আরম্ভ করিয়া কোদালি ও করাত পর্য্যন্ত সকল সামগ্রীই আমরা শেফিল্ড বা ঐরূপ অন্য কোন স্থানের বিশ্বকর্ম্মাদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করি, আর কৈলাসের মত কারিকরেরা লাঙ্গলের ফাল গড়িয়া, বড় জোর দুখানি কাস্তে কি একখানি বঁটি নির্ম্মাণ করিয়া যে দুপয়সা পায়, তাহা দিয়া অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। যখন সেরূপ কোন কাজ না জোটে, তখন সপরিবারে অনাহারে মরিতে বসে। এমন দুর্দ্দশাপন্ন শিল্পী বঙ্গদেশের প্রতি গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায়।

কৈলাসের বয়স হইয়াছে, কিন্তু বয়সের সঙ্গে তাহার বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই। দেব-দ্বিজে তাহার অসাধারণ ভক্তি, গ্রামের হরিসভায় ও বারয়ারী পূজায় কৈলাস অনাহারে থাকিয়াও চাঁদা জোগাইত। যদি কেহ বলিত,—"কিহে কৈলাস মিস্ত্রী, বড় যে 'সা-খরচে' হয়েছ!" কৈলাস বলিত,—"ভগবান ছাড়া ত আর দেনেওয়ালা কেউ নাই, তিনি হাতে যে দু' পয়সা তুলে দিয়েছেন তা তাঁর কাজেই ব্যয় করি, অনাহারে ত আর তিনি মানুষকে মারেন না!"—এই ভাবেই কৈলাসের যৌবনকাল অতীত হইল; পিতা রামজয় কর্ম্মকার পৌত্রমুখ সন্দর্শনের আশায় অল্প বয়সেই কৈলাসের বিবাহ দিয়াছিল, কিন্তু 'নাতির মুখ' দেখিবার আশা তাহার সফল হয় নাই। বধূমাতা সন্তানবতী হইবার পূর্ব্বেই রামজয়কে ভবের খেলা শেষ করিয়া এক অজ্ঞাত বিদেশে যাত্রা করিতে হইল। কৈলাসের দিদি বিধবা দুর্গামণি ঘরের মধ্যে লুটাইয়া পড়িয়া অশ্রুপ্রবাহে ধরাতল সিক্ত করিয়া সরোদনে বলিল,—"বাবাগো! তোমার কৈলাসকে ফেলে কোথায় গেলে!—ছেলেমানুষ সে, এত বড় সংসারটা কি করে চালাবে গো বাবা!"—কৈলাসের সংসারে তখন তাহার দিদি, স্ত্রী ও সে নিজে। কৈলাস চোখের জল মুছিয়া বলিল,—"দিদি, তুই কাঁদিস্ নে। তোর চোখে জল দেখলে আমার কলিজা ফাট ফাট করে। আমি লাঙ্গল গ'ড়ে আমাদের তিন জনের পেটের ভাত করতে পারবো!"

২

লাঙ্গল গড়িয়া, বঁটি ও কাস্তে গড়িয়া কিছুদিন কাটিল। সুখে না হোক শান্তিতে কৈলাসের দিনপাত হইতেছিল। সংসারে তিনটি প্রাণী; দিদি দুর্গামণি সংসারের কর্ত্রী; কৈলাসের স্ত্রী রক্ষাকালী তাহার অনুগতা এবং একান্ত সুশীলা। সমস্ত দিন পরিশ্রমেও তাহার মুখে কথা ছিল না। রূপ তাহার যে একেবারেই ছিল না তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু রূপ অপেক্ষা তাহার স্বাস্থ্য অনেক অধিক ছিল, আর সেই স্বাস্থ্যের আতিশয্যেই সে অধিক সুন্দরী বলিয়া প্রতীয়মান হইত। স্ত্রীর প্রতি কৈলাসের আকর্ষণ ঠিক নেশার মত ছিল, কিন্তু সেজন্য কোন দিন তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে কোন ব্যাঘাত হয় নাই। কৈলাস যদি স্ত্রীকে বলিত,—"ও গো! শুনচো, ও কামারের ঝি! এবার পূজোয় কি কাপড় নেবে, গুলবাহার না নীলেম্বরী?"—কৈলাসপত্নী নথ নাড়িয়া চক্ষু বক্র করিয়া ভ্রূযুগলের শরাসনে জ্যা-রোপণ করিয়া বলিত,—"তা ঠাকুজিকে জিজ্ঞাসা কর না কেন? মিন্সের পছন্দ দেখে গায়ে জ্বর আসে, বুড়ো মাগী হলাম, এখনও নীলেম্বরী পরবার বয়স আছে কি না!"—কৈলাস গম্ভীর হইয়া বলিত,—"বয়স নেই তা ত জানি, তবে রক্কেকালীর নীলেম্বরীই মানায় ভাল!"—"যাও যাও আর ব্যাখ্যানায় কাজ নেই, আমি নয় রক্কেকালী, পছন্দ না হয়, একটা ভদ্রকালী কোথাও থেকে খোজ করে আনগে!"—কৈলাস এইরূপ প্রেমসম্ভাষণে খুসী হইয়া কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে বসিয়া যাইত। তাহার পর তাহার স্ত্রী যখন ঢেঁকিশালে প্রবেশ করিয়া ধান ভানিত, ঢেঁকির লাঙ্গুলে সঘন পদ তাড়নায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ আন্দোলিত হইত, ললাটে, অর্দ্ধাবৃত-বক্ষে ঘর্ম্ম বিন্দু সঞ্চিত হইত, এবং মস্তকের নিবিড় কৃষ্ণ কেশের রাশি মলয়ানিল-প্রবাহ-হিল্লোলিত তড়াগ-সলিলবৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিত, তখন আড়াল হইতে সেই দৃশ্য দেখিয়া কৈলাস প্রফুল্লমনে গৃহপ্রাঙ্গণস্থ বাতাপী লেবুর গাছের স্কন্ধদেশে এক লম্ফে আরোহণ করিত, তাহার পর স্বরচিত রাগিণীতে গান ধরিত,—

"রণমাঝে দিগম্বরী নাচো গো!"

রক্ষাকালী সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি অসম্বৃত বস্ত্র টানিয়া বক্ষে ও মস্তকে তুলিয়া দিত, এবং একবার রোষকষায়িত নেত্রে লেবুর গাছের দিকে চাহিত, কিন্তু কৈলাসকে আর সে অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যাইত না; কেবল বসন্তের একটা

উদ্দাম বায়ু সেই বৃক্ষস্থ পুষ্পমঞ্জরীর সৌরভ হরণ করিয়া তাহার অবগুণ্ঠন উড়াইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিত, তাহার অঞ্চল আন্দোলিত করিত, এবং তাহার বিশ বৎসরের পরিপুষ্ট, আবেগপূর্ণ, উন্মাদনাময় যৌবনের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য যে মদিরবিহ্বলতা আনিয়া দিত, তাহার আবেশে তাহার মনে হইত, এ জীবন ঠিক একভাবে ঢেঁকির সেবা করিয়া অতিবাহিত করিবার নহে; হঠাৎ যেন অজ্ঞাতসারে তাহার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত, এবং পা-ও সেই সঙ্গে বুঝি বেতালা পড়িত, তাই তাহার ঠাকুরঝি মুখ তুলিয়া বলিত,—"বৌ কি ঘুমুচ্ছিস্! হাতটা দেখচি না কেটে দিয়ে আর তুই থাম্‌বিনে।"

ননদের এই তীব্র উপহাসে তাহার কবিত্ব ও স্বপ্ন আকাশকুসুমের ন্যায় এক মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইত।

৩

কিন্তু যৌবনের মোহ দীর্ঘকাল থাকে না, এবং সংসারের সুখও ক্ষণস্থায়ী।

রক্ষাকালীর অনেক বয়স পর্য্যন্ত সন্তানাদি হয় নাই, একুশ বৎসর বয়সে তাহার পুত্র নদেরচাঁদ ভূমিষ্ঠ হইল। কৈলাসের দিদির ইচ্ছা ছেলেটির অন্নপ্রাশনে কিছু সমারোহ করা হয়। ছয়মাসে কৈলাস ছেলের মুখে ভাত দিল। এই উপলক্ষে সে গ্রামের সকল কামারকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দিল, এবং ছেলের জন্য রূপার বালা, মল, কোমরে নিমফল ও গলায় রূপার হাঁসুলী গড়াইয়া দিল। পুত্রের অন্নপ্রাশনে কৈলাসের একশত টাকা ব্যয় হইল। কতক টাকা বাড়ী বন্ধক রাখিয়া মহাজনের নিকট কর্জ্জ করিল, কতক টাকা গরু বাছুর বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিল। কৈলাসের পিতার আমলের কয়েকটি দুগ্ধবতী গাভী ছিল, একটি গাই গরু ভিন্ন আর সকলগুলিকেই এই উপলক্ষে বিক্রয় করিতে হইল।

ষষ্ঠীদেবী অনেক সময় অযাচিত ভাবেও মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করেন; নদেরচাঁদের জন্মের একবৎসর পরে কৈলাসের একটি কন্যা জন্মিল। কৈলাস কন্যার নাম রাখিল পার্ব্বতী। দিদির বড় ইচ্ছা পার্ব্বতীর জন্য দুগাছি ঘুঙুর দেওয়া মল দেয়, কিন্তু কৈলাস এবার আর দিদির 'মনুষ্যজন্মের সাধ' পূর্ণ করিতে পারিল না, ঋণে সে আকণ্ঠ নিমজ্জিত; মহাজন যখন তখন তাহাকে বলিত,—"কর্ম্ম-কারের পো! দেনা শোধের কি কোচ্চ, সুদে আসলে অনেক টাকা হয়ে গেল, তোমার বাড়ী ঘরেরও ত জীর্ণ দশা। আমি ত ভাই এত টাকা আর ফেলে রাখ্‌তে পারিনে। যদি সহজে টাকা শোধ না কর ত আমাকে অন্য পথ দেখ্‌তে হবে।"—কৈলাস সবিনয়ে বলিত,—"এই ভাই আর দু'চার মাস সবুর কর, আস্‌চে চোতে তোমার সব টাকা শোধ ক'র্‌ব,"—কিন্তু শোধ যে কোথা হইতে করিবে তাহা কৈলাস জানিত না; দুশ্চিন্তায় তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, কপালে শিরা দেখা দিল, তাহার প্রফুল্লতা, উৎসাহ, উদ্যম সব চলিয়া গেল। আরও দুঃখের বিষয়, তাহার ব্যবসায়ও ক্রমে অচল হইয়া উঠিল, মধ্যে মধ্যে যে দুই একখানি লাঙ্গলের ফাল, কাস্তে কি বঁটি গাড়িবার 'ফরমাইস' পাইত তাহাতে সংসার প্রতিপালন তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইল।

ক্রমে এমনই হইল যে, তাহার দুইবেলা আহার চলে না। বিপদ কখন একাকী আসে না; এই সময় সুযোগ বুঝিয়া দুর্ভিক্ষও দেখা দিল। এই দুর্ভাগ্য দেশে দুর্ভিক্ষ ত নিত্য লাগিয়াই আছে। যে শ্রমজীবী দৈনিক আট পয়সা উপার্জ্জন করে তাহাকেও সুজন্মার বৎসরে চারিটাকা মনের চাউল কিনিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। আমরা যে বৎসরের কথা লিখিতেছি সে বৎসর মা-লক্ষ্মীর পীঠস্থান বরিশাল ও বাখরগঞ্জে ধান হয় নাই, যাহা কিছু হইয়াছিল তাহা মহাজনেরা দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় প্রথমেই গোলাজাত করিয়া ফেলিয়াছিল। কৈলাস দেখিল এক মন মোটা চাউল পাঁচ টাকার কমে পাওয়া যায় না। প্রত্যহ একবেলা খাইলেও মাসে তাহার এক মন চাউল ভিন্ন সংসার চলে না; কিন্তু কোন মাসে সে তিন চারি টাকার অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে না। মহাজনের পীড়াপীড়িতে সে তাহার বিক্রয়াবশিষ্ট গাভীটিকেও বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল, কিন্তু তাহাতেও মহাজনের সুদের টাকার অর্দ্ধেকও শেষ হইল না। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া অগত্যা সে তাহার স্ত্রীর নিকট পুত্রের অলঙ্কার কয়খানি চাহিল, বাঁধা দিয়া কিছু টাকা আনিবে, ইহাই তাহার ইচ্ছা।

রাত্রে কৈলাস একটা নারিকেলের নাড়ু মুখে দিয়া

একঘটি জলে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া দাওয়ায় বসিয়া দা'কাটা মোটা তামাক টানিতে টানিতে বলিল,—"ওগো শুন্‌চো, নদেরচাঁদের গহনা কখানা দেও, যে দশটাকা পাই ধার করে আনি, মহাজন বেটাকে নৈলে ত আর পারা যায় না। নাহক দেওয়ানী মামলা বাধিয়ে ভিটে ছাড়া করবে।"—রক্ষাকালীরও আর সে স্ফূর্ত্তি নাই, তাহার কেশ রুক্ষ, পরিধেয় বস্ত্র মলিন, অন্নাভাবে দেহ শীর্ণ, চিন্তায় মন অবসন্ন। কেবল স্বামীর ও পুত্রের মুখ চাহিয়া নীরবে সেই সাধ্বী সকল যাতনা সহ্য করিত; কোন দিন রাত্রে সে একমুষ্টি চাউল চিবাইয়া ক্ষুধার অসহ্য যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ নিবারণ করিত, কোন দিন হয়ত ঘরে চাল থাকিত না, একটু গুড় মুখে দিয়া বা একখানি নারিকেল খাইয়া তাহার রাত্রি কাটিত। কৈলাসের দিদি বলিত,—"বৌ! কি হবে? আমরা যে না খেয়ে মরি!"—রক্ষাকালী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিত,—"যদি ভগবান অদৃষ্টে তা লিখে থাকেন তাই হবে।" কৈলাসের আঙ্গিনায় গোটা দুই তিন নারিকেলের ও খেজুরের গাছ ছিল, শীতকালে খেজুর গাছ কাটিয়া গাছিরা তাহাকে কয়েক সের গুড় দিয়াছিল, সেই গুড় দিয়া ও গাছের নারিকেল কয়টি পাড়িয়া সে 'ছাঁইয়ের লাড়ু' করিয়া রাখিয়াছিল, স্বামী ও পুত্র কন্যার জন্য তাহা সে সযত্নে সঞ্চিত রাখিয়াছিল, প্রাণ গেলেও সে একটি নাড়ু নিজে খাইত না।

রক্ষাকালী ঘরের মধ্যে বসিয়া কোষ্টা দিয়া একটা 'শিকে' বুনিতে ছিল, একটা কেরোসিনের টিমি এক পাশে বসিয়া বসিয়া বিস্তর ধূম্র ও অল্প আলোক উদ্গারণ করিতেছিল। স্বামীর কথা শুনিয়া সে বলিল, "গহনা ত ভারি, তা বন্ধক রেখে বড় জোর আট দশ টাকা পাবে, তাতে কিই বা হবে; আর যে তা ফিরে পাব সে আশাও করিনে। তা নিয়ে যাও, ভিটে টা তো আগে বজায় রাখতে হবে।" কৈলাস সকল গহনাই একটা নেকড়ায় বাঁধিয়া লইল, শেষে বলিল,—"বালা জোড়াটা দিলে আরও দুই একটাকা বেশী পাওয়া যাইত।"—রক্ষাকালী বলিল,—"বালা কি করে দিই, তা ত আমার প্যাট্‌রার মধ্যে তোলা নেই, নদেরচাঁদের হাতে আছে, ও আমি তার হাত থেকে প্রাণ ধরে খুলে দিতে পারবো না।"—রক্ষাকালী অশ্রুসজল চক্ষু বস্ত্রাঞ্চলে মার্জ্জনা করিল।

সেদিন শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী কি ত্রয়োদশী তিথি। মুক্ত চন্দ্রালোকে ধরাতল প্লাবিত হইতেছিল, এবং বৃক্ষলতা-সমাচ্ছন্ন, প্রান্তরপরিবেষ্টিত গ্রামখানি আলেখ্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। নদেরচাঁদ এতক্ষণ অগ্নিকুণ্ডের পাশে তাহার পিসির কাছে বসিয়া 'সাত ভাই চম্পার' গল্প শুনিতেছিল। গল্প শেষ হইলে, সে একটা কঞ্চিকে অশ্বে পরিণত করিয়া ও তাহা দুই উলঙ্গ জানুর ব্যবধানে স্থাপন করিয়া অশ্বারোহণের কল্পিত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে এই অশ্বে আরোহণ করিয়া লাফাইয়া চলিতে চলিতে পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইল, পিসিমার গল্পের ছড়াটা তাহার বড় ভাল লাগিয়াছিল,—সে বলিল,—

"সাত ভাই চম্পা জাগোরে!"
"কেন বোন পারুল ডাকোরে!"

মা খুকি ঘুমিয়েচে?"—কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে হইল তাহার মা যেন কাঁদিতেছে। সে একেবারে মায়ের পিঠের উপর আসিয়া পড়িল, এবং ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিজের মাথাটি মায়ের গালের উপর রাখিয়া তাহার কোমল করপল্লবে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা, তুই কাঁদ্‌চিস্ কেন? বাবা বকেচে?"

এবার আর মায়ের চোখের অশ্রু বাধা মানিলনা, তাহার দুই গাল বহিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নদেরচাঁদ মাকে ভুলাইবার জন্য বলিল,—"মা বড় খিদে লেগেছে, দুধ খাব।"—মায়ের দুঃখসমুদ্র আরও উথলিয়া উঠিল। সে বলিল,—"কেন বাছা তুই আমার পেটে জন্মেছিলি! আমি যে তোদের ভাই বোনকে দুবেলা পেট ভরে খেতে দিতেও পারচিনে। হরি হে! তোমার মনে কি এই ছিল? আমার পাপে আমার দুধের বাছাদের কেন কষ্ট দাও!"—কৈলাস সকল কথাই শুনিল, তাহার মনের মধ্যে কি হইতেছিল—আমরা দুবেলা খাইতে পাই, আমরা তাহা অনুভব করিতে পারিবনা, এবং সে ভাব লেখনীতে ব্যক্ত করিবার শক্তিও নাই। কৈলাস বসিয়া বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল। কিন্তু কলিকার আগুন অনেকক্ষণ পূর্ব্বে নিবিয়া গিয়াছিল। চারি বৎসরের শিশু নদেরচাঁদ দুধ দুধ করিয়া মায়ের কোলের কাছে মাটিতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল; তাহার মাথা মায়ের কোলের উপর ছিল; রক্ষাকালীর

অজ্ঞাত সারে কয়েক বিন্দু উষ্ণ অশ্রু ছেলের মাথার চুলের মধ্যে গড়াইয়া পড়িল।

মেয়েটির বয়স এখনও তিন বৎসর পূর্ণ হয় নাই। যত দিন গাভীটি ঘরে ছিল, যেটুকু দুধ হইত তাহা জ্বাল দিয়া রক্ষাকালী ছেলেমেয়েদের খাইতে দিত। এখন আর গরু নাই, একবার ভাত খাইয়া ছেলে মেয়ে থাকিতে পারে না, তাই সে ভাতের ফেন গড়াইয়া ছেলে মেয়ের জন্য রাখিয়া দিত; কোন দিন একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহাই তাহাদের দুই তিন বার খাইতে দিত, কোন দিন একটু গুড় গুলিয়া তাহা মিষ্ট করিয়া দিত। নদেরচাঁদের বুদ্ধি হইয়াছিল সে বলিত,—"মা এ দুধ ভাল নয়, আমি ও খাব না। আমি আমাদের বুধি গায়ের দুধ খাব।"—তাহার পরই জিজ্ঞাসা করিত,—"মা বুধি কোথায়, তাকে কে নিয়ে গিয়েচে, আর আস্‌বে না?"—নিষ্ফল অশ্রু বিসর্জ্জন করা ভিন্ন রক্ষাকালীর ইহার উত্তর ছিল না।

মাঘমাসের শেষে একদিন কৈলাসকে সপরিবারে উপবাসে থাকিতে হইল। দিদি কাতর ভাবে বলিল,—"কৈলাসরে! এতদিনে বুঝি অনাহারে অপমৃত্যু হয়। আমরা না হয় না খেয়ে থাকলাম, ছেলে মেয়ে দুটো যে মারা পড়্‌লো। এখন উপায় কি করি?"—নদেরচাঁদ বলিল,—"মা কিছু খেতে দে, পেট জলে গেল।"—মেয়েটা একখান কাঁথায় অবসন্ন ভাবে পড়িয়াছিল, তাহার মুখ দিয়া ক্রন্দন নিঃসারিত হইতে ছিল না; সে ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, আর চক্ষু দিয়া দুটি জলের ধারা গাল বহিয়া পড়িতেছিল; সমস্ত দিন ক্ষুধার তাড়নায় চীৎকার করিয়া এখন তাহার অবসাদ আসিয়াছিল। কৈলাস কোথা হইতে একটা মাটীর আলু সংগ্রহ করিয়া আনিল, কৈলাসের স্ত্রী তাহাই জলে সিদ্ধ করিয়া একটু লবণ মাখিয়া তাহার স্বামী, পুত্রকে ও ননদকে খাইতে দিল, কিন্তু তাহাও পেট ভরিয়া দিতে পারিল না। রক্ষাকালী নিজে অভুক্ত থাকিয়া মেয়েটিকে কোলে লইয়া সেই সিদ্ধ আলু এক একটু করিয়া তাহার মুখে দিতে লাগিল। কৈলাস আহারান্তে (!) স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কৈ তুমি খেলেনা!"—রক্ষাকালী নিরুত্তর। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসায় সে নত মুখে বলিল,—"সব ত সিদ্ধ করিনি; যে টুকু সিদ্ধ করেছিলাম তা আর নেই, সকালে ছেলে মেয়ের মুখে কি দেব? তাই এক টুকরা আলু রেখে দিয়েছি; তুমি ভেবোনা, ঘুমুলেই রাত কেটে যাবে।" কৈলাস হতাশ ভাবে বলিল,—"রাত ত কাটবে, কিন্তু আবার যে দিন আস্‌বে! কাল কি করে সংসার চলবে?"—অনেক চিন্তার পর কৈলাস স্থির করিল, পরদিন সে কাহারও ক্ষেতে মজুর খাটিতে যাইবে। তাহার এই কার্য্যের জন্য সমাজে নিন্দা হইবার ভয় আছে বটে, কিন্তু ছেলে মেয়ে ও স্ত্রীর প্রাণরক্ষা করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

৫

পরদিন প্রভাতে কৈলাস কাজের সন্ধানে বাহির হইল। কিন্তু দেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, চারি পয়সা দিয়াও কেহ মজুর লয়না। দরিদ্র গ্রামবাসিগণ অপেক্ষাকৃত সচ্ছলঅবস্থাপন্ন গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কাজ জুটাইতে পারিতেছেনা। কৈলাস অনাহারে বেলা বারটা পর্য্যন্ত কাজের সন্ধানে ঘুরিল, কিন্তু কাজ জুটিলনা। তখন সে গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী নিবিড়পত্র বৃহৎ তেঁতুলগাছের ছায়ায় বসিয়া তাহার ললাটের ঘর্ম্ম মুছিতে লাগিল। তাহার মর্ম্মভেদ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে একটি অব্যক্ত ধ্বনি মধ্যাহ্ন বায়ুতে মিশিয়া গেল। সে কাতর কণ্ঠে একবার ডাকিয়াছিল,—"হে ভগবান!"

মানুষের শোকদুঃখে ভগবানের হৃদয় বিগলিত হয় শুনিয়াছি। যদি না হইত তাহা হইলে পৃথিবীতে মানুষের দুঃখযন্ত্রণা আরও সহস্রগুণ বৃদ্ধি হইত। জাতিবিশেষে সমাজবিশেষে একথা ধ্রুব সত্য, তবে ব্যক্তিবিশেষে ইহা সর্ব্বদা না ও খাটিতে পারে, তাই কত সময় কত জনকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে শুনিয়াছি,—"ভগবান তোমার বিচার নাই!"—ক্ষুদ্র পৃথিবীর কীট আমরা ভগবানের বিচার শক্তির সমালোচনা করি এবং কত সময় তাঁহাকে বধির বলিয়া তিরস্কার করি।

এক পোয়া মাটির আলু সিদ্ধ দিয়া একটি পরিবারের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। গৃহে পরিবারবর্গের ক্ষুধার তাড়না অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া কৈলাস মানসিক যন্ত্রণায় ছট ফট করিতে লাগিল। এ অবস্থায় যদি সে ছেলে মেয়েদের কাছেও থাকে তাহা হইলে তাহার কতকটা শান্তি হইতে পারে ভাবিয়া কৈলাস ছুটিতে ছুটিতে বাড়ী গেল। নদেরচাঁদ তাহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা

করিল,—'বাবা কি এনেছো দেও, আমার বড় খিদে পেয়েছে। সকালবেলা সেই আলু সিদ্ধ পেয়েছি, আর কিছু পাইনি, এই দেখ পেট"—নদেরচাঁদ তাহার পেট দেখাইল। পার্ব্বতী বলিল, "বাবা,—খিদে! কি খাব?"—কৈলাসের দিদি বলিল, "কৈলাস রে! দুদিন না খেয়ে আছি, আর ত সহ্য হয় না, ছেলে মেয়ে দুটো যে মলো! কি করি?"—কেবল সর্ব্বংসহা মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা অভাগিনী রক্ষাকালী কোন কথা বলিল না, একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া মস্তক নত করিল, এবং অঞ্চলে চক্ষু মুছিল। সে বুঝিয়াছিল, কৈলাস রিক্ত হস্তে ফিরিয়াছে।

কৈলাস আর স্থির থাকিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া উঠিল, বলিল,—"দিদি, না খাইয়াই মরিতে হইবে। মরিবার আগে ছেলে মেয়ে দুটোকে কি রেখে যেতে পারবো! আর সহ্য হয় না। দেখি যদি ভিক্ষা করিয়াও একমুঠা চাউল মিলাইতে পারি।"—কৈলাস উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইল, নদেরচাঁদ তাহার পশ্চাতে স্খলিত পদে দৌড়িয়া গেল, বলিতে লাগিল,—"বাবা গো, আমাকে নিয়ে যাও, বড় খিদে পেয়েছে। বাবা, আমি ফেন খাব, ফেন খেতে আর কাঁদবো না।"— বালকের কণ্ঠস্বর দূরে কৈলাসের কর্ণে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল। কৈলাস আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাতর কণ্ঠে ডাকিল, "ভগবান!"—ভগবানের আসন টলিল কি?—রক্ষাকালী মধ্য পথ হইতে পুত্রকে কোলে করিয়া ঘরে লইয়া আসিল। ইতিমধ্যে কৈলাসের একজন প্রতিবেশী রাখাল মাঠ হইতে এক আঁটি ছোলার গাছ লইয়া আসিল; বলিল, "বৌ এই ছোলা গাছগুলো নেও, তোমার নদেরচাঁদের জলখাবার হবে।" গাছগুলিতে অনেক পুষ্ট, পক্বপ্রায় ছোলা ছিল। গাছসমেত সেই ছোলাগুলি অগ্নিতে অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া সেই ফল ছাড়াইয়া রক্ষাকালী পুত্র কন্যাকে তাহাই খাইতে দিল, রাখাল-বালকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় সিক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে ভাষায় সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিলনা, সজল নেত্রে স্থির দৃষ্টিতে ক্ষণকাল সে সেই বালকের দিকে চাহিয়া বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "ভাই তুই একশ বছরের হয়ে বেঁচে থাক।"

কৈলাস গ্রামের জমীদার-বাড়ীতে গিয়া করজোড়ে জমীদার কৃষ্ণসুন্দর বাবুর বৈঠকখানায় দাঁড়াইল। কৃষ্ণসুন্দর তখন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর গুড়গুড়িতে সুগন্ধি তামাক টানিতে টানিতে বয়স্যগণের সঙ্গে পাশা খেলিতেছিলেন;—অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হইবার পর হইতে তিনি আর মধ্যাহ্নে নিদ্রা যান না, তাঁহার গৃহচিকিৎসক এবং যমরাজমন্ত্রী চিত্রগুপ্তের বংশাবতংশ শ্রীযুক্ত নীতিকণ্ঠ কবিকণ্ঠভূষণ কাব্যচঞ্চু মহাশয় ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, দিবা নিদ্রায় অজীর্ণ রোগ বৃদ্ধি হইবে, অতএব আহারের পর বিশ্রামের সময়টি কোনপ্রকার লঘু কার্য্যে ক্ষেপণ করাই কর্ত্তব্য।

গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে নামাইয়া জমীদার মহাশয় বলিলেন, "কি রে কৈলেস, অসময়ে কি মনে করে?"

কৈলাস সরোদনে বলিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা, আপনি রক্ষা করুন, ছেলেমেয়ে দুটো না খেয়ে মরে!"

জমীদার বলিলেন, "তা আমি রক্ষে করবার কে? আজ দুবছর বাড়ীর খাজনা দিস্‌নি। পেয়াদা পাঠাইনি এই অনেক, আবার ভিক্ষে চাইতে এসেছিস্! লজ্জা করে না?"

নীলাম্বর ভট্টাচার্য্য জমীদার মহাশয়ের প্রতিবেশী। ভগিনীপতি কিছু টাকা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। বিধবা ভগিনীর টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়া তিনি জমীদার বাবুর মোসাহেবীতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি জমীদার মহাশয়ের কথা শেষ হইলে বলিলেন, "সত্যই ত! জোয়ান মরদ মানুষ, খেটে খেগে যা!—ভিক্ষে করতে লজ্জা করে না? বাবু আর কত দিক থেকে কত দান করবেন। এই সেদিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মহারাণীর 'কম্বর খানা' তৈয়ারীর জন্য পাঁচশো টাকা চাঁদা নিয়ে গেল।—টাকা ত আর গাছের ফল নয়!"

জমীদার মহাশয় বলিলেন, "না হে নীলু, পাঁচশো নয়। পাঁচশো হলে ত বাঁচতাম, হাজার টাকা দিতে হয়েছে; ম্যাজিষ্টর সাহেব আমাকে কুঠিতে ডেকে বল্লে, 'বাবু এ টাকা দিলে লাট সাহেব খুসী হয়ে তোমাকে রায় বাহাদুর করবে।' তা পদবীটের মান আছে বটে, যদি সরকার বাহাদুরের মর্জ্জি হয় তবে রায় বাহাদুর হতে কতক্ষণ!"

তিন চারিজন বয়স্য বলিল, "তা বটে, তা বটে; আপনি রায় বাহাদুর যে এত দিন হন নি এই আশ্চর্য্য!"

জমীদার মহাশয়ের দৃষ্টি কৈলাসের উপর নিপতিত হইল,

কৈলাস তখনও করজোড়ে দণ্ডায়মান ছিল। তিনি বলিলেন, "যাও খেটে খাওগে বাপু! নীলুভায়া ঠিক কথা বলেছে!"

কৈলাস কাতরভাবে বলিল, "সমস্ত দিন কাজের জন্য ঘুরিচি, কোথাও কাজ পাই নি কর্ত্তা!"

"তাই বুঝি আমার দোরে মরতে এসেছিস্? যা, কিছু পাবিনে।"

"ছেলেটা আর মেয়েটা মরে কর্ত্তা! আপনারও ত দুটো ছেলেমেয়ে আছে!"

জমীদার মহাশয় চক্ষু পাকাইয়া বলিলেন, "বটে! এত বড় কথা! আমার ঘরে দাঁড়িয়ে শাপ শাপান্ত!—তেওয়ারি! এই হারামজাদাকে দুটো থাপ্পড় দিয়ে দেউড়ীর বার করে দেও ত!"

তেওয়ারি টিকি দুলাইতে দুলাইতে আসিয়া, কৈলাসের গালে বিরাশি সিকার চপেটাঘাত করিয়া তাহার হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। তাহার পর দেউড়ীর বাহিরে আনিয়া তাহাকে পদাঘাত করিল!

৬

উন্মত্তের ন্যায় হইয়া কৈলাস সমস্ত দিন পথে পথে ঘুরিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার সে বাড়ীর কাছে গেল, কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল, তাহার পুত্র নদেরচাঁদ মাটিতে পড়িয়া ধুলায় লুটাইতে লুটাইতে তখনও বলিতেছে "বাবা গো, এস গো। বড় খিদে লেগেছে বাবা! আর থাক্‌তে পারচিনে!"—কৈলাস আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না, তাহার চক্ষু অস্বাভাবিক দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। কৈলাস টলিতে টলিতে মাতালের মত মধ্যাহ্নের সেই তেঁতুল তলায় আসিল। একবার কি ভাবিল, বিড় বিড় করিয়া কি বলিল, তাহার পর গাছে উঠিল; একটি অনতিস্থূল শাখায় পরিধেয় বস্ত্রের ফাঁস প্রস্তুত করিয়া সে তাহা গলায় দিল, এবং ডাল হইতে পা সরাইয়া লইল।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে কৈলাসের সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি লুপ্ত হইল, কেবল তাহার কর্ণরন্ধ্রে একটি ক্ষুদ্র বালকের ক্ষুধার্ত্ত আর্ত্তনাদ শ্মশানের মধ্যাহ্ন বায়ুর ন্যায় প্রবেশ করিতে লাগিল, অবশেষে তাহাও থামিয়া গেল। মহাজনের ঋণপাশ হইতে, দুশ্চিন্তার আক্রমণ হইতে, সকল ক্ষোভ, দুঃখ, অপমানের হাত হইতে সেই নববসন্তের সন্ধ্যায় সে চিরমুক্তি লাভ করিল।

নদেরচাঁদ তখনও ধুলায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিল,—"বাবা গো! বাবা গো! বড় খিদে লেগেছে বাবা!"

বাঙ্গালী সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ হতভাগ্য বঙ্গীয় শ্রমজীবীর ইহাই অদৃষ্টলিপি!*

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বলদেব পালিত।

৺বিশ্বনাথ পালিত দানাপুর হইতে ইংরাজের কর্ম্মচারীরূপে আফগানিস্থানে গিয়াছিলেন। সে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখন তাঁহার পুত্র ৺বলদেব পালিত নিতান্ত বালক। বিশ্বনাথ কাবুল যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। তদানীন্তন রাজসরকার হইতে তাঁহার নাবালক পুত্রের শিক্ষা ও ভরণপোষণের নিমিত্ত বৃত্তির ব্যবস্থা হইয়াছিল। বলদেব পালিত মহাশয় দানাপুরে ইংরাজী শিক্ষা করিলে তিনি পেন্সন-পে-আফিসে (Pension Pay Office) কেরাণী নিযুক্ত হন। তখন দানাপুরে পেন্সনপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের পেন্সন বণ্টনের একটা কেন্দ্র ছিল। সিপাহীবিদ্রোহের পর, অনেক পেন্সনপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাজবিদ্রোহী হইয়াছিল এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কোম্পানি অনেকের পেন্সন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বলদেব পালিত এই সকল লোকের মধ্যে যাহারা নির্দ্দোষী তাহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়ের সহিত লেখালেখি করেন। তাহার ফলে অনেকেই পুনরায় বৃত্তি পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। এই অপ্রত্যাশিত ফললাভে অনেকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে বাজেয়াপ্ত পেন্সনের অংশ দিতে চাহিলে তিনি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু পরে উপকৃত ব্যক্তিগণের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি প্রতিদান গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

---

* এই গল্পটি "বঙ্গভাষা"র প্রকাশার্থ লিখিত হইয়াছিল। ঐ অল্পায়ু কিন্তু নানা উৎকৃষ্ট রচনায় অলঙ্কৃত মাসিক পত্রিকা উঠিয়া যাওয়ায় উহার সম্পাদক কুমার শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় আমাদিগকে এই রচনাটি পাঠাইয়া দিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।—প্রবাসী-সম্পাদক।



স্বর্গীয় বলদেব পালিত।

বলদেব পালিত প্রথমে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহা যথেষ্ট নহে। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তিনি জ্ঞান চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমে তিনি ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠ করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি এই সময়ে তিনি রাত্রি বারোটা একটা পর্য্যন্ত অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। তাহার পর সংস্কৃত শিক্ষার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইল। স্বীয় চেষ্টায় তিনি শীঘ্রই সংস্কৃত শিক্ষা করিলেন। ক্রমে অধ্যয়ন ও অনুশীলনের গুণে সংস্কৃতে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিল। পাঠক পরে তাহার পরিচয় পাইবেন। ভাল সংস্কৃত গ্রন্থ যাহা পাইলেন তাহা তিনি একেবারে আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। সেই সময়ে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর-ছন্দের কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। পালিত মহাশয়ের মনে হইল সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কাব্য রচনা করা যায় কি না? ইতি পূর্ব্বেই তাঁহার কবিতা রচনার অভ্যাস জন্মিয়াছিল। সুতরাং এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে বিলম্ব হইল না। কলিকাতায় যাতায়াত সূত্রে ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার খুব আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। মিত্র মহাশয় তাঁহার কাব্যানুরাগ দেখিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে একাধিকবার দানাপুরে আসিয়া তাঁহার সহিত কালাতিপাত করিয়া গিয়াছেন। পালিত মহাশয়ের বন্ধুবর্গের মধ্যে অধ্যাপক-প্রবর ও সুদার্শনিক ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের (এম, এ) নাম উল্লেখ যোগ্য। ইনি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পাটনা কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। পালিত মহাশয় গম্ভীরপ্রকৃতি ও ঋজুস্বভাবের লোক ছিলেন। উক্ত অধ্যাপক মহাশয়ও খুব চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং উভয়ের মিলনে মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়াছিল; এবং পরস্পরের সাহচর্য্যে যে উভয়েই উপকৃত হইয়াছিলেন তাহা তৎকালীন বঙ্গদর্শন পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। রাজকৃষ্ণবাবুর "মেঘদূতের" অনুবাদ পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষাকে পুষ্ট করিবার ভাব তিনি পালিত মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পালিত মহাশয় ইংরাজী সংস্কৃত ও বাংলা ব্যতীত কিছু উর্দ্দুও শিক্ষা করিয়াছিলেন। যাহা হউক বাংলা সাহিত্যের নিমিত্ত তিনি যেটুকু করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

কোন লেখকের পরিচয় দিতে হইলে আমরা অনেক সময় আমাদের নিজের কথায় তাঁহার কতকগুলি প্রশংসা বা নিন্দা করিয়া ক্ষান্ত হই। ইহার ফল এই হয় যে অনেকেই সেরূপ আলোচনায় তৃপ্তিলাভ করেন না। বিশেষতঃ যখন বক্ষ্যমাণ কবির কাব্য সকলের নিকট পরিচিত নয়, সেক্ষেত্রে ঐরূপ আলোচনা অরণ্যে রোদনের ন্যায় ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা আছে। সুতরাং কোন কবির পরিচয় দিতে হইলে তাহার কাব্যই প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত।

স্বর্গীয় পালিত মহাশয়ের দুই খানি কাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। শুনিয়াছি তিনি আরও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।* যাহা হউক, এই গ্রন্থ দুইখানির নাম— (১) ভর্তৃহরি কাব্য ও (২) কর্ণার্জ্জুন কাব্য। ভর্তৃহরি কাব্য চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। ১২৭৯ সালে উহা মুদ্রিত হয়। কর্ণার্জ্জুন কাব্যে মুদ্রাঙ্কনের সন দেখিতে পাইলাম না। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম উহা প্রায় একই সময়ে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

পালিত মহাশয়ের রচনার বিশেষত্ব এই যে তিনি বাংলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কৃত "মেঘদূতে"র কয়েকটী শ্লোকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত

* তন্মধ্যে একখানির নাম "কাব্যমঞ্জরী"।

হইয়াছে। উহা কতকটা সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে রচিত বলিয়া মনে হইল। শুনিয়াছি কেহ কেহ "মেঘদূতের" বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন।* জানি না উহাতে কি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু মনে হয় মন্দাক্রান্তা ছন্দ বাদ দিলে মেঘদূতের বারো-আনা সৌন্দর্য্য চলিয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদিন বর্ষাকালের প্রভাতে ষ্টীমারযোগে ঢাকা যাইতেছিলাম। পদ্মার উত্তালতরঙ্গরাজির সহিত ষ্টীমারের চাকার সংঘর্ষণে এক অপূর্ব্ব ঘর্ঘর-ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। আকাশে মেঘাড়ম্বর ও নিম্নে অনির্ব্বচনীয় ঘর্ঘর-শব্দ এই দুই মিলিত হইয়া বাস্তবিক এক অপূর্ব্ব মন্দাক্রান্তা ছন্দের সৃষ্টি করিতেছিল। সেই দিন বুঝিলাম সঙ্গীতের সুর ও কাব্যের ছন্দ একই উপাদানের বস্তু। সুতরাং কাব্যরচনায় যে ছন্দ নির্ব্বাচনের প্রয়োজন এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। তবে এ কথাও সত্য যে সৌন্দর্য্য উদ্বুদ্ধ করিলে ছন্দ হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয় না—ভাবের সঙ্গে ভাষা ও ছন্দ আপনি আসিয়া পড়ে। যাহা হউক ভর্তৃহরি কাব্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল :—

"এই খণ্ড কাব্যখানিতে ভূ-বিখ্যাত রাজা ভর্ত্তৃহরির বৈরাগ্য-সূচনা ও বনগমন বর্ণিত হইয়াছে। ইহা আদ্যোপান্ত সংস্কৃতচ্ছন্দে বিরচিত। * * * বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যাহার অদ্ভুত রচনাশক্তি "যৌবনোদ্যান" প্রভৃতি কাব্যত্রয়ে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তিনি আমার অনুরোধে উপজাতিচ্ছন্দে (বৃত্রাসুর বধ নামক) একখানি মহাকাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। * * ভারতচন্দ্র অসাধারণ রচনাশক্তি সত্ত্বেও কেবল 'ভুজঙ্গপ্রয়াত', 'তূণক', 'তোটক' 'পজ্ঝটিকা' 'গীতিকা' 'পঞ্চচামর' প্রভৃতি কতিপয় সামান্য অনুৎকৃষ্ট ছন্দ লিখিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন। * * উপজাতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান ছন্দের একটীরও উদাহরণ বঙ্গভাষায় দিয়া গেলেন না। * * তিনি যদি, এই সকল ছন্দে স্বীয় কাব্যগুলিকে অলঙ্কৃত করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে এত দিনে অস্মদ্দেশীয় কবিতার যে কত উন্নতি হইত, তাহা বলা যায় না। কবি-তিলক শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদনকে ইংরাজীমতে অমিত্রাক্ষর পয়ার লিখিতে হইত না। * *।"

লেখকের সহিত শেষোক্ত বিষয়ে আমাদের মত মিলে না। মাইকেলের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সংস্কৃত ছন্দে কবিতা রচনা করেন নাই এ জন্য দুঃখ হইতে পারে, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি যে বাংলা সাহিত্যের শ্রী উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন এ কথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। ইহার পর গ্রন্থকার ছন্দ, যতি, ও শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আরও লিখিতেছেন :—

"আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে এই কাব্যের স্থানে স্থানে আমি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত মহাকবিদিগের রচনার অনুকরণ বা অনুবাদ করিয়াছি। * * দ্বিতীয় সর্গে "কাদম্বরীর" এবং তৃতীয় সর্গে "উত্তরচরিতের" অনুকরণ সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। * * রাজা ভর্ত্তৃহরির * * অনঙ্গা ও পিঙ্গলা নাম্নী দুই মহিষী ছিলেন * * রাজা ভর্ত্তৃহরি অনঙ্গার অসচ্চরিত্র কিরূপে জানিতে পারিলেন তাহা বেতাল পঞ্চবিংশতিতে প্রকাশিত আছে, এবং তাহাই এই কাব্যখানির প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি রাণীর কুব্যবহার দৃষ্টে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিরক্তচিত্তে সাম্রাজ্য পরিত্যাগানন্তর সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া পুষ্করতীর্থের নিকটবর্ত্তী নাগপর্ব্বতে, আলোয়ারে, কাশীধামে এবং চরণাদ্রিতে বহুকাল বাস করেন, এরূপ কিম্বদন্তী আছে। নাগপর্ব্বতে তিনি যে প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া ধ্যান করিতেন সেই প্রস্তরখণ্ড অথবা তাহার কোন প্রতিনিধি সেখানকার পাণ্ডারা যাত্রিগণকে দেখাইতে ক্রটী করে না; এবং চুনারের কেল্লায় রাজা ভর্ত্তৃহরির গুহা অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে। * * তাঁহার নামে এক শৈব সম্প্রদায় অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। বোধ হয় তিনিই তাহাদের আদি গুরু।"

এই সুদীর্ঘ ভূমিকার পাদটীকার প্রতি মনোনিবেশ করিলে গ্রন্থকারের প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

পালিত মহাশয়ের রচনা হইতে কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করা গেল। প্রথম সর্গে রাজপত্নী অনঙ্গার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিতেছেন—

"সুতনু অনতিবক্র ভ্রূলতা দীর্ঘ-রেখা;
প্রণয়-সলিল-পূর্ণ স্নিগ্ধ নীলাব্জ-নেত্র;
যিনি মধুকর পালী পক্ষ্ম রাজী বিশালা;
নয়ন-তট অপাঙ্গে, কজ্জলে উজ্জ্বলাভা।"
"চরণ-অরুণ বর্ণে লজ্জিছে রক্ত-পদ্মে;
ক্বণিত কখন তাহে স্বর্ণমঞ্জীর মঞ্জু;
মধুর মধুর ধারা যার সিঞ্জার শব্দে,
মদকল অলিবৃন্দে আসিয়া হার মানে।"

শিপ্রা-তটের সৌন্দর্য্য নিম্নোদ্ধৃত আটটী চরণে বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—

ত্রিদশ-জয়-পতাকা তুল্য, নীলাম্বরীকে
সচল জলদ-মালা শোভিছে রক্তবর্ণে;
কল-কলিত বলাকা নিম্নভাগে বিরাজে;
নিরখি গগন-শোভা মোহিতা রাজপত্নী।"
"বিবিধ কুসুম গন্ধে পূর্ণ উদ্যানরাজী;
রসিক-মধুপ-পুঞ্জে গুঞ্জি পীযূষ ভুঞ্জে;
ফুলময় নব নীপে পাপিয়া মুক্তকণ্ঠে
ভুলয় মধুর তানে মোহিছে চিত্ত গানে।"

উল্লিখিত চারিটী শ্লোকই মালিনীছন্দে রচিত। শ্রী

* ৺ অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইহার মধ্যে একজন। তিনি সংস্কৃত ছন্দ রক্ষা করেন নাই।—লেখক।

সর্গেই রাজা জ্যোৎস্নাপ্রাবিত উপবনে রাণী-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—

"ঘারেক উর্দ্ধে করিয়া সুদৃষ্টি
দেখ প্রিয়ে, নব্য শশী সরাগে
সমস্ত লোকের বিনোদি চক্ষুঃ
প্রাচী-বধূ-আস্য সহাস্যে চুম্বে।"

"তথাপি তাহে হইয়া অতৃপ্ত
নিশীথিনী-কান্ত নিতান্ত ধৃষ্ট,
সরোবরে শুভ্র কর প্রসারি,
জাগাইছে সুপ্ত কুমুদ্বতীরে।"

এই দুইটী শ্লোক উপজাতিচ্ছন্দে রচিত। দ্বিতীয় সর্গের ভাট-বন্দনা হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল; ইহা মদিরাচ্ছন্দে রচিত—

"ফুল্ল বিশাল সমুজ্জ্বল লোচন, পাটল পঙ্কজচ্ছবি নিন্দে;
বজ্র-সমান বিপক্ষদলে, ফুলবাণ হয়ে রমণী-মন বিন্ধে।
চন্দন-অর্দ্ধসুধাকর সুন্দর উন্নত চারু ললাটে,
হেরি মহোজ্জ্বল দীপ্তি অরি-রাজগণের ভয়ে বুক ফাটে।"

বন্দি-বন্দনা হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল। ইহা মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদীচ্ছন্দে রচিত; গীতগোবিন্দে এই ছন্দের বহুল ব্যবহার হইয়াছে—

"প্রতাপ-রবি তব শশিশেখর-গিরি তাপিল যদি প্রকাশি,
জিনি তিন-পথগা* কীর্ত্তি-নিম্নগা যদ্যপি ডুবাল কাশী,
ব্যাকুল অন্তর বনিতা সহ হয় আগত তব আগারে;
তুমি হৃদি-ভবনে নিলে ত্রিনয়নে অন্নদায় ভাণ্ডারে।"

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে যথেষ্ট কবিত্বশক্তি, অনুশীলনশক্তি ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু স্থানে স্থানে দোষ নাই এমন নহে। প্রাচীন কাব্যসমূহের অশ্লীলতা দোষ কিয়ৎপরিমাণে এই গ্রন্থে সংক্রামিত হইয়াছে, তথাপি গ্রন্থকার আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

"কর্ণার্জ্জুন কাব্য" কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ পরীক্ষার্থিনীদিগের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। ইহাতে সংস্কৃত ছন্দ অল্প ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু পয়ারে লিখিত কোন কোন অংশেও বেশ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে কবি লিখিতেছেন—

"যামিনী যামার্দ্ধ গত কৌরব-শিবিরে;
প্রকৃতি ঢাকিলা মুখ তমিস্রা-তিমিরে;
নক্ষত্র-নিকরে যথা মণ্ডিত গগন,
কুরুক্ষেত্রে জ্বলিতেছে অগ্নি অগণন।
যদিও সমর-শ্রান্ত বহু লক্ষ বীর
নিদ্রার কোমল অঙ্কে এখন সুস্থির,
জলধি-নির্ঘোষ সম কল কল রব
এখনো শান্তির রাজ্য করিছে বিপ্লব।
মাঝে মাঝে শুনি অশ্ব-প্রোথের নিস্বন,
তার সঙ্গে মাতঙ্গের বিটপী চর্ব্বণ।
স্থানে স্থানে শস্ত্রপাণি প্রহরি নিচয়
আগন্ত' জনেরে ডাকি লয় পরিচয়।
কখনো বা নিশাচর অশুভ কৌশিক
অন্তরীক্ষে ঘোর রবে ডাকে আকস্মিক।
বল, দেবি বীণাপাণি, এ হেন সময়ে
মহারাজ কৌরবের বিশ্রাম আলয়ে,
পরিয়া সমর-সজ্জা ধূলায় ধূসর,
উপস্থিত হয় যত মহা ধনুর্দ্ধর?
সমবেত বীরবর্গ মন্ত্রণা কারণ;
অনলে অনর্থ হেতু গ্রহ-সম্মিলন।
জ্বলিতেছে রত্নাধারে দীপ শত শত;
নিশারে নাশিয়া যেন প্রভাত আগত;
যায় কি তাহার হায়! মনের আঁধার?
দীপ্তিহীন বিমলিন বদন সবার।
সুবর্ণ-রজতময় আসনে আসীন,
অধোমুখে সভ্যগণ চিন্তায় বিলীন।"

উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিতে করিতে মনে হয় যেন কবিবর নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধের" অংশবিশেষ পাঠ করিতেছি। এস্থলে বক্তব্য এই যে, "পলাশীর যুদ্ধ" কর্ণার্জ্জুন কাব্যের পরে প্রকাশিত হয়। এই কাব্য ছয়সর্গে সমাপ্ত। ইহার তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ পাঠ করিতে করিতে মন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যায়। মানব-মনে যুগপৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাব (হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময় ইত্যাদি) উদ্রেক করিবার শক্তি যদি কাব্যের লক্ষণ হয়, তবে এই গ্রন্থকে সুলক্ষণাক্রান্ত কাব্য বলা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয় এমন সুরচিত কাব্যেও দু'একটী অপভ্রংশ শব্দের উচ্চারণানুযায়ী বর্ণ-বিন্যাস প্রদত্ত হইয়াছে। এই কাব্যের চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভিক অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া আমরা বিদায় লইব—

"নিঃশব্দে নিশীথ আসি' গাঢ়-নীলবেশে
সুষুপ্তির ইন্দ্রজালে মোহে চরাচর;
গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি অম্বরীমণ্ডল।
নীরবে নক্ষত্র-কুল জাগে নভোদেশে
পাণ্ডব-শিবিরে যথা প্রহরি-নিকর,
অথবা সমর-ক্ষেত্রে উল্কামুখী দল।

* * *

* ত্রিপথগা—গঙ্গা।

"নিদ্রাবেশে কোন যোদ্ধা দেখিছে স্বপন
বহুদিন পরে সেই প্রত্যাগত বাসে।
সাধের রমণী তার তাহারে পাইয়া,
অশ্রুজলে করিতেছে পদ-প্রক্ষালন;
এলাইয়া বেণী পুনঃ মনের উল্লাসে
মুচিতেছে (?) সেই জল কেশপাশ দিয়া।'

"পিতারে চিনিতে নারি অবাক হইয়া
ধূলা মাখা কোমলাঙ্গ শিশু সুতগণ,
মায়ের অঞ্চল ধরি পিতৃমুখ পানে,
সবিস্ময়ে এক দৃষ্টে রয়েছে চাহিয়া,
তখন তাদিগে সতী করিয়া চুম্বন
'বাবা' বলি' ডাকিবারে কহে কাণে কাণে।"

"আহ্লাদে সৈনিক বর কোলেতে যেমন
লইবে সর্ব্বস্ব ধন সন্তান সকলে,
শিবার চীৎকারে তার স্বপ্ন পায় লয়।
কোথা বা সে প্রিয়া। কোথা প্রিয় পুত্রগণ।
ভাসিল বদন তার নয়নের জলে
দীর্ঘশ্বাসে তরঙ্গিত হইল হৃদয়।"

গ্রন্থকার শেষ-জীবনে স্বীয় বাঁকিপুরস্থ ভবনে বাস করিতেছিলেন। যৌবনের উপার্জ্জিত অর্থ তাঁহাকে ভোগ-বিলাসের পথে পরিচালিত করে নাই। লক্ষপতি হইয়াও তিনি কিরূপ দীনবেশে থাকিতেন, তাহা চিত্র হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি নিজে জ্ঞান-পিপাসু ছিলেন, সেই নিমিত্ত দানাপুর, বাঁকিপুর, আরা, ছাপরা ও গয়ায় ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সাধারণের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি দানবিষয়েও মুক্তহস্ত ছিলেন। স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। বেহারের অনেক কাজ ইঁহারা মিলিতভাবে করিতেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী পালিত মহাশয় বিস্ফোটক রোগে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। ঐ বৎসর বেহারের পক্ষে বড় দুর্ব্বৎসর গিয়াছে। মাননীয় গুরুপ্রসাদ সেন ঐ বৎসরেই ১৪ই অক্টোবর স্বর্গারোহণ করেন। ইঁহার বিষয় পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

খেয়া।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুর নবপ্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থ খেয়ার সমালোচনা করা হইয়াছে। সমালোচনা প্রসঙ্গে যেগুলি কবিতাকে সমালোচক মহাশয় খুব স্পষ্ট কবিতা বলিয়াছেন, তন্মধে 'কোকিল' অন্যতম। এই কবিতার গূঢ় তাৎপর্য্য আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। 'অনাহত' 'অনাবশ্যক,' 'গানশোনা' নামক কবিতা ত্রয়ে অর্থও ঈষৎ জটিল বোধ হইয়াছে। সমালোচক মহাশয় বা অন্য কো সুধী ঐ কবিতাগুলির অর্থ প্রকাশ করিলে আমার ও অনেকের উপকা করিবেন।

সমালোচক মহাশয় যে তিনটি কবিতাকে 'সত্যসত্যই ফুটিতে পা নাই কাকেই অস্পষ্টতাদোষে দূষিত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধে 'বাঁশি' আমার নিকট অস্পষ্ট, কিন্তু অপর দুইটি কবিতার অর্থ যা আমি বুঝিয়াছি তাহা এই স্থলে প্রকাশ করিতেছি,—কবি ও সুধীবৃ তাহার যথার্থ বিচার করিবেন।

দান।

ভেবেছিলাম চেয়ে নেব তোমার পবিত্র কোমল স্নিগ্ধ সুন্দর প্রস একটুকু কিন্তু হে প্রভু আমি চাইনি সাহস করে'।

ভেবেছিলাম তোমার প্রসাদ যখন বিশ্বে বিতরিত হ'বে তখন আ একটি কণা কুড়াইয়া লইব। তাই আমি কাঙালের মত প্রতীক্ষ করিতেছিলাম, তবু চাহনি সাহস করে'।

হে প্রভু আমি যাহা পাইলাম তাহা সুখ নহে দুঃখদাহ। আ করেছিলাম পাইব এক পাইলাম আর।

এখন আমি ভাবি বসে' একি তোমার দান। ওগো প্রভু, আমি অক্ষম অশক্ত, এই গুরুভার দুঃখ বহন করা কি আমার সাধ্য। তোম দান আমার বুকে পুষে রাখবার জিনিষ। কিন্তু

রাখতে গেলে বুকের মাঝে
ব্যথা যে পায় প্রাণ।
তবু আমি বইব বুকে
এই বেদনার মান—
নিয়ে তোমারি এই দান'।

আমি চরম দুঃখ বরণ করিয়া হৃদয়ে লইলাম। আমি তোমার ন মরণকে জয় করিয়া সর্ব্বজয়ী অভয় হইব। তোমার দুঃখদান আ কর্ম্মবন্ধন খণ্ডন করিবে।

তোমাকে পাইবার জন্য আর আমার ব্যাকুল চঞ্চলতা নাই। তু আমায় যাহা দিয়াছ তাহা পাইয়াই আমি চরিতার্থ। তোমার দুঃখব্যথা আমাকে তোমার উপযুক্ত করিয়া আপনা আপনি গড়ি তুলিবে।

হার।

এই ভবসংসার জুয়ার আড্ডায় আমরা সকলে ক্রীড়ারত। আ আপনার অদৃষ্ট ভাগ্য আপনি গড়িয়া তুলিতেছি।

তুমি আমাদিগকে (আমাকে ও আমার ক্রীড়াসঙ্গীকে, যা সহিত আমার ভাগ্যসূত্র গ্রথিত) 'হারের দলে বসিয়ে দিলে'। জীবনে যদি ক্রমাগত হারিয়াই চলিতে হয়, তথাপি তোমার প্রবর্ত খেলা আমরা ছাড়িব না। আমরা হারের দুঃখ বহন করিয়া মৃত্যু অগ্রসর হইব।

হে রাজাধিরাজ, 'পিতা নোহসি'। আমরা রাজার ছেলের মত বড় ডাক ডাকিয়া খেলিব, 'বিনা পণে খেলব না গো'। তুমি সং না পাইলে নিষ্কৃতি দেও না। আমাদের সকল কর্ম্মফল তোম সমর্পণ করিয়া আমরা রিক্তমুক্ত হইব।

কিন্তু একবার সকল বিত্ত ঘুচাইয়া রিক্তমুক্ত হইলেই [illegible] না। পুনর্জন্ম পুনরায় খেলায় প্রবর্ত্তিত হয়। [illegible]

জয়ী হয় (সংসারে যে সুখসম্পৎ পায়) সে যে প্রকৃত জয়ী, তাহা কে জানে? এই সংশয়ক্ষেত্রে পরাজয়ই আমাদের ভাল।

'ছেড়ে তোমার করব সাধন,
ক্ষতির ক্ষুরে কাটব বাঁধন,
শেষ দানেতে তোমার কাছে
বিকিয়ে দেব আপনারে'।

'তারপরে কি করবে তুমি' আমাদের উপায়, সে তত্ত্ব ভাবিয়া নির্ণয় করিতে কে পারে প্রভু। 'শুধু তুমি জানাও যারে সেই জানে'।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যোতির্নির্ব্বাণ।

দশম পরিচ্ছেদ।

সোণামণি।

বর্ষার জল-প্রবাহ-বিধৌত প্রস্ফুটিত কমলিনীর পূর্ণসৌন্দর্য্য কি কখনও আপনার চক্ষে পড়িয়াছে? শারদীয় শিশির-ধারা-প্লাবিত বনমল্লিকার শুভ্র ঢলঢলায়মান, সৌন্দর্য্যসম্ভার কি কখনও আপনার চক্ষে পড়িয়াছে? জ্যোৎস্নাপ্রবাহ-প্লাবিতা স্থিরা ধীরা অতি গম্ভীর মূর্ত্তি প্রসন্নমুখী শ্যামল প্রকৃতির গম্ভীর সৌন্দর্য্য কি কখনও আপনার দৃষ্টিপথে আসিয়াছে? যদি আসিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার অপরিমেয় উচ্ছলিত সৌন্দর্য্যসম্ভারের পবিত্রতার সহিত, সোণামণির রূপ, কল্পনায় আপনার মনে আঁকিয়া লউন।

সোণামণি অল্প বয়সে বিধবা। সোণা বিক্রমপুরেশ্বর রাজা চাঁদরায়ের একমাত্র আদরিণী কন্যা। পূর্ণ মুকুলিত অবস্থায় কীটদষ্ট হইয়া কোরকের যে অবস্থা, অকালবৈধব্যে সোণামণির সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

সোণার ভ্রাতৃজায়া রাণী কমলা, সোণাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, কিন্তু স্নেহে তাহার প্রাণের দুঃখ যাইবার নহে। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি—বিক্রমপুরেশ্বর রাজা চাঁদরায় সোণা বলিতে অজ্ঞান—কিন্তু তাহাতেও সোণার দুঃখ যাইবার নহে। ভগিনীস্নেহ-বিমুগ্ধ যুবরাজ কেদার রায় নানা মিষ্ট কথায় সোণার মন তুষ্ট করেন, কিন্তু তাহাতেও সোণার প্রাণের উন্মভাব বিদূরিত হয় না। যাহা জগতে সোণার সর্ব্বস্ব ছিল, যাহা থাকিলে দুঃখিনীও রাজরাণী, যাহা রমণীর সুখ, শান্তি, আশা, আনন্দ—যাহা রমণীর জীবনের ধ্রুবতারা, হৃদয়াকাশে একমাত্র জ্যোতির্ম্ময় ষোলকলা পূর্ণ দীপ্ত শশধর—সোণা অভাগিনী সে বহুমূল্য রত্ন হারাইয়াছে।

সেই শৈশব-যৌবনের প্রথম মুখরিত অবস্থায়, স্বামীর স্মৃতি আজও ধিকি ধিকি তাহার প্রাণের অতি নিভৃতে নীরবে জলিতেছে। সেই একদিনের আদর, একদিনের সোহাগ, একদিনের বিরাগ সবই তাহার মনে আছে। একদিন তাহার সব ছিল—আজ সে সর্ব্বস্ব হারাইয়া দুঃখিনী। সকলে বলে সোণা অদৃষ্টদোষে স্বামীহীনা। কিন্তু সোণা ভাবে—তাহার কর্ম্মদোষে সে স্বামীকে প্রকারান্তরে হত্যা করিয়াছে। অথবা তাহার অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছে।

চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশীয় এক পরম কান্তিমান যুবার সহিত সোণার বিবাহ হইয়াছিল। সোণা বাল্যকাল হইতেই বড় আদরে পালিতা। অতি আদরে, তাহার মনে একটা আত্মম্ভরিতা অসিয়াছিল। সেই আত্মম্ভরিতায় তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল।

রাজ-জামাতা রূপে গুণে সর্ব্ববিষয়েই সোণার অনুরূপ। তাঁহার হৃদয়ের সরলতা উদারতা দেখিয়া রাজপুরীর সকলেই মুগ্ধ। সকলেরই মুখে রাজ-জামাতার গুণের সুখ্যাতি। এত সুখ্যাতি যৌবনমদোন্মত্তা, অতি-আদরিণী সোণার ভাল লাগিল না।

সোণা সাধ্যমত স্বামীর মনোরঞ্জন করিত—কিন্তু এক এক সময়ে পারিত না। একটু যেন উদ্ধত ভাব প্রকাশ করিত। তাহাতে রাজ-জামাতা কুমার শশাশেখর রাগ করিতেন না। হাঁসিতেন মাত্র। কিন্তু উদ্ধতপ্রকৃতি সোণামণি সে হাসিতে আরও রাগিয়া যাইত। স্বামী যখন আদর করিয়া বলিতেন—"সোণা! তোমায় আজ চন্দ্রদ্বীপে আমাদের বাটীতে লইয়া যাইব।" সোণা সেদিন রাগিয়া কিছুই খাইত না—স্বামীর সহিত কথাও কহিত না।

একদিনের ঘটনায় কিন্তু বিপরীত ফল উৎপন্ন হইল। যাহা হইল—তাহার আর প্রতিকারের পথ রহিল না। সে দিন যাহা হইয়াছিল, সোণা আজও তাহার ফল ভোগ করিতেছে। সেই একদিনের পাপে সোণার চক্ষে যে জলধারা বহিতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আজও শেষ হয় নাই—হইবেনা—সোণা যতদিন থাকিবে—যতদিন তাহার দেহ মাটীতে না মিশাইবে, তাহাকে এইরূপেই কাঁদিতে হইবে। ঘটনাটা আপনাদের জানিয়া রাখা উচিত।

দোল-পুর্ণিমা। আকাশে মৃগাঙ্কের সম্মোহন মূর্ত্তি যেন সেদিন শতগুণে উজ্জ্বলতা লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নব প্রতিষ্ঠিত শ্রীপুরে মহা-সমারোহে দোলযাত্রার আয়োজন। গৃহে গৃহে উৎসব, বাদ্যধ্বনি, মঙ্গলঘট, ধ্বজপতাকা। প্রত্যেক গৃহপ্রাঙ্গণ, প্রবেশদ্বার, এমন কি শয়নকক্ষ পর্য্যন্ত আবিরে লালে—লাল! উজ্জ্বল চাঁদের কিরণ শোভাময়ী শ্রীপুরের আবির রাগ লোহিত সৌন্দর্য্যের উপর পড়িয়া আরও সুন্দর দেখাইতেছিল।

উৎসবকোলাহল রজনীর গম্ভীরতার সহিত ক্রমশঃ মৃদুল হইয়া আসিতেছে। দূরশ্রুত বেণুবীণার রব, ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। রমণীর দ্রুত গমন-সঞ্জাত ভূষণ-শিঞ্জন ক্রমশঃ অতি মৃদু হইয়া পড়িতেছে। রজনীর দ্বি-যাম অতীত প্রায়।

এই সময়ে, এক উজ্জ্বলিত কক্ষে বসিয়া সোণামণি, আর তার পাশে—রাজ-জামাতা কুমার শশীশেখর। সমস্ত দিন হোরি-ক্রীড়ার পর গাত্র মার্জ্জনা করিয়া, নববস্ত্রে ভূষিতা হইয়া, সুবাসিত তাম্বুল-রাগে ওষ্ঠাধরকে আরও সুরাগরঞ্জিত করিয়া সোণা আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে বসিয়াছে।

রাজকুমার শশীশেখরের কি যেন একটা দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল। তিনি সোণার রুক্ষপ্রকৃতি ও যৌবনসুলভ প্রগলভ-ভাব জানিয়াও একটু সামান্য রহস্যের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলেন না। গোলাপ ও মৃগনাভি-বাসিত দুই চারিটী কুঙ্কুম, তাঁহার হস্তে একটি ক্ষুদ্র থলিয়ায় লুক্কায়িত ছিল। ইচ্ছা—সোণাকে সেই কয়েকটী কুঙ্কুম ছুঁড়িয়া মারিয়া লালে লাল করিয়া দিবেন।

সম্মুখে রৌপ্যপাত্রে রাশিকৃত আবির কুঙ্কুম রহিয়াছে। রাশিকৃত সদ্যপ্রস্ফুটিত সুবাসিত ফুলের মালা রহিয়াছে—রাজকুমারের তাহাতে দৃষ্টি নাই। তাঁহার হাতে যে কয়েকটী লুকান কুঙ্কুম আছে—সেগুলি যেন সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য। কেন না—ইহা তাঁহার স্বহস্ত-নির্ম্মিত। অবসর বুঝিয়া প্রেমালাপের পূর্ব্বেই, রাজকুমার তাহার দুইটী লইয়া সোণাকে ছুড়িয়া মারিলেন। সুবাসিত কুঙ্কুম, সোণার পুষ্প-কোমল অঙ্গের সামান্য সংঘর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া বিদীর্ণ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কুঙ্কুমমধ্যস্থ কতকটা সুবাসিত ফাগ্ সোণার চক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাতে সোণা একটু যন্ত্রণা পাইল।

আবার সেই ক্রোধ, আবার সেই—উদ্ধতা। অ সেই উন্নত বঙ্কিম-গ্রীবার হেলনী, আবার সেই ক্রো অভিমানরঞ্জিত, যুগ্ম-ওষ্ঠাধরের মৃদু-কম্পনভঙ্গী। সোণ রহস্য বুঝিল না, এ প্রেমালাপ বুঝিল না, রাগিয়া বলি "তোমার মত নরাধম স্বামীর আর যেন না মুখ দেখি হয়।"

অনেক সময়ে অনেক রকমের কথা মানুষের মুখ হ বাহির হয়। সেগুলার গায়ে যদি কিছু ভালমন্দ মি থাকে, তাহা যেন বায়ুস্তরে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু হাও গুণে কখন কখন অতি সামান্য শ্লেষ, অতি সামান্য তিরস্ক বিষাক্ত-বিশিখের ন্যায় মানবের হৃদয়ে আঘাত করে। আঘাতে মানুষ তখনই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে!

সোণামণির অনেক রূঢ় কথা রাজকুমার এ পর্য্যন্ত শু আসিয়াছেন, কিন্তু সব হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। ভাবিতেন—বয়স হইলে ও ভাবটা যাইবে। কিন্তু সে দি কথাগুলি, যেন প্রত্যেক অক্ষরে হলাহল পূর্ণ করিয়া শ শেখরের বুকে গিয়া বিঁধিল। সে আঘাতে তিনি চ হইয়া উঠিলেন।

ভাবিলেন—এই কি আমার ধর্ম্মপরিণীতা পত্নী? যা সঙ্গে, সখীত্ব দাসীত্ব সম্বন্ধ—এই কি তার ব্যবহার! যা কাছে মিষ্ট কথা শুনিবার জন্য এতটুকু রহস্যের আয়ো করিয়াছিলাম—এই কি তাহার প্রতিদান! ছিঃ আমার একটু আত্ম-সম্ভ্রম জ্ঞান নাই! আমারও না রাজব জন্ম!

শশীশেখর বিনাবাক্যব্যয়ে চলিয়া যাইতে উদ্যত—কি পারিলেন না। সোণার রূপজ্যোতিঃ—এত অপমানে, মর্ম্মবেদনাতেও তাঁহাকে আয়ত্তাধীন করিল। এ ভুব মোহিনী স্বর্ণপ্রতিমাকে অপমানের বিনিময়েও তিনি হৃদ রাখিতে প্রস্তুত! কি গভীর প্রেম! কি অদ্ভুত রূপোন্মা

সেই অর্দ্ধ-এলায়িত কুন্তল-রাগময় গণ্ডস্পর্শী মেলা অলকাগুচ্ছ, সেই আয়ত চঞ্চলভঙ্গিময় কৃষ্ণতার নেত্রযুগ সেই মৃণালগঞ্জিত চম্পকরাগরঞ্জিত সুকোমল বাহুবল্লী— সেই দেহযষ্টির সর্ব্বকেন্দ্র বেষ্টন করিয়া বিদ্যুতের তর সমুচ্ছ্বসিত রূপরাশি!

রাজকুমার অপমান সহ্য করিয়া, মুখে একটু হাসি আনি



কলিকাতা কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী

বলিলেন—"সোণামণি! তোমার চ'খে কি আঘাত লাগিয়াছে? সত্যই আমি অন্যায় কাজ করিয়াছি।"

ইহাতে ও সোণার ক্রোধশান্তি হইল না। আহতা, ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় সোণামণি—এত প্রীতি, স্নেহের, কোমল উৎসের মধুরতায় ডুবিতে পারিল না। সে বিনা বাক্যব্যয়ে সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া রোষভরে অন্যগৃহে চলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে রাজকুমারকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। রাজপুরীর মধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল!! প্রথমে রাণী কমলা একথা জানিতে পারিলেন। তিনি সোণাকে এজন্য স্নেহময় তিরস্কার করিলেন। কমলা কথাটা স্বামীকে জানাইলেন। কেদার রায় তখনই পিতাকে সংবাদ দিয়া চারিদিকে অশ্বারোহী, পদাতিক ও বরকন্দাজ পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা গ্রামের পর গ্রাম, পল্লীর পর পল্লী, নগরের পর নগর সবই খুঁজিল কিন্তু রাজকুমারকে পাইল না।

যাহারা নদীপথে রাজ জামাতার অনুসন্ধানে গিয়াছিল, তাহাদের একদল দেখিল—পদ্মার প্রবলস্রোতে, কতকগুলি পোষাক জলে ভাসিয়া আসিতেছে। তাহারা লম্ফ দিয়া জলে পড়িয়া সে পোষাক উঠাইল। কালু সর্দ্দার সে নৌকায় ছিল। সে তাহা রাজকুমারের পোষাক বলিয়া চিনিতে পারিল। আর একদল আর এক দিক হইতে একটী উষ্ণীস্ আনিয়া হাজির করিল। সে উষ্ণীস্ চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের কৌলিক অর্দ্ধ-চন্দ্রাঙ্কিত চিহ্নমণ্ডিত!

আর সন্দেহ নাই! সকলেই সাব্যস্ত করিল—রাজকুমার জলমগ্ন হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাহারা মৃতদেহ সন্ধানের জন্য আরও চেষ্টা করিল। কিন্তু হায়। সব পরিশ্রমই বৃথা হইল!!

সেই সাংঘাতিক নিদর্শন লইয়া, তাহারা সকলে রাজপুরীতে পৌঁছিল। রাজা চাঁদরায় ও যুবরাজ কেদার রায় মর্ম্মাহত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এদিকে চন্দ্রদ্বীপের রাজবাটীতে যে পদাতিক গিয়াছিল, সেও আসিয়া সংবাদ দিল—রাজকুমার বাটী ফিরিয়া যান নাই!

মৃত্যুর জলন্ত নিদর্শন সম্মুখে!! সেই সুন্দর দেহ যে পদ্মার প্রচণ্ড সলিল গ্রাস করিয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্মুখে! সকলেই মুহূর্ত্তে বিশ্বাস করিল।

কাঁদে, সকলের চোখের জল শুকাইল—কিন্তু সোণামণির শুকাইল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রতধারিণীর আশা।

সোণা আর চুল বাঁধে না। সুগন্ধি তৈল জানালা গলাইয়া নদীতে ফেলিয়া দেয়। দর্পণে মুখ দেখে না—গৃহ ভিত্তি সংলগ্ন সমস্ত দর্পণগাত্রে সে কালরঙের কাপড় ঢাকিয়া দিয়াছে। সোণা পাড়ওয়ালা কাপড় পরে না—রাশি রাশি স্বর্ণখচিত বহুমূল্য কৌষেয় পোকায় কাটিতেছে। সোণা সামান্য আহার করে, একবেলা—খালি আতপের হবিষ্য। তাহাতে লবণ পর্য্যন্তও না। শয্যা—সামান্য কম্বলের উপর, তাহাও প্রস্তরময় মেঝের বুকে। উপাধান নাই, আস্তরণ নাই—সে ক্ষীণ-দেহবল্লরী সংযমের কঠোর নিষ্পেষণে সর্ব্ব বিষয়ে অভ্যস্ত, সর্ব্ব বিষয়েই সুখ-দুঃখ-ভেদবোধ বিরহিত।

সংসারে সোণার তিনটী কাজ। একটী কাজ—প্রভাতে উঠিয়া স্নানান্তে, পিতার প্রতিষ্ঠিত অষ্টভুজা ও ছিন্নমস্তার মন্দিরে দেবতার পূজা। দ্বিতীয় কাজ—তাহার একমাত্র অবলম্বন, স্নেহের পুত্তলী শিশু রাজকুমার মণিরায়ের পালন-কার্য্য। তৃতীয়—গভীর নিশীথে—নীরবে—প্রত্যহ অশ্রু-বিসর্জ্জন।*

সোণার চারিদিকে এখন অন্ধকার! তাহার চক্ষে সংসার অন্ধকার—এই অনন্ত শোভাসৌন্দর্য্যশালিনী জড় প্রকৃতি অন্ধকার—তাহার জীবন অন্ধকার। এত অন্ধকারেও সে একটী অস্ফুট আলোক-রেখা হৃদয়ের অতি নিভৃত কন্দরে লুকাইয়া, একটু আশাময় জীবন যাপন করিতেছিল।

সে ক্ষুদ্র আলোক-রেখাটী আর কিছুই নহে। সোণা এত সাক্ষ্য সাবুদের জলন্ত প্রমাণেও বিশ্বাস করে নাই, যে তাহার ইষ্টদেবতা স্বামী, প্রকৃতই জলমগ্ন হইয়াছেন। সমাজের শাসনে সে বিধবার বেশ পরিত, মনের বৈরাগ্যে ব্রহ্মচর্য্যের পবিত্র-ব্রতাচরণ করিত। কিন্তু মনে ভাবিত—"আমি বিধবা নই। আমি ঘোর পাপিনী—তাই আমার

---

* কিম্বদন্তী রাজা চাঁদ রায়ের প্রতিষ্ঠিত এই অষ্টভুজা মূর্ত্তি, মহারাজ মানসিংহ বঙ্গজয়ের পর অম্বর প্রাসাদে লইয়া গিয়াছিলেন। এই ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দিরেই মানসিংহ নিয়োজিত গুপ্ত-ঘাতকগণের হস্তে রাজা কেদার রায় অতি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হন।

ইষ্টদেবতা প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া আমার দম্ভ অভিমানের শাস্তি দিতেছেন।" মানুষের সব যায়—তবু থাকে আশা। যে পান্থ, ভীমঝটিকায় ঘনান্ধকারে প্রান্তরমধ্যে চলচ্ছক্তি বিহীন, সেও বিদ্যুৎরেখা দেখিয়া হৃদয়ে আশা পোষণ করে। যে অপরাধী এখনই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে—সেও ভাবে হয় ত বন্ধনরজ্জু ছিন্ন হইয়া প্রাণে বাঁচিতে পারে। রুগ্নশয্যায় শায়িত মুমূর্ষু অবস্থাপ্রাপ্ত একমাত্র নয়নের মণি জগতান্তরে বিদায় লইবার আয়োজন করিতেছে, তবু তাহার স্নেহময়ী মাতা ভাবেন—অমুক বৈদ্যকে আনাই—আমার দুলাল বাঁচিতে পারে। তাই বলিতেছিলাম, এই বিরাট নৈরাশ্যময় মরুময় মানব জীবনের, একমাত্র সঞ্জীবনী শক্তি আশা!!

আশার ছলনায় হতভাগিনী সোণামণি তখনও স্বামীর অস্তিত্ব কামনা করিতেছিল! সোণা ভাবিয়াছিল, যদি সে যথার্থ সাধ্বী হয়, যথার্থ পতিপ্রাণা হয়—সাবিত্রীর ন্যায় সে আবার তাহার মৃত স্বামীর সাক্ষাৎ পাইবে। যেদিন তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইবে, সেদিন সে তাহার জীবিতেশ্বরকে জীবন্ত দেখিতে পাইবে। যে যাহা বলুক না কেন—চাঁদ রায়ের আদরিণী কন্যা অনাথিনী সোণামণি এইরূপে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে, আশার এক সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বনে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। প্রকৃত সাধ্বী এই রূপেই, জীবনে মরণে, স্বামীর সাহচর্য্য কামনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণা হিন্দু বিধবার ইহাই উচ্চ আদর্শ। সোণামণি সেই মহান আদর্শেই দীক্ষিত হইয়াছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সোণার সর্ব্বনাশের আয়োজন।

রাজা চাঁদরায়ের প্রাসাদে অন্তঃপুরস্থ বিভাগে, এক বিস্তৃত দীর্ঘিকা, স্বচ্ছ-শ্যাম-সলিলে দীর্ঘাঙ্গ আবরিত করিয়া প্রতিদিনই স্বর্ণময় সূর্য্যরশ্মি বুকে ধারণ করিত—আর নিশাকালে শান্ত শীতল চন্দ্র-কিরণে উদ্ভাসিত হইত। এই দীর্ঘিকার ঠিক মধ্যস্থলে একটী বিস্তৃত চতুষ্কোণ গাঁথনির উপর এক রম্য গ্রীষ্মাবাস। চারিদিকে স্থির সলিলরাশি—আর সেই কাকচক্ষু-তরঙ্গচাঞ্চল্যহীন সলিলরাশির বক্ষ ভেদ করিয়া সুন্দর কারুকার্য্যময় গগনস্পর্শী চূড়াসমন্বিত মর্ম্মরমণ্ডিত ক্ষুদ্র প্রমোদ ভবন। সাধারণতঃ ইহা রাজবাড়ীর "জলটুঙ্গি" বলিয়া পরিচিত ছিল। প্রকৃত নাম ছিল—"স্বর্ণ বা সে মঞ্জিল।"

এই জলটুঙ্গির উত্তরাংশে একটী বিস্তৃত সেতু, উভয় পা মধ্যে সংযোজকরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সোণামঞ্জিলে যাই এই একটী বই পথ নাই। যে দীর্ঘিকার বুকের উপর বিলাস-সৌধ প্রতিষ্ঠিত, তাহার চারিধারে আর চারিটী ঘা একটী ঘাটে রাজপরিবারবর্গ স্নানাদি করিতেন। অন্য অন্যান্য অন্তঃপুরিকারা প্রয়োজন মত ব্যবহার করিতে তৃতীয় ঘাটের পিছনে একটী উদ্যান। এখানে নিত্য প্র টিত অসংখ্য সুগন্ধি পুষ্প, রাত্রে ফুটিয়া প্রভাতে দেবত সেবার জন্য আত্মসমর্পণ করিত। শেষের ঘাটটী অন ক্ষুদ্র। এটী রাজবাড়ীর দাসীদিগের জন্য।

এই প্রমোদভবন অন্তঃপুর মধ্যে। এ জন্য ইহার চা দিক অত্যুচ্চ প্রাচীর দিয়া বেষ্টন করা ছিল। প্রবাদ এই- সোণামণির মন তুষ্টির জন্য রাজা চাঁদরায় এই বিলাস নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

এক দিন এই সোণামঞ্জিলে অভাগিনী সোণাম তাহার অষ্টম বর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মণিরায়কে লইয়া পদ্মার শো দেখিতেছিলেন। উপরের মিনারে উঠিলে অদূরবর্ত্তী পদ্মা তরঙ্গময়ী সৌন্দর্য্য সহজেই দৃষ্টিপথের গোচরীভূত হ সর্ব্বোচ্চ মিনারে একটী ক্ষুদ্র বারান্দা। এই বারান্দা দশ ব জন বলিষ্ঠ লোকের ভার সহিতে সক্ষম।

পদ্মায় কত নৌকা পাল তুলিয়া যাইতেছে। স্রো নাচিতে নাচিতে, কত গহনার নৌকা যাত্রী লইয়া সারিগা প্রতিধ্বনি তুলিয়া, গন্তব্যপথে ছুটিয়াছে। সূর্য্য অস্ত যাইবা তখন অনেক বিলম্ব। আদিত্য-দেবের উজ্জ্বল রশ্মিসংঘা পদ্মার স্ফুরিত জল, গলিত স্বর্ণস্রোতের ন্যায় দেখাইতেছিল

বালক মণিরায় তাহার পিতৃস্বসার সহিত পদ্মার এ বহুদূরবিস্তৃত লোক-লোচন-তৃপ্তিকর বিরাট সৌন্দ দেখিতেছিল। প্রশ্নের পর প্রশ্নদ্বারা, সে সোণামণি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। সোণামণি সেই সমস্ত বাল স্বভাবসুলভ প্রশ্নের যথা সাধ্য সদুত্তর প্রদানে, তাহার সর কৌতূহল নিবৃত্তি করিতেছিলেন।

সোণামণি সহসা পদ্মার দিকে বিস্ফারিতনেত্রে চাহি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"হায়! এই পদ্মা

আমার সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়াছে! একদিন এই স্থানে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, এইরূপ সতৃষ্ণ নেত্রে পদ্মার বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলাম—কিন্তু হায়! কোথায় আজ—আমার সেই ইষ্ট, অভীষ্ট, আরাধ্য—আদরণীয়!”

অতীতের স্মৃতিপ্রাখর্য্যে সেই মাধুরীমাখা স্বর্ণপ্রতিমার আয়ত ইন্দীবর-লোচনে শোকাশ্রু ফুটিয়া উঠিল। যেন অতীত জীবনের সুখময়স্মৃতি প্রাণের প্রবল উম্মাকে তরলীভূত করিয়া নেত্রপথে সলিলাকারে বাহির করিয়া দিল। সে উষ্ণাশ্রুবিন্দু কেবলমাত্র উপরে বসিয়া দেখিলেন—ভগবান! আর নীচে দেখিল সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি অষ্টমবর্ষীয় বালক মণি রায়।

মণিরায় তাহার পিসিমাকে মা'র অপেক্ষা বেশী ভাল বাসিত। রাণী কমলা, মণিকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন বটে—কিন্তু সোণাই তাহাকে অতি শৈশব হইতে স্নেহ আদরে পুষ্ট করিয়াছিল। সোণার চক্ষে বালক কখনও অশ্রু দেখে নাই। সোণাও কখনও বালকের সম্মুখে অশ্রুপাত করে নাই। আজ স্নেহময়ী পিসিমার চোখে জলধারা দেখিয়া বালকের কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। মণিরায় সোণার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল—“পিসিমা! তোমায় একটা কথা বলবো মনে করেছিলুম—বলা হোল না। তুমি কাঁদলে কেন?”

সোণামণি ভুলাইবার জন্য সস্নেহে বলিলেন—“না বাবা! আমি কাঁদি নাই। রোদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চোখে জল আসিয়াছে।”

বালক মণিরায় এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইল না। পিসিমার মনে কি যে একটা অজানিত দুঃখ, প্রচ্ছন্নভাবে লুকাইয়া আছে—তাহা সে জানিতে চায়। এত দিন সে পিসিমাকে কখনও তাহার সুমুখে কাঁদিতে দেখে নাই—কিন্তু সোণা আজ সহসা ধরা দিয়াছে। পিসিমার অবস্থা সম্বন্ধে বালকের সেই কোমল হৃদয়ে একটা ধূমায়িত সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। বালক মণিরায় মনোভাব চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া বলিল,—“আচ্ছা পিসিমা! তুমি এমন ধারা সাদা কাপড় পর কেন? মা'র মত জরিবসান কাপড় পর না কেন? মা'র মত আলতা পর না—চুল বাঁধ না কেন?”

সোণামণি এবার বড় কঠোর সমস্যায় পড়িলেন। বালকের সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের এ সরল প্রশ্নের উত্তর দানে তাঁহার জিহ্বায় জড়তা উপস্থিত হইল। সোণামণি বিমর্ষ মুখে হাসি আনিয়া বলিলেন—“তুমি যত দিন না বড় হবে ততদিন আমায় ও সব পরিতে নাই বাবা!”

বালক মণিরায় বলিল—“যদি তাই হয়, তাহা হইলে আমায় এ সব জরি বসান কাপড় পড়াও কেন পিসিমা! তুমি আমায় কত ভালবাস—তুমি যা করিবে আমি তাই করিব।”

সোণামণি সেই বিষন্ন মুখে আবার একটু হাসি আনিয়া বলিল—“আচ্ছা তাই হবে। পরশু বীরাষ্টমী। তারপর থেকে তুমি সাদা কাপড় পরো।”

বীরাষ্টমার নামে বালকের শিশুহৃদয়ে সহসা একটা ভাব পরিবর্ত্তন হইল। গতবৎসর বীরাষ্টমীর উৎসব, সে শ্রীপুরে দেখিয়াছিল। কত মল্ল, যোদ্ধৃবেশী, মালকোচা মারিয়া, রক্তচন্দনে রক্তবস্ত্রে দেহ চিত্রিত করিয়া, বর্শা, সড়কী, তরবারি হস্তে অষ্টভুজার মন্দিরপ্রাঙ্গণে মল্লক্রীড়া করিয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িল। কত জনতা, কত বাদ্যভাণ্ড, কত কোলাহল সে উৎসবক্ষেত্র মাতাইয়া তুলিয়াছিল, তাহা ও মনে পড়িল। বীর বালকের মনে তখনই তরবারি পরিবার সাধ জাগিয়া উঠিল। মণি বাহানার সুর তুলিয়া বলিল—“পিসিমা! আমার তরবার বেঁধে দাও না। আমি বাবাকে, রাজা-দাদাকে দেখিয়ে আসি।”

সোণামণি বালকের কোমলগণ্ডে চুম্বন করিয়া বলিলেন—“ছি! বাবা! বাহানা করিতে নাই—এখানে তলোয়ার কোথা পাব? মজ্লিসের ঘরে ত তলোয়ার নেই—যে তোমায় দোব।”

মণি বলিল—“কেন মা'র ঘরের সম্মুখের দেওয়ালে এক খানা ছোট ঢাল ও তলোয়ার তোলা আছে। কালিদাদা আমায় আরবারে বীরাষ্টমীর দিন খেলতে দিয়েছিল। আমি খুব ছোট বলে, মা বলেছিলেন, ‘তোলা থাক, আসছে বছরে খেলবে’। আমি ত একবছর বড় হয়েছি। আমার সেই তলোয়ার পরিয়ে দেবে চল।”

বালক মণিরায়, সহজে পিসিমাকে স্থানচ্যুত করিতে না পারিয়া সবলে তাহার বস্ত্রাকর্ষণ করিতে লাগিল। সোণামণি বালককে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া, অগত্যা মজ্লিসের মিনার হইতে নামিয়া আসিলেন।

হায়! এই মিনারের বারান্দার উপর আরোহণই সোণা মণির কাল হইয়াছিল। কেন—কিসে তাহা পাঠক পরে জানিতে পারিবেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অগ্নির দাহিকাশক্তি।

হায় রে! ছার রমণীর রূপ! এই রূপের জন্যই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইতে, আর এই বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত জগতে অনেক কাণ্ড হইয়াগিয়াছে! ভারতের ইতিহাস, পুরাণ, উপপুরাণ, কাব্য, নাটক, উপন্যাস সর্ব্বত্রেই এই সর্ব্ববিজয়িনী রূপের কীর্ত্তিকাহিনীতে পরিপূর্ণ। রূপের বর্ণনা না হইলে কাব্য হয় না, সুন্দর রূপের সুন্দর বর্ণনা না করিতে পারিলে সুকবি হয় না, রূপজ মোহ—কাব্যে নাটকে প্রবেশ না করিলে ঘাত প্রতিঘাত হয় না। রূপের মোহ না হইলে সমাজ, জাতি, উচ্ছন্ন যায় না। এমনিই রমণীরূপের মোহিনীশক্তি! তাই বলিতেছিলাম—কি যেন একটা অলক্ষ্য মোহিনীশক্তি, উৎকট উত্তেজনা লইয়া এই রূপের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আকাঙ্ক্ষা, পাপ, প্রলোভন, পতন, আত্মনাশ যেন এই রূপমোহের প্রত্যেক স্তরানুস্তরে বেষ্টন করিয়াছে।

বড় জগতের কথা ছাড়িয়া দিই—বড় রাজ্যের কথা ছাড়িয়া দিই—বড় সমাজের কথা ধরিতে চাহি না। আমাদের এই ছোট সমাজে—ঘরে ঘরে নিত্যই রূপের পূজা। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই এই উন্মাদিনী রূপমন্ত্রের উপাসক। রমণীরূপে প্রেমের আকর্ষণী শক্তি, রমণীরূপে ধ্বংসের দাহিকা শক্তি, রমণীরূপে আত্মবিনাশের দারুণ হলাহল। হায়! কেন বিধাতা রমণীকে এ ছার রূপ দিয়াছিলেন?

নবাব ইশা খাঁ চাঁদরায়ের আথিত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। রাজা চাঁদরায় যথাসাধ্য সরলতা-সৌজন্যময় আতিথ্যে, বন্ধুর সন্তোষসাধন করিয়াছেন। নবাব ইশাখাঁও চাঁদ রায়ের আতিথ্য-আপ্যায়নে বিমুগ্ধ ও বশীভূত।

রাজবাড়ীর সন্নিকটে "নন্দন কানন" বলিয়া একটী সুন্দর উদ্যানে ইশাখাঁর বাসস্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এই নন্দন কাননের পার্শ্বেই উচ্চ-প্রাচীরমণ্ডিত "ছত্রমঞ্জিল।"

হায়! অতি কুক্ষণেই রূপসী সোণামণি, অলসিত স্নেহ-সৌন্দর্য্য লইয়া সেই গগনস্পর্শী মঞ্জিলের বারান্দায় রাজপুত্র মণিরায়কে লইয়া উঠিয়াছিলেন! অতি কুক্ষণেই—ঠিক সে সময়ে দৈবঘটনায় বাধ্য হইয়া, নবাব সাহেবও তাঁহার নন্দন কাননের প্রাসাদের ছাদে উঠিয়াছিলেন। তাহা না হইলে বোধ হয় এত সহজে আগুণ ধরিত না। নবাবের ছাদ হইতে ছত্র-মঞ্জিলের বারান্দা অতি নিকটবর্ত্তী। সেখান হইতে সবই অতি স্পষ্ট দেখা যায়।

নবাব ইশা খাঁ জানিতেন না, যে রাজান্তঃপুরের মঞ্জিলে বারান্দায় কোন অন্তঃপুরিকা উঠিয়াছেন। যখন ছাদের উপরে উঠিয়া তিনি সে অতুলনীয় রূপরাশি দেখিতে পাইলেন, তখনই তাঁহার চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হইল। তিনি চক্ষু ফিরাইলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার নিস্তার নাই। ক্রমে সেই অদৃষ্টপূর্ব্বসুন্দরী অলক্ষিতে তাঁহার দিকে ঘটনাবশে ফিরিয়া দাঁড়াইল। রূপের সে ষোলকলাপূর্ণ সৌন্দর্য্যে মদিরাময় উত্তেজনায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। তিনি ছাদ-প্রাচীরোপরি অবনত-মুখে শষ্পসমন্বিত বৃক্ষশাখার অন্তরালে দাঁড়াইয়া তৃপ্তির সহিত সেই অদৃষ্টপূর্ব্বারূপসীর রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন। সে দেখায় চক্ষের পলক পড়িল না—আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইল না। শত যুগে ও সহস্র বর্ষেও তৃপ্তি হওয়া সম্ভব নয়। মিনারোপরি পরিদৃষ্টা রমণী—যুবতী। তাহার সাজসজ্জার কোন পরিপাট্য নাই। সেই স্বর্ণজ্যোতিময় রূপসমষ্টি দেহযষ্টি আবার তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। ইশা খাঁ নিতান্ত অভদ্রতা করিতেছেন ভাবিয়া, নীচে নামিয়া যাইতে অগ্রসর হইলেন কিন্তু তাঁহার পদদ্বয় যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ। কে যেন তাঁহাদের এক চৌম্বকাকর্ষণে কীলক-বদ্ধ করিয়া দিয়াছে!

চিত্রে অঙ্কিত মূর্ত্তি দেখিলে, মানুষ যেমন মনে একটা তাহার স্পষ্ট আভাষ লইয়া হৃদয়ে চিত্রস্থ মূর্ত্তির ছায়া প্রতিষ্ঠিত করে, নবাব ইশা খাঁ, সেইরূপ স্পষ্টভাবে সেই মিনারোপরি দৃষ্ট মূর্ত্তির ছায়া মনে আঁকিয়া লইয়া নীচে নামিয়া আসিলেন অন্তরে, বাহ্যে, সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে সেই তরঙ্গায়িত রূপের প্রতিচ্ছায়া! এ কাল রূপের ছায়া, হায়! কিছুতেই যে প্রাণ হইতে মুছিতে চায় না। সেই আগুল্‌ফলম্বিত কেশরাশি, সেই পবনদোলায়িত জ্যোৎস্নাধবল চঞ্চল অঞ্চলপ্রান্ত—সেই রন্ধ্রে রন্ধ্রে সৌন্দর্য্যবিকীর্ণ সুগঠিত সুন্দর দেহযষ্টি—সেই গলিত-কাঞ্চন-বর্ণ-বর্ণিত রূপের তরঙ্গোচ্ছ্বাস—সেই [illegible]

ফিরনি—সেই গ্রীবাভঙ্গি, কিছুই যে তাঁহার মন হইতে মুছিতে চাহে না।

ইশা খাঁ যে কক্ষে থাকিতেন তাহাতে কয়েকখানি বহুমূল্য তৈলচিত্র ছিল। ইহার মধ্যে এক খানি যশোরেশ্বর রাজা বিক্রমাদিত্যের, অপর খানি প্রতাপাদিত্যের। আর এক খানি চিত্র প্রতাপের সহচর—শঙ্কর ব্রাহ্মণের। আর এক খানি ভুলুয়ার অধীশ্বর—লক্ষ্মণমাণিক্যের। এই ছবি গুলির শেষ প্রান্তে রাজা চাঁদরায়ের নিজের ছবি। চাঁদরায়ের ছবির এক পার্শ্বে যুবরাজ কেদার রায় ও অপর পার্শ্বে রাজকুমারী সোণামণি। সকল চিত্রেই দর্শকের চিনিবার জন্য উর্দ্দু অক্ষরে চিত্রিত মূর্ত্তির নাম নিচে লেখা ছিল।

দেওয়ালের অন্য চিত্রগুলির মধ্যে চিত্রিতা স্ত্রীমূর্ত্তিটী যেন নবাবের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিল।

বিবাহের পূর্ব্বে—যৌবনসন্ধিসমাবেশের প্রাক্কালে, রাজা চাঁদ রায় নিজের স্নেহময়ী কন্যার এই চিত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। নবাব ইশা খাঁ এই চিত্রের সম্মুখীন হইয়া একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছেন। মিনারের বারান্দার সজীব মূর্ত্তি ও সেই ভিত্তিগাত্রে সন্নিবিষ্ট তৈলচিত্রের চিত্রিত মূর্ত্তি—যেন একই জনের বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। তাঁহার বোধ হইল, ভিত্তিগাত্রলগ্ন মূর্ত্তি যেন বিকাশ, মিনারদৃষ্ট মূর্ত্তি—তাহার পূর্ণতা। ভিত্তিগাত্রসংলগ্ন চিত্র যেন ছায়া, মিনারদৃষ্ট মূর্ত্তি—পরিস্ফুট আলোক।

নবাব এক দৃষ্টে সেই যৌবন-সন্ধিগতা রূপসীর প্রতিচ্ছবি দেখিতে নিমগ্ন—এমন সময়ে কে যেন তাঁহাকে পিছন হইতে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"নবাব সাহেব! এক দৃষ্টে কি দেখিতেছেন?"

সম্বোধনকারী আর কেহই নহেন—স্বয়ং বিক্রমপুরাধিপতি রাজা চাঁদরায়। চাঁদরায় আবার প্রশ্ন করিলেন—"এ ছবিখানি কি সুচিত্রিত বলিয়া বোধ করেন? ইহাতে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছি। ইহা আমার কন্যার চিত্র।"

নবাব ইশা খাঁর হৃদয়ে, দারুণ আকাঙ্ক্ষা জলিয়া উঠিল। তিনি মিনারে যাহাকে দেখিয়াছেন—সে আর কেউ নয়, যৌবন-বিকাশ-পরিপুষ্টা, সরল-রূপ-শালিনী, প্রস্ফুটসৌন্দর্য্য-শ্রী সেই এই সোণামণি। তিনি বহুকষ্টে হৃদয়ভাব চাপিয়া রাখিয়া, কম্পিতস্বরে বলিলেন—"হাঁ দোস্ত! ছবিখানি বেশ আঁকা হইয়াছে। আপনি আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আমি খিজিরপুরে যাইবার জন্য বড়ই চঞ্চল হইয়াছি।"

চাঁদরায় সহাস্যে বলিলেন—"এত শীঘ্র যাইবেন! পরিচর্য্যায় কত অঙ্গহীন হইয়াছে, আপনার ন্যায় সহৃদয় বন্ধুকে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না।"

ইশা খাঁ সহাস্যে বলিলেন—"আপনার অনুগ্রহ এইরূপ। আমাদের কাজের কথা ত সব শেষ হইয়াছে, এখন স্বচ্ছন্দে যাইতে পারি।"

চাঁদরায় বলিলেন—"হাঁ—কিন্তু একটা কথার মীমাংসা হয় নাই।"

ইশা খাঁ কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কথা?"

চাঁদ। সনন্দের কথা।

ইশা। দিল্লীশ্বর আপনার দুর্গনির্ম্মাণ সেনাবৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন কথাই বোধ হয় এখনও শোনেন নাই। আপনি যুবরাজ কেদার রায়কে নজর সমেত দিল্লীতে পাঠান না কেন?

চাঁদ। ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু কেদার কি এ কাজে একা সমর্থ হইবে?

ইশা। দিল্লীশ্বর জানেন—বিক্রমপুরের ভুঁইয়া, রাজা চাঁদরায় একজন কৃতকর্ম্মা পুরুষ। পোর্টুগীজ, ফিরিঙ্গি ও পাঠানেরা এখন মাথা তুলিতেছে। তাহাদের দমনের জন্য বাঙ্গালার জমীদারদের সহায়তা বাদশাহের প্রার্থনীয়। আমার বিশ্বাস, যুবরাজ দিল্লীতে আপনার প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলেই, আপনি রাজোপাধি ও সনন্দ লাভ করিবেন। বরঞ্চ আমি আমার বন্ধু অম্বরেশ্বর মহারাজ মানসিংহকে সুপারিশ করিয়া দিব। তাঁহার কোন অসুবিধাই হইবে না।

চাঁদ। আপনার ন্যায় বন্ধুর সহায়তায় নিশ্চয়ই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত। কিন্তু আপনি আর এক সপ্তাহ থাকিয়া যান।

ইশা খাঁ এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না। ইচ্ছা থাকিলেও পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে, বাহিরে তখনও সেই মোহিনী প্রতিমা! নবাব ইশা খাঁ! এখনও সাবধান হও! এখনও ফিরিবার পথ আছে।

ইশা খাঁ সাহেবের সে সুমতি হইলনা। ভবিতব্য তাঁহার প্রবৃত্তি অন্য পথে প্রসারিত করিল

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

স্ত্রীচরিত্র।

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীশ্রীসঙ্ঘপাল মুমুক্ষু মহাশয় শ্রীশ্রীঅঙ্ঘ্রি যুগল পঙ্কজেষু।

মতিমন্, আমি বিপদে পড়িয়া আপনার শরণাপন্ন হইতেছি, কৃপা করিয়া রক্ষা করুন।

আপনি বোধ হয় জানেন, ওদন্তপুরীর রত্নাকর শ্রেষ্ঠীর কন্যা সুমিতার পাণিপ্রার্থী ছিলাম আমি। রমণীর জটিল মনস্তত্ত্বানভিজ্ঞ আমার সামান্য নির্বুদ্ধিতায় আমি তৎকর্ত্তৃক-পরিত্যক্ত হইয়াছি। ওঃ, মনস্তাপ!

আপনি সুমিতাকে বাল্যাবধি জানেন,—অর্থাৎ আপনি অন্ততঃ মনে করেন যে আপনি তাহাকে জানেন। কিন্তু হায়, রমণীচরিত্র নিতান্তই দুর্জ্ঞেয়। তাহাদের মতি, গতি, চিন্তাপ্রণালী, আচার, ব্যবহার সবই পুরুষের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়, চমৎকার, বিস্ময়কর। তাহাদের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি কিসে যে হয়, তাহা বলা দুঃসাধ্য। দুঃসাধ্য বলিয়াই আমার আজ এই বিপদ। হায়!

আমি সুমিতার শৈশবসঙ্গী। তাহার মনস্তত্ত্ব নিপুণতার সহিত অধিগত [illegible]য়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল; কিন্তু এখন আমার ভ্রান্তি উপলব্ধি করিয়াছি। ওদন্তপুরীর ভিক্ষুসঙ্ঘের ধর্ম্মপ্রভাবে সে আশৈশব পূতশীলা, ধর্ম্মিষ্ঠা। সে ধর্ম্মের নামে পাগল হয়; প্রভু তথাগত বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ আলোচনায় তাহার চিত্তটি বায়ুমুখে শুষ্কপত্রের মত লঘুভাবে নর্ত্তনমুখ হয়। তাহার রুষ্টি তুষ্টি ক্ষণে ক্ষণে; কত দিন তাহার নিগ্রহ পুরস্কার ভোগ করিয়াছি, কিন্তু এইবারকার মত স্থায়ী ক্রোধ তাহার কখন দেখি নাই। হায় অদৃষ্ট!

আমি তাহাকে আমার প্রাণের মত ভালবাসিতাম, এখনও বাসি। সেও যেন ভালবাসিত বোধ হইত; কিন্তু কেন এমন হইল! অত ভালবাসা এক নিমেষে কেমন করিয়া নষ্ট হইয়া গেল!

গত বৈশাখীপূর্ণিমার দিন কার্য্যব্যপদেশে আ[illegible] শ্রাবস্তিপুরীতে যাওয়া আবশ্যক হয়। আমি বিদেশ যা[illegible] পূর্ব্বে সুমিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। আ[illegible] বিদেশ যাত্রার কথা শুনিয়া তাহার সেই আকর্ণ-বিশ্র[illegible] চক্ষু দুটি অশ্রুভারাবনত হইয়া পড়িল,—সে নীরবে আম[illegible] হাতখানি ধরিল। আহা, সে স্পর্শে কি ব্যাকুলতা, [illegible] স্নেহ ব্যক্ত করিয়া দিল; কি মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করি[illegible] অহো, সেই মদির-স্পর্শ!

আমি সত্বর প্রত্যাবর্ত্তনের আশা দিয়া তাহার চ[illegible] জল মুছাইয়া দিলাম। তখন সে বলিল,—'তুমি নগ[illegible] যাইতেছ; নিদর্শন স্বরূপ আমার জন্য কিছু আনিও'।

আমি বলিলাম,—'কি আনিব বল'?

সে হাসিয়া বলিল,—'আমি কি বলিব? আমার মনোম[illegible] যাহা হয় কিছু আনিও। আমি তোমার বিচারক্ষমত[illegible] পরীক্ষা করিব'। এই অনুরোধ আমার কাল হইল!

আমি শ্রাবস্তিপুরী যাত্রা করিলাম। আমি কয়েকদি[illegible] কার্য্যে এমন ব্যস্ত ছিলাম যে সুমিতার অনুরোধ বিস্মৃ[illegible] হইয়া গিয়াছিলাম। পথে আসিয়া মনে পড়িল। নিরুপায় দুঃখিতমনে চিন্তিত হইলাম। সহসা একটা মতলব মনে পড়িল—কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম। হায় ভ্রান্ত আশ্বাস!

গৃহে ফিরিয়া সুমিতাকে দেখিতে গেলাম। সুমিত[illegible] প্রভাতের শিশিরসিক্ত ফুলটির মত কাঁদিয়া হাসিয়া আমা[illegible] হাত ধরিল। আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল,—'দেখি কি আনিয়াছ?'

আমি মুখখানা নিতান্ত অপ্রতিভের মত করিয়া বলিলাম, —'ঐ যাঃ, ভুলিয়া গিয়াছি'। সে এ কথা বিশ্বাস করিল না।

সে হাসিয়া বলিল,—'প্রেমিক প্রেমাস্পদের অনুরোধ স্মরণ রাখে না, ইহা অসম্ভব'।

আমি মনে মনে লজ্জিত হইয়া আমার ত্রুটি স্বীকার করিলাম, তবু সে আমায় বিশ্বাস করিল না। তাহার ব্যগ্র দৃষ্টি আমার উত্তরীয়-অন্তরালে যাহা হয় একটা কিছু আবিষ্কার করিবার জন্য উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। তাহার কৌতূহল ও আগ্রহ লইয়া আমি খেলা করিতে লাগিলাম—তাহার কাকুতি মিনতি, অনুনয় বিনয় পরম পরিতোষের সহিত উপভোগ করিতে লাগিলাম। যখন তাহার

উচ্ছ্বসিত কৌতূহল অশ্রুবিন্দুরূপে পক্ষ্মপ্রান্তে কম্পমান দেখিলাম, তখন আমি একটি গজদন্তখচিত চন্দনকাষ্ঠের ক্ষুদ্র পেটিকা তাহার হস্তে দিলাম। সুমিতার কুতূহলী চক্ষু পেটিকার মধ্যে একটি ছিন্ন নখ দেখিয়া দীপ্ত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া নীরব প্রশ্ন করিল—'একি ?'

আমি মিথ্যাবাদী, তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া বলিলাম, —'উহা ভগবান বুদ্ধদেবের পদনখকণা'। দৃঢ়ভক্তিভরে পেটিকাটি মস্তকে স্পর্শ করিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া সুখাবেশে সুমিতা বিহ্বলা হইল। আমি আমার শঠতার জন্য লজ্জায় মরিয়া গেলাম। হায় ধর্ম্মহীন নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা!

আমার ক্লিষ্ট মুখভাব দেখিয়া বিশ্বাসপরায়ণা সরলারও বুঝি সন্দেহ হইয়াছিল, তাই সুমিতা আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'একি যথার্থ ভগবানের পদনখ ? এ দুর্লভ সামগ্রী তুমি কেমন করিয়া পাইলে ?'

আমি ধূর্ত্তের মত, এদিক ওদিক তাকাইয়া চুপি চুপি বলিলাম,—'মহারাজ বিম্বিসারের স্তূপ হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছি'। হায়, আমি অনাচারী, অধার্ম্মিক; শঠতা করিয়া আমারই পদনখ ভগবানের নামে চালাইয়া দিয়া, সরলা বালিকার ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রতি কৃতঘ্নতা করিলাম।

সরলা সুমিতা তাহার আয়ত চক্ষু দুটি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া শুধু নীরবে আমার দিকে চাহিল; আমার হাতখানি ধরিয়া তাহার অনাড়ম্বর স্নেহ সবটুকু নিঃশেষে যেন আমার পূজায় নিয়োজিত করিয়া দিল। হায় অপাত্রে বিশ্বাস! হায় অপূজ্যের পূজা!

ক্ষণেক পরে আনন্দসংবৃতা সুমিতা প্রশ্ন করিল,—'মহারাজের স্তূপ হইতে চুরি করিলে কেমন করিয়া ?'

হায় মিথ্যা কথা! একবার একটা বলিলে আর নিস্তার নাই; রক্তবীজ রাক্ষসের মত তার উদ্ভব নিবারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমি মিথ্যাকে মিথ্যার আবরণ দিয়া বলিলাম, —'রাজরক্ষীদের সহস্রমুদ্রা ও ধর্ম্মপাল পুরোহিতকে দশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা উৎকোচ দিয়া ভগবান বুদ্ধের দন্ত, কেশ ও নখের মধ্যে ভগবানের পাদনখই তোমার অধিক প্রিয় হইবে বলিয়া, পাদনখ চুরি করারই প্রবৃত্তি আমার হইয়াছিল।' আমার মিথ্যাবাণী শতদলের মত হাসিতে লাগিল;—সে হাসিতে আমি দেখিলাম বিদ্রূপ, সুমিতা দেখিল প্রেমের প্রতিষ্ঠা!

সুমিতা হর্ষগদ্‌গদ হইয়া বলিল,—'তুমি যথার্থই আমাকে ভালবাস, নতুবা এমন মনোমত দুর্লভ সামগ্রী তোমায় আনিতে প্রবৃত্তি কে দিল ? তোমার মরিষ্ঠ মন্ময় প্রেম। প্রেম অন্তর্য্যামী!' এই বলিয়া তাহার ক্ষুদ্র মস্তকটি আমার স্কন্ধন্যস্ত করিল। হায় সেই স্পর্শ, সেই ঘ্রাণ আজও তেমনি নূতন মনে হইতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার প্রথম দিনই শেষদিন হইয়া গেল! আবেশেই তন্দ্রা টুটিয়া গেল!

আমি এই চুরির কথা গোপন রাখিতে অনুরোধ করিলাম; প্রকাশ পাইলে আমার প্রাণসংশয় তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম। আবার প্রতারণা!

দুদিন পরেই রত্নাকর শ্রেষ্ঠী শ্রাবস্তিপুরী যাত্রা করিলেন। আমার অজ্ঞাতসারে সঙ্গে গেল সুমিতা।

বলিতে লজ্জা করে,—আমি ধর্ম্মের বড় একটা ধার ধারিতাম না। শ্রাবস্তিপুরীতে গিয়াছিলাম কার্য্যের জন্য; আমি মহারাজ বিম্বিসারের রচিত স্তূপ চক্ষেও দেখি নাই। আমি সেই স্তূপের একটা কাল্পনিক বর্ণনা দিয়া, আমারই পাদনখ ভগবানের নামে চালাইয়া দিয়াছিলাম। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে সুমিতা কখন এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া নগর দর্শনে যাইবে। প্রেমের জন্য যে মন্দিরে আমি পবিত্র-পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম বলিয়া তাহার যে ধারণা হইয়াছিল, তাহারই বলবৎ আকর্ষণ তাহাকে সেই স্থান দেখিবার জন্য উদ্‌ব্যস্ত করিয়াছিল বোধ হয়।

সুমিতার নগরগমন সংবাদে আমি ভীত হইলাম। কয়েক দিন পরেই দেখিলাম আমার ভয় নিরর্থক নয়। সুমিতার পত্র পাইলাম—

'ভদ্র,

আপনার সহিত আমার বিবাহবন্ধন অসম্ভব। যেখানে শঠতা, প্রতারণা, সেখানে প্রেমের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আপনার পেটিকা প্রত্যর্পণ করিলাম—শঠতার জয়চিহ্ন আপনারই। আমার সাক্ষাৎকামী হইবেন না; সফলমনোরথ হইবেন না। ইতি—

প্রতারিতা সুমিতা।'

'ভদ্র' সম্বোধনে তাহার গূঢ় তিরস্কার অনুভব করিয়া লজ্জিত হইলাম।

হায় দুর্জ্ঞেয় রমণী চরিত্র! আমি সুমিতার আদর অনুরাগ অধিক পাইয়াছিলাম, যখন সে আমাকে পবিত্র মন্দির অপবিত্রকারী চোর বলিয়া জানিয়াছিল, আর আজ আমি তাহার সঙ্গবঞ্চিত স্নেহচ্যুত কারণ আমি চোর নহি,—বহুলোকের আরাধ্যবস্তু আমার স্বার্থের জন্য চুরি করি নাই। হায়—

'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ'।

আমার অনুনয়, বিনয় ও কাতর প্রার্থনা সব ব্যর্থ হইল। ধর্ম্মিষ্ঠার ক্ষুব্ধ চিত্ত আমার অনুনয়ে কোমল নমনীয় দেখিলাম না। তাহার গৃহে আমি এখন বারিতপ্রসর। হায়, কি করিতে কি হইল!

আমি ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায়, বিরহে ক্লিষ্ট হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছি।

বোধ হয় ইহা জ্ঞাত হইয়াই আনন্দমিত্রের কন্যা সুমিতার সখী সুজাতা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। যে সর্ত্তে সুমিতা আমাকে ক্ষমা করিয়া পুনর্গ্রহণ করিতে পারেন তাহা আমাকে বলিয়া গিয়াছেন।

আমাকে ভগবান তথাগতের কোন চিহ্ন সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে, এবং সে চিহ্ন বৌদ্ধমহাসমিতির দ্বারা অকাট্যপ্রমাণে প্রশংসিত করাইতে হইবে। যদি পারি তবেই আমার রক্ষা নতুবা আমি গেছি।

আমি চিন্তা মনস্তাপে পাগল হইব বোধ হয়। আপনি কি আমাকে এ বিপদে সাহায্য করিয়া প্রাণদান করিতে পারেন না? আশা করি আপনি দয়া করিয়া চেষ্টা করিবেন। আমিও সিংহল, চীন, তিব্বতে ভগবানের কোন চিহ্ন সংগ্রহের জন্য যাত্রা করিব। সুমিতার জন্য অর্থনাশ ও ক্লেশ আমি গ্রাহ্য করি না। অর্থব্যয় ও ক্লেশ সহ্য করিয়াও সুমিতাকে পাইব কি।

আমার শঠতার অতিরিক্ত দণ্ড আমি ভোগ করিতেছি। আপনি আমার মার্জ্জনা করিয়া উপায় নির্দ্দেশ করিবেন। মহারাজ বিম্বিসার নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাজ অজাতশত্রু তথাগত বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম্মে আস্থাবান নহেন শুনিতেছি। তিনি নাকি স্তূপে পূজানিষেধ করিয়াছেন। যদি স্তূপ নষ্ট করা হয়, আপনি কি ভগবানের পদ নখ-কণা সংগ্রহ করিয়া আমাকে দিতে পারেন না? আপনার উপদেশ প্রতীক্ষায় জীবিত রহিলাম। সতত আপনার চরণধূলার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী। নিবেদন ইতি—

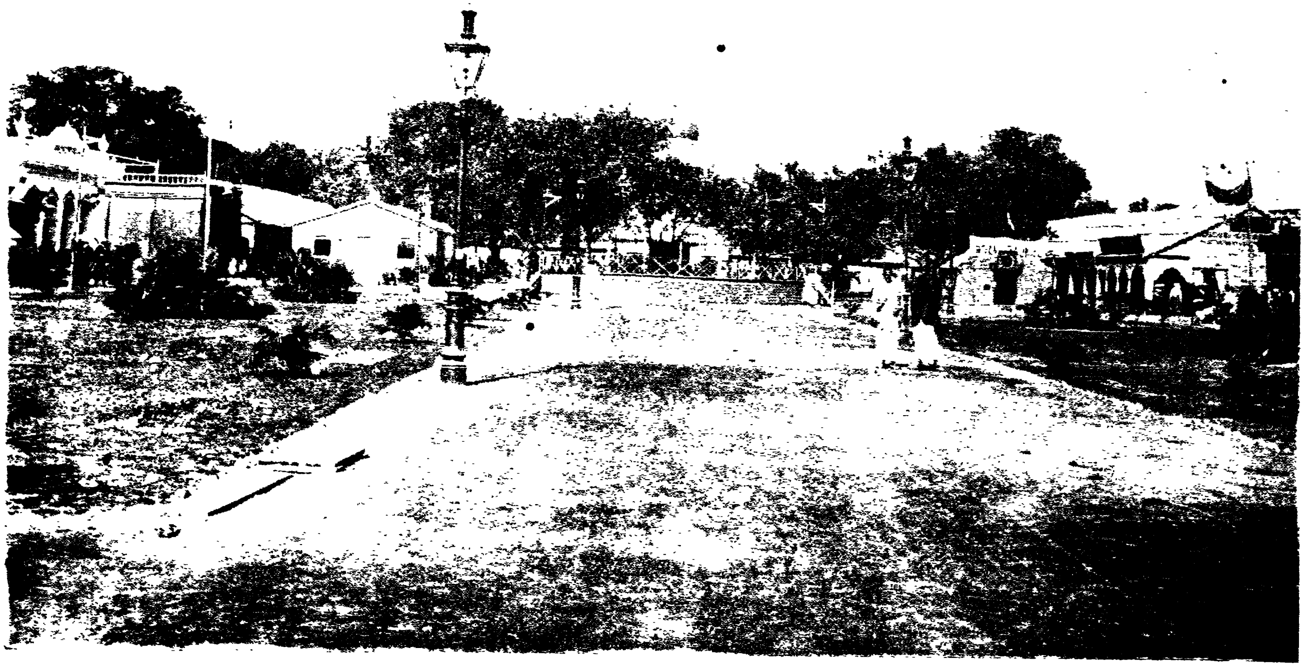
কমলাভিখু প্রণত হতভাগ্য বজ্রসেন।"*

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঐতিহাসিক জোহর।

বঙ্গদেশের ইতিহাসের জন্য সর্ব্বপ্রথম আমাদিগকে মোসলমান ঐতিহাসিকগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। হিন্দু বাঙালীর লেখনী প্রসূত দেশের ইতিহাস নাই, যে দুই একখানি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রকৃত ইতিহাস বলা যায় কি না সন্দেহ। ইতিহাস বলিলেও তাহা বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণের চর্ব্বিত চর্ব্বণ। মোসলমান লেখকগণ কৃপা করিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই এখন আমাদের অতীত অন্ধকার ভেদ করিবার একমাত্র ধ্রুবতারা। কিন্তু সে সকল ইতিহাস পারস্য ভাষায় লিখিত, কাযেই তাহাতে সকল বাঙালীর দন্তস্ফুট হইবার জো নাই। পারস্য-ভাষাভিজ্ঞ কোন বাঙালী কর্ত্তৃক ঐ সকল ইতিহাসের একখানিও দেশীয়দিগের জন্য দেশীয় ভাষায় অনূদিত হয় নাই। বিদেশীয় শ্বেতদ্বীপের লেখকগণ প্রগাঢ় অধ্যবসায় দ্বারা পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করতঃ পারস্য ভাষায় লিখিত মোসলমান রাজত্বের অধিকাংশ ইতিহাস অনুবাদ করিয়া দেশ বিদেশের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। ইংরেজ লেখকগণের ঐ সকল অনুবাদই আজ আমাদের অবলম্বন। ইংরেজী অভিজ্ঞ পাঠকগণ ইহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু যাহারা ইংরেজী জানেন না, তাঁহাদিগকে যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিতে হইতেছে। কোন বাঙালী লেখক যে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা আমার বিদিত নাই। তবে সম্প্রতি মালদহ নিবাসী ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সঙ্কলিত প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে পারস্য ভাষায় লিখিত রিয়াজ-উস্-সালাতিন নামক বাঙ্গলার ইতিহাস, মৈমনসিংহ কেদারপুর নিবাসী সুলেখক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় বাঙ্গলায় অনুবাদ করতঃ প্রকাশ করিয়াছেন। গোলাম হোসেনের রিয়াজ-উস্-

* গী দে মোপাসাঁর গল্প অবলম্বনে।



২। কলিকাতা কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী।

সালাতিন বাঙ্লার ইতিহাস সঙ্কলনে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ রামপ্রাণ বাবু বাঙ্লায় অনুবাদ করিয়া ইংরেজী অনভিজ্ঞ পাঠকবর্গের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ঐতিহাসিক ব্লক্ম্যান মহোদয় রিয়াজ-উস্-সালাতিন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"The latest writer on Bengal History is Gholam Husain of Zaidpur, poetically styled 'Salim,' who composed his Riyaz-us salatin "the garden of kings" at the request of Mr George Udny of Maldha This work the title of which contains in the numerical value of the letter the date of its completion (A H 1202 or A D 1787-88) is rare, but is much prized as being the fullest account in Persian of the Mohamadan History of Bengal, which the author brings down to his own time (Blochmann's Geography and History of Bengal)

আমাদের আলোচ্য ঐতিহাসিকের গ্রন্থের নাম—তেজ কিবাত্-উলওয়াকিয়াত। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ষ্টুয়ার্ট এই গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত করেন। ইহার আর একখানি পাণ্ডুলিপি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইলিয়ট সাহেবের নিকট ছিল, সেখানির নাম—হুমায়ুন-সাহী (সম্রাট হুমায়ুন)। ইহাকে তারিখি-হুমায়ুনও (হুমায়ুনের জীবনী ও সময়) বলা হইত। জোহর সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পর হিজরী ৯৯৫ সালে (১৫৮৭ খৃঃ অঃ) এই গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত করেন। তজ্জন্য অনেকে ইহার সমুদয় বৃত্তান্ত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি করিয়া থাকেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পর গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করায়, লেখককে সমস্ত বিষয়ের জন্ত কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। অধ্যাপক ডাউসন বলেন,—

"The fact of their having been commenced full thirty years after the death of Humayun, greatly diminishes their claim to be considered a faithful and exact account of the occurrences they record "

ইহাতে গ্রন্থকার কোন কোন বিষয়ে অনিচ্ছা সত্বেও ভ্রম করিয়া বসিয়াছেন। বিশেষতঃ যখন যে ঘটনা সংঘটিত হয়, তিনি তৎকালে সে বিষয়ের নোট রাখেন নাই। অধিকন্তু তিনি সম্রাট হুমায়ুনের অধীনে কার্য্য করিতেন এবং সদা সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করিতে হইত। গ্রন্থকার অতিরিক্ত মাত্রায় প্রভুভক্ত ছিলেন। তজ্জন্য প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত তিনি স্বীয় ইতিহাসে সম্রাটের একটী দোষেরও উল্লেখ করেন নাই। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব তাঁহার ভারতের ইতিহাসের অনেক উপকরণ জোহরের ইতিহাস হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা জোহরের নিকট অধিক কৃতজ্ঞ। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন লিখিয়াছেন,—

'He was in constant attendance on Humayun and although unacquainted with his political relations and secret designs, was a minute and correct observer of all that came within his reach, and describes what he saw with simplicity and distinctness He was devoted to Humayun, and anxious to put all his actions in the most favourable light, but he seldom imagined that anything in his master's conduct required either concealment or apology '

তেজ-কিবাত উল-ওয়াকিয়াত বা তারিখ ই-হুমায়ুনে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই একটী ত্রুটী থাকিলেও ইহাতে জানিবার শিখিবার এবং প্রশংসার বিষয় অনেক আছে। বহুবৎসর পর স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া কোন বিষয় লিখিতে হইলে যেরূপ ত্রুটী হইতে পারে, তদতিরিক্ত ইহাতে কোন ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় না। গ্রন্থকার পণ্ডিত (*) ছিলেন না, তিনি সরলভাবে সোজা কথায় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই হৃদয়গ্রাহী এবং সে সকলের বর্ণনা খাঁটি সত্য। জোহর রচনা সুন্দর করিবার অভিপ্রায়ে কোনরূপ প্রয়াস স্বীকার করেন নাই এবং অতিরিক্ত বাগাড়ম্বর প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় প্রভুর অযথা প্রশংসা করতঃ লেখনী কলুষিতও করেন নাই। তাহার পূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তী অধিকাংশ মোসলমান লেখকই অতিরঞ্জনে সুদক্ষ ছিলেন, কিন্তু জোহরের সত্যবাদিতা, সততা এবং সরলতা ইংরেজ লেখকবর্গের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। ডাউসন বলেন,—

These Memoirs afford much amusement from the *naive* and simple style in which they are written * it bears the appearance of truth and honesty "

জোহরের গ্রন্থ পাঠে তাঁহার নিজের বিষয় অতি অল্পই জানা যায়। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"বাল্যকালে পরম দয়ালু সম্রাট হুমায়ুনের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটে। এই সময় হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নানা সময়ে নানা পদে থাকিয়া মোগলসম্রাটের পরিচর্য্যা করিয়াছি। আমি যখনই যে

(*) "The Author of this work was not a learned person, it has no claim to erudition' – Major Hewart's Private Memoirs of the Emperor Humayun

কার্য্য করিয়াছি, তাহাতেই আমাকে সতত সম্রাটের কাছে অবস্থান করিতে হইয়াছে। যে সকল ঘটনা আমার চক্ষের সম্মুখে সংঘটিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের একখানি ইতিবৃত্ত লিখিয়া রাখিলে কৌতূহলোদ্দীপক হইবে, তাহাই আমার ধারণা হয়। যদিও আমার রচনা-নৈপুণ্য কিছুমাত্র নাই তত্রাপি সেই ধারণা বশেই আমি আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যানুসারে সেই সকল বিষয় এই গ্রন্থে বর্ণন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। আমি এই গ্রন্থ ৯৯৫ হিজরীতে লিখিতে আরম্ভ করি এবং ইহার নাম তেজকিরাত-উল-ওয়াকিয়াত (ঘটনা পরম্পরা—Relation of Occurrences) রাখি।"

গ্রন্থকার এই সময় কি কার্য্য করিতেন তাহার উল্লেখ নাই। কেবল লিখিয়াছেন,—

"আমি নানা সময় নানা কার্য্যে নিয়োজিত হইলেও আমার প্রধান কার্য্য ছিল - সম্রাটের জলযোগান। আমি 'আফ্‌তাব্‌চি' (Ewer-bearer বা আধুনিক ভাষায় পানি-পাঁড়ে) ছিলাম। সম্রাটের পানের, স্নানের ও সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করিয়া আমার নিকট রাখিতে হইত, যখনই সম্রাটের প্রয়োজন হইত তখনই আমাকে যোগাইতে হইত।"

শের খাঁ কর্তৃক পরাজিত হইয়া হুমায়ুন যখন দিগন্ত-বিস্তীর্ণ মরুভূমি ও অপরিচিত জনপদের ভিতর দিয়া শাহ তামশের আশ্রয়ে পলায়নপর হন, পথি মধ্যে এক দুস্তর মরুভূমে তাঁহার পানীয় নিঃশেষ হইয়া যায়। হুমায়ুন অতি, তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জোহরের নিকট প্রার্থনা করিয়া এক বিন্দু বারিও পান না, কিন্তু ইহাতে তিনি ভৃত্যের উপর কিছুমাত্র রুষ্ট হন নাই। সম্রাট তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে অগ্রসর হইয়া সম্মুখে কিয়দ্দূরে যাইয়া একটী ক্ষুদ্র জলাশয় দেখিতে পান। তথায় তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া তিনি একটী কূপ খনন করান। পরে তিনি ঐ কূপোদকই পান করিয়াছিলেন, এবং প্রস্থান কালে প্রচুর পরিমাণে উহার জল সঙ্গে লইয়া যান।

জোহর সম্রাটের অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন, তিনি কুত্রাপি তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই। সম্রাটও এই গুণে তৎপ্রতি সদাশয়তা প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করিতেন না। তজ্জন্যই জোহর অনুপযুক্ততা সত্ত্বেও উত্তরোত্তর উচ্চপদ প্রাপ্ত হন। জোহর এইরূপ বিশ্বাসী ভৃত্যের প্রভু-ভক্তি হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তিনি সম্রাটের আচরণে ও স্বভাবে দোষের লেশমাত্র দর্শন করেন নাই, সম্রাটের সকল কার্য্যই তাঁহার সু-নজরে পড়িয়াছে। কাযেই তাঁহার লোক-চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতার অপব্যবহার হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। জোহরের ইতিহাসের আর একটী ত্রুটী এই যে, তিনি হুমায়ুনের আভ্যন্তরিক ও পারিবারিক বৃত্তান্তের উল্লেখ করেন নাই। হুমায়ুন কি চরিত্রের লোক ছিলেন, তাহা জোহরের ইতিহা পাঠে বিচার করিবার সুবিধা নাই। বাবর ও জাহাঙ্গীরে স্বরচিত ইতিহাসে এই সকল বিষয়ের প্রচুর উদাহরণ আছে জাহাঙ্গীরের ইতিহাসে ইহার এতই প্রাচুর্য্য যে, তৎসমুদ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ হয় এবং সে সকলে ইতিহাস না বলিয়া সুন্দর উপন্যাস বলা যুক্তিসঙ্গত। কিং এতৎসত্ত্বেও জোহর হুমায়ুনের রাজনৈতিক জীবনের যে সুন্দ আলেখ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, অন্য কো লেখকই তদপেক্ষা উজ্জ্বল ও মনোহারী বর্ণনা করিতে সক্ষ হন নাই। শের শাহ কর্তৃক পরাজিত হইয়া যে ভাবে হুমায়ুন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন, শাহ তামশের আলয়ে যে সঙ্কটাপঃ অবস্থায় তিনি পতিত হন, বিপদের সময় তিনি যে সৎসাহ ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, যুদ্ধ ব্যাপারে যে অধ্যবসায় ও চতুরতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে সকলের প্রতি হুমায়ুন যে সদাশয়তা ও উদারতা দেখাইয়াছেন, তাহার তুল প্রতিদ্বন্দ্বী সচরাচর দেখা যায় না। সম্রাটের যে পরিমা দৃঢ়তা থাকা আবশ্যক, হুমায়ুনের হৃদয়ে তাহার অভা থাকিলেও, তাঁহার এই দুর্ব্বলতা leaned to virtue's side. কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়া গিয়াছেন, যদি হুমায়ুন কিয়ৎপরিমাণেও হৃদয়হীন হইতেন, তবে তিনি আরও ক্ষমতাশালী সম্রাট বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন।

হুমায়ুনের অনুগ্রহে জোহর জল-সংগ্রহকারের পদ হইতে উন্নীত হন কিন্তু উন্নীত হইয়া কি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করেন নাই। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, সম্রাট হুমায়ুন কৃপা করিয়া তাঁহার এই দীন ক্ষুদ্র ভৃত্যের প্রতি হাইবতপুর পরগনার রাজস্ব সংগ্রহের ভারার্পণ করেন। আবুল ফজলও এই কথার সমর্থন করিয়াছেন। আবুল ফজল বলেন, "Mihtar Jauhar, treasurer of the Punjab." যাহোক জোহর যে পরে কোন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। জোহর প্রথমাবস্থায় যে কার্য্য করিতেন, সে কার্য্য ও সে পদ ইয়ুরোপ খণ্ডেও অজানিত ছিল না। ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন,—

"* * * Aftabchy or *Ewer-bearer*, an office formerly well known in all the courts of Europe, and still to be found in the establishment of our king's household."

জোহরের ইতিহাস দৃষ্টে সম্রাট্ হুমায়ুনের চরিত্র সমালোচনা করিতে হইলে, আমরা বলিতে পারি যে, সম্রাটের চরিত্র কলঙ্কশূন্য। কিন্তু দুর্ব্বল মানবের পক্ষে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র যশোরাশি প্রত্যাশা করা অসম্ভব, তজ্জন্যই কোন কোন কার্য্যে হুমায়ুনের চিত্ত-দৌর্ব্বল্য প্রকাশিত হইয়াছে,—তাহা নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের চিরকলঙ্কবৎ ইতিহাস বজ্রকঠোরস্বরে ঘোষণা করিতেছে। মৃত্যুশয্যায় বাবর হুমায়ুনের হাত ধরিয়া বলিয়া যান যে, তিনি যেন ভ্রাতৃগণের সহিত সদ্ব্যবহার করেন। সম্রাটের সহোদরগণ বহুবার রাজদ্রোহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, হুমায়ুন কেবল যে তাহাদের সেই গুরুতর অপরাধ সকল ক্ষমা করেন তাহা নহে, তৎসত্বেও তিনি তাহাদিগকে প্রাণের ভাই বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন। যুবরাজ কামরান সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধে অপরাধী হন, তাহাকে বার বার সাবধান করিয়া দেওয়া সত্বেও তিনি সতর্ক না হওয়ায়, সম্রাট কঠিন আজ্ঞা প্রচার করেন।

হুমায়ুনের সিংহাসন আরোহণের সময় হইতে জোহরের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। হুমায়ুন ত্রয়োবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন, সুতরাং তাঁহার জীবনের প্রথম তেইশ বৎসরের বিবরণ এই ইতিহাসে বিবৃত হয় নাই। যুবরাজ অবস্থায় হুমায়ুন পিতার (সম্রাট বাবর) অনেক উপকার করেন, বাবরের আফগান ও ভারত-যুদ্ধে তিনি যোগদান করেন। কেবল যোগদান নহে; হুমায়ুন বিশেষ রণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বাবর সর্ব্বদাই সদুপদেশ দ্বারা পুত্রকে সৎপথে পরিচালিত করিতেন। যখনই তিনি পুত্রের কোন ত্রুটী লক্ষ্য করিতেন, তখনই তিনি মৃদু ভর্ৎসনা দ্বারা পুত্রকে সতর্ক করিয়া দিতেন। বাবর একবার পুত্রকে লিখেন :—

"যখনই যে অবস্থায় তুমি পতিত হইবে, দৃঢ়তার সহিত তাহা হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিবে : সাম্রাজ্যশাসন করিতে হইলে আলস্য ও আয়াসের দিকে তাকাইলে চলিবে না। * * মহৎ ব্যক্তি নিজ শক্তি চালনা করে, আমি আশা করি তুমি তাহার সহিত (যুবরাজ কামরান) ভাল ব্যবহার করিবে। * * যদি আমার প্রশংসাভাজন হইতে চাও, তবে সহচরদিগের সহিত মিশিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিও না, সকলের সহিত সরল ব্যবহার ও সর্ব্বদা সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা করিবে। * * একজন সম্রাট যেরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকেন, তদপেক্ষা কঠিন বন্ধন আর কাহারও নাই।" ইত্যাদি।*

* Memoirs of Baber.

হুমায়ুনের পিতৃভক্তি হ্রাস হইতে দেখিয়া বাবর লিখিয়াছেন :—

"তোমার সহিত আমার কতকগুলি বিবাদভঞ্জন করিতে আছে। দুই তিন বৎসর হইল তোমার নিকট হইতে কোন দূত আমার সমীপে উপনীত হয় নাই এবং আমি যে দূত তোমার নিকট পাঠাইয়াছি সে-ও এই বার মাসের মধ্যে ফিরিল না।"*

বাবর তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার রচনা-শক্তিও ছিল, সরল অথচ অর্থপূর্ণ রচনা তিনি পছন্দ করিতেন এবং নিজেও তদ্রূপ লিখিতেন। একদা হুমায়ুন তাঁহাকে একখানি পত্র লিখেন, তাহাতে যুবরাজ অভিধান হইতে বাছিয়া বাছিয়া কঠিন ও দীর্ঘ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত শব্দ সংযোজিত না হওয়ায় স্থানে স্থানে পত্রের অর্থ ও ভাব বিকৃত হয়। এই পত্রের উত্তরে বাবর পুত্রকে যে পত্রখানি লিখেন, তাহার ইংরেজী অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"In compliance with my wishes, you have indeed written me letters, but you certainly never read them over; for had you attempted to read them, you must have found it absolutely impossible, and would then undoubtedly have put them by. I contrived indeed to decypher and comprehend the meaning of your last letter, but with much difficulty. It is excessively confused and crabbed. Whoever saw a Moamma (a riddle or a charade) in prose? Your spelling is not bad, yet not correct. You have written *iltafat* with a *toe* (instead of a *te*) and *Kuling* with a *be* (instead of a *Kaf*). Your letter may indeed be read; but in consequence of the far-fetched words you have employed, the meaning is by no means very intelligible. You certainly do not excel in letter-writing, and fail chiefly because you have too good a desire to show your acquirements. For the future, you should write unaffectedly, with clearness, using plain words, which would cost less trouble both to the writer and the reader."*

বাবরের স্ব-রচিত জীবন-চরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি কখন পুত্রের গুরুতর অসদ্ব্যবহার বা অন্যায় কার্য্য অবলোকন করেন নাই। হুমায়ুন একবার দিল্লীর ধনরত্নপূর্ণ কয়েকটী গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত দেখিয়া, জোরজবরদস্তিতে তাহা অধিকার করেন। বাবর এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন,—"আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি

* Memoirs of Baber.

তুমি এরূপ কার্য্য করিবে।" বাবর পুত্রের এবম্প্রকার আচরণে বিশেষ দুঃখিত হইয়া ঐ পত্রেই তাঁহাকে তীব্র তিরস্কার করেন। পুত্রের এই গুরুতর অপরাধ সত্ত্বেও বাবর যে, কেবল পত্রে দুটো রূঢ় কথা লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার অকৃত্রিম বাৎসল্য ও স্নেহের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। একবার হুমায়ুন সঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত হন, নানা প্রকার চিকিৎসাতেও কোন সুফল হয় নাই। এমন সময় একদা আবু বাকা নামে এক প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষ বাবরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন যে এই সব ক্ষেত্রে পীড়িতের কোন নিকট আত্মীয় বা বন্ধু যদি তাঁদের নিজের কোন মূল্যবান প্রিয়বস্তু উৎসর্গ করেন, তবে ভগবান পীড়িতের আর কিছুদিন আয়ু দান করিয়া থাকেন। বাবর তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করেন যে, পুত্র আরোগ্য হইলে তিনি স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন। পূর্ব্বোক্ত সাধু তাহাকে এই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়া বলেন যে, আগরা হইতে যে বহুমূল্যবান হীরকখণ্ড আনীত হইয়াছে তাহাই বিসর্জ্জন করুন, কারণ তৎকালে উহাই পৃথিবীর মধ্যে অধিক মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু বাবর তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্য কিছুতেই প্রত্যাহার করিলেন না। মোসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, অতঃপর হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে আরোগ্য পাইতে লাগিলেন, সম্রাট বাবরের জীবন ও স্বাস্থ্য সেই পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত ও ভগ্ন হইতে লাগিল। পরে যে দিন হুমায়ুন সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন, সেই দিনই বাবরের জীবন-প্রদীপ তৈলশূন্য হইয়া চিরনির্ব্বাণ লাভ করিল।

জোহর হুমায়ুনের সিংহাসন আরোহণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া হিজরী ৯৬৩ শাল (১৫৫৬ খৃঃ অঃ) পর্যন্তের বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন। ৯৬৩ হিজরীতে রবি-অল-আবুল মাসের ১১ই তারিখে (২১ জানুয়ারী, ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ) দিল্লী সহরে হুমায়ুনের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। জোহর কেবল তাঁহার মৃত্যুদিনের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কিসে তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয় তদ্বিবরণ কিছু লিপিবদ্ধ করেন নাই।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পরও অনেকদিন জোহর দিল্লীর দরবারে অবস্থান করেন, এরূপ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু তৎকালে তিনি কি কার্য্য করিতেন তাহার উল্লেখ নাই। জোহরের ইতিহাসে তাঁহার জীবনের বিশেষ কোন ঘটনারই উল্লেখ নাই। জোহর গ্রন্থ শেষে যে যাহে গ্রন্থের ত্রুটী উল্লেখ করিয়া বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তাঁহার পাঠকবর্গের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া অদ্য বিদায় গ্রহণ করিলাম।

"He (Jouhar) hopes that the liberal and enlightene persons of the age will excuse and pardon the imperfections and errors of his work, and prays that th readers of it may be preserved from all misfortunes."

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত বিচার।

(আদি পর্ব্ব ১ম হইতে ৫৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত)

অনেক যুগের অনেক আখ্যান পুরাণ লইয়া মহাভারত সংগঠিত; কাজেই উহাতে নানাপ্রকার কথা এবং নানা শ্রেণীর রচনা থাকিতে পারে। তথাপি এক সময়ে মহাভারত সংহিতা সঙ্কলিত বা সংগৃহীত হইবার পরেও উহাতে অনেক কথা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। লিপিপ্রমাদে কিম্বা বিভিন্ন প্রদেশের কথকদিগের অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত যোজনায়, যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রক্ষিত মহাভারতের পাঠ মিলাইয়া কিয়ৎপরিমাণে ধরা যাইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান ডাক্তার Winternitz দক্ষিণ প্রদেশের পাঠধৃত মহাভারত প্রকাশ করিবেন বলিয়া বহুদিন অপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি পত্রে তিনি উহার কয়েক অধ্যায়ের যে নমুনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক আশা হইয়াছিল; কিন্তু এখনও সে গ্রন্থ প্রকাশিত হইল না। ডাক্তার ম্যাক্‌ডোনেল মহোদয় আমাকে লিখিয়াছিলেন, যে ইংলণ্ডে মহাভারতের একখানি সুবিচারিত সংস্করণ (Critical Edition) প্রকাশের উত্তোগ হইতেছে। এ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে পাঠ মিলাইয়া কোন বিচার করা অসম্ভব; কেননা দক্ষিণ-প্রদেশের পাঠ, সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত।

একবার সংহিতা সঙ্কলিত হইবার পরেও যে কুশী লব ও কথকেরা এবং "সূত-মাগধ-বন্দিনঃ," অনেক নূতন যোজনা

করিয়াছিলেন, এবং সংহিতা সঙ্কলিত হইবার পর, যে সকল কথা সংগৃহীত হয় নাই দেখিয়া, "অপ্যত্র গাথাং গায়ন্তি যে পুরাণবিদোজনাঃ" বলিয়া নূতন যোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা যে কোন প্রদেশের মহাভারত পড়িলেই ধরিতে পারা যায়। পর্ব্বে পর্ব্বে এবং অধ্যায়ে অধ্যায়ে মহাভারত খানি সংগৃহীত হইয়া বিভক্ত হইবার পর যে সকল নূতন যোজনা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অনেকগুলি অতি কাঁচা যোজনা। অশ্বমেধপর্ব্বের ৬৬ অধ্যায়ে কুন্তী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "হে যদুনন্দন, তুমি ঐষীক পর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে উত্তরার পুত্রকে বাঁচাইবে, এখন তাহা কর"। "ঐষিক পর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে," এই কথা সংহিতা সংগ্রহের পরের যোজনা, তাহাতে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন কি? ঐ অধ্যায়টি যে ৬২ অধ্যায়ের পর অপ্রয়োজনে লিখিত, তাহা পাঠকেরা দেখিতে পারেন। ঐ রকম কাঁচা যোজনা আরও আছে; ভীষ্ম পর্ব্বে, যুধিষ্ঠির কর্ণকে নিবৃত্ত করাইবার জন্য শল্যকে বলিলেন, যে উদ্যোগ পর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহা পালন কর। শকুন্তলার সপ্তমাঙ্কে যদি পাইতাম যে শকুন্তলা দেবী, দুষ্মন্তের উপর রাগ করিয়া বলিতেছেন, যে "তুমি পঞ্চমাঙ্কে যে বলিয়াছিলে, আমাকে চিনিতে পার না, সে কেমন কথা?" তাহা হইলে কি বলিতাম?

কতক গুলি অধ্যায় নিজেই বলিয়া দিতেছে, "আমরা প্রক্ষিপ্ত।" প্রথমত আদি পর্ব্বের প্রথম অধ্যায়টি যে প্রত্যক্ষরূপে প্রক্ষিপ্ত, তাহা দেখাইতেছি। (১) সূত বলিলেন বা সৌতি বলিলেন, যে বৈশম্পায়ন সর্পসত্রে যে লক্ষশ্লোকময়ী ভারতসংহিতা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই বলিবেন (১০৯)। কিন্তু দু'চারি লাইন পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, যে বৈশম্পায়ন যাহা রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে ২৪ হাজার শ্লোক ছিল; এবং পণ্ডিতেরা তাহাকেই ভারত বলিয়া জানেন (১০২)। এই ভারত আদৌ ভারত সংহিতা নহে, কেননা তাহাতে উপাখ্যানভাগ ছিল না; অথচ উহাকে ভারত সংহিতা বলা হইয়াছে। (২) ঐ স্থানেই আছে যে ব্যাসের অনুক্রমণিকায় ১৫০ শ্লোক ছিল, কিন্তু এই অনুক্রমণিকায় ২৫৭ শ্লোক আছে। "ব্যাস একটা অনুক্রমণিকায় লিখিয়াছিলেন" এ কথা বলিলেই বুঝা গেল, যে এটা সে অনুক্রমণিকা নহে; এটা নূতন। এটা নূতন বটে, তবে নূতন সংহিতা রচিত হইবার সময়ে এটি প্রথম অধ্যায় স্বরূপ সৌতি যোজনা করিয়াছিলেন; এরূপ তর্ক কেহ তুলিতে পারেন। এটা যে তাহাও নয়, তাহা দেখাইতেছি। (৩) মহাভারত, সংহিতারূপে রচিত হইবার পর, যে এই অনুক্রমণিকা, তাহা ৪১ হইতে ৫২ শ্লোক পর্য্যন্ত পড়িলেই জানা যায়। ৫২ শ্লোকে ইহাও লিখিত আছে যে পণ্ডিতেরা কেহ বা উপরিচর উপাখ্যান হইতে মহাভারতের আরম্ভ স্বীকার করেন, কেহ বা আস্তিক পর্ব্ব হইতে মহাভারতের আরম্ভ স্বীকার করেন, কেহ বা বলেন, যে "মন্বাদি" কথা হইতে ভারতের আরম্ভ। তাহা হইলেই মহাভারতের যে তিন বার সংস্করণ হইয়া গিয়াছিল, তাহা স্বীকৃত হইল। সৌতি যখন কেবল বৈশম্পায়ন কথাই আখ্যান দ্বারা বৃদ্ধি করিয়া প্রথম বিবৃত করিয়াছিলেন, তখন এত সংস্করণ তাঁহার বিবৃতির পূর্ব্বে থাকিতে পারে না। নৈমিষারণ্যের ঋষিরাও যাহা জানিতেন না, সৌতি তাহাই বলিতেছিলেন (১ হইতে ৪)। কিন্তু অনুক্রমণিকায় আছে যে, অনুক্রমণিকা লিখিবার পূর্ব্বেই ভারত সংহিতা গ্রন্থরূপে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে (৫০); এবং বহুতর কবি ঐ আখ্যান অবলম্বন করিয়া অনেক কাব্য লিখিয়া গিয়াছিলেন। (৪) এই অনুক্রমণিকা লেখকের "যদাশ্রৌষং" প্রভৃতি কবিতাটি বেশ বটে, কিন্তু বুদ্ধি তেমন পাকা মনে হয় না। "ভারত" শব্দটি ভার (বোঝা) শব্দ হইতে উৎপন্ন নহে, তাহা সকলেই জানেন; ঐ শব্দের পূর্ব্বে "মহা" জুড়িলেই "মহাভারত" হইল। কিন্তু পূর্ব্বের ভারতী কথা মহাভারত নামে খ্যাত হইল কেন, ইহার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া লিখিত হইয়াছে, যে বইখানি বেজায় ভার হইয়াছিল; এবং সকল দেবতারা যখন ওজন করিয়া দেখিলেন যে গ্রন্থখানি চারি বেদ অপেক্ষাও ভারি, তখন ওজন দরে মহাভারতের মূল্য স্থির হইয়া নাম হইল "মহাভারত" (২৭১—২৭৪)। পণ্ডিতেরা এই অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি পড়িয়া মহাভারতকে, মহাভারত, বলিবেন। "ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ," এ কথা অনুক্রমণিকাতেই আছে। সেই জন্যই যে উহা প্রাচীন

কাল হইতে ৫ম বেদ নামে পূজ্য, সে কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। কাজেই মহাভারতের নাম কেন হইল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বহু পরবর্ত্তী লেখক না হইলে, এমন ভুল কেহ করে না। (৫) সমগ্র মহাভারতের মধ্যে এই অধ্যায়েই কেবল গণেশের নাম আছে; তাঁহার নাম আবার হেরম্ব। দেশী হিড়িম্বো, ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে হেরম্ব হইয়াছিলেন, তাহা কেহ দেখাইতে পারিবে না। হেরম্বদেবের সম্বন্ধে পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে অনেক কথা লিখিয়াছি।

এই অনুক্রমণিকার সহিত পরবর্ত্তী চতুর্থ, ৫৯ এবং ৬১ অধ্যায় মিলাইয়া পড়িলে, আর একটি মারাত্মক প্রমাণ পাওয়া যায়, সেইটি অনুক্রমণিকার বিরুদ্ধে সপ্তম যুক্তি। প্রথম অধ্যায়ে লিখিত হইল, যে সৌতির আগমনের পর নৈমিষারণ্যের ঋষিরা স্বীকৃত হইলেন, যে সৌতি মহাভারত কথা বলুন (২১); সৌতিও স্বীকৃত হইয়া বলিলেন যে তিনি তাহা বলিতেছেন; এবং তিনি ঋষিদিগকে তাহা অবহিত হইয়া শুনিতে অনুরোধ করিলেন (১০৯)। এইরূপে মহাভারত কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া "যদা শ্রৌষং" ইত্যাদি দ্বারা সমগ্র ভারতের একটা সংক্ষিপ্ত কথাও বলিয়া ফেলিলেন। আবার চতুর্থ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, যে অনুক্রমণিকার প্রথম শ্লোক পুনর্ব্বার কথায় কথায় লিখিত। সৌতি আবার নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে ঋষিগণ আপনারা কি শুনিতে চাহেন, এবং আমিই বা কি বলিব? হরি হরি! একবার সকল কথা বলিয়া ফেলিয়া, আবার কিং ভবন্তঃ শ্রোতুমিচ্ছন্তি, কিং অহং ব্রবামীতি? ৫৯ অধ্যায়ে পঁহুছিয়া দেখিতে পাই, যে সৌতি না কি বেদব্যাসের মহাভারত কথা আরম্ভই করেন নাই; তিনি নাকি ভৃগুবংশের কথা মাত্রই বলিয়াছেন। সৌতি জানাইলেন যে সর্পসত্রের অবকাশকালে মহাভারত বিকৃত হইয়াছিল, এবং অমনি সেই কথা শুনিবার জন্য ঋষিদের কৌতূহল জন্মিল। "শ্রোতুমিচ্ছামি বৈ কথাং" বলিবার পর সৌতি বলিলেন যে, "হন্ত, তে কথয়িষ্যামি মহদাখ্যানমুত্তমম্, কৃষ্ণদ্বৈপায়নমতং মহাভারতম্—আদিতঃ"।

যদি এই ৫৯ অধ্যায় হইতেই আদি ধরা যায়, তাহা হইলে মহাভারতের আরম্ভ প্রায় উপরিচর কথার কাছাকাছি আসিয়া পড়ে। কিন্তু যদি ৫৯ অধ্যায়টিও পরিত্যাগ করা যায় তাহা হইলে পূর্ব্ব অধ্যায় গুলির সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্ক শূন্য ভাবে উপরিচর কথা হইতে মহাভারতের আরম্ভ পাওয়া যায়।

প্রথম অধ্যায়টি ত নিতান্ত প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু কথা এই যে সময়ে মহাভারত প্রথমতঃ সংহিতারূপে পঠিত হইয়াছিল তখন আস্তীক পর্ব্বও উহাতে সন্নিবিষ্ট ছিল কি না? দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত অধ্যায়গুলির বিচার না করিলে তাহা বলা যায় না; কাজেই তাহাই করিতেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়টি পর্ব্ব সংগ্রহের অধ্যায়; সমগ্র মহাভারতের বিচারের পর আপনা আপনি ধরা পরিবে যে, সংহিতা রচনার সময়ে ঐ রূপ সূচীপত্র প্রস্তুত হইয়াছিল কি না।

তৃতীয় অধ্যায় বা পৌষ্যপর্ব্ব একেবারে জোর করিয়া গুঁজিয়া দেওয়া। প্রথম দ্বিতীয়ের সঙ্গে উহার সংস্রব নাই পরবর্ত্তী অধ্যায়ের সহিতও কোন সম্পর্ক নাই। চতুর্থ অধ্যায়ের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, তাহাই নয়, চতুর্থ অধ্যায়টিতে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে সৌতির আগমন এবং সৌতি সৌনক সংবাদের আরম্ভ। প্রথম তিনটি অধ্যায়ই চতুর্থ অধ্যায় দ্বারা নির্ব্বাসিত হয়। হইতে পারে যে উপমন্যুর উপাখ্যান প্রাচীন; কিন্তু এমন অসংলগ্ন ভাবে তৃতীয় অধ্যায়ে যোজিত হইল কেন? আখ্যানটি পুরাতন বলিয়াই মনে হয়। তাহা হইলে এইরূপ হওয়া সম্ভব যে, ঐ আখ্যানটি মহাভারত সংহিতা গঠনের সময় যোজিত হইতে পারে নাই বলিয়া, পরে কেহ উহা কোন সূতমুখে শুনিয়া যোজনা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেটা কবেকার কথা? যখন চতুর্থ অধ্যায় রচিত হইয়াছিল, তখনকার কথা ত নহে। একেবারে স্থান না পাইয়া, যখন দ্বিতীয় এবং চতুর্থের মধ্যে আখ্যানটি গুঁজিতে হইয়াছে, তখন আখ্যানটি পুরাতন হইলেও আস্তিক পর্ব্বাদি যোজনার পরে ঐটি যোজিত। ঐ অধ্যায়ের মহাদেবের বিশেষ প্রাধান্যের শ্লোকটি, মহাদেব এবং বিষ্ণু লইয়া দলাদলি বাধিবার পরের সময়ের বলিয়া মনে হয়। অধ্যায়টি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া—প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বিচার করিতেছি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যখন পাই, যে কি নিমিত্ত সর্পসত্র হইয়াছিল, তাহাই প্রশ্নরূপে প্রথম উত্থাপিত, তখন তৃতীয় অধ্যায় নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত; কারণ উহাতে ঐ কারণ উল্লিখিত হই-

য়াছে। ৫৯ ও ৬০ অধ্যায়ের সঙ্গে মিলাইলে যে চতুর্থ অধ্যায়টি বৃথা হইয়া পড়ে; তাহা দেখাইয়াছি। পৌলোম পর্ব্বটিও পৌষ্যের মত পূর্ব্ব-পরবর্ত্তী কথার সহিত সম্পর্ক শূন্য। যে সর্পসত্র কথার আরম্ভকথা উহাতে লিখিত, তাহা সম্পূর্ণভাবে আস্তিক পর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কি জন্য সর্পসত্র হইল সেই প্রশ্নই আস্তিক পর্ব্বের প্রথমে প্রথম উত্থাপিত। পৌলোম পর্ব্বের অস্তিত্ব থাকিলে ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে আস্তিক পর্ব্ব নিশ্চয়ই অন্যভাবে আরব্ধ হইত। কাজেই দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সমস্ত অধ্যায় গুলিই "আস্তিক পর্ব্বযুক্ত" মহাভারতকথা রচিত হইবার পরে যোজিত; অর্থাৎ মহাভারত সংহিতা গঠিত হইবার পরে প্রক্ষিপ্ত।

১৩ হইতে ৫৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত আস্তিক পর্ব্ব। আস্তিক পর্ব্বের পরেই নূতন করিয়া মহাভারত আরম্ভ সূচিত হইতেছে। কিন্তু কথা এই, যে উপরিচর আখ্যান হইতে যে ভারত পূর্ব্বে ছিল, তাহা কি মহাভারত সংহিতা ছিল? যখন মহাভারত সংহিতারূপে গঠিত হইল, তখন আস্তিক পর্ব্ব লইয়াই হইয়াছিল? কথাটির বিচারের প্রয়োজন।

সর্পসত্রে মহাভারত প্রথমতঃ বিবৃত হইয়াছিল, একথা প্রথম, চতুর্থ এবং একোনষষ্টিতম অধ্যায়ে অবিসংবাদীরূপে পাই। কাজেই উপরিচর হইতে আরম্ভ করিয়া যে মহাভারত, তাহাতেও সর্পসত্রের ভূমিকা ছিল মনে করিতে পারি। যখন সর্পসত্রের কথা ছিল, তখন যে সর্পসত্র কেন হইয়াছিল, এ কথার আমূল ইতিহাস না বলিয়া মহাভারত বিবৃত হইয়াছিল তাহা বলা যাইতে পারে না। সকল পুরাণ লইয়া যখন মহাভারত সংহিতা, তখন সর্পসত্র স্বীকৃতস্থলে উহার পুরাণ ত্যাগ করিয়া সংহিতা রচিত হয় নাই। এরূপ স্থলে যদি সমগ্র আস্তিক পর্ব্বটি বাদদিয়া মহাভারত আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে আস্তিক পর্ব্বের বর্ণিত বিষয় মহাভারত হইতে চলিয়া যায় কি না, তাহা দেখিতে হইবে।

জনমেজয়ের সর্পসত্র কেমন করিয়া নিষ্ফল হইয়াছিল, সে কথা তাঁহার সর্পসত্রে বিবৃত মহাভারতে থাকিতে পারে না। তখনকার বিবৃত মহাভারত কেবল মাত্র ভারতী কথা। আস্তিক পর্ব্বের প্রথমেই উল্লিখিত হইল, যে আস্তিক পর্ব্বের কথা পুরাণ নামে কীর্ত্তিত (১৩—৬), এবং সেই পুরাণ নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিদিগের নিকট পূর্ব্বেই সূতের পিতা বলিয়াছিলেন, এবং এখন সৌতি তাহা শৌনককে বলিতে বলিলেন। এই আরম্ভ প্রথম অধ্যায়ের প্রতিবাদী। যে রাজা সর্পসত্র করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কি, তিনি কাহার পুত্র, এ কথাও শৌনক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন (১৩—৩)। এই উক্তি ৫৯ এবং তৎপরবর্ত্তী অধ্যায় কথার প্রতিবাদী। যাহা হউক, সর্পকুলের জন্ম কথা ৬৬ এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আছে। নূতন করিয়া সেখানে বিনতার পুত্রদিগের নাম এমন ভাবে বলা হইয়াছে, যে পূর্ব্বে কখনও বলা হয় নাই। ইহাতে আস্তিক পর্ব্বটা পরে যোজিত বলিয়াই সন্দেহ হয়। তবে কথা এই, যে ১৩, ১৪ এবং ১৫ অধ্যায়ে আস্তিক পুরাণ যে ভাবে বর্ণিত আছে ৫৯ অধ্যায়ের পরবর্ত্তী কোন অধ্যায়ে তাহা নাই। এরূপ স্থলে যদি বলা যায়, যে আস্তিক-পুরাণ কথা (১৩ হইতে ১৫ অধ্যায় পর্য্যন্ত) মহাভারত সংহিতা প্রথম সঙ্কলনের সময় যোজিত হইয়াছিল, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে সহসা কিছু বলা শক্ত। ত্রয়োদশের সহিত ৫৯ এর যে বিবাদ দেখাইয়াছি, তৎসম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে, যে পূর্ব্বের আরম্ভযুক্ত ভারতী কথার সহিত পুরাণাদি যোগ করিয়া যখন সংহিতা গঠিত হইল, তখন আস্তিক পুরাণের প্রারম্ভে আবার একটু আরম্ভ কথা না জুড়িলে চলে না বলিয়া তাহা করা হইয়াছে।

আস্তিক পুরাণ পঞ্চদশ অধ্যায়েই শেষ হইয়া গেল। ঐ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটি এই:—"এতদাখ্যান মাস্তিকং যথাবৎ কথিতং ময়া। প্রব্রূহিভৃগুশার্দ্দূল, কিমন্যৎ কথয়ামিতে।" ইহার পরে আর ঋষিদিগের পক্ষে বোকা বা ন্যাকা সাজিয়া পুনঃ পুনঃ আস্তিক পুরাণ জিজ্ঞাসা করা চলে না। যাহা যথাবৎ বলা হইয়া গিয়াছে, তাহা আবার জিজ্ঞাসা করা কেন? একবার নহে পরবর্ত্তী অধ্যায় গুলিতে ২।৩ বার বৃথা পুনরুক্তি আছে।

এখন যদি ১৬ অধ্যায় হইতে ৫৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে কি ফল হয়, তাহা বলিতেছি। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি প্রথম বারটি অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত।

যে সকল ছন্দ আলঙ্কারিক সাহিত্যের যুগের, অর্থাৎ অন্যান্য সাহিত্য মিলাইলে যে সকল ছন্দ তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে পাওয়া যায় না, সেই সকল ছন্দের মধ্যে রুচিরা ছন্দ

১৯ অধ্যায়ে ১০টি, ২৩ অধ্যায়ে ৬টি, ২৫ অধ্যায়ে ২ টি, ২৮ অধ্যায়ে ২টি, ৩৪ অধ্যায়ে ১টি এবং ৫৬ অধ্যায়ে ১ টি। আদিপর্ব্বের মধ্যে এই ২২টি ছাড়া আর রুচিরা নাই।

সমগ্র মহাভারতে বসন্ততিলকা মোটে ৭টি, তাহার মধ্যে আদিতে ৩ টি, এবং ঐ তিনটির মধ্যে ২টিই দ্বিতীয় অধ্যায়ে। আদিতে কেবল চারিটি প্রহর্ষিণী আছে; উহার মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২টি, ২১ অধ্যায়ে একটি এবং ২২ অধ্যায়ে একটি। আদিপর্ব্বের মধ্যে কেবল ৩০ অধ্যায়েই দুইটি পুষ্পিতাগ্রা ও অপরবক্ত্রের মিশ্র রচনা আছে। মহাভারতে কেবল দুটি স্থলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শালিনী রচনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; ৫৮ অধ্যায়ে উহার একটি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

আস্তিক পর্ব্বে সমুদ্রমন্থনের পুরাণ আছে। সমগ্র মহাভারতের মধ্যে ঐ পুরাণের আর কুত্রাপি উল্লেখ বা উপন্যাস নাই। মহাদেব নীলকণ্ঠ হইলেন কেন, এই কথার মীমাংসায় শান্তি এবং অনুশাসন পর্ব্বে আছে যে বিষ্ণু তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ হাত মহাদেবের গলায় দিয়াছিলেন বলিয়া ঐরূপ হইয়াছিল। সমুদ্রমন্থনের পুরাণে নীলকণ্ঠের যে ইতিহাস আছে, তাহা মহাভারতের কোথাও স্বীকৃত নহে; এবং সমুদ্রমন্থন সংসৃষ্ট পুরাণে জ্ঞান যে কাহারও ছিল, তাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না। তবে একথাও বলা যাইতে পারে, যে ১৭ অধ্যায়ের ২য় শ্লোক হইতে ১৮ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক যদি ছাঁটিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কোনপ্রকার বাধা উপস্থিত হয় না; বরং গল্পটি বেশ প্রাসঙ্গিকভাবে চালান যায়। ইহা হইলে, কেবল সমুদ্রমন্থনের নূতন পুরাণটি পরিত্যক্ত হয়, অথচ আস্তিক পর্ব্বে বাধা পড়ে না। আমি পূর্ব্বে এইরূপ বিচার করিয়াছিলাম; কিন্তু আস্তিক পর্ব্বের যে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া এখন নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহাতে নূতন ছন্দ সমাবেশের কথায় সুবিচার হয়। এরূপ হইতে পারে, যে গোড়ার কথার ছল ধরিয়া কোন কথক, পরবর্ত্তী সময়ে আস্তিক পর্ব্বেও প্রক্ষিপ্তে প্রক্ষিপ্ত সমাবেশ করিয়া নূতন পুরাণ যোজনা করিয়াছেন। বহুপাঠধৃত মহাভারত না পাইলে, এ কথার সম্পূর্ণ বিচার চলে না। সমগ্র আস্তিক পর্ব্ব এবং প্রথম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় বাদ দিলে, যে পরবর্ত্তী অধ্যায়ের সর্পসত্রের নূতন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং মহাভারতের কথা নূতন করিয়া বলিবার সংকল্প, অবিরোধী র রক্ষা করা যায়, তাহা বলিয়াছি।

তাহার পর আবার ৬২ অধ্যায়ে যখন পাইতেছি, মহাভারত খানি সংহিতারূপে সৃষ্ট, এবং যাহা ভারতে ন তাহা ভারতে নাই; এবং ঐ অধ্যায়ের পর হইতেই য বংশ সম্ভব এবং উপরিচর কথার আরম্ভ; তখন ৫৮ অং পর্য্যন্ত সমগ্র অংশই, মহাভারত খানি সংহিতারূপে এক পঠিত হইবার পরে, যোজিত বলিয়া ধরাই যুক্তিসিদ্ধ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদা

বঙ্গসাহিত্যের সহিত হিন্দীর ঘনিষ্ঠতা।

বঙ্গসাহিত্য অল্প কালের মধ্যে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়া তাহাতে এক্ষণে বেশ বুঝা যায় হিন্দী উর্দ্দু বা গুরুমুখী প্রভৃ হইতে তাহার গ্রহণ করিবার অল্প স্থানই আছে। বঙ্গসাহি যেমন সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের নিকট ঋণী, হি বঙ্গসাহিত্যের নিকট ততদূর না হউক, কতদূর ঋণী, অ এই প্রবন্ধে তাহার আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

যুক্ত প্রদেশ এবং পঞ্জাবের দেশভাষাকে আমরা হিন্দ বলিব। কারণ উর্দ্দু, পঞ্জাবী, জাটকী, বৈশওয়ারী, ভোজপু মাগধী প্রভৃতি যাবতীয় উপভাষা এক হিন্দীরই অন্তর্গত ব যাইতে পারে।* উচ্চারণভেদ এবং কৃষিজাত বা বাণি ব্যবসায়াদির দ্বারা অপর জাতির সংস্রবে উপগত শব্দবৈচি মূল ভাষা হইতে অপভাষাগুলি বিভিন্নরূপ ধারণ করে। মা জাটদিগের ভাষা এইরূপে ভিন্নভাব ধারণ করায় জাট বা হিন্দকী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যে কোন উর্দ্দু গ্রন্থে বি ভাগের উপর হিন্দী শব্দ পাওয়া যায়। যে কয়টী পা আরব্য প্রভৃতি শব্দ থাকে তাহাদের হিন্দী প্রতিশব্দ বসা দেবনাগরী অক্ষরে লিখিলে সে গ্রন্থখানি খাঁটী হিন্দী পুস্ত

* "The claim of Punjabi to be considered an dependent language rests more upon its phone system, and its store of words not found in Hin than upon any radical difference in its structure inflections."—Beam's Comparative Grammar of Indian Languages.

হইতে পারে। বৈশওয়ারী, ভোজপুরী প্রভৃতি হিন্দীরই বিভিন্ন প্রাদেশিকতার নিদর্শন মাত্র। এই সকল কারণে উত্তরপশ্চিম, অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতানা ও পঞ্জাবের দেশভাষা হিন্দী বলিলে দোষের হয় না।

এই হিন্দী ভাষা অতি প্রাচীন হইলেও অল্প দিন হইতে ইহার সাহিত্যের দৈন্য ঘুচাইবার চেষ্টা হইতেছে। হিন্দী-সাহিত্যের ইতিহাসে* আছে অষ্টম শতাব্দীর উজ্জয়িনীনিবাসী পুষ্য কবি হিন্দীর প্রথম কবি ও গ্রন্থকার। ইহাঁর পর এবং রাজপুতানার রাজকবি চাঁদবরদাইয়ের মধ্যে খুমানসিংহ প্রমুখ চারিজন কবির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর এই চাঁদকবি হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শারঙ্গধর কবীশ্বর প্রমুখ অন্য তিনজন কবির সহিত হিন্দী ঐতিহাসিক সাহিত্যের শেষ সূচিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব কবিগণ যেমন বাঙ্গালা সাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করিয়াছিলেন, উত্তরভারতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর রামানন্দস্বামী প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক এবং অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণ দ্বারা হিন্দীসাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। এই সাহিত্যের যুগপ্রবর্ত্তকগণের মধ্যে কবীর দাস, মীরাবাই প্রভৃতি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে হিন্দীতে মুসলমান সাহিত্যের প্রভাব বিস্তৃত হয়। পদ্মাবতপ্রণেতা মালিক মহম্মদ ফারসী এবং ফায়জী প্রমুখ কয়েকজন মুসলমান কবি হিন্দী সাহিত্যে রসন্যাসের ছায়াপাত এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন। তৎপরে ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে বল্লভাচার্য্য, বিট্ঠলবিপুল এবং তাঁহাদের আটজন শিষ্য বা অষ্টছাপ, হরিদাস স্বামী, সুরদাস, গোঁসাই তুলসীদাস, দাদু ও বিহারীলাল প্রমুখ মহারথিগণের সমসাময়িক প্রায় দুইশত কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সময় হিন্দী সাহিত্যের "স্বর্ণযুগ।" অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রিয়দাস, গঙ্গাপতি, গিরিধর প্রভৃতি কবিগণ প্রমুখ টীকা ও ভাষ্যকারগণের আবির্ভাবে হিন্দী সাহিত্যের নবযুগ সূচিত হয়। এই সময়ে একখানি বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ লেখকেরও নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি অশ্ববিনোদ † প্রণেতা কবি চেতনচন্দ্র। এ পর্য্যন্ত হিন্দী সাহিত্যে উর্দ্দুর চিহ্ন মাত্র ছিলনা। "বাগ ও বাহার" নামক বিখ্যাত পারস্য গ্রন্থের মুখবন্ধে মীর আম্মন কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে যে আকবর বাদশাহের সময়ে নানা প্রদেশ হইতে সমাগত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রাজকার্য্যে এবং ব্যবসায় বাণিজ্যাদি বিষয়ে পরস্পর পরস্পরের সহিত সহজে কথোপকথন চলিতে পারিবে বলিয়া সকল ভাষার সংমিশ্রনে উর্দ্দু অর্থাৎ মিশ্র ভাষার সৃষ্টি হয় *। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহা কথিত ভাষায় বদ্ধ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দীর পরিবর্ত্তে হিন্দুস্থানী † সাহিত্যের জন্ম হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লাল্লুজীলাল এই ভাষায় প্রেমসাগর গ্রন্থ লিখিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় গদ্য লিখনপ্রণালীর পথ প্রদর্শন করিলেন। সুতরাং হিন্দী গদ্য এবং আধুনিক ‡ বাঙ্গালা গদ্য প্রায় একই সময় জন্মগ্রহণ করে। এই সময়ে অযোধ্যা ও বুন্দেল খণ্ডে § এবং তৎপরে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরাজশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন মুদ্রাযন্ত্র বারাণসীতে প্রবেশ লাভ করে তখন বর্ত্তমান হিন্দী সাহিত্যের এই কেন্দ্রস্থান হইতে সমগ্র হিন্দুস্থানে যুগান্তর উপস্থিত হয়। কাশীনরেশ এবং অযোধ্যার তালুকদারগণ সাহিত্যসেবীদিগকে প্রভূত উৎসাহ দান করিয়া হিন্দী সাহিত্যের শ্রী ফিরাইয়া দেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দী সাহিত্যে রাজা শিবপ্রসাদ ‖ এবং ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র ¶ চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় উদীত হইলেন।

* শিবসিংহ সেঙ্গর প্রণীত "শিবসিংহ সরোজ"।

† A treatise on Veterinary Surgery.

* "যব্ আকবর বাদশহ তখ্তপর্ বৈঠে তব্ চারোঁ তরফ্‌কে মুল্‌কোঁকে সব্ কয়ুম কদরদানী আউর ফয়েজরসানী উন্ খান্‌দান সে সানিকি শুন্‌কর হুজুরমে একর্ জমায়ে হুয়ে—লেকিন্ গোএরা খাওর বোলী জুদি জুদি থি। একট্ঠে হোনে সে আপস মে লেন দেন সওদা সুল্‌ক্ সওয়াল জবাব করতে এক জবান উর্দ্দুকি মোকর্রর হুই।"

† অর্থাৎ পারস্য বা দেবনাগরী অক্ষরে উর্দ্দু মিশ্রিত হিন্দী।

‡ আধুনিক, কারণ বাঙ্গলায় বহু পূর্ব্বে গদ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য দ্রষ্টব্য।

§ ঝাঁসী, হামিরপুর, বাঁদা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি প্রদেশ।

‖ "The benefit done to the intellect of Hindustan by such men" as Raja Siva Prosad and Harish Chandra cannot be easily calculated"—"the Mediæval Vernacular Literature of Hindustan (Chap XI) by G. A. Grierson, Vienna, 1888.

¶ "He has done more for the popularisation of vernacular literature than almost any living Indian He was certainly the best critic which Northern India has produced"—ibid.

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রধান লক্ষণ সাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্য; বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থের আবির্ভাব এবং প্রধানতঃ সাময়িক সাহিত্যের অভ্যুদয়। বাঙ্গালা অপেক্ষা হিন্দুস্থানের সাহিত্য প্রাচীন ইতিহাসের গৌরব করিতে পারে। যে সময় বঙ্গভাষায় একখানিও ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ, তাহার বহুপূর্ব্বে উর্দ্দু ও হিন্দীতে অনেকগুলি ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্বে শিবসিংহ সেঙ্গর কর্ত্তৃক "শিবসিংহ সরোজ" লিখিত হইয়াছিল। শব্দকল্পদ্রুম সংস্কৃত অভিধান। বঙ্গসাহিত্য ইহার গৌরবের ভাগী তত নহে; কিন্তু ১৮৪২-৩ অব্দে কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগকল্পদ্রুম ও রাগসাগরোদ্ভব লিখিয়া হিন্দীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থের আলোচনায় বঙ্গসাহিত্য পুষ্টিলাভ করিতে পারে। যে সময়ে বাঙ্গালায় পাঠ্যগ্রন্থের একান্ত অভাব ছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দী "বৈতাল পচীশি" হইতে অনুবাদ করিয়া "বেতালপঞ্চবিংশতি" প্রণয়ন করেন। অন্যান্য বিষয়েও হিন্দী আমাদের শিক্ষা ও আলোচনার উপযোগী। যে ভাষা ভারতব্যাপী বলিলেও চলে, যাহার সাহিত্য বহুশতাব্দীর প্রাচীন* এবং বহু বিস্তৃত † তাহার সংস্রবে বঙ্গসাহিত্য লাভবান হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গের কাশীদাস ও কৃত্তিবাস যাহা করিয়াছেন যে সাহিত্যের একজনমাত্র কবি গোঁসাই তুলসীদাস একখানি গ্রন্থে তদপেক্ষা অধিক ‡ কার্য্য করিয়াছেন সে সাহিত্যের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু হিন্দীর এই ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও বঙ্গসাহিত্য ইহার অনুকরণে উন্নত হইবেনা ইহা আর এক্ষণে কেহই অস্বীকার করিবেন না। হিন্দী অধিক পুরাতন হইলেও সাহিত্য হিসাবে এখনও ইহা বঙ্গসাহিত্যের বহু নিম্নে অবস্থান করিতেছে। বোধ হয় পারস্য ও উর্দ্দু সাহিত্যের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া, প্রাচীন হিন্দী সাহিত্য এরূপ পশ্চাৎপদ হইয়া আছে। সুখের বিষয় ইংরাজী ও বঙ্গসাহিত্যের সংস্রবে ইহার উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইতেছে। উর্দ্দুর প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহা অনেকের অবিদিত নাই। সেই প্রভাব অতিক্রম করিয়া এখনও আদালতের বাঙ্গালা স্বীয় স্বাতন্ত্র লাভ করিতে পারে নাই। এই মুসলমান সাহিত্যের সংস্রবেই বঙ্গসাহিত্য ভারতচন্দ্রাদির ন্যায় অতুল প্রতিভাশালী কবিগণের হস্তে পড়িয়াও শ্লীলতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। এই জন্য হিন্দুস্থানী সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠতায় বঙ্গসাহিত্যে পুনরায় কলঙ্ক স্পর্শ না করে সে দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহার শিষ্টাচার, লিপিচাতুর্য্য এবং প্রণয় ও বিরহ ঘটিত ললিত ভাবতরঙ্গের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের আবিলতা অবসাদ ফিরিয়া না আইসে। উর্দ্দুর এইরূপ হীনভাবদুষ্টতার অনেক প্রমাণ আছে। তন্মধ্যে একটী রহস্যজনক ঘটনার উল্লেখ করিব। পঞ্জাব বড়ই উর্দ্দুপ্রিয়। নাগরী প্রচারিণী সভা, আর্য্যসমাজ এবং গুরমুখী ভাষার পোষকগণের প্রভূত যত্নেও প্রতি বৎসর উর্দ্দুর গ্রন্থ সংখ্যা এবং উর্দ্দুর লেখক ও পাঠক সংখ্যার হ্রাস হইতেছে না। মূল হিন্দী সাহিত্যে যেমন গোঁসাই, ফকির এবং সাধকগণের ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট হইয়াছে, উর্দ্দুতে তদ্রূপ মুসলমান বিলাসিতার ছায়াপাত হইয়া সাহিত্যের আদর্শকে খাট করিয়া ফেলিয়াছে। ঐ সাহিত্য সুন্দর হইলেও কিরূপ দুর্নীতিপ্রবণ তাহা যে কোন উর্দ্দুপুস্তকালয়ের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে। প্রায় ত্রিশ একত্রিশ বৎসর হইল পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট লাহোরের কতকগুলি পুস্তকবিক্রেতাকে কুরুচিপূর্ণ পুস্তক বিক্রয়ের জন্য অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করায় অন্যান্য পুস্তকবিক্রেতাগণ শঙ্কিত হইয়া এরূপ যাবতীয় পুস্তক নষ্ট করায় বাজারে পঞ্জিকা ও আইন সংক্রান্ত পুস্তক ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।* বঙ্গসাহিত্যকে হিন্দীর সংস্রবে লাভবান হইতে

* পুষ্যকবি ৭১৩ খৃঃ অব্দে খ্যাতি লাভ করেন।

† From Bhagalpore to the Punjab, from the Himalyas to the Nurbada—Grierson.

"It has been interwoven into the life, character and speech of the Hindi population of more than three hundred years"—Griersons' Hindi literature Chap. vi.

‡ সমগ্র ভারতে বঙ্গভাষাভাষীর দ্বিগুণ হিন্দী ভাষাভাষী। এমন কি বঙ্গে হিন্দী ভাষাভাষী অর্দ্ধেকের অধিক—Para: 307, Page 233 Census of Bengal 1891 by C. J. O., Donnelm. a.

* "It appears that the fines lately inflicted on some booksellers of Lahore for dealing in obscene books have so frightened the rest that Pundit Krishen

হইলে প্রাচীন হিন্দীসাহিত্য আলোচনা করিতে হইবে। কারণ এই হিন্দুস্থানী সাহিত্য ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় বর্ত্তমান হিন্দী বঙ্গসাহিত্য হইতেই স্বীয় দৈন্য দূর করিতে যত্নবান। পঞ্জাবে কুড়ি বাইশ বৎসর পূর্ব্বে ৺ অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠের হিন্দী অনুবাদ তথাকার বিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্দ্ধারিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ অনুবাদের স্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল পাঠ্যপুস্তকে এক্ষণে আর বদ্ধ নাই। বঙ্কিম বাবু প্রমুখ বঙ্গীয় সাহিত্যরথীদিগের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদিত এবং ঐ সকল পুস্তকের অনুকরণে নানাবিধ পুস্তক লিখিত হইতেছে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে যেমন অনুবাদের যুগ আসিয়াছিল, হিন্দী সাহিত্যে এখন তাহাই আসিয়াছে। বাবু রাধাকৃষ্ণ দাসের "দুঃখিনী বালা" উপন্যাস, পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ প্রণীত "সরস্বতী নাটক," বাবু দেবকীনন্দন ক্ষত্রী প্রণীত "বীরেন্দ্র বীর" এবং "চন্দ্রকান্ত সন্ততি" পণ্ডিত লেখরাম কর্ত্তৃক অনুবাদিত "কবিপঞ্চ কালিদাস" পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস প্রণীত "সাহিত্য নবনীত" এবং সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, নাটক ও উপন্যাস প্রভৃতি গ্রন্থের অজস্র অনুবাদ গ্রন্থ তাহার নিদর্শন। এক্ষণে বঙ্গসাহিত্যের প্রভাব হিন্দীর উপর কতদূর বিস্তৃত হইয়াছে তাহা দেখাইতে হইলে প্রসঙ্গ অনেক বাড়িয়া যাইবে। (সুতরাং এক কথায় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, বঙ্গসাহিত্যের জীবনীশক্তি এবং আভ্যন্তরীণ ভাবে হিন্দীসাহিত্য যেরূপে ধীরে ধীরে অনুপ্রাণিত হইতেছে, ইহার ভাষা এবং শব্দসমাবেশও বাঙ্গালার অনুরূপ হইয়া আসিতেছে।) অদ্য আমরা তাহার কতিপয় স্থূল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াই এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

"আউর স্থানোকো ছোড় দিজিয়ে ; কাশীমে ইয়ে বাত প্রসিদ্ধ হায় কি যদি কোই মনুষ্য এক ক্ষেত্রমে কেবল একহী দিন খায় তো বর্ষভর তক ও আপনা সময় ভলী ভাঁতি বিতা সকতা হায়" এই কথাগুলি বাঙ্গালা শব্দের সুরে উচ্চারণ করিলে অথবা—

Lal, a member of the Literary Society of the Punjab who was desirous to buy some books he required says he could not, in all the shops he visited, find any thing but almanacks or works referring to laws and regulations."—Page 120. The Indian Antiquary April. 1875.

"ইস্ লেখকে সমাপ্ত করনে পর হমনে বড়াহী হৃদয়-বিদারক য়হ সমাচর সুনা কি সর্ব্বগুণমণ্ডিত পণ্ডিতবর সুকবি সাহিত্যাচার্য্য ভারতরত্ন ভারতভূষণ * * * অনেক বিদ্যাপঙ্কৃত পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস মহোদয় কো কুটিল কাল কি করাল চালনে * * ন ছোড়া * * যদি য়হ বজ্রপাত ন হোতা তো আশা থী কি ইস্ প্রবন্ধ মে কোই মত দৃঢ়তা সে স্থির হো জাতা।" এই কথাগুলি বাঙ্গালায় লিখিলে সংস্কৃতের মধ্যস্থতায় বাঙ্গালার সহিত হিন্দীর কতদূর আত্মীয়তা জন্মিতেছে বেশ বুঝা যাইবে। উভয় জাতির মধ্যে নিত্যব্যবহৃত প্রবাদবাক্য সকল হইতেও ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিম মধ্যভারত এবং অযোধ্যাবাসীর ত কথাই নাই এমন কি সুদূর পঞ্জাব-বাসিগণের প্রবচন সমূহ যে বহুলাংশে বাঙ্গালা প্রবাদবচনের অনুরূপ এবং পরস্পরের মনোভাব উপমা নির্ব্বাচন ও শব্দসমাবেশ সমভাবাপন্ন তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালা প্রবচন।		পঞ্জাবী প্রবচন।
১। যার কাজ তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে	...	জিস্ দা কামউস নন সাজে হোর অন্ খিজ্ঞা বাজে।
২ যার লাঠি তার মাটি	...	জিস্দা ভেগ্ উস্দা দেগ।
৩ যার খাই তার গাই	...	জিস্দা খাই উস্দা গাই।
৪ যেথা বৃক্ষ নাই সেথা এরণ্ড প্রধান	...	জিথে দরখত্ নেহি উথে রিণ্ড পরধান।
৫ পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়	...	পাপীকা ধন অকারণ যায়।
৬। না নমন তেল হবে না রাধা নাচবে	...	না নওমন তেল হোগা না রাধা নাচে গা।

অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। যাঁহারা অধিক প্রমাণ চাহেন তাঁহারা "Fallon's Dictionary of Hindustani Proverbs" পুস্তক দেখিতে পারেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

হিমালয় দেখিয়া।

তরুণ অরুণ উঠেছে গগনে
শাখে শাখে পাখী গাহিছে
নয়ন মেলিয়া, দেখিনু সমুখে
হিমগিরি দূরে শোভিছে ;

অমল ধবল কিরীট মাথায়
রঞ্জিত উষার আলোকে
অতি অপরূপ রূপের মাধুরী
উছলে পলকে পলকে ;

অবাক হইয়া চাহিয়া রহিনু
পলকবিহীন নয়নে
অই হিমগিরি, দেবতাসেবিত
বর্ণিত তন্ত্রে পুরাণে !

উন্নত মস্তক ভেদিয়া গগন
স্পর্শিছে নীল অম্বরে
শুভ্র জটাপাশ পড়েছে ছড়ায়ে
বিশাল স্কন্ধ উপরে ;

কত জনপদ নগর প্রান্তর
শোভিছে অঙ্কের উপরে
যক্ষ সুর নর ভুচর খেচর
দিবস যামিনী বিচরে।

অতীতের সাক্ষী তুমি হিমালয়
মহিমা ভুবনবিদিত
কাব্য ইতিহাসে পুরাণে তন্ত্রে
তোমার কাহিনী লিখিত।

কত যোগী ঋষি কন্দরে কন্দরে
বেদমন্ত্র পাঠ করিছে
পবিত্র সলিলা, জাহ্নবী যমুনা
পদতলে সদা লুটিছে।

অই বুঝি অই, কৈলাসের চূড়া
শত সূর্য্য সম ভাতিছে
তুষার মণ্ডিত অমল ধবল
শিখর গগন চুম্বিছে—

অই বুঝি কাছে গিরিরাজপুরী
কাঁদে বুঝি রাণী মেনকা
"উমা" "উমা" বলে লুটায় ভূতলে
ছিন্নমূল যেন লতিকা—

শিলাতলে অই, যোগী বেশে শিব
মগন কঠোর সাধনে ;
নিরুদ্ধ নিশ্বাস, আঁখি নিমীলিত
নিশ্চল নিস্পন্দ আসনে ;

উদ্ভিন্নযৌবনা গিরিরাজকন্যা
বন্দিছে যোগীর চরণ,
খসিছে কুসুম কেশদাম হতে
চঞ্চল অঙ্গের বসন—

সহসা আশ্রমে আসিল বসন্ত
মলয় সমীর বহিল
ফুটিল অশোক, ছুটিল ভ্রমর
শাখে শাখে পাখী গাহিল,

ভঙ্গ হলো ধ্যান, দেখে যোগীবর
চিত্রপট সম দাঁড়ায়ে,
সম্মুখে পার্ব্বতী, চম্পকবরণী
কুসুম ভূষণে সাজিয়ে—

ওই বুঝি অই, কুবের আলয়
অলকা ভুবনবিদিত
নিত্য জ্যোৎস্না যেথা সতত বিরাজে,
পাদপ নিত্য পুষ্পিত।

ময়ুরকণ্ঠে কেকারব উঠে
উন্মত্ত ভ্রমর গুঞ্জরে
বিদ্যুৎবরণী যক্ষবধূগণ
বিরাজে প্রমোদমন্দিরে—

শিশির মথিতা পদ্মিনীর মত
মলিন বসন ভূষণে
বসে আছে হোথা যক্ষবালা এক
কাতর সজল নয়নে,

মেঘদূত তার আসেনি তখন
শুনাতে পতির বেদনা
কাঁদে বসে তাই স্মরিয়ে বঁধুয়ে
করিছে মিলনকামনা—

অই বুঝি দূরে মানসরোবর
শোভিত কনক কমলে
দলে দলে দলে, রাজহংস চরে
স্ফটিকশুভ্র সলিলে

দেবদারু দ্রুম শোভে চারিধারে
নিকুঞ্জ বিহগকুজিত
বনপথ হতে মুরজার ধ্বনি
ভাসিয়া আসিছে নিয়ত,

মানসরোবর, দেবতা বাঞ্ছিত
বিধির অপূর্ব্ব রচনা
সিদ্ধ যতি ঋষি চারিধারে তার
করিছে বিভুর বন্দনা।

হে হিমাদ্রি তব, পদতলে অই
রয়েছে ভারতজননী
ফলে ফুলে জলে সাজালে তাহারে
করিলে ভুবনমোহিনী

জ্ঞানের গৌরবে যশের সৌরভে
নাহি ছিল তার তুলনা
বীর পুত্রগণ বীরের মতন
করিত মায়ের বন্দনা

নানা ছন্দে কবি, রচি যশোগান
গাহিত দুয়ারে দুয়ারে
প্রতিধ্বনি তার, উঠিত নিয়ত
পর্ব্বতে প্রান্তরে নগরে।

দেখিলে হিমাদ্রি ভারতআকাশে
তরুণ-অরুণ উঠিল
দেখিলে আবার নিবিড় আঁধার
কালসম তারে ঘেরিল,

নিয়তির চক্র উঠিছে নামিছে
ভাঙ্গিছে গড়িছে, জগতে
সে নিয়তি বশে, আবার প্রভাতে
হাসিবে তপন ভারতে।

নমি হিমগিরি চরণে তোমার
করিলে ধন্য আমারে
জাগালে হৃদয়ে অতীতের স্মৃতি
নব নব ভাব অন্তরে।

অক্ষুণ্ণ থাকুক তোমার মহিমা
দেশে দেশে হো'ক ঘোষিত
প্রশান্ত তোমার মূরতি মধুর
যুগে যুগে হো'ক বন্দিত।

হেরিয়ে তোমার বিরাট মূরতি
উজ্জল ধবল কান্তি
চপল বাসনা লুকালো অন্তরে
পশিল হৃদয়ে শান্তি।

শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

জীবনাহুতি।

ভাসিতে ত সকলেই পারে,
স্রোত ঠেলে দাঁড়াবে ক'জনা?
তরীখানি ছেড়ে দিলে
আপনি ত উজানে বহে না।

আঁলোক যতই ফুটাবে, ফুটিবে,
আঁধার যতই টানিবে; আসিবে;
ছিড়িলে বাঁধন সকলি টুটিবে,
কিছু ত নহে অজানা।
স্রোত ঠেলে দাঁড়াবে ক'জনা?

ব্যথা, সেত সকলেরই আছে,
ওগো হাসিমুখ ক'জনার?
জগতেত সকলেই থাকে,
কেবা হয় সবাকার?

রবি-শশী সাথে মোরা যদি ঘুরি,
কালের চক্রে উঠি আর পড়ি
অদৃষ্টের দাস আপনারে করি,
তবে, প্রকৃত জীবন হল না।
স্রোত ঠেলে দাঁড়াবে ক'জনা?

বাঁচা, সেত নহে গো জীবন
প্রকৃত যদি না হয়,
মরণ, সেও নহেত মরণ
সেযে নূতন জীবন পায়।

সংগ্রাম, সেত করিতেই হবে
তবেত নূতন জীবন পাবে ;
দূরেতে দাঁড়ায়ে দেখিলে কি হবে
কে দিবে আপনা ?
স্রোত ঠেলে দাঁড়াবে ক'জনা ?

অলস শয়নে সকলে থাকিলে
সে অলসে সুখ থাকে না,
যদি না জগতে পর সুখ তরে
কেহ না বিকাত আপনা।

সকলেই যদি একরূপ হত,
একটানা স্রোতে বহিয়া যেত,
একি বাধা সুর চিরকাল গে'ত
তবে এমন সুখের হত না।
স্রোত ঠেলে দাঁড়াবে ক'জনা ?

সান্ধ্যগগনে মলিন আঁধারে
কত তারা উঠে ফুটে,
সকলেই জ্বলে আপনার মনে
কেহ কেহ পড়ে টুটে ;

কত মেঘ আসে আকাশের গায়,
কেহ চলে যায়, কেহ পুন ছায়,
কেহবা আবেগে ঝরিয়া যায়,
আপনারে ধরে রাখে না।
স্রোত ঠেলে দাঁড়াবে ক'জনা ?

সুধু সুখ লয়ে ক্ষুদ্র জীবন
চিরদিন তবে চলে না,
সকলেই যদি ছোট হয়ে থাকে
বড় কিরে কেহ হবে না ?

অঞ্জলি করি আপনার প্রাণ
অনাদিচরণে করে দিতে দান,
ভুলে যেতে সব মান সম্মান,
করিতে হইবে সাধনা।
স্রোত ঠেলে দাঁড়াবে ক'জনা ?

পাষাণের কারা ভাঙ্গিয়া নিঝর
আপনিত ছুটে যায়,
নদী হয়ে শেষে বিপুল আবেগে
সাগরের পানে ধায় ;

কত জল রাশি বাঁধা পড়ে আছে
নির্দ্দয় কারা পাষাণের কাছে,
কেহ ভেঙ্গে ছোটে জগতের মাঝে,
সকলেত পারে না।
স্রোত ঠেলে দাড়াবে ক'জনা ?

প্রাণ দিতে সকলেই চায়,
মঙ্গল যোগ মিলে না ;
মিলিলেও তাহা ভেসে চলে যায়,
সকলেই যে রে আনমনা।

দিতে হবে প্রা'ণ, পণ করে লও
অলস স্বপ্ন অতলে ডুবাও,
অন্ধ বাঁধন ছিঁড়ে চলে যাও,
বাধাত কেহরে দিবে না।
স্রোত ঠেলে দাঁড়াবে ক'জনা ?

শ্রীসরোজকুমারী গুহ

৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত



আমীর হবীবুল্লা খাঁ

OPINIONS OF THE PRESS

ON

THE MODERN REVIEW

The Advocate.—We owe an apology to our friend Babu Ramananda Chatterjee of Allahabad, for not noticing his excellent English monthly, the *Modern Review*. The first number which is lying on our table is full of good things. The place of honour is given to a paper by the late Principal W. Knox Johnson, M. A., of the Jubbulpore College, on *Western Literature and the Educated Public of India*. We very seldom come across articles of such high literary merit in the periodical literature of India. The paper both in its matter and style is one of the best we have ever read and its critical acumen and happy phrasing remind one of that prince of English critics, Matthew Arnold. It is followed by more than a dozen excellent articles.

* * * * * * *

A special feature of this journal are short reviews of books published in the different vernaculars of India—Hindi, Urdu, Bengali, Gujarati, &c. The get-up of the Magazine is excellent and the illustrations, of which there are several, superb. We heartily congratulate Mr. Chatterjee on his new venture and hope that it will prove a success. If he succeeds in maintaining the high standard of which the first number gives ample promise, we have no hesitation in saying that the *Modern Review* will easily take the very first place among the English periodicals of our country. We strongly advise our readers to get the first number of the *Modern Review* and judge for themselves. We can assure them that they will not be disappointed.

The Amrita Bazar Patrika.—The first number of the "Modern Review" amply fulfils the promise held out in the prospectus. It is excellent alike in its get-up as well as in its matter. As the prospectus led us to hope, it is "interesting, instructive and inspiring." Inspiring very few magazine articles are, in this sensation-loving age. But the "Modern Review" contains two such papers; namely, "work and wages" by Babu Heramba Chandra Maitra, written in a poetic but severely chaste style, and "Western Literature and the Educated Public of India" by the late Principal Knox Johnson. Ravi Varma's picture "The Fatal Garland" has been admirably reproduced in colours in a style which would do credit to any press in India. Most of the other twenty-two pictures have also been neatly reproduced. The articles cover the whole range of Indian thought and activity, literary, artistic, social, religious, industrial, economic and political. Almost all the writers are men of mark in their respective spheres of work. The reviews of books written in the principal vernaculars of India form a new and useful feature of this periodical. They enable us to form an idea at a glance of the progress made in our national literatures in different directions in different provinces. And it must be remembered that it is our vernacular literatures that really reveal and touch the heart of the nation. Stories like that of "Behula" are not only interesting, but they depict and enforce the national ideal uninfluenced by foreign life and thought. Professor Jadunath Sarkar of Patna College, has long been working in the still unexplored mines of manuscript Persian historical literature with great energy, devotion, self-sacrifice and critical acumen. His "Sivaji Letters" from newly discovered materials and the Life of Sivaji from Persian sources which he promises to contribute to the "Modern Review" will, we are sure, be valuable original contributions to Maratha historical literature. Sister Nivedita in her article on "The Function of Art in Shaping Nationality," the first of a series, and the editor in his article on Ravi Varma, have sought to direct the moral and intellectual energy of our nation in channels hitherto greatly neglected. Rao Bahadur G. V. Joshi, one of the foremost economists of India, in a remarkable article draws attention to the State machinery for the development and exploitation of India's vast natural resources; and, while deploring that it should all benefit the foreigner, exhorts the Government to form an "Economic Council for India" consisting of leading Indian economists so that the aforesaid machinery may benefit the children of the soil. His paper deserves the attention of all well-wishers of India. Mr. Havell's short article we have already noticed in a previous issue. Exigencies of space prevent us from noticing the other articles, such as those by Mr. G. Subramania Iyer, and Sir

Bhalchandra Krishna. Altogether, the "Modern Review" has made a splendid beginning; and it would depend as much on the energy and devotion of the Editor as on the patronage of the public, which he so richly deserves, to maintain the "Review" in its present high level of excellence.

The Arya Patrika. The January number of this excellent *Review* is before us. We have been told that "arrangements have been made to make the new periodical attractive in form and appearance. No pains will be spared to make its pages interesting, instructive, and inspiring. Its contents will be varied, consisting of articles on literary, historical, scientific, economical, industrial, educational, artistic, social, political and other subjects. The articles will be illustrated where necessary." With regard to these promises we have not the least heistation in saying that they have, each and all, been fulfilled. The form and appearance of the Magazine is so attractive that it is difficult to resist the temptation of subscribing to it. In the number before us there are no less than 23 illustrations, almost all of them *Swadeshi*, and beautiful. Coming to the articles, they are 15 in number, the Review of Books being excepted, and from the perusal of these articles one can not but come to the conclusion that they are of a varied interest and do full justice to the subjects treated therein. Taking the *Review* as a whole we can say that the *Modern Revew* is the only of its kind and compares favourably with the English Magazines which besides providing for their readers quite a goodly number of original articles for their intellectual food furnishes them with a number of excellent illustrations to gratify their æsthetic taste. Hence, we strongly recommend it to our readers and trust that they will extend their patronage to it.

The Bengalee. We have read the first number of the *Modern Review* with great pleasure. In Mr. Ramananda Chatterjee it has got an editor who can always command the cordial co-operation of a large circle of distinguished writers. If the high standard reached in the first number is sustained by its successors, the *Review* will have soon secured for itself a foremost place among Indian periodicals. The illustrations are many and well executed, and on the whole the Editor may be congratulated on having brought out such a splendid number.

Capital. The Magazine consists of 122 pages of large type on glazed paper, and contains 23 illustrations comprising portraits (Mr. Dadabhai Naoroji, among the number) of well-known Indians, reproductions of some of Ravi Varma's pictures, Indian Scenery, &c. The literary menu is of a sufficiently appetising order to appeal to all kinds of readers, and amongst the articles there is one on "Calcutta" by the editor which is of an exceedingly interesting nature. I wish "The Modern Review" all success and a large circle of readers.

The Englishman. This publication is apparently the outcome of the so-called National movement, judging by the tenour of most of the articles, but the tone is unexceptionable and all the contributions are of an interesting nature. They may be grouped under three classes, the topical, literary, and political. Under the first head, perhaps the most interesting, is the well illustrated article on Mr. Dadabhai Naoroji, by the Editor. Next to this comes an article, also by the Editor, on Ravi Varma, India's greatest modern painter, illustrated with some fine examples of the master's work. Other articles under this head are those on the Hindu Widow's Home at Poona, a long essay by Rao Bahadur G. V. Joshi, advocating an Economic Council for India; the first of a series of articles on Natural Science in the Universities; a letter on hand-loom weaving by Mr. Havell; and a detailed description of Calcutta by the Editor. On the literary side Sister Nivedita's well-written essay on Art and Nationality and the late Principal Knox Johnson's address on Western Literature and Educated Indians are perhaps the best. There is also a rather philosophical discourse on work and wages. Some new letters of Sivaji and the essays on Maratha Historical Literature and the Bengali ballad of Behula, have a peculiar interest of their own. Two political articles by Subramania Iyer and Sir Bhalchandra Krishna are interesting as illustrating the pessimistic and optimistic views of Mr. John Morley. As will be seen from the above the review contains a deal of readable matter, and is well printed and excellently illustrated.

The Empire. Of making many magazines in India there is no end, and "The Modern Review", published at Allahabad, is the latest and by no means the least interesting on the list. It is a literary and artistic miscellany, and the contents of the first number are of a remarkably high class on both the literary and the artistic side. With regard to its many features of interest perhaps the most attractive is a biographical sketch of Mr. Ravi Varma, the famous artist of Southern India, illustrated by beautiful specimens of his work. Another paper by the Editor (Mr. Ramananda Chatterjee) deals with Calcutta, apropos of the recent meeting of Congress, and tells us a lot of facts about the

capital which we had for the most part forgotten. Sister Nivedita has an article on "The Function of Art in Shaping Nationality", which is, as might have been expected, a thoughtful and beautifully phrased composition. The other contents are all of the highest order and justify the happiest auguries of success for the "*Modern Review*."

The Hindoo Patriot. The magazine is modern in every sense, in get-up, finish, spirit, and tone. The first number, that of January, is so elegant and interesting that, if the level attained by it is maintained, the "Modern Review" will soon rank among the first-rate monthly journals of India. There is enough of variety in the pages of the Review, while a new feature of it is that it is illustrated. Over a dozen well executed pictures and portraits have been inserted, those from the paintings by Ravi Varma depicting "The Fatal Garland," "King Rukmangada and Mohini," and "Sita under the Asoka tree," being of a very high order. The portraits of Ravi Varma, the late Mr. W. Knox Johnson, Mr. Dadabhai Naoroji, Dr. Rash B. Ghosh, the Gaekwar of Baroda, the Maharani of Cooch Behar, Mr. R. V. Naidu, Mr. V. D. Thackersay, Mr. J. Choudhuri, and Sir Chandra M. Ghosh, are faithful and do credit to the artist. We are glad that such a high-class magazine has been started in India. Its annual subscription is Rs. 6 only, a cheap price, which ought to make it as popular as it deserves to be. Besides, the magazine has made a notable concession in favour of the Swadeshi movement, by announcing that it will insert four-line advertisements of Swadeshi goods free of charge. We heartily wish our contemporary every success and recommend the magazine to the reading public.

The Hindu.—Mr. Ramanand Chatterjee of Allahabad, its present editor, has spared neither money nor labour, in making the first issue an extremely well got up, and eminently readable number. Judging from the contributions appearing in the paper, it is evident that the journal has already secured a first-rate list of contributors, and if the level attained by the first number is kept up, we may expect one more permanent addition to the high-class monthly journals, which have become a feature in this country already.

The Indian Daily Telegraph.—The first number of the *Modern Review*, dated January, 1907, a new monthly review and miscellany, edited by Ramananda Chatterji, is a very promising one. It contains a well written article on "Western Literature and the Educated Public of India" by the late Principal W. Knox Johnson, M. A., a most interesting article by Sister Nivedita on "The Function of Art in Shaping Nationality," and such subjects as "The Study of Natural Science in the Indian Universities," "The Industrial Problem in India," "The Indian Hand-loom Industry" and "Self-reliance against Mendicancy," the latter article being by Sir Balchandra Krishna, are all treated in an entertaining and readable manner. "The Modern Review" should obtain a large circle of readers if it continues to provide equally good fare in the future.

The Indian Nation.— * * * It consists of over a dozen articles all well-written and interesting, besides literary notices. The printing and get-up are excellent, and there are several finely executed illustrations. Probably in matter and certainly in form it represents the high-water mark of magazine literature in this country, and we offer to the projectors our hearty wishes of success. In a country where the reading public is neither large nor appreciative and where advertisements are neither numerous nor particularly paying, it is not wise to make a journal too cheap. The subscription instead of being 6 Rs. should have been 15 Rs. per annum. Students' libraries which should be among the main supporters of the publication, will probably put in pleas for free gifts or reduced rates. We trust it will have the sympathy and support of the Government.

The Indian Patriot. * * * The review is full of interesting matter on various subjects, political, social, industrial, economical, concerning India. The review contains an excellent account of the Hindu Widows' Home at Poona, and the writer, Professor V. B. Patwardhan, M. A., has prominently placed before the public the urgent need that exists for the amelioration of the miserable lot of womankind, and the noble work that the Widows' Home is doing in that cause. There are 80 inmates on the rolls of the Institution, and its financial condition speaks volumes in favour of its excellent management. The balance on date to the credit of the Home is Rs. 31,768-14-7 and this is for the first 9 months of 1906. Among other articles of interest are a character sketch of Mr. Dadabhai Naoroji and the late Mr. Ravi Varma, the famous artist. Self-reliance against Mendicancy is another pen-picture of the state of feelings now existing in Bengalee political ranks. * * * Some of the articles are beautifully illustrated and judging from the pains bestowed in the getting up of the review, it is bound to take the front rank in the journals of the country. We wish every success to the enterprise and commend

the review to the patronage of all educated men in the country.

The Indian People. The first number of the *Modern Review*, edited by Mr. Ramananda Chatterji, more than fulfils the promise of its modest announcement, and places it easily at the head of Indian periodicals. We are not at all surprised that the appearance of this magazine has elicited a chorus of generous praise throughout India. Mr. Ramananda Chatterjee is himself a scholar and writer; he is not an advertiser or a publisher. The January number is as brilliant as the literary level is high. And the wealth of illustrations is absolutely beyond compare except in the *Prabasi*, Mr. Ramananda Chatterjee's Bengali magazine. The place of honour is given to a paper by the late Principal W. Knox Johnson, read after a Convocation of the Allahabad University, and we have no hesitation in saying that it is very rarely that a contribution of such intrinsic value is found in an Indian magazine. The scholar and thinker are quite apparent in Mr. Heramba Chandra Maitra's earnest paper on "Work and Wages." Among other writers are Sister Nivedita, Mr. G. Subramania Iyer, Mr. E. V. Havell, Sir Bhalchandra Krishna and others. The Editor contributes three papers on Mr. Dadabhai Naoroji, Ravi Varma and Calcutta, each one of which displays great industry, power of discernment and judgment. The *Modern Review* is a high class magazine dealing with the questions of the day as well as larger questions of permanent interest and the illustrations are as attractive as they are beautiful. We may fairly claim that the success of this brilliant periodical may be looked upon as assured.

Indian Social Reformer.—We are glad to see that the January number of the *Modern Review* has already been issued and that it amply bears out the claims made for it in the prospectus.

Indian Spectator.—It contains over 100 pages of reading matter, and is profusely illustrated. There are fifteen articles on a variety of subjects—social, political, literary, scientific, and artistic. The place of honour is given to a very interesting and instructive article on "Western Literature and the Educated Public of India" by the late Prof. W. Knox Johnson. It is followed by Principal Maitra's timely paper on "Work and Wages". Among other contributions may be noted: "The Function of Art in Shaping Nationality" by Sister Nivedita, "The Indian Hand-loom Industry" by Mr. E. B. Havell, "Sivaji Letters" by Prof. Sarkar, and "Maratha Historical Literature" by Mr. Parasnis. The Editor himself contributes three articles: one on "Dadabhai Naoroji," another on "Ravi Varma" and a third on "Calcutta". There are in all twenty-three illustrations, three of them being from the original paintings by the late Ravi Varma. The *Modern Review* is attractively got up; the printing is well done, and does credit to the Indian Press. We wish it all success.

The Indian Trade Journal.—The first number of the *Modern Review*, published at Allahabad, contains an interesting account by Rao Bahadur G. V. Joshi of the organizations, official and otherwise, for the solution of the Industrial Problem in India, and certain reflections by the author as to the nature and causes of the defects in the system described.

The Indu Prakash. Mr. Chatterjee is an accomplished scholar and readers of Indian periodicals do not require any words from us to introduce him to them. He is a frequent contributor to Indian journals and his contributions were always learned and weighty. We have no doubt, therefore, that under his Editorship the *Modern Review* will grow into a great power not only in Upper India, but all over the country. A journal of the kind is a great desideratum and the *Modern Review* supplies a real want. We have in fact very few periodicals in India which are really worth-reading and which appeal to the higher educated classes.' * * * The *Modern Review*, therefore, is not one too many and judging from the list of subjects dealt with in the first issue and the persons who have written them we can predict a great future for it. The writers include such men as Mr. G. Subramania Iyer, Principal H. Maitra, Rao Bahadur G. V. Joshi, Sir Bhalchandra Krishna and others. The get-up of the magazine is excellent and the *Indian Press* of Allahabad deserves to be congratulated on it. One striking feature of the *Review* is a number of striking illustrations, faultlessly executed.

Light. Mr. G. Subramaniya Iyer, B. A., contributes a very suggestive article to the first number of the *Modern Review* on the political relations between England and India.

The Madras Mail.— * * * It is full of promise. It deals with Indian questions from economical, industrial, artistic, social, political and other points of view, and the illustrations also have a local colour. All the articles are thoughtful and interesting, but perhaps at the present moment attention will be chiefly attracted by two of them, one a sort of character sketch of Mr. Dadabhai Naoroji, and the other entitled "Self-reliance against Mendicancy," which is an attempt, and a very good one, by Sir Bhalchandra Krishna to show that the Extremists in the Congress

rty are endeavouring to proceed too rapidly and o far, and to adopt methods outside the function d capacity of the Congress.

The Madras Times.—We have great pleasure noticing the arrival upon the journalistic scene of a w review, entitled "The Modern Review" which is publication of a remarkably high order. It is printed the Indian Press at Allahabad and edited and pubshed by Mr. Ramananda Chatterjee. It promises to a great credit to Indian Journalism. Its get-up is l that could be desired, the cover being quiet and steful and the print and paper of a high order. The ost striking feature of it is the illustrations. There e many in tones but the frontispiece is coloured and presents one of Ravi Varma's masterpieces, "The atal Garland." There are several other reproductions Ravi Varma's works including the splendid "King ukmangada and Mohini," a work full of true artistic eling and admirably executed. Several portraits of ndian celebrities are also given. The reading matter s of a very high order. There are fifteen articles in ddition to literary reviews. The editor himself conributes three articles and the remainder are by emient writers such as the late Mr. W. Knox Johnson, Messrs. G. Subramania Iyer, Herambachandra Maitra, E. B. Havell, Lieut.-Col. Kirtikar, I.M.S., and Rao Bahadur G. V. Joshi.

Motherland.—The first number of the *Modern Review* (Allahabad, Subs. Rs. 6) is a thing of beauty and a joy for ever. The Editor, Mr. Ramanand Chatterjee, M. A., deserves the warmest congratulaions on his success. The reading matter is varied vast, and interesting. Our town is represented by Professor Jadunath Sarkar, who has written an article on his newly discovered letters between the Maratha King Sivaji and the Mughals. Principal Knox Johnson's article deserves to be read over and over again.

The Oriental Review.—Neither the contents, nor the get-up of the Review belies the happy title which Mr. Chatterjee has given to his publication. The Review is modern in every way, and there is nothing obsolete about it. The writers are all men of eminence who deal for the most part with the most important topics of the month that must interest the upper educated classes. * * * But a really high class journal like the *Modern Review* is none too many. We have very few periodicals in India which could appeal to the educated classes, and there is more talent that remains to be brought to public notice than has been or can be done by the few periodicals that are already extant. The first number has as many as fourteen articles, three of them written by the Editor himself. * * * The illustrations are excellent.

The Panjabee.—We hail with delight the addition of the *Modern Review* to the existing roll of Indian monthly Magazines. Heretofore we had four excellent periodicals published in the English language in India, *viz.*: The *Indian Review, East and West, The Hindustan Review*, and the *Indian World*; and now the *Modern Review*, the first or January 1907 number of which has just reached our hands will make a very valuable addition to the existing list. When noticing the prospectus issued by Mr. Ramananda Chatterjee, the Editor of the new periodical, we remember having observed that if all the promises were fulfilled we had no doubt of the Magazine at once taking a prominent place in Indian periodical literature. Well, the promises held out in the prospectus have been literally fulfilled. The number before us contains twelve papers on topical subjects by well-known writers in addition to three from the pen of the editor himself. The place of honour is given to a paper on "Western literature and the educated public of India" by the late Principal W. Knox Johnson. Principal Maitra writes on "Work and Wages." Mr. Dinesh Chandra Sen next contributes an account of "Behula:" a myth of the snake goddess. Professor Patwardhan of the Fergusson College follows with a very readable and instructive account of the "Hindu Widow's Home, Poona." That veteran Indian journalist, Mr. Subramania Iyer of Madras, discourses on "Mr. Morley and India's Industrial future." Sister Nivedita contributes an essay on "the function of Art in shaping Nationality" evidently the first of a series to follow hereafter. Lieutenant Colonel Kirtikar (I.M.S., retired) also contributes the first paper of a series on "the study of Natural Science in the Indian Universities." Rao Bahadur G. V. Joshi, the greatest Indian Economist, makes a valuable contribution on "the Industrial Problem in India." Mr. Havell writes on "the Indian Hand-loom industry." The editor writes learnedly on the greatest Indian Patriot, the greatest Indian Artist, and the first Indian city. Sir Bhalchandra writes on "Self-reliance against Mendicancy." Mr. Parasnis writes on "Maratha Historical literature." And, lastly, Professor Jadunath Sarkar contributes a paper on "Sivaji's letters." The Magazine is profusely illustrated, the number before us containing as many as twenty-three different illustrations. We must, however, observe that only a few of them really illustrate

the articles published. The frontispiece in three colours, reproduced from the original painting entitled the "Fatal Garland" by Raja Ravi Varma, on a well-known tragic episode in the Raghuvansha, would reflect credit even on the best illustrated English and American Magazines. The magazine contains some 122 pages. We welcome with the greatest pleasure the addition of the *Modern Review* to our exchange list and if it maintains its present excellence in the succeeding issues, it will at once become the favourite magazine of the English-knowing Indian reader, considering the very modest rate of annual subscription, *viz.*, Rs. 6 in advance.

The Pioneer.—In the pages of the *Modern Review*, the first number of which has just been published by the Indian Press, Allahabad, Professor Jadunath Sarkar claims to have discovered two of the original documents upon which Grant Duff based his famous *History of the Mahrattas*. Grant Duff himself asserted that most of his materials were deposited with the Literary Society of Bombay, but no trace of these documents was forthcoming when a search was made for them in 1867. Professor Sarkar believes that the right track has so far not been followed, and that many of the missing manuscripts may some day be found in Europe. He himself made a careful investigation in "all the Royal and public libraries of Europe," and his quest was rewarded by the discovery of the two manuscripts already mentioned, the one being a Persian translation of a Maratha Life of Sivaji (India Office Library), the other a manuscript of the Royal Asiatic Society of London called the *Khatut-i-Shiwaji*. A full translation of the former is promised in a later issue of the review; in the meantime the Professor contents himself with giving English translations of some of the letters found in the latter manuscript. Whether or not these formed part of the material on which Grant Duff relied, they make interesting reading for students of Indian history.

The Prajabandhu.—We welcome with pleasure a notable addition to the periodical Press of this country in the shape of the *Modern Review* of Allahabad the first number of which has just been out. It will be remembered that while noticing the prospectus of this new monthly in November last, we remarked that if the promises given in it were fulfilled, the *Modern Review* will be a valuable addition to the periodical publications in our midst. A cursory glance at the first number of this new Magazine has convinced us that it fully comes up to the expectations that we were led to form in connection with it on perusing the prospectus. In addition to several excellent contributions from well-known writers, both Indian and European, the *Review* contains more than twenty illustrations, of which the frontispiece is the most remarkable and is executed in a way that would do credit to any first-class English Magazine. The get-up of the Magazine is excellent, and containing as it does 122 pages of good readable matter, the annual subscription of Rs. six is quite reasonable.

The Sind Journal.—* * * contains able articles on important topics literary, historical, scientific, economical, industrial, artistic, social and political—contributed by Indian and English writers of fame. There are as many as 23 illustrations in the Number, several of which are beautifully executed. The get-up of the Journal, the printing, the paper &c., does great credit to the printers. If the *Modern Review* continues to keep up the style and finish of the first number, the Review will be an acquisition to the Indian Magazine world. * * * The Editor himself contributes three papers on Dadabhoy Naoroji, Ravi Varma and Calcutta, each one of which reflects great credit on his power of thought and discernment. The wealth of illustrations, with which the journal is full, can rarely be surpassed by any other Indian Magazine. The fatal garland by Ravi Varma, Coronation of Sita, a woman clasping the feet of an image (from the Ajanta Cave paintings), King Rukmangada and Mohini and Sita under the Asoka Tree have made the Review highly attractive. Taking into consideration that the Review has been made so interesting, instructive and inspiring, its price of Rs. 6 per annum is reasonably low, and we hope it will not fail to secure a sufficiently large circulation, to make a successful undertaking. We heartily congratulate Mr. Ramananda Chatterjee on this splendid enterprise of his and wish him a grand success.

The Statesman.—With the approach of the new year a new monthly magazine has just made its appearance. The publication, which, under the title of *The Modern Review*, is edited by Mr. Ramananda Chatterjee, promises to form a welcome addition to Indian periodical literature. In typographical and pictorial excellence, so far as may be judged from the first number, our young contemporary can challenge the best magazine in the country; while the list of contents covers the whole field of modern Indian activity—literary, social, and industrial. All these subjects are treated by competent writers, while the editor himself contributes three interesting articles on Mr.

Dadabhai Naoroji, on Ravi Varma and on Calcutta. We wish the venture every success.

The Subodha Patrica.—The January number (Vol. I number I) which we have before us contains among others four ably written articles on 1 Western Literature and the Educated Public of India by the late Principal W. Knox Johnson, M. A.; 2 The function of Art in shaping Nationality by Sister Nivedita; 3 The Industrial problem of India by R. B. G. V. Joshi; and 4 "Self-reliance" against "Mendicancy" by Sir Bhalchandra Krishna. All these articles are very interesting and highly informing, but we specially recommend the last named one to the perusal of what is termed the extremist party in politics among us. The Modern Review is to be a monthly of ordinarily eighty pages of closely printed matter but this limit, we are told, will be freely exceeded on important occasions, as is the case with the first number. The twenty-three illustrations contained in this number are bright and picturesque. On the whole the Modern Review may safely be said to have embarked on its career in an auspicious manner; and if the present standard of efficiency could be maintained it is sure to take the first place among the monthlies of this country. We wish the Modern Review a long and useful career and hope that it will have a wide circulation as it deserves to have.

Unity and the Minister.—We have received the opening number of the *Modern Review*, edited from Allahabad, by Babu Ramananda Chaterjee, M. A., who has so successfully established his claim as a first class Magazine conductor by his Bengali Monthly the *Prabasi*. The first number of the *Modern Review*, which is of the size of Mr. Stead's *Review of Reviews*, contains 122 pages of reading matter, excellently printed and is profusely interspersed with superbly-executed half-tone mythological and historical illustrations and pictures of Indian notabilities among the latter of which those of Her Highness the Maharani of Cooch Behar, C. I., His Highness the Gaekwad of Baroda, Mr. Dadabhai Naoroji, Sir Chandra Madhab Ghosh and the Hon'ble Dr. Rasvihari Ghosh deserve prominent mention. The issue before us contains no less than fifteen articles—among which * * * have afforded us ample pleasure, and we have considerably profited by the erudition displayed by the writers thereof. The appearance of the *Modern Review* shows that a really first class magazine contrasting well with similar English and American publications can be produced in this country by really enterprising publishers. We congratulate Babu Ramananda Chatterjee on his being the pioneer of the publication in this country of such a magnificently rich magazine, ...

The Wednesday Review.—The *Modern Review* which hails from Allahabad is a notable addition to Indian Journalism. It is an illustrated monthly and the articles are scholarly, varied and interesting. The January number contains as many as fourteen articles, three of them coming from the pen of the Editor himself. We would specially commend to the reader the very instructive paper contributed by the late Mr. W. Knox Johnson on the ever interesting subject of Western literature and the educated public of India. Mr. G. Subramani Aiyer writes under the heading 'Mr. Morley and India's Industrial Future.' Sir Balachandra Krishna's article 'Self-reliance against Mendicancy' which we extract elsewhere will repay perusal. Mr. E. B. Havell writes on the Indian hand-loom industry. The Editor has chosen for his themes, Mr. Dadabhai Naoroji, Ravi Varma and Calcutta. The other contributions are equally interesting and we congratulate the Editor, Mr. Ramananda Chatterjee, on the publication of so substantial a journal.

CONTENTS OF THE JANUARY NUMBER.

CONTENTS OF THE FEBRUARY NUMBER.

ILLUSTRATIONS IN THE JANUARY NUMBER.

ILLUSTRATIONS IN THE FEBRUARY NUMBER.

INDIAN PRESS, ALLAHABAD.

প্রবাসী

"Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters."
"to look on noble forms
Makes noble thro' the sensuous organism
That which is higher."—*Tennyson.*

৬ষ্ঠ ভাগ। | ফাল্গুণ, ১৩১৩। | ১১শ সংখ্যা।

অস্মুরোপাসক।

অস্মুরোপাসনার কথা শুনিয়াই হয়ত অনেকে চমকিয়া উঠিবেন। দেবগণই ত উপাস্য কিন্তু কে কবে অস্মুরের উপাসনা করিয়াছে? যাহাদের আচার, ব্যবহার অতি কুৎসিৎ, যাহাদের প্রকৃতি অত্যন্ত ঘৃণিত, যাহারা সর্ব্বদাই দেবগণের প্রতি শক্রুতাচরণ করিয়া থাকে, তাহারা কি কখন উপাস্য হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিব—অস্মুরগণের প্রকৃতি যে ঘৃণিত তাহা কে বলিল? অস্মুরবিরোধিগণের শাস্ত্র পড়িয়া কখনই অস্মুরগণের প্রকৃতির বিচার করা উচিত নয়। হিন্দুগণ অস্মুর বিরোধী, তাহাদিগের শাস্ত্রে ত অস্মুরের নিন্দা থাকিবেই। কিন্তু এই হিন্দু শাস্ত্রেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে অস্মুরগণকে যেমন ঘৃণিতভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে তাহারা তেমন ঘৃণিত নহে।

রামায়ণের একস্থলে লিখিত আছে :—

"হে রঘুনন্দন! অনন্তর (সমুদ্র মন্থনের সময়) বরুণের কন্যা মহাভাগা বারুণী (=সুরা) উত্থান করিয়াই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন কেহ তাহাকে গ্রহণ করে কিনা। হে রাম! দিতির পুত্রগণ সেই বরুণনন্দিনীকে গ্রহণ করিলেন না। হে বীর! অদিতির পুত্রগণই সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে পরিগ্রহ করিলেন। এইরূপে এই সুরাকে গ্রহণ করিলেন না বলিয়া দিতির পুত্রগণ অসুর এবং সুরা গ্রহণ করিলেন বলিয়া অদিতির পুত্রগণ সুর নামে বিখ্যাত হইলেন। বারুণীকে প্রাপ্ত হইয়া সুরগণের অতিশয় আমোদ ও হর্ষ হইয়াছিল।"

দিতে পুত্রা ন তাং রাম জগৃহু র্বরুণাত্মজাম্
অদিতেস্তু সুতাবীর জগৃহুস্তামনিন্দিতাম্।
অসুরাস্তেন দৈত্যেয়া সুরাস্তেনাদিতে সুতাঃ
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাশ্চাসন্ বারুণী গ্রহণাৎ সুরাঃ

রামায়ণ ৪৫ সর্গ বালকাণ্ড ৩৬-৩৮।

সুরা হইতে সুর ও অসুর শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহা সত্য না হইলেও উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা একটী নূতন সত্য লাভ করিতেছি। বুঝা যাইতেছে যে দেবোপাসকগণ সুরাপান করিতেন এবং অসুরোপাসকগণ সুরাবিরোধী ছিলেন। দেবোপাসকগণই যখন অসুর বিষয়ে এই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, তখন এ কথার সত্যতায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। সুরাপান করিতেন না বলিয়া অসুরগণ প্রাচীনকালে ঘৃণার্হ হইয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা এজন্য অসুরোপাসকগণকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিতেছি। সুতরাং ইহাদিগের আচার ব্যবহারকে যে প্রকার কুৎসিৎ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে ইহাদিগের চরিত্র সে প্রকার কুৎসিৎ নহে; আর ইহাদিগের প্রকৃতি আদৌ ঘৃণিত ছিল কি না সে বিষয়েও গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষেই অসুরের উপাসনা প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সময়েও এদেশে অনেক অসুরোপাসক বাস করিতেছেন। ব্যবসা বাণিজ্যবিষয়ে ইহাঁরা

এখনও ভারতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ইহাদিগের দানশীলতা জগতে বিখ্যাত। এই সম্প্রদায় ভুক্তই একজন জাতীয় কংগ্রেসে তিনবার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন অর্থাৎ বর্ত্তমান পারসীক (পার্সী) গণই অসুরোপাসক।

দেবাসুর।

পারসীক শাস্ত্রে একমাত্র অসুরই উপাস্য এবং দেবগণ ঘৃণার্হ। ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশে অসুর ও দেব উভয়ই উপাস্য, আধুনিক অংশে কোন কোন স্থলে অসুরকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখা হইয়াছে এবং অপরাপর ধর্ম্মগ্রন্থে সর্ব্বত্রই দেবগণ পূজ্য ও অসুর ঘৃণার্হ। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত এই যে উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণের পূর্ব্বপুরুষ এক সময়ে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহারা এক সময়ে দেব ও অসুরের পূজা করিত। কালক্রমে ধর্ম্মমতাদি লইয়া সমাজে বিপুল গোলযোগ আরম্ভ হইল। একদল দেবোপাসনা বর্জ্জন করিয়া একমাত্র অসুরকেই উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন আর জনসাধারণ দেবতা ও অসুর উভয়েরই উপাসনা লইয়া রহিল। দুই দলের মধ্যে যতই বিদ্বেষ বাড়িয়া উঠিল ততই উপাসনারও পার্থক্য ঘটিল। হিন্দু আর্য্যগণ পূর্ব্বে অসুরকেও উপাসনা করিতেন কিন্তু এখন তাঁহারা অসুরকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া কেবল দেবপূজা লইয়াই রহিলেন।

ঋগ্বেদে অসুরোপাসনা।

অসুর শব্দ 'অসু' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। 'অসু' শব্দের অর্থ প্রাণ, সুতরাং 'অসুর' শব্দের অর্থ প্রাণবান কিম্বা বলবান। ঋগ্বেদে প্রায় ১০০ স্থলে এই শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়; ইহার মধ্যে কেবল মাত্র ১১টী স্থলে ইহার অর্থ 'দেবশত্রু' এবং অন্যান্য স্থলে বরুণ, সবিতা, সূর্য্য, পূষা, মিত্র, রুদ্র, মরুৎ, বায়ু, অগ্নি, সোম, ত্বষ্টা, পর্জ্জন্য ইত্যাদি দেবগণকে এবং কোন কোন স্থলে শ্রেষ্ঠ মানবকেও 'অসুর' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অসুরবিষয়ক দুই একটী ঋক্ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

১। হে অসুর বরুণ! তুমি দেব ও মনুষ্য সকলেরই রাজা। ২।২৭।১০।

২। হিরণ্যহস্ত অসুর, সুনেতা, হর্ষদাতা ও ধনবান সবিতা অভিমুখ হইয়া আগমন করুন। ১।৩৫।১০।

৩। সেই দীপ্তিমান ও মহান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে সুখকর স্তুতি বাক্য উচ্চারণ কর, কারণ তিনি যশঃশালী ও অসুর। ১।৫৪।৩।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি জগতের ও সমুদয় দেবতাগণের রাজা। তুমি মনুষ্যগণকে রক্ষা কর। হে অসুর! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। ১।১৭৪।১।

৫। যাঁহার ধনুর্ব্বাণ অতি উৎকৃষ্ট, যিনি সমস্ত ঔষধের অধিপতি, সেই রুদ্রের স্তব কর। ...নমস্কার দ্বারা সেই দীপ্তিমান অসুরের পূজা কর। ৫।৪২।১১।

৬। তোমরা স্তুতিযোগ্য, অসুর সুদক্ষ ... অগ্নিকে সর্ব্বদা পূজা কর। ৭।২।৩।

৭। অসুরগণ পিতৃস্বরূপ; তাঁহাদিগের সুখোদ্দেশে আমি স্তব উচ্চারণ করিয়া থাকি। ১০।১২৪।৩

৮। যাহা দ্যুলোকের পর পারে (কিম্বা পূর্ব্বে) বর্ত্তমান ছিল, যাহা পৃথিবীর পর পারে (কিম্বা পূর্ব্বে), যাহা অসুর দেবগণের পর পারে (কিম্বা পূর্ব্বে),-- সে কোন্ বস্তু? যাহা হইতে জলসমূহ গর্ভধারণ করিয়াছে, যাহাতে সমুদয় দেবগণ অন্তর্ভূত ছিলেন—সে বস্তু কি? ১০।৮২।৫।

এখানে দেবগণকে অসুর বলা হইয়াছে।

৯। "মহৎ দেবানাং অসুরত্বং একং" দেবগণের মহৎ বল একই।৩।৫৫।

এই অংশে একই সূক্তে ২২ বার অসুর শব্দ উক্ত হইয়াছে।

সুতরাং হিন্দু আর্য্যগণ যে এক সময়ে অসুরোপাসক ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যে সমুদয় ঋক্ অত্যন্ত প্রাচীন সে সমুদয় স্থলে 'অসুর' শব্দ সম্মানসূচক, আর যে সমুদয় মন্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক, কেবল সেই সমুদয় মন্ত্রেই 'অসুর' শব্দ ঘৃণাসূচক। দশম মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্র সর্ব্বশেষে বিরচিত এবং এই মণ্ডলে 'অসুর' শব্দ ৬ বার পৌরাণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে এক সময়ে ঋষিগণ অসুরোপাসনা করিতেন এবং ঋগ্বেদের শেষ সময়ে অনেকে অসুর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

দেবাসুরের দুইটী অর্থ।

'অবস্তা' শাস্ত্রে 'দেব' শব্দের দুইটী অর্থ। আমরা যাহাদিগকে দেবতা বলি, অবস্তাতে তাহাদিগকেও দেব বলা হইয়াছে। আর দেবোপাসকগণেরও একটী নাম দেব (বন্দীদাৎ ৮।৩২; যশ্ন ১২)।

ভারতীয় শাস্ত্রে অসুর শব্দেরও দুইটী অর্থ। প্রচলিত অর্থ সকলেই জানেন। পুরাণাদিতে অসুরোপাসকগণকেও অসুর বলা হইয়াছে। যেমন শর্ম্মিষ্ঠা অসুরবংশোদ্ভব, ইহাঁর পিতা বৃষপর্ব্বা একজন অসুর। প্রহ্লাদও অসুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেবাসুর যুদ্ধেরও দুইটী

অর্থ; ১। দেবগণের সহিত অসুরগণের যুদ্ধ, ২। দেবোপাসকগণের সহিত অসুরোপাসকগণের যুদ্ধ।

উপাস্যদেবতা যে উপাসকগণকে সাহায্য করেন এ বিশ্বাস অতি স্বাভাবিক। ঋগ্বেদে বহুস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে দেবগণ ঋষিগণের পক্ষ হইয়া শত্রুদিগের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন। দেবপূজকদিগের সহিত অসুরপূজকদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং ইহারা ভাবিতেন যে ইঁহাদের উপাস্যপুরুষও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেন।

আশ্চর্য্য সাদৃশ্য।

পারসীকগণ একেশ্বরবাদী এবং বৈদিক আর্য্যগণ বহু দেবতার উপাসনা করিতেন। পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মে ত মতভেদ থাকিবেই। কিন্তু উভয় ধর্ম্মে যে প্রকার সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ঋগ্বেদে ৩৩ জন দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। (১।৩৪।১১; ৪৫।২ ইত্যাদি)। অবস্তাতে লিখিত আছে 'অহুর মজদা' ৩৩ জন 'রতু' সৃষ্টি করিয়াছেন (যস্ন ১।১০; ৪।১৫; ৬।৯ ইত্যাদি)। জগতে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করাই 'রতু' দিগের কার্য্য।

ইন্দ্র হিন্দুদিগের একজন উপাস্য; অবস্তাতেও ইহাঁর নাম পাওয়া যায় (বন্দী ১৯।৪৩) কিন্তু এখানে ইনি অসুরবিরোধী।

শুক্ল যজুর্ব্বেদে (১৬।৮) 'সর্ব্ব' নামক একজন দেবতার উল্লেখ আছে; অবস্তাতে 'সৌর্ব্ব' নামক একজন দেবতার নাম পাওয়া যায়।

বেদে অশ্বিদ্বয়কে 'নাসত্য' বলা হইয়াছে; অবস্তাতে ইহার অনুরূপ নাম 'নাংহৈত্য'।

অনেক বৈদিক দেবতাও অসুরধর্ম্মে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। অবশ্যই ঐ ধর্ম্মে ইহাদিগের নাম দেবতা নহে; ইহারা এখানে 'যজত' (যজনীয় পূজনীয়) নামে খ্যাত। নিম্নে কয়েকটী নাম দেওয়া গেল :—

বৈদিক মিত্র	=	অবস্তার	মিথ্র
„ অর্য্যমন্	=	„	ঐর্য্যমন্
„ অরমতি	=	„	আরমতি;
„ ভগ	=	„	বঘ;
„ বায়ু	=	„	বয়ু
বৈদিক অপাংনপাৎ	=	অবস্তার	অপংনপাৎ
„ বৃত্রঘ্ন	=	„	বেরেত্রঘ্ন
„ নরাশংস	=	„	নৈর্য্যোসংহ

বেদে অগ্নি, পূষা ও ব্রহ্মণস্পতিকে নরাশংস বলা হয়; অবস্তাতে নৈর্য্যোসংহ একজন স্বর্গীয় দূত।

অপরাপর পুরুষের নামেও অনেক সাদৃশ্য আছে :—

বৈদিক যম	=	অবস্তার	যিম;
„ বিবস্বৎ	=	„	বীবংঘ্বৎ
„ ত্রিত	=	„	থ্রিত
„ ত্রৈতন	=	„	থ্রএতওন
„ দানব	=	„	দানু

ইহা ভিন্ন আরও অনেক নাম আছে যাহাতে উভয় জাতির একত্ব প্রমাণিত হয়।

যাগযজ্ঞ।

বৈদিক যাগযজ্ঞের সহিত পারসীক যাগযজ্ঞেরও অনেক সাদৃশ্য আছে। প্রথমতঃ যজ্ঞীয় ভাষার সাদৃশ্য :—

বৈদিক ইষ্টি	=	অবস্তার	ঈস্তি
„ আহুতি	=	„	আজুইতি।
„ হোতা	=	„	জওতা
„ যজ্ঞ	=	„	যস্ন
„ আপ্রী	=	„	আফ্রী
„ গাথা	=	„	গাথা
„ মন্ত্র	=	„	মন্থ্র

বৈদিক অগ্নিষ্টোম ও পারসীকদিগের যজিষ্ণ একই যজ্ঞ। তবে শেষোক্ত যজ্ঞটী অতি সংক্ষেপে সম্পন্ন করা হয়। লোকের প্রকৃতি অনুসারে যজ্ঞের প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। দুর্গা পূজার সময় শাক্তের বাড়ীতে ছাগবলি দেওয়া হয়—কিন্তু বৈষ্ণবের গৃহে ছাগের পরিবর্ত্তে কুষ্মাণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদিক যজ্ঞও তেমনি পারসীক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অগ্নিষ্টোমে চারিটী ছাগবলি দেওয়া হয় এবং মাংসের কিয়দংশ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। অবশিষ্টাংশ পুরোহিত ও যজ্ঞকর্ত্তা ভোজন করিয়া থাকেন। কিন্তু আসুর যজ্ঞে কয়েকটী বৃষলোম একটী ক্ষুদ্র পাত্রে রাখিয়া অগ্নির সম্মুখে

স্থাপন করা হয়। প্রাচীনকালে একখণ্ড মাংসও অগ্নির সম্মুখে রাখা হইত। বৈদিক যজ্ঞে 'পুরোডাশ' ব্যবহৃত হয়; পারসীকগণ 'দারুন' নামক একপ্রকার পিষ্টক ব্যবহার করিয়া থাকেন। সোমরস উভয় যজ্ঞেরই একটী প্রধান অঙ্গ। প্রায় একই প্রণালীতে লতা হইতে রস বাহির করা হয়। তবে হিন্দুদিগের সোমরসে মাদকতাশক্তি আছে; পারসীক সোমরসে কোন প্রকার মাদকতা শক্তি নাই। অসুর যজ্ঞে একজন হোতা অতি সামান্য পরিমাণে সোমরস আস্বাদন করিয়া থাকেন কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞে সকলেই সোমরস পান করেন এবং হোতা ও অধ্বর্য্যুদিগকে প্রচুর পরিমাণে ঐ রস পান করিতে হয়। ব্রাহ্মণগণ সোমরস অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন কিন্তু পারসীকগণ ঐ রস অগ্নি সম্মুখে রাখিয়া থাকেন ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণদিগের দর্শপূর্ণমেষ্টি যজ্ঞ ও পারসীকদিগের 'দারুন' যজ্ঞ প্রায় অনুরূপ। বৈদিক চাতুর্মাস্য ইষ্টি ও পারসীকগণের 'গহন্ বার' যজ্ঞে মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। ব্রাহ্মণদিগের 'আপ্রী' ও পারসীকগণের 'আফ্রীগান্' একই যজ্ঞ।

গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান।

উপবীত গ্রহণ না করিলে ব্রাহ্মণসন্তান যেমন ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে না তেমনি পারসীকগণও বিনা উপবীতে অসুরোপাসক বলিয়া পরিগণিত হয় না। ইহারা সচরাচর সপ্তম বর্ষে 'কুস্তি' অর্থাৎ উপবীত গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে হিন্দুগণ পঞ্চগব্য ব্যবহার করেন। পারসীকগণের মধ্যে এজন্য 'গোমেজ' অর্থাৎ গোমূত্র ব্যবহৃত হয়। হিন্দুগণের মধ্যে যেমন মৃতব্যক্তির জন্য 'ত্রিরাত্রি' ও 'দশাহ' করিতে হয়, পারসিকগণের মধ্যেও তেমনি ঐ ঐ সময়ে দুইটী অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখা যাইতেছে যে প্রায় অনেক বিষয়েই দেবোপাসক ও অসুরোপাসকদিগের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। সুতরাং এই দুই সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ যে এক সময়ে এক জাতিভুক্ত ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই উভয় দলে কি প্রকার শত্রুতা ছিল তাহা একবার আলোচনা করা যাউক।

দেববিদ্বেষ ও ধর্ম্মদীক্ষা।

কেবল দেববাদিগণ যে অসুরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন তাহা নহে অসুরোপাসকগণও দেবগণকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। 'অবস্তা' গ্রন্থে লিখিত আছে যে জগতে যাহা কিছু কল্যাণকর তাহার একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা 'অহুর মজ্‌দা' অর্থাৎ মহান্ অসুর। আর যাহা কিছু অকল্যাণকর তাহাই দেবগণ সৃষ্টি করিয়াছে। 'অহুর মজ্‌দা' জগৎকে সুখময় করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিন্তু দেবগণ সর্ব্বত্রই দুঃখ ছড়াইয়া রাখিয়াছে। ইহারা কোন স্থলে অতিশয় শীত, কোন স্থলে বা অতিশয় গ্রীষ্ম সৃষ্টি করিয়াছে। হিংসা বিদ্বেষ, চৌর্য্য লুণ্ঠন, যাদুবিদ্যা, অবিশ্বাস, অহঙ্কার, অত্যাচার, অশ্রুজল, ক্রন্দন, বিষাক্ত কীট পতঙ্গ ও সর্প, বিকলাঙ্গ সন্তান ইত্যাদি সমুদয়ই দেবগণের সৃষ্টি। বন্দীদাৎ ১।

দেবগণের চরিত্রও অতি ভীষণ; ইহাদিগের চরিত্র ব্যভিচারাদি দোষে দূষিত এবং ইহারা ইহাপেক্ষাও কুৎসিৎ পাপে কলঙ্কিত। বন্দীদাৎ ৮।৩২।

দীক্ষার সময় যে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় 'যস্ন' (= যজ্ঞ) নামক গ্রন্থ হইতে তাহার অংশ বিশেষ নিম্নে অনূদিত হইল:—

আর আমি 'দেব' রহিলাম না অর্থাৎ দেবোপাসক রহিলাম না। আমি আপনাকে 'মজ্‌দা' বিশ্বাসী জরথুস্ত্রমতাবলম্বী, দেববিরোধী অসুর ভক্ত, 'অমেষ স্পেন্ত' অর্থাৎ পবিত্রাত্মা অমরগণের স্তোতা ও উপাসক বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। যাহা কিছু কল্যাণকর তাহা অহুর মজ্‌দার সৃষ্টি বলিয়া বিশ্বাস করি। তিনি পবিত্র ও জ্যোতির্ম্ময়। আমি দেব-গণকে ত্যাগ করি। ইহারা পাপময়, দুষ্ট, ভ্রষ্ট ও পাপকারী। ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা মিথ্যাবাদী ঘৃণিত ও পাপাত্মা। যাহারা দেবতা বা দেবতুল্য, যাতু বা যাতু তুল্য, কিম্বা এইরূপ প্রকৃতি সম্পন্ন আর যে কেহ আছে আমি সে সমুদয়কেই ত্যাগ করি। আমি প্রকাশ্যভাবে ইহাদিগকে পরিত্যাগ করি। যস্ন ১২।

অসুরোপাসকগণ দেবগণকে কি প্রকার ঘৃণা করিতেন তাহা উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইতেছে।

অবস্তাতে লিখিত আছে যে অসুরোপাসকগণ দিবা-রাত্রিতে ৫ বার উপাসনা করিবেন। ইহার মধ্যে চারি বার নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়:—

আমি ঘোষণা করিতেছি যে আমি মজ্‌দা বিশ্বাসী, জরথুস্ত্র মতাবলম্বী এবং দেববিরোধী। গাহ, ১।১; ৩।১; ৪।১; ৫।১

'যস্ন' নামক গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থলেও উক্ত মন্ত্রটী পাওয়া যায়। (১।২৩; ৩।২৪ ইত্যাদি)।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রসমূহ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে পারসীকগণও এক সময়ে দেববিশ্বাসী ছিলেন। দেবোপাসক-গণের মধ্যেই এক দল সংস্কারক উত্থিত হইয়া দেবোপাসনার

বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। যাঁহারা অসুর ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেন তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র প্রতিদিনই উচ্চারণ করিতে হইত। ইহা স্বীকার না করিলে উক্ত মন্ত্রের কোন অর্থ থাকে না।

বিরোধের কারণ।

এখন প্রশ্ন এই যে ইহাদের মধ্যে বিরোধ কেন উৎপন্ন হইল? পণ্ডিতগণ ইহার দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রথম কারণ।

পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও আচার্য্য হৌগ (Haug) এবং ওয়েষ্ট (West) প্রমুখ অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে পারসীকদিগের পূর্ব্বপুরুষই প্রথমে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তন করেন। এই সময়ে হিন্দুদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ গো মহিষাদি লইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। কখন ইহারা ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইবে এই ভয়ে গৃহস্থগণকে সততই সশঙ্কিত হইয়া থাকিতে হইত। শুনা গিয়াছে লুণ্ঠন করিবার পূর্ব্বে ডাকাইতগণ কালীপূজা করিয়া বাহির হইত; বৈদিক যুগেও যে হিন্দু আর্য্যগণ লুণ্ঠনাদির পূর্ব্বে দেবতাকে আহ্বান করিতেন। ইন্দ্রই লুণ্ঠনকারীদিগের প্রধান দেবতা। প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি ঋক উদ্ধৃত হইল :—

১। ইন্দ্র পণিদিগের ধন অপহরণ করিতে গমন করেন (মুষে অজতি) এবং সেই ধন উপাসকদিগকে বিভাগ করিয়া দেন। ৫।৩৪।৭।

মুষে=চোরয়িতুং (চুরি করিবার জন্য) সায়ন।

২। ইন্দ্র যুদ্ধ করিয়া গো সংগ্রহ করেন। ৪।৪৭।১০

৩। হে ইন্দ্র! ব্যাধ যেমন শীকার করে তেমনি আমরা—তোমার স্তোতৃগণ তোমার সাহায্যে যেন ধনলাভার্থ—জয়লাভ করিতে পারি। ৪।২০।৩।

৪। ইন্দ্র পরিপন্থীর ন্যায়...ধন অপহরণ করেন। ১।১০৩।৬।

পরিপন্থী=মার্গ নিরোধকঃ চোরঃ (অর্থাৎ ডাকাইত)—সায়ন।

লুণ্ঠনকার্য্যের জন্য যে কেবল ইন্দ্রেরই পূজা করা হইত তাহা নহে—আর্য্যগণ এই উদ্দেশ্যে অপরাপর দেবতাকেও আহ্বান করিতেন।

১। এই বৃহস্পতি দেব ধন ও গো সহিত গো-ব্রজ জয় করিয়াছিলেন। ৬।৭৩।২।

২। হে অগ্নি ও সোম! তোমার যে বীর্য্য দ্বারা পণিদিগের নিকট হইতে গোধন অপহৃত করিয়াছিলে (অমুষ্ণীতম) তাহা সুবিখ্যাত। ১।৯৩।৪।

৩। হে ঊষা! তুমি শত্রুগণের ধন আহরণ কর। হে ধনবতি! ধন স্তোতাদিগের নিকট প্রেরণ কর। ৭।৭৭।৪।

বেদে পাওয়া যাইতেছে যে আর্য্যগণ শত্রুগণের ধন অপহরণ করিতেন। ইহাঁরা যে অসুরোপাসকগণের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতেন—'অবস্তা'তে তাহার প্রমাণ আছে। 'যস্ন' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে কৃষিকর্ম্ম করিয়া মানুষ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে ইহাই 'অসুর মজদা'র ইচ্ছা (৩১।৫ ও ৬)। কিন্তু ইহারা লুণ্ঠনাদি করিয়া ধন লাভ করে এবং শস্যক্ষেত্রাদি ধ্বংস করিয়া থাকে (৩২।১১; ৪৪।২০)। দেবোপাসকগণ যে প্রথমে কৃষিকার্য্যের বিরোধী ছিল তাহার আরও অনেক প্রমাণ আছে।

যখন যব সৃষ্ট হইল, তখন দেবগণ চমকিয়া উঠিল। যখন ইহা অঙ্কুরিত হইল তখন দেবগণের হৃদয় মোহপ্রাপ্ত হইল। যখন যব বাড়িতে লাগিল তখন দেবগণ চীৎকার করিতে লাগিল। যখন শীষ বাহির হইল তখন দেবগণ পলায়ন করিল। যে গৃহে শস্য নষ্ট হইয়া যায় দেবগণ সেই গৃহেই বাস করিতে পারে। যখন প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় তখন দেবগণ এতই যন্ত্রণা ভোগ করে যে, তাহাদিগের গলার মধ্যে যেন উত্তপ্ত লৌহ ঘুরাণ হয়। অবস্তা, বন্দীদাৎ ৩।৩২।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে দেবোপাসকগণ এ সময়ে কৃষিকার্য্য করিত না। কৃষকগণ বহুদিন পরিশ্রম করিয়া যে শস্য উৎপাদন করে শত্রুগণ তাহা একদিনেই লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। অসুরোপাসকগণের জীবনেও ইহাই ঘটিয়াছিল। তাহাদিগকে যে প্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে প্রাণ বড়ই ব্যথিত হয়। এই সমুদয় বিপদ আপদের মধ্যে ইহারা যে সমুদয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী।

এই সমুদয় কারণে যে পারসীকগণ হিন্দু আর্য্যগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন এবং তাহাদের দেবতাকেও ঘৃণা করিবেন ইহাতে কিছুই বিচিত্র নাই।

দ্বিতীয় কারণ।

বৈদিক আর্য্যগণ বহুদেববাদী ছিলেন এবং পারসীকগণ একেশ্বরে বিশ্বাস করিতেন।* ঋষিগণের চক্ষে সমুদয় দেবতাই সমান :—

"হে দেবগণ! তোমাদিগের মধ্যে কেহ শিশু নাই। কেহ কুমার নাই। তোমরা সকলেই মহান।" ঋঃ ৮।৩০।১।

কিন্তু পারসীকগণ বিশ্বাস করিতেন যে 'অহুর মজদা'

একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা। ইহার অনেক অনুচর থাকিলেও তাঁহারা তাঁহার সমকক্ষ নহে। ইহাদিগের নাম 'অমেষ স্পেন্ত,' অর্থাৎ পবিত্র অমরগণ। ইহারা সকলেই 'অহুর মজদা' কর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁহার আজ্ঞাধীন।

উপাস্য দেবতার আদর্শ বিষয়েও উভয় সম্প্রদায়ের মতভেদ আছে। বৈদিক দেবতাগণ নীত্যংশে অনেক হীন। ইহাঁরা যে লুণ্ঠনাদি কার্য্যে সাহায্য করিতেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণ অত্যন্ত মদ্য প্রিয় কিন্তু 'অহুর মজদা' কখনও মদ্য পান করেন না (বন্দী ৯।২০)। ইহার অনুচরগণের প্রকৃতিও যে কি প্রকার উন্নত তাহা তাহাদের নাম হইতেই প্রতিপন্ন হইবে। 'অমেষ স্পেন্ত'-দিগের নাম অর্থ সহ প্রদত্ত হইল।

১। বহুমনো=সাধু মন।

২। অষ বহিশ্ত=পরম পবিত্রতা।

৩। ক্ষত্র বৈর্য্য=শ্রেষ্ঠ রাজশক্তি।

৪। স্পেন্ত আরমৈতি=পবিত্র শান্তি।

৫। হৌরবতাৎ=স্বাস্থ্য।

৬। অমেরেতাৎ=অমৃতত্ব।

ধর্ম্মের আদর্শ বিষয়ে যাহাদিগের মধ্যে এত মতভেদ তাহাদিগের পক্ষে একত্রে শান্তিতে বাস করা অসম্ভব।

ইন্দ্রবিদ্বেষ।

অসুরোপাসকগণ যে সমুদয় দেবতাকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেন, তাহাদিগের মধ্যে ইন্দ্রই সর্ব্বপ্রধান। ভারতীয় শাস্ত্রেও দেখিতে পাই যে ইন্দ্রকে পদচ্যুত করিবার জন্য অসুরগণ বারংবার দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় ইন্দ্রই দেবগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন। পৌরাণিক সাহিত্যে লিখিত আছে যে সময়ে সময়ে বিষ্ণুকেও অসুরবধের জন্য যজ্ঞক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইত। কিন্তু এ প্রকার ঘটনা সচরাচর ঘটিত না। ঋগ্বেদে পাওয়া যায় ইন্দ্রই অসুর বধ করেন। কখন কখন বিষ্ণুও ইন্দ্রের সাহায্য করিয়া থাকেন। কিন্তু অসুর বধ বিষ্ণুর প্রধান কার্য্য নহে; বিষ্ণু ইন্দ্রের সহচর মাত্র। আর পারসীক শাস্ত্রে যখন বিষ্ণুর নাম পাওয়া যায় না তখন বলিতেই হইবে যে ইন্দ্র লইয়াই দেবাসুরের যুদ্ধ।

অসুরোপাসকগণ কেন ইন্দ্রকে ঘৃণা করিতেন তাহার যথেষ্ট কারণ আছে।

আজকাল যেমন তান্ত্রিক উপাসনার সহিত মদ্যপানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীনকালে ইন্দ্রপূজার সঙ্গেও তেমনি সোমরসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ঋগ্বেদে লিখিত আছে, দেবতা ও মানুষগণের মধ্যে একমাত্র ইন্দ্রই অধিক সোমরস পান করিতে পারেন (৮।২।৪); ইন্দ্র এতই সোমরসপ্রিয় যে জন্মিবামাত্রই সোমপান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন (৩।৪৮।২,৩); বৃত্রবধের সময় তিনি তিন সরোবর সোমরস পান করিয়াছিলেন (৫।২৯।৭); কেবল তিনটী সরোবর কেন, কখন কখন সোমরসপূর্ণ ত্রিশটী সরোবর যুগপৎ পান করিয়া থাকেন (৮।৭৭।৪)। সোমরসের মত্ততায় ইন্দ্র সমুদয় অসাধারণ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন (২।১৫)। অসুরোপাসকগণও যজ্ঞের সময় সোমরস প্রস্তুত করিতেন কিন্তু তাঁহারা পানের জন্য ইহা ব্যবহার করিতেন না। নিয়ম রক্ষার জন্য কেবলমাত্র একজন হোতাকে সামান্য পরিমাণে সোমরস আস্বাদন করিতে হইত। ব্রাহ্মণগণ সোমলতা হইতে রস নির্গত করিয়া মদ্য প্রস্তুত করিতেন কিন্তু পারসীক যজ্ঞে কেবল রস ব্যবহার করা হইত। এ রসে কোন প্রকার মাদকতা শক্তি থাকিত না। রামায়ণ হইতে পূর্ব্বে যে অংশ (বাল: ৪৫।৩৬—৩৮) উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও প্রমাণিত হইবে যে অসুরোপাসকগণ সুরা ব্যবহার করিতেন না।

ইন্দ্র লুণ্ঠনকারীদিগের দেবতা ও মদ্যপায়ীদিগের দেবতা এবং তিনি স্বয়ং লুণ্ঠন করেন ও ঘোরতর মদ্যপায়ী এইজন্য অসুরোপাসকগণ প্রধানতঃ ইন্দ্রকেই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।

পঞ্চনদে বিচ্ছেদ।

পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বলেন, আফগানিস্থানেই উভয় দলে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল এবং পরিণামে বৈদিক আর্য্যগণই উক্ত প্রদেশ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু যে প্রকার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আর উক্ত মত সমর্থন করা যায় না। আমাদের মনে হয় পঞ্জাব প্রদেশেই এই গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত হইয়াছিল।

বন্দীদাৎ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে 'অহুর

মজদা' বহু মনোরম স্থান সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ১৬টী স্থান সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। একটী স্থানের নাম "হরহ্বৈতি"। আমরা যে স্থলে 'স' ব্যবহার করি, অবস্তাতে সে স্থলে 'হ' ব্যবহৃত হয়। সুতরাং

হরহ্বৈতি = সরস্বতী।

সরস্বতী নদীকূল ভারতীয় শাস্ত্রেও পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত। আর একটী স্থলের নাম "হপ্ত হিন্দব"। ইহার সংস্কৃত নাম "সপ্তসিন্ধু"। ঋগ্বেদেও এই প্রদেশের নাম বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। (১৩২।১২ ; ৩৪।৮ ইত্যাদি)। প্রাচীন ভারতে পঞ্চনদ অর্থাৎ পঞ্জাবকেই কখন কখন সপ্তসিন্ধু বলা হইত। প্রকৃত পক্ষে উক্ত প্রদেশে নদী উপনদীর সংখ্যা পাঁচটী নহে কিন্তু সাতটী। সুতরাং সপ্তসিন্ধুই ইহার প্রকৃত নাম।

সরস্বতী এবং সপ্তসিন্ধু অসুরোপাসকদিগের স্বদেশ না হইলে ইঁহারা কখনই এ সমুদয় স্থানের এত প্রশংসা করিতেন না। আর এই দুইটী স্থল যে ইঁহাদের বাসভূমি তাহা উক্ত গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। (বন্দী ১।১)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষেই দেবাসুরের সংগ্রাম হইয়াছিল এবং পরিণামে অসুরোপাসকগণ পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। ইঁহারা পরে পারস্যদেশে আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়াই, ইঁহাদের নাম পারসীক বা পার্সী।

অনেকে মনে করেন দেবাসুরের যুদ্ধ নিতান্তই অমূলক ঘটনা। পুরাণাদি গ্রন্থে ইহা যে ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে এরূপ বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু ইহা একটী ঐতিহাসিক ঘটনা। এই সংগ্রামের মূলে কতটুকু সত্য আছে তাহা অত্রকার প্রবন্ধে বর্ণনা করা হইল। অসুরদিগের ভাষা ও ধর্ম্ম বিষয়ে সময়ান্তরে আলোচনা করা যাইবে।

২২।১।১৯০৭। শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

বিজাতীয় রকমে স্বদেশোন্নতি।

প্রবাসীর কার্ত্তিক সংখ্যায় 'সর্ব্ববিষয়ে স্বদেশী' প্রবন্ধকার 'নানারূপ নিষেধ বিধান অনুস্বার বিসর্গের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া' স্বদেশোন্নতিকে জীবনের একমাত্র মহাব্রত করিবার জন্য, বজ্রগম্ভীর স্বরে আমাদের আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নির্ব্বাচিত উন্নতির পথটি একান্ত বিভীষিকাপূর্ণ, হঠাৎ সে পথে পদার্পণ করিতে—এতকাল সাহেবিয়ানার বিড়ম্বনা সহিবার পরে—আর তো সাহস হয় না। হইতে পারে বিলাত গিয়া কিছুকাল সাহেবি হাওয়া গায়ে লাগাইয়া আসিলে সাহেবিয়ানার বিভীষিকাগুলা আপনা হইতে সহিয়া যাইতেও পারে কিন্তু তথাপি আজন্ম অভ্যস্ত পোষাক পরিচ্ছদ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে কষ্ট হয় দুঃখ হয়। প্রবন্ধকার বলেন "যদি সেটা স্বজাতির পক্ষে স্বদেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, তবে সে দুঃখ সে কষ্ট বক্ষ পাতিয়া পুরুষের মত বহন করিতে হইবে; নাকে কাঁদিলে চলিবে না।" এখন দেখা যাক এই শক্তিশেলটা 'বক্ষ পাতিয়া' বহন করিয়া বাস্তবিক আমরা স্বর্গের পথ উন্মুক্ত করিব কি 'পপাত চ' হইয়া নরক যন্ত্রণা ভুগিতে থাকিব।

মুখবন্ধে সাহেবদের হইয়া ওকালতী করিতে গিয়া প্রবন্ধকার দেশভক্তিটাকে বিলাতী আমদানি বলিতেছেন এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ রামচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রকে সাক্ষির কাঠগড়ায় খাড়া করিয়া, জেরার চোটে হয়কে নয় প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি শিক্ষিত লোক; অতএব, 'পাশ্চাত্য সভ্যতালক্ষ্মী' তাঁহার স্কন্ধে ভর করিবার সুবিধা পাইয়া 'বন্দেমাতরম্' রূপ একতান সঙ্গীত আমাদের শুনাইলেন, তৎপূর্ব্বে দেশকে মা বলিয়া আমরা কেহ ডাকি নাই! এই কথাই যদি ঠিক হয়, তবে যশোরেশ্বরী, চিত্তো-রেশ্বরীর স্থান কোথায়? রাজলক্ষ্মী গৃহলক্ষ্মীতেই বা প্রভেদ থাকে কেমন করিয়া! দেবী জগদ্ধাত্রীকে না রাখিলেও চলে, অসুরপীড়িতা বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিতে বিশেষ বিশেষ অবতারের কোন আবশ্যকই হয় না এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের শত শত বৎসর পূর্ব্বে যবন সম্রাটকে বাধা দিবার জন্য পাণিপথক্ষেত্রে অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গ রাজপুত চৌহানের একত্র সমাবেশেরও কোন অর্থ থাকে না! ও বলিতে হয় মাতা 'বসুন্ধরা' নয় কিন্তু বিমাতা 'ইউরোপ' 'টেম্‌স্ টনেল' পথে আসিয়া অযোধ্যাপুরী হইতে সীতাদেবীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন ও তাঁহাকে 'টাউয়ার অব্ লণ্ডনে' লুকাইয়া রাখিলেন'। হায়! অমরকোষ খুঁজিয়া 'প্যাট্রিয়টিজিমের'

প্রতিশব্দ না মিলিলেও আমাদের দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে আমাদের পূর্ব্বতন পিতামহগণ পুরাণ ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় সে কথাটি দেব ভাষায় শোণিতাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন। তা ছাড়া দেশপ্রীতির ভাবটা পাশ্চাত্যেও যতটা এখানেও ততটুকু। তবে কেন প্রবন্ধকার অনর্থক আমাদিগকে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট ঋণী করিতে চাহেন বুঝিলাম না। বাঙ্গালী বাঙ্গালাকে পঞ্জাবী পঞ্চনদ প্রদেশকে যদি দেশ বলিয়া ভাবেন, যদি সে সমস্ত ভারতবর্ষটীকে একটি দেশ বলিয়া কখনও না জানিয়া থাকে, তাহাতেই বা এমন ক্ষতি কি? ইংরাজ, রুষ, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, আমেরিকান সকলেই তো নিজের নিজের মুল্লুকটাকে দেশ বলিয়াই জানে এবং সেই দেশটুকুর জন্যই প্রাণ দিয়া ক্ষান্ত থাকে; এমন তো কোন পাশ্চাত্য জাতি দেখিনা যে সমস্ত ইউরোপটাকে আপনার দেশ বলিয়া সম্বোধন করিল অথবা সেটার জন্য নিজের কিছু ত্যাগ করিল! সমস্ত ইউরোপটা যেমন রুষ, ব্রিটীশ, ফ্রেঞ্চ, আমেরিকান প্রভৃতি ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত, সমস্ত ভারতবর্ষটাও তো তেমনি হিন্দু, মুসলমান, পারসীক খ্রীষ্টান প্রভৃতি নানা জাতিতে পরিপূর্ণ; সমস্ত পাশ্চাত্য জাতি যেমন এক খৃষ্টধর্ম্মের বন্ধনে এক, সমস্ত হিন্দু সন্তানও তো তেমনি সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের শৃঙ্খলে এক হইয়া রহিয়াছে! এখানে যেমন শাক্ত বৈষ্ণবের ঝগড়া সেখানেও তাই, দেশ প্রীতিটা গজাইয়া উঠিবার সেখানেও যতটুকু সুবিধা এখানেও পরাধীন বলিয়া ততটা না হোক কতকটা যে আছেই একথা কেমন করিয়া অস্বীকার করি? এবং কেমন করিয়াই বা বলি "বন্দে মাতরম্" বাঙ্গালীর বিস্ময় ও পাশ্চাত্য সভ্যতালক্ষ্মীই আমাদের সে মধুর বাণী শুনাইলেন? যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার নাম গন্ধও এদেশে ছিল না তখন এই স্বদেশপ্রীতির অরুণ স্রোতে রাজপুতানা ভাসিয়াছিল, বাঙ্গালার প্রতাপাদিত্য অস্ত গিয়াছিল অথচ আমাদের 'স্বদেশপ্রীতি নিজস্ব নয়'? প্রতাপ সিংহের মন্ত্রী ভামশাহ যখন পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত, প্রাণপাত করিয়া অর্জ্জিত ধনরাশি অকাতরে রাণার করে সমর্পণ করিলেন, তখন তিনি সেটা প্রতাপের জলযোগের ব্যবস্থা করিতে দেন নাই, দেশের জন্যই সমর্পণ করিয়াছিলেন নিশ্চয়; প্রতাপের প্রতিজ্ঞা 'যতদিন চিতোর পরহস্তে ততদিন বনবাস ব্রত পালন' ইহার অর্থ কি দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার নয়? তবে কেমন করিয়া বলি যে দেশের জন্য প্রাণদান এ ভাব আমাদের পূর্ব্বে ছিল না এবং আমাদের বক্ষের ভৃগুপদ চিহ্নটা বিলাতী বুটের সুস্পষ্ট ছাপ!

প্রবন্ধকার বলিতে চাহেন 'বন্দে মাতরম্' বিলাতি ভাব এবং সেই বিলাতি ভাবের প্রভাবে আমাদের স্বদেশী ভাব! এ পরের দ্রব্য লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ না করিয়া তিনি আমাদিগকে সযত্নে বুকের পকেটে রাখিতে উপদেশ দিতেছেন! যিনিই যাই বলুন আমি তো ইহাতে রাজি নই, আমি তো বলি, 'বন্দেমাতরম্' বিলাতি বলিয়া হয় তো চলিয়া যাইত যদি ওই 'রং' টুকু না থাকিত। মিষ্টার মুখার্জ্জি 'বন্দেমাতরমের' গায়ে বিলাতি রমের গন্ধ পাইয়াছেন কেমন করিয়া এবং সেরূপটা হইলে সেটাকে মহারত্ন বোধে আমাদের বক্ষে ধরিতে বলেন কি জন্য জানিনা, সহজ বুদ্ধিতে এই বুঝি যে, বিলাতি হইতে দেশীয়ের উদ্ভব 'ওক্' গাছে আম্র ফলের ন্যায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সুসাধ্য হইলেও প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ। দেশীয় ভাব স্বদেশপ্রীতির জন্ম দেয়, মানুষ মানুষ প্রসব করে, গরুর জননী হইতে পারে না! আমাদের পাঁজীপুঁথিতে দেশপূজার পদ্ধতি না পাইয়া লেখক স্থির করিয়াছেন যে দেশকে মা বলিয়া পূজা করাটা বিলাতি প্রথা! বিলাতি কোন্ ধর্ম্মপুস্তকে ও পঞ্জিকায় দেশমায়ের পূজার তারিখ ও মন্ত্র পদ্ধতি তিনি দেখিলেন? 'বাইবেলে' যিশুরই একাধিপত্য, পঞ্জিকায় ও King's Birth day, Xmas day প্রভৃতি ছাড়া 'Motherland day' বলিয়া কোন তো উল্লেখ দেখি না? যে পাশ্চাত্য জাতিকে তিনি দেশপূজায় আমাদের গুরুঠাকুর বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন সেই পাশ্চাত্য জাতিই দেশ-পূজাপদ্ধতিতে আমাদের অপেক্ষা যে বিশেষ পণ্ডিত নয় একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। 'প্যাট্রিয়টিজিম' শব্দের প্রতিশব্দ অমরকোষে না মিলিলেও মহাভারত অশুদ্ধ হইল এ আবিষ্কারেরও প্রয়োজন নাই। 'নেলসনের' হ্যাটকোট গ্লাসকেসে রাখিয়া সেগুলাকে পুষ্পমাল্যে সাজাইয়া বৎসরে একদিন 'রুল ব্রিটানিয়া' বলিয়া ভেঁপু বাজাইলে যদি 'প্যাট্রিয়টিজিম্' হয়, তবে প্রভাতে প্রতিদিন শয্যাত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মাগণের নাম স্মরণকেই বা 'প্যাট্রিয়টিজিম্' না বলি কেন? দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য

ধনপ্রাণ উৎসর্গ করার নাম যদি 'প্যাট্রিয়টিজিম্' হয়, তবে যে মহাত্মা বঙ্গদেশ হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত তীর্থযাত্রীর পাকা রাস্তা নিজব্যয়ে বানাইয়া গেছেন, যে হিন্দুসন্তান স্বদেশ না রাখিলে স্বধর্ম্ম রক্ষা অসম্ভব জানিয়া সমরাঙ্গণে প্রাণ দিয়াছেন তাঁহারাই বা 'দেশভক্ত' বলিয়া পরিচিত না হইবেন কেন?

বঙ্গোপসাগরে ভাসমান জাহাজি গোরার মুখে 'Home Sweet Home' যদি আমাদের চোখে জল আনিতে পারে, তবে লঙ্কাপ্রবাসী শ্রীরামচন্দ্রের "ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা মিত্রাস্মভ্যং ন রোচতে, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই উক্তির যথার্থ ভাবার্থ কেন না আমরা গ্রহণ করিতে পারিব এবং কেনই বা ঐ দুই ছত্র শ্লোকের মহৎ ভাবটা সঙ্কুচিত আকারে আমাদের নিকট প্রতিভাত হইবে?

উপরোক্ত শ্লোকটি প্রবন্ধকার কোন্ রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড হইতে উদ্ধার করিলেন জানি না এবং কোন্ যুক্তিবলে তিনি জন্মভূমির অর্থ পরিখাবেষ্টিত অযোধ্যাপুরীটুকুই বলিতে চাহেন বুঝিলাম না! এইটুকু জানি যে উক্ত শ্লোক বাল্মীকির রামচন্দ্র উচ্চারণ করেন নাই, জন্মভূমির প্রতিশব্দ বাস্তভিটা কিম্বা স্বগ্রাম নয় এবং রামচন্দ্র কৌশল্যার অঞ্চলের নিধি হইলেও প্রবন্ধকার যতটা ভাবিয়াছেন—ততটা 'তুষুকে' কিম্বা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন না। জন্মভূমিটাকে রামচন্দ্র অযোধ্যা ছাড়া আরও একটা বড় পদার্থ বলিয়া জানিতেন। নচেৎ যে বনবাসের কঠোরতা স্মরণ করিলে এমন যে উচ্চশিক্ষিত আমরা আমাদেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, সেই বনবাসে বসিয়া রামচন্দ্র কখন কি বলিতে পারিতেন "উপস্পৃশংস্ত্রিষবণং মধুমূলফলাশনঃ নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়েঽহং ত্বয়াসহ" অর্থাৎ "আমি তোমার সহিত এই স্থানে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া মধু ও ফলমূল আহার করত অযোধ্যা এবং রাজ্যতেও স্পৃহা রাখি না"; কেবলমাত্র অযোধ্যাটুকুই জন্মভূমি বলিয়া জানিলে, ধর্ম্মপ্রাণ রাঘবের মুখে আমরা এ কথা কখনই শুনিতাম না। দু'একদিনের জন্য বনভ্রমণে গেলে বনভোজনের আনন্দে কথাটা বলিয়া ফেলা অসম্ভব নয়; কিন্তু যে বনে চতুর্দ্দশ বৎসর কাটাইতে হইবে সেই আর্য্যঋষিগণ-সেবিত ভারতবর্ষের বনগুলাকেও জন্মভূমি বলিয়া ধারণা না থাকিলে অযোধ্যাটাকে মন হইতে অত সহজে দূর করিয়া দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার; তা'ছাড়া নূতন আলোকপ্রাপ্ত আমাদের চোখে জন্মভূমিটা যেমন জননী বলিয়া ঠেকিতেছে তেমনি নেহাৎ সেকেলে 'হিরামের' চোখেও ঠেকিয়াছিল। নচেৎ প্রবন্ধকারের উদ্ধৃত রামায়ণের শ্লোকেতেও রামচন্দ্র জন্মভূমিটাকে জননীর পার্শ্বে আসন দেন কেন? আর কেমই বা 'চ' রূপ বিনিসুতার হারে উভয়কে একত্র বাঁধেন? প্রবন্ধকার ভাবিয়াছেন, 'চ' টা জননীকে জন্মভূমি হইতে পৃথক রাখিয়াছে কিন্তু আমরা তো দেখিতেছি ঐ 'চ' টাই ডাক ছাড়িয়া বলিতেছে 'জন্মভূমিকে মা বলিয়া বন্দনা কর'।

এখন রামকে ছাড়িয়া শ্যামকে দেখা যাউক—"ভারতবর্ষ একটি সমগ্র দেশ এবং আমাদের জন্মভূমি, এ ভাবটি আমরা কি উপায়ে পাইতাম ইংরাজ যদি সমস্ত ভারতবর্ষের একচ্ছত্র অধিপতি না হইত? ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিচার ব্যবস্থা এক না হইত? সম্রাটের হস্তে দূর—অতি দূর প্রদেশেরও শাসনকার্য্য না থাকিত এবং ভারতবর্ষের প্রজা-পুঞ্জের রাজনৈতিক একত্বভাব না জন্মিত?" শিল্পজগতের মানুষ আমার কাছে নৈতিক এবং আইনকানুনের দিকটা 'foreign country'ই বটে, উপরন্তু কোম্পানির চাকর রাজনৈতিক চোরাবালিতে পদক্ষেপ করিতে ইচ্ছাও রাখি না। নচেৎ ভারতের পুরাণ ইতিহাস হইতে দেখাইতে পারিতাম যে ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বেও ভারতবাসী দুই দশবার একচ্ছত্র কাহাকে বলে, এক আইন, এক বিচার, এক সম্রাটের শাসন কাহাকে বলে এখনকার মতই অনুভব করিবার সুবিধা পাইয়াছিল এবং মিষ্টার মুখার্জ্জির কল্পিত Ideaটাও সাহেবদের যতটা ভারতবাসীরও ততখানি অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল। প্রবন্ধকার বৃথা গঞ্জনায় প্রবাসী বাঙ্গালী ও কেরাণী বাবুদের কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দিয়াছেন। English Channel পার হইতে গিয়া Lord Byron যদি 'adieu adieu my native land' বলিয়া আক্ষেপসূচক কবিতা লিখিয়া থাকেন এবং সে জন্য হাস্যাস্পদ না হইয়া থাকেন তবে বঙ্গ কবিই বা দোষ করিলেন কি? কটকে যাইতেও যেমন, ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সও তেমনি ছয় ঘণ্টার সমুদ্রপথ বই নয়।

ডালরুটিখোর খোট্টার দেশে বসিয়া কেরাণী বাবু

মনিবের করুণার উদ্রেক করিয়া সংসারের সুবন্দোবস্ত করিতে যদি যত্নবান হন, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির জন্য যদি তার প্রাণ সত্যই ব্যাকুল হয় এবং কাটখোট্টা রকমের উত্তরপশ্চিমটাকে 'পূবদেশ' বলিয়া ধারণা করিতে অক্ষম বেচারা যদি মনের দুঃখে foreign countryতে আছি বলিয়া ফেলে তবে সেই বা এমন বিশেষ কি অপরাধ করিল? বরং বাঙ্গালী হইয়া সে যে বঙ্গদেশটাকে শ্রদ্ধার সহিত প্রীতির সহিত দেখে, রাজনৈতিক বক্তার মত মুখে মাত্র ভারতমাতা ভারতমাতা বলিয়া চীৎকার করে না, সেটা একটা গুণের মধ্যেই বলিতে হইবে। তা'ছাড়া কোন্ ভারতবর্ষটা আমরা সমগ্র দেশ বলিয়া জানিব? পুরাকালে ভারতবর্ষ ছিল—"উত্তরংযৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্, বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ," নব সহস্র যোজনবিস্তৃত সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত; মোগল আমলে ভারতবর্ষটা কাবুল হইতে বাঙ্গালা, বাঙ্গালা হইতে কুমারিকা, কুমারিকা হইতে সিন্ধু পঞ্জাব! ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষের স্থূল শরীরটা কাবুলের দিকটায় যেমন বাড়িতে পাইতেছে না তেমনি বর্ম্মার দিকটায় বেশ একটুখানি পুষ্টতা লাভ করিয়াছে! পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ সকল এবং রাক্ষসপুরী লঙ্কাও এখন ভারতবর্ষ! এখন কথা এই যে ইংরাজ রাজার লাল চিহ্নিত 'British India,' মোগলের 'হিন্দুস্থান' না ঋষিগণ নির্দ্দিষ্ট 'নব সহস্র যোজন বিস্তৃত বর্ষ' আমাদের জন্মভূমি ও একটি সমগ্র দেশ? প্রবন্ধকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে ইংরাজ যদি সমস্ত ভারতবর্ষের একছত্র অধিপতি না হইত, তবে সমস্ত ভারতবর্ষটাকে একটি দেশ বলিয়া আমরা মনে করিবার অবসর পাইতাম কি? এই একের নম্বর Ideaটার গূঢ় অর্থ যে আমাদের হাড়ে হাড়ে এখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই এ কথা বলিতেই হইবে। আমরা হিন্দুস্থানের অর্থ হিন্দুসন্তানের বাসস্থান বুঝিতে পারি, ঋষিগণের ভাবার্থও বুঝিতে সক্ষম, কিন্তু খাঁটি স্বদেশী নহে এই যে Idea এটাকে মিষ্টার মুখার্জ্জির উপদেশমত লাল চিহ্নিত British Indiaর মানচিত্র হইতে কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না!

Idea নম্বর 'টু' দেশপ্রীতির ভাবটা আমাদের নিজস্ব নহে!! য়ুরোপীয় জাতিগণের ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল, তাই স্বদেশপ্রীতির ভাবটা তাহাদের মধ্যে বিশিষ্টরূপে জাগ্রত হইবার অবসর ঘটিয়াছে!! হিন্দু-রাজত্বের ইতিহাস য়ুরোপীয় ইতিহাসের তুলনায় শান্তিময়… …মুসলমান আবির্ভাবের পূর্ব্বে হিন্দুকে কেহ হিন্দুস্থান হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করে নাই সুতরাং দেশকে মা বলিয়া জড়াইয়া ধরিবার অবকাশও হয় নাই!!! এই দুয়ের নম্বর Idea টি আমরা রসিক কবি দ্বিজুবাবুকে উপহার দিতেছি। তাঁর 'সাধে কি বাবা বলি, গুঁতার চোটে বাবা বলায়' গানটির জুড়িদার স্বরূপ। মুখার্জ্জি সাহেবের স্বদেশ-প্রীতি পরের ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়া আনা সন্দেহ নাই কিন্তু মূল্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু কিছু সন্দেহ আছে। যে প্রীতিটা রঙ্গমঞ্চে 'ভাই ভাই' বলিয়া চীৎকার না করিলেও সহোদর ভাইকে একান্নবর্ত্তী রাখে, জাত ভাইকে যত্ন করে ও পরকে আদর করিতে কুণ্ঠিত হয় না সেই প্রীতিটা—দাগি হইলেও—আমরা খাঁটি বলিয়া জানি; আর যে প্রীতিতে ভাই ভাই ঠাঁই-ঠাঁই, অর্দ্ধাঙ্গিনী কুটুম্ব, পরজন native কিম্বা niggar ভিক্ষার্থিকে পুলিষ দেখায়, কুকুর খেদায়, সেটা বেদাগ হইলেও অত্যুৎকৃষ্ট 'টেট কোম্পানির' নকল হীরা বলিয়া আমরা সন্দেহ করি। প্রাচ্য জাতিটা বুনিয়াদি ঘরের নিঃস্ব সন্তান; সে কর্ত্তাদের আমলের মলিন শত ছিন্ন কাশ্মিরী শাল গায়ে দিয়া বেড়াইলে কিম্বা ভিখারীর কন্থা ধারণ করিয়া রাজসভায় যাইলে হতমান হইবে না কিন্তু চটকদার জার্ম্মানউলের দোশালা উড়াইয়া বাহার লইতে গেলে সে কিছুতেই প্রশংসার পাত্র হইবে না এই রূপই আমাদের বিশ্বাস। প্রবন্ধকার এই বুনিয়াদি প্রাচ্য জাতি-টাকে নূতন জাতীয়তার ভিত্তিস্থাপনের জন্য আহ্বান করিয়াছেন এবং সেজন্য কতকগুলি মালমসলার ফর্দ্দ দিয়া-ছেন, যথা:—প্রথম স্বদেশপ্রীতি সেটা দেশী হইলে চলিবে না! আমেরিকা ইংলণ্ড কিম্বা প্যারিস হইতে আমদানি করিতে হইবে! এটি অত্যাবশ্যক মসলা! আমরা যে প্রণালীতে যত ভাগে আমাদের দেশপ্রীতিরূপ 'এঁটেল মাটি' বুনিয়াদ পাকা করিতে লাগাইয়া আসিতেছি সেরূপ করিলে চলিবে না; P. W. D.র লিখিত মত Table দেখিয়া প্রস্তুত করা চাই!

দ্বিতীয় মসলাঃ—প্রজাতন্ত্রতা ; এই মসলা আমাদের চিরপ্রথামত জগদীশ্বরের নাম করিয়া কিম্বা রাজার নাম করিয়া বন্টন করিলে চলিবে না। এখানেও সেই P. W. Dর চরণ সার করিতে হইবে! প্রবন্ধকারের মতে এখন হইতে রাজায় প্রজায় প্রতিপালক ও প্রতিপাল্য সম্বন্ধ থাকিবে না! রাজার পক্ষে প্রজারঞ্জন প্রজার পক্ষে রাজভক্তি ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে না! দরবারে যাইয়া রাজাকে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা বলিয়া সেলাম কর ও ঘরে আসিয়া বলিও——!!! ইহা না করিলে দেশের মঙ্গলের 'নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'! এক কথায় ধর্ম্মের ও প্রগাঢ় প্রীতির মসলা দিয়া তুমি যে মহারত্নমণ্ডিত রাজমহলটী এতকাল ধরিয়া গড়িয়া তুলিয়াছ সেটাকে চূর্ণ করিয়া তাহার স্থানে রঙ্গিন কাচে সাজান ঠিক বিলাতের মত একটি 'টৌউন হল' খাড়া কর!

প্রাচ্য জাতিটা যে চিরকালই রাজপরতন্ত্র থাকিতে চাহিবে অর্থাৎ দিল্লীশ্বরকে জগদীশ্বর আর প্রজাতন্ত্রটা দিল্লীকা লাড্ডু বলিয়া জানিবে তাহার প্রমাণ জাপান ; অত বড় যে জাতি, যাঁহার পদতলে বসিয়া এখন এক শতাব্দী ধরিয়া আমরা জাতীয়তা শিক্ষা করিতে পারি, তিনি এখনও দেশের রাজাকে আমাদেরই মত দেবতার অংশ বলিয়া উপাসনা করেন ; সেখানে রাজা যখন পথে বাহির হন তখন প্রজাবৃন্দ আমাদেরই মত শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া থাকে এবং সে সময়ে যদি কোন খাস বিলাতি সাহেব নিজের বাটীর বারান্দায় টুপি মাথায় দাঁড়ায় তবে জনসাধারণ তাহার ঘাড় ধরিয়া নীচে নামাইয়া, 'রাজা সকলের উপরে' এই বাক্যটি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেয়। সুশিক্ষিত জাপানীর মুখে শুনিয়াছি যে সম্রাটের মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিতেও তাহাদের সাহস হয় না এবং ঘরে ঘরে সম্রাটের মূর্ত্তি বুদ্ধদেব ও পিতৃগণের সহিত সমানে পূজিত হয়। বিলাতি মতে প্রজাতন্ত্রতা সাধন না করিলেও যে আমাদের সদ্‌গতির আশা আছে এটা জাপানকে দেখিয়া বেশ বিশ্বাস হইতেছে।

পরে প্রবন্ধকার দেশের ধনবৃদ্ধি ও শিল্পকলার উন্নতি কল্পে আমাদের দীর্ঘকাল য়ুরোপ, আমেরিকায় শিক্ষালাভ করিতে পাঠাইতে চাহেন এবং সেখানে জাতি রাখা অসম্ভব বলিয়া ভট্টাচার্য্যগণকে বর্ণাশ্রম প্রথা ও জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দিতে বলেন ও তাহার পরিবর্ত্তে বিদেশী আচার অর্থাৎ কতকগুলি অনাচারের প্রবর্ত্তন করিতে বলেন। আচারবান রহিয়া ও বর্ণাশ্রম বজায় রাখিয়া বাণিজ্যের উন্নতি, স্বদেশী জাহাজ ও পুত্রটির বিলাত যাত্রার বন্দোবস্ত কিরূপে করেন, ভাবিয়া প্রবন্ধকার ব্যাকুল হইয়াছেন ; মাথা যদি না থাকিত তবে মাথার বেদনাও থাকিত না, কিন্তু মাথা আছে অতএব সেটাকে বকাইতেই হইবে—পুত্র আছে সেটিকে বিলাত পাঠাইতেই হইবে এইটাই যদি সাব্যস্ত হয় তবে বিলাত হইতে ফিরিয়া কিঞ্চিৎ গোময় ও গঙ্গাজলের ব্যবস্থার কোন আপত্তি না করিলেই ত সকল গোল মিটিয়া টিকিরও সম্মান বজায় থাকে টাকারও অভাব থাকে না! অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ সকলে সকল রকমেরই বিধান যখন আছে তখন বিশেষ ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণ সন্তান বাণিজ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া যে পতিত হন নাই এবং সেটা যে ভট্টাচার্য্যগণের অনুমোদিত সহরের 'ভট্টাচার্য্য কোম্পানীই' তো তাহার প্রমাণ! ভট্টাচার্য্যগণের বুকে বসিয়া টিকি উপড়াইতে গেলে আপত্তির আশঙ্কা আছে কিন্তু পাকা চুল গুলি বাছিয়া তুলিলে কিম্বা পুরাতন গামছা খানা ফেলিয়া নূতন গামছার বন্দোবস্ত করিলে তাঁহারা কখন আপত্তি করেন নাই করিবেনও না। বিলাত যাইলে যে ধনবৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়া থাকে দেশে থাকিলে সেটুকু হইবার উপায় নাই এটাও হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, কেন না দেখিয়াছি আমাদের পিতামহগণ এই দেশে বসিয়া, ধর্ম্ম কর্ম্ম, আচার বিচার বজায় রাখিয়া, তুযুক মুড়ি দিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে বেশ ধনবৃদ্ধি করিয়া গেছেন? যাহা আমরা বিলাত গিয়া হাটকোট পরিয়া, টম্ টম্ হাঁকাইয়া করিতে তো পারিতেছিই না! বরং সেকালের সঞ্চিত ধনের অধিকাংশ সাহেবিয়ানার বকামিতে উড়াইতে বসিয়াছি!

আজ কাল বিলাতে গিয়া শিক্ষালাভের একটা ঝোঁক আমাদের ঘাড়ে চাপিয়াছে! আমরা কাপড় বুনিতে শিখিব সেজন্য বিলাতে শিক্ষালাভ করিতে চলিয়াছি। আমরা কামার হইব, ছুতার হইব, জুতা সেলাই করিব, চণ্ডীপাঠ করিব, বিজাতি শিক্ষার প্রয়োজন! ধান বুনিতে ধান ভানিতে সেই শিবের গীত 'বিলাত'! আমি জিজ্ঞাসা করি, আমাদের ঘরের পাশে ঢাকা, শ্রীরামপুর, কাশী, কাশ্মীরের

জগৎ বিখ্যাত তাঁতশালা সকল থাকিতে পুত্রটিকে ম্যান্‌চেষ্টার পাঠাইতে যাই কেন? এই মৃতপ্রায় শিল্পগুলার চর্চ্চা করিয়া সেগুলাকে পুনর্জ্জীবন প্রদান করার অর্থ কি দেশের শিল্পোন্নতি নয়? দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, জয়পুর, কটকের যে সকল আশ্চর্য্য শিল্প পাশ্চাত্যের চক্ষে আজিও অভিনব, বিস্ময়কর, অনুকরণের অসাধ্য বলিয়া গণ্য হইতেছে সে গুলাকে পায়ে ঠেলিয়া আমরা চলিয়াছি, ইতালী, প্যারিস, ইংলণ্ড, আমেরিকার শিল্প বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে! এটা কি কম আক্ষেপের বিষয়! উন্নতির পথ কি এই? ম্যানচেষ্টার আমাদিগকে সস্তা মালের বস্তা বাঁধিতে শিখাইতে পারে কিন্তু সস্তার তিন অবস্থা হইতে রক্ষার উপায় সে জানে না। ইতালী আমাদের oleograph প্রণালীতে তৈয়ারি করিবে বটে, কিন্তু প্রাচ্য শিল্পের মোহিনী মন্ত্রটা শিখাইবার ক্ষমতা এবং অধিকার তাহার তো নাই! জার্ম্মাণি জার্ম্মাণ উলে কাঁচা রঙ্গে নকল কাশ্মীরি শাল কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় যেন দেখাইয়া দিল কিন্তু শত বর্ষেও একখানা যথার্থ কাশ্মীরী শাল ভারতবর্ষের পরিবর্ত্তনশীল জলবায়ুর উৎপাত সহ্য করিয়া পোকা মাকড়ের হাত এড়াইয়া কেমন করিয়া কোন দ্রব্যগুণে যে চিরকাল টাট্‌কা থাকে এ রহস্যটুকু কি আজও জানিতে পারিল? ভারতবর্ষ যে আজও রত্নের ভাণ্ডার বলিয়া পাশ্চাত্যের নিকট লোভনীয় এটা কি আমাদের বিলাত গিয়া শিল্প শিক্ষার ফল! পাশ্চাত্যের সঙ্গে সওদাগরী জুয়াচুরিতে টক্কর দিতে না গিয়া খাঁটি মাল লইয়া বাজারে দাঁড়ানই ঠিক, নচেৎ আমাদের 'নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'। আমরা বছরকতক বিলাতে গিয়া শিল্পাচার্য্য হইয়া ঘরে ফিরিতে চাহিতেছি কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমাদের চাষার সঙ্গে চাষা, তাঁতির সঙ্গে তাঁতি, মাঝির সঙ্গে মাঝি হইয়া বহুকাল কাটাইতে হইবে ও বর্ণ অনুসারে বিভিন্ন শিক্ষালাভ করিতে হইবে, তবেই আমরা যথার্থ উন্নতি করিতে পারিব। বর্ণঅনুসারে শিল্প চর্চ্চাটা যে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন এ কথাটা ভট্টাচার্য্যগণের অনুমোদিত বলিয়া এই উন্নতির যুগে পাছে আমাদের মনোমত না হয় সে জন্য ভারতশিল্পের যথার্থ হিতৈষী, সরকারি শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, খাস বিলাতি Mr. Havell এর পত্রাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল:—

...I have not yet heard of any organised effort to give direct practical help to the weavers themselves and yet they are the people that must be helped if any practical result is to be got out of "Swadesi." Schools are all very well but unless you can get the weavers to come to the schools and to use the improved looms you are only creating a new class of weavers to compete with the old ones......nothing is gained by new power loom mills except putting money into the pockets of a few share-holders (or taking money out of them) and reproducing the same disgusting conditions as in power-loom Mills in Europe......Swadesi will be utterly discredited if it does not keep a higher ideal before it than that of mearly imitating Western whitakarism. I hold firmly to the belief that morality in manufacture as in other things pays in the long run.

অতএব সনাতন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া বড় বড় ভাগবত ব্যাপারে বিলাতের অনুকরণ করিতে যাই কোন সাহসে!

আমরা ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছি। এখন স্বদেশীয়তার তপ্ত-তৈল-কটাহের ব্যবস্থা আমাদের সহিতেই হইবে। জাতীয় উন্নতির ছুতা করিয়া পিছাইলে আমাদের পূর্ব্ববল ফিরিয়া পাইবার আশা নাই। নৌকা ঝড়ে পড়িলে কূলের দিকে ফিরিয়া আসাই শ্রেয়, অগ্রসর হইতেই হইবে বলিয়া বাণের মুখে নৌকাটাকে ডুবাইয়া লাভ কি?

অতঃপর প্রবন্ধকার বলিতেছেন—স্বদেশভক্তি, প্রজাতন্ত্রতা, বর্ণনির্ব্বিশেষ বাণিজ্যাদি সেবা, দেশান্তরগমন, এই সমস্ত বিষয়ে যদি আমরা সনাতন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয়ের অনুকরণ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি, যদি এই সকল বড় বড় ভাগবত ব্যাপারে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট ঋণী হইতে সম্মত হই, তবে পরিচ্ছদাদি সামান্য বহির্ব্বিষয়ক ব্যাপারে অনুকরণ কি মহাপাতক বলিয়া সাব্যস্ত হইবে? 'পশ্চিমের হাতিই যদি গলিয়া গেল, তবে মশা গুলিকে লইয়া এত টানাটানি কেন'?

দেখিয়া শেখা অপেক্ষা ঠেকিয়া শেখার ফল অধিক; পশ্চিমের ছুঁচটি গলাইতে দিয়া যে বিষম শিক্ষা লাভ হইয়াছে এখন সেদিকের হাতি কেন, মশাটি পর্য্যন্ত গলিতে দিতে আর তো সাহস হয় না। বিলাতি 'অপকার্য্যগুলা' সমাজের নগণ্য অংশের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলে তো কোন গোলই ছিল না। কিম্বা এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গরম হ্যাটকোট পরিয়া গরম গরম খানা খাইয়া আমার 'চিনির বলদগুলি' যদি গলিতে

চাহিতেন এবং দেশে নূতন একটা ক্ষীরোদ সাগরের সৃষ্টি করিতেন, তাহাতেই বা আপত্তি ছিল কি? কিন্তু যখন দেখিতেছি যে আমার 'প্রিয় বলদগুলি' বিলাতি কম্বল মুড়ি দিয়াই গলিতে চাহিতেছেন ও বিলাতি কম্বলটা চিনিটুকুও শুষিয়া লইবার উপক্রম করিতেছে তখন পরিচ্ছদাদি বহির্ব্বিষয়ক ব্যাপারটা সামান্য হইলেও গুরুতর সমস্যাই হইয়া দাঁড়ায়। প্রবন্ধকার হ্যাটকোটটাকে যতটা নিরীহ ভাবিয়া উন্নতির কূলে উত্তীর্ণ হইবার সহায় স্বরূপ আমাদিগকে ধারণ করিতে বলিতেছেন, আমরা কিন্তু সেটাকে সেরূপটা ভাবিতে পারিতেছিনা। বিলাতি কম্বল যে ধরিব সেটা যদি 'কম্লী' হইয়া পড়ে এবং আমাকে ছাড়িতে না চাহে তবে উপায়? জাপান বলবান জাতি 'কম্লীর' মত দু'শটার ভার বহন করিতে পারে এবং ইচ্ছামত সে ভার স্কন্ধ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতেও পারে, ফেলিয়াছেও বটে; কিন্তু পক্ষাঘাতে অশক্ত আমাদের বক্ষে 'কম্লী' চাপিলে কি কম বিপত্তিটা ঘটিবে!

প্রবন্ধকার সমস্ত ভারতবাসীর জন্য এক পোষাক আবিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন এবং ইংরাজি ভাষার ন্যায় পাশ্চাত্য পরিচ্ছদটাও চালাইয়া লইতে আমাদের পরামর্শ দিতেছেন। ফিরিঙ্গী সমাজে ফিরিঙ্গী বলিয়া চলিয়া যাইতে অথবা রেলওয়ে কুলির নিকট সাহেব বলিয়া সেলাম পাইতে প্রবন্ধকারও এ ব্যবস্থাটা করিতে চাহেন না নিশ্চয়। তাঁহার মনোগত ভাবটা বোধ হয় যে অনেকে ইংরাজি ভাষা শিক্ষার দরুণ আমরা যেমন পরস্পরে পরিচিত হইবার সুবিধা পাইয়াছি তেমনি পরিচ্ছদটা সাহেবি হইয়া গেলে ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া আমাদের চিনিয়া লইতে আর কাহারও গোল হইবে না; অর্থাৎ আমরা যে সাহেব নয় ভারতবর্ষীয়, এটা আমাদের হ্যাটকোট কলার নেক্টাই ও সেই সঙ্গে ইংরাজি বুলির ঝঙ্কারটায় অতি সহজে বুঝিয়া লও; রং দেখিয়া ভ্রম করিও না যে আমরা সুশিক্ষিত কাফ্রি, উন্নত জাপান, কিম্বা তোমাদেরই কোন জাত ভাই; জানিও আমরা এক ভারতবর্ষীয় জাতি! ধর্ম্মে এক না হই, কর্ম্মে এক না হই, হিন্দু মুসলমানে, খোট্টাতে বাঙ্গালীতে, পার্সিতে মান্দ্রাজীতে, বিবাহ প্রভৃতি চালাই না চালাই, তবু জানিও আমরা এক! ধুতি চাদরে পাগড়িতে কিম্বা নাগরায় আমাদের ভারতবর্ষীয় বলিয়া জানিতে তোমাদের কষ্ট হইত এখন সে গোল মিটিয়া গেল! এবার যদি ভুল কর তো সে অপরাধ অমার্জ্জনীয়!

হায়! হ্যাটকোটের এতগুণ যদি আগে জানিতাম! এখন ইচ্ছা করিলেও জাতিবর্ণ প্রভৃতি কুসংস্কারগুলার হাত এড়াইতে পারিব না। কেমন একটা বিশ্বাস জন্মাইয়া গেছে যে, কাক তাহার কালোপাখার কোট লইয়া আর ময়ূর তাহার চিত্র বিচিত্র পেখম উড়াইয়া বেড়াইলেই মানায় ভাল, সেইটাই তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। নচেৎ ময়ূর যদি বলে 'আমি ময়ূরজাতি না পক্ষিজাতি' এবং পাখনা ছাড়িয়া কাক-পরিচ্ছদ ধরে ও কাক সে ছুতায় বক হইয়া দাঁড়ায়, বকটা চিল, চিলটা ঈগল পক্ষি, গোরুটা চতুষ্পদ খানার টেবেল, মানুষটা দুই ঠেঙ্গে আর একটা কিছু হইয়া পড়ে, তবে বিষম প্রলয় উপস্থিত হইবে। 'প্রলয় পয়োধিজলে' জগৎ শুদ্ধ একাকার দেখিবার যদি বাসনা থাকে তবে প্রবন্ধকারের সে সাধু ইচ্ছায় আমি বাধা দিতে চাহি না; কিন্তু বলিয়া রাখি যে, সে সময় তাঁর বড় সাধের ভারতবর্ষীয় জাতিটাকে সহস্র চেষ্টাতেও খুঁজিয়া পাইবেন কি না সন্দেহ; 'এত বড় যে জাপান' তাঁহাকেও উদ্ধারের জন্য নেহাৎ সাবেবি যজ্ঞের বরাহটার শরণ লইতে হইবেই হইবে 'নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'। জাপান যে একথাটা একেবারে বোঝে নাই এটা বলিতে পারিলাম না, কেন না আমার কোন জাপানি বন্ধুকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করিয়া আমি বড়ই ঠকিয়াছি:—

মিষ্টার মুখার্জ্জির লিখিত মত আমি আমার উচ্চশিক্ষিত জাপানি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বিদেশীয় জ্ঞান, বিদেশীয় শিল্পশিক্ষা, তথা রাজনীতি, তথা যুদ্ধ কৌশল, এই সমস্তের জোরেই তোমরা এত বড় যুদ্ধটা জিতিয়া ফেলিলে এবং তোমরাও যে একটা কেও কেটা নও এ কথা প্রমাণ করিতে পারিলে; নচেৎ আমরা তোমাদের নামও শুনিতে পাইতাম না?' লোকটা হাসিয়া উত্তর দিল, "এটা তোমাদের ভারি ভ্রম। তাই যদি হয় তবে 'রুষ' তো আমাদের সহজেই হারাইয়া দিতে পারিত। কেন না 'রুষ' যতটা ইউরোপীয় জাপান নিশ্চয়ই ততটা নয়"?

আমি বলিলাম "তবে তোমরা নিজের পরিচ্ছদ ছাড়িয়া সাহেবি পোষাক পরিলে কেন!" সে বলিল "এ কথা কে

বলে ? যদি তুমি জাপান যাও তবে দেখিবে, বারো আনা লোক সেখানে দেশীয় পোষাক ব্যবহার করে। একদল লোক আছে বটে যাহারা 'হ্যাটকোটের' পক্ষপাতি, তাহারা বিলাত ফেরত, জাপানে তাহাদের 'বিলাতি জ্বরগ্রস্ত কহে'। জাপানে লোক আফিসে যাইতে সাহেব সাজে বটে কিন্তু ঘরে আসিয়া যে জাপানি সেই জাপানিই হয়! এমন কি জাপান-সম্রাট জীবনে অধিকাংশ সময় জাতীয় সাজে থাকেন।"

জাপানি বন্ধুবরের কথায় বুঝিলাম যে জন্মদিনে, পিতৃ শ্রাদ্ধে, বিবাহে, অশৌচ অবস্থায় সে সাহেব সাজে না, কিম্বা সে সাজে কাহারও বাড়ি উপস্থিত হইয়া অভদ্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে না।

'পরিচ্ছদে স্বদেশী হও, সর্ব্ববিষয়ে স্বদেশী হও, এমন কথা জাপানে কেহ বলেন কি না', এ কথার উত্তরে বন্ধুবর ইউরোপ প্রত্যাগত জাপান রাজদূত, অধুনা শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ ঘোরতর স্বদেশী S. Makimono মহোদয়ের নামোল্লেখ করিয়া আমাকে একেবারে নিরুত্তর করিয়া দিলেন! অধিক প্রশ্ন করিতে সাহস করিলাম না; কিন্তু মনে মনে বুঝিলাম যে জাপানের যত কিছু বল বুদ্ধি তার স্বোপার্জ্জিত, স্বদেশজাত, ধার করা নয়, ভিক্ষা করাও নয়।

ধুতি চাদরের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। কেবল এই মাত্র বলিতে চাই যে কোট-প্যান্ট আঁটিয়া গুণ্ডামি করাটাই জীবনের চরম লক্ষ্য নয় ও গুণ্ডামি করিতে চাহিলে ধুতি চাদরেও যে সেটা বেশ চলে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বড়বাজারে এক রাত্রি ঘুরিয়া আসিলেই প্রবন্ধকার সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বিলাত ফেরত বাঙ্গালী ধুতি ধরিলে সেটা 'পরিবর্ত্তন' নয় 'প্রত্যাবর্ত্তন'; যে বেশটা চিরকাল পরিয়া আসিলাম সেটা ছাড়িয়া হ্যাটকোট ধরারই নাম 'পরিবর্ত্তন' এবং সেটা দেখিয়া দুঃখ হয় বলিয়াই বলি 'ধুতি চাদর ছাড়িয়া হ্যাটকোট ধরিও না'; প্রবন্ধকারের শুনিবার ভুল। 'হ্যাটকোট ছাড়িয়া ধুতি চাদর ধর' এরূপ বলিতে যাইব কেন? যখন জানি আমরা বাঙ্গালী।

প্রবন্ধকার ambassador হইবার, Buckingham Palaceএ State Ballএ যাইবার য়ুরোপীয় জাতিকে সৈন্য সাহায্য করিবার স্বপ্ন দেখিতে চাহেন দেখুন; আমরা এইটুকু জানিয়াই ক্ষান্ত যে, আমাদের যাহা সত্য যাহা শিব তাহা আপনা হইতেই বজায় থাকিবে, অসত্য ও অশিব চির কালই আমাদের সহিত ছায়ার ন্যায় বর্ত্তমান রহিবে—যেমন সকল দেশেই আছে—সে জন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন এখন এই যে উন্নতির পথ ভাবিয়া আমরা যে অধঃপাতের মুখে অগ্রসর হইয়াছি সেইটা হইতে প্রথমে পুরাতনের ক্রোড়ে ফিরিয়া আসা ও বিদেশীয় feeding bottleএর পরিবর্ত্তে মাতৃ দুগ্ধ পান করিয়া আপনাকে সবল করিয়া তোলা। অধিক জানার পূর্ব্বে এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট যে আমরা মায়ের অবাধ্য সন্তান ঘরে যদি না ফিরি তবে মা কেমন করিয়া আমাদের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিবেন!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বামী স্বরূপানন্দ।

কবি নদীর স্রোতের সহিত কালের গতির তুলনা করিয়াছেন। পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীকুলের প্রচণ্ড নির্ঘোষে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে উল্লম্ফন, এবং প্রস্তরভেদী অমিত প্রতাপ দেখিলে কথা কতক সত্য বলিয়া মনে হইলেও কালস্রোতে যে অভাবনীয় অচিন্তনীয় আমূল পরিবর্ত্তন-রাজি আমাদের ভিতর সহসা উপস্থিত হইয়া থাকে, সে সকল নদীবেগে কোথায়? আবার মনুষ্যমনের উপর কালের যে অদ্ভুত আধিপত্য, তাহার সাদৃশ্যও নদীবেগে কিঞ্চিন্মাত্র অনুভূত হয় না। মুহূর্ত্তমাত্র কখন কখন বৎসরেরও অধিক বলিয়া মনে হইয়া থাকে। আবার কয়েক বর্ষ কাল যেন দুই চারি দিন মাত্র বলিয়া মনে হয়। দুঃখনিশার চিরস্থায়িত্ব এবং সুখের দিনের আস্বাদন পাইতে না পাইতে সহসা অবসান কে না জীবনে অনুভব করিয়াছে? অতএব হে কালশক্তি! তুমি ক্ষুদ্র মনুষ্যকুলের সসীম পরিমাণ গণনার পারে অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্মের সহিত অখণ্ড স্বরূপে নিত্য বিরাজিতা থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ডগোলকান্তর্গত যাবতীয় নামরূপ ক্রীড়াচ্ছলে ইচ্ছামত ভাঙ্গিতেছ গড়িতেছ, আবার কখন বা কিছুকাল আপাতঃ স্থির রাখিয়া মনুষ্যকুলকে অনিত্যে নিত্য

অনুভব করাইয়া অট্টাট্টহাসে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিতেছ। আবার যথার্থ শরণাগত বিরল কাহাকেও বা সর্ব্বপ্রকার নামরূপ ও পরিণামের শ্মশান মধ্যগত নিত্যসুন্দর নিজ কমনীয় কান্তি প্রদর্শনে ধন্য করিয়া কালীনামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছ! হে চণ্ডী! তোমার মোহিনী মায়ায় কতই না নামরূপের সহিত এ জীবনে সংযোগ হইল! সে সকল এখন কোথায়? বিচিত্র মুক্ত কেশপাশে আবরিত করিয়া সে 'পরাণ-পুতলি' সকল কেমনে কোথায় লুক্কায়িত রাখিয়াছ? আজ নয়বৎসর যাহার সহিত সম্বন্ধে উল্লাসিত রাখিয়াছিলে সে বিচিত্র গুণরাজির বিচিত্র সমাবেশস্থল স্বরূপানন্দকেই বা আজ সহসা কোথায় লুক্কায়িত করিলে?

সে আজ নয় বৎসরের কথা। তখন পুণ্যপ্রতাপ স্বামী বিবেকানন্দ অদ্ভুত গুরুশক্তি বিস্তারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশ সমূহ চমকিত করিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী বেলুড় গ্রামে শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে গুরুভ্রাতাকুল এবং শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" শিক্ষা প্রদানে নিযুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমান মঠবাটীর নির্ম্মাণ তখনও আরম্ভ হয় নাই জমীমাত্র ক্রীত হইয়াছিল, এবং ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে সমাগত স্বামীজীর কয়েকটি ভক্ত 'ধীরা মাতা' 'নিবেদিতা' এবং 'জয়া' সেই জমীস্থ ভগ্ন বাটিকায় অবস্থান করিতেছিলেন। ধর্ম্মপিপাসু কতই না মানব সে সময় স্বামিজীর প্রভাবে নিত্য আকর্ষিত এবং কৃপালাভে ধন্য হইয়া নবীন জীবন লাভ করিতেছিল! বৈশাখের—অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসের? অপরাহ্ন। স্বামিজী গৈরিক বসন পরিধান করিয়া নিম্নতলস্থ গৃহ নিজপ্রভায় আলোকিত করিয়া উপবিষ্ট। অনেক গুলি লোক কলিকাতা হইতে সমাগত। তাহারা সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধর্ম্মসংক্রান্ত নানা কূট প্রশ্ন উত্থাপিত করিতেছিল এবং সে সকলের সদুত্তর লাভে আপ্যায়িত এবং অবাক হইতেছিল এবং ভাবিতেছিল "এরূপ অপূর্ব্ব জ্ঞানের কথা, ভাবের কথায় এরূপ জলন্ত অগ্নিময়ী অন্তঃস্থলস্পর্শী ভাষাপ্রয়োগ তো পূর্ব্বে অন্য কোথাও শুনি নাই! ভগবন! এ-সৎপুরুষের সঙ্গ যেন বহুকাল লাভে ধন্য হইতে পারি!" কয়েক ঘণ্টা ঐরূপ বাক্যালাপের পর অনেকে বাটীর বাহিরের উদ্যানে পরিভ্রমণ, শ্রীরামকৃষ্ণের পাদুকাদি দর্শন বা তামাকু সেবনাদি করিতে উঠিয়া গেল। কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলীমধ্যগত ষড়বিংশতি বর্ষ বয়স্ক কৃশ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ব্রাহ্মণ যুবক অন্য সকলের সহিত বাহিরে না যাইয়া একান্তে অবস্থিত স্বামিজীর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিল এবং সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। তাহার স্থির উজ্জ্বল নয়নে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির এবং আলাপে বিদ্যা, বিনয়, ধৈর্য্য, অমায়িকতা এবং যথার্থ ধর্ম্মজীবন লাভের দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় পাইয়া স্বামিজী আনন্দিত হইলেন এবং তাহাকে মঠে অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। সদ্‌গুরু সচ্ছিষ্যলাভে উল্লসিত হইলেন।

পরে জানিলাম ঐ যুবকের নাম অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়, বাটি ভবানীপুর এবং তত্রস্থ অনেক সদনুষ্ঠান তাঁহার এবং তৎসহযোগী আমাদের বন্ধু, বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। শুনিলাম ভবানীপুর চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ইঁহাদের যত্নে নিযুক্ত হইয়া সমাগত জনগণকে ব্যাকরণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে শিক্ষাদান করিতেছেন। ঐ-চতুষ্পাঠীর ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য নিয়মিত কালে চাঁদা সংগ্রহ হয় এবং "উষা" (Dawn) নামক একখানি মাসিক পত্রও ইঁহার দ্বারা কয়েক বৎসর হইতে সম্পাদিত হইয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভে সমর্থ হইয়াছে, এবং ঐ পত্র হইতে যাহা উপস্বত্ব হইতেছে তাহাও ঐ চতুষ্পাঠীর শিক্ষকের বেতন প্রদান, শাস্ত্র-গ্রন্থাদি ক্রয় এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহে নিয়োজিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান বিস্তার ব্যতীত তৎপ্রদেশস্থ ছাত্রজীবনের সংস্কারও ঐ সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য এবং তদর্থ নিয়মিত কালে সভা আহুত হইয়া তদুপযোগী বক্তৃতা, সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ, কথোপকথন এবং সদালোচনাদিও নিয়মিত রূপে হইয়া আসিতেছে। আরও জানিলাম অজয়হরির মানসিক তেজ, উদ্যম এবং অধ্যবসায় অদ্ভুত হইলেও শরীর বহুবর্ষব্যাপী অজীর্ণ রোগাক্রান্ত এবং তজ্জন্য কঠিন পরিশ্রমে অপটু। সময় সময় হৃদ্‌গতির আতিশয্য নিবন্ধন কষ্টও পাইয়া থাকেন, এ কথাও যেন শুনিয়াছিলাম।

* * * *

গুরু বলিলেন "অজয়হরি, সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম রক্ষা করিতে পারিবে তো? সাপের মুখে যাইতে বলিব, বাঘের মুখে

যাইতে বলিব, অগ্ন্যুদ্গারী তোপের মুখে যাইতে বলিব—নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও বিচার মাত্র না করিয়া অবিচলিত হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে হইবে। সুখাভিলাষী হইলে হইবে না। কাম-কাঞ্চনের সম্বন্ধ মাত্র রাখিতে পাইবে না। হৃদয়ের মমতা খণ্ড খণ্ড করিয়া বিসর্জ্জন করিতে হইবে। 'অভিমানং সুরাপানং গৌরবং ঘোর রৌরবং প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা'—মানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। 'গুরুদেবো' 'আত্মদেবো' হইয়া 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' জীবন যাপন করিতে হইবে। পারিবে তো? জানিয়া শুনিয়া অগ্রসর হও—নতুবা এখনও নিরস্ত হইয়া সংসারে যেরূপ সদ্ভাবে এতদিন কাটাইয়া আসিয়াছ সেই ভাবে আমৃত্যু থাক।" অজয় তাহাতে প্রস্তুত—কিছু মাত্র বিচলিত নহে!

অমাবস্যার নিশা অবসান প্রায়। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত জগৎ অধিকার করিয়া ক্ষণেকের জন্য মানবের অস্থির মনকে স্বীয় প্রভাবে স্থির করিয়া ভগবৎপ্রেমের পবিত্র নীরে আপ্লুত করতঃ বর্ত্তমান। গুরু বিরজা হোম সমাপন করিয়া হাসিতে হাসিতে দণ্ডায়মান হইলেন। শঙ্করাদি ভারতের যাবতীয় আচার্য্য এবং ঋষিকুল পবিত্রীকৃত জ্ঞানবৈরাগ্যে সমুজ্জ্বল গৈরিকবসনে শোভিতকায় মুণ্ডিতশির ভস্ম ও তিলকে শোভিতললাট শিষ্যও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন। স্বামিজী সচ্ছিষ্যকে সস্নেহে উঠাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে চিরদিনের মত সমর্পণ করিলেন। জগতে অজয়-হরির মৃত্যু হইল এবং স্বামি স্বরূপানন্দ নবীন জীবন লাভ করিয়া প্রফুল্লমুখে মন্দির হইতে নির্গত হইলেন! দেখিলেন উষার রক্তিমচ্ছটায় পূর্ব্বগগন উদ্ভাসিত হইয়াছে, স্বামিজী তানপুরা মিলাইয়া অপূর্ব্ব স্বরলহরীতে গৃহ পূর্ণ করিতেছেন এবং শ্রীমন্দিরে ঠাকুরের মঙ্গল আরতি আরম্ভ হইয়াছে।

অপরাহ্ণে "ধীরা মাতা" প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া স্বামিজী বলিলেন "We have made an acquisition today," অদ্য আমরা একটি রত্ন লাভ করিয়াছি! মঠাধ্যক্ষ গুরুভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "স্বরূপের শরীর খারাপ। ডাল চচ্চড়ি সহিবে না। দুগ্ধের বন্দোবস্ত করিয়া দিও।"

* * *

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ এপ্রেল মাস। স্বামিজীর অনুগত ভক্ত কাপ্তেন সেভিয়ার সহধর্ম্মিণীর সহিত আলমোড়ায় অবস্থান করিতেছেন। কলিকাতায় দারুণ গ্রীষ্ম—স্বামিজীর শরীর-ও ভাল নয়। আলমোড়ায় যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিল। স্বামিজী সম্মত হইলেন এবং বলিলেন "তুরীয়ানন্দ ও সদানন্দ আমার সঙ্গে চলুক। স্বরূপের শরীর খারাপ—সেও চলুক। ওখানে কিছুদিন থাকিয়া নিবেদিতা জয়া ও ধীরামাতার সহিত আমি কাশ্মীরে যাইব।" লালা বদ্রি সাহের "টম্‌সন্ হাউস" নামক বাঙ্গালায় সকলে ১৬ই মে তারিখে উপস্থিত হইলেন।

১০ই জুন তারিখে—অথবা কয়েক দিন পরে?—মান্দ্রাজ হইতে সংবাদ আসিল "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকার শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক, রাজম্ আয়ার সহসা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কাগজ চলা দায়, কারণ উপযুক্ত লোকাভাব। স্বামিজী উক্ত কাগজের ভার গ্রহণ করিবেন কি?

স্বামিজী কাপ্তেনকে ডাকিয়া বলিলেন "সেভিয়ার! তুমি ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত কার্য্য করিবে বলিয়াছিলে। বাঙ্গালার জলবায়ু এবং গ্রীষ্ম তোমার সহ্য হওয়া অসম্ভব। অতএব তুমি আলমোড়ার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে থাকিয়া 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা চালাইবার ভার গ্রহণ কর না কেন? কাগজ খানির তিন সহস্রেরও উপর গ্রাহক সংখ্যা হইয়াছে। এবং আমারই পরামর্শে উহা প্রথম মুদ্রিত হইয়া ক্রমে বেদান্ত-জ্ঞান-বিস্তারের বিশেষ যন্ত্র স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আমার ইচ্ছা নয় যে উহা বন্ধ হয়। উপযুক্ত সম্পাদকও আমি তোমাকে দিতেছি। স্বরূপানন্দ স্বামির ও বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং তোমার সাহায্যে সে অনায়াসে উহা চালাইতে পারিবে"। সেভিয়ার সম্মত হইলেন এবং সেই দিন হইতে "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকা সম্পাদনের ভার স্বরূপানন্দ গ্রহণ করিলেন। স্বামিজীও উক্ত পত্রিকার বন্দোবস্ত করিয়া কাশ্মীর যাত্রা করিলেন।

কাপ্তেন সেভিয়ার কাগজের ভার লইয়া অবধি একটি উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া অবশেষে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আল-মোড়া সহর হইতে ৪৮ মাইল দূরে "মায়ীপট অথবা মায়াবতী" নামক স্থান ক্রয় করিয়া তথায় নিজ বাসস্থান, স্বামিজীর থাকিবার নিমিত্ত মঠবাটী এবং "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকার

প্রবাসী।



স্বামী স্বরূপানন্দ

Kuntaline Press, Calcutta.

ছাপাখানা এবং তৎসংক্রান্ত লোক জনের থাকিবার ঘরদ্বার নির্ম্মাণ করিয়া কাগজ চালাইতে লাগিলেন। কাপ্তেন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বরূপকে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং স্বরূপও সে পিতৃস্নেহের কখন অবমাননা করেন নাই। হিমাচলের মঠের ভার স্বরূপের উপরেই অর্পিত হইল।

* * * *

স্বরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন চতুঃপার্শ্বস্থ জনগণ ভীষণ দারিদ্র্য এবং অজ্ঞানে নিপতিত। হিমাচলের অতুল উর্ব্বর ক্ষেত্রে বাস করিয়াও উহাদের অন্নাভাবে শীর্ণ কায়, পরিধানে ছিন্ন চীর! উপনিষদের অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান তো দূরের কথা সামান্য নীতি বা গৃহধর্ম্মের কথা তাহাদিগকে শুনায় অথবা কৃষি ও অর্থাগমের উপায় কহিয়া যাহাতে তাহাদের কথঞ্চিৎ দুঃখ দূর হয় সে ব্যবস্থা করে, রোগে প্রপীড়িত হইলে সহানুভূতি করিয়া ঔষধাদি প্রদান করে, অথবা তাহাদের অসহায় অপোগণ্ড বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেয়—এরূপ লোকেরও একপ্রকার সম্পূর্ণাভাব! সর্ব্বভূতজননী দয়া তাঁহার হৃদয়ে উপবেশন করিলেন। স্বরূপ পত্রিকা সম্পাদন ব্যতীত বদ্ধপরিকর হইয়া লোকহিতকর নানা অনুষ্ঠানে অহর্নিশি ব্যাপৃত হইলেন। বিগত আট বৎসরে তাঁহার অপূর্ব্ব উদ্যমে যে সকল সদনুষ্ঠানের প্রারম্ভ হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া অসম্ভব। আমরা সে সকলের সংক্ষেপ আবৃত্তি মাত্র করিয়াই নিরস্ত থাকিব।

১ম। মঠস্থ স্বদেশী ও বিদেশী (পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে সমাগত) ব্রহ্মচারী এবং তরুণ সন্ন্যাসীদিগকে বিদ্যা এবং ধর্ম্মশিক্ষা দান এবং অদ্বৈতজ্ঞান সাধনায় নিযুক্ত রাখা।

২য়। পাশ্চাত্য প্রদেশাগত ম্যাকোনেল সাহেবের সহায়ে কৃষির উন্নতি ও তৎপ্রচারের চেষ্টা।

৩য়। হিমাচলে বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা।

৪র্থ। পাহাড়ী বালকদিগের ভিতর বিদ্যাবিস্তারের জন্য মায়াবতীতে এবং সোর নামক গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ।

৫ম। মায়াবতীতে দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন।

৬ষ্ঠ। নৈনিতাল, আলমোড়া প্রভৃতি স্থানে মধ্যে মধ্যে গমন করিয়া পর্ব্বতবাসীদিগকে বিদ্যা ও ধর্ম্মশিক্ষা দান।

৭ম। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজপুতানায় কিষণগড় নামক স্থানে গমন করিয়া দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত জনগণের সহায়তা করণ এবং অনাথ বালক বালিকাদিগের জন্য আশ্রম স্থাপন।

৮ম। ঐ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে নৈনিতালে গমন করিয়া ১৯শে জুন পর্য্যন্ত থাকিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থসংগ্রহকরণ এবং সংগৃহীত অর্থে কন্‌খলে সাধু ও যাত্রিগণের জন্য দাতব্য ঔষধালয় এবং সেবাশ্রম সংস্থাপন।

৯ম। ১৯০২ ডিসেম্বর হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত এলাহাবাদে অবস্থান করিয়া বক্তৃতাদি দানে সাধারণের মধ্যে যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞান বিস্তার। ঐ সকল বক্তৃতা ফলে সর্ব্বসাধারণের মন শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের কার্য্যকলাপে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে তাহারা স্বামীজিকে ঐ স্থানে মঠস্থাপন করিয়া নিয়মিতরূপে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য বার বার অনুরোধ করেন এবং তৎসংক্রান্ত ব্যয় ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন।

১০ম। কাঙ্গরা প্রদেশস্থ ধর্ম্মশালা নামক স্থানে ভীষণ ভূমিকম্প উপস্থিত হইলে তদ্দেশবাসিগণকে সহায়তা দান করিতে চাঁদা সংগ্রহকরণ এবং স্বামী নির্ভয়ানন্দ এবং এক ব্রহ্মচারীকে আশ্রম হইতে তথায় বিপন্নগণের সেবা ও অর্থ সাহায্যের জন্য প্রেরণ।

১১শ। স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীর সম্পূর্ণ সংস্করণ বাহির করিবার উদ্যোগ এবং কিয়দংশ মুদ্রিত করণ।

কর্ম্মযোগাবলম্বনে নরনারীর সেবায় সতত নিযুক্ত থাকিলেও স্বামী স্বরূপ ধ্যানাদি সাধনেও উদাসীন ছিলেন না। মায়াবতী আশ্রমের অনতিদূরবর্ত্তী জঙ্গলমধ্যগত তাঁহার সাধনকুটীরই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসিগণের প্রমুখাৎ অবগত আছি—চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণে হিমাচলের নিবিড় বনরাজি যখন স্নাত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিত এবং চিরনীহারমুকুটিত নন্দাদেবী এবং ত্রিশূল শৃঙ্গ যখন উমা-মহেশের কাঞ্চনজড়িত কর্পূরধবলাঙ্গের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইয়া মানবমনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের অভিনয় আনয়ন করিয়া চিত্তবৃত্তি স্তম্ভিত করিয়া তাহাকে সমাধি মুখের নিকটবর্ত্তী করিত, তখন স্বরূপানন্দস্বামীর হৃদয় অপূর্ব্বভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত এবং সেই নিবিড় রজনীতে যষ্টি মাত্র অবলম্বন করিয়া ব্যাঘ্রভল্লুকাদি শ্বাপদসঙ্কুল বনমধ্যে

গুরুভ্রাতাগণ সমভিব্যাহারে প্রবিষ্ট হইতেন এবং কখন বা কয়েক ঘণ্টা বিচরণ করিয়া প্রত্যাগত হইতেন, আবার কখন বা সাধনকুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। ব্রহ্মপ্রাণ স্বামীর হৃদয়ে তখন যে গভীর ভাবোচ্ছাস উপস্থিত হইত তাহার নিরূপণ কে করিতে সক্ষম ?

ভারতের কৃতবিদ্য ছাত্রকুল যাহাতে ধর্ম্মের জন্য লোকহিতের জন্য এবং পল্লীবাসী দরিদ্র কৃষককুলে বিদ্যা বিস্তারের জন্য তাঁহার ন্যায় সর্ব্বত্যাগী হইয়া তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদেরই মঙ্গলে আত্মোৎসর্গ করে সে বিষয়ে স্বামিজীর বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ লক্ষিত হইত। নৈনিতাল, আলমোড়া, এলাহাবাদ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যখনই তিনি গমন করিতেন তখনই ছাত্রদিগের মধ্যগত হইয়া তাহাদিগকে তদ্বিষয়ে উৎসাহিত করিতেন। আবার তাহাদিগকে যথার্থ স্বার্থত্যাগে সর্ব্বত্র পশ্চাৎপদ দেখিয়া বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইতেন। কতবার কতলোকেই না তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছে—"ছাত্রগণেই আমাদের ভবিষ্যতের সকল আশা নিহিত রহিয়াছে। হায় ! এখনও তাহারা যশ, মান, রাজনীতি প্রভৃতির বৃথা হুজুগে কিছু কালের জন্য উন্মত্ত হইয়া আবার পরক্ষণেই উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং চিরকালের নিমিত্ত সংসারে মগ্ন হইতেছে। কবে তাহারা দেশের জন্য যথার্থ ত্যাগধর্ম্ম শিখিবে ?" হিমাচলের কার্য্যভার গ্রহণের পর স্বামী স্বরূপ দুইবার মাত্র কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। তত্রস্থ বন্ধুবর্গ তাঁহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং ভাবিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অনেক কার্য্য এখনও তাঁহার দ্বারা সাধিত হইবে। প্রথম বার স্বামী বিবেকানন্দজীর সেবা ও তাঁহার পবিত্র সহবাসে কিছুকাল থাকিবেন বলিয়া সমাগত হন। স্বামী স্বরূপের গুরুভক্তির নিদর্শন স্বরূপ একটী ঘটনা আমাদের এখানে মনে আসিতেছে। কিষণগড়ে অবস্থানকালে তিনি তথাকার মাননীয় দেওয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। দেওয়ান তাঁহার সদালাপে অতীব পরিতৃপ্ত হইয়া জনৈক বন্ধুর সহিত স্বামীজির পরিচয় প্রদান কালে বলিলেন যে এই মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা। স্বরূপানন্দ তাঁহার ভ্রম তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া বলিলেন যে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের অনুগত সেবক ও নগণ্য শিষ্য মাত্র। দেওয়ান তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধিতে যতদূর না মুগ্ধ হইয়াছিলেন এতাদৃশ বিনয় ও সত্যনিষ্ঠা দর্শনে তদপেক্ষা অধিক মুগ্ধ হন। তদবধি দেওয়ান তাঁহাকে তাহার বন্ধুমধ্যে পরিগণিত করিতেন। ১৯০১ সালের শীতকালে দিল্লিদরবারে উপস্থিত হইয়া দেওয়ান সাহেব স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন সমীপে লইয়া যান এবং ঐ সমারোহে সমাগত রাজপুতানা এবং গুজরাটের যাবতীয় রাজন্যবর্গের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দেন। স্বামীজির সদালাপে বরদারাজ শ্রীরামকৃষ্ণমিশন এবং স্বামী বিবেকানন্দের উপর বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে এবং তাঁহার পূজ্যপাদ গুরুমহারাজকে নিজ রাজ্যে কিছুকালের জন্য আগমন ও অবস্থান করিয়া ধর্ম্মপ্রচারের জন্য নিমন্ত্রণ প্রদান করেন। সেভিয়ার-সহধর্ম্মিণী মায়াবতী আশ্রমভূমি প্রভৃতি দেবোত্তর করিয়া দিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তাঁহার সহিত স্বামীজি দ্বিতীয়বার কলিকাতায় উপস্থিত হন। সেবারে আগমন করিয়া কিন্তু তিনি হৃদযন্ত্রের দুর্ব্বলতা জ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর, এল, দত্তজ মহাশয়ের চিকিৎসায় তাহার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে তিনি কার্য্যশেষে ঔষধ লইয়া পুনরায় মায়াবতী প্রত্যাগমন করিলেন।

* * * *

১৯০৬।৬ই জুন তারিখে স্বামী স্বরূপ মায়াবতী হইতে আলমোড়া এবং তথা হইতে নৈনিতালে গমনোদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। প্রয়োজন—ঐ উভয় স্থানের একটিতে "প্রবুদ্ধভারত" প্রেস উঠাইয়া লইয়া গেলে তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত যথার্থ ত্যাগধর্ম্মপ্রচারের মায়াবতী অপেক্ষা সুবিধা হইতে পারে কি না তাহাই নির্দ্ধারণ করা। এ সময়ে তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল ; নৈনিতালে বায়ু পরিবর্ত্তন ও কিছুকাল বিশ্রামের দ্বারা আপন স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনও ঐ যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। নৈনিতালে ঐ উদ্দেশ্যে একটী স্থান দর্শন করিয়া যখন তিনি লালা অমরসাহের ভবনে প্রত্যাগত হইতেছিলেন তখন পথিমধ্যে বৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভিজিতে হইয়াছিল এবং বাসায় আসিয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিলেও সেই ঠাণ্ডা লাগিয়া পরদিন হইতেই তাঁহার সর্দ্দি ও জ্বর হইল। কর্ম্মবীর স্বামী স্বরূপ তখনও লোকহিতকর কর্ম্মে বিরত নহেন।



"ভাঁওয়ালির শ্মশানের নিকট সোহম্‌স্বামীর আশ্রম"।

স্বীয় গুরু স্বামী বিবেকানন্দের ফটো সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া সমাগত জনগণকে সকল বিষয়ে সদুপদেশ দানে নিযুক্ত রহিলেন। লোকসমাগমের বিরাম নাই এবং স্বামীজীরও তাহাদের সহিত সদালাপে ক্লান্তি নাই। শুনিতে পাই যখনই তিনি ঐ স্থানে উপস্থিত হইতেন তখনই তাঁহার যথার্থ প্রেম এবং সদালাপে আকৃষ্ট হইয়া ঐরূপ লোক-সমাগম হইত। দুই চারিদিনেই জ্বর বৃদ্ধি হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিয়া দেখা দিল। তখনও বিরাম নাই, যতক্ষণ পারিতেন উপবিষ্ট হইয়া সদালাপ করিতেন এবং চিঠিপত্রের উত্তরাদি অপরের দ্বারা লিখাইতেন। কানপুরের সুপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক বাবু মহেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী তখন নৈনিতালে বায়ু পরিবর্ত্তনে আসিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজীর সদালাপে ও নানা গুণে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং রোগের সূত্রপাত হইতেই তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। স্থানীয় আসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জনও তাঁহার সহিত স্বামীজীকে প্রত্যহ দেখিয়া যাইতেন। ক্রমশঃ জ্বর রোগ অতিমাত্র বৃদ্ধি হওয়ায় বাক্যালাপ অসম্ভব হইয়া উঠিল—ডাক্তারেরাও ভয় পাইলেন। লালা অমরনাথ ও তত্রস্থ বন্ধুগণ দিবারাত্র প্রেমের সহিত তাঁহাদের স্বামীজীর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। কিন্তু কোন ফলই হইল না। ২৭শে জুন বেলা দুই প্রহরের সময় স্বামী স্বরূপানন্দ নিদ্রিতের ন্যায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। সে নিদ্রাই মহানিদ্রায় অবসান হইল। ফুল ফুটিয়াছিল—ভ্রমরও মধুলোভে নিত্য সমাগত হইতেছিল—কিন্তু সহসা নীহারপাতে শুষ্ক হইয়া গেল। অয়ি দেবি জগন্মাতঃ! তুমি কি সে অপূর্ব্ব প্রসূনের মহিমা নরলোকে বুঝিবে না বলিয়া নিজ কেশে ধারণ করিয়া তাহার গৌরব বর্দ্ধিত করিলে?

* * * *

পুষ্প, ভস্মলেপ এবং নবীনগৈরিকে শোভিত হইয়া স্বরূপানন্দের শবদেহ নৈনিতালের নিকটবর্ত্তী ভাওয়ালি নামক স্থানে অগ্নিসাৎ হইল।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানিদেব বয়ুণানি বিদ্বান্
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম॥

হে অগ্নি! আমাদিগকে ধনের (অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগের) নিমিত্ত সুপথে লইয়া যাও; হে দেব! তুমি সমুদায় কর্ম্ম জ্ঞাত আছ। আমাদিগের মন হইতে কুটিল পাপ দূর কর। তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

হরি ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

স্বামী সারদানন্দ।

মুসলমানের গুণ এবং হিন্দুর দোষ।

উর্দ্দু, হিন্দি, মরাঠী, গুজরাটী ও তামিল প্রভৃতি ভাষা সকলের হিন্দু লেখকগণ, লেখনী চালনা করিবার সময়, মুসলমানগণের প্রতি কি প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা অবগত নহি। কিন্তু বঙ্গদেশীয় হিন্দুলেখকগণ যে সময় সময় অসতর্কতা ও অসংযমের সহিত লিখিতেন তাহা অবগত আছি। এই প্রকার লেখার দ্বারা শিক্ষিত মুসলমান সমাজে যে অসন্তোষ উৎপাদন করা হইত, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অনেকে মুসলমানদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন এবং মনে করিতেন, বুঝি তাঁহাদের সকল বিষয়েই দোষ। কিন্তু নিরপেক্ষ, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, এই ভাব কখনই পোষণ করিতে পারেন না। এই বিষয়ে আমার মতে উভয়েই দোষী। কেন না উচ্চ শ্রেণীর গোঁড়া মুসলমানগণও হিন্দুগণের প্রতি সেই প্রকার অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন। দোষ ছাড়া কেহই নাই এবং কেহই সর্ব্বগুণান্বিত নাই।

আমরা চিন্তা করিয়া দেখিতে পাই যে কতকগুলি বিষয়ে মুসলমানের যে দোষ, হিন্দুগণের তাহাতে গুণ এবং হিন্দুর যে বিষয়ে দোষ, মুসলমানের সে বিষয়ে গুণ। তাই আমরা মুসলমানের গুণের কথাই সর্ব্বপ্রথমে আলোচনা করিব, কেন না তাঁহাদের যে দোষ আছে তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত এবং সর্ব্বত্র বিদিত। তাঁহাদের গুণাগুণের কথা অধিকাংশ লোকেই চিন্তা করিয়া দেখেন না বা চিন্তা করিয়া দেখিলেও তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন না। আমরা বাঙ্গলা দেশের কথাই বলিতেছি।

মুসলমানের গুণ।

১। একেশ্বরবাদিতা।	৭। স্বপক্ষপোষকতা।
২। ধর্ম্মোন্মত্ততা।	৮। প্রতিহিংসাপরায়ণতা।
৩। একতাপ্রিয়তা।	৯। সমরপ্রিয়তা।
৪। সাহসিকতা।	১০। একসাম্প্রদায়িকতা।
৫। তেজস্বিতা।	১১। আত্মসম্মানবোধ।
৬। কোন কোন বিষয়ে কর্ত্তব্যপরায়ণতা।	

হিন্দুর দোষ।

১। বহু দেবদেবীর উপাসকতা।	৭। পক্ষপোষকগুণ-বিহীনতা।
২। ধর্ম্মোন্মাদবিহীনতা।	
৩। পরস্পর অনৈক্য।	৮। প্রতিহিংসাজ্ঞানশূন্যতা
৪। ভীরুতা।	৯। যুদ্ধবিমুখতা।
৫। নিস্তেজতা।	১০। বহুসাম্প্রদায়িকতা।
৬। কোন কোন বিষয়ে কর্ত্তব্যবিমুখতা।	১১। আত্মসম্মান-বিহীনতা।

উপরোক্ত দোষগুণের যে তালিকা দিলাম তাহাতে অনেকেই আমাদের মতের সঙ্গে একমত হইতে পারিবেন না, পক্ষান্তরে কেহ কেহ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিয়া লেখককে ভৎর্সনা করিবেন। সুতরাং আমরা একে একে বিচার করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

১। একেশ্বরবাদিতা—অধুনা সভ্য জগৎ একেশ্বর-বাদিতা একটা জাতীয়গুণের মধ্যে গণ্য, এবং পৌত্তলি-কতাকে একটা দোষের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন। অনেকে এরূপও বলিয়া থাকেন যে "Idolatry is the remnant of barbarism"; অর্থাৎ পৌত্তলিকতা বর্ব্বরতার লুপ্তাবশেষ। যাহা হউক এই ধর্ম্মমত লইয়া বিতণ্ডা করাটা ভাল নয়। তবে যাহা জ্ঞান বিশ্বাস মতে ধারণা তাহাই লিখিলাম।

২। ধর্ম্মোন্মত্ততা—বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম্মোন্মত্ততা নাই বলিলেও হয়। আমরা কোন ব্যক্তিগত কথা বলিতেছি না, তাহা হইলে অনেক ধর্ম্মপ্রাণ সাধু ব্যক্তির অবমাননা করা হয়। আমরা এই কথাটা জাতীয়ভাবে বলিতে ইচ্ছা করি। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মনে করুন কলিকাতা সহরের উন্নতির প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট এইরূপ আর এক প্রস্তাব করিয়া তাহার রিজলিউশন ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত করিলেন যে "কালীঘাটে কালীবাড়ী থাকায় তথায় সর্ব্বদাই বহু লোকের ভিড় থাকে। মফস্বল হইতে বহু লোক আসিয়া একত্র সমবেত থাকায় মল মুত্রাদিতে ও অন্যান্য কারণে স্থানটী অতি অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। এই অস্বাস্থ্যকর নেটিব কোয়াটার, কেল্লার গোরাসৈন্যগণের এবং চৌরঙ্গির শ্বেতকায়গণের মধ্যে নানা সংক্রামক ব্যাধি আনিয়া দিতে পারে। শ্বেতকায়দিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে, ভারত সাম্রাজ্য সুদৃঢ় থাকিতে পারে না। তাই গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করেন যে কালীবাড়ী আরো দক্ষিণে তিন কি চারি মাইল দূরে স্থানান্তরিত করিয়া এবং নিকটবর্ত্তী মসজিদগুলি তুলিয়া দূরে কোন ভাল স্থানে লইয়া গিয়া পূর্ব্বোক্ত কালীবাড়ী ও মসজিদের স্থানে, ইউরোপীয়গণের সান্ধ্যভ্রমণের জন্য একটী পার্ক এবং.তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী জিমখানা নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য।" বড় লাট মহারাণীর ঘোষণাপত্রের মর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছেন। তাই হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি সম্মান ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া মনে করুন যদি আরো লিখেন যে, "গবর্ণমেণ্ট কাহারো ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না, পরন্তু বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। বহুজনতাপূর্ণ কলিকাতা সহরের নিকট কালীবাড়ী ও মসজিদ থাকিলে লোকের গোলে ধর্ম্মকার্য্যের বিঘ্ন ঘটে, সেই জন্য মন্দির ও মসজিদগুলি নির্জ্জন শান্তিময় স্থানে লইয়া গেলে উভয়েরই মঙ্গল। গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করিবেন, ইত্যাদি"। বলা বাহুল্য যে এই প্রকার আদেশ জারি হইবা মাত্রই সহরের হিন্দু, মুসলমানগণের মধ্যে এক মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। হিন্দুগণ সহরের নানাস্থানে সভা সমিতি করিয়া এই হুকুমের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কত বক্তৃতা করিলেন, মন্দিরে মন্দিরে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করিয়া লাটসাহেবের যাহাতে সুমতি হয়, তাহার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সকল দ্বারা কোন ফল না পাইয়া বিলাতের ষ্টেট সেক্রেটারিকে টেলিগ্রাম করিলেন, যে সরকার লোকের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে শীঘ্র বিলাত যাইতে আদেশ করা হউক এবং তাঁহার আদেশ রদ হউক, ইত্যাদি। এই প্রকার হৈ, হৈ, রৈ, রৈ, রব কিছু দিন করিয়া হিন্দুর নেতাগণ, বিকারের রোগীর মত ক্রমে অবসন্ন হইয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত প্রায় হইলেন।

আর অপর দিকে সমস্ত মুসলমান দলে দলে মসজিদে আসিয়া জমা হইতে লাগিলেন এবং কি উপায় দ্বারা এই কার্য্যের প্রতিকার করা যায় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালী, পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী ও পাঠানজাতীয় মুসলমানগণ একত্র সমবেত হইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া গবর্ণমেণ্টকে আপনাদের মনোবেদনা জানাইয়া হুকুম রদের জন্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই হুকুম রদ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে মুসলমানগণ নিরস্ত হইবেন না, তাঁহাদের জেদ ও তেজ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। তাঁহারা হয় ত প্রতিকারের জন্য নিজ হস্তে আইনের ভার লইবেন। যত মুসলমান ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিয়া যে যাহাকে যেখানে পাইবে তাহাকেই প্রহার করিবে, হয় ত হত্যা করিবে, হয় ত সুবিধা পাইলে তাঁহাদের বাড়ি ঘর পর্য্যন্ত লুঠপাট করিবে। যতদিন কোন প্রতিকার না হয় তত দিন কিছুতেই শান্তি ভোগ করিতে পারিবে না। মুসলমান ধর্ম্ম গেল বলিয়া চীৎকার করিবে, উন্মত্তপ্রায় হইয়া অন্নজল পরিত্যাগ করিবে। ফল কি হইবে? পল্টনের গোরা আসিয়া দলে দলে মুসলমানকে গুলি করিয়া হত্যা করিবে, জেলখানায় আবদ্ধ করিবে, কিন্তু এই সকল কঠিন শাসনেও তাহারা নিরস্ত হইবে না। হিন্দুর বৎসরাবধি চীৎকারে সমস্ত বঙ্গে যাহা ঘটে নাই, সেদিন বকরাইদের দিন অল্প সময় মধ্যে তাহা ঘটিল, একথা সকলেই অবগত আছেন। পাঠকগণ! কেমন এই কি না, আরো কিছু আছে? ইহাকে ধর্ম্মোন্মত্ততা বলিবেন কি, হিন্দুদিগের ক্ষণিক আন্দোলনকে ধর্ম্মোন্মত্ততা বলিবেন? ফলকথা হিন্দুর প্রাণে সজীবতা নাই, তাঁহাদের কেবল ফাঁপা হৈ, হৈ, রৈ, রৈ, শব্দ! ভিতরে কোন সার নাই। হিন্দুর ক্রোধ, শুষ্ক কদলী পত্রে অগ্নি সংযোগ করিলে যেমন হঠাৎ ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার নিমিষেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তাদৃশ। পক্ষান্তরে মুসলমানের ক্রোধ তুষের আগুনের মত, সহজে নিবিতে চায় না। উপরোক্ত কাল্পনিক ঘটনা উপলক্ষে হিন্দুর আন্দোলন কদাচিৎ কলিকাতার সীমানা অতিক্রম করিবে, কিন্তু

মুসলমানের আন্দোলন দাবানলের মত সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া পড়িবে। ইহাকেই বলে সজীবতা। যদিও আজ কয়েক মাস হইল হিন্দু মহলে কিঞ্চিৎ সজীবতার চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে, তাহা নেতাগণ মধ্যেই বিশেষ আবদ্ধ; মুসলমানের সঙ্গে তুলনাই হইতে পারে না।

৩। একতাপ্রিয়তা—কোন হাটে, বাজারে, রাস্তা ঘাটে, একজন মুসলমানকে অপর কেহ অপমান করিলে বা প্রহার করিলে, সেই ব্যক্তি তেমন সহজে সরিয়া যাইতে পারে কি? যাহার সঙ্গে কোন দিন পরিচয় নাই, এমন লোক পর্য্যন্ত অপমানিত ব্যক্তির পক্ষ হইয়া অপমানকারীকে জব্দ করিতে চেষ্টা করিবে, তাহাতে হয় ত দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া মাথা ফাটাফাটিও হইতে পারে। অপর পক্ষে এক গ্রামের, এক গ্রামের কেন এক বাড়ীর, কএকজন হিন্দুর মধ্যে এক জনকে যদি অপর কোন মুসলমান অপমান করে, তাহা হইলে আমরা সচরাচর কি দেখিতে পাই? আমরা দেখিতে পাই যে অপমানিত ব্যক্তির সঙ্গিগণ হয় ত অপমান-কারীকে জিজ্ঞাসা করিবে যে কেন সে ঐ ব্যক্তিকে অপমান করিল। বেশীর ভাগ হয় ত একটু সামান্য বচসা করিয়া আস্তে আস্তে সকলে সরিয়া পড়িতে চেষ্টা করিবে। অধিকন্তু উল্টে অপমানিত ব্যক্তিকেই জব্দ করিবে যে "কেমন, তোমার বুদ্ধির দোষে তুমি অপমানিত হও, যেমন কার্য্য তেমন ফল।" হয় ত আরো অপমানকারীকে বলিবে, "যাও ভাই আর রাগ করিও না, ও লোকটার বুদ্ধি নাই, তাই তোমার সঙ্গে ওরূপ করিয়াছে, ইত্যাদি"। লেখক পূর্ব্ববঙ্গে অনেক সময় এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আজকাল নব্য বাঙ্গালীর মধ্যে কত-কটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৪। সাহসিকতা—যদি এক দল বিপক্ষ বা দুর্ব্বৃত্ত কোন মুসলমানের বাড়ী আক্রমণ করে, তখন আক্রান্ত ব্যক্তি চীৎকার করিয়া তাহার ভাই, মামু, চাচা, ফুফু, খালু সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিবে। বলাবাহুল্য যে সকলেই অতি আগ্রহের সহিত আসিয়া আক্রমণকারীকে প্রত্যাক্রমণ করিবে। ইহাতে হয় ত কাহারো কাহারো মাথা ফাটিবে, কেহবা খুন হইবে, তাহাতে কিন্তু ইহারা একটুও দুঃখিত হইবে না। কারণ তাহারা জানে যে এইটি একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এইরূপ আত্মরক্ষা না করিলে চিরকলঙ্ক।

আবার সেইমত একদল দুর্ব্বৃত্ত বা বিপক্ষ যদি কোন হিন্দুর বাটী আক্রমণ করে, তাহা হইলে কি হইবে? তাহা হইলে বাড়ীর কর্ত্তা যদি সময় পান তাহা হইলে আপন পরিবারবর্গ লইয়া বাটীর পশ্চাদ্দিক দিয়া পলায়ন করিবেন, আর তিনি যদি সে সময় টুকুও না পান, তাহা হইলে পরিবারবর্গ ফেলিয়াই নিজের প্রাণটি লইয়া সর্ব্বাগ্রে সরিয়া পড়িবেন। আর তাঁহার প্রতিবেশিগণ আপন মান বজায় রাখিয়া আড়াল হইতে তামাসা দেখিবেন এবং কেহই এদিকে যে কি দুর্দ্দশা হইল তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিবেন না। দুর্ব্বৃত্তগণ আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলে, সকলে আসিয়া বৃথা আস্ফালন করিবে, কেহ হয় ত বলিবে "আমি থাকিলে শালাদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিতাম, ইত্যাদি।" এই ঘটনা লইয়া কএক দিন আন্দোলন চলিবে, আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অপরাধিগণকে শাস্তি দিবার চেষ্টা হইবে। মোকদ্দমায় আসামীগণ খালাস পাইলে সব চুপ হইয়া যাইবে।

৫। তেজস্বিতা—আমরা সকল বিষয়েই মুসলমান-দিগকে যেমন তেজস্বী ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত দেখিতে পাই হিন্দুগণের মধ্যে সেই অভাব সর্ব্বদাই লক্ষ করি। বাহুল্য ও পুনরুক্তি ভয়ে এ বিষয় অধিক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না।

৬। কোন কোন বিষয়ে কর্ত্তব্যপরায়ণতা—কোন বিপদসঙ্কুল দুরূহ কার্য্যে, একজন মুসলমানকে আমরা যেমন কর্ত্তব্যপরায়ণ দেখিতে পাই একজন হিন্দুকে ঠিক সেই বিষয়ে, সেই কার্য্যে কর্ত্তব্যবিমুখ দেখিয়া থাকি। এ কথাটা অবশ্য সকল বিষয়ে খাটিবে না। কোন কোন বিশেষ বিষয়ে প্রযোজ্য মাত্র। এ কথাটা একটী দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

একদা আমার ছাত্রাবস্থায় দিনাজপুর অবস্থানকালে (১৮৭৭-৭৮ খৃঃ) মফস্বলে দুইজন জমিদারমধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। উভয় পক্ষের কাছারিতে আত্মরক্ষার্থ কতকগুলি লাঠিয়াল থাকিত। একদিন একপক্ষের জমিদার স্বয়ং পাল্কী আরোহণে প্রায় ২০০ লাঠিয়াল লইয়া অপরপক্ষের কাছারি লুট করিবার জন্য আসিতেছিলেন। কিন্তু এ পক্ষের সে দিন মাত্র চারিজন লাঠিয়াল উপস্থিত ছিল। ইহা ভিন্ন একজন গোমস্তা ও কএকজন হিন্দু ভৃত্য উপস্থিত ছিল। বিপক্ষগণ

হিন্দু লোক লইয়া কাছারি লুট করিবার জন্য আসিতেছে দেখিয়া এই চারিজন মুসলমান লাঠিয়াল কোমর বাঁধিয়া ঢাল সড়কি প্রভৃতি অস্ত্রসহ কাছারির সদর দরজায় দাঁড়াইয়া তাহাদের প্রথানুযায়ী "লাঠিয়ালি ডাক" ছাড়িতে লাগিল। এই চারিজনের মহাবিক্রম ও আস্ফালনে বিপক্ষের এতগুলি লোক স্তম্ভিত হইল। মুসলমান জমিদার পাল্কী নামাইতে হুকুম দিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এ চারিজন লাঠিয়ালের বাড়ী পাবনা জেলায় ছিল। দিনাজপুর অঞ্চলে দক্ষিণ দেশী লাঠিয়ালগণের নাম খুব বিখ্যাত ছিল। সেই জন্য আক্রমণকারী জমিদার স্বয়ং মুসলমান হইয়াও ইতস্ততঃ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই চারিজন লাঠিয়ালের সর্দ্দার নিজ কাছারির গোমস্তার নিকট হুকুম চাহিল। কারণ মনিবের হুকুম বিনা ইহারা যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে খুন জখম হয়, তাহা হইলে সেই জন্য জমিদারী দায়ী হইবেন না। সেই জন্য তাহারা পুনঃ পুনঃ হুকুম চাহিতে লাগিল। কিন্তু গোমস্তা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া দিল। এদিকে মনিবের কাছারি লুট হইয়া যাইবে, তাহা এই কএকজন লাঠিয়াল জীবিত থাকিতে তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। তাই তাহারা ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। পদাঘাতে ঘরের কপাট ভাঙ্গিয়া গোমস্তাকে হুকুম দিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। কিন্তু কাপুরুষের মুখ দিয়া আর বাক্য সরিল না, সে উল্টে আপন লাঠিয়ালগণকে দশ টাকা ঘুষ দিয়া পলাইতে বলিল। বলা বাহুল্য ইহারা দুঃখিত হইয়া অগত্যা কাছারি ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইল। হিন্দুভৃত্যগণ পূর্ব্বেই পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়াছিল। বিপক্ষগণ এই চারিজন লাঠিয়ালকে হটিতে দেখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া আসিয়া কাছারি লুটপাঠ করিয়া চলিয়া গেল।

৭। স্বপক্ষপোষকতা—যদি কোন পল্লীগ্রামে কোন বিষয় লইয়া দুইটি পক্ষ হয় এবং দুই পক্ষেই হিন্দু মুসলমান থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে মুসলমানগণ যেমন উৎসাহের সহিত আপন পক্ষ সমর্থন করিবে, হিন্দুগণ তাদৃশ করিবে না। এই দুই পক্ষে যদি দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়, তাহা হইলে মুসলমানগণ যেমন সমস্ত বিপদ আপন শিরে লইয়া আপন মস্তক অগ্রবর্ত্তী করিয়া দিবে, হিন্দুগণ তাহা কিছুতেই পারিবে না। হিন্দুগণ বরং আড়ালে থাকিয়া "পা দিয়া সাপ খেলিবে।" তাহারা কিছুতেই খুঁকির মধ্যে যাইবেনা।

৮। প্রতিহিংসাপরায়ণতা—এটা গুণ কি দোষ সে বিষয়ে সকলে একমত হইবে না। নিতান্ত ধার্ম্মিক, সাধু, বৈরাগীর পক্ষে প্রতিহিংসা একটা দোষ বটে। কিন্তু গৃহীর পক্ষে প্রতিহিংসা গুণ বলিয়া গণ্য। যে যিশু এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে, অপর গণ্ড ফিরাইয়া দিতে বলিয়াছেন, তাঁহারই শিষ্য খৃষ্টান ইংরেজগণ কেমন প্রতিহিংসাপরায়ণ, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। মূল কথা প্রতিহিংসা গুণ না থাকিলে আপন মান ইজ্জৎ রক্ষা করা দায়। সর্ব্বদাই দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইতে হয়।

কোন প্রবল ব্যক্তি যদি কোন দুর্ব্বল মুসলমানকে কি তাহার পরিবারবর্গকে অপমানিত করে, তাহা হইলে সে কি করিবে? সে কি চুপ করিয়া এই অপমান সহ্য করিবে? কখনই না। সে আশু তাহার কোন প্রতিকার করিতে না পারিলেও কিছু দিন সহ্য করিয়া থাকিবে, কিন্তু যখনই সুযোগ ঘটিবে, তখনই তাহার অপমানের প্রতিশোধ তুলিয়া, প্রাণের প্রতিহিংসার আগুন নির্ব্বাপিত করিবে। সে হয়ত অত্যাচারীর প্রাণ লইতেও কুণ্ঠিত হইব না। আর অন্য দিকে একজন হিন্দু কোন প্রবল ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপমানিত হইলে সে হয় ত অত্যাচার নিবারণের জন্য কোম্পানী বাহাদুরের বা মহারাণীর দোহাই দিবে। অগোচরে বৃথা আস্ফালন করিবে, বড় জোর জেলা অভিমুখে দৌড়িয়া নালিশ করিবে। কিছু দিন পরে সমস্ত ভুলিয়া যাইবে। সম্ভবতঃ কালে আবার সেই অত্যাচারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে।

৯। সমরপ্রিয়তা—মুসলমান যে লড়াই ভাল বাসে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন, তাহা সর্ব্বত্র বিদিত। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালী হিন্দুর নামের সঙ্গে লড়াইয়ের নামটা যোগ না করাই ভাল, তাহাতে বাঙ্গালীর কলঙ্ক নহে, লড়াইয়েরই কলঙ্ক।

১০। একসাম্প্রদায়িকতা—মুসলমানগণ যে দেশীই হউক না কেন, যে ভাষীই হউক না কেন, তাহাদের খাদ্য ও আচার ব্যবহার ভিন্ন হউক না কেন, ধর্ম্ম বিষয়ে বাহ্যাচারে শিয়া ও সুন্নী দুই সম্প্রদায় হইলেও মূলতঃ তাহাদের কোন পার্থক্য নাই। এক কলিকাতা সহরে কোন মসজিদে কাবুলী, পঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, বাঙ্গালী, বর্ম্মী ও চীনা মুসলমানগণ যদি

একত্র হয়, তবে সকলেই একত্র এক বিছানায় নামাজ পড়িবে এবং একত্র এক বিছানায় বসিয়া এক সান্কে আহার করিবে, কেহ কাহাকেও নীচ বা অস্পৃশ্য মনে করিবে না। অপর দিকে, অন্য দেশের কথা দূরে থাকুক এক গ্রামের হিন্দু-দিগের মধ্যে বহু সম্প্রদায়, কাহারো সহিত কাহারো আহার বিহার নাই, আদানপ্রদান নাই।

কোন ব্রাহ্মণকায়স্থের বাড়ীর বারান্দায়, কোন নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু যদি উঠে, তাহা হইলে তথাকার পিতলের হাঁড়ির জল নষ্ট হইল, মেটে জলের হাঁড়িটি অস্পৃশ্য হইয়া আর ব্যবহারের উপযোগী রহিল না। কোন ব্রাহ্মণ ঘাটে স্নান করিয়া আহ্নিক করিতেছেন এমন সময়ে নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতীয় কোন ব্যক্তির ছায়া যদি তাঁহার গাত্র স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাঁহার সন্ধ্যা নষ্ট হইবে এবং তিনি "রাধা মাধব রাধা মাধব" বলিতে বলিতে পুনরায় স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবেন।

১১। আত্মসম্মানবোধ—মুসলমান যেমন আত্মসম্মান রক্ষা করিতে পারে হিন্দু তেমন পারে না, কারণ হিন্দুর তেজ নাই, জেদ নাই ও সাহস নাই। ইহার একটী আধুনিক দৃষ্টান্ত, রংপুরের মৌলবীর চটিজুতা। উহা যে পুলিশম্যানের ঘাড়ে চটাপট্ পড়িয়াছিল, তাহার কারণ পুলিশম্যানের মৌলবীর সম্মানের প্রতি দৃষ্টি না করা।

উপরে হিন্দুগণের যত দোষের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা নমঃশূদ্র, কৈবর্ত্ত ও কোন কোন স্থানের গোয়ালা প্রভৃতি জাতির পক্ষে সকল বিষয়ে খাটিবে না। কারণ ইহাদের মধ্যে সাহসিক ও তেজী লোক এখনও আছে। নমঃশূদ্রগণ সাহস তেজ ও বীরত্বে এক সময়ে মুসলমান অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না, কিন্তু দুইটি কারণে ইহারা মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে। প্রথম কারণ কোন দাঙ্গা, হাঙ্গামায় অভিযুক্ত হইয়া কোন নমঃশূদ্র জেলে গেলে, গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থানুসারে, তাহাদের দ্বারা জেলখানার মেথরের কার্য্য করান হয় এবং দ্বিতীয় কারণ এই যে তাহারা আর্য্যত্বাভিমানী উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের কাপুরুষতার অনুকরণ করিয়া, ভদ্র-শ্রেণীভুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে। নমঃশূদ্র জাতির তেজ, সাহস এবং একতা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন তাহার এক আনা আছে কিনা সন্দেহ। আবার এখনও যেটুকু আছে, তাহা আর পঞ্চাশ বৎসরে থাকিবে না। নমঃশূদ্রের বীরত্ব বিষয়ে ঘটনাবলী স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আশা করি সত্বরই প্রকাশিত হইবে। বাস্তবিক হিন্দুর মধ্যে নমঃশূদ্র জাতি Honorable Exception অর্থাৎ গৌরবান্বিত ব্যতিক্রম স্থল।

এযাবৎ মুসলমানের গুণের বর্ণনা করিলাম। এখন যদি তাঁহাদের দোষের কথা না বলি এবং হিন্দুর গুণের কথা উল্লেখ না করি তাহা হইলে সত্যের অপলাপ হইবে।

মুসলমানগণের মধ্যে নিষ্ঠুর, দুর্দ্দান্ত, বিশ্বাসঘাতক এবং পরস্ত্রী-অপহারক লোকের সংখ্যা হিন্দু সমাজের অপেক্ষা বেশী মনে হয়। এই সকলই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য এবং প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। এই কথাগুলি আমি জাতীয়ভাবেই বলিতেছি, ব্যক্তিগত ভাবে বলা উদ্দেশ্য নহে। ভদ্র মুসলমানগণের মধ্যে অতি সাধু ও দয়ালু লোক যে বহুপরিমাণে আছে তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না।

হিন্দুর জাতীয় গুণ শিষ্ট, শান্ত, দয়ালু ও কোমল প্রকৃতি। আবার হিন্দুর মধ্যে নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতক যে নাই তাহাও কেহই বলিবেন না। যে সমাজেরই হউক অধিকাংশের ব্যবহার লইয়াই দোষ গুণের বিচার। এই যে বাঙ্গালী হিন্দুর অপদার্থতার কথা সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ করিলাম, তাই বলিয়া কি কেহ মনে করিবেন যে তাহাদের মধ্যেও অনেক তেজী ও সাহসী লোক নাই। তাহা কেহই বলিবেন না।

বর্ত্তমানে দেশের স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সমাজে কতক পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে বটে, তাহা কিন্তু জনসাধারণের সংখ্যার তুলনায় কিছুই নহে।

হিন্দু মুসলমানে যে প্রীতিস্থাপনের চেষ্টা হইতেছে তাহাও অতি মহৎ কার্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু সফলকাম হইতে কত দিন লাগিবে তাহা ভবিষ্যদ্গর্ভে নিহিত। শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতাগণের কর্ত্তব্য তাঁহারা প্রতিনিয়ত অশিক্ষিত লোক মধ্যে এই বিষয়ের আন্দোলন করেন এবং হিন্দু ভ্রাতাগণের কর্ত্তব্য মুসলমানগণের যে মহদ্গুণগুলির কথা বলিলাম তাহার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করেন।

হিন্দুসমাজে একদল লোক আছেন তাঁহারা নিজের

দোষ মাত্রই দেখেন না, তাঁহারা মনে করেন নিজেদের সমস্তই অতি উৎকৃষ্ট। লেখক একজন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু হইয়াও যে নিজ জাতির বিরুদ্ধে কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে নিজ জাতির দোষগুলি সংশোধন করাইয়া এক আদর্শ জাতিতে পরিণত করান। এই মত যাঁহাদের নিকট অপ্রিয় বলিয়া বোধ হইবে তাঁহাদের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি যে তাঁহারা ক্ষমা করিবেন।

১৬ই মার্চ্চ ১৯০৬ সাল। শ্রীরামলাল সরকার।

শিল্প-সমিতির প্রবন্ধাবলী।

বেনারস কংগ্রেসসংশ্লিষ্ট প্রদর্শনীর সঙ্গে একটি শিল্প-সমিতির প্রথম অনুষ্ঠান হয়। কলিকাতায় তাহার দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ প্রবন্ধাকারে উপস্থাপিত করেন। এই সকল প্রবন্ধ বহু জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ। আমরা সেই প্রবন্ধগুলির সারসংগ্রহ করিয়া প্রবাসীর পাঠকবর্গকে বিজ্ঞাপিত করিতে চেষ্টা করিব।

চাউল তৈয়ারি।

ভারতে অন্নচিন্তা চমৎকারা হইয়া উঠিয়াছে। এই অন্ন-সমস্যার দিনে বাঙ্গালীর মনোযোগ প্রথমেই শ্রীযুক্ত হেনরি এইচ, ঘোষের 'চাউল তৈয়ারি' নামক প্রবন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। আমরা এজন্য প্রথমেই সেই প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিতেছি।

বাংলায় চাউল তৈয়ারি করা একটি বহুবিস্তৃত ব্যবসায়। বাংলায় উৎপন্ন চাউল ভারতে অন্য সকল প্রদেশের উৎপন্ন সমষ্টি হইতেও অনেক অধিক। সরকারি কর্ম্মচারী ও রিপোর্টদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে সমগ্র ভারতের কৃষি উৎপন্ন ব্যবসায়ের মধ্যে চাউলের ব্যবসায়ই বৃহৎ এবং প্রধান।

কিন্তু অর্থশাস্ত্রের হিসাবে এদেশের চাউল প্রস্তুত প্রণালী নিতান্ত দোষসঙ্কুল। এদেশের চিরাচরিত উপায়ে চাউল প্রস্তুত করিতে যে সময় ও শক্তির অনর্থক অপব্যয় হয়, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বাঁচাইতে পারিলে আমাদের প্রধান খাদ্য চাউলের মূল্য হ্রাস হয় এবং অবশিষ্ট শক্তি ও সময় অন্য ব্যবসায়ক্ষেত্রে—যেমন তূলার কাজে—নিয়োজিত করিলে নূতনতর লাভের পন্থা উন্মুক্ত হয়।

আমাদের দেশে ধান্য হইতে চাউল বাহির করিবার দুইটি সনাতন যন্ত্র আছে—ঢেঁকি ও হাতমসুলি (বা বড় হামানদিস্তা)। এই সকল যন্ত্র যে শুধু নিতান্ত অনুন্নত তাহা নহে, পরন্তু ইহাদের ব্যবহার নিতান্ত কষ্টকর ও ব্যয়সাপেক্ষ। ইহাদের সাহায্যে প্রস্তুত চাউল যথেষ্ট পরিষ্কৃতও হয় না। এই সকল যন্ত্রে প্রচলিত নিয়মে একমণ চাউল প্রস্তুত করিতে গড়ে সাড়ে ছয় আনা লাগে। উষ্ণা বা সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত করিতে সাত আনা পর্য্যন্ত এবং আলো বা আতপ চাউল প্রস্তুত করিতে ন্যূনপক্ষে ছয় আনা পর্য্যন্ত খরচ পড়ে। এই নিয়মে একমণ উষ্ণা চাউল প্রস্তুত করিতে একজন লোকের প্রায় ২১ ঘণ্টা সময় লাগে। তাহার বিবরণ যথা—ধান ঝাড়িয়া পরিষ্কার করা ১ ঘণ্টা, ধান জলে ফেলা ও তোলা ½ ঘণ্টা (ধান জলে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়া থাকে), সিদ্ধ করা ২ ঘণ্টা, শুষ্ক করা ১½ ঘণ্টা (রৌদ্রে যদিও ৫.৬ ঘণ্টা রাখিতে হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে ধান নাড়িয়া উল্টাইয়া দেওয়া ছাড়া সকল সময় লোকের উপস্থিতি আবশ্যক হয় না), ঢেঁকিতে ধান কুটা ১৬ ঘণ্টা (ঢেঁকিতে কুটিতে দুইজন লোকের আবশ্যক এবং ৮ ঘণ্টা সময় লাগে, দুই জনের ৮ ঘণ্টা করিয়া এক জনের ১৬ ঘণ্টা ধরা যাইতে পারে। সর্ব্বমোট ২১ ঘণ্টা। অপর পক্ষে, আতপ চাউল প্রস্তুত করিতে—পরিষ্কার করা ১ ঘণ্টা, শুষ্ককরা ১ ঘণ্টা, ঢেঁকিতে কুটা এবং ঝাড়া ১৬ ঘণ্টা মোট ১৮ ঘণ্টা লাগে। প্রতিদিন ৯ ঘণ্টার মজুরী তিন আনা ধরিলে ২১ ঘণ্টার মজুরী সাত আনা এবং ১৮ ঘণ্টার ছয় আনা হয় *। অর্থাৎ গড়পড়তা মজুরী মণ প্রতি সাড়ে ছয় আনা। বঙ্গের কোন কোন স্থানে একমণ চাউল প্রস্তুত করিবার মজুরী ছয় আনা ও তুষ কুঁড়োর অর্দ্ধেক ভাগ নির্দ্দিষ্ট আছে,—ইহা আমাদের নির্দ্দিষ্ট গড়পড়তা মজুরী সাড়ে ছয় আনারই সমতুল্য।

---

* আতপ চাউল প্রস্তুত করিতে খরচ কম ধরা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃত দেখা যায় উষ্ণা চাউল অপেক্ষা আতপের মূল্য অধিক।—লেখক।

ধান্যের উৎকর্ষাপকর্ষ এবং চাউলের কাঁড়া আঁকাড়ার উপর চাউল প্রস্তুত করিবার খরচের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। উপরে যে হিসাব প্রদত্ত হইল, উহা মাঝারি রকম উৎপন্নের হিসাব। বাংলার মাঝারি রকমের একমণ ধান্য হইতে ২৬ সের চাউল, ১৩ সের তুষ ও ১ সের কুঁড়ো পাওয়া যায়। মোটা ধান্য হইতে চাউলের পরিমাণ কিছু বেশী এবং সরু ধান্য হইতে মিহি চাউলের পরিমাণ কিছু অল্প হইয়া থাকে।

আমেরিকা ও বর্ম্মায় যে উন্নত পদ্ধতিতে চাউল প্রস্তুত হইতেছে তাহার সংক্ষেপ বর্ণনা অসম্ভব। যে পদ্ধতি কার্য্যকরী অথচ অল্পব্যয় বলিয়া আমাদের দেশের উপযুক্ত এবং যাহা অনুসরণ করিয়া আমি নিজে সন্তোষজনক ফল পাইয়াছি, সেই পদ্ধতি সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করিতেছি।

ধান ঝাড়িয়া পরিষ্কার করা।

চাউল প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ধান হইতে আবর্জ্জনা (মাটির গুটি, কাঠি, খড়, কুটা ইত্যাদি) পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয়। ইহার জন্য 'আবর্ত্তিত-পরিষ্কারক যন্ত্র' (circular-motion seperator) ব্যবহার করিলে ভাল হয়।* এই যন্ত্র রেঙ্গুনে ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্র আতপ চাউল প্রস্তুত করিতে আবশ্যক; সিদ্ধ বা উষ্ণা চাউল প্রস্তুত করিতে ব্যবহার না করিলেও চলে; উষ্ণা চাউলের জন্য ধান জলে ভিজাইয়া দিতে হয়, এবং জলে পড়িলে আপেক্ষিক গুরুত্ব ধান হইতে সকল আবর্জ্জনা পৃথক করিয়া ফেলে। খড় কুটা ভাসিয়া উঠে, মাটি গলিয়া যায়।

জলে ভিজান।

উষ্ণা চাউল তৈয়ার করিতে হইলে সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে সকল আবর্জ্জনা দূর ও তুষ নরম করিবার জন্য ধান ২৪ ঘণ্টা পরিষ্কার টাটকা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়।

সিদ্ধকরা।

তৎপরে ধান অর্দ্ধসিদ্ধ করিয়া লইলে প্রস্তুতকারকের সুবিধা ও শ্রমলাঘব হয় এবং আহারের পক্ষেও সুপাচ্য হয়। আমাদের দেশে ধান জলে ফেলিয়া সিদ্ধ করা হয়; কিন্তু সেরূপ না করিয়া গরম বাষ্পের ভাপে সিদ্ধ করিলে শ্রম-লাঘব, সময় বাঁচান এবং কার্য্য চারুতর হয়। ভাপে সিদ্ধ করিবার একরূপ যন্ত্র আছে,—যে পাত্রে ধান থাকে সেই পাত্রে সংলগ্ন নল বহিয়া অন্য জলের পাত্র হইতে গরম বাষ্প সঞ্চরিত হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ চাউল জলে সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট হয়। *

শুষ্ক করা।

আলো এবং উষ্ণা উভয়বিধ চাউল প্রস্তুত করিতে রৌদ্রে শুষ্ক করা আবশ্যক হয়। (উষ্ণা করিতে ধান সিদ্ধ করার পর শুকাইতে হয়)। শুষ্ক করার উদ্দেশ্য ধানের তুষ চাউলের দানার গা হইতে আলগা করিয়া লওয়া। শুষ্ক হইলে চাউলের দানা যে পরিমাণ সঙ্কুচিত হয়, তুষ সে পরিমাণে হয় না; ইহাতেই তুষ আলগা হইয়া যায়। সিদ্ধ ধান শুকাইলে কার্য্য ভাল হয়। সিদ্ধ করিলে চাউলের দানা ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে, এবং শুষ্ক হইলে অধিক সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। শুকাইতে অসিদ্ধ ধানের ৩ ঘণ্টা ও সিদ্ধ ধানের ৫ ঘণ্টা লাগে। মাঝে মাঝে ধান নাড়িয়া দেওয়া দরকার হয়।

অধিক পরিমাণ ধান রৌদ্রে শুষ্ক করা বিষম ল্যাঠা ও কষ্টকর। এজন্য বর্ম্মায় (এবং এদেশেও) উত্তপ্তীকৃত বাতাসের সাহায্যে শোষণকার্য্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া সন্তোষজনক ফললাভ হয় নাই। এবং এরূপে শুষ্ক ধান্যের চাউল পরিষ্কার সাদা হয় না। কিন্তু চা ও গম যখন এই উপায়ে সুচারুরূপে শুষ্ক হইতেছে, তখন চাউল সম্বন্ধেও একেবারে হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। এ পর্য্যন্ত যতপ্রকার যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা হইয়াছে, তন্মধ্যে গীব সাহেবের গম শুষ্ক করা যন্ত্র (Gibb's Wheat Dryer) হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বোধ হয়, খরিদদার যুটিলে টমাস রবিনসন কোম্পানি (Messrs. Thomas Robinson and son, Ld, of Rochdale) যাঁহারা প্রসিদ্ধ Mallinson's Wheat

* আমাদের সনাতন যন্ত্র কুলার এখন পেন্সন পাইবারও সময় ও দাবী হইয়াছে।—লেখক।

* আমি জানি বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত মানকর প্রভৃতি স্থানে গরম ফুটন্ত জলের হাঁড়ির মুখের উপর বাঁশের চাঙারী বা ঝুড়িতে ধান রাখিয়া বাষ্পস্বেদ দেওয়া হয়। এই উপায় সকলের দ্বারা সহজেই অনুসৃত হইতে পারে। এই উপায়ে প্রস্তুত চাউল আলো বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রচলিত আতপ-প্রস্তুত-প্রক্রিয়া অপেক্ষা ইহা বোধ হয় সহজসাধ্য। অতএব ইহা অনুসৃত হইলে ব্যবসায়ী অধিকতর লাভবান হইতে পারেন।— লেখক।

Dryer প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহারা উৎকৃষ্ট ধান্য শুকাইবার যন্ত্রও নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারেন। সালকিয়ার শ্রীযুক্ত রাখালদাস খাঁ কৃত ধান শুকাইবার যন্ত্র চেতলার এক কলে ব্যবহৃত হইতেছে এবং তাহা দ্বারা যথেষ্ট কার্য্যও সম্পন্ন হইতেছে। এই কল ৪ জন কুলির দ্বারা ৮ ঘণ্টা চালিত হইলে ৪০/০ মণ ধান্য শুষ্ক করিতে পারে। সুতরাং রাখাল বাবুর কলের কার্য্য রৌদ্র শোষণ অপেক্ষা সহজ বা সস্তা কিছুই নহে।

ধান ভানা।

ধান শুকাইলে কুটিতে হয়। ইহার দেশী যন্ত্র সেই নারদ মুনির আমলের ঘুণ ধরা ঢেঁকি। ধানভানা কল ইংলণ্ড, জর্ম্মনী প্রভৃতি বহু দেশে প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু সর্ব্বোত্তম কল আমেরিকা ও বর্ম্মাতে প্রস্তুত হয়।

ছোট খাটোর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধানভানা কল Engelberg Huller No. 2. ইহাতে মাঝারি রকমের ৬০/০ মণ ধান ৮ ঘণ্টায় ভানা যায়। মূল্য ৭০০৲ টাকা। সালকিয়ার রাখালবাবুর কলও মন্দ নয়। তাহাতে ৮ ঘণ্টায় ৪০/০ মণ ধানভানা যায়। মূল্য ৩০০৲ টাকা মাত্র। রাখালবাবুর কলের আর এক সুবিধা এই যে কলের ক্ষয়িত, ভগ্ন বা নষ্ট অংশ বদলাইতে Engelberg কলের কোন অংশ বদলাইবার খরচ অপেক্ষা খরচ ঢের কম পড়ে। শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর ঘটকের কল অকর্ম্মণ্য। রেঙ্গুনে প্রস্তুত Cowie's Huller বাংলা ধানের পক্ষে সর্ব্বোত্তম কল। কিন্তু এই কল স্থাপন ও চালান উভয়ই সামান্য মূলধনে চলে না। এই কল নানা আকারের হয়, এবং ১০০ হইতে ২০০ মণ আঁছাটা চাউল প্রস্তুত করিতে সক্ষম।

কাঁড়ান।

তুষহীন হইলেও চাউল খুব পরিষ্কার হয় না। ইহাকে পুনরায় কুটিয়া বা কাঁড়াইয়া পরিষ্কার করিতে হয়, অন্যথা চাউল কিছু মোটা, ময়লা ও খসখসে হয়। Engelberg Huller No. 1, চাউল কাঁড়াইবার পক্ষে মন্দ যন্ত্র নহে। রেঙ্গুনের The white Rice Cone নামক যন্ত্র, অতি সুন্দর এবং ইহার কার্য্যকরণক্ষমতাও যথেষ্ট, কিন্তু ইহা অধিক ব্যয়সাপেক্ষ।

ছাঁটা।

কাঁড়ান হইলেই চাউল বেশ সাদা হয়। কিন্তু বিদেশে রপ্তানি বা ক্রেতা মুগ্ধ করিবার জন্য পুনরায় কুটিয়া চকচকে পালিশ করিয়া লওয়া হয়। রামকৃষ্ণপুর চালের কলে (The Ramkristopur Rice Mills, Ld.) জার্ম্মানীতে নির্ম্মিত Schluze's Pearler নামক যন্ত্রে সুন্দর চাউল ছাঁটা চলিতেছে।*

উপরি বর্ণিত উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত চাউলের প্রতি-মণে তৈয়ারি খরচ আলোতে আড়াই আনা এবং উষ্ণায় তিন আনা পড়ে। ইহা আছাঁটা চাউলের পক্ষে। ছাঁটা চাউলে গড়ে মণ প্রতি তিন আনা তৈয়ারি খরচ পড়িবে। যদি সিদ্ধ চাউল শুকাইবার কোন সহজ কৃত্রিম উপায় আয়ত্ত করা যায়, তাহা হইলে খরচ আরো আধ আনা কমান যায়। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে আমেরিকা বা রেঙ্গুনের চাউল প্রস্তুত প্রণালী এদেশে যথেষ্ট ভাবে অনুসৃত হইলে, আমাদের জীবনোপায় প্রধান খাদ্য চাউলের দর মণকরা অন্তত পক্ষে চারি আনা কমিয়া যাইতে পারে এবং যথেষ্ট পরিমাণ পরিশ্রমেরও উপচয় হইয়া অন্য কোন লাভজনক ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে পারে। এই লাভ বাহ্যত দেখিতে সামান্য হইলেও আমাদের মত দরিদ্র দেশে গৃহস্থ বা ব্যবসায়ী কাহারই উপেক্ষা অবহেলার যোগ্য নহে।

বাংলায় তূলার চাষ।

অন্ন চিন্তার পর উগ্রতার হিসাবে বস্ত্র চিন্তা প্রধান। এবং এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে ম্যাঞ্চেষ্টারের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবারও আর যো নাই।

বস্ত্র বহুবিধ আঁশ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে যথা—তূলা, পাট, শন, রিয়া, এলো, কদলী, রেশম, পশম প্রভৃতি। এতন্মধ্যে সাধারণত ব্যবহারের জন্য তূলা ও পাটের আঁশই ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য আঁশ সৌখীনতা বা বিশেষ অবস্থা বা সময়ের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তূলা ও পাটের মধ্যে তূলাই আবার মুখ্য ও প্রচলিত উপাদান। এজন্য বাংলা গভর্ণমেণ্টের চাষ বিভাগের সহকারী কর্ত্তা (Assist-

* আমাদের দেশে সাধারণতঃ চাউলে বালি মিশাইয়া ঢেঁকিতে চাপও ঘর্ষণের সাহায্যে চাল চকচকে করা হয়। দেখিতে সুন্দর হয় বটে, কিন্তু খাওয়া ভুকর, একেবারে বালুকাহীন হয় না।—লেখক।

ant Director of Agriculture, Bengal) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ "বঙ্গে তূলার চাষ" বিশেষ ভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রবন্ধে তূলা-চাষ সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান লাভ করা যায় না। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তিতে আমাদের বিশেষ কোন উপকারের আশা নাই বলিয়া অতি সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্যের সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

বাংলায় তূলার চাষ ক্রমশ কমিতেছে, কিন্তু ভারতে বাড়িতেছে। ঢাকায় পূর্ব্বে যখন মসলিন প্রস্তুত হইত, তখন ঐ জেলায় তূলার চাষ চলিত ছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঢাকাস্থ রেসিডেন্ট জন বেব ১৭৯০ সালে লিখিয়াছেন যে তূলার চাষে চাষীর প্রতি একর জমিতে (তিন বিঘায়) মোটে ৭॥০ টাকা আয় থাকিত। এবং লাভের অল্পতাই তূলার চাষের ক্রমশ হ্রাস প্রাপ্তির কারণ।

প্রাচীনকালে বাংলায় বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক তূলার চাষ হইলেও, বাংলার আবশ্যক পরিমাণ তূলা বাংলায় উৎপন্ন হইত না; ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানি করিতে হইত। এখনো বাঙালী চাষীর অন্যবিধ লাভজনক চাষ (যথা পাট, ধান ইত্যাদি) ছাড়িয়া তূলার চাষ অবলম্বন করা উচিত নয়। পূর্ব্বকালের মত এখনো বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আমদানি করিয়া বঙ্গের অভাব পূরণ হইতে পারে।

মিশর দেশের তূলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তন্নিম্নে মার্কিনের, এবং উহাদের অপেক্ষা বহু অপকৃষ্ট ভারতের তূলা। এ জন্য ভারতের তূলার আদর কম। ভারতে ১ কোটি ৯০ লক্ষ একর ভূমিতে ৩০ লক্ষ গাঁইট তূলা জন্মে এবং মার্কিণে ২ কোটি ৮০ লক্ষ একর ভূমিতে ১ কোটি গাঁইট তূলা উৎপন্ন হয়। অপকৃষ্ট অল্প জিনিষ লইয়া প্রতিযোগিতা একরূপ অসম্ভব।

উৎকৃষ্ট তূলা জন্মাইতে পারিলে চলিতে পারে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দ্বারা বহুবারের বহু চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক Mr. Medlicott's *Cotton Hand-Book for Bengal* নামক পুস্তকে সেই সকল নিষ্ফল চেষ্টার বিবরণ দেখিতে পাইবেন।

আমাদের দেশের জলবায়ু তূলা চাষের নিতান্ত অনুপযোগী। আমেরিকায় এপ্রেল মাসে বপন করিয়া নবেম্বরে ফসল লওয়া হয়। ঐ সময়ের মধ্যে সে দেশে মোটে ২৫ ইঞ্চ বৃষ্টি পড়ে। এপ্রিল মে মাসে একটু বেশী বৃষ্টি হইলে ফসল খারাপ হইয়া যায়। আমাদের দেশের কোন অংশে ঐ সময়ে চাষ আরম্ভ করিবারই মত বৃষ্টি হয় না, কোন অংশে বা রীতিমত বর্ষা আরম্ভ হইয়া যায়। এবং বাংলার অনেক জমিই নিতান্ত নিম্ন; জমিতে জল দাঁড়াইলে তূলা ভাল হয় না। মিশর দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থার পার্থক্য আরো অধিক। মিশরে বৃষ্টি খুব কমই হয়, এবং সেচন দ্বারা চাষ ইচ্ছানুরূপ হইয়া থাকে। এজন্য মিশরে প্রতি একরে ৫০০ পাউণ্ড, আমেরিকায় ২০০ পাউণ্ড এবং ভারতে ৮০ পাউণ্ড মাত্র উৎপন্ন হয়।

কিন্তু অতীতের বিফলতা দেখিয়া বর্ত্তমানে নিবৃত্ত থাকিবার আবশ্যকতা নাই। তখনকার অপেক্ষা চাষ প্রণালী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে। বিজ্ঞান সাহায্যে বিদেশী তূলা দেশের উপযোগী করিয়া লওয়া যায়। আমেরিকা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ হইতে এক প্রকার তূলা লইয়া চাষ করিতে আরম্ভ করে। ইহার গাছ বারমাস থাকে এবং শীতকালে তূলা পাকে। প্রথমবারে আমেরিকার শীতের প্রকোপে সব তূলা নষ্ট হইয়া যায়। গাছগুলি কিন্তু রাখিয়া দেওয়া হয়; এবং সেই সকল শুষ্ক গাছ হইতে বসন্তের মোহনস্পর্শে নব পল্লবোদ্গম হয় ও পরবর্ত্তী গাঢ় শীত পড়িবার পূর্ব্বেই শরতের মধ্যে তূলা পাকিয়া উঠে। এই বীজ হইতে নূতন বৃক্ষ উৎপাদিত হয়, এবং তাহাদের মধ্যে আবার যাহারা শীঘ্র ফুল ফল প্রসব করে তাহাদের বীজ বাছিয়া লইয়া চাষ করা হয়। এইরূপ কয়েক বৎসরের চেষ্টায় অক্টোবর নবেম্বরে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ জাত তূলার মত সুন্দর তূলা উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং ক্রমশ আদিম নমুনা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইয়া উঠিতেছে।

মিশরদেশীয় তূলার সহিত সাঙ্কর্য্যসম্পাদন দ্বারা আমেরিকার তূলা ক্রমশ অতি উৎকৃষ্ট হইতেছে। আমাদের দেশে এই উপায় অনুসরণ করিয়া দেখা যাইতে পারে। ডাঙা মাঠের দো-আঁসলা জমিতে তূলা খুব ভাল হয়। এবং চেষ্টা করিলে যে আবহজনিত অসুবিধা দূর করা যায় না, তাহা বোধ হয় না।

ভারতে পাটের চাষ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বস্ত্র নির্ম্মাণে ব্যবহৃত সর্ব্বপ্রকার আঁশের মধ্যে তূলা প্রথম এবং পাট দ্বিতীয়। এজন্য এক্ষণে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের চাষবিভাগের শ্রীযুক্ত এন, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুলিখিত প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছি :—

১৮২৮ সালে যখন প্রথম য়ুরোপে পাট রপ্তানি আরম্ভ হয়, তখন হইতেই ভারতে রীতিমত পাটের চাষের সূত্রপাত। তৎপূর্ব্বে পারিবারিক ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক চাষী অতি সামান্য পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিত মাত্র। পাটের চাষ এক্ষণে ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে এবং পাটের ব্যবহারও নানাদিকে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। ইহা এক্ষণে বিশেষ লাভজনক ফসল হইয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে ৪ কোটী ২৫ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন হইয়াছে এবং এ দেশে বর্ত্তমান বর্ষে সর্ব্বমোট কলের সংখ্যা ২৩৮৮৪ হইয়াছে। পরিমাণের সঙ্গে কলের সংখ্যা প্রতি-বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে। পাটের আবশ্যকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যও ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে হইতে ১০ বৎসর পূর্ব্ব অপেক্ষা বর্ত্তমানে দ্বিগুণ মূল্য হইয়াছে।

কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা পাটের অপকর্ষ ঘটিয়াছে। ইহার কারণ (১) ফসলের অবনতি (২) জমির অবনতি (৩) চাষে অনবধানতা (৪) সার প্রদানের অভাব (৫) পাট তৈয়ারিতে অসতর্কতা (৬) ওজন বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ীর নানাপ্রকার প্রবঞ্চনা। প্রত্যেক চাষী ও ব্যবসায়ীর এই দোষ কয়টির প্রতি অবহিত হইয়া প্রতিকার চেষ্টা কর্ত্তব্য। অন্যথা য়ুরোপ আমেরিকার কারিগরেরা বিরূপ হইয়া অন্য দেশের দ্রব্য লইতে আরম্ভ করিলে এতবড় লাভজনক ব্যবসায় ভারত হইতে অচিরে লুপ্ত হইয়া যাইবে। ইতিমধ্যে অন্য-বিধ বৃক্ষ হইতে আঁশ সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে, এবং কোন কোন বৃক্ষ হইতে পাটের মত উৎকৃষ্ট আঁশ পাওয়া গিয়াছে। যথা—শন, পটুয়া, ধৈঞ্চে, আমেরিকার এলো, মার্ত্ত, আকন্দ, রমি বা রিয়া প্রভৃতি। সুতরাং পাটের চাষী ও ব্যবসায়ীদের সময় থাকিতে সাবধান হওয়া উচিত।

যাঁহারা উন্নত পদ্ধতিতে পাটের চাষ অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ শিরোনাম হইতে আবশ্যকীয় ইঙ্গিত সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

পাটের দেশীয় নাম।

পাট, কোষ্টা, নালিতা, ঝুঁটো, নলিয়া, নরচা ইত্যাদি।

প্রকার—পাট দ্বিবিধ। একপ্রকারের ডাঁটা লাল, ইহা অধিক উৎপন্ন হয় না। ইহার বীজ লম্বা ধরণের; নিম্ন জলপ্লাবিত জমিতে জন্মে না। অপর প্রকারের ডাঁটা সবুজ, বীজ গোল, এবং জলে ডোবা জমিতেও বেশ উৎপন্ন হয়। বাংলায় এই দ্বিতীয় প্রকারের চাষই অধিক দেখা যায় এবং এই সবুজ ডাঁটার পাট গাছে আঁশও অনেক অধিক পাওয়া যায়। বিভক্ত দুই শ্রেণীর বোটানি বা উদ্ভিদ বিদ্যার নাম Capsularis এবং Olitorious। উভয় বিভাগেই লাল সবুজ দুই প্রকারের পাট আছে। তন্মধ্যে সবুজ Capsularis এবং লাল Olitorious চাষের পক্ষে ভাল এবং প্রচুর উৎপন্ন হয়।

চাষের সীমা।

যুক্ত বঙ্গে ২৭ জেলায় এবং ৩১৪৪৬০০ একর জমি অধিকার করিয়া পাট চাষ হয়। কুচবেহার, নেপাল ও বিহারেও পাটের চাষ ক্রমশ প্রস্তৃত হইতেছে।

জমি।

পাট সকল প্রকার জমিতেই উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু চর জমি বা নিম্ন জলে-ডোবা জমিতেই খুব ভাল হইতে দেখা যায়। সুন্দরবনের লোণা জমিতেও পাট হইতেছে, দো-আঁসলা জমিতে প্রচুর উৎপন্ন হয়; কাঁকরের জমিতে বা ইষ্টকবর্ণ জমিতে ভাল জন্মে না।

আবহ।

ফসলের সময়ের প্রথম ভাগে যথেষ্ট উত্তাপের এবং যথেষ্ট বৃষ্টি ব্যতীতও প্রচুর রসসঞ্চরণের উপর ভাল ফসল প্রাপ্তি নির্ভর করে।

পরবর্ত্তী ফসল।

অনেক চাষী পাটের জমিতে অন্য কোন ফসল না বুনিয়া পর বৎসর সেই পতিত জমিতে পুনরায় পাট বুনিয়া থাকে। এ প্রথা ভাল নহে। উঁচু জমিতে মটর কলাই জাতীয় ফসলের পরে উত্তম পাটের ফসল পাওয়া যায় দেখা গিয়াছে। ইহা আউস ধান্যের পর বুনিলে এবং পাট কাটিয়া লইয়া আমন ধান্য বা আলু সেই জমিতে বুনিলে সকল ফসলই

কোন ব্রণ পীড়া উদ্গত হইলে বাঙ্গালার কৃষি বিভাগের কর্ত্তাকে (Director of Agriculture, Bengal) জানাইলে প্রতিকারের উপায় পাওয়া যাইতে পারে।

নিম্নলিখিত ঔষধটি পোকালাগা পত্রে সেচন করিলে পোকা মরিয়া যায়। কিন্তু ইহা কিঞ্চিৎ ব্যয়সাপেক্ষ।

২ গ্যালন (সওয়া সাত সের) কেরোসিন তেল; ½ পাউণ্ড (এক পোয়া) বার সোপ এবং ১ গ্যালন গরম ফুটন্ত জল একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ৩০।৪০ গ্যালন জল মিশাইয়া পাতলা করিয়া লইলে এক-একর জমিতে সেচন করা যায়। পিচকারি সাহায্যে গাছের উপর ছড়াইয়া দিতে হয়।

নিম্নলিখিত অল্প খরচের উপায়টিও পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

১৬ ফুট লম্বা, ১৪ ফুট চৌড়া একখানা কাপড় (টুকরা কাপড় সেলাই করিয়া ঐ মাপের কাপড় তৈয়ার করা যাইতে পারে) ভাঁজ করিয়া দুই মুখ সেলাই করিয়া থলির মত করিতে হইবে। দুই মুখে শক্ত কাপড়ের ফালি সেলাই করিয়া তাহাতে ২ ফুট লম্বা বাঁশের টুকরা বাঁধিয়া দুইজনে বাঁশ ধরিয়া পাটগাছের উপর দিয়া সমতলভাবে ও দ্রুত টানিয়া লইয়া গেলে অনেক পোকা সেই জালে পড়িবে। তাহাদিগকে ঝাড়িয়া ১০ ভাগ জল ও ১ ভাগ কেরোসিন তেলের মিশ্রণে ছাড়িয়া দিলে মরিয়া যাইবে।

ভেজাল ও প্রবঞ্চনা।

বালি এবং জল দিয়া পাট অনেক সময় ভারি করা হয়। এই প্রবঞ্চনা ও ভেজালে পাটের অবস্থা খারাপ হইয়া যায়। বিলাতের কারিগরেরা এজন্য নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সময় থাকিতে চাষী, আড়তদার, খরিদ্দার প্রভৃতি সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট প্রতিষেধক আইন কল্পনা করিতেছেন, কিন্তু চাষী প্রভৃতিরা প্রকৃত অবস্থা না বুঝিলে সে আইনে বিশেষ কিছু সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয় না।

পাটের উৎপন্নসীমা, বাজার ও প্রকার।

প্রাদেশিক নাম।	জন্মস্থান।	পাটের প্রকার।
১। উত্তরীয়া	রংপুর ও জলপাইগুড়ি	হেউতি, ভাদিয়া
২। সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	ককায়া বোম্বাই দেশী
৩। নারায়ণগঞ্জ	ময়মনসিংহ	বরণ বা বড় পাট
৪। দিয়ারা বা চর	ফরিদপুর	সূত পাট
৫। দেশী	কলিকাতার সন্নিহিত হুগলি প্রভৃতি স্থান	দেশী নল পাট

পাটের প্রধান বাজার:—সিরাজগঞ্জ (পাবনা), নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) মাদারিপুর (ফরিদপুর), চাঁদপুর (ত্রিপুরা), ডোমার (রংপুর), এবং চিৎপুর (কলিকাতা)।*

পাটগাছের আবশ্যকতা।

পাটের আঁশ ব্যতীত পাট গাছ অনেক কাজে লাগে। ধানের ক্ষেতে ভাদুলিয়া নামক একরূপ ঘাস জন্মিয়া ধানের বড় ক্ষতি করে। যে ক্ষেতে এই ঘাস অধিক জন্মে, সেই ক্ষেতে পাটের চাষ করিলে ঐ ঘাস মরিয়া যায়। এ দেশের অনেক কৃষক ইহা অবগত আছে। পাতা ও ডগা কাঁচ অবস্থায় বাঙালী গৃহস্থের প্রিয় খাদ্য। ইহার পাতা উপকারী ঔষধ (নালিতা পাতা)। সবজী সারের মধ্যে পাট অন্যান্য সবজি সারের সমকক্ষ। পাটকাঠি রন্ধনে জ্বালানি এবং পানের বরজের বেড়া ইত্যাদি কার্য্যে প্রচুর ব্যবহার হয়। ইহার কাঠিতে দেশী দেশালাইয়ের কাঠিও হইতেছে। গাছের মূল কাগজের একটী প্রধান উপাদান। বীজ হইতে এক প্রকার জ্বালানি তেলও বাহির করা যায়। তাহার খোল পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

পাটের আঁশ হইতে দড়ি, দড়া, কাপড়, কাগজ, চট, খোলে ইত্যাদি বহু আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পাটের চাষী।

জাতি নির্ব্বিচারে সকল কৃষক ইহার চাষ করে।

উপসংহার।

প্রতি বৎসর কৃষিবিভাগ হইতে দুইবার করিয়া পাটের চাষের পরিমাণ ও ফসলের পরিমাণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে ব্যবসাদার ও সাধারণে যথেষ্ট তথ্য অবগত হইয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট যেরূপ যত্ন করিতেছেন, অচিরে পাট বঙ্গের প্রধান ব্যবসায়-সামগ্রী হইয়া উঠিবে।

* প্রবন্ধকার মালদহ, পূর্ণিয়া, দিনাজপুর এবং কলিকাতার সন্নিহিত প্রধান বাজার ভদ্রেশ্বরের উল্লেখ করেন নাই।—লেখক।



বিচারপতি সৈয়দ শারফুদ্দিন্।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

কদলীতন্তু।

আমাদের দেশের প্রতি পল্লীতে প্রতি বৎসর কত কলাগাছ অযথা নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু উহার ফল গ্রহণের পর আমরা যে ঐ সকল গাছ হইতে আঁশ বা সুতা বাহির করিয়া যথেষ্ট লাভবান হইতে পারি, ইহা বোধহয় অনেকেরই অজ্ঞাত। শ্রীযুক্ত জে, এন, ব্যানার্জ্জি এ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়া শিল্পসমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

কলার সুতা বা আঁশ সম্বন্ধে ভারতের অভিজ্ঞতা নিতান্ত নূতন নহে। ক্রিমীয় যুদ্ধের সময় রুষ হইতে ইংলণ্ডে পাটের রপ্তানি বন্ধ হইলে ভারত গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন প্রকারের আঁশ ও তাহাদের মূল্য সম্বন্ধে সন্ধান করিয়া ইহার অস্তিত্ব অবগত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহা তৎকালে সংগৃহীত না হওয়ার কারণ (১) সাধারণ লোকের অনভিজ্ঞতা; (২) ভারতে বহুবিধ তন্তুপ্রদ বৃক্ষের প্রাচুর্য্য এবং সে সকলের ব্যবহারে সাধারণ লোকের অভিজ্ঞতা, এবং (৩) উপযুক্ত তন্তুনিষ্কাশন কলের অভাব।

আমি পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছি যে ফল হইয়া যাওয়ার পর একটা কলাগাছের থাম হইতে প্রায় তিন পোয়া ওজনের পরিষ্কার, উজ্জ্বল, দীর্ঘ এবং মূল্যবান আঁশ বা তন্তু সংগৃহীত হইতে পারে। একজন বয়স্ক লোক সপ্তাহের শিক্ষায় দিনে ৮টা গাছ শেষ করিতে পারে, যদি একজন বালক তাহার সহকারীরূপে কলার থাম হইতে খোলাগুলি খুলিয়া খুলিয়া সিকি ইঞ্চ চৌড়া করিয়া লম্বা ফালি চিরিয়া দেয় এবং উৎপন্ন তন্তু সকল সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেয়। বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক মজুরী চারি আনা ও বালকের দেড় আনা ধরিলে দৈনিক সাড়ে পাঁচ আনা খরচে প্রায় ৭ সের তন্তু পাওয়া যায়। এইরূপে বিশেষ শিক্ষিত লোকের জন্য অধিক মজুরী ধরিয়াও ৫৫৲ টাকায় এক টন ওজনের তন্তু পাওয়া যাইবে। ইহাতে রেলভাড়া, গোগাড়ী ও কুলি ভাড়া, গাঁটবাঁধাই খরচ, রেলভাড়া, ব্যবসায় কমিশন, ইন্সিওরেন্স খরচ ইত্যাদি বাবত আরো ৪০৲ টাকা যোগ করিলে ৯৫৲ টাকা হয়। মোটামুটি ধরিলে ১০০৲ টাকায় এক টন* কদলীতন্তু লণ্ডনে গিয়া পৌছিবে। সম্প্রতি প্রাপ্ত London Chamber of Commerce প্রদত্ত দরের সর্ব্বনিম্ন হার ধরিলেও প্রতি টন তন্তুর মূল্য ৫৬০ টাকা, অর্থাৎ প্রতি টনে নেট আয় ৪৬০৲ টাকা।

বাংলার এক বিঘা জমিতে প্রায় ৪০০ ঝাড় কলা লাগান হয়। সুতরাং বিঘা প্রতি ফলকর ও পাতার আয় বাদে ৯৴ মণ তন্তু হইতে ১৫০৲ টাকা বেওজর আয় পাওয়া যাইবে। এই দেড় শত টাকা অবশ্য সমস্তই চাষের মালিকের পকেটে পৌছিবে না। চাষের খরচ ইত্যাদি বাদে বিঘা প্রতি অন্তত পক্ষে ২৫টা টাকা নেট আয় তাঁহার অনিবার্য্য। অতএব দেখা যাইতেছে এই কলার চাষ যথেষ্ট লাভজনক এবং খনার বচন "৩৬০ ঝাড় কলা রুয়ে থাকগে গৃহস্থ ঘরে শুয়ে" নিতান্তই সত্য বলিয়া মনে হয়।

কলা ১৮ মাসের ফসল। প্রথমত চাষ করিয়া ফল-সমাপ্তির জন্য ১৮ মাস অপেক্ষা করিয়া না থাকিয়া স্বকীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অব্যবহার্য্য কলার থাম সকল সংগ্রহ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত জে, এন ব্যানার্জ্জি ১৫ টাকা মাত্র মূল্যে কদলী-তন্তু নিষ্কাশন যন্ত্র সরবরাহ করিতেছেন। এই কল মজবুত, সহজ বহনীয়, সরলনির্ম্মাণ এবং কর্ম্মক্ষম। এই কলে প্রস্তুত আঁশ হইতে দিব্য শক্ত সূত্র বা দড়ি প্রস্তুত হইতে পারে এবং উহা বিবিধবর্ণে রঞ্জিত করিয়া কার্পেট, রাগ (কম্বল) পরদা প্রভৃতি বিবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে। * ইহার কল কলিকাতা শিল্পপ্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাপ্তি স্থান ৯, কাশীমিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

* ২৭ মণে এক টন।—লেখক।

* আমি কদলীতন্তু নির্ম্মিত কাপড়, রূমাল ও জামার কাপড় দেখিয়াছি। উহা সিল্ক, গরদ বলিয়া ভ্রম হয়। উজ্জ্বল ও টেঁকসই।—লেখক।

বৌদ্ধ প্রসঙ্গ।

(মূল পালি মিলিন্দ প্রশ্ন† হইতে।)

১। সন্ন্যাসীর শরীর।

রাজা বলিলেন, 'নাগসেন, সন্ন্যাসি- (প্রব্রজিত) গণের শরীর কি প্রিয়'?

† মিলিন্দ প্রশ্নের মূল কোপেনহাগেনের V. Trenckner প্রকাশ করিয়াছেন। সিংহলেও কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। Rhys Davids

'না মহারাজ, সন্ন্যাসিগণের শরীর প্রিয় নহে'।

'তবে কি জন্য আপনারা ইহাকে বহন করেন * ও ইহার নিমিত্ত মমতা অনুভব করেন'?

'মহারাজ, আপনি কি কখন কোন সংগ্রামে গমন করিয়া শরাঘাত প্রাপ্ত হন না'?

'হাঁ হই'।

'মহারাজ, সেই ব্রণে কি কোন প্রলেপ লেপন করা হয়, তৈল মাখাইয়া দেওয়া যায়, এবং সূক্ষ্ম বসনের পটীতে তাহাকে ভালরূপে বেষ্টিত করিয়া রাখা হয়'?

'হাঁ মহাশয়; প্রলেপও লেপন করা হয়, তৈলও মাখান হয়, এবং সূক্ষ্ম বসনের পটীর দ্বারা তাহাকে ভালরূপে বেষ্টিত করিয়াও রাখা যায়'।

'মহারাজ, ব্রণ কি আপনার প্রিয় যে তাহাতে প্রলেপও লেপন করা হয়, তৈলও মাখান হয়, এবং সূক্ষ্ম বসনের পটীতে ভালরূপে বেষ্টিত করিয়াও রাখা হয়'?

'ব্রণ আমার প্রিয় নহে, তবে (সেখানে পুনর্ব্বার) মাংস জন্মিতে পারে এজন্য তাহাতে প্রলেপ লেপন করা হয়, তৈলও মাখান হয়, এবং সূক্ষ্ম বসনের পটীতে তাহাকে ভালরূপে বেষ্টিত করিয়াও রাখা যায়'।

'এইরূপই মহারাজ, সন্ন্যাসিগণের শরীর অপ্রিয়, অথচ তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যানুগ্রহের নিমিত্ত শরীর বহন করেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগের উৎসাহ থাকে না। মহারাজ, ভগবান্ শরীরকে ব্রণোপম বলিয়াছেন, তজ্জন্য সন্ন্যাসীরা শরীরের প্রতি নিরুৎসাহ থাকিয়াই ব্রণের ন্যায় তাহাকে বহন করেন। মহারাজ, ভগবান্ ইহা বলিয়াছেন—

"আর্দ্র চর্ম্মাবৃত মহাব্রণ নবদ্বার।
অপবিত্র পূতি গন্ধি গলে চারিধার"॥

'সাধু নাগসেন!'

২। বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞতা।

রাজা বলিলেন 'নাগসেন, বুদ্ধ কি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ছিলেন'?

'হাঁ মহারাজ, ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ছিলেন'।

'তবে নাগসেন, কিজন্য তিনি ক্রমানুসারে (যুগপৎ নহে) শ্রাবকগণকে শিক্ষাপদ সমূহ জানাইয়া ছিলেন'?*

'মহারাজ, আপনার কি এরূপ কোন বৈদ্য আছে, যে পৃথিবীতে সমস্ত ঔষধকেই জানে'?

'হাঁ আছে'।

'সেই বৈদ্য কি মহারাজ, রোগীকে (ঔষধ পানের উপযুক্ত) সময় আসিলে ঔষধ পান করায়, না (তাদৃশ) সময় না আসিলেই'?

'সময় আসিলেই রোগীকে ঔষধ পান করায়, না আসিলে করায় না'।

'এই প্রকারই মহারাজ, ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী হইলেও অকালে শ্রাবকগণকে শিক্ষাপদসমূহ জানান নাই; যাবজ্জীবন অনতিক্রমনীয় শিক্ষাপদসমূহ, তিনি সময় প্রাপ্ত হইলেই শ্রাবকগণকে জানাইয়া থাকেন'।

'সাধু নাগ সেন'!

৩। ভেষজ ও অভেষজ।

রাজা বলিলেন, 'নাগসেন, যে ব্যক্তি মাতা মৃত হইলে রোদন করে, এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মপ্রেমে রোদন করে, এই রোদনকারী উভয় ব্যক্তির মধ্যে কাহার অশ্রু ভেষজ সদৃশ, এবং কাহার ভেষজ সদৃশ নহে'?

'মহারাজ, একজনের অশ্রু রাগ দ্বেষ ও মোহে মলিন ও উষ্ণ, এবং আর একজনের প্রীতিজনিত সৌমনস্যে বিমল ও শীতল। মহারাজ, যাহা শীতল তাহাই ভেষজ, যাহা উষ্ণ, তাহা ভেষজ নহে'।

'সাধু নাগ সেন'!

৪। সরাগ ও বীতরাগ।

রাজা বলিলেন, 'নাগসেন, সরাগ ও বীতরাগের মধ্যে ভেদ কি'?

ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন ইহা Sacred Books of the East নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর মধ্যে ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

* মূল 'কেলায়থ'। শীলবংশকৃত পালি ধাতুমঞ্জুষায় 'কেল' ধাতুর অর্থ 'সঙ্কলনাদি' লিখিত হইয়াছে। Rhys Davids অর্থ ধরিয়াছেন 'to nourish.' cf. 'কায়ং পরিহরন্তি' ৫১ পৃঃ, সিংহল সংস্করণ।

* রাজার অভিপ্রায় এই যে বুদ্ধ যদি সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্বদর্শী হইতেন, তবে তিনি যুগপৎ সমস্ত শিক্ষাপদ উপদেশ দিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই; তিনি সময়ে সময়ে অনেকবারে তাহা উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে জানা যাইতেছে, পরে উপদিষ্ট বিষয়গুলির জ্ঞান, পূর্ব্ব বিষয়গুলির উপদেশের সময় বুদ্ধের ছিল না। অতএব তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্বদর্শী বলিতে পারা যায় না।

'মহারাজ, একজন আকাঙ্ক্ষাযুক্ত এবং একজন আকাঙ্ক্ষাযুক্ত নহে'।

'নাগসেন, এই আকাঙ্ক্ষাযুক্ত ও অনাকাঙ্ক্ষাযুক্ত, ইহার মানে কি' ?

'মহারাজ, একজন অর্থী আর একজন অর্থী নহে'।

'আমি দেখিতে পাই, যে সরাগ বা যে বীতরাগ, ইহারা সকলেই শোভন খাদ্যভোজ্যই ইচ্ছা করে, কেহই অশোভন ইচ্ছা করে না'।

'মহারাজ, অবীতরাগ ব্যক্তি ভোজ্যবস্তুর রস ও রসে একটী আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিয়া ভোজন করে, কিন্তু বীতরাগ ব্যক্তি রসমাত্র অনুভব করিয়া ভোজন করে। সেই রসে তাহার আকাঙ্ক্ষা থাকে না'।

'সাধু নাগসেন'!

৫। বুদ্ধের স্মরণ ও প্রাণাতিপাত।

রাজা বলিলেন, 'ভগবন্ নাগসেন, আপনারা বলিয়া থাকেন, 'যে ব্যক্তি শত বর্ষ ধরিয়া পাপকার্য্য করে, সে মরণকালে একবার বুদ্ধের স্মরণ করিলে দেবতাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিবে'। এ কথায়, আমি শ্রদ্ধা করি না। আপনারা আরও বলেন, 'একটীও প্রাণাতিপাত করিলে নরকে উৎপন্ন হইতে হইবে'। এটাও আমি শ্রদ্ধা করি না।

'মহারাজ, আপনি কি মনে করেন? ক্ষুদ্র পাষাণও কি নৌকা বিনা জলে ভাসিতে পারে'?

'নিশ্চয়ই না'।

'মহারাজ শতবাহনবাহ্য পাষাণকে যদি নৌকায় স্থাপন করা যায়, তবে কি তাহা জলে ভাসিবে'?

'হাঁ, ভাসিবে'।

'মহারাজ (এখানে) যেমন নৌকা, কুশলকর্ম্মকেও সেইরূপ দেখিবেন'।

'সাধু নাগসেন'!

৬। ভবিষ্যৎ দুঃখ।

রাজা বলিলেন, 'নাগসেন, আপনারা কি অতীত দুঃখের ধ্বংসের জন্য অধ্যবসায় করিয়া থাকেন'?

'না মহারাজ'।

'তবে কি অনাগত (ভবিষ্যৎ) দুঃখের ধ্বংসের জন্য অধ্যবসায় করেন'?

'না মহারাজ'।

'তবে কি বর্ত্তমান দুঃখের ধ্বংসের জন্য'?

'মহারাজ, ইহাও নহে'।

'যদি আপনারা অতীত, অনাগত, বা বর্ত্তমান দুঃখের ধ্বংসের জন্য অধ্যবসায় না করেন, তবে এই অধ্যবসায়ের প্রয়োজন কি'?

স্থবির বলিলেন 'কি প্রয়োজন মহারাজ? এই (বর্ত্তমান) দুঃখ নিরুদ্ধ (বিনষ্ট) হইবে। এবং অপর কোন দুঃখ উৎপন্ন হইবে না এই জন্যই অধ্যবসায়'।

'নাগ সেন, অনাগত দুঃখ কি আছে'?

'না মহারাজ, নাই'।

'তবে দেখিতেছি আপনারা অতি পণ্ডিত, কেন না যাহা নাই, সেই দুঃখেরই ধ্বংসের জন্য আপনারা অধ্যবসায় করেন!'*

'মহারাজ, আপনার কি কোন প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুরাজগণ কখন আপনার বিরুদ্ধে আসিয়া উপস্থিত হন?'

'হাঁ মহাশয়, উপস্থিত হন।'

'মহারাজ, সেই সময় কি আপনারা পরিখা খনন, প্রাকার গ্রন্থন, গোপুর ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ, এবং ধান্য প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রীর সংগ্রহ করাইয়া থাকেন'?

'নিশ্চয়ই না, পূর্ব্বেই সেই সমস্ত প্রস্তুত থাকে'।

'সেই সময় কি মহারাজ, আপনারা হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ, এবং ধনু ও খড়্গামুষ্টির পরিচালনা শিক্ষা করেন'?

'কি জন্য?' 'না, পূর্ব্বেই তাহা শিক্ষিত থাকে'?

'অনাগত ভয়ের নিবারণ জন্য'।

'মহারাজ, অনাগত ভয় নামে কি কিছু আছে'?

'না মহাশয়'।

'মহারাজ, আপনারা অতি পণ্ডিত! কেন না আপনারা অনাগত-অসৎ ভয়ের নিবারণ জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন'?

'দৃষ্টান্ত প্রদান করুন'।

'মহারাজ, আপনি যখন পিপাসিত হইবেন, তখন কি জল পান করিব বলিয়া কূপ, পুষ্করিণী বা তড়াগ খনন করাইবেন'?

---

* রাজার অভিপ্রায় এই যে অনাগত ভবিষ্যৎ দুঃখ যখন নাই, তাহার সত্তাই নাই, তখন সে আবার আসিবে কি, এবং তাহার জন্য অধ্যবসায়ের প্রয়োজন কি?

'না মহাশয়, পূর্ব্বেই তাহার চেষ্টা করা হয়'।

'কি জন্য ?'

'অনাগত পিপাসার নিবারণ জন্য'।

'মহারাজ, অনাগত পিপাসা কি আছে' ?

'না মহাশয়'।

'মহারাজ, আপনারা অতি পণ্ডিত! আপনারা অনাগত অসৎ পিপাসার নিবারণ জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন'!

'আরও দৃষ্টান্ত প্রদান করুন'।

'আপনি যখন মহারাজ, বুভুক্ষিত হইবেন, তখন কি ভাত খাইব ভাবিয়া, ক্ষেত্র কর্ষণ করাইয়া বীজ বপনকরাইবেন' ?

'না, পূর্ব্বেই তাহার চেষ্টা করা হইয়া থাকে'।

'কি নিমিত্ত' ?

'অনাগত বুভুক্ষার নিবারণ নিমিত্ত'।

'মহারাজ, অনাগত বুভুক্ষা কি আছে' ?

'না'।

'মহারাজ, আপনারা অতি পণ্ডিত! আপনারা অনাগত-অসৎ বুভুক্ষার নিবারণ জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন'।

'সাধু নাগসেন'!

৭। ব্রহ্মলোকের দূরত্ব।

রাজা বলিলেন, 'নাগসেন, এই স্থান হইতে ব্রহ্মলোক কতদূরে' ?

'মহারাজ, ব্রহ্মলোক দূরে, কূটাগারপরিমিত কোন শিলাখণ্ড ব্রহ্মলোক হইতে ভ্রষ্ট হইলে অহোরাত্রে অষ্টচত্বারিংশৎ যোজন গতিতে চারি মাসে পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে'!

'নাগ সেন আপনারা বলেন, যেমন কোন বলবান্ পুরুষ —কুঞ্চিত বাহুকে (শীঘ্র অনায়াসে) প্রসারিত করিতে পারে, বা প্রসারিত বাহুকে কুঞ্চিত করিতে পারে, এইরূপ বশীকৃতচিত্ত বিভূতিমান্ ভিক্ষু জম্বুদ্বীপ হইতে অন্তর্হিত হইয়া ব্রহ্মলোকে প্রাদুর্ভূত হইতে পারেন' আপনার একথার আমি শ্রদ্ধা করিতে পারি না। এই প্রকার অতি সত্বরে তত বহুশত যোজন কিরূপে যাইতে পারে?'

'মহারাজ, আপনার জন্মভূমি কোথায় ?'

'অলসন্দ নামে এক দ্বীপ আছে। সেইখানে আমি জন্ম গ্রহণ করি'।

'মহারাজ, এইখান হইতে অলসন্দ * কত দূর হইবে ?'

'দুইশত যোজন হইবে'।

'আপনি কি মহারাজ, জানেন, সেখানে কোন কাজ করিয়া এখন চিন্তা করেন' ? †

'হাঁ চিন্তা করি'।

'মহারাজ, আপনি শীঘ্র, দুইশত যোজন গমন করিয়াছেন'। ‡

'সাধু, নাগসেন'।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

জ্যোতির্নির্ব্বাণ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সমস্যার মুখে।

"তাহা হইলে এখন উপায় ?"

"উপায় কর্ম্মস্রোতে—আত্ম-সমর্পণ।"

"কর্ম্মস্রোত ত প্রতিকূলে লইয়া যাইবে। সেটা ভাবিয়াছেন কি ?"

"ভাবিয়াছি—দেখিতেছি। কর্ম্মস্রোতের বিরুদ্ধে যাইবার কোন শক্তিই এ ক্ষুদ্র মানবের নাই। বিধাতা স্বয়ং কর্ম্মের অধীন।"

"এই অদৃষ্টবাদই বাঙ্গলার শক্তি স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছে।"

"না কেদার! অদৃষ্টবাদ বাঙ্গলার শক্তিনাশ করে নাই। বাঙ্গালীর নিজের স্বার্থে— প্রকৃত পুরুষকারের অভাবে বাঙ্গলার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। অমন তেজস্বী, বীরচূড়ামণি প্রতাপাদিত্য গেলেন কেন—কেদার ?"

"সামান্য চাকসিরি পরগণার জন্য। সামান্য স্বার্থের জন্য নিরীহ খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের প্রাণ নাশে! কিন্তু আমরা ত সেরূপ পাপ কিছু করি নাই। পর্টুগীজদস্যু প্রজাপীড়ন করিতেছে—যাহারা ধর্ম্মমতে আমাদের আশ্রিত ও শক্তির অধীন—তাহাদের ছেলে পুলে কাড়িয়া লইতেছে—ঝি বৌ বে-আবরু করিতেছে। এও কি নীরবে সহ্য করিতে হইবে?"

---

* "Alexandria (in Baktria) built on an island in the Indus." Rh D.

† এই প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই যে মনে মনে কোন দূর স্থানে কোন কাজ করিয়া লোকে চিন্তা করিয়া থাকে।

‡ ঋদ্ধি বা বিভূতিমান্ ভিক্ষু মনের ন্যায় দ্রুত গমন করিতে পারে—ইহাই নাগসেনের এখানে অভিপ্রায়।

"তুমি তাহাতে বাধা দিবে কিরূপে ?"

"আমাদের সেলেখানায় গোলাগুলির অভাব নাই, আমার ঢালী সড়কী গোলন্দাজের অভাব নাই। এতদিন যাহা সঞ্চয় করিয়াছি এখন তাহার ব্যয়ের দিন আসিয়াছে।"

"গোলাগুলি এ ক্ষেত্রে তোমার কি কাজে লাগিবে ? তুমি কি তাদের কয়েদ করিয়া তোপের মুখে উড়াইতে চাও ?"

"তা নয়—আমি পর্টুগীজদের সন্দীপের কেল্লা আক্রমণ করিব। পর্টুগীজ দমনে শক্তি প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর বাহুবল প্রতিষ্ঠা করিব। যে পর্টুগীজ দমনে দিল্লীশ্বর সফল হন নাই—আমি ভবানীর কৃপায় তা সুসিদ্ধ করিব।"

"করিতে পার। তোমার সাহস, শৌর্য্য, প্রতিভা সব আছে। কিন্তু যে বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তুমি এ কাজ করিবে—সেই বাদসাহই তোমার কাজে বিরক্ত হইবেন। তখন মোগলের সহিত আমাদের যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইবে।"

"কেন ?"

"জাননা—সুবেদার, ফৌজদার সবই পর্টুগীজদস্যুদের অর্থভোগী। দস্যুসেনাপতি গঞ্জালিসের লুঠের টাকা সকলের মুখবন্ধ করিয়াছে!" তুমি বিজয়ী হইলে ফৌজদার সুবেদার দিল্লীশ্বরকে বুঝাইবে বাঙ্গালীর বাহুবলে বঙ্গদেশ পুনরায় স্বাধীন হইতেছে। প্রতাপাদিত্য যা পারে নাই—কেদার রায় তাহা করিতে পারিয়াছে।

"তাহা হইলে উপায় কি পিতা! আর্ত্ত, কাতর, অশ্রু-প্লাবিত, নিরীহ প্রজার প্রাণ, ধন, সম্ভ্রম রক্ষার উপায় কি পিতা ?"

"এখন পথে এস। কর্ম্মসূত্র স্বীকার কর। একটু আগে যাহা বলিয়াছি তাহাই বুঝিয়া দেখ। প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের শক্তিসংঘর্ষ দুর্ব্বলেরই যথেষ্ট অনিষ্ট। আমরা ভিতরে ভিতরে সবল হইলে এ সংঘর্ষণ আপনিই বাধিয়া যাইবে। তখন আমরা জয়ী হইব।"

"আপনার মতে কি এখন নিশ্চেষ্ট থাকাই উচিত ?"

"না ঠিক তা নয়। নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া প্রকৃত কার্য্য-পথ অনুসরণ করাই এখন আমাদের কর্ত্তব্য। আমার এ বৃদ্ধ শরীর। আমার ক্ষমতায় আর কিছুই হইবে না। বাঙ্গালীর প্রতিনিধিরূপে, বঙ্গদেশের প্রতিনিধিরূপে এখন তোমাকেই কার্য্য করিতে হইবে।"

"কিরূপে সে কার্য্য করিব পিতা ?"

"এ বিষয়ে নবাব ইশা খাঁ যা পরামর্শ দিয়াছেন তাহাই বুঝিতেছি শ্রেয়ঃ ও সমীচিন।"

"তিনি কি বলেন—"

"তিনি বলেন প্রথমতঃ দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে রাজসনন্দ আনাইয়া রাজোপাধি ধারণ—দিল্লীদরবারে বশ্যতা স্বীকার—ও এতদ্বারা বাদসাহের মনে বিশ্বাস উৎপাদন। দিল্লীশ্বরকে বাঙ্গলার পর্টুগীজ-অত্যাচারসম্বন্ধে সমস্ত কথা জ্ঞাপন। বাদসাহ এরূপক্ষেত্রে হয় ত স্বেচ্ছায় তোমায় পর্টুগীজদমনের ভার দিতে পারেন।"

"ইশা খাঁ আপনার প্রকৃত বন্ধু। এখন বুঝিতেছি তাহার যুক্তিই আমাদের অবলম্বনীয়। কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কি—"

"বাদসাহ যদি রাজোপাধি দেন, সনন্দ দেন, তাহা হইলে তাহার পদোপযুক্ত সম্মান রক্ষার জন্য আরও সেনা চাই গোলন্দাজ চাই গোলাগুলি চাই।"

"বুঝিয়াছি! কিন্তু তোমার মনের কথা অন্য রূপ! কেদার! আমা হইতেই তুমি পৃথিবীর আলোক দেখিয়াছ। এ চাঁদ রায় এই পক্ক কেশ-গুচ্ছ লইয়া বাঙ্গলায় অনেক ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছে। তোমার মনের উদ্দেশ্য এই অছিলায় নিজেদের সেনাবল বৃদ্ধি করা। যদি বাদসা সনন্দ না দেন—যদি পর্টুগীজদমনে অনুমতি না দেন—তাহা হইলে তাহার অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া তুমি স্বহস্তে কার্য্যভার গ্রহণ করিবে। আমি তোমার এ আত্মনির্ভরতার প্রশংসা করি। কিন্তু মনে রাখিও আত্মনির্ভরতা, প্রতিপদেই সুবিবেচনার দ্বারা চালিত হওয়া উচিত। এখন যদি দিল্লী যাওয়া তোমার অভিপ্রেত হয়, বল—তাহার আয়োজন করিয়া দিই।"

কথাটা হইতেছিল—গভীর নিশীথে এক নিভৃত কক্ষের মধ্যে পিতাপুত্রে। বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের মধ্যে।

কেদার রায় শেষ কথাগুলি শুনিয়া যেন একটু চিন্তিত হইলেন। বলিলেন—"এখন দিল্লী গমন সুবিধাকর হইবে কি ? শুনিয়াছি আকবরসাহ মৃত্যুশয্যায়।"

চাঁদ রায় গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"আকবর সাহ

এবার রক্ষা পাইবেন না। তুমি এখান হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই হয় ত সেলিমসাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবেন।"

কেদার রায় বলিলেন—"তাহাই হউক। আমার দিল্লী যাওয়ার আয়োজন আরম্ভ করুন। কিন্তু আমার পূর্ব্বের প্রস্তাবের একটী মীমাংসা করিবেন না কি?"

"কি প্রস্তাব?"

"সেনা বৃদ্ধির।"

"এখন অত টাকা পাইব কোথায়? মহল হাজিয়া গিয়াছে। প্রজা নাতোয়ান। জুলুম করিয়া করসংগ্রহ চাঁদ রায়ের প্রবৃত্তির সীমাবহির্ভূত।"

"আমি একটা প্রস্তাব করিতে চাই—অনুমতি দিন।"

"বল—"

"আমাদের চাঁদপুরের মহলটা বিক্রয় করিয়া এজন্য অর্থ সংগ্রহ করিলে হয় না?"

"চাঁদপুরের মহল সোণার মহল! অতবড় দামী জমীদারি কিনিবে কে?"

"নবাব ইশা খাঁ।"

"ইশা খাঁ!! না কেদার! ও মহল আমি ছাড়িতে পারিব না। দিল্লীর রাজস্ব বাকী পড়িলে—ঐ মহল হইতেই উঠিয়া যায়। ইশা খাঁ ঐ মহল দখল করিলে—আমাদের অতি দুর্ব্বল হইতে হইবে।"

কেদার রায় বিমর্ষচিত্তে মলিন মুখে বলিলেন—"তবে কি কোন উপায় নাই পিতা! দেশের এত বড় একটা কাজ, সামান্য টাকার জন্য—বন্ধ থাকিবে?"

সহসা সেই রুদ্ধ-কক্ষদ্বার সবলে খুলিয়া দিয়া, এক উন্মুক্তকেশা গৈরিকপরিহিতা, ত্রিশূল-হস্তা ভৈরবী সেই গৃহদ্বার হইতেই গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর করিল—"না বাবা! টাকার অভাবে দেশের বড় কাজ বন্ধ থাকে না।"

সহসা সেই নির্জ্জন নিশীথে—নির্জ্জন কক্ষে, সহসা এক ভৈরবীকে উপস্থিত দেখিয়া চাঁদ রায় একটু বিস্মিত হইলেন। কিন্তু কেদার রায় হইলেন না। তিনি দেখিলেন,—এ ভৈরবী আর কেউ নয়—সেই পর্টুগীজ-অত্যাচার-পীড়িতা, প্রতিহিংসা-ব্রত-পরায়ণা অভাগিনী অনীতা।

চাঁদ রায় সস্মিত মুখে, বিস্ময়াপ্লুত-স্বরে প্রশ্ন করিলেন—"কে তুমি মা?"

অনীতা বলিল "আমি এক অভাগিনী। আপনার নিকট পরিচিতা না হইলেও—মহারাজ! আপনার পুত্র এই যুবরাজ কেদার রায় আমার প্রিয়শিষ্য।"

"শিষ্য!! কি মহামন্ত্রে আপনি আমার পুত্রকে দীক্ষিত করিয়াছেন?"

"মাতৃপূজার মহামন্ত্রে।"

"এ মা কে?"

"স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমি।"

"পূজার উপকরণ কি?"

"আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, সৎসাহস, কর্ত্তব্যবোধ"।

চাঁদ রায়ের বিস্ময় বাড়িয়া উঠিল। তিনি গম্ভীর মুখে বলিলেন—"ভালই করিয়াছেন। আশা করি আপনার নির্ব্বাচিত শিষ্য কর্ম্মের অনুপযোগী হইবে না। কিন্তু গভীর নিশীথে এ গুপ্ত কক্ষে আসিলেন কিরূপে?"

"আমি সন্ন্যাসিনী। হিন্দু রাজার রাজপুরীর সর্ব্বত্রই আমাদের অব্যাহত গমনাধিকার।"

"তা সত্য—কিন্তু আমার পুরী সুরক্ষিত। বিশেষতঃ যে কক্ষে আপনি উপস্থিত হইয়াছেন—তাহা অন্তঃপুরের মধ্যে। আপনি প্রহরীদেব চক্ষু এড়াইলেন কিরূপে?"

"এই বেশ—এই ত্রিশূল—আমাব সহায়তা করিয়াছে।"

"কাহাকেও পথ ছাড়িয়া দিবার আদেশ ছিল না।"

"আমার আদেশ ছিল। দেখিতে চান—দেখাইতেছি।" অনীতা বস্ত্রাঞ্চল খুলিয়া এক অঙ্গুরীয় দেখাইলেন। তাহা চাঁদ রায়ের নিজের নামাঙ্কিত।

চাঁদ রায় আরও বিস্মিত হইলেন। বলিলেন—"মা! এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে?"

"দাতা সম্মুখে দাঁড়াইয়া, জিজ্ঞাসা করুন।"

কেদার রায় অনীতার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ সময়ে নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহাকে এই অঙ্গুরীয় দিয়া আসিয়াছিলেন। এখন তাঁহার সকল কথা মনে হইল। চাঁদ রায়ও সন্ন্যাসিনীর কক্ষপ্রবেশ ব্যাপারের গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিলেন।

কিন্তু তখনও তাঁহার উৎকণ্ঠা যায় নাই। সন্ন্যাসিনীর প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইল। তিনি সোৎসুকে প্রশ্ন করিলেন—"সহসা এ গভীর রাত্রে—এ কক্ষে আসিলে কেন মা?"

"জননী বঙ্গভূমির কার্য্যে একটুমাত্র সহায়তা করিব বলিয়া আসিয়াছি।"

"আমাদের যেরূপ সহায়তার প্রয়োজন, তাহা তোমার দ্বারা কিরূপে হইবে? তুমি স্ত্রীলোক সন্ন্যাসিনী—আশ্রয়-শূন্যা—"

সন্ন্যাসিনীর মুখমণ্ডল সহসা ক্রোধে দীপ্ত হইয়া উঠিল। ধীর-কম্পিত গম্ভীরস্বরে অনীতা বলিলেন—"সকল সন্ন্যাসিনীই ভিখারিণী নয় মহারাজ! চিরদিন আমি এরূপ সন্ন্যাসিনী ছিলাম না, একদিন আমারও সুখের দিন গিয়াছে।"

চাঁদ রায় এ উত্তরে যেন একটু অপ্রস্তুত হইলেন। বলিলেন—"মা! তোমায় চিনিতে পারি নাই, আমায় মার্জ্জনা কর।"

"বাবা! কোন অপরাধই ত হয় নাই। এখন যা বলিতে আসিয়াছি বলিয়া যাই। সে কথা এখনও অসম্পূর্ণ—"

"কি কথা মা!"

"এই অর্থের কথা। কত টাকার প্রয়োজন মহারাজ! বিশ কলসী সোণার, মোহর মা কপালিনী দেশের কাজের জন্য লুকাইয়া রাখিয়াছেন। আপনার পুত্র কেদার রায়কে এই গভীর নিশীথে আমার সঙ্গে দিন। আমি সমস্ত সম্পত্তি উহাকে অর্পণ করিব।"

"তোমার এ মহাদানের উদ্দেশ্য কি মা?"

"শত্রু দমন—প্রতিহিংসা গ্রহণ"

"প্রতিহিংসা—কিসের?"

"স্বামী-হত্যার।"

"কে সে কাজ করিল—প্রতিহিংসার পাত্র কে?"

"ডাকাতের সর্দ্দার পর্টুগীজ গঞ্জালীস।"

"মা! তুমি শক্তিস্বরূপিনী সাক্ষাৎ ভগবতী। কিন্তু মা! যে স্ত্রীজাতি মাতৃরূপে জগতপালিনী,—জায়ারূপে সংসারের অধিষ্ঠাত্রী,—যাহারা এ সংসারে করুণার সজীব মূর্ত্তি,—তাহাদের কি প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়া উচিত?"

"না—উচিত নয়। তবে এ সম্বন্ধে ক্ষেত্র ও পাত্র বিচার আছে। রাজ-রাজ্যেশ্বর! প্রাণের জ্বালায় স্বামীর শবদেহ পার্শ্বে না বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,—'যে আমার এ সীমন্তের উজ্জ্বল সিন্দুর মলিন করিয়াছে, যে আমায় আজ এ দুরবস্থায় ফেলিয়াছে—তাহার শোণিতে এ সিন্দুররাগ মুছিব। পুত্রহত্যা করিলে মার্জ্জনা করিতে পারিতাম; কিন্তু স্বামী-হত্যার মার্জ্জনা নাই'।

"জানিনা সন্ন্যাসিনী! কে তুমি—আমায় এ গভীর রাত্রে ছলনা করিতে আসিয়াছ। কিন্তু তোমার দত্ত সম্পত্তি গ্রহণে আমার অধিকার কি?"

"মহারাজ! যে অর্থ আমি আপনাকে দিব, ন্যায়াধিকারে তা আমার। স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির আমিই উত্তরাধিকারিণী। আমার স্বামীর শেষমুহূর্ত্তের অতি পবিত্র আদেশপালনে এ অর্থ ব্যয়িত হইবে! আরও এক কথা অনাথার ধন রাজার পায়। আপনি এ বিক্রমপুররাজ্যের রাজ্যেশ্বর। এ ধন আপনার।"

চাঁদরায় সন্ন্যাসিনীর দারুণ প্রতিজ্ঞায়, অমানুষিক মহত্বে মোহিত হইলেন। এ সন্ন্যাসিনীর পরিচয় জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। তিনি সসম্ভ্রমভাবে প্রশ্ন করিলেন—"মা! আপনার পরিচয় জানিতে পারি কি?"

"আগের—না পরের?"

"আগের"

"না—যতদিন এ ব্রত পূর্ণ না হইবে ততদিন পরিচয় দিব না। খালি জানিয়া রাখুন—আমি ব্রাহ্মণকন্যা, ব্রাহ্মণ-কুলবধূ—ব্রাহ্মণের পত্নী। আর ব্রহ্ম হত্যার, পতিহত্যার প্রতিশোধপরায়ণা অনাথিনী অনীতা।"

অনীতা সস্নেহে কেদার রায়ের হস্ত-ধারণ করিয়া বলিলেন—"এস বাবা! আমার সঙ্গে এস—আমি স্বামীর ন্যস্ত অর্থ তোমায় দেখাইয়া দিই।"

সে হস্ত ধারণে যেন বোধ হইল, যেন শান্তি আসিয়া প্রতিভাকে আশ্রয় করিয়াছে—পবিত্রতা আসিয়া সৌম্যকে আশ্রয় করিয়াছে, জ্যোতি আসিয়া দীপ্তিকে আশ্রয় করিয়াছে।

সন্ন্যাসিনী আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। দ্রুত-বেগে কেদার রায়ের হস্তাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে গৃহের বাহির করিয়া লইয়া গেলেন। চাঁদরায় কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না। তিনি মন্ত্রমুগ্ধ—নির্ব্বাক—নিশ্চল। প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

এ সন্ন্যাসিনী কে?

বনের পর বন। অটবীর পরে অটবী। সেই গভীর রাত্রে, কেদার রায়কে সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসিনী—দ্রুতপদে চলিয়াছেন।

কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই। একবারও পিছনে চাহিয়া দেখিতেছেন না। পশ্চাতের বীরত্বব্যঞ্জক পদশব্দই তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতেছে। বিরলান্ধকারে সেই সংকীর্ণ বন পথে চলিতে কোন অসুবিধাই হইতে ছিল না। সমস্ত পথ ঘাট যেন তাঁহার পরিচিত।

শ্রীপুর হইতে ক্রমে ক্রমে এইরূপে তাঁহারা দুইজনে প্রায় দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেন। কেদার রায় ইতি পূর্ব্বে আর কখনও এ পথে আসেন নাই। তবে বনের গভীরতা ও পাদপসমষ্টির ঘন সমাবেশ দেখিয়া অনুভব করিলেন—তিনি ইতিপূর্ব্বে যে অরণ্যে অনীতার প্রথম দর্শন পাইয়াছিলেন—এ সেই বন।

যুবরাজ কেদাররায়ও দুঃসাহসী। তিনি বিনা প্রশ্নে পথ অতিবাহিত করিতেছেন। মুখে প্রশ্ন নাই, মনে ভয় ও সন্দেহ নাই, প্রাণে অবিশ্বাস নাই। কৌতূহল কেবল তাঁহাকে বাক্যশূন্য করিয়া রাখিয়াছে!

সন্ন্যাসিনী সহসা মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন—"কেদার-রায়! এইবার আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়াছি। তুমি এই খানে দাঁড়াও। আমি এ গুহার দ্বার খুলিবার বন্দোবস্ত করি।"

তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর। শ্যামল-পত্রাচ্ছাদিত দীর্ঘ শীর্ষ বন্য-পাদপসমূহ যেন কত আদরের অন্ধকারকে বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেই পাদপশীর্ষ হইতে যুগ যুগান্তব্যাপী দূরে সুবিস্তৃত নীলাকাশে, সপ্তর্ষিমণ্ডল অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র পরিবেষ্টিত হইয়া স্নিগ্ধজ্যোতিতে জ্বলিতেছে।

সেই অন্ধকার মধ্যে একা দাঁড়াইয়া যুবরাজ কেদাররায়। তিনি তখন মনে মনে উদ্যমশালিনী, শক্তির সজীব মূর্ত্তি সেই ভৈরবীর দুর্ব্বোধ্য কার্য্যপ্রণালীর আদ্যোপান্ত অনুশীলন করিতেছিলেন।

ভৈরবী সেই অন্ধকারে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া পশ্চাৎ দিক হইতে কেদার রায়ের অঙ্গস্পর্শ করিয়া বলিলেন—"চল! আমরা ভিতরে যাই বাবা।"

কেদাররায় সোৎসুকে প্রশ্ন কহিলেন—"গুহার মধ্যে আর কে আছে? কে আপনাকে দ্বার খুলিয়া দিল?"

সন্ন্যাসিনী সেই অন্ধকারে মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"আমারই মত আর একজন আছে। আর আজ মধ্যরাত্রে আর একজন মহাসৌভাগ্যশালিনী আসিয়াছেন।"

"কে তিনি?"

"ভিতরে গেলেই দেখিতে পাইবে।"

গুহার কথা বলিয়াছি, কিন্তু তাহা যেন ঠিক গুহা নয়। এক তালা বাটীর চারি দিক পাহাড়ের মত উঁচু মাটীর স্তূপ দিয়া ঘেরিয়া দিলে যাহা হয়, ইহা তাহারই অনুরূপ। ভিতরে ক্ষুদ্র দালান, দেবমন্দির, চত্বর, যাহা প্রয়োজনীয় সবই আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যেন সে স্থানটীর নিত্য আবাসকেন্দ্র।

সন্ন্যাসিনী কেদার রায়কে সঙ্গে লইয়া এক ক্ষুদ্র গৃহদ্বারের নিকট দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"বাবা! তুমি এই গৃহে বিশ্রাম কর। এই গৃহমধ্যে এক জনকে দেখিতে পাইবে তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইও না! আমি মায়ের মঙ্গল আরতির জোগাড় করিয়া এখনই আসিতেছি।

সেই সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র গৃহের দ্বার উন্মুক্ত। তাহাতে দীপ জ্বলিতেছে। সেই দীপালোকের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া এক অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা স্ত্রী মূর্ত্তি।

সন্ন্যাসিনী চলিয়া গেলে, সেই রমণীয় রমণীমূর্ত্তি আরও নিকটে আসিল। আসিয়া কেদাররায়কে প্রণাম করিল। তখনও তাহার মুখ অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত।

কেদাররায় বিস্ময়াপ্লুত-চিত্তে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। সে অপরিচিতা রমণী কেন বা তাঁহাকে প্রণাম করিল, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বিস্ময়-প্লাবিত-চিত্তে প্রশ্ন করিলেন—"আপনি কে?"

অতি স্পষ্ট স্বরে উত্তর আসিল—"আমি আপনার চরণের দাসী।"

কেদাররায় এ উত্তরে আরও বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে আর চিন্তার অবসর না দিয়া, অবগুণ্ঠনমণ্ডিতা মূর্ত্তি দ্রুতবেগে আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিল। তিনি সে মূর্ত্তি চিনিলেন!

কেদার রায় বিস্মিতচিত্তে শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন—"একি? রাণী কমলা! তুমি এখানে কেন?"

কমলা হাস্যমুখে উত্তর করিল—"তুমি এখানে কেন?"

"সন্ন্যাসিনী আমায় আনিয়াছেন।"

"আমারও সেই অবস্থা।"

"সন্ধ্যার পূর্ব্বে ত তোমায় প্রাসাদে দেখিয়াছি। তবে তুমি এখানে আসিলে কিরূপে?"

"আগে বল তুমি এখানে আসিলে কিরূপে ?"

"এই সন্ন্যাসিনী আমায় আনিয়াছেন; কিন্তু আমি যেরূপে আসিয়াছি সেইরূপে আসা ত তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"আমি আমার নিজের যান বাহনে এখানে আসিয়াছি। আটজন সড়কি ও বেহারা আমার সঙ্গে।"

"কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না কমলা! এ দুর্ব্বোধ্য ঘটনার প্রহেলিকা ভাঙ্গিয়া দাও।"

"কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে এই খানে বস। সব বলিতেছি।"

গৃহমধ্যে একটী মাদুর পাতা ছিল। উভয়ে সেই আসনে বসিলেন। কমলা বলিতে লাগিলেন—"সন্ধ্যার পর অষ্টভুজার মন্দিরের আরতির পর, আমি নিত্যপূজা করিতে যাই। তখন সেখানে জন-মানবও থাকে না। ঠাকুর প্রণাম করিয়া উঠিতে যাইতেছি—দেখি এই সন্ন্যাসিনী সম্মুখে।"

"তোমার নিকট একদিন ইহাঁর কথা শুনিয়াছিলাম। ইহাঁকে চোখে দেখিয়া আমার বড়ই শ্রদ্ধাভক্তি বাড়িল। ইহাঁর কথায় সেই ভক্তিশ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি পাইল।"

"তোমার যিনি গুরু স্থানীয়া তাঁহাকেই বা অবিশ্বাস কি? সন্ন্যাসিনী আমাকে তোমার বিবাহ-বাসরে প্রদত্ত আমার শ্বশুরের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইলেন।"

"সন্ন্যাসিনী আমায় বলিলেন—'মা! তোমার স্বামী আমার পুত্র—তুমি আমার পুত্রবধূ। একবার আমাদের বাড়ীতে যাইতে হইবে। তুমি রাজরাণী—রাজকুলবধূ। কিন্তু স্বামীর অনুমতি না লইয়া তোমায় গৃহের বাহির হইতে হইবে। এই মা অষ্টভুজা সাক্ষী—আজ আমি তোমার স্বামীকে ও তোমাকে এক নূতন কর্ত্তব্যে দীক্ষিত করিব। এখনই তোমার যান বাহন ও প্রহরী লইয়া গোপনে পুরীর বাহিরে চল। আমি তোমায় কতক পথ অগ্রসর করিয়া দিয়া আসি।'"

"সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"মনে ভাবিও না—এজন্য তুমি তোমার স্বামীর কাছে অপরাধিনী হইবে। মার কাছে কন্যা গেলে তাহার কোন অপরাধ হয় না। এক্ষেত্রে যদি হয়, তাহার দায়িত্ব আমি লইলাম। যে স্বামীর অনুমতির জন্য তুমি আকাঙ্ক্ষিত তাঁহাকেই দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে তোমার গন্তব্য স্থানে দেখিতে পাইবে।"

"এত অনুরোধে আমি কোনও আপত্তি করিতে পারিলাম না। কি একটা তীব্র কৌতূহলপ্রহেলিকার ছায়া আমার মনের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। আমি তখনই কালিদাসকে গোপনে সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া সওয়ার হইয়া খিড়কীর দ্বার দিয়া বাহির হইয়াছি।"

"বাহিরে আসিয়া দেখি—আর এক রমণী মূর্ত্তি। আমার আর কোন অবিশ্বাস হইল না। কালিদাস যখন আমার সঙ্গে রহিল তখন সন্দেহের কোন কারণই নাই।"

কেদার রায় বলিলেন—"কমলা! এতক্ষণে সব বুঝিয়াছি, কিন্তু কালিদাস কোথায় ?"

"সে ঐ মন্দিরের পার্শ্বের ঘরে আছে। সন্ন্যাসিনী তাহাকেও দীক্ষিত করিবেন বলিয়াছেন।"

কথোপকথন আর চলিল না। সন্ন্যাসিনী বাহির হইতে ডাকিলেন—"কেদার! বৌমা! তোমরা দুজনেই বাহিরে এস।"

দুই জনেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

কিয়দ্দূর গিয়াই কালিকা-মন্দির। মন্দির ঘৃত-প্রদীপোজ্জ্বলিত। সেই উজ্জ্বল আলোকে নৃমুণ্ডমালিনী খর্পরহস্তা কপালিনী আরও জ্যোতির্ম্ময়ী।

নিকটে দুইখানি দ্বীপিচর্ম্মের আসন। কেদার রায় ও কমলা সেই আসনে পাশা পাশি বসিলেন। সন্ন্যাসিনী নিজে একখানি অজিনাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

সন্ন্যাসিনী গম্ভীর কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"বলিব না মনে করিয়াছিলাম, কেদার রায়! এ জীবনের শোকময় কাহিনী জীবনের নিভৃতকেন্দ্রে চিরজীবনের মত লুকাইয়া রাখিব এই সংকল্পই করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার কাছে আমায় ইচ্ছা করিয়া সে সংকল্পের বাঁধ ভাঙ্গিতে হইতেছে।"

"এক স্বদেশ-প্রেমিক সাহসী বীর ব্রাহ্মণকুমার এ হতভাগিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। স্বদেশের জন্য সে ব্রাহ্মণকুমারের আত্মত্যাগ অতি প্রশংশনীয়। দেশের জন্যই তিনি পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট আকবর শাহের প্রধান শত্রু হইয়া ছিলেন। দেশের জন্যই তিনি স্ত্রীপুত্র সংসার ত্যাগ করিয়া এক প্রদীপ্ত ভাস্করসম তেজস্বী বীরপুরুষের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়াছিলেন। জীবন থাকিতেও তিনি তাঁহার পার্শ্ব ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে

বাঙ্গালীর ভীরুতার কলঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়াছিল। তাঁহার শৌর্য্যে মোগল সেনাপতি মানসিংহকেও বলিতে হইয়াছিল 'বাঙ্গালীর হাত হইতে বাঙ্গলা কাড়িয়া লওয়া এই দুই বীর জীবিত থাকিতে কোনরূপেই সম্ভব নহে।'"

"আশ্রয়তরু স্বরূপ যে মহাবীরকে লক্ষ্য পথে রাখিয়া আমার ইষ্টদেব মাতৃভূমির কাজে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন তিনিই ভাস্বরকীর্ত্তিময় গৌরবমণ্ডিত যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্য। আমার স্বামী ব্রাহ্মণ হইলেও কখন তাঁহার উপর গুরুগিরি করেন নাই। হিতাহিত বিবেচনা না করিয়াই তিনি তাঁহার আদেশ পালন করিতেন। আর সেই উদার-হৃদয় তেজস্বী বীর আদিত্য-স্বরূপ-পূর্ণ-তেজময় প্রতাপ! স্বামী স্বেচ্ছায় গুরুর আসন ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি প্রতি কার্য্যে তাঁহার সম্মতি না লইয়া অগ্রসর হইতেন না।"

কেদার রায়ের মুখমণ্ডল সহসা রক্তিম ভাব ধারণ করিল। তিনি উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"মা! মা! তবে কি আপনি শঙ্কর ব্রাহ্মণের পত্নী?"

সন্ন্যাসিনী অশ্রুপ্লুত চক্ষে বলিলেন—"হাঁ বাবা। তোমার অনুমান যথার্থ। আমিই সেই অভাগিনী"।

কেদার রায় বলিলেন—"হায়! আজ যদি শঙ্করের ন্যায় তেজস্বী ব্রাহ্মণের ছায়ামূর্ত্তিও আমার পশ্চাতে থাকিত, তাহা হইলে বলিতে পারি না, বাঙ্গলায় আবার হিন্দু পতাকা উড়িত কি না। মা! আমি সেই পুরুষসিংহের পত্নীর সহায়তা পাইতেছি, আমার নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই"।

সন্ন্যাসিনী পুনরায় বলিলেন—"আজ চারি বৎসর হইল প্রতাপাদিত্য এই নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া পরলোকে গিয়াছেন। আমিও এই চারি বৎসর স্বামীবিরহ সহ্য করিয়া প্রাণে দাবানলের জ্বালা লইয়া পথে পথে বেড়াইতেছি। জীবনে—একমাত্র ধ্রুব লক্ষ্য স্বামীহত্যার প্রতিহিংসা। আর আমার ন্যায় অত্যাচার-পীড়িত অভাগিনীদের সতীত্ব ও ধর্ম্ম রক্ষা। তাই তোমার ন্যায় শক্তিমান পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি"।

কেদার রায় বিনীত ভাবে বলিলেন—"যখন অতটা বলিয়াছেন, তখন কোন্ নৃশংস আপনার স্বামীর জীবন গ্রহণ করিল—তাহা বলিতে কি আপত্তি আছে?"

সন্ন্যাসিনীর চক্ষুর্দ্বয় হইতে অনলজ্যোতিঃ বাহির হইল। কেদার রায় ও কমলা সে উৎকীর্ণ-জ্যোতিঃকণায় একটু কম্পিতচিত্ত হইলেন। সন্ন্যাসিনী বজ্র-নির্ঘোষ-স্বরে বলিতে লাগিলেন—"প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর আমার স্বামী অনেক চেষ্টায় যশোরের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু একজনের শত্রুতায় তাহা পারেন নাই। সে শত্রু আর কেউ নয়—পর্টুগীজ সেনাপতি ডাকাত গঞ্জালিস। গঞ্জালিস প্রতাপাদিত্যের অনেক নুন খাইয়াছিল। প্রতাপ তাহাকে বড় বিশ্বাস করিতেন। বিশ্বাস করিয়া সেনাপতির পদও দিয়াছিলেন। একসময়ে সে সে পদের গৌরবরক্ষাও করিয়াছিল। কিন্তু শেষ-মানসিংহের প্ররোচনায় কঠোর ভেদনীতিতে সে গুপ্তভাবে মোগলপক্ষ অবলম্বন করে।"

"গঞ্জালিস্ শুনিয়াছিল—আমার স্বামী মোগলের লুঠের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য রাজভাণ্ডারের প্রচুর অর্থ প্রতাপাদিত্যের পরামর্শে নিজ বাটীতে ভূপ্রোথিত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রতাপ তাঁহাকে সেই অর্থ দান করিয়া বাঙ্গলার স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার যদি সম্ভব হয়, তাহাতে ব্যয় করিতে আদেশ করিয়াছেন। মানসিংহ এই অর্থ-প্রয়াসী না হইলেও আমার স্বামীর জীবননাশ-প্রয়াসী। কিন্তু গঞ্জালিস এই অর্থ-প্রয়াসী। আমার স্বামী একদিন বিশ্বাস করিয়া সরলভাবে তাহাকে এ কথার একটু আভাসও দিয়াছিলেন।

"যে উদ্দেশ্যই হউক না কেন, একদিন পাপিষ্ঠ ছদ্মবেশে মোগল সৈন্য লইয়া আমার ক্ষুদ্র পুরী আক্রমণ করিল। নিষ্ঠুর ভাবে আমার স্বামীকে হত্যা করিল। আমায় এক গৃহে ইতিপূর্ব্বেই বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল। আমি স্বামীর মৃত্যুতে বাধা দিতে পারিলাম না—এই আমার দারুণ পরিতাপ।

"লুণ্ঠন ডাকাতি শেষ করিয়া, দস্যুরা চলিয়া গেল। আমিও বন্ধন মুক্ত হইলাম। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম—গৃহভিত্তির ও উঠানের নানা স্থান খনিত মৃত্তিকাস্তূপ—জলন্ত মশালের কৃষ্ণবর্ণ দগ্ধাবশেষ।

দ্রুতপদে স্বামীর সন্ধানে গেলাম। দেখিলাম, আমার আশা, আনন্দ, উৎসাহ—সব শেষ হইবার পথে বসিয়াছে।

আহত স্থান হইতে প্রবল বেগে প্রচুর শোণিতধারা বহিতেছে। শরীরের নানা স্থানে ভীষণ আঘাত। প্রচুর শোণিতস্রাবে স্বর্ণশয্যা ভাসিয়া যাইতেছে।

"অনেক চেষ্টায়—অনেক শুশ্রূষায়—সেই মূর্চ্ছিত দেহে চৈতন্য-সঞ্চার করিলাম। কিন্তু নিভিবার পূর্ব্বে দীপ যেরূপ উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে, তাঁহার মুখমণ্ডল সেইরূপ প্রসন্ন ভাব ধারণ করিল। আমায় ধীর কম্পিত স্বরে বলিলেন—'এ হত্যার মর্ম্ম বুঝিয়াছি। যে অস্ত্রাঘাতে আমার এ দশা করিয়াছে তাহাকেও আমি চিনিতে পারিয়াছি। সে গঞ্জালিস্। যে শেষবার আমার দেহে অস্ত্রাঘাত করিয়াছে—সে ম্যাটিস্। স্বামীহত্যার প্রতিহিংসা না লইয়া সীমন্তের সিন্দূর মুছিও না। আমি পরলোকে তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।'"

"দীপ নিভিল। সজ্জিত প্রতিমাপূর্ণ দালানের দীপাবলী নিভিয়া ঘোর আঁধার আসিল। আমার সোণার সংসার—জন্মের মত প্রলয়ান্ধকারে বিলীন হইল। আমার যাহা ছিল—সব জন্মের মত কালস্তরে বিলীন হইল।

"বৎস! যে অর্থের জন্য পর্টুগীজ ডাকাত আমার স্বামীর প্রাণনাশ করিয়াছে, সে অর্থ তাহারা পায় নাই। সে অর্থ আমারা বহুকাল পূর্ব্বে উদ্যানে প্রোথিত করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। সেই অর্থই এখানে রাতারাতি সরাইয়া আনিয়াছি। আমার এক খুল্লতাত এই বিপদের সময় আমার সহায়তা করেন। এই যে বাটী দেখিতেছ ইহা তাঁহারই। তিনিও এখন স্বর্গে। তাঁর একমাত্র অভাগিনী কন্যাকে তিনি আমার কাছে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনিই আজ এ গুহাদ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন।"

"এই গ্রামের নাম বীরপুর। দারুণ মহামারীতে গত দুই বৎসরে এ গ্রাম শ্মশান হইয়াছে। অনেক লোক মরিয়াছে—যাহারা মরে নাই তাহারা পলাইয়াছে। মহাশ্মশানই কালিকার প্রিয়। তাই এই মহাশ্মশানে এই সোণার পদ্মাসনে শ্মশানালয়বাসিনী কালিকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

"রাজা কেদার রায়! তুমি আমার প্রিয় শিষ্য। রাণী মা কমলে! তুমিও আজ হইতে দীক্ষিত হইলে। স্ত্রীর সহায়তা না হইলে স্বামীর ধর্ম্মকার্য্য অসম্পূর্ণ হয়। তুমি সুখে সম্পদে, আপদে বিপদে, স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান কর, কর্ম্মানুষ্ঠান কর। শক্তি সঙ্গিনী না হইলে পুরুষকারের মূল্য কমিয়া যায়। ঐ দেখ—ভূতলে পতিত মহাযোগী মহাকালের উপরে, মা শক্তিরূপা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। কমলে! এমন একদিন আসিবে যে দিন স্ত্রীজাতির শক্তি এই শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির মুক্তির জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে। তাই আজ ভবানীর সম্মুখে আনিয়া তোমাদের স্বদেশহিতব্রতে দীক্ষিত করিলাম। সস্ত্রীক দীক্ষা না হইলে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার জন্মে না।"

"আমার স্বামীর অধিকৃত ধন—কেদার রায়! আজ তোমাকে দেশহিতব্রতের মহানুষ্ঠানের সহায়তার জন্য আমি নিঃস্বার্থে অর্পণ করিলাম। আমি স্বামী-পুত্র-হীনা। সমগ্র বঙ্গসন্তান আমার পুত্র স্থানীয়। যাহারা দেশের শত্রু—তাহাদের নিপাত করিবার চেষ্টা করিবে।"

"তোমাদের দীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। মঙ্গলারতির সময় উপস্থিত। প্রভাতও হইয়াছে। আরতির পর তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর"।

মঙ্গলারতি হইয়া গেল। এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আসিয়া আরতি সমাপন করিলেন। আরতি সমাপনান্তে, সেই সন্ন্যাসী রাজা ও রাণীকে আশীর্ব্বাদী পুষ্প দিয়া সহসা অদৃশ্য হইলেন।

অনীতা—রাজা ও রাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এই প্রসন্নমুখী, বরাভয়প্রদা মার নিকট বর প্রার্থনা কর। দুই জনেই সমকণ্ঠে বল—

'আয়ুর্দ্দেহি যশোদেহি ভাগ্যং ভগবতী দেহিমে।'

"এইবার মাকে প্রণাম কর—বল—

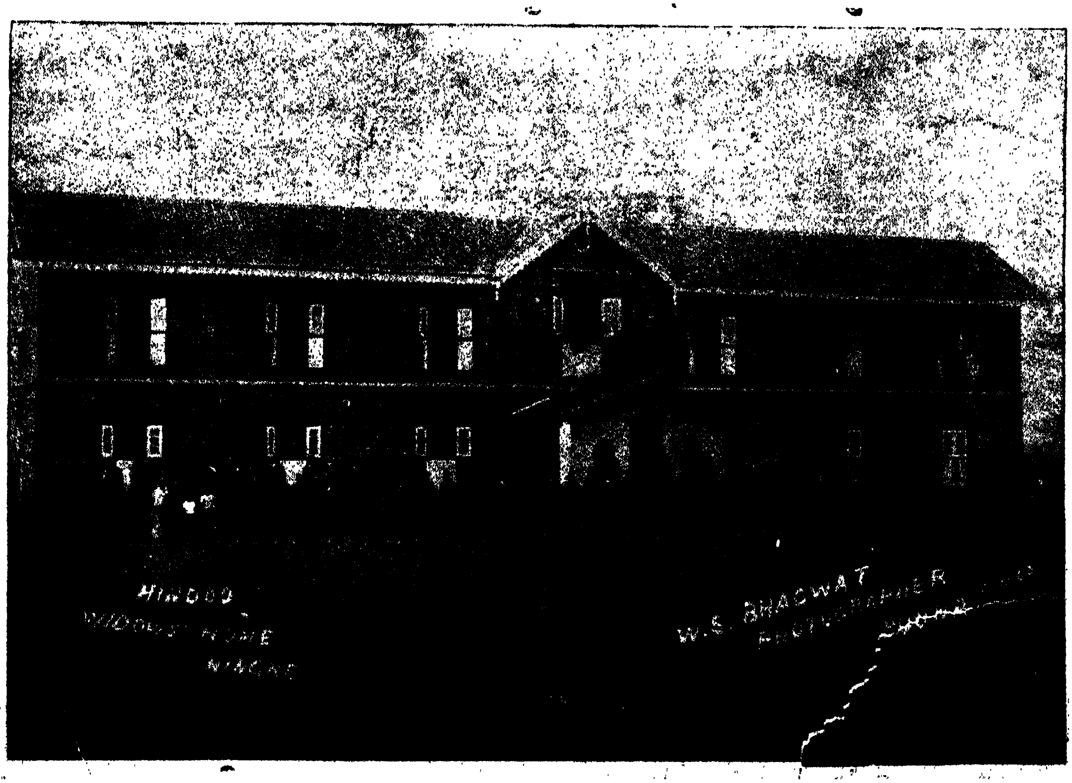
'নমামি সর্ব্বমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে।'"

প্রণাম শেষ হইলে অনীতা গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "বৎস! সম্মুখে বিরাট কার্য্যক্ষেত্র। এখন স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হও। ঐ দেখ বরাভয়-প্রদ করে ইঙ্গিত করিয়া মা তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

পুনার হিন্দু-বিধবাশ্রম।

আজকাল আমাদের দেশে চারিদিকে প্রত্যেক বিষয়ে উন্নতি ও সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা কিছু না কিছু পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় জীবন গঠন একদেশী সংস্কারে সম্ভব নহে, জাতির প্রত্যেক বিভাগের সংস্কার-সামঞ্জস্য না হইলে জাতীয় জীবন পূর্ণপুষ্ট কখনই হইতে পারে না। নরনারী লইয়া সমাজ; সমাজ উন্নত হইতে চাহিলে নর ও নারী উভয়েরই উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে জাতীয় জীবনের অর্দ্ধাঙ্গ রমণীসমাজ বিকল, অবশ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া আছে। সমাজের সকলবিধ উন্নতি-চেষ্টার পূর্ব্বে যে নারীসমাজকে সুস্থ সবল করিয়া তোলা আবশ্যক ইহা স্বীকার করিতে আজকাল বোধ হয় কাহারও সন্দেহ বা দ্বিধা হইবে না। নারীগণ তাঁহাদের বৈদিক গৌরব এবং মর্য্যাদা ক্রমে ক্রমে হারাইয়া অন্তঃপুরের গণ্ডীর মধ্যে শুধু সেবিকা হইয়া উঠিয়াছেন। সেবাধর্ম্ম অতি পবিত্র ও মহান; কিন্তু ক্রীতদাসও ত সেবা করে, তাহাদের মহত্ব ও ত্যাগের প্রশংসা কীর্ত্তিত হয় না কেন? কারণ, তাহাদের কৃত সেবা ও ত্যাগ স্বেচ্ছাকৃত নহে, দুর্ব্বলের নিরুপায় সেবা। আমাদের নারীসমাজকে আমরা সেইরূপ সেবার যন্ত্র করিয়া তুলিয়াছি, তাঁহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা নাই, করিতেও জানেন না; তুচ্ছ বিষয়, হেয় প্রসঙ্গ লইয়া কোন মতে উত্তাক্ত জীবন অতিবাহিত করিতেছেন মাত্র। সমগ্র নারীজাতির অবস্থা যদি এইরূপ, হিন্দু-বিধবার অবস্থা ইহা অপেক্ষা আরও অধিক শোচনীয়, বিশেষতঃ বঙ্গে। তাঁহাদের আপনার বলিয়া নির্ভর করিতে কেহ নাই, দুর্ভর জীবন গঞ্জনা লাঞ্ছনার মধ্যে শোকে দুঃখে অবসান করাই তাঁহাদের ভাগ্য। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি অনুচিত এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে; ইহা বিতণ্ডার কারণ হইতে পারে; কিন্তু বিধবাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ও পরিশোধন যে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বিধবাকে প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী, পরহিতব্রতা হইতে হইলেও রীতিমত শিক্ষা দীক্ষার যে দরকার ইহা সকলের বুঝা উচিত। অশিক্ষিত পটুত্ব প্রাকৃতিক নিয়ম নহে; সকল উন্নতিই শিক্ষাসাপেক্ষ।



পুনা হিন্দু বিধবাশ্রম।

আধুনিক কর্ম্মবাহুল্যের দিনে পুরুষ যদি কর্ম্মক্ষেত্রে রমণীর সাহায্য পাইতেন,তাহা হইলে আমরা আরও কত অগ্রসর হইতে পারিতাম। নারীজাতির শিক্ষাসংস্কার শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু এখন আমরা যদি হিন্দু-বিধবাদিগকে শিক্ষা দীক্ষার দ্বারা মহৎ কর্ম্মের উপযুক্ত করিয়া লইতে পারি তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত বন্ধনহীনা মুক্তসম্বন্ধা তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিপুল সাহায্য লাভ করিতে পারি। বিধবার শ্রমপটুতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, কর্ম্মের ইচ্ছা, শুভাকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ যদি কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়, তবে আমরা কতখানি কাজ না করিতে পারি।

হিন্দু-বিধবাদিগকে শিক্ষিত ও সৎকর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাদের জীবনভার লাঘব করিবার চেষ্টায় বঙ্গে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাক্ষিণাত্যে পণ্ডিতা রমা বাঈ প্রথম। শশিপদ বাবুর বরাহনগর বিধবাশ্রম ১৮৮৭ সালে এবং পণ্ডিতার বোম্বাই বিধবাশ্রম ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম আশ্রমটি ১০ বৎসর সফল কার্য্য করিয়া স্থাপয়িতার বার্দ্ধক্য ও অপর পরিচালকের অভাবহেতু বন্ধ হইয়া গিয়াছে; দ্বিতীয়টি স্থাপয়িত্রীর বিধর্ম্মিতার জন্য হিন্দুসমাজের সহানুভূতি হারাইয়াছে।

১৮৯৬ সালে পুনা সহরে একটি বিধবাশ্রম সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতি পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রমদ্বয়ের বৈফল্য হইতে এই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন যে প্রথম-উদ্যোক্তার উত্তরাধিকারীর অভাব এবং ধর্ম্মবৈষম্য এই শুভানুষ্ঠানের অন্তরায় হইতে পারে। এজন্য প্রথম হইতেই তাঁহারা এদিকে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনুষ্ঠাতৃগণ আপাত সাফল্য অপেক্ষা স্থায়িত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিলেন। এবং কিছু অর্থসংগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ কয়েকটি বিধবাকে গভর্ণমেণ্ট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং স্ত্রীশিক্ষা কলেজে রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দুই বৎসর পরে তাঁহারা দশ হাজার টাকা সঞ্চিত ও আরও কিছু সাময়িক চাঁদার সম্ভাবনা দেখিলেন। তখন তাঁহারা ১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে 'পুনা হিন্দু-বিধবাশ্রম' স্থাপন করিলেন, এবং ১৮৯৯ সালের জানুয়ারি মাস হইতে পৃথক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আশ্রমের কার্য্য আরম্ভ হইল। তখন দুইটি মাত্র বিধবা এই আশ্রমের ছাত্রী এবং সপত্নীক অধ্যাপক কার্ভে আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক। আশ্রমের ব্যয়ে দশ জন বিধবা পূর্ব্বোক্ত গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়দ্বয়ে শিক্ষিত হইতেছিলেন, তাঁহাদের শিক্ষাস্থানের পরিবর্ত্তন করা হইল না।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর অনুষ্ঠাতৃগণের চেষ্টা হইল আধুনিক সহরের আবিলতার প্রভাব হইতে আশ্রমটিকে দূরে সহরের বাহিরে লইয়া যাওয়া। বৎসরকাল পরে প্লেগ আসিয়া সেই ইচ্ছাকে উদ্যুক্ত করিল। ৮ রাও বাহাদুর জি, জি, গোখলে সহরের বাহিরে একখণ্ড জমি আশ্রমকে দান করেন; আশ্রম সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়, এবং এখন সেখানে পাকাবাড়ী নির্ম্মিত হইয়া বিধবাশ্রমটি পূর্ণ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর এই ১১ বৎসরে আশ্রমের সর্ব্ববিধ কল্যাণ ও উন্নতি বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। আশ্রমগৃহ ক্রমশ বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছে—তাহার বর্ত্তমান মূল্য ৩৫ হাজার টাকা। আশ্রমের ছাত্রী সংখ্যা, শিক্ষিতব্য বিষয়, শিক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষক এবং অর্থশক্তি—সাধারণের আশ্রমের উপকারিতা-উপলব্ধিহেতু সহানুভূতি প্রসারের সহিত বেশ সন্তোষকরভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক, কল্যাণেচ্ছু, সাহায্যদাতাও ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতেছে।

আশ্রম-সমিতির কার্য্য ১২ জন সভ্যগঠিত অনুষ্ঠান-সভার দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার রামকৃষ্ণ-গোপাল ভাণ্ডারকর অনুষ্ঠাতৃসংঘের বর্ত্তমান নায়ক এবং শ্রীমতী রমাবাঈ রানাড়ে মহিলাসমিতির কর্ত্রী। এতদ্ভিন্ন সমিতির একজন আয়ব্যয়পরীক্ষক ও দুই জন ধনরক্ষক আছেন।

এই আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য,—যে সকল জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই, সেই শ্রেণীর বিধবাদিগকে শিক্ষা দিয়া উন্নতমনা করা এবং সদুপায়ে জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় করিয়া দেওয়া। কয়েক বৎসরের শিক্ষার পর বিধবাগণ আশ্রম ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ স্থানে যাইতে পারেন; কিন্তু কেহ আশ্রমের সেবা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে আশ্রমে থাকিতে দেওয়া হয়। দয়াব্রত বা সেবা-ব্রতে শিক্ষিত দীক্ষিত করিয়া এক কর্ম্মিষ্ঠার দল গঠন করাও সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

আশ্রমের অধিকাংশ ছাত্রীই দরিদ্র। প্রায় সকলের



সধবা ও কুমারী ছাত্রীগণ।

গ্রাসাচ্ছাদনের ভার আশ্রমকেই বহন করিতে হয়। বিধবা-দিগের ছোট ছোট মেয়েগুলিকেও আশ্রমে থাকিতে দেওয়া হয়। আশ্রমের শিক্ষাসাফল্য দেখিয়া অনেক অভিভাবক খরচ দিয়া অবিধবাদিগকেও আশ্রমে ভর্ত্তি করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। ইহাতে বর্ত্তমান মোট ছাত্রী সংখ্যা ৮০ জনের মধ্যে ৬০ জন বিধবা এবং ২০ জন অবিধবা। এই বিধবাশ্রম ক্রমশ সর্ব্ব শ্রেণীর রমণীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া উঠিতেছে।

ভর্ত্তি হইলে পর প্রথম দুই বৎসর লেখাপড়া ও সামান্য অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রীগণ চতুর্থভাগ মারাঠী পুস্তক পড়িতে সক্ষম হইলে ব্যাকরণ, কাব্য, ইতিহাস, ভূগোল-বিদ্যা এবং ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরাজি শিক্ষা ইচ্ছাসাপেক্ষ। মারাঠী চতুর্থমান সম্পূর্ণ হইলে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করা হয়। সংস্কৃত শিক্ষাও ইচ্ছাসাপেক্ষ। ইংরাজি চতুর্থমান শেষ হইলে, বিশ্ববিদ্যালয় নির্দ্দিষ্ট সকলবিধ পাঠ রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠাতৃসংঘ একটি শিক্ষাশালা খুলিবার বাসনা করিয়াছেন; সেখানে স্কুলের জন্য শিক্ষয়িত্রীদিগকে শিক্ষাদান-পদ্ধতি আয়ত্ত করান হইবে। এবং যাহাতে এই আশ্রম ও শিক্ষাশালা গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হয়, তজ্জন্যও চেষ্টা হইতেছে। তাহা হইলে এখানে শিক্ষিতাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র প্রশস্ত হইবে এবং অনেক সুবিধা হইতে পারিবে।

আমাদের দেশে শতকরা একজন মাত্র স্ত্রীলোক পড়িতে পারেন। এ অবস্থায় লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়াই প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু কেবল লেখাপড়া শিখিয়া সকলের পক্ষে স্বচ্ছন্দ জীবিকার্জ্জন সহজ নাও হইতে পারে। এজন্য শিল্প-শিক্ষারও ব্যবস্থা হইতেছে—যথা, সিবন, বয়ন প্রভৃতি।

আশ্রমের প্রত্যেক বাসিনীকে গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিতে হয়। ঝাঁটা, কুটা প্রভৃতি কাজ আশ্রমবাসিনীদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ১৫ মিনিট হইতে আধঘণ্টা পর্য্যন্ত করিতে দেওয়া হয়। এবং কাহাকেও একদিনে দেড় ঘণ্টার বেশী গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত রাখা হয় না। মধ্যবিত্ত



অধ্যাপক ডি. কে. কার্ভে ;

কুমারী দ্বারকাবাঈ চাব্‌রেকর, শ্রীমতী বেণুবাঈ নাম জোশী, শ্রীমতী পার্ব্বতীবাঈ আঠাবালে, শ্রীমতী কাশীবাঈ দেবধর এবং শ্রীমতী বনুবাঈ দেশপাণ্ডে।

গৃহস্থকন্যাদের সকল প্রকার গৃহকর্ম্মে অভ্যস্ত ও সক্ষম হওয়া উচিত। এজন্য আশ্রমগৃহের সকলবিধ গৃহস্থালীর কর্ম্ম পর্য্যায়ক্রমে সকল অধিবাসিনীকেই করিতে হয়। গৃহকর্ম্মের মধ্যে রন্ধন প্রধান ; প্রতি অধিবাসিনী অন্ততঃ ছয় জনের ভোজ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করিতে সক্ষম হয়েন, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করা হয়।

বয়স্কাগণ ৫॥০টা হইতে ৬টার মধ্যে প্রাতে শয্যাত্যাগ করেন। বালিকারা আধ ঘণ্টা অনুগ্রহ পাইয়া থাকেন। কিঞ্চিৎ গৃহকর্ম্মের পর স্নান ও আপনাপন বস্ত্র ধৌত করা হইলে, কিয়ৎক্ষণ সকলে স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ উপাসনা পূজা করেন। তৎপরে সকলে পাঠ অভ্যাস করিতে নিযুক্ত হয়েন এবং ১০টার সময় আহারের ঘণ্টাধ্বনি হইলে আহার করিয়া বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েন। ১১টার সময় বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা আরম্ভ হয়। অধ্যাপনার পূর্ব্বে ১৫ মিনিট ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য ব্যয়িত হয়, বয়স্কাগণ গীতার শ্লোক আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করেন, এবং বালিকারা মাতৃভাষাগ্রথিত সাধুপদাবলী গান করেন। স্কুলে অর্দ্ধঘণ্টা জলযোগের ছুটি হয়। ৪-১৫ সময় স্কুল বন্ধ হয়। বৈকালেও কিঞ্চিৎ গৃহকর্ম্মের পর সকলে যথেচ্ছ বিচরণ করেন। সন্ধ্যাভোজনের ঘণ্টাধ্বনি হইলে আহারান্তে সকলে নৈশপাঠে নিবিষ্ট হয়েন। বালিকারা ৯টার সময় শয়ন করে; শয়নের পূর্ব্বে কতকগুলি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সঙ্গীত গান করে। অন্যান্য সকলে গীতামন্দিরে সমবেত হইয়া একত্রে নানাবিধ পদ ও সাধুরচিত অভঙ্গ গান করেন। তৎপরে নানাবিধ দার্শনিক, নৈতিক ও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কিছু কিছু পাঠ হয়। এই সকল ধর্ম্মচর্চ্চায় কোনরূপ বিশেষ মত কাহাকেও শিক্ষা দেওয়া হয় না। সাধারণ ধর্ম্মতত্ত্ব সকল বুঝাইয়া দিয়া ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করাই উদ্দেশ্য। ধর্ম্মসম্বন্ধে সকলের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা রক্ষা করা হয়। সাড়ে নয়টার সময় ঘণ্টাধ্বনি হইলে সভা ভঙ্গ হয়। দশটার মধ্যে সকলে শয়ন করেন।—ইহাই আশ্রমের দৈনিক কার্য্যপ্রণালী।

এইরূপ লোক-হিতকর প্রতিষ্ঠান সকলের কার্য্যে উৎ-

সমর্পিত-সমগ্র-জীবন সেবকের অভাবে কত প্রতিষ্ঠান অকালে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু মহারাষ্ট্রদেশের সৌভাগ্যক্রমে সে দেশে স্বার্থত্যাগী পুরুষ নারীর অভাব নাই। পুনার প্রসিদ্ধ ফার্গুসন কলেজের কত অধ্যাপক ৭৫৲ টাকা মাত্র পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া সমগ্রজীবন শিক্ষাব্রতে উৎসর্গ করিয়াছেন। সেই স্বার্থত্যাগের পবিত্র মন্দিরের অন্যতম পুরোহিত অধ্যাপক কার্ভে—যাঁহার উৎসাহপ্ররোচনায় অধ্যাপক পরাঞ্জপ্যে শিক্ষিত হইয়া জগদবিখ্যাত ও দেশমান্য হইয়াছেন, সেই অধ্যাপক কার্ভে—সস্ত্রীক এই বিধবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, এবং ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত কেবলমাত্র তাঁহাদেরই ঐকান্তিক যত্ন, পরিশ্রম, সাহায্য ও তত্ত্বাবধানে উহা চালিত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীমতী পার্ব্বতী বাঈ আঠাবালে তাঁহার সমগ্র জীবনের শক্তিসামর্থ্য শিক্ষা দীক্ষা আশ্রমেব সেবায় উৎসর্গ কবেন। বৎসরকাল পরে শ্রীমতী বনুভাই দেশপাণ্ডে এবং আর কয়েক মাস পবে শ্রীমতী নামযোশী ও দেবধর সেবাব্রত গ্রহণ করেন। ইঁহারা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তা। এতদ্ভিন্ন অল্পশিক্ষিতা কিন্তু উদারহৃদয়া আরো কয়েকটি মহিলা আশ্রমের কার্য্যে আত্মদান করিয়াছেন। ইঁহাবা সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র গ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে আশ্রমের সেবা কবিতেছেন। যে প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি এরূপ আত্মত্যাগের উপর, তাহার মরণাশঙ্কা থাকে না।

আশ্রমের উপবিলিখিত অধ্যাপিকাগণ পর্য্যায়ক্রমে আশ্রমের উদ্দেশ্য প্রচারকল্পে দেশপর্য্যটন কবেন। ইহা দ্বারা আমাদের দেশের পুরুষদের বিধবানামকজীবের বিস্মৃতি-লুপ্ত অস্তিত্ব ও অবস্থা স্মরণ হইয়া উঠে, রুদ্ধ চিন্তা মুক্ত হইয়া পড়ে, এবং বিধবারাও আপনাদের আত্মোপলব্ধির দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন।

এই সকল অধ্যাপিকা ব্যতীত ছয় জন অধ্যাপক শিক্ষা-দান করেন। তাঁহারা সস্ত্রীক আশ্রমগৃহেই বাস করেন। শিক্ষিতা রমণীর অভাবে এই ব্যবস্থা অনিবার্য্য।

আশ্রমটি ক্রমশ দেশে বিদেশে পরিচিত হইতেছে এবং আপনার সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা বহু লোকের মনে এরূপ আশ্রমের সর্ব্বত্রাভাব জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে।

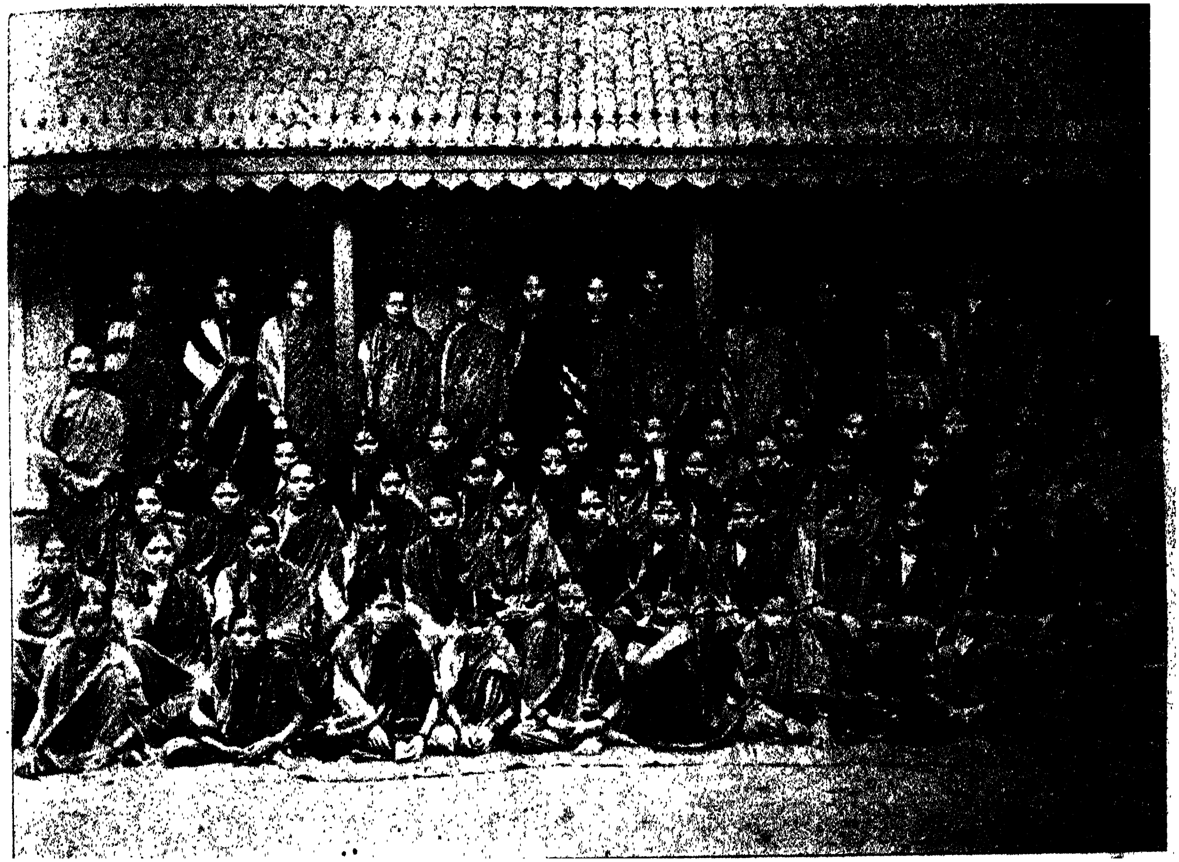
আশ্রমের আর্থিক অবস্থার ক্রমশ উন্নতি হইতেছে। অর্থকোষের প্রতিষ্ঠাও অধ্যাপক কার্ভের আত্মত্যাগ হইতে। তিনি সপত্নীক আশ্রমের কল্যাণার্থে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছেন। তিনি ফার্গুসন কলেজে মাসিক ৭৫৲ টাকা মাত্র বেতনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; তিনি ধনী নহেন। কিন্তু মনের বলই বল; তিনি আশ্রমে সর্ব্বস্ব দান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এক সময়ে আর্থিক অনাটনে আশ্রম ক্লিষ্ট ও মরণোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল; অধ্যাপক কার্ভে আশ্রমের স্থায়ী অর্থকোষের জন্য আপনার জীবন-বীমার প্রাপ্তব্য অর্থ আশ্রমকে দান করিয়া তাহার অকাল-মৃত্যু নিবারণ করেন। এক্ষণে সাধারণের কথঞ্চিৎ সহানুভূতি থাকিলে এই আশ্রমের কোন অকল্যাণ সম্ভাবনা ঘটিবে না।

অধ্যাপক কার্ভে রক্তহীন রোগীর শরীরে যেন আপনার স্বাস্থ্যময় উষ্ণশোণিত সঞ্চালিত করিয়া দিয়াছেন। রোগীর জীবনীশক্তি উজ্জীবিত হইয়াছে, ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা ভাল হইলে রোগীর আর বিনাশ নাই। অনেকে ঔষধপথ্য লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন; স্বেচ্ছাকৃত বহুতর দান—রাজোচিত দান হইতে দারিদ্রের কণাভিক্ষা পর্য্যন্ত—সাদরে গৃহীত হইতেছে।

আশ্রমের অস্তিত্ব অল্পদিনের। ইহার মধ্যে আমাদের মত বাপ পিতামহের দোহাই দেওয়া গোঁড়া সংস্কারবিরোধীর দেশে যেটুকু কার্য্য হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট বলিতে হইবে। কতকগুলি বিধবা শিক্ষিতা হইয়া আশ্রমের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছেন, এবং ৭ জন স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করিয়াছেন। অনেকে এখন স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনক্ষমা হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা অধিকতর শিক্ষিতা হইবার বাসনায় এখনো আশ্রম ত্যাগ করেন নাই।

আশ্রম দ্বিবিধ-কার্য্য করিতেছে। প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ কার্য্য,—বিধবাদের অবস্থোন্নতি; অপ্রত্যক্ষ,—বিধবার প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ। এখন অনেক পরিবারে বৈধব্যের কষ্ট উপলব্ধি হইতেছে, এবং বালবৈধব্য নিবারণকল্পে কন্যার বয়োবৃদ্ধি হইলে বিবাহের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

দাক্ষিণাত্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা দেখিলে বাঙালী আমাদের আশ্চর্য্য হইতে হয়। সে দেশের বিধবারা বঙ্গবিধবার চেয়ে ঢের সুখী; একাদশীর পাষণ্ড-



বিধবা ছাত্রীগণ।

পীড়ন, গৃহের দাসীত্বে নিয়োগ সে দেশে নাই। আমরা যেমন অবজ্ঞা ও ঘৃণার চক্ষে স্ত্রীজাতিকে দেখি তাঁহারা তেমন নহেন। তাঁহারা আপনার মাতা, ভগ্নী, পত্নীর মর্য্যাদা রাখিতে জানেন। তথাপি তাঁহাদের দেশে জীবন্ত ক্রমবর্দ্ধমান বিধবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বোধ হয় তাঁহারা নারীজাতির মর্য্যাদা জানেন বলিয়াই হইয়াছে। সকল দেশের অপেক্ষা বঙ্গবিধবার দুর্ভাগ্য ও দুর্ভর-কষ্ট কাতরকণ্ঠে আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। পুণ্যশ্লোক রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের পদাঙ্ক অনুসরণক্ষম সে কোন্ মহাত্মা কবে আপনার অমিত বল সাহস উৎসাহশক্তি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, যাঁহাকে নির্জ্জিত বঙ্গমহিলার সকৃতজ্ঞ আশীর্ব্বাদ ধন্য করিয়া যশোমাল্যে বরণ করিয়া নিবে?

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কলিকাতার জাতীয় যজ্ঞে প্রাতঃস্মরণীয় দাদাভাই নওরোজী মহাশয়কে এবার বহুসংখ্যক লোকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। এবারকার কংগ্রেসের কার্য্য দেখিয়া মনে হইয়াছে, তিনি যেন আমাদের অবিভক্ত রাজনৈতিক পরিবারের কর্ত্তা। একই পরিবারে যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধে অবান্তর বিষয়ে মতভেদ হইলেও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সকলেই যেরূপ একমত হইয়া কাজ করেন, আমরাও এবার তেমনি তাঁহার প্রাধান্যে নানা মতভেদ সত্ত্বেও এক হইয়া আমাদের স্বাধীনতাবিরোধীদের বিরুদ্ধে রক্তপাতবিহীন সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছি।

আমরা কি চাই, তাহা পরিষ্কার ভাবে নওরোজী মহাশয় বলিয়াছেন। আমরা "স্বরাজ্য" চাই, ইংলণ্ডের মত

কিম্বা ইংরাজ উপনিবেশগুলির মত "স্বরাজ্য" বা স্বায়ত্ত রাজ্যশাসন প্রণালী চাই। অনেকে তাড়াতাড়ি ভাবিয়া লইয়াছেন, যে দাদাভাই নওরোজী ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চান না। তাহা ভুল। তিনি নিজে ইংলণ্ডের মত অথবা উপনিবেশগুলির মত স্বরাজ্য চান, বলিয়াছেন। ইংলণ্ডের মত স্বরাজ্য বলিলে কি বুঝায়? ইংলণ্ড কাহারও অধীন নহে। সুতরাং উহার অর্থ, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। তাহা যদি না পান, তাহা হইলে নওরোজী মহাশয় উপনিবেশসমূহের মত স্বরাজ্য অর্থাৎ ইংলণ্ডের নামমাত্র অধীনতায় স্বরাজ্য লইতেও প্রস্তুত আছেন। কিন্তু দাদাভাই নওরোজী মনে করেন না যে আমরা হঠাৎ একদিনে স্বরাজ্য লাভ করিতে পারি। তিনি তাহার কতকগুলি সোপান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎসমুদয় তাঁহার বক্তৃতায় দ্রষ্টব্য।

স্বরাজ্যলাভের উপায়স্বরূপ তিনি আন্দোলন ও আবেদন করিতে বলেন। আবেদনকে তিনি ভিক্ষা বলেন না। স্বাধীন দেশেও আবেদন করার রীতি আছে; তথায়ও প্রজাদের অনেক আবেদন অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। তিনি বলেন যে আমাদের নিজদেশে আমাদের সমুদয় দেশবাসীকে আমাদের রাজনৈতিক অধিকারসমূহ জানান উচিত; কেমন করিয়া তৎসমুদয় পাওয়া যায় ও ভোগ করা যায়, তাহাও জানান উচিত। ইংলণ্ডেও খুব তেজের সহিত আমাদের ন্যায্য অধিকারসমূহ পাইবার জন্য আন্দোলন করা উচিত।

দুঃখের বিষয় দাদাভাই নওরোজী বিদেশীবর্জ্জন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতায় কিছু বলেন নাই। কিন্তু তিনি যে ইহার বিরোধী নহেন, তাহার প্রমাণ আছে। যখন বাঙ্গলাদেশে প্রথমে বিদেশী বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা করা হয়, তখন তিনি বাঙ্গালীদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন ও বিদেশীবর্জ্জন-প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় থাকিতে বলিয়াছিলেন।

আমরা বিদেশীবর্জ্জন প্রতিজ্ঞা করিয়া ভালই করিয়াছি। অন্যান্য প্রদেশের কেহ কেহ যাহাই বলুন, ইহাতে আমাদের লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। লজ্জার অন্য কারণ আছে বটে। তাহা এই যে আমরা দৃঢ়তার সহিত বিদেশী-বর্জ্জন প্রতিজ্ঞা রাখিতেছি না। এবার কলিকাতায় গিয়া দেখিয়াছি, অনেক নেতৃস্থানীয় লোকে যত্নের সহিত বিদেশীবর্জ্জন প্রতিজ্ঞা রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন না।

স্বদেশের শিল্পোদ্ধারকল্পে বিদেশীবর্জ্জন একান্ত আবশ্যক। কিন্তু রাজনৈতিক অস্ত্রস্বরূপেও বিদেশীবর্জ্জন প্রতিজ্ঞা ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু, প্রতিজ্ঞা দৃঢ়রূপে রাখিতে না পারিলে উহা না করাই ভাল। কারণ, তাহা হইলে অতঃপর আমাদের ধমকে কেহ আর ভয় পাইবে না।

আজকাল দেখিতে পাই অনেক ভারতহিতৈষী ইংরাজও ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার কল্পনাতেও বিরক্ত হন। কিন্তু চিরকাল এ ভাব ছিল না। পূর্ব্বে অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ কেবল যে নির্ভয়ে এইরূপ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নয়, তাঁহারা এরূপ আশা করাটাও ইংলণ্ডের গৌরবের কারণ মনে করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা, প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে যিনি ভারতের গবর্ণর জেনেরাল ছিলেন, সেই মার্কুইস অব্ হেষ্টিংসের "অপ্রকাশ্য" (Private) রোজনাম্চা হইতে একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার তারিখ ১৭ই মে, ১৮১৮।

"A time not very remote will arrive when England will, on sound principles of policy, wish to relinquish the domination which she has gradually and unintentionally assumed over this country, and from which she cannot at present recede. In that hour it would be the proudest boast and most delightful reflection that she had used her sovereignty towards enlightening her temporary subjects, so as to enable the native communities to walk alone in the paths of justice, and to maintain with probity towards their benefactress that commercial intercourse in which we should then find a solid interest." *The Private Journal of the Marquis of Hastings*, Vol. ii., p. 326.

এখানে লর্ড হেষ্টিংস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সুদূর ভবিষ্যতের কথা বলিয়া বলেন নাই। বলিয়াছিলেন—"a time not very remote will arrive," "এক সময় আসিবে, তাহা বেশী দূরও নহে।" ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন। আর ১৯০৬ সালে উদারনৈতিকপ্রবর মর্লী সাহেব বলিয়াছেন "যে তাঁহার দুর্ব্বল কল্পনা যতদূর যায়, ততদূর পর্য্যন্ত ভবিষ্যতে তিনি ভারতবর্ষে একনায়ক শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছেন!"

বড়োদার মহারাজা গায়কোয়াড় শিল্পসমিতিতে যে প্রারম্ভিক বক্তৃতা করেন, তাহা আদ্যোপান্ত অতি সারবান্। তিনি একদিকে যেমন হাতের তাঁত প্রভৃতির উন্নতির আবশ্যকতা প্রদর্শন করেন, অপরদিকে আবার তেমনি কলকারখানায় পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সহিত সমকক্ষতা করিতে না পারিলে আমাদের সর্ব্বনাশ যে অবশ্যম্ভাবী তাহাও বলেন। বিজ্ঞান ও কলকারখানার সমুদয় তত্ত্ব শিক্ষার জন্য বিদেশযাত্রার তিনি সমর্থন করেন। সাধারণ বিদ্যালয় সকলেও কারুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া তিনি ভালই করিয়াছেন। তিনি বার বার আবেগের সহিত বলিয়াছেন যে আমাদিগকে জাত্যভিমান ভুলিতে হইবে, এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষা দিয়া আমাদের সমকক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। নতুবা আমাদের গতি নাই। সর্ব্বশেষে তিনি দেখাইয়াছেন, যে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার উজ্জ্বলতায়

ইহার দোষ সকলের প্রতি অন্ধ হইয়া যান নাই। ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য দেশ সকল হইতে বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য ও রাজনীতি শিখিবেন, কিন্তু তদ্বিনিময়ে আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতজীবন পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে দান করিবেন।

সমাজসংস্কার-সমিতিতে সার্ চন্দ্রমাধব ঘোষ যে বক্তৃতা করেন, তাহার কোন বিশেষত্ব নাই। কিন্তু, যিনি যাহাই বলুন, ঘোষ মহাশয়ের এ কথা ঠিক্ যে বাঙ্গালীরা অনেক বৎসর হইতে জাতীয় উন্নতির অন্য সকল পন্থা অবহেলা করিয়া কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যাপৃত আছেন। এরূপ করিলে সর্ব্বাঙ্গীন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। এবার সমাজসংস্কার-সমিতিতে কয়েকজন মহিলার, বিশেষতঃ শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর, বক্তৃতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। ইহা খুব শুভ লক্ষণ। কারণ, সমাজসংস্কারের একটী প্রধান অঙ্গ নারীদের প্রতি অত্যাচার এবং নারীদের দুর্দ্দশা নিবারণ। নারীগণ একাজে হাত দিলে যেরূপ সদুপায় নির্ণীত হইবে, এবং সহজে কাজ হইবে, অন্য কোন প্রকারে তাহা হইবে না। নারীরাই মাতৃরূপে মানুষ গড়েন। সুতরাং তাঁহারাই জাতীয়মহত্বের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ।

এই কারণে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে যে মহিলাসমিতি গঠিত হয় এবং যাহার তৃতীয় অধিবেশন গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় হইয়াগিয়াছে, তাহা বড় আশাপ্রদ। যদি দুই বাড়ীর কেবল পুরুষদের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা হয় না।. কিন্তু মেয়েদের মধ্যেও যদি সাখিত্ব থাকে, তাহা হইলে খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ভারতীয় জাতিনির্ম্মাণে এতদিন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী পুরুষেরাই ব্যাপৃত ছিলেন। এখন নারীগণও পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয়া এ কার্য্যে মন দিয়াছেন। অন্তঃপুরিকাগণের পর্য্যন্ত ইহার প্রতি চোখ পড়িয়াছে। এখন বেশ জমাট বাঁধিবে বলিয়া আশা করা যায়। বড়োদার মহারাণীকে মহিলাসমিতির সভানেত্রী করা ঠিকই হইয়াছিল। রূপে গুণে মর্য্যাদায় তিনি ভারতরমণীর শীর্ষস্থানীয়া। তিনি স্বদেশীর বড় অনুরাগিনী। তাঁহার পরিচিতা কোন মহিলার পরিচ্ছদের কোন অংশ বিদেশী উপকরণে নির্ম্মিত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে তিরস্কার করেন। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্নী একটি বক্তৃতা পাঠ করিয়া বড়োদার মহারাণী ও সমুদয় সমাগত মহিলাগণকে সম্বর্দ্ধনা করেন। এই বক্তৃতাটির ভাষা ও বক্তব্য বিষয় উভয়ই উৎকৃষ্ট। নারীশিক্ষা সম্বন্ধে একটি কথা অনেকেই ভুলিয়া যান। তিনি নারীশিক্ষার প্রধান প্রয়োজনীয়তা এই দেখান—

"Because woman, like man, is first of all a mind, and only in the second place physical and body, because life is a great spiritual experience which demands every power of the ripe and awakened heart and intellect for its true fulfilment."

মহিলাসমিতিতে পঠিত অনেকগুলি প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। কোনও শিক্ষিতা মহিলাকর্ত্তৃক লিখিত এই সমিতির বৃত্তান্ত অন্যত্র মুদ্রিত হইল।

মাদকনিবারিণী সমিতির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে আসিয়া শ্রীযুক্ত সামুয়েলস্মিথ সাহেব হঠাৎ কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘজীবনে তিনি ভারতবর্ষের উপকারার্থ অনেক কাজ করিয়াছেন। মাদকনিবারণ চেষ্টা তাহার অন্যতম। আমরা অনেকে খবর রাখি না যে আমাদের দেশে সুরাপান প্রভৃতি পাপ কিরূপ বাড়িতেছে। ১৯০২-৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে মদ আফিং প্রভৃতির দোকান ১১৮৪৭২টা ছিল; ১৯০৩-৪ সালে ঐ সংখ্যা বাড়িয়া ১২০৮৭২ হয়। অর্থাৎ একবৎসরে ২৪০০টা দোকান বাড়ে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেন্টের আবকারী বিভাগের আয় ছিল, ১,৭৫৫,০০০ পৌণ্ড। ১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে উহা ৫,২৯১,০০০ পৌণ্ড হয়। অর্থাৎ ত্রিশবৎসরে তিনগুণ বাড়িয়াছে! আমাদের দেশে দেখা যায় যে বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কারক ও রক্ষণশীলদলের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু নেশা করা ত কেহই ভাল বলিতে পারেন না। তবে কেন দেশের এই সর্ব্বনাশ হইতেছে? সকলে একযোগে উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে ইহার প্রতিকার হইবে না।

কলিকাতা শিল্প ও কৃষিপ্রদর্শনী বেশ হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে ভারত বাস্তবিকই সোণার ভারত। আমাদের খনিজ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ অতুল। আমাদের দেশের লোকের বুদ্ধি, হস্তনৈপুণ্য, অধ্যবসায়ও আছে। কেবল উদ্যম, আধুনিক কলকারখানার জ্ঞান, সমবেত ভাবে চেষ্টা করিবার ক্ষমতা এবং যৌথ কারবার করিবার অনভ্যাস বশতঃ আমরা দরিদ্র ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছি। আমাদের এই সকল অভাব ও ত্রুটি দূর করিবার জন্য চেষ্টা না হইলে বরং আর প্রদর্শনী না হওয়াই ভাল। কারণ, আমাদের অসিদ্ধ (raw) দ্রব্যসম্ভার ও শ্রমপটুতাদি দেখিয়া পাশ্চাত্য ধনীলোকদের লোভ ত হইয়াই আছে। তাহারা একবার ভাল করিয়া ভারতবর্ষে বসিয়া মূলধন খাটাইয়া শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে মন দিলে আমাদের আর রক্ষা কোথায়?

প্রদর্শনীর চিত্রশিল্পবিভাগে শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অঙ্কিত দৃশ্যগুলি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় ঐ চিত্রগুলির রং ফলান এরূপ যে ভাল ফোটোগ্রাফ তুলাইয়া খুব ভাল হাফটোন ব্লক প্রস্তুত করাইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট কালী দিয়া অতিশয় দক্ষতার সহিত খুব ভাল কাগজে না ছাপিলে উহার সৌন্দর্য্যের কোন আভাস

দেওয়া যায় না। এতদ্ভিন্ন, ধুরন্ধরের "গীতবাদ্যশিক্ষা", উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয়ের পুরীর নিকটের একটি দৃশ্য, দ্বারকানাথ আত্রের "পূজান্তে," প্রভৃতি, এবং "কর্ণের সূর্য্য পূজা" প্রভৃতি চিত্রও সুন্দর হইয়াছিল। জাতীয়ভাবোদ্দীপক কয়েকখানি ছবি শিল্পাংশে উৎকৃষ্ট না হইলেও আশাপ্রদ। মহিলাগণের চিত্রিত কোন ছবিই খুব ভাল হইয়াছিল বলা যায় না। তবে অনেকের বেশ ক্ষমতা আছে বটে। তাঁহারা বিদেশীর নকল না করিয়া দেশী কল্পনার সাহায্যে দেশী "আটপৌরে" বিষয়ের, বা রামায়ণ মহাভারতাদির ছবি আঁকিলে অধিকতর সফলকাম হইবেন। ব্রোমাইড্ এন্‌লার্জমেণ্ট বিভাগে কুলদারঞ্জন রায় যে একখানি রঙ্গীন ছবি দিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর। তরুণীর সৌন্দর্য্য যেরূপ অনির্ব্বচনীয়, চিত্রের নৈপুণ্যও তদ্রূপ।

ভারতবাসীর নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ, বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার "শোষণগ্রাফ" প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, এবং অন্যান্য কারখানার নির্ম্মিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলি সুন্দর হইয়াছে। ন্যাশন্যাল সোপ, বেঙ্গল সোপ প্রভৃতি সাবানই কত রকম। কিন্তু এক এক করিয়া সকল বিভাগের কথা বলা "প্রবাসীর" পক্ষে অসম্ভব।

কলিকাতার নানা অনুষ্ঠানে সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসী ব্যাপৃত ছিলেন। ঠিক্ সেই সময়ে ঢাকার মুসলমানদিগের শিক্ষাসমিতি বসিতেছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত সৈয়দ শরফুদ্দিন তাঁহার উর্দ্দু বক্তৃতায় বিদেশী সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে অনুবাদ করিয়া জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি করার প্রয়োজন দেখাইয়াছিলেন। মুসলমান কেন, সমুদয় ভারতবাসীরই এই কার্য্যে যোগ দেওয়া উচিত। বিজ্ঞান শিক্ষাও তিনি বিশেষ আবশ্যক বলেন। নারীগণের শিক্ষার একান্ত আবশ্যকতা তিনি স্বীকার করেন কিন্তু বলেন যে মুসলমান বালিকাদিগকে স্কুলে পাঠাইবার এখনও সময় আসে নাই। আমরা কিন্তু জানি যে কোথাও কোথাও মুসলমান বালিকাদিগকে স্কুলে পাঠান হয়, এবং তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালীমুসলমানদের উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করা উচিত, কিন্তু বাঙ্গালাও ভাল করিয়া শিখা উচিত, এবং জ্ঞানলাভ মাতৃভাষার সাহায্যেই হওয়া কর্ত্তব্য, এরূপ নির্দ্ধারণ সঙ্গতই হইয়াছে। আমাদের বোধ হয়, উর্দ্দুই বলুন আর হিন্দিই বলুন, হিন্দুস্থানীভাষা আমরা সকলেই অন্ততঃ মোটামুটি রকমে শিখিলে ভাল হয়। কেন না, দেখা যাইতেছে যে এই ভাষা ভারতের যত লোক বুঝে, আর কোন ভাষা তত লোকে বুঝে না। সুতরাং ইহা জাতীয়তাস্থাপনের সহায়স্বরূপ হইতে পারে।

মুসলমানশিক্ষাসমিতির সভাপতি সৈয়দ শরফুদ্দিন সাহেবের সম্বন্ধে আমরা একটি ক্ষুদ্র রচনা পাইয়াছি তাহা এখানেই মুদ্রিত করিতেছি—

"বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগে বেহারের যে গৌরব ছিল এবং যে অতীত গৌরবের ধ্বংশাবশেষ মাত্র বক্ষে ধারণ করিয়া বেহার আজও প্রত্নতত্ত্ববিদের পুণ্যক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে, সেখানে উপযুক্ত মানুষ অতি অল্প। এ জন্য বড় দুঃখ হয়। কিন্তু একেবারে নাই এমন নহে। স্বর্গীয় শালগ্রাম সিংহের কথা অনেকে শুনিয়াছেন। সুবিখ্যাত ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী মৌলভী খোদাবক্স খাঁ বাহাদুরের নামও শিক্ষিতসমাজে অজ্ঞাত নহে। আজ আমরা মাননীয় জজ সরফুদ্দিন সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

"মাননীয় সরফুদ্দিন ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর পাটনা জেলার অন্তর্গত নেওরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেণ ইঁহার পিতার নাম সৈয়দ ফর্জান্দ আলি। এই বংশের একটু ঐতিহাসিক বিশেষত্ব আছে। ইতিহাসে সৈয়দ সরফুদ্দিনের পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। মুসলমান শাসনাধিকারকালে তাঁহারা উচ্চপদ ও সম্মানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এবং বহুঘটনার মধ্যে তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা ও বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের বংশধর উত্তরকালে যে বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন তাহা সৈয়দ সরফুদ্দিনের শৈশবেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল।

"বাল্যকালে তিনি পাটনা কলিজিয়েট স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি ইংলণ্ডে যান। সে সময়ে মুসলমানগণ বিদেশীয় শিক্ষাকে একটু সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং জাতীয়তা সম্বন্ধে খুব রক্ষণশীল মত পোষণ করিতেন। ইহার পূর্ব্বে সার সৈয়দ আহম্মদ ইংলণ্ড যাওয়ায় সে ভাব কতকটা খর্ব্ব হইয়াছিল। কিন্তু অনেক বিঘ্নবিপত্তির সম্ভাবনা সত্ত্বেও তরুণ যুবক সরফুদ্দিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হন নাই বা কোনো দ্বিধা অনুভব করেন নাই।

"মিড্‌ল টেম্পলে (Middle Temple) নির্দ্দিষ্টকাল আইন অধ্যয়নার্থীরূপে বাস করিয়া তিনি ১৮৮০ অব্দে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। প্রথমতঃ তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে কিছুদিন ব্যারিষ্টারী করিয়াছিলেন, কিন্তু পারিবারিক কতকগুলি ব্যাপারে তাঁহার পক্ষে পাটনায় থাকা সর্ব্বদা প্রয়োজন হইতে লাগিল। এই উপলক্ষে তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া পাটনায় আসিয়া স্বীয় ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিলেন। এবং অচিরেই তিনি এখানে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। অদ্যাপি বাঁকিপুর আদালতে মাননীয় সরফুদ্দিনের নামে পেশাদারী বা উকিলের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত সাক্ষ্যদাতার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়া থাকে। তাঁহার জেরায় কত সুবিন্যস্ত সুরচিত মোকদ্দমা শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না। যাঁহারা স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখিয়াছেন তাঁহারা বিস্ময়ের সহিত শতমুখে তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রশংসা করিয়া থাকেন। প্রকাশ্যসভায় তাঁহার ধীর, সারগর্ভ বক্তৃতাশক্তিতে অনেকেই মুগ্ধ।

"এ সকল বাহিরের কথা। বাহিরের যোগ্যতা ও কার্য্যদক্ষতা অনেকেরই থাকে। কিন্তু মনুষ্যত্ব অনেকের থাকে না। মুসলমান সমাজে একাধিক বিবাহ ধর্ম্মানুমোদিত হইলেও মাননীয় সরফুদ্দিন একাধিক দারপরিগ্রহ করেন নাই। ধনীসমাজে এবং বিশেষতঃ বেহার প্রদেশে সুরাপান দোষের মধ্যে গণনীয় নহে। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি যে বিগত ষোল বৎসরের মধ্যে তিনি সুরাস্পর্শ করেন নাই। অধিকন্তু বেহারে মাদকতা নিবারণের তিনি বিশেষ উদ্যোগী। মুসলমানসমাজের একটা নিন্দা আছে যে তাঁহারা অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় এবং কথাটার মধ্যে কিছু সত্য থাকিলেও আমরা ইঁহার মধ্যে সেরূপ কুৎসিৎ বিলাসের ভাব দেখি নাই। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশোর্দ্ধ হইলেও কার্য্যতৎপরতায় (activity of habits) তিনি অনেক যুবকের আদর্শস্থানীয়। (চিত্র হইতে ইহা কতকটা অনুমিত হইতে পারিবে)। আমন্ত্রকদিগের প্রতি

তাঁহার সাদরসম্ভাষণ ও সরল, অমায়িক ব্যবহার যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন না।

"কংগ্রেসের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকায় তিনি অনেকের নিকট লাঞ্ছিত হইয়াছেন; কিন্তু নিজের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে উৎপীড়িত ও নিন্দিত হইয়াও তিনি কংগ্রেস সম্বন্ধে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করেন নাই। বেহারপ্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন একদল বেহারীকে তিনি চিরদিন উপদেশ দিয়া আসিতেছেন—"Unite and work"—এবং স্বীয় জীবনে এই নীতি অনুসারে ছোট বড় অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ইহার ফলে বাঙ্গালীদের প্রতি বেহারীদের বিদ্বেষভাব দিন দিন অন্তর্হিত হইতেছে—এবং রক্ষণশীলদল হইতেও কোনো কোনো ব্যক্তিকে আমরা কংগ্রেসমণ্ডপে দেখিতে পাইতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোরূপে ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপেও তিনি কোনো কোনো বিষয়ে স্বীয় যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন।

"গত ডিসেম্বর মাসের শেষে ঢাকায় সমগ্র ভারতীয় মুসলমানদিগের যে সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল ইনি তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। মুসলমানসমাজ তাঁহাকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া যোগ্যতার সম্মান করিয়াছেন। আমরা আশা করি বেহারে অবস্থানকালে তিনি যেমন সম্প্রদায় বা প্রদেশ বিশেষে তাঁহার কার্য্যকরীশক্তিকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, কলিকাতায় অবস্থানকালেও সেইরূপ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায় ও সকল বিভাগে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ও সামর্থ্যের নিয়োগ করিতে ত্রুটি করিবেন না। হাইকোর্ট বেঞ্চে তিনি উন্নীত হওয়ায় আমরা সুখী হইয়াছি; এই নবপদ তাঁহাকে যে নবশক্তির অধিকারী করিয়াছে আমরা আশা করি তাহা তিল তিল করিয়া তিনি জাতীয় উন্নতি ও কল্যাণের নিমিত্ত ব্যয় করিয়া ধন্য হইবেন।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপধ্যায়।"

আফগানিস্তানের আমীরের ভারতদর্শনে আমাদের ক্ষতি লাভ কি, এক হিসাবে, তাহার আলোচনা করা, ভদ্রতাবিরুদ্ধ বিবেচিত হইতে পারে। কারণ, তিনি আমাদের দেশে অতিথি স্বরূপে আসিয়াছেন। দুঃখের বিষয় যদিও আতিথ্যটা আমাদের টাকায় হইতেছে, কিন্তু অতিথিসৎকারের বন্দোবস্ত বা টাকা খরচ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলিবার অধিকার নাই। খরচ সম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে ইংলণ্ড তাঁহার অতিথিসৎকার করিতেছেন, নিজ সাম্রাজ্যের জন্য,—প্রধানতঃ বা কেবল আমাদের উপকারের জন্য নহে। সুতরাং ব্যয়ের অধিকাংশ বা সমস্তই ইংলণ্ডের বহন করা উচিত।

আমীরের ভারতাগমনে একটি বিষয়ে বিশেষ উপকার হইয়াছে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রাচ্য রাজারাও ধর্ম্ম বিষয়ে নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করিতে পারেন, এবং তাঁহাদের দ্বারাও ধর্ম্মকলহ নিবারিত হইতে পারে। আমীরের কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের প্রতি মনের ভাব প্রতিবেশীদের মধ্যে যেমন হওয়া উচিত, অনেকটা তদ্রূপ হইয়াছে। ইহা কম লাভ নহে। সাত্ত্বিকতা লাভ ত আছেই; তা ছাড়া, ইহা নিশ্চয় যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের মৈত্রী ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে আমরা কখনও একজাতি হইতে পারিব না, এবং আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভও ঘটিবে না।

ইংরাজ বলিতেছেন আমীরের ভারতাগমনের সহিত রাজনীতির কোনই সম্পর্ক নাই। ইহা কখন সত্য হইতে পারে না। ইংরাজ অবশ্য পরের টাকায় অতিথিসৎকার করিতেছেন। কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে যে কোন গূঢ় অভিপ্রায় না থাকিলে ইংরাজ পরের টাকাও এমন জলের মত খরচ করিবেন। আসল কথা এই,—ইংরাজ আমীরকে (রুশিয়ার বিরুদ্ধে) নিজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিতে চান। দ্বিতীয় অভিপ্রায়,—যুদ্ধবিগ্রহ ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য আমীর যাহাতে আফগানিস্তানে রেল ও টেলিগ্রাফের তার বসাইতে দেন, তাহার চেষ্টা। তৃতীয় অভিপ্রায়,—আমীর যাহাতে আফগনিস্তানের খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ ঐশ্বর্য্য তথাকথিত শিল্পবাণিজ্য দ্বারা লুণ্ঠন করিতে ইংরাজকে অনুমতি দেন, তাহার চেষ্টা। আমরা জানি না, আমীর ইংরাজের এই সকল অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইতে দিবেন কি না। তাঁহাকে বুদ্ধিমান ও সাহসী ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হইতেছে। তাঁহার প্রজাগণ রেল, টেলিগ্রাফ, কলকারখানা, সম্পূর্ণরূপে নিজেরা চালাইতে সক্ষম হইবার পূর্ব্বে, এই সকল ব্যাপার অবাধভাবে নিজ রাজ্যে ইংরাজকে প্রবর্ত্তিত করিতে দিলে আফগানিস্তানের শিল্পবাণিজ্য পরায়ত্ত হইবে, দেশ গজভুক্ত কপিত্থের মত অন্তঃসারশূন্য হইবে, এবং অচিরে আফগানিস্তান, নামে না হইলেও কার্য্যতঃ, ইংরাজের অধীন হইবে, ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।

আমীরকে পাশ্চাত্যশিক্ষার অনুরাগী বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষা ভাল, কিন্তু কেবল সাহিত্যিক শিক্ষায় আফগানেরা পৌরুষবিহীন হইয়া পড়িতে পারে। আমীরের প্রধান কর্ত্তব্য, নিজের প্রজাদিগকে বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষা দ্বারা শিল্পবাণিজ্যে ও যুদ্ধে পাশ্চাত্যজাতি সকলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ করা। নতুবা পাশ্চাত্য সভ্যতার উপরের পালিশ ও মার্জ্জিত ভাব লইয়া কোন লাভ হইবে না, বরং ক্ষতি হইবে।

ইংরাজের যে চতুর্থ অভিপ্রায় আছে বলিয়া আমরা অনুমান করি, তাহাতে ভারতবাসীর কিছু ক্ষতি আছে বলিয়া তাহা সর্ব্বশেষে বলিতেছি। এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, যদি এই অনিষ্ট হয় তাহা হইলে ইহা আমীরের দ্বারা হইবে না, আমীরকে তজ্জন্য সাক্ষাৎভাবে দায়ী করা যাইবে না। সম্ভাবিত অনিষ্টটা এই—কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভারতগবর্ণমেণ্ট সমরপ্রিয় ভারতবর্ষীয় জাতি সকলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া সীমান্তপ্রদেশবাসী আফ্রিদি প্রভৃতি জাতিকে সেনাদলভুক্ত করিতেছেন। ইহাতে অনেক যুদ্ধক্ষম ভারতবাসীর অন্ন ত

মারা যাইতেছেই; অধিকন্তু ভারতবাসী সকল জাতিই ক্রমশ পৌরুষবিহীন হইয়া পড়িতেছে। অন্ততঃ আংশিক-ভাবেও স্বদেশরক্ষার অধিকার, গৌরব ও আত্মপ্রসাদ হইতে তাহারা চ্যুত হইতেছে। আফগানিস্তানের আমীরের সঙ্গে ইংরাজের খুব বনিবনাও হইয়া গেলে ইংরাজ খাস আফগানিস্তান হইতেই সেনাসংগ্রহ করিবেন। তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় হিন্দু মুসলমান শিখ গুর্খাদি সকল সমর-ক্ষম জাতি ক্রমশ আরও নির্বীর্য্য হইয়া পড়িবে, এবং স্বদেশরক্ষার অধিকার, গৌরব ও আত্মপ্রসাদ সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া বর্ত্তমানকাল অপেক্ষাও পরপদানত হইয়া পড়িবে। ইহাই আমাদের আশঙ্কা।

আমীর ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে নিজাম, মহীশূররাজ, এবং বড়োদার গায়কোয়াড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইল না। ইহার অর্থ কি?

মুসলমানধর্ম্মের এক মহদ্‌গুণ পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল। এবার আরও ভাল করিয়া জানা গেল। তাহা, সকল মানুষের ধর্ম্মবিষয়ে সাম্য। মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী কোন রাজা সর্ব্বসাধারণকে নিজের সহিত ভগবানের আরাধনা করিতে ডাকিতেন কি? আমীর সর্ব্বত্রই ডাকিতেছেন। অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীরা নিজ ধর্ম্মাবলম্বী বিদেশী রাজাকে নিজের লোক মনে করে কি? ইউরোপের কোন খৃষ্টান রাজা ভারতে আসিলে ভারতবর্ষীয় খৃষ্টানেরা কি ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ নির্ব্বিশেষে তাঁহার সহিত উপাসনা করিতে আহূত হইবে, বা তাঁহাকে নিজের লোক মনে করিবে? কখনই না। মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব যেমন জগদ্ব্যাপী, এমন আর কোনও ধর্ম্মাবলম্বীর নহে। এই জন্য রাজনৈতিক হিসাবে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের ওজন বেশী মনে করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে স্বাভাবিক। হিন্দুর নিজ শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি নাই। মুসলমানের পরোক্ষ বহির্বল আছে। ইহাতে কাহার সুবিধা বা অসুবিধা তাহা তাঁহারা নিজে বুঝিবেন, আমরা বলিতে চাই না। কিন্তু কথাটা ভুলিবার যোগ্য নহে।

মহিলা সভা।

গত ১৫ই পৌষ শনিবার কলিকাতা মহানগরীতে বেথুন কলেজ গৃহে এক মহতী নারীসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বেলা ১১টা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত এই সভার কার্য্য চলিয়াছিল। কেবল নারীগণের উদ্যোগে ও কার্য্যকারিতায় এরূপ বিপুল সভার অধিবেশন কলিকাতা নগরীতে বোধ হয় এই প্রথম। কলেজগৃহ অতি পরিপাটী রূপে সজ্জিত হইয়া অতি মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছিল। বড়োদার মহারাণী এই সভার সভানেত্রী পদে বৃতা হইয়াছিলেন। সভাস্থলে কুচবিহারের মহারাণী, ময়ূরভঞ্জের মহারাণী, প্রতাপগড়ের মহারাণী, নাটোরের মহারাণী, দিঘাপাতিয়ার মহারাণী, শ্রীমতী কাশীবাই হার্লাকার, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীমতী যোশী, শ্রীমতী খারে, শ্রীমতী বিভালকার, শ্রীমতী ত্রিবেদী, শ্রীমতী প্রসন্নতারা গুপ্ত, শ্রীমতী গোবিন্দমোহিনী সিংহ, শ্রীমতী রাজকুমারী দাস, এম এ, শ্রীমতী চন্দ্রমুখী সোমগাই, এম এ, শ্রীমতী অবলা বসু, শ্রীমতী হেমলতা সরকার, শ্রীমতী লীলাবতী মল্লিক, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী, শ্রীমতী রেবা রাও, কোকনদের শ্রী সাবিত্রী লক্ষ্মীনারায়ণী বাই প্রভৃতি পার্শী মারহাটী, বাঙ্গালী, গুজরাটী, মান্দ্রাজী, উত্তরপশ্চিম ও উৎকল দেশীয়া নানাবর্ণ ও জাতির পঞ্চশতের অধিক মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে মহারাণী বড়োদার অভ্যর্থনা সঙ্গীত গীত হইয়া কার্য্য আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা-সভানেত্রী শ্রীমতী কুচবিহারের মহারাণী বড়োদার মহারাণী ও সমাগত নারীমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করিলেন; তৎপরে মহিলাসমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী অবলা বসু বড়োদার মহারাণীকে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র মহিলা সমিতির পক্ষ হইতে পাঠ করেন। তাহার পর ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী মাননীয়া শ্রীমতী বড়োদার মহারাণীকে সভানেত্রীপদে বরণ ও শ্রীমতী যাদুমতি দেবী উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। তৎপরে শ্রীমতী বড়োদার মহারাণী বক্তৃতা পাঠ করেন। তৎপরে সভানেত্রীর আদেশে—

১। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু "স্ত্রী শিক্ষা" সম্বন্ধে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন এবং শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত ও শ্রীমতী হেমলতা সরকার বাঙ্গলাতে উক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে "অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী" এই সঙ্গীত গীত হয়—

তৎপরে,

২। শ্রীমতী কাশীবাই হার্লাকার "প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য" (মারহাট্টা ভাষা)।
৩। শ্রীমতী যোশী "পুত্রকন্যার বিবাহ" (হিন্দী)।
৪। শ্রীমতী কাশীবাই ত্রিবেদী "দাম্পত্য সম্বন্ধ" (গুজরাটী)।
৫। শ্রীমতী বিভালকার "অবরোধ প্রথা" (ইংরাজী)।

(বাঙ্গালা আবৃত্তি)

৬। শ্রীমতী স্নেহলতা সেন "আদর্শ হিন্দুনারী" (ইংরাজী)
৭। শ্রীমতী মৃণালিনী সেন "অবরোধ প্রথা" (বাঙ্গলা)।
৮। শ্রীমতী সরোজকুমারী সেন, সম্বলপুর "আদর্শ গৃহস্থ" (বাঙ্গালা)
৯। শ্রীমতী রাজকুমারী দাস এম এ, "অবরোধ প্রথা" (বাঙ্গালা)।
১০। শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র "নবপরিণীতা বধূর প্রতি শ্বশ্রূর কর্ত্তব্য" প্রবন্ধ পাঠ করেন। (বাঙ্গলা)।

ইহার পর ঐকতানিক বাদ্য।

তৎপরে—

১১। শ্রীমতী কাশীবাই "আদর্শ গৃহস্থ" (ইংরাজীতে)।
১২। শ্রীমতী লক্ষ্মী নারসাম্বা "প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য" (তেলেগু)।
১৩। শ্রীমতী রেবা রাও "উৎকলে নারী জাতি" (বাঙ্গালা)।
১৪। শ্রীমতী শরম্মা (ভিজিগাপট্টমের ভারতীয় সমাজের সম্পাদিকা) "স্ত্রী স্বাধীনতা" (তেলেগু)।
১৫। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী "নারীর শিক্ষালয়" (বাঙ্গলা ও ইংরাজী)।
১৬। শ্রীমতী মেগানাবিন মানিকচাঁদ বোম্বেবাসিনী জৈন মহিলা হিন্দিতে ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে ওজস্বিনী হিন্দী বক্তৃতা করেন। তৎপরে একটী জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে সভানেত্রীকে ধন্যবাদ দিয়া জলযোগান্তে সভাভঙ্গ হয়।

চেতন-সঙ্গীত।

(১)

ক্ষান্ত হও ভ্রান্ত পান্থদল, অন্ধমোহ এবে পরিহরি'
নয়ন উন্মিলি' চে'য়ে দেখ—আত্মমদে, আপনা-বিস্মরি',
কোথা হ'তে কোন্ পথে—কত দূরে এসেছ চলিয়া ;—
ভীষণ আঁধার একে চতুর্দ্দিকে আসে আচ্ছাদিয়া !
সম্মুখে হুঙ্কারি' হের—আস্ফালিয়া আসে পারাবার
প্রমত্ত উল্লাসভরে লক্ষ বাহু করিয়া বিস্তার
গ্রাসিবারে তোমাদের। শান্ত হও ক্ষণেক এখন ;—
দিশাহারা হ'য়ে আর অতলে হ'য়োনা নিমগন।

(২)

দাঁড়াও। আত্মস্থ হ'য়ে ভেবে' দেখ—কোন্ লক্ষ ধরি'
চলিয়াছ এই দিকে। অদূরে যে উল্লম্ফন করি'
বারম্বার তোমাদেরে আলিঙ্গিতে চাহিছে জলধি,
প্রবেশিতে তা'রি গর্ব্ভে তীব্র ইচ্ছা জেগে' থাকে যদি—
যাও তবে, অনায়াসে হেন ভাবে হও অগ্রসর ;—
অস্তিত্বে বিলুপ্ত করি' পৃথ্বী হ'তে লুকাও সত্বর।

(৩)

আর যদি বাঁচিবারে—যদি চাহ রক্ষিতে জীবন,
ক্ষান্ত হও তবে মূর্খ,—মুক্ত কর মুদ্রিত নয়ন।
জেনে' লও আপনারে,—কর মনে অতীত গৌরব ;
বুঝে' দেখ—কি কুহকে বিদলিয়া অনন্ত বৈভব,
কি মোহে নরক-গর্ব্ভে ডুবিবারে চলেছ ধাইয়া ;
ভেবে দেখ—আজি হায়, কোথা হ'তে এসেছ নামিয়া !

(৪)

বড় উর্দ্ধে ছিল সেই মহোজ্জ্বল প্রেম-সিংহাসন,
যেথা হ'তে ধ্যান-লব্ধ, অগ্নি-গর্ভ বেদান্তবচন
প্রসৃত হইত নিত্য ভূমা-তৃপ্ত ঋষি-কণ্ঠ হ'তে
সঞ্জীবিত করি' এই অজ্ঞ, অন্ধ, পঙ্কিল জগতে।
এ জগৎ সেইক্ষণে নির্ণিমেষ রহিত চাহিয়া—
(একান্ত বিস্ময়-ভরে, বহুনিম্নে নিশ্বাস রোধিয়া,
শ্রদ্ধায়-বিস্ময়ে মুগ্ধ, অনুতপ্ত আপন অজ্ঞানে !)
সেই জ্যোতির্ম্ময়, দীপ্ত, নির্ব্বিকার পুরুষের পানে,
বিশ্বের বিস্ময়-কেন্দ্র—মরতের সে আদর্শ-প্রাণ
তোমাদেরি মাঝে ওরে অংশে অংশে আজো বিদ্যমান !
—সে পুণ্য রুধির বহি' বক্ষোমাঝে, এবে অচেতন
ক্ষিপ্ত বেগে, ভ্রান্তিমদে আজো—অহো, ধাইছ এমন !

(৫)

সুপ্ত শক্তি না জাগায়ে না জানিয়ে নিজ পরিচয়—
কোথা যাও ? ফিরে চল ;—আছে, ওরে, আছেরে সময়।
চল পুনঃ সেই স্মৃতি পূর্ণ করি' অন্তর কন্দরে,
আপনা-সম্বরি' চল মহত্বের সে উচ্চ শিখরে।
ঐক্য মন্ত্রে লভ দীক্ষা, হও সবে আত্ম-সমাহিত ;
চল—ফিরে' চল পুনঃ মহালক্ষ্য করিতে সাধিত।

(৬)

প্রাণপণে, স্মরি' তাঁ'রে কহ সবে—জয় বিশ্ব-প্রভু !
জেনো স্থির—তাঁর প্রেমে বিফল না র'বে বাঞ্ছা কভু।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

গ্রন্থসমালোচনা।

১। দুর্গাদাস—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক। সম্রাট ঔরংজেবের সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনার ভিত্তিতে গল্প বা আখ্যানবস্তু প্রতিষ্ঠিত। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "আমি ইতিহাসকে ক্ষুণ্ণ করি নাই ; অনেক বাদ দিয়াছি—অনেক যোগ করিয়াছি ; কিন্তু ইতিহাসকে অতিক্রম করি নাই।" ইতিহাসের কথা যাহাই হউক, দুর্গাদাস অতি সুচিত্রিত। সমগ্র জীবন নিঃস্বার্থ স্বদেশ-সেবায় অতিবাহিত, কর্ম্মে এবং সংযমে ভীষ্মের মত অটল ও অচল, যুধিষ্ঠিরের মত ক্ষমাশীল এবং বিনীত, অর্জ্জুনের মত যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, এ চরিত্র এই পতিত জাতির ইতিহাসে অমূল্য। যখন এই পতিত দেশের উদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন দুর্গাদাস বলিতেছেন, "ব্যর্থ হয়েছি। পাল্লাম না এ জাতিকে টেনে তুল্‌তে। সহস্র বৎসরের নিষ্পেষণে জাতি নির্জ্জীব হয়েছে…।" দুর্গাদাসের এই পরাজয় কথাই নাটকের শেষ। কর্ত্তব্য-সেবায় যে পরাজয়, তাহাই যে জয়ের ভিত্তি, এই নাটকের উপসংহারে তাহাই সূচিত। পুণ্যের যে শুভ্র আলোকে দুর্গাদাসের চিত্র অঙ্কিত, সেই আলোকেই অশিক্ষিত দরিদ্র কাশিম এবং সুশিক্ষিত উচ্চপদস্থ দিলীর খাঁ চিত্রিত। স্বার্থপরতার জন্য এবং সংযমের অভাবে ভারতবাসিগণ সম্মিলিত হইতে পারিল না, কাজেই দেশ জাগিল না ; দুর্গাদাস নাটকের প্রতি ছত্রে এই সুশিক্ষা। এই নাটকের প্রাণবায়ু, দুর্গাদাসের দীর্ঘনিশ্বাস।

২। বাঙ্গালীর বল—শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কথাগ্রন্থ। উৎসর্গপত্রে পরিচয় পাইলাম, যে এই লেখক, বঙ্গভাষার নবজীবনদাতা এবং নব কথাগ্রন্থের নূতন স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। লেখকের ভাষা ভাল, বর্ণনাশক্তি আছে, গল্পে বিচিত্রতা বিধান করিবার ক্ষমতা আছে এবং কল্পনায় মধুরতা আছে। বিস্ময় এবং বিচিত্রতার সমাবেশে যাহাতে অতিপ্রাকৃত ঘটনার অধিক অবতারণা না করা হয়, লেখক ভবিষ্যতে সে বিষয়ে সাবধান হইবেন আশা করি। কেবলমাত্র ছাঁকা যাতাদের উপাদানে মানুষ গড়া শক্ত ; তাই মায়া যেন হাওয়ায় মিলাইয়া গিয়াছে।

৩। চিত্র—শ্রীকেদারনাথ মজুমদার প্রণীত। ময়মনসিংহ জেলায় তিনটি ঐতিহাসিক প্রবাদ অবলম্বনে তিনটি ক্ষুদ্র গল্প লিখিত হইয়াছে। গল্প কয়েকটি সুলিখিত।

৪। সাধনা—শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী প্রণীত কবিতাগ্রন্থ। ভাষা এবং পদ্যরচনা নির্দ্দোষ ; অনেকগুলি কবিতায় ভাবও বেশ সুন্দর ফুটিয়াছে। মায়ের কৃপা, এবং পতির প্রতি সতী প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় যথেষ্ট মধুরতা আছে।

৫। প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা প্রণীত কয়েকটি কবিতা একত্রে প্রকাশিত। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ লিখিত ভূমিকায় পড়িলাম, যে রচয়িত্রী বালিকা এবং বিধবা। যিনি বালিকা বয়সে এই প্রকার রচনা করিয়াছেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ।

৬। আয়ুর্ব্বেদীয় স্বাস্থ্যরক্ষা—শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত প্রণীত। স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে স্কুল-পাঠ্য অনেক গ্রন্থ আছে ; এ গ্রন্থ তাহাদের সহিত প্রতি-

যোগিতা করিতে পারিবে না;—সে উদ্দেশ্যেও এ গ্রন্থ লিখিত নহে। নাম আয়ুর্ব্বেদীয় স্বাস্থ্যরক্ষা। যদি সত্য সত্যই সত্যচরণ গুপ্ত মহাশয় প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ হইতে প্রত্যেক কথা সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিতেন, তাহা হইলে বড় উপাদেয় গ্রন্থ হইত। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য না হইলেও অন্য নানা কারণে লোকে উহা পড়িত। অভ্যঙ্গ ও স্নান অধ্যায়ে চারিটি স্থানে 'চরকের' নিদর্শনা দেওয়া হইয়াছে, এই মাত্র। পুস্তিকা-খানিতে এমন অনেক একালের কথা আছে, যাহা সম্ভবতঃ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইতে পারে নাই।

৭। এড়ি রেশম—শ্রীঅমূল্যধন রায় প্রণীত। অতি সহজ ভাষায় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে এড়ি চাষের উপায় এবং আয় ব্যয় বিষয়ে সকল জ্ঞাতব্য কথা লিখিত হইয়াছে। মূল্য ৶০ আনা।

৮। স্বদেশী-প্রচারকে উপায়। বাবু গঙ্গাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয়ের নাম হিন্দি সাহিত্যে সুপরিচিত। পুস্তিকাখানির সমগ্র উদ্দেশ্য উহার নামেই সম্পূর্ণ ব্যক্ত রহিয়াছে। স্বদেশ-সেবার জন্য যাঁহারা উদ্যোগী তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হউক, এই কামনা করি।

৯। স্বর্ণকলিকা—কবিতাগুচ্ছ। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার বসাক প্রণীত।

১০। বিভূতিমালা—ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দে প্রণীত।

১১। ব্রহ্মভট্টপরিচয়, প্রথম ভাগ- শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট প্রণীত। ইহাতে ভট্ট বা ভাটজাতির ইতিহাস লিখিত হইতেছে। প্রাচীন শাস্ত্র খুঁজিয়া যদি স্বজাতির একটা বিশেষ মাহাত্ম্য নাই পাওয়া যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? জাতির উন্নতির জন্য সকলেই উদ্যোগী হইয়াছেন এবং হইতেছেন, ইহাই মঙ্গলের কথা। উন্নত হইলে যে মাহাত্ম্য বিকশিত হইবে, তাহার কাছে অতীত কথা অতি তুচ্ছ। ব্রহ্মভট্ট নাম না লিখিয়া কেবল ভট্ট লিখিলেই ভাল হইত।

১২। বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ। প্রণেতা—ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। এই গ্রন্থে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ জমীদার প্রভৃতির যে বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কি উপায়ে, কাহার নিকট হইতে এবং কি প্রকার মূল হইতে সংগৃহীত, তাহা আদৌ প্রদত্ত হয় নাই। উহা না থাকিলে গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক মূল্য হয় না। হইতে পারে, যে যাহা লিখিত হইয়াছে, সবই ঠিক; কিন্তু কোন প্রকারে ঐ কথাগুলি কেহ কাহারো নামের জোরে গ্রহণ করিতে পারে না। ভবিষ্যতে এই দোষটুকু দূর করিয়া দিলে, সাহিত্যে এখানির স্থান হইতে পারিবে।

১৩। মহিলাসমিতিতে পঠিত প্রবন্ধ। ইহাতে সাতটি প্রবন্ধ আছে। সবগুলিই সুলিখিত এবং নারীগণের পাঠযোগ্য।

আগামী বর্ষের প্রবাসী।

আমরা আগামী বৎসরের প্রবাসীতে পরলোকগত রাজা রবিবর্ম্মার অনেকগুলি মূল তৈলচিত্রের প্রতিলিপি মুদ্রিত করিব। এগুলি বাজারে প্রাপ্তব্য কিম্বা অন্য কাগজে প্রকাশিত ছবির বিনা অনুমতিতে প্রকাশিত নকল নহে, বা ধার করা ছবিও নহে। রবিবর্ম্মার দ্বিতীয় পুত্র শিল্পী শ্রীযুক্ত রামবর্ম্মা এগুলি আমাদিগকে প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। রামবর্ম্মারও ছবি আমরা মুদ্রিত করিব। তদ্ভিন্ন, শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর প্রভৃতির ছবিও মুদ্রিত হইবে। ভগিনী নিবেদিতা নিজ অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত মন্তব্য সহ যে সকল ইউরোপীয় ছবি আমাদিগকে প্রকাশার্থ বাছিয়া দিতেছেন, তৎসমুদয়ও ছাপা হইবে।

প্রবন্ধাদির উৎকর্ষও যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং বর্দ্ধিত হয়, তৎপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।

প্রবাসী খুব ভাল কাগজ, ইহা আমরা মনে করি না। ইহার দোষ ত্রুটি আমরা যত জানি, অপরে তত জানেন কি না সন্দেহ।

গ্রাহক ও পাঠকগণকে একটি কথা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। কাগজ ভাল করিয়া চালান অর্থসাপেক্ষ। এখনও প্রবাসী ঋণমুক্ত হয় নাই; সম্পাদকের কিছু পাওয়া ত দূরের কথা। আমাদের দেশে পাঠক আছে, সমালোচক বোধ হয় ততোধিক, কিন্তু অর্থদাতা গ্রাহক বড় কম। প্রবাসীর এখন গ্রাহকসংখ্যা যত, তাহার দ্বিগুণ হইলে তবে ইহা ভাল করিয়া চলিতে পারে। সম্পাদকের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে আমরা মনোযোগী আছি। সাহিত্যানুরাগীরা নিজের কর্ত্তব্য করিলেই সুখের বিষয় হয়।

৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



ডিউক অব কনট



ডাচেস অব্ কনট।

প্রবাসী

"Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters."
"to look on noble forms
Makes noble thro' the sensuous organism
That which is higher."—*Tennyson.*

৬ষ্ঠ ভাগ। | চৈত্র, ১৩১৩। | ১২শ সংখ্যা

বয়কট্ (Boycott)।

পৌষমাসের প্রবাসীতে বয়কটের প্রসঙ্গ মাত্র উত্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে চাই। কারণ, দেখিয়াছি, অনেক শিক্ষিত লোকের মনেও বয়কট্ বিষয়ে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে।

বয়কট্ কথার উৎপত্তি ও ইতিহাস।

খৃষ্টীয় ১৮৭৯ সনের শেষ ও ১৮৮০ সনের প্রথম ভাগে, শীতকালে, আয়র্লণ্ডে ভীষণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। একেই বহুকালাবধি আইরিশ প্রজাগণের অবস্থা অতি হীন ছিল, তাহাতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে সহস্র সহস্র নরনারী অনশনে অর্দ্ধাশনে কালযাপন করিতে বাধ্য হয়। প্রজাসাধারণের এরূপ অসহনীয় ক্লেশের সময়েও জমিদারগণ কড়াক্রান্তিতে খাজানা আদায় করিতে সচেষ্ট হইলেন, এবং যাহারা খাজানা দিতে অসমর্থ হইল, তাহাদিগকে উৎখাত করিতে লাগিলেন। আয়র্লণ্ডের ভূমিসম্বন্ধীয় আইন চিরদিনই জমিদারগণের সহায় ছিল। প্রজাগণ উপায়ান্তর-রহিত হইয়া জমিদারবর্গ ও তাঁহাদিগের কর্ম্মচারিগণের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইল। এই সময়ে কাপ্তান বয়কট নামক একজন ইংরাজ একজন বড় জমিদারের নায়েব (agent) ছিলেন। তাঁহার প্রতিবেশী প্রজাগণ তাঁহার সহিত সকল প্রকারের সংশ্রব ত্যাগ করে। এমন কি, তিনি গৃহকর্ম্মের জন্যও ভৃত্য পাইলেন না। গৃহের ও ক্ষেত্রের যাবতীয় কার্য্য তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নীকে নিজ হস্তে সম্পন্ন করিতে হইত। অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে পুলিশ-প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া পথে বাহির হইতে হইত। এই ঘটনা হইতে 'কাহাকেও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা,' এই অর্থে 'বয়কট্' কথা প্রচলিত হয়। সুবিখ্যাত চার্লস্ পার্ণেল ও মাইকেল ডেবিট্ কর্ত্তৃক স্থাপিত আইরিশ ল্যাণ্ডলীগের কার্য্যকারিতায় ইহার প্রভাব আয়র্লণ্ডময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। যাহারা ল্যাণ্ডলীগে যোগ না দিত, তাহারা কেবল সামাজিক-ভাবে 'এক ঘরে' হইত তাহা নয়, তাহারা কোনও দোকানদারের নিকট কোনও জিনিস পাইত না, বা কাহাকেও কোনও জিনিস বিক্রয় করিতে পারিত না। সংক্ষেপে বলিতে হয়, এই বয়কটের শাসনে তাহাদিগের জীবন ভারবহ হইয়া উঠিত, সুতরাং অচিরাৎ অনুতপ্ত হইয়া তাহাদিগকে প্রজাসাধারণের সহিত মিলিত হইতে হইত। এই ব্যাপক অর্থে বয়কট্ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আমরা এই প্রবন্ধে উহা 'বৈদেশিক পণ্যবর্জ্জন' অর্থেই ব্যবহার করিব।

বয়কট্ বা বিদেশজাত পণ্যবর্জ্জনের বিরুদ্ধে যে কয়েকটী আপত্তি সচরাচর শুনা যায়, একে একে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথম আপত্তি—বয়কট্ অবাধবাণিজ্যনীতি-বিরোধী।

এক শ্রেণীর সমালোচক বলেন, বয়কট "ফ্রী ট্রেড" (Free Trade) বা অবাধবাণিজ্যের পরিপন্থী, অতএব উহা নিন্দনীয়। সুতরাং আগে দেখিতে হয়, ফ্রী ট্রেড কি এবং উহা ভারতবর্ষের উপযোগী কি না।

অবাধবাণিজ্যের মূল সূত্র।

অবাধবাণিজ্যের মূল সূত্র একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে। মনে করা যাক, বঙ্গদেশে যে পরিমাণ ধন ও শ্রম ব্যয়ে পঞ্চাশ মণ ধান হয়, সেই পরিমাণ ধন ও শ্রমব্যয়ে পঁচিশ মণ পাট উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঠিক্ ঐ পরিমাণ ধন ও শ্রম ব্যয়ে ব্রহ্মদেশে পনর মণ পাট ও পঁয়তাল্লিশ মণ ধান উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ বঙ্গদেশে দুই মণ ধানের বিনিময়ে এক মণ পাট ও ব্রহ্মদেশে তিন মণ ধানের বিনিময়ে এক মণ পাট পাওয়া যায়। সুতরাং ধান ও পাট উভয়ই ব্রহ্মদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে সুলভ হইলেও এই দুই দেশই ধান ও পাটের আদান প্রদান দ্বারা লাভবান হইতে পারে। বঙ্গদেশ যদি ব্রহ্মদেশ হইতে পাটের বিনিময়ে ধান গ্রহণ করে, তবে এক মণ পাট দিয়া আড়াই মণ ধান পাইলেও তাহার আধ মণ ধান লাভ। এবং ব্রহ্মদেশ যদি ধানের বিনিময়ে পাট গ্রহণ করে, তবে আড়াই মণ ধান দিয়া এক মণ পাট পাইলেও তাহার আধ মণ ধান লাভ। অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ এক্ষণে তিন মণ ধানের বিনিময়ে এক মণের অধিক পাট পাইবে। সুতরাং এই আদান-প্রদান দ্বারা উভয়েরই লাভ হইবে। এক্ষণে যদি বঙ্গদেশ অধিকতর রূপে পাট ও ব্রহ্মদেশ অধিকতর রূপে ধান উৎপাদন করিয়া পরস্পর ঐ সকল পণ্য বিনিময় করে, তবে উভয় দেশের সমষ্টিগত ধন বৃদ্ধি পাইবে। অন্যথা, যদি বঙ্গদেশ পূর্ব্বের মত ধান ও ব্রহ্মদেশ পাট উৎপাদনের চেষ্টা করে, তবে উভয়েরই ধন ও শ্রম কিয়ৎপরিমাণে অপব্যয়িত হইবে। অর্থাৎ যে স্থলে বঙ্গদেশ এক মণ পাটের বিনিময়ে ব্রহ্মদেশ হইতে আড়াই মণ ধান পাইয়া অধিকতর রূপে পাট উৎপাদন করিতে পারিত, সে স্থলে তাহাকে দুই মণ ধান পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, এবং ব্রহ্মদেশও আড়াই মণ ধানের বিনিময়ে এক মণ পাট পাইবে না, তাহাকে এক মণ পাটের জন্য তিন মণ ধান দিতে হইবে। অবাধবাণিজ্য এই ক্ষতি হইতে উভয়দেশকেই রক্ষা করে।*

অবাধবাণিজ্য অব্যাহত রাজনৈতিক অধিকার ভিন্ন অসম্ভব। (Free Trade presupposes Freedom.)

কিন্তু এস্থলে একটী কথা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য: বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশ যে এই বিনিময় দ্বারা লাভবান্ হইবে, তদুদ্দেশ্যে উভয়েরই অব্যাহতভাবে নিজ নিজ ধন ও শ্রম বিনিয়োগের অধিকার থাকা আবশ্যক। যদি বঙ্গদেশের অবস্থা এমন হয় যে, যে যে ক্ষেত্রে ধন ও শ্রম খাটাইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ হইতে পারে, সেই সকল ক্ষেত্রে তাহার প্রবেশাধিকার নাই, তবে এই অবাধবাণিজ্য তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ উহার মূল কথাই এই যে, উহা প্রত্যেক দেশকে সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক কার্য্যে আপনার শক্তি বিনিয়োগ করিতে সমর্থ করে।† যাহাদিগের এই

* If two countries which trade together attempted, as far as was physically possible, to produce for themselves what they now import from one another, the labour and capital of the two countries would not be so productive, the two together would not obtain from their industry so great a quantity of commodities, as when each employs itself in producing, both for itself and for the other, the things in which its labour is relatively most efficient. The addition thus made to the produce of the two combined, constitutes the advantage of the trade.

—*Mill's Political Economy, p. 349.*

† Free trade is simply an extension of the principle of the division of labour. By breaking down the artificial barriers which have been erected between nations, each country, instead of being obliged to depend entirely on home manufactures, can devote its energies to those branches of trade or agriculture to which natural circumstances or national peculiarities have especially adopted it.—*Mrs. Fawcett's Political Economy for Beginners, p. 15.*

অধিকার নাই, তাহাদিগের পক্ষে ফ্রিট্রেড বা অবাধবাণিজ্য, বন্ধ্যার পুত্রলাভের ন্যায় অলীক। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনে করুন, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে অবাধবাণিজ্য চলিতেছে। ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে লৌহ দিতেছে, ভারতবর্ষ তাহার বিনিময়ে অতি সহজে লবণ দিতে পারে। কিন্তু লবণ ভারতীয় গবর্ণমেন্টের একচেটিয়া, সুতরাং গবর্ণমেন্ট নিজেই অবাধবাণিজ্যনীতির মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। কেবল গবর্ণমেন্টের একচেটিয়া অবাধবাণিজ্যনীতির বিরোধী নহে। শিল্প ও বাণিজ্যের সর্ব্বতোমুখী উন্নতির জন্য যে সকল উপকরণ আবশ্যক, ভারতবর্ষের ন্যায় পরাধীন দেশে তাহা দুষ্প্রাপ্য। বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বল এবং স্বাস্থ্য আবশ্যক। জলবায়ু ও খাদ্য দ্বারা শারীরিক বল ও স্বাস্থ্য নিয়মিত হয়। ভারতের জলবায়ু সনাতন কাল হইতেই ভারতে আছে—কিন্তু তাহার দোষে যদি প্রজাসাধারণ দলে দলে মরিতে আরম্ভ করে, তবে তাহার প্রতিকার অনেক পরিমাণে সরকার বাহাদুরের হাতে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আর দিনের পর দিন প্রজাগণ অর্দ্ধাশনে থাকিলে, সরকার বাহাদুরকে নির্দ্দোষ মনে করা যাইতে পারে না। সুতরাং অনায়াসেই বলা যাইতে পারে, শারীরিক বল ও স্বাস্থ্য বহুলপরিমাণে রাজনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। মানসিক ও নৈতিক বলের সহিত রাজনৈতিক অধিকারের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা পৌষের প্রবাসীতে বিবৃত হইয়াছে, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। তৎপর, ঐ ত্রিবিধ প্রকারের বল ও স্বাস্থ্যই আশাশীলতা, স্বাধীনতা ও ইচ্ছানুরূপ স্থান ও কার্য্য পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে।* পরাধীন দেশে স্বাধীনতা তো নাই-ই, আশাশীলতা ও পরিবর্ত্তনক্ষমতাও অতি মন্দীভূত। সুতরাং অবাধবাণিজ্যের পক্ষে যে সকল গুণ অত্যাবশ্যক, ভারতে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ অসম্ভব।

শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ভূ-বিদ্যা, খনিজ-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, স্থাপত্য, এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতির উন্নত জ্ঞান অপরিহার্য্য। এদেশে এ সকল শিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা থাকিলে ভারতীয় যুবকগণকে নানা বিপদ্ ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া বিদেশে যাইতে হইত না। বঙ্গীয় ছাত্র রুড়কী কলেজে গৃহীত হয় না, এদেশে নৌ-বিদ্যা শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই নাই, বিলাতেও নৌ-বিভাগে কোনও ভারতীয় ছাত্র প্রবেশ করিতে পারে না। নানারূপে ভারতবাসীর হাত পা বাঁধা, তথাপি অনেকে আমাদিগকে বুঝাইতে চাহেন যে, ভারতে ও বিলাতের মধ্যে যে বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা একান্তই অবাধ।

অবাধবাণিজ্যের দোহাই হাস্যজনক।

অতীতকাহিনীর আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ইংরেজগণ যত দিন না ভারতীয় শিল্পের সর্ব্বনাশসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, ততদিন স্বদেশে অবাধবাণিজ্যনীতি অবলম্বন করেন নাই। কি গর্হিত উপায়ে তাঁহারা এ-দেশীয় শিল্পের উচ্ছেদসাধন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মহাশয় তাঁহার Economical History of British India নামক গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। আশা করি, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই উহা পাঠ করিয়াছেন। আমরা এস্থলে শুধু বলিতে চাই যে, সে কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া যাঁহারা এক্ষণে অবাধবাণিজ্যের দোহাই দিয়া বয়কটের নিন্দা করেন, তাঁহারা কপট না নির্ব্বোধ, ইহা নির্ণয় করা কিঞ্চিৎ কঠিন। ভারতবর্ষ হইতে যখন বিলাতে বস্ত্র রপ্তানি হইত, তখন যদি ইঁহারা অবাধবাণিজ্যের পক্ষে সংগ্রাম করিতেন, তবে বুঝিতাম ইঁহাদিগের কথার মূল্য

---

* "We have next to consider the conditions on which depend health and strength, physical, mental and moral. They are the basis of industrial efficiency, on which the production of material wealth depends." —*Marshall's Economies of Industry, p. 111.*

"Next come three closely allied conditions of vigour, namely hopefulness, freedom and change. All history is full of the record of inefficiency caused in varying degrees by slavery, serfdom, and other forms of civil and political oppression and repression. Freedom and hope increase not only man's willingness but also his power for work.

"Changes of work, of scene, and of personal associations bring new thoughts, call attention to the imperfection of old methods, stimulate a 'divine discontent,' and in every way develop creator energy."—*Marshall's Economies of Industry, p. 114*

আছে। কিন্তু সে সময়ে বিলাতী পণ্য কলিকাতায় শতকরা আড়াই টাকা এবং ভারতীয় পণ্য ইংলণ্ডে শতকরা চারিশত টাকা শুল্ক দিত! এইরূপে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে *যখন ভারতীয় শিল্প সমূলে নির্ম্মূল হইল, তখন ইংরেজগণ অপূর্ব্ব উদারতাগুণে অবাধবাণিজ্যের পক্ষপাতী হইয়া জোর করিয়া ভারতে উহার প্রবর্ত্তন করিলেন। অবাধবাণিজ্য তো বটেই!**

ভারতীয় শিল্প যাহাতে পুনরুজ্জীবিত না হইতে পারে, তৎপক্ষে ভারতের ও বিলাতের গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই সাবধান। এদেশীয় শ্রমজীবিগণের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য সম্প্রতি জন্ মর্লী এক কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। ঐ কমিটীর উদ্দেশ্য অতি মহৎ, সন্দেহ নাই। বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে এত সংগ্রাম করিয়াও কিন্তু মর্লীর সিংহাসন টলাইতে পারা গেল না! আর সে দিন লর্ড মিণ্টো প্রদর্শনীক্ষেত্রে "সাধু স্বদেশী" ও "অসাধু স্বদেশী" ইত্যাকার অনেক সুমিষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। মর্লীর কমিটী, মিণ্টোর উপদেশ এবং ফুলারের লাঠী—এই সকলের মধ্যেই এক নিগূঢ় সমপ্রাণতা রহিয়াছে, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা দেখিতে পাইবেন। বস্তুতঃ বর্ত্তমান অবস্থায় অবাধবাণিজ্যের দোহাই দিয়া ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে বাধ্য করা, আর জরাজীর্ণ, বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে প্রকাণ্ড দানবের সহিত মল্লযুদ্ধে আহ্বান করা একই কথা।† অবাধবাণিজ্য ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী—এবং এখন অন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের যে ব্যবস্থা আছে, তাহাকে অবাধবাণিজ্য বলা নিতান্তই অযৌক্তিক।

ভারতের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক।

অন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের একটী নিয়ম এই যে, আমদানী ও রপ্তানী পরস্পরের মূল্য প্রদান করে। অর্থাৎ সমকক্ষভাবে বাণিজ্য চলিলে, ভারতবর্ষ যদি বিলাতে এক কোটী টাকার গম রপ্তানী করে, তবে তৎপরিবর্ত্তে বিলাত হইতে এক কোটী টাকার বস্ত্র আমদানী করিবে। কিন্তু ভারতবর্ষ যদি ইংলণ্ডের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে উহার সুদস্বরূপ ঐ এক কোটী টাকার উপর অতিরিক্ত গম রপ্তানী করিতে হইবে। এবং এইরূপে ভারতের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক হইবে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ যদি প্রতি বৎসর বিলাতে এক কোটী দশ লক্ষ টাকার গম পাঠাইয়া বিলাত হইতে এক কোটী টাকার বস্ত্র গ্রহণ করে, তবে সে ক্রমেই নিঃস্ব হইয়া পড়িবে। সুতরাং যে দেশের রপ্তানী আমদানী অপেক্ষা অধিক, সে দেশের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়। ভারতবর্ষের অবস্থাও ঠিক্ তাই। এ দেশের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বৎসরে প্রায় সাঁইত্রিশ কোটী টাকা অধিক।‡ ইহার কারণ ভারতসচিবের আফিসের ব্যয়, ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের পেন্সন, রেলওয়ে ইত্যাদির মূলধনের সুদ প্রভৃতি বাবদে ভারতবর্ষকে বৎসরে অনেক কোটি টাকা বিলাতে দিতে হয়—উহার সমস্তই রপ্তানীরূপে প্রেরিত হয়। এই অস্বাভাবিক ও সর্ব্বনাশকর অবস্থা হইতে দেশকে রক্ষা করিবার একতম উপায় বয়কট্। কারণ আমরা যদি বিলাতী পণ্য গ্রহণ না করি, তবে তৎপরিবর্ত্তে এদেশীয় পণ্যও বিলাতে

* "The above extract will show that while British Political Economists professed the principles of free-trade from the latter end of the eighteenth century, the British Nation declined to adopt them till they had crushed the Manufacturing Power of India, and reared their own Manufacturing Power. Then the British Nation turned free-traders, and invited other nations to accept free-trade-principles. The other nations, including the British Colonies, know better, and are now rearing their Manufacturing Power by protection. But in India the Manufacturing Power of the people was stamped out by protection against her industries, and then free-trade was forced on her so as to prevent a revival.—*Dutt's Economical History, p. 302.*

† "Free-trade between England and India in a matter like this is something like a race between a starving, exhausting invalid, and a strong man with a horse to ride on. Free trade between countries which have equal command over their own resources is one thing, but even then the Colonies snapped their fingers at all such talk. But what can India do? Before powerful English interests, India must and does go to the wall."—*Dadabhai Naoroji's Poverty and Un British Rule in India, p. 62.*

‡ ১৯০৩ সনের ৩১এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে আমদানী ১৩২,৭২, ১৫,০৭৬৲ রপ্তানী, ১৬৯,৭৮,৯৪,২৩০৲।

প্রেরিত হইবে না। সুতরাং যেমন আমদানী কমিবে, তেমনি রপ্তানীও কমিয়া যাইবে। অর্থাৎ দেশের ধন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতররূপে দেশে থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে আরও যে সকল উপকার হইবে, তাহার কথা এস্থলে না বলিলেও চলে।

অন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের ক্ষতি।

আমরা বিলাতে চাউল, গম প্রভৃতি আহার্য্য, এবং পাট প্রভৃতি কাঁচা মাল পাঠাই। তদ্বিনিময়ে বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বস্তু পাই বটে, কিন্তু এগুলি ছাড়া আমরা এমন অনেক বস্তু গ্রহণ করি, যাহা জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় নয়। অন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের একটী নিয়ম এই যে, এ দেশ হইতে যাহা রপ্তানী হইবে, এ দেশে তাহার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং যাহা আমদানী হইবে, তাহার মূল্য হ্রাস হইবে। এই নিয়মানুসারে এ দেশে চাউল, গম প্রভৃতি আহার্য্যবস্তু দুর্ম্মূল্য হইতেছে এবং ফসল একটু মন্দ হইলেই সহস্র সহস্র লোককে অনশনে বা অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করিতে হইতেছে। পক্ষান্তরে বিলাসের উপকরণগুলি সস্তা পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রজাসাধারণের লাভ কি? আর কাঁচা মাল অল্পমূল্যে বিলাতকে দিয়া তাহাই আবার রূপান্তরিতরূপে অধিক মূল্যে আমরা গ্রহণ করিতেছি—পাচ টাকায় এক মণ পাট বিক্রয় করিয়া তাহারই বস্ত্র পঞ্চাশ টাকায় ক্রয় করিতেছি—ইহাতে আমরা কতদূর লাভবান্ হইতেছি, ইহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এই বাণিজ্য বন্ধ হউক—ভারতের নগরে নগরে শিল্পশালা প্রতিষ্ঠিত হউক—দ্রুতগতিতে দেশের ধন বৃদ্ধি হইবে—অচিরাৎ ভারতবাসীর শ্রী পুনরাগমন করিবে। ইংরেজগণ পরোপকারের জন্য অবাধবাণিজ্যনীতি অবলম্বন করেন নাই—উদরের জ্বালায় করিয়াছেন।* ভারতবর্ষের পক্ষে উহার কোনও আবশ্যক নাই। কারণ আমাদের "সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা" ভারতজননী একাকিনীই তাঁহার কোটী কোটী সন্তানের সর্ব্বপ্রকার অভাবমোচনে সমর্থা।

* The necessity of relying upon foreign countries for our supplies of food has forced upon England the adoption of free-trade.—*Mrs. Fawcetts' Political Economy, p. 174.*

বয়কট্ একপ্রকারের আমদানী শুল্ক (Boycott is a sort of Protection)।

বিলাতের গবর্ণমেণ্ট যখন ভারতীয় পণ্যের উপর দুর্ব্বহ শুল্ক স্থাপন করিয়া ভারতীয় শিল্পের উচ্ছেদসাধন করিতেছিলেন, তখন, ভারতের রাজপুরুষগণও আমাদিগের স্বদেশীয় হইলে বিলাতী পণ্যের উপর ঐরূপ শুল্ক স্থাপন করিয়া প্রাদেশিক শিল্পকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিতেন। কিন্তু ভারতের প্রকৃত রাজা ইংরেজবণিকগণ, সুতরাং আমাদের সদাশয় ভারতগবর্ণমেণ্ট বিলাতী পণ্যের উপর শুল্ক স্থাপন করিবেন, ইহা তো দূরের কথা, বোম্বে ও অন্যান্য স্থানের কাপড়ের কলগুলি যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে, তাহার বিধান করিতে সর্ব্বদাই অগ্রসর! এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য, আমরা নিজেরা বৈদেশিক পণ্যের উপর শুল্ক স্থাপন করিয়া ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার করি। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক।

মনে করা যাক্, একখানি বিলাতী কাপড় এক টাকায় এ দেশে পাওয়া যায়। তাহার কারণ ঐ কাপড়ের উপকরণের মূল্য, শ্রমজীবীর বেতন, এ দেশে উহা আনিবার ব্যয় প্রভৃতি নির্ব্বাহ করিয়াও কাপড়খানিতে দুই আনা বা এক আনা লাভ হয়। কিন্তু ঐরূপ একখানি দেশী কাপড় আঠার আনায় বিক্রয় করিলে তবে তত্তুল্য লাভ থাকে। সুতরাং লোকে সস্তা বলিয়া বিলাতী কাপড়ই ক্রয় করিবে। এখন গবর্ণমেণ্ট যদি ঐ বিলাতী কাপড়ের উপরে তিন আনা শুল্ক স্থাপন করেন, তবে আর উহা এ দেশে এক টাকায় বিক্রীত হইতে পারিবে না; তখন উহার মূল্য বৃদ্ধি হইবে, সুতরাং দেশীয় বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে না পারাতে ক্রমে উহার আমদানী রহিত হইবে। ইহারই নাম শিল্পরক্ষা বা Protection। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংরেজ-উপনিবেশসমূহ বিলাতী পণ্যের উপর এইরূপ শুল্ক স্থাপন করিয়া আপন আপন শিল্প রক্ষা করিতেছে। আমরাও যদি একটাকায় একখানি বিলাতী কাপড় ক্রয় না করিয়া কিঞ্চিৎ অধিক মূল্যে একখানি দেশী কাপড় ক্রয় করি, তবে যাহা অধিক দিলাম, তাহা ঐ শুল্কের কার্য্য করিবে। সুতরাং বয়কট্ বা বিদেশী বর্জ্জন কোনও পৈশাচিক ব্যাপার

নহে, উহা আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন দেশ সমূহে বহুকাল প্রচলিত বাণিজ্যনীতির অস্ফুট অনুসরণ।

আমদানী শুল্ক (Protection) সর্ব্বথা নিন্দনীয় নহে।

এক ইংলণ্ড অনাহারের ভয়ে অবাধবাণিজ্যনীতি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইংলণ্ডেও কয়েক বৎসর ধরিয়া চেম্বার্লেন উহা পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন। এবং জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের ন্যায় মনস্বী লেখক ও স্থলবিশেষে প্রটেকশন বা আমদানী-শুল্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, যদি কোনও দেশে কোনও পণ্যের উপর শুল্ক স্থাপন করিলে, ঐ পণ্য ঐ দেশেই উৎপন্ন করিবার স্থায়ী উপায় প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে, তবে ঐরূপ শুল্ক স্থাপন সর্ব্বথা সঙ্গত।* ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই নীতি সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য—কারণ এ দেশে বস্ত্রশিল্পের তো কথাই নাই—আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য এমন কিছুই নাই, যাহা উপযুক্ত উৎসাহ পাইলে প্রভূতপরিমাণে উৎপন্ন হইতে, না পারে।

জাতীয় জীবনে অর্থ-লাভই চরমশ্রেয়ঃ নহে।

আর যদি বা অর্থনীতির সিদ্ধান্ত অনুসারে বয়কটের কিছু দোষ ত্রুটি থাকে, মনে রাখিতে হইবে, জাতীয় জীবনে অর্থনীতিই এক মাত্র পথপ্রদর্শক নহে—অর্থনীতির উপরেও নীতি আছে—স্বর্ণ রৌপ্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধন আছে। অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ লেখক জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যাহা economically disadvantageous, তাহা অনেক সময়ে politically expedient, অর্থাৎ কোনও প্রণালী অর্থের হিসাবে ক্ষতিকর হইলেই তাহা পরিত্যাজ্য নহে, কারণ, জাতীয় উন্নতির পক্ষে তাহা অত্যাবশ্যক হইতে পারে। ইহা বলিবার অপেক্ষা করে না যে বয়কট্ বঙ্গদেশে এক নবজীবন আনয়ন করিয়াছে। অতি অল্প দিনের মধ্যে ইহা বাঙ্গালীদিগের মধ্যে স্বাবলম্বন ও স্বাধীন চিন্তার প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছে, নানা ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তি স্ফুরণের পথ সুগম করিয়া দিয়াছে, এবং এই নির্জ্জীব জাতির হৃদয়ে আত্মমর্য্যাদা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব জাগ্রৎ করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং অবাধবাণিজ্যনীতি যাহাই বলুক না কেন, বয়কট্ বঙ্গদেশে ভারতে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকুক।

দ্বিতীয় আপত্তি, ইহা বিচ্ছিন্নতামূলক।
(Boycotty means isolation)।

বয়কটের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি, ইহা এই সভ্যতা ও উন্নতির যুগে ভারতকে অপরাপর দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে চাহে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, এই ধারণা ভ্রমাত্মক। আমরা চাই, আবহমানকাল ভারত যেমন ইয়ুরোপ ও এসিয়াকে শিল্পজাতপণ্য দিয়া ধনধান্যে পরিপূর্ণ থাকিত, তেমনি আবার শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি করিয়া কমলাকে গৃহে অচঞ্চলা করিয়া রাখুক। ভারত কেন ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র গ্রহণ করিবে—ভারতের বস্ত্র অলঙ্কারের মত ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রেরিত হউক। কার্পাস, পাট এদেশেই বস্ত্রে রূপান্তরিত হউক, চাউল, গম প্রভৃতি আহার্য্য বস্তুতে প্রতি গৃহস্থের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকুক, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টিতে গরিব জনসাধারণ যেন আর পঙ্গপালের মত মৃত্যুমুখে পতিত না হয়।

তৃতীয় আপত্তি, ইহা অভাবাত্মক (negative)।

কোন কোনও দেশবিখ্যাত ব্যক্তি এই বলিয়া বয়কটের নিন্দা করেন যে স্বদেশী ভাবাত্মক, বয়কট্ অভাবাত্মক। আমরা এতকাল তো জানিতাম, ভাব ও অভাবে দিবারাত্রির ন্যায় নিত্য সম্বন্ধ, একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। স্বদেশী বস্ত ব্যবহার করিব, অথচ বিদেশীপণ্য বর্জ্জন করিব না, ইহা কিরূপে সম্ভব, তাহা সুতীক্ষ্মমেধাবিশিষ্ট ব্যবহারজীবিগণের পক্ষেই বলা সম্ভব, অথবা বলিতে হয়, ইহা "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

* "The only case in which on mere principles of political economy, protecting duties can be defensible, is when they are imposed temporarily, (especially in a young and rising nation) in hopes of naturalizing a foreign industry, in itself perfectly suitable to the circumstances of the country ... A protecting duty, continued for a reasonable time, will sometimes be the least inconvenient mode in which the nation can tax itself for the support of such an experiment."—*Mill's Political Economy, p. 556.*

চতুর্থ আপত্তি, বয়কট্ নিষ্ফল, কারণ বৈদেশিকপণ্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

কোন কোন বুদ্ধিমান লোকের মুখে শুনিতে পাই, "সকলেই যদি বিদেশী বর্জ্জন করে, তবে চলিবে কি রূপে? এ দেশে জীবনধারণোপযোগী শিল্পজাত এত প্রচুর উৎপন্ন হয় না, যে তাহাতে সমস্ত ভারতবাসীর অভাব মোচন হইতে পারে! যখন বৈদেশিকপণ্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই, তখন আমরা না হয় বিদেশী ত্যাগ নাই করিলাম।" একটী গল্প বলিলেই ইহাদিগের কথার উত্তর দেওয়া হইবে।

এক রাজা একটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়া প্রজাগণকে আদেশ করিলেন, এক রাত্রির মধ্যে উহা দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে, এবং তদর্থে প্রত্যেক প্রজাকে এক ঘটী দুগ্ধ দিতে হইবে। প্রজাগণ সকলেই চতুর। প্রত্যেকেই ভাবিল, আর সকলেই দুগ্ধ দিবে, আমি না হয় এক ঘটী জলই দিলাম। নিশাবসানে দেখা গেল, সেই দীর্ঘিকা জলে পরিপূর্ণ, উহাতে এক বিন্দুও দুগ্ধ নাই।

পঞ্চম আপত্তি, বয়কট্ প্রেমবিরোধী।

ধার্ম্মিক বা ধর্ম্মাভিমানী কেহ কেহ বলেন, বয়কট্ প্রেমবিরোধী। হাঁ, ইংরেজপ্রেম-চাকুরীপ্রেম-শ্বেতাঙ্গপদ-লেহনপ্রেম-বিরোধী তো বটেই। কিন্তু ইহা বিশ্বপ্রেমের বিরোধী নহে। একজন বিখ্যাত লেখক বলিয়াছেন, "যে স্বদেশকে প্রীতি করিতে জানে না, তাহার পক্ষে বিশ্বপ্রেম মিথ্যা কল্পনা।" উচ্চতম প্রেমধর্ম্মের উপদেশ এই, যদি তোমার প্রতিবেশীর বস্ত্র না থাকে, আর তোমার দুখানি বস্ত্র থাকে, প্রতিবেশী অনাহারে থাকে, আর তোমার গৃহে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য থাকে, তবে তুমি অপরাধী।* বয়কট্ ভারতীয় প্রজাপুঞ্জকে মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা করিতে চাহে, ইহা যে প্রেমের বিরোধী, তাহার অর্থ স্বার্থপরতা ও নিশ্চেষ্টতা—মানবপ্রীতি নহে।

সামাজিক বয়কট্ এদেশে নূতন নহে।

এতক্ষণ বৈদেশিক পণ্যবর্জ্জনের কথা বলিলাম। দেশদ্রোহীকে সামাজিকদণ্ডে দণ্ডিত করাও সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। প্রেমাবতার বুদ্ধদেব তাহার বিধি দিয়া গিয়াছেন। একবার ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। এই কলহে চন্ননামক একজন ভিক্ষু ভিক্ষুণীদিগের পক্ষ অবলম্বন করে। তাহাতে সংঘপ্রীতির অভাব দেখিয়া বুদ্ধদেব তাহার প্রতি ব্রহ্মদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। ব্রহ্মদণ্ড আর কিছুই নহে—সামাজিক বয়কট্।

"চন্নস্স, আনন্দ, ভিক্খুনো মম্'অচ্চয়েন ব্রহ্মদণ্ডো কাতব্বো তি। কতমো পন, ভন্তে, ব্রহ্মদণ্ডো তি। চন্নো, আনন্দ, ভিক্খু যং ইচ্ছেয্য তং বদেয্য, সো ভিক্খূহি নেব বত্তব্বো ন ওবদিতব্বো ন অনুসাসিতব্বো তি।"
মহাপরিনিব্বানসুত্তং। ৬।

"হে আনন্দ, আমার দেহান্ত হইলে চন্নের প্রতি ব্রহ্মদণ্ড প্রয়োগ করিবে। (আনন্দ বলিলেন) ভগবন্, ব্রহ্মদণ্ড কি? (বুদ্ধ বলিলেন), হে আনন্দ, চন্ন যাহা ইচ্ছা বলুক, ভিক্ষুগণ তাহার সহিত কথা বলিবে না, তাহাকে উপদেশ দিবে না, তাহাকে অনুশাসন করিবে না।"

কথিত আছে, চন্ন এই দণ্ড বহন করিতে না পারিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে সংঘের শরণাপন্ন হয়, ও পরিশেষে সাধনবলে নির্ব্বাণ লাভ করে।

"আমি বুদ্ধদেব অপেক্ষা প্রেমধর্ম্মে সমুন্নত", এই স্পর্দ্ধা যিনি অন্তরে পোষণ না করেন, তিনি স্বদেশদ্রোহীর দণ্ডদানে কুণ্ঠিত হইতে পারেন না।

উপসংহার।

আয়র্লণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের অবস্থাগত সাদৃশ্য আছে। আয়র্লণ্ডেই 'বয়কটের' উৎপত্তি। অতএ ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে উহা অতি সঙ্গতরূপেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সকলের জন্য এক পথ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, সকল জাতিই এক উপায়ে সৌভাগ্যমঞ্চে আরোহণ করিবে না। আমেরিকা অস্ত্র বলে যাহা করিয়াছে, ভারতবর্ষ যে বয়কটের সাহায্যে তাহা করিবে না, কে বলিতে পারে? সে দিন দূরবর্ত্তী হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বয়কটের প্রয়োজনীয়তা খণ্ডিত হইতেছে না।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

---

* "I felt, and feel even now, and shall never stop feeling, that I am a participant in a crime which is taking place all the time, so long as I have superfluous food, and another man has none, and I have two garments, when another has not even one."
—*Tolstoy's What shall we do then?, p. 15.*

নেপালের বৌদ্ধ মন্দির।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্মস্থান এবং প্রধান লীলাভূমি ভারতবর্ষ হইতে বহু শতাব্দী হইল উক্তধর্ম্ম একেবারে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। একটীও বিশুদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির ভারতের কুত্রাপি আর দেখা যায় না। লুম্বিনী, কপিলাবাস্তু, গয়া, কুশিনগর, সকলই শ্মশান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ভারতবাসী আর সেখানে তীর্থযাত্রা করে না। এক সময় যেখানে সহস্র সহস্র বিহার মন্দির ছিল এখন তাহা সমভূমি, হয়ত শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী। ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে। কিন্তু নেপাল উপত্যকায় পদার্পণ করিলে সহসা যেন দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বের ছবি নয়নপথে উদ্‌ঘাটিত হয়। যে ধর্ম্ম ভারতবর্ষে এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছে তাহা দুর্গম নেপাল রাজ্যে অভ্রভেদী পর্ব্বত মালা বেষ্টিত অপূর্ব্ব শোভাময় বিচিত্র প্রদেশে, এখনও জনসাধারণের প্রধান ধর্ম্ম। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে উহাত সম্পূর্ণরূপেই বৌদ্ধ ভূমি ছিল। চীন, জাপান, তীব্বত, ব্রহ্মদেশে যেরূপ বৌদ্ধ ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীয়মান আছে নেপালে একদিন তাহাই ছিল। এখন নেপালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের হীনতার একশেষ হইলেও একেবারে তীরোধান হয় নাই। নেপাল উপত্যকায় পদার্পণ করিলে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ মন্দির দৃষ্টিগোচর হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পশুপতিনাথের মন্দির হয়ত এক সময় বৌদ্ধ মন্দির ছিল, কিন্তু এখনও নেপালে অত্যন্ত প্রাচীন বিশুদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির সকল অতি সুন্দর অবস্থায় আছে। এই সকল বৌদ্ধ মন্দির তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১। কতকগুলি আদি বুদ্ধের নামে উৎসর্গী কৃত।

২। কতকগুলি কোন বোধিসত্ত্ব মহাত্মার স্মৃতি চিহ্ন।

৩। অধিকাংশ মন্দির কোন মৃত মহাত্মার দেহাবশেষ বা চিতাভস্ম রক্ষার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে।

কাটমণ্ডু সহরের অদূরে স্বয়ম্ভুনাথের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নেওয়ারদিগের অতি পবিত্র তীর্থ। নেপালের ইহা প্রাচীনতম মন্দির বলিলেও চলে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কাটমণ্ডু সহরের প্রায় ১ মাইল পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের শিখরদেশে স্বয়ম্ভুনাথ বা আদি বুদ্ধের এই প্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত। নেপাল উপত্যকা হইতে এই পর্ব্বতটী প্রায় ৩০০ ফিট উচ্চ হইবে। কথিত আছে মাঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব যখন নাগবাস হ্রদের জল নির্গত করিয়া দেন তখন হ্রদে একটী শতদলের মধ্যে স্বয়ম্ভু ভগবান দিব্যজ্যোতিতে প্রকাশিত হইলেন। সেই পদ্মের মূল পশুপতিনাথের নিকটবর্ত্তী গুহ্যেশ্বরীতে নিহিত ছিল, এবং পুষ্পটীর উপর বর্ত্তমান সয়ম্ভুনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সয়ম্ভুনাথের মন্দিরের অদূরে মাঞ্জুশ্রীর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। নেপালে মাঞ্জুশ্রীর অনেক মন্দির আছে অনেক স্থলে বুদ্ধের চরণ এবং মাঞ্জুশ্রীর চরণ মন্দিরে অঙ্কিত দেখা যায়,একের চরণে চক্ষু,অপরের চরণে চক্র দেখা যায়। উপত্যকা হইতে প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানবলী দিয়া পর্ব্বতশিখরে স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরে উঠিতে হয়। এই প্রকারে প্রায় পাঁচ ছয় শত সোপান পরম্পরার সাহায্যে সয়ম্ভু শিখরে উঠিতে হয়। এই সোপানশ্রেণী অতিক্রম করা বড় সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। সোপানশ্রেণীর পাদদেশে বুদ্ধদেবের প্রস্তর নির্ম্মিত ধ্যানমগ্ন এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বামে ধর্ম্ম, এবং দক্ষিণে সঙ্ঘের ক্ষুদ্রতম মূর্ত্তি আছে। ১৬৩৭ সালে এই বুদ্ধমূর্ত্তি নেপাল রাজ প্রতাপমল্ল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সোপানবলীতে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে পথের উভয়পার্শ্বে সর্পোপরি প্রতিষ্ঠিত গরুড়ের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। গরুড়ের মস্তকে বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধের ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি আছে। হিন্দুদিগের উপাস্য গরুড় বুদ্ধের বশ্যতা স্বীকার করিয়া মন্দিরের দ্বার রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এই ভাবেই অনেক বৌদ্ধ মন্দিরে গরুড় গণেশ প্রভৃতি হিন্দু-দেবদেবী প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বৌদ্ধগণ পূর্ব্বের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া হিন্দু-দেবদেবীগণের পূজা করিয়া থাকেন। সোপানাবলী দিয়া উঠিয়াই মন্দিরের সম্মুখে প্রকাণ্ড স্বর্ণবর্ণের বজ্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও নেপালরাজ প্রতাপমল্ল কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। বৌদ্ধ মন্দিরে বজ্রের সার্থকতা কি তাহা প্রথমে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বজ্রটী ইন্দ্রের, বুদ্ধ কর্ত্তৃক হিন্দু দেবতা ইন্দ্রের পরাজয়ের চিহ্ন স্বরূপ আদি বুদ্ধের মন্দিরের দ্বার দেশে বজ্রটী স্থাপিত হইয়াছে। বজ্রের সম্মুখেই স্বয়ম্ভুর মন্দির কিন্তু ইহাকে মন্দির

বলিলে ঠিক হইবে না ইহা মন্দির নয় প্রকাণ্ড স্তূপ। এই স্তূপের চারিদিকে সুন্দর সুন্দর মন্দির আছে বটে। তাহার কোনটা বা বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধ, কোনটা বা বৈরচন, কোনটা বা অমিতাভ প্রভৃতির মন্দির। প্রাঙ্গণে বৌদ্ধভিক্ষুদিগের জন্য বিহার সকল দেখিতে পাওয়া যায়। চারিদিকেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘণ্টা। মন্দির চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধদিগের জপযন্ত্র বা মণি আছে। দর্শকগণ ঘণ্টা ধ্বনি করিয়া এবং জপযন্ত্র ঘুরাইয়া পূজার ফল লাভ করে। স্বয়ম্ভু অদ্যাবধি বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থ। নেপালে শীতকালে বিস্তর তীব্বতবাসীর সমাগম হয়। তাঁহাদিগের নিকট স্বয়ম্ভু অতি পবিত্র তীর্থ। নেপাল বাসী নেওয়ারগণ সর্ব্বদা স্বয়ম্ভুনাথ দর্শন করিতে আসে বটে, কিন্তু হিন্দদিগের নিকট এ স্থানের বিশেষ কোন সম্মান নাই। পশুপতিনাথের মন্দিরে হিন্দু বৌদ্ধ সকলেই গিয়া থাকে। এখানে জন সমাগম নাই বলিলেও হয়। প্রাঙ্গণ প্রায় জন-শূন্য দেখিলাম। বানরদল আনন্দে বিহার করিতেছে।

স্বয়ম্ভুর মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন। কথিত আছে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নেপালরাজ গোরাদাস ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের নিকট প্রস্তরফলকে লিখিত বিবরণ হইতে কোন্ সময়ে কোন্ মহাত্মা এই মন্দিরের সংস্কার করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা যায়। যথা—

১। ১৫৯৬ সালে নেওয়াররাজ শিবসিংহমল্ল ইহার পূর্ণসংস্কার করেন।

২। ১৬৩৯ সালে লাসা হইতে আগত সিয়া মা নামে জনৈক লামা ইহার পুনঃসংস্কার করেন।

৩। ১৬৫০ সালে নেওয়াররাজ বিখ্যাত প্রতাপমল্ল আদি স্তূপের চারিদিকে পাঁচটী অতি সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত করিয়া পঞ্চ বুদ্ধ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

৪। ১৭৫০ শালে লাসা হইতে দুই জন লামা আসিয়া এই মন্দিরের সংস্কার করেন। ইহার পরেও অনেকবার অল্পাধিক পরিমাণে ইহার সংস্কার হইয়া আসিতেছে। জানিনা এইরূপ প্রাচীন মন্দির আর আছে কি না, কিন্তু বর্ত্তমান সময়েও ইহার অবস্থা ভালই আছে।

বোধনাথ বা বৌধ।

কাটমণ্ডু সহরের তিন মাইল দূরে তীব্বতবাসী বৌদ্ধ-দিগের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ বোধনাথ প্রতিষ্ঠিত। স্বয়ম্ভুর মন্দিরে হিন্দুগণ কদাচিৎ গিয়া থাকে, কিন্তু বোধনাথ খাঁটি বৌদ্ধতীর্থ। তীব্বতীগণ ইহার চতুর্দ্দিকে বাস করে। ইহা তাহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাহাদিগেরই তীর্থ। ইহাও অতি প্রাচীন। অতি পুরাকালে লাসা হইতে কাশ নামে কোন তীব্বতী তীর্থ ভ্রমোণোদ্দেশে নেপালে আগমন করেন, তাঁহারই দেহাবশেষ এই স্তূপের গর্ভে রক্ষিত হইয়াছে। ইহাও প্রকাণ্ড গোলাকার এক স্তূপ ইহার ব্যাস ৯০ ফিট এবং মধ্যভাগ উচ্চে ১৩৫ ফিট হইবে নেপাল উপত্যকার সর্ব্বত্রই ইহার স্বর্ণময় চূড়া এবং তন্নিম্নস্থিত চক্ষুদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকাণ্ড স্তূপটীর চতুর্দ্দিকেও জপযন্ত্র। ইহা তীব্বতীদিগের একটী ক্ষুদ্র সহর, এবং অপরিচ্ছন্নতায় অতুলনীয়। বোধনাথের সহিত হিন্দুদিগের কোন সম্পর্ক নাই। তাহারা ইহার ত্রিসীমায় পদার্পণ করে কি না সন্দেহ।

৩। পাটনে মচ্ছেন্দ্রনাথের মন্দির।

নেপালের নেওয়ারগণ মচ্ছেন্দ্রনাথকে বোধিস্বত্ব পদ্মপাণির অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। কথিত আছে, আসামের কপথল পর্ব্বত মচ্ছেন্দ্রনাথের আবাস ছিল। একবার নেপালে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হয়। তখন ভাটগাঁওএর রাজা নরেন্দ্র দেব তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনেন, এবং তাঁহার আগমন মাত্রে নেপালে প্রচুর বারিবর্ষণ হয় এবং প্রজাগণের প্রাণরক্ষা হয়। অদ্যাবধি মচ্ছেন্দ্রনাথের যাত্রার দিবস এক পসলা বৃষ্টি না হইয়া যায় না। এই মন্দির পাটনের দক্ষিণ দিকে নরেন্দ্র দেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

৪। কাটমণ্ডু সহরে ছোট মচ্ছেন্দ্রনাথের মন্দির আছে।

পাটনে অশোকের মন্দির।

নেপালের ইতিহাসে দেখা যায় সম্রাট অশোক সপরিবারে সদলে নেপালে আগমন করেন। কাটমণ্ডু সহরের সন্নিহিত পুরাতন পাটন অর্থাৎ ললিত পাটন তাঁহা দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি সহরের মধ্যভাগে এবং চারি কোণে আদি বুদ্ধের যে সকল মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা অদ্যাবধি সুন্দর অবস্থায় আছে। এই সকল মন্দিরের গর্ভে অশোক যাহা নিহিত করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাবধি কেহ স্পর্শ করে নাই, জানি না ভবিষ্যতে এই সকল মন্দিরের গর্ভ হইতে কত অমূল্য পুরাতত্ত্ব সংগৃহীত হইবে।

ভাঁটগাঁওএ অশোকের প্রতিষ্ঠিত মন্দির আছে। কীর্ত্তিপুরে এবং ভাটগাঁও অসংখ্য বৌদ্ধ মন্দির আছে। ইহার কোনটা বা আদিবুদ্ধ কোনটা বা মান্দুশ্রী কোনটা কোন বোধিস্বত্বের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। সংকীর্ণস্থানে তাহার বর্ণনা এবং উল্লেখ করা দুঃসাধ্য। এরূপ অসংখ্য বৌদ্ধ কীর্ত্তি ভারতে আর কুত্রাপি নাই। নেপাল বৌদ্ধদিগের অতি প্রিয় ভূমি তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

জাতীয় শিক্ষার উপাদান।

বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারি মাসের ঈষ্ট্ এণ্ড ওয়েষ্ট্ পত্রে কলিকাতা কলাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাবেল সাহেব "বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারে কলাবিদ্যার সম্বন্ধ বিচার" বিষয়ে এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধে কলাবিদ্যাদ্বারা কেবল চিত্রশিল্প বুঝান হয় নাই;—যাবতীয় শিল্প অর্থাৎ যাহাতে কারিগরী বিদ্যা প্রয়োগ করিতে হয় এমন সকল শিল্প ঐ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত হাবেল সাহেবের প্রবন্ধের বিষয়গত কোন সম্পর্ক নাই; কেবল ঐ প্রবন্ধ হইতে হাবেল সাহেবের একটিমাত্র উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের মুখবন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম। সেই উক্তিটি এই,—"The artificial culture of the West has destroyed the National culture of the East." অর্থাৎ 'পাশ্চাত্য কৃত্রিমতা প্রাচ্য জাতীয় শিক্ষাব লোপ সাধন করিয়াছে।' হাবেল সাহেবের কথার তাৎপর্য্য এই যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান যেমন ভারতবর্ষীয় বালক বালিকার মনের উৎকর্ষ সাধন করিবার উপায়রূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার অনুযায়ী তাহাদের হৃদয়ের স্ফুটনোদ্দেশ্যে কোন শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হয় নাই; এ কারণ ভারতীয় বালকবালিকা এক একটি কৃত্রিম মানসিক জীবরূপে পরিণত হইতেছে; কিন্তু তাহাদের মনের ও হৃদয়ের সমতা সাধন দ্বারা প্রকৃত জাতীয়ত্ব জন্মাইতে পারিতেছে না। (হাবেল সাহেবের উক্তির এইরূপ ব্যাখ্যা তাঁহার উদ্দেশ্য ঠিক প্রকটিত করে কিনা আমি এস্থলে তাহার বিচার করিব না। কিন্তু আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের পক্ষে তাঁহার উক্তিতে 'National' কথাটির উপর জোর দিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করাতে আমার মনোভাব প্রকাশ করা সুগম হইতেছে)।

গত বৈশাখের প্রবাসীতে "জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা আলোচিত হইয়াছে এই প্রবন্ধ তাহার পুনরাবৃত্তি না হইলেও কতকটা অনুবৃত্তি মনে করিতে হইবে। ঐ প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে জাতীয়তা জন্মাইতে হইলে জাতীয়ভাবের স্ফুরণ ও তদর্থে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজনীয়। এমন কি, বর্ত্তমান সরকারী বেসরকারী স্কুল এবং কলেজ মাত্রকেই জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করা যাইতে পারে। তাহাতে কেবল পরকীয় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান হইতে রস সংগ্রহ করিয়া জাতীয়ভাবের অঙ্কুর গজাইয়া দিতে হইবে। দশের ভাবের মিলনে জাতির উৎপত্তি হয়; সেই মিলন যেখানে দশজন একত্র হয় সেখানেই ঘটিতে পারে। তাহার জন্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে 'বয়কট' করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না; এবং তাহা করিতে গেলে সার্থকতা অপেক্ষা অনর্থ প্রচুর ঘটিবে। আসল কথা হাবেল যাহাকে কৃত্রিমতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা পরিহার করিয়া আমাদের স্বভাবেতে শিক্ষার বীজ রোপিত করিতে হইবে। কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে গবর্ণমেণ্ট নূতন শিক্ষা বিষয়ক আইন করিয়া আমাদের জাতীয় বন্ধন শিথিল করিয়া আমাদিগকে রাজভক্ত প্রজা করিতে চাহিতেছেন;—তাহা সত্য হইলেও তাহার দোষটা কোন্‌খানে তাহা দেখিতে পাইতেছি না। পররাষ্ট্রাধীন দেশে রাজভক্ত প্রজা রাজার জাতি নহে বলিয়া কি তাহাদের কোনও জাতি থাকিতে পারিবে না? আর জগতে এমন মূর্খ রাজা কে আছে যে রাজভক্ত প্রজা কামনা না করিয়া রাজবিদ্বেষী প্রজা বাঞ্ছা করিবে? আসল কথা এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার পথ কথঞ্চিৎ রোধ করিলে,—কৃত্রিম উপায়ে বর্দ্ধিতসংখ্যক বিএ, এম্, এর, সংখ্যা হ্রাস করিলে,—তেমন কোনও অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহা আমি মনে করি না। একবার শিক্ষার বীজ রোপিত হইলে, কৃত্রিমতার পথ যত রুদ্ধ হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে; কারণ স্বাভাবিক জাতীয়তা অঙ্কুরিত ও উদ্বুদ্ধ হইবার অবকাশ পাইবে। হাবেল সাহেবের কথাগুলি আমাদিগকে বিশেষ মনোযোগের সহিত বুঝিয়া লইতে হইবে।

তিনি বলিতে চান যে কেবল সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান দ্বারাই উচ্চশিক্ষা হয় না; তাহা স্বীকার্য্য হইলে কেবল বহুসংখ্যক বি,এ, এম,এ, পাশ না করিতে দিলে উচ্চশিক্ষার পথ রোধ করা হইল, এ কথার অর্থ কি? বাস্তবিক আমাদের জাতীয় শিক্ষার ইহা অন্তরায় নহে। আমাদের প্রথম অভাব জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্র, জাতীয় শিক্ষার উপাদান। ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

"জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি" প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয় কিম্বা তৎসংসৃষ্ট কলেজ সকল কেবল ভাব জন্মাইবার কল বিশেষ। তাহাতে জাতীয় ভাব পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত এবং উন্নত হয় বটে, কিন্তু তাহারা জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমার উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী লোক লইয়া জাতি হয় না। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সমষ্টি সমগ্র জাতি নহে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি না হইলে যে শিক্ষা হয় না তাহাও নহে। এদেশে ব্যবসায়ী ইংরাজ যাঁহারা আসেন তাঁহাদের কয়জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী? তাহা নয় বলিয়া কি তাঁহারা অশিক্ষিত? ব্যবসাদার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কারিগর প্রভৃতি যে সকল ইংরাজ দেখা যায় তাঁহারা অধিকাংশই উপাধিবর্জ্জিত অথচ শিক্ষিত। ইয়ুরোপে যে কোন জাতিতে দেখা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা সর্ব্বত্রই মুষ্টিমেয়, এবং তাহারা জাতীয় উন্নতির সোপান হইলেও জাতীয় জীবনের অবলম্বন নহে। যে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার হস্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত রহিয়াছে তাহাতে কতজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী আছেন? তবে আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিই শিক্ষার মানদণ্ডরূপে গৃহীত হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিব,—ইহার একমাত্র কারণ আমাদের জাতীয়শিক্ষার অভাব! গবর্ণমেণ্টের উপর রাগ করিয়া যখন আমরা জাতীয় শিক্ষার ভান করিলাম, তখন ঠিক ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই অনুরূপ কতকগুলি পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিলাম মাত্র;—ইহাই কি জাতীয় শিক্ষা?

বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের দোষ দেখাইয়া অনেকে বলিতেছেন যে, আমাদের উচ্চশিক্ষা রোধ করিবার মানসে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার মাত্রা বাড়াইয়া আমাদিগের শিক্ষিত হইবার পথ সঙ্কীর্ণ করিতেছেন। আমি মনে করি, তাহাতে আমাদের জাতীয় শিক্ষার পক্ষে লাভ ছাড়া লোকসান কিছুই হয় নাই। মনে করা যাউক, প্রবেশিকা পরীক্ষার মাত্রা বাড়াইয়া এমন করা হইল যে তাহাতে যে বিদ্যা প্রয়োজন হইবে তাহা বর্ত্তমান (কিম্বা গত) মধ্য (F. A. বা Intermediate) পরীক্ষার সমান। তাহাতে এই ফল হইবে যে আগে যে স্থলে বৎসরে যত জন এফ, এ, পরীক্ষার্থী পাওয়া যাইত, সে স্থলে প্রায় সেই সমবয়সে তাহার প্রায় দ্বিগুণসংখ্যক বিদ্যার্থী ঐ সর্ব্ববিদ্যার পরীক্ষা (অর্থাৎ বর্ত্তমান প্রবেশিকা পরীক্ষা) দিতে আসিবে। তা' ছাড়া বি, এ, এম, এ, পাশের সংখ্যা হ্রাস হইলে তাহাতে মুনসেফ, ডেপুটী কিম্বা উকীলের সংখ্যা কমিবে না, কেবল উমেদারের সংখ্যা কমিবে মাত্র; এবং এখন যেখানে ২০৲ বেতনে বি, এ কেরাণী পাওয়া যায় তাহা লুপ্ত হইয়া আবার প্রবেশিকা পাশকরা কেরাণীর আদর বাড়িবে। ইহা জাতীয় হিসাবে লাভ কি লোকসান তাহা বিবেচনা করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির অভাবে আমাদের জাতীয় অধঃপতন প্রশস্ত হইবার কোনও আশঙ্কা নাই; অথচ সেই উপাধিকেই একমাত্র শিক্ষার চরম মনে না করিলে, শিক্ষা নানাবিষয়োন্মুখী হইয়া প্রকৃত জাতীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে ইহাই আমার ধারণা।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে "School Final" নামে একটা পরীক্ষা কয়েক বৎসর যাবৎ প্রচলিত ছিল; আগামী বৎসর হইতে তাহা নূতন প্রবেশিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতেছে। ঐ পরীক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ না হইলেও উহার নামটি অতি সার্থক ছিল। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রার্থী নহে তাহাদের পক্ষে "প্রবেশিকা পরীক্ষা" কি? কোথায় প্রবেশ করিবার যোগ্যতার পরীক্ষা? এরূপ স্থলে "প্রবেশিকা" নাম না দিয়া, "School Final" (অর্থাৎ "বিদ্যাশালাশিক্ষা সমাপ্তি" কিম্বা ইহা হইতেও কোনও একটা সুবোধ্যতর বাঙ্গালা নামকরণ করিয়া ঐরূপ) নামে একটা পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা জাতীয় শিক্ষার প্রথম স্তর বলিয়া মনে হয়। ইহার বিষয়গুলি এমত হওয়া চাই যাহাতে ব্যবসায়িক বৃত্তি নির্ব্বাচন পক্ষে এই পরীক্ষা ব্যবহৃত হইতে পারে; যেমন শিল্পশিক্ষার্থী জাপানযাত্রীগণ

এই পরীক্ষার ফলে বৃত্তিলাভ করিতে পারিবে। ইহাতে জাপানী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে। এইরূপ বিদ্যালয় ও এই জাতীয়পরীক্ষা আমাদের জাতীয়শিক্ষার প্রথম উপাদান বলিয়া মনে করি।

আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, জাতীয়শিক্ষার ভিত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নহে। জাতীয়বিদ্যালয়ই জাতীয়শিক্ষার প্রথম উপাদান; এবং তাহা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপোষক না করিয়া, যাহাতে তদ্দ্বারা নানামুখী শিক্ষার সূত্রপাত ও বিস্তৃতি ঘটাইতে পারা যায় তাহার দিকে মনোনিবেশ করিলেই জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি-স্থাপন হইবে। একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষা যে শিক্ষার উপায় এবং চরম তাহা মনে করা ভ্রম। এ দেশে এমন দিন কখনও আসিবে কি না যখন ইংরাজিভাষা বাদ দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত ও পরিচালিত হইতে পারিবে তাহা বলা বড় শক্ত। কিন্তু প্রাথমিকশিক্ষা সর্ব্বত্র মাতৃভাষায় হওয়া বিধেয় এবং জাতীয়শিক্ষার পক্ষে ইংরাজি ভাষান্তর-রূপ ব্যবহার করিতেই হইবে; এমন কি আরও দুই একটি (কিম্বা ততোধিক) পরকীয় ভাষা জাতীয়শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। নিজের জাতীয়উন্নতি সাধন করিতে হইলে নানাজাতির ভাব স্বভাব জানা প্রয়োজন হইবে এবং নানা শিল্পশিক্ষার্থে নানা দেশে লোক পাঠাইতে হইবে; সেই উদ্দেশ্যেই সকল উন্নত জাতির ভাষা জানা প্রয়োজন। এমন বিশ্ববিদ্যালয় জগতে কোথাও নাই যেখানে কেবল একটী মাত্র পরকীয় ভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যা অর্জ্জনের প্রয়াস হইয়া থাকে; ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেরই ইহা মুখ্য দোষ, এবং এই একমাত্র কারণেই ভারতীয় শিক্ষার কৃত্রিমতা দেখিয়া বুদ্ধিমান লোকেরা আক্ষেপ করিয়া থাকেন। অনুবাদ ও অনুকরণ এই দুইটিই বর্ত্তমান ভারতীয়শিক্ষার সাধারণ ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জগতের যাবতীয় ভাবের সার আমরা ইংরাজির অনুবাদ হইতে সংগ্রহ করিতেছি ও ইংরাজির অনুকরণে আমাদের ভাবপোষণ করিতেছি। ইহাতে আমাদের শিক্ষা জাতি হারাইয়া একান্ত কৃত্রিম হইয়া পড়িতেছে। হাবেল সাহেবের মতে কলাবিদ্যাতে পর্য্যন্ত আমরা কৃত্রিমতা প্রবেশ করাইতে বসিয়াছি। এ কারণ একদিকে হাবেল সাহেব ও অপর দিকে ভগিনী নিবেদিতা (Modern Review পত্রিকা দ্রষ্টব্য) আমাদের জাতীয়তার ধ্বংসসাধন হইতেছে দেখিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। সে যাহা হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বাদ দিলেও, জাতীয় উন্নতিকল্পে যে শিক্ষা প্রয়োজন তাহাতে একাধিক চলিত ভাষা ও তৎসঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া "বিদ্যাশালাশিক্ষা সমাপ্তি" পর্য্যন্ত জাতীয় শিক্ষার অন্তর্গত থাকিবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংসৃষ্ট শিক্ষা জাতীয় বিলাসিতার লক্ষণ; তাহা জাতীয় ভাবের উৎকর্ষণ ও পরিপোষণ জন্য প্রয়োজন, কিন্তু তাহা শিক্ষার ভিত্তি নহে। আমরা ইয়ুরোপের ভাবরাজ্যের এমন এক স্তরে ইংরাজের সংঘর্ষে আসিয়া পড়িয়াছি যে, সেখানে আমাদের শিক্ষার ভিত্তি খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাই প্রাথমিক শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে কথা না শুনিয়া চারিদিকেই কেবল বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের কথা শুনিতে পাইতেছি। শিক্ষা সম্বন্ধে আজকাল সকলেই কথা কহিয়া থাকি, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। আমাদের শিক্ষার কৃত্রিমতার ইহা অপেক্ষা আর কি প্রকৃষ্ট প্রমাণ হইতে পারে? ইয়ুরোপে সর্ব্বত্র উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষের সহিত প্রাথমিক শিক্ষারও উৎকর্ষ সাধন করা হইতেছে। ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আইন লইয়া তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। জার্ম্মেনিতে প্রতি-নিয়ত প্রাথমিক শিক্ষার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত ও সমস্ত ইয়ুরোপে তাহা অনুকৃত হইতেছে। সর্ব্বত্র ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে প্রাথমিক শিক্ষাই জাতীয় শিক্ষার প্রথম সোপান। ইহাকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া জাতীয় উন্নতিকল্পে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই জাতীয়শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করা হইবে। শিক্ষাতে জাতীয়ভাব প্রবিষ্ট করাইতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষাতে সেই জাতীয় ভাবের উদ্বোধন না করিলে চলিতেছে না। প্রাচীন ভারতীয় গুরুকুল-বিদ্যালয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা একালে হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না; অর্থাৎ ঠিক প্রাচীন বিদ্যালয়ের অনুরূপ বিদ্যালয় আধুনিক অবস্থায় সম্ভবপর নহে, ইহাই আমার বলিবার উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই প্রাচীন বিদ্যালয়েরই নূতন সংস্করণ, বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করিয়া সর্ব্বত্র জাতীয়তা বন্ধনের সূত্রপাত

করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধেও বলিয়াছি এখনও পুনরুক্তি করিতেছি যে, আধুনিক নিয়মে জতীয়তা বন্ধন করিতে হইলে আধুনিক প্রণালীতে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। প্রাচীন গুরুকুলের দিনে জাতীয়তা লইয়া সংগ্রাম বাধিবার কোন আশঙ্কা ছিল না। এখন বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। এ হেন অবস্থায় জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা একটি গুরুতর সমস্যা। আমি এই প্রবন্ধে কোন ব্যবস্থা উপস্থিত করিবার প্রয়াস পাই নাই, একারণ আমার বক্তব্য অসংলগ্ন প্রলাপের ন্যায় প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু যদি কোন সুবিবেচক ও বিচক্ষণতর ব্যক্তি ইহার ব্যবস্থাদানে অগ্রসর ও কৃতকার্য্য হন তাহা হইলেই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

হাঁচির কথা।

আমাদের ধর্ম্মনিবন্ধকারগণ বলেন, কেহ হাঁচিলে 'জীব', ও কাহারও পদস্খলন হইলে 'উত্তিষ্ঠ' বা 'উঠ' বলিতে হয়। এই রূপ কেহ হাই তুলিলে অঙ্গুলিধ্বনি (তুড়ি) বিধেয়। শক্রর সম্বন্ধেও এ আচার প্রতিপালনীয়, নতুবা ব্রহ্মবধের পাতকী হইতে হয়। হাঁচি সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রে আরও দেখা যায় যে, হাঁচিলে যে ব্যক্তি 'জীব' শব্দ প্রয়োগ করেন, তাঁহাকেও 'জীব' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে হয়।*

বঙ্গদেশে নব্য সম্প্রদায় অনাদর করিলেও, প্রাচীনের মধ্যে এখনও এই ব্যবহার দেখা যায়। ইহা অনেকেই জানেন, বহু স্থানে কেবল 'জীব' শব্দ উচ্চারণ না করিয়া 'জীব সত্য' বা 'জীব সত্যং' উচ্চারণ করা হয়। স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে ইহা বিশেষ প্রচলিত দেখিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধ হইতে জানা যাইবে, মূলে তাহা 'জীব সত্য' নহে,—'জীব শতম্'। অর্থাৎ শত বৎসর জীবিত থাক।

এই হাঁচি সম্বন্ধে বৌদ্ধজাতকে * একটী সুন্দর গল্প দেখা যায়। তাহাই এখানে উদ্ধৃত হইতেছে।

রাজা প্রসেনজিৎ ভগবান্ বুদ্ধকে একটী আরাম প্রদান করেন। ইহার নাম "রাজকারাম"। কোন দিন এই "রাজকারামে' ভিক্ষুসংঘ মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া ভগবান্ ধর্ম্মোপদেশ করিতে করিতে হাঁচিয়া উঠেন। ভিক্ষুগণ তাহা শুনিয়া 'জীবতু সুগতো', 'জীবতু ভগবা'—এই শব্দে মহান্ কোলাহল উৎপাদন করেন। ইহাতে ধর্ম্মোপদেশের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ভগবান ভিক্ষুগণকে আমন্ত্রণ করিয়া কহিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যে 'জীব' শব্দ উচ্চারণ করিলে, এই বিশ্বাসে কি কেহ বাঁচিবে না মরিবে?"

"না ভগবন্, কেহই বাঁচিবে, বা মরিবে না।"

"ভিক্ষুগণ, হাঁচিলে আর 'জীব', বলিবে না।——যে বলিবে সে দুঃখ প্রাপ্ত হইবে।"

সেই সময়ে ভিক্ষু সমূহ হাঁচিলে সাধারণ মনুষ্যেরা 'জীব' শব্দ উচ্চারণ করিত; কিন্তু ভিক্ষুগণ তাহাতে কিছুই বলিতেন না। সেই সমস্ত মনুষ্য চিন্তা করিতে লাগিল "কি জন্য এই শাক্যপুত্রমতানুযায়ী ভিক্ষুগণ 'জীব' বলিলেও, কিছু আলাপ করেন না।" কথা ভগবানের নিকট উঠিল। তিনি বলিলেন—"ভিক্ষুগণ, গৃহিসমূহ মাঙ্গলিক ইচ্ছা করেন; অতএব আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, গৃহিগণ 'জীব' বলিলে, তোমরাও 'প্রতিজীব' বলিবে।" ভিক্ষুরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ভগবান্, এই 'জীব-প্রতিজীব' ব্যবহার কখন উৎপন্ন হইয়াছে?" "হে ভিক্ষুগণ, ইহা প্রাচীনকাল হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে",—এই কথা বলিয়া ভগবান্ বলিতে লাগিলেন;—

"পুরাকালে বারাণসী নগরে যখন ব্রহ্মদত্ত রাজ্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাষ্ট্রে কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বোধিসত্ত্ব যখন ষোড়শ-বর্ষদেশীয় তখন তাঁহার পিতা ও তিনি কিছু মৃদ্ভাণ্ড লইয়া গ্রামনিগমাদিতে ভ্রমণ

* "ক্ষুতোৎপতন জৃম্ভাসু জীবোত্তিষ্ঠা স্ফুলিধ্বনি।
শত্রোরপিচ কর্ত্তব্য মন্যথা ব্রহ্মহা ভবেৎ॥"
"জীবেতি ক্ষুবতো ব্রূয়াদ্ জীবেত্যুক্ত স্বয়া সহ।"
রঘুনন্দনকৃত্ত তিথিতত্ত্ব ও মদন পারিজাত প্রভৃতি।

* সটীক বৌদ্ধজাতক সমূহ (পালিভাষায়) শ্রীযুক্ত V. Fausboll পাঁচ খণ্ডে লণ্ডনে সম্পাদিত করিয়াছেন। T. W. Rhys Davids ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। আমাদের অদ্যকার বর্ণিত সর্গ-জাতক ২য় খণ্ডের ৫ম সংখ্যক।

করিতে করিতে বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে এক দৌবারিকের গৃহে পাক করিয়া ভোজন করিবার পর জিজ্ঞাসা করিলেন যে অবেলায় উপস্থিত আগন্তুকেরা কোথায় থাকিতে পারে। লোকেরা উত্তর করিল, 'নগরের বহির্দ্দেশে একখানা ঘর আছে কিন্তু তাহাতে মনুষ্যেরা থাকে না; তোমাদের ইচ্ছা হইলে, সেখানে থাকিতে পার। বোধিসত্ত্ব বলিলেন 'বাবা, আপনি যক্ষের ভয় করিবেন না, আমি তাহাকে বশীভূত করিয়া আপনার পায়ে ফেলিব।' তিনি এই বলিয়া পিতার সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। পিতা একখানি ফলকে শুইয়া পড়িলেন। পুত্র উপবেশন করিয়া পিতার পদসংবাহন করিতে লাগিলেন।

সেই স্থানে এক যক্ষ বাস করিত। সেই যক্ষ দ্বাদশ বৎসর কুবেরের অর্চ্চনা করিয়া গৃহখানি লাভ করিয়াছে। ইহার নিয়ম এই যে, যে সকল ব্যক্তি এই গৃহে প্রবেশ করিবে, তাহাদের মধ্যে 'জীব' ও 'প্রতিজীব'-বাদী ভিন্ন সকলকেই সেই যক্ষ ভক্ষণ করিবে। ইহার স্থান ছিল গৃহের পশ্চাৎস্থিত একটী বংশস্থূণা।

যক্ষ বোধিসত্ত্বের পিতা গর্গকে হাঁচাইবার জন্য স্বপ্রভাবে এক প্রকার সূক্ষ্ম চূর্ণ গৃহ মধ্যে বিকীর্ণ করিয়া দিল। চূর্ণ আসিয়া নাসাপুটে প্রবেশ করায় গর্গ হাঁচিয়া উঠিলেন। বোধিসত্ত্ব যক্ষকে স্থূণা হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া তাহার অভিপ্রায় সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, এবং পিতাকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রথম গাথাটী উচ্চারণ করিলেন—

"জীব বস্‌সসতং গগ্‌গ, অপরানি চ বীসতিং।
মা মং পিসাচা খাদন্তু জীব বং সরদো সতং॥"*

যক্ষ তাহা শুনিয়া ভাবিল 'ইহাকে ত আর খাইতে পারা যাইবে না, কেন না এ 'জীব' বলিয়াছে, অতএব ইহার পিতাকে খাইতে হইবে।' এই ভাবিয়া যক্ষ গর্গের নিকট উপস্থিত হইল। গর্গও তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া, এই দ্বিতীয় গাথা উচ্চারণ করিলেন—

"ত্বমিপ বস্‌সসতং জীব অপরানি চ বীসতিং।
বিসং পিসাচা খাদন্তু জীবত্বং সরদো সতং॥"*

যক্ষ দেখিল যে ইহাদের একজনকেও খাওয়া তাহার শক্তিতে নাই; অতএব প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইল।

তখন বোধিসত্ত্ব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'যক্ষ, কি জন্য তুমি এই গৃহপ্রবিষ্ট মনুষ্যগণকে ভক্ষণ কর?'

'দ্বাদশ বৎসর কুবেরের অর্চ্চনা করিয়া আমি এই গৃহখানি লাভ করিয়াছি।'

তুমি কি 'সমস্ত লোককেই ভক্ষণ করিবার জন্য ইহা পাইয়াছ?'

'হাঁচিলে যাহারা 'জীব'-প্রতিজীব' বলে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া, অপর সকলকে আমি ভক্ষণ করি।'

'দেখ যক্ষ, তুমি পূর্ব্বকালেও অকুশল কর্ম্ম করিয়া ক্রূর পরহিংসক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, এখনও ঐরূপ করিলে তুমি নিতান্ত তমঃপরায়ণ হইয়া উঠিবে। অতএব তুমি এখন প্রাণাতিপাত প্রভৃতি অকুশল কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হও।'

বোধিসত্ত্ব এই প্রকারে তাহাকে শাসন ও নরকভয় প্রদর্শনে তিরস্কার করিয়া 'প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হইব' —ইত্যাদি পঞ্চশীল প্রদান করিলেন, এবং ভৃত্যের ন্যায় করিয়া রাখিলেন।

পরদিন নগরের মনুষ্যগণ বেড়াইতে বেড়াইতে যক্ষের বোধিসত্ত্ব কর্ত্তৃক ঐরূপ ভাব দর্শন করিয়া রাজার নিকট নিবেদন করিল 'দেব, একজন মনুষ্য যক্ষকে শাসন করিয়া ভৃত্যের মত করিয়া রাখিয়াছে।' রাজা তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্বকে আনয়ন করাইয়া সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন, এবং তাঁহার পিতার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। যক্ষ রাজার নিকট বলি গ্রহণ করিতে লাগিল। রাজাও বোধিসত্ত্বের উপদেশ অনুসরণ পূর্ব্বক দানাদি পুণ্য কর্ম্ম করিয়া কালক্রমে স্বর্গলোকে গমন করিলেন।'

---

* সংস্কৃত—

জীব বর্ষশতং গর্গ অপরাং চ বিংশতিম্।
মা মাং পিশাচাঃ খাদন্তু জীব ত্বং শরদঃ শতম্॥

* সংস্কৃত—

ত্বমপি বর্ষশতং জীব, অপরাংচ বিংশতিম্।
বিষং পিশাচাঃ খাদন্তু, জীবত্বং শরদঃ শতম্॥

বিষং পিশাচাঃ খাদন্তু—ইহার তাৎপর্য্য এই যে পিশাচেরা বিষ পান করিয়া মরিয়া যাউক।

শাস্তা (বোধিসত্ত্ব) এই ধর্ম্মদেশনার উপসংহার করিয়া বলিলেন এ সময়ে 'জীব-প্রতিজীব' ব্যবহার উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ঐ সময়ে এই উপাখ্যানের রাজা ছিলেন আনন্দ, পিতা ছিলেন কাশ্যপ, এবং পুত্র ছিলাম আমি।"

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

প্রাচীন পুরাণ।

মহাভারতে, রামায়ণে, পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলিতে, এবং অন্যান্য সাহিত্যে, যে সকল পুরাণেতিহাস পাওয়া যায়, সেগুলি যদি বৈদিক পুরাণের সহিত মিলাইয়া দেখা যায়, তাহা হইলে নূতন পৌরাণীকী কথার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ সুস্পষ্ট হয়। বৈদিক অনুষ্ঠানের কয়েকখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বনে কয়েকটি প্রসিদ্ধ পৌরাণিক গল্পের পরিচয় দিতেছি।

বৈদিক দেবতাগণ তিনটি বর্গে বিভক্ত, যথা অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্য। অর্থাৎ, দেবতাগণ কেহ কেহ বা অগ্নিবর্গে কেহ কেহ বা বায়ুবর্গে এবং কেহ কেহ বা সূর্য্যবর্গে অন্তর্নিবিষ্ট। এই জন্য সকল বৈদিক অনুষ্ঠানের গ্রন্থেই তিনটি দেবতা, মূল বা প্রধান দেবতা বলিয়া স্বীকৃত। এ বিষয়ে বেদানুক্রমণি, সর্ব্বানুক্রমণি এবং বৃহদ্দেবতা প্রসিদ্ধ এবং মান্য গ্রন্থ। সর্ব্বানুক্রমণির আরম্ভভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোকে এবং বৃহদ্দেবতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১২৪ শ্লোকে পাই, যে ঐ তিনটি দেবতা ভিন্ন ভিন্ন গণনায় তিনটি মূল দেবতা হইলেও, সমষ্টিভাবে দেবতা একটি মাত্র; এবং সেই দেবতা প্রজাপতি। যথা:—

ব্যাহৃতানাং সমস্তানাং দৈবতং তু প্রজাপতিঃ।
ব্যাস্তানাময়মগ্নিশ্চ বায়ুঃ সূর্য্যশ্চ দেবতাঃ।

দেবগণের ইতিহাসের এই মূল সূত্রটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিলে পরবর্ত্তী ত্রিমূর্ত্তির ইতিহাস' ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়। প্রজাপতিই একমাত্র মূল দেবতা; এবং সকল লৌকিক কথা এবং পুরাণের মূলে এই প্রজাপতি।

১। প্রজাপতির বংশের কথা।

প্রজাপতির বংশের পুরাণের মূল, ঋগ্বেদের সপ্তমমণ্ডলে (৭ম, ১০৪—৯৬) বৃহদ্দেবতার পঞ্চম অধ্যায়ের ১৪৩—১৫৯ শ্লোকগুলিতে এইরূপ আছে:—প্রজাপতির পুত্র মরীচি, এবং মরীচির পুত্র কশ্যপমুনি। কশ্যপকে দক্ষ, তাঁহার ত্রয়োদশটি কন্যা দান করিয়াছিলেন; কশ্যপের সেই পত্নীদিগের নাম—অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, মুনি, ক্রোধা, বিশ্বা, বরিষ্ঠা, সুরভি, বিনতা এবং কদ্রু। বৃহদ্দেবতার এই কথা মহাভারতের আদি পর্ব্বে পাই বটে, কিন্তু বরিষ্ঠা এবং সুরভি দেবীদ্বয়ের পরিবর্ত্তে প্রধা এবং কপিলা নাম পাই। বৈদিক শ্লোকের উপর মহাভারতের পরিবর্ত্তন বন্ধনী দিয়া দেখাইতেছি:— (তথা)

অদিতির্দিতিদনুঃ কালা দনায়ুঃ সিংহিকা মুনিঃ
(প্রধা চ বিশ্বাচ) (বিনতা কপিলা মুনিঃ)
ক্রোধা বিশ্বাবরিষ্ঠাচ সুরভি র্বিনতা তথা
(শ্চমনুজব্যাঘ দক্ষ কন্যৈব ভারত)
কদ্রুশ্চৈবেতি দুহিতঃ কশ্যপায় দদৌসচ।

মহাভারতের শল্য পর্ব্বের ৩৫ অধ্যায়ে দক্ষের কন্যা ২৭টি বলিয়া লিখিত; এবং উহাঁরা সকলেই চন্দ্রের পত্নী বলিয়া বর্ণিত। শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে আবার দক্ষের কন্যা সংখ্যা ৫০টি পাই। এই ক্রমবিকশিত পুরাণ মহাভারতে অনেক পরে যোজিত সন্দেহ নাই। রামায়ণের আরণ্যকাণ্ডের ১০ম ও ১১শ শ্লোকে পাই, যে দক্ষের কন্যা সংখ্যা ৬০টি! এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে ৮টিকে কশ্যপ বিবাহ করেন। এই ৮ জনের নাম—অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা (ক্রোধা ও বিশ্বার এক সঙ্গের সংস্করণ), মনু (মুনির ভ্রান্ত সংস্করণ), এবং অনলা। অনলাটি হয়ত মহাভারতের কপিলা নামের ভ্রান্ত নূতন সংস্করণ।

কশ্যপ এবং তাঁহার পত্নীগণ হইতে, "দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব উরগ, রাক্ষস, পক্ষী (বয়াংসি) পিশাচ এবং অন্য জন্তুগণ" উৎপন্ন (বৃহ—৫,—১৪৬)। এ বিষয়ে একালের পুরাণে বেশি পরিবর্ত্তন নাই। কিন্তু রামায়ণে, সুরভিকে গাভী-সুরভি করিয়া উহার মলমূত্র হইতে শক-যবনাদির উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতে কিন্তু বশিষ্ঠের ধেনু, এদেশবাসী অনার্য্য শবর সৈন্য পর্য্যন্তই উৎপন্ন করিয়াছিল; (শল্য—৪০,২০)। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী হইতে আগত বিদেশীয়দিগের উৎপত্তি কথা এই প্রসঙ্গে মহাভারতে না থাকিলেও, অন্য প্রসঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

অদিতির গর্ভজাত দ্বাদশ পুত্র, দ্বাদশ আদিত্য; যথা—ভগ, অর্য্যমা, অংশ, মিত্র, বরুণ, ধাতা, বিধাতা, মহাদ্যুতি বিবস্বৎ, ত্বষ্টা, পুষা, ইন্দ্র, এবং বিষ্ণু (বৃহ—৫, ১৪৭—১৪৮)। মহাভারত, রামায়ণ, এবং পরবর্ত্তী পুরাণগ্রন্থে এই নামগুলির সামান্য রকমের পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। মহাভারতের আদিপর্ব্বের ৬৫ অধ্যায়ের তালিকাটি বৈদিক গ্রন্থের অনুরূপ বটে; কিন্তু শান্তিপর্ব্বের তালিকা হালের পুরাণের অনুরূপ। শেষ তালিকাটি পরবর্ত্তী সময়ের প্রক্ষিপ্ত রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি।

অদিতিসম্ভূত মিত্র এবং বরুণ প্রাচীনকালে বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইরানীগণ ইন্দ্রকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু মিত্র এবং বরুণ তাঁহাদেরও প্রধান দেবতা স্বীকৃত ছিলেন। এই যুগলাদিত্য, অর্থাৎ মিত্র এবং বরুণ, একদিন যজ্ঞস্থলে উর্ব্বশীকে দেখিয়াছিলেন; এবং তাহাতে যজ্ঞার্থ রক্ষিত পূর্ব্বরাত্রির বাসিজলের কুম্ভে তাঁহাদের "রেতশ্চস্কন্দ"। বৃহদ্দেবতার অনুরূপ সর্ব্বানুক্রমণিতেও বাসিজলের কথা আছে (১—১৬৬):—"বাসতীবরে কুম্ভে⋯অপতৎ"। ইহাতেই অগস্ত্য এবং বশিষ্ঠের জন্ম। কুম্ভে তরল পদার্থে মাপ (মান) হয় বলিয়া, কুম্ভজাত বশিষ্ঠ ঋষির নাম হইল "মান্য" (বৃহ—৫, ১৫৩—৪)। অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রার কথা অন্য প্রসঙ্গে লিখিব।

রামায়ণে আছে, (উ—৫৬) যে বরুণ উর্ব্বশীকে একদিন আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু সে দিন সে মিত্রের সেবায় নিযুক্তা ছিল। মিত্রের অভিশাপে উর্ব্বশী পৃথিবীতে আসিয়া কাশীরাজ পুরুরবার ভোগ্যা হয়েন। পূর্ব্বোদ্ধৃত বশিষ্ঠ জন্ম-পুরাণটি রামায়ণে স্বীকৃত আছে বটে, তবে সেটি বশিষ্ঠের দ্বিতীয় জন্মকথা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণে এবং পুরাণগ্রন্থে বশিষ্ঠকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মার পুত্রই বলা হইয়াছে। উর্ব্বশীর উপাখ্যান পরে দিতেছি।

২। বিশ্বামিত্র কথা।

আর্য্যানুক্রমণি, সর্ব্বানুক্রমণি এবং বৃহদ্দেবতায়, কোন্ ব্রহ্মর্ষি ঋগ্বেদের কোন্ সূক্তের কর্ত্তা, তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে; এবং সূক্তপাঠের ফল শ্রুতিও আছে। উহাই দেখাইতে গিয়া লিখিত হইয়াছে, যে গাথিপুত্র (গাধি নহে) বিশ্বামিত্র, যিনি প্রথমতঃ পৃথিবী শাসন করিতেন, এবং পরে ঋষিব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহার শতপুত্র ছিল; এবং তিনি অমুক অমুক সূক্তের দ্রষ্টা (বৃহ—৪, ৯৫ ও পরবর্ত্তী) কথাটি বুঝিয়া লইতে হইবে। বিশ্বামিত্র প্রথমে ক্ষত্রিয় "জাতি" লোক ছিলেন; এবং পরে ব্রাহ্মণ "জাতির" লোক হইলেন, এরূপ নহে। প্রথমতঃ রাজন্য বা ক্ষত্রিয় কার্য্য করিতেন, এবং পরে তপস্যা বা ব্রাহ্মণ কার্য্য করিলেন, এই মাত্র। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় স্বতন্ত্র "জাতি," এ বিভাগ তখন ছিল না। বৈদিক সাহিত্যেও পাই এবং প্রাকৃত ভাষায় ত্রিপিটকেও পাই, যে ঐ প্রকার প্রভেদ ছিল না। একজন রাজা যিনি ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত, তাঁহার সম্বন্ধেই পাই যে তিনি আবার "ইসি পবজ্জা" করিলেন। ইহার বহুতর দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিতে পারি, কিন্তু এখানে বৃহদ্দেবতার শ্লোকটিতেই দেখিতে পাইবেন, যে বিশ্বামিত্র কেবল রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া তপস্যা অবলম্বন করিয়া মন্ত্রদ্রষ্টা বা ব্রহ্মর্ষি হইলেন:—

প্রশাস্য গাং য স্তপসাভ্যগচ্ছৎ
ব্রহ্মর্ষিতামেক শতং চ পুত্রান্
সগাথিপুত্র স্ত জগাদ সূক্তং
সোমস্তমেতাগ্নেয়ং পরে চ।

ইনি রাজা সুদার কুলপুরোহিত ছিলেন, এবং বশিষ্ঠ কুলের সহিত ইঁহার বিবাদ ছিল। অনেকগুলি সূক্ত এই বিবাদের অভিশম্পাতে সৃষ্ট বলিয়া, বশিষ্ঠবংশীয় কেহ তাহা পাঠ বা শ্রবণ করেন না; এইরূপ লিখিত আছে।

৩। দেবাপি আখ্যান।

(বৃহদ্দেবতা ৭ ও ৮ অধ্যায়)

মহাভারতপ্রসঙ্গে এই আখ্যানটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া, বিশেষ ভাবে এটির প্রতি পাঠকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কথার ব্যাখ্যাও এই আখ্যানে সুস্পষ্ট হইবে।

ঋষ্টিসেনের দুই পুত্র, দেবাপি এবং কৌরব শন্তনু (শান্তনু নহে।) জ্যেষ্ঠ দেবাপির চর্ম্মরোগ ছিল (ত্বগ্‌-দোষ) বলিয়া, ঋষ্টিসেন তাঁহাকে রাজা করিতে চাহিলেও, তিনি রাজা হইলেন না। প্রজারা পরে শন্তনুকে রাজা করিল। শন্তনু রাজা হইবার পর বার বৎসর অনাবৃষ্টি হয়; প্রজারা তখন এই দুর্ণিমিত্ত,



স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

...জ্যেষ্ঠাতিক্রম কারণে আরোপ করিল। শন্তনু, প্রজাবর্গ সহিত দেবাপির নিকটে গিয়া তাঁহাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। দেবাপি কহিলেন, "আমি ত্বগ্-দোষী, রাজা হইব না। কিন্তু রাজা শন্তনুর পুরোহিত হইয়া যজ্ঞ করিয়া বৃষ্টি করাইব।" দেবাপি পুরোহিত হইয়া যে যে ঋক্ উচ্চারণ করিয়া বৃষ্টি করাইয়াছিলেন, এবং যে প্রকারে মন্ত্রদ্রষ্টা হইলেন তাহা লিখিত হইয়াছে। ঋক্‌গুলি বৃষ্টি অনুষ্ঠানের মন্ত্র বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

৪। পুরুরবা ও উর্ব্বশীর কথা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে রামায়ণে লিখিত হইয়াছে, যে পুরুরবা কাশীর রাজা ছিলেন। কিন্তু হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপরাণ প্রভৃতিতে "উত্তরে জাহ্নবীতীরে প্রতিষ্ঠানে" ইঁহার রাজধানী নির্দ্দিষ্ট। এই প্রতিষ্ঠান যে প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী, তাহা নাটকেও পাই পুরাণাদিতেও পাই। পুরাণে আছে, যে "রাজ্যং স কারয়ামাস প্রয়াগে পৃথিবী-পতি"। এই প্রতিষ্ঠান যে অন্ধ্র রাজাদিগের গোদাবরী সন্নিহিত প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান্ নহে, তাহা মনে রাখা উচিত। সায়নের টীকা অবলম্বন করিলে বৈদিকসূক্তের যে অর্থ হয়, তাহাতে কাশী কিম্বা এলাহাবাদ পুরুরবার রাজধানী হয় না।

বিক্রমোর্ব্বোশী নাটকের গল্পের মূল, ঋক্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে। ঐ সূক্তে ১৮টি ঋক্ আছে; এবং সমগ্র সূক্তটি একটি জমাট বাঁধা কবিতা। ঋক্‌বেদের আখ্যানটিতে প্রণয়ের পূর্ব্ব ইতিহাস নাই, কেবল প্রেমিকের প্রেম সম্ভাষণ এবং বিরহের কাতরোক্তি আছে। কাজেই পরবর্ত্তী বৈদিকগ্রন্থ এবং পুরাণ অবলম্বন করিয়া ঐ গল্পটির আদি কথা কতদূর পাওয়া যায়, তাহা দেখাইয়া, পরে সমগ্র সূক্তটির বিবরণ লিখিব।

ঐ সূক্তের প্রসঙ্গে বৃহদ্দেবতায় ৭ম অধ্যায়ে আছে, যে পুরাকালে অপ্সরা উর্ব্বশী, রাজর্ষি পুরুরবার সহিত ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবে প্রীতিবদ্ধ হইয়া উভয়ে একসঙ্গে ছিলেন, এইরূপই পাই; পুরাণের অভিশাপের কথা নাই। ইন্দ্র তাহাতে অসূয়াপরবশ হইয়া উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটাইলেন। প্রাচীন "অসূয়া" শব্দটি ঠিক Jealousyর অনুরূপ; এখনও ঐ শব্দটিকে ঐ অর্থে ব্যবহার করিলে ভাল হয়। মিলন ভঙ্গে রাজা উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতে করিতে উর্ব্বশীকে এক সরোবরে তাঁহারই মত সুন্দরী পঞ্চসখী সহ দেখিলেন। রাজার অনুরোধে সে রহিল না; স্বর্গে দেখা হইবে বলিয়া চলিয়া গেল। এই আখ্যানযুক্ত সূক্তকে যাস্ক "সংবাদ" বলেন, এবং শৌনক "ইতিহাস" বলেন। "সংবাদ" অর্থ কথোপকথন বা dialogue, এবং ইতিহাস, গল্প বা story অর্থে ব্যবহৃত।

আখ্যানটি শতপথ ব্রাহ্মণে বিস্তৃতভাবে আছে। এই বর্ণনায় এবং ঋকের ব্যাখ্যায় যে নূতন কএকটি কথা আছে, তাহা গ্রহণ না করিলে ঋক্-বেদের সংক্ষিপ্তকথাসক্ত সূক্তটির অর্থই করা যায় না। কথা কয়েকটি এই:—"উর্ব্বশীর সহিত একত্র বাসের পূর্ব্বে এই সর্ত্ত ছিল, যে রাজা কদাপি উর্ব্বশীকে নগ্নাবস্থায় দেখা দিবেন না। গন্ধর্ব্বেরা যখন দেখিলেন যে, উর্ব্বশী চিরদিনের মত রাজগৃহে রহিল, তখন ইন্দ্রের সাহায্যে এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া, একদিন রাত্রে উর্ব্বশীর দুইটি উরণা (মেষশাবক) হরণ করিল। উরণা চুরি গেল বলিয়া উর্ব্বশী গোল তুলিবা মাত্র রাজা নগ্নাবস্থায়ই উঠিয়া চোর তাড়া করিলেন। অমনি বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠায়, উর্ব্বশী "তংতথা দিবা এবং নগ্নং দদর্শ। ততোহ এব ইয়ং তিরোবভুব।"

শতপথের আদর্শেই হরিবংশ (১০, ২৬), বিষ্ণু পুরাণ (৪, ৬), ভাগবত (৯, ১৪) প্রভৃতিতে গল্পটি লিখিত বটে, কিন্তু অনেক পরিবর্ত্তন আছে। উর্ব্বশীকে দেখিয়া ছিলেন বলিয়া, মিত্র এবং বরুণ হইতে অগস্ত্য বশিষ্ঠের জন্ম হয়; সে কথা বলিয়াছি। ঐ কথার সূত্র ধরিয়া পুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, মিত্র এবং বরুণ উর্ব্বশীকে মনুষ্যভোগ্যা হইবার জন্য শাপ দিয়াছিলেন। উর্ব্বশী সহবাসে রাজার সাতটি পুত্র হইয়াছিল বলিয়া হরিবংশে পাই। প্রাচীনেরা কেবল একটি পুত্রের কথা বলেন। বায়ু পুরাণে ৬টি পুত্রের কথা আছে; এবং বিষ্ণু পুরাণ বায়ুর অনুরূপ। ভাগবতে আবার শত-পথের স্থালী কথায় নূতন বিবরণ দিয়া উর্ব্বশীর উরণীদ্বয়কে যজ্ঞের অরণি করা হইয়াছে। এবং যুগান্তের পর এক রাত্রির মিলনে, "পঞ্চপুত্রোৎপত্তয়ে" উর্ব্বশীর গর্ভধারণের কথা আছে।

যে প্রাচীন বৃহৎকথা অবলম্বনে কাশ্মীরে "কথা-সরিৎসাগর"

রচিত, সেই বৃহৎ কথা এখন পাওয়া যায় না। কথা-সরিৎ-সাগরের আখ্যানে আছে, যে রাজা পুরুরবার স্বর্গ পর্য্যন্ত অপ্রতিহত গতি ছিল। তিনি নন্দন বনে উর্ব্বশীকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন এবং উর্ব্বশীও প্রীতিবদ্ধা হয়। "নারায়ণ" তাহা জানিয়া নারদকে দিয়া ইন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া রাজা এবং উর্ব্বশীর মিলন করাইয়া দেন। পরে একদা ইন্দ্রসভায় উৎসবে পুরুরবা রম্ভার নৃত্যের ক্রটি দেখিয়া হাসিয়াছিলেন। রম্ভা রাগ করিয়া বলিল, "জানে দিব্যংইদংনৃত্যং, কিং ত্বং জানাসি মানব ?" পুরুরবা বলিলেন, যে উর্ব্বশী যখন তাঁহার ঘরে, তখন তিনি নৃত্য জ্ঞানে কেও কেটা নহেন। তখন উর্ব্বশীর সহিত বিচ্ছেদের অভিশাপ হইল। পরে হরির আরাধনায় শাপমুক্ত হইয়া রাজা উর্ব্বশীকে লইয়া ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

নাটকে যে কেশী দৈত্যকর্ত্তৃক উর্ব্বশীহরণের কথা আছে, 'লক্ষ্মীস্বয়ম্বর' নাটক অভিনয়ের সময়ে শাপের কথা আছে, সে সকলগুলিই মৎস্যপুরাণের ২৪ অধ্যায়ে পাই। আমার মনে হয় যে মৎস্যপুরাণের গল্প, কবিকথার অনুরূপ ও পরবর্ত্তী। সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন।

ঋগ্‌বেদের সূক্তটির পদ্যানুবাদ দিতেছি। অমন সুন্দর কবিতার পদ্যানুবাদ করিবার সাহস ধৃষ্টতা বটে; পাঠকগণ এই পদ্যরচনালোলুপ লেখকের সে ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

পুরুরবা ও উর্ব্বশী।

(ঋগ্বেদ ১০ম, ৯৫ সূক্ত।)

১। পুরুরবা—হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে
বচাংসি মিশ্রা কৃণবাবহৈনু।
ন নৌ মন্ত্রা অনুদিদাস এতে
ময়স্করে পরতরে চনাহন্।

(শতপথের ব্যাখ্যা হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে উর্ব্বশীর চলিয়া যাইবার পর দেখা হওয়ায়, এই সংবাদের আরম্ভ। আমাদের পূর্ব্ব সুখের মন্ত্র বা চিন্তায় আমরা সুখী হইতে পারিনা, এইরূপ অর্থ কেবল পূর্ব্ববৃত্তান্ত ধরিলেই করা যায়; নচেৎ শেষ চরণের অর্থ হয় না। বচাংসি…ইত্যাদির অর্থে শতপথে আছে, যে "কি কারণে চলিয়া গেলে, তাহা শুনিব" ইত্যাদি।)

ও গো ও জায়া, প্রীতি কি মায়া
নাহি কি চিত মাঝারে ?
রহ গো তুমি ! কহ গো শুনি
তেজিলে কেন আমারে।
যাপিনু দোঁহে প্রেমের মোহে
কত দিবস যামিনী ;
শুধু সে কথা স্মরিলে ব্যথা
যায় কি, কহ কামিনি !

২। উর্ব্বশী—কিমেতা বাচা কৃণ বা তবাহং
প্রাএতমিষং উষসা মগ্রিয়েব
পুররবঃ পুনরস্তং পরে হি পরে হি
দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি।

সে কথা বলে' হবেকি ? চলে'
গেছি প্রথম উষার প্রায়।
যাও গো ঘরে ; বাতাস ধরে'
কখনো বল রাখা কি যায় ?

৩। পুরু—ইষুর্ণ শ্রিয় ইষুধে রসনা গোষাঃ শতসা ন রং হিঃ।
অবীরে এত তৌ বিদবিদ্যুত ন্নোরান মায়ুং চিতয়স্ত ধুনয়ঃ।

(অনুবাদের অতিরিক্ত কথা শতপথের ব্যাখ্যা অবলম্বনে ; নহিলে বিদ্যুৎ এবং মেষের রবের কথা মিলান যায় না।)

অবীর গণ আসি যখন
হরিল মেষশাবকে,
শুনি সে রুত ছুটিনু দ্রুত
শরের মত পলকে ;
ঘোড়ার প্রায় ছুটিতে হায়
দীপ্ত হ'ল চপলা ;
অমনি মোরে বিরহ ঘোরে
ফেলিয়া গেলে অবলা !

৪ উর্ব্বশী—
সা বসু দধতী শ্বশুরায় বয় উষো যদি বষ্ট্যন্তি গৃহাৎ
অস্তংননক্ষে যস্মিন্ চাকান্দিবা নক্তং শ্নথিতা বৈতসেন।

(উর্ব্বশী যে শ্বশুরকে অর্থ দিয়া এবং জীবন নিরাপদ করাইয়া, রাজাকে লইয়া স্বতন্ত্র থাকিতেন, একথাব পুরাণ

শতপথেও নাই, সায়নের টীকাতেও নাই। শ্নথ, আলিঙ্গন অর্থে।)

ধন বিতরি শ্বশুরে করি
জীবন পথে নিরাপদ,
সুখেতে মাতি দিবস রাতি
ভোগিনু প্রীতি সম্পদ।

৫। ঐ-উর্ব্বশী—

ত্রিঃস্ম মাহ্নঃ শ্নথয়ো বৈতসেনোতস্মমে বাত্যৈপৃণাসি।
পুরুরবোনুতে কেতমায়ং রাজামেবীরতন্বস্তদাসীঃ।

আমারে ঘন আলিঙ্গন
করিতে দিনে তিন বার;
চাহিলে প্রীতি দিতাম নিতি;
দেহের রাজা ছিলে আমার।

৬। পুরুরবা—

যা সুজূর্ণিঃ শ্রেণিঃ সুম্নআপির্হ্রদে চক্ষুর্ণ গ্রন্থিনীচরণ্যুঃ
তা অঞ্জয়ো হরুণয়ো ন সস্রুঃ শ্রিয়েগাবোন ধেনবোহনবন্ত।

(সখীদিগের নামগুলি বড় কটমটে। কোন্ ঘটনা লইয়া এ কথা, তাহা শতপথেও নাই, সায়নেও নাই। এ কি রাজাকে দেখিয়া সরোবর হইতে?)

সখীরা—সুজূর্ণি, শ্রেণি, হ্রদে চক্ষু, আর ধনী
চরণ্যু, গ্রন্থিনী, সুম্নআপি,
লালগাভী সম তারা ভয়েতে হইয়ে সারা
একেবারে পলাইল কাঁপি।

৭। উর্ব্বশী—

সমস্মিন্ জায়মান আসতগ্না উতে মবর্দ্ধন্নদ্যঃ স্বগূর্ত্তা।
মহে যত্বা পুরুরবোরণায়া বর্দ্ধয়ন্ দস্যুহত্যায় দেবাঃ।

(রাজার এই জন্ম কথা,কথা সরিৎ সাগরের বৃত্তান্তে পাওয়া যায়। বৈদিক "গ্না" পরবর্ত্তী যুগের মাতৃকাদলের মত।)

তোমাকে পালিতে নদী ধারা দিল নিরবধি,
দেবীরা সেবিল জন্মক্ষণে;
দস্যু বধ হেতু রণ করিবারে দেবগণ
দেহে বল দিলেন বিজনে।

৮। পুরুরবা—

সচাযদাসু জহতীষ্বৎকম মানুষীষু মানুষো নিষেবে।
অপস্ম মত্তরসন্তী ন ভুজ্যুস্তা অত্রসন্ রথস্পৃশো না শ্বাঃ।

(এই বা কোন্ সময়ের কথা? সখীরা কি পত্নীর মত রাজার গৃহে থাকিতেন? অথবা এই সরোবরেই পলাইবার সময়-কার কথা? রাজা উহাদিগের আলিঙ্গনও চাহিয়া ছিলেন না কি? কাহার আলিঙ্গন, তাহা অনুবাদেও অস্পষ্ট রাখিলাম।

যবে আমি আলিঙ্গন চাহিলাম, সখীগণ
(ভীরু তারা) পলাইল বসন ফেলিয়া।
রথস্পর্শ পেলে গায় অশ্বেরা যেমন ধায়,
তেমনি ত্বরিত গতি গেছিল চলিয়া।

৯। ঐ-পুরুরবা—

যদা সুমর্ত্তো অমৃতাসুনিস্পৃক্সং ক্ষোণীভিঃ ক্রতুভির্ণ পৃংক্তে।
তা আতয়ো ন তন্বঃ শুংভতস্বা অশ্বাসোন ক্রীলয়ে দন্দশানাঃ।

(অমর রমণীরা বহুবচনে আছেন বলিয়া সখীদিগের সহিত রাজার সম্বন্ধ সূচিত হয়।)

অমর কামিনী-সহ (মর আমি) অহরহ
ভালবেসে কহিতাম কথা;
হংসী সম, মনলোভা দেখাইত অঙ্গ-শোভা;
অশ্বক্রীড়া-সম তা'রা তথা
দংশন করিত কত; খেলা হ'ত মনোমত।
স্মরিয়ে জাগিছে মনে ব্যথা।

১০। ঐ-পুরুরবা—

বিদ্যুন্নযাপতন্তী দবিদ্যোৎ ভরন্তী মে অপ্যাকাম্যানি।
জনিষ্টো অপোনর্য্যঃনর্ম্যঃ সুজাতঃ প্রোর্ব্বশী তিরত দীর্ঘমায়ুঃ।

("যা" উর্ব্বশীকে লক্ষ্য করিয়া। অনুবাদে মধ্যমপুরুষই দেওয়া গেল।)

অঙ্গেতে বিদ্যুৎ তব ঝলকিত; আনি' নব
উপহার দিতে মোরে সলিল ছেঁচিয়া।
তব রূপ-নদী-নীর হ'তে আন পুত্র বীর;
হে উর্ব্বশী, দীর্ঘকাল রহগো বাঁচিয়া।

১১। উর্ব্বশী—

জজ্ঞিষ ইৎথা গোপীথ্যায় হি দধাথ তৎপুরুরবো ম ওজঃ
অশাসংত্বাবিদুষী সস্মিন্নহন্ন ম আশৃণোঃ কিমভুগ্ বদাসি।

(পৃথিবীর খাদ্য খাইয়া পুত্র ধারণ ক্ষমতা হইয়াছিল, এবং গমনপূর্ব্বেই গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল, সে কথা উর্ব্বশী বলিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু রাজা শুনিতে পান নাই।)

সে ক্ষমতা আছে স্বামী ; লভেছিনু তাহা আমি
ধরায় গো-দুগ্ধ-পানে মর্ত্ত্যে বাস করি।
সে কথা, যখন যাই, বলেছিনু ; শোনো নাই।
কিবা লাভ আছে আর অন্য কথা স্মরি'।

১২। পুরুরবা—

কদা সূনুঃ পিতরং জাত ইচ্ছাচ্চক্রন্নাশ্রু বর্ত্তয়ৎ বিজানন
কো দম্পতী সমনসাবি যুযোদধ যদগ্নিঃ শ্বশুরেষুদীদয়ৎ

বল শুনি, কোথা কবে জনমিয়া পুত্র, তবে
কাঁদিয়া খুঁজিয়া কাছে আসিবে আমার ?
তুমি আমি দূরে দূরে রতি যদি, গৃহপুরে
কেমনে হইবে যজ্ঞ আমার পিতার ?

১৩। উর্ব্বশী—

প্রতি ব্রবাণি বর্ত্তয়তে অশ্রু চক্রন্ন ক্রন্দদাধ্যে শিবায়ৈ
প্রতত্তে হিনবা যত্তে অস্মে পরেহ্যস্তংনহিমুর মাপঃ।

কাঁদিলে সান্ত্বনা দিব, অশ্রুজল মুছাইব,
সাধিব মঙ্গল তা'র, করিব যতন।
পাবে তুমি পুত্র তব, আমি কাছে নাহি রব ;
বৃথা আশা তেজি' গৃহে কর গো গমন।

১৪। পুরুরবা—

সুদেবো অদ্য প্রপতে দনাবৃৎ পরাবতং পরমাং গন্তবা উ
অধা শয়ীত নিঋতে রুপস্থেহধৈনং বৃকারভসাসো অদ্যুঃ।

(নিঋতি অর্থ ধ্বংস, সুদেব অর্থ প্রিয়দেব বা প্রিয়পাত্র বা প্রণয়ী।)

প্রণয়ী তোমার, প্রিয়ে, থাকিবে কি গৃহে গিয়ে ?
যাব দূর দেশে চলি, ফিরিব না আর।
রহিব কিসের সুখে ? শয্যা নিব ধ্বংস বুকে ;
দেহ মম হিংস্র বৃকে করিবে আহার।

১৫। উর্ব্বশী—

পুরুরবো, মামৃথা ; মাপ্রপপ্তো, মাত্বা বৃকানো অশিবান্ উক্ষন্।
ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি, সালাবৃকানাং হৃদয়ানি এতা।

(এই সুমধুর করুণ ভাব, এই আত্মনিন্দার মূলের বেদনাটুকু অনুবাদে ফুটানো অসম্ভব।)

পুরুরবা মরিওনা, দেহপাত করিওনা,
বৃকভোগ্য করি নাশ কোরোনা তনুর।
রমণীর প্রাণ মাঝে প্রেম প্রীতি কোথা আছে ?
বাঘিনীর মত তার পরাণ নিষ্ঠুর।

১৬। ঐ উর্ব্বশী—

যদ্বিরুপাচরং মর্ত্তেষবসং রাত্রীঃ শরদশ্চতস্রঃ
ঘৃতস্যস্তোকং সকৃদহ্ন আশ্নাং তাদেবেদং তাতৃপাণা চরামি।

(উর্ব্বশী পৃথিবীতে থাকিবার সময় কেবল ঘৃত খাইতেন ; এখনো তিনি সংযতা আছেন বলিলেন। উহার অর্থ বড় চমৎকার। উর্ব্বশীকে তখন স্বর্গে আর কোন দেবভোগ্যা কল্পনা করা যায় না।)

ধরার নারীর রূপ ধরি যবে ছিনু ভূপ,
চারিটি শরৎ ভরি ভোগিলাম নিশি,
করি শুধু ঘৃত পান ছিনু আমি; এবে প্রাণ
তেমনি ধারণ করি, জেনো রাজঋষি।

১৭। পুরুরবা—

অন্তরিক্ষ প্রাংরজসো বিমাজীমুপ শিক্ষাং উর্ব্বশীং বশিষ্ঠঃ
উপত্বা রাতিঃ সুকৃতস্য তিষ্ঠান্নি বর্ত্তস্ব হৃদয়ং তপ্যতে মে।

অন্তরীক্ষে আছ প্রিয়ে, আমি পূত প্রেম দিয়ে
ডাকি গো তোমারে, আসি হও গো উদয়।
প্রীতি দত্ত উপহার লহ প্রিয়ে, একবার
এস কাছে, আজি মোর জ্বলিছে হৃদয়।

১৮। উর্ব্বশী—

ইতিত্বা দেবা ইম আহুঃ "ঐল, যথেমেতৎ ভবসি মৃত্যুবন্ধুঃ
প্রজাতে দেবান্ হবিষা যজাতি, স্বর্গউ ত্বমপি মাদয়াসে।

ঐ শোনো, যে বচন কহিছেন দেবগণ,
"মরণের পরে ঐল, তোমার সন্ততি
যজ্ঞে দেবগণে নিত্য করিবেন পরিতৃপ্ত ;
স্বর্গ ভোগ হবে তব, পাবে মোরে পতি।"

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

পেকিং রাজপুরী *

কিছু দিন হইল মিস্ ক্যাথারিণ কার্‌ল (Miss Katharine Carl) নামক একজন আমেরিকান মহিলা "With the

* চীনারা পেকিং কে "পে-চিন" বলে। পে অর্থ উত্তর, এবং চিন অর্থ নগর বা রাজধানী—অর্থাৎ "উত্তর রাজধানী।"

Empress Dowager of China" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত চিত্রকর। তিনি বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞীর কএকখানি তৈল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহার একখানি চিত্র আমেরিকার সেণ্ট লুইস্ প্রদর্শনীতে প্রদর্শনার্থ প্রেরিত হইয়াছিল।



চীনা পোষাকপরা কুমারী কার্ল্।

পেকিনস্থ আমেরিকান রাজদূত ও তদীয় পত্নীর সাহায্যে মিস্ কারল্ পেকিন রাজপুরীতে প্রবেশাধিকার ও চিত্রাঙ্কনের ভার প্রাপ্ত হইয়া কিছু দিন রাজপুরীতেই বাস করিয়াছিলেন। এই সুযোগে রাজপুরীর যে যে প্রকৃত বিষয় সকল তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছিলেন, সেই সকল তথ্য যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থ দ্বারা সম্রাট্, সম্রাজ্ঞী ও রাজপুরীর অন্যান্য বিষয়সম্পর্কীয় যে সকল অলীক প্রবাদ বিদেশীগণ মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, তিনি তাহা খণ্ডন করিয়াছেন।

মিস্ কারল ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে চীন রাজপুরী-সম্বন্ধীয় কোন কথা প্রকাশ করা চীনাদিগের জাতীয় রীতি-বিরুদ্ধ, সুতরাং ইহা প্রকাশ করিলে রাজপুরীতে তিনি যে সমাদর ও আতিথিসৎকার ভোগ করিয়াছেন তাহার বিপরীত কার্য্য হইবে; কিন্তু তিনি দেশে ফিরিয়া গেলে আমেরিকার ও ইংলণ্ডের অনেক সংবাদ পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে নানা মিথ্যা কথা সকল প্রচারিত হইতে লাগিল। লোকের সেই সকল ভ্রম দূর করিবার মানসে নাকি তিনি, চীনার নিয়ম বিরুদ্ধ হইলেও এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

আমার স্বদেশবাসীর জ্ঞাতার্থে মিস্ কারলের গ্রন্থ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আমার নিজের যে যৎসামান্য অভিজ্ঞতা আছে তাহা ও অন্যান্য ইয়ুরোপীয়গণের নিকট যাহা যাহা অনুসন্ধানে অবগত হইতে পারিয়াছি তাহা অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। কারণ পেকিন রাজপুরীর প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া আমার পক্ষে কেন, যে সকল ইয়ুরোপীয় নরনারীগণ বহু বৎসর যাবৎ পেকিনে বাস করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষেও সম্ভবপর নহে।

রাজপ্রাসাদ।

(Palace of the forbidden City).

চীন সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান রাজবংশের তিনটী স্বতন্ত্র আবাস আছে। যথা (১) শীতাবাস, (২) গ্রীষ্মাবাস ও (৩) সাগরাবাস।* সম্রাট্ ও বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী যখন যে আবাসে বাস করেন তাঁহাদের রাজকীয় কার্য্যাদি তথায়ই সম্পন্ন করিয়া থাকেন; যেমন আমাদিগের দেশের শিমলা, দারজিলিং ইত্যাদি।

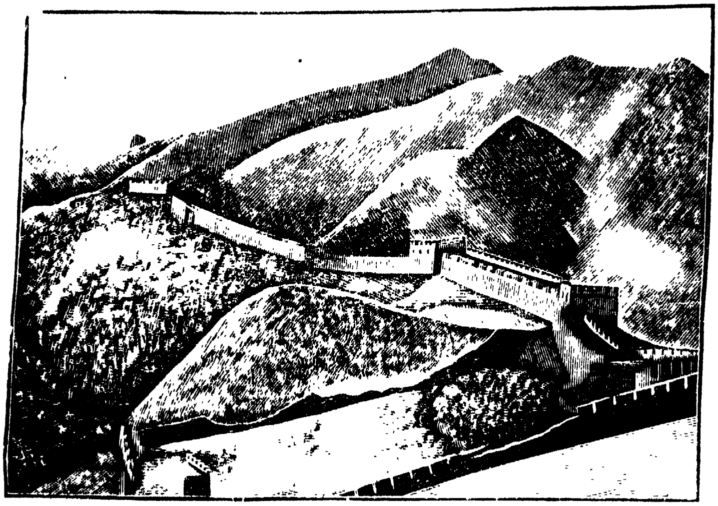
১। শীতাবাস।

রাজকীয় শীতাবাস খাস পেকিং সহরে। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীগণ বৎসরে প্রায় তিন চারি মাস যাবত এই প্রাসাদে বাস করিয়া থাকেন। "সমস্ত পেকিন নগর, পর পর তিনটী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। যথা চীনা প্রাচীর, তাতার প্রাচীর এবং মাঞ্চু রাজপুরীবেষ্টিত প্রাচীর। সর্ব্বমধ্যে রাজপুরী-বেষ্টিত প্রাচীর এবং সর্ব্ব বহির্ভাগে চীনা প্রাচীর। রাজকীয় শীতাবাস সেই সর্ব্ব মধ্যস্থ প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে।"

উপরস্থ উদ্ধৃত অংশে মিস্ কারলের পুস্তকানুযায়ী লিখিত হইল, কিন্তু ঐ কথা সত্য নহে। এখানকার বর্ত্তমান কাষ্টম বিভাগের কমিশনার মিঃ মেজ্ বহুদিন যাবত পেকিনে বাস করিয়াছিলেন, পেকিন নগরের একখানি মানচিত্র আমাকে দেখাইলেন। তাহাতে চীনা প্রাচীর বেষ্টিত নগরের যে অংশ তাহা তাতার ও মাঞ্চু প্রাচীর বেষ্টিত নগরের বাহিরে ও দক্ষিণে, কিন্তু তাতার প্রাচীর বেষ্টিত নগরের দক্ষিণের প্রাচীরই চীনা প্রাচীর বেষ্টিত নগরের উত্তর প্রাচীর রূপে পরিণত হইয়াছে।

রাজপুরীবেষ্টিত প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে পরিখা। এই পরিখার উপর শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরময় সেতুসকল আছে। তাহার কোনটী অতিক্রম করিলেই নগর প্রাচীর ও তাহার প্রধান দরজা দৃষ্ট হয়। পরিখা পার হইয়া এক উন্নত রাস্তা অবলম্বনপূর্ব্বক যাইলে কোল হিল্ বা কয়লা পর্ব্বতের পাদদেশে 'মাঞ্চু' সৈন্যাবাসের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়। এই স্থানেই প্রাচীরের প্রধান এক দরজা। রাজপুরীর সর্ব্ব-

* (1) Winter Palace, (2) Summer Palace & (3) Sea-Palace.



বৃহৎ চীন প্রাচীরের এক অংশ।

মণ্ডিত বেদীর উপর প্রাচীন কালীয় একখানি সিংহাসন। তাহার পার্শ্বে লাক্ষামণ্ডিত একখানি ক্ষুদ্র টুল।

এই উৎকৃষ্ট প্রকাণ্ড কক্ষের বাম ও দক্ষিণ কক্ষে প্রবেশ করিবার অতি বৃহৎ বৃহৎ দরজা সকল আছে। সেই দরজার পাল্লাসকল স্বর্ণ কার্য্যখচিত নানা মূর্ত্তির (dragoon) প্রতিকৃতিযুক্ত। এই দরজাসকল মুক্ত করিয়া তাহাতে সাটিননির্ম্মিত পরদা সকল ঝুলাইয়া রাখা হয়। এই কক্ষের সম্মুখ ও পশ্চাদংশ প্রায় কাচমণ্ডিত। কক্ষের ছাদটী উচ্চ স্তম্ভের উপর স্থাপিত। জানালাগুলির নিম্নার্দ্ধ কাচমণ্ডিত এবং উপরার্দ্ধ কোরিয়া দেশীয় কাগজমণ্ডিত।

প্রধান দরজা অতিক্রম করিয়া, উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত আরো কতকগুলি দরজা পার হইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্রমে ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। এই সকল ভিতরের উচ্চ প্রাচীরের পার্শ্ব দিয়া দুই ধারে সৈন্য বা প্রহরিগণের জন্য কাষ্ঠনির্ম্মিত দীর্ঘ বারাক সকল আছে। এই বারাক সকলের মেজে পাকা শাণ করা। উত্তরদেশীয় চীনারা এই মেজের উপর শয়ন করিয়া থাকে। এই মেজের নিম্নে অগ্নিকুণ্ড করিবার জন্য গহ্বর সকল আছে। শীতকালে বিছানার নিম্নে অগ্নিকুণ্ড থাকায় গরিব সৈন্যগণের আচ্ছাদন বস্ত্রের অনেক সহায়তা করিয়া থাকে।

উপর্য্যুপরি দরজা সকল অতিক্রম করিয়া গেলে একটী শ্বেত প্রস্তরমণ্ডিত আঙ্গিনা অতিক্রম করিতে হয়। সর্ব্বশেষে এক বৃহৎ আঙ্গিনায় উপস্থিত হইতে হয়। সেই আঙ্গিনার প্রাচীর উচ্চ এবং তাহার গাত্রে বড় বড় দরজা সকল আছে। এই আঙ্গিনার সম্মুখে বৃদ্ধারাণীর সিংহাসন গৃহ। এই আঙ্গিনাবেষ্টনকারী সুরম্য প্রাচীর সকল নানা কারুকার্য্যে শোভিত এবং বহু প্রকার চিত্রে রঞ্জিত। সিংহাসন গৃহের মধ্য কক্ষের দরজাটী এত বড় যে যখন তাহা মুক্ত থাকে তখন তাহার পাল্লা সকল ভাঁজে ভাঁজে রাখিতে হয়। এই গৃহের বারান্দা অন্যান্য প্রাসাদের বারান্দা সকল হইতে স্বতন্ত্র ধরণে নির্ম্মিত।

সিংহাসন কক্ষের নির্ম্মাণকৌশল, শিল্পকার্য্য, সুরুচির পরিচয় ও চিত্তহারিত্ব নাকি অন্যান্য প্রাসাদ বা চীনদেশের অন্যান্য স্থানের অট্টালিকা সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই কক্ষের মেজে কৃষ্ণ বর্ণের মর্ম্মর প্রস্তরনির্ম্মিত, তাহা এত পালিশ ও চিক্কণ যে তাহাতে প্রাচীর ও ছাদের অভ্যন্তর পৃষ্ঠের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। মধ্যস্থলে একটী অনুচ্চ বেদী, তাহা মূল্যবান গালিচা দ্বারা মণ্ডিত। সেই গালিচা-

এই কক্ষের দক্ষিণের পার্শ্বস্থ কক্ষে বৃদ্ধারাণীর বৈঠকখানা। এই কক্ষের সম্মুখে বারান্দা। ইহার কাচনির্ম্মিত জানালা সকল দ্বারা সূর্য্যের আলো প্রবেশ করিয়া ভিতরস্থ কাচ সকলে প্রতিফলিত হইয়া ঝিক্‌মিক্ করিতে থাকে। বারান্দা ও কক্ষের ভিতরে ও বাহিরের নানাবিধ প্রস্ফুটিত পুষ্পবৃক্ষ, পুষ্পবৃক্ষ সকল আধারে রক্ষিত হইয়া কক্ষটী যেন নন্দন কাননে পরিণত করিয়াছে। মূল্যবান পট্টবস্ত্রাচ্ছাদিত আসন সকল, কাষ্ঠফলকে স্তরে স্তরে স্তম্ভাকৃতি রক্ষিত বহুবিধ সুরস ফল সকল, বহুবিধ সুগন্ধি দ্রব্য সকল, প্রাচীর গাত্রে নানা চিত্র সকল ও পূর্ব্বোক্ত প্রস্ফুটিত পুষ্প সকল বৃদ্ধারাণীর নারীসুলভ কোমল প্রকৃতির সমবায়ে বাস্তবিকই তাহার বৈঠকখানা কক্ষটাকে যেন একটী অপ্সরাপুরীতে পরিণত করিয়াছে। তিনি মুক্ত বায়ু, পুষ্পসৌন্দর্য্য ও সূর্য্যের আলো অত্যন্ত ভাল বাসেন।

সিংহাসন গৃহের এক কক্ষ ক্ষুদ্র একটী দেব মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। সেই কক্ষে বুদ্ধদেবের ক্ষুদ্র একটী মূর্ত্তি স্থাপিত, এবং সেই মূর্ত্তির পশ্চাতে প্রাচীরগাত্রে বুদ্ধদেবের মাতার একটী ছবি রক্ষিত আছে। এই বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে অহরহ ধুপ ও দশাং জ্বলিতে থাকে।

রাণীর বৈঠকখানাগৃহের পশ্চাতের অংশ দ্বিতল বিশিষ্ট। এক গুপ্ত সিঁড়ি দ্বারা তাহাতে যাইতে হয়। এই কক্ষের দ্বিতলাংশের নিম্নে একখানি পালঙ্ক আছে, তাহাতে রাণী দিনেরবেলায় অল্প কালের জন্য নিদ্রা গিয়া থাকেন। কক্ষের সেগুন কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাচীর গাত্রে নানা জীবজন্তুর প্রতিকৃতি খোদিত ও রঞ্জিত হইয়া শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রাচীরগাত্রে বহুবিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ধরণের বড় বড় ঘড়ি সকল রক্ষিত হইয়াছে।

এই বৈঠকখানাগৃহের প্রাচীরে লৌহফলকে খোদিত

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি, আর একখানিতে মহারাণীর স্বামী পুত্রগণ সহ আর এক প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। শুনিতে পাওয়া যায় যে বৃদ্ধারাণী মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে অতি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। উভয়ের রাজত্বকাল মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্যও লক্ষিত হয়। উভয়েই বিধবা, উভয়েই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ন্যায় ইঁহারও নাকি বাসনা যে ইঁনিও ততদিন জীবিত থাকিয়া রাজ্যশাসন করিবেন।

রাণীর শয়নকক্ষের গুপ্ত সিঁড়ি দ্বারা উপরে গেলে তাহার নিজের ভজনালয় দৃষ্ট হয়। এই ভজনালয়ে এক বেদীর উপর স্বর্ণনির্ম্মিত এক বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। তাহার সম্মুখে স্বর্ণময় বর্ত্তিকাদণ্ডে (Candle Stick) অহরহ বাতি জ্বলিতেছে। সেই বর্ত্তিকাদণ্ডসকল নানা মূল্যবান প্রস্তরে খচিত। সুরঞ্জিত পুষ্পাধারে মণি-মুক্তা-খচিত কৃত্রিম পুষ্প সকল শোভা পাইতেছে। মন্দিরটীর মেজে রাজকীয় পীতবর্ণের পটবস্ত্রাচ্ছাদিত এবং ইহার প্রাচীরগাত্রে নানা সাধু, যোগী সন্ন্যাসীগণের প্রতিকৃতি রক্ষিত হইয়া স্থানটী যেন এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যপূর্ণ করিয়াছে। বিশেষ কোন পর্ব্ব উপলক্ষে লামাগণ আসিয়া নাকি এখানে পূজাদি করিয়া থাকেন।

এই মন্দিরটীর জানালা বিশেষ ধরণে নির্ম্মিত। জানালা সকলে বিবিধপ্রকার কড়ি ও শঙ্খের খণ্ড সকল শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে স্তরে স্তরে সংবদ্ধ রহিয়াছে। সেই জানালা হইতে মন্দীভূত আলো কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণময় বুদ্ধমূর্ত্তি, এবং লাল ও স্বর্ণবর্ণের পরিচ্ছদধারী সাধু সন্ন্যাসীগণের মূর্ত্তির উপর প্রতিফলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া থাকে। এই ভজনকক্ষটী বৃদ্ধারাণীর অতি প্রিয় স্থান। তিনি নির্জ্জনে এখানে আসিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন।

বৃদ্ধারাণীর অন্তঃপুরবেষ্টিত প্রাচীরের উত্তর প্রান্তে যে তিনটী বড় বড় গৃহ লক্ষিত হয়, তাহার প্রথমটীতে বৃদ্ধা মহারাণীর আর একখানি সিংহাসন স্থাপিত। এই গৃহের ভিত্তি ৮ ফুট উচ্চ মার্ব্বল প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত। এই উচ্চ ভিত্তির উপর নিজের সিংহাসন গৃহ নির্ম্মিত। ইহার ধাপ সকলের ঠিক মধ্যে প্রকাণ্ড একখানি মর্ম্মর প্রস্তরের খোদিত জোড়া নাগমূর্ত্তি Double dragon)। এই প্রস্তরখণ্ডের উপর এমন ভাবে শিল্পনৈপুণ্য দ্বারা নাগ-মূর্ত্তিদ্বয় খোদিত ও রঞ্জিত হইয়াছে যে দূর হইতে দেখা যায় যেন সিঁড়ির উপর একখানা গালচা পাতিত রহিয়াছে। এই নাগমূর্ত্তি পদদ্বারা স্পর্শ করিবার নিয়ম নাই। উপরে যাইতে হইলে তাহার উভয় পার্শ্ব হইয়া যাইতে হয়। সম্রাজ্ঞীর অন্তঃপুরস্থ তিন কক্ষের মধ্যে এই গৃহটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই গৃহটীর মধ্যস্থল ৫০ ফুট উচ্চ, চতুর্দ্দিকে বারান্দা বেষ্টিত,



গ্রীষ্মবসনপরিহিতা মর্য্যাদায় দ্বিতীয় স্থানীয়া চীনের রাণী।

এবং প্রাচীর কাষ্ঠময়। তাহা নানা কারুকার্য্য-খচিত। মধ্য কক্ষে সিংহাসন ও বেদী স্থাপিত। সিংহাসনের সম্মুখে একটী বেদীর উপর প্রকাণ্ড এক জেড প্রস্তরে খোদিত জলাধার। গ্রীষ্মকালে কক্ষটী শীতল রাখিবার জন্য এই মূল্যবান আধারে জল রক্ষিত হইয়া থাকে। মহারাণী ভিক্টোরিয়াপ্রেরিত একটী বাদ্যযন্ত্র এবং ইউরোপীয় অন্যান্য রাজগণপ্রেরিত নানাবিধ উপহারদ্রব্য এই সিংহাসন-কক্ষের প্রাচীরগাত্রে ও চতুষ্পার্শ্বে শোভা পাইতেছে। সিংহাসনকক্ষের দক্ষিণদিকের কক্ষসকল সম্রাট নিজে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সম্রাট এই কক্ষসকলের একটী হইতে নিকটবর্ত্তী নাট্যশালায় নাট্যাভিনয় দর্শন করিয়া থাকেন। এই সিংহাসনকক্ষের বামপার্শ্বের কক্ষে বৃদ্ধা মহারাণীর শয়নাগার। ইহার নিকট ৫ ফুট উচ্চ একখণ্ড মূল্যবান জেড প্রস্তর দৃষ্ট হয়, তাহা খনি হইতে কি ভাবে প্রস্তর উত্তোলিত হইয়া থাকে, তাহার দৃশ্য ব্যক্ত করিতেছে। এই সিংহাসনকক্ষের অপর প্রান্ত হইতে অন্যান্য গৃহ সকল দৃষ্ট হয়। সম্রাটের গৃহসকল হইতে বৃদ্ধারাণীর গৃহসকল এক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত। সম্রাটের প্রাসাদ সকল এই সকল হইতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ও জাঁকজমকশালী। রাজকীয় দরবারগৃহ সম্রাটের শীতাবাসের প্রাসাদের সীমার মধ্যে, কিন্তু সম্রাজ্ঞীর প্রাসাদ-সীমার মধ্যে রাজকীয় নাট্যশালা। শীতাবাসের প্রাসাদে রাজ্যের অধিকাংশ রাজকার্য্য সম্রাট স্বয়ং নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, কিন্তু গ্রীষ্মাবাসে তাহার বিপরীত। গ্রীষ্মাবাসে বৃদ্ধারাণীকেই অধিকাংশ রাজকার্য্যে প্রভুত্ব করিতে দেখা যায়।

২। গ্রীষ্মাবাস।

পেকিন রাজধানীর শীতাবাস পরিত্যাগ করিয়া গ্রীষ্মাবাসে যাইতে গাড়িতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে। পেকিন নগর পরিত্যাগ করিয়া উর্ব্বরা শস্যক্ষেত্র ও মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যময় প্রান্তরসকল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। পর্ব্বতের পাদদেশে সুদূরে রাজকীয় গ্রীষ্মাবাস স্থাপিত। দেড় ঘণ্টা পথ অতিক্রম করিলে এক প্রসিদ্ধ জনপদে উপস্থিত হইতে হয়। তাহার পর পীতবর্ণে রঞ্জিত লামা ধর্ম্ম-মন্দিরসকলের ধ্বংশাবশেষ ও ক্রমে রাজবংশীয় অপর আভিজাতবর্গের প্রাচীরবেষ্টিত প্রাসাদসকল দু'ধারে অতিক্রম করিয়া রাজকীয় গ্রীষ্মাবাস স্পষ্টভাবে নয়নপথে পতিত হয়। রাজকীয় গ্রীষ্মাবাসের নিকটস্থ শৈলশ্রেণী, হ্রদ, ফল-পুষ্পোদ্যান, উপত্যকা ও পরিখাদির একত্র সমবায়ে দৃশ্যটী বাস্তবিকই মনোহারী। পীতবর্ণের টালিযুক্ত লালবর্ণের প্রাচীরসকল, সবুজবর্ণের গৃহছাদসকল, পত্রপুষ্পবেষ্টিত প্রাসাদসকল অতি মনোমুগ্ধকারী দৃশ্য তাহার কোন সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দিকে মঠ ও মন্দিরে বেষ্টিত অসংখ্য খিলান দরজাসম্বলিত রাজপুরী নিজেই যেন একটী নগরে পরিণত হইয়া রহিয়াছে।



জ্যেষ্ঠা ও অপর দুইজন রাজকুমারী।

রাজপুরীস্থ প্রধান প্রবেশদ্বারে শত শত অন্ধ, আতুর ও খঞ্জ প্রভৃতি ভিক্ষুকগণ ভিক্ষালব্ধ অর্থ প্রয়াসে অপেক্ষা করিতেছে। রাজপুরীতে প্রবেশকারী শত সহস্র রাজারাজড়া ও আভিজাতবর্গ হইতে অর্থ যাচ্ঞা করিয়া ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। রাজকীয় "ফরেন আফিস্" (Wai wupu) গ্রীষ্মাবাস হইতে ১৬ মাইল দূরে, খাস পেকিনে স্থাপিত, কিন্তু সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী যখন গ্রীষ্মাবাসে বাস করেন তখন সেই ফরেন আফিস তথায় স্থানান্তরিত হইয়া থাকে।



প্রিন্স্ চিং।

রাজপ্রাসাদের বহিঃপ্রাচীরের সদর দরজা অতিক্রম করিলেই ফরেন আফিস, তাহা অতিক্রম করিলেই কিছু দূরে রাজপুরী প্রবেশের দরজা। এই দরজা অতিক্রম করিয়া গেলে ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি আঙ্গিনা পার হইয়া অবশেষে এক বৃহৎ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে হয়। এই প্রাঙ্গণটী নানাপ্রকার পত্র পুষ্প বৃক্ষের দ্বারা শোভিত। এই আঙ্গিনা হইতে সম্মুখে কাচময় দরজাযুক্ত রাজপ্রাসাদ দৃষ্ট হয়, তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লিখিত আছে "শো" অর্থাৎ "দীর্ঘজীবন"। এই প্রাসাদে প্রবেশ করিলেই বৃদ্ধারাণীর সিংহাসনকক্ষ। গ্রীষ্মাবাসের নির্ম্মাণপ্রণালী ধনী চীনাদের গৃহ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণপ্রণালীর ন্যায়। এই সকল গৃহ প্রায় ৮ ফুট উচ্চ প্রস্তরময় ভিত্তির উপর নির্ম্মিত। গৃহগুলির উভয় প্রান্তই বারান্দাযুক্ত, কাঠের বেড়া, টালি বা খাপরার ছাউনি এবং কাঠের খুঁটিযুক্ত।

পেকিং রাজপুরি।

রাজপ্রাসাদের কক্ষের মেজেগুলি শ্বেত মার্ব্বল প্রস্তরমণ্ডিত। কাষ্ঠময় বেড়াগুলিতে নানা জীবজন্তুর প্রতিকৃতি খোদিত এবং শিল্পনৈপুণ্যের সহিত রঞ্জিত। প্রাসাদপ্রাঙ্গণ নানা পত্র পুষ্প বৃক্ষ সকল দ্বারা শোভিত। গবাক্ষগুলি শীতাবাসের কক্ষের ন্যায় নিম্নার্দ্ধ কাচ এবং উপরার্দ্ধ কাগজমণ্ডিত। কক্ষপ্রাচীর-গাত্রে রেশমী বস্ত্রে চিত্রিত নানা ছবি ও কাগজে প্রাচীন ভাষা হইতে ধর্ম্মকথা সকল লিখিত হইয়া মান-

চন্দ্রাকৃতিরূপে দোদুল্যমান রহিয়াছে। রেশমী বস্ত্রাচ্ছাদিত গদিযুক্ত আসন সকল অতি উপাদেয় এবং আরাম দায়ী।

রাজপ্রাসাদের সীমার মধ্যেই রাজকীয় নাট্যশালা। একটী প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া গেলেই নাট্যশালা দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টেজ ঘরের সম্মুখে সম্রাট, সম্রাজ্ঞী ও অন্যান্য মহিলাগণের বসিবার জন্য অতি উচ্চ সুন্দর একটী প্রাসাদ আছে। সেই রাজকীয় নাট্যদর্শন-মন্দিরের উভয় পার্শ্বে অপর গৃহে উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণের এবং রাজবংশের অন্যান্য পুরুষগণের বসিবার স্থান। এই সকল উচ্চ কর্ম্মচারী ও আভিজাতবর্গের আসন মেজেতে গালিচার উপর। কারণ সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীগণের সম্মুখে অপর কাহারও কোন উচ্চাসনে বা কেদারায় বসিবার আদেশ নাই। সুতরাং তাঁহারা গালিচার ফরাসে বসিয়া অভিনয় দেখিতে বাধ্য হন।



চীনের বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী।

বৃদ্ধা মহারাণী সিংহাসনকক্ষে রাজকীয় কার্য্যাদি করিয়া থাকেন এবং এই কক্ষেই বিদেশী দূতগণের বা বিদেশী মহিলাগণের অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। এই সিংহাসনকক্ষটী অতি উচ্চ, ইহার ছাদ কাষ্ঠময় খুঁটীর উপর স্থাপিত। ইহার গবাক্ষ সকলও পূর্ব্ববর্ণিত ভাবে নির্ম্মিত। দুই দিকে জানালা এবং তাহার মধ্যস্থলে ছাদ পর্য্যন্ত উচ্চ কাচময় প্রকাণ্ড দরজাসকল। সিংহাসনকক্ষের প্রাচীর গাত্রে মহারাণীর প্রিয়তম কবিগণের রচিত কবিতাযুক্ত মানচিত্রাকৃতি পট সকল ঝুলান রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন রেশমী বস্ত্রে লিখিত নানা পদ্য সকল প্রাচীর গাত্রে শোভা পাইতেছে। এই সকল কবিতাগুলির কোন কোনটী কোন পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীগণের রচনা, কোন কোনটী বা বৃদ্ধারাণীর নামে উৎসর্গীকৃত কবিতা। জানালাগুলির পার্শ্বদেশ উৎকৃষ্ট নীলবর্ণের পট্টবস্ত্র নির্ম্মিত পরদাচ্ছাদিত। এই বর্ণটী সম্রাজ্ঞীর প্রিয় জিনিষ। রাজকীয় কার্য্যসংক্রান্ত দ্রব্য ও চিত্রগুলি পীতবর্ণের, তাহা ভিন্ন সমস্তই নীল বর্ণের।

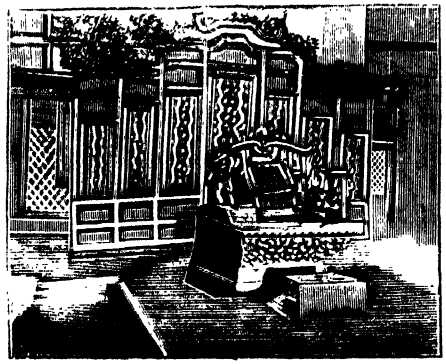
সিংহাসনকক্ষের দক্ষিণে ভিতরে ক্ষুদ্র একটী দেবমন্দির। এই মন্দিরমধ্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ধ্যানে মগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তি। এই মন্দিরটী নানা পুষ্প ও সুগন্ধিদ্রব্যের সমবায়ে চিত্তহারী। দেবমূর্ত্তির সম্মুখে বেদীর উপর ধূপাদি স্থাপিত। তাহাতে অহোরাত্র ধূপ ধূনা জ্বলিতেছে। সিংহাসনকক্ষের বাম দিকের কক্ষে মহারাণীর শয়নাগার। এই শয়নকক্ষের পশ্চাদভাগে একটী স্বতন্ত্র কক্ষে মহারাণীর পরিচারিকাগণের অবস্থান করিবার স্থান। সিংহাসনকক্ষের পশ্চাতে পাঁচপাখা (Five-winged) সেগুন কাষ্ঠনির্ম্মিত একটী উৎকৃষ্ট পরদা, তাহাতে নানা মূল্যবান প্রস্তর সকল সংবদ্ধ থাকিয়া তাহার সৌন্দর্য্য ও মূল্য অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। এই পরদার সম্মুখে আরাম কেদারার ন্যায় একখানি আসন। সম্রাজ্ঞী বা সম্রাট দরবারাদি রাজকার্য্য করিতে করিতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তখন ইহাতে আসিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন। বৃদ্ধা মহারাণী কোন রাজকার্য্য সম্পন্ন করিবার সময় ঠিক সোজাভাবে সর্ব্বদাই উপবেশন করিয়া থাকেন, তিনি কখনও হেলিয়া বা ঢলিয়া আপনার ক্লান্তির চিহ্ন প্রকাশ করেন না। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এই প্রকার আরামদায়ী আসন বিশেষ প্রয়োজন হয় বলিয়া বোধ হয় না।

রাজবংশের প্রাচীন সিংহাসন অতি ভারি, তাহা সর্ব্বপ্রধান দরবারগৃহে রক্ষিত। এই দরবারগৃহে এবং অন্যান্য প্রাসাদে তিনি অপেক্ষাকৃত হাল্কা ধরণের রাজাসন সকল স্থাপিত করিয়াছেন। এই আসন গুলি বৃত্তাকার, সেগুন কাষ্ঠনির্ম্মিত, রাজকীয় পীতবর্ণের পট্টবস্ত্রাচ্ছাদিত গদিযুক্ত। রাজাসনের উভয় পার্শ্বে ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত প্রকাণ্ড পাখা সকল রক্ষিত আছে।* সিংহাসনের পার্শ্বে কাষ্ঠফলকোপরি স্তরে স্তরে নানাবিধ রসাল ফলসকল স্তূপাকৃতি ভাবে রক্ষিত। তাহার পার্শ্বে বড় পুষ্পাধারে (vases) নানা প্রকার পুষ্পসকল রক্ষিত। এই বহুবিধ প্রস্ফুটিত পুষ্প-

* আমাদিগের দেশেও এই প্রকার পাখার চলন আছে।



একটি সিংহাসন।



একটি সিংহাসন।

সকলের সৌরভে কক্ষটী আমোদিত করিয়া থাকে। এই সকল ভিন্ন কক্ষ মধ্যে পঁচাশি প্রকার বড় বড় ঘড়ি সকল রক্ষিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছে, কেননা চীনারা ঘড়ির বড় অনুরাগী। কোন কোন ঘড়ি স্বর্ণমণ্ডিত, কোন কোনটাতে কুক্কুটমূর্ত্তি স্থাপিত, ঘণ্টা বাজিবার সময় কুক্কুট ধ্বনি করিয়া থাকে। কোন কোন ঘড়ি হইতে ঘণ্টা বাজিবার কালে জলধারা পতিত হইতে থাকে। কোন কোন ঘড়িতে বাদ্যযন্ত্র সংলগ্ন, কোন কোন ঘড়ির ঘণ্টা বাজিবার সময় এক মিছিল বাহির হইয়া থাকে। এই সকল ভিন্ন ও অন্যান্য নানাবিধ বিদেশীদ্রব্যে সিংহাসনকক্ষটি সুশোভিত। কিন্তু ঘড়ি ভিন্ন অন্যান্য বিদেশীদ্রব্যের প্রতি বৃদ্ধারাণীর বিশেষ আগ্রহ আছে বলিয়া বোধ হয় না। এই সকল বিদেশীদ্রব্যের অধিকাংশই বিদেশগামী চীনকর্ম্মচারিগণ প্রদত্ত উপহার।

এই গ্রীষ্মাবাসের মধ্যে প্রিন্স্ চুনের বাসস্থান। তিনি বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা ছিলেন, তাঁহাকে সচরাচর লোকে সপ্তম কুমার (Seventh Prince) বলিয়া জানিত। এই সপ্তম কুমারের প্রাসাদটীও অতি মনোহর। তাঁহার প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে ফল-পুষ্পোদ্যান ও সরোবর শোভিত। বর্ত্তমান সম্রাট রাজপদে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে তিনিও তাঁহার পিতার প্রাসাদে বাস করিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯০০ খৃঃ বক্‌সার যুদ্ধের সময় ইংরেজ সৈন্যগণ এই প্রাসাদটী ধ্বংশ করিয়া ফেলিয়াছে। বৃদ্ধরাণীর প্রাসাদও ইউরোপীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার এখন সংস্কার হওয়ায়, ধ্বংসের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না।

প্রিন্স্ চুন বা সপ্তম কুমার অতি শিক্ষিত ও ভাবুক লোক ছিলেন। কবিতারচনায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার প্রাসাদের সম্মুখে উদ্যান মধ্যে প্রস্তরফলকসকলে নৈসর্গিক দৃশ্যসম্বলিত নানা কবিতা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। সরোবরস্থ প্রস্ফুটিত পদ্ম দৃষ্টে পৃথিবীর ধন সম্পদ ও পদগৌরবের অস্থায়িত্ব চিন্তা করিয়া যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার একটীর বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথাঃ—

অদ্য তুমি মনোহর পদ্ম পুষ্প সম।
গৌরবে উন্নত শির কান্তি অনুপম॥
কল্য কিন্তু দেখি তোমা অবনত শির।
'কাল-জলে' মগ্ন দেহ নিস্তেজ শরীর॥

সপ্তম প্রিন্স্ কুকুর ও ঘোড়ার বড় অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার কুকুর ও ঘোড়াসকলের সমাধির উপর, প্রস্তরফলকে তাহাদের নাম, গুণের বিষয় এবং মৃত্যুর তারিখ লিখিত আছে।*

এই গ্রীষ্মাবাসের কোন কোন উচ্চ প্রাসাদ হইতে পেকিন যাইবার রাজপথ দৃষ্ট হয়। তখন পুরীস্থ মহিলাগণ রাজপথগামিদিগের পরিচ্ছদ দৃষ্টে বুঝিতে পারেন, কোন্ শ্রেণীর লোকসকল যাতায়াত করিতেছে। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী পীতবর্ণের শিবিকায় আরোহণ করিয়া থাকেন। সম্রাটের পাটরাণী ভিন্ন অন্য সকল পত্নীগণ কমলা লেবুর রং-বিশিষ্ট যানে আরোহণ করেন। রাজকুমারীগণ (Princeses) লাল বর্ণের যানে চড়িয়া থাকেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাণ্ডারিনগণ (রাজকর্ম্মচারি) সবুজবর্ণের যানে, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর মাণ্ডারিনগণ নীলবর্ণের শিবিকায় আরোহণ করিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন সর্ব্বসাধারণ লোকের মধ্যে ভিন্ন রং ও আকৃতির শিবিকা সকল আরোহণ করিবার নিয়ম। প্রজাসাধারণ মধ্যে ধনী হইলেও উপরোক্ত কোন প্রকার রংবিশিষ্ট যান বা বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারেন না। অতি নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের নীলবর্ণের বস্ত্রাচ্ছাদিত দুই চাকার গাড়িতে যাইবার নিয়ম।

সপ্তম প্রিন্স্ চুন সম্রাট শিয়েন ফেংএর (Hsein Feng) সপ্তম ভ্রাতা। সেই জন্য ইহার নাম সপ্তম কুমার। সম্রাট

* এই কথা মনে পড়িলে আক্ষেপ হয় যে, একটী কুকুর বা ঘোড়ার স্মরণচিহ্ন কত যত্নে রক্ষিত হয়, আর আমাদিগের দেশের রাজরাজড়া বা গণ্যমান্য লোক মরিলে তাহার পরদিন কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।



লালবোতামযুক্ত ম্যাণ্ডারিন।

শিয়েন ফেং বর্ত্তমান বৃদ্ধারাণীর স্বামী ছিলেন। সপ্তম প্রিন্সের মহিষী, বর্ত্তমান সম্রাটের মাতা ও বর্ত্তমান বৃদ্ধারাণীর ভগিনী ছিলেন। এই রাজকুমার বর্ত্তমান বৃদ্ধারাণীর ও পূর্ব্ব প্রাসাদের মহারাণীর সঙ্গে অতি মিত্রভাবে বাস করিতেন। বৃদ্ধারাণীর পুত্রের নাম ছিল টুংছি। সম্রাট টুংছিরও বর্ত্তমান সম্রাটের নাবালক অবস্থায় এই বৃদ্ধারাণী ও পূর্ব্ব-প্রাসাদের রাণী একত্র যোগে ইঁহাদের অভিভাবক বা গার্ডিয়ান-রূপে রাজ্যশাসন করিতেন। সেই সময়ে প্রিন্স চুন ইঁহাদের একজন বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ছিলেন। বৃদ্ধা রাণীর স্বামী সম্রাট শিয়েন ফেং-এর মৃত্যু হইলে তদীয় নাবালক পুত্র টুংছি সম্রাটরূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, কিন্তু এই নবীন সম্রাট অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবা মাত্র দুই বৎসর কাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন, এবং বিংশতি বৎসর বয়সে তিনি লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার পরলোক গমনে পুত্রশোকসন্তপ্ত বৃদ্ধারাণী জেশী, এক দিকে বিশ্বস্তদেবর-পুত্র, অপর দিকে ভগ্নীপুত্র বর্ত্তমান সম্রাটকে পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে দত্তকরূপে গ্রহণ করিয়া সম্রাটের পদে বরণ করেন। তখন রাজপদে আসীন বর্ত্তমান সম্রাটের নাম হয় কোয়াংশি। কোন সম্রাটের মৃত্যু হইলে রাজসভার মন্ত্রী ও পারিষদগণের দ্বারা ভবিষ্যৎ সম্রাট নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন।

প্রিন্স ও উভয় রাণীই তৎকালীন বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক অতি প্রশংসিত হইতেন।

দরবারগৃহ।

শীতাবাসের রাজপুরীর মধ্যে প্রাচীরের পর প্রাচীর সকল, এবং তথাকার দরবারগৃহও স্বতন্ত্র প্রাচীরবেষ্টিত, কিন্তু গ্রীষ্মাবাসীয় প্রাসাদ সকল একই প্রাচীরের ভিতর। গ্রীষ্মা-বাসের দরবারগৃহ (Grand Hall of reception) স্বতন্ত্র এক প্রান্তে প্রাচীরের ধারে। এই দরবারগৃহ অতি বৃহৎ ও জাঁকজমকশালী। এই গৃহ ও সিংহাসনগৃহের ন্যায় টেবল চেয়ার, রাজাসন এবং নানাবিধ চিত্রে শোভিত। ইহার মধ্যে তিনটী বড় বড় পিয়ানো বাদ্য যন্ত্র আছে। কক্ষ প্রাচীর গাত্রে বড় বড় অক্ষরে মানচিত্রাকৃতি পটসকলে নানা ধর্ম্ম ও নীতি কথা লিখিত আছে। তাহার এক খানিতে লিখিত আছে যে "সম্রাট তাঁহার প্রজাবর্গের সুখ ও সৌভাগ্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী," ইত্যাদি।

কক্ষটীর মধ্যস্থলে বেদীর উপর সিংহাসন স্থাপিত। তাহার পশ্চাতে পাঁচ পক্ষাবিশিষ্ট পরদাসকল স্থাপিত। প্রাচীনকালীয় বেদী ও সিংহাসন বর্ত্তমানকালীয় বেদী ও সিংহাসন অপেক্ষা অনুন্নত ও জাঁকজমকবিহীন। ঐ রাজাসন এইক্ষণ আর ব্যবহৃত হয় না। ইহা দ্বারা বোধ হয় পূর্ব্ব কালের সম্রাটগণ তাদৃশ আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন না। তখন বেদী ও আসন অনুন্নত ও আড়ম্বরবিহীন থাকায় মন্ত্রীগণ সম্রাটের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়া স্বাধীন ভাবে আবেদন নিবেদন করিতে পারিতেন কিন্তু এইক্ষণ তাহার বিপরীত। এইক্ষণ কোন মন্ত্রী বা পারিষদবর্গ মস্তক উন্নত করিয়া সম্রাটের পবিত্র দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে অবনত মস্তকে জানুপাতিয়া অবস্থিতি করিতে হয়।

এইরূপ শুনা যায় যে বর্ত্তমান সম্রাট যে কএক বৎসর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই সময়ে রাত্রি প্রায় তিনটার সময় দরবার আরম্ভ করিতেন। তখন মাত্র দুইটী চরবীর বাতি তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে জ্বালিবার আদেশ ছিল। কক্ষের অন্যান্য স্থানে চীন দেশী লণ্ঠন জ্বালা হইত, কিন্তু তাহাতে কক্ষ মধ্যে সুন্দর আলো হইত না। শুনা যায় যে এই প্রকার মিটু মিটে আলোকে দরবার করিবার উদ্দেশ্য এই যে, পাছে কোন মন্ত্রী বা কর্ম্ম-চারী ভুল ক্রমে তাঁহার পবিত্র দেহখানি দেখিয়া ফেলে! আরো শুনা যায় যে সম্রাট দরবারে সময় সময় ক্লান্ত হইয়া নিঃশব্দে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, খাস কামরায় গিয়া হয়ত চুরট টানিতেছেন, ইতিমধ্যে দরবারি মন্ত্রীগণ বা রাজকর্ম্মচারিগণ অবনত মস্তকে আপন আপন বক্তব্য ব্যক্ত

করিতেছেন, কিন্তু হঠাৎ সিংহাসনের দিকে চাহিয়া দেখেন যে শূন্য সিংহাসন!

কোন বিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী বা রাজকীয় সম্মানিত উপাধিধারী প্রিন্সগণ, মাসের বিশেষ কোন কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে আপন আপন বিভাগের কার্য্যাদির রিপোর্ট অথবা সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য রাজদরবারে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

সম্রাট ও বৃদ্ধা মহারাণী প্রায় প্রতিদিনই দরবার করিয়া থাকেন এবং প্রতিদিনই প্রধান মন্ত্রী (Prime Minister) এবং সর্ব্ব প্রধান কার্য্য সম্পাদকের (Grand Secretary) সঙ্গে রাজকীয় নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রীসভার (Grand Council) বৈঠক প্রত্যহই হইয়া থাকে। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের কার্য্যান্তে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী সেইদিনের কার্য্যের সমালোচনা প্রধান মন্ত্রী চিংর (Prince Ching) সঙ্গে করিয়া থাকেন।

রাজকীয় টেলিগ্রামাদি বিশেষ জরুরি না হইলে আপন আপন বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরিত হইয়া থাকে। এই সকল টেলিগ্রামের মর্ম্ম পরদিন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে অবগত করান হইয়া থাকে। কোন প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, বা অন্যান্য গুরুতর বিষয়ের টেলিগ্রাম-সকল রাজপুরীর দ্বারে উপস্থিত করা হইয়া থাকে। প্রধান খোজা সেই টেলিগ্রামসকল গ্রহণ করিয়া পীতবর্ণের পট্টবস্ত্রাচ্ছাদিত আধারে সেই সকল রাখিয়া, অবনতজানু হইয়া বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞীর নিকট উপস্থিত করে। ইহা ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট সময় ভিন্ন রাজপুরীতে অন্য কোন টেলিগ্রাম প্রেরণ করিবার নিয়ম নাই। প্রাতঃকাল সাত ঘটিকা হইতে একাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত সম্রাট ও বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী প্রত্যহ দরবার কার্য্য করিয়া থাকেন। তদন্তে তাঁহারা সেইদিনের জন্য বিশ্রাম করিয়া থাকেন।

সিংহাসনের সম্মুখে মেজের উপর পাঁচখানি ছোট ছোট গদি স্থাপিত থাকে। যখন গ্রাণ্ড কাউন্সিলের মেম্বরগণ রাজদরবারে গমন করেন, তখন তাঁহারা এক এক জনে সেই এক এক খান ছোট গদির উপর জানু পাতিয়া অবনতশিরে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে রাজকীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন। প্রধান মন্ত্রীর গদিখানি সিংহাসনের অধিকতর সন্নিকট। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদিগুলি কেবল গ্রাণ্ড কাউন্সিলের মেম্বরগণের সম্মানার্থ প্রদত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু অপরাপর রাজকর্ম্মচারিগণ "স্বর্গীয় সন্তান" সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীগণের সঙ্গে কথা বলিতে হইলে প্রস্তরময় মেজের উপর জানু পাতিয়া অবনত মস্তকে থাকিতে বাধ্য। উক্ত পাঁচখানি গদি দ্বারা সিংহাসনের নিকটবর্ত্তী স্থান-সকল জুড়িয়া থাকায়, রাজকর্ম্মচারিগণ অপেক্ষাকৃত দূরে মুক্ত মেজের উপর অবস্থান করিতে বাধ্য হন। তাহাতে

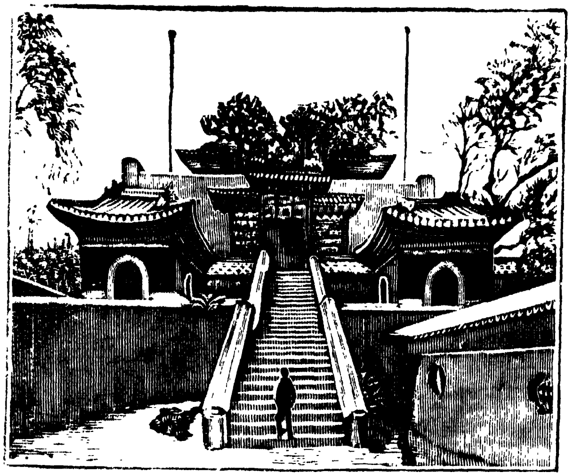


চীনসম্রাটের পাটরাণী।

এক দিকে প্রস্তর সংঘর্ষে জানুতে বেদনা বোধ হয়, অপর দিকে দূরে থাকা বিধায় সম্রাটের মৃদু ভাষা ভাল মত বোধ-গম্য করিতে পারেন না। এই সকল কষ্ট ও অসুবিধা নিবারণ জন্য কর্ম্মচারিগণ সময় সময় রাজ সমীপে গমন কালে পথদর্শক খোজাকে উৎকোচ প্রদানপূর্ব্বক উক্ত গদি সকল সরাইয়া সিংহাসনের আরো নিকটে লইয়া যাইতে বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্ব হইতে আপন আপন জানুর সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুলার গদি বাঁধিয়া রাজদরবারে যাইয়া থাকেন। তাঁহাদের লম্বা চোগাদ্বারা অবশ্য উক্ত জানুসংলগ্ন ক্ষুদ্র গদি সকল দৃষ্ট হয় না। প্রধান মন্ত্রী ও গ্রাণ্ড সেক্রেটারির আসন স্থানচ্যুত করিবার আদেশ নাই।

যখন কোন উচ্চ কর্ম্মচারীকে সঙ্গে করিয়া সেই কার্য্যে নিযুক্ত খোজা দরবারগৃহের নিকট উপস্থিত হয়, তখন সে প্রথমতঃ ভূমিতে পতিত হইয়া সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে জানায় যে, "প্রভো, অমুক রাজকর্ম্মচারী এত ঘণ্টা এত মিনিট হইল রাজপ্রাসাদে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, আদেশ হইলে তাঁহাকে দরবারগৃহে উপস্থিত করি।" উৎকোচ-গ্রাহী খোজা ভূতলে পতিত হইয়া সম্রাটকে সংবাদ দেওয়ার অবসরে অতি সতর্কতার সহিত উৎকোচের সর্ত্তানুসারে গদি সরাইয়া দিয়া থাকে। উক্ত কর্ম্মচারীর নাম উচ্চারণ করিবা মাত্র পদমর্য্যাদানুসারে ও উৎকোচের পরিমাণানুসারে যিনি

[illegible] তিনি ততটা অগ্রসর হইয়া সিংহাসনের নিকট অবস্থান করিতে পারেন। যে খোজা এই সকল কর্ম্মচারিগণকে রাজদরবারে হাজির করিয়া দিয়া থাকে, তাহারা জানু পাতিয়া অবনত মস্তকে অবস্থান করা মাত্রই সে দৌড়িয়া বাহিরে যাইতে বাধ্য হয়। অন্য কর্ম্মচারিগণ ও খোজাগণ দৃষ্টি রাখে যে ঐ খোজা বহির্ভাগে চলিয়া গিয়াছে কি না, যদি সে দূরে না গিয়া আড়ালে থাকিয়া কোন কথা শুনিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার শিরশ্ছেদ পর্য্যন্ত ব্যবস্থা হইতে পারে। সম্রাটের সঙ্গে রাজকীয় কোন কথার গুপ্তসংবাদ বাহিরে প্রকাশিত না হয় সেই জন্য এই প্রকার কঠোর ব্যবস্থা।



চীন স্থাপত্যের একটি নমুনা।

খোজা চলিয়া গেলে উক্ত কর্ম্মচারী আপন বক্তব্য সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। তাঁহার বক্তব্য সমাপ্ত হইলে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া সিংহাসনগৃহ পরিত্যাগ করিতে পারেন। এ বিষয় মোগল সম্রাটগণের মত নহে যে, সম্রাটকে পৃষ্ঠ পরিদর্শন করান নিষিদ্ধ বিধায় দরবারিগণ সম্রাটের দিকে মুখ রাখিয়া পশ্চাতে ক্রমে হটিতে থাকেন।

চীনভাষা ও জাতীয়ভাবে চীনদেশের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে দেবরাজ্যের অধীশ্বর ও অধীশ্বরীরূপ (Celestial Majesty) মনে করা হইয়া থাকে। সেই জন্য যে কোন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হউন না কেন, তিনি প্রধান মন্ত্রী হউন, বা গ্রাণ্ড সেক্রেটারি অথবা রাজকুমার হউন না কেন, সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে দরবারগৃহে কোন আবেদন নিবেদন করিতে হইলে জানু পাতিয়া অবনতমস্তকে কথা বলিতে হইবে। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর খাস কামরায়ও যদি কোন কর্ম্মচারী কোন সরকারী কার্য্যসম্পর্কে কোন কথা বলিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তথায়ও তাঁহাকে অবনতজানু ও নতশির হইয়া তাহা বলিতে হইবে; কিন্তু সরকারী কার্য্য ভিন্ন অন্যান্য বিষয়সকলের আলাপাদি করিতে হইলে উক্ত প্রণালী অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় না। তখন সোজা ভাবে, সেই কর্ম্মচারী দণ্ডায়মান হইয়া সম্রাট বা সম্রাজ্ঞীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক কথা বলিতে পারেন। আবার এই প্রকার বে-সরকারী (Private) বিষয়ের আলাপাদি হইতে হইতে, যদি সম্রাট বা সম্রাজ্ঞী ইতিমধ্যে কোন রাজকীয় কার্য্যের হুকুম প্রদান করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই কর্ম্মচারীকে জানু পাতিয়া অবনতমস্তকে সেই রাজকীয় আদেশ গ্রহণ করিতে হয়। এই প্রকার অবনত জানু ও নতশির হওয়াকে চীনভাষায় "খ-টেউ" বলে। প্রকৃতপক্ষে অবনতজানু হওয়া আমাদের দেশের প্রণত হওয়ার ন্যায়। ইহার দ্বারা ধন্যবাদ প্রদান করা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ পায়।

গ্রীষ্মাবাস বৃদ্ধারাণীর বড় প্রিয়। এই সকল অট্টালিকা ও প্রাসাদসকল এমন ভাবে নির্ম্মিত যেন এক প্রকাণ্ড নিকুঞ্জ বন মধ্যে এক উৎকৃষ্ট উদ্যানবাটীবিশেষ বলিয়া বোধ হয়। ইহা পেকিনের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে। এই রাজপুরীর পশ্চিমদিকের শৈলশ্রেণী এক অপূর্ব্ব নৈসর্গিক দৃশ্য ধারণ করিয়া রহিয়াছে। রাজপ্রাসাদগুলি এক প্রকাণ্ড হ্রদের ধারে শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্ম্মিত। হ্রদের ধার শ্বেতপ্রস্তর দ্বারা বাঁধান। তাহার মাঝে সুরম্য ধাপসকল নির্ম্মিত হইয়া সৌন্দর্য্য ও সুবিধা উভয়ই বৃদ্ধি করিয়াছে। গ্রীষ্মাবাসের প্রাঙ্গনসীমার মধ্যে একটী সর্ব্বোচ্চ শৈলোপরি দশ হাজার বুদ্ধমূর্ত্তিসম্বলিত এক প্রকাণ্ড মন্দির আছে। হ্রদের ধার হইতে শ্বেতপ্রস্তরময় ধাপ সকল নির্ম্মিত হইয়া ক্রমোচ্চ পর্ব্বতগাত্রে উঠিয়াছে। সেই সকল ধাপ দ্বারা "দশহাজারি বুদ্ধমন্দির" বিনা ক্লেশে উঠিতে পারা যায়। উক্ত শৈলোপরি আরো সুন্দর সুন্দর নানা প্রাসাদ সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা ভিন্ন নানা প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ খিলান দরজা (Memorial Arch) দৃষ্ট হয়। এই পর্ব্বতের এই সকল দৃশ্য অতি মনোমুগ্ধকর। চীনজাতির শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা এই স্থানে প্রকাশ পাইতেছে।

হ্রদের মধ্যে, অতি সুন্দর একটী দ্বীপোপরি রাজপ্রাসাদ ও ধর্ম্মমন্দির সকল এমন শিল্পকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে যে দূর হইতে দৃষ্ট হয়, যেন প্রকাণ্ড একখানি শৈলখণ্ড দ্বীপ হইতে উত্থিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। হ্রদের দক্ষিণ পাড় হইতে উত্তর পাড়ে যাইতে হইলে সতরটী খিলান বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট এক প্রস্তরময় সেতু পার হইয়া যাইতে হয়।

এই হ্রদটী কৃত্রিম হ্রদ। পেকিন নগরস্থ পরিখা হইতে জল আনিয়া ইহার জল সরবরাহ করা হইয়াছে। সেই



মঙ্গোলীয় লামাগণ।

জলধারা এমন ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া হ্রদে পতিত হইতেছে, বোধ হয় যেন পর্ব্বত-নিঃসৃত ঝরণাবারিসকল একত্র মিলিত হইয়া এক নদীরূপে পরিণত হইয়াছে। হ্রদ হইতে বহির্গত জলপ্রণালীসকলের উপর উচ্চপৃষ্ঠ সদৃশ কুদ্র প্রস্তরময় সেতু সকল নির্ম্মিত হইয়া স্বভাব ও শিল্পনৈপুণ্যের সমবায়ে অতি মনোরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সহসা দূর হইতে দৃষ্টি করিলে ইহার কোন্‌টা স্বাভাবিক কোন্‌টা কৃত্রিম তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই।

চীনাদিগের হর্ম্ম্যনির্ম্মাণকৌশল এমন চমৎকার যে তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। চীনাদিগের একতলবিশিষ্ট শ্রেণীবদ্ধ গৃহসকল দূর হইতে এমন দৃষ্ট হয় যেন কোন এক বৃহৎ অভিযানের তাঁবু সকল অবস্থিতি করিতেছে। একটী তাঁবুর সঙ্গে একখানি চীনাগৃহের বেশ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তাঁবুটার যেমন দুই পার্শ্বে বংশদণ্ডের সাহায্যে উত্তোলন করিয়া তাহার দুই প্রান্ত উন্নত এবং মধ্যাংশ অবনত হয়, সেই প্রকার চীনাদিগের গৃহের মটকাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। চীনাদিগের গৃহের বারান্দা সকলও তাঁবুর নিম্নপ্রান্তের ন্যায় মধ্যে নত, সর্ব্ব নিম্ন ও দুই প্রান্ত কিঞ্চিৎ উন্নত। তাঁবুর যেমন নিম্নাংশে ঝালর থাকে, চীনাদিগের গৃহের ছাঁচার প্রান্তসকলে কাষ্ঠময় রঞ্জিত ঝালর সকল সংবদ্ধ থাকিয়া শোভা পায়। তাঁবুর খুঁটি সকলও মৃত্তিকা প্রোথিত নহে। চীনাদের গৃহের খুঁটি সকল মৃত্তিকা প্রোথিত নহে। তাঁবু সকল যেমন যথা ইচ্ছা খুলিয়া স্থানান্তরিত করা যায়, চীনাদিগের গৃহও খুলিয়া স্থানান্তর করা যায়, কিন্তু তত সহজ নহে। তাঁবুর রংএর সঙ্গে চীনাদের ঘরের ছাদের রংএর বেশ ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় যে, অতি প্রাচীন কালে যখন চীন জাতির নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না, তখন তাহারা তাঁবুতে বাস করিত। ক্রমে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর অনুকরণে গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে।

গ্রীষ্মাবাসের সীমার মধ্যে অসংখ্য ফল ও পুষ্পের বৃক্ষ সকল দৃষ্ট হয় এবং নানা শস্য ও শাকসব্জী যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে রাই, মটর, গোধুম, কপি, সালগম, মূলা ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য।

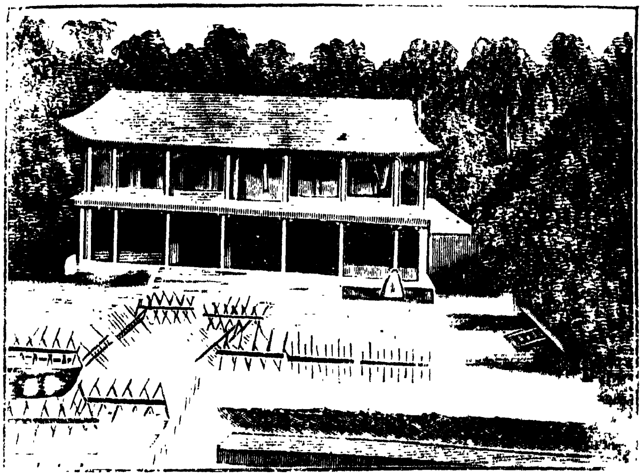
একটী পাহাড়কে 'পুষ্পপর্ব্বত' বলে। তাহার চতুর্দ্দিক থাকে থাকে কর্ত্তিত হইয়া নানাবিধ পুষ্প রোপিত হইয়াছে। যখন পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয়, তখন তাহাকে বাস্তবিকই পুষ্পপর্ব্বত না বলিয়া থাকা যায় না। তখন সমস্ত পাহাড়টাকে একটা প্রকাণ্ড পুষ্পস্তবক বলিয়া বোধ হয়। এই প্রকার ফল, পুষ্প ও শস্য ক্ষেত্র বেষ্টিত গ্রীষ্মাবাস যেন একটী নন্দন কানন বিশেষ।

'দশ হাজারি বুদ্ধমন্দিরটী' চাকচিক্যশালী উৎকৃষ্ট টালি দ্বারা নির্ম্মিত। সেই সকল টালির মধ্যে মধ্যে একটী করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। সকলের মধ্য স্থানে একটী বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। এমন বোধ হয় যে সকল মূর্ত্তি গণনা করিলে যেন দশ হাজারেরও অধিক মূর্ত্তি হইবে।

মন্দিরটীর মধ্যে স্বতন্ত্র তিনটী কক্ষে স্বতন্ত্র তিনটী বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। এই মন্দির মধ্যে আর একটী প্রকাণ্ড প্রাসদ্ধ বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল, তাহা ১৯০০ খৃঃ ইউরোপীয় সৈন্যগণ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া হ্রদের জলে নিক্ষেপ করিয়াছে। বৃদ্ধা-রাণী এই জন্য সর্ব্বদাই নাকি দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বিদেশীগণ সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে, চীনারা সর্ব্বদাই বিদেশীকে ঘৃণা করিয়া থাকে। বিদেশীদিগকে ভালবাসিবার কোন কারণ দেখা যায় না। ইউরোপীয় সুসভ্য খৃষ্টিয়ান সৈন্যগণ যে ভাবে চীনদেশের মঠ মন্দির সকল ধ্বংস করিয়াছে, যে ভাবে তাহাদের বাসগৃহসকল দগ্ধ করিয়া বাসা ছাড়া করিয়াছে, যে ভাবে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তাহারা নরহত্যা করিয়াছে, তাহা কেবল সুসভ্য জাতি কেন কোন অসভ্য বর্ব্বর জাতির পক্ষেও সম্ভব হয় না। মিশ্‌ কার্ল তাঁহার পুস্তকে এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

'দশহাজারি' মঠের পশ্চাতে পর্ব্বতের পাদদেশে প্রাচীন গ্রীষ্মাবাস দৃষ্ট হয়। সেই গ্রীষ্মাবাসের গৃহসকল ১৮৫৯ খৃঃ ও ১৮৬০ খৃঃ ফরাসী ও ইংরেজ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ধ্বংস হইয়াছিল। তদবধি তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এবং বর্ত্তমান নূতন প্রাসাদসকল নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৮৯০ খৃঃ সাদা সৈন্যগণ এই গ্রীষ্মাবাস এমন ভাবে ধ্বংস করিয়াছিল, যে তাহাও বর্ণনাতীত। কিন্তু ঐ সকল বৃদ্ধারাণী এমন ভাবে সংস্কার করিয়াছেন যে সেই ধ্বংসের চিহ্ন এখন বিশেষ দৃষ্ট হয় না।



১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিদেশী সৈন্যের দ্বারা বিনষ্ট গ্রীষ্মপ্রাসাদের অংশ।

প্রাচীন গ্রীষ্মাবাসের ধ্বংসাবশেষের পার্শ্বে একটী হ্রদ আছে। যদিও ঐ সকল অট্টালিকা ধ্বংসপ্রায়, তবুও তাহার নির্ম্মাণে শিল্পনৈপুণ্যের যে সকল চিহ্ন আছে, তাহা এখনও বিস্ময়কর। শুনিতে পাওয়া যায় বৃদ্ধারাণী যখন এই স্থান দর্শন করিতে আইসেন, তখন তাঁহার হৃদয় নাকি দুঃখে অভিভূত হয়, কারণ এই প্রাসাদেই তিনি যৌবনকালে স্বামীসহ বাস করিতেন। অবশ্যই এই দৃশ্য তাঁহার সেই সুখের দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

গ্রীষ্মাবাসের মন্দিরময় পর্ব্বত হইতে পেকিন যাইবার রাস্তা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৃদ্ধারাণী ও মহিষীগণ এই স্থান হইতে রাজপুরীর বাহিরে জগতের যে দৃশ্য তাহা দেখিয়া থাকেন। কারণ রাজপুরীমধ্যে আবদ্ধ থাকায় অন্য দৃশ্য দেখিবার সাধ্য নাই। তাহার কারণ যখন পেকিন হইতে গ্রীষ্মাবাসে গমন করেন, বা গ্রীষ্মাবাস হইতে শীতাবাসে গমন করিয়া থাকেন তখন রাজপথে অন্য কোন লোক চলিবার সাধ্য নাই। সেই সময়ে রাস্তার দুধারে লাল পতাকা-সকল প্রোথিত করিয়া জনসাধারণকে দূরে যাইতে আদেশ করা হইয়া থাকে। পেকিন সহর মধ্যে প্রবেশ করিলেও রাস্তার দুধারে পরদা দ্বারা ঘেরা হইয়া থাকে এবং রাজপথের দুধারের লোকসকল সেই পরদার আড়ালে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। এই পর্ব্বত হইতে যদি রাণীগণ রাজপথে সম্রাটের শিবিকা দৃষ্টি করেন তাহা হইলে বৃদ্ধারাণী যুবতী রাণীগণকে ও অন্যান্য মহিষীগণকে সাবধান করিয়া দিয়া থাকেন যেন তাঁহারা এত দূর হইতে সম্রাটের শিবিকার প্রতি দৃষ্টি না করেন। কারণ এ বড় অবৈধ কার্য্য।

গ্রীষ্মাবাসে উদ্যান সমিতি।

পেকিনের বক্সার বিদ্রোহের পর, পেকিনস্থ ইউরোপীয়-গণকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য বৃদ্ধারাণী নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। সময় সময় পেকিন লিগেশনের বিভিন্ন দেশীয় রাজদূতগণও তাঁহাদের মহিলাগণকে উদ্যান সমিতিতে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইউরোপীয় প্রথানুযায়ী পুরুষ ও রমণীগণের এক দিন এক সময়ে নিমন্ত্রণ করেন না। এক দিন পুরুষের এবং তাহার পরদিন রমণীগণের নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। প্রথম দিন পুরুষগণের নিমন্ত্রণ হইলে, তাঁহারা আসিয়া ওয়াই-উ-পু বা ফরেন আফিসে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন। তখন ভিতরে সংবাদ প্রেরিত হইয়া থাকে। সম্রাজ্ঞী দরবারগৃহে সিংহাসনে উপবেশন করিয়া থাকেন, সম্রাট সেই আসনের নিম্নে একখানি টুলের উপর উপবেশন করেন। তৎপর আগন্তুক বিদেশীয় রাজদূতগণ একে একে সিংহাসন কক্ষে উপস্থিত হইয়া তিনবার অবনত হইয়া 'খ-ঠৈউ' বা প্রণাম করণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিতে বাধ্য হন। এই প্রকার একে একে সকল দূতের অভিবাদন কার্য্য সমাপ্ত হইলে, বৃদ্ধারাণী সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক নিম্নে অপর আসন গ্রহণ করেন এবং দূত গণও আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। তখন ইঁহাদের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপ হইয়া থাকে। অতঃপর সকলকে উদ্যান সমিতিতে আহ্বান করা হইয়া থাকে। তথায় নিমন্ত্রিত ভদ্রগণকে নানা প্রকার, চীনদেশী ও বিলাতী খাদ্য ও মদ্যাদি পানাহার করিতে দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন। সকলে জলযোগ করণপূর্ব্বক হ্রদ মধ্যে নৌকা চালন করিতে গমন করিয়া থাকেন। পুরুষগণের নিমন্ত্রণের দিবস বৃদ্ধা মহারাণী ভিন্ন অন্য কোন রমণী তাহাতে যোগ দান করেন না।

রমণীগণ নিমন্ত্রিত হইয়া শিবিকারোহণে প্রথমতঃ ওয়াই-উ-পু নামক ফরেন আফিসে উপস্থিত হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। তথা হইতে রাজপুরী মধ্যে সংবাদ প্রেরিত হইলে ভিতর গমনপূর্ব্বক সিংহাসনারূঢ় সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে একে একে পরিচয়সহ প্রদর্শিত (Presented) হইয়া থাকেন। ইহাদিগকেও তিনবার অবনত মস্তকে খ-ঠৈউ প্রণালীতে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। পরে সকলের অভিবাদন শেষ হইলে মহারাণী সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক নিম্নে আসন গ্রহণ করিয়া সকলের সঙ্গে সদালাপ করিয়া থাকেন। পরে উদ্যান সমিতিতে নিমন্ত্রিত মহিলাগণ আহূত হইয়া নানা প্রকার স্বদেশী ও বিদেশী চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সামগ্রীর দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া থাকেন। অতঃপর রাজপুরীস্থ অন্যান্য মহিষী ও মহিলাগণ সহ নৌকারোহণপূর্ব্বক হ্রদ মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকেন। হ্রদ মধ্যে মার্ব্বল প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বিতল বিশিষ্ট একখানি জাহাজ নির্ম্মিত আছে। উহার কারুকার্য্য

সূক্ষ্মধরণের না হইলেও উহা দে বার জিনিষ বটে। সকলে এই মর্ম্মরপ্রস্তরময় জাহাজে উপস্থিত হইলে তথায় পুনরায় সামান্য ধরণের জলযোগ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বৃদ্ধা মহারাণী এই প্রকার আমোদের বড় পক্ষপাতি, তিনি অবসর মত প্রায় প্রত্যহই এই হ্রদ মধ্যে নৌকাযোগে বিচরণ করিয়া থাকেন।

সাগরাবাস (Sea Palace)।

এই সাগরাবাস পেকিনের শীতাবাসের নিকট। এই সাগরাবাসের সীমার মধ্যে রাজপ্রাসাদ আছে, সিংহাসন আছে, এবং অনেকগুলি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দির আছে। তাহা ভিন্ন অনেকগুলি বৌদ্ধ-ভিক্ষুআশ্রম আছে। বৌদ্ধ যোগীগণের নিভৃত চিন্তা ও আরাধনার জন্য কতকগুলি নির্জ্জন গুহা আছে। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীগণ দেবার্চ্চনা উপলক্ষে আসিয়া এই সাগরাবাসে দুই চারি দিন বাস করিয়া থাকেন। ১৩১১ সালের ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে "চীন দেশের যমরাজা" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে চীন দেশে প্রতি বৎসর শরৎ কালে চীনারা আপন মৃত আত্মীয়গণের আত্মার পূজা করিয়া থাকে, এবং সেই উপলক্ষে নানা খাদ্য দ্রব্য উৎসর্গ ও বলিদান করিয়া থাকে। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীগণও প্রতি শরৎকালে এখানে আসিয়া আপন আপন পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মার পূজা ও উৎসর্গাদি করিয়া থাকে।

অন্যান্য রাজাবাস অপেক্ষা সাগরাবাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহা প্রায় ৫০ বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। পেকিন লিগেশন হইতে বহির্গত হইয়া এক হ্রদের ধারে উপস্থিত হইতে হয়। তথা হইতে নৌকাযোগে হ্রদ পার হইতে প্রায় ২০ মিনিট সময়ের প্রয়োজন হয়। ইহা পার হইয়া অপর পারে গেলে সাগরাবাসে উপস্থিত হওয়া যায়। তথায় বৃদ্ধারাণীর নিজের ভজনার জন্য স্বতন্ত্র এক মন্দির আছে। অট্টালিকা ও মন্দিরগুলি অতি শিল্পনৈপুণ্যে নির্ম্মিত। অন্যান্য প্রাসাদের ন্যায়, এখানেও সিংহাসনগৃহ, বাসগৃহ, ভৃত্যগণের আবাস সকল রাজোচিত জাঁকজমকে অতি সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ম্মিত আছে। হ্রদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটী দ্বীপ আছে। তাহাতে ক্ষুদ্র একটী মন্দিরগাত্রে একটী পদ্য লিখিত আছে। তাহার ভাবার্থ এই :—

"নিশাকালে চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নায় তুমি অবগাহন কর, দিনের বেলায় সূর্য্যদেব তোমাকে চুম্বন করেন। আর স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ হ্রদের তরঙ্গ-মালা তুমি আপন গলে মাল্যরূপে পরিধান কর।"

এই দ্বীপের অপর পার্শ্বে হ্রদের ধারে একটী মন্দির দৃষ্ট হয়। এই মঠটী ১৯০০ খৃঃ ইউরোপীয় সৈন্যগণ একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার সংস্কারকার্য্য পুনরায় হইতেছে। এই মন্দিরে বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণ বাস করিতেন এবং ইহার নিকটবর্ত্তী গুহায় যোগীগণের বাস ছিল। মন্দির প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার ফুলের বাগিচা ও শাক সবজীর বাগিচা দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি ও নানা সাধুমূর্ত্তি সকল স্বর্ণপত্রে মণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতেছে। মন্দিরের কাষ্ঠময় ছাদের ভিতর পৃষ্ঠ নানা খোদিতকার্য্যে শোভিত। এই মন্দিরের নির্ম্মাণপ্রণালী ও সাধু-সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি রোমান ক্যাথলিক গিরজার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।

এই মন্দিরের পশ্চাতে ৩০ ফুট উচ্চ, ধাপযুক্ত মঞ্চসদৃশ স্থানে উঠিলে কয়লা পাহাড়ের (Coal Hill) সুন্দর দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়। তাহার উপরে "ডাগ্‌গবা" নামক স্মৃতি স্থান দৃষ্ট হয়, যে স্থানে মিং রাজবংশের সম্রাট মাঞ্চুগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। এই শেষ মিং সম্রাটের আত্মহত্যাসম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তি আছে যে যখন মাঞ্চুগণ রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল সেই সময় তাহার প্রজাবর্গও বিদ্রোহী হইয়া নগর অবরোধ করে। সম্রাট নগরদরজা বন্ধ করিয়া দিয়া মহা চিন্তাকুল হইলেন। তাহার সেনাপতিগণ স্থানান্তরে মাঞ্চুগণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। সম্রাট নিরুপায় হইয়া রাজপরিবাররক্ষক দেবতার নিকট গিয়া ধন্না দিলেন। তখন রাজকীয় জ্যোতিষেরা গণনা করিয়া কহিল যে জুয়াখেলার গুটিকা দ্বারা তাঁহার ভাগ্য পরীক্ষা হইবে। গুটিকা নিক্ষেপে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা যদি তিনি লাভ করিতে পারেন, তবে শত্রুগণ তাঁহার কিছুই করিতে পারিবে না। রাজা তদনুযায়ী গুটিকা তিন বার নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু বিপরীত ফল ফলিল। তখন হতাশ হইয়া ক্রোধে দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন যে, "যাহারা ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়া আইসে তুমি তাহাদিগকে আরো নিপীড়ন কর, যাহারা রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিয়া তোমার আশ্রয় লয়, তুমি তাহাদিগকে আরো যন্ত্রণা দাও, যাহারা বিপদে পড়িয়া শত্রু ভয়ে ভীত হইয়া আইসে তুমি তাহাদিগকে আরো বিপদে ফেল, তোমাকে ভজনা করিয়া আমার মোটে এই ফল হইল।" সম্রাট এই বলিয়া ক্রোধে বাহির হইয়া গিয়া, রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। পর দিন দেখা গেল সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর দেহ রশি দ্বারা গাছে ঝুলিতেছে। পরাভূত হইয়া নানা যন্ত্রণা সহকারে শত্রুর হস্তে নিহত হওয়া অপেক্ষা আত্ম হত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণা এড়াইলেন।

এই মঞ্চের দুইধারে অষ্টকোণ বিশিষ্ট দুইটী গৃহ নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে পাণ্ডাগণ গিয়া নির্জ্জন বাস ও ধর্ম্মচিন্তা করিয়া থাকেন। চীনদেশের সমস্ত ধর্ম্মমন্দির ও কবরস্থান সকল চোংস্ত নামক বৃক্ষ সম্বলিত। এই বৃক্ষ চীনাদিগের অতি পবিত্র জিনিষ। বোধ হয় গ্রীকগণ এই বৃক্ষ চীনদেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। চীনারা ইহাকে জীবনদায়িনী ও অমরত্বের চিহ্নস্বরূপ মনে করিয়া থাকে।



মাতৃমূর্ত্তি।

দাগনান বুভারেট কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

Kuntaline Press, Calcutta.

এই মন্দির হইতে উচ্চস্থানে শৈলশৃঙ্গে আর একটী মন্দির দৃষ্ট হয়। তাহার মধ্যে শ্বেতবর্ণের জেড পাথর নির্ম্মিত এক বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে আনীত হয় তখন বুদ্ধ মূর্ত্তি ভারতবর্ষীয় ধরণের ছিল; কিন্তু কালক্রমে সেই চেহারা পরিবর্ত্তিত হইয়া চীনা ধরণের চেহারায় পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের বুদ্ধমূর্ত্তির নাক ব্রহ্মদেশীয় লোকের নাকের সদৃশ চাপা।

এই মন্দিরের বুদ্ধমূর্ত্তি রাজকীয় পীতবর্ণের সাটিন বস্ত্রাবৃত। মাঞ্চুজাতীয় শিরোভূষণ বুদ্ধমূর্ত্তির মস্তকে শোভা পায়। মূর্ত্তির সম্মুখে ধূপ দীপাদি সর্ব্বদা জ্বলিতে থাকে। এই মন্দিরে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী শরৎকালে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ) করিয়া থাকেন।

এই মন্দির প্রাঙ্গণেই সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। নৈসর্গিক দৃশ্যে এই মন্দির ও রাজপ্রাসাদ সকল অতুলনীয় করিয়া রাখিয়াছে। এই মন্দির হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া এক শ্বেত প্রস্তরময় হ্রদ পার হইয়া অপর পারে গেলে রোমান কার্থলিক গির্জ্জা দৃষ্ট হয়। এই গির্জ্জার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে, উহার চূড়া হইতে শীতাবাসের রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণ দৃষ্ট হয়। এই জন্য বৃদ্ধা মহারাণী এক আপত্তি উত্থাপন করেন। সেই কারণ বশতঃ তিনি রোমান কাথলিক পাদরিগণের নিকট হইতে এই গির্জ্জা রাজসরকারের অর্থে খরিদ করিয়া লইয়াছেন। চীন সাম্রাজ্যের রাজবাটীর সমীপে খৃষ্টান-গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

[ক্রমশঃ]

শ্রীরামলাল সরকার।

ঐতিহাসিক বীর-গাথা।

ভক্তি থাপ্পা।

(ভক্তি থাপ্পা একজন প্রসিদ্ধ গুরখা বীর। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ইংরাজের সহিত গুরখা জাতির যে সমর হয়, তাহাতে উক্ত বীর বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া সমর ক্ষেত্রে শেষ শয্যায় শয়ন করেন। বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে "Cassell's Battles of the Nineteenth Century গ্রন্থে "The Gurkha War" দ্রষ্টব্য।)

"বক্ষের' পরে
হের ওই ওরে
বসেছে ব্যাঘ্র গর্ব্বে,
না হটালে তায়
ছিঁড়িয়ে হৃদয়
দলিবে সকল দর্পে।
কে আছে এমন
মাঝে অগণন
নেপালের বীর সন্তান,
পারে উপাড়িতে—
দেশথল হ'তে
রিপুকেতু রাখি সম্মান?"
এত বলি সেনাপতি,
যেন দুঃখিত অতি
বসে সভাতলে,
আঁখি ছল ছলে;
কি ব্যথা আজিকে সহে প্রাণ,
জননীর হেরি অপমান!

শুনি সেই বাণী
আপনা আপনি
লাফায়ে পড়িল মধ্যে,
"আজি নিশি ভোরে
স্থির শত্রুরে
বিতাড়িব ঘোর যুদ্ধে;
না পারিলে তায়
শুইব সেথায়
শপথ করিনু অদ্য;
ফিরে যদি আসি
গলে দিও ফাঁসি
হব তোমাদেরি বধ্য।
চকিত হইল সভা,
হেরিয়া বীরের প্রভা।

ফুটিল তখন
আশার বচন,
"ভয় নাই আর ভয় নাই,
মা'র সম্মান র'বে ভাই।"

নিশি প্রায় ভোর
আছে কিছু ঘোর,
সাথে দু'হাজার সৈন্য,
চলে বীরবর
বুকে নাহি ডর
রাখিতে মায়ের মান্য।
দেওথল গিরি
পদতলে তা'রি—
দাঁড়াল অর্দ্ধ চক্রে,
উপরে যাহার
গর্ব্বে তাহার
বসিয়া শত্রু অগ্রে।
সেথায় প্রাকার রচি,
সাজায়েছে তোপ রাজি,
সাধ্য কাহার
করে অধিকার
চড়ি' তল হ'তে গিরি শিরে,
কামানের মুখে বুক ধরে।

ফুটিল আলোক
হাসিল ভূলোক,
ঊষা সে গিরির শৃঙ্গে,
পাতিয়া চরণ
অলক্ত বরণ
মাথায় শুভ্র অঙ্গে।
বীরের ললাটে
আচম্বিতে ফোটে
রাঙা চন্দন-রেখা,
প্রভাত-রাণীর
কমল পাণির
যেন মঙ্গল টীকা!

বাজিয়া উঠিল ভেরী,
সজোরে দর্প করি',
প্রচারিয়া রণ,
অসি ঝন্ ঝন্
বাজিল সবার হাতে হাতে,
ছুটিল উড়াতে অরি মাথে।

"অসাধ্য যাহা
সাধ আজি তাহা,
ওরে অদ্রির সন্তান,
দেখায়ে জগতে
মায়ের তরেতে
কেমনেরে দিতে হয় প্রাণ!
স্বাধীনতা ধন
করিবে হরণ
সে কি হবে কভু সহ্য,
তাহার যে কাছে
সব হায় মিছে
জীবন সে অতি তুচ্ছ!"
উৎসাহে সবে মাতি,
উঠিছে ফুলায়ে ছাতি,
অগ্নির বাণ
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ
পাতিছে গিরি ঢালু গায়,
ভ্রূক্ষেপ নাহি কিছু তায়।

অর্দ্ধেক পথে
শমনের সাথে
হ'ল সকলেরি সাক্ষাৎ,
করাতের পাতে
গোধূমের খেতে
শীর্ষ যেমন ধূলিসাৎ।
প্রথম দলের
একটী প্রাণের
দেখা আর কেহ নাহি পায়,

রক্তের ধারা
শত পথে তা'রা
গিরির গাত্র বহে ধায়।
আবার বাজিল ভেরী,
আবার খড়্গ ধরি',
মায়েরে তখন
করিয়া স্মরণ
নব বীর দল এল বেড়ে,
দর্পে উঠিল সবে তেড়ে।

ঝড়ের আগায়
ধূলি কণা প্রায়
তোপ মুখে উড়ে কোথা'
বার বার বার
পুনঃ এক বার
সকলি সে হ'ল বৃথা।
"দেব অভিশাপ,
হ'ল বুঝি পাপ,
আছে সে প্রায়শ্চিত্ত,
স্বদেশের হিতে
সে পাপ ক্ষালিতে
আমি দিব হৃদি রক্ত।"
আপনি থাপ্পা শেষে,
দাঁড়াল অগ্রে এসে,
"এই বার চল
দেখি কত বল
আছে ইংরাজ তোপ মুখে,
জননীর নাম লেখা বুকে।"

বীর যে ক'জন
বাকি ও তখন
ছুটিল থাপ্পা সাথে ;
পথেতে কেবল
প্রিয় শব দল
পড়িয়া গিরি গা'তে।

পাষাণ সে বুকে
আবরিয়া রেখে
পাষাণ হৃদয় খানি,
কণা করুণার
নাহি সেথা আর
শুধু প্রতিশোধ জানি।
মুষ্টিমেয় সে দল,
পড়িল শত্রু বল,
সাহসে ফুলিয়া
আসিল ছুটিয়া
অসি হাতে বীর বিক্রমে,
শেষ ডালি দিতে সবে যমে।

বহ্নি যেমতে
নিবিতে নিবিতে
পোড়ায় কিছু ও তবু,
তেমতি বীরের
শিখা শৌর্য্যের
হ'তেও সে নিবু নিবু,
পাইল যাহায়
সমূলে তাহায়
পাড়িল ধরণী তলে,
তার পর যায়
পড়ে হায় হায়
পাষাণ জননী কোলে।
পরাজয় পরিপূর্ণ,
থাপ্পার আশা চূর্ণ!
হেরে অরি এসে
সমরের শেষে
বীর লয়ে ক্ষত শত থান,
জননীর তরে দে'ছে প্রাণ।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ।

আমার ডাক্তারী।

এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া রেলির পাটগুদামে সামান্য কেরাণীর কার্য্যে জীবনটাকে উৎসর্গ করিয়া দিলাম। বেলা দশটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত খাটিয়া কুড়িটি টাকা মাসে উপার্জ্জন করিতাম; তাহাতে বুভুক্ষু উদর কখন আমায় আশীর্ব্বাদ করে নাই।

একটা মতলব মাথায় আসিল, ডাক্তারী করিলে হয় না! দেশে পাড়াগাঁয়ে ১০।১৫টা শিশিতে বিবিধ বর্ণের কটু, তিক্ত, কষায় জল ভরিয়া যদি ব্যবসা করি তবে মাসে ত্রিশটা টাকাও কি উপার্জ্জন করিতে পারিব না! উপার্জ্জনে দশটা টাকা বৃদ্ধি হইলে উদর দেবতার আশীর্ব্বাদ লাভ সুনিশ্চয়, এবং দাস্যমুক্ত মনের প্রফুল্লতা অবশ্যম্ভব।

দুই একখানা বাংলা ইংরাজি বই ক্রমে ক্রমে কিনিয়া পড়িতে লাগিলাম। যখন খান চার পাঁচ বই সংগ্রহ করিলাম তখন স্থির করিলাম, ডাক্তারী বিদ্যায় যথেষ্ট পরিপক্ক হইয়াছি। দাস্যবৃত্তি আর না।

চাকরী ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীতে গিয়া বসিলাম। পুঁজি গোটাকত বর্ণগর্ভ শিশি, একটা চোঙ আর একটা জ্বরের কাঠি—যাহাকে সহরে লোকে বলে থার্ম্মোমিটর।

আমাকে কেউ শক্ত পীড়া চিকিৎসার জন্য ডাকে না। মাথাধরা, পেটকামড়ানি, দাদ, চুলকণা প্রভৃতি ব্যায়রাম নামের কলঙ্ক ব্যায়রামকুলাধম দিগের চিকিৎসা আমার ভাল লাগে না।

একমাস কাটিয়া গেল। সে মাসে উপার্জ্জন করিলাম তিন টাকা তের আনা তিন পয়সা। মা কাঁদিলেন, গৃহিণী তর্জ্জন করিলেন, উদর বাপান্ত করিলেন, আমার বিবাহলব্ধ চেনছড়া বাঁধা পড়িলেন।

তখন এক বন্ধুর পরামর্শে হোমিওপ্যাথির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমার বন্ধুবর বলিলেন, তিনি নাকি একমাত্র নক্সভমিকা দিয়া ৪৫৬ রকম রোগ ভাল করিয়াছেন। আমি এহেন নক্সভমিকার প্রেমে মুগ্ধ হইব আশ্চর্য্য কি? নক্সভমিকাকে বরণ করিয়া গৃহে আনিলাম; সেকালের রাজরাণীদের মত নক্সভমিকা শত সহচরী সঙ্গে আমার অন্তঃপুর আলো করিয়া বসিলেন। বলিতে লজ্জা নাই, বন্ধুবরের মত আমার একাগ্র, একনিষ্ঠ প্রেম ছিল না; আমি পুরাকালের রাজাদের মত রাণী অপেক্ষা দাসীদের প্রতিই অধিক মনোযোগী হইলাম। প্রেয়সী এলোপ্যাথি অপেক্ষা হোমিওপ্যাথির অনেক সুবিধা দেখিলাম—৫।৭টা বোতল মিকশ্চার, পিল, পেষ্ট, প্লাষ্টার করার হাঙ্গামা কিছুই নাই। একটা ঔষধ লইয়া টুপ করিয়া একটি ফোঁটা ফেল, শিশিতে পড়ুক না পড়ুক আমি খালাস। সুয়োরাণী হোমিওপ্যাথি দুয়োরাণীকে ক্রমশ দূর করিতে লাগিল। সুয়োরাণীর সুযোগে অনেক বই খুলি আর চিকিৎসা করি। সটান সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া লোকদের শুনাইয়া দি ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারও বই দেখিয়া চিকিৎসা করিতেন।

যাহোক সুয়োরাণীর পয় ভাল। তৃতীয় মাসে আমি উপার্জ্জন করিলাম বত্রিশ টাকা সাড়ে বার আনা।

বই দেখিয়া চিকিৎসাটা চলিতে লাগিল ভালই। কিন্তু যখন মেটিরিয়া মেডিকার মধ্যে সিম্ফাসিস্ পিউবিস, অস্ আন্নমিনেটা, সুপ্রাঅরবিটাল রিজান, ফেমোর বোন, ফিফ্থ্ পেয়ার অব নভস্ প্রভৃতি পৈশাচিক ভাষার সাক্ষাৎ পাইতাম, তখন চেম্বার্সের ডিক্সনরীও আমাকে কোন হদিস বলিয়া দিত না; আমি হতাশ হইলাম।

যা হোক কোন রকমে পসারটা জমিয়া গেল। আগেই ত' বলিয়াছি যে সুয়োরাণীর পয় ভাল। দু তিন বৎসরে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিলাম—উদর দেবতা যে পরিতুষ্ট তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ—দিব্য একটু ভুঁড়ি।

গেঁয়ো লোকের মত গেঁয়ো রোগগুলোও বেশ নিরীহ রকমের। দু তিন বৎসরের চিকিৎসা ব্যবসায়ে কেহই ত মরিল না। শাস্ত্রে বলে 'শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ, সহস্রমারী চিকিৎসকঃ'। যখন মনে করিতাম যে আমি 'একমারী'ও নহি, তখন গভীর খেদে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত।

অবশেষে—হায় অবশেষে আমার পালা আসিল। এক বৃদ্ধ দম্পতির সবে ধন নীলমণি, বৃহৎ পরিবারের একমাত্র অন্নগ্রাস একটি যুবকের জ্বর হইল। চিকিৎসার্থ আহূত হইলাম ডাক্তার—আমি।

একোনাইট, ইপিকাক, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া প্রভৃতি আমার বাক্সস্থ সকল ঔষধগুলি লইয়াই নানাবিধ কসরৎ করিতে লাগিলাম। আটদিন গেল তবু জ্বর ছাড়িল না।

নবম দিনে দেখিলাম নাড়ী দুষ্প্রাপ্য—রোগী বলিল আমি ভাল আছি। আমার সাহস, রোগীর আশ্বাস, কিন্তু ভীত জনকজননীকে নিশ্চিন্ত করিতে পারিল না; তাঁহারা অন্য ডাক্তার ডাকিলেন। দশম দিনের সন্ধ্যাকালে রোগী হাসিয়া বলিল 'হাঃ হাঃ হাঃ আমি ভাল হইলাম'। বৃদ্ধ বৃদ্ধা কাঁদিয়া বলিল 'নীলমণি, বাপ্ কোথা যাস' ছোট ছোট ভাইবোন গুলি অস্ফুট কলরব করিয়া উঠিল, রোগীর স্ত্রী আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল 'ওগো আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল'। রোগীর উন্মুক্ত চক্ষু বিকশিত দন্ত ঢাকিতে না ঢাকিতে রোগী মরিয়া গেল।

হায় হায়, এ কি হইল। তাহার মৃত্যু যেন আমাকে পাইয়া বসিল। বাতাসে শুনি সেই হাসি, 'হা হা হা'। গঙ্গার জল ছলক ছলক করিয়া বলে 'নীলমণি বাপ কোথা যাস।' পাখীর কাকলীতে শিশুগুলির করুণ ক্রন্দন শুনিতে পাই। 'বউ কথা কও' ডাকে আমি চমকিয়া শুনি 'ওগো কি হ'ল'। আমার চক্ষুর সম্মুখে সেই দীপ্তদৃষ্টি বিকশিত দশন সর্ব্বদা আমাকে বিভীষিকা দেখায়।

বৃদ্ধ বৃদ্ধার চোখের দিকে চাহিতে পারি না, মনে হয় তাঁহাদের কাতরদৃষ্টি আমাকে ধিক্কার দিতেছে। তাঁহাদের কাহাকেও কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে দেখিলে মনে হয় যেন তাঁহারা আমার পরিচয় দিতেছেন 'ঐ খুনে'। লজ্জায় সঙ্কোচে আমি অস্থির হইলাম; লোকের মুখের দিকে চাহিতে আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। তাঁহারা আমায় দেখিয়া হাসিয়া সস্নেহস্বরে কুশল প্রশ্ন করিলে আমার উপহাস বোধ হইত, কান্না আসিত। মনে কেমন সদা সর্ব্বদা একটা অশান্তির ভাব জাগত থাকিত—অস্বস্তিতে প্রাণ জালাতন হইত।

খুনে হত্যাকারী কি নরকযন্ত্রণা ভোগ করে তাহার আভাস কিছু বুঝিতে পারিলাম। বিশ্বচরাচর যেন ষড়যন্ত্র করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বলিতে থাকে 'ঐ খুনে! ওগো ঐ খুনে'! অন্তরের মধ্যে করুণ প্রশ্ন উঠিতে থাকে 'আমি খুনে? ওগো আমি কি খুনে'?

আমি ডাক্তারী ছাড়িয়া আবার রেলির পাটগুদামে চাকরী লইয়াছি; কিন্তু আমার স্বস্তি নাই। ডাক্তারী আমলে গৃহিণী দু'খানা গহনা, মা দু'টা ব্রত করিয়া লোভবতী হইয়াছেন, তাঁহাদের অসন্তুষ্টি কাংস্য-ঘণ্টার মত সর্ব্বদাই আমার শ্রবণ বিদীর্ণ করিবার উপক্রম করিতেছে। এবং এখনো সেই যুবকের মৃত্যুর ধিক্কার আমার অন্তর বিমথিত করিয়া দিতেছে!

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

ভদ্রা।

(১)

উড়িষ্যার একটী নিভৃত পল্লীতে নিধিরাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অরণ্যপরিবেষ্টিত, শ্যামল গিরিরাজির উপত্যকায় অথবা মহানদীর বালুকাময় সৈকতে খেলা করিয়া তাহার জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর বেশ কাটিয়া গিয়াছিল।

তারপর নিধিরামের পিতা তাহাকে লইয়া একবার শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা দেখিতে গেল। কিন্তু তথায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় তাহার পিতার মহাযাত্রা সেইখানেই সাঙ্গ হইল। বালক নিধিরাম ব্যাপার খানা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, কারণ তাহার চারিপাশে মৃত্যুর ছবি একটা স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

নিঃসহায় নিধিরাম অনাহারে মরিল না। কোথাও একমুঠা কোথাও দুইমুঠা খাইয়া বড় হইল। রাজসিক আহারে পুষ্ট ও নবনীনিন্দিত শয্যার সম্পীড়নে ক্লিষ্টতনু ধনীতনয় অপেক্ষাও তাহার দেহে অধিক সজীবতা ও সামর্থ্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

আত্ম-শক্তির পরিচয় পাইলে মানুষ আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে চায় না। ইহা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যখন নিধিরাম বাল্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিল তখন তাহার মনে মোটা রকমের দুই একটা চিন্তা আসিয়া জুটিল। পক্ষী যেমন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞান হইয়াও অজ্ঞাত-প্রেরণায় ভাবী শাবকের জন্য সযত্নে আশ্রয়-স্থান নির্ম্মাণ করে ও তাহাতেই যেমন তাহার তৃপ্তি, নিধিরামও বুঝি তেমনি অন্ধভাবে সমুদ্রতীরে ঝাউ বৃক্ষ সমূহের অন্তরালে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর রচনা করিতেছিল। যদি কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত সে কুটীর কাহার জন্য, তাহা হইলে সে উত্তর

খুঁজিয়া পাইত না, বুঝি আপনার মর্ম্মের কথা সে নিজেও বুঝিতে পারিত না।

(২)

নিধিরাম মাছ ধরিত। আরও অনেকে মাছ ধরিত। নিধিরাম তাহাদের সহিত কলহ করিত, কখনো বা নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া আবার তাহাদেরই ভালবাসা ক্রয় করিত। ধীবরের মেয়েরা নিধিরামের সঞ্চিত সুন্দর গোলাপদলতুল্য ঝিনুকগুলি যথেচ্ছভাবে কাড়িয়া লইত। নিধিরাম কখনো হাসিত, কখনো তাহাদের উপর রাগ করিত, গালি দিত; কখনো বা তাহাদের জ্বালায় অস্থির হইয়া নিজের পুঞ্জীকৃত ধন সেই ঝিনুকগুলি সমুদ্রের সফেন উর্ম্মিরাজিতে নিক্ষেপ করিয়া হিংসাবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিত।

ভদ্রার পিতা মাতা ছিল না। সে প্রত্যহ সঙ্গিনীদের সঙ্গে মাছ ধরিতে আসিত। তাহার সঙ্গিনীরা যখন নিধিরামের উপর উপদ্রব করিত, তখন ভদ্রা তাহাদিগকে নিবারণ করিত। নিধিরাম ভদ্রাকে ভালবাসিত কি না বলা যায় না। কিন্তু ভদ্রা তাহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে ইন্ধনসংগ্রহের নিমিত্ত অনেক সময় নিধিরামের কুটীরের চতুঃপার্শ্বস্থ ঝাউবনে ঘুরিয়া বেড়াইত। নিধিরামও জাল বুনিতে বুনিতে অনেক সময় তাহাদের সঙ্গে নিজের সুখ দুঃখের কথা বলিত।

যেখানে সভ্যতার আলোক প্রবেশ করিয়াছে সেখানে প্রেম অনেক প্রতীক্ষা করে, অনেক বিচার করে, সময়ে সময়ে হাট বাজার করার মত ক্ষতি লাভ হিসাব করিয়া দেখে কিন্তু যেখানে প্রেম শুধু প্রার্থিতকে চায়, তাহার আর কিছু দেখে না, সেখানে একটা সহজ সরল বন্ধন আপনিই আপনার অধিকার বিস্তার করে—সামাজিকতা বা পৌরোহিত্যের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না। নিধিরাম ভদ্রাকে বিবাহ করিল। উভয়েই মনে করিল, তাহারা সুখী হইয়াছে।

(৩)

শ্রাবণ মাসে উদার উন্মুক্ত আকাশে প্রভাতকালেই মেঘ ঘনীভূত হইতেছিল। সুদূর চক্রবাল হইতে আরম্ভ করিয়া যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু মেঘের ঘটা। আর সিন্ধু যেন ফুঁপিয়া, গর্জ্জিয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছিল। ভদ্রা কুটীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ছিল। মেঘাড়ম্বর দেখিয়া নিধিরাম একটা দুর্য্যোগ আশঙ্কা করিয়া কোথাও বাহির হয় নাই। হঠাৎ মেঘগর্জ্জনে ভদ্রা শিহরিয়া উঠিল। ভদ্রাকে তদবস্থ দেখিয়া নিধিরাম তাহার আসন্নপ্রসবাবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া কুটীর মধ্যে যাইতে বলিল।

ভদ্রা কুটীরে প্রবেশ করিল, নিধিরাম আপনার মনে কাজ করিতে লাগিল। আর মধ্যে মধ্যে ভয়কম্পিতা ভদ্রার নিকট আসিয়া আশ্বাস দিতে লাগিল।

দিন শেষ হইবার পূর্ব্বেই চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল। বিষম ঘূর্ণিবায়ু চারিদিকে অট্টহাস্যে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিধিরাম কুটীর দ্বার বন্ধ করিয়া চকমকি ঠুকিয়া প্রদীপ জ্বালিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। তখন সে জীর্ণশয্যার উপর ভদ্রার মস্তকটী আপনার বক্ষের মধ্যে রাখিয়া তাহার সহিত কথা বলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু রোষদীপ্ত সিন্ধুর গর্জ্জন ও ঝাউবনের শাখাপল্লবের মধ্যে বাধাপ্রাপ্ত ঝটিকার প্রলয়-প্রলাপে তাহার সে চেষ্টাও বিফল হইল। ভদ্রা অসীম নির্ভরের সহিত স্বামীর কটিদেশ আঁকড়িয়া ধরিল।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। ঝটিকার দাপট প্রবলতর হইতে লাগিল। যখন সমুদ্রস্রোতের বিপুল মর্ম্মরধ্বনি নিকটে শ্রুত হইল, তখন ভদ্রা একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল, তারপর কে কোথায় গেল তার চিহ্নও রহিল না।

(৪)

রাত্রির ঝড়বৃষ্টির পর প্রভাতের অরুণজাল বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। আশে পাশে রাত্রির বিপ্লবের কিছু কিছু চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। চক্রবাল-রেখা বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। অন্যান্য দিনের ন্যায় ধীবর ও ধীবর-ললনাগণ তখনও কলহ-কাকলীতে বেলাভূমি মুখরিত করে নাই।

নিধিরাম উন্মত্তের ন্যায় কি খুঁজিতেছিল। একস্থানে একটী মৃত রাসভ পড়িয়াছিল। তাহার পার্শ্বেই একটী বস্ত্রের স্তূপ। নিধিরাম বারম্বার সেই বস্ত্ররাশি উলটিয়া পালটিয়া দেখিল। প্রণয়ীর হৃদয় যেন আপনার দৃষ্টি-শক্তিকেও বিশ্বাস করিতে চাহে না। তারপর শূন্য বস্ত্রস্তূপ ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। যাহার সন্ধানে ছুটিতেছিল এবার তাহার সন্ধান পাইল: হৃদয়ের ধন একখানি ভগ্ন নৌকার প্রান্তে লৌহ-শৃঙ্খলের বেষ্টনের মধ্যে পড়িয়াছিল। উন্মত্ত

নিধিরাম তাহার পাণ্ডুবর্ণ কপোলে একটী উত্তপ্ত চুম্বন করিল। ভাবিয়াছিল সে জাগিবে; কিন্তু সে জাগিল না। তখন সে তাহার কঠিন, বিবর্ণ দেহযষ্টি স্পর্শ করিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার ক্রন্দনে ভদ্রার বস্ত্র ঈষৎ কম্পিত হইল। বস্ত্রাঞ্চল অপসারিত করিয়া নিধিরাম দেখিল একটী সুন্দর সদ্যোজাত শিশু কন্যা। তাহার কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ ললাট অতিক্রম করিয়া ক্ষীণ ভ্রূরেখাযুগলের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। উহাকে দুই হস্তে তুলিয়া লইবা মাত্র শিশু ক্রন্দন করিয়া তাহার জীবনের পরিচয় দিল। নিধিরাম স্থির হইয়া দেখিল সে ভদ্রার রূপান্তর মাত্র!

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিল্পসমিতির প্রবন্ধাবলী।

দেশলাইয়ের উপযুক্ত কাঠ।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, এফ, এল, এস, রচিত প্রবন্ধ সাময়িক ও যথেষ্ট তথ্যপূর্ণ হইয়াছে। নিম্নে তাহার সার সঙ্কলিত হইল—

সুইডেন দেশ দেশলাই প্রস্তুত কার্য্যে প্রধান। তথায় অ্যাস্পেন নামক কাঠেই প্রধানত দেশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স প্রস্তুত হয়। তৎপরে পাইন কাঠের আসন। ভারতে অ্যাস্পেন কোথাও জন্মে না। অ্যাস্পেন সদৃশ একরূপ কাঠ কাশ্মীর ও পঞ্জাবের নিকটস্থ হিমালয় পর্ব্বতে এবং আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা কোথাও প্রচুর জন্মে না, এবং ফুল বা ফল প্রসব করে না বলিয়া ইহার চাষ করাও দুষ্কর। এই গাছের কাশ্মীরী নাম জংলী ফ্র্যাষ্ট। ইহারই কাঠে আঙুরের বাক্স তৈয়ার হয়; সুতরাং ইহা একরূপ সকলেরই পরিচিত। পঞ্জাবের উত্তর সীমার লোক ব্যতীত অপর কাহারো ইহা পাওয়া দুষ্কর, অতএব ইহার আশা আমাদের ত্যাগ করা উচিত।

পাইন গাছও ভারতে জন্মে না। য়ুরোপের প্রধান দুইটি কাঠই যখন আমাদের দেশে অপ্রাপ্য তখন তদ্বৎ অন্য কোন কাঠের সন্ধান করিতে হইবে। সুতরাং কিরূপ গুণবিশিষ্ট কাঠ আবশ্যক তাহা অগ্রে জানা উচিত।

দেশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স উভয়ের জন্যই এমন কাঠ আবশ্যক যাহা সহজে চেরা যায়, অথচ চিরিতে বা বাক্স তৈয়ারি করিবার জন্য নোওাইলে ভাঙিয়া যায় না, এবং স্থিতিস্থাপক। কাঠির জন্য ইহা সহজ দাহ্য হওয়া দরকার এবং একবার ধরিয়া গেলে শেষ পর্য্যন্ত সমানভাবে জ্বলিবে ও জ্বলিবার সময় কোনরূপ বদগন্ধ বাহির হইবে না। দেশলাইয়ের কাঠ নরম ও হাল্কা অথচ চিম্‌ড়ে হওয়া দরকার। নতুবা জ্বালিবার জন্য ঘসলে ভাঙিয়া যাইবে। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য ইহাও আবশ্যক যে, কারখানার নিকটেই যথেষ্ট পরিমাণে সেই কাঠ পাওয়া যাইবে।

লম্বা ঘননিবিষ্ট আঁশবিশিষ্ট ও গ্রন্থিশূন্য কাঠ চেরা সহজ। অনেক গাছ স্বভাবতই সোজা হয়। এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করিলে গাছকে সোজা ও গ্রন্থিশূন্য হইতে বাধ্য করিতে পারা যায়।

সুইডেনে কলে দেশালায়ের কাঠি প্রস্তুত করা হয়। কাঠির মাপে পুরু কাঠের তক্তা চিরিয়া ছোট ছোট কাঠি কাটিয়া লওয়া হয়।

ভাল দেশলাইয়ে কাঠিকে সহজদাহ্য করিবার জন্য প্যারাফিন জাতীয় দ্রব্যে ভিজাইয়া লওয়া হয়। কোন কোন কাঠ স্বভাবতই সর্জ্জরস তুল্য দাহ্য রসযুক্ত বা তৈলাক্ত হয়। সেইরূপ কাঠ প্যারাফিন সংযোগ করা অপেক্ষা গ্রহণীয়। অনেক খারাপ কাঠে শীঘ্র আগুন ধরাইবার জন্য মুখের কাছে গন্ধক লাগান হয়।

জ্বলিবার সময় দুর্গন্ধজনক কাঠ ত্যাগ করিবার জন্য এক্ষণে বিশেষ অন্বেষণের আবশ্যক নাই। গন্ধক লাগান ঘসা দেশলাই (লাল দেশলাই) জ্বলিবার সময় বিষম ধূম ও দুর্গন্ধ উদ্গার করে। তাহারই যখন বাজারে যথেষ্ট কাটতি, তখন বিশেষ চিন্তা নাই।

দেশলাইয়ের উপযুক্ত কাঠ কি এবং তাহার যথেষ্ট সরবরাহ কিরূপে হইতে পারে, ইহাই প্রধান আলোচ্য। আমাদের দেশে সহজ প্রাপ্য অথচ উপরিলিখিত গুণবিশিষ্ট দেশলাইয়ের কাঠের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

১। গাহোরি সোপা।

আসাম ও কাছাড়ে পাওয়া যায়, কিন্তু যথেষ্ট নহে। আসামী নাম।

২। শিমূল।

বাংলায় যথেষ্ট, ভারতের সকল দেশেই পাওয়া যায়। কাঠে যথেষ্ট ফস্ফরিক এসিড আছে। বীজ ও ডাল হইতে শীঘ্র জন্মে।

৩। মহা-নিম, ঘোড়করম।

উড়িষ্যা, পালামো, ছোটনাগপুর, প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। প্রচুর নহে; কিন্তু বীজ ও ডাল রোপণ করিলে শীঘ্র জন্মে।

৪। শলৈ বা শালাই (?)

বাংলা নাম (?)। দেশলাইয়ের খুব উপযোগী নহে, কিন্তু কাঠে যথেষ্ট দাহ্যরস আছে। রাজপুতানা হইতে ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত পাহাড় জন্মে।

৫। গম্ফাণ্ড্রা এক্সিল্লারিস।

শ্রীহট্ট ও মালাবার উপকূলে প্রাপ্তব্য। বোটানির নাম। দেশী নামের উল্লেখ নাই।

৬। হলিগারণা বেডোমি (?)

পশ্চিম ঘাটে পাওয়া যায়। বোটানির নাম, দেশী নাম অজ্ঞাত।

৭। আমড়া।

সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য। শীঘ্র জন্মান যায়।

৮। বকফুল।

বাংলায় চেষ্টা করিলে প্রচুর উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

৯। ধোল্‌ধক।

হিন্দীনাম। ভারত ও বর্ম্মার জঙ্গলে জন্মে।

১০। পালিতামাদার।

পূর্ব্ববঙ্গে অধিক জন্মে।

১১। ত্যান্‌্যিন।

বর্ম্মা নাম। বর্ম্মায় জন্মে।

১২। পিটেল্লা।

উড়িয়া নাম। উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্য ইহার জন্মস্থান।

১৩। সন্দুগাঁজা (?)

দারজিলিং, তরাই, গারো হিল ও বর্ম্মায় পাওয়া যায়।

১৪। কদম।

ইহার কাঠে বদগন্ধ আছে। বাংলা, আসাম, দারজিলিং তরাই ও বর্ম্মার পেগুতে পাওয়া যায়।

১৫। শিরিদ।

মারাঠী নাম। পশ্চিম ঘাটে জন্মে। গাছ খুব বড় হয়।

১৬। ভলেনা বা ভোলন।

হিন্দি নাম। ভারতের সব জঙ্গলে পাওয়া যায়।

১৭। বহল।

বাংলা নাম। লাসোরা—হিন্দি নাম। স্যাঁতা জঙ্গলে জন্মে।

১৮। বপ।

ল্যাপচা নাম। আসাম, বর্ম্মা ও পূর্ব্ব হিমালয় ইহার প্রাপ্তি স্থান। ইহার কাঠ অত্যন্ত নরম, এবং বেশি জন্মেও না।

১৯। গামার, গাম্ভির বা গাম্ভারি।

ভারত ব্রহ্মের স্যাঁতা জায়গায় জন্মে।

২০। পিঠালি বা পিঠুলি।

বাংলার পল্লীগ্রামে পাওয়া যায়। হিমালয় ও চট্টগ্রামের জঙ্গলে জন্মে।

২১। গেঁওয়া।

বাংলা নাম (?)। ভারত, ব্রহ্ম, ও আন্দামানের জঙ্গলে জন্মে। সুন্দর বনে যথেষ্ট। কলিকাতায় ইহার কাঠ তক্তাপোষ ও অন্যান্য সস্তা কাঠের কাজে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। (কেওড়া কাঠ কি?—লেখক)।

২২। মোলেং।

বর্ম্মা নাম। একরকম তুঁত গাছ। জাপানে ইহার ছালে কাগজ তৈয়ারি হয়। বর্ম্মা ও মর্ত্তবানে যথেষ্ট জন্মে। চেষ্টা করিলে পূর্ব্ব ও মধ্য বঙ্গে জন্মান যাইতে পারে। জন্মাইতে পারিলে কাঠ হইতে দেশলাই এবং ছাল হইতে কাগজের উপাদান পাওয়া সহজ হয়। ইহা খুব শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে এবং ইহার গোড়া হইতে অনেক গাছ উদ্গত হয়। ইংরাজি নাম The Paper-Mulberry-Tree of Japan.



রামপঞ্চায়তন।

শ্রীযুক্ত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর কর্তৃক প্রবাসীর জন্য অঙ্কিত।

Kuntaline Press, Calcutta.

২৩। ডুমুর।

সর্ব্বত্রজ।

২৪। জংলি ফ্রাস্ট।

কাশ্মীরি নাম। পঞ্জাবী নাম মল। পঞ্জাব হিমালয় ও কাশ্মীর হইতে আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত ভূভাগ ইহার জন্মস্থান। ইহা য়ুরোপীয় পাইন তুল্য, এবং ইহার কথা প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে। এদেশপ্রাপ্য সকল কাঠের মধ্যে ইহাই দেশলাইয়ের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

২৫। বাঙ্গিকাঠ।

(নেপালি) বা গরপিপল (কুমায়ুন)—সিন্ধু হইতে ভুটান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হিমালয় পর্ব্বতে পাওয়া যায়। ইহার কাঠ উৎকর্ষে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারে। দারজিলিঙ হইতে ইহা সংগ্রহ করা সহজ বোধ হয়। দারজিলিঙে আর একরকম কাঠ আছে। যাহাকে লেপচারা বলে

২৬। সুংরিবং।

ইহার কাঠও দেশলাইয়ের পক্ষে তুল্য উপযোগী হওয়া সম্ভব।

২৭। টংসি।

(ভুটিয়া নাম) বা কৈল (জৌনসর)—ইহার ইংরাজি নাম Blue pine। জন্মস্থান পশ্চিম হিমালয় ও ভুটান।

২৮। চীর

(হিন্দি) গিট (লেপচা)—আফগানিস্থান হইতে ভুটান পর্য্যন্ত বিস্তৃত বহির্হিমালয়ে পাওয়া যায়। ইংরাজি নাম Long-leaved pine.

২৯। রাই

(হিন্দি)—হিমালয়ে প্রাপ্তব্য। ইংরাজি নাম The Himalayan Spruce.

৩০। মরিন্দা

(হিন্দি) নেপালের পশ্চিম হিমালয়ে জন্মে। ইংরাজি নাম The Himalayan Silver Fir। ইহার এবং রাই গাছের কাঠ দেশলাইয়ের কাঠির বেশ উপযুক্ত, কিন্তু বাক্সের পক্ষে বড় নরম।

৩১। বাঁশ।

যাহা নিতান্ত ফাঁপা নয়, যাহার বাতা খুব পুরু হয়, এমন বাঁশের উল্লেখও এই সঙ্গে করা যাইতে পারে। নিরেট বাঁশে কাঠি এবং ফাঁপা বাঁশে বাক্স তৈয়ারি হইতে পারে। এই সব বাক্স চোঙের আকারে হইবে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? কাঠের চাকতি দিয়া চোঙের এক মুখ বন্ধ করিয়া অন্য মুখে কোন রকম একটা ঢাকনি লাগাইলে দিব্য বাক্স হইয়া যাইবে। কাঠি ঘসিয়া জ্বালিবার মসলা (ফস্ফরাস, বা শিরিষ ও কাঁচের গুঁড়া) দুই দিকের চাকতিতে বা চোঙের পাশ চাঁছিয়া চেপ্টা করিয়া তাহাতে লাগান চলে।

যদি কেহ দেশলাইয়ের কারখানা খুলেন, তিনি উপরিউক্ত ৩১ রকম কাঠের মধ্যে প্রথমত শিমুল, আমড়া ও গেঁওয়া (বা কেওড়া) কাঠ কাঠির জন্য এবং কদম ও পিঠালি বাক্সের জন্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

কোন কাঠের নমুনা দরকার হইলে The Imperial Forest Economist, Imperial Forest College and Research Institute, Dehra Dun, ঠিকানায় আবেদন করিলে নমুনার কাঠ পাওয়া যাইতে পারে।

জ্যোতিনির্ব্বাণ।

ষোড়শ-পরিচ্ছেদ।

বিপদের মুখে।

তখনও রজনীর শেষযাম আছে। ঊষার আলো ফুটিবার অনেকটা বিলম্ব। নীলাকাশের গায়ে তখনও তারকার জ্যোতি নিভে নাই। সঞ্জীবনী ঊষার শীতল বাতাস তখনও অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত বনকুসুম গুলিকে দোলাইয়া চঞ্চল করে নাই।

কেদার রায় কালিদাসকে ডাকিলেন। প্রভুভক্ত ব্রাহ্মণ তখনই অস্ত্র শস্ত্রে বিভূষিত হইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

যুবরাজ বলিলেন—"কালিদাস! আমাদের এখানকার কাজ শেষ হইয়াছে। তুমি রাণীকে লইয়া অগ্রসর হও।"

কালিদাস একটু বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিলেন—"কেন আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাইবেন না।"

"যখন তুমি সঙ্গে আছ, তখন আমার না গেলেও চলে। আমি ধলেশ্বরীর মোহানায় একবার যাইব। সে দিন অন্ধকারে সে স্থান দেখিয়াছি। আজ একবার দিবালোকে সেটী ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করি।"

কালিদাস প্রভুর মনের কথা বুঝিয়া বলিল—শিবিকা প্রস্তুতের আদেশ দিয়াছি। বোধ হয় বাহকেরা প্রস্তুত হইয়াছে। আমি রাণীমাকে লইয়া বাহিরে যাই।

এমন সময়ে অনীতা সেই স্থানে আসিলেন।—অশ্রুপূর্ণ নয়নে কমলাকে বলিলেন—"মা! আশীর্ব্বাদ করি, স্বামী-সোহাগিনী হও। স্বামীর সহিত কর্ত্তব্যপালনে যশোময়ী হও।"

কমলা ও কেদার রায়—ভৈরবীর পদবন্দনা করিলেন। কালিদাস ও মস্তক অবনত করিল। অনীতা বলিলেন—"শিবিকা প্রস্তুত, চল তোমাদের তুলিয়া দিয়া আসি।"

কেদার রায় অনীতাকে নিজের মনের উদ্দেশ্য বলিলেন। তিনি শুনিয়া কোন আপত্তি করিলেন না।

সেই ক্ষুদ্র গুহার আঙ্গিনায় শিবিকায় উঠিয়া, কমলা চলিয়া গেলেন। কেদার রায়ও অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া অন্যপথে গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন এতটুকু আলো ফুটিয়াছে যে পথ দেখা যায়।

অগ্রে পশ্চাতে চারিজন করিয়া রক্ষী। শিবিকার পার্শ্বে উন্মুক্ত অসি হস্তে কালিদাস। অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার পর কালিদাসের মনে এক নূতন কল্পনা আসিল। প্রভাতের পূর্ব্বে শ্রীপুরে পৌছিতে হইলে এ পথে বিলম্ব হইতে পারে। গৌরীপুরের জঙ্গলের পথ দিয়া গেলে অতি সহজেই পদ্মার তীরবর্ত্তী হওয়া যাইবে। বিক্রমপুরের আশে পাশে কোন স্থানই কালিদাসের অপরিচিত ছিল না।

তবে গৌরীপুরের জঙ্গলটা বড় নিবিড়। নদীর তীরবর্ত্তী বলিয়া দুই একবার ইতিপূর্ব্বে ডাকাতিও হইয়া গিয়াছে। কালিদাস সৈনিকপুরুষ, সাহসী—তাহাতে তাহার সঙ্গে আটজন বাছা বাছা অস্ত্রধারী। ছয়জন জোয়ান শিবিকাবাহক। আর এই ভোরের বেলায় কি ডাকাত সেই বনে বসিয়া আছে!

কালিদাস ভয় পাইল না। সেনাগণকে গৌরীপুরের জঙ্গলের পথ ধরিতে ইঙ্গিত করিল। অজাগর গতিতে বাঁকিয়া চুরিয়া সওয়ারী সমেত শিবিকা জঙ্গল পথে অগ্রসর হইল।

বাহিরে উষার আলোক ছটা একটু একটু ফুটিয়াছিল; কিন্তু এই জঙ্গলের গভীরতার জন্য এখানে সেরূপ ফুটিতে পারে নাই। কাজেই অন্ধকার ও নির্জ্জনতার সহায়তায় বনস্থলী একটু ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। তবে জঙ্গলের সকল অংশই সমান গভীর নহে।

সহসা সেই জঙ্গলে শুষ্ক পত্রের উপর দুর দ্রুত পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। সাহসী কালিদাস মনে ভাবিল—বন্যশৃগাল। সে তাহা গ্রাহ্যও করিল না। আবার সেইরূপ পদশব্দ! কালিদাস ভাবিল—ভ্রম!

এবার ভ্রম যেন সত্যে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। সহসা সন্ সন্ শব্দে এক তীর আসিয়া কালিদাসের দক্ষিণ কর্ণের নিকট দিয়া চলিয়া গেল।

কালিদাস অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই বিশেষ লক্ষ্য হয় না। তবে অদূরস্থ বৃক্ষকাণ্ডের নিকটে যেন দুই চারিটী ছায়ামূর্ত্তি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া বোধ হইল।

কালিদাস অব্যর্থ লক্ষ্যে তীর ছুড়িল। সে তীর গিয়া বৃক্ষান্তরালের সেই লুকায়িত মূর্ত্তিসমূহের একজনের মাথা ভেদ করিল। সে চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

সহসা অপর পক্ষ হইতে বন্দুকের আওয়াজ হইল। বন্দুকের গুলি ছুটিয়া গিয়া এক গাছের গায়ে বিদ্ধ হইল। গাছ না থাকিলে, সেই গুলি কালিদাসের মাথা বিঁধিত।

কিন্তু সহসা কি যে যেন এক অদ্ভুত মায়াবলে বন-ভূমির শুষ্ক পত্রাদি জ্বলিয়া উঠিয়া এক সর্ব্বভুক প্রচণ্ড অনল সৃষ্টি করিল। সে অনল-জ্যোতিতে সেই অন্ধকারমণ্ডিত শ্যামল বনভূমি উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল! কালিদাস দেখিল—সেখান হইতে চার রশি দূরে প্রায় ১৫।২০ জন দস্যু বৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া।

বন্দুকের মুখনিঃসৃত জ্বলন্ত বারুদের আগুনে বনের শুষ্ক পত্র জ্বলিয়া উঠিয়া যে এই আলোক সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বুঝিতে কালিদাসের বিলম্ব হইল না। সে আগে শত্রুর মুখ দেখিতে পায় নাই। এখন তাহাদের সকলকেই দেখিতে পাইল। এই বনানল সে ভগবৎ-প্রেরিত বলিয়াই বুঝিল।

কালিদাস আটজন রক্ষীর দিকে ফিরিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল—"ভাই সব! আজ মহাকর্ত্তব্য আমাদের সম্মুখে।

রাণীমাকে রক্ষার জন্য সকলকেই প্রাণ দিতে হইবে। শত শরাঘাত, সহস্র বন্দুকের গুলি, আমাদের বিচলিত করিতে পারিবে না। দেহে প্রাণ থাকিতে শিবিকার নিকট কেহই অগ্রসর হইতে পারিবে না। বল তোমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত?"

প্রতিপক্ষদল সংখ্যায় বেশী। তবু চাঁদরায়ের সেনারা ভয় পাইল না। তাহারা—"জয় মা কালী" বলিয়া একটা হুঙ্কার করিয়া উঠিল। সে হুঙ্কারে যেন সেই বনপথ বিস্তারিত অনলের সর্ব্বগ্রাসী শিখা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল।

কালিদাস আবার বলিল—"তোমরা চারিজন এইখানে শিবিকা রক্ষা কর। আমি অপর চারিজনকে লইয়া শত্রুদের আক্রমণ করি। আমার বোধ হয়, আরও বেশীলোক এই বনের অন্যস্থানে লুক্কায়িত আছে।"

তৎক্ষণাৎ চারিজন সেনা কালিদাসের সঙ্গ লইল। কমলা শিবিকার আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিয়া সবই দেখিতেছিলেন। কালিদাস তাঁহার রক্ষার জন্য অনর্থক নিজের প্রাণ বলি দিতে যাইতেছে দেখিয়া, কমলা কালিদাসের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"যাইও না—বাবা! উহারা সংখ্যায় বেশী। কেন বৃথা প্রাণ দিবে।

কালিদাস বলিল—"কেমন করিয়া সহ্য করিব রাণীমা! আমরা জীবিত থাকিতে যে, দস্যুরা আসিয়া আপনার অঙ্গ-স্পর্শ করিবে?"

কমলা স্থিরভাবে বলিলেন,—"অঙ্গস্পর্শ করিবে কেন? আমার গায়ে যাহা কিছু আছে সবই খুলিয়া দিই। তুমি উহাদের দিয়া আইস।"

কালিদাস রাণীর এ প্রস্তাব বড় সুযুক্তি বলিয়া মনে করিল না। বলিল—"অলঙ্কার লইয়াই কি দস্যুরা ক্ষান্ত হইবে! যদি তাহাদের অন্য উদ্দেশ্য থাকে।"

কমলা গ্রীবা উন্নত করিয়া সিংহীর ন্যায় সরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"না উহাদের আর কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তবে তুমি এরূপ ভাবে চারিজন লোক লইয়া যাইও না। আমি রাণী—আমার কথা শোন।"

কালিদাস বলিল—"তাই করিব মা! আপনি শিবিকার মধ্যে যান। চারিজনে—শিবিকা রক্ষা করুক, আর আমরা মোহাড়ায় দাঁড়াই।

দস্যুরা আর বিলম্ব করিতে পারিতেছিল না। অমন শিকার হাত ছাড়া হয়। গাছের আড়ালে এই আট জন লোকে এমন ভাবে সার দিয়া কৌশলে দাঁড়াইয়াছিল যেন বোধ হইতেছিল সঙ্গে অনেক লোক আছে।

সহসা দস্যুদলের মধ্যে হইতে এক ব্যক্তি বন্দুকহস্তে সকলের অগ্রে আসিয়া বলিল—"Down with them: can't lose precious moments গুলি চালাও।"

তীক্ষ্ণবুদ্ধি কালিদাস বুঝিয়া লইল—দস্যুদের মধ্যে পর্টুগীজ আছে। এতদিন যে অত্যাচার সাধারণ প্রজার উপর হইতেছিল, আজ তাহা রাজ্যের রাণীর উপর হইতে চলিয়াছে।

কালিদাসের সেই কালিকা মূর্ত্তি মনে পড়িল—অনীতার নিকটে সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য মনে পড়িল—যুবরাজ ও রাণীর পবিত্র শপথ মনে পড়িল। কালীদাস সাহসে বুক বাঁধিয়া চীৎকার করিল—"জয় মা ভবানীর জয়।"

সে চীৎকারে বনস্থলী আবার কাঁপিয়া উঠিল—আবার সেই কখনও নির্ব্বাণোন্মুখ কখনও জ্বলনোন্মুখ, বনাগ্নিশিখা কাঁপিয়া উঠিল—সেই আট জন সৈনিকের বক্ষমধ্যস্থ ধমনীতে শোনিতপ্রবাহের উপর প্রতিধ্বনি সংঘাত হইল—"জয় মা ভবানীর জয়।"

কাহারা যেন অদূর হইতে ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে—মহাকল্লোল তুলিয়া হাঁকিল—"জয় মা ভবানীর জয়।"

প্রতিধ্বনি বায়ুস্তরে না মিশাইতে মিশাইতে উন্মুক্ত তরবারি ও বর্ষাহস্তে একদল সৈনিক সহসা সেই বনক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অতর্কিত ভাবে পশ্চাত হইতে ডাকাতদের আক্রমণ করিল।

তাহাদের বর্ষায় ও তরবারির আঘাতে কয়েকজন ডাকাত মরিল। যাহাদের হাতে বন্দুক ছিল, তাহারা বন্দুক ছুঁড়িবার অবসর পাইল না। দস্যুরা ঊর্দ্ধশ্বাসে অন্ধকারের মধ্যে মিশাইল।

কোলাহল চলিয়া গেল—বিপদ চলিয়া গেল—আবার সেই উত্তেজনাময় বনভূমি পূর্ব্ববৎ স্থির গাম্ভীর্য্যে পরিপূরিত হইল। যাহারা পিছন হইতে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা যে রাজসংসারের লোক, কালিদাস তাহা বুঝিতে পারিল। কিন্তু কাহার অধীনে কি অবস্থায়, শত্রুর সন্ধান পাইয়া তাহারা এই গভীর বনে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না।

বিজয়ী সেনাগণ নিকটে আসিল। তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া কালিদাসের পদবন্দনা করিয়া বলিল —"সর্দ্দার! আজ আল্লা আমাদের রক্ষা করিয়াছেন।"

কালিদাস তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—"কালুসেখ! তুমি ভাই কেমন করিয়া এখানে আসিলে?"

"সেই শক্তিরূপিণী ভবানী আমাদের পাঠাইয়াছেন।"

"সব খুলিয়া বল কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না? যুবরাজের সহিত দেখা হইয়াছিল?"

"তাঁহার সন্ধান জানি না, আমরা রাণীর সন্ধানে এ বনে আসিয়াছিলাম। আমাদের মা কোথায়?"

কমলা শিবিকা হইতে বাহির হইয়া বলিলেন—"কালু সেখ! এই যে তোমাদের মা! বাবা তোমাদের মত সন্তানের মা হইতে পাওয়ার কত আনন্দ, কত গৌরব, তাহা আজ বেশ করিয়া বুঝিলাম। কালু সেখ! তুমি মুসলমান। কিন্তু তুমি আমার স্নেহময় সন্তান। এই হিন্দুমুসলমানের মা হইয়া আজ আমি এই বিক্রমপুরের শক্তিময়ী রাজরাণী।"

কালু সেখ আভূমি প্রণত হইয়া রাণীকে সম্মান প্রদর্শন করিল। কমলা সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি কালু! তোমরা কেমন করিয়া এখানে আসিলে?"

কালু সেখ বলিতে লাগিল—"মা! আপনি ও যুবরাজ চলিয়া আসিবার পর গোঁসাই ঠাকুর আমাদের ডাকিয়া পাঠান।"

"ঠাকুর কি জানিয়াছেন আমরা এখানে আসিয়াছি?"

"হাঁ—তাঁহার চক্ষে ধুলা দিবার উপায় নাই যে মা!"

"মহারাজ জানিয়াছেন?"

"ঠাকুর জানিলেই মহারাজ জানিবেন।"

মহারাজ যখন শুনিলেন, কি ঘটনায় আপনি রাজপুরী ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তিনি বিস্ময়াপ্লুত হইলেন। ভৈরবীর এ অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপে কি এক মোহময় রহস্য বিজড়িত তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তবে যুবরাজ ও রক্ষীরা সঙ্গে আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।"

"তবে তোমরা আসিলে কেন?"

"গোঁসাই ঠাকুর আমাদের পাঠাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন দেশ কাল অতি খারাপ। দেশে যে অত্যাচার হইতেছে, তাহাতে রাজরাণীরও পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। বিপদে পড়িলে আটজন রক্ষীতে কিছুই করিতে পারিবে না।"

"তোমরা কখন আসিয়াছিলে?"

"রাত্রি দ্বিপ্রহরে।"

"আমরা যে এ বনে আসিয়াছি জানিলে কিরূপে?"

"গোঁসাই ঠাকুরের মুখে।"

"ঠাকুর আমাদের গন্তব্য পথ জানিলেন কিরূপে?"

"আপনাতে ও সেই সন্ন্যাসিনীতে যখন মন্দিরে কথা হইতেছিল—ঠাকুর তাহা সবই শুনিয়াছিলেন।"

কমলা মনে মনে ভাবিলেন, রাজগুরু গোঁসাই ঠাকুর কেবল শাস্ত্রাধ্যায়ী নহেন। মন্ত্রণা ভেদেও তাঁহার শক্তি যথেষ্ট। কমলা আবার প্রশ্ন করিলেন—"তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

"আমরা সমস্ত রাত সেই গুহার বাহিরে ছিলাম। আপনার বাহক ও সিপাহীগণ গুহার ভিতরে ছিল। কেন না আমরা তাহাদের বাহিরে খুঁজিয়া পাই নাই। পথশ্রমে ক্লান্ত হওয়ায়, আমার সঙ্গীরা নিদ্রিত হয়। শেষ রাত্রে বাহকদের কথোপকথন শব্দ ও পদশব্দ শুনিয়া আমরা আপনাদের অনুসরণ করি। কিন্তু সহসা আপনারা গৌরীপুরের জঙ্গলে প্রবেশ করায় আমরা আর অনুসরণ করিতে পারি নাই।"

"কি করিয়া টের পাইলে—যে আমরা দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি?"

"প্রথমে কিছুই জানিতে পারি নাই। সহসা জঙ্গলের মধ্যে অতি দূর হইতে আলোর রেখা দেখিয়া আমরা দ্রুত পদে অগ্রসর হইলাম। আলো লক্ষ্য করিয়া, বনজঙ্গল লতাগুল্ম ভেদ করিয়া নিকটে আসিয়া দেখিতে পাইলাম—দস্যুদল আপনাদের উপর আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে। জঙ্গলের মধ্যস্থিত আলোকে আমরা সেনাপতিকে চিনিতে পারিয়া—আমাদের রক্ষীদের চিনিতে পারিয়া, শত্রুদের পশ্চাৎ হইতে সবেগে আক্রমণ করিলাম।"

কমলার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হইল। অধীনস্থদিগকে নিতান্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ দেখিলে যে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রাণে আসে তাহাই চক্ষু ফুটিয়া প্রবাহিত হয়। কমলার এ অশ্রুধারাও—তাই।

শ্বশুরের—রাজগুরুর অনুমতি না লইয়া গোপনে পুরী

ত্যাগ করিয়া কমলা যে পাপ করিয়াছিলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল। কমলা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আজ যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছি, জীবনান্ত পর্য্যন্ত তাহা পালন করিব। যাহারা দেশের সামান্য আশ্রয়হীন প্রজা হইতে শক্তি-সম্পদ-সম্পন্না রাজরাণীর উপর অত্যাচার করিতে প্রস্তুত, স্বামীর সহায়তায় তাহাদের সমূলে উচ্ছেদ করিব। না পারি, আর যেন কেহ আমাকে বিক্রমপুরের রাজরাণী বলিয়া না ডাকে।"

কমলা সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া সেনাদের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন—"বৎস! এগুলি তোমাদের, তোমরা ইহা রক্ষা করিয়াছ এবং এ রাজপ্রসাদ তোমাদেরই উপযুক্ত।"

"কালিদাস নম্রভাবে বলিল—"রাণী মা! আমরা কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি। আপনাকে দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া আমরা সন্তানের কর্ত্তব্য—নিমকের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি। পুরস্কারের লোভে এ কাজ করি নাই ত মা! আমরা এ বহুমূল্য রাজোপহারের উপযুক্ত নহি—আমরা আপনার স্নেহের উপযুক্ত।"

কমলা অধীনস্থ সেনানীদের এই নিঃস্বার্থতায় ও উদারতায় মোহিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন—এই অধম জাতি যখন নিজের স্বার্থ ভুলিয়া কর্ত্তব্যপালন করিতে শিখিবে তখনই ইহারা মানুষ হইবে! যে দিন সকল বাঙ্গালী ইহাদের মত নিঃস্বার্থ নির্লোভ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবে—সেইদিন শ্রীপুরের রাজলক্ষ্মী হিন্দুরাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবেন। তবে কমলা ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি আবার বলিলেন—"এ সব অলঙ্কার ত ডাকাতে লইত বাবা! তোমরা রক্ষা করিয়াছ, এগুলি তোমাদের।"

কালিদাস বলিল—"রাণীমা! আপনার সম্পত্তিরক্ষার জন্য ও আপনাকে রক্ষার জন্যই আমরা রাজ-অন্নভোগী। এগুলি দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছি বলিয়া, রাজরাণীর অঙ্গের শোভাবর্দ্ধক অলঙ্কারের উপর আমাদের অধিকার জন্মিতে পারে না।"

কমলা তাহাদের নির্ব্বন্ধ পরিবর্ত্তন না করিতে পারিয়া বলিলেন—"প্রভাত হইতে বিলম্ব নাই। চল আমরা এ বন ত্যাগ করি।"

কালুসেখের সহিত বিংশতি জন অস্ত্রধারী ছিল। আটাশ জন রক্ষী রাণীর শিবিকা বেষ্টন করিয়া শ্রীপুরের পথ ধরিল।

প্রভাতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীরা সবিস্ময়ে দেখিল—অসংখ্য রক্ষীবেষ্টিত শিবিকা শ্রীপুরের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

রাম শ্যামের কাণে কাণে বলিল—"এ পাল্কীতে রাণী আছেন। রাণী পূজা করিবার জন্য বনের কালীমন্দিরে গিয়াছিলেন।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সিসামহলের রাণী।

চট্টগ্রামের নবাব, ইশাখাঁর এগারসিন্ধু দুর্গের এক স্নিগ্ধ-দীপোজ্জ্বলিত, পুষ্পবাসসুবাসিত, সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া—এক অলোকসামান্যা সুন্দরী। উজ্জ্বল-গৌরাঙ্গী, হাস্যমুখী, স্ফুরিতাধরা সুন্দরী একখানি দর্পণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিজের কমনীয় মুখকান্তির, তাম্বুলরাগরঞ্জিত ওষ্ঠাধরের লোহিত-রাগের কমনীয় প্রতিবিম্ব দেখিতেছেন। সে দেখায় যেন আশা মিটিতেছে না। আপনা আপনি বলিতেছেন—"ছাই এ রূপ! এরূপে কি নবাব ভুলিয়া থাকেন।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে, সুগন্ধি তৈলদ্বারা সেই সুচিকণ কেশরাশি সুমার্জ্জিত করিয়া দাসী আসিয়া কেশপাশ বাঁধিয়া দিয়া বিচিত্র বেণী রচনা করিয়া দিয়া যায়। কিন্তু সে দিন কেহ দেয় নাই। কেন না, সুন্দরী নিষেধ করিয়াছেন।

অন্য দিন এই সুন্দরী, সুন্দর কারুকার্য্যময় স্বর্ণখচিত ওড়না অঙ্গরাখা প্রভৃতিতে সুভূষিতা হইয়া স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের দীপ্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, আজ তাহারও কোন চিহ্ন নাই। সামান্য এক খানি ফিরোজা রঙ্গের ওড়না ও জরির কাজ করা এক খানি ঢাকাই কাপড়ে সেই ক্ষীণ দেহযষ্টি আবরিত করিয়াছেন। আজ বেশভূষার কোন পারিপাট্য নাই।

রাশীকৃত স্বর্ণময় অলঙ্কার সিন্দুকে তোলা আছে। আজ তাহার এক খানিও তিনি পরেন নাই। কেন—তাহা তিনি বলিতে পারেন। এমন কি আজ মনিবন্ধও বলয় শূন্য।

পাঠক পাঠিকা হয় ত ভাবিতে পারেন—এ সুন্দরী মানিনী। কিন্তু মানিনীর সে স্ফুরিতাধর, কম্পিত দীর্ঘশ্বাস আবেগময় চঞ্চল-দৃষ্টি, ক্রোধদষ্ট ধীর-কম্পিত সুলোহিত ওষ্ঠাধর কিছুই ত তাঁহাতে নাই। বরঞ্চ এ সকলের পরিবর্ত্তে

তাহার রাগরঞ্জিত ওষ্ঠপুটে মৃদু হাস্যরেখা অতি প্রত্যক্ষভাবে পরিস্ফুট। কে এ অনিন্দ্য-সুন্দরী! যিনি, সন্ধ্যালোক উজ্জ্বলিত এগারসিন্ধু দুর্গের এই মর্ম্মরমণ্ডিত কক্ষে বসিয়া মুকুরে আপনার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন?

এ সুন্দরী—দলিয়া বেগম। চট্টগ্রাম প্রদেশাধিপতি শক্তিসম্পন্ন রাজ্যেশ্বর নবাব ইশাখাঁর প্রণয়িনী। দলিয়া দর্পিতা অভিমানিনী। কিন্তু প্রেমময়ী সর্ব্বদা প্রফুল্লবদনী।

দলিয়া ছাড়া আরও অনেকে নবাব ইশাখাঁর অনুগ্রহের পাত্রী ছিল। নবাবের অনুগ্রহলাভের জন্য অনেকে চিত্তরঞ্জিনী কলাবিদ্যা শিখিয়াছিল। অনেকে আগরার রঙ্গমহালের অনেক নামজাদা বেগমদের কার্য্যকলাপের ছলাময়ী কৌশলের অনুকরণ করিয়াছিল। অনেকে ঘসিয়া, মাজিয়া, পুঁছিয়া ধুইয়া রূপের জ্যোতি প্রখর করিয়া নূতনত্ব আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই দলিয়া বেগমের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে নাই। অনেকে দলিয়াকে ভয় করিত, অনেকে সখীত্বের ও বন্ধুত্বের ভাণ করিত। যাহারা নিতান্তই মনোভাব চপিয়া রাখিতে না পারিত, তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত। মনে মনে সকলেই দলিয়ার সুখ-সৌভাগ্যের চির পতন কামনা করিত। কিন্তু এত করিয়াও তাহারা কিছু করিতে পারে নাই। দলিয়া সুন্দরীকুল মধ্যে শ্রেষ্ঠা, প্রসূন রাশির মধ্যে পদ্ম যেমন গরবিনী—বেগম মণ্ডলীতে দলিয়াও সেইরূপ।

আজকাল কিন্তু দলিয়ার অদৃষ্ট-স্রোত যেন একটু মন্দা হইয়া গিয়াছে। নবাবের সে একান্ত অনুগ্রহ, আগ্রহ, আসঙ্গলিপ্সা, গভীর প্রেম যেন একটু টলিয়াছে। সেই ক্ষণ-অদর্শনে চঞ্চলতা, সেই সন্ধ্যা-সমাগমে আশা-প্রতীক্ষার ব্যাকুলতা, সেই মিলনে আনন্দের প্রাবল্য যেন একটু কমিয়াছে। তাই দলিয়া মনে মনে ভাবে—হায়! কেন এমনটা হইল। অপরে এ কথা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে নাই। কিন্তু দলিয়া মনে মনে সবই বুঝিয়াছিল। সেই চির-সতর্কা, চঞ্চলা সুন্দরী, মনের কথা মনেই চাপিয়া রাখিয়াছিল। কখনও নবাবকে মনোভাব ফুটিয়া বলে নাই।

আর নবাব ইশাখাঁ—যিনি দলিয়াকে জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়াছিলেন—রাজ্যের বড় বড় কথা হইতে অতি ছোট কথাটী পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়া দলিয়াকে বলিতেন, যাহার তৃপ্তির জন্য যিনি সুদূর চট্টগ্রামে বসিয়াও আগরা, দিল্লীর রঙ্গমহলের প্রচলিত নবোদ্ভাবিত শিল্পকলাময় পোষাক-পরিচ্ছদ, বহুব্যয়ে আনাইয়া দলিয়াকে পরাইয়া ভ্রান্ত চকোরের ন্যায় তাহার সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতেন—আজকাল সেই দলিয়াকে তিনি বড় একটা বিশ্বাস করেন না। চতুরা দলিয়াও নবাবকে জানিতে দেয় না, যে সে এই অবিশ্বাসের কথা বুঝিতে পারিয়াছে।

দলিয়া আজ চুল বাঁধে নাই। ইচ্ছা করিয়া অলঙ্কার ভারে সেই সুকোমল দেহযষ্টিকে ব্যথিত করে নাই। সংকল্প করিয়া বহুমূল্য মণি-খচিত বসনে সেই বিদ্যুত-প্রভা-তরঙ্গায়িত দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে নাই। নূতন উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়া সে অঙ্গরাগ করে নাই। কি উদ্দেশ্য—কি সংকল্প—তাহা সেই বলিতে পারে।

গৃহ-গাত্রের চারিদিক বেষ্টন করিয়া, আটখানি সুবৃহৎ দর্পণ। দলিয়া আদর করিয়া এই কক্ষের নাম দিয়াছে "সিসামহল"। সৌন্দর্য্য-গরবিনী দলিয়া এই দর্পণ-রাজিতে তাহার রূপপ্রভা প্রতিফলিত করিয়া প্রতিক্ষণেই একটা আত্মগরিমা অনুভব করিত।

কিন্তু আজ দর্পণেও মুখ দেখিতে তাহার প্রবৃত্তি নাই। এক অননুভবনীয় চাঞ্চল্য, সে যেন তাহার কোমল মাংসপেশী-জড়িত ক্ষুদ্র হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। প্রথমে একখানি দর্পণের কাছে দাঁড়াইয়া দলিয়া দেখিল, সেখানা যেন মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রতিবিম্বধারণের শক্তি যেন কমিয়া গিয়াছে। গৃহের ছাদ-বিলম্বিত কলমওয়ালা ঝাড়গুলার জ্যোতিই যেন তাহাতে বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত। তাহার সুন্দর মুখখানি যেন তাহাতে ঠিক প্রতিফলিত হয় নাই।

দলিয়া রাগ করিল, অভিমান করিল, ঠোঁট ফুলাইল, দর্পণকে অভিসম্পাত করিল, শেষ তাহাতে পানের পিক ফেলিয়া দিয়া সকল মনঃক্ষোভ নিবারণ করিল। আবার একখানি দর্পণের নিকটস্থ হইল, তাহাতেও সেই দোষ। দলিয়া রাগ করিয়া তাহার উপরের আচ্ছাদনী নীল কাপড়টা টানিয়া তাহা ঢাকিয়া দিল। যাহার উপরে তাহার এত রাগ, তাহাকে হাতের কাছে না পাইয়া সুন্দরী দলিয়া, এইরূপে নিশ্চল, বোধহীন, স্পন্দহীন, সমবেদনাহীন জড়-পদার্থের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল।

তাহাতেও শান্তি নাই। প্রাণে যেন কি একটা অস্ফুট জ্বালার প্রবাহ। সেটা ফল্গুস্রোতের ন্যায় মনের ভিতরই প্রবাহিত হইতেছে। দলিয়া যেন অনেক চেষ্টা করিয়া সেটাকে ধরিতে পারিতেছে না! দলিয়া কি উন্মাদিনী।

দলিয়া তখনকার হিসাবে শিক্ষিতা। চির-অমর কবি সাদীর গ্রন্থাবলী তাহার বড় প্রিয়। দলিয়া মনে ভাবিল একটু পড়িলে, কবিতা আবৃত্তি করিলে, মনের তীব্র জ্বালাটা হয় ত কমিয়া আসিবে। সে একখানি মখমলমণ্ডিত ক্ষুদ্র কাষ্ঠাধারে গুলেঁস্তাখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। একটী কবিতা ভাল লাগিল। সেটী দুই তিন বার পড়িল, তবু জ্বালা গেল না, তবু আশা মিটিল না—দলিয়া তাহা উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিল।

"তাপে ফেরাক্ কা সাদ্‌মা সাগ মাইন জাতা
হারাম মৌত্ না হোতি তো জহর্ খা জাতা।"

কিন্তু হায়! ইহাতেও শান্তি আসিল না। জহর খাইলে অনন্ত নরক!! দলিয়া তা সহিতে পারিবে না। দলিয়া আর একলা থাকিতে পারিতেছে না। তাহার প্রাণের ভিতর হু হু করিতেছে। দলিয়া ব্যস্তভাবে ডাকিল—"বাঁদি"!

গুলফম বাঁদী, কিসের নেশায় জানি না, ঘরের বাহিরে দরজার কাছে বসিয়া ঢুলিতেছিল। গুলফমের বয়সটা দলিয়ার চেয়ে কিছু বেশী। কর্ত্রীর ডাক শুনিয়া সে চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া জবাব দিল—"বিবি!"

প্রকোষ্ঠতলে, বিস্তৃত কার্পেটের উপর একটা ফুলদানীতে ফুলের তোড়া বসান ছিল। গুলফম্ বাঁদী ঘুমের ঘোরে তাহার উপর পড়িল। নিজে মাটীতে পড়িল না, তবে ফুলদানীটা উল্টাইয়া ফেলিল! দলিয়া রোষভরে বলিলেন—"পোড়ার মুখো বাঁদী। জাহান্নমে কি তোর স্থান নাই?"

বাঁদী গুলফম—ওরফে গুলফমেন্নিসা, অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"কসুর মাফ্ হয় বিবিজি। হুকুম ফরমাইয়ে।"

দলিয়ার হুকুম করিবার কিছুই ছিল না। একলা থাকিতে না পারিয়া সে খেয়ালের বশে বাঁদিকে ডাকিয়াছিল। ইচ্ছা ছিল—দুই চারিটা গল্প শুনিবে! কিন্তু ঘুমন্ত বাঁদী কি গল্প গুলিকে সরস করিয়া বলিতে পারিবে?

তবু দলিয়া গুলফম্‌কে জিজ্ঞাসা করিল—"নবাব কোথায় বাঁদি?"

গুলফম্ বলিল—"তাতো জানি না--বেগম সাহেব।

দলিয়া রাগিল। বলিল—"ঘুমাইতে জানিস্—পোলাও হজম করিতে পারিস্ আর নবাবের খবর রাখিতে পারিস্ না?"

গুলফম্‌ও সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। বিশেষতঃ তাহার কাঁচা ঘুমটা ভাঙ্গিয়াছে। তার উপর আবার এই তিরস্কারের ঘটা। গুলফম্ বলিল—"নবাবের খোঁজরাখা যার দরকার, তিনিই খবর রাখেন না—আমরা ত বাঁদী।"

দলিয়া কথাটা বুঝিল। কিন্তু রাগ করিল না। মনে ভাবিল—"সত্যই আমি অন্যায় করিয়াছি। যে আমার ঈপ্সিত, দয়িত, প্রিয়, তাহাকে আমি নিজে খুঁজিব না-ত কি এই বাঁদী খুঁজিবে! যতদিন নবাবের খুঁজিবার সখ্ ছিল, তিনি খুঁজিয়াছেন। এখন তাঁহার ভালবাসার প্রবল স্রোত ভাঁটার মুখে। এখন খুঁজিবার পালা আমার!"

কিন্তু নবাব ঈশা খাঁ আজকাল আবার এগারসিন্ধু দুর্গে থাকেন না। দুর্গ-নিকটস্থ এক নদী-তীরের বারদোয়ারিতে অবস্থান করেন। আজ সন্ধ্যার পর দলিয়ার মহলে আসিবেন বলিয়া সংবাদ দিয়াছিলেন---কিন্তু তখনও তাঁহার দেখা নাই! হায়! দলিয়া কোথায় তাঁহাকে খুঁজিবে!

রূপের জ্যোতির তীব্র জ্বালায়, পুরুষ-পতঙ্গের মন বাঁধিয়া রাখিতে হয়। দলিয়া ভাবিল, তাহার রূপের আকর্ষণীশক্তি নিশ্চয়ই কমিয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে নবাব ঈশা খাঁ আসিব বলিয়া, আশা দিয়া দেখা দেন না কেন? সন্দেহটা মিটাইবার জন্য দলিয়া গুলফমকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ গুলফম্! সত্যই কি আমি সুন্দরী?"

কথা শেষ না হইতে হইতেই—কে যেন একটা প্রতিধ্বনি করিল—"সত্যই দলিয়া তুমি অতি সুন্দরী।" প্রতিধ্বনি শুনিয়া বাঁদী গুলফম্ কক্ষ হইতে সরিয়া পড়িল।

দলিয়া বঙ্কিম-গ্রীবা উন্নত করিয়া দেখিল—জাঁহাপনা আসিয়াছেন। তাহার মনে তখনই একটা অভিমান আসিয়া জুটিল। সে অভিমানের উষ্মায়, চক্ষে দুইটী মুক্তাফল দেখা দিল। সেই মুক্তাফল দুটি একটু চঞ্চলতার সহিত দলিয়ার আরক্তিম গণ্ডদেশ বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। সে গণ্ডপ্রবাহী মুক্তাধারা, নবাবসাহেবের চক্ষু এড়াইল না। নবাব সোৎসুকে দলিয়ার গণ্ডপ্রবাহী ধারাদুটী নিজের গন্ধবাসিত রুমালে

মুছাইয়া দিয়া—আদরের সহিত বলিলেন—"দলিয়া বেগম! কাঁদিতেছ কেন?"

দলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"যত দিন হাসিতে দিয়াছিলেন—তত দিন হাসিয়াছি। এখন কান্না দেখিলে সুখী হন, তাই কাঁদিতেছি।"

"কেন দলিয়া! বল আমি কিসে অপরাধী।"

দলিয়া হাসিয়া বলিল—"অপরাধ আপনার নয় জাঁহাপনা! আমি বাঁদী চরণাশ্রিতা—আমিই অপরাধিনী। আমি আশাপথ চাহিয়া ক্লান্ত হই—আপনি আসেন না, আসিব বলিয়া সংবাদ দিয়া পাঠান—নিরাশ করেন। আজকাল এত ছলনা শিখিতেছেন কেন? যে প্রাণভরিয়া ভালবাসে, তাহার সহিত এ ছলনা কেন জনাব?"

নবাব চিন্তান্বিতভাবে বলিলেন—"তা নয় দলিয়া—তা নয়। এখন আমার অনেক ভাবনা। আকবার সা স্বর্গে গিয়াছেন, সেলিম সা জাঁহাগীর নাম লইয়া দিল্লীর তক্তে বসিয়াছেন। তাঁহাকে নজর দিয়া অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে, তা আমি পারিব না। এইজন্য হিরণ-মঞ্জিলে বসিয়া দিনরাত নানা কথা ভাবি।"

দলিয়া বলিল—"সত্যই কি এই চিন্তায় আপনি কাতর?"

"কেন এ প্রশ্ন করিতেছ দলিয়া! নবাব ইশা খাঁ কখনও তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেন নাই।"

"এতদিন করেন নাই—কিন্তু এইবার করিতেছেন।"

"কিসে জানিলে দলিয়া।"

"মনের অগোচর পাপ নাই জাঁহাপনা। নিজের মনের ভিতর খুঁজিয়া দেখুন, কি তীব্রজালায় আপনার প্রাণ পুড়িয়া যাইতেছে।"

"কি বলিতেছ তুমি—দলিয়া বেগম!! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"পারিবেন না। আমি নারী হইয়া যাহা সহজে বুঝিয়াছি, আপনি পুরুষ হইয়া তাহা শত চেষ্টাতেও পারিবেন না। কিন্তু জাঁহাপনা! সাবধান!"

"দলিয়া! কিসে সাবধান হইব?"

"রূপমোহের প্রবল অগ্নিতে!"

"কার রূপ-মোহ—তোমার?"

"আমার নয়! চাঁদরায়ের কন্যা সোণামণির!

"সোণামণির! অসম্ভব! তুমি মিথ্যাবাদিনী।"

"দলিয়া মিথ্যাবদিনী নয়! দলিয়া অনেক প্রমাণ দেখাইতে পারে।"

"কি প্রমাণ?"

"আপনার মুখ, চোখ—আর এই ছিন্ন পত্রখণ্ড। আমি জানি নবাব ইশা খা সুকবি। কিন্তু সোণামনির নাম না থাকিলে কি কবিতার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে না, জাঁহাপনা।"

"দলিয়া! রাক্ষসী! কি বলিতেছ! দলিয়া তুমি না প্রেমময়ী।"

দলিয়া একখণ্ড কাগজ, সেই চম্পকনিন্দিত দুই ক্ষুদ্র অঙ্গুলির মধ্যে ধরিয়া নবাবকে দেখাইয়া বলিল—"কার হাতের লেখা জনাব?"

নবাব তাহা চিনিলেন। নিজের অসাবধানতার জন্য মনে মনে বড় অনুতপ্ত হইলেন। দলিয়াকে মনে মনে শত অভিসম্পাত দিলেন। সর্প-দষ্ট ব্যক্তির ন্যায় দ্রুতবেগে দলিয়ার কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

আর দলিয়া! সে নিজের হাতে আগুণ জালাইয়াছে, তাহাতে তাহাকে পুড়িতেই হইবে। নবাব যে রোষভরে সহসা তাহার কক্ষ ত্যাগ করিবেন, তাহা সে ভাবে নাই। দলিয়া নিস্তব্ধ—নির্ব্বাক!..

দলিয়া দ্বার পানে ছুটিল। দ্বারে দাঁড়াইয়া—গুলফম্। দলিয়া প্রশ্ন করিল—"গুলফম্! জাঁহাপনা কোন দিকে গেলেন?"

গুলফম্ বলিল—"পুরীর বাহিরে গিয়াছেন। কি হইয়াছে বিবি?"

দলিয়া—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে!"

"কেন কে সর্ব্বনাশ করিল?"

"আমি নিজেই করিয়াছি।"

দলিয়া দ্রুতপদে কাঁদিতে কাঁদিতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল। মাটীতে কার্পেটের উপর পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"এস দয়িত! এস বাঞ্ছিত! ফিরিয়া এস! আর আমি তোমায় সন্দেহ করিব না।"

দলিয়া যাহাকে এত কাতর কণ্ঠে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে ডাকিল, সে আর ফিরিল না। দলিয়ার উচ্ছ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠের এ কাতর-

আহ্বান, সেই প্রস্তরময় গৃহ-প্রাকার ভেদ করিয়া—বাহিরে গেল না। গৃহমধ্যে প্রতিধ্বনি তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া—তাহাই দলিয়ার কাণে পৌছাইয়া দিল।

হায়! দলিয়া—কেন না বুঝিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিলে! ধিক রমণীর প্রেমে! ধিক তাহাদের সন্দেহে!

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

আমন্ত্রণ।*

আয়োদ-ধৌম্য নামক এক ঋষির আরুণি ও উপমন্যু নামে দুই শিষ্য ছিলেন। আয়োদ-ধৌম্য একদিন আরুণিকে আহ্বান করিয়া ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে আদেশ করিলেন। আরুণি উপাধ্যায়ের আদেশ মত আলি বাঁধিতে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে সেই স্থানে শয়ন করিয়া জলনির্গম নিবারণ করিলেন। কিছু কাল পরে উপাধ্যায় অপর শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পাঞ্চালদেশীয় আরুণি কোথায় গিয়াছে? তাহারা কহিল, আপনি তাহাকে ক্ষেত্রে আলি বাঁধিতে প্রেরণ করিয়াছেন। শিষ্যপরিবেষ্টিত ঋষি সেই ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন, ভো বৎস আরুণি, কোথায় গিয়াছ, আইস! আরুণি তখন উত্থিত হইয়া, উপাধ্যায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিনীত বচনে কহিলেন, ক্ষেত্রের যে জল নিঃসৃত হইতেছিল, তাহা অবারণীয়; তাহার প্রতিরোধের নিমিত্ত আমি তথায় শয়ন করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার কথা শ্রবণ করিয়া সহসা কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া আপনার সম্মুখীন হইলাম, অভিবাদন করি, আর কি অনুষ্ঠান করিব, অনুমতি করুন। উপাধ্যায় কহিলেন, যে হেতু তুমি কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছ, অতএব অদ্যাবধি তোমার নাম উদ্দালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে এবং আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ এই নিমিত্ত তোমার শ্রেয়লাভ হইবে।

উপমন্যু নামক দ্বিতীয় শিষ্যকে উপাধ্যায় একদা কহিলেন, বৎস উপমন্যু, সতত সাবধানে আমার গোধন রক্ষা কর। আদেশ মত উপমন্যু গোচারণে প্রবৃত্ত হইলেন। দিবাভাগে গোচারণ করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতেন। এক দিন উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস উপমন্যু, তোমাকে অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি, তুমি এক্ষণে কিরূপে আহার করিয়া থাক, বল। উপমন্যু কহিলেন, ভগবন্, আমি এক্ষণে ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাত উপযোগ করা তোমার বিধেয় নহে। গুরুর আদেশ স্বীকার করিয়া উপমন্যু আহরিত ভিক্ষান্ন গুরুকে অর্পণ করিলেন। উপাধ্যায় সমস্ত গ্রহণ করিলেন, শিষ্যকে কিছু দিলেন না। কিছু দিন পরে উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস উপমন্যু, তোমার ভিক্ষান্ন সমুদায় গ্রহণ করিয়া থাকি, তথাপি তোমাকে অত্যন্ত স্থূলকায় দেখিতেছি, এখন কি আহার করিয়া থাক? উপমন্যু কহিলেন, একবার ভিক্ষা করিয়া আপনাকে প্রদান করি, দ্বিতীয়বার কয়েক মুষ্টি তণ্ডুল আহরণ করিয়া উদর পূরণ করিয়া থাকি। উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, ইহা ভদ্রলোকের ধর্ম্ম ও সমুচিত কর্ম্ম নহে। ইহাতে অন্যের বৃত্তিরোধ হইতেছে, আরও এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তুমিও ক্রমশঃ লোভপরায়ণ হইবে। উপমন্যু দ্বিতীয়বার ভিক্ষা আহরণ পরিত্যাগ করিলেন। তথাপি তাঁহার দেহে কৃশতার কোন লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া গুরু একদিন কহিলেন, তোমার ভিক্ষান্ন আমি সমুদায় গ্রহণ করি, তুমি দ্বিতীয়বার ভিক্ষা কর না, তথাপি তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক স্থূলকায় দেখিতেছি, এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক, বল। উপমন্যু কহিলেন, এক্ষণে ধেনুগণের দুগ্ধ পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি। উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, আমি তোমাকে অনুমতি করি নাই, সুতরাং ধেনুর দুগ্ধ পান করা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে। উপমন্যু গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। কিছুদিন পরে উপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, উপমন্যু, তুমি ভিক্ষান্ন ভক্ষণ ও দ্বিতীয়বার ভিক্ষার্থ পর্য্যটন কর না, এবং ধেনুর দুগ্ধপান করিতেও তোমাকে নিবারণ করিয়াছি, তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থূলকলেবর দেখিতেছি, এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক? উপমন্যু কহিলেন, বৎসগণ মাতৃস্তন পান করিয়া যে ফেন উদ্গার করে, আমি তাহা পান করি। উপাধ্যায় কহিলেন, অতি শান্ত স্বভাব বৎসগণ

---

* প্রয়াগ সাহিত্য-সম্মিলনে তরুণবয়স্কদিগকে সম্বোধন করিয়া পঠিত।

তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া অধিক পরিমাণে ফেন উদ্গার করিয়া থাকে, সুতরাং তুমি তাহাদিগের আহারের ব্যাঘাত করিতেছ। অতঃপর তোমার ফেন পান করাও বিধেয় নহে। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু ফেন পান হইতে বিরত হইলেন ও পূর্ব্ববৎ গো রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় উপমন্যু এক দিন অরণ্যে গোচারণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন। তাহাতে চক্ষুদোষ জন্মিয়া অন্ধ হইলেন এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপে নিপতিত হইলেন।

সন্ধ্যার সময় উপাধ্যায় আয়োদ-ধৌম্য শিষ্যদিগকে কহিলেন, উপমন্যু এ পর্য্যন্ত আসিতেছে না, বোধ হয় তাহাকে সর্ব্বপ্রকার আহার করিতে নিষেধ করিয়াছি, এজন্য সে কুপিত হইয়াছে। চল, আমরা তাহার অনুসন্ধান করি। উপাধ্যায় শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, বৎস উপমন্যু, কোথায় আছ, বলিয়া মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আহ্বানধ্বনি শুনিতে পাইয়া উপমন্যু কহিলেন, আমি কূপে পতিত হইয়াছি। তিনি অন্ধ হইয়াছেন জানিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের স্তব কর, তাহা হইলে তোমার চক্ষুলাভ হইবে। উপমন্যু অশ্বিনীকুমারের স্তব করিলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অশ্বিনীকুমারযুগল তথায় আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, আমরা তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব তোমাকে এক পিষ্টক দিতেছি ভক্ষণ কর। উপমন্যু কহিলেন, আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া অপূপ ভক্ষণ করিতে পারিব না। অশ্বিনীতনয়দ্বয় কহিলেন, পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় আমাদিগকে স্তব করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এক পিষ্টক দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি গুরুর আদেশ না লইয়া তাহা উপযোগ করেন, অতএব তোমার উপাধ্যায় যেরূপ করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ কর। উপমন্যু কহিলেন, আপনাদিগকে অনুনয় করিতেছি, আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া অপূপ ভক্ষণ করিতে পারিব না। অশ্বিনীকুমারদ্বয় কহিলেন, তোমার এই প্রকার অসাধারণ গুরুভক্তি দর্শনে আমরা অতিশয় প্রসন্ন হইলাম, তোমার উপাধ্যায়ের দন্ত সকল লৌহময়, তোমার হিরণ্ময় হইবে এবং তুমি চক্ষু ও শ্রেয়লাভ করিবে।

মহাভারতে কথিত এই উপাখ্যানে গভীর শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে। কি কারণে, কোন উদ্দেশ্যে আয়োদ-ধৌম্য শিষ্যদ্বয়কে এরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ নাই। শিষ্যের চরিত্রবর্ণন এই উপাখ্যানের উদ্দেশ্য। আরুণিকে যখন উপাধ্যায় কহিলেন, ক্ষেত্রের আলি বন্ধন কর, এবং আরুণি যখন আলি বাঁধিতে অসমর্থ হইলেন, সে সময় গুরুকে গিয়া তিনি নিবেদন করিলেন না যে আদিষ্ট কার্য্য তাঁহার শক্তির অসাধ্য। জলনির্গমমুখে আপনার দেহ রক্ষা করিয়া জল রোধ করিলেন। উপমন্যুকে গুরু একে একে সকল আহার্য্যসামগ্রী হইতে নিবৃত্ত করিলেন, কিন্তু উপমন্যু একবারও গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন নাই যে অনাহারে কিরূপে তিনি প্রাণ ধারণ করিবেন। গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করা ত দূরে থাকুক, সে সম্বন্ধে কখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না। অশ্বিনীকুমারের বাক্যে জানা যাইতেছে যে আরুণি ও উপমন্যুর যেরূপ গুরুভক্তি ছিল শিষ্যাবস্থায় স্বয়ং আয়োদ-ধৌম্যের তদনুরূপ গুরুভক্তি ছিল না। অশ্বিনীকুমার উপমন্যুর পরীক্ষা করিলেন, তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইলেন যে গুরুর অপেক্ষা অধিক গুরুভক্তির আবশ্যক নাই, কিন্তু অনশনে ক্লিষ্ট, অন্ধ উপমন্যু পিষ্টকে লুব্ধ হইলেন না, গুরুভক্তি সম্বন্ধে গুরুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন না। গুরুকে লৌহদন্ত ও শিষ্যকে হিরণ্ময় দন্তের বর প্রদান করিয়া অশ্বিনীকুমার গুরু ও শিষ্যে প্রভেদ নির্দ্দেশ করিলেন। এই উপাখ্যান হইতে বুঝিতে পারা যায় যে অসঙ্কোচে ও দ্বিধাশূন্য চিত্তে গুরুর আজ্ঞা পালন করা শিষ্যের প্রধান ও মুখ্য কর্ত্তব্য।

এই গুরু শিষ্যের সম্বন্ধের বিস্তৃতিতে সমাজের বন্ধন ও শাসন। বয়োবৃদ্ধ দিগের সহিত বয়ঃকনিষ্ঠ দিগের কি সম্বন্ধ? এ বিষয়ে সমাজে যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ধীর ভাবে তাহা আলোচনা করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বত্র এই কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে একালের বালক ও যুবকগণ গুরুদিগের ও বর্ষীয়ানদিগের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তি বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না। সে কথা বিচার করিবার পূর্ব্বে বয়োবৃদ্ধ ও গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদিগের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কি না বিচার করিতে হইবে। প্রাচীনদিগের মধ্যে সাধারণতঃ বালক ও যুবকদিগের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিতে পাওয়া

যায়। ছেলে-ছোকরার দল বলিলেই বুঝায় যে তাহাদের কোন শক্তি বা গুণ, অথবা কোন বিষয়ে কর্ম্মপটুতা নাই। প্রবীণে ও নবীনে মিলন স্থান কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যুবক ও বালকদিগের সহিত কোন বিষয়ে লিপ্ত না হওয়াই প্রবীণতার প্রধান লক্ষণ।

কোন্ শাস্ত্রে অথবা প্রাচীন কোন্ গ্রন্থে এমন শিক্ষা আছে যে প্রাচীনেরা বালক ও যুবকদিগের প্রতি তাচ্ছিল্য ও অবহেলা প্রদর্শন করিবে? আর্য্য শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্যে শুধু যে এরূপ শিক্ষা নাই এমন নয়, বরং বালক ও যুবকদিগের কীর্ত্তিই মহাকীর্ত্তি বলিয়া প্রথিত হইয়াছে। ভক্তদিগের মধ্যে শিশু ধ্রুব প্রহ্লাদের তুল্য ভক্ত কে? পণ্ডিতের মধ্যে শিশু শুকদেব ও বালক অষ্টাবক্রের তুল্য পণ্ডিত কে? বীরের মধ্যে কিশোরবয়স্ক রাম, কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের তুল্য বীর কে? গায়কের মধ্যে লবকুশের তুল্য গায়ক কে? জগৎ কর্ম্মক্ষেত্র, যে কর্ম্মবীর সেই জয় লাভ করে। যৌবন কর্ম্মের প্রধান সময় এবং বাল্যাবস্থা হইতে কর্ম্মপটুতার সূচনা হওয়া উচিত। জগতে যে কোন মহৎ কর্ম্ম করিতে চায়, সেই যুবকদিগের সহায়তা অন্বেষণ করে। প্রবীণেরা পরামর্শদাতা, বিবেচক, অভিজ্ঞ। তরুণবয়স্ক ব্যক্তিগণ বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। যুবকের সহায়তা যে কেবল প্রাচীনেরা লইতেন তাহা নহে। যেখানে উদ্যম, যেখানে উন্নতি, যেখানে কর্ম্ম, সেইখানেই যুবকের সমাগম। ছত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্স ও জর্ম্মানীতে যে মহাসমর হয়, তাহাতে জর্ম্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকগণ অস্ত্র ধারণ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল। যে অভূতপূর্ব্ব বিচিত্র বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া জাপান রুসিয়াকে ধূলিধূসরিত করিয়াছে, জাপানী যুবকগণই তাহার প্রধান নিদর্শন। কেবল রণক্ষেত্রে নহে। যেখানে ধর্ম্মশিক্ষা সে স্থানেও যুবকের প্রয়োজন। রামকৃষ্ণ পরমহংস কিশোরবয়স্ক নরেন্দ্রনাথ দত্তকে কি দেখিয়া আপনার কাছে টানিয়া লইয়াছিলেন? বয়োবৃদ্ধ প্রবীণগণ নরেন্দ্রনাথে কোন গুণ দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু সেই যুবা গুরুর কৃপায় দিগ্বিজয়ী ধর্ম্মবীর বিবেকানন্দ স্বামী নামে মার্কিনে ও ইংলণ্ডে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

নবীনের প্রতি অবহেলা প্রাচীনের পক্ষে গৌরবের কথা নহে। প্রবীণের প্রতি অনাস্থা নবীনের পক্ষে ঘোর অমঙ্গলের কারণ। ভাব বিপ্লবে ও শিক্ষা বিপ্লবে এই উভয় অনর্থ এ দেশে ঘটিয়াছে। প্রবীণ দিগের ত্রুটি সংশোধন হইবার উপায় নাই, কিন্তু বালক ও যুবকদিগের কথা স্বতন্ত্র। আজ যাহারা বালক অথবা তরুণ তাহারাই যখন প্রবীণ হইয়া বালকদিগের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইবে তখন সমাজ আবার সংযত, সুন্দর, সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইবে। বালক ও যুবকদিগকে সেই ভার লইতে আমরা আহ্বান করিতেছি। সেই প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য আবার নূতন করিয়া সমাজের ভিত্তি-স্বরূপ প্রথম আশ্রমরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ওজোগুণ-সম্পন্ন, অক্লিষ্টকর্ম্মা হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে হইবে।

সকল সাধনার মূলে শারীরিক সুস্থতা ও সবলতা। তাহাই প্রথম সাধনা। মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের সঙ্গে শরীরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গভীর অরণ্যে ভ্রাতাদিগের পুনর্জীবন প্রার্থী হইয়া যুধিষ্ঠির যখন যক্ষের বহুতর কূট প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছিলেন সেই অবসরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, লাভের মধ্যে উত্তম কি? ধনলাভ, যশোলাভ প্রভৃতি, সাধারণ বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা হয়, কিন্তু যুধিষ্ঠির সে উত্তর দেন নাই। তিনি উত্তর করিলেন, লাভের মধ্যে আরোগ্য উত্তম। আরোগ্য অর্থাৎ সুস্থতা, সবলতা, কর্ম্মপটুতা। এই শ্রেষ্ঠলাভের জন্য যত্নবান হও। লঘুহস্ত, ক্ষিপ্রকারী, বলশালী, মেধাবী হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।

যে প্রবীণতার গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়া আমরা বালক ও যুবকদিগকে অবহেলা করি, প্রবীণতার সেই আদর্শ পরিত্যাগ করিতে হইবে। অবস্থাবিশেষে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, জীবনের উচ্চ আদর্শ লুপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত আত্মসম্মান আমরা বহুকাল হারাইয়াছি। কোন মতে জীবনধারণ করা জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে। কিছু আত্মতৃপ্তি, কিছু আত্মসুখ, পরিশিষ্ট ঔদার্য্য ও দুর্ব্বলতা, ইহাই আমাদের জীবনের আদর্শ। যদি এই অধোগতি অবারিত থাকিত, জীবনের স্রোত ক্রমাগত শীর্ণ সঙ্কীর্ণ হইতে থাকিত তাহা হইলে নূতন আশার নূতন কথা বলিবার কোন প্রয়োজন হইত না। কিন্তু এই প্রাচীন দেশে নূতনের আবির্ভাব হইয়াছে, নূতন প্রভাবের নূতন বাতাস উঠিয়াছে, জাগরণ-মন্ত্রপূত সেই তীব্রশীতলবায়ুস্পৃষ্ট হইয়া এই প্রাচীন

পুণ্যভূমি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বয়সবিগুণে, প্রবীণতার জরাজড়িত চক্ষে যে আলোক স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না, তোমাদের নবীন উজ্জ্বলচক্ষে সেই আলোক প্রদীপ্ত ও প্রভাসিত হইয়া উঠুক। ভবিষ্যতের গ্রন্থপৃষ্ঠায় যে অক্ষর আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না, তোমরা সেই ভাষা পাঠ করিয়া সেই শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া, প্রবল উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

যুগে যুগে মহাপুরুষদিগের শক্তিসঞ্চারিণী মহাবাণী স্মরণ কর। লোকগুরুদিগের বাক্য বালক ভগীরথের শঙ্খনাদ-তুল্য। ভগীরথের শঙ্খধ্বনি অনুসরণ করিয়া, হিমাচল দীর্ণ করিয়া, ঐরাবতের দর্প চূর্ণ করিয়া, ললিত তরল গমনে, পুলকিত কল কল কণ্ঠে, ভারতভূমিকে সুজলা শস্যশ্যামলা করিয়া, তরঙ্গক্ষুব্ধ উদ্বেলিত প্রবাহে যেমন জাহ্নবী প্রবাহিতা হইয়াছিলেন, তোমাদের জীবনজাহ্নবী যেন সেইরূপ বর্দ্ধিত-কলেবরা হইয়া মহাত্মাদিগের মহাবাণী অনুসরণ করে। তোমরা শিশু প্রহ্লাদের বিশ্বাস গ্রহণ কর, প্রবীণ হিরণ্যকশিপুর অবিশ্বাসে তোমাদের প্রয়োজন নাই। যে বিশ্বাসের বলে প্রহ্লাদ সর্ব্বব্যাপী বিশ্বকারণকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেন, সেই বিশ্বাসের বলে পাহাড় ভাঙ্গে, মৃতব্যক্তি পুনর্জীবন লাভ করে। হিরণ্যকশিপুর প্রবীণ অবিশ্বাসে আপনার গৃহস্তম্ভ ভগ্ন হয় এবং তাহা হইতে ঘোর সংহাররূপী নরসিংহ মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়।

আবার কর্ম্মযুগ ফিরিয়া আসিতেছে, কর্ম্মী কোথায়? দেখ, কর্ম্ম সম্মুখে, আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। ভারতবাসীর মথিতহৃদয়সমুদ্র হইতে যে মাতৃমূর্ত্তি উত্থিত হইয়াছে, সেই মাতৃসেবায় আত্মসমর্পণ কর। পুরুষানুক্রমে প্রাচীন ও প্রবীণগণ বহু গবেষণা দ্বারা মাতৃভূমির মঙ্গল সাধন করিতে পারেন নাই। তোমরা কর্ম্ম দ্বারা, ত্যাগ দ্বারা সেই কর্ত্তব্য পালন করিতে প্রয়াসী হও। বন্দে মাতরম্!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

মৃদ্‌-ভক্ষণ।

মানুষের স্বভাবে যত প্রকার বৈচিত্র আছে, তন্মধ্যে মৃদ্‌-ভক্ষণের রুচি সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত এবং অকারণ বলিয়া মনে হয়। বঙ্গের সকলেই বোধ হয় জ্ঞাত আছেন যে স্ত্রীলোকেরা অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় পোড়া মাটির জন্য কিরূপ লোলুপ-ব্যগ্র হইয়া উঠেন, এবং তাঁহাদের উৎপাতে অনেক সময় গৃহের চুল্লী পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হইতে থাকে। কলিকাতার গর্ভিণীদিগের 'পাতখোলা' খাওয়া ত রীতিমত একটা সৌখীনপ্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ষ্টার থিয়েটারের ব্যঙ্গনাট্য 'তাজ্জব ব্যাপারে' পাতখোলা খাওয়া উপহসিত হইয়া বঙ্গের অন্যান্য অংশেও সুপরিচিত হইয়াছে। পঠদ্দশায় যখন রঘুবংশে দীলিপ-মহিষী সুদক্ষিণা দেবীর দোহদ-সংস্কারের বর্ণনা পাঠ করিতেছিলাম, তখন তাহাতে মহিষীর মৃদ্‌-ভক্ষণে বিশেষ রুচি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। পঞ্চম শতাব্দীতে উজ্জয়িনীর রাজসভায় বসিয়া কালিদাস লিখিয়াছেন—

> "তদাননং মৃৎসুরভি ক্ষিতীশ্বরো
> রহস্যুপাঘ্রায় ন তৃপ্তিমাযযৌ ॥৩৩
> "দিবং মরুত্বানিব ভোক্ষতে ভুবং
> দিগন্তবিশ্রান্তরথো হি তৎসুতঃ।
> অতোভিলাষে প্রথমং তথাবিধে
> মনো ববন্ধান্যরসান্ বিলঙ্ঘ্য সা" ॥৩৪

রাণীর মৃত্তিকাসুরভিত মুখ আঘ্রাণ করিয়া রাজা তৃপ্তি পাইতেছিলেন না। তাঁহার দিগ্বিজয়ী পুত্র রঘু ইন্দ্রের স্বর্গোপভোগের ন্যায় পৃথিবী উপভোগ করিবেন জানিয়াই যেন রাণী সর্ব্বপ্রকার রস ত্যাগ করিয়া প্রথম হইতে মৃদ্‌-ভক্ষণে মন নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ উড়িষ্যার প্রান্ত হইতে টীকাচ্ছলে লিখিয়াছেন—"গর্ভিণীনাং মৃদ্‌ভক্ষণং লোকপ্রসিদ্ধমেব। দোহদহেতুকে মৃদ্‌ ভক্ষণে হেত্বন্তরম্ উৎপ্রেক্ষতে। দোহদহেতুকস্য মৃদ্‌ভক্ষণস্য পুত্রভুভোগ-সূচনার্থত্বম্ উৎপ্রেক্ষতে"। মল্লিনাথ ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। অতএব দেখা যাইতেছে যে এ স্বভাব অতিপ্রাচীন, এবং ভারতের একপ্রান্ত (উজ্জয়িনী) হইতে অপর প্রান্ত (উড়িষ্যা) পর্য্যন্ত সুপ্রচলিত এবং 'লোকপ্রসিদ্ধ'।

শ্রীযুক্ত ডেভিড্ হুপার ও হ্যারল্ড এইচ্ ম্যান চা-বাগানের কুলিদিগের মধ্যে মৃদ্‌ভক্ষণের রীতি ও তাহার কুফল দেখিয়া এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়া দেখিতে পান যে কেবল ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের সর্ব্বশ্রেণীর

লোকের মধ্যেই যে এই স্বভাব দৃষ্ট হয় তাহা নহে, পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সকল লোকের মধ্যে এই স্বভাব আছে। তাঁহারা এ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া এসিয়াটিক সোসাইটিতে উপস্থিত করেন। সেই প্রবন্ধের সারসংগ্রহ আমরা এখানে প্রবাসীর পাঠকের জন্য উদ্ধৃত করিতেছি। (Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. I., No. 12).

মৃদ্-ভক্ষণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ তাঁহারা ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

১। অপরাপর দেশে মৃদ্ভক্ষণের প্রচলন ও প্রসার।
২। ভারতের মৃদ্-ভক্ষক।
৩। ভক্ষিতব্য মৃত্তিকার আকার-প্রকার-ভেদ।
৪। ভারতে মৃদ্-ভক্ষণের স্বভাব।
৫। ঔষধরূপে মৃত্তিকার ব্যবহার।
৬। সাধারণ মন্তব্য।

১। অপরাপর দেশে মৃদ্-ভক্ষণের প্রচলন ও প্রসার।

য়ুরোপীয় বহু গ্রন্থে কর্দ্দম ও অন্যান্য প্রকারের মৃত্তিকা মনুষ্যের খাদ্যরূপে বহুস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। প্লিনি (Pliny, ১ম শতাব্দী) তদ্বিরচিত ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন যে রোমানদিগের শস্য ও খড়ি মিশ্রিত একরূপ খাদ্য ছিল। বর্ত্তমানকালে জর্ম্মানীর অনেকাংশে রুটিতে মাখনের পরিবর্ত্তে কাদা মাখিয়া ভক্ষণ প্রচলিত আছে; তখন কাদার নাম হয় 'শিলামাখন' (stone butter)। উত্তর সুইডেনে মাটি সেঁকিয়া রুটি প্রস্তুত করা হয়, এবং ইটালি ও সার্ডিনিয়া-দ্বীপে সেরূপ মৃদ্-রুটী প্রকাশ্য বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। ফিন্‌ল্যাণ্ডে একরূপ মাটি প্রচলিত খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়; সেই মাটি একরূপ কীটের অস্থিপূর্ণ। কাপ্তেন ফ্রাঙ্কলিন উত্তরমেরুস্থ এক জাতিকে মৃদ্ভোজী দেখিয়াছিলেন। বিলাতী স্কুলের ছেলেরা—বিশেষতঃ মেয়েরা—শ্লেট পেন্‌সিল, খড়ি ও কয়লা খাইতে ভালবাসে।

আমেরিকায় বহু অসভ্যজাতি, কাফ্রি এবং দরিদ্র শ্বেতাঙ্গগণও খাদ্যরূপে মৃত্তিকা ব্যবহার করে। চেম্বার্স এন্‌সাইক্লোপীডিয়াতে ইহার বিশেষ বিবরণ প্রাপ্তব্য। অরিনকো প্রদেশের অটোম্যাক ও ব্রেজিলের কোন কোন জাতি এক প্রকার তৈলাক্ত মৃত্তিকা ভক্ষণ করে। মার্টিনিক দ্বীপে একপ্রকার লাল মাটি বা অগ্নিগিরি-উৎসৃষ্ট পীতাভ মৃত্তিকা বাজারে খাদ্যরূপে বিক্রীত হইত। (মার্টিনিক দ্বীপ অল্পদিন হইল অগ্নিগিরির উপপ্লবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে)। দক্ষিণ আমেরিকার আদিম নিবাসিগণ 'ফাসা' বা 'পাসা' নামক মৃত্তিকা আহার করে; বেনেগাস বলেন যে কালিফর্নিয়ার অধিবাসিগণ রুটি সুস্বাদু করিবার জন্য তাহাতে একপ্রকার লাল মাটি মিশ্রিত করে। ফ্লোরিডার অধিবাসীদিগের ভাষায় একটি রোগের নাম 'জিপাটেরা' অর্থাৎ মাটি খাইয়া ব্যামো। ক্যাবার্জা ডি ভ্যাকা বলেন যে মৃত্তিকামিশ্রিত শিম আমেরিকার আদিমনিবাসীদের সাধারণ প্রচলিত খাদ্য।

আফ্রিকার পশ্চিমাংশে এবং গিনিতে নিগ্রোগণের মধ্যে মৃত্তিকাভক্ষণ বহুপ্রাচীন প্রচলিত প্রথা। ডাক্তার রাদারফোর্ড ইহার সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ও জাঞ্জিবারেও এই প্রথা বর্ত্তমান; এবং মৃদ্ভক্ষণে এক প্রকার রোগ হয়, তাহার তদ্দেশীয় নাম 'সাকুরা'।

এসিয়ার মধ্যে আরব দেশে মৃদ্ভক্ষণ প্রথা ৫০ বৎসর পূর্ব্বে সার্ রিচার্ড বার্টন দেখিয়া আসিয়াছেন। খাদ্য-মৃত্তিকার আরব নাম 'তফ্‌ল্', পারস্য 'ঘিল-ই-সারশিন্', এবং সিন্ধি 'মেটু'। কেহ কেহ ইহা স্নানের মত ব্যবহার করে; কাহারো বিশ্বাস পয়গম্বর ইহা ঔষধার্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন। সার্ বার্টন কেবল রক্তহীন স্ত্রীলোকদিগকে এই মাটি খাইতে দেখিয়াছেন। (Pilgrimage to Al-Madineh and Meccah Vol. I., p. 415). খালিফ আব্দুল মালেকের (৬৮৫-৭০৫) প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা হজ্জাজ মৃদ্ভক্ষণে অত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়া ডাক্তার থিয়োডোসাসের ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। ডাক্তার বলেন 'এ রোগের ঔষধ আপনার মত লোকের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা'। হজ্জাজ সেই দিন হইতে মৃদ্ভক্ষণ ছাড়িয়া দিলেন। এল্-বৈতারের চিকিৎসা-গ্রন্থে বহু মৃত্তিকার ঔষধিগুণ ব্যক্ত হইয়াছে (Le Clerc's Historie de la Medicine Arabe I., p. 83).

এম্, এনানডেল মালয় ও শ্যামের স্ত্রীলোকদিগকে নদী-কূলের এক প্রকার মাটি পোড়াইয়া খাইতে দেখিয়াছেন (Fasciculi Malayenses, Anthropology, Pt. II, p. 62)। সেই মৃত্তিকা বলবর্দ্ধক (tonic) রূপে কার্য্য

করে। বোর্ণিও দ্বীপের অধিবাসিগণ বহুবিধ মৃত্তিকা খাদ্যরূপে ব্যবহার করে (H. Ling Roth, The Natives of Sarawak & British North Borneo)। তাহারা নৌকায় কোথাও যাইবার সময় অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে খানিকটা সাদা তৈলাক্ত মাটি সংগ্রহ করিয়া লয়, কি জানি যদি খাদ্যের অভাব ঘটে। তাহারা বলে যে এই মৃত্তিকা বেশ পুষ্টিকর খাদ্য। বোর্ণিওর ডায়াক (Dyak) জাতি সন্দেশের মত আগ্রহের সহিত এক প্রকার পাথর খাইয়া থাকে (Odeardo Beccari's Wanderings in the great forests of Borneo, pp. 335, 337)। এই পাথর নরম এবং ভঙ্গুর ও তৈলাক্ত। ইহা সৌখীন খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। নবগিনির অধিবাসীরা এক প্রকার লাল মাটি খায় (L. M. D' Albertis' New Guinea: What I did and what I saw, p. 89)। যবদ্বীপেও এ প্রথার অভাব নাই; মৃৎপিষ্টক পল্লীর হাটে বিক্রয় হয়। সুমাত্রা ও যবদ্বীপে এই মৃৎপিষ্টক সযত্নে প্রস্তুত হয়; প্রথমে কাদা হইতে বালি কাঁকর প্রভৃতি শক্ত পদার্থ বাছিয়া ফেলিয়া জল দিয়া ময়দা মাখার মত মাখা হয়। সেই মাখা কাদায় সরু সরু করিয়া পিষ্টক গড়িয়া লোহার চাটুতে সেঁকিয়া বা ভাজিয়া লওয়া হয়। অনেক সময় এই পিষ্টক পশু বা মনুষ্যাকৃতি করিয়া গড়া হয়। (বোধ হয় নরখাদকের স্বভাবনিদর্শন। --লেখক)। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত মৃত্তিকার অধিকাংশ জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থপূর্ণ।

আনামের অধিবাসীর নিকট মৃৎখাদ্য লোভনীয় এবং সৌখীন খাদ্য। চীনারাও এক প্রকার শ্বেতমৃত্তিকা আহার করে। হানবোর বলেন, ঔষধার্থ ব্যবহৃত দ্বিবিধ মৃত্তিকা চীনের বাজারে বিক্রয় হয়। (Science Papers, p. 219). উহাদের নাম 'চিঃ-শিঃ-চে' এবং 'কী-হেবা-শিঃ'। চীনারা দালের সঙ্গে জিপসম (খড়ি মাটি) মিশ্রিত করিয়া একরূপ মোরব্বা বা আচার প্রস্তুত করে, এবং খুব পছন্দ করে।

জাপানের অসভ্য আইনোগণ এক রকম মাটি, এক রকম গাছের পাতার সঙ্গে খুব খায়; এবং মাটি দিয়া একরূপ ঝোল রাঁধে। যেখানে এই মাটি পাওয়া যায় তাহার নাম 'সিটোনাই' অর্থাৎ খাদ্যমৃত্তিকার উপত্যকা। ইহার ভক্ষণ তাহাদের খাদ্যাভাবের জন্য নহে, ইহা স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়াই ভক্ষণ করিয়া থাকে।

২। ভারতের মৃদ্‌ভক্ষক।

ভারতে এই প্রথা নূতন নহে। কালিদাস, মল্লিনাথের সময়ের বিবরণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে বর্ত্তমান কালে মৃদ্‌ভক্ষণ কোন্ প্রদেশে কিরূপ প্রচলিত তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

(ক) আসাম—আসামের চা-বাগানের কুলিরা খুব মাটি খায়। তন্মধ্যে বিহারী, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর অঞ্চলের অধিবাসী, শ্রীহট্টবাসী বাঙালী, ভুয়াঘাটোয়াল, পাহাড়ী ও ভুটিয়া কুলিরাই অধিক খায়। প্রায় সকল গর্ভিণীই মৃত্তিকা প্রিয়। ইহাতে বহু অনর্থও সংঘটিত হইয়া থাকে। কিশোরীদিগের পুষ্পবতী হওয়ার সমকালে মৃদ্‌ভক্ষণের বাসনা খুব বলবতী হইতে দেখা যায়। মগেদের মধ্যে এ অভ্যাস নাই, কাহারো হইলে সে শীঘ্র তাহা ত্যাগ করে।

(খ) বাংলা—বাংলায় এই অভ্যাস বহু বিস্তৃত। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির মধ্যেই প্রচলিত, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ও ইতর শ্রেণীর মধ্যে। গর্ভিণী ও কিশোরীদিগের জন্য পাতখোলা বাজারে বিক্রয় হয়। পুরুষদের মধ্যে এ অভ্যাস প্রায় দেখা যায় না। (বালকেরা কিন্তু মাটিপ্রিয়; মুগ, কলাই প্রভৃতির মধ্যে যে মাটির গুটি থাকে তাহা, বৃন্দাবনের মাখনমাটি, চা-খড়ি, শ্লেটপেন্সিল, কয়লা, প্রভৃতি তাহারা আগ্রহের সহিত খায়—লেখক)।

(গ) বোম্বাই—বোম্বাইয়ের সকল সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোক এমন কি সৌখীন পার্শীমহিলারাও—মৃত্তিকাভোজী। তবে সকল সময়ে নহে, প্রায়ই গর্ভাবস্থায় বা ঋতুকালীন খাইতে দেখা যায়। পুরুষের মধ্যে এ অভ্যাস দুষ্প্রাপ্য।

(ঘ) পঞ্জাব—সকল শ্রেণীর, সকল অবস্থার লোকের মধ্যে এই অভ্যাস দেখা যায়। (Swynnerton's The Adventures of the Panjab Hero Raja Rasalu and other Folk-tales of the Panjab)। সন্ন্যাসী ফকিরদের প্রায়ই মাটি খাইতে দেখা যায়। (ছাই খাইতেও দেখিয়াছি; ঘুঁটের ছাই বাংলার মেয়েদের প্রিয় খাদ্য—লেখক)।

মুসাখেল তহশিল ও দলবন্দিন্ সব্-তহশিল ভিন্ন বেলুচিস্থানের সকল প্রদেশে মৃদ্‌ভক্ষণ প্রচলিত আছে (Mr.

Hughes-Buller)। আফগান, বেলুচি প্রভৃতি জাতীয় গর্ভিণী স্ত্রীলোকেরা খুব মাটি খায়। কাহারো মতে প্রথমাবস্থায় শোঁদামাটির লোভ প্রবল হয়। আফগানেরা স্ত্রীলোকের মাটি খাওয়া দেখিয়া তাহাদিগকে সসত্ত্বা বলিয়া বুঝিতে পারে। কখন কখন গর্ভিণী না হইলেও স্ত্রীলোকেরা মাটি খাইয়া থাকে।

(ঙ) মান্দ্রাজ, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর—মহীশূর ও মান্দ্রাজের অনেক জেলায় মৃদ্‌ভক্ষণ প্রচলিত দেখা যায়। মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালোরের বাজারে একরূপ মাটি-খাদ্য তৈয়ারি বিক্রয় হয়। চায়ের দেশে পুরুষ স্ত্রী বয়স নির্বিচারে মৃদ্‌ভক্ষণে অভ্যস্ত। বন্যজাতিরা প্রায়ই খায় না।' নিম্নশ্রেণীর তামিল স্ত্রীলোকেরা মাটি খায়। উচ্চশ্রেণীর লোক বা মুসলমানদের মধ্যে ইহার প্রচলন শোনা যায় নাই। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনে চা বাগানের কুলির মধ্যেই এই অভ্যাস বেশী দেখা যায়। ইহারা পারিয়া শানার প্রভৃতি জাতীয় হিন্দু এবং খৃষ্টান। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের ছোট বড় সকল স্ত্রীলোকই মাটি খাইতে ভাল বাসে; হামাগুড়ি টানা ছেলেরা পর্য্যন্ত অভ্যস্ত দেখা যায়। একজন ডাক্তার বলেন ত্রিবাঙ্কুরের শতকরা ৭৫ জন স্ত্রীলোক মাটি খায়; পুরুষেরা কদাচ খায়।

এস, সি, মিত্র মৃদ্‌ভক্ষণ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, (Journ. Anthropol Soc. Bombay, VII 1905 pp. 284-290.)। তিনি মৃদ্‌ভক্ষণ কয়েকটি ভারতীয় জাতির মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধকর্ত্তারা তাহা স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মতে এই অভ্যাস অল্পবিস্তর সকল জাতির মধ্যেই আছে। এই মতই আমাদের সমীচীন বোধ হয়।

৩। ভক্ষিতব্য মৃত্তিকার আকার-প্রকার ভেদ।

এক বালুকা ভিন্ন সকল প্রকার মাটিই ভক্ষিত হইতে দেখা যায়। V. Ball (Manual of the Geology of India [Economic Geology, 1881] V) বলেন যে 'কেওলিন' নামক চীনা মাটির (চীনের কেওলিন পাহাড়ের মাটি) মত এক প্রকার মাটি জগতের সর্ব্বদেশে ভক্ষিত হয়, এবং তাহার ব্যবহার কেবল গর্ভিণীদিগের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। পশ্চিম সিন্ধুপ্রদেশে একরূপ হরিতাভ মৃত্তিকা কাপড় সাফ করিতে ব্যবহৃত হয়; গর্ভিণীগণ ইহা খাইয়াও থাকে (W. T. Blanford, Memoirs, Geological Survey of India, VII, p. 195)। পঞ্জাবের বাজারে একরূপ নরম, মেটেরঙের, সাবানধর্ম্মী প্রস্তরখণ্ড বিক্রয় হয়, তাহা ঔষধার্থ ভক্ষিত ও মাথাঘসারূপে ব্যবহৃত হয়। তাহার নাম 'মিটিপচনি'। 'মিটি-মুলতানি' বা 'ঘিল-ই-মুলতানি' নামক মাটি তিন প্রকার; প্রথম সাদা রঙের 'খাজরু' বা অদনীয়; বিকানীর, জসল্মীর হইতে সংগৃহীত প্রতি বৎসর ২০০০ উট বোঝাই মৃত্তিকা রপ্তানি হয় (Major Powell এবং T. La Touche) এই মুলতানি মাটি বড়োদা হইতে বেলুচিস্থান এবং বেলুচিস্থান হইতে বাংলা, সর্ব্বদেশে ভক্ষিত হয়। দ্বিতীয় পীতবর্ণের 'ভাকৃরি' দারুদ্রগণ বস্ত্ররঞ্জনার্থ ব্যবহার করে; এবং তৃতীয় 'সব্‌জ্‌-মিটি' কাপড় কাচিতে ও মাথা ঘসিতে ব্যবহৃত হয়। এই তৃতীয়ের অপর নাম 'মিটি-সব্‌জ্‌-খুরদানি', সসত্ত্বা স্ত্রীলোকেরা ইহাও খাইয়া থাকে Baden Powell, Panjab Products, p. 20)। মণিপুরে একটা তৈলাক্ত-কর্দ্দম-শৈল আছে; তাহার মাটি বাজারে বিক্রীত হয়, এবং ঔষধিগুণসম্পন্ন বলিয়া ভক্ষিত হয় (R. D. Oldham, "Geology of Manipur and the Naga Hills, Memoirs, Geological Survey of India, XIX, p. 241")। কলিকাতা মিউজিয়মে মণিপুরের 'চর্ব্বক' নামক এক প্রকার অদনীয় মৃত্তিকার নমুনা সংগৃহীত আছে। ভারতের প্রধান প্রধান সহরে খাদিতব্য মৃত্তিকা নানা আকারে প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হয়। কলিকাতার পাতখোলা পাতলা পাতলা ছোট ছোট ডিশের মত সূতা দিয়া অনেকগুলি একত্র গাঁথিয়া রাখিবার জন্য মধ্যস্থলে একটি করিয়া গোল ছিদ্র বিশিষ্ট। হুগলিতেও ছিদ্রশূন্য গোলাকৃতি মৃৎপিষ্টক বা পাতখোলা বিক্রয় হয়। চট্টগ্রামে বড় বড় মাটির রেকাবির মত অর্দ্ধদগ্ধ খোলা বিক্রয় হয়; ইহার নির্ম্মাণে বিবিরহাট ও বাদেরহাটের মৃত্তিকা ব্যবহৃত হয়। বঙ্গের অন্যান্য অংশেও পোড়া মাটির খুপরি বিক্রয় হয়। কলিকাতায় 'রাজমহল মাটি' বলিয়া একরূপ মাটি বিক্রয় হয়। (রাজমহলের সেই মাটিতে চীনা মাটির বাসনের মত নানাবিধ বাসন পুতুল ইত্যাদি কলিকাতায় তৈয়ারি হইতেছে। মাটি সাদা ধবধবে।—লেখক)

মান্দ্রাজে দ্বিবিধ তিলক মাটি বিক্রয় হয়; বৈষ্ণবদিগের

তিলক করিবার জন্য এক শ্বেতবর্ণের চতুষ্কোণ লম্বা লম্বা খণ্ড, পাশটির মত এবং অপর পাটলবর্ণ, শৈবগণ জলে গুলিয়া পান করে। স্ত্রীলোকেরা এই উভয়বিধ তিলক মাটিই খাইয়া থাকে।

বোম্বাই নগরেও একরূপ অর্দ্ধদগ্ধ অদনীয় মৃত্তিকা দোকানে বিক্রয় হয় এবং রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করিয়াও বিক্রয় হয়। দগ্ধ মৃত্তিকা প্রস্তুত করিবার স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আছে, তাহাদিগকে 'চানাকুড়মুড়িওয়ালা' বলে, তাহারা শস্যাদিও ভাজিয়া বিক্রয় করে। সেই মাটির নাম 'খড়িমাটি'।

বেলুচিস্থানের বহুস্থানে বাজারে অদনীয় মৃত্তিকা বিক্রীত হয়। বালি ছাড়া সব মাটিই খাদ্য। পুরাতন মাটির দেয়ালের মাটিই অধিক পছন্দ হয়। চমনের স্ত্রীলোকেরা একরূপ পলিমাটি (কর্ক) খাইয়া থাকে। কালাট প্রভৃতি স্থানে সিন্ধুপ্রদেশের 'মেট' নামক মাটির খুব আদর; তাহা অপ্রাপ্য হইলে দেশী 'করকত' নামক লোনা মাটির আশ্রয় লওয়া হয়; তাহাও অপ্রাপ্য হইলে কাদায় নুন মাখিয়া পোড়াইয়া খাওয়া হয়। উনমের পোড়া মাটিও খায়। Hughes Buller ১১ রকম অদনীয় মাটির নমুনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বেলুচিদের বিশ্বাস 'কাচ্চা' মাটি অপেক্ষা 'পাকা' (দগ্ধ) মাটি কম অপকারী। অনেক সময় সদ্য-দগ্ধ মৃদ্‌খণ্ড দুগ্ধে ফেলিয়া দুধ চুষাইয়া লইয়া খাওয়া হয়। মাটির পরিবর্ত্তে কখন কখন ছাই ও কয়লাও বাদ যায় না। আফগানিস্থানের অদনীয় মৃত্তিকার নাম 'ঘিল-ই-সরশু'।

বড়োদায় অদনীয় মৃত্তিকা ত্রিবিধ—(১) পিলি মাটি (পীতাভ), (২) কালি মাটি (কৃষ্ণবর্ণ), (৩) খড়ি মাটি (সাদা)। দ্বারকার গোপীতলাও নামক পুষ্করিনীর মাটির লম্বা লম্বা টুকরা তিলকের জন্য বিক্রীত হয়; ইহার নাম গোপীচন্দন। ইহা কেহ কেহ খায়। (বাংলার স্ত্রীলোকেরা গোপীচন্দন খাইয়া থাকেন।—লেখক)।

আসাম কাছাড়ে লাল, কাল, নীল, বহুবর্ণের মৃত্তিকা কাঁচা ও পোড়া খাওয়া প্রচলিত আছে। মাটি খাওয়ার এমন কু-অভ্যাস যে ভাল মাটি দুষ্প্রাপ্য হইলে কলসীভাঙ্গা পর্য্যন্ত ভক্ষিত হইতে দেখা যায়। কুলিরা উইঢিপির মধ্যস্থলের মৃত্তিকা খাইতে বড় ভালবাসে; মাটির সঙ্গে কয়েকটা করিয়া উইপোকা মাটি স্বাদুতর করিবার জন্য মাখিয়া লইয়া থাকে।

ত্রিবাঙ্কুরের কুলিরা ভূমির প্রথম স্তরের নিম্নে প্রাপ্য একরূপ লাল মাটি খুব ভালবাসে। কেহ কেহ কাল রঙের কেঁচোর মাটিও খায়। মাটিখোর কেহ কেহ জীর্ণ কাঠ খাইতেও ভালবাসে দেখা গিয়াছে। অগ্নিমান্দ্য হইলে ত্রিবাঙ্কুরবাসীরা 'বেরাটি'র ছাই (ঘুঁটের ছাই), কয়লা ইত্যাদি খায়। স্বচ্ছল অবস্থার সৌখীন লোকে মাটি বেশ করিয়া চূর্ণ করিয়া ময়দারমত মাখিয়া পিষ্টক গঠন করে এবং মসিনা বা নারিকেল তৈলে ভাজিয়া দিব্য আনন্দে আহার করে। কেহ তাহা মধু মাখিয়া আরো সুস্বাদ করিয়া লয়।

আবার ডাক্তার আর, কে, গুপ্ত বলেন যে তাঁহার পরিচারিকা প্রত্যহ কাদা ও পোড়ামাটি ছাড়া ছয় ছটাক বালি খাইত।

লোণামাটি অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়। বোধ হয় লবণের মহার্ঘতাই ইহার কারণ। দাক্ষিণাত্যে লবণের অভাবে অনেকে কাঠের ছাই ব্যবহার করে (ইহা বৃটিশ-গভর্ণমেন্টের সদাশয়তার ফল; হা অদৃষ্ট, তবু বৃটিশ-গভর্ণমেন্ট অবোধ নিরীহ প্রজার মা-বাপ! অশেষ প্রীতি-ভক্তির আস্পদ!—লেখক)। নীলগিরির বন্যজাতি গাছের ছালের ছাই পাকা তেঁতুল মাখিয়া খায়। তেঁতুল মাখা ছাইকে 'বুঠি পুল্লি' বলে।

বল্লভাচার্য্য বৈষ্ণবসম্প্রদায় (এবং অন্যান্য বহুভক্ত) দূরদেশস্থ ঠাকুরের চরণামৃত মাটিতে মাখিয়া ডেলা পাকাইয়া রাখিয়া দেন; এবং প্রাত্যহিক পূজান্তে একটু করিয়া খাইয়া থাকেন। (ব্রাহ্মণের পদরজ খাওয়াও হিন্দুসমাজে বহুপ্রচলিত।—লেখক)।

দুর্ভিক্ষের সময় ভারতে অনেকে মাটি খাইয়া জীবন ধারণ করে। 'চুরুভাটা' (যোধপুর), 'গাইভাটা', 'গিয়াভাটা', 'ঘিয়াভাটা', 'পলিয়া' (জয়পুর), 'সংগ্রজ' (বিকানীর), 'আজমীঢ়',(মাড়োয়ার) নামক প্রস্তর চূর্ণ করিয়া আটা তৈয়ারী হয়, এবং তৎপ্রস্তুত চাপাটি হতভাগ্যদের দুর্ভর জীবন কষ্ট পাইবার জন্যই কোন মতে ধারণ করিয়া রাখে।

L. L. Ferfnor of the Geological Survey of India সংগৃহীত ৩২ প্রকার অদনীয় মৃত্তিকার স্বরূপ

বর্ণনা করিয়াছেন এবং গুণাগুণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা সমগ্র প্রবন্ধের একরূপ পুনরাবৃত্তি বলিয়া এখানে দেওয়া হইল না। কৌতূহলী পাঠক Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. I, 12, 1906, দেখিতে পারেন। নির্ণীতগুণাগুণ ৩২ রকম ছাড়া আরো ১১ রকম মৃত্তিকা সংগৃহীত হইয়াছে। মোটের উপর অদনীয় মৃত্তিকার এক ভারতেই ৪৩ প্রকারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, আরো থাকা অসম্ভব নহে।

৪। ভারতে মৃদ্‌ভক্ষণের স্বভাব।

মৃদ্‌ভক্ষণে প্রবৃত্তির নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। (১) শোঁদা গন্ধ এবং এক প্রকার বিচিত্র স্বাদ লোভনীয় বোধ হয়। (গ্রীষ্মদগ্ধ ধরণীপৃষ্ঠে যখন বর্ষার প্রথম ধারা পতন হয়, তখন মৃত্তিকার শোঁদা গন্ধ কাহাকে না মুগ্ধ করে? রঘুবংশে সুদক্ষিণার মৃৎসুরভি মুখের আঘ্রাণ করিয়া রাজা দিলীপ তৃপ্ত হইতেছিলেন না; কালিদাস ইহার উপমা দিয়াছেন যে যেমন প্রথম ধারাসিক্তা ধরিত্রীর গন্ধ লইয়া হস্তী তৃপ্ত হয় না। শোঁদাগন্ধি ও স্বাদু মৃত্তিকা যদি আবার কুড়কুড়ে হয়, তাহা হইলে তাহা আরো লোভনীয় হয়। Elia তাঁহার Essayতে যেমন বলিয়াছেন যে 'to overcome shy but brittle resistance' মানবস্বভাবের প্রিয় বলিয়া মানুষ croquet [পাঁপর ভাজার মত এক প্রকার কুড়কুড়ে খাদ্য] খাইতে ভালবাসে। মৃদ্‌ভক্ষকের পক্ষেও ইহাও একটা কারণ বোধ হয়।—লেখক)। (২) অসম অবস্থায় (যথা গর্ভধারণ) রুচি বিকৃতি। (৩) ক্ষুণ্ণিবৃত্তি। (৪) অপরের দৃষ্টান্তানুকরণ এবং (৫) মৃত্তিকার ওষধিগুণে বিশ্বাস।

মৃদ্‌ভক্ষণ অহিফেন ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের মত। গন্ধাস্বাদে আকৃষ্ট হইয়া খাইতে আরম্ভ করিলে তাহা যেন পাইয়া বসে, সহজে তাহার প্রলোভন ও অভ্যাস ছাড়া যায় না। মৃদ্‌ভক্ষণে বিশেষ অভ্যস্ত ব্যক্তিকে যদি মাটি খাইতে না দেওয়া হয়, তাহাদের মুখের ভাব এবং অবস্থা মৌতাতভ্রষ্ট নেশাখোরের মত দেখিতে হয়; শরীর অবসন্ন স্ফূর্ত্তিহীন বোধ হয়।

যাহারা অভ্যাসে পুরাতন হইয়া পড়ে, তাহারা দিনের মধ্যে আধসের তিন পোয়া পর্য্যন্ত মাটি খাইয়া থাকে। মৃদ্‌ভক্ষকেরা প্রায়ই রক্তহীন হইয়া পড়ে। এবং রক্তহীন রোগীরাই আবার অধিক অনুরক্ত হইয়া পড়ে। অতএব এই অভ্যাস রক্তহীনতার কারণ এবং ফল উভয়ই দেখা যাইতেছে। মৃদ্‌ভক্ষকের প্রায়ই কৃমির উৎপাত থাকে; এই অভ্যাসে ব্যাধির উৎপত্তি বা ব্যাধির জন্য এই অভ্যাস তাহা ঠিক বলা যায় না। মাটির সঙ্গে কৃমি বীজ থাকে, তাহা উদরে গিয়া পুষ্ট বর্দ্ধিত হইয়া উঠে বোধ হয়। কিন্তু প্রথমস্তরনিম্ন মৃত্তিকা প্রায়ই দূষিত জৈব পদার্থশূন্য হয়।

বালকদের এই অভ্যাস হইলে তাহারা রুগ্ন বিশ্রী হইতে থাকে। পশ্চিমাঞ্চলের মাতারা শিশুদিগকে অনভ্যস্ত করিবার জন্য মোল্লা বা সৈয়দ প্রভৃতির নিকট হইতে মন্ত্রপূত মাদুলি লইয়া ধারণ করাইয়া থাকেন। কলিকাতার মাতারা গৃহসন্নিহিত ভূমিতে নিমের পাতা দেন (?) ছেলেদের তিক্ত লাগিলে আর খাইবে না বলিয়া।

মান্দ্রাজের একটি ব্রাহ্মণ ছাত্র এতদূর অভ্যস্ত হইয়াছিল যে অন্য কোন মাটি না পাইলে কপালের তিলক ছাড়াইয়া খাইত। সে রক্তহীন ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং উদরাময় তাহার নিত্য সহচর ছিল। এই অভ্যাসে উপরোক্ত রোগ হইতে পাথুরি, হৃদদৌর্ব্বল্য, শোথ ও উদরী পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

এই অভ্যাস দৃঢ়বদ্ধ হইলে অন্য সকল প্রকার খাদ্যে অরুচি ও মৃদ্‌ভক্ষণে রুচি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

৫। ঔষধরূপে মৃত্তিকার ব্যবহার।

সকল দেশে সকল কালে বিশেষ বিশেষ মৃত্তিকার ওষধিগুণ এবং যাদুশক্তিতে বিশ্বাস দেখা যায়।

মাল্টা দ্বীপের এক গুহায় ঋষি পৌল একরাত্রি যাপন করেন; তথাকার মৃত্তিকা রোগনাশক বলিয়া ব্যবহৃত হইত; এবং তাৎকালিক ভৈষজ্যতত্ত্বে সেই মৃত্তিকা স্বেদকারক, বিষাক্ত জন্তুর দংশন-প্রতিকারক ঔষধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পুরাকালে এই মৃত্তিকার খণ্ড সকল অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইত (Hill, History of the Materia Medica)। পবিত্রাত্মা উলরিকের সমাধিস্থানের মৃত্তিকাও ওষধিরূপে পরিগণিত হইত। (Bruckman, Epistolaria Itineraria)। পয়গম্বর মহম্মদের গোরের মৃত্তিকাও ঔষধ-ধর্ম্মী। মক্কায় উক্ত গোরের মৃৎখণ্ড বিক্রয় হয়; তাহাতে

আরবিতে লেখা থাকে 'পরমেশ্বরের নাম ; আমাদের দেশের মৃত্তিকা, আমাদের লালা মিশ্রিত'। পয়গম্বরের সমাধির মৃত্তিকা চামড়ার থলিতে ভরিয়া হস্তে গলায় অহিতপ্রতিষেধক মাতুলিরূপেও ব্যবহৃত হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দী প্রাদুর্ভূত মালাবারের খ্যাতনামা চিকিৎসক এল-বৈতার নয় প্রকার ভেষজ-গুণসম্পন্ন মৃত্তিকার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন :—থিন্ মাখ্‌টুম ; থিন্ মেশ্‌র (মিশরের মাটি), থিন্ শ্যামস্ (শ্যামসের মাটি), থিন্ বেজিরাত্ এল-মেক্রিক, থিন্ কিমলিয়া, থিন্ কেমি (দ্রাক্ষাক্ষার), থিন্ হর (কর্দ্দম), থিন্ আর্ম্মানী এবং থিন্ নিসাবরী। শেষোক্ত মৃত্তিকা খুব শ্বেতবর্ণ, খাইতে সুস্বাদু ; কাঁচা লবণস্বাদ, পোড়া মিষ্ট। কেহ কেহ ইহা গোলাপজল বা কর্পূর বাসিত করিয়া পিষ্টক তৈয়ার করে।

মহম্মদ ইবন্ জাকারিয়া (৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ) শেষোক্ত মৃত্তিকাকে হৃৎসংস্কারক ও বমনবারক বলিয়াছেন। ক্ষার, কাবাবচিনি, এলাচ, কর্পূর, মৃগনাভি, গোলাপ, লেবু প্রভৃতি সংযুক্ত করিয়া খাইলে বমন রোধ করে। কিন্তু যাহাদের যকৃৎ দুর্ব্বল, মূত্রপ্রণালীতে পাথুরি জন্মে, কিংবা রুগ্ন পাণ্ডুর বর্ণ ব্যক্তিকে মৃত্তিকা ব্যবস্থা উচিত নহে। নিদ্রিতাবস্থায় যাহাদের লালাক্ষরণ হয়, যাহাদের উদরাময় সত্ত্বেও অসহ্য ক্ষুধা হয়, তাহাদের পক্ষে ইহা উপকারী। ইহা পাকস্থলীর বহুপ্রকার রোগে ব্যবস্থা করিয়া তিনি আশ্চর্য্যজনক ফললাভ করিয়াছিলেন। ইহার প্রশংসা তিনি বহু প্রকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন (Translation by L. Le Clerc, Paris).

ভারতের মৃদ্‌ভক্ষকগণেরও অনেকে মৃত্তিকার ঔষধে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকে। কাহারো মতে ইহা উত্তেজক ; কেহ বিশ্বাস করে যে গর্ভাবস্থায় অম্ল এবং বুকজ্বালা বা ঋতুজনিত ক্লেশ ইহাতে উপশমিত হয়। বেলুচিগণের বিশ্বাস মৃৎখাদিকার প্রসব সহজ হয় এবং প্রসবের পূর্ব্বে যে 'জলভাঙ্গে' তাহা শোষণ করিয়া লয়। কিন্তু এ বিশ্বাস ভুল ; বরং সেই স্রাব বন্ধ হইয়া গিয়া প্রসব কষ্টকর হইয়া উঠে।

হয় ত' বিশেষ কোন প্রকার মৃত্তিকা অল্প একটু খাইলে উপকার হইতে পারে, কিন্তু অল্পে আরম্ভ করিলেও শেষে অভ্যাস বৃদ্ধি হইয়া অকালমৃত্যু ঘটায়। (Miss Martineaur একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে হয় যে If I begin with a glass who shall guarantee me that I shall not end by a bottle—লেখক)।

ভাগবত সিংহজী ভারতীয় ঔষধের তালিকা প্রদানকালে বলিয়াছেন যে 'হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রে ধাতু, রস (পারদ), লবণ, রত্ন, মৃত্তিকা প্রভৃতি ঔষধরূপে গণ্য। কয়েক প্রকার বালুকা ও মৃত্তিকা ব্যবহার হয়, যথা—খটিকা, কর্দ্দম, গোপীচন্দন, সিকতা ইত্যাদি (A Short History of Aryan Medical Science)। Irvine বলেন, 'মুলতানি মাটি উদরাময়ে ৫ হইতে ৩০ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহৃত হয় (Materia Medica of Patna)। সখারাম অর্জ্জুন ঔষধিরূপে ব্যবহৃত কতকগুলি মৃত্তিকার উল্লেখ করিয়াছেন—

গোপীচন্দন, পানিসোকা (মারাঠী)। (Silicate of Alumina)। প্রথমটি মাথাধরা বা অন্য কোনরূপ প্রদাহ হইলে প্রলেপরূপে ব্যবহৃত হয় ; দ্বিতীয়টি ঘা শীঘ্র শুষ্ক করিবার জন্য প্রলেপিত হয়।

সঙ্গ-ই-বস্রি (পারস্য, অর্থ বসরার পাথর বা মাটি)। (Silicate of Alumina with lime and iron). অনিয়মিত ঋতুতে ব্যবহৃত হয়। লৌহ থাকায় উপকারও হয়।

মুলতানি মাটি চিনির সহিত খাইলে প্রদর আরোগ্য হয় ; অমনি খাইলে গর্ভাবস্থার অম্লজনিত উপসর্গ উপশমিত হয়। (Bombay Drugs) ডাক্তার ফেরোজদীন মহরুক বলেন যে ইহা পাকস্থলীর প্রদাহ, পুরাতন উদরাময় প্রভৃতি রোগ উপশম করিতে সক্ষম বিশ্বাসে দিল্লিতে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

ইউ, সি, দত্ত ঔষধে ব্যবহৃত মৃত্তিকার মধ্যে গৈরিক বা গেরি মাটির উল্লেখ করিয়াছেন। মিষ্টগন্ধী সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা বিবিধ রক্তস্রাবরোধক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। (Materia Medica of the Hindus).

ঘিল-ই-আরমানী, মুলতানি মিট্টি, ও গোপীচন্দন গ্রন্থিস্ফীতি বা প্রদাহস্থানে প্রলেপ প্রদত্ত হয়। মান্দ্রাজে চর্ম্মরোগে কর্দ্দম প্রলেপ দেওয়া হয়।

বিহারের এস, সি, মিত্র বলেন 'পিউড়ীমিট্টি' নামক

মাটি শিলায় (করকা) জলে মাখিয়া শুষ্ক করিয়া রাখা হয়। কলেরার রোগীর বুকে তাহার প্রলেপ দিলে গাত্রদাহ নিবারণ করে।

ব্রিটিশ মেডিক্যাল জর্ণলে মৃত্তিকার ভেষজগুণের আলোচনা হইতেছে। একজন অর্শরোগী মাটির বড়ি খাইয়া সুস্থ হইয়াছিল। একটি বাঙালী ভদ্রলোক প্রবন্ধলেখকদ্বয়ের মধ্যে একজনকে বলিয়াছেন যে তিনি অর্শের কষ্ট নিবৃত্তির জন্য মধ্যে মধ্যে কর্দ্দম বটিকা সেবন করিয়া থাকেন। হানিম্যান মৃত্তিকা হইতে 'এল্যুমিনা' নামক ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; সকল হোমিওপ্যাথ গুহ্যদ্বারসম্বন্ধীয় পীড়ায় ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন।

J. Stumpf বলেন (Berl. Klin. Woch. per Apoteker Zeitung) কলেরা রোগে খালি পেটে (১৮ হইতে ২৪ ঘণ্টা উপবাসের পর) খুব অধিক মাত্রায় (বয়স্ক ৭০—১০০ গ্র্যাম, শিশু ৩০—১০ গ্র্যাম, ১ গ্র্যাম = ১৫.৪৩২ গ্রেণ) মৃত্তিকাচূর্ণ সেবন করাইলে রোগী শীঘ্র সুস্থ হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়ে। সমগ্র পূর্ণ মাত্রা জলে গুলিয়া অল্প অল্প করিয়া ২০।২৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করিতে হয়।

৬। সাধারণ মন্তব্য।

আমাদের সংগৃহীত তত্ত্ব হইতে দেখা গেল যে মৃদ্ভক্ষণ দেশকালপাত্র নির্বিচারে প্রচলিত। সুসভ্য ধনী হইতে বন্য দরিদ্র পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষ বা বয়সনির্বিচারে সকলেই মাটি খাইয়া থাকে। পরের অভ্যাস দেখিয়া বা ঔষধার্থে একবার ভক্ষণ করিলে পুনরায় ভক্ষণে লোলুপতা জন্মে, ক্রমশ অত্যাজ্য অভ্যাসে পরিণত হয়। প্রথমে রোগ, পরে অকাল মৃত্যু এই অভ্যাসের অনিবার্য্য ফল। দুর্ভিক্ষের সময় বাধ্য হইয়া যে সকল হতভাগ্য মৃত্তিকা ভক্ষণ করে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি।

প্রাণী বা উদ্ভিদ শরীরের কোনও অংশ সুস্থ আছে কি না জানিতে হইলে, সেই অংশ রীতিমত পরিপুষ্ট হইতেছে কি না দেখার রীতি আছে। পরিপুষ্টি হওয়া জীবনের অন্যতম লক্ষণ। কিন্তু এই পরিপুষ্টি বা বৃদ্ধির কাজ উদ্ভিদ শরীরে কিপ্রকারে চলে, তাহা এ পর্য্যন্ত ঠিক জানা যায় নাই। উদ্ভিদ-শরীরে আঘাত উত্তেজনা দিয়া দেখা গিয়াছে, যে উত্তেজনা এখন গাছের বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে, পর মুহূর্ত্তে তাহা দ্বারাই আবার বৃদ্ধির রোধ হইয়া পড়িতেছে। বহু অনুসন্ধানেও উত্তেজনার এই উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যের মধ্যে কোনও নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারা যায় নাই। বাহিরের উত্তেজনার ঐ বিসদৃশ কার্য্য দেখিয়া উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ গাছের ভিতরকার একটি স্বাভাবিক উত্তেজনার (Inner Stimulus) অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছেন, এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া আজকাল গাছের বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় নানা ব্যাপারের ব্যাখ্যান দিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু ঐ আভ্যন্তরীন উত্তেজনা জিনিসটা যে কি, এবং তাহার উৎপত্তিই বা কোথায়, আধুনিক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণের গ্রন্থে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থে (Plant Response) ঐ কাল্পনিক উত্তেজনার উৎপত্তি-রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং উহার সহিত বাহিরের আঘাত-উত্তেজনার কি প্রকার সম্বন্ধ তাহাও সুস্পষ্ট দেখাইয়া তিনি উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্বন্ধে সকল সমস্যারই সুমীমাংসা করিয়াছেন।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় নূতন সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে, পৌনঃপুনিক সাড়া (Multiple response) সম্বন্ধে আচার্য্য বসু মহাশয়ের অবিষ্কারের যে সকল কথা পূর্ব্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা একবার স্মরণ করা আবশ্যক। আমরা সেই প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম, সাধারণ সুস্থ গাছে আঘাত দিলে প্রতি আঘাতেই এক একটি সাড়া পাওয়া যায়, কিন্তু উহার ভিতরকার শক্তির পরিমাণ যদি প্রচুর হয়, তবে একই উত্তেজনার পর পর অনেকগুলি সাড়া দেখা দিতে আরম্ভ করে। অপরিপুষ্ট দুর্ব্বল বনচাঁড়াল (Desmodium) গাছ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, প্রতি আঘাতে পাতা এক একবার মাত্র উঠিয়া নামিয়া সাড়া দিতে থাকিবে। পরিপুষ্ট সবল গাছে আঘাত দাও, একই আঘাতে সেটির পাতা বহুবার উঠানামা করিয়া সাড়া দিতে আরম্ভ করিবে। এই পৌনঃপুনিক সাড়া কেবল বনচাঁড়াল গাছেরই বিশেষত্ব নয়। আঘাত উত্তেজনায় গাছ মাত্রেরই শরীরে পৌনঃপুনিক সাড়া চলা ফেরা করে, বনচাঁড়াল

গাছের পাতার গঠন ও অবস্থান উত্তেজনা গ্রহণ করিয়া প্রত্যক্ষ সাড়া দিবার অনুকূল বলিয়া আমরা কেবল ঐ রকম দু' একটা গাছে পাতার উঠানামা দেখি। এ সকল স্থলে উত্তেজনাস্রোত বৃক্ষশরীরের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে পাতাগুলাকে নাড়া দিয়া যেন আপনার অস্তিত্ব প্রকাশ করে। অপর বৃক্ষে উত্তেজনা প্রবাহের অস্তিত্ব এই উপায়ে ধরা যায় না, বৈদ্যুতিক উপায়ে বুঝিতে হয়।

প্রবাসীতে প্রকাশিত পৌনঃপুনিক সাড়াশীর্ষক প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি, উদ্ভিদের কোন অঙ্গে আঘাত বা উত্তেজনা দিলে, প্রথমেই আঘাতপ্রাপ্ত অংশ হইতে জলীয় ভাগ কোষপরম্পরায়ও সর্ব্বাঙ্গে চলিতে আরম্ভ করে, এবং পরে আণবিক বিকারজাত প্রকৃত উত্তেজনা তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া গাছে সাড়ার প্রকাশ করিতে থাকে। লজ্জাবতী লতার একটা লম্বা ডালের গোড়ায় কোন প্রকার আঘাত দাও, প্রথমেই আহত অংশের কোষগুলির জলীয়-ভাগ কোষপরম্পরায় চলিয়া পত্রবৃন্তগুলিকে রসপুষ্ট ও খাড়া করিয়া দিবে, এবং পরে প্রকৃত আণবিক উত্তেজনা পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া পাতাগুলিকে নামাইয়া ফেলিবে। রসপুষ্টিজনিত পাতার আকস্মিক উত্থান, এবং পরক্ষণে প্রকৃত উত্তেজনাজনিত তাহাদিগের পতন, লজ্জাবতী গাছে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। অপর গাছে এই প্রকার প্রত্যক্ষ সাড়া দেখিবার উপায় নাই; কিন্তু বৃক্ষমাত্রেই যে ঐ উত্তেজনাদ্বয় বিচিত্র গতিতে চলা ফেরা করে, আচার্য্য বসু মহাশয় নানা পরীক্ষায় তাহা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন।

আচার্য্য বসুমহাশয় পূর্ব্বোক্ত রসসঞ্চলনকেই বৃক্ষের বৃদ্ধির মূল কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইঁহার মতে, উত্তেজনা প্রাপ্ত অংশ হইতে যখন তালে তালে রস সঞ্চালিত হইতে থাকে, গাছের বর্দ্ধনশীল অংশ তাহা দ্বারা ধাক্কা পাইয়া সেইপ্রকার তালে তালে প্রসারিত ও আকুঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে। একটা রবারের নল টানিয়া ছাড়িয়া দিলে, সেটি যেমন পূর্ব্বের আকার পুনঃপ্রাপ্ত হয়, ঐ আকুঞ্চন প্রসারণও কতকটা সেইপ্রকারের. পার্থক্যের মধ্যে এই যে, গাছের বর্দ্ধনশীল অংশ রসের ধাক্কা পাইয়া যে টুকু প্রসারিত হয়, ধাক্কা বন্ধ হইলে রবারের নলের মত সেটি ঠিক্ পূর্ব্বের আকার ফেরত্ পায় না। প্রসারিত হইবা মাত্র ফাঁকা স্থানে বৃক্ষের বৃদ্ধিকর সামগ্রী সঞ্চিত হইয়া প্রসারণকে কিঞ্চিৎ-পরিমাণে স্থায়ী করিয়া দেয়। কাজেই পৌনঃপুনিক ধাক্কায় সেই এক একটু স্থায়ী প্রসারণ জমা হইয়া গাছটিকে বাড়াইয়া তুলে।

গাছের বৃদ্ধির পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যান হইতে দেখা যাইতেছে, আহত স্থান হইতে উত্তেজনাগুলি যেমন তালে তালে আসিয়া বর্দ্ধনশীল কোমল অংশে ধাক্কা দেয়, গাছও ঠিক্ সেইপ্রকার তালে তালে বাড়ে। উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবে এ পর্য্যন্ত সূক্ষ্মরূপে গাছের বৃদ্ধি পরীক্ষা করা হয় নাই। আচার্য্য বসু মহাশয় তাঁহার "ক্রেস্কোগ্রাফ্" নামক যন্ত্র দ্বারা গাছমাত্রেরই ঐ প্রকার তালে তালে বাড়া সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন।

সুতরাং দেখা গেল, গাছের কোন অংশে আঘাত দিলে সেই স্থান হইতে উত্তেজনাটা পুনঃ পুনঃ যাওয়া আসা করিতে আরম্ভ করে, এবং তদ্দ্বারা গাছের বৃদ্ধি সম্ভব হয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সাধারণ অবস্থায় গাছে ঐ প্রকার আঘাত উত্তেজনা কোথা হইতে পায়? কোন গাছের পৌনঃপুনিক সাড়া দেখিতে ইচ্ছা করিলে, আমরা সেই গাছটির কোন অংশে তাপ প্রয়োগ করিয়া বা অপর কোন প্রকার আঘাত দিয়া উত্তেজিত করি এবং এই উত্তেজনা পৌনঃপুনিক সাড়া সুরু করে। গাছ যখন আপনা হইতেই বাড়িতেছে, তখন এই প্রকার আঘাত কোথা হইতে আসে? আচার্য্য বসু মহাশয় এই প্রশ্নের সুমীমাংসা করিয়াছেন। তিনি নানা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন, বাহিরের তাপ আলোক ও রস সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিদ সকল যখন শক্তিপূর্ণ থাকে, তখন বাহির হইতে কোনপ্রকার আঘাত উত্তেজনা না দিলেও তাহাদের পৌনঃপুনিক সাড়া চলিতে থাকে। এই প্রকার অবস্থায় বায়ু দ্বারা গাছের পাতাগুলির মৃদু আন্দোলন বা পত্রগুলির পরস্পর সংঘর্ষণ প্রভৃতি সামান্য আঘাতও অনেক সময় পৌনঃপুনিক সাড়া সুরু করাইবার কারণ হইয়া দাঁড়ায়; এবং যে পর্য্যন্ত সেই পূর্ব্বসঞ্চিত শক্তির ভাণ্ডার ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, ঐ সাড়ার আর বিলয় হয় না। আচার্য্য বসু মহাশয় নানা পরীক্ষা দ্বারা, পৌনঃপুনিক সাড়ার এই প্রকার সত্বর প্রবর্ত্তন অনেক গাছে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, এবং ইহার উপরই নির্ভর করিয়া তিনি বলিতেছেন, গাছগুলি যখন তাপালোকের শক্তি ও রস সংগ্রহ করিয়া বেশ স্ফূর্ত্তি-

সম্পন্ন থাকে, তখন তাহাতে যেমন আপনা হইতেই পৌনঃপুনিক সাড়া চলিতে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে রসপ্রবাহের ধাক্কা পাইয়া গাছও সেইপ্রকারে বাড়িতে থাকে।

বৃক্ষের পৌনঃপুনিক সাড়া ও তাহাদের বৃদ্ধির সাড়া তুলনা করিবার জন্য আচার্য্য বসুমহাশয় অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন, এবং এই সকল পরীক্ষালব্ধ অনেকগুলি চিত্র তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। এই উভয়বিধ সাড়ালিপি তুলনা করিলে খুঁটি নাটি সকল ব্যাপারেই তাহাদের একতা দেখা যায়। সুতরাং পৌনঃপুনিক সাড়ার রসপ্রবাহ যে, গাছপালাকে বাড়াইয়া তুলে তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বলা বাহুল্য প্রাচীন ও আধুনিক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণ পৌনঃপুনিক সাড়ার খুঁটিনাটি সকল ব্যাপার জানিতেন না। কাজেই উদ্ভিদের বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাঁরা গাছের কোন এক অন্তর্নিহিত শক্তিকে (Inner Stimuli) তাহাদের বৃদ্ধির কারণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই শক্তির প্রকৃত পরিচয় তাঁহাদের নিকট পাওয়া যাইত না। আচার্য্য বসু মহাশয় এই আবিষ্কার দ্বারা এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার ছিল তাহা স্পষ্ট-ভাষায় সকলকে জানাইয়াছেন। উদ্ভিদ শরীরের তালে তালে কম্পন (Rhythmic activity) যে তাহাদের বৃদ্ধির একমাত্র কারণ তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, এবং বৃক্ষের উত্তেজনাশীলতাই, যে ঐ কম্পনের মূল কারণ তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। সুতরাং এখানেই সেই রহস্যময় "inner stimuli" কথাটির সদ্ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতেছে। উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়াইয়া বাহিরের তাপালোক হইতে গাছপালা যে সকল শক্তি নিজের দেহে সঞ্চিত রাখে, স্থূল কথায় বলিতে গেলে তাহাই উদ্ভিদের inner stimulia মূল উৎপাদক।

শক্তির সঞ্চয় না থাকিলে সজীব নির্জীব কোন বস্তুই কাজ করিতে পারে না। বাহিরের তাপালোক উদ্ভিদ দেহে শক্তি-সঞ্চার করে, কাজেই গাছপালাকে তাপালোক হইতে বঞ্চিত করিলে, সেগুলির নির্জীব হইয়া পড়ার সম্ভাবনা। আচার্য্য বসু মহাশয় শত শত পরীক্ষায় নানা জাতীয় উদ্ভিদকে ঐ প্রকারে নির্জীব করিয়া, পরে তাহাদের দেহে কৃত্রিম উপায়ে তাপালোক প্রভৃতির উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া, সেগুলিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাহিরের উত্তেজনা দেহস্থ করিয়া মৃতপ্রায় উদ্ভিদ সকল সুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং ক্ষণকালের মধ্যে তাহাদের বৃদ্ধি ও রস শোষণও দেখা গিয়াছিল।

শক্তি সঞ্চিত হইলেই, তাহা দ্বারা কাজ পাওয়া যায় না। আমাদের নিজের শরীরের কথা ভাবিলেই তাহা বেশ বুঝা যায়। যখন কোনও কারণে শরীর খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, শক্তির সঞ্চয় আরম্ভ হইলেই তখন আমাদের কার্য্য করিবার সামর্থ ফিরিয়া আসে না। সে সময়ে শরীরের সমস্ত শক্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়, সুতরাং শরীরকে খাড়া রাখিবার জন্য যে একটু শক্তির আবশ্যক, সে টুকু সর্ব্বাগ্রে আমরা আত্মসাৎ করিয়া লই, এবং ইহার প্রতিদানে আমরা কোন কার্য্যই দেখাইতে পারি না। এই প্রকারে খাড়া হওয়ার পর যে শক্তি পাওয়া যায় আমরা কেবল তাহা দ্বারাই কাজ দেখাইতে পারি। আচার্য্য বসু মহাশয় উদ্ভিদেও অবিকল পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রাণিলক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন। দুর্ব্বল গাছ পরীক্ষা করিয়া দেখ,—তাহাতে বৃদ্ধি ও রস-শোষণ প্রভৃতি কার্য্যের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইবে না। তারপর তাহাতে উত্তেজনা প্রয়োগ কর,—স্পষ্টই বুঝা যাইবে উহার কতক অংশ গাছটিকে সবল করিবার জন্য ব্যয়িত হইয়া পড়িতেছে, এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বারা তাহার বৃদ্ধি ও রসশোষণের কার্য্য আরম্ভ হইতেছে।

শীতাতপের আধিক্য প্রাণীর স্বাস্থ্য-রক্ষার অনুকূল নয়। অত্যন্ত শীত বা অত্যন্ত গরমে সাধারণ প্রাণীর জীবন রক্ষা করা দায় হইয়া পড়ে। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় শীতাতপের মাত্রা একটা নির্দ্দিষ্ট সীমায় পৌঁছিলে প্রাণী বেশ স্ফূর্ত্তি সম্পন্ন হইয়া পড়ে। নানা জাতীয় প্রাণীর মধ্যে কোন্‌টি কিপ্রকার উষ্ণতায় সুস্থ থাকে, তাহা আজও স্থিরীকৃত হয় নাই, তবে শারীরিক গঠন ও অবস্থা অনুসারে প্রত্যেক প্রাণীরই যে এক একটা স্বাস্থ্যপ্রদ উষ্ণতা আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। আচার্য্য বসু মহাশয় নানা উদ্ভিদ পরীক্ষা করিয়া, প্রত্যেক জাতির এক একটা স্বাস্থ্যপ্রদ উষ্ণতা (Optimum Temperature) আবিষ্কার করিয়াছেন। উষ্ণতা ক্রমে

বৃদ্ধি পাইয়া ঐ নির্দ্দিষ্ট সীমায় পৌঁছিলে, যে গাছগুলি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতে আরম্ভ করে, আচার্য্য বসু মহাশয় তাঁহার স্বাবিষ্কৃত যন্ত্র দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

NOTES ON PICTURES.

It seems wise, in our reproduction of notable European pictures, to go on for a series of months giving only modern works. In this way, we hope to create a broad impression in the mind of the reader, as to the subjects and method of the European art of the present age, and then go back to an earlier period, and try to illustrate the way in which this power was gained, by reproducing a few typical examples of older masterpieces.

One reason for choosing this order of procedure, lies perhaps in the fact that if our readers saw first a Virgin and Child by Botticelli, the Avenue of Trees at Middelharnis by Hobbema, a few Madonnas by Raphael, and the Last Supper by Leonardo da Vinci, they might not care for the much slighter work of the moderns. Men were much more serious over their painting in the old days, and consequently they gave birth to conceptions which carry with them an air of eternity. They painted in the grand style. Modern work is slighter, more personal; it seeks intimate and elusive moments. And by the same rule, while it is often exquisite, it is almost always fugitive, in the impression it makes on the beholder.

When it fails, on the other hand, it fails by pettiness and melodrama, whereas the old painters were always sincere, never self-conscious, and may have been stiff or crude or exaggerated in many ways, but could never by any means have been guilty of vulgarity.

One great reason for these differences lies in the fact that the artists of Italy, Germany and Holland, from the thirteenth to the sixteenth centuries, had a much smaller choice of subjects than the moderns. At first, at least in Italy, they painted very little except religious subjects. Then they began to draw upon the Greek and Latin classics, and we have Venuses and Auroras and Sea Gods, and the rest. It was in Holland that the idea of realism, or painting the common things of common life, was born. And now a days it often seems as if an artists, only idea were to paint something that had never been painted before. Yet even now, the dreamers and poets of Europe—and a painter is only a poet singing in colour—cannot help turning back time and again to the old religious themes. Perhaps a man feels that until he has painted a Madonna, or a Last Supper, like the old masters, he has not fully measured his power. Perhaps the impulse is finer than this, a desire to translate high ideals into the common tongue. In any case, some of the finest pictures, even in modern times, are religious and Christian. This was so, though not in its full sense, with the two modern European pictures which we have already given, St. Genevieve watching over Paris, by Puvis de Chavannes, and the Angelus by J. F. Millet. But of the picture which we give in the present month, it is true in a much larger way. This is actually a modern Madonna, by a living painter, Dagnan Bouveret.

Different as they are in many ways, there is something in the spirit of this work that brings it and the Angelus of Millet very close together. It is the blending of the ideal with the real. In this picture, we scarcely know whether the mother is portrayed as an Italian peasant-woman or as a nun. The child is an Italian peasant-baby. In no detail has the artist shrunk from faithful copying of his original. The arbor in which we see the two, is a vine-clad verandah cooling the door of a peasant-home, a common form, it may be, for the Italian farmhouse or cottage. But it is meant to suggest a cloister. The simple woollen gown of the mother with the heavy peasant *Sabots*, is meant for the habit of the nun. Every detail of the painting is charged with symbolism. We are made to realise that this is not the mother of Jesus, nor yet the peasant-wife it seems. It is the very soul of man, of each or any of *us* clasping to itself that thought it holds most dear.

To be fully felt, this picture should be seen for the first time suddenly. It is only in this way, that one can be adequatly touched and held by the wonderful intimacy of the eyes. I know of no other picture, of any period, in which the heart is so powerfully made to tell the secret of its own tenderness.

NIVEDITA OF RK.—V.

চিত্র সম্বন্ধে।

আমরা য়ুরোপীয় বিখ্যাত চিত্রকরদিগের চিত্র-প্রতিলিপি [illegible] ক্রমানুযায়ী প্রকাশ করিব। প্রথমতঃ আধুনিক চিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাতনের দিকে অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করি। আধুনিক

চিত্রের দ্বারা বর্ত্তমান কালের য়ুরোপীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি ও অঙ্কিতব্য বিষয় সম্বন্ধে একটা মোটামুটি রকম ধারণা করিয়া লইয়া প্রাচীন শিল্প-গুরুদিগের কয়েকটি বিশেষ চিত্র-দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব, কিরূপে কোথা হইতে বর্ত্তমানের ক্ষমতা অর্জ্জিত হইয়াছে।

এইরূপ বিপরীত প্রণালী অনুসরণের একটি প্রধান কারণ এই যে হয় ত পাঠক প্রথমত বটিসেল্লি-অঙ্কিত 'মাতা ও শিশু,' হবেমা রচিত 'মিডেলহেনিসের তরুবীথি,' র‍্যাফেলের কয়েকটি 'মাতৃমূর্ত্তি' এবং লিওনার্ডো ডা ভিন্সি-অঙ্কিত 'শেষ ভোজ' দেখিলে পরে আধুনিক শিল্পীর হীনতর চিত্র দেখিয়া তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন ও মনোযোগী নাও হইতে পারে। প্রাচীন শিল্পিগণ তাঁহাদের রচনা বিষয়ে অধিকতর গভীরভাবানুপ্রাণিত ছিলেন, এজন্য তাঁহাদের চিত্রের অভিব্যক্তির সহিত অনাত্মনন্তের একটি গূঢ়ভাব জড়িত দেখা যায়। তাঁহাদের চিত্র ঐশ্বর্য্যময় অপূর্ব্ব সুন্দর পদ্ধতিতে অঙ্কিত হইত। বর্ত্তমান কালের চিত্র অধিকতর স্বসম্বন্ধীয়, পরিচিত অথচ কষ্টায়ত্ত ঘটনাই তাহাদের অনুসন্ধেয়, এজন্য প্রাচীন কালের অপেক্ষা হীনতর, এবং সেই কারণেই যদিও এ সকল অনেক সময় সৌন্দর্য্যের হিসাবে অতি চমৎকার, তথাপি দর্শকের মনের উপর স্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত করিতে পারে না। অপর পক্ষে যখন চিত্র সফলাঙ্কন হয় না, তখন তাহার কারণ—বিষয়ের তুচ্ছতা এবং কষ্টকল্পনা। পুরাতন শিল্পিগণ সতত সরল সহজভাবে ও আত্মবিস্মৃত হইয়া চিত্রেই নিবিষ্ট হইতেন; হয় ত কাহারো কাহারো বা চিত্র আড়ষ্ট বা অস্ফুট সামান্য ভাবের বা অপ্রাকৃত অতিরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কেহই কখন হীনতা বা তুচ্ছতার দোষে দুষ্ট নহেন।

উভয় যুগের চিত্রের বৈষম্যের একটি কারণ, ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর ইটালি, জর্ম্মণী ও হলাণ্ডের শিল্পিগণের আধুনিক শিল্পী অপেক্ষা অঙ্কিতব্য বিষয়ল্পিতা। বিশেষত ইটালিতে প্রথমত কেবল ধর্ম্মবিষয়েই চিত্রচর্চ্চা হইত। তৎপরে প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন পুরাণের বিষয় আরম্ভ হয়, তাহার ফলে রতিদেবী, উষাদেবী, সূর্য্যদেব ও অন্যান্য দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাই। হলাণ্ডেই প্রথম বাস্তবের প্রচলন, অর্থাৎ সাধারণ জীবনের সাধারণ ঘটনা অঙ্কন আরম্ভ হয়। এবং অনঙ্কিতপূর্ব্ব বিষয়ের অঙ্কনই অধুনাতন-কালের চিত্রকরের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এখনো সকল য়ুরোপীয় কল্পনাকুশল ও কবিশিল্পি—চিত্রকরও কবি, যদিও তাঁহার মধুর সঙ্গীত শব্দে নহে, বর্ণে পরিস্ফুট—এখন তখন ফিরিয়া ফিরিয়া সেই প্রাচীন ধর্ম্মবিষয়ের দিকে যাইতে বাধ্য হইয়া থাকেন। বোধহয় তাঁহাদের মনে হয় যে প্রাচীন চিত্রগুরুদিগের মত যদি মাতৃমূর্ত্তি বা শেষ ভোজ না আঁকিতে পারিলাম তবে আমাদের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার পূর্ণ যাচাই হইল কৈ? বোধহয় সেরূপ প্রবর্ত্তনার কারণ এতদপেক্ষাও সূক্ষ্ম— সে হয় ত উচ্চআদর্শকে সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত করিবার অদম্য [illegible]। প্রবর্ত্তনার কারণ যাহাই হউক আধুনিক যুগেরও উৎকৃষ্টতম চিত্রের অধিকাংশই ধর্ম্মচিত্র এবং খৃষ্টীয়। আমরা যে দুটি চিত্র ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, স্তাভ্যান্সিস্ অঙ্কিত প্যারি প্রহরায় নিযুক্তা ধর্ম্মিষ্ঠা জেনিভিভ ও জে, এফ, মিলেট অঙ্কিত উপাসনার ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে, তাহাদের জন্ম সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা এইরূপ ধর্ম্মভাবপ্রসূত। বর্ত্তমান মাসে প্রকাশিত চিত্র সম্বন্ধে এ কথা অধিক-রূপে বলা যাইতে পারে। ইহা জীবিত চিত্রকর দাগনান-বুভারেট অঙ্কিত বাস্তবিক একটি আধুনিক মাতৃমূর্ত্তি।

যদিও বর্ত্তমান চিত্রে ও মিলেটের 'ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে' চিত্রে বহু বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে, তথাপি এই চিত্রের অন্তরে এমন একটি ভাব আছে যাহা উভয়ের ঘনিষ্ঠতা সূচিত করিতেছে। তাহা আদর্শের সহিত বাস্তবের সম্মিলন, এই চিত্রাঙ্কিত মাতা যেন কোন ইটালীয় কৃষকপত্নী অথবা সন্ন্যাসিনী এবং শিশুটি যেন ইটালীয় কৃষক শিশু। চিত্রকর বাস্তবের কোনো অংশ বাদ দিয়া অঙ্কিত করেন নাই। যে লতাবিতানে আমরা শিশু ও মাতা উভয়কে দেখিতেছি, তাহা হয়ত কোন কৃষক-কুটিরের দ্রাক্ষালতাবেষ্টিত বারান্দা, এবং হয় ত বা এইরূপ বারান্দা ইটালীয় কৃষিগৃহ বা কুটিরের নিতান্ত নিজস্ব সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু ইহা দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রম সূচিত হইয়াছে। মাতার অনাড়ম্বর পরিচ্ছদ ও স্থূল কাষ্ঠপাদুকা সন্ন্যাসিনীর পরিচ্ছদ সূচনার জন্য অঙ্কিত বুঝিতে হইবে। এইরূপে চিত্রের প্রতিটি বিষয় বিশেষ কিছুর ইঙ্গিত জানাইতেছে। চিত্র দেখিয়া আমাদের মনে হয়, ইনি ঠিক যিশুমাতা নহেন, কিংবা কোন কৃষকপত্নীও নহেন। ইহা যেন মানুষের আমাদের প্রত্যেকের বা আমাদের মধ্যে কাহারো আত্মা, তাহার সর্ব্বপ্রিয় ভাবটিকে সস্নেহে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে।

এই ভাবটি পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, সর্ব্ব প্রথমবার সহসা এই চিত্র চক্ষুসম্মুখে ধরা দরকার। কেবল এইরূপে দর্শকের চিত্তের গূঢ়স্থান স্পৃষ্ট হইবে, এবং তিনি তাহার সহিত তাঁহার অন্তরের অত্যাশ্চর্য্য ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। আমি আর কোন যুগের আর এমন কোন চিত্রের কথা জানি না, যাহাতে হৃদয় তাহার কোমল মধুর ভাব এমন সুস্পষ্ট করিয়া পরিব্যক্ত করিতে পারিয়াছে।

গ্রন্থসমালোচনা।

দাক্ষায়ণী সতী, নাচনী বেহুলা এবং কালুব্যাধ [illegible] তিনটী প্রাচীন উপাখ্যান লইয়া শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তিনখানি ক্ষুদ্র গল্প রচনা করিয়াছেন। এই নব্যতার যুগে বহু পুরাতন এই তিনটি উপাখ্যান যদি আমাদের মন আকর্ষণ না করে তবে বলিব না যে গল্পের কিম্বা উক্ত তিন গল্পের নূতন কথক দীনেশ বাবুর দোষ। দোষটা সম্পূর্ণই আমাদের এবং এই ঘোরতর সাহেবিয়ানাগ্রস্ত কলিকালেরও বটে।

আমাদের ঘর বাহির যখন দেশীয় ছিল, যখন আমরা দেশীয় ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতাম তখন সম্পূর্ণ দেশীয় এই উপাখ্যানগুলির রসগ্রহণ আমাদের পক্ষে সহজ ছিল। যখন সতীর সহগমনের আদর্শ

গৃহে গৃহে বিদ্যমান তখন শিবনিন্দা শ্রবণে সতীর দেহত্যাগ আদুরে মেয়ের অভিমান বলিয়া ঠেকিত না; উপাস্য দেবতার প্রতি ভক্তি যখন আমাদের জীবন্ত ছিল তখন মনসার সহিত বাদ করিয়া চাঁদ সদাগরের সাত পুত্রের সহিত যথাসর্ব্বস্ব জলে দেওয়ার অর্থ বোকামি না বুঝিয়া আমরা অন্যরূপ বুঝিতাম, বেহুলাকে ফুল্লরাকে সতীকে সাবিত্রীকে আমরা জীবন্ত আমাদের ঘরে ঘরে দেখিতাম, উপাখ্যানের নায়িকা বলিয়া জানিতাম না এবং কাজেই এই উপাখ্যানগুলির যথার্থ মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম ও পুরাণ পাঠে চণ্ডির গানে প্রাণের সহিত যোগ দিতে পারিতাম। এখন আমাদের মঙ্গল প্রদীপের বদলে Electric Light, বধূর চরণে অলক্তকের বদলে সবুট মোজা, প্রাণের দুহিতা পূজার কয়দিন পিত্রালয়ে না আসিয়া 'ওয়ালটেয়রে' Changeএ চলেন, একালে এই প্রাচীন উপাখ্যানগুলি পড়িয়া হাসিবার কাঁদিবার অবসর বা ক্ষমতা আমাদের কোথায়? পাশ্চাত্য আদর্শের খর-আলোকে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে। এখন এই সকল প্রাচীন উপাখ্যানগুলিতে যে একটা স্নিগ্ধ অথচ অপূর্ব্ব জ্যোতি বর্ত্তমান সেটা আমাদের চোখে না পড়াই সম্ভব এবং সেই জন্য দীনেশ বাবুর ন্যায় মর্ম্মজ্ঞ লেখকগণের সাহায্য আমাদের লইতেই হইবে। আজ আমরা শিব হারাইয়াছি কাযেই সতীর মহিমা ব্যাখ্যা না শুনিয়া যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না; পতিকে দেবতা বলিয়া জানিতে শিখিতেছি না, পাতিব্রত্যের গৌরব, বই না পড়িয়া বুঝি কেমন করিয়া? চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলে তবে আমরা দেখিতে পাইব নচেৎ উপায় নাই। কোন কিছুর গুণ ব্যাখ্যা তখনই প্রয়োজন হয় যখন জিনিষটা সহজে বুঝিবার শক্তি আমরা হারাইয়াছি। আজ যে আমাদের প্রাচীন গল্পগুলি ব্যাখ্যা করিয়া দীনেশ বাবুকে বুঝাইতে হইতেছে সেটা এই কারণেই। দীনেশ বাবুর পুস্তক তিনখানি নূতন গল্পের বই বলিয়া না বুঝিয়া প্রাচীন কাব্যের ব্যাখ্যা বলিয়া ধরাই ঠিক এবং সেই জন্যই দীনেশ বাবু আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

যাত্রার দলকে Stageএ খাড়া করিয়া দিলে তাহার দুর্গতি অনিবার্য্য; তেমনি প্রাচীন গল্পগুলিকে আধুনিক ছাঁচে ঢালিয়া নবেল গড়িতে চেষ্টা পাওয়া একান্ত গর্হিত কার্য্য। প্রাচীনের গুণব্যাখ্যা শতবার কর দোষ নাই কিন্তু সেটাতে নূতন রং চড়াইয়া বাজারে ছাড়িলে অপরাধ অমার্জ্জনীয়। দীনেশ বাবু যদি সে চেষ্টা করিতেন তবে বন্ধু বলিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিতাম না।

আমার ঘরে নিতান্ত জীর্ণ প্রাচীন কালের একখানি বারানসী সাটী আছে—তাহার কারুকার্য্য অতি অপূর্ব্ব, জরীর পাড়টুকু এবং বাসন্তী রংটা কালে কালে ম্লান হইয়া এমন স্নিগ্ধরূপ ধারণ করিয়াছে যে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়—আজ যদি কোন আমার প্রিয় বন্ধু সেই সাটী লইয়া বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে নিজের খরচে সেটাকে নূতন রঙ্গাইয়া আমার সম্মুখে — তবে মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে তাঁহাকে শাপ

it often...
omething th... ও সেকালের মেয়ে। তাহাদের ধরিয়া সভ্য

করিবার চেষ্টায় যে একটা দারুণ নিষ্ঠুরতা আছে সেটা অনে- লেখক ভুলিয়া যাইতেছেন এবং সেই জন্যই সাহিত্য মঞ্চে সে- 'খনা' ক্ষণদারূপে নবেলের Heroine সাজিয়া প্রকাশ পাইতে পাইতেছি।

আমাদের সৌভাগ্য যে দীনেশ বাবুর গ্রন্থ তিনখানি ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ লইয়া এক একটা ঘোরতর দার্শনিক উঠে নাই এবং সেটাও আবার আমাদের কিনিয়া আনিয়া প- আদায় করিতে—আদ্যোপান্ত মায় বিজ্ঞাপন পড়িয়া উঠিতে হয়

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আজকাল চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে স্বদেশভক্তি প্রেমের চর্চ্চা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইতেছে। উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত হওয়া উচিত। এ- ধর্ম্মাবলম্বী লোকেই যে স্বদেশসেবক হইতে পারে- যয়ে সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনে ইহা একটি প্রধান শিক্ষনীয় বিষয়। পাদরীগণ খৃষ্টশিষ্য হইলেও এক আধজন বাদ দি- ভারতবর্ষের লোকদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য চে- না; তাঁহারা নিজেদের জাতভাই রাজকর্ম্মচারী- মিলিয়া মিশিয়া আনন্দে কালযাপন করেন, ও- মতেই সায় দেন। ভারতবর্ষীয় খৃষ্টানেরা অধিকাং- সকল পাদরীদের আশ্রিত বলিয়া বিদেশীভাবাপন্ন সকলে এরূপ নহেন। খৃষ্টান হইলেই জাতীয়তা হইবে, এমন কোন কথা নাই। সুখের বিষয় অন্যান্য দেশী লোকেরা খৃষ্টান হইলেই যেমন একটা বিজা- লইয়া ফিরিঙ্গি সাজিয়া বসেন, বাঙ্গালী খৃষ্টানেরা তাহা করেন না। স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাঁদের অগ্রণী ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সাহেব ছিলেন না, প্রাচ্যজাতীয় ছিলেন। তাঁহার ও যোগ প্রাচ্য রকমের ছিল। এই জন্য, এবং ধর্ম্ম- কৃষ্ণকায়ের প্রতি অবিচার দেখিয়া, তিনি পাশ্চা- খৃষ্টানসম্প্রদায়ের নানা মতের নাগপাশ ছিন্ন করি- খৃষ্টীয়-সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন।

কালীচরণ বাবুর জীবন হইতে আমরা আর একটি শিক্ষা লাভ করি যে সর্ব্ববিধ সংস্কার পরস্পরসাপেক্ষ। দেশের সকল সৎকাজের সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল। তাঁহার চরিত্র হইতে আর একটি শিক্ষনীয় বিষয় এই যে ঔদ্ধত্যের সহিত স্বাধীনচিত্ততা ও তেজস্বিতার কোন সম্পর্ক নাই। তিনি মধুর নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন; কিন্তু কখন নিজের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করেন নাই।

স্বর্গীয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র ও পুত্রবধূ ডিউক এবং ডচেস্ অব কনট্ ভারতভ্রমণ করিতে আসিয়াছেন। ইহাঁদের পূর্ব্বে বর্ত্তমান যুবরাজ ও তৎপূর্ব্বে বর্ত্তমান সম্রাট প্রভৃতি রাজবংশীয় লোকেরা ভারতভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে ফল কি হইয়াছে? ভারতের রাজকোষের টাকা জলের মত খরচ হইয়াছে, দেশীয় রাজারা অনেকে অতিথিসৎকারের জ্বালায় জ্বালাতন ও ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। অন্য দিকে রাজবংশীয়গণ আমাদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই সার্টিফিকেট দিয়াছেন যে ভারতবাসীরা রাজভক্ত। এইরূপ ছেলেভুলান ব্যাপার কত কাল চলিবে? আমরা যদি রাজভক্ত, তাহা হইলে অস্ত্র আইনটা কেন রহিয়াছে ও উহার কঠোরতা কেন দিন দিন বাড়ান হইতেছে? আমাদিগকে যদি রাজভক্ত মনে কর, তাহা হইলে দেশী কোনও লোককে কোনও উচ্চ সৈনিক কার্য্যে কেন নিযুক্ত করা হয় না? দেশী সাধারণ সৈন্যগণকে খারাপ বন্দুক ও গোরা সৈন্যদিগকে ভাল বন্দুক কেন দেওয়া হয়? উপযুক্ত হইলেও দেশী লোকদিগকে উচ্চ শাসনকার্য্যে কেন নিযুক্ত করা হয় না?

কুমিল্লায় হিন্দুমুসলমানে যে ঝগড়া বাধিয়াছে, তাহা ঘোর পরিতাপের বিষয়। হিন্দুমুসলমানের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আচারে প্রভেদ আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মিল হইতে পারে। ধন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চরিত্র এবং রাজনৈতিক অবস্থা ও অধিকার, এই সকল বিষয়ে একের উন্নতি অপরের উন্নতির অন্তরায় নহে; উভয়ের উন্নতি পরস্পরসাপেক্ষ। শিল্পবাণিজ্যে, শাসনকার্য্যে ইংরাজের একচেটিয়া প্রভুত্ব না কমিলে, এবং তৎপরে ক্রমশঃ লোপ না পাইলে কাহারও মঙ্গল নাই। কিন্তু এই অবস্থায় পৌঁছিতে হইলে উভয় সম্প্রদায়ের একযোগে কাজ করা দরকার। হিন্দু মুসলমানকে চাপা দিয়া রাখিবেন, বা গলা টিপিয়া ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবেন, ইহা যেমন অসম্ভব, মুসলমান আবার প্রভুত্বলাভ করিবেন, ইহাও তেমনি অসম্ভব। ইংরাজ যদি মুসলমানের পিঠ চাপড়ান বা মুসলমানকে ২।৪টা কেরাণীগিরি বা দারোগাগিরি দেন, তাহা নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, হিন্দুমুসলমানে ঝগড়া বাধাইবার জন্য, মুসলমান-প্রীতির জন্য নহে। ইংরাজ যে মুসলমানকে ভয় করেন, বা হিন্দুরা মুসলমানকে ভয় করিবেন, ইহা মনে করাও বাতুলতা মাত্র। ইংরাজ যখন ছলে বলে কৌশলে ভারতের রাজা হন, তখন রাজশক্তি মোটের উপর মুসলমানের হাত হইতে হিন্দু ও শিখের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল। এই সকল কথা ভাল করিয়া বুঝা উচিত। ইংরাজ-প্রভুত্ব চিরস্থায়ী হইবে না; কিন্তু হিন্দুমুসলমানের ভারতবর্ষবাস স্থায়ী। কেহ কাহাকে নিজের অধীন বা দাস করিতে পারিবে না। অথচ একে অপরের সঙ্গে মিলিয়া কাজ না করিলে কাহারও মঙ্গল নাই। এক ভগবান উভয়েরই শ্রষ্ঠা; এক ভগবান্ উভয়েরই সহস্র দোষ ও অপরাধ সত্ত্বেও উভয়কেই সমভাবে বাতাস জল ও অন্ন দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতেছেন; কার্য্যতঃ দেখিতেছি অভাবে পড়িলে, দুর্ভিক্ষে, হিন্দুকে মুসলমান সাহার্য্য করেন, মুসলমানকে হিন্দু সাহার্য্য করেন; অনেক উৎসবে আমোদে সৎকার্য্যে উভয় দলে বন্ধুত্ব দেখা যায়; তবে কেন উভয়দলে ঝগড়া করিয়া শ্বেতকায় শত্রুর আনন্দ ও বল বৃদ্ধি করেন?

বর্ত্তমান সংখ্যায় মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধরের যে চিত্রখানি দেওয়া গেল, তাহার নাম তিনি "রামপঞ্চায়তন" রাখিয়াছেন সীতা ও রাম সিংহাসনে আসীন। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমান যথাযোগ্য ভাবে দণ্ডায়মান।

ষষ্ঠ ও সপ্তম বৎসরের প্রবাসী।

বর্ত্তমান বৎসরের প্রবাসী সমস্ত সংখ্যা আর পাওয়া যায় না। প্রথম বৎসরের প্রবাসী পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় বৎসরের ও প্রায় সেই দশা। অন্যান্য বৎসরের প্রবাসীও ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতেছে। সুতরাং যাঁহার যে দরকার শীঘ্র লইবেন।

...নিগুলির
...গমনের আদর্শ

সপ্তম বৎসরের প্রবাসী আমরা কিছু বেশী ছাপাইতেছি। তাহা হইলেও বৎসরের শেষপর্য্যন্ত সমুদয় সংখ্যা দিতে পারিব কিনা সন্দেহ। অতএব যাঁহারা সমস্ত সংখ্যা নিশ্চয় পাইতে চান, তাঁহারা প্রথমেই গ্রাহক হইলে ভাল হয়। এরূপ বলায় আমাদের স্বার্থ এই যে প্রথম হইতে বেশী টাকা হাতে আসিলে আমরা নির্ভয়ে কাগজের উন্নতির চেষ্টা করিতে পারি, এবং বৃথা ঘর বোঝাইও হইয়া থাকে না। কোন বৎসরের প্রবাসীই যে পড়িয়া থাকিবে না, আমরা জানি। কলিকাতার পটলডাঙ্গায় হারিসন রে ধারে অনেক প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রের পুরাতন সংখ্যা পাই প্রবাসী পাইবেন না। অন্ততঃ আমরা চেষ্টা করিয়াও নাই এবং অন্য অনেকেও পান নাই।

৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।